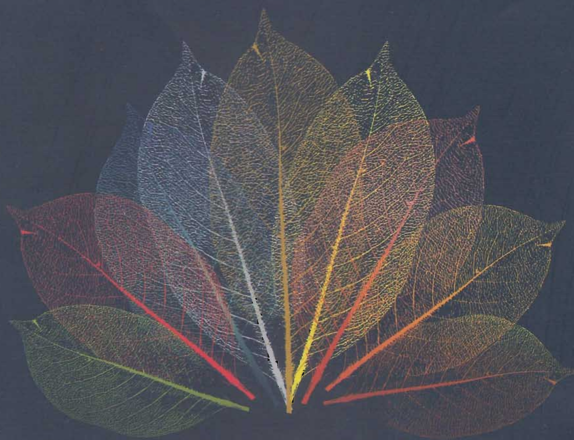
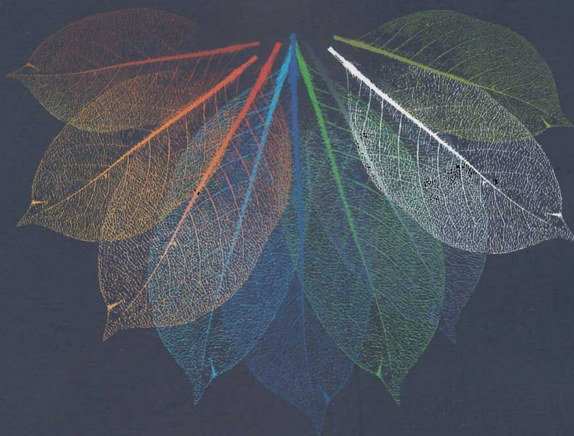


সমকাল

ঈদ সংখ্যা ২০১৬



সম্পাদক
গোলাম সারওয়ার

প্রকাশক
এ. কে. আজাদ

ঈদসংখ্যা সম্পাদক
মাহবুব আজীজ

সম্পাদনা সহযোগী
আহমাদ শামীম ।। সঞ্জয় ঘোষ

বিভাগীয় সম্পাদক
রঞ্জু চৌধুরী ।। মীর সামী

প্রচ্ছদ
আনিসুজ্জামান সোহেল

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা
আবুল খায়ের চৌধুরী

বিপণন ব্যবস্থাপনা
অমিত রাইহান

বিজ্ঞাপন সমন্বয়
মিজানুর রহমান

অক্ষর বিন্যাস
মো. আলী হোসেন

পৃষ্ঠাবিন্যাস ও গ্রাফিক্স
বোরহান আজাদ

গ্রাফিক্স সহযোগিতা
এস ইউ শাহীন
ফরিদুর রহমান

মুদ্রণ সংশোধন
শাখাওয়াত হোসেন

মুদ্রণ ও উৎপাদন
মিজানুর রহমান ।। ফয়সাল আহমেদ

মূল্য
২০০ টাকা



প্রকাশক কর্তৃক ঈদ সংখ্যা ২০১৬ টাইমস মিডিয়া লিমিটেড
১৩৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : ১৩৬, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
টেলিফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৪, ৮৮৭০১৯৫, ৮৮৭০১৯২
ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯০, ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭০১৯৬
ইন্টারনেটে পড়ুন : www.samakal.net



সমকাল

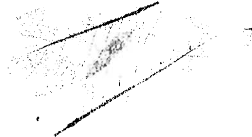
ঈদ সংখ্যা ২০১৬

সম্পাদকের কথা

আমরা এখন এক দুঃসহ, অস্থির সময় অতিক্রম করছি। সর্বত্র অস্বস্তির বাতাবরণ। উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিচ্ছে। মুক্তমনা থেকে শুরু করে সমাজের নানা স্তরের মানুষ তাদের জিঘাংসার শিকার হচ্ছেন। তবু জীবন তো থেমে থাকে না। বহতা নদীর মতো প্রবহমান এ জীবনে আমরা সুখের সন্ধান করি। পবিত্র সিয়াম সাধনা শেষে ঈদ যেন সেই সুখের বন্দর। এবারের রমজানের দিনগুলো সুদীর্ঘ। কখনও অসহনীয় গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত; কখনও 'বহুযুগের ওপার থেকে' আসা আষাঢ়ের জলভরা মেঘ ও বাতাসের শীতল শিহরণ। সিয়াম সাধনার দিন প্রায় শেষ। ঈদের অনাবিল আনন্দ আমাদের প্রাণ-মন স্পর্শ করবে, তারই অপেক্ষায় আমরা। জীবনের যাবতীয় কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, অপ্রাপ্তি সবকিছু ভুলিয়ে দেবে ঈদ উৎসব। এই উৎসবে সমকালের সাহিত্যসম্ভার 'ঈদসংখ্যা সমকাল' পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দের পাশাপাশি কিঞ্চিৎ নির্ভারও বটে। প্রতিদিনের সমকাল প্রকাশ ছাড়াও এবার আমাদের আরও দুটি আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ২৯ মে 'ব্র্যাক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান উৎসব, বারো বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ১ জুন সমকালের শুভার্থীদের নিয়ে আনন্দমেলা। সকলের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সমকাল পরিবারের আন্তরিক প্রয়াসে অনুষ্ঠান দুটি সম্ভবত আমরা সুচারুরূপেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। এরই পাশাপাশি সমকাল এই প্রথম প্রকাশ করেছে একটি দৃষ্টিনন্দন 'ঈদ ফ্যাশন ২০১৬'। আশা করি, এই আয়োজনও আপনাদের ভালো লাগবে।

এবারও পাঠকের বিশাল প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রবীণ-নবীনের শ্রেষ্ঠ রচনায় 'সমকাল ঈদসংখ্যা' সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি বলে আমাদের বিশ্বাস। একই সঙ্গে আমরা সবিনয়ে আমাদের অক্ষমতার কথা অকপটে স্বীকার করে বলব, সাহিত্যগুণে গুণান্বিত, চমৎকার অনেক লেখাই আমরা ছাপাতে পারিনি শুধু কলেবর সীমিত রাখার বাধ্যবাধকতার কারণে। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, এসব লেখা ছাপা হলে 'সমকাল ঈদসংখ্যা' আরও সমৃদ্ধ হতো। তাদের সকলের কাছে আমাদের বিনীত ক্ষমাপ্রার্থনা।

আশা করি, সমকালের এবারের ঈদসংখ্যা আপনাদের ভালো লাগবে, বরাবরের মতোই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ঈদ মোবারক।





সমকাল
ঈদ সংখ্যা ২০১৬

|সূ|চি|প|ত্র|

উপন্যাস

দুর্লভ

সবিশেষ



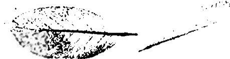


সমকাল
ঈদ সংখ্যা ২০১৬

|সূ|চি|প|ত্র|

আখ্যান

গল্প





সমকাল

ঈদ সংখ্যা ২০১৬

|সূ|চি|প|ত্র|





সমকাল

ঈদ সংখ্যা ২০১৬

সূচিপত্র





সমকাল

ঈদ সংখ্যা ২০১৬

|সূ|চি|প|ত্র|





সমকাল

ঈদ সংখ্যা ২০১৬

|সূ|চি|প|ত্র|







আল মাহমুদ
তোমার পৃষ্ঠে শীতল হস্ত

চলতে চলতে বলতে চেয়েছি আমার কথা
পৃথিবীর বাঁক পাড় হয়ে যাই শুধু কথকতা
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এ দেনা মিটিয়ে চলেছি অন্তে
গোধূলির আলো আমাকে ঘিরেছে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে
শূন্য এ হাত নামে কালোরাত ধীরে অতি ধীরে
তবু ভালবাসি মানুষের ভিড়ে মেশামেশি করে
চলতে থাকা

আমার ঠাণ্ডা শীতল হস্ত তোমার পৃষ্ঠে
ছুঁইয়ে হাঁটছি কে জানে কোথায়
নাম ধরে ডাকে আমারই তো নাম
দ্বিধা থরথর চলছি সামনে বলতে এবার
নিজের খবর
শুধু এইটুকু রয়েছে তো বাকি একটি বিষয়
হাত তুলে বলে আমারই বিজয়,
আমি অক্ষয়-অনন্ত গতি
মতি স্থির করে চলছি সামনে পেরিয়ে আঁধার
আমার চলার অন্ত হবে কি পথের উপরেই
কে জানে কোথায় সমাপ্তি চাই
হাত তুলে বলি আমিই বিজয়ী
খেলা শেষ হলো, বেলা শেষ হলো
মেলা ভেঙ্গে গেছে
আমিই বিজয়ী

মহাদেব সাহা
নৃত্য থামাও, বুড়ো ভাঁড়

এই বুড়োবালককে একটুও লাই দিও না আর
দেওয়া উচিতই নয়, যার এত ক্ষুধা, তাকে;
শেখাবে অগ্নি, নিষিদ্ধ নিঝুম ফল, যত পারে নুন,
শর্করা আমিষ
মেতে উঠবে উরুতে ভুরুতে;
এই মৎশিকারি লোভী লোকটাকে নির্ভর করো না।
দেখবে তোমাদের শহরের রাস্তাগুলি সব আঁশটে গন্ধে ভরে দেবে
এতো কে সইবে, কোন নারী, সংসার, সমাজ, জাতিসংঘ এমনকি
জীবন?

কেউ না, কেউ না; সকলেই মৃদু হেসে চলে যাবে
বাজবে মাদল, বাঁশি, ঢোল, তার পায়ে শুধুই ভুল নৃত্য
ঘুঙুর বাজতে থাকবে পা হবে পাথর;
এই বেয়াড়া বুড়োকে আর মাঝরাতে শহরে নামতে দিও না
বুড়ো ভাঁড়, নাচা-গাওয়া খুব হলো, ভাঙা গলায় আর কোকিলের

ডাক নয়,
কেন আর ভাঙবে এস্রাজ,
দিঘির পদ্ম সব তছনছ করবে দুহাতে?
অসুস্থ অস্থির এই জীবনকে কেউ কবি বলতে চাও, বলতে পারো
তাতে কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না;
এই জীবনের জিহ্বায় সে ছুঁয়েছে গরল
করেছে নিজেরি বিনাশ, অন্ধকারে দিয়েছে ঝাঁপ জংলা নদীতে,
বুড়ো ভাঁড়টাকে সামলাও, কেউ দেখবে না তার জলনৃত্য
কারো চোখ ভিজবে না, বিষাদ হবে না।

আসাদ চৌধুরী
ভীমরতি

নদী কি ঘাটে এসে
নিজেকে খুঁজে পায়?
নদীর কথা ছাড়া,
এমন কি সাগরও ...
ঠাকুর জানালেন
সাগর নাকি বলে
'আমি তো আর নাই।'
কী ক'রে ভাবো তুমি
তোমার কাছে ভিড়ে
বলতে পারি শুধু
'এই তো আমি আছি,
তোমার কাছাকাছি।'

কিন্তু ওষ্ঠের
শুধুই বিড়-বিড়
'আমি তো আর নাই।'
বাউল এ বাণীর
মর্ম ঠিক বোঝে,
কিন্তু যাকে বলা
তিনি কি বুঝলেন?



নির্মলেন্দু গুণ
অগ্নিতে যার আপত্তি নেই

থামাও কেন? গড়াতে দাও,
গড়াক;
জড়াতে চায়? জড়াতে দাও,
জড়াক।

যদি পাকিয়ে ওঠে জট,
তৈরি হবে নতুন সংকট।
সুখ না হলে দুঃখ দিয়ে
পূর্ণ হবে ঘট।

ডরাও কেন? এগোতে দাও
জাগুক;
সরাও কেন? এগোতে দাও
লাগুক।

জীবন শেষে মরণ হয়,
মরণ শেষে হয় কী?
অগ্নিতে যার আপত্তি নেই,
মাটিতে তার ভয় কী।

অলঙ্করণ : : ধ্রুব এষ

বেলাল চৌধুরী
অতীতের তোমাকেই

তোমাদের এখানেই তো বিদ্যুতের উৎপত্তি
তোমরাই তো জানা-অজানা চেনা-অচেনা
সকল চাওয়ার প্রয়োজন মেটাতে প্রস্তুত থাক
সর্বদা অন্যকে আলো দিয়ে সুখী করাই
তো জানতাম তোমাদের কাজ।
আজ কেন এমন হচ্ছে! কেন নিভছে বিদ্যুৎ!

বারবার কেন ফিরে যেতে হচ্ছে
পেছনের দিকে, কেন খুঁজতে হচ্ছে

মোমের শিখা, মোমের আলো!

আমার মন বলছে মোমের আলো
অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিতে বার
বার সামনে আসছে পুড়ে পুড়ে জানিয়ে
দিচ্ছে আমাদের অতীতকে ভুলে যেতে
নেই। বলে দিচ্ছে অতীত আবেগের অনুভব।

অতীতের অভিজ্ঞতা অতীতের ইতিহাস
অতীতের মমতা অতীতের জ্ঞান সবই সুন্দর
বর্তমান বলে তো কিছু থাকছে না হাতে
বুঝতে পারছি সকালের তুমি কীভাবে
বিকেলেই অতীত হচ্ছো।
আমি তাই অতীতের তোমাকেই চাই।
তুমি কি আমার হচ্ছো?

সানাউল হক খান
বয়স্ক কষ্ট

দুঃখেরা মাঝে-মধ্যে কাঁদে, কেউ তারে কাঁদায়
কষ্ট কিন্তু চুপচাপ নিরিবিলি থাকে
কুড়িয়ে পাওয়া আর হেলায় হারিয়ে ফেলা
শৈশবের ঘুড়ি-লাঠিম,
রঙিন মার্বেল, চোর-পুলিশের দুমড়ানো চিরকুট
কষ্টে আছে ধুলোর প্রসাধন-মাখা
দিদা'র জলকলস
দুঃখ ছাড়া ওসবের জন্যে আজ কিছুই করি না
কৈশোর খুব কষ্টে আছে
তারে একটু খুঁজতেই দেখি
বুক-পকেটে ভাঁজ-করা দুঃখের চিঠি
তাতে নির্ভুল বানানে লেখা দীর্ঘশ্বাস
কষ্ট তো দুঃখের অগ্রজ
চোখের জলজ রেখা
মাঝে-মধ্যে কাঁদে
কেউ তারে কাঁদায় একা
কষ্ট খুব চুপচাপ নিরিবিলি থাকে
তার কতোটা বয়স হলো
কেউ কি গুনে রাখে?

মুহম্মদ নূরুল হুদা
হে দয়াময় হে মায়াময়

মানুষের জন্যে খুব দয়া হয়
মানুষকে মানুষ থাকতে দাও দয়াময়
মানুষের জন্যে খুব মায়া হয়
মানুষকে মানুষ থাকতে দাও মায়াময়

মানুষেরা অমানুষ হয়ে গেলে
শুধু মানুষেরই ক্ষয় হয়
মানুষকে মানুষ থাকতে দাও দয়াময়

মানুষেরা অমানুষ হয়ে গেলে
শুধু পশুদেরই জয় হয়
মানুষকে মানুষ থাকতে দাও দয়াময়

ভয় হয়, খুব ভয় হয়
মানুষকে মানুষ থাকতে দাও দয়াময়
মানুষকে মানুষ থাকতে দাও মায়াময়



নাসির আহমেদ
আয়নার ভেতরে

আয়নায় তাকাতে ভয়ে জড়োসড়ো হই অকস্মাৎ
আশ্চর্য ঘোরের মতো আমার মুখের মধ্যে অন্য কারও মুখ!
এ কোন বিভ্রম তবে, শব্দ করে আয়না ফেটে যায়
দেখি সেই বিচূর্ণ আয়নায় গল্প বলে যায় আমারই নানির মুখ।
আমার শৈশব এসে কেন আজ মুছে দিল দীপ্র বর্তমান
কে শোনায় রূপকথা আমার নানির মুখে আয়নার ভেতরে!
ভয়ে জড়োসড়ো আমি, রাক্ষস-খোক্কস স্নায়ুকোষে
রাজকুমারের ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে অরণ্যের গহিন ভেতরে।
বন্দিনী রূপসী রাজকুমারীর শরীরের অর্ধাংশ পাথর
তাকে উদ্ধারের জন্য রাজকুমারের এই তীব্র অভিযান
স্নায়ুতে লতিয়ে ওঠে হারানো শৈশব আর শৈশবের গল্পগাথা
নানির সুরেলা গান এবং মায়াবী মন্ত্র অন্ধ জাদুকর।
নিজের ঘরকে আজ নিজেরই অচেনা লাগে খুব
কে যেন আমাকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় এখন
নানির ফোঁকলা দাঁতে হাসির রহস্যময় সেই রূপকথা
আমাকে ভ্রমণে নিচ্ছে বর্তমান ছেড়ে কোন সুদূর অতীতে।
আয়নার ভেতরে দেখি বাগদাদের রাজপথে গভীর রাত্রিতে
মরুভূমি পার হয়ে আসা ঘোড়াগুলো ছুটে যাচ্ছে দ্রুত
ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে উঠে তাকাতেই দেখি
শেভিং লোশন মাখা শাদামুখ এ যে আমি আমারই বেসিনে!



মাহমুদ আল জামান
চলে যাচ্ছে কেন

হাসপাতালে শুভ্র বেডে শুয়ে
একটি সুবর্ণশ্লোক বুকে নিয়ে তুমি যখন চলে যাচ্ছো
উন্মূল বাসনা আর গৃহহীন বোধ
তোমাকে আবারো কুরে কুরে খাচ্ছে
অস্থির ব্যূহজালেও
ভিটেমাটি নকশা বুনে দিয়েছে তোমার শরীরে
কেন যাবে সবিতা? তোমারও তো প্রেম আছে
মৃত ভ্রাতার স্মৃতি আছে
দেখ, আবারো নিসর্গ হয়ে উঠছে গাঢ় সবুজ
নদীতে প্রগাঢ় শব্দ জলের, ছল্ছল ছল্ছল
কোথায়ও কেউ নেই তবুও
এই বৃক্ষ লতা প্রার্থনায়
তোমাকে দেবে মোহন শব্দের প্রতিভাস

ভয়ঙ্কর, শূন্যতা বুকে নিয়ে
মানুষ হাঁটছে এখন রাজপথে–
নিঃসঙ্গ তাড়া করছে মানুষকে
নীল সাদা হয়ে যাচ্ছে

কুরে কুরে অন্ধকারে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে অন্ধকারে
দামামা বাজায় স্বেচ্ছাচারী,
সবকিছু তছনছ করে

তুমি যেও না, এই হাসপাতাল, এই
তোমার উন্মূল বাসনা
একদিন তো কথা বলবে, শূন্যতায়, শূন্যতায়

কামাল চৌধুরী
সমুদ্র বিলাস

দিনমান ক্ষয়ে যাওয়া উজ্জ্বলতা, তোমাকে ডাকবো আমি গোধূলিবেলায়
তোমাকে ডাকবো আজ প্রলম্বিত জখমি চিৎকারে
নোনা রাতে তপ্ত ঠোঁটে, মাস্তলের সমুদ্র বিলাসে
অবগাহনের শেষে ফিরে আসা জলে
জলোচ্ছ্বাসে-সংকেতে ইশারায়

এই প্রতি টানে, ধেয়ে আসা জলে, জন্ম নেবে সম্পর্কের কোলাহল
জন্ম নেবে অসম্পূর্ণ ঘরের তৈজস
নিস্তব্ধতা ভেঙে গেলে
আমাদের পাঠক শরীরে শোনা যাবে জাহাজের বাঁশি
সেখানে রুপোলি রাতে আমাকেই ডেকে নিও ফের
অতর্কিত আলিঙ্গনে, জীবিত জোৎস্নায়...



মুহম্মদ সবুর
জীবনে চলার পথে

জীবন মানে এ্যাত্তো কিছু সয়ে যাওয়া,
বয়ে যাওয়া
হরেক রকম হট্টগোল আর সুখ-শান্তি
নামের কল্পগাথা খুঁজে-খুঁজে ক্লান্ত হওয়া।

একটাই তো জীবন আর একটাই তো ভুবন
আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে হাজার স্টেশন
কোথায় নামবো, থামবো কোথায়, দেবো কোথায় ছুট
এপার নরক ওপার স্বর্গ মধ্যিটাই বিদ্‌ঘুট।

মৃত্যুমুখী ধ'রে রাখা কেবল একটা জীবন
ব্যর্থ-সফল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আগুনেই ম্লান
দিনরাত্রি মেঘ কুয়াশায় ভেজা পাখির পালক
হাতে নিয়ে উড়াল দেয় হাজার-হাজার বালক
মাঝে-মাঝে উল্কা জাগে ভাঙে অভিমান
হৃৎপিণ্ডে পাথর ঘ'ষে জ্বালায় যে আগুন।

কেবল আসা কেবল যাওয়া, ছিল-নেই
নিয়ম ভেঙে দুমড়েমুচড়ে নিরন্তর এই
ব্যতিক্রমের অভিধানে অনায়াসে ঢুকে পড়া
সহজ নয়তো নিরূপদ্রবে জীবন গড়া
ঘুমুতে যাওয়া আর ঘুম ভাঙার
মধ্যিখানে এ্যাত্তো কিছু সয়ে যাবার
কঠিন কঠোর লোহার বেড়ির ভার
কেবল নত ক'রে ক্রমশ নিচে নামার।

ঝলসে যাবার আগে আর
মালিক, ভার তুমি দিও না কাঁধে আবার।

ময়ূখ চৌধুরী
মৃত্যুদৃশ্য

প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছিলো আমার– আলকাতরার চেয়েও ঘন থিকথিকে
সাব্যস্ত মৃতদেহটাকে গর্তের মধ্যে মাটি-চাপা দিয়ে
তারপর ফিরে গেলে যার যার জীবিত আস্তানায়।

আমার শিয়রে কয়েকটা আগরবাতি তখনও উড়ছে,
তার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে আসছিল গেরুয়া গন্ধ–
আমি বিভোর, আমি কৃতজ্ঞ।
মাত্র একটা বৃষ্টি হতে দাও, দেখবে–
নয়টা আগরবাতির বিনিময়ে ঠিকই পাঠিয়ে দেব
উদ্গাত ঘাসের সবুজ, যার অজস্রতা গুনতে গুনতে
তোমরা পৌঁছে যাবে আমার কাছে

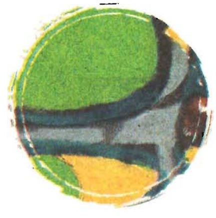
তখন আমি জানতে চাইব তার কথা
যে আমার পাশে শুয়ে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল।

আমার চোখ দুটো তৃণের শিকড় বেয়ে কীভাবে উঠে আসছে দ্যাখো,
কাণ্ড বেয়ে, ডাল বেয়ে চূড়ান্ত সূক্ষ্মতায়।
তোমরা তাকে দেখতে পাচ্ছ–
ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যে আমার মরদেহ দেখতে আসেনি?
আমি আজও জীবিত
তার চোখে!



হাসান হাফিজ
প্রশ্ন তুমি রহস্য-ঘুঙুর

জীবন কী শুধুমাত্র বেদনামন্থন?
হাইব্রিড আঁধারের চাষ?
আলো বলতে কিছু তবে নাই?
কার কাছে জিজ্ঞাসার সদুত্তর পাই?
ভেবে দ্যাখো ওরে আউলা মন
উত্তর না পেলে খুঁজে
ডোবো চোখ বুজে
ডেকে আনো আত্মঘাতী সঘন সন্ত্রাস
সরল বাংলায় বলে
সাড়ে সর্বনাশ!
জীবন তাহলে কী
প্রশ্নই চলেছে বেজে
রহস্য-ঘুঙুর হয়ে
নৃত্যশীলা এই ছন্দের
কোনোরূপ কপটতা নাই
ধুকপুক বিরতিহীন
বাঁচার তিয়াসা তবে তীব্র কেন এত
মৃত্যুকে লাঞ্ছন দিয়ে
জীবনেরই কাছে ফিরে যাই



ফারুক মাহমুদ
অন্ধ দস্যু

কপাট ভাঙার শব্দ। বলতে পারো আমি সেই দস্যু
চোখের বন্ধনে নয়। অনন্তের। রয়েছি প্রস্তুত

কর্মহীন টিকে থাকা ক্লান্তিকর। হাতে-গোনা সংখ্যা
পাথরে প্রজ্ঞার মুখ! স্তূপাকার- শ্রমের কঙ্কাল

যথেষ্ট হয়েছে জড়ো। জড়বস্তু। অসার গর্জন
কোন কাজে লাগে বলো থিতু মেঘ! প্রতিভার বর্জ্য

দাঁড়াবে সামর্থ্য পায়ে। কেউ বলে, কর্মটা স্পর্ধার
মনের জানালা থেকে খুলে ফেলো দমবন্ধ পর্দা

নির্মাণ যথেষ্ট নয়। পড়ে থাকে পথচ্যুত চুমু
দুচোখে অনড় কান্তি। ঝড় নেই ব্যগ্র ও তুমুল

পিছনে প্রসন্ন মেঘ। বিভীষিকা উঁচু নিচু ধ্বংস
আমার কী কাজ বলো পুষে রাখা মৃত্যুর সংশয়

কোন চোখে নোনাজল, কোন চোখে জন্ম নেয় অশ্রু
কেউ না জানিল যদি.... জানা আছে অন্ধ এ দস্যুর

মুজতবা আহমেদ মুরশেদ
অপাপ

অস্বীকার করে তো কোথাও চলে যাওয়া যায় না!
অন্তর উৎসারিত ঘৃণা, দ্রোহ, ক্রোধ সাথেই থাকে– নির্মাণ করে আগামী।
চারদিকে আগ্রাসী আগুন লপলপিয়ে হাঁকে মানুষের চৈতন্যর আলপথ ছিঁড়ে খুঁড়ে।
ক্ষুধার্ত হরিণের সাথে আগুন তখন ধাবমান ধরিত্রীর কোনায় কোনায় নতুন সুরে।

অস্বীকার করে তো কোথাও চলে যাওয়া যায় না!
বাতাসেরা হার্পুণ হয়ে মেঘের ভেতর ছিঁড়ে নামিয়ে আনে ঝড়ের মিনার!
খণ্ড খণ্ড ঝড় নিনাদে নিনাদে প্রবল তৃপ্তিতে প্রোথিত হতে থাকে গভীরে মাটির
প্রয়োজনীয় বীজ হাতে আর উচ্চস্বরে চিৎকার করে ডাকে,
আসুক আসুক অচঞ্চল মানুষের দিন সূর্যালোকে।

অস্বীকার করে তো কোথাও চলে যাওয়া যায় না!
আমিও অস্বীকার করিনি প্রোমিথিউসের জীবন আর সভ্যতার স্মারক এবং তোমাকে।
দুরন্ত ঝড়, তাণ্ডব, ঘৃণা, ক্রোধ আর দ্রোহ– করিনি অস্বীকার আমিও কোনো কিছুকেই...
প্রদীপের শেষ শিখাটুকু পেতে অস্বীকার করিনি লড়াইয়ের ভূমি আমি কখনো ভুলে।

অস্বীকার করে তো কোথাও চলে যাওয়া যায় না !
আমিও যাইনি চলে! তুমিও কোথায় তবে চলে যাবে আমাকে ফেলে !

মারুফ রায়হান
মমির মতন প্রেম

প্রেমভিক্ষা অসম্ভব। উঠুক হৃদয়ে মরুঝড়
থাকুক নিভৃতে মূক অনিঃশেষ নির্জন নির্ঝর
বয়স জানিয়ে দ্যায় সম্পর্কের গতি, বহু মাত্রা
যদিও শুরুতে শুধু মোহ, একমুখী অভিযাত্রা
তিনটি দশক টানটান উপেক্ষার অভিনয়
শেষাবধি ওষ্ঠচ্যুত অনুরাগ– বিশুদ্ধ বিনয়
বিমূর্ত ঈর্ষার কষ্ট গচ্ছিত ছিল কি দূর গৃহে
নিষ্ঠুরার ওষ্ঠ নিলো তুলে যত্নে সঘন সাগ্রহে
আয়ু ফুরোবার আগে এ প্রাপ্তি সামান্য নয় মানি
শূন্য প্রেম-পানপাত্র– প্রেমিকের সমূহ সম্মানী
একতরফের প্রেম সতত গোপন অভিপ্রায়
সর্বস্ব হারিয়ে ঠিকই একদিন সমগ্রতা পায়
স্বীকৃতি চায়নি ভালোবাসা, তবু পুড়লো প্রবল
মমির মতন প্রেম চিরজীবী বিদগ্ধ বিহ্বল॥

টোকন ঠাকুর
আয়েশি পদ্য

মেঘ, ভাল্লাগলে এসো আমার বাসায়

তোমাকে আমি ধরে রাখব ভাষায়
ভাষা, পৌছুবে কোন দেশে!
সেখানে কেউ ভিজতে ভিজতে
নিউমোনিয়ায় মারা যাবে
মেঘ, তোমাকে ভালোবেসে
তার আগেই তো পদ্য লিখে আমি
ভেসে গিয়েছি গানে
কে আর তা জানে?





রেজাউদ্দিন স্টালিন
হেমন্তের রাত্রি

হেমন্তের এ রাত্রি আরো গভীর হলো গানে
রবীন্দ্রসঙ্গীতও ছিলো আকাশের উদ্যানে

চাঁদের সভায় শ্রোতা ছিলো সহস্র জোছনারা
বাউল ছিলো বৃক্ষরা আর তারারা একতারা

হারানো দিন উঠলো কেঁদে শিশিরাশ্রু জল
ভিজিয়ে দিলো মনের মাটি স্মৃতিরা সম্বল

কোথায় কবে ছেলেবেলা নদীতে ঝাঁপ দিত
সারা বিকেল পাখির ডানায় পূর্ণ সমর্পিত

ছবির প্রিয় নায়িকাগুলো উঠলো জেগে ফের
মিললো যেন স্বীকৃতি আজ নিঃশব্দ প্রেমের

মাহবুব কবির
মায়ের ভাষা

হাল্কা বৃষ্টির পরে জঙ্গলের গন্ধ কী আদিম।
কীটপতঙ্গের একটানা হাসি চিৎকার গানের মধ্যে–
নীলচে জিভ বের করে লকলকিয়ে কী দেখায় ধাড়ি
গুইসাপ?
কাঠরিড়ালির দৌড়ের ওপর নেউলের চকিত ভ্রূক্ষেপে
আমার শৈশব লাফিয়ে ওঠে।
আর বিকেলের সামান্য নিচে বসে
আদিবাসী কবিবন্ধুটি বলে–
সে আর বাংলায় লিখবে না, মায়ের ভাষায় লিখবে।

দ্রাবিড় সৈকত
কুত্রাপি ২১৮

বিষণ্ন ক্ষুরের কি কমে যায় ধার?
যার গরু তার সব! তৃণকুলে কেউ নেই ত্যাগী?
যোগী ও যতনে ভাব
রোগী ও পতনে পাপ,
আসল অভাব কই থাকে?
বই থাকে পড়বার, জ্ঞানায়তনে ফাঁকা হাওয়া
পাড়
বাঁধার লাগে বাস্তব জ্ঞান, নয় তরল বিদ্যা তোর
বড় চোর গৃহস্থ ঘুমিয়ে যদি থাকে

শোয়াইব জিবরান
পথ্য

ক্ষুধার্ত করে তোলো, হাংরি রাখো নিজেরে
যেন এই বনে, পাশের লোকালয়ে কোনো রক্তমাংস নাই।

সেই সাধ মনে করে জেগে ওঠো মাত্রই তো গতকালের
নরমাংস ভক্ষণের। যেন বহুদিন তুমি খুব অনাহারে
নিপতিত; মাংসাশী– ঘাসপাতা খেয়ে বেঁচে আছো
লজ্জা আর ক্রোধের জীবন।

নিজেরে আগ্রাসী করে তোলো, শিকারে। ক্রুদ্ধ করে তুলো
গেঁথে চলো সেই সকল হরিণের ছায়া, পথরেখা যেদিকে গেছে
আর নখ লুকিয়ে খুব নরম পায়ে হেঁটে চলো গহন বনপথে

তৃপ্ত করো না নিজেরে। কিছুতেই না, কিছুতেই।

তবেই না দেবী ধরা দেবেন তোমার পাতায়, অমরতা।



ওবায়েদ আকাশ
জুলফিয়া : সমাজতন্ত্রের বর্ষিত ধারা

জুলফিয়া, কর্পোরেট মাতৃতন্ত্রের নিচে
অভিলাষী ব্যর্থতা দিয়ে আকাঙ্ক্ষার মুখ ঢাকেন

তার হাত থেকে দুর্মূল্য মার্বেলগুলো
আগুনের আদিখ্যেতায় চাপা পড়ে থাকে–
সভ্যতার বিস্মৃতি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ফাউনটেন পেনে
টুপটুপ করে বর্ষিত হয় সাম্যবাদের চাঁদ

একদিন তলস্তয়ের পেছন পেছন হেঁটে
জুলফিয়া শরীরে ঘটিয়ে নিলেন যুদ্ধের ঘটনাবলি
এবং নেরুদার অন্তস্তল থেকে প্রেম ও বিপ্লবের দৃশ্যাবলি

জুলফিয়া মনসুর, কর্পোরেট ধ্বনিবিজ্ঞানের ঠোঁটে
দুর্নিবার ঝুলিয়ে দিলেন মিছিলের প্রত্যন্ত স্লোগান

দূরদূরান্ত থেকে ডানাওয়ালা ঈগলেরা আসে
কারো ভাষা ও কারো ভঙ্গিমার শেষে সর্বশেষ ঝুলে থাকে
কর্পোরেট সম্প্রীতির মতো সম্পূরক বুলি

জুলফিয়ার কাস্তে-হাতুড়ির মতো প্রতীকী পৃথিবী তাতে
উথলে ওঠে সমুদ্রমুদ্রায়। বহুবর্ণিল ধাতব অর্গলগুলোয়
ঘূর্ণমান প্রতিশ্রুতি থেকে মানুষের আস্থাগুলি প্রযত্ন বিশ্বাসে রেখে

এমন বিশুষ্ক দিনে জুলফিয়া ফেটে পড়ে বিবিধ বৃষ্টির ধারায়





মুজিব ইরম
চম্পুকাব্য

সেই উজাইয়ের দিন, জল ও মেঘের ডাকে বিল থেকে উঠে আসে জোড়া বোয়ালের ঝাঁক। আর তারা জলকেলি করে, আর তারা মিলনের আনন্দে ভুলে যায় শিকারী ও শিকার, স্থল ও জলের সীমানা, চোরাস্রোত, সতর্ক চলন...আর আমরা শিকারী হই, আর আমরা উজাইয়ের লোভে বিপদ উপেক্ষা করে হাওরে হারাই। হাত ফসকে চলে যায় কামার্ত বোয়াল, সঙ্গিনীর সাথে, জলের গভীরে।

এভাবেই উজাইয়ের দিনে ঝলক দেওয়া উজাইয়ের মাছগুলো অদৃশে হারায়, আর হারানোর বেদনা বুকের ভেতর জাগল হতে থাকে।

সাখাওয়াত টিপু
লংমার্চের ছায়া

কেউ কি দেখে কেউ কি মাপে
জীবন মানেই ফেউ
বৃত্তঘেরা নানা খোপে
নিজের ছায়ায়, মাড়ায় নিজেই
পায়ের পতন পা জানে না
ভূমি ভাঙা পন্থে
চোখ ঝুলে যায় কুহক মায়ায়
আজগুবি সব কণ্ঠে!

মগজ তোমার আলটা দেহাত
গজ মিটারের রাষ্ট্রে
যাবার আগেই মনটা বেহাত
কে বাঁধে কে কাষ্ঠে
নিবেশ তোমার ওপরওলার
নাক কাটলেই যাত্রা শুরু
জন্ম হতে কে আশীষ আর
ধর্মতলার নতুন গুরু?

এক পা গেলেই, দুইপা পেছায়
জীবন কি আর আশু
মানুষ তো নয়, বানররূপীর
যেন লাফায় অচিন পশু
মানুষ এখন মানুষ তো নাই
ধুঁকছে কেবল নিজের ছায়ায়!

রুদ্র আরিফ
প্লাস্টিকনামা

হচ্ছে না দেখা— সূর্য অনেক দিন; ভোরে, ঘুম থেকে উঠে,
ফ্লাডলাইট, শুধু ফ্লাডলাইট জ্বেলে রাখা। ধোঁয়ার বেহেশতিঘ্রাণে
ভাসা এ শহরে, প্রতি মুহূর্তই, প্লাস্টিকের মতো আয়ু : কুঁচকে
যাওয়ার ভয়; তবু ক্ষয় নয় সম্ভব; পুনর্জীবনের জয়, নয় পুনরুজ্জীবন

তুষার কবির
কিন্নরী

আবারও বুকঝিম বৃষ্টি!
বন্দরের থেমে থাকা জাহাজগুলোর পর
ঝরে যাচ্ছে একটানা ঘুমঘোর জলের কিন্নরী!
মাস্তুলের হাওয়ায়
উড়ে যাচ্ছে চারিদিকে জলমগ্ন সুরের লহরী!

বহুকাল বৃষ্টির অপেক্ষা করে
যে প্রমোদতরীটি থেমে ছিল
দিকশূন্য প্রাচীন নোঙ্গরে— মরচে পড়া ডকইয়ার্ডে—
লহমায় বৃষ্টির ফোঁটায় সেও জেগে ওঠে
গহন সুদূর অতলান্তে—
মহাস্রোতে ভাসতে ভাসতে বাঁক ফেরে
ঘুমদ্রাঘিমায়— ঠাণ্ডা জলস্রোতে—
চকমকি বালুচরে—
তরঙ্গের মুদ্রাবিভঙ্গের মোহে
সমুদ্রের জলরাশি ঘিরে কে যেন বাজিয়ে যায় শুধু
সান্ধ্যস্বরে সুরের ভৈরবী!

আর অই দূরে— সমুদ্রের তীর ছেড়ে— বাতিঘর পার হয়ে
পাথুরে ডেরায় যারা গান গায়
প্রার্থিত বৃষ্টির জন্যে আর শোনে মাস্তুলের গান;
তাদের আস্তিনে দেখি জড়ো হয়
মন্দ্রস্রোত জলের কোরক— সৈকতের তৃণলিপি—
আর দূর গম্বুজের নক্ষত্রস্মারক!

জাহানারা পারভীন
কিছু বিষ

রোলটানা পাটিগণিতের খাতা,
তোমার কাছেও আছে কিছু ঋণ

কবে কোন ছুটির দুপুরে কাঁঠাল মুচিকে দেখিয়ে নখের আঁচড়,
কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি কুড়ানো লাল দিনে, কোমল পাপড়িতে যুদ্ধ
বাধাতে বাধাতে তোমার বুকে কাটা একটি দুটি আঁচড়।

অন্ত্যমিলে সাজানো কিছু শব্দের খসড়া, প্রাথমিক তুষ,
আবেগের দিয়াশলাই নিজ হাতে ছোড়া পেন্সিলে আঁকা
খড়ের গাদায়, স্বরচিত আগুনে পোহানো
শীতের উত্তাপ। চোখের সঙ্গে জাগিয়ে রাখা তোমাকেও।

তোমার মলাটে জমা ধুলোর প্রলেপ মুছে দিতে দিতে ভাবি
কিছু বিষ কীভাবে যে মিশে যায় পাস্তুরিত দুধে!

তবে কি প্রতিটি মানুষই এক একজন ব্যর্থ সহিস!



আফরোজা সোমা
কলাবতী ফুল

তাকে বেসেছি ভালো, অথবা বাসি নাই,
এই বোধের মাঝখানে
তারা থাকে, থেকে যায়
সমাধানহীন।
অথবা সমাধান,
যাকে নিঃশেষে বিভাজ্য বলা যায়
হয়তো থাকে না।
তবু আলিঙ্গনে
কলাবতী ফুলের মতন
রঙিন হয়ে ওঠে একেকটি মানুষ।

শিমুল সালাহ্উদ্দিন
পাগলপর্ব ৬

আমি নাকি পাগলের মতো হাসি।

পাগলের মতো ইতস্তত
তাকিয়ে থেকে আনমনা এদিকে ওদিকে
দীর্ঘ পথ এলোমেলো পায়ে হেঁটে তার কাছে আসি

তারই কাছে আসি, বারবার, তারই কাছে, তবু বোঝে না সে
কেনো ঐ 'আমি' পাগলের মতো হেসে তার কাছে আসে!

কিভাবে রে সে পাগল করেছে তার ভালোমানুষে!

আমি হাসি, যখনি বলে সে
'আমি' নাকি পাগল হয়েছে হেসে।

শুভাশিস সিনহা
নবান্ন

আপাতত ধান কাটা হোক, খড়ে খড়ে
বাওকুড়ানি খেলায় মজুক, আকাশ কুয়াশা-
ঢাকা, তবু নীল শাড়ি পরে মেয়েরা হাঁটুক,
পায়ের পাতার নিচে আধেক শিশির আর
আধোমাটিবালু, পেটে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে শিশুর
থুঁতনিখানা দেখুক গর্ভিণী, আপাতত সবজিগুলো
আরও একটু সবুজ থাকুক, আমাদের বয়সের
মতো, আমরাও বাড়িনি এতটুকু, ভেতরে সবুজ
প্রেম দূরে দূরে পোড়াসোনারঙ দেখে হাসে,
কাস্তের ডগায় ঘুম, কোদালে কোদালে ভুল
খননের দাগ, তবু মাটির ভেতর হৃৎপিণ্ড আছে,
ধান পেকে চাল হলে তা-ই খেয়ে রক্ত বাড়ে
তার...
আপাতত খেত ভ'রে থাক।



পিয়াস মজিদ
ত্রিরক্তপুষ্প

বিচূর্ণ আলোর টেবিল
আমি নেই
এত এত ছায়ালেখা
তবু আমারই

২
বয়ে নিয়ে চলি
জীবনকুটিল
যেহেতু সঙ্গে
শ্মশানসুন্দর

৩
রক্তের প্রতিটি স্পন্দে
শুনি সেই উষর ঢেউ:
মরুসমুদ্রের।

নওশাদ জামিল
মন্ত্র

বলি, এসো, গলাগলি ধরে
জড়ো হবো বালির সাগরে।
পদতলে সরে গেছে মাটি
পথে পথে ছড়ানো কঙ্কাল
বিছিয়েছে মাকড়সার জাল
কীভাবে তোমাকে নিয়ে হাঁটি?
চোখের আড়ালে গান হয়ে
বেজে ওঠে অধীর প্রলাপ
বলি, এসো, ভুলে যাই শাপ
সমূহ ব্যথার দুঃখ নিয়ে।
বলি, এসো, গলাগলি ধরে
একসাথে বাঁচি পরস্পরে।



মাহবুবুল হক শাকিল
গোলাপবালা মা

মিনি ট্রাকটি যখন গলি থেকে বের হয়
তখনও বেশ চনমনে রোদ আকাশজুড়ে;
নামে মানিক মিয়ার প্রসারিত রাস্তায়, ন্যাম ফ্ল্যাটের
বারান্দার তারে কতিপয় শুকাতে দেয়া পোশাক।

ট্রাকের রেলিং ধরে কয়েক বৃদ্ধ দাড়িসহ, মধ্যবয়সীরা
এবং তিনজন বালক মাথার টুপি আঁকড়ে ধরার আগেই
ইলশেগুড়ি বৃষ্টিরা সব হাওয়ায় ভাসে, জাটকা থেকে পুষ্ট,
রসগোল্লার রসের মতো ভিজিয়ে দেয় ধবল পিরান।

ড্রাইভারের হাতের সিগারেট ভিজে যায়, কেঁপেওঠা
মিনিট্রাকের তেল চিটচিটে ত্রিপলে অপার্থিব জল গড়ায়,
শুয়ে থাকা সন্তানের হিমগায়ে হাত বোলায় গোলাপবালা মা।

গ্যাব্রিয়েল সুমন
পাখিপিতার জার্নাল

আমার স্ত্রী আর আমার পুত্র একই স্কুলে পড়েন। অ্যাসেম্বলিতে আমার পুত্র যে গান করে : তার ২-১টা আমি লেখি। শহরের প্রধানবাতি অনেকদিন ধরে কাজ করে না। আকাশের স্থির ও ভ্রাম্যমাণ বাতিগুলি দিয়ে মুহূর্ত চলে। এইভাবে গান আসে আর সুযোগ তৈরি হয়, ধুলো ঝেড়ে এস্রাজ ও টেলিস্কোপদুটিকে বাইরে নিয়ে আসবার। আমার পুত্র ভালোবাসে 'খাম্বাজ' শুনতে শুনতে ২-১টা সবুজ নক্ষত্র কাঁচের জারে জমাতে...

জুন্‌নু রাইন
যখন আমি আমার নিঃসঙ্গতার

মাঝে মাঝে ভাবি ক্লান্তির হবো, আমাকে দখল করা সময়ের কাছ থেকে চেয়ে নেব নিজের জন্য একটু সময়
পরিচিত এই আলো-অন্ধকার আর আমার অর্থময় গোধূলির কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ছুটে যাবো অন্য কোথাও;
যাবো একটু সময়ের জন্য অথবা হাজার হাজার বছরের জন্য, লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে।
কিংবা সময়গুলোকে মুক্ত করে দেব, আমার জন্য অথবা আমি সময়ের জন্য
কোন অপেক্ষায় দণ্ডিতের হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো না।...

মাঝে মাঝে ভাবি ক্লান্তির হবো...

আহমদ জামাল জাফরী
স্পর্শের অতীত তবু

যা কিছু কাছের ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি
স্পর্শের অতীত তবু টানে কেন মন?
অদেখা কণ্ঠেরও থাকে নাকি শারীরিক ভাষা?
জলের আয়নায় প্রতিবিম্বিত চাঁদের মতো কাছের
অথচ ছুঁয়ে দিলে বিস্মৃত-অলক্ষ্য দূরে,
দূর মেঘেরা ফিরে আসে বৃষ্টি হয়ে
বাতাসের দোলনায়।
জলজ উৎসবে সবুজ বৃক্ষ দাঁড়িয়ে থাকে
দূরলোকে তার চোখ
আর ঘিরে থাকে স্তব্ধতার অনন্ত বিষাদ,
গহন আলোর অবিরল বর্ষণ
অস্থির ছায়া হয়ে গলে গলে পরে
ছেঁড়া কার্পাস তুলোর মতোন।

শাহাজাদা বসুনিয়া
ইচ্ছেগুলো ওড়ে

যেখানে সীমান্ত শেষ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকা,
সেখানে শুরু হয়, যেখানে সীমানা শেষ।
কেবল সীমানা শেষ হয় না মনের ভুবনে।
মন চলে শুধু একাকার সীমান্তহীন প্রহরে।
ভৌগোলিক সীমান্তে বাধা পড়ে মনুষ্য দেহ,
সীমাহীন আকাশে মন ওড়ে মেঘের ভেতর,
ইচ্ছার ডানাগুলো নীলাকাশে ওড়ে হনুমানের মতো,
পাখির ডানার মতো ইচ্ছেগুলো নড়াচড়া করে,
উড়াল দেয় মধ্যাকাশে, সীমাহীন নীলাকাশে।
যেখানে সীমান্ত শেষ, সেখানেই ইচ্ছার শুরু,
ইচ্ছে করে ঘুড়ির মতো উড়তে শূন্য আকাশে।
সীমান্তে প্রহরীরা রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকে,
ক্ষণে ক্ষণে হুইসাল বাজে, অন্তর কাঁপে থেকে থেকে,
মনের সীমান্ত অবাধে খোলা অসীম আকাশের মতো।
অনুভূতির হুইসাল বাজে, ছটফট করে মন,
উদাসী বাউলের মতো সুর বাজে, ঢেউ তোলে মনে।
যেখানে সীমান্ত শেষ, সেখানেই অনুভূতির শুরু,
সাহসে সীমান্ত পাড়ি দেয় মন অসীম ও সসীমে,
সীমান্তহীন, সেখানেই অনুভূতির সীমানা শুরু,
জীবন এভাবেই চলে বাকহীন জয়ে॥



রহিমা আফরোজ মুন্নী
দেবদূত



এই ধীর রমণ-মন্থন রাতে
কানের কাছে কে
দাঁতকপাটি'র শব্দ
কে এলো এগিয়ে
দাঁতমুখ খিঁচিয়ে
কে?
কে ও!
গুন গুন গেয়ে
নেয়ে উঠলেন
চিনি কি তাহারে? তারে
এমন অনাহুত
কে তবে ভালবাসে কঠিনেরে!

খোয়াবে, ক্যালেন্ডারে
গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো পুরানো সন্ত্রাস
আলপটকা ঝুলে রইলো
আনন্দে খাবি খেলো করোটিরা

তুমি শুধু এই করতে পারো?
আঁধার এলেই বেড়া-টপকে এর বাড়ি ওর বাড়ি

আমিও নিয়েছি কিনে যতো উদ্ধার আমার
দেখো সত্য, কেমন বিদ্রূপ করছি তোমাকে!

ফারহানা হক
ইনবক্স

সুপ্রভাত। ঘুম ভাঙলো?
না, ভাঙেনি, আর পা ও মাটি ছোঁয়নি।
বন্ধ চোখে টাইপ?
তোমাকে লিখি মনের আঙুলে
বাহ। কী দারুণ মিথ্যা সাতসকালে।
চা করেছ? তোমার আঙুল ভেজানো জলে।
কী করে খাবে? যান্ত্রিক জালে?
না যান্ত্রিক জালের যন্ত্রী হবো না
তোমার ওই আঙুলে স্বপ্নের আংটি পরিয়ে
আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াব শেষ বিকেলে।
বুঝলে পাগলী।
রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি একা
সকাল থেকে ইনবক্স একদম ফাঁকা।

অলঙ্করণ : : বোরহান আজাদ

তিরিশের কবি পত্রালির আলোকে



সংগ্রহ-গ্রন্থনা-ভূমিকা : আবুল আহসান চৌধুরী

আধুনিকতার অনুকূলে বাংলা কবিতার যে পালাবদল, তার রূপায়ণ হয়েছিল মূলত তিরিশের কবিদের হাত ধরে। বাংলা কবিতার এই মৌলিক রূপান্তর ছিল প্রসঙ্গ ও প্রকরণ উভয় দিক থেকেই। এই কবিতা তার চেতনায় ধারণ করেছিল কিছু অভিনব উপলব্ধি। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতার চারিত্র নির্দেশ করতে গিয়ে তার সংকলিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন : 'একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এ সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে...।'

এই বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে তিরিশের প্রধান কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ও বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)। অবশ্য সতীর্থ-সহযাত্রী হিসেবে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯), অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯), সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য (১৯০৯-১৯৬৯) এবং আরও কারও কারও নামও অনিবার্যভাবেই এসে যায়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, এরা রবীন্দ্র-প্রভাববলয় ও পুরনো কাব্যচিন্তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন।

দুই

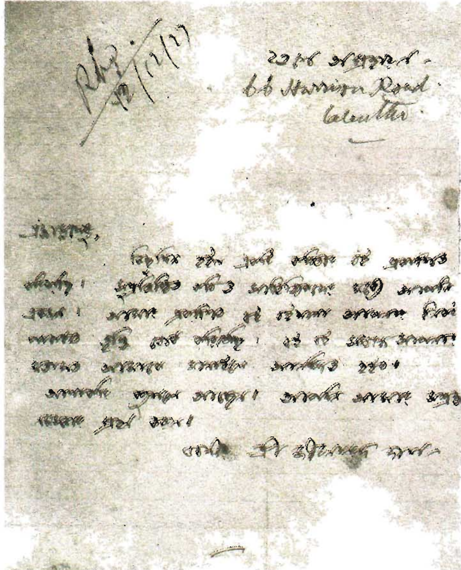
'তিরিশের কবি' বলে যারা চিহ্নিত তাদের অনেকেই তিরিশের দশকের আগ থেকেই লেখা শুরু করেছিলেন। এই দশকে তাদের লেখা আরও বিশুদ্ধ ও পরিণত হয়ে ওঠে এবং বিকশিত এইসব কবির কারও কারও কবিতার বইও বের হয়। 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে দ্বন্দ্বও তিরিশের দশকেই জমে ওঠে– যা ছিল আধুনিকতার সঙ্গে রক্ষণশীলতার বিরোধ। তাই এক অর্থে বলা চলে, তিরিশের দশকই আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ সময়পর্ব। তিরিশের প্রধান কবিরা এর পরও বেশ কয়েক দশক বাংলা কবিতার জগৎকে শাসন করেন এবং তাদের প্রভাব ও প্রেরণা উত্তরকালকে স্বীকার করতে হয়।

তিন

জীবনানন্দ দাশ-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে– তিরিশের এই প্রধান পাঁচ কবির ১৩টি চিঠি এখানে সংকলিত হলো। চিঠিগুলো লেখা হয়েছিল সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৬৫), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), সুরজিৎ দাশগুপ্ত (জ. ১৯৩৪) ও আবুল আহসান চৌধুরী (জ. ১৯৫৩)-কে। এদের মধ্যে সাবিত্রীপ্রসন্ন কবি ও সাময়িকপত্র-সম্পাদক হিসেবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। নেতাজির সুহৃদ এই কবি এক সময় রাজনীতির সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন এবং সে কারণে কারাবরণও করেন। অন্নদাশঙ্কর– বাঙালি পাঠকের কাছে এই বহুমাত্রিক খ্যাতিমান সব্যসাচী লেখক ও মুক্তমনের বুদ্ধিজীবীর পরিচয় সুবিদিত। সাহিত্যবোদ্ধা সুরজিতের পরিচয় কবি-কথাশিল্পী-প্রাবন্ধিক-শিশুসাহিত্যিক-সাংবাদিক-চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে। সুরজিত তার সময়ের লেখকদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষায় ছিলেন অগ্রণী ও অক্লান্ত। আবুল আহসান এখানে প্রকাশিত পত্রাবলির সংগ্রাহক, সংকলক ও ভূমিকা-লেখক।

চার

সংকলিত চিঠিপত্রের প্রতি দ্রুত দৃষ্টিপাতের ভেতর দিয়ে পত্রলেখকদের মানস্তার চকিত পরিচয় পেশ করা হলো। আত্মনিমগ্ন, প্রচারকুণ্ঠ, জনকোলাহল থেকে দূরত্ব-রচনাকারী জীবনানন্দ দাশ স্বভাবের অনুকূল না হলেও সাবিত্রীপ্রসন্নকে তার কবিতার বই পাঠিয়ে মতামত প্রত্যাশা এবং সেসঙ্গে তার সখ্যও কামনা করেন। তার চিঠিতে অগ্রজ-কবির প্রতি এক


66 Harrison Road
Calcutta

জীবনানন্দ দাশের চিঠি

ধরনের বিনয় ও সমীহ প্রকাশ পেয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সংক্ষিপ্ত জবাবিপত্রে সৌজন্য ও আন্তরিকতার স্পর্শ আছে– দু'এক ছত্রে শিল্প-সাহিত্য নিয়ে নিজস্ব বোধ-বিশ্বাস ও কূটাভাসের পরিচয়ও মেলে। নিজের কবিতা ও ছন্দ নিয়ে বেশ খোলামেলা মন্তব্যও করেছেন সুধীন্দ্রনাথ। অমিয় চক্রবর্তীর পত্রগুচ্ছে সাহিত্যের প্রসঙ্গের পাশাপাশি রাষ্ট্রিক বিষয় ও সমকালীন সংকটও স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রায় সব চিঠিই সংক্ষিপ্ত ও সৌজন্যমূলক। এতে তার পত্রিকা, লেখা, কোনো বিশেষ বিষয়ে তার মত ও পত্র-প্রেরকের জিজ্ঞাসার জবাব এবং সেসঙ্গে আন্তরিক বন্ধুপ্রীতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে অশ্লীলতার অভিযোগে তার 'রাত

ভর বৃষ্টি' (১৯৬৭) উপন্যাস নিয়ে মামলার বিষয়ে উদ্বেগ ও দৃঢ়তা প্রকাশিত। বিষ্ণু দের চিঠি প্রাপ্তিস্বীকার কিংবা সৌজন্য-বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও দু-একটি প্রসঙ্গে তার সংক্ষিপ্ত অথচ সুচিন্তিত মতামত স্থান পেয়েছে।

পাঁচ

এখানে চিঠিগুলো সাজানো হয়েছে পত্রলেখকের বয়স এবং চিঠির তারিখ অনুসারে। দুষ্পাঠ্য হস্তাক্ষর কিংবা অস্পষ্টতার কারণে কোনো শব্দ বোঝা না গেলে সে ক্ষেত্রে ছাড়ের জায়গায় তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে ডট কিংবা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনও বন্ধনীর মধ্যে সম্ভাব্য শব্দের উল্লেখ মিলবে। ভাষা ও বানানের বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করার মতো। একই কালের লেখক হওয়া সত্ত্বেও এই স্বাতন্ত্র্য-চেতনা মুদ্রিত তাদের রচনা ও পত্রাবলিতে।

আবুল আহসান চৌধুরী

চিঠি : ১ [সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-কে]
৩রা পৌষ

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চিঠি

66 Harrison Road
Calcutta
শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন হোলো আপনার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছি। অনেককাল থেকে আপনার কবিতা পড়ে তৃপ্তি পেয়ে এসেছি। আমার বই আপনাকে পাঠিয়ে খানিকটা কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেলাম। আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ ক'রতে পারলে খুবই আহ্লাদিত হ'তাম। আমি কিছুকাল ধরে City Collegeএ অধ্যাপনা করছি। আপনি কলকাতায় ছিলেন জানতে পারলাম। দেখা হোলো না– বড়ই পরিতাপের বিষয়। ভবিষ্যতে আলাপ-পরিচয়ের আশায় রইলাম। আপনি মুর্শিদাবাদে কি ক'রছেন? আপনার মত কবিকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি। মাঝে মাঝে খবর জানালে আনন্দিত হব। আপনার পত্রের আশায় থাকব। আশা করি ভালো আছেন। আপনি আমার প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি।

ভবদীয়
শ্রীজীবনানন্দ দাশ

চিঠি : ২ [সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়-কে]
২৩শে অগ্রহায়ণ

66 Harrison Road
Calcutta
শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিছুদিন হইল একটি কবিতার বই প্রকাশিত করিয়াছি। সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আপনি একজন। আমার প্রকাশিত এই বইখানা আপনার নিকট পাঠাইতে তৃপ্তি বোধ করিতেছি। এই বই সম্বন্ধে আপনার মতামত আমাকে জানাইলে আনন্দিত হইব।

আশা করি কুশলে আছেন। আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন।

ভবদীয়
শ্রীজীবনানন্দ দাশ

চিঠি : ৩ [সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]
৬নং সুইট
৬ রাসেল স্ট্রিট
কলিকাতা ১৬
কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠির জবাব দিতে এত দেরি হলো ব'লে অপরাধ নিও না। সাত-আট মাস অসুস্থ ছিলুম। ফলে অপিসে অনেক কাজ জমে গেছে, এবং সে-কাজের বেশ খানিকটা কলকাতায় ব'সে শেষ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ গত দু' মাসে কয়েকবার বাইরে যেতে হয়েছে; এবং এই অস্থিতির মধ্যে চিঠি লেখার সুযোগ ক'রে উঠতে পারিনি। তাছাড়া তোমার প্রশ্নগুলির যথোচিত জবাব দিতে গেলে প্রবন্ধ লেখা ছাড়া উপায় নেই; এবং তার সময় কোথায়?

তবু সংক্ষেপে ব'লে রাখি সম্প্রতি বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হয়েছি। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত আমি এ-বিষয়ে প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলুম। কিন্তু সেকালের যে-সব তরুণ কবিদের মধ্যে আমরা অপার সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিলুম, তাদের অধিকাংশই অন্তত আমার আশাভঙ্গ

ঘটিয়েছেন, তবে এ অভিযোগ শুধু বাঙালি কবিদের সম্পর্কেই খাটে না, আজকালকার পাশ্চাত্ত্য লেখকেরাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। একমাত্র এলিয়টই পরিণতির দিকে প্রাগ্রসর।

বাংলা গল্প-উপন্যাস আমি বড় একটা পড়ি না। হয়তো সেজন্যেই এখনো পর্যন্ত এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল যে 'গোরা'ই বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ছোটগল্পের অভাব আমাদের ভাষায় নেই, এবং এখনো ভালো ছোটগল্প নিশ্চয়ই লেখা হয়, যদিও 'প্রগতি'-র মোহে একাধিক নামকরা লেখক আজ পথভ্রষ্ট। কিন্তু পশ্চিমেও এখন অপকর্ষের যুগ চলেছে, এবং ইংরেজি বা ফরাসিতে সম্প্রতি কোনো প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস পড়েছি ব'লে মনে নেই।

আড়াই বছর হলো স্টেটসম্যানের কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে চাকরি নিয়েছি। কিন্তু অফিসের জন্যেই যে আমি আজকাল লিখি না, তা নয়। লেখবার বিশেষ কিছু নেই বলেই আমার কলম আর চলে না।

তোমার কুশল কামনা করি। ইতি ৯/১/৫২

শুভার্থী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

গদ্যচ্ছন্দ আমার অসহ্য লাগে, এবং পদ্যচ্ছন্দে স্খলন-পতন-ত্রুটির অবকাশ নেই বলেই আমার বিশ্বাস।

চিঠি : ৪ [সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]

৬নং সুইট

৬ রাসেল স্ট্রিট

কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

তোমার দুখানি চিঠিই পেয়েছি– ধন্যবাদ। সংবর্তের সমালোচনা সম্পর্কে দিলীপ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা কয়ে তোমাকে যথাসম্ভব জানাব। কিন্তু তাকে ধরা শক্ত।

ছন্দঃপ্রয়োগে ভুল-চুক নিশ্চয়ই আমারও ঘটে: এবং 'ক্রন্দসী'-তে অন্তত দু' জায়গায় পয়ারের প্রচলিত অক্ষর গণনার রীতি আমি পালন করিনি। কবিতা দুটোর নাম মনে নেই: কিন্তু শব্দ দুটো মনে আছে– 'জন্মান্তরের' আর 'হিরণ্ময়ের'। উভয়ই পাঁচ অক্ষরের শব্দ, কিন্তু ছন্দের খাতিরে দুটোই ষড়মাত্রিক হিসাবে পাঠ্য।

'উপপাখী' ['উটপাখী'] থেকে তুমি যে লাইনটা উদ্ধার করেছ– তাতে কিন্তু সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। কারণ ও-কবিতাটা পয়ার ছন্দে লেখা নয়, মাত্রাচ্ছন্দে লেখা। প্রতি লাইনে চৌদ্দ মাত্রা আছে বটে; কিন্তু লানইগুলোর পর্বভাগ ৬+৬+২। পয়ারে প্রথম যতি আট অক্ষরের পরে, এবং প্রতি পর্বে চার অক্ষর থাকে। অর্থাৎ এ দুটো ছন্দের জাতই আলাদা– চেঁচিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবে যে

আমার কথা কি শুনতে পাওনা তুমি

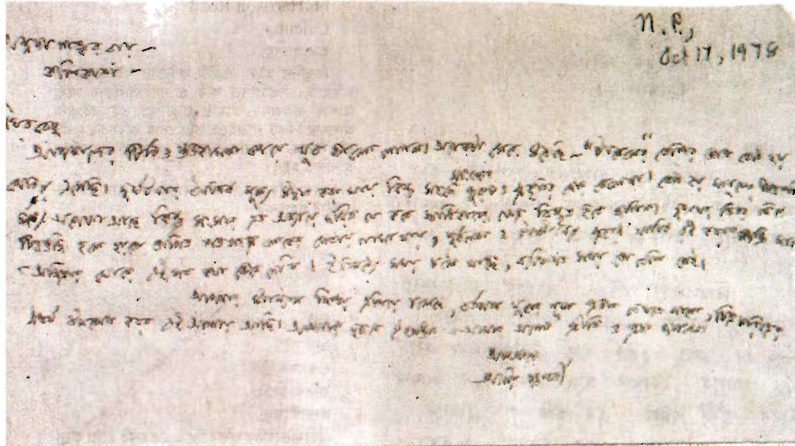
আর মহাভারতের কথা অমৃতসমান

এক ছন্দ নয়, এক নিয়ম মেনে ও-দুটো পংক্তির ছন্দোলিপি বানানো অসম্ভব।

আশা করি কুশলে আছ। ইতি ১০ জুলাই ১৯৫৩

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত


N.Y.,
Oct 17, 1978

অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি

চিঠি : ৫ [সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]

৬নং সুইট
৬ রাসেল স্ট্রিট
কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

তোমার ২৪ তারিখের পোস্টকার্ড তথা তার আগের চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। প্রথমটির জবাব দিতে পারিনি নানা কারণে ব্যস্ত আছি ব'লে।

বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'সংবর্তে' সমালোচনা বেরোনোয় আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না, এবং তুমিই যদি সমালোচনা করতে চাও, তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমার নিজের পুঁজি থেকে এক কপি বই তোমাকে নিশ্চয়ই দেব। তবে আমার বিশ্বাস এ-রকম ক্ষেত্রে প্রকাশককে লেখাই সাধারণ নিয়ম।

আশা করি কুশলে আছ। ইতি ২৬/৮/৫৩

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

[illegible]
১৩/৮/৭২

প্রিয়বরেষু,

[illegible]

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে'র চিঠি

চিঠি : ৬ [অন্নদাশঙ্কর রায়-কে]

STATE UNIVERSITY COLLEGE
NEW PALTZ, NEW YORK
92 Riverside Apts,
New Paltz, N.Y
12561

১৭ই জুন ১৯৭৭

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়
শান্তি নিকেতন

প্রিয়বরেষু

বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যায় আপনার প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত ভালো লাগল। অনেক নূতন তথ্য পেলাম। তার বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে গ্রথিত বৈষয়িক জীবনের এমন সুমিত পরিচয় আগে কেউ দেননি। পূর্বেও একবার আপনার লেখা কবির গ্রাম-চর্যা এবং কর্মীরূপ বিষয়ের রচনা পড়েছিলাম– মনে আশা হয় কোনো সময়ে হয়তো কবি ও কর্মীর বিচিত্র আলোচনা একটি পুঁথি আকারে আপনি বার করবেন।

দেশে দারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল, দরকার ছিল। ঠিক বুঝতে পারিনি দিল্লি থেকে কতদূর অন্যায় চাপ সম দেশবাসীর ওপর পড়েছিল– সব চৌচির হয়ে গেল। কিছু ভালো কাজও হয়তো দিল্লির পরিকল্পনায় ছিল কিন্তু জুলুম করলে কিছুই টেকে না এর সার্থক প্রমাণ পাওয়া গেল। নতুন রাষ্ট্রের কাজ সবেমাত্র সুরু হয়েছে কিন্তু এরি মধ্যে মুক্তির অনেকখানি হাওয়া সমস্ত দেশে ছড়িয়ে গেছে।

আমরা ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছি, সেপ্টেম্বরে শান্তি নিকেতনে পৌছব। এ দেশে ৩০ বৎসর থাকার ফলে মাটিতে অনেক সূক্ষ্ম শিকড় চারিয়ে গেছে– ভালোয় মন্দে মার্কিনের জীবনস্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। এখানকার 'জনসাধারণ' বন্ধুবৎসল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তরুচ্ছায়াময় প্রাণকেন্দ্রের মতো। বস্টনে এবং শেষ পর্যন্ত এই শৈল-ঘেরা ছোট গ্রামটিতে যা পেয়েছি তার অবধি নেই। এখানে আমার কাজ শেষ কিন্তু ন্যু ইয়র্ক য়ুনিভার্সিটির বই কেন্দ্রে আমার ব্যবহারের জন্যে যতদিন চাই একটি ঘর দিয়েছে Family [?] Tower-এ। ফিরে এলেও পাবো। একেবারে অযাচিত এবং যোগ্যতার অতীত এই সুব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "ভালো নাহি লাগে আর॥ আসা-যাওয়া বারবার ॥ বহুদূর দুরাশার॥ প্রয়াসে ॥ পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে॥"

আমাদের জীবনেও অনেক পারাপার ঘটল, হয়তো পূরবীর সুরে ঘাটের কাছে পৌছব।

আপনারা আমাদের প্রীতি জানবেন।
অমিয় চক্রবর্তী

চিঠি : ৭ [অন্নদাশঙ্কর রায়-কে]

N. P.

Oct. 17, 1978

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়
শান্তি নিকেতন

প্রিয়বরেষু,

আপনাদের চিঠি ও শুভকামনা পেয়ে খুব ভালো লাগল। অনেকটা সেরে উঠেছি– 'টাকেলে'র বেশির ভাগ বোধ হয় পেরিয়ে এসেছি। দুর্ঘটনার নৈতিক মূল্য উদ্ধার করা যায় কিন্তু সহজে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির জোর মেলে না। বোধ হয় মানুষের চিত্তশক্তির জন্যে অপেক্ষা আছে কিন্তু সংসার এত অন্যায়ে জড়িত যে কবে স্বাধিকারের ক্ষেত্র বিস্তৃত হবে জানি না। দুঃখের ভিতর দিয়ে চিত্তশুদ্ধি হলে হয়তো তাপিত শত সহস্র লোকের সেবায় নামা যায়, দুর্বলতা ও ঔদাসীন্যের প্রহরণ খানিক রদ করবার শক্তি জন্মে– অনিদ্রার ঘোরে এই সব কথা ভেবে দেখি। ইতিমধ্যে সময় চ'লে যাচ্ছে, ব্যক্তিগত সময় তো বেশি নেই।

আপনার উপন্যাস নিশ্চয় এগিয়ে চলেছে, বর্তমান যুগের নতুন প্রভাত দেখতে পাবো, চিত্র চরিত্রের ঐশ্বর্য উপভোগ করব এই আশায় আছি। আপনারা দুজনে হৈমন্তীর ও আমার অশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানবেন।

আপনাদের
অমিয় চক্রবর্তী

চিঠি : ৮ [সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]

KAVITA BHAVAN
202 RASHBEHARI AVENUE
CALCUTTA
১৯.৯.৫০

কল্যাণীয়েষু

আমার কবিতার বইয়ের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো? এ-প্রশ্নের উত্তরে আমি নির্বাক। তোমরা পাঠক, তোমরা তার বিচার কোরো।

'কবিতা' উঠে যাবার আশঙ্কা খুবই আছে, তবে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। তোমাদের অঞ্চলে 'কবিতা'র কিছু গ্রাহক হ'তে পারে কি? তোমার যখন এ-বিষয়ে আগ্রহ আছে, হয়তো তুমি চেষ্টা করবে? [।]

আধুনিক বাংলা কবিতার নতুন সংস্করণ শীঘ্র বেরোবার সম্ভাবনা দেখছি না।– 'কবিতা' আষাঢ় সংখ্যা এখনো বেরোয়নি।

"Nine" অতিরিক্ত কোনো কপি আমার কাছে নেই। এ-দেশে কোথাও পাওয়া যায় ব'লেও জানি না।

আমার শুভকামনা তোমাকে জানাই।

বুদ্ধদেব বসু

চিঠি : ৯ [অন্নদাশঙ্কর রায়-কে]

KAVITA BHAVAN, 364/9
NETAJI S.C. BOSE ROAD.
CALCUTTA 47
২৭/১২/৬৮

প্রিয়বরেষু,

আজ ডি.এম. লাইব্রেরি মারফৎ আপনার 'আর্ট' বইখানা পেলাম। এর অনেকখানি অংশ আমার পূর্বপরিচিত, কিন্তু হাতে পাওয়ামাত্র আবার স্বাদ নেবার লোভ সামলাতে পারলুম না। উৎসর্গ-পত্রে আপনি আমাকে সম্মানিত



KAVITABHAVAN

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি

করেছেন; পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে দিয়েছেন নির্ভার ও স্বচ্ছন্দগামী গদ্য পড়ার বিশুদ্ধ সুখ। বাংলা সাহিত্যে বীরবলের সার্থকতম উত্তরসাধক আপনি; সরসতা ও কৌতুক মিশিয়ে জ্ঞানগর্ভ বিষয়কে এমনভাবে রমণীয় ক'রে তুলতে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ– এক প্রমথ চৌধুরী ছাড়া। আমাদের সেই সব খোলামেলা দিন, যখন তর্কে ঝাঁজ ছিলো না, সাহিত্যিকেরা অনন্যভাবে 'শিবিরে' বিভক্ত হ'য়ে যাননি– সেই লুপ্ত দিনগুলির সৌরভ আপনার বইয়ে নতুন ক'রে পাওয়া গেলো। এটি আপনার সমব-

সমবয়সীদের পক্ষে একটি মূল্যবান উপহার।

আর-একবার, বইটিতে আমার প্রতি যে-ব্যক্তিগত প্রীতির নিদর্শন আছে, তার জন্য আর-একবার আপনাকে কৃতজ্ঞতা না-জানিয়ে চিঠি শেষ করতে পারছি না। আর আমাদের উভয়ের প্রীতিনমস্কার আপনাদের উভয়কে–

বুদ্ধদেব বসু

চিঠি : ১০ [অন্নদাশঙ্কর রায়-কে]

৩৬৪১৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৪৭
১৬/৫/৭৩

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে খুশি হয়েছি।

আমি কখনো ভাবিনি এই মামলার ফলে আমার নাম কলঙ্কিত হয়েছে– তবে বইটাকে মেরে ফেলা হ'লো ব'লে [...] ছিলুম। তাই হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে আনন্দিত হয়েছি– শুধু ব্যক্তিগত কারণে নয়, বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কারণেও।

আপনি একাধারে সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ পুরুষ, আপনি এ-বিষয়ে কিছু লিখলে আমরা সকলেই উপকৃত হবো। প্যুরিটান ইংরেজেরা দেড়শো বছর আগে যে-অস্পষ্ট এবং অন্যায় আইন ক'রে গিয়েছিলো, সেটার যে মৌলিক সংস্কার বর্তমান কালে প্রয়োজন, সে-কথাটাই জোর গলায় বলা দরকার। কিন্তু দেশে অন্ন বস্ত্র শৃঙ্খলার এত সমস্যা থাকতে সে-কথায় কান দেবে কে?

তবু, আলোচনার ফলে দেশের মধ্যে একটা আবহাওয়া তৈরি হ'লেও কিঞ্চিৎ লাভ।

সুপ্রিয়কে বলবো আপনাকে এক কপি বই পাঠিয়ে দিতে। আপনি ও শ্রীমতী রায় আমার প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন। আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

বুদ্ধদেব বসু

চিঠি : ১১ [সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]

৫/৪/৬৮

স্নেহাস্পদেষু,

তোমাদের কলকাতায় ছুটির শেষটা খুব দুর্যোগে গিয়েছিল জানতে পেরে কষ্ট লাগল। যা হোক, তোমাদের শিশুপুত্রটি এখন নিশ্চয়ই একেবারে সেরে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন ভাগসিঙের[?] কথাটা জানা রইল। তুমি ঐ অবস্থায় আর কি করতে পারতে?

'সেই অন্ধকার চাই'-এর পরে কোনও কবিতার বই বেরোয়নি, প্রকাশকদের নানা দুর্বিপাক যায়। গোটা দুই বই বেরোতে পারে অবশ্য! লিখি তো অনর্গল।

তোমার বড়গল্পটি বই[য়ে] পড়েছি, তুমি উত্তরোত্তর মানবিকতা অর্জন করছ দেখছি। তাই খুশি হয়েছি। প্রবন্ধের বইটিও একবার দেখেছি, আগে জানা ছিল মনে হল। তুমি ভেবেছ বক্তব্য বিষয়ে। কিন্তু প্রেম নানা রকম হয় তো, এবং কবিদের ক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্ট্য কিভাবে বিশেষ বিশেষ কবিতাকে বা কবিতাপর্বকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দরকার এবং কেউ যদি কবি না হন, তাহলে যতই প্রেমবৈচিত্র্যের সৌভাগ্য হোক না কেন তার কবিতার বিকাশে তার রূপায়ণ হয় না কেন? তাছাড়া, রবীন্দ্রবিচারে মহিলাদের স্থান ব্যক্তিগত জীবনের দিকে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, কবিতার দিক থেকেও নিতাই গৌণ বা সেকেন্ডারি নয় কি?– তাড়াতাড়ি লিখলুম।

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিষ্ণু দে

চিঠি : ১২ [সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]

রিখিয়া, দেওঘর, বিহার
৫/৪/৬৮

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। কলকাতার ঠিকানাতেই লিখছি। আমরা দিন পনেরো হল এখানে এসেছি। ছোট বাড়ি, তিন নাতি তিন নাত্নি মাৎ ক'রে রেখেছে।

প্রাচীন আচার অনুষ্ঠানের রীতিবিন্যস্ত সৌন্দর্য বিষয়ে যা লিখেছ, তা ঠিকই। মুগ্ধ লাগে এখনও। তবে ঐ জীবনযাত্রা তো গতপ্রায়, এবং তার রীতিবিন্যাসও। তবে, আমি ভাবি যে জীবনযাত্রার তাগিদে ঐ সব আনুষ্ঠানিক আচারগত সৌন্দর্যরীতি বিকশিত ও প্রথাসিদ্ধ হয়েছিল, সেইরকম বর্তমান– ভাবী জীবনবিন্যাসের আন্তরিক প্রয়োজনেই বিকশিত হবে নতুন শিল্প ও আনুষ্ঠানিক সৌন্দর্য– রিটুয়ালস্– নবকলেবরে। কিন্তু আপাতত আমরা মৃতপ্রায় এক ও আসন্নজন্ম দুই জগতের দ্বীপে ভাসছি তো।

আমাদের শুভেচ্ছা জেনো।
বিষ্ণু দে

চিঠি : ১৩ [আবুল আহসান চৌধুরী-কে]

১/১০, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলকাতা- ২৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার সুন্দর চিঠিটা কদিন আগেই পেয়েছি। খুশি হয়েছি সে কথাটা জানাতে দেরি হল, কারণ এতজন বাড়িতে এসেছেন আর এত চিঠিও এসেছে যে আপনার চিঠিটি চাপা পড়েছিল। আজ আমার স্ত্রী বার ক'রে দিলেন।

ধন্যবাদ জানানোটা কৃত্রিম হবে, খুশিটাই জানাই।

বহুকাল আগে আমরা একবার কুষ্টিয়ায় দিন কয়েক কাটাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিষ্ণু দে ❖

অলঙ্করণ : : বোরহান আজাদ

মূল : আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

একটি পরিচ্ছন্ন আলো ঝকঝকে জায়গা

ভূমিকা ও অনুবাদ : হাসান আজিজুল হক



অনুবাদ গল্প

[মাত্র ১৫ বছর বয়সে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন ভ্যানচালক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ৪-৫ বছরব্যাপী এই যুদ্ধের আগুনে পুড়েছিলো সমস্ত পৃথিবী। বিশেষ করে ইউরোপ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। হেমিংওয়ে সারাজীবন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপকে নিয়ে লিখেছেন বেশি। তাতে যে হতাশা, মানবজীবনের মূল্যহীনতা, মানুষের নিষ্ঠুরতা ও ধর্ষকামের পরিচয় পেয়েছিলেন তা তুলে ধরাই তার সারাজীবনের সাহিত্যকর্ম। সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে তার সাহিত্যে। পুরুষের বীর্যহীনতা আর নারীর ছোট করে ছাঁটা চুল এ দুটোই তার সাহিত্যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কর্মহীনতা, অবক্ষয়, জীবনের অর্থহীনতা তার সমস্ত লেখার বাক্যে বাক্যে ঢুকে রয়েছে। গত শতাব্দীর ৬০ সালে মাত্র ৬১ বছর বয়সে তিনি নিজে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন। নিচের গল্পটি খুব সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে চরিত্রগুলোর ভেতরে বেঁচে থাকার খোলসটা খুলে ফেলে কেমন সময়টা যাচ্ছিলো, সেইসব ক্লান্তি, কর্মহীনতা, অর্থহীন জীবন ক্ষেপণের কথাই বলেছে।]

রাত অনেকটা হয়ে গেছে। কফি হাউস থেকে সবাই চলে গেছে। একজন বৃদ্ধ শুধু জানালার কাছে বসে আছে। দিনের বেলাটায় রাস্তা ছিলো ধুলোভরা, এখন শিশিরে ভিজে ধুলো আর উড়ছে না। বৃদ্ধ মানুষটি এখানে চুপ করে বসে থাকতে পছন্দ করেন, কারণ তিনি বদ্ধ কালা। আর এখন রাত্রি এতই শান্ত যে, তিনি রাতের সঙ্গে দিনের তফাৎটা ধরতে পারেন। কফি হাউসের বেয়ারা দু'জন ভালোই জানে যে, বৃদ্ধটি এখন বেশ একটু মাতাল হয়ে পড়েছেন। তবে যেহেতু তিনি খদ্দের হিসেবে ভালো, তবুও যদি খুব বেশি মাতাল হয়ে যান, তবে বিল না মিটিয়েই চলে যাবেন। তারা সেজন্য তার ওপরে নজর রাখছে।

'জানো, গত সপ্তাহে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলো', একজন বেয়ারা বললো।

'কেন?'

'সে মনে হয় হতাশ হয়ে পড়েছিলো।'

'কী নিয়ে হতাশ?'

'কোনো কিছুই নিয়ে নয়।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'তার অনেক টাকা।'

কফি হাউসের দরজার কাছে দেয়াল ঘেঁষে লাগানো টেবিলে ওরা দু'জন বসেছিলো। ঘরের সব টেবিলই এখন খালি। কেবল এই বৃদ্ধের টেবিলটি ছাড়া। জানালার পাশের গাছটার ছায়া পড়েছিলো তার ওপর। সামান্য নড়ছিলো গাছের পাতাগুলো। রাস্তা দিয়ে একটি মেয়ে ও একজন সৈনিক হেঁটে গেলো। রাস্তার আলো সৈনিকটার তামার পদকের ওপর ঝকঝক করে উঠলো। মেয়েটার মাথায় কোনো টুপি ছিলো না। সে ওর পাশে দ্রুত হাঁটছিলো।

'পাহারাদার ওকে নিশ্চয় ধরবে', একজন বেয়ারা বললো।

'তাতে আর কী হবে? সে যা চায় তা যখন পেয়েই গেছে।'

'তার বরং রাস্তা থেকে নিচে নেমে যাওয়াই উচিত। গার্ড তাকে নিশ্চয় ধরবে। এই মিনিট পাঁচেক আগে তারা এদিক দিয়েই গেলো।'

ছায়ায় বসে থাকা বৃদ্ধটি গ্লাস দিয়ে তার প্লেটে কয়েকটা টোকা দিলো। অল্পবয়সী বেয়ারাটি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কী চাইছেন?'

বৃদ্ধটি তার দিকে তাকালো। বললো, 'আরেকটা ব্র্যান্ডি।'

'মাতাল হয়ে পড়বেন কিন্তু।' বেয়ারাটি এ কথা বলায় বৃদ্ধ তার দিকে তাকালেন। বেয়ারাটি চলে গেলো।

'ইনি সারা রাতই থাকবেন।' সে অন্য বেয়ারাটিকে বললো। 'এদিকে আমার ঘুম পাচ্ছে। রাত তিনটের আগে একদিনও শুতে পারি না। বুড়োটা সেদিন আত্মহত্যা করতে পারলে ভালো হতো।'

তারপর সে কাউন্টারের ভেতর থেকে এক বোতল ব্র্যান্ডি নিয়ে বুড়োর টেবিলের কাছে এলো। প্লেটটি টেবিলের ওপর রাখলো। আর ব্র্যান্ডি দিয়ে তার গ্লাসটাকে ভর্তি করে দিলো।

'গত সপ্তাহে চেষ্টা করেছিলেন, তাতে মারা গেলেই পারতেন।' কালা লোকটাকে সে বললো। বুড়োটি আঙুল তুলে বললেন, 'আরেকটু দাও।' বেয়ারা তখন এমন করে গ্লাসটি ভরলো যে, গ্লাস ছাপিয়ে অনেকটা ব্র্যান্ডি প্লেটের ওপর ছলকে পড়লো। 'ধন্যবাদ', বুড়ো জানালেন। বোতল নিয়ে বেয়ারা তখন কফি হাউসের ভেতরে ঢুকে গেলো। তারপর আবার সে তার বন্ধুর পাশে বসলো।

'লোকটা এখন মাতাল হয়েছে।' সে বললো।

'সে প্রতিরাতেই মাতাল হয়।'

'কী জন্য সে মরতে গেছিলো, জানো?'

'আমি জানবো কী করে?'

'কীভাবে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলো?'

'সে গলায় দড়ি দিয়েছিলো।'

'দড়ি কেটে তাকে নামালো কে?'

'তার ভাইজি।'

'বাঁচাতে কেন গেলো?'

'তার আত্মার সদ্গতির জন্যে।'

'কত টাকা আছে তার?'

'অনেক টাকা।'

'৮০ বছর বয়স হবে লোকটার।'

'হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো। ৮০ বছর তো হবেই।'

'উফ! লোকটা বাড়ি যাচ্ছে না কেন? তিনটের আগে একদিনও ঘুমোতে পারছি না। এই লোকটা বিছানায় যায় কখন?'

'ও এখানে বসে থাকতেই পছন্দ করে।'

'ও একা। আমি তো একা নই। আমার স্ত্রী তো বিছানায় অপেক্ষা করতে থাকে।'

'তারও একদিন স্ত্রী ছিলো।'

'এখন স্ত্রী থাকলেও কোনো লাভ নেই।'

'তা কি তুমি বলতে পারো? তার স্ত্রী হয়তো খুব ভালো।'

'আরে না। তার ভাইজি তার দেখাশোনা করে।'

'আমি জানি। তুমি তো এইমাত্র বললে। সে-ই দড়ি কেটে তাকে নিচে নামিয়েছিলো।'

'আমি অতো বুড়ো হতে চাই না। বুড়ো মানুষ একটা নোংরা ব্যাপার।'

'সবসময় নয়। দেখো এই বুড়োটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সে চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মদ খায় না। এমনকি এখনো মাতাল তবুও দেখ তার দিকে চেয়ে।'

'আমি তার দিকে তাকাতে চাই না। আমি এক্ষুনি বাড়ি যেতে চাই। যাদের কাজ করে খেতে হয় তাদের জন্য এই লোকটার কোনো খেয়ালই নেই।'

বুড়ো মানুষটি ঘরটার দিকে চেয়ে দেখলো একবার। তারপর বেয়ারাদের দিকে তাকালো। 'আরেকটা ব্র্যান্ডি।' গ্লাসটাকে ইঙ্গিত করে সে বললো। বাড়ি যাবার জন্য যে লোকটি তাড়া করছিলো সে দ্রুত তার কাছে এলো।

'শেষ। আজ রাতে আর নয়। ক্যাফে বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আরেকটা।' বৃদ্ধ বললো।

'না। আজকের মতো শেষ।' বেয়ারা কাঁধের তোয়ালে দিয়ে টেবিলটা মুছলো আর সেইসঙ্গে ঘাড় নাড়লো।

বৃদ্ধটি উঠে দাঁড়ালেন এবং প্লেটগুলো গুনে দেখলেন। তারপর পকেট থেকে একটা চামড়ার মানিব্যাগ বের করে সব মিলিয়ে দাম যা হয়েছে পরিশোধ করলেন। আর বেয়ারাটির জন্য কিছু পেসেটা বখশিশ রাখলেন। বেয়ারা বৃদ্ধটিকে রাস্তায় নেমে যেতে দেখলো। খুবই বুড়ো মানুষ, হাঁটার কোনো স্থিরতা নেই বটে, তবে বেশ মর্যাদার সঙ্গে তিনি হাঁটছিলেন।

যে বেয়ারাটির বাড়ি ফেরার তাড়া ছিলো না সে বললো, 'আহা তাকে তুমি থাকতে দিলে না কেন?' তারা তখন জানালার শাটারগুলো নামাচ্ছিলো। 'এখন আড়াইটাও বাজেনি।'

'আমি ঘুমোবার জন্য বাড়ি যেতে চাই।'



'এক ঘণ্টায় কী এসে যায়?'

'না ভাই। আমার যতটা এসে যায় তার ততটা নয়।'

'একটা ঘণ্টা আর কতটুকু? সবার কাছেই এক ঘণ্টা।'

'তুমি দেখছি বুড়োটার মতোই কথা বলছো। আরে বাবা, সে তো এক বোতল মদ কিনে বাড়ি গিয়েও খেতে পারতো।'

'দুটো এক কথা হলো না।'

যে বেয়ারার বউ আছে সে বলল, 'না, এক কথা নয়। সে ঠিক অবিবেচক হতে চাইছিলো না। একটু তাড়াহুড়ো করছিলো মাত্র।'

'আর তুমি? তোমার তো রাত বেশি করে ঘরে ফিরতে হলে ভয়ের কিছু নেই।'

'তুমি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছো?'

'না। আমি তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করছিলাম মাত্র।'

'না। দ্যাখো আমার আত্মবিশ্বাস আছে। আমার পুরো আত্মবিশ্বাস আছে', তাড়াহুড়ো করছিলো যে বেয়ারাটি সে বললো আর শাটারগুলো তাড়াতাড়ি টেনে নামাতে লাগলো।

বয়স্ক বেয়ারাটি বললো, 'তোমার আত্মবিশ্বাস আছে, একটা চাকরিও আছে, তোমার তো সবই আছে।'

'আর তোমার কিসের অভাব?'

'কাজ ছাড়া সব কিছুর অভাব।'

'আমার যা আছে, তার সবই তোমারও আছে।'

'না। আত্মবিশ্বাস আমার কখনো ছিলো না। আর এখন আমি আর তরুণ নেই।'

'ছাড়ো ওসব কথা। বাজে কথা বাদ দিয়ে দরজায় তালা লাগাও।'

বয়স্ক বেয়ারাটি বললো, 'কফি হাউসে যারা বেশিক্ষণ থাকতে চায় আমি তাদের দলে। আমি সেই তাদেরই দলে, যারা ঘুমোতে বিছানায় যেতে চায় না। যারা সারা রাত্রির জন্য আলো জ্বালিয়ে রাখতে চায়।'

'আমি বাড়ি যেতে চাই। ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতে চাই।'

'আমরা দু-রকমের মানুষ', বয়স্ক বেয়ারাটি বললো। যে বাড়ি যেতে চায় সে এখন পোশাক পরে তৈরি হয়েছে। যে তা চায় না সে বললো, 'এটা শুধু জোয়ানই থাকার প্রশ্ন নয়, বা আত্মবিশ্বাসী থাকার প্রশ্নও নয়। যদিও এগুলি চমৎকার জিনিস। প্রতি রাতেই আমি কফি হাউসটি বন্ধ করতে অনিচ্ছুক। কারণ কারো না কারো এখানে আসার দরকার হতে পারে।'

'দ্যাখো, নাইট ক্লাবগুলো সারারাত খোলা থাকে।'

'তুমি বুঝতে পারছো না। এটা একটা পরিচ্ছন্ন এবং মন প্রফুল্ল করা কফি হাউস। এটা উজ্জ্বল-আলোকিত। এখানে আলো খুব চমৎকার। তার ওপরে গাছের পাতাগুলির ছায়াও রয়েছে।'

'শুভরাত্রি', তরুণ বেয়ারাটি বললো।

'শুভরাত্রি', বয়স্ক বেয়ারাটি জবাব দিলো। বিদ্যুতের আলো বন্ধ করে দিয়ে সে নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা চালিয়ে গেলো। 'আলো তো বটেই, জায়গাটি পরিচ্ছন্ন ও মন ভালো করাও হতে হবে। সঙ্গীতের কোনো প্রয়োজন নেই। নিশ্চয় তুমি সঙ্গীত চাও না এবং নিশ্চয় তুমি একটা বিশিষ্ট ব্যক্তির ভঙ্গি নিয়ে কোনো কফি হাউসের সামনে দাঁড়াতেও যাও না। যদিও এ সবেরই ব্যবস্থা এখানে করা আছে।'

'তোমার ভয়টা কিসের?'

'না। এটা ভীতি বা আতঙ্কের না।'

সে খুব ভালোই জানে এটা কিছুই নয়। সব মিলিয়ে এটা আসলেই কিছুই নয়। আর মানুষ মাত্রই কিছুই নয়। আসলে শুধুই আলো, আসলে আলো আর খানিকটা পরিচ্ছন্নতা আর একটু সাজানো-গোছানো। কেউ কেউ এর মধ্যেই জীবন কাটায়, কিন্তু তা কোনোদিন অনুভব করে না। সে শুধু এই জানে এটা শূন্য, কিছুই না। জানে যে, যারা 'কিছুই নয়'-এর মধ্যে আছে তারা জানে, আমার ভেতরটা 'কিছুই না'। 'কিছুই না' তোমার নাম, তোমার সাম্রাজ্য। 'কিছুই না' তোমার ইচ্ছা। তোমার 'কিছুই না' শূন্যতার মধ্যে শূন্যতা। শূন্যতাই তোমার রাজ্য। তুমি শূন্যতায় পরিণত হবে, শূন্যতারই ভেতরে। কারণ তা শূন্যতার মধ্যেই আছে। আমাদের এই 'কিছুই না' দাও। আমাদের প্রতিদিনের 'কিছুই না', আর আমাদের 'কিছুই না', যা আমাদেরকে 'কিছু না' থেকে তৈরি করেছে 'কিছুই না'। আমাদেরকে দাও 'কিছুই না'-এর ভেতর থেকে। 'কিছুই না'-এর ভেতর থেকে আমাদেরকে ক্রমাগত সরবরাহ করো। 'কিছুই না'-এর জয় হোক, 'কিছুই না' পূর্ণতা লাভ করুক। তোমার সঙ্গে 'কিছুই না' থাকুক। সে মৃদু হাসলো এবং বারের কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালো হাতে একটি বাষ্প বেরোনো ঝকঝকে কফি মেশিন নিয়ে।

'তোমার কী আছে?' অন্য বেয়ারাটি জিজ্ঞেস করলো।

'নাডা' (কিছুই না)।

'ছোট্ট একটা কাপ', বারম্যান তার কাপে কফি ঢেলে দিলো।

বেয়ারাটি তখন বললো, 'আলো খুব উজ্জ্বল এবং প্রফুল্লকর। কিন্তু একটু বিশৃঙ্খল।'

বারম্যান তার দিকে তাকালো কিন্তু তার কথার জবাব দিলো না। কথাবার্তা বলার সময় এখন নয়।

'আরেক কাপ চাও নাকি?' বারম্যান জিজ্ঞেস করলো।

'না। ধন্যবাদ।' বেয়ারাটি এ কথা বলে বেরিয়ে চলে গেলো। সে মদের দোকান অপছন্দ করতো। একটা পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত কফি হাউস একেবারেই ভিন্ন জিনিস। এখন আর বেশি কিছু না ভেবে সে বাড়িতে তার ঘরে যাবে। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত সকালে আলো দেখা দিলে ঘুমিয়ে পড়বে। যতই হোক সে তো নিজে জানতো এটা সম্ভবত অনিদ্রা রোগ। অনেকেরই অবশ্য এরকম আছে। ❖

সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে দ্বিতীয় সৈয়দ-হক

দ্বিতীয় সৈয়দ-হক

মেঘ ও বাবার কিছু কথা



সবিশেষ

****

'–আমি এই কহিনীর বিষয় লয়ে জলেশ্বরীর দীর্ঘ খরার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি। বুঝি আমার দাঁড়াবার কাল শেষ হয়ে আসে। তারই যেন সঙ্কেত হয় আকাশে মেঘের গর্জনে, যদিও মেঘ এখনো চোখের গোচরে আসে নাই। অচিরে সে আসে।'

–গুপ্ত জীবন, প্রকাশ্য মৃত্যু– সৈয়দ শামসুল হক, সেপ্টেম্বর ২০০৩

****

বর্ষাকালে আধকোশা নদীর তীরে ঢেউ আছড়ে পরে, তারই মধ্যে আলিফ মোহাম্মদ নামে একজন খেয়াঘাটে তার খেয়া নৌকাটি বেঁধে রাখে। প্রতিদিন সকালে সে তার কপালে সুরমা দিয়ে একটি আলিফ অক্ষর লেখে, যাতে করে অশুভ তার থেকে দূরে থাকে। তবে লিখে কোনো লাভ হয় না। জ্বরের ঘোরে উন্মত্ত অবস্থায় নৌকার রশি ছিঁড়ে টেনে নিয়ে যায় আলিফকে তার নৌকাসহ আধকোশার গর্ভে। সে জানে না যে সেদিন তার মৃত্যু হবে সেই নদীর হাতে। আলিফের ছেলে শুকুরও জানে না যে নদী তার বাবাকে এভাবে নিয়ে যাবে। জানলেও বা করার কিছু ছিল না। প্রকৃতির কাছে আমরা দুর্বল, অসহায়। এসব ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে আমাদের শুধু দেখার ও অপেক্ষার। করার কিছু নেই। এই কাহিনীটি যদিও আমার বাবার কল্পনায় সৃষ্ট, আজ এই কথা আমার কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। দু'মাস হলো জানতে পারলাম, বাবা ক্যান্সারে আক্রান্ত। ফুসফুসের ক্যান্সার, যা থেকে মানুষে সাধারণত সহজে রক্ষা পায় না। তবুও, একটি আশাহীন জীবন তো কোনো জীবন না। চিকিৎসা চলে, আশা আমরা করে যাই, আর বাকিটুকু রয়ে যায় সৃষ্টিকর্তার হাতে। ১৯৭৯ সালে জার্মানিতে যখন আমার ছোট চাচা নিহত হন, বাবা লিখেছিলেন যে আমাদের জীবন যেন একের পর এক প্রতিশ্রুতি আমাদের কবরে চলার পথে। সেই প্রতিশ্রুতি, সেই অঙ্গীকার হাতে নিয়েই আজ কিছু কথা বলার আছে বাবাকে নিয়ে। এবং যদিও জন্মগত সূত্রে আমি তার ছেলে, আমার মতো আরও অসংখ্য ছেলে আর মেয়ে ছড়িয়ে রয়েছে তার দেশে-বিদেশে। তাদের সৌজন্যেও এই লেখাটি আমার আজ লেখা। একজন নামকরা ব্যক্তি মারা গেলে অনেকেই তাকে নিয়ে লিখতে পারেন এবং তা লিখবেন; কিন্তু আমি যার কথা বলব, তিনি একজন জীবিত কিংবদন্তি হয়ে আছেন এখনও আমাদের মাঝে এবং তাই এই লেখাটির আরেকটি উদ্দেশ্য অত্যন্ত সরল; সেটা হলো তাকেও আমার এই ফাঁকে কিছু কথা বলা যা সহজে বলার সুযোগ হয়ে ওঠে না।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, একটি মানুষকে তার স্রষ্টা যখন আহ্বান করে তার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য, সে সেটা টের পায় তার অবচেতন অথবা অর্ধচেতন মনে। সেই কারণেই বোধহয় বাবা কিছু মাস আগে তার ছেলেবেলার পৈতৃক বাড়ি কুড়িগ্রাম থেকে ফিরে এসে বেশ উদ্যমের সাথে ঘোষণা করলেন, তিনি তার বাবার; অর্থাৎ আমার দাদার পুরনো খাট ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছেন। যে খাটে তার বাবা শুয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তাকে শুধু 'বাবা, আমি যাই' বলে। বলা বাহুল্য, এ কথা শুনে আমি তার মতো এত উৎসাহী হতে পারলাম না, তবে বাধাও দিতে মন চাইল না। কারণ আমি অনুভব করলাম, বাবার মধ্যে এমন একটি আদিম, প্রাচীন টান কাজ করছে যা ঠিকমতো বুঝে ওঠার ক্ষমতা আমার নেই। এবং ঠিক এমনই একটি টানের কারণেই হয়তোবা তিনি কিছুদিন আগে বায়না ধরলেন একবার আমাদেরকে, বিশেষ করে তার পাঁচ বছর বয়সের নাতি এজরা সৈয়দ হককে নিয়ে একবার কুড়িগ্রাম বেড়িয়ে আসবেন এবং সেখানে আমরা তিন পুরুষের বড় ছেলে একসঙ্গে মিলে সেই শহরের মাঝে কবরস্থানে রাস্তার ধারে থাকা আমার দাদার কবরটি জিয়ারত করে আসব।

এ উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমরা সপরিবারে গাড়ি করে বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে। আমার জীবনে তৃতীয়বারের মতো কুড়িগ্রাম যাওয়া, আমার ছেলে ও স্ত্রীর জন্য এই প্রথম। যেতে যেতে ভাবলাম, এমন কতবার সফরে বেরিয়েছি বাবার সঙ্গে। ছেলেবেলায় যখন এক সময় আমার মা বিদেশে ছিলেন পড়ালেখার কারণে, তখন বাবা আমাকে প্রায়ই নিয়ে যেতেন তার সঙ্গে ঢাকার বাইরে কোনো কাজ থাকলে। তখন আশ্চর্য হতাম দেখে, বাবার কাছে গোটা বাংলাদেশ যেন নিজের হাতের রেখার মতো সুপরিচিত। কোনো এক অজ-পাড়াগাঁয়ের পাশ দিয়ে গাড়ি যেতে তিনি এমনও বলতেন, 'ওই যে বটগাছটা দেখছ, তার নিচে চায়ের দোকানটায় খুব ভালো চা বানায়।' মনে হতো, সম্পূর্ণ দেশটা বাবার হাতের মুঠোয়। তাই তার সঙ্গে ঘুরে আরিচা ঘাটের পাশে মচমচে ভাজা ইলিশ মাছের সঙ্গে ভাত, কুমিল্লার পেড়া সন্দেশ, ফরিদপুরের গরম রসগোল্লা, এমনকি পুরনো এক জমিদার বাড়িতে এক ডিম পোচের পাহাড়ের সামনে নাশতায় বসে, এমন করেই বাবার সঙ্গে আমার ছেলেবেলা কেটেছিল। বাবার সঙ্গে পথে বেরোলে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি কেন এত দীর্ঘ জীবনেও কখনও তার বাংলাদেশি পাসপোর্ট ত্যাগ করে অন্য কোনো দেশের নাগরিকতা নেননি। তখনকার সময় বাবা আবার সিনেমাতেও হাত দিয়েছিলেন কিছুদিন এবং আমাকে মাঝেমধ্যে নিয়ে যেতেন তার ফিল্মের দলের সঙ্গে এদিক-ওদিক। 'বড় ভাল লোক ছিল' নামে একটি সিনেমার কথা মনে পড়ে, যাতে আছে সেই গান– 'হায়রে মানুষ রঙিন ফানুস, দম ফুরাইলে ঠুস' এবং আরও মনে পড়ে একটি সিনেমার গান যার কথা ছিল, 'কী হবে এত ভেবে, যা হবার তাই হবে।' তাহলে মনে হয়, মৃত্যু আর ভাগ্য– এই দুটি বিষয় নিয়ে একটি লেখককে অনেক চিন্তাভাবনা করতে হয়; আমাদের শেষ মুহূর্তে যে চিন্তা আমরা নিজেদেরকে নিয়ে করে থাকি।

ঢাকার মনিপুরীপাড়ায় মা'র বন্ধু কোহিনূর খালার বাসায় আমরা তখন ভাড়া থাকতাম। এবং সেখানে থেকে সেই অল্প বয়সেই শুনলাম একজন রাষ্ট্রপতিকে চট্টগ্রামে গুলি করে হত্যা করা হলো, একজন জেনারেল ক্ষমতায় এসে আমাকে জানালেন– বাংলাদেশে আটষট্টি হাজার গ্রাম আছে, এবং অনেক হৈ-হুল্লোড়ের সঙ্গে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা আসলেন দেশে ফিরে। এখন বুঝি, সেই সময় ঠিক আমি যেমন একটি শিশু থেকে কিশোরে পরিণত হচ্ছিলাম, দেশটাও তা-ই হচ্ছিল। লন্ডন থেকে এসে আমার দশ বছর বয়সে রাজনীতি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। অথচ বাংলাদেশে এসে দেখলাম রাজনীতি জিনিসটা যেন প্রতিটা মানুষের রক্তের শিরায়। সম্পূর্ণ ঢাকা শহর যখন একবার দেখলাম ছেয়ে গেছে নৌকা, ধানের শীষ, হারিকেন, লাঙ্গল, ছাতায়; তখন আমিও উৎসাহী হয়ে একটি বড় পোস্টার বানিয়ে তাতে লিখেছিলাম– 'দ্বিতীয় সৈয়দ হককে ডিম মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন' এবং আমাদের পাড়ার প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে বাসিন্দাদের কাছ থেকে একটি টিনের বাক্সে ভোট আদায় করেছিলাম। বোঝাই যায়, আমার সেই ব্যক্তিগত ভোটে আমাকেই সব পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে শেষপর্যন্ত নির্বাচিত করা হয়েছিল। বাবার কাছ থেকেই তখন বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে প্রথম জানা এবং এ ব্যাপারে আমার সেই দশ বছর বয়সের কৌতূহলী মনের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর তিনি আমাকে একনাগাড়ে দিয়ে যেতেন। এখন এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এসব সময়ের মধ্যেই আমার ছেলেবেলা কেটেছিল বাবার সঙ্গে। তার সঙ্গে আমার ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে এগুলো বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তার পরও থেকে যায় কত কথা, সচিত্র সন্ধানীর অফিসে বসে, পুরানা পল্টনে কোনো এক প্রাচীন প্রিন্টিং প্রেসে, কিংবা বায়তুল মোকাররম পেরিয়ে আমাদের টয়োটা স্টারলেট গাড়িতে করে লক্ষ্মীবাজারে চাচা-বাড়ির পথে– সবখানে বাবার সঙ্গে একটি ছোট্ট উপগ্রহর মতো আমি। এমন নানা অসংযুক্ত কথা ভাবতেই কেমন জানি সময় কেটে যায়! একবার সাভার পেরিয়ে স্মৃতিসৌধের কাছে গাড়ি থামিয়ে 'জয়' নামে একটি রেস্তরাঁয় ডিম-পরোটা দিয়ে নাশতা করে

একটানে যমুনা সেতু পার হয়ে আমরা চললাম বাবার সেই কল্পিত জলেশ্বরীর দিকে।

গন্তব্যস্থানের যত কাছে আমরা এসে পড়লাম, তত যেন বাবার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারলাম। যেন তিনি নিজেকে হালকা বোধ করছেন। চিন্তামুক্ত, তৃপ্ত; একটি শান্ত ভাব। এমন অনুভূতি বোধহয় মানুষের হয় যখন তাদের মনে একটি ফিরে আসার ভাবনা থাকে। রংপুর পার হতেই বাবা আমাদেরকে গর্বের সঙ্গে একের পর এক দৃশ্য দেখাতে লাগলেন। কোথায় কোন এক বাজার বসত, কোন জায়গায় মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি মিলিটারির হাতে এলাকার কিছু দুঃসাহসী ছেলে মারা যায়, কোন নদীর তীর কমতে কমতে কত দূর এসেছে এবং কোন এক রেল স্টেশন যেখানে এক সময় নাকি আমার দাদা দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাবার চোখ ঝলমল করে। যেন বর্তমান সময়ে থেকেও দূর অতীতে এক এক করে স্মৃতি ভাসছে চোখের সামনে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে আসছিল যখন ক্লান্ত আমরা কুড়িগ্রামের ডাকবাংলোতে এসে পৌছলাম। ডাকবাংলোটি সেই আগের মতো নেই। ইতিমধ্যে কে যেন ঐতিহাসিক পুরনো সেই কাঠের কুঠিবাড়ির মতো বিল্ডিংকে ভেঙে তার পরিবর্তে আধুনিক একটি দালান দাঁড় করিয়েছে এবং মানুষকে বোধহয় একটি ক্ষুদ্র সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সেই আগের বাংলোর একটি ছোট্ট সংস্করণ তৈরি করে মাঠের মাঝখানে রেখেছে। ডাকবাংলোর পাশে এখনও সেই পুকুরটি রয়েছে, যার ধারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যরা বসে বিশ্রাম নিত এবং যাদের সঙ্গে আমার বাবা মাঝেমধ্যে সময় কাটাতেন।

কুড়িগ্রামে একটি বেশ মজার মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আব্রাহাম লিঙ্কন নামে একজন স্থানীয় আইনজীবী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বুঝলাম, বাবার সঙ্গে তার অনেক দিন ধরেই পরিচয় এবং এটাও অনুভব করলাম, বাবা তাকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। লিঙ্কন সাহেবের বাসায় সেদিন রাতে খেতে গিয়ে দেখলাম, তিনি তো বাসা নয়, ছোটখাটো এক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে থাকেন। প্রতিটি দেওয়ালে টাঙানো সেই সময়ের কোনো না কোনো স্মৃতি, ফটো, দলিল, খবরের কাগজের কাটিং। সেই ক্লান্ত অবস্থাতেই অনেকক্ষণ ঘুরে কাটালাম তার অদ্ভুত সেই বাসাটি উপভোগ করে। পরদিন ভোরে আজানের সময় ঘুম ভাংলে ভাবলাম, একবার শহরটিকে হেঁটে একটু দেখে নিই। ঢাকার দূষিত ধুলোয় ভরা পরিবেশ থেকে এসে বেশ ভালোই লাগছিল মফস্বলের খাঁটি বাতাস গিলতে। এমন সময় দেখি লিঙ্কন সাহেব এক মোটরসাইকেলে এসে থামলেন আমার পাশে। একগাল হেসে আমাকে প্রভাতের শুভকামনা জানিয়েই বলে উঠলেন, 'চলেন, একবার আপনার বাবার কবরটা দেখে আসি!' কথাটা শুনে মনটা একটু চুপসে গেল আমার। একটু থতমত খেয়ে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে!' ঠিক তখনই আবার মনে পড়ল, বাবা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন, কুড়িগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজ প্রাঙ্গণে তার জন্য একটি জায়গা বরাদ্দ করা হয়েছিল, যেখানে তাদের ইচ্ছা তাকে শেষবারের মতো শোয়ানো হবে। জায়গাটা আসলেই একবার দেখার দরকার আছে ভেবে উঠে পড়লাম মোটরসাইকেলে। লিঙ্কন সাহেব এলাকায় ভালোভাবেই পরিচিত থাকার কারণে সারাটা পথ এক হাত হ্যান্ডেলে রেখে, আরেক হাত দিয়ে মানুষজনকে সালাম দিতে দিতে নিয়ে গেলেন আমাকে একটি ছোট্ট সফরে গভর্নমেন্ট কলেজের উদ্দেশে। কলেজটা অনেক বড় আর সুন্দর। যা ভেবেছিলাম, একদমই তা নয়। আর তার সামনে, রাস্তার ধার ঘেঁষে একটানা লম্বালম্বি দুই বিঘা মতো জমি; যা সম্পূর্ণ ধানের ফসলে বোনা। সেই জায়গাটিই নাকি বাবার জন্য রাখা আছে। সামনে লম্বা রাস্তাটা ধরে বাঁ দিকে কিছুদূর গেলেই 'সীমান্ত' নামে একটি বিএসএফের ক্যান্টিন, তার পরই ভারত, ডাইনে গেলে কুড়িগ্রাম শহর। মনে মনে তখন আল্লাহর কাছে ছোট্ট একটি প্রার্থনা করেছিলাম, যেন বাবাকে এখনও অনেক দিন ধরে শেষবারের মতো এখানে নিয়ে আসতে না হয়।

আমার আবার বহুদিন ধরে গোপনে বেশ অভিমান ছিল। কারণ আমরা থাকি ঢাকায় অথচ আমার বাবা চান তাকে মাটি দেওয়া হবে দূর এই শহরে। যে শহরের সঙ্গে আমার নিজের ছেলেবেলার কোনো স্মৃতি নেই। যার সঙ্গে আমার বাবা ও আমার পূর্বপুরুষের সূত্র ছাড়া আমার সরাসরি কোনো সম্পর্কই নেই। আসল কথাটা হলো, আমি এখানে শুধু নিজের কথাটাই এতদিন ভাবছিলাম। ভাবতাম, বাবা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছ থেকে এত দূরে সরে থাকতে চান কেন? তাহলে কি চান না যে তিনি চলে গেলে আমরা তবুও তাকে হাতের কাছে পাব? তবে এবারে কুড়িগ্রামে গিয়ে আমার চিন্তাধারায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এলো। প্রথমটি হলো, আমি কুড়িগ্রামকে কিছুটা ভালোবেসে ফেললাম। এত ছিমছাম গোছানো একটি শহর, তার ওপর প্রতিটি মানুষের এত আন্তরিকতা– দেখে মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। আর সেসব মানুষ শুধু আত্মীয়স্বজনও নয়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে অচেনা লোকজন আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কতদিন থাকব, আমি কেন এত দীর্ঘ দিন পর এসেছি এবং অনুরোধ করল সামনের বার যেন আরও সময় হাতে নিয়ে আসি। বুঝতে পারলাম, যদিও আমি তাদেরকে চিনি না, তারা অনেকেই আমাকে চেনেন। হয়তোবা আমার ছোট দাদার সঙ্গে চেহারায় আমার কিছুটা মিল আছে কি-না তাই তারা আমাকে একা দেখেও চিনতে পেরেছেন– নিশ্চয়ই এটা হবে তাদের সেই অতীতের প্রিয় কলা-খাওয়া ডাক্তারের নাতি।

দ্বিতীয় কারণটি আর একটু গভীর। আর সেটি হলো এই পনেরো বছর পর যে আমি কুড়িগ্রামে এলাম, সেই পনেরো বছরের মধ্যে আমি বাবার আরও অনেক লেখা পড়তে পেরেছি এবং বয়স হওয়ার কারণে সেগুলোকে একটি পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে পেরেছি। লেখকের ছেলে হয়ে এখানে আমার আরও একটি সৌভাগ্য হলো, আমি লেখাগুলো পড়ে তার সঙ্গে আবার সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করতে পেরেছি। আর সেই আলোচনার মাধ্যমেই বুঝতে পেলাম, যখন একদিন এক দরিদ্র পাটনির নায়ে নদী পার হতে এসেছিলেন ঈশ্বরী, যখন নৌকার পাটাতনে পড়েছিল ঈশ্বরীর ভেজা পায়ের ছাপ, সেই ছাপটি শুধু সেই নৌকায় পড়েনি; সেটি তখন পড়েছিল আমার বাবার বুকেও। যে মানুষটিকে আমি সারাজীবন শুধু বাবা বলে দেখেছি, তাকে কিন্তু আমি তার এই জলেশ্বরী থেকে আলাদা করে দেখতে পারি না। এই গল্পের স্রষ্টা যে তার সৃষ্টি থেকে অবিচ্ছেদ্য। আর সেই কারণেই আমি বাবার কুড়িগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজের সামনে কবর হওয়ার ইচ্ছায় কোনো বাধা দিতে পারলাম না। মানুষের শেষ ইচ্ছা এমন একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার যে, সেখানে আমার বাধা দেওয়াটা ঠিকও হবে না। তাই ধরে নিলাম, আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে আমার আবারও দেখা হবে তার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে, আবারও আমি একদিন আসব ধরলা নদীরে পারে; আবারও একদিন গাড়ি করে ভোগডাঙ্গায় রাস্তার ধারে এক কাপ চা খেয়ে আসব এবং এমন করেই দাদা-বাড়িতে যাওয়া-আসার মধ্যে থাকতে হবে আমাকে। কথাটা ভাবতে যতখানি খারাপ লাগবে ভেবেছিলাম, তা কিন্তু একেবারেই লাগল না। বরং মনে হলো, জীবনে এই প্রথমবারের মতো যেন একটি আসল দাদা-বাড়ি পেলাম।

কুড়িগ্রামে যদিও পনেরো বছর পর আমার আসা,



স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে সৈয়দ শামসুল হক

শহরটিকে কিন্তু আমি খুব আন্তরিকভাবে চিনি। কোথায় পুরনো রেল স্টেশন ছিল, কোনদিক দিয়ে বাজারের মধ্য দিয়ে জাহাজ ঘর এবং আমার দাদার পুরনো ডিসপেনসারি আর কোন রাস্তা ধরলে আমার দাদার বাড়ি পৌঁছানো যায়– এ সবই আমার ভালোমতো জানা রয়েছে। এর কারণ মাত্র একটিই। ছেলেবেলায় রোজ দুপুরে খাবার পরে আমার কাজ ছিল বাবার পাশে শুয়ে গল্প শোনা। কিন্তু আর দশটা ছেলে যেমন সেই বয়সে সিন্দাবাদের গল্প কিংবা ঠাকুরমার ঝুলি শুনে থাকত; আমি বাবার কাছে একটার পর একটা গল্প শুনতাম কুড়িগ্রামে তার ছেলেবেলা নিয়ে। তাই আমি জানতাম আমার বড় দাদার বাড়িতে প্রতি বছর আমগাছের শীর্ষে সেই সোনালি আমটি পাড়ার আনুষ্ঠানিক সরঞ্জাম। আমি জানতাম আমার ইদ্রিস দাদা কীভাবে লুকিয়ে আমার দাদার ডিসপেনসারিতে চালের আড়ত দিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা খেলেন। আমি জানতাম যে আমার ছোট চাচা বিড়ি খেতে গিয়ে কীভাবে দাদার হাতে পিটুনি খেলেন। এমনকি জানতাম সেই আধা-পাগলা তইবর দা কীভাবে দোকানে চা খাওয়ার পর কাপটি ছুড়ে মারতেন এবং কীভাবে দোকানের সব কর্মচারী ক্রিকেট খেলার ফিল্ডারের মতো প্রস্তুত থাকত সেই কাপটিকে ধরার জন্য।

দুটি কথা বর্তমানে মনে আসে এই স্মৃতিগুলোর কারণে। প্রথমত, আমি নিজে এখন একটি চঞ্চল ছেলের বাবা হয়ে বুঝি, আমার বাবার কী অসীম ধৈর্য ছিল আমাকে দিনের পর দিন রোজ দুপুরে এতখানি সময় নিয়ে এসব গল্প শোনানোতে। এক একটি গল্প যে কতবার শুনে ফেললাম, তার হিসাব নেই। শুধু মনে আছে, বাবা কোনোদিনও একটুখানি বিরক্তি প্রকাশ করলেন না যখন আমি শতবারের মতো কোনো এক গল্প শুনতে চাইতাম। তাই আমারও মুখস্থ হয়ে গেল তইবর দা'র সেই চা খাওয়ার কথা। আমি জানতাম, একটি বানরের খাঁচায় আঙুল দিলে আমার দুষ্টু ছোট চাচা কামড় খাবেনই, এবং আমি এমনও জানতাম যে ভবিষ্যতে যিনি একজন বিখ্যাত লেখক হতে চলেছিলেন, তিনি কীভাবে একাকী তার বাড়ির ছাদে দুই টিনের চালের ফাঁকে বসে কাগজের এক বাক্স দিয়ে নিজের হাতে বানানো একটি ছোট বায়োস্কোপ নিয়ে কত সময় কাটাতেন। এক সময় বহুদিন জ্বরে ভুগে যে তিনি কল্পনা করতেন একটি বিস্কুটের টিনের ওপর এক পা দিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকার কথা। এসব কাহিনী আমার কাছে অত্যন্ত আন্তরিক হয়ে যায় সেই সময়। দ্বিতীয় কথাটি যা মনে এলো, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। আমি বুঝতে পারলাম, বাবা দীর্ঘদিন কুড়িগ্রামকে ফেলে এলেও তার মন থেকে কিন্তুকুড়িগ্রাম কোনোদিনও দূরে সরে যায়নি। তিনি যে জলেশ্বরীকে নিয়ে এত অসংখ্য কথা লিখেছেন; লোকে যদি একবার জানত সেই জলেশ্বরীর প্রতি তার বুকে চিরজীবন কী এক নিষ্পাপ ভালবাসা!

কুড়িগ্রামে যাওয়ার আগেই ঢাকায় আমাদের বাসাতে এসে হাজির হলো আমার দাদার সেই খাট ও ডিসপেনসারি থেকে দুটি কাঠের আলমারি। তিনটি আসবাবপত্রেরই অবস্থা খুব করুণ। ঘুণে ধরা, জায়গায় জায়গায় খেয়ে যাওয়া, ধুলো মাখানো কয়েকটা ভাঙা কাঠের টুকরো যেন এসে পৌঁছল আমাদের দুয়ারে। যখন ট্রাক থেকে নামানো হয়েছিল, তখন বেশ বুক ফুলিয়ে বাবাকে বলেছিলাম কোনো চিন্তা না করতে। এগুলো ঠিকঠাক করতে যা লাগে তা আমিই করব। কিন্তু কুড়িগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে এসে বিবেচনা করে দেখলাম, কাজটি যত সহজ ভেবেছিলাম, তা মোটেই নয়। মেরামতের কাজ তো প্রচুর রয়েছে, কিন্তু তার সেই আগের মতো চেহারা বের করাটা এক বিশাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এর মূল কারণটা হলো, খাটটিতে কিছু বছর পরপর কে যেন পুরু করে এনামেল পেইন্ট দিয়ে এক দফা রঙ মেরে দিয়েছে। তা ছাড়া আলমারির দরজা ধরে টান দিলে তা হাতে খুলে চলে আসে। আমার এক ছেলেবেলার বন্ধু, যে এখন বাংলাদেশের অন্যতম ফার্নিচার কারখানার মালিক, খুব গম্ভীরভাবে জিনিসগুলো পর্যবেক্ষণ করে খানিকক্ষণ মাথা চুলকে জানাল, এটি আসলে কাঠমিস্ত্রির কাজ নয়। এটির বারো-আনা কাজ হলো রঙমিস্ত্রির। এবং সে এমনও জানাল, এখানে তিনজন দক্ষ মিস্ত্রিকে একটানা এক মাস কাজ করতে হবে। শুনে তো আমার মাথায় হাত। তবুও কাজটি না করলে নয়, তাই মনে করে শুরু করে দিলাম। শুরু করাতেই দেখা দিতে লাগল নানান ধরনের বাড়তি সমস্যা। খাট ঠিক করে কোথায় রাখব? নিচের তলার ঘরটা তো আপাতত গেস্ট-রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাহলে অতিথিদের চিলেকোঠার রুমে থাকার ব্যবস্থা করি। কিন্তু সেখানে তো আবার বছরের পর বছর জমে থাকা জিনিসের আবর্জনা। সেগুলো গুছিয়ে না হয় ছাদের স্টোর-রুমে রাখি। সেখানে তো আবার বর্ষায় চার আঙুল পানি জমে। তাহলে ছাদের পাইপ ঠিক করে পানি যাওয়ার ব্যবস্থা আগে করতে হয়। সেই একের পর এক কাজ বাড়তেই থাকল। একটি সাধারণ কাজ পরিণত হলো মস্ত বড় এক প্রোজেক্টে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, নিচতলার ঘরের বাইরে পশ্চিমের টানা বারান্দায় যে বাবার জন্য একটি লাইব্রেরি আর বৈঠকখানা তৈরি করব, সে জায়গার মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অন্তত পক্ষে দশ-বারো হাজার বই-খাতা, ম্যাগাজিন, ডায়েরি, চিরকুট, পাণ্ডুলিপি, খবরের কাগজ, পোস্টার, ক্যালেন্ডারসহ অসংখ্য জিনিস। তারও মধ্যে রয়েছে টিকটিকি, তেলাপোকা, উইপোকা, ছারপোকা, ইঁদুর আর নানা ধরনের অকথিত জীবজন্তু যারা হয়তোবা ভাবতেও

পারেনি, একদিন তাদের রাজত্ব সেখানে শেষ হয়ে আসবে। আমার একটি কথা আছে যে কোনো কাজ শুরু করলেই তা শেষ হওয়ার পথে নামে, এই ভেবে শার্টের হাতা গুটিয়ে হাতে ন্যাকড়া নিয়ে নেমে গেলাম সেই ধুলোমাখা অক্ষরের সাগরে।

কাজ করতে করতে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আসে মাথায়। তাদের মধ্যে একটি হলো এই লেখা। আমার আবার লেখার কাজ সব সময় সিংহভাগটা হয় মাথার মধ্যে। কম্পিউটার বা খাতা-কলম নিয়ে পরে বসলে আমার তখন কাজটি থাকে শুধু নিজের কাছ থেকে এক ধরনের ডিকটেশন নেওয়ার মতো। তাই মনে মনে এই কথাগুলো সাজাতে থাকলাম। সেই কারণে মনটা ক্রমশ গম্ভীর হতে থাকল। তারই মাঝে লক্ষ্য করলাম, একটি লেখকের জীবনে বিস্তারিত কত ধরনের সম্বন্ধে আমাকে প্রথমে জানতে হবে। কৌতূহল জাগলে আবার বইটার পেছনটা এক ঝলক দেখে নিতে হবে। তারপর যেগুলো খুব বেশি ভালো লাগে, তাদের পাতা খুলে সূচিপত্র থেকে শুরু করে কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি চলবে। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, একদিকে বই থেকে ধুলো মুছছি, আরেকদিকে তৈরি হচ্ছে আমার ভবিষ্যতে পড়ার জন্য একটি ছোট্ট পাহাড়। 'দৈনিক পাকিস্তান' নামে ১৯৭০ সালের একটি খবরের কাগজ পেয়ে কোনো লোক একবার সেটা না দেখার লোভ সামলাতে পারে? কাগজটা পড়ে মন কিছুটা বিগড়ে গেল কয়েকটি কারণে। প্রথমে ভাবলাম, আমি তাহলে পাকিস্তান আমলেই জন্মেছি; নিজেকে তখন ঠিক খাঁটি বাঙালি মনে হলো না। তারপর ভাবলাম, আমার এখন যে বয়স, সেই



আনোয়ারা সৈয়দ হক ও সৈয়দ শামসুল হক

বইয়ের প্রভাব যে থেকে থাকে। এবং আমাদের বাসায় তো একজন নয়, দু-দুজন লেখক বাস করে দীর্ঘ দিন ধরে। আমাকে নিয়ে ধরলে আড়াইটাও বলা চলে। তাই বের হতে থাকল একের পর এক পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রধান অঞ্চল থেকে উপন্যাস, কবিতার বই, রচনা, প্রবন্ধ। তার পরও লেখার ওপরে লেখা, ব্যাকরণ, শব্দকোষ, ছন্দ, লেখার অনুরূপ-ধ্বনি-সাদৃশ্য, মিত্রাক্ষর; অর্থাৎ একটি লেখকের যন্ত্র-বাক্সের মধ্যে যা কিছু থাকতে পারে সবই পেলাম সেই স্তূপের মাঝে। আমার একজন প্রিয় লেখক স্টিফেন কিং-এর 'অন রাইটিং' নামে একটি আত্মজীবনীমূলক বই আছে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রতিটি অসাধারণ লেখকের একটি বিশেষ গুণ থাকে। সেটি হলো তারা প্রত্যেকেই একই সঙ্গে অসাধারণ পাঠকও। এই কথাটির সত্যতা কিছুটা অনুভব করতে পারলাম বাবা-মা'র সেই আলাদীনের গুহার ভেতরে সঞ্চিত বইপত্র দেখে।

আমার মতো লোককে দিয়ে বই গোছানোও আবার এক বিপজ্জনক ব্যাপার। প্রতিটি বইয়ের নাম, লেখক ও বিষয় বয়সের মধ্যেই আমার বাবা এই হাজার হাজার বই পড়ে হজম করেছেন। এই কিছুটা অপদার্থ এবং অবাঙালি মিশ্র অনুভূতি নিয়েই আবার কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু সেটি তো আর কাজ নয়, সেটি পরিণত হয়েছে আমার জন্য এক ধরনের মেডিটেশনে। থেকে থেকেই মনটা ফিরে যায় বাবার দিকে। তিনি এই মুহূর্তে কেমন আছেন, তার চিকিৎসাটা ঠিকমতো হচ্ছে কি-না, কবে দেশে আসা সম্ভব হবে, এমনকি বাবা কি আদৌ কোনোদিন দেশে ফিরবেন? তাহলে কি শেষ পর্যন্ত এসব কাজ, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকা আমার সারাজীবনের উচ্চারণ না করা প্রতিশ্রুতি– এ সবই কি ব্যর্থ হবে আমার? তখন মনে হয়, আমিও যেন জলেশ্বরীর দীর্ঘ খরার ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার চোখের গোচরে এই মেঘ এসে গেল বলে।

এসব চিন্তাভাবনাকে আমি বেশি প্রশ্রয় দিতে চাই না। ক্যান্সার এমন একটি রোগ যে মন খারাপ করার এখনও অনেক সময় পড়ে আছে সামনে। আর আমার বাবার কাছ থেকে জীবনে অনেক কিছুই তো শিখেছি। তার মধ্যে শিখেছি

বিপদের মুখে নির্ভয় হতে। আঠারো বছর বয়সে যখন তার নিজের বাবা মারা যান, তখন তিনি সব কাজ-কর্ম সেরে, দাফন দিয়ে, সংসারের প্রতিটি কর্তব্য পালন করে অবশেষে বিকেলে এক কাপ চা নিয়ে বারান্দায় বসতে গিয়ে তখনই কেবলমাত্র কেঁদে ফেলেছিলেন। আর তাই আমিও এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমাকে টেনে নিচে নিয়ে যেতে দিই না। বাবা-মা উভয়েই সারাজীবন বলে গেছেন, আমার একটি ছোট্ট গুণ আছে। আর সেটা হলো, আমি নাকি বেশ রসিক একজন মানুষ। শত দুঃখের মাঝেও আমি লোকজনের মুখে হাসি ফোটাতে পারি। আর তাই দুশ্চিন্তা মাথা থেকে দূর করে আমি নিজেকেই জোর করে এক ধরনের আমোদিত করতে থাকি। ম্যাগাজিনগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে লক্ষ্য করলাম বেশ কয়েকটির ওপরে আমার মা'র হাতের লেখা। কোনটাতে ইংরেজিতে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে লেখা 'ডু নট রিমুভ' এবং তার নিচে দুটি দাগ কাটা, হয়তোবা আমাদেরকে আদেশটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। ভাবটা যেন এগুলোতে কেউ হাত দিলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হবে। মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পারলাম, আমার মা এক হাতের আঙুল উঠিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করে কড়া গলায় কথাটি বলছেন। আবার অন্যমনস্কভাবে খেয়াল করলাম কতগুলো ম্যাগাজিনের কভারে শুধু 'স-শা-হ' অক্ষরগুলো লেখা। সেগুলোতে বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই আমার বাবার লেখা আছে, তবে সেখানে তালব্য-শ-টা কেন যে 'আ-কার' পেল অথচ দন্ত্য-স-টা 'ঐ-কার' পেল না, তা আমি ঠিক যাচাই করতে পারলাম না। আবার খুঁজে পেলাম কতগুলো পুরনো বাজারের হিসাব, যাতে লেখা ছিল 'ডিম ৬ টাকা, পাউরুটি ৫ টাকা, এক দিস্তা কাগজ ৪ টাকা' ইত্যাদি। যেখানে আজকাল একটি ফকিরকেও পাঁচ টাকা দিতে গেলে মাঝেমধ্যে দ্বিধা হয়, যদি ওরা নাক সিটকায়। অবশেষে মা'র দুএকটা পুরনো ডায়েরির পাতাও চুরি করে পড়ে দেখলাম, যেখানে আমার আট বছর বয়সের কথা লেখা আছে এবং মুগ্ধ হয়ে ভাবলাম, আমার ও আমার নিজের ছেলের মধ্যে কতটা মিল রয়েছে।

সেই ডায়েরিতে একটি লেখা বিশেষ করে আমার মনে খুব প্রভাব ফেলল। যেখানে মা দুঃখ করছেন, তার জীবনে আরও কত লেখা অলিখিত রয়ে গেল। এটাই বোধহয় সৃষ্টিশীল মানুষদের জীবনে সবচেয়ে বড় আফসোস। সৃষ্টির কি কোনো বিরাম আছে? সে যে কখন আমাদের ওপর কোন বয়সে এসে ভর করে বসে আমরা জানি না! কিন্তু আমরা জানি আমাদের শেষনিশ্বাসের মুহূর্তেও তার সমাপ্তি ঘটবে না।

লন্ডনে নাকি কিছুদিন আগে বাবা ডাক্তারকে বলেছিলেন, তার আর কিছু চাই না, শুধু আর দু-তিনটা বই লেখার আছে, সেগুলো যেন তিনি কোনোমতে সুস্থ থেকে আমাদেরকে দিয়ে যেতে পারেন। বুঝতে পারলাম, একজন শিল্পীর কাছে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তার বউ-বাচ্চা, নাতি-নাতনিকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ তো আছেই, কিন্তু তার সৃষ্টিকে অসৃষ্ট রেখে যাওয়ার মতো দুঃখ তার কাছে আর নেই। মানুষের চৈতন্যের মাঝে তার আরও কিছু কথা ছড়িয়ে যাওয়ার কথা থাকে, যেটার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত হতে না হয়। এটা নিজেই তো এক ধরনের জীবিত মৃত্যু। এবং এই মৃত্যুটা তার প্রকাশ্যেই হয়, সে গুপ্ত আর থাকে না। বাবার নিজেরই কথায়– 'আর কত গল্প-প্রবন্ধ রচনা করা যায়', বৈকি!

দিনের পর দিন সেই বই গোছাতে গিয়ে এক সময় ভাবলাম, এত বই, এগুলোও তো প্রত্যেকটি কারও না কারও বাবা অথবা মা'র লেখা। তাদের মধ্যে কেউবা এখনও বেঁচে আছেন আবার কেউবা নেই। আর বড় কষ্ট লাগল চেনা-পরিচিতদের লেখা বই দেখে। শামসুর রাহমানের কবিতা-সমগ্র, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস– এমন সব নামকরা কথাশিল্পীর বই যাদেরকে আমি ছেলেবেলা থেকে বাবার সঙ্গে দেখে এসেছি, সম্মান করেছি, এমনকি আঙ্কেলও বলে ডেকেছি। আরও দেখলাম কাইয়ুম চৌধুরীর হাতে আঁকা এক এক বইয়ের অসাধারণ প্রচ্ছদ এবং মনে পড়ে গেল তাকে দেখেছি কতদিন লন্ডন ও বাংলাদেশ উভয় দেশে, তার চোখে চশমা আর কাঁধে ঝুলে থাকা সাদা চুল নিয়ে। সেই মানুষটিও তো দম ফুরাইয়া ঠুস হইয়া গেল। সেই কাছের অতি প্রিয় মানুষ তো একটিও আর নেই। 'শহর' নামে একটি কবিতায় বাবা আজ থেকে বিশ বছরেরও আগে ঠিক এই প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন যে আজ এই শহর তার কাছে 'বড় ধূসর, ধূসর বলে মনে হয়' এবং যেন 'আমারও সময় হল, যাবার সময়।' তবে সৃষ্টিকর্তার অসীম রহমতে তিনি বেঁচে গেলেন এই পর্যন্ত। না হলে তার গুপ্ত জীবন, প্রকাশ্য মৃত্যুর কথা আমরা জানতাম না, নারীগণ নামে কোনো এক নাটক রচিত হতো না এবং পরিমলদের বাড়িতে উড়ে যাওয়া বাদুড় আর দরজায় ঝোলানো তালা থেকে যেত শুধু তারই কল্পনায়। আমাদের চৈতন্যে সেই ছবিগুলো তিনি এঁকে যেতে পারতেন না, কখনও প্রবেশ করত না সেগুলো আমাদের মনে। লেখার কথা যখন তুলেছি, তখন বলি যে 'ঈর্ষা' নামে বাবার একটি কাব্যনাট্য আছে, যেটি আমার কাছে খুব প্রিয়। সেই নাটকটি সম্বন্ধে তিনি বহু বছর আগে আমাকে একবার গর্ব করে বলেছিলেন, তার বিশ্বাস– সেটা আজ থেকে দু'শ বছর পরেও লোকে পড়বে। আমারও সেই বিশ্বাস। এক সময় যখন কলকাতায় নাটকটি করা হয়, তখন দর্শকরা তাকে নাটকের শেষে দাঁড়িয়ে থেকে সংবর্ধনা জানায়। দু'শ বছর পরেও আমার বিশ্বাস– লোকে এইভাবেই নাটকটিকে গ্রহণ করবে কিন্তু তখন আর বাবা থাকবেন না তাদের সেই সংবর্ধনা পাওয়ার জন্য। হয়তোবা এমনও হতে পারে, তিনি তখন সেটা অনুভব করবেন কোনো এক প্রান্ত থেকে। আমি জানি না, তবে আমি আশা করে যাই।

এমন সব কথা মাথায় নিয়ে যে সামান্য বই গোছানোর কাজটি একটি পর্বতের মতো পথ রোধ করে আমার সামনে উঠে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এবং উইপোকার জ্বালায় বই সংরক্ষণ করে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। আর তাই দেখলাম প্রচুর বই নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের পাতা ফুটো ফুটো হয়ে ঝুরঝুরে অবস্থায়, যেগুলো হাতে নেওয়ামাত্র বাঁধন ছিঁড়ে পাতা ঝরে পড়ে যায় মাটিতে। কষ্ট লাগল দেখে। কারণ বইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আমার মধ্যে ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয়েছে। তার ওপর, যে বইগুলোর এই অবস্থা, তাদের অধিকাংশ আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। কারণ এককালে আমার কাজই ছিল বাবার লাইব্রেরিতে থেকে একের পর এক বইয়ের নামগুলো পড়া। সেই বইগুলো তখন আমার বুঝে পড়ার সাধ্য ছিল না, আর এখন দেখলাম চোখের সামনে তাদেরকে পড়ার সম্ভাবনাটাও চলে গেল মাটিতে ঝর ঝর করে পড়ে। কিন্তু এটাতে জাগল যেন আমার মধ্যে এক নতুন ধরনের অনুভব। উপলব্ধি করতে পারলাম, বইয়ের পাতা গুঁড়ো হয়ে মিশে যেতে পারে ধুলোর সঙ্গে, তাই বলে কি সেই বইয়ের মর্যাদা আমাদের কাছে কোনো অংশে কমে যায়? তার শাঁস, তার মূল বক্তব্য কি কোনোভাবে সংকুচিত হয় আমাদের কাছে তার ফলে? কখনোই তা হতে পারে না। আর এই যদি হয় সত্য, তাহলে তো আমার বাবা নিজেই একটি জীবন্ত বই। ক্যান্সারে খেয়ে যেতে পারে তাকে, মিশে যেতে পারে ধুলোর সঙ্গে তার শরীর যেমনে একদিন আমাদের সবাইকে যেতে হবে, কিন্তু চিরজীবী হয়ে থাকবে তার আশ্চর্য চিন্তাধারা ও আলোকিত মন তার কর্মের মাঝে। সেই কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার

কত যুগ আগেও যেই মানুষটি সারা রাত জেগে জিনে ভর করা একটি উন্মাদের মতো তার অলিম্পাস টাইপরাইটারে অক্ষর ঠুকে যেতেন, যার হাতের আঙুল ফেটে রক্ত বেরিয়ে যেত তার লেখার তীব্র জোয়ারে, সে তো চোখের নিমিষে উধাও হয়ে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে, কিন্তু তার লিখিত সন্তানগুলো তো আমাদেরকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না। কঠিন বাস্তবতার সম্মুখে এই কথাটি ভেবে আমি একটু না হলেও কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম।

মূল কথা এই, একটি মানুষের জীবনের কর্মের সঙ্গে তার আয়ুর কোনো সম্পর্ক নেই। জীবন অস্থায়ী; তাকে সেটা হতেই হবে। কিন্তু শিল্প অমর, শিল্প থাকে চিরকাল। ঠিক যেভাবে আমরা শত মৃৎশিল্পীকে স্মরণ করে থাকি তাদের কাজের ভেতরে, সেভাবেই আমি জানি– বাবাও একদিন বেঁচে থাকবেন পাঠকদের মনে তার কাব্য, তার উপন্যাস আর অন্যান্য লেখার মাধ্যমে। কিন্তু সে তো আর সবার কথা। আমার কাছে তো তিনি সাহিত্যিক নন; একুশে পদক অথবা স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত একটি ব্যক্তিও নন। তিনি আমার বাবা। আমার প্রথম বন্ধু, আমার প্রধান শিক্ষক এবং আমার জীবনে প্রতিটা সুখ-দুঃখে পেতে-থাকা কান। এক হাতে ধৈর্যশীল, আরেক হাতে এমন এক বিস্ময়কর মানসিকতার মালিক, যার ছোঁয়ার আভাস তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন দিনের পর দিন। যে মানুষটির সঙ্গে আমার এমনকি কোনোদিন ভাষারও প্রয়োজন হয় না, শুধু দু'জনার মধ্যে একটি কুঞ্চিত ভ্রু বা আড়ালে একটি মৃদু হাসি দিয়ে একে অপরকে বুঝিয়ে দিতে পারি হাজারটা না-বলা কথা। সে তো আমারই বাবা। তবে প্রথমেই বলেছি, একটি আশাহীন জীবন তো কোনো জীবন নয়। তাই এখনও আমি আশা করে যাই, কেউ হয়তোবা আমাকে ডেকে বলবে– 'কান্দিস না, শুকুর। নদী তোর বাপকে খাইছে তো কী হইছে! মুই আছি। তোর চিন্তা কিসে?' কিন্তু আমি এটাও জানি, সেই আশা কোনোদিন পূরণ হবে না।

অবশেষে কথা সামান্যই। এবং সেটা হলো এই, পরানের গহীন ভিতরে আমার একটিই কামনা, যেন আমাদের মাঝে তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় এখনও বহুদিন, যেন তিনি আরও অনেক বৈশাখে আরও অনেক পঙক্তিমালা রচনা করতে পারেন, যেন মৃত্যুর নীল দংশন থেকে তিনি আরও কিছুদিন হলেও রক্ষা পান। আরও কামনা করি, কুড়িগ্রাম গভর্নমেন্ট কলেজের সামনে মাঠটাতে যেন আরও অনেক বছর সবুজ ধানের শীষ বাতাসে দুলতে পারে। আর ততদিন যেন বাবার স্বপ্নে তার মা বুনে যেতে থাকেন নারিকেল পাতার পাটি, ব্যর্থ আহ্বান করে যান তার কাছে চলে আসার জন্য। আর ইতিমধ্যে আমি? আমি শুধু গুছিয়ে যাব বাবার বই; মিস্ত্রির পেছনে তাড়া দিয়ে যাব কাজ ঠিকমতো করার জন্য, আমি ছাদে চিলেকোঠার ঘরটি সাজিয়ে রাখব সুন্দর করে। আমি গলায় এক তিক্ত স্বাদ নিয়েও নিজেকে ব্যস্ততার মধ্যে ডুবিয়ে রাখব। কেননা, তা না হলে অলসতা ও বেকারত্ব দু'দিক থেকে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে মানসিক বিকলতার নির্জন পথে। সে পথে এখন আমার চলার সময় নেই। হয়তোবা একদিন শুকুর মোহাম্মদের মতো আমারও ঘুণে ধরা কঙ্কাল সেজদায় পড়ে থাকবে কোনো এক ঈদগার মাঠে। তবে এখন নয়। এখন তো নির্ভয় হওয়ার সময়। যে প্রদীপের আলোয় আমার নিজের লেখার হাতেখড়ি, সে প্রদীপ যে এখন নিভে যেতে চায়। এবং তখন তো শুধু তার নিচেই অন্ধকার থাকবে না, চারদিক ছেয়ে যাবে অন্ধকারে আর আমার রয়ে যাবে এমন এক উত্তরাধিকার, যার উপযুক্ত হয়ে ওঠার ক্ষমতা আমার নেই। তখন আমিই হবো সেই অন্ধকার। ❖



স্ত্রী জিনা আমব্রিন খান ও সন্তান এজরা সৈয়দ-হকের সঙ্গে দ্বিতীয় সৈয়দ-হক ছবি : : রাজিব পাল



উ প ন্যা স

রাহাত খান

বিপন্ন বিস্ময়

একটি মুখস্থ সকাল সূর্যের সামান্য উদয় নিয়ে মেঘভরা আকাশ ভেদ করে উঠছিল। অন্ধকার বিদেয় নিয়েছিল আগেই। চারদিকে একটি লোকালয়ের পটচিত্র ক্রমে ক্রমে প্রকাশমান হচ্ছিল।

অলঙ্করণ : : বিপ্লব সরকার



এই সময় একটা রিকশা একজন মধ্যবয়সী আরোহী নিয়ে গ্রামের পাকা রাস্তা ধরে সামনে এগোচ্ছিল। এই-ই নাকি তেত্রিশপাড়া গ্রাম।

আরোহী অসুস্থ। রিকশার হুড ধরে বসে ছিল। চারদিকে তাকাচ্ছিল। তার চোখে সন্দেহ, বিস্ময় দুই-ই ছিল। সন্দেহ হচ্ছিল, কারণ পুরনো গাছপালা, পুকুর, বাড়িঘর প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। ঘোষপাড়াটা যেন উধাও হয়ে গেছে। জামতলাটা ছিল বাঁধানো, অদূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকার কথা একটা মঠ। তাঁতিপাড়াটা বা কোথায় গেল?

তবে এটাই যে তেত্রিশপাড়া গ্রাম, তাও কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছিল। একটা গ্রামের কাঠামো বদলাতে থাকে সময়ের সাথে সাথে। তাই বলে গ্রামটা তো সেই গ্রামই থেকে যায়। হঠাৎ হঠাৎ গ্রামটাকে সে চিনতে পারছিল। বিস্মিত হচ্ছিল গ্রামের বদল দেখে। আগে পাকা বাড়ি বলতে ছিল পালবাড়ি। যা কি-না তার পৈতৃক নিবাস। এখন বেশ কয়েকটা হাফ-বিল্ডিং আর দুটো পাকা বাড়ি দ্যাখে সে রাস্তার দু'পাশে। আগে ছড়াছড়ি ছিল আম, কাঁঠাল বাগানের। এখন রাস্তার ধারে মেহগনি। আর প্রচুর শাল, সেগুন রাস্তা থেকে একটু দূরে এখানে সেখানে।

আরোহীর নাম ক্যাবলা পাল। রোগা, ভুগা একটা শরীর তার। রিকশা করে যেতেও কষ্ট হচ্ছিল। আর কদ্দুর, জিজ্ঞেস করলেই রিকশাওয়ালা জানায়, এই তো পেরায় আসি গেলাম।

ক্যাবলা পালের শৈশব, কৈশোর এবং তরুণ বয়সের কয়েকটি বছর এই গ্রামে কেটেছে। নবনীতাকে বিয়ের পরও তো বার দুই গ্রামে নিয়ে এসে বেশ কিছুদিন কেটেছে। সেই গ্রাম মাত্র ষোল বছরে কী রকম বদলে গেল! অবশ্য তার জীবনটাও তো কম বদল দ্যাখেনি। সুন্দরী স্ত্রী এবং শিশু অমূল্যকে নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুরের এক ছোট শহরে চমৎকার কাটছিল তার সময়টা। হঠাৎ কোত্থেকে কী হল! স্বর্গ থেকে পতন ঘটল নরকে।

সেই দুঃসময় তার এখনো চলছে।

বর্ডার পার হয়ে ঢুকেছে পিতৃভূমিতে। ট্রেনে, বাসে, জলযানে অতি কষ্টে তার গ্রাম-যাত্রা চলছিল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি আত্মাটা দেহ ছেড়ে যায়। কিন্তু ক্যাবলা পালের যে বড় সাধ তার নিজের তেত্রিশপাড়া গ্রামে পিতা স্বর্গতঃ রঘুনাথ পালের বাড়িতে শুয়ে মরা! ঈশ্বর হয়তো তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

ক্যাবলা জানে না তার যে বুড়ি পিসিমা বাড়ি আগলে ছিলেন, তিনি বেঁচে আছেন কি-না। বাড়িটা, বাড়ির চতুষ্পার্শ্বের গাছপালা ঘেরা বিশাল বাগান, জমি-জমা ইত্যাদি অন্যের দখলে চলে গেছে কি-না।

গেলেও করার কিছু নেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হয়। তার বাবা রঘুনাথ পর্যন্ত তাদের তিন পুরুষ মহাজনী কারবার করেছে। কত মানুষের সর্বনাশ যে হয়েছে তাদের হাতে। বাবাকে মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলতে শুনেছি, –আমি কী কইরব? বন্ধক দিই জমি দিলি; বন্ধক ছুটাতি পারলি না। না খাতি খাতি মারা গেলি। ভগমানের শাসন! আমি কী কইরব?

ক্যাবলা বেশিদূর পড়ালেখা করেনি। তবে সে বুঝতে পারত, তার বাপকে ধর্মে ধরেছে খাবলা মেরে। খামোকা ভগবানের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে নিজের দোষ, নিজের পাপ খণ্ডাতে চাইছে!

তিন পুরুষের পাপ। ক্যাবলা অবশ্য মহাজনী কারবারের দিকে যায়নি। সে সময় পয়সা দিয়ে বর্ডার পার হওয়া যেত। বাপকে হতাশা ও উদ্বেগের মধ্যে রেখে সে পাড়ি জমিয়েছিল পশ্চিম দিনাজপুরের একটা ছিমছাম ছোট শহর নিমপুরায়। তাদের গ্রামের আরো কয়েক ঘর আগে থেকে সেখানে ছিল। একটা বড় দালান কিনে নিয়ে সে বীজধানের দোকান বসিয়েছিল। ক্যাবলা পাল জানত দোকানে উন্নত জাতের বীজ, পাশাপাশি উন্নতমানের সার রাখলে ব্যবসা ভালো জমবে।

তার ধারণা বাস্তবের সাথে মিলে গিয়েছিল। বছর খানেকের মধ্যে ব্যবসায়ে ভালো লাভের মুখ দেখেছিল সে।

শুধু কি ব্যবসা? একটা সুখের সংসারও তার হয়ে গিয়েছিল। ডানাকাটা পরী যাকে বলে, সেই তার স্ত্রী নবনীতার কারণে। নবনীতা প্রথম রাতেই বশ মেনে গিয়েছিল। সে যেভাবে চেয়েছে সেভাবেই ক্যাবলা পাল করেছে সংসারের জন্য। দু'বছর পর অমূল্য এসে গিয়েছিল তাদের সংসারে। সব মিলিয়ে সেই দিনগুলি ক্যাবলা পালের জন্য ছিল স্বর্গে বাস করার মতো আনন্দময়।

আনন্দ বোধ করি এমনি হয়। ক্ষণস্থায়ী। তাদের সুখের সংসারও ভেঙে গিয়েছিল একটা হত্যাকাণ্ডে। ঘরের ভেতর খুন হয়ে মরে পড়েছিল নবনীতা।

অমূল্য তখন স্কুলে। পুলিশ ক্যাবলা পালকে ওই দিনই ধরে গরাদে পুরেছিল।

রিকশায় নিজের রোগে জর্জর, দুর্বল দেহটি কোনোরকমে রক্ষা করে যাচ্ছে ক্যাবলা পাল। শেষ পর্যন্ত নিজের গ্রামে ফিরতে পেরেছে বলে তার মনে হচ্ছিল যেন কোন অপার্থিব অবলম্বনের আশ্রয় পেয়েছে। বাড়িটা দখলও যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ওই বাড়ির কোনো একটা জায়গায় কি নিজগৃহে মৃত্যুবরণের সুযোগ দখলকারী তাকে দেবে না– নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে সে।

বাড়ি নয়, জমি-জমা সম্পত্তি নয়, পালবাড়িতে জন্মেছিল, পালবাড়িতে মরতে চায় ক্যাবলা। সে জানে মৃত্যু তার চারপাশে ঘুরছে। যে কোনো মুহূর্তে আত্মা তার দেহ ছেড়ে উড়াল দেবে। মৃত্যুর পায়ের আওয়াজ সে শুনতে পায় যখন-তখন।

রিকশাওয়ালাকে সে জিজ্ঞেস করে পালবাড়িটা আর কদ্দূর। রিকশাওয়ালা বলে : এই তো পেরায় আসি গেলাম।

নানা রোগ-ব্যাধি, নিঃশ্বাসের কষ্ট ইত্যাদি নিয়ে নিজের গ্রামে শেষ পর্যন্ত ফিরতে পেরেছে। এও কি কম সৌভাগ্যের কথা! ঈশ্বরের কম কৃপা!

এই এ্যাতো দূর রাস্তা পার হয়ে সে আসতে পেরেছে– নিজেরই একেক সময় বিশ্বাস হতে চায় না! বর্ডার ক্রস করা; ট্রেনে, বাসে, জলযানে চড়া, কখনো কখনো হাঁটতে হওয়া, হ্যাপা কি কম গেছে তার দুর্বল, কাহিল শরীরের ওপর দিয়ে!

এখন নিজ ভিটেয় পৌঁছে ক'দিনের জন্য আশ্রয় পেলে হয়। তাদের বাড়িটা ছিল প্রাচীর ঘেরা। ভেতরে ও বাইরে দুটি পাকা দালান। খুচরো দু'একটা ভিটে-পাকা টিনের ঘরও ছিল। বাড়িটার কোনো নাম ছিল না। তবে তল্লাটের লোকজনের মুখে মুখে নাম হয়ে গিয়েছিল মহাজন-বাড়ি।

বাড়িটা কেউ ভালো চোখে দেখত না। আবার ভয়ে কেউ নিন্দাও করতে সাহস পেত না। মহাজন-বাড়ির পদ্মপুকুর আর বাগান-গাছপালার বেশ নামডাক ছিল। শ্বশুরবাড়ি ঘুরেফিরে দেখে নবনীতা বেজায় খুশি। রাতে ক্যাবলাকে জড়িয়ে ধরে সে বলে : এমন প্রেকাণ্ড একটি বাড়িতে আমার বিয়ে হইছে, কী সৌভাগ্য আমার!

আসলে সৌভাগ্য তো ছিল ক্যাবলার। নবনীতা বাংলাদেশেরই বরিশালের মেয়ে। ওর বাবা ছিলেন তেমন পসার না হওয়া এক মোক্তার মোক্তার এবং তার স্ত্রী দু'জনই দেখতে বেশ ভালোই, তবে কিশোরী নবনীতা ক্রমে দেখতে হয়ে উঠছিল ছায়াছবির নায়িকাদের মত। লম্বা, মাথায় ঘন কেশরাশি, অনিন্দ্যসুন্দর চোখ-মুখ ও দেহবল্লরী

রাস্তায় বখাটেরা জ্বালাতন করত বলে নবনীতা বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেনি। তবে এ নিয়ে তার তেমন দুঃখ ছিল না। সে মনে মনে নিশ্চিত ছিল, ছায়াছবির নায়িকা হতেই তার জন্ম। ছায়া-ছবি জগতের কেউ না কেউ তাকে লুফে নিতে এই এলো বলে।

অপেক্ষায় দিন কাটত নবনীতার।

এসব গল্প হেসে হেসে ক্যাবলাকে নবনীতাই বলত। বোম্বে বা কলকাতা, কোনো ঠাঁই থেকে কেউ এল না। শেষে পাড়ার অজিতেষ নবনীতাকে কলকাতা নিয়ে যেতে রাজি হয়। ফিল্ম-পাড়ার লোকজন আগে তো দেখবে, পছন্দ করা না করা তো পরের কথা! অজিতেষের একটাই বাসনা– নবনীতা নায়িকা হয়ে গেলে পুরনো বন্ধুকে যেন ভুলে না যায়।

অজিতেষ মোটেও নবনীতার বন্ধু নয়। নবনীতার পেছনে ফিল্ডিং মারত, প্রেমপত্র লিখত তো অনেক ছেলেই। অজিতেষ

পাত্তা না পাওয়া তাদের একজন। তবে দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলে বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল, নবনীতার সাথে এমনিই এটা-ওটা নিয়ে কথা বলার একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বটে।

মেয়েদের নিয়ে দুর্নাম ছিল অজিতেষের। তার সাথে কে যায় পালিয়ে কলকাতা-বোম্বাই! নবনীতা বলে দেয়, অজিতেষের এত গরজ কেন নবনীতাকে কলকাতা নিয়ে যেতে। একটা লুচ্চা-বদমাশের সাথে পালিয়ে কোথাও যাওয়ার মেয়ে নবনীতা নয়।

অজিতেষ যেন খুব দুঃখ পেয়েছে। বলে : তাহলে একটা আলিঙ্গন আর চুমু দে। এরপর বলে, অরুণদের দোকানে এক প্লেট কাচ্চু খেয়ে সে পরদিনই গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরবে। পূর্ব জনমের প্রিয়াকেই যদি না পায়, কী লাভ অজিতেষের বেঁচে থাকার!

হাসছিল বটে নবনীতা। আর জ্যাঠার রূপা-বাঁধানো মুখের লাঠিটা নিয়ে দৌড়ানি দিয়েছিল ওই মূর্তিমান শয়তানটাকে!

এসব গল্প নবনীতার স্টকে আরো কয়েকটা ছিল। ক্যাবলার স্বামী-অন্ত-প্রাণ স্ত্রী তো ছিল বটে নবনীতা। আর অনেক স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে যা থাকে না, সেই সুন্দর বোঝা-পড়ার বন্ধুত্বও ছিল তাদের।

নবনীতার এ ধরনের প্রত্যেকটা গল্পের শেষে ক্যাবলা বলত : তারপর!

নবনীতা বলত : তারপর আর কি। ক্যাবলা পাল এসে গেল, গল্পের নটে গাছটি মুড়োলো।

ক্যাবলা পালের জীবনটা কত ঘটনা, কত কাহিনী দিয়ে গড়া! আর বলাও যায় না কখন, কোন স্মৃতি মনের আয়নায় ভেসে ওঠে।

রিকশা করে যেতে যেতে যেন জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ হচ্ছিল। তবু সুখের স্মৃতি তার অন্তরকে সুধা ও বিষ দুই-ই জুগিয়ে যাচ্ছিল।

আর কদ্দূর পালবাড়ি!

রিকশাওয়ালাকে জবাবটা দিতে হয় না। ক্যাবলা পাল নিজের চোখে দ্যাখে, অদূরে ভাঙা দেয়াল, প্রচুর গাছপালার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা একটা একতলা ভবন।

সে শুধু বলে : ঠাকুর। ঠাকুর।

দুই

কামিনী, এমনিই, খাওয়ার পর বাসন-কোষন ধুয়ে তেমন কাজ তো থাকে না, তার এ সময় দিবা-নিদ্রার অভ্যেসও নেই; দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির খিড়কি দরজা ধরে; এমনিই, খামোকা। তার চোখ দুটি মুখস্থ জায়গাটার কতকিছু দেখছিল। হঠাৎ দ্যাখে ময়না মেম্বার হন হন করে তাদের বাড়ির দিকে আসছে।

একটু যে তার ভাবের গতিক নড়ন-চড়ন করল না, তা নয়। গতকালই তো দেখা হয়েছিল, একান্ত দেখা যাকে বলে। রঘু পালের বাড়ির পেছন বাগানের শেষ প্রান্তে সাপ আর বেজির যেদিকটায় জীবন-মরণ যুদ্ধ হয়, সেই অনেকটা জায়গাজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঁশবনে। কাজ শেষ হওয়ার পর ময়না মেম্বার তার লুঙ্গিটা কোনোমতে পরে, একটা কথাও না বলে বাঁশবন থেকে বেরিয়ে দক্ষিণের দিকে চলে গিয়েছিল।

কামিনীও বেশিক্ষণ তিন-চার পরতের বাঁশপাতার ওপর বেশিক্ষণ শুয়ে থাকেনি। তবে মেয়ে মানুষের তৈরি হয়ে উঠতে একটু সময় তো লাগে। কেন যে বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল! এরই মধ্যে তার চুল ঠিক করা, জামা পরা। সায়ার বাঁধন ঠিক করে নিয়ে শাড়ি পরা।

তার ঝুঁকি ময়না মেম্বারের চেয়ে একটু কম। সাপ আর পাগলা শেয়ালের উপদ্রব আছে বলে রঘু পালের বাড়িতে বিশেষ কেউ ঢোকে না। তাছাড়া কাঁধে গামছা ফেলে পাল-বাড়িতে সে তো যায় পরিত্যক্ত, ভাঙা সিঁড়ির পদ্মপুকুরে বেলা একটা-দেড়টায় চান করতে।

প্রত্যেক দিন, বৃষ্টি-বাদলা না থাকলে কামিনী পালবাড়ির পদ্মপুকুরে স্নান করতে যাবে। ময়না মেম্বার রোজ তো যায়ই না, কবে যাবে সেটা শুধু কোনো না কোনো কৌশলে কামিনীকে জানিয়ে দেয়। সপ্তাহে বড়জোর দু'দিন। তিন দিনও হয়ে যায় কখনো কখনো। আবার মাস-দেড় মাস যাওয়া হয় না, এমনও হয়। যা হোক, ময়না মেম্বার বাঁশবনে যাওয়ার টাইম দিলে কামিনী যায়। দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হয় দু'একটা। কোনো কোনো দিন একটা কথাও হয় না। যন্ত্রের মতো দু'জন দু'জনের সাথে মিশে যায়।

হন হন করে ময়না মেম্বার আসছে। কামিনী তেমনি দাঁড়িয়ে।

: দাদাকে একটা খবর দে।

: কী বুইলত...

: ক, ময়না মেম্বার আসিছে।

কামিনীর চোখে খানিকটা কটাক্ষ ছিল বৈকি। তবে সেটা ময়না মেম্বারের কাছে তেমন দাম পায় না। কামিনীকে কোনো আস্কারা না দিয়ে ঢুকে যায় মধু পালের বাংলা ঘরে।

একটু পর থেলো হুঁকা হাতে ঘরে ঢোকে মধু পাল। ইঙ্গিতে একটু অপেক্ষা করবে বলে হুকায় মন দেয় মধু পাল। তার চেহারা একটু গোলগাল। লম্বাও তেমন কিছু না। ময়না মেম্বারের তেজি শরীর আছে, তবে মধু পালের চেয়েও সে খাটো। তা হোক, কবে পাকিস্তান আমলে সে বিডি মেম্বার হয়েছিল, এখনো সাত গেরামের কাছে সে ময়না মেম্বার নামেই পরিচিত। একটু মান-সম্মানও পায় গেরামে। তার আর কি বিষয়-সম্পদ একটু কম আছে। আর ক্যাবলা পাল ফিরেছে, তাকে যদি মংলার মাঠে দশ বিঘা জমি ফেরত দিতে হয়, তাহলে ময়না মেম্বার আগে যেমন কোনো রকমে পেট চালা'ত, সেই ময়না মেম্বারের দশায় চলে যায়।

ক্যাবলা পাল ফিরে এসেছে শুনে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কী হয়, কী হবে সেটা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছে না। মধু পালও ক্যাবলার ম্যালা জমিজমা তার দখলে রেখেছে। জমিজমা নিজের নিজের ভোগ দখলে রাখার কৌশলটা মধু পাল আর ময়না মেম্বার মিলেই করেছিল : এ জন্যে জাল কাগজপত্র করা, এসি ল্যান্ড, নায়েব, সাব-রেজিস্ট্রারদের নিয়মিত পয়সা-কড়ি দেওয়া–সবই করছে। করতে হচ্ছে। এখন ক্যাবলা স্বয়ং ফিরে এসেছে। জমিজমার আসল কাগজপত্র তো বুড়ি নিভাননী আর ক্যাবলার কাছেই থাকার কথা। বলছে বটে খুব অসুস্থ, বাপের ভিটেয় মরতে এসেছে! কিন্তু ক্যাবলা পাল যদি না মরে?

মধু পাল থেলো হুঁকা থেকে সাদা ধোঁয়া উড়াচ্ছে। নাকে-মুখে ধোঁয়া। ব্যাটা কোনো রকম চিন্তিত বলে মনে হয় না। ময়না মেম্বার রাগের চেয়ে চিন্তিত বেশি।

মধু পাল হুঁকা এক পাশে রেখে বলে : কী খবর ময়না?

: খবর আর কী। সর্বস্বান্ত হতি চললাম! তোমার তো চিন্তা নাই। তুমি পাল, ক্যাবলা চরণও পাল। আবার শুনলাম, ক্যাবলা পালের চিকিৎসা আর সেবা-যত্নের ব্যবস্থাও করিছ। তোমার মতলব তো পরিষ্কারই বুঝা যাচ্ছে। তা আমি ময়না মেম্বার যদি লোকসানে যাই, তাহলি তুমি কিন্তু শান্তিতে থাকতি পাবা না–আমার পরিষ্কার কথা।

মধু পাল রঘুনাথ পালের বংশের কেউ না। পাশের বাড়িতে আছে, ঘটনা এইমাত্র।

মধু পাল ময়না মেম্বারের কথায় এক গাল হাসে। বলে : তোমারে বাদ দিই কোনো কাম করিছি? আমার এই কথার একখান জবাব দাও দেকিনি...

: আহা, আগে করো নাই। এখন জমিজমা আর বাড়ির মালিক ফিরি আসিছে! এখন করবা। দু'জনায় মিলি বড় করি করবা। সমস্যা কোথায়...

: মেম্বার, তুমি হলা একখান বোকার হদ্দ। বড় হইছে তোমার-আমার। তোমার স্বার্থ আমার, আমার স্বার্থ তোমার। এই বিধেন যদি না মানি, তয় তুমি শেষ, আমিও শেষ...

ময়না মেম্বার বলে : কথাটা তো সেরকমই ছেল! তয় এখন তো শুনি তুমি ক্যাবলা চরণকে সারিয়ে তোলার জন্যি খগেন ডাক্তারকে লাগিয়েছ। আবার ক্যাবলার সেবা-যত্নের জন্যি লাগিয়েছ তোমার ছোট বোন কামিনীকে। তোমার স্বার্থ যে



আমার, আমার স্বার্থ তোমার– সেইটা ক্যামনে বুঝি, কও!

মধু পালের মুখে সেই মোলায়েম হাসি। জানায়, খগেন ডাক্তার হোমেপ্যাথিক। তিনবার মেট্রিক পরীক্ষা ফেল মেরে শেষে হেনিম্যানের একখান বই আর স্টেথোস্কোপ কিনে ডাক্তার বনে গেছে। তার চিকিৎসায় আজ পর্যন্ত ভালো হয়েছে কেউ, এমন নজির আছে? ময়না মেম্বারই বলুক।

আর সেবা-যত্নের জন্য কামিনীকে ক্যাবলা চরণের কাছে পাঠাবার রহস্যও ময়না মেম্বারকে খুলে বলে মধু পাল। ক্যাবলা চরণের পিসি নিভাননী বুড়ি ম্যালা ঔষধি গাছের সন্ধান রাখে। সে নাকি পণ করেছে– লতা-পাতা, শেকড়-বাকড়ের রস খাইয়ে ভাইপোকে সারিয়ে তুলবে। তা বুড়ি কামিনীকে পাশে পেয়ে মহাখুশি। ঔষধ বানিয়ে কামিনীকেই সে দ্যায় ক্যাবলাকে খাইয়ে দিতে। এখন কামিনী সেই ঔষধ না খাইয়ে যা খুশি খাইয়ে দেয়, তাহলে কেসটা কেমন দাঁড়াবে? চাই কি, কামিনী একটু ইয়ে করে, বুঝলা তো মেম্বার, ক্যাবলা চরণ মেলামেশা করুক, ... বাড়ি আর সম্পত্তি লিখে দিয়ে কামিনীকে বিয়ে করলে সেটাই বা মন্দ কী ...

মধু পালের বাক্যি শুনে ময়না মেম্বার তাজ্জব বনে যায়। কামিনীর বিষয়টা শুনে তার খানিকটা খারাপ লাগছে বটে। তবে ক্যাবলা চরণের যা কি-না দুর্বল আর রোগা-ভুগা শরীর হয়েছে, তাতে চিন্তার খুব একটা কারণ নেই। এখন কথা হচ্ছে, লোকটা কত তাড়াতাড়ি মরে!

এই কথারও উত্তর ছিল মধু পালের কাছে। জানায়, তিন মাসের ওপরে এই দেহ যাবে না।

: যদি তিন মাসে আপদ চিরবিদায় না নেয়?

: আমার কান কাটি ফেলি দেব!

মধু পালের এত বড় কথার পর ময়না মেম্বার আর কথা বাড়ায় না। সে যে মধু পালকে খুব একটা বিশ্বাস করে, তা নয়। তবে এইটুকু জানে– ময়না মেম্বার ঠকা খেলে মধু পালও রেহাই পাবে না।

কামিনীর সাথে একবার দেখা হওয়া দরকার। মেয়েলোকটা যে তার বশে আছে, সেটা বেশ ভালো জানে ময়না মেম্বার। তাকে এখন সে পায় কোথায়?

পরের দিন দুপুর হব হব দিকটায় চুপিসারে সে গেল ক্যাবলা পালদের পদ্মপুকুরে। লুকিয়ে থাকল একটা গাছের আড়ালে।

আগে জায়গাটা বিরান হয়ে থাকত। ক্যাবলা পাল বাড়ি এসেছে শুনে যখন-তখন গেরামের লোকজন তাকে দেখতে আসছে। খুব কৌতূহল মানুষজনের। যে ব্যক্তির স্ত্রী হত্যার দায়ে আদালতে ফাঁসির রায় হয়েছিল, এমনকি রায় কার্যকর হয়েছে বলেও শোনা গিয়েছিল; সেই ব্যক্তি দুর্বল অসুস্থ দেহ নিয়ে জীবিত কী করে গেরামে আসে? ফাঁসি হওয়া থেকে বেঁচে গেল কীভারে?

ক্যাবলা চরণ তো বেশি কথা বলতে পারে না, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা নিয়ে আসা লোকজনকে বলা হয় যে, আগে ভালো হয়ে উঠুক, তারপর একদা ফাঁসির দণ্ড পাওয়া ব্যক্তি স্বয়ং এসবের জবাব দেবে। মধু পাল তার লোকদের দিয়ে এসব সামলায়। কার মনে কী আছে কে জানে!

মধু পালকে নিয়ে আর ভাবে না ময়না মেম্বার। কামিনীর কাছ থেকে বৃত্তান্ত শুনতে চায়। বুঝতে চায়, মধু পাল তাকে নিয়ে খেলাচ্ছে কি-না।

গাছের আড়ালে ঘণ্টা দুই বসে থাকল ময়না মেম্বার। লোকজন যে বাড়ির এদিকটায় ঢুকছে তা নয়। তবু সাবধান থাকা ভালো। কামিনীর সাথে তার সম্পর্ক জানাজানি হলে বিপদ আছে। তার এক নম্বরের বিবি তো সূতিকায় ভোগে। সে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিজের শরীরের রক্তহীন, জীর্ণ-শীর্ণ দেহটি নিয়ে সর্বক্ষণ দুশ্চিন্তায়।

বিপদ হতে পারে দ্বিতীয় বিবি দুলিজানকে নিয়ে। কয়েক বছরে সেও তার আগের ভরা জোয়ানি শরীর অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। তবে কি-না একটা কিছু এদিক-ওদিক হলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে। এমন ধারালো জিহ্বা, ময়না মেম্বারের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করতে ছাড়ে না। আর বিবির গায়ে হাত দিলে?



রীতিমতো ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। দুলিজানের আছে মাইক-ফাটানো গলা। এমন কান্না আর চিল্লানি শুরু হয়, যাতে কি-না এ-পাড়া ও-পাড়ার লোক ময়না মেম্বারের বাড়ি এসে ভেঙে পড়ে। মান-সম্মান বলতে কিছু থাকে না।

কামিনীকে শাদি করতে পারলে ভালো হত। পেলাম দিলাম, –ব্যস এইটুকুতেই সন্তুষ্ট। অবশ্য স্ত্রী হলে কামিনী মেয়েলোকটা কেমন দাঁড়াত তা বলা সহজ না।

এককালে দুলিজানও কি কম শান্ত আর চুপচাপ ছিল? বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে স্বামীকে হারিয়েছিল বত্রিশপাড়ারই মীর বাড়ির দুলিজান। আই বাপ, কী শরীরখানা ছিল সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটার! মুঠি ধরা কোমর, ভরা কলসীর মতো পাছা আর বড়ো কালো ভারি সুন্দর এক জোড়া চোখ ছিল!

ময়না মেম্বার পেছনে লেগেছিল। সূতিকায় তার পহেলা বিবির তো শরীর বলতে গেলে অকেজোই হয়ে গিয়েছিল। তবু দুলিজানের সাথে বিয়ের সম্বন্ধ করার আগে বিবি কুলসুমের অনুমতি নিয়েছিল। একেবারে কাগজে-কলমে। বিবির চোখ দুটি পানিতে ভেসে যাচ্ছিল। ঠোঁট চেপে কান্না ঠেকিয়ে বিবি কাগজে একটা টিপসই দিয়ে দিয়েছিল। কুলসুমের জন্য ময়না মেম্বারের বুকে একটু কষ্টের ভাব হয়েছিল। মেয়েলোকের জন্য ময়না মেম্বারের এই জিনিস খুব একটা হয় না। তার দুই স্ত্রী-ই বলে, দয়ামায়া ভালোবাসা– এসব কলবের জিনিস নাকি ময়না মেম্বারের নাই।

কামিনী কিছু বলে না। যা কিছু বলে তা তার চোখ। তাদের মধ্যে যা কিছু সম্পর্ক তা রঘু পালের বাঁশবাগানে। কথাবার্তা হলে সামান্যই হয়। অনেক সময় হয়ই না। শরীরই তো শরীরের সাথে কথা বলে। একটা শরীর আর একটা শরীরকে দিতে চায়। দ্বিতীয় শরীর থেকে পেতে চায়। সারকথা তো এইটাই? নাকি?

ময়না মেম্বার পুরুষ। যারা যারা তার কব্জায় এসেছিল তাদের ভাব-চরিতে বিষয়টা বোঝা যেত। তবে হ্যাঁ, ময়না মেম্বার মেয়েদের তেমন বোঝে না। তার দুই স্ত্রীর কাছে তার পরিচয় স্বার্থপর ও হৃদয়হীন বলে। সংসার, সমাজ আর বিষয়-আশয়ের ঝামেলা মেটাতেই হিমশিম খাওয়া একটা লোক সে। প্রয়োজনের সময় পুরুষ হওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে তা, স্বীকার করা ভালো, ময়না মেম্বার তা বিশেষ জানে না, বিশেষ বোঝে না। কামিনীই বা কতটুকু বোঝে? তার বড়ো ডাগর দুটি চোখ কখনো কখনো কী যেন বিদ্যুৎ-চমক ছড়িয়ে বলতে চায়! জানাতে চায়, এতদিনেও ময়না মেম্বার কতটাই বা সেসব বুঝতে পারল!

সূর্য মাথার ওপর উঠে গেছে। কামিনীর পদ্মপুকুরে আসার কোনো লক্ষণ দ্যাখে না ময়না মেম্বার। না, সে রেগে যায়নি। দুঃখ পায়নি। বিষয়-আশয় আর মানুষকে তার শরীর থেকে যতটা জানা যায়, তাতে সে নিশ্চিত কামিনী তার বসে আছে। তার মুঠোয় আছে। মধু পাল ক্যাবলা-চরণকে নিয়ে ময়না মেম্বারের সাথে কোনো চালাকি বা ধাপ্পাবাজির খেল খেলছে কি-না, তা কামিনীর কাছ থেকে ঠিক জানতে পারবে।

বিকেলে সে মধু পালকে কিছু না জানিয়ে ক্যাবলা-চরণকে দেখার ভান করে রঘু পালের বাড়িতে ঢুকে যায়। গেট পার হয়েছে কি হয়নি, দালানের বারান্দা থেকে একটা নারীকণ্ঠ শোনা যায় : কে রে?

ক্যাবলার চার কুড়ি বয়স পেরুলো পিসি। এই বয়সেও কী বাজখাঁই গলা! শুধু বাজখাঁই গলা না; চলাফেরা, চেহারা দেখেও মনে হয় না বুড়ির কমপক্ষে চার কুড়ি বয়স। লম্বা শরীর একটু নুয়ে পড়েছে, চলাফেরা করে একখানা মজবুত লাঠি নিয়ে। তবে বয়সের হিম্মত, দাপট কোনোটারই কমতি নেই।

একবার মধু পাল আর ময়না মেম্বার দু'জনই রাতের বেলায় চুপিসারে গিয়ে বুড়িকে গলাটিপে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। পরে মধু পালই পিছিয়ে যায়। পিছিয়ে যায় এই যুক্তি দেখিয়ে যে, বুড়িকে খুন করলেই যে রঘু পালের বাড়ি-সম্পত্তি সব কব্জা করা যাবে– তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর বুড়ি খুন হলে প্রতিবেশী হিসেবে পুলিশের হাতে ধরা খাবে তো মধু

পালই! সে যা কি-না নরম আর ভীতু মানুষ, পুলিশের দুটো রোলের বাড়ি খেলে চক্রান্তের কথা সব বলে দেবে। তারচে বুড়ি বেঁচে আছে বিধায় রঘু পালের যেটুকু জমি তারা ভোগদখল করে খাচ্ছে তা অনেকটা আইন ও লোকের কাছে বৈধতা পাচ্ছে। তাছাড়া কৌশলে যখন কাজ হচ্ছে তখন খুনাখুনির মধ্যে যাওয়ার দরকারটা কী! আর স্বর্গ-নরক বলেও তো একটা কথা আছে! নাকি নাই?

যুক্তিটা মেনে নিয়েছিল ময়না মেম্বার! তবে এই খুনখুনে বুড়ি যে শিগগিরই মারা যাচ্ছে না– এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। এখন আবার মরা-মা-মরার তালিকায় ঢুকেছে ক্যাবলা-চরণ! হ্যাঁ, সে খুবই অসুস্থ। দুর্বল আর কাহিল তো আছেই; শরীরে রোগ-ব্যাধিও ম্যালাই আছে। হাঁপানি আছে, শ্বাস-কষ্ট হয় মাঝেমধ্যে, হার্টে ব্যামো থাকা বিচিত্র কিছু না।

লোকটার দিন শেষ– সেটা তাকে দেখে বিশ্বাস হয়। তবে বুড়ি যেমন বছর কে বছর যায়, মরছে না, ক্যাবলা-চরণেরও যদি তেমনটা হয়। তিন মাসের মধ্যে মরে যাওয়ার বদলে যদি নতুনভাবে বেঁচে ওঠে!

হাঁ, মধু পালের একটা কথা মেনে নিতে হয় বটে। ক্যাবলা-চরণ বেঁচে উঠে কামিনীর ছলা-কলার ফাঁদে যদি পড়ে আর যে কোনো বয়স ও স্বাস্থ্যের অনেক পুরুষ মানুষের বেলায় যা হয়, লালসায় পড়ে যদি বাড়ি-সম্পত্তি লিখে দিয়ে কামিনীকে বিয়ে করে ফেলে, তাহলে মধু পাল আর ময়না মেম্বার দু'জনারই তো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তিন মাসের মধ্যে যদি মরে তো ভালো। যদি না কামিনীর ছলনার ফাঁদে পড়ে।

কামিনীর যা কি-না শরীর, যা কি-না চাওয়া তা ওই হাড়গিলে, হাগা-মুতায় কাহিল ক্যাবলা-চরণকে দিয়ে যে হওয়ার নয়, তা দিব্যি বুঝতে পারে ময়না মেম্বার! সন্দেহ নিয়ে কামিনীকে ক্যাবলা-চরণের পিছে লাগিয়ে, বিয়ে পর্যন্ত ব্যাপারটা টেনে কার্যসিদ্ধি করা যায়। বাকি ওপরওলার ইচ্ছা।

বুড়ির 'কে রে'র জবাবে ময়না মেম্বার গম্ভীর গলায় বলে : পিসিমা, আমি : ময়না মেম্বার!

নিভাননী মধু পাল আর ময়না মেম্বারকে একেবারেই পছন্দ করেন না। এই দুই শয়তান যে মহাজন-বাড়ির বেশকিছু জমিজমা ভোগদখল করে খাচ্ছে তা বিলক্ষণ জানেন। তবে কি-না, এই দুই শয়তানকে ভয় হয় তার– কোনদিন কী করে বসে কে জানে!

একটু কেঁধো গলায় নিভাননী বলেন : বাবু তো এখন খেয়েদেয়ে বিছানায় গড়ান দিচ্ছে...

ময়না মেম্বার বলে : পুরনো বন্ধু তো। যখন-তখন দেখতি ভারি ইচ্ছে করে। আমি এই যাব আর একনজর দেখে চলি আসব।

বুড়ি আর কথা বাড়ান না। সোনার দেশটা দিনকে দিন যা হচ্ছে তা কহতব্য নয়। হিন্দুরা মার খায় পাকিস্তানে আর মুসলমানরা মার খায় হিন্দুস্তানে। ইন্ডিয়ায়। হাওয়াটা এসে লাগে বাংলাদেশে। মানুষ আর মানুষ থাকছে না। ভণ্ড আর পশু হচ্ছে দিনকে দিন। কী দরকার ছিল বাপু ভারত ভাগাভাগির! এই ভাঙাভাঙির! হিন্দু বল মুসলমান বল– কেউই শান্তি পাচ্ছিস না। আর একাত্তরে কী ভয়াবহ ঘটনাই ঘটল! নিভাননীর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ হয়েছে। চোখের সামনে পাক-সেনা আর গেরামেরই রাজাকার আল-বদররা স্বামী, ছেলে-মেয়ে আর হিন্দু-মুসলমান দুই জাতকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে মারল। ভাবলে বুক ভেঙে যায় নিভাননীর। বাঁশবনের একটা গর্তে লুগিয়ে থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। আর সুবলচরণ তো তখন ইন্ডিয়ায়। ছোট কাকার সাথে পাঁচ বছরের কৈবল্যচরণ সেখানে গিয়েছিল বেড়াতে।

কী দিনই গেছে ভগবান! ভাবলেই নিভাননীর চোখ দুটি ভিজে ওঠে! এরপরও নিভাননী যে জীবন কাটায় তাকে তো ঠিক জীবন বলা যায় না! যাকে বলে রয়েসয়ে কোনোমতে প্রাণটা বাঁচানো। এই রকম বেঁচে থাকার যদিও কোনো অর্থ হয় না।

স্মৃতির দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠেন নিভাননী। তাকিয়ে দ্যাখেন খাটোপনা লোকটা তার ভাইপো যাকে তিনি বাবু বলে ডাকেন, হেলে-দুলে বুক চিতিয়ে দালানঘরের দিকে যাচ্ছে। নিভাননীর এখন আর তত ভয় বা দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। বাবুর ঘরে কামিনী তো আছে। ওর মতো ভালো মেয়ে সংসারে ক'জন মেলে!

কামিনী যেমন তার পিসি নিভাননীর দুঃখ আর অসহায়ত্ব বোঝে, নিভাননী তেমনি বাইশ বছরে বিধবা হওয়া কামিনীর দুঃখ আর ভোগান্তির কথা জানেন। পঁয়তাল্লিশ বছরে বিধবা নিভাননী না পারছিলেন সম্মান খোয়াতে, না পারছিলেন প্রায় প্রতি রাতে যন্ত্রণাদগ্ধ হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে। মানুষ যেভাবে বাঁচতে চায়, সেটা তো তার স্বভাব যা হয়তো ভগবান, হয়তো প্রকৃতির তৈরি করা। না, কামিনীর মতো তিনিও বেশ ক'বছর ভুগেছেন। বৃদ্ধত্ব এখন অসহায়ত্ব থেকে বাঁচাতে পারে না ঠিকই, তবে মানুষকে একটা জীবন-ভেদি দীর্ঘশ্বাসের পাশাপাশি অন্তত একটা অশৈলী ভোগান্তি থেকে তো রক্ষা করে।

কামিনীর সব কথা তিনি জানেন না। জানতেও চান না। মান-সম্মানটুকু বাঁচিয়ে সে যদি গোপনে কোনো পুরুষ নেয়, নিক। হিন্দু বিধবার জীবনটাই তো কষ্টে আর যন্ত্রণায় বেঁধে দেওয়া। সেই কষ্ট মৃত্যুর মতোই নির্মম, নিষ্ঠুর আর নির্যাতনে ভরা।

কামিনী তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনোদিন কিছু বলেনি। বলতে চায় না। তবে দিনের একটা না একটা সময় সে পিসির কাছে আসবেই আসবে। বুড়ির কত কিছু খেতে ইচ্ছে করে! সেটা শুধু কামিনীকেই বলেন। কামিনী তার সাধ্যমতো প্রত্যেকটা বার কিছু না কিছু নিয়ে আসে। কত গল্প হয় দু'জনের মধ্যে। তার একটাই ছেলে ছিল। হিমাদ্রি। হিমু। পাকিস্তানের সেনারা বাপ আর ছেলেকে একজনের পর আরেকজনকে একই কায়দায় গুলি করে মেরেছিল। হিমু বেঁচে থাকলে আর কামিনীর সাথে তার বিয়ে হলে বেশ হত। কথাটা যতই ভাবেন ততই তার দুঃখ আর শোকের অন্ত থাকে না।

হায়রে জীবন! নিভাননীকে একটু একটু না মেরে একেবারে কেন মৃত্যুর হাতে তুলে দেয় না।

এদিকে ময়না মেম্বার ক্যাবলা-চরণের ঘরে ঢুকে দ্যাখে কামিনী আছে : বিছানায় পা তুলে বসেছে। পাশ ফিরে শুয়ে আছে রোগে ভুগে এতটুকু হয়ে যাওয়া শরীরের ক্যাবলা-চরণের দিকে। কামিনী তার দিকে কিছুটা হেলান দিয়ে বসেছে। তার হাত ক্যাবলার মাথার চুলে বিলি কাটছে।

হঠাৎ ময়না মেম্বারকে দেখে কামিনী একটু অবাক। অপ্রস্তুতও কিছুটা। সে তার কৈবল্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে বসাটা সংশোধন করে নেয়। সোজা হয়ে বসে। কৈবল্যের মাথার চুল থেকে হাত সরিয়ে নেয়।

এসব খেয়াল করে দেখতে ময়না মেম্বারের তেমন কোনো আগ্রহ নেই।

সোজা কামিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে : কৈবল্যদার যত্নআত্তি ঠিকমতো করবা। বুঝলা তো...

কামিনী হতবাক। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

: দাদা কি ঘুম পাড়ি গেছে?

: হ্যাঁ, বোধহয়

: তাহলি বারান্দায় এট্টু আসো...

বারান্দা নয়, ওরা ঢোকে পাশের ঘরে। দেয়ালে ফাটল। মেঝেয় সাত যুগের ধুলো। ময়না মেম্বার কামিনীকে কাছে টানার চেষ্টা করে না। শুধু সংক্ষেপে জানায়, কৈবল্যচরণ সেরে উঠুক। জমি-সম্পত্তি, বাড়ি-বাগান লিখে দিয়ে কামিনীকে বিয়ে করুক। তাতেই মধু পাল ও তার স্বার্থ। কামিনী যেন কথাটা মনে রাখে।

কামিনী সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে। পাশাপাশি মনে মনে ভাবে : তাতে আমার স্বার্থ! কথাগুলো বলে ময়না মেম্বার দাঁড়ায় না। কামিনী কেমন আছে, সেটুকু বলার ভদ্রতাও দেখায় না। অপমানের একটা লিকলিকে সাপ কামিনীর হৃদযন্ত্র যেন কামড়ে ধরে। এই লোকটার কাছে কতটাই যে সস্তা আর হেয় হয়েছে কামিনী। সে তার ঠোঁট কামড়ে ধরে।

ততক্ষণে ময়না মেম্বার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। যা বলার কথা তা কামিনীকে বলল। ব্যস, আর সময় ক্ষেপণের কী দরকার?. গত সপ্তাহে উপ-শহরের সাদেক মীর্জার সাথে ময়না মেম্বারের দেখা হয়েছিল। মীর্জা সবই বোঝে। বোঝে, দখল করতে পারাটাই বেশি মূল্যবান। মামলা হলে দেওয়ানি মামলা টেনে টেনে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তো নেওয়া যাবে। তিনি পঞ্চাশ লাখের একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু কিসের কী! কৈবল্যচরণ ফিরে আসায় এখন আম আর ছালা দুই-ই যায়। বাড়ি বিক্রি তো এখন রীতিমতো দিবা-স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চিন্তা, কৈবল্যচরণদের ক্ষেত-জমির যেটুকু ভোগ-দখলে আছে, সেটুকু ময়না মেম্বার রক্ষা করতে পারে কি-না। গেরামের বেশ ক'জন ধড়িবাজ লোক একটু খালি অপেক্ষা করছে কৈবল্যচরণের ভালো হয়ে ওঠার। শরীর সেরে উঠলেই তারা যে মধু পাল আর ময়না মেম্বারের ইতিবৃত্ত জমি-জমা গাপ করে যাওয়ার বৃত্তান্ত ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে– তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য তার আগেই কামিনী আর কৈবল্য'র মধ্যে কাণ্ডটা ঘটিয়ে দিলেই কাম ফতে। কোনো ধড়িবাজের সাধ্য নেই এই মামলায় মাথা গলায়।

কামিনী যে তার সম্পূর্ণ বশে আছে– এ নিয়ে ময়না মেম্বারের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কাণ্ডটা ঘটাতে হবে। ঘটাতেই হবে। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়। রেজিস্ট্রারকে কিছু টাকা দিতে হলে দেবে তারা। তারা মানে নিজে ময়না মেম্বার আর মধু পাল। কৈবল্যচরণ মরুক, বাঁচুক– কোনোটাতে তাদের লোকসান নেই। শুধু কামিনীর সাথে কৈবল্যের ঘটনাটা ঘটলেই হয়।

তিন

পিসি কী যেন লতা-পাতার রস খাওয়াচ্ছে, একটু আস্তে-ধীরে হলেও রোগের উপসর্গগুলো দূর হচ্ছে কৈবল্য'র। বিচ্ছিরি একটা আমাশা ছিল, সেটা অনেকটা সেরে ওঠার পথে। ভাত খেতে পারছে, শুধু দুধ তার পেটে সয় না, আর বেশি মিষ্টি ও রসালু ফল খেলে একই রকম পেট-কামড়ানি, আমাশার ভাব হয়।

ইদানীং আগের মতো প্রায় সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকা বা পড়ে পড়ে ঘুমোনো অনেকটা কমেছে। বাড়িতে রঘু পালের আমলের একটা আরাম-কেদারা ময়লা আর ভাঙা আসবাবপত্রের স্তূপ থেকে উদ্ধার করে ধুয়ে-মুছে রাখা হয়েছে ঘরের পাশেই তিনটা আমগাছের ঝুপির নিচে। এ বাড়ি বহু পুরনো কাজের লোক, মধ্যবয়সী তবে শরীরে বেশ শক্ত-পোক্ত রামদাস কৈবল্যচরণের ফিরে আসার খবর শুনে এসে গেছে, আর বালক বয়সে যেমন পিসিমার সস্নেহ শাসনের ছায়ায় কাজ-কর্ম করত, সেই কাজ।

আর কামিনী এর মধ্যে মনের দিক দিয়ে বদলেছে অনেকখানি। আবার বিয়ে করে সংসারী হওয়ার একটা সাধ মাঝে মাঝেই তার হৃৎপিণ্ডের রক্তে বলক তোলে। ময়না মেম্বারের কাছে তার চাহিদা ইদানীং খুব বেড়েছে। কামিনী এটা-ওটা ওজর তুলে বাঁশবনে যাওয়া বলতে গেলে ছেড়ে দিয়েছে। মাঝে একদিন শুধু বাঁশবনে গিয়েছিল মিথ্যে করে ময়না মেম্বারকে এটা বলতে যে, তার মাসিক সবে শুরু হয়েছে। পেটে, সারা অঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা।

কামিনী আরো বলেছিল, দাদা আর ময়না মেম্বারের কথামতো কাজ তো সে চালিয়ে যাচ্ছে। পিসির ঔষধ, নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া আর কামিনীর সেবা-যত্নে লোকটা কিছুটা হলেও সেরে উঠেছে।

ময়না মেম্বার, কেন যেন এক রকমের কড়া-মেজাজে খর চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। তাকিয়েছিল যতক্ষণ না কামিনী তার চোখ নামিয়ে আনত চোখে তার সামনে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ছিল।

হঠাৎ গলার সুর পাল্টে, স্বাভাবিক গলায়ই বলে : আচ্ছা যাও। খালি দেখি নিও শিকার যেন হাত থাকি দি সটকি না যাই।

ময়না মেম্বারকে কামিনীর শরীর এখনও বিদ্রোহিনীর মতো, জেদির মতো চায় বৈকি। মাঝেমধ্যে চায়। আবার কামিনীর মনে একটা ঘৃণা ও অপমানবোধ বাড়ছে দিন দিন। ঘৃণা সে নিজেকেও করে। ইদানীং সংসার করার একটা সুখ-চিন্তা কামিনীকে নতুন একটা মানুষ করে তুলতে চাইছে যেন।

অঘ্রানের সকাল। জল-খাবার খেয়ে ভারি প্রসন্ন মনে আমকুঞ্জের নিচে ছায়ায় আরাম-কেদারায় আধশোয়া হয়ে বসে ছিল কৈবল্যচরণ। ইদানীং তার খাওয়ার ক্ষুধা একটু একটু ফিরে আসছে; আগের মতো মল তেমন শক্ত বা পাতলা হয় না। কয়েক বছর ধরে তেমন হচ্ছিল। কৈবল্য ইদানীং টের পায় তার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা একটু মাথাচাড়া দিচ্ছে।

সে তো এসেছিল স্বর্গীয় পিতৃদেব রঘুনাথ পালের বাড়ি এসে মরবে। বাঁচার আশা তার শেষ হয়ে গিয়েছিল জেলে গিয়ে। তখনো তার বিচার শেষ হয়নি। তাকে সারাদিন বেদম খাটানো হত। যারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি মাথায় নিয়ে জেলখানায় ছিল, তাদের কেউ কেউ কেন যেন মহা ক্ষ্যাপা ছিল তার ওপর। শালা, সুন্দরী বউটা মেরে এসেছিল। কিল-ঘুষি, পেটে ও পাছায় লাথি– এসব ছিল তাদের স্বাভাবিক আচরণ কৈবল্যের প্রতি। কৈবল্য ভেবে পেত না– একই হত্যাকাণ্ডের কারণে যাদের ফাঁসির দণ্ড না হয়ে যাবজ্জীবন হয়েছে তারা কিসের শোধ মেটায় কৈবল্যের ওপর এভাবে লাথি, চড়-থাপ্পড় মেরে! নাকি এসবই ঘৃণার বিরুদ্ধে ঘৃণা? জমে থাকা আক্রোশ অন্যের ওপর মেটানো! হায় ভগবান! মানুষ কী বিচিত্র!

তার ফাঁসির দণ্ড হয়ে গিয়েছিল জজ-কোর্টে। হাইকোর্টে কে বা কারা যে আপিল করেছে তার কেস, তা সে মোটে জানত না। পরে তো নিজের চোখে দেখেছিল। তার শ্যালক অরবিন্দ দেবনাথ এবং সদ্য ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরা হাইকোর্টের সনদধারী তার ও নবনীতার একমাত্র পুত্র অমূল্য পাল। তারই ছেলে!

প্রথমে নিম্ন আদালতের বিচারক কৈবল্যচরণকে বেকসুর খালাস দিয়েছিল। যুবক বয়সী বিচারক তার রায়ে পুলিশের চার্জশিটের বিপক্ষে এই যুক্তি তুলে ধরেন যে, বিবাদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও আইনি নির্দেশের প্রয়োজনীয় বিবরণী তুলে ধরার বদলে স্ত্রী-হত্যার দর্শনোচিত বিরোধিতা এবং উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে। আইনের বিধানে অপরাধ নির্ণয় ও নির্ধারণে নানা অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ও প্রকৃত ঘটনার প্রকৃত বিবরণাদি থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। আসামি যে প্রকৃতই তার স্ত্রী'কে হত্যা করেছে– পুলিশ-রিপোর্ট তার সত্যতা বিধান করতে পারেনি।

সরকার ছিল মামলার বাদী। তারা এই মামলায় আপিল করার পক্ষপাতী ছিল না। নেপথ্যে থেকে কে বা কারা এই মামলা জেলা-কোর্টে আপিলের ক্ষেত্রে পুলিশ বা সরকারের পিপিকে অর্থ ও প্রভাবের জোরে নমনীয় বা বলা যাক সম্মত করল সে সম্পর্কে কৈবল্যচরণ দু'একটা গুজব শুনেছে বৈকি!

রতনের নাম এইসব নাম বা রটনার মধ্যে ছিল। সে ছিল গোটা পশ্চিম দিনাজপুরের এক কোটিপতি ব্যবসায়ীর ছেলে। অত্যন্ত প্রিয়-দর্শন এবং নায়কোচিত চেহারা আর স্বাস্থ্যের অধিকারী। নবনীতা একবার কৈবল্যকে বলেছিল বটে রতন ভালো ছেলে, স্কুলে ছেলেকে দিতে বা নিতে আসার সময় তার সাথে দেখা হয়, তাদের মধ্যে একটা মৃদু বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে বটে।

মৃদু বন্ধুত্ব বলতে কী বুঝায় তা কৈবল্যচরণ বা ক্যাবলা পাল, যা-ই বলা যাক, ঠিক বুঝতে পারেনি। সে অনেক সময় স্ত্রীকে বুঝতে পারে না। আবার এটুকু বোঝে, তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক একদম ঠিকঠাক আছে। খুব সম্ভব কোনো ফাঁক-ফোকর নেই। তাছাড়া আজকাল মেয়েরা কাজে-কর্মে বাইরে যাচ্ছে, যেতে হচ্ছে– সহমত বা পারস্পরিক সম্মান ও সহানুভূতি থাকা ছেলে বা লোকদের সাথে বন্ধুত্ব তো হতেই পারে।

রটনায় এ রকম শুনেছিল কৈবল্য যে, রতন নাকি নিশ্চিত-সন্দেহপরায়ণ স্বামীই আক্রোশের বশে নবনীতাকে হত্যা করেছে; তার চরম শাস্তি হওয়া শুধু তার না, গোটা সমাজের দাবি। বহু লোক পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে তাকে বলেছে, রতন নাকি নীরবে নিঃশব্দে নবনীতাকে ভালোবাসত। নবনীতার

নৃশংস হত্যাকাণ্ড কিছুতেই সে মেনে নিতে পারেনি।

নবনীতাকে কে বা কারা হত্যা করেছে– এই প্রশ্ন ক্যাবলা পালেরও। কিন্তু যে মুহূর্তে ভালোবাসা ও সমাজের দাবির নামে রতন ও তার বাবা মামলার নেপথ্য পৃষ্ঠপোষকতায় নেমে যায়, তখন থেকে ক্যাবলা পালের পক্ষে মামলার অভিযোগের পাল্লা ভারী হতে শুরু করে। জেলে থেকে ফাঁসির দণ্ড মাথায় নিয়ে ক্যাবলা পাল ভাবত, তাহলে কি রতন-নবনীতার মধ্যে কোনো সম্পর্ক ছিল? পরে ভাবত, নবনীতার কাজে কিংবা হাবে-ভাবে তো সন্দেহ করার চিহ্নমাত্র কিছু দ্যাখেনি সে। কোনোদিন। মাঝে মাঝে কিছু লোক অবশ্য এসব কথা বলে তাকে জ্বালাতন করে। খুব সম্ভব পাবলিক তার পক্ষে বলে রাস্তাঘাটে হৈ-হাঙ্গামা কিছু করার সাহস পায় না। হ্যাঁ, রতনের নামও উচ্চারণ করত নবনীতা। বলত, দেখে আর দু'একবার কথা বলে তো মনে হয়েছিল ভালো ছেলে। ভদ্র। তবে কার মনে কী আছে বাবা, তা কে বলতে পারে!

অমূল্যকে সকালে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ক্যাবলা তার ভটভটিয়ায় চড়ে দোকানে চলে যেত। কোনোদিন নিজের জন্য খাবার-ভর্তি টিফিন-ক্যারিয়ার সাথে করে নিয়ে যেত। কোনোদিন বাসায় ফিরত বাসায় খেতে, স্ত্রীর সাথে বিছানায় একটা মল্লযুদ্ধ হতোই, নবনীতা 'না' 'না' করলেও সে ঠিক স্ত্রীর ইচ্ছে বুঝে নিত। ওদের দু'জনের মধ্যে ভারি সুন্দর বোঝাপড়া ছিল। এর মধ্যে রতন নামে ভালো আর ভদ্র-ছেলেটা কেন যে নবনীতার হত্যাকাণ্ড মামলায় জড়িয়ে পড়ল, এত কাণ্ড, এত ভোগান্তি রোগে ভুগে তার মরণদশার পর সে রহস্য কিছুমাত্র বুঝতে পারল না ক্যাবলা।

তিনটে চারদিক ঘেরা আমগাছের ছায়ার নিচে আরাম কেদারায় বসে আছে গ্রামে এসে লোকজনের কাছে বেশ খানিকটা সম্মান পেয়ে বাবু কৈবল্যচরণ হওয়া নিমপুরের নিতান্তই ক্যাবলা পাল। ঝির ঝির হাওয়া বইছে। রোদের আঁচ ততটা লাগছে না। অঘ্রান মাস বলেই হয়তো। তবে একটা ব্যাপার তো লক্ষ্য না করে পারা যায় না ে, নিমপুরায় এবং বাংলাদেশের তেত্রিশপাড়ায় জলবায়ু, আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন ঘটেছে। অবশ্য এটা শুধু ভারতে বা বাংলাদেশে না, দুনিয়ার সর্বত্র ঘটছে।

অথচ ক্যাবলার ছোটবেলায়, সেটা বলা যাক উনষাট সালে, বর্ষার সময় ধরায় যেন নেমে আসত জলের উৎসব। সেপ্টেম্বর থেকে শীত, ডিসেম্বর একেবারে হাড় কাঁপাত। হেমন্ত, বসন্ত সব আলাদা করে চেনা যেত। চেনা যেত ধানের আঘ্রাণ আর হু হু হাওয়ার বৈশাখকে। আর জষ্ঠির মধুমাস তো নানা ফলফলারির গন্ধে নিজেই নিজেকে চেনাত।

ক্যাবলা রোদে চারদিক ঘিরে রাখা গাছের ছায়ার নিচে বসে আর ভাবে, বাংলাদেশে বাংলার ছয় ঋতুর প্রত্যেকটাকে এখনো তবু চেনা যায়। একদিন যা শুনেছে, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরের মতো দীর্ঘ গ্রীষ্ম ও স্বল্পকালীন বর্ষা ছাড়া অন্য কোনো ঋতুর দেখা মিলবে না ভারতে বা বাংলাদেশেও। মানুষের বেঁচে থাকার অর্থটাও হয়তো অনেকটাই বদলে যাবে! তবে ভালোবাসা! কামনা-বাসনা। এসব মানুষের মধ্যে বদলাবে কি?

না, বোধ হয়। ক্যাবলা পাল নিজেই এই সত্য বহন করছে। এসেছিস সাত-পুরুষের ভিটেয় মরতে। পিসির বলতেই হয় কী সব লতা-পাতার রস আর কামিনীর সেবা-যত্নে এখন সে বেশ কিছুটা ভালো। পেটের বিচ্ছিরি অসুখ একদম ভালো হয়নি ঠিকই। তবে ভরসা করা যায় স্বর্ণ-চূর্ণ, মধু আর নিমপাতার রসাতলে পিসির তৈরি ভেষজ পান করে পাঁচ মাস সাত মাসে অন্তত আরো কিছুটা ভালো হয়ে যাবে কৈবল্য। ক্যাবলা পালের বয়স তো কম হল না। পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে কিংবা শিগগির ছাড়াবে। মানুষের যথাসময়ে খিদে পেলে আর রাত সাড়ে ন'টা দশটার মধ্যে ঘুম এসে গেলে সেটা যে শরীর-মনের একটা স্বাভাবিক অবস্থা বোঝায়, এটা তো না বোঝার কিছু নেই।

ক্যাবলা পাল মহাজন-বাড়ির ভিটেয় শুয়ে মরতে এসেছিল বর্ডার পার হয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে দেহের অশেষ কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করে বাংলাদেশের নিজ বাড়ির ভিটেয় মরতেই। কথাটা এতটুকু বাড়িয়ে বা মিথ্যে করে বলা নয়। ভগবানের কী লীলা, এখন সে চাইছে বেঁচে উঠতে। নিমপুরে গিয়ে কিংবা না গিয়ে হোক, আবার মন চাইছে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে।

এই সময় কামিনীকে কিছুটা কুণ্ঠিত পায়ে আম্রকুঞ্জের দিকে আসতে দেখা যায়। আর জনমে মেয়েটি নিশ্চয়ই কৈবল্যর ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল। এমন অন্তরঢালা সেবা-যত্ন সে কোনোদিন কারু কাছে পায়নি। মা কিংবা দুহিতার কথা আলাদা। তার স্ত্রী নিবেদিতা তার যে যত্নআত্তি করেনি, তা নয়। তবে তাদের দু'জনের সম্পর্ক সঙ্গী-সঙ্গিনীর বললেই বোধকরি সত্যিটা বেশি প্রকাশ পায়।

পিসিকে দু'একদিন কথাটা ক্যাবলা নানাভাবে জিজ্ঞেস করেছে। পিসি প্রত্যেকটা বার কামিনীর গুণ-গানের প্রশংসা করেছেন। তিনি তো ইদানীং চোখে কম দেখেন, কানে কম শোনেন, বাড়ির পাশে বাড়ি। নিজেদের বংশের কেউ না হলেও প্রতিবেশী হিসেবে আত্মীয়ের মতোই বলা যায় কামিনীকে। তিনিই কামিনীকে বলেছিলেন তার অসুস্থ ভাইপোর সেবা-যত্নের ভারটা নিতে। কামিনীর দাদা মধুও খুব চায় অসুস্থ প্রতিবেশীর সেবা-যত্ন করে একটু সাহায্য করতে, এই আর কি।

ক্যাবলা বলে, ভারি ভালো মেয়ে কামিনী। আমি তো সঙ্কুচিত হয়ে থাকি, ভাবি পরের ঘরের একটা মেয়েকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে কি-না।

পিসির দাঁত নেই। থোবড়ানো গালে একটু হেসে বলেন, নারে, মেয়েটা ভারি লক্ষ্মী আছে।

লক্ষ্মী তো আছে বটে। মাঝে মাঝে অনেক রাত জেগে সেবা দেয়। আগে তো কামিনীর ক্যাবলাকে হাত-পা ঘষে দিত, মাথার চুলে বিলি কেটে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করত, ক্যাবলার কিছু মনে হত না। ইদানীং শরীর একটু সেরে ওঠাতে ক্যাবলার ভাব-মর্জিও কিছু বদলে গেছে।

মুখে কিছু বলে না। বলা কি যায়? তবে ইদানীং খাটে বসে সেবা-যত্ন দিলে হয় কি, কামিনীর থেকে একটা মেয়েলি গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে যায়। দু'একদিন ক্যাবলাকে শয়ন থেকে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে যাবার সময় কামিনীর ভরা বুকের স্পর্শ আচমকা এসে ক্যাবলার শরীরে লেগেছে। এক রাতে কামিনী তার খাটে শুয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েও পড়েছিল, পরে জেগে উঠে বসে লজ্জা পায়। মাথা নিচু করে কুণ্ঠিত পায়ে বাইরে চলে যেতে গিয়েও কেন যেন লজ্জার হাসি ক্ষীণ চাঁদের রেখার মতো ওর ঠোঁটের কোণে প্রকাশ পায়।

কামিনী এসে জানতে চায়, ক্যাবলা দা ঘরে যাবে, না আরো কিছুক্ষণ বাইরে বসে কাটাতে চায়।

কৈবল্য বলে : কে জানতি চাইছে? পিসি, না অন্য কেউ?

বাড়িতে পিসি ও কামিনী ছাড়া তেমন করে বলার আর তো কেউ নেই। কামিনী ভয়, কুণ্ঠা, লজ্জা কাটিয়ে উঠে বেশ অনেকটা সপ্রতিভ। সে বলে : পিসিমা বলে নাই...

কৈবল্য বলে : তাহলে বাকি থাকে আরেকজন। তার কাছি তো আমার অনেক ঋণ জমি গেছে। সে বললে তো উঠতিই হয়।

আঁচল চাপা দিয়ে হাসি গোপন করে কামিনী। আরেকজন যে সে– কামিনীর সেটা বুঝতে দিতে আপত্তি নেই। বাঁশবনে দুঃস্বপ্নের ইতি ঘটেছে। সামনে আশার বাতি তো কৈবল্য ছাড়া আর কে!

কামিনীর মনে হয় গল্প বেশি দীর্ঘ করা ঠিক হবে না। আর তার দাদা মধু পাল ও ময়না মেম্বার সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যদি কৈবল্যের সাথে রেজিস্ট্রেশন করে গাঁটছড়া বাঁধা হয়, তাহলে ষড়যন্ত্রে সে নেই। ইদানীং কে এক মীর্জা সাহেব তো কৈবল্যের যোগাযোগ রাখছেন। বাড়ি ও বাগানের জন্য একটা বড় টাকাও দিতে রাজি। আর পিসি তার লোকজন দিয়ে যতটা জমি ভোগ-দখলে রেখেছেন, কামিনীর ধারণা বিক্রি করতে পারলে সেই ক্ষেত-জমি বাবদ টাকাও নেহাত কম পাওয়া যাবে না।

বসবাস করা সম্ভব হলে কৈবল্যকে নিতে তেত্রিশপাড়া

গ্রামেই থেকে যায় কামিনী। তবে তার নিজের দাদা এবং ময়না মেম্বার সে রকম কিছু একটা হতে দেবে না। দরকার হলে কৈবল্যকে ছুরি বিঁধিয়ে হোক, পদ্মপুকুরে ধাক্কা দিয়ে হলে হোক, গোখরো সাপ লেলিয়ে দিয়ে হোক, জন্মের মতো শেষ করে দেবে। কৈবল্যকে তারা বাঁচতে দেবে না।

সেটা যা-ই ঘটুক। কামিনী বহু পাপ করেছে। কৈবল্যের সাথে তার রেজিস্ট্রেশন বিয়ে হলে পিসিকে নিয়ে তারা তিনজন বাড়ি, বাগান, ক্ষেত-জমি বেচার টাকা নিয়ে বর্ডার পার হয়ে নিমপুরে চলে যাবে। তা না হলে আত্মহত্যার পথ তো আছে।

তবে কামিনী যতটা বুঝতে পারে তাতে মনে হয় তার আশার বাতিটা যেন একটু একটু জ্বলে উঠতে চাইছে। কৈবল্য যত সেরে উঠছে তত আরো আগ্রহ বাড়ছে কামিনীর দিকে। এমন কথাও সে কামিনীকে ইদানীংকালে বলেছে যে, ঠাকুর জানেন নবনীতাকে কে বা কারা কোন কারণে মেরেছে, নবনীতাকে কৈবল্য এবং কৈবল্যকে নবনীতা তো ভালোবাসত, তারা সংসার করছিল সুখে, তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটা দুঃস্বপ্নের অতীত, কল্পনারও বইরে। এও বলেছিল, নবনীতাকে সে ভালোবাসত, চিরকাল ভালোবেসে যাবে, তবে শরীর সেরে উঠলে, জীবন অনেকটা স্বাভাবিক হলে একজন আইনসঙ্গত সঙ্গিনী তো চাই। কৈবল্য যে সংসার করা স্ত্রীর স্বামীর ভালোবেসে স্বর্গ তৈরি করা বড় ভালোবাসত।

কামিনী দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা মাথা নিচু করে আম্রকুঞ্জে, আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে থাকা কৈবল্যের সামনে। পিসি ছাড়া অন্য কেউ বলতে কামিনীকেই বোঝায়– সেটা আরো বুঝুক লোকটা। বেশি সময় দেওয়া যায় না, তবে গল্পটা সামান্যই শুরু হয়েছে, তৈরি হোক। আরো বেশ খানিকটা তৈরি হোক।

কামিনী হাত বাড়ায়। এবার কালো, ভাষাময় কটাক্ষময় চোখ দুটি মেলে ধরা। এ আরেক নতুন অভিজ্ঞতা! কৈবল্য মনে মনে ভাবে– খুব সুন্দরী না। তবে শরীরের গড়ন, বাঁধুনি নবনীতার সাথে পাল্লা দিতে পারে বৈকি। আর কামিনীর শরীরের মেয়েলি গন্ধটা। যা ছড়ায়। আর যেন সংসারেরই সবচেয়ে গোপন আনন্দকে একটা বিমূর্ত ভাষা দিতে চায়।

কামিনী তাকে আলগোছে কিছুটা জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে আসে। খাটে শুইয়ে দেয়। পরে বলে : একটু আসি?

: বাড়ি যাতিছ?

: হ্যাঁ।

: ক্যান বাবা, পুকুরে চান করি নিয়ে এ বাড়িতেই তো খাওয়া-খাদ্যি করতি পার...

: পারি কি পারি না, সে আপনি বুইঝবেন না। বলে কামিনী ঘর ছেড়ে চলে যায়!

চার

রতন বসে ছিল একটা ছোট নদীর ধারে। দু'পাশে ম্যালা গাছপালা। সে যে খুব উন্মনা হয়ে বিকেলে জলে সূর্যের রঙ পরা নদী দেখছিল বা বিকেল উপভোগ করছিল, তা মোটেও নয়। সে অপেক্ষা করছিল শিশির ও সাইফের জন্য। শিশির কলেজে দ্বিতীয় বছরে উঠেই পড়াশোনা ছেড়ে যায় এবং বাম রাজনীতিতে যোগ দেয়। বাম রাজনীতির ওপর কিছু পড়াশোনা আগে থেকেই ছিল। বাম রাজনীতির স্থানীয় নেতা এবং শিলিগুড়ি পর্যায়ের কয়েকজন বাম নেতার সাথেও জানাশোনা ছিল তার। রামপুরের রাজনীতি ছিল রতন আর শিশিরের কব্জায়। সাইফ একটু দরিদ্র পরিবারের। পড়াশোনায় বিএ পাস। তার কাজ রতন ও শিশিরের সাগরেদি করা। তিনজনই আবাল্য বন্ধু।

নবনীতা যেদিন খুন হয় সেদিন গাড়ি নিয়ে বাসার কাছেই ছিল সাইফ ও শিশির। নবনীতাই নাকি রতনকে দুপুরের দিকটায় যেতে বলেছিল। 'খেলাটা বুঝলি তো?' রতন চোখ টিপে বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছিল। বলেছিল : আজই রঙ্গলীলার পাট চুকিয়ে ফেলব।'

ওরা জানত না রতন সিঙ্গাপুর মেড ইস্পাতের ফলা নিয়ে নবনীতার বাড়ি ঢুকছে। নবনীতা বহুত খুব খাবসুরত বটে। আঁচলের নিচে থাকা স্তন দুটি যে আকারে ও প্রকারে না-ছোট-না বড় আর গোল চাকতির মতো বসানো তা পরনের শাড়ি গোপন করত না। আর চোখ দুটি তো মায়াবিনী হরিণী যেমন হয়। নবনীতার হাইট, ফিগার, গায়ের ফর্সা রঙ– সবই ছিল বারবার তাকিয়ে দেখার মতো। শুধু এই উপ-শহরেই নয়, কলকাতার টালিগঞ্জে এমন রূপের রানী কেউ আছে কি-না তা নিয়ে এই সবে গজিয়ে উঠতে থাকা শহরের অনেকেরই মনে সন্দেহ আছে।

রতন তো নবনীতা বলতে পাগল ছিল।

অথচ রতন নিজে দেখতে কম সুশ্রী ছিল না। একহারা গড়নের শরীরে পেশিবহুল স্বাস্থ্যের জেল্লা বেশ ভালোই বোঝা যেত বাইরে থেকে। চিতানো বুক, সরু কোমর আর মাংসল পাছা ও উরু ছিল পুরুষোচিত সৌন্দর্যের নমুনা। শহরের অনেকে রতনকে হিরো এবং দু'তরফে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও নবনীতাকে হিরোইন বলে। রতনের কানে তা তো গেছেই, মনে হয় নবনীতাও তা জানে।

রাস্তায় দু'জনের দেখা এবং দু'একটা ভদ্রতাসূচক কথা-বার্তাও হয়েছে। বন্ধুদের সামনে। রতন শহরের পাজি-ফক্কর গ্রুপকে কড়াভাবে জানিয়ে রেখেছে তারা যেন পেছনে বা আড়ালে নবনীতাকে নিয়ে কোনোরকম নোংরামি, ইতরামি না করে। তাহলে নির্ঘাত ওদের খবর। শহরের অনেকে জানে, গুরু রতনের এয়ার-মার্ক করা জিনিস হচ্ছে নবনীতা।

রতনের বন্ধুরা, বিশেষ করে শিশির ও সাইফ ভেবে পায় না,



বহু রূপবতী, যৌবনাবতী যেখানে রতনের নেশায় পাগলপ্রায়, সেখানে কাউকে কোনো পাত্তা না দিয়ে রতন এই বাঙ্গাল মেয়েটাকে নিয়ে অমন মেতে উঠল কেন? তাও যেখানে নবনীতা এক বিবাহিতা নারী, এক ছেলে সন্তানের মা।

রতনকে জিজ্ঞেস করে এর বিশেষ কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। একবার কী প্রসঙ্গে যেন সে সাইফকে বলেছিল, অ্যাদ্দিন যা প্রেম-মহব্বত কিচ্ছু বিশ্বাস করতাম, এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

রতনের বাবা প্রমথনাথ কোটিপতির অধিক বললে হয়। তার ছেলে এই-ই একটি। রতননাথ ঘোষ। তার অবশ্য ডানাকাটা পরীর মতো পাঁচটা মেয়েও আছে। রতনের বড় চার মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়ে প্রমথনাথ ও মীরা ঘোষের সংসারে এক ছেলে, এক মেয়েতে এসে ঠেকেছে এখন। গাছপালার বিশাল বাগান, পুকুর নিয়ে প্রমথনাথের বেশ বড়সড় দোতলা বাড়ি। মেয়ে, জামাই, আত্মীয়-স্বজনে সব সময় সরগরম রতনদের বাড়ি। সেই বাড়ির একমাত্র ছেলে হওয়ায় বাড়িতে এমনকি শহরে তার কদরই আলাদা।

রতন বেশ হাসিখুশি, আমুদে ছেলে। শহরের বহু, এমনকি জনাকয় পরস্ত্রীও তার প্রতি আকৃষ্ট। ওদের নাচিয়েই তার আনন্দ। কাউকে ধরা দেয় না। এর যে কী অর্থ, বন্ধুরা তা বুঝতে পারে না। একবার বন্ধুদের সে বলেছিল বটে মেয়েদের কেন যেন ওর ভালো লাগে। একটা ঘটনাও বন্ধুদের সে বলেছিল।

সেই বয়ঃসন্ধিকালের কথা। বয়স চৌদ্দ-পনেরো হবে। নিজেদের বাড়িতেই কী একটা পরব উপলক্ষে ম্যালা লোকজন। তাকে একই ঘরে না-যুবতী, না মধ্যবয়সী কিছুটা দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ার সাথে থাকতে হয়েছিল। মধ্যরাতে লাজুক অথচ ভেতরে ভেতরে কৌতূহলী কিশোরকে তিনি খেলাটা শিখিয়েছিলেন। ভোররাত পর্যন্ত চলেছিল তখন কিছুটা অনিচ্ছুক এবং ভীত-সন্ত্রস্ত কিশোরকে নিয়ে আত্মীয় মহিলার খেলা।

রতন তো এই ঘটনাই মেয়েদের প্রতি তার মানসিক বীতরাগের কারণ হিসেবে বলে। তবে বন্ধুদের অনেকের ধারণা, ব্যাটা তলে তলে মধু খায়। কাউকে নিজের গোপন অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলতে চায় না। কেউ কেউ আবার রতনের কথা বিশ্বাস করে। বলে, ডাক্তারের সাথে কথা বলে দ্যাখ। ওরা স্বাভাবিক হওয়ার ঠিক ওষুধ বা উপায় বাৎলে দেবে। রতন বলে যে, সে স্বাভাবিকই আছে। তার উত্থান-পতন, কামনা-বাসনা সবই ঠিক আছে। ঠিক মানুষটা পেলে তার স্বভাবে যেটুকু অস্বাভাবিকত্ব আছে তা ঠিক ঘুচে যাবে।

আর কেউ না জানুক, রতন বুঝেছিল সেই মেয়েটিই নবনীতা। সুন্দর একটি কাব্য রচনা হতে পারত উভয়ে মিলে। ভুল রতনেরই। সেই স্বাভাবিক সময়টার আগেই সে সুযোগ নিতে গিয়েছিল।

ভটভটিয়ার শব্দ আসছে।

একটু পর দেখা গেল শিশির ও সাইফকে।

ওরা সেই পুরনো খবরই নিয়ে এসেছে। বাঙ্গালটার ঘরবাড়ি তেমন তালা-চাবি দেওয়া। বাঙ্গালের বাচ্চাটা আসে। এখন তো তাকে আর বাচ্চা বলা চলে না, নিদেনপক্ষে তিরিশের কাছাকাছি বয়স। বিলেত থেকে ব্যালেস্টারি না ব্যারিস্টারি ডিগ্রি নিয়ে এসে মামা, তিনিই হাইকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী, তার চেম্বারে থেকে ওকালতি করছে।

হ্যাঁ, নাম অমূল্য পাল। সেই তো রতনকে দেখিয়ে বলেছিল : হ্যাঁ, এই লোকটাই মাকে মেরেছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

টাকার জোরে হত্যার দায় থেকে বেঁচে গিয়েছিল রতন। তবে বিষয় সেটা তো নয়। বিষয় হচ্ছে কৈবল্য। একটা উজবুক আর বিপজ্জনক ধরনের অবুঝ প্রেতাত্মা যেন তার ওপর ভর করে। ঘটনাচক্রে হলেও হত্যাকারী তো সে-ই। রতনলাল ঘোষ। কিন্তু এখনো সে বিশ্বাস করে কৈবল্যচরণের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। কেন? কারণ ভগবান নবনীতাকে রতনলালের জন্যই পাঠিয়েছিলেন।

রতনলাল ও নবনীতা কী চমৎকার জুড়ি হতে পারত! কিন্তু ঘটনা যেভাবেই ঘটুক, নবনীতাকে বিয়ে করে ফেলা কৈবল্যর এবং কৈবল্যকে প্রাণ-মন নিয়ে ভালোবেসে ফেলা নবনীতার, কোনোটাই গ্রহণ করার মতো নয়। অন্তত রতনের কাছে। লাথি মারো যুক্তির পাছায়। ভালোবাসা যুক্তি না। যুক্তিও ভালোবাসা না। ভালোবাসার জগৎ অনুপম সুন্দর অবাস্তব যেন না। অন্ধ ভালোবাসা ভিন্ন মানুষের জন্ম দেয়। এই যেমন আজো, এই সাতচল্লিশ বছর বয়সেও রতন জিঘাংসা পোষণ করে কৈবল্যের প্রতি। ফাঁসি হওয়া থেকে প্রায় এক অলৌকিক ঘটনার মতো বেঁচে গিয়েছিল। এবার রতনের হাতে তার মৃত্যু ঠিক হয়ে আছে।

মুশকিল, ফাঁসির রায় বাতিল হওয়ার পর কৈবল্য কোথায় যে উধাও হয়ে গেল! খবর নিতে যতটুকু জানা গেছে, লোকটা তীর্থে তীর্থে নাকি ঘুরে বেড়ায়। নানা রোগে-শোকে কাহিল। এর মধ্যে দিন কয়েকের মধ্যে একবার নিমপুরে ফিরেছিল। লোকটার ভাগ্য বলতে হবে, একটা বড় ব্যবসার ধান্দায় রতন সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ছিল কলকাতায়। যখন খবর পায় তখন দেরি হয়ে গেছে, কৈবল্য চলে গেছে বাংলাদেশে।

রতনের ধারণা, কৈবল্য একদিন না একদিন নিমপুরে ফিরে আসবে। শহরে তালা মারা পড়ে আছে তার বাসাবাড়ি। দোকানপাট অবশ্য বেচে দিয়েছিল জেল থেকে খালাস হয়ে বেরিয়েই। তার ছেলে অমূল্য থাকে কলকাতায়। ওকালতিতে ভালোই নাকি পসার করেছে। তা অমূল্য নবনীতার গর্ভের ধন, তার প্রতি রতনলালের বরং এক ধরনের স্নেহ বা বাৎসল্য যা-ই বলা যাক, আছে। নবনীতার ছেলে যে!

রতনলালের স্ত্রী ময়ূরী। সে তো রতনকে একটা আস্ত পাগল বলেই মনে করে। পাগল না হলে শোবার ঘরে কেউ পরস্ত্রীর ছবি টাঙিয়ে রাখে! ময়ূরীকে আদর, ভালোবাসার সময়ও বালিশের পাশে থাকে নবনীতার ছবি। অর্থাৎ আদর করে সে ময়ূরীকে নয়, নবনীতাকে। ময়ূরীকে রমণ করে না, করে যতটুকু সে জেনেছে মোটেও ভদ্রতা ও সৌজন্যের বেশি আর কিছু না দেওয়া নবনীতা নামে এই কল্পনাকে।

বড়লোকের বৌ। এক ছেলে, এক মেয়ে নিয়ে উচ্চ মধ্যবিত্তের ঝকঝকে, স্বচ্ছন্দ এমনকি বলা যায়, বিলাসিতাপূর্ণ সংসার, অগত্যা সবদিক ভেবেচিন্তে ময়ূর মেনেই নিয়েছে শুধু শোবার ঘরে রতনের এই পাগলামি। আর সব ব্যাপারে ময়ূরীর মর্যাদা ও প্রতাপ ঠিক আছে। বাংলাদেশে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের, শুধু দেখতে ভালো, ময়ূরীকে বাস্তবতার কারণে এই অপমান সয়ে নেওয়া ছাড়া আর কী উপায় ছিল!

তিন বন্ধু গোল হয়ে বসেছে। রতন স্কচ ছাড়া কিছু মুখে দেয় না। অন্যদিন বন্ধুদের জন্য দেশি হুইস্কি বা রামের ব্যবস্থা থাকে। আজ তিনজনেরই স্কচ চলছে।

সামনে নদীর কুঞ্চিত জল। পাহাড় খুব দূরে নয়, খুব কাছেও নয়। তবে স্রোত আছে, জলের বয়ে যাওয়ার মধ্যে ফুটে উঠেছে ছোট ছোট ঘূর্ণি, যা জলকে কোঁকড়ানো করে তুলেছে।

সাইফ একেবারে খালি হাতে আসেনি। তার কাছে খবর– কৈবল্যচরণ খুব অসুস্থ বটে। সে গিয়ে ঢুকেছে বাংলাদেশে।

রতনলাল বলে : বাংলাদেশে হঠাৎ?

শিশির বলে : ওই বাঞ্চোতের নাকি দেশে দালানবাড়ি আর একরকে একর জমি আছে...

শিশিরের কৈবল্যকে বাঞ্চোত বলাটা পছন্দ হয়নি। রতনলালের মামলা কৈবল্যের সাথে। তাকে বাঞ্চোত বলার সে কে?

রতনলালের মুখের হাল বদলে যেতে দেখে শিশির বুঝেছে, রতন ভেতরে ভেতরে রেগে আছে। তা শিশির এখন বাম রাজনীতি ছেড়ে তৃণমূলে এসেছে। বাম রাজত্ব শেষ হওয়ার আগেই সে ঘোষণা দিয়ে জেলার আরো কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিল বলে দিদি খুব সন্তুষ্ট আছেন শিশির কান্তি ভদ্রের ওপর। দাদাগিরি চালু আছে আগের মতো। ইয়ংদের ওপর শিশিরের প্রভাব আগের চেয়েও বেড়েছে। পরের

রাজ্যসভা নির্বাচন আসতে আরো তিন বছর বাকি। দিদি কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। এ জন্য শিশির রতনকে হাতে রাখে। এমপি হতে গেলে মালদার আদমি পকেটে থাকা জরুরি– পলিটিক্সের এই সাধারণ, অতি সাধারণ অঙ্ক কে না জানে!

রতনলাল ঘোষ হচ্ছে, শিশির অন্তত মনে করে, তার ভাগের মুরগি। তাই রতনলাল তার কথা শুনে মেজাজ খারাপ করে ফেলায় সে চুপ করে থাকে। এসব হাফ মেড লোককে শায়েস্তা করার বহু রাজনৈতিক সামাজিক অস্ত্র তার হাতে আছে। তবে সাচ্চা রাজনীতি করতে গেলে সঠিক সময় ও সুযোগের জন্য অপেক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

পাশাপাশি শিশির মনে মনে একটু অবাক হয়ে এও ভাবে, রতনলাল তো অ্যাবনর্মাল কোনো লোক নয়। ব্যবসা, সংসার সবই করে যাচ্ছে। স্বাভাবিক মানুষের মতো। ব্যবসায়িক ধান্দাবাজিতে তো এরই মধ্যে বহু পাকা হয়ে গেছে তার এই বাল্যবন্ধুটি। শুধু নবনীতা সংক্রান্ত ব্যাপারেই সে এখনো সেই আগের মতো অস্বাভাবিক হয়ে আছে। কেন? এত বছর পরও কেন ওই ব্যাপারে তার অস্বাভাবিকত্ব ঘুচল না?

কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য রতনলালের ফুর্তিবাজ মেজাজটা ফিরে আসে। শিশিরের সাথে তার থমকে যাওয়া ভাবটা উধাও। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে বন্ধুরা গিয়ে রতনলালের ঢাউস দেখতে বিদেশি লেক্সাস গাড়িতে গিয়ে বসে।

মেজাজ খুলে গেলে রতনলালের যা হয় এবং বন্ধুরা একাধিকবার শুনেও হে হে করে আরো শুনতে চায়। এসে যায় সেই নবনীতা প্রসঙ্গ।

নবনীতার সাথে প্রথমবার আলাপ হয়েছিল কীভাবে? সাতচল্লিশেও যৌবন ধরে রাখা রতনলাল নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে। আর কোথায়? সেন্ট মেরি ডিভাইন স্কুলের মোড়ে।

নবনীতা রাস্তা ক্রস করছিল। ডান হাতে টিফিন ক্যারিয়ার, বাম হাতে বাসী কাপড়-চোপড়ের আর একটা ব্যাগ। রতনলাল তার হাল ফ্যাশনের লাল রঙের মিতসুবিশি মোটরসাইকেলটা রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে নবনীতার দিকে এগিয়ে যায় দৃপ্তপদে।

নবনীতা হয়তো তার হাবভাব আর বুক চিতিয়ে এগিয়ে আসা দেখে একটু ভড়কেই গিয়েছিল। হা-হা-হা।

রতনলাল তার হাত থেকে কাপড়-চোপড় ভর্তি ব্যাগটা নিয়ে নেয়। তারপর বলে : আমি ভালো কোনো লন্ড্রিতে দিয়ে দেব...

নবনীতা এতোক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। যথেষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বলে : আমার কাপড়-চোপড় আপনি কেন লন্ড্রিতে দিয়ে দেবেন? আমারটা আমিই দেব। ব্যাগটা দিন...

রতনলাল নব্য যুবক হিসেবে দেখতে যথেষ্ট সুশ্রী আর রূপবান। তার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে তার প্রতি এই ছোট শহরের কম মেয়ে আকর্ষিত নয়। কেউ কেউ তো প্রেমে পড়ে রতনের থেকে কোনোরূপ সাড়া না পাওয়ার যাতনায় ভুগছে।

নিজেই নিজের প্রায় গত হওয়া যৌবনের সেইসব আনন্দময় কথা বলে। বাহবা নেয় বন্ধুদের কাছ থেকে। রতনলাল বিদেশি মাল খাওয়াচ্ছে। বাহবা তো বন্ধুদের কাছ থেকে হকের পাওনা।

তারপর?

নিজ প্রশংসায় একটু বেশি যাওয়া রতনলালকে সংক্ষিপ্তকরণের পথে আনতেই যেন খুব ঔৎসুক্য দেখায় সাইফ!

কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে রতনলালের চম্পট। কিছুক্ষণের মধ্যে ৭৫০ সিসির দৈত্যকায় লাল মিতসুবিশি চড়ে উধাও। নবনীতা নাকি বাসায় গিয়ে এই ঘটনা সবিস্তারে বলেছেও তার স্বামী কৈবল্যচরণকে। কৈবল্য ঘটনা শুনে যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে গিয়েছিল। তবে নবনীতা না হোক, কৈবল্যচরণ তো জানে, ছোট শহরটির সেরা ধনীর একমাত্র ছেলেকে নিমপুর কেন, জেলা শহরের থানা পুলিশও হজম করতে পারবে না।

কৈবল্যচরণ তার স্ত্রীকে নাকি একটু সাবধানে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে বলেছিল। আর বলেছিল : তুমি রেগে না গিয়ে ভদ্র ব্যবহার কোরো। যদ্দূর জানি-শুনি, রতনলালের নামে কোনো মেয়েঘটিত দুর্নাম-টুর্নাম নেই...

নবনীতা রাগ করে বলে : তোমার কী নবনীতাকে ধরে টরে নিয়ে গেলে! বউ গেলে বউ পাবা...

কৈবল্য নাকি প্রস্তাব দিয়েছিল, অমূল্যকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আর নিয়ে আসার দায়িত্বটা, পাশাপাশি টুকটাক বাইরের কাজ ইত্যাদি সে-ই করবে। নবনীতা তেজি মেয়ে। সে রাজি হয়নি...

সাইফ বলে : তারপর?

একটা ভয়াবহ দাঁত খিঁচুনি দিয়ে শিশির বলে : তারপর তোর বাপের মাথা! তুই তো শালা পুরসভার কেরানি আছিস... তোর তো খেয়ে-দেয়ে কোনো কাজ নেই। তুই শালা সারারাত তারপর, তারপর করে ছহি বড় রতন-নবনীতার কেচ্ছা শুনে যা, আমি চললাম...

রতনলাল কোনো কোনো সময় শিশিরকে একটু সমঝে চলে। রাজনীতি করে শালা বহুত উঁচা জায়গায় চলে গেছে। বলে তো এমপি হবে, মিনিস্টার হবে। লক্ষণটা অবশ্য সে ধরনেরই ঠেকে।

সেও বলে : বটম আপ। আবার আসব রোববারে।

বলে সাইফের পিঠ চাপড়ে দেয়। আর বলে, ভাব হওয়ার পর নবনীতা এসব তাকে বলেছিল।

একটু পর রতনলালের গাড়ি বনজঙ্গল ঘেরা নদীর কিনারা থেকে শহরের দিকে যেতে থাকে। রতনলালকে গুনগুন করে গাইতে শোনা যায় : তুমি আর আমি মিলে...

পাঁচ

যা বন্ধুদের কাছে বলেনি, তা হচ্ছে ঘটনার দিন নবনীতা তাকে পাখার বাঁট দিয়ে চোখের দিকটায় আঘাত করে। রাগে সে অন্ধ হয়ে যায়। তারপরই ঘটায়। সে-ই ঘটায়।

কাপড়-চোপড় ভর্তি ব্যাগটা নবনীতার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিতে তার বরং আনন্দই হয়েছিল। অপ্সরা সুন্দরীর সাথে যে কোনো একটা নাটকই সে করতে চেয়েছিল। করতে পেরে মহা আনন্দে ছিল। ইস্ত্রি করা কাপড়ের ব্যাগটা ছোট একটা ছেলের হাত দিয়ে নবনীতার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। নাম-পরিচয়হীন একখণ্ড কাগজে লিখেছিল : ক্ষমা চাই। মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই বলে বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে পাঠালাম।

এই চিরকুট কৈবল্যকে দেখিয়েছিল নবনীতা।

কৈবল্য তার বিস্ময় আর বিরক্তি গোপন করেনি। সে বলেছিল : এখনকার ছেলেদের বুঝি না বাবা। ছেলে আছে, হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর! একজন দিদির বয়সী বিবাহিত মহিলার পেছনে তুই লাগিস কেনো!

পরে অবশ্য বলেছিল : সাক্ষাৎ মাফ চাইতে এলে তুমি আবার রাগারাগি করো না।

নবনীতা বলে : অবশ্যি করব!

একটু চেঁচিয়ে কৈবল্য বলেছে : মানে?

: মানে তোমার মাথা আর মণ্ডু!

পরে কৈবল্য বুঝেছিল নবনীতা তাকে একটা নিমোরদে ভেবেছে। স্বামী তো না-ই, পুরুষও না। সে মনে মনে একটু অনুতপ্ত হয়েছিল। তবে ইন্ডিয়ার এই ছোটো শহরটায় তার পরিচিতি ক্ষীণ, তার ওপর সামান্য গ্রোসারি শপের দোকানদার হয়ে শহরের কোটিপতির আদুরে প্রায় মাস্তান ছেলের সাথে পাল্লা দিতে যাওয়া। সেটা তো কৈবল্যের পক্ষে কোনোদিন সম্ভব না। নবনীতার সাথে এমন গাঢ় সম্পর্ক কৈবল্যের, এত করে সে নবনীতার জন্য, এই সামান্য বিষয়টা কেন নবনীতা বোঝে না।

চার-পাঁচ দিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসাবাসি তো দূরের কথা, কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। ষষ্ঠ দিনে নবনীতা, যেন গত পাঁচ দিনে দু'জনের মধ্যে কিছুই হয়নি, সে রকম একটা সহজ ভাব নিয়ে কৈবল্যকে বলে : আজ আচ্ছা করে সাটিয়ে দিলাম চোরের বাচ্চাটাকে। স্কুলের বাইরে একটা গাছের ছায়ায় বসেছিলাম...

ঘটনাটা কৈবল্যকে খুলে বলে নবনীতা। কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে যেন উদয় হয় রতন। কাঁচুমাচু চেহারা। বলে তার খুব ভুল হয়ে গেছে, ব্যাগটা নবনীতার হাত থেকে ওভাবে ছিনিয়ে নেওয়া

তার মোটেও উচিত হয়নি।

নবনীতা একদিন আশঙ্কা করে আসছিল রতন যা কি-না মাস্তান টাইপের ছেলে, হঠাৎ চড়াও হয়ে কী করে বসে, কে জানে! স্কুলে বাচ্চাদের অনেক ক'জন মা ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া ঘটনার পর থেকে রাস্তাঘাটে, এমনকি নিজের বাসায় সাবধানে থাকবে বলেছে। রতন ঠিক মাস্তান টাইপের ছেলে না। আবার খুব ভালো চরিত্রের ছেলেও বলা যায় না তাকে। দেখতে সুশ্রী, বড়লোকের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর, মেয়েদের নিয়ে তার সুনাম-দুর্নাম দুই-ই আছে।

নবনীতা বাইরে যেমনই ঠাঁট-ফাট দেখাক, ভেতরে তো ভীতু। সুন্দরী এবং মেয়ে হয়ে জন্মানো যে অন্যায্য, ভণ্ড সমাজে খুব একটা নিরাপদ বিষয় নয়, তা তো সে দেখে আসছে কৈশোরে পা দেওয়ারও আগে থেকে। তার ওপর নবনীতা শুধু সুন্দরী নয়, নায়িকার মতো সুন্দরী। রতনও অবশ্য আকর্ষণীয়। প্রায় যুবক, চিতানো বুক ও দীর্ঘকায় শরীর নিয়ে তাকে নায়কদের মতোই লাগে দেখতে। তবে নবনীতার বিপদ হচ্ছে সে নারী। আর রতনের সুবিধা হচ্ছে সে পুরুষ। যুবক হয়ে উঠেছে, বহু মাস্তান তার হাতে আছে আর নবনীতার ওপর চোখ পড়েছে। বিপদ এখানেই।

মার্জনা চাওয়ার পরও নবনীতা কিছু বলছে না দেখে রতন যেন খুব দুঃখিত হয়ে বলে : বুঝলাম। মার্জনা করলেন না।

নবনীতা বলে : আমার নীরবতা তা বুঝায় না রতনলাল।

: তাহলে কী বুঝায়! খুশি হয়েছেন...

: নিশ্চয়ই খুশি হয়েছি।

: বেশ, তাহলে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

অনুরোধটা যদি কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে চা খাওয়া। নবনীতা একটু হেসে বলে : যাব। তবে সেটা আজ না।

: কবে তাহলে...

: আরে সবে তো পরিচয় হল! আর দু'চারটে দিন যাক।

: তাহলে কথা দিচ্ছেন?

নবনীতার এইসব ছেলে-ছোকরাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কিছু নেই। স্বামী-সন্তান নিয়ে সে সুখে ঘর-সংসার করছে। ফিল্ম জগত নিয়ে তার যেটুকু মোহ ছিল, এখন পরিষ্কার বুঝতে পারে ওসবই অসার। যারা স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে চায়, তাদের জন্য এমনকি বিপজ্জনক।

হ্যাঁ, ক্যাবলা দেখতে তেমন সুদর্শন নয়। বরং বলতে হয় নিতান্তই সাদামাটা চেহারা, স্বাস্থ্য। তবে বিয়ের পরই নবনীতা বুঝতে পেরে সুখী একটা সংসার গড়ে তোলার জাদুকাঠি তার আয়ত্তে আছে। স্ত্রীকে যে অসম্ভব ভালোবাসে লোকটা, তা নারী হয়ে বুঝবে না কেন নবনীতা!

সংসারটা বাঁচাবার জন্যই দুর্জনের সাথে সম্মান বিসর্জন না দিয়ে যতটা পারা যায়, কম্প্রোমাইজ করলে ক্ষতি কী! ভদ্রতা ও সম্মানের মধ্যে রতনলালের সাথে সম্পর্কটা বজায় রাখলে যদি শহরের তার দিকে নজর দেওয়া আজেবাজে লোকের হাত থেকে বাঁচা যায়, তাহলে রতনলালের সাথে তার খানিকটা বন্ধুত্ব হলোই।

ঘটনার ষষ্ঠ দিনে রতনলালের মার্জনা চাওয়ার কথাটা কৈবল্যকে সে বলেছিল। সে রাতেই স্বামীর সাথে নবনীতার মিলমিশ হয়ে গিয়েছিল।

রতনলালের সাথে একটা না প্রেম না নিছক বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রূপ-তৃষ্ণা শুধু তো ছেলেদেরই একচেটিয়া নয়, অবচেতনে ওঁৎপেতে থাকা সেই মোহ নবনীতারও ছিল বৈকি। তবে ভেসে যাওয়ার মতো ঘটনা রতনলালের সঙ্গে তার কোনোদিনই ঘটেনি।

হ্যাঁ, রেস্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে চা খাওয়া থেকে সকাল এগারোটা থেকে বাবুকে স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত মাঝে মধ্যে নবনীতা ও রতন গাড়ি করে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে বৈকি। বসে থেকেছে কাজলরেখা নদীর গাছপালা ঘেরা নির্জনে। রতন নবনীতার হাত ধরার বাইরে আর কোনো কিছুতেই অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেনি। শুধু বারবার একটা কথা বলত : ঈশ্বর তোমাকে আমাকে পাঠিয়েছিলেন একসাথে জীবনটা কাটাতে! কেন যে সেটা হলো না!

রতন যা চায় নবনীতার স্বপ্ন তো মোটেও তা নয়। ইতিমধ্যে তারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে ঠিক করেছে, একটা কিছুর ব্যবস্থা করে তারা বছরখানেকের মধ্যে কলকাতা চলে যাবে। স্বামী-স্ত্রী মিলে মাঝে মাঝে বাস বা রেলগাড়িতে করে কলকাতায় যায়ও। কলকাতার ভেতরে নয়, উপকণ্ঠে কোথাও। বাইরে যেমনই দেখাক, বাংলাদেশে ঝিনাইদহ জেলার বত্রিশপাড়া গ্রামের মহাজনবাড়ির ছেলে কৈবল্যচরণ পালের টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য সচ্ছলতা বড় একটা কম ছিল না। কলকাতার উপকণ্ঠে শহর ছড়িয়ে পড়ছে। এখনো পুরো শহর না হওয়া গাছপালা ঘেরা কোনো গ্রামে একখণ্ড জমি কেনার টার্গেট ছিল তাদের। পেলেই তারা সকলের অজান্তে দোকানপাট বিক্রি করে কলকাতা চলে যাবে,–এরকম একটা স্বপ্ন পোষণ করে কাটছিল তাদের দিনগুলো।

তারপর ঘটে সেই অভাবনীয় ঘটনাটি।

পাঁচ

এর মধ্যে আশু পালের সাথে ময়না মেম্বারের খানিকটা গরম কথাবার্তা হয়ে যায় একদিন। আশু পালের বাড়িতেই।

আশু পাল তবক দেওয়া একটা পান মুখে পুরে বলছিল যে কৈবল্যচরণ তার বাড়ি ও বাগান বিক্রি করে যদি কামিনীকে বিয়ে করে অথবা না করে ইন্ডিয়া চলে যায়ও তাতেও তো তাদের লাভ বৈ ক্ষতি কিছু হয় না।

ময়না মেম্বার চটে আছে। মহাজন বাড়ির ক্ষেত-জমির কিছুটা তো তারা দু'জন মিলে ভোগ করছেই। বাকিটা এবার কামিনীকে বিয়ে করে কিংবা না করে কৈবল্যচরণ ইন্ডিয়া চলে যাওয়া মাত্র কিছু নকল কাগজপত্র তৈরি করে দখলে নেবে। কিন্তু ক্যাশ তো কিছু পাওয়া হবে না তাতে। ক্যাশ পাওয়ার পন্থা হলো বাড়িটা পুকুর ও বাগানসহ উপজেলার বড় ব্যবসায়ী সাদেক মীর্জার কাছে বেচে দেওয়া। মীর্জা পঞ্চাশ লাখ পর্যন্ত উঠেছেন। দখল দিতে পারলে তিনি যে ষাট পর্যন্ত ওঠাবেন তাতে বোধ করি সন্দেহ নেই।

কিন্তু আশু পাল ইদানীং যা বলছে তার হাবভাব দেখায় তাতে তা মনে হয় না ময়না মেম্বারের সাথে আগের জায়গায় সে আছে। ইদানীং কৈবল্যচরণের জন্য ভারি দয়া-মায়া দেখায় ব্যাটা। আর ছোট বোন কামিনী তো দিনরাত মহাজন বাড়িতেই। বাঁশ বাগানে যেতে বললে না যাওয়ার নানা অজুহাত দেখায় ময়না মেম্বারকে।

একদিন ময়নার কথায় কামিনী বাঁশ বাগানে গিয়েছিল বটে, কাপড় খোলেনি। একটু দূরে দূরে ছিল। কামিনী কাপড় না খোলায় ময়না মেম্বার রাগ করেনি বটে, তবে মনে মনে বেশ অবাক হয়েছিল। খেলাটা তাহলে কী চলছে, সেটা ভাবতে চেষ্টা করেছিল।

কামিনী একখানা গোপন কথা বলেছিল বটে। জানিয়েছিল শরীর আর খানিকটা সুস্থ হলে পিসিকে নিয়ে কৈবল্যচরণ ইন্ডিয়া চলে যাবে।

কামিনীকে বাড়ি-সম্পত্তি লিখে দিয়ে বিয়ে করা? না এসব ব্যাপারে কৈবল্যচরণ আশু পাল কিংবা কামিনীর সাথে কোনো কথা এ পর্যন্ত বলেনি। বলার সম্ভাবনা খুব কম।

ময়না মেম্বার কৈবল্যচরণের হালফিল খবরাখবর কামিনী এবং অন্যান্য সূত্র থেকে রাখে বৈকি। কামিনী যেসব কথা তাকে বলে না, ইচ্ছে করে বলে না– এ নিয়ে তার মনে সন্দেহ নেই। কামিনী তো ময়না মেম্বারের পৌরুষের কাছে বাঁধা গাভী। বিধবা মেয়েলোক ময়নাকে ছেড়ে কোথায়ই বা যাবে। তবে হ্যাঁ, কৈবল্য তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেটা আলাদা কথা। কামিনীকে বিয়ের উছিলায় বিক্রি করে দিতে তো স্বয়ং তার দাদা আশু পাল এবং ময়না মেম্বার রাজিই আছে।

কিন্তু আশু পাল ইদানীং যেন অন্যরকম চেহারা দেখায়। তার মতলবখানা ঠিক কী তা ময়না মেম্বার বুঝতে পারছে না।

আশু পালের তবক দেওয়া পান মুখে পুরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথাটা তার ঠিক মনঃপূত হয় না।

সে একটুখানি গরম দেখায়। বলে : তুমি একেক সময় একেক কথা বোলো হে আশুদা। পরিষ্কার করি মতলবখানা একটা ভাঙ্গি বলো দিকিনি...

আশু পাল বলে : তুমি কি কৈবল্যচরণের লাশ ফেলে বাড়ি বাগান দখল করতি চাও নাকি!

ময়না মেম্বার জানায়, না, সে রকম কোনো ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু আশু পাল যে একেক সময় একেক ভাব ধরে তার কী হবে। বলল : কৈবল্য চরণ তিন মাসের মধ্যেই মরবে। মরবেই। বাজি ধরে বলল। তারপর বলল, কামিনীকে কৈবল্য চরণের সাথে মেলামেশার সুযোগ দিলে নিশ্চিত তাদের কাম হয়ে যাবে। বাড়ি, পুকুর, বাগান কামিনীর নামে লিখে দিয়ে ঠিক বিয়ে করতে চাইবে। বিয়েটা হয়ে গেলে তো তাদের আর কোনো হ্যাপা থাকে না। কৈবল্যচরণ কামিনী আর বুড়ি নিভাননী পিসিকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাবে আর তারপরই দখল দিয়ে যাবে মীর্জা সাহেবকে। আশু পাল পাবে টাকার ষাট ভাগ, ময়না মেম্বার পাবে চল্লিশ ভাগ। এই হার ঠিক রেখে কৈবল্যচরণের বাকি জমিরও ভোগ-দখল নেওয়া যাবে!

কিন্তু সবই যে দিবা-স্বপ্ন হতে চলেছে। তার কী হবে।

বাইরে থেকে আশু পালকে সব সময়ই একটা সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট ভাব নিয়ে থাকতে দেখা যায়। সবার সঙ্গেই তার সম্পর্ক ভালো। অন্তত বাহ্যত। ময়না মেম্বার ছাড়াও তল্লাটের বেশ ক'জনের সঙ্গে তার স্বার্থের সম্পর্ক রয়েছে। তবে গোপনে। আর সব সময়ই লোকটা ভদ্র ব্যবহার, বুদ্ধি ও চালাকি দিয়ে স্বার্থের পার্টনারদের দমিয়ে রাখে।

ময়না মেম্বারকে একটু রেগে যেতে দেখে বলে : মহাজনবাড়ির কৈবল্য গ্রামে ফিরে আসিছে, হেই কারণে গেরামের বেশির ভাগ লোক খুশি। কেন জানো? তার তো মহাজনবাড়ির ক্ষেত-জমি কেউ ভোগ করতে পারতেছে না। ভোগ করিছে কারা। আশুতোষ পাল আর ময়না মেম্বার! আর এটি মোটেও ভালো চোখে দেখতেছে না। এখন তুমিই বলো সব হারানোর চাইতে কিছু পাওয়াটা ভালো কি না!

ময়না মেম্বার বিষয়টা যে জানে না, তা নয়। জানে, মহাজনবাড়ির কিছু ক্ষেত-জমি ভোগ দখল করার ব্যাপারটায় সবারই বুক টাটায়। আশু পালের বুদ্ধি, চালাকি আর রেজিস্ট্রার অফিসের কেরানিদের টাকা-পয়সা খাইয়ে কিছু নকল তবে রেজিস্ট্রার অফিসে গ্রাহ্য কাগজপত্রের জোরে বুক টাটালেও কেউ কিছু করতে পারছে না। আর কৈবল্যচরণরা পাল বলে অনেকে মনে করে আশুপাল বুঝি বা একই বংশের লোক।

এখন কৈবল্যচরণ বাড়ি এসে পড়ায় গেরামের সবাই দেখতে চায় সে তার বাড়ি, বাগান আর চল্লিশ-পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে কী করে। বেঁচে দেয় নাকি কাউকে ভোগ দখল করতে দিয়ে যায়।

বুদ্ধির দৌড়ে আশুপালের কাছে অনেকবারের মতো আর একবার একটা ঠেকান খায় ময়না মেম্বার। কামিনী তো তার পৌরুষের বশে ছিল। কেন যে নিজ ভিটেয় মরতে আসা প্রায়-মৃত কৈবল্যচরণকে বিভাননী বুড়ির ভেষজ চিকিৎসায় সারিয়ে তোলার বদলে কামিনীকে বলল, না ভেষজ না খাইয়ে প্রায় মৃত লোকটার দ্রুত মরার ব্যবস্থা করতে, এই বুদ্ধিটা কেন যে তার মাথায় খেলল না, সে জন্য আফসোস হয় ময়নার।

ময়না মেম্বার একটু বিমর্ষ। একটু হতবাক। নিজেকে সামলে নিয়ে মোটামুটি ধীর-গম্ভীর গলায় জানতে চায় তাহলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করা!

ধৈর্য। আশু পাল ভারী অমায়িক গলায় ময়না মেম্বারকে বলে, ধৈর্য ধারণ করতি হবে। ঈশ্বর তাদের পক্ষে আছেন

ঘরের টিনের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে কামিনী তার দাদা আর বাঁশবনে তার একদা পুরুষ ময়না মেম্বারের কথাবার্তা শোনার জন্য কান পেতে ছিল। সব কথা যে শুনতে পারছিল তা নয়। তবে ময়না মেম্বার যে কৈবল্যচরণ সেরে উঠে বাড়ি-সম্পত্তি লিখে দিয়ে কামিনীকে বিয়ে না করায় খুব হতাশ, সেটা সে ভালোই বুঝেছে। আর তার দাদা যে বলছিল, ঈশ্বর তাদের পক্ষে আছেন, সেটা শুনে আঁচল চাপা দিয়ে না হেসে পারেনি। ঈশ্বর যে কেন অন্যের বাড়ি সম্পত্তি দখল করার কুকর্মে দুই প্রতারকের সাথে থাকবেন, সেটা ভেবেই সে হাসছিল!

ময়না মেম্বার ঘর ছেড়ে বাইরে পা দেওয়ার উপক্রম করতেই কামিনী চকিতে সরে গেল। ময়না মেম্বার আসার আগে সে বৌদি নিভার সঙ্গে গল্প করছিল। বৌদি কামিনীর প্রায় সব কথা জানে। দু'জন প্রায় একই বয়সী। ক্রমে ক্রমে তারা বন্ধু হয়ে উঠেছে। বাঁশ বনের ব্যাপারটা একটু একটু ইঙ্গিতের ভাষায় নিভার নানা ঠাট্টা-রসিকতার জবাবে কামিনী নিভাকে বলেছে। নিভা ঠিকই বুঝে নিয়েছে বাঁশবনে ভালো-লাগা, ভালোবাসার টান নিয়ে যায় না কামিনী। যায় হয়তো নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে। ইচ্ছের ভেতর অনেক সময় বেশির ভাগ অনিচ্ছা থাকা বিচিত্র নয়। নিজে নারী হয়ে বিভা বোঝে বৈকি! এই ব্যাপারে সে তার বিধবা, সুদেহী ননদিনীকে ভালো-মন্দ কিছুই বলে না।

বাইরের ঘরে স্বামী ও তার সঙ্গী ময়না মেম্বারের জন্য তবক দেওয়া দুই খিলি পান বিভাই তৈরি করে কাজের ছেলেটাকে দিয়ে পাঠিয়েছিল। এ সময় গল্প হচ্ছিল তার কামিনীর সাথে। বিভা জানতে চাইছিল কৈবল্যচরণের সাথে তার ঘটনা কতদূর গড়িয়েছে। হেসে কামিনী বলছিল ঘটনা গড়াবে আবার কী। যে লোক নিজের হাতে স্ত্রী হত্যা করে, তার সাথে কিসের ঘটনা। কিসের সম্পর্ক!

বিভা জিজ্ঞেস করে : লোকটা বলিছে তোকে?

: কী বুইলবে?

: এই যে তুই বললি, স্ত্রীকে হত্যা করিছে।

কামিনী বলে : কিছুই বলে না। বহুত চালাক লোক আছে!

বিভা বলে : তুই জিজ্ঞেস করেছিলি কোনো সময়?

: করিনি আবার।

কামিনীর চোখে কৌতুকের ঝিলিক। বিভাকে জানায় বাবু, বাবু মানে শরীরে বেশ খানিকটা সেরে ওঠা। কৈবল্যচরণ একদিন বাড়ির পেছনের বাগানে গাছের ছায়ার নিচে বসে চা খাবেন বলে আবদার জানালেন মন-ভুলানো আদরের পিসিমার কাছে। মন-ভুলানোই তো বটে। বুড়ি মানুষটা স্বামী, ছেলে, বাড়ি ও সম্পত্তি হারিয়ে সেই যে কবে থেকে আশ্রয় নিয়েছে বাপের ভিটেয়, কত আপদ-বিপদ আর ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আছে, বয়স আশি হয় হয়, মনের জোরে টিকে আছে, কই নিমপুরে সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতা ভাইপোটি একটা দিনও কি বুড়ির ভালো-মন্দের কোনো খবর নিয়েছিল?

গল্পটা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে বিভা বলে : আহা, এসব থাক না। যা জানতি চাইলাম, সেইটে বল।

কামিনী একটুখানি চুপ করে থাকে। বোধহয় এর মধ্যে নিজেকে সামলে নেয়। বলে যে ভাইপোর আবদার শুনে বুড়ি একটা ঘরে স্তূপ করে রাখা আসবাবপত্রের স্তূপ থেকে একটা ছোট টেবিল, দুটো চেয়ার কৈবল্যচরণের ফিরে আসার খবর শুনে ছুটে আসা বাড়ির পুরনো চাকর কালুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় বাগানে। আমঝুপির নিচে। চায়ের ব্যবস্থাও কোনোমতে হয়ে যায়। ফোকলা হেসে বুড়ি আবার কামিনীকে বলে হাত ধরে সাবধানে কৈবল্যকে নিয়ে যেতে। বলে যে কামিনীর জন্যও চা থাকবে। দু'জনে মিলে দুপুরে খাওয়ার আগে গল্প করুক। অবশ্য বেশিক্ষণ বসে থাকলে বাবু মানে আদরের ভাষায় কৈবল্য যদি অস্বস্তি বা অসুস্থ বোধ করে, তাহলে কামিনী যেন তাকে ধরে ধরে ঘরে ফিরিয়ে আনে।

বিভা মূল গল্প শুনতে আগ্রহী। কৈবল্য তার স্ত্রীকে খুন করেছিল কি না। ফাঁসির দণ্ড দিয়েছিল, তাকে আদালত। ফাঁসি হওয়া থেকে সে বাঁচল কীভাবে? এ ছাড়া একটা বেশি বয়স না হওয়া পুরুষ মানুষের 'এই যে দিন-রাত সেবা-যত্ন করার নামে পড়ে আছে কামিনী– সে সবও বৌদিকে বলুক না কেন কামিনী! আপদ বিপদ হলে দাদা-বৌদিই তার ভরসা।

বিভা বলে : তারপর?

বাবু খুব মেজাজে ছেল। পেছনে ফেলে আসা কথা খুব বইলতে ছেল। তো আমি এরই মধ্যি এক সময় কইলাম, ক্যাবলদা, বৌদির কথা বলে না ক্যান! তো মানুষটা আমার দিকে চোখ ফেরায়। বুক থেকে ঠেলে ওঠে একটা দীর্ঘশ্বাস! চুপ করে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলে : নবনীতা! তারে যে কত ভালোবাসতাম!

: তো তারে খুন কইরলেন ক্যান! হত্যি হওয়ার মতো এমন কী দোষ করেছিলেন বৌদিদি?

ফ্যালফ্যাল করে কৈবল্য তাকিয়ে থাকে কামিনীর দিকে। পরে ভারি আনমনা হয়ে যায়। যেন চলে গিয়েছিল নবনীতার সাথে ঘর-সংসারের দিনগুলিতে। কীভাবে স্ত্রীকে হত্যা করেছিল সেসব তার অনুতাপের মধ্যেও কৈবল্য ডুব দিয়েছিল হয়তো বা।

কামিনী শোনে লোকটা ফিসফিস করে বলছে : আর মাস দুই-তিনেক! কলকাতা থেকে মাইল পনের দুরে শিবপুর গ্রামে একখণ্ড জমি তারা পেয়ে গিয়েছিল। জায়গাটা নবনীতার বেশ পছন্দ হয়েছিল। তার পছন্দ হওয়াতেই তো নির্ভেজাল জমিটা কেনার জন্য সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বায়না দেওয়া।

জিহ্বায় চুক চুক শব্দ তোলে কৈবল্য। আবার বলে আর মাস দুই-তিনেক সময় পেলে দোকান, বাড়ি বেচার ব্যবস্থা তো গোপনে চূড়ান্তই হয়ে গিয়েছিল। তারা ঠিক নিমপুর ছেড়ে কলকাতা পাড়ি দিত। জমি কিনে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিত। ভাগ্যই তা হতে দিল না।

চা পানের পর্ব শেষ। প্রশ্ন শুনে বৈকল্যর এ রকম প্রতিক্রিয়া দেখে একটু ভড়কে যায় কামিনী। আর কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি সে। তাছাড়া চান, খাওয়ার সময়ও প্রায় হয়ে গিয়েছিল। কামিনী বলে : ঠিক আছে, পুরনো কথা আর ভাবতে হবি না। এখন ঘরে যাই চলেন।

বিভা একটু হতাশ হয়। সে ভাবে, কামিনী যেমন বলল, তাতে মনে হয় কৈবল্য লোকটা হয় একান্ত সরল ভালো মানুষ, না হয় পাজির পা ঝাড়া গোছের কোনো লোক। শেষের মানুষটাই হওয়ার কথা কৈবল্যের। তা নইলে, থানা-পুলিশ আদালত তো ঘাস খায় না। বিচারে লোকটার ফাঁসির দণ্ড হবে কেন?

বিভা বলে : তুই তো দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায়, কোনো কোনো দিন বেশ রাত পর্যন্ত কাটাস কৈবল্যদার সাথে। মানুষটা তোর কেমন লাগে!

কামিনী একটু আনমনা হয়ে বলে : মনে তো হয় সরল। আর খুব ভীতু। লোকটার হাবভাব দেখি মনে লাগে জানি খুব ভয়ে আছে। কিসের জন্যি এ্যাতো ভয়, সেটাও বোঝার উপায় নেই। একদিন শুধু এইটুকুন বলেছেন, পুলিশ তাকে খুব মারধর করত। আর নীতা বৌদির মতো পরমা সুন্দরী একটা মেয়ে খুন করিছে বলে শহরের বেশিরভাগ মানুষ ঘেন্না করত তারে। আর রাগ তো ছেলই।

বিভা বলে : কৈবল্যচরণই তার স্ত্রীকে মারিছে। সে ছাড়া আর কে হবি। তোর বিয়ে হলি তোরেও দেখবি মারধর কইরবে। একটা খুন করি যথেষ্ট সাজা ভোগ করিছে লোকটা, আর হয়তো খুন-খারাবির দিকে যাবি না। তো মানুষটা ভালো না, তোরে কয়ে রাখলাম...

কামিনীদের বাড়িটা কৈবল্যচরণ গা ঘেঁষাঘেঁষি। ওরা পাল, শূদ্র, কামিনীরাও তাই। তবে দুই বাড়ির লোকদের বংশ আলাদা, পেশা আলাদা। কৈবল্যচরণদের মূল পেশা ছিল সুদে টাকা খাটানো। বাজারে পাট আর লোহার কারবার ছিল।

কামিনীরা মহাজন বাড়ির শান-শওকত, জমি-সম্পত্তি নাম-ধাম ইত্যাদির তুলনায় বলতে গেলে খুবই তুচ্ছ পরিবার। হ্যাঁ, বাপের জমি-জমা মন্দ ছিল না, খেয়ে-পরে পরিবারের ভালোই চলে যেত। আর মহাজন বাড়ির ছেলেমেয়েরা এবং আশু পাল-কামিনীদের জ্ঞাতিরা পাকিস্তান আমলে একে একে ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশ হওয়ার আগে পর্যন্ত, হিন্দুদের আর কোনো পরিবার গ্রামে নেই বলে, মহাজন বাড়ির রঘু পাল আর আশু-কামিনীদের বাবা সনাতন পালের পরিবারের মধ্যে মিলমিশ, আসা-যাওয়া ইত্যাদি বেশ ছিল। তারপর তো পাকিস্তান বাহিনী আর রেজাকারদের হাতে বড়দের মধ্যে লুকিয়ে পালিয়ে বেঁচে ছিল শুধু আশু-কামিনীদের মা সুলতা আর কামিনী-আশু দুই ভাইবোন।

এরপরও প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর যায় যায়। কৈবল্যচরণদের বাড়িতে শুধু নিভাননী পিসি আর পালের শুধু আশু পালের পরিবার। আশু পালের কোনো ছেলেপুলে নেই। তবে আশু পালের তা নিয়ে কোনো দুঃখ নেই। ভগবান একদিন না একদিন কৃপা করবেন। এই ভরসায় তারা আছে। বিভা-একহারা গড়নের বেশ পোক্ত শরীরের। তাকে সুন্দরী বা অসুন্দরী কোনোটাই যেন বলা যায় না। বেশ ব্যক্তিত্ব আছে।

আর কামিনী তো বিয়ে না হওয়া বয়সে বেশ ভালোই ছিল। সতেরো বছরে বিয়ে গিয়ে তার রূপ কী একটা সুখ-আহ্লাদে আরও যেন খানিকটা খোলতাই হয়েছিল। তবে কপাল যার মন্দ তার রূপ বা আঁটসাঁট বাঁধনের শরীরে কী আসে যায়! শরীরের ভেতর শরীরেরই আচার-বিচার আর মনে তার কি একটা বেপরোয়া চালাকি পাশাপাশি ভয়, আতঙ্ক, যাতনা। এসব নিয়ে কামিনীর বেঁচে থাকা। এ রকম থাকাটাকে যদি আদৌ বেঁচে থাকা বলা যায়।

কৈবল্যচরণ হঠাৎ অসুস্থ শরীরে ইন্ডিয়া ছেড়ে নিজ দেশে, নিজ পৈতৃক ভিটেয় এসে পড়ায় দুই পালবাড়ির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যেমন বেড়েছে, তেমনি একটা স্বার্থও কৈবল্যচরণ ও কামিনীকে কিছুটা কাছাকাছি এনে দিয়েছে। কৈবল্যচরণ এখনও নবনীতা ছাড়া অন্য কোনো নারীকে সম্ভবত মনে ঠাঁই দেয় না। আর কামিনীর শরীর ও মন যেন বা একটা অসম্ভব কিছু ঘটুক, সেটাই চাইছে। বিয়ে, সংসার? হ্যাঁ, কেন নয়। মন না হোক, কৈবল্য কামিনীকে বিয়ে করে একটা সংসার তো দিতে পারে!

কামিনী অবশ্য সবই চায় সতর্কচিত্তে। দুনিয়াটা যে দিনকে দিন তার জন্য কী রকম বৈরী হয়ে উঠছে, তা তো সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। জানে নিশ্চিত পাওয়াটাও শেষে সমুদ্রমন্থনে গরল পাওয়ার মতো হয়ে যায়। এই-ই তো বিধবা হওয়ার পর থেকে গত চৌদ্দ-পনেরো বছরের তার অভিজ্ঞতা।

তারপরও দিনের মতো দিন কেটে যায়। কামিনী যে খুব একটা দুঃখ-কাতর, বাইরে থেকে অন্তত বলা যাবে না। আর জীবন বোধকরি সকল মানুষকে প্রতিদিন কিছু না কিছু একটা দিয়ে হোক আশা-কল্পনা, হোক ধর্ম চেতনা, হোক বাঁচার একটা স্বভাব-আকুতি, মানুষকে মোমবাতির শিখার মতো প্রত্যাশায় বাঁচিয়ে রাখে। বাতাসে শেষ কাঁপুনি দিয়ে নিভে যাওয়ার আগে পর্যন্ত।

পাশের বাড়ি মহাজনবাড়ি। প্রাচীর দেওয়া পুকুর ও বিস্তৃত বাগান নিয়ে বিশাল এই বাড়িতে দীর্ঘদিন এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা, কামিনীর চেয়ে বোধকরি বেশি হতভাগিনী নিভাননী ছাড়া কেউ বসবাস করত না। হঠাৎ কৈবল্যচরণ এসে পড়ায় কীভাবে কীভাবে যেন কামিনীর জন্য একটা প্রত্যাশা হঠাৎ তার ডালপালা ছড়াতে শুরু করেছে। কামিনী জানে, বৈরী বাতাসের সামান্য ফুঁয়েও প্রত্যাশার ক্ষীণ প্রদীপটি নিভে যেতে পারে। আবার পোড়-খাওয়া এখনও দেহ-মনে যথেষ্ট যুবতী থাকা কামিনী জানে প্রত্যাশা পূরণ হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। অন্তত কৈবল্যর সেবা-যত্নের সময়টায় দু'একবার তো তেমনই মনে হয়েছে তার। তার ভাইয়ের স্ত্রী, তার খুবই বন্ধু বিভাকে সে এসবের কিছুই কোনোদিন জানায়নি।

নিভাননী আজ সকাল সকাল মহাজনবাড়ি যেতে বলেছে কামিনীকে। কামিনী চুল না ভিজিয়ে চানটা করে নেয়। যতটা, যতটা অদেখলেপনা মনে হয়। সেভাবে লাল সবুজ শাড়ি আর সাদা জামা পরে তৈরি হয়ে নেয় কামিনী। তার সাজুগুজু করতে খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে যে বিধবা। ভাই, বৌদি কামিনীকে কিছু বলবে না। বরং ওরা যে চায় শুধু কলঙ্ক-টলঙ্ক হয় এমন কিছু না করে, সেজেগুজে থাকুক, চাই কি বাচ্চা হওয়া বাঁচিয়ে। সমাজের চোখ ও কানের আড়ালে পুরুষ সম্পর্ক করুক কামিনীর শান্তিতে, আনন্দে তো থাকা হলো, ওদের আপত্তি নেই। ছোট বোনটিকে দাদা ও বৌদি যথার্থই ভালোবাসে।

. কামিনী আগে সেরকমটা যে করেনি। এরই মধ্যে তার দূর-সম্পর্কের এক দেবর জ্যোতির্ময় ছিল। এখন ঢাকায় সংসার, চাকরি নিয়ে থিতু আবাল্য পরিচিত, বন্ধুই বলা যায়, অরুণ দেবনাথ। আর ক'দিন আগেও তো তার ছিল ময়না মেম্বার। বাঁশবনে গিয়ে কামিনী অন্তত শরীর জুড়িয়ে আসতে পারে। সেই সুযোগ তার হাতে আছে এখনও।

তবে বৈকল্যচরণ এ গ্রামে নিজ বাড়িতে আসার পর কামিনীর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। বাঁশবনে সে মোটে একবার গিয়েছিল। তাও একটা অজুহাত দেখিয়ে কাপড়-খোলা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারে। শরীরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ঠিকই আছে। তবে শরীর সে দিত ঘরের মানুষটাকে।

কৈবল্যর সাথে তার বিয়ে হয় কি না-হয় তা সময়ই জানে। তবে কামিনীর সেই বিয়ের আগের মতো একটা প্রত্যাশা কুঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে যেন ফুল হয়ে ফোটার স্বপ্ন দেখছিল। নিজেকে অতীত মুছে দিয়ে কুমারী বলে ভাবতে ভালো লাগে কামিনীর। হ্যাঁ, এই কথা কেউ জানে না। কৈবল্যচরণ তো নয়ই, প্রায়-প্রাণের বন্ধু হয়ে ওটা সমবয়সী বিভা বৌদিও জানে না। খুব ক্ষীণ কিছুটা হয়তো নিভাননী পিসিমা জানে। তা পিসি তো চিরটাকাল কামিনীর সুখ-দুঃখের সাথী। বয়স ও বন্ধুত্বের সংসার সাথে মেলে না এমন একটা বন্ধুত্ব পিসির সাথে আছে।

তৈরি হয়ে তাদের বাড়ির কাঠের ফটকের বাইরে আসে। মহাজনবাড়ি তো গ্রামের প্রথম প্রাচীর দেওয়া দালানবাড়ি। আশু পালের বাড়ি সেই তুলনায় প্রতিযোগিতায় একেবারেই টেকে না। তবে গাছপালা আছে, দুই ফুট ইটের পাকা ভিতের ওপর কাঠ ও বাঁশের লতায়-পাতায় ছাওয়া বেড়া আছে, বাইরের ঘরটা হাফ বিল্ডিং, ভেতরের টিনের বেড়া ও পাকা ভিটের দুটো মজবুত ঘর আছে, মহাজনবাড়ি নয়, তেত্রিশপাড়া গ্রামের অন্যসব বাড়ির তুলনায় তাদের বাড়িটাকে ভালো বাড়ি বললে খুব বেশি বলা হয় না।

দুই বাড়ির সামনের রাস্তাটা পাকা। কখনও ফাঁকা। কখনও রিকশা ও গাড়ি চলাচল, লোকজনের যাওয়া-আসা বেশ থাকে। তবে ফাঁক বুঝে মহাজনবাড়ি ঢুকতে কামিনীর কোনোই অসুবিধে হয় না।

পিসিমার রান্নার আয়োজন চলছে। তা চোখে তো বেশি দ্যাখেন না। ভালো রান্নার অভ্যেসও বহুকাল থেকে। কৈবল্য বাড়ি আসার পর রান্নাটা কামিনীই করে। এ বাড়ির পুরনো ভৃত্য ভুলু ফিরে এসেছে। তাকে দিয়েই ফুট-ফরমাস খাটানো এবং বাজার করাটা সারা হয়। কামিনী গতকাল থেকে জানে বৈকি পিসির ক্রমে ভালো হয়ে উঠতে থাকা ভাইপো এঁচোড়, পটোল ভাজি খেতে চেয়েছে। সবই মহাজনবাড়ির বাগানে এন্তার আছে। শুধু মসলা এনেছে ভুলু, পাড়ারই নতুন পত্তন হওয়া বাজার থেকে।

তা কৈবল্য দুপুরে বেশ খেল। সাথে শুধু মেরুদণ্ডের কাঁটা থাকা বড় খলশে মাত্র। কামিনী পাশে বসে পাখা হাতে। কৈবল্যর, কেন জানে না, মনে হচ্ছিল নবনীতার রচনা করা স্বর্গতুল্য সংসারে বসে আহার করছে। এও সে পাশাপাশি জানে বৈকি নবনীতা নয়, রান্না করেছে কামিনী। পাখা হাতে বাতাস দিচ্ছে সে-ই।

কৈবল্য এককালে বড় সুখে ছিল। নবনীতা কেন যে অত অপরূপা সুন্দরী হতে গেল। পেছনের কথা।

ছয়

নবরূপা বিয়ের আগে একটি ছেলেকে পছন্দ করেছিল। ছেলেটির নাম ছিল আবদুল আহাদ। মুসলমান ছেলে। ঝিনাইদহে ফুলগাতী গ্রামে বাস করত আহাদের দরিদ্র পরিবার। দরিদ্র পরিবার। তবে এককালে, আড়াইশ'-তিনশ' বছর আগে তাদের পরিবার বড় জমিদারির পত্তন পেয়েছিল তখনকার খণ্ড বাংলার এক সুলতানের কাছ থেকে। জমিদারি নেই, বাড়ি-ঘর বলতে গেলে ধ্বংসস্তূপের ভেতর, বাবা প্রাইমারি স্কুলের উর্দু শিক্ষক বলে মাইনের সামান্য টাকায় ওদের চলে। তবে জমিদারি, বাড়ি-ঘর, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব গেলেও এই বংশের একটা জিনিস অটুট আছে– দৈহিক সৌন্দর্য এবং চলাফেরায় একটা স্বাতন্ত্র্য।

দেখা হয়েছিল থানা বাজারের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। দুটি মানুষের দীপশিখার মতো গায়ের রঙ এবং দৈহিক রূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমবেত হওয়া লোকজনের মুগ্ধতা কেড়ে নিয়েছিল। ঘটনাটা নিতান্তই কাকতালীয়।

নবনীতাকে দেখে আহাদের কী অনুভূতি তা জানার উপায় ছিল না। সে তখন ঢাকায় দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাসায় থেকে বিএ ক্লাসে পড়ছিল। নিয়মিত বৃত্তি পাওয়া ছেলেটি পরিবারের অর্থ সাহায্য ও নিজের সামান্য হাতখরচের জন্য দুটি টিউশনি করে একূল-ওকূল সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। লড়াকু ছেলে, একই সাথে বিনয়ী ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে গোটা এলাকায় তার ওপর মানুষের সহানুভূতি ও মান্যতা দুই-ই ছিল।

এসবই থানা বাজারে বাস করা নবনীতার বান্ধবী মুর্শিদা বানুর কাছে শোনা। নবনীতাকে দেখে আবদুল্লাহ আহাদের ভাবগতিক জানা না গেলেও সে সন্ধ্যা নবনীতা বাড়ি ফিরেছিল প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ার বেদনাময়, পাশাপাশি মধুর এক আবেগানুভূতি নিয়ে। মুর্শিদা বানু তার হয়ে আবদুল্লাহ আহাদের মোবাইল নম্বরটি জোগাড় করে নবনীতাকে দিয়েছিল। বিয়ের পরও আবদুল্লাহর সাথে নবনীতার যোগাযোগ ছিল। বলতে গেলে আমৃত্যু। এই বিষয়টা কৈবল্যচরণকে জানায়নি নবনীতা। কৈবল্যচরণ এও জানে না আবদুল্লাহর পরামর্শেই পরিবারের পছন্দকে মূল্য দিয়ে বিয়েতে রাজি হয়েছিল নবনীতা।

সে ভেবেছিল মুর্শিদা বানুর সৌজন্যে আবদুল্লাহ তো নবনীতার সেলফোনের নম্বর জানে, আগে ফোনটা আবদুল্লাই করবে। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, ও পক্ষের কোনো সাড়া নেই। ধৈর্য শক্তি ও সংযমের ঘাটতি নবনীতার প্রায় ছিল না বললে বেশি বলা হয় না। তবে হৃদয়ের কথা জানাতে কে না ব্যাকুল হয়? বিশেষ করে সেলফোনের যুগে! নব্বই দশকের মধ্যভাগ পার হয়ে যখন আরও একটা বছর গড়িয়ে গেছে!

প্রথমবার ডায়ালেই আবদুল্লাহকে পেয়ে গিয়েছিল। তার স্বতঃস্ফূর্ত হাসিখুশি কণ্ঠে খানিকটা আগ্রহ ও অপেক্ষা ছিল বলে মনে হয় নবনীতার।

প্রথম আলাপেই দু'জন দু'জনকে বিয়ে হোক না হোক, বন্ধু বলে মেনে নেয়। তুমি সম্বোধনে নেমে আসে। নিয়মিত যোগাযোগ রাখার অঙ্গীকার করে। প্রথম প্রেমের আবেগ, সামলাতে গিয়েও ততটা পারছিল না নবনীতা। তবে আবদুল্লাহর কণ্ঠ ছিল সহজ-সরল। ভারি সুন্দর এক নম্রতা প্রকাশ করছিল তার পুরুষোচিত কণ্ঠস্বর। হাসতে হাসতে এও বলে যে, নবনীতা যেন মনে রাখে এক মাকাল ফলের সাথে সে যোগাযোগ করেছে। শুধু দেখতেই হয়তো খানিকটা রূপবান। তবে সে মানুষটা আসলেই ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার গোছের।

নবনীতা বলে : মাকাল ফল তাহলি তো আমিও। দুই মাকাল ফলের এক হয়ে মিলে গেলে ক্ষতি কী।

হাসতে হাসতে কথাগুলি বলেছিল। আবদুল্লাহ উত্তরে বলে নবনীতা মাকাল হতে যাবে কেন? রূপ থাকবে নারীর, গুণ থাকবে পুরুষের। নারীর রূপের সাথে গুণ থাকলে আরও ভালো। পুরুষের প্রেরণা তেমন নারী বৈ আর কে?

বেশ কয়েক মাস পর ওদের দেখা হয়েছিল গঞ্জে মুর্শিদা বানুদের বাড়ি থেকে একটু দূরে এক আমবাগানে। মধুমাস আসতে বেশি বাকি নেই। আম্রমুকুলের আবেশ ছড়ানো গন্ধ আর ঝিরিঝিরি প্রাক-বৈশাখের বাতাস যেন তাদের নিভৃতে তাদের দেখা করার পক্ষে ছিল। হাত স্পর্শ করা পর্যন্ত তারা গিয়েছিল। আবদুল্লাহ জানিয়ে দেয় তাদের ভারি একটা দুঃসময় যাচ্ছে। বিএ পাস করেছে সে ভালোভাবেই। পাস কোর্সে সাধারণত যা কেউ পায় না সেই প্রথম বিভাগের দ্বিতীয় কেউ না থাকা প্রথম নামটা তারই বটে। সিভিল সার্ভিস দেওয়ার জন্য ভাবছিল, এই সময় বাবার কোলন ক্যান্সার ধরা পড়ে। গিয়ে-থুয়ে খানিকটা ক্ষেত-জমি তাদের ছিল যার বর্গাচাষ থেকে

বছরের খোরাকি ধানটা তার পরিবার পেত। সেই জমি বিক্রি করে বাবার চিকিৎসা করা চলছে।

নবনীতার পরিবার মোটামুটি সচ্ছল। তবে ধনাঢ্য বলা যায় না কোনোমতে। এদিকে বাড়ির রূপবতী কন্যার দিকে স্থানীয় কিছু বখাটের নজর পড়েছে, পরিবার খুব চিন্তিত। অন্তত নবনীতাকে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দেওয়া যায় কি-না সেটা গুরুত্বের সাথে ভাবা হচ্ছে।

নবনীতার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তাদের ভালো লাগাটা বিয়েতে গড়াক চাই, না-ই গড়াক, আবদুল্লাহর দুঃসময়ে সে যদি কিছু সাহায্য করতে পারত।

অবশ্য আবদুল্লাহ সেই সাহায্য নেবে কি-না, সেও আরেক কথা।

ওদের কাছে বেশি সময় ছিল না। গ্রাম-সমাজে এক যুবা ছেলের সাথে সোমত্ত বয়সের, তার ওপর বেজায় রকম সুন্দরী, সময় তাদের জন্য এই ভয়ই কমিয়ে দিয়েছিল।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর আবদুল্লাহ আহাদ কব্জি উল্টে ঘড়ি দ্যাখে। নবনীতা বিষয়টা বুঝতে পারে। তারা কিছুক্ষণ কথা বলে। আবদুল্লাহ তার হাত স্পর্শ করে। জানায়, সেলফোনে যখন-তখন কথা বলা তো চলতেই পারে। মাঝে-মধ্যে দেখাও এই বাগানে বা গঞ্জে না হোক, অন্য কোথাও।

আবদুল্লাহ কথা বলে বেশ গুছিয়ে। দায়িত্বশীলদের মতো। তাদের ভালো-লাগা সেলফোনের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। নবনীতা বুঝেছিল অসম্ভব শব্দটা দু'জনকার সম্পর্কের মধ্যে যেন বা নিয়তির মতো বসে আছে। দীর্ঘশ্বাসই শেষ পরিণতি। মাস পাঁচেকের মধ্যে তাকে আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তবে আবদুল্লাহ আহাদের সাথে তার সেলফোনের সম্পর্কটা ছিল আমৃত্যু। নিমপুরে বাংলাদেশের বহু লোক বাস করে। বড় পিতৃব্যের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল সে। ক্রমে ক্রমে বছরখানেকেরও কম সময়ের মধ্যে গোটা পরিবার। নিমপুরে জমি ছিল বেশ সস্তা। জায়গাটাও বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে। বাড়ি করে, জমি ও ব্যবসার বন্দোবস্ত করে ওখানেই বসবাস করতে শুরু করে।

তবে নবনীতার বিয়ে ঠিক হয় বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া আসার কিছুদিন আগে। কৈবল্যচরণের ফটো তাকে দেখানো হয়েছিল। দুই একবার দেখে এইটুকু বুঝেছিল লোকটার হাইট তার সমান হলে হতে পারে। গায়ের রঙ বড়জোর শ্যামলা। দেখতে তেমন স্মার্ট মনে হয় না। দৈহিক স্বাস্থ্যের বিচারে পাস মার্কের অধিক নম্বর দেওয়া যায়। আর মায়ের কাছে, কাকির কাছে যা শোনা গেল তাতে বোঝা গেল নিজ স্বাধীন ব্যবসায়ী। নিজে একতলা প্রাচীরঘেরা বাড়ি করেছে। টাকা-পয়সা বেশ আছে বলে বাংলাদেশ থেকে জানান দেওয়া হয়েছে। আর বাড়ির বড়রা এই রকম মন্তব্য করেছে যে, নবনীতার জন্য একই সাথে ইন্ডিয়া যাওয়া এবং একেবারে স্বামী, সংসার, সাংসারিক সচ্ছলতা পাওয়া এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর হতে পারে না।

নবনীতা পরিবারকে হ্যাঁ বলে দিয়ে বিষয়টা আবদুল্লাহ আহাদকে জানিয়ে দেয়। বেশ অন্তরঙ্গ কণ্ঠে আবদুল্লাহ জানায় এর চেয়ে ভালো খবর আর কী হতে পারে। নবনীতা যেন স্বামীকে নিয়ে সুখী হতে চেষ্টা করে।

নিজের খবরও জানায় আবদুল্লাহ। জমি বিক্রির টাকায় বাবাকে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে। ক্যান্সারের প্রাথমিক স্তর বিধায় চিকিৎসাগুণে বাবা হয়তো ভালো হয়ে উঠবেন। তবে মা ও ছোট দুই ভাই-বোনের বোঝা এখন সরাসরি তার ঘাড়ে চাপবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে সে এখন ঢাকার এখানে-ওখানে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবশ্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার আশা সে ছেড়ে দেয়নি।

মোটামুটি শান্তভাবেই সেলফোনে তাদের বিদায়ের পালা ঢুকল। যা হয়, ঠিকানা বিনিময়ের পর তারা দু'জনকে সামান্য আবেগতাড়িত গলায় জানায় দু'জন তারা একে অন্যকে মনে রাখবে। আর ওপরওয়ালা যদি ইচ্ছে করেন তাদের কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো একদিন দেখা হয়ে যেতে পারে। আর কিছু না হোক, চিরকাল তারা একে অন্যের বন্ধু, সুহৃদ, হিতৈষী হয়ে তো থাকতে পারে।

নিমপুর বড় কাকার বাসা। বিয়ের আগে সে বাড়িতে ডাকিয়ে এনে একদিন কৈবল্যচরণকে নবনীতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তারা যাতে একটু নিভৃতে কিছু কথাবার্তা বলাবলি করতে পারে, সে সুযোগ করে দেওয়া হলো।

নবনীতা আগেই ঠিক করে রেখেছিল, একটা একেবারে নিজের সংসার তো কৈবল্যচরণকে বিয়ে করে সে পেতে পারে। তার আর বিশেষ কোনো ইচ্ছে বা কৌতূহল ছিল না। বরং পরিবার ও সমাজের প্রতি সামান্য খানিকটা বিরাগ ছিল এই ভেবে ভালোলাগা, ভালোবাসা থাকলেও মুসলমান আবদুল্লাহর সাথে তার বিয়ে হওয়ার কোনো সুযোগ কি ছিল কোনোভাবে। তার চেয়ে পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে করে ফেলাটাই ভালো। হোক না সে রূপবতী। দশ ক্লাস পর্যন্ত পড়া হিন্দু মেয়ের কৈবল্যচরণের সাথে বিয়ে হওয়া ছাড়া তার জীবনে স্বাভাবিক আর কী ঘটনা ঘটতে পারত।

নবনীতার ফটো দেখেই মনে মনে পাগল হয়েছিল কৈবল্য। সাক্ষাতে অপ্সরা-সুন্দরী দেখে নিজ ভাগ্যকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। নবনীতা শুধু সুন্দরীই না, পরমা সুন্দরী। ভাগ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কিছু রহস্য না বুঝেই শুরু হয় নবনীতার সাথে সংসার করা নিয়ে তার স্বপ্ন দেখা।

বিয়ের পর কৈবল্যকে মেনে নিতে কোনো অসুবিধে হয়নি নবনীতার। শুধু একান্ত সময়ে নয়, সংসার রচনার প্রতিটি ধাপে তার প্রতি কৈবল্যর সততা, আন্তরিকতা, দায়িত্ব বোধ ইত্যাদি দেখে নিজেকে বরং তার ভাগ্যবতী বলে মনে হয়। পুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব না খুইয়ে কেউ যদি তার স্ত্রীর অনুগত ও প্রেমিক হয়, সেটা যে কোনো নারীই ভাগ্যের লক্ষণ বলে ভাবতে চাইবে।

আবদুল্লাহর প্রতি তার অনুরাগ ও আগ্রহ জন্মানোর বিষয়টি কৈবল্যকে জানিয়েছিল। আরও বলেছিল বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া স্বামীকে যে আগ্রহ-অভিপ্রায়-আবেগ ইত্যাদি নবনীতার থাকা সত্ত্বেও খুব সম্ভব আবদুল্লাহর বৈরাগ্য, হ্যাঁ বৈরাগ্যই বলা যায়, হাতের স্পর্শটুকু ছাড়া তাদের সম্পর্ক এগোতে পারেনি।

কৈবল্যচরণ স্ত্রীর পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে, শরীরের আবেগ-উচ্ছ্বাস ইত্যাদি শান্ত হওয়ার পর।

সে শুধু বলে : আহা হা।

: আহা হা মানে?

: মানে, মনের খায়েশ মনেই রয়ি গেল, পূরণ আর হলো না।

এ রকম ঠাট্টা-রসিকতা বিয়ের প্রথম দিকে হতো নবনীতা ও কৈবল্যচরণের মধ্যে। নবনীতা চাপ দিত বিয়ের আগে কৈবল্যচরণের কোনো ঘটনা-ফটনা আছে কি-না। না নেই। কৈবল্যচরণের সাফ উত্তর। নবনীতা বলত : নিশ্চয়ই আছে। না থেকে পারে না। একে ঘাড়ে গর্দানে ষাঁড়ের মতো স্বাস্থ্য, তার ওপর বড়লোক মহাজনবাড়ির ছেলে। কৈবল্যচরণ বলত : মহাজনবাড়ি আর থাকলাম কোথায়? চল্লিশ বছর বয়সেই তো চলি এলাম ইন্ডিয়ায়। নিমপুরে।

নবনীতা : অসম্ভব!

কৈবল্য : বিশ্বাস না করলি আর কি করতি পারি?

নবনীতা : বিশ্বাসে কাজ হবে না। দাঁড়াও, ঝিনাইদহ আর নিমপুর,- দুই ঠাঁইয়েই খবর নিচ্ছি। ধরা একদিন খেতেই হবে-

নবনীতার জীবন ও সংসার বেশ সুন্দরভাবে রচিত হতে শুরু করেছিল। অমূল্য এসে নবনীতাকে দিয়েছিল দাম্পত্যে আরও খানিকটা পূর্ণতা।

এ সময় এসে যায় মহা দুর্দৈবের মতো রতন।

রতনলাল ঘোষ। আবদুল্লাহর মতো রূপবান ও আকর্ষণীয় না হলেও বেশ দীর্ঘকায়, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সুদর্শন যুবা তো ছিল বটে রতনলাল। শুরুতে একটা বিপর্যয় হয়ে দেখা দিলেও নবনীতার মনে যে রূপ-তৃষ্ণা ছিল ভেতরে ভেতরে, কোনো রকম

কোনো ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও, যেন ভেতরের সেই আত্মঘাতী সুখের কাছে সমর্পণ করেছিল নিজেকে নবনীতা, রূপ-তৃষ্ণা তাকে যেন বাধ্য করত রতনলালের প্রতি তাকাতে। সংসার, স্বামীর প্রতি সততা বজায় রেখে, গোপনে, খুব গোপনে রতনলালকে একটু-আধটু প্রশ্রয় দিত।

অথচ কৈবল্য ও নবনীতা দু'জনই ঠিক করেছিল রতনলালকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না হয়তো শেষ পর্যন্ত, তাই নিমপুর ত্যাগ করাই হবে সঠিক কাজ। সংসার, অমূল্য, কৈবল্য সবার প্রতি মায়া ছিল নবনীতার। সংসার ভেঙে রূপ-তৃষ্ণার মূল্য দিতে নবনীতা একটুও রাজি ছিল না। মাঝেমধ্যে আত্মীয়বাড়ি যাওয়ার নাম করে তারা ঘুরে বেড়াত কলকাতার উপকণ্ঠে থাকা শহর হতে শুরু করা গ্রামগুলোতে। একখণ্ড জমির বায়নাও দিয়ে রেখেছিল কৈবল্য। জায়গাটা তখনও অনেক শহর যা পায় না, সেই গাছপালা ও নিভৃতির ছায়াঘেরা ছিল। শহর ছিল চার ভাগের এক ভাগ, গ্রাম ছিল। এমন জায়গাই পছন্দ ছিল নবনীতার।

হয়তো মাস চারের বা ছয়েকের মধ্যে সবার অগোচরে তারা নিমপুর ছেড়ে আনন্দপুরে ঠিক চলে যেত। তার আগেই যে ঘটনাটা ঘটে। মরার আগে পর্যন্ত নবনীতা ভাবতে পারেনি সে খুন হতে যাচ্ছে। সে টাল খেয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কোটর থেকে বের হয়ে আসা চোখে দ্যাখে একটা উদ্যত ধারালো চাকু তার ওপর নেমে আসছে।

নবনীতার শেষ ক'টি চিৎকার কেউ শোনেনি হয়তো। চোখ দুটি যেন খুব অবিশ্বাসে কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

এই দৃশ্য দেখে কৈবল্যর মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠেছিল। একটা গগনবিদারী চিৎকার তার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এসেছিল। সে ছিল হতচকিত। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুইয়ের মধ্যে আবর্তিত হতে হতে সে মূর্ছিতপ্রায় হয়ে এলিয়ে পড়ে মেঝের ওপর।

পরে কোর্টে দেওয়া পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়, স্ত্রীকে নিজ হাতে চাকু দিয়ে মেরে টাল সামলাতে পারেনি কৈবল্যচরণ। আশপাশের দু'জন মহিলা এবং বাসার কাছে এক মুদি দোকানদারের সাক্ষ্যদান করা বক্তব্যে এ ধারণা পোষণ করার অবকাশ থাকে আসামি কৈবল্যচরণ ছিল পরমা সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপরায়ণ।

চার্জশিটে পুলিশ আরও জানায়, নবনীতা পাল খুন হওয়ার পর থেকে আদালতে সোপর্দ হওয়া পর্যন্ত খুন সে নিজে করেছে নাকি এই খুনের জন্য কোনো ব্যক্তি বা চক্রকে দায়ী করে, এ নিয়ে একটি কথাও বলেনি অভিযুক্ত কৈবল্যচরণ পাল।

আদালতের একটি প্রাথমিক নথিতে পুলিশের এই বয়ানকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়, আসামিকে বহু ধরনের জেরা করা হয়েছে। সে কখনও করুণ চোখে তাকিয়েছে, চোখের ভাষা তো স্বীকৃত কোনো ভাষা, আইনের চোখে জোরালোভাবে গ্রাহ্য বলে মনে হতে পারে এমন কোনো ভাষা নয়। তাহলে বলতে হয়, উদ্ধত ভাষায় তার চোখ বেশি তাকিয়েছে। তবে এসব বিষয় আদালত তেমন আমলে নিচ্ছে না। আদালত যা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছে তা হলো অভিযুক্ত আসামি কৈবল্যচরণের পুলিশের কাছে কিংবা আদালতে নানা জেরার জবাবে একটি কথাও বলেনি।

আদালতের নথিতে আরও বলা হয়, ঠিক আদালত অন্যান্য সূত্রের পর্যবেক্ষণ ও বক্তব্য, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামত এ বিষয়টি বিলক্ষণ জানে যে, বড় কোনো মানসিক আঘাতে কোনো ব্যক্তি বাক-ক্ষমতা হারানো খুবই সম্ভব। তার বাকশক্তি ফিরে পাওয়ার উপায় এবং সময় নিয়ে অপেক্ষ করা, দুই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া।

অভিযুক্ত আসামি কৈবল্যচরণকে পুলিশের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। ডা. সুরজিৎ বসু এবং ডা. নির্মল আচার্য লিখিতভাবে জানান, রোগী সব রকমে সুস্থ আছে, স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। মানুষের ধারণা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞানের অতীত কোনো অনাবিষ্কৃত বিকার, তাকে আবার বলছি সম্ভবত রোগী সজ্ঞানে নিজের মধ্যে লালন করছে। রোগীর বাক-রহিতের রহস্য এর বেশি উদ্‌ঘাটনের সক্ষমতা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের নেই। আমরা দুঃখিত।

পুলিশের চার্জশিট আদালতে পৌঁছতে দেরি হওয়া, স্নায়ু ডাক্তারদের দিয়ে রোগী তথা অভিযুক্ত আসামিকে চিকিৎসা করানো, কোর্টে শুনানির পর শুনানিতে সময়ক্ষেপণ ইত্যাকার কারণে কৈবল্যচরণকে বিনা বিচারে চার বছর জেলে কাটাতে হয়। নিম্নআদালতে তাকে যুক্তি-গ্রাহ্য সাক্ষ্যের অভাবে, নিছক সন্দেহের কারণে কাউকে সাজা দেওয়ার আইনি বিধান না থাকায় কৈবল্যচরণকে খালাস দেওয়া হয়।

এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে নিমপুর উপশহরের জনৈক মানিক চৌধুরী, পিতা মোহিনী চৌধুরী, আদি নিবাস তেত্রিশপাড়া, জেলা ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ। গত ১৪ বছর ধরে তারা ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের নিমপুর উপশহরের বাসিন্দা। তারা দূরসম্পর্কে কৈবল্যচরণদের আত্মীয়। সেটা বলতে গেলে দুই প্রজন্ম আগে। অর্থাৎ রঘুনাথ পালের বাবা কৃষ্ণচরণ পালের সময়কার।

তবে এই দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা কৈবল্যচরণ ভালো কী মন্দ স্বভাবের, খুশি নাকি খুশি না– তা কিছুই নির্ধারণ করে না। মানিক চৌধুরী নিজেই সেটা স্বীকার করে নিয়ে আদালতকে বলে ঘটনার সময় রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। হঠাৎ নারীকণ্ঠের 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে গগনবিদারী চিৎকার শুনে সে দ্রুত কৈবল্যচরণের বাড়ি গিয়ে ঢোকে। বাইরের দরজা হাট করে খোলা। চিৎকারের শব্দ অনুসরণ করে কৈবল্যচরণদের শয়নগৃহে গিয়ে হাজির হয়। দ্যাখে কৈবল্যচরণ মেঝেয় পড়ে থাকা স্ত্রী নবনীতাকে ধারালো চাকু দিয়ে আঘাত করছে। আমি (মানিক চৌধুরী) ঝট করে মোবাইলে ঘটনাটা তুলে ফেললে খুনি আমার দিকেও ধাওয়া করে, এই ভয়ে খুব দ্রুত চম্পট দিই।

আদালত থেকে প্রশ্ন করা হয়, এত নিশ্চিত সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও নিম্ন আদালতকে সে কথা বলা হয়নি কেন? মোবাইলে তোলা খুনের ছবিওবা জমা দেওয়া হয়নি কেন?

বাদী সরকার পক্ষ। বিজ্ঞ সরকারি প্রসিকিউটার বলেন যে, মানিক চৌধুরী নেহায়েতই এক নিরীহ দরিদ্র লোক। এককালে পূর্ববঙ্গে জমিদারি ছিল। দাঙ্গায় দুই পুত্র ও মাকে হারায়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর শহরে একটা কবরেজি ওষুধের দোকান চালায়। বেচারা কায়-কষ্টে কোনোরকমে দিনাতিপাত করে। প্রথমদিকে তাই খুন-খারাবি আর থানা-পুলিশের ব্যাপার বলে সে পুলিশ বা আদালতে যায়নি। নিরীহ ও ভীতু মানুষের পুলিশ মানে তো আঠারো ঘা। তবে যখন শুনল কৈবল্যচরণ বেকসুর খালাসের রায় পেয়েছে কোর্ট থেকে, তখন বিবেকের তীব্র দংশনে জর্জরিত হয়ে সে আদালতে উপস্থিত না হয়ে পারেনি।

ছবি বড়। এনলার্জ করা। তাতে পরিষ্কার দেখা যায়, নবনীতা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত হয়ে আর কৈবল্যচরণের হাতে একটা চাকু। নবনীতার বুকে চাকু বসিয়ে দিচ্ছে। চোখেমুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি।

উচ্চ আদালতে সরকার পক্ষের আইনজীবী নতমস্তকে বিজ্ঞ আদালতের রায় মেনে নেন। কৈবল্যচরণের আপিলের সুযোগ দিয়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন উচ্চ আদালত।

আগে কারাগারে প্রচুর মারধর করে পুলিশ কৈবল্যচরণের ওপর। কনডেম সেলে গিয়ে বরং সে পুলিশের মার খাওয়া থেকে বেঁচে যায়। কাজে কোনোরকম গাফিলতি না করলেও পুলিশ তাকে যখন-তখন এমন মারধর করে কেন, সে কথা কৈবল্যচরণ সাহস করে একদিন এক পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছিল। পুলিশটি একটা ধূর্ত আর রহস্যময় হাসি উপহার দিয়েছিল। বুড়ো আঙুল ও মধ্যমা ঘষে একটা আওয়াজ বার করে বলেছিল : সবই মালকড়ির ব্যাপার, বুঝলি শালা ...

মালকড়ির ব্যাপার। তার মানে কেউ তাহলে জেলে তাকে ঢুকিয়েছে। তার তো খুব অস্পষ্ট চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে মাঝে

মঝে মনে হয় নবনীতার প্রতি তার যা কিছু বিরাগ ও সন্দেহ ছিল, মনের ভেতরের সেসব শত্রুই তার হাতে একটা ক্ষুরধার চাকু তুলে দিয়েছিল। আততায়ী সে-ই ছিল কি-না। হয়তো ছিল। না হয়তো, কেন? নবনীতার খুনি সে-ই ছিল।

নবনীতাকে সে খুব ভালোবাসত। নবনীতাকে তো রতনলালও ভালোবাসত। তাহলে ভালোবাসা জিনিসটার জিজ্ঞাসা কী দাঁড়ায়? নিজের ভেতরে ও বাইরে না পাওয়ার মতো কাউকে পেয়ে যাওয়ায় ধীরে ধীরে নিজের বৈষয়িক ও আত্মিক মর্যাদা তৈরি হতে থাকা। সেটা কি ভালোবাসা, যা সে ও রতনলাল নবনীতাকে দিচ্ছিল বা ধীরক্রমে আরো দিতে চাইছিল।

হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই নবনীতাকে সংসারের একটা গণ্ডির ভেতর এবং মনের ভেতর থাকা মনের চেয়ে ঢের বেশি আচ্ছন্ন অথচ সবকিছু মানুষের দেহে ছেড়ে মৃত্যু যা দখল করে, তেমন শক্তিশালী একটা সবকিছুর কিছু কিছু কৈবল্যচরণ পেয়ে যাচ্ছিল। নবনীতার থেকে ক্রমাগত পেয়ে যাচ্ছিল। যদি সহজেই কিংবা নানা গোঁজামিল দিয়ে যাকে বলা হয় ভালোবাসা। সে ও নবনীতা পরস্পর পরস্পরকে দিয়ে যাচ্ছিল। কোনো সন্দেহ নেই।

তবু দুর্বলচিত্ত মানুষ। সন্দেহ আছে। নায়কের মতো সুন্দর, স্মার্ট, বিত্তশালী, দেহজুড়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রতনলালকে কী দিয়ে যাচ্ছিল নবনীতা? শুধু কি লোক দেখানো কিছু বন্ধুত্ব? কী দিচ্ছিল নবনীতা রতনলালকে? শুধু মনে মনে কিছু? নাকি নগদা-নগদি কিছু কিছু?

হ্যাঁ, কৈবল্যচরণের ভেতরে, খুব ভেতরে নবনীতার প্রতি হারাবার একটা ভয়, যা কি-না আসলে মুখোশ না পরা, নাম সন্দেহ অথবা নাম ভালোবাসার আতিশয্য- তা তো ছিলই। সে কি একদিন ঝকঝকে দুপুরে কিছু একটা ইতি টানার জন্য অপার্থিব থেকে যাতনাকে মানুষের বোধগম্য ভাষা দেওয়ার জন্য অদমী আততায়ী হয়ে উঠেছিল।

হয়তো। হয়তো না। কিন্তু জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাকে মারধর করার জন্য মালকড়ি জোগাচ্ছে কে। প্রথমে নামটা যার আসে, সে তো রতনলাল।

তাহলে রতনলাল, নিশ্চয়ই রতনলাল, সে ছাড়া আর কে। নবনীতা থেকে কতটা পেয়েছিল? কী কী পেয়েছিল? কনডেম সেলে ঢোকার পর নরক-যন্ত্রণা ভোগাত তাকে এসব বিষমাখা চিন্তা।

আশ্চর্য। তারপরও সে ভাবত কোনো লৌকিক-অলৌকিক উপায় আছে কি-না, যাতে ফাঁসির দণ্ড বাতিল হয়ে সে জেলখানা থেকে নির্দোষ বেরিয়ে আসতে পারে কিংবা ধরা যাক সে দোষী। সেই নবনীতাকে খুন করেছিল। রিভিউ করার ক্ষীণ সময়টাতে এমন কিছু ঘটতে পারে না!

কনডেম সেলে ঢোকার দু'দিন পর তার আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটার মাননীয় নলিনী চক্রবর্তী ভারি দুঃখ ও শোক প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। হাসি-হাসি পরবো ফাঁসি- এই সাহসও সান্ত্বনা কৈবল্যচরণের অন্তরে ঢোকাতে চেষ্টা করেছিলেন ষাটোর্ধ্ব বয়সের ভারি বৈষ্ণব বৈষ্ণব চেহারার ভদ্রলোকটি। ধুতির কোনায় চোখ মুছে আর্দ্রকণ্ঠে বলেছিলেন কী হবে মশাই বেঁচে থেকে।

তবু কৈবল্যচরণ কেন যেন বেঁচে যেতে ইচ্ছে করে। হঠাৎ এই সময় জেলে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসে তাকে জানান, তার ফাঁসির আদেশ অবৈধ ও অসত্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত- এই বক্তব্যের সাথে কিছু যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ ও প্রশ্ন রেখে কে এক নিরঞ্জন ঘোষ উচ্চ আদালতে হাজির হয়ে মামলার পুনঃশুনানির আবেদন করেছেন। আপিল বিভাগ সেটি খারিজ করে দেবেন বলেই ভাবা হয়েছিল। শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে সে রকমটাই হয়। তবে সদ্য প্রধান বিচারপতি হওয়া নিবারণচন্দ্র শীল মহাশয় নাকি মামলার পুনঃশুনানির আবেদনে সাড়া দেওয়া যায় কি-না তা বিবেচনা করতে রাজি হয়েছেন। প্রধান বিচারপতি মানে তার সরাসরি নেতৃত্বাধীন গঠিত গোটা আপিল বিভাগ। এই 'অন্যায্য' আবেদনে সবচেয়ে নাখোশ হয়েছেন মাননীয় এটর্নি জেনারেলের সহকারী কৃষ্ণ-ভাবে সদাইকাতর নলিনী চক্রবর্তী। কলিকালে কত কী ঘটে তা দেখার জন্য তাকে অপেক্ষায় থাকতেই হচ্ছে। কেননা এটা যে স্বয়ং প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ফুল বেঞ্চের সিদ্ধান্ত!

মামলা পুনঃশুনানির আবেদন যিনি করেছেন তার নাম নিরঞ্জন ঘোষ, কৈবল্যচরণের সম্বন্ধি। তার সাথে নিশ্চয়ই আছে পুত্র অমূল্য পাল, যার বছর দুই আগে জজকোর্ট থেকে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার সনদ পাওয়ার কথা।

এই দু'জন আত্মীয়, একজন তো কৈবল্য- নবনীতার পুত্র যে কি-না আত্মার আত্মীয়, রক্ত-সূত্রে বাঁধা,- কোথায় ছিল অ্যাদ্দিন। জেলে থাকা এবং বিচারকালীন তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতা নিয়ে ভারি দুঃখে ও অভিমানে ভুগেছে কৈবল্যচরণ।

এখন দুঃখ নয়, অভিমান নয়, একটা বিস্ময় ও মহাজাগতিক বোধ দখল করেছে তাকে। সে ভাবে, আরে ফাঁসির দণ্ড ঘোষিত হওয়া কনডেম সেলে বসে, শুয়ে জেগে থেকে এমনকি তন্দ্রা সর্বস্ব ঘুমে এ রকম একটা অলৌকিক কিছু ঘটার কথা তো সে ভাবত। না, ওপরওলার কাছে প্রার্থনা করা-টরা কিছু না। সে শুধু এমনিই আনমনা হয়ে ভাবত। হয়তো বেঁচে থাকার একটা অবচেতন আশা মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে। হয়তো থাকে। কৈবল্যচরণকে ধর্ম এখনো খাবলা মেরে ধরেনি। কেন ধরেনি তা সে জানে না। যেমন জানে না পুনঃশুনানির প্রায় অলৌকিক ঘটনাটা কী করে ঘটল।

নিরঞ্জন ঘোষ পশ্চিম দিনাজপুরের সেরা আইনজীবী। মামার ফার্মে আছে পুত্র অমূল্যচরণ। তারা অ্যাদ্দিন পর কেন কৈবল্যচরণকে বাঁচাতে আসে যখন মৃত্যুদণ্ড তার হয়েই গেছে? দ্রুত মামলা পুনঃশুনানির জন্য মহামান্য আদালত থেকে একটা বিবেচনা পাওয়া আর পুনঃশুনানির আদেশ পাওয়া তো এক বস্তু নয়। সব মিলিয়ে কনডেম সেলে থাকা, মৃত্যুর প্রহর গোনা কৈবল্যর মন ভারি এক বিস্ময় ও অভিমানে ভরে যায়।

সে ভাবে কী করে ঘটল এই অসম্ভব?

ঘটনা আরো গভীরে

সাত

রতনলাল একদিন সকাল ১১টায় যথারীতি বসে তার ব্যবসার কাজকর্ম দেখছিল। তার বাবা প্রয়াত হয়েছেন বছর নয় হলো। বাবার মৃত্যুর পর সংসার চালানো এবং ব্যবসা পরিচালনা দুই ক্ষেত্রেই বেশ ভালো করছে রতনলাল।

সংসারে মায়ের কোনো অনুযোগ নেই। পত্নী ময়ূরী সংসার বাবদ মাসিক বরাদ্দ টাকা ছাড়াও যথেষ্ট হাত খরচ পায়, শখ-আহ্লাদও মেটাতে পারে। রতনলাল লোকটা স্ত্রী-সংসার-মা-ছেলেমেয়ে অন্তত এটা তার চারপাশের লোকজন বেশ জানে। রতনলালের মা লীলাবতী তো ছেলেকে সোনার টুকরো ছেলে ছাড়া আর কিছু বলেন না।

স্ত্রীর ভালোবাসা, উচ্ছ্বাস-আবেগ, যে কোনো ভালো কাজ প্রেরণা, সমর্থন পায়। শুধু একটি ক্ষেত্রে রতনলাল সেই আগের লোকটিই থেকে গেছে। বদলাবে বলে মনে হয়। সেই না বদলানো জায়গাটা এখনো দখল করে আছে নবনীতা। বিছানায় ময়ূরীই সঙ্গিনী বটে, তবে তাকে সহ্য করতে হয় ওই ছায়ারঙিনীকে। অপার আনন্দের সময়টায় উচ্চারিত হয় তার নাম।

ময়ূরী জানে এ নিয়ে রতনলালের সাথে বাকবিতণ্ডা বা মান-অভিমান করে লাভ নেই। নবনীতার মতো পরমা না হলেও সেও তো ডাকসাইটে সুন্দরীই ছিল সারা তল্লাটে। রূপ, পড়াশোনায়, মেধা, রান্না, গান ইত্যাকার নানা গুণের কারণেই তো একমাত্র পুত্রের বউ করে তাকে এনেছিলেন শ্বশুর রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।

শ্বশুরের মৃত্যুর আগে অবধি নবনীতার প্রসঙ্গ কিংবা বলা যায় স্বামীর দ্বিচারিতার বিষয়টি নিয়ে কোনো রা শব্দ করেনি ময়ূরী। শাশুড়ি বেঁচে আছেন, এখনো রতনলালের বিপক্ষে তার ক্ষোভটা এক শিশিরদা ছাড়া কারো কাছে প্রকাশ করে না। সে বিলক্ষণ

জানে, তার বিপদের সময় যে তার সাহায্যে আসতে পারে সেই রতনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিশির ছাড়া আর কেউ নয়। ময়ূর জানে শিশির অর্থ, নারী ও রাজনীতিতে পদ-পদবিতে সুযোগ নেওয়ার ঠিক সময়টা জানে। তার রতনলালের বিপক্ষে ক্ষোভ সাত-কানে পৌঁছতে যতক্ষণ ঠিক মুহূর্তটি না আসছে।

রতনলাল ব্যবসা-বুদ্ধিতে বাপের চেয়েও এককাঠি সরেস। মাঝে মধ্যে শিশিরকে সাথে নিয়ে কিংবা না নিয়ে ক্ষমতাধরদের কাছে যায়। জেলা শহর কিংবা কলকাতা। আর বছর কয়েকের মধ্যে হয়তো দিল্লি যাবে। টাকা টাকাকে ধরে আনে। বাবার শিক্ষা তো ছিল, নিজ অভিজ্ঞতা এবং শিশিরের সাথে এখানে সেখানে ঘোরাটাও ব্যবসাতে বেশ কাজে লাগে। অবশ্য শিশির বিনা নজরে কিছুই করে না। তা হোক, ব্যবসা করতে গেলে প্রয়োজনে রাজনীতি, প্রয়োজনে সন্ত্রাসী ছাড়া, প্রয়োজনে উৎকোচ দেওয়া– টাকা বা নারী কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে টাকা, নারী– এসব বাস্তব জ্ঞান সে শুধু যে লাভ করেছে তা নয়, এসবের চর্চাও ব্যবসা চালাতে গিয়ে চলছে নিয়মিত।

তার জীবনে একটা পাওয়াই শুধু নিষ্ফল রয়ে গেল চিরদিনের মতো। নবনীতা। সুখ ও ভালোবাসা এই দুই পাওয়া শুধু নবনীতাতেই সম্ভব ছিল। রতনলাল এখনো বিশ্বাস করে, তার যেমন জন্ম হয়েছিল নবনীতার জন্য নবনীতারও তাই। মাঝে বিয়ে নামে একটা ব্লক বসিয়ে নবনীতাকে কেড়ে নিয়েছিল কৈবল্যচরণ নামে বাংলাদেশ থেকে মাইগ্রেট হয়ে আসা একটা অসহ্য, অযোগ্য লোক।

এখনো তক্কে তক্কে আছে রতনলাল। না, খুন করবে না সে কৈবল্যকে। একটা অঙ্গহানি শুধু ঘটানো হবে তার। ঈশ্বরের শপথ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের শপথ। পূজ্য মাতৃদেবীর শপথ। এটা সে করবে। করবেই। নবনীতাকে তো মৃত্যু গহ্বর থেকে ফিরিয়ে আনার উপায় নেই!

যদি থাকত। হ্যাঁ, প্রথমদিকে, কৈবল্যর জেলে যাওয়ার পর বেশ ক'জন কালী সাধকের পেছনে ঘুরেছিল। কিছুদিন পর সে বুঝতে পেরেছিল ওরা সব ভুয়া। কতকগুলো ফাঁকিবাজি শিখে ওরা মানুষকে ঠকায়। অর্থ উপার্জন করে। ভৈরবী আর মহেশ্বরী নামধারী তান্ত্রিক নারীদের যথেচ্ছ ভোগ করে।

বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে কিছুদিন চুপচাপ ছিল। বন্ধুরা সন্দেহ করত রতন বুঝি বা নবনীতা নামে, মৃত্যুর ওপারে চলে যাওয়া এক কুহেলিকার পেছনে অন্ধের মতো ঘুরছে। বন্ধুরা তো বটেই, রতনলালের বাবা-মা, ঘনিষ্ঠ জনেরা ছেলেটির ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।

আবার এও ঠিক, নবনীতার মোহ তাকে যত আচ্ছন্ন করুক, বাইরে সে ছিল স্বাভাবিক। ঘনিষ্ঠ যারা তারা ছাড়া রতনলালের মনের ভেতরকার পাগলামির বিষয়টা জানত না।

ঘনিষ্ঠজনেরা জানত। বাইরের লোকদের জানার উপায় কী। সে তার বাবার ব্যবসায়ে আগের মতোই কাজ করে যাচ্ছিল। বন্ধু-ইয়ারদের সাথে বসা-টসা, দিল্লাগী করা সবই চালিয়ে যাচ্ছিল।

রতনলালকে বাইরে থেকে জানার উপায় কী? সে তো বাপ-মায়ের ঠিক করা মেয়ে বেশ ভালো দেখতে, সুন্দর দেহ-লতার ময়ূরী মেয়েটাকে বিয়েও করল। স্বাভাবিক জীবনযাপন করে যাচ্ছিল।

হ্যাঁ, ময়ূরী বুঝেছিল। তাকে সবকিছু সহ্য করে নিতে হয়েছে। কারণ সে যে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নিতান্তই এক মেয়ে মানুষ হয়ে গেছে। মা হয়ে আটকা পড়েছে সংসার নামের এক বিপজ্জনক জতুগৃহে। তবে হ্যাঁ, সেও শিশিরকে নিয়ে মাকড়সার একটা জাল বুনে যাচ্ছিল। বিছানায় নবনীতা সর্বস্ব রতনলাল যে শেষ পর্যন্ত তার ও শিশিরের খুব গোপনে ধীরক্রমে তৈরি করা এই জালে ধরা খেতে হবে, সে ব্যাপারে ময়ূরী এক রকম নিশ্চিত ছিল।

আর রতনলাল ভাবত, মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হতো যে, মানুষ কেন বোঝে না, নবনীতাকে রতনলালের জন্য কিংবা বলা যাক রতনলালকে নবনীতার জন্য পৃথিবীতে পাঠানো। এও সে ভাবত, তার পরিপার্শ্বের লোকজন যদি ভাবে সে পাগল, মনে একটা পাগলামি আছে তো তারা সেটা ভাবুক না। ভেবে যাক। রতনলাল তো তার ভুবন নিয়ে আছে যা ঈশ্বর-বিশ্বাসের মতোই নিগূঢ়। তার রক্তে নবনীতার রক্ত। নবনীতার রক্তে তার রক্ত। মানুষ মানে না, বোঝে না নবনীতার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসগুলো ছিল রতনলালের এবং রতনলালের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসগুলো ছিল নবনীতার। তা বুঝুক তারা। রতনলালের খুব গোপন, খুবই গোপন বিশ্বাস আর চিন্তা নিয়ে ওদের চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কী!

কালী সাধকদের ছেড়ে একবার রতনলাল গেল নিমপুর থেকে বিশ-বাইশ মাইল দূরে, এক মুসলিম সাধকের কাছে। তাঁর সম্পর্কে স্থানীয় এবং দূরের লোকদের ধারণা হয়েছিল। কঠিন সাধনা শেষে সাফল্য অর্জন করেছেন। বহু মৃতপ্রায় রোগীর সেবা-যত্ন করে, ওপর ওয়ালার কাছে আশীর্বাদ চেয়ে তাদের বলতে গেলে প্রায় পুনরুজ্জীবিত করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন ওপর ওয়ালার কাছে আশীর্বাদ জানিয়ে, এ রকমটা অবশ্য তার সম্পর্কে শোনা যায় না। তবে তার যে অলৌকিক শক্তি আছে, সেটা বেশির ভাগ লোক বিশ্বাস করে। কী মুসলমান, কী হিন্দু।

রতনলালের নবনীতা ব্যাধি এমন পর্যায়ে যে, মুসলিম সাধক লোকটা যদি নবনীতাকে জীবিত করে দেওয়ার বদলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যেতেও বলেন তাহলে তাতেও সে রাজি আছে। একটা নিষ্ঠুর পীড়নে সবার আড়ালে সে জ্বলছে, নবনীতার পুনঃজীবন এবং রতনলালের সাথে সমস্যাটা ইহকাল যাপন করা ছাড়া সেই দহন নিভবে না।

সে গেল গাড়ি নিয়ে নিত্যপুরে, মুসলিম সাধকের কাছে। তার নাম মহসিন বাবা। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তাঁর দেখা পাওয়া গেল। দেখতে লম্বা, লিকলিকে, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, গায়ের তীব্র ফর্সা রঙটা জ্যোতির মতো জ্বলছে। ভারি সরল, যেনবা খুব নিষ্পাপ ও নিরীহ দুটি চোখে। সদ্য হাস্যময়। নিঃশব্দে।

নিজেকে আল্লাহর ফকির ভাবতে ভালোবাসেন। নামাজ-রোজা ইত্যাদির পর রোগীর সেবাযত্ন করাটাই নাকি তার প্রধান ব্রত। মাঝে মাঝে তিনি চলে যান আজমির, মক্কা-মদিনা।

ফকিরের সাথে দেখা হওয়ার পর রতনলাল যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়ে নিজের কথাগুলো বললো। মনে হলো ফকির যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। মুখে একটা নির্মল হাসি। আকুতি-মিনতি যতটা করার করল রতনলাল। এও বলল তার মনস্কামনা পূর্ণ হলে অঢেল টাকা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি তো থাকলই, ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হতেও আপত্তি নেই তার।

নিঃশব্দ হাসি ফকিরের মুখে। জানালেন রতনলালের ভেতর আল্লাহ এমন একটা শক্তি দিয়েছেন, যা লোকের চোখে হয়তো জেদ বা গোয়ার্তুমি বলে মনে হবে, তবে মন ও আত্মার একটা শক্তির, যার সঠিক ব্যবহার কখনো হয়নি। জানালেন যাকে রতনবাবা পুনঃজীবিত করতে চাইছেন, তিনি পরকালে একবার শুধু পুনরুজ্জীবিত হবে। রতনলাল যদি স্রষ্টার অরূপে একত্বে এবং অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস করেন যেমনটা কি-না বলা হয়েছে আদি মনুহ সংবিধানে যা কি-না মৌর্যদের ভারতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত সনাতন ধর্মের ভিত্তি ছিল, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, সৎকর্ম করেন, মানুষকে ভালোবাসেন, তাহলে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে হলে তা বাবাজি পাবেন বৈকি। স্রষ্টা যে মানুষকে ভালোবেসে সৃষ্টি করেছেন। অনুতপ্ত হলে খুনিকেও মহান স্রষ্টা ক্ষমা করতে পারেন। এটা শুধু তাঁর এখতিয়ার।

রতনলালের কাছে কথাগুলো যে খুব একটা খারাপ লাগল তা নয়। আবার ফকরি তাকে শুধু সান্ত্বনা দিলেন, শুধু তত্ত্বকথা শোনালেন এতেও তার চিত্ত সন্তুষ্টি পায় না। লোকটা তার ইচ্ছা পূরণে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। আবার এও ঠিক, তিনি কালীসাধকের মতো তাকে ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি। যা বলার তা ভারি সুন্দরভাবে, মুগ্ধ করার মতো এক হাস্যময় সারল্যে এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত এক বিনয়ে তা প্রকাশ করেছেন।

ফকিরের কোনো চাওয়া নেই। বিশ্বাসের কারণে কটু কথা শুনতে বা লাঞ্ছিত হতেও যেনবা আপত্তি নেই।

রতনলাল তার দানবাক্সে কিছু দিয়ে চলে আসে। না এরপরও জীবিত নবনীতার জন্য তার অপেক্ষার শেষ নেই। তার মনে হয়, সব সময় তার অন্তরে ইচ্ছাশক্তির এক দীপ-শিখা অনির্বান জ্বলতে থাকে। বন্ধু-বান্ধব, হিতৈষী, স্ত্রী ময়ূরী তো বটেই এমনকি গর্ভধারিণী মা পর্যন্ত নবনীতা সংক্রান্ত তার জ্বলন্ত বিশ্বাসকে নিছক পাগলামি এবং চেতনে-অবচেতনে একটা জটিল ও সূক্ষ্ম মনো বিকলন বলে ধারণা করে। তা করে করুক রতনলাল তো কারো সুখের ঘরে আগুন দিতে যাচ্ছে না। সে ব্যবসা করে, সংসার করে আর মনের গহিনে বিশ্বাস করে, অপেক্ষা করে সামনে যে কোনোদিন নবনীতার সাথে তার দেখা হবে। সঙ্গত হবে।

তাতে কার কী ক্ষতি!

যেদিনের কথা বলা হচ্ছিল। রতনলাল বসে আছে তার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সুসজ্জিত অফিসে। নানা ভাবনা-চিন্তা চলছিল মনের ভেতর পাশাপাশি অফিসের কাজ-কর্ম করাও চলছিল যথারীতি।

ঠিক এ সময় আর কাছে ফোনে একটা জরুরি বার্তা দেওয়া হয়। কলকাতায় ভারতীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো। বলা হয় আজ বিকেল চারটের মধ্যে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের মাননীয় উপ-হাইকমিশনার তার দু'জন সহকারী এবং ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের পাহারা নিয়ে যাবেন রতনলাল ঘোষ, পিতা মোহনলাল ঘোষ, নিমপুর, রতনলালের অফিসে। এটি তার ব্যক্তিগত ভিজিট। তবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রশ্নে মাননীয় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনারের প্রাপ্য আতিথ্য ও সম্মান আর নিরাপত্তার প্রশ্নটি জরুরি।

ফোনে জানানো যেহেতু এটা বাংলাদেশের মাননীয় উপ-হাইকমিশনারের ব্যক্তিগত সফর। তবে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে এই ভ্রমণ এবং দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেহেতু তার কলকাতা বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে সম্মান ও নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ, সাধারণ কূটনীতিতে যা গ্রাহ্য ও পালনীয়।

প্রথম ফোন এসেছিল পাঁচদিন আগে। গতকাল তা কনফার্ম করা হয়েছে। রতনলাল তার অফিসে বসে কৌতূহলী ও উদ্বিগ্ন। হঠাৎ তার কাছে বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার আসছেন কেন? কোনো সুসংবাদ হিসাবে এটাকে তো গণ্য করার হেতু নেই। আর কোনো দুঃসংবাদই হবে কেন তার এখানে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনারের হঠাৎ এ রকম আসাটা।

শিশিরকে শুধু খবরটা বলা হয়েছিল। শিশির শুধু তাকে বলেছে আপ্যায়নের ভালো ব্যবস্থা রাখতে। আর অতিথির সঙ্গে অত্যন্ত পরিমার্জিত ব্যবহার বজায় রাখতে। ব্যক্তিগত সফর। কাজেই ময়ূরীর ভদ্র, পরিশীলিত পোশাক পরিধান করে তৈরি থাকে, প্রয়োজনে তাকে ডেকে অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ব্যক্তিগত সফর কাজেই শিশির বা অন্য কারো সেখানে উপস্থিত না থাকাই শ্রেয়। তবে শিশির এবং এলাকার এমপি রণদা প্রসাদ শর্মা ঘণ্টাখানেক পর রতনলালের অফিসে একটা উপস্থিতি দিলেও দিতে পারে।

মধ্যাহ্নভোজের পর বাংলাদেশের কলকাতাস্থ উপ-হাইকমিশন গাড়িবহর নিয়ে হাজির। সঙ্গে তার স্ত্রী। সুতরাং ময়ূরীকে ডাকতে হলো।

ময়ূরী দ্যাখে উপ-হাইকমিশনার আবদুল্লাহ আহাদকে দেখতে লাগছে কোনো গ্রিক ভাস্কর্যের মতো। অথবা অরণ্য দেবের মতো। সত্যিকারের রূপবান ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পুরুষ বলতে যা বোঝায়। তাঁর স্ত্রী মুর্শিদা বানু। তিনি তত ফর্সা নন। তবে লম্বায় পাঁচ ফিট সাত-আটের কম নয়। ছিপছিপে শরীর বলে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বেশ মানিয়ে যায়।

আবদুল্লাহ আহাদ রতনলালের অফিসে ঘণ্টাখানেক ছিলেন। একান্ত কিছু আলাপের প্রশ্ন ওঠায় ময়ূরী ও মুর্শিদা বানু চলে যান অন্য কক্ষে।

আবদুল্লাহ আহাদ সরাসরি জানান রতনলালকে যে নবনীতা তার বন্ধু ছিলেন। তার হত্যাকাণ্ডে দুঃখ পেয়েছেন স্বামী-স্ত্রী তারা দু'জনই। মুর্শিদা তো বলতে গেলে নবনীতার প্রাণের বন্ধু ছিলে। তাদের বন্ধুত্বের একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছিল, তবে নবনীতা জানতো না মুর্শিদা বানু ও আবদুল্লাহ আহাদের মধ্যে হৃদয় থেকে হৃদয়ের কিছুটা বিনিময় সেসময় থেকেই হচ্ছিল।

একান্তে বসার পর আবদুল্লাহ আহাদ রতনলালকে খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করে নবনীতার হত্যাকাণ্ড এবং এ নিয়ে চলা মামলা নিয়ে তিনি ব্যক্তিগত কিছু কৌতূহল ও প্রশ্ন ব্যক্ত করতে পারেন কি-না। রতনলাল আবদুল্লাহ রূপ এবং বিনীত, সুন্দর ব্যবহারে রীতিমতো মুগ্ধ। সে বিলক্ষণ বুঝতে পারে নিজের নায়কোচিত চেহারা নিয়ে এতদিন মনের গোপনে যে গর্বটুকু ছিল, আবদুল্লাহ সাহেবকে দেখার পর সেটা গেছে। আবদুল্লাহর রূপবান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চেহারা সম্পর্কে একদিন নবনীতা তাকে কিছুটা বলেছিল বটে, তবে আসলে সামান্য আভাসই দিয়েছিল। পুরোটা সামনাসামনি দেখে রতনলাল বিস্মিত ও মুগ্ধ।

আবদুল্লাহ আহাদের প্রশ্ন শুনে রতনলাল বলে : সংকোচ না করে বলুন, আমি যেটুকু জানি আপনাকে বলব।

: আচ্ছা, নিম্নআদালত তো নবনীতার স্বামী কৈবল্যচরণকে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস দিয়েছিল, সরকার বাদী হওয়ায় বিষয়টার নিষ্পত্তি ওই রায়ের পরই হয়ে যাওয়ার কথা। মামলা উচ্চ আদালতে আপিল করেছিল কে বা কারা?

রতনলাল প্রশ্ন শুনে একটুখানি চুপ করে থাকে। তার কথায় মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল তো একই পাড়ার বাসিন্দা হিসাবে সায়েক উদ্দিন, তার বন্ধু। পেছনে থেকে উকিল নিয়োগ থেকে শুরু করে নানান জায়গায় তদবির করা ও টাকা-পয়সা দেওয়ার কাজটা সেই করছিল।

একটু চুপ করে থেকে রতনলাল বলে : ধরে নিন আরেকজনকে দিয়ে কাজটা আমিই করিয়েছি।

মৃদু হেসে আবদুল্লাহ বলেন : নবনীতাকে খুব ভালোবাসতেন বুঝি!

রতনলালও হাসে। বলে : সত্যি কথা বলতে গেলে একতরফা। নবনীতা হাত ধরার বাইরে সামান্য যেটুকু গিয়েছিল সেটা আমার চাপাচাপিতে...

আবদুল্লাহ আহাদ বলেন : চাকুর তিনটে ঘা খেয়ে নবনীতা কতক্ষণ বেঁচেছিল সে সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে?

হঠাৎ রতনলালের বুকে একটা হিম-শীতল এসে লাগে। তক্ষুনি বুঝতে পারে আবদুল্লাহ আহাদ নবনীতা হত্যাকাণ্ডে অনেক খোঁজ রাখে। অবশ্য তাকে ধরার তো কোনো উপায় নেই। পুলিশ গিয়ে হাতে-নাতে খুনিকে ধরে। রক্তাক্ত চাকুটা যে তার হাতেই ছিল।

: কৈবল্যচরণ?

: হ্যাঁ, নবনীতার স্বামী। শুনেছি লোকটা স্ত্রীকে খুব সন্দেহটন্দেহ করত!

: নবনীতা এ ব্যাপারে কোনোদিন কিছু বলেছে?

রতনলাল বলে : দেখুন স্যার, নবনীতাকে আমার খুব ভালো লাগত। তারপরও কেন ওর সাথে খানিকটা বন্ধুত্বের সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলাম সেটা নিয়তি জানে! আমার খুব কষ্ট হয়েছিল নবনীতার মতো সৎ, অপ্সরীর মতো সুন্দরী স্ত্রীকে তার অযোগ্য স্বামী হত্যা করেছে শুনে।

: কষ্ট হওয়ারই কথা। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো মিষ্টার রতনলাল, পুলিশ এত দ্রুত অকুস্থলে গিয়ে হাজির হলো কী করে!

হ্যাঁ, টাকা খাওয়া পুলিশকে রতনই ম্যানেজ করেছিল। বলেছিল আশপাশে তক্কে তক্কে থাকতে। দুপুরে বা সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরলে চাকুসহ কৈবল্যকে স্ত্রী হত্যার দায়ে গ্রেফতার করতে। তা রতনলালের জন্য বিষয়টা সৌভাগ্যই বলতে হবে। কেননা কৈবল্যচরণ সেদিন রতনলালের তড়িঘড়ি করে প্রস্থানের মিনিট বিশেকের মধ্যে বাসায় ফেরে। ব্যস, পুলিশ বাসায় ঢুকে হতভম্ব কৈবল্যকে ধরল। উচ্চ আদালতে বিষয়টা খুব গুরুত্ব দিয়েছে। মামলার শুনানি অবশ্য বেশ কয়েকবার হয়েছে। সেটা ধূর্ত সরকারি উকিলের পরামর্শে। লোকটা প্রমাণ করতে চাইছিল সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে কেসের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি করতে।

রতনলাল, আবদুল্লাহ আহাদের প্রশ্ন শুনে উত্তরে বলে : আশপাশের লোকজন নবনীতার মরণভেদী চিৎকার শুনে পুলিশে খবর দিয়ে থাকবে হয়তো। আমি এ রকমটা শুনেছি।

আবদুল্লাহ আহাদ প্রায় স্বগতোক্তি করার মতো করে বলে : নবনীতার মরণভেদী চিৎকার শুনে আশপাশের কেউ দেখতে গেল, খুনি ধরতে গেল পুলিশ। তাও খুনের আধ ঘণ্টা পর, কৈবল্যচরণ যখন দুপুরে খেতে বাসায় ফেরার পরপরই।

বলে মন জুড়ানো হাসিটা হাসে বিনীত, ভদ্র মেজাজ ও রূপবান লোকটা। একটু হেসে বলে : নবনীতা আমার ও আমার স্ত্রীর বন্ধু ছিল কি-না। আপনার মতো আমরা ঘটনাটা খবরের কাগজে পড়ে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।

রতনলালের চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। কোনোমতে সেটা সামাল দিয়ে বলে : যা হওয়ার তো হয়েই গেছে... আমাদের তো কিছু করার ছিল না।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে বিদায় নেন কলকাতার বাংলাদেশস্থ উপ-হাইকমিশনার। সেই রাতেই বৈঠক বসেছিল আবদুল্লাহ আহাদের বাসায় নিরঞ্জন ঘোষ আর অমূল্য পাল মিলে। মানিক চৌধুরী নামে কোনো ব্যক্তি বা তার পূর্বপুরুষের অস্তিত্ব যে কোনোকালে ঝিনাইদহে দুর্গাপুর থানায় কখনও ছিল নামেই সরকারি প্রমাণ-পত্রসহ আরও কিছু যুক্তগ্রাহ্য প্রশ্ন নিয়ে তিনজনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। রিভিউ মঞ্জুর হওয়ার পেছনে নিরঞ্জন ঘোষ ও অমূল্য পালের পাশাপাশি মানিক চৌধুরীর অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ-পত্র, মৃত্যু-মুহূর্তে নবনীতার ফোনে খুব কষ্ট করে, আবদুল্লাহকে হত্যাকারীর নাম বলে যাওয়া য়ার রেকর্ড আবদুল্লাহর মোবাইলে রয়েছে। মেডিকেল রিপোর্টে নবনীতার প্রায় ঘণ্টাখানেক মৃত্যুযন্ত্রণা ছটফট করে মরার পরও পুলিশ প্রতিবেশীদের কৈবল্যর বাসায় ঢুকতে দেয়নি, পুলিশ যা করেছে তা হলো কৈবল্যচরণ বাসায় ঢোকার পর তারা ভেতরে ঢুকে কৈবল্যকে চাকু হাতে দাঁড়াতে বাধ্য করে এবং পুলিশ ফটো তুলে রাখে। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এসব বিষয়সহ আরও কিছু অর্থবহ ঘটনা ও আলামত।

রিভিউর শুনানিতে আবদুল্লাহ আহাদের মোবাইলে নবনীতার কণ্ঠস্বর ছিল ঘরঘরে, অস্পষ্ট। শুধু স্পষ্ট শোনা যায় ঘোষ শব্দটি। রতনলাল হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে সন্দেহের তালিকায় স্থান নেয়। রক্ষা পায়। তবে কৈবল্যচরণ যে স্ত্রী নবনীতার হত্যাকারী নয়, তা আদালতের রায়ে দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

আট

কৈবল্যর শরীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো এখন। তার গোটা দুই সিদ্ধান্তও ময়না মেম্বার আশু পালকে খুব খুশি করতে না পারলেও খুব বেজারও করেনি। প্রথম সিদ্ধান্ত ভিটেবাড়ি, পুকুর, বাগানসহ বাড়ির আশপাশের পাঁচ একরের মতো জমি সে বেচবে কি বেচবে না, সেটা তার ব্যাপার। দরকার মনে করলে পুরনো ভৃত্য ভুলু তো আছেই, চাই কী এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা মহাজন বাড়ির দু'চারজন আত্মীয়স্বজনকে বাড়ি নিয়ে এসে বসাতে পারে কৈবল্য। বাড়ি বলে কথা। দেশ বলে কথা। কৈবল্য তো দুই দেশেরই বাসিন্দা। ভিটে-বাড়ি ও দেশের দাবি সে ছাড়বে না। কখনও না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, দূরের জমিগুলো আপাতত মধু পাল এবং তার স্যাঙাৎ ময়না মেম্বার মিলে ভোগ-দখল করতে থাকুক। বছর খানেকের মধ্যে দেশে অর্থাৎ ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে ফেরার আশা রাখে কৈবল্য। তখন কিছু দরদাম ঠিক হলে জমিগুলো আর কারও কাছে নয়, আশু পাল এবং ময়না মেম্বারের কাছে বিক্কিরি করা হবে।

আরও একটা ব্যাপার আছে। এক রকমের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তই বলা যেতে পারে। নিমপুরে বা ধরা যাক তেত্রিশপাড়া গ্রামে, তার বাড়ি তো খালি। ঘর-সংসার বলতে কিছু নেই। হ্যাঁ, মধ্য চল্লিশের কিছু পরে এই বয়সে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো যায়। কিন্তু মন যে তেমন আর সাড়া দেয় না। দশ-এগারো বছর তো তীর্থে তীর্থে এমন করে কেটেছিল তার। এর মধ্যে শরীরটা একেবারে ছিবড়ে হয়ে, নানা রোগে জর্জর হয়ে তাকে ধর্ম-পালনের তেমন সন্তুষ্টি বা প্রশান্তি দিতে পারেনি। হতে পারে সে যে পাপী, এটা তারই প্রতিফলন।

কৈবল্য আরও ভাবে নিঃসঙ্গতা মানুষের ভারি এক শত্রু। তার হাত থেকে পরিত্রাণের যে উপায়, সেও তো ঈশ্বরেরই নির্দেশ? না, কি? ঈশ্বর সাধনা অবশ্যই। সংসার করাও ধর্মবিরোধী বা অশৈলী কিছু নয়। নবনীতা সংসারে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। চিরকাল। যতদিন কৈবল্য বেঁচে আছে।'

তারপরও তো কিছু কথা থেকে যায়। কিছু অপূর্ণতা যা বুকের ভেতরটা খোঁচায়। কামিনী? হতে পারে। নাও হতে পারে।

এসব ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই একদিন কৈবল্য তার পিসি নিভাননীকে বলে : আমার তো নিমপুরে একবার যাতি হবে। ভাবছিলাম কী, সাথে তোমাদেরও নিই যাই।

পিসি তিরিক্কি মেজাজের মানুষ। তিনি বলেন : তোমাদের মানিটা কী হয়! আমাকে তো তুই নিই যাবি! বহুবার করেছিস। তা আর কে? আর কারা? কামিনী?

এই বয়সেও কৈবল্যকে ভারি লজ্জিত হতে দেখা গেল। কোনো রকমে বলে : তা ধরো গিয়ে সেরকমই হয়। তোমার আমার সাথে যাতি সে রাজি হবে?

পিসি এবার থোবড়া গালে একটু হাসে। বলে যে এমনি এমনি তো নিয়ে যাওয়া যাবে না। ধর্মসাক্ষী রেখে বিয়ের বিধি-ব্যবস্থা তাহলে করতে হয়। সেটা কোনো সমস্যা নয়। তবে কামিনীকে তো একটু জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। সেটা কৈবল্যই করে দেখুক না...

কৈবল্য এবারও লজ্জিত। বিব্রত। এরই মধ্যে একদিন সে কামিনীকে, কে জানে কী তাড়নায়, কী পিপাসায় জড়িয়ে ধরেছিল। কামিনীর চোখে কী রকম একটা ব্যথা-ভরা উদ্ভাস ফুটে ওঠেছিল। জড়িয়ে ধরে কামিনীর রক্ত-সূত্রের গুচ্ছের হালকা কালচে ঠোঁটে কৈবল্য চুমুই খেতে চেয়েছিল বৈকি। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে কৈবল্যর শিথিল আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। ঘর থেকে বার হয়ে গিয়েছিল তক্ষুনি।

বিবেক নাকি ধর্মীয় বিধি-নিষেধের একটা পাপ ভাবনার ধাক্কা বুকের গহিন ভেতরে কৈবল্য খেয়েছিল বৈকি। লজ্জা পেয়েছিল। মেয়েটা গত চার-পাঁচ মাসে এতো যত্ন-আত্তি করেছে, রান্নাবান্না করে খাইয়েছে, শারীরিক দুর্বলতার সময় কৈবল্যকে ধরে ধরে পদ্ম পুকুরের ধারে, কাছে বাগানের এখানে-ওখানে নিয়ে গেছে আর প্রতিদানে কৈবল্য এমন আচরণটা করল কামিনীর সাথে!

আবার এমন হয়েছে, শরীর বেশ খানিকটা ভালো হওয়ার পরও কামিনী শায়িত কৈবল্যর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে পিসির তৈরি ভেষজ রস খাইয়েছে। ঝুঁকে পড়ার কারণেই সম্ভবত কামিনীর ভরা বুকের কোমল-কঠিন স্পর্শ লেগেছে কৈবল্যর শরীরে। এসবে এতটুকু কোন সংকোচ কামিনীর মধ্যে দেখা যায়নি।

নারীর এক রকম কিছু আচরণগত এবং স্বভাবজাত রহস্য আছে, যা কৈবল্যর মতো অতি সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দায়। নবনীতা কি কম রহস্যময়ী ছিল। কৈবল্য দেহ-প্রাণ সর্বস্ব গিয়ে বেশ পরিষ্কার বুঝত স্ত্রী তাকে ভালোবাসে। মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার সব ক'টি নিবেদন ও লক্ষণ নবনীতার মধ্যে কৈবল্য পেয়েছে। তারপরও প্রথমে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ, পরে মৃদু আপসকামিতা, তারও পরে সামান্য বন্ধুত্ব– রতনলালের সাথে বন্ধুত্ব দিন দিন যেন-বা গাঢ়তর হওয়ার আভাস পেয়ে কৈবল্য ভেতরে ভেতরে অনেক সময়ই একটা চাপা দেওয়া বিভ্রান্তিতে ভুগেছে। আবার নিমপুর ছেড়ে কলকাতা কিংবা মহানগরীর আশপাশে কোথাও নবনীতার পালাবার আগ্রহ কৈবল্যকে আশ্বস্তও করেছে। তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়ায়!

নারী রহস্যময়ী। জীবন কখনও মধুর, কখনও তিক্ত। জীবন কখনও নির্বিবাদে বয়ে চলে সুখ-দুঃখের তরঙ্গ-লীলার মধ্য দিয়ে। কখনও জীবন আনন্দ, কখনও কণ্টকময়।

এতোদিনে কৈবল্য বুঝেছে জীবনের ও নারীর এই

রহস্যময়তা, তার মাধুর্য ও তিক্ততা মেনেই জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে হবে। যদি দ্যাখে নিমপুর, কলকাতার আশপাশ কিংবা ইন্ডিয়ায় বসবাস করা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, তার ও তার চৌদ্দপুরুষের দেশ তো আছে, বাংলাদেশ, আছে তেত্রিশপাড়া গ্রামের মহাজনবাড়ি– কৈবল্য চলে আসবে সেখানে। মানুষকে তার জন্মের দায় ও ঋণ শোধ করতেই হয়। সেও করবে।

নতুনভাবে জীবন শুরু করতে একটা সঙ্গিনী চাই। সে হিসেবে কামিনী মন্দ কী?

হ্যাঁ, কৈবল্য কামিনীর কিছু কিছু পতন-স্খলনের কথা জানে বৈকি। তাতে কামিনীর গ্রহণযোগ্যতা তার কাছে কিছু কম নম্বর পায় না। বিধবা কামিনীর অতীতে যা-ই হয়ে থাকুক। অতি-বর্তমানের কামিনীর ডানা মেলা দুই ভুরুর নিচে পাপড়ি ঘেরা দুটি চোখের সততা ও গভীরতা স্পষ্টই কামিনীর মূল পরিচয়টি তুলে ধরে। অতি প্রতিকূলতায়ও যে নারী তার স্বভাব-মাধুর্য হারায় না, কামিনী যে বহুলাংশে সেই নারী তা তার চলাফেরা, মৃদু কথন এবং চোখের ভাবই পরিষ্কারই বলে দ্যায়।

কথাটা তা নয়। কৈবল্যর কাছে কামিনী গ্রহণযোগ্যতার ভালো নম্বর পেয়ে বসে আছে বহু আগে। কিন্তু কথাটা কামিনীকে

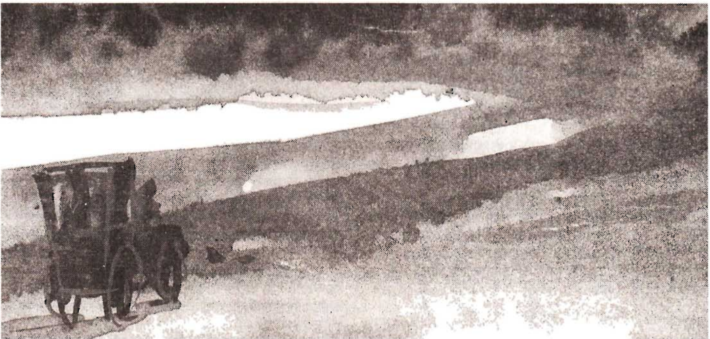
একটু বেশি তাড়িত হন আশির কাছাকাছি বয়সের বৃদ্ধা পিসি। গ্রামে এ রকম একা ও নিঃসঙ্গ থাকতে একেবারেই ভালো লাগে না তার। ভয় প্রতিটি মুহূর্তে। ডাকাতির ভয়। বাপের কাছে বন্ধকি দলিলপত্র, জমি-জমার পর্চা কাগজপত্র। আর কেউ না হোক, আশু এবং সেসূত্রে ময়না তো এসবের খবরাখবর জানে! ভয় হয়। প্রতি মুহূর্তে ভয়।

পিসি তার শেষ ঐহিক ভরসা ভাইপোর এ রকম পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টা একেবারেই মেনে নিতে পারেন না। কৈবল্য বাড়ি ফেরার পর এই ক'টা মাস বড় ভালো কাটছিল। পোড়া কপালীর কি কোনো দিন সুখ মেলে।

কামিনীর ঠোঁটে একটা ম্লান হাসি খেলে গিয়েছিল। কী ভুলই সে করেছিল ঘর-সংসারের স্বপ্ন। নিজেকে সামলে নিতে তার দেরি হয়। বন্ধুর মতো ননদিনীর ভাগ্যে প্রায় সব পেয়ে শেষে সব হারানোর ঘটনাটা তাকে বেশ কিছুটা দুঃখকাতর করে তুলেছে।

কামিনী বলে : আহা, আমার সাথে তার লিখিত বা অলিখিত কোনো সম্পর্ক তো ছেল। লোকটা কাউকে কিছু না জানাইয়ি আসিছেন, বলেও গেল কাউকে নাজানায়। তাকে দোষটা কোথায় দেবা বৌদি...

কামিনীর কথা শুনে পিত্ত জ্বলে যায় বিভার। সে চটেমটে



বলে কে। প্রশ্ন হলো সেটা। কৈবল্য দু'একদিনের মধ্যে নিমপুরে যেতে চায়।

পিসি আর কামিনীকে নিয়ে গেলে ভালো হয়। ছেলে অমূল্যর সঙ্গে তো তার দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা বলতে হয়, আলোচনা করতে হয়। তারপর না হয়, নিমপুরে বা দেশে তেত্রিশপাড়ায় ফিরে এসে কাজটা সেরে ফেলত।

পিসিকে কথাটা বলল বটে। বলার পর কৈবল্য বাস্তবটা ভালো বুঝতে পারছে। তার নিমপুরে জরুরি মোকাবেলার একটা কাজ পড়ে আছে। রতনলাল। শক্তিশালী লোক। বিশাল বড়লোক, তার ওপর সে যে মাস্তান-বাহিনী পোষে সে তো প্রায় সবারই জানা। কিন্তু তা হোক মোকাবেলা কৈবল্য করবেই রতনলালের সাথে! ঈশ্বরের শপথ! নবনীতার শপথ!

তাহলে?

নয়

মহাজনবাড়ির কৈবল্য রাতে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কাউকে কিছু না বলে।

কৈবল্যর অসুস্থ শরীর নিয়ে গ্রামে ফেরাটা সেদিন গ্রামের সবচেয়ে বড় খবর ও ঘটনা ছিল। তার হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াটা এলাকায় এক ধরনের ক্ষোভ ও বিস্ময় সৃষ্টি করে।

বলে : তুই চুপ কর। একটা কথাও কবি না। সব দোষ হলো ঐ লোকটার। একটা যুবতী মাইয়াকে দিল কিনা পিশাচ-বাড়ির কু'জাত ছেলের দিন-রাত যত্ন-আত্তি করতে।

ঐ লোকটা, আশু পাল, তখন ঘরের দাওয়ায় উঁচু পিঁড়ির ওপর বসে খেলো হুকায় ঘনঘন টান দিয়ে ঘুড়ুক ঘুড়ুক শব্দ তুলছিল আর রাশি রাশি সাদা ধোঁয়া উড়াচ্ছিল। তাকে খুব একটা চিন্তিত কিংবা অসন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছিল না।

সে বরং আনমনে অপেক্ষা করছিল বাড়ির বাইরে ময়না মেম্বারের ডাক শুনতে। কৈবল্যর কাউকে কিছু না বলে যাওয়ার কারণে চিন্তান্বিত এবং হতাশ হওয়ার কথা তারই।

কৈবল্য অবশ্য রাতে চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মোটেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল না। সে হাঁটা পথে প্রথমে গেল থানা-বাজারে। মাইলতিনেক পথ হাঁটতে তার খানিকটা যে কষ্ট হয়নি, তা মেনে নেয়। তবে বাড়ি থেকে লুকিয়ে-পালিয়ে আসতে পেরে সে স্বস্তিবোধ করছে। রতনলাল তার জীবনের শেষ মোকাবেলা। প্রমাণের অভাবে কৈবল্য এবং রতনলাল দু'জনই মামলায় দায় থেকে খালাস পেয়েছে বটে। তবে তীর্থে বেরিয়ে পড়ার আগে ও তীর্থ থেকে নিমপুরে দিন দুই থেকে সে বুঝতে পেরেছে নবনীতার খুনি কে হতে পারে। নিমপুরের কিছু কিছু লোকের এটা ধারণা বটে, কৈবল্য একেবারে নিশ্চিত।

নবনীতার ঘাতক রতনলালই। নবনীতা প্রায় ঘণ্টাখানেক মেঝেয় পড়েছিল রক্তাক্ত শরীরে। পাশে পড়েছিল তার প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী মোবাইলটা। শেষ ফোনটা নবনীতা করেছিল কুষ্টিয়ায় তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের আবদুল্লাহ আহাদকে। সেটা তো জানা গিয়েছিল আদালতে রিভিউ শোনানির সময়। তবে কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার আবদুল্লাহ আহাদের মোবাইলে নবনীতা বলার কথার মধ্যে 'পাল' শব্দটি না থাকায় কৈবল্যর মামলার দায় থেকে সেটা উল্লেখযোগ্য রকম সাহায্য করেছে। যদি শুধু সন্দেহজনিত কারণে কাউকে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা যায় না বিধায় রতনালালকেও দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে কৈবল্য বুঝেছিল রতনলাল নবনীতার হত্যাকারী হলেও হতে পারে।

নবনীতার রক্তাক্ত দেহ প্রায় ঘণ্টাখানেক পড়েছিল মেঝেয়। মর্গ-রিপোর্টে সে রকম একটা বিশেষজ্ঞ মতই ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কোনো একটা সময়ে অবিকল রক্তক্ষরণ ও চাকুর উপর্যুপরি আঘাতের যন্ত্রণায় হতভাগিনীর মৃত্যু হয়ে থাকবে। নবনীতার মৃতদেহের পাশে পড়েছিল তার প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী মোবাইল সেটটি।

নবনীতা কৈবল্যকে ফোন করার বদলে কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার আবদুল্লাহ আহাদকে ফোন করেছিল কেন, এ নিয়ে আদালতে বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছিল। পরে নবনীতার কললিস্ট পরীক্ষার আগে মোবাইলে তার সাথে শেষ কথা হয় আবদুল্লাহ আহাদের সাথে। রিপিট পয়েন্টে চাপ দিলেই তাকে পাওয়া মনে করে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করা নবনীতা তাকেই হত্যাকারীর নামটা বলেছিল। নবনীতার জড়িয়ে বলা শব্দ ছিল অস্পষ্ট। একটু স্পষ্ট করে শুধু পাওয়া গিয়েছিল 'ঘোষ' শব্দটি।

তবে রতনলাল হত্যাকারী হতে পারে সেটা কৈবল্য বুঝেছিল একটু অন্যভাবে। নবনীতার হত্যাকাণ্ডের পর ঘণ্টাখানেক পর যে বাসায় ঢোকে। গেট ছিল খোলা যা সাধারণভাবে হওয়ার কথা নয়। তখনই কৈবল্য যেন অস্বাভাবিক কিছু আঁচ করেছিল। শোবার ঘরে সে দেখতে পায় বুকে চাকু বসানো নবনীতার রক্তাক্ত দেহ।

শোবার ঘরে ঢুকে কৈবল্য একটা মিহি, খুবই মিহি এসেন্সের গন্ধ পায়। এই ধরনের এসেন্স নবনীতা ব্যবহার করত না। সেটা নবনীতার শাড়ি-জামা শুঁকে সহজেই সে বুঝে গিয়েছিল। এই এসেন্স ব্যবহারকারী যে, সে-ই নবনীতার হত্যাকারী, তেমন কথা বলা যেতেই পারে। দুঃখের বিষয় কৈবল্যর বলা এসেন্সের এই বিষয়টি সরকারি উকিলের আপত্তির কারণে এবং নিরঞ্জন ঘোষ ও অমূল্য পালের পাল্টা যুক্তি আদালত গ্রহণ করা না করায় কৈবল্যর বক্তব্য কোনো মূল্য পায়নি।

না পাক। কিন্তু কৈবল্য তো মিহি এসেন্সের গন্ধটা শুঁকেছিল। সেটা সে ভোলে কী করে। রতনলাল তার জামায় এই এসেন্স মাখে কি-না জেনে নিক্ষিপ্ত হয়ে সেটা সে জানবে কীভাবে!

তবে রতনলালকে তার সন্দেহ। কৈবল্য নিশ্চিত নবনীতা ও রতনলালের মধ্যে এমন কিছু একটা ঘটেছিল যে কারণে নবনীতাকে চিরতরে সরিয়ে দিতে রতনলাল নিজে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

রতনলাল যে কৈবল্যর বাসায় যায়, গোপনেই তো বলা যায়, সেটা তার জানা ছিল না, নবনীতা কিছু বলেনি তাকে সে সম্পর্কে। নবনীতা যা যা ঘটে তা সব বলত কৈবল্যকে। বলে যেন একটা গুরু দায়ভার থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, সে রকমটা একটা সততা নাকি ধূর্তটার উদ্ভাস ফুটে উঠত চোখেমুখে।

সব ঘটনা খুলে বলা নবনীতা রতনলালের গোপনে কৈবল্যর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাসায় আসার বিষয়টা আড়াল করে রাখার রহস্যটা কী?

কৈবল্য জানে না। নবনীতার সরল, সুন্দর স্বভাবের স্মৃতিই বুকে গেঁথে আছে কৈবল্যর। স্বর্গের অপ্সরীদের তো সৎ বা সতী থাকার উপায় নেই। স্বর্গে তো তাদের নিয়ে দেবতাদের লীলাখেলা চলেই, আবার মর্তের কোনো মুনি-ঋষির কামাগ্নিতে পড়লে সেখানেও অপ্সরাকে বিধাতার বিধানে আত্মদান, তথা দেহদান করতে হয়।

কৈবল্যর নবনীতা এ রকম ছিল না। কৈবল্য ছিল শুধু তার। নবনীতা ছিল শুধু কৈবল্যর।

ভিসা পেতে দিনকয় সময় হয়। গোপনে আশু পালকে দিয়ে অদূরবর্তী নদীর ধারে কিছু জমি বিক্রি করে হাজার কয়েক টাকা পায় কৈবল্য। সেই টাকা তাকে সাহায্য করে কয়েকটা দিন ঢাকা শহরে বিমান বন্দরের নিকটে একটি কম মানের তবে পরিচ্ছন্ন ও গাছপালার ভেতর তুলনামূলক নির্জন হোটেলে বাস করতে। জন্মভূমি দেশটা ক্রমেই যে বহু যুগের অন্তহীন দরিদ্র দশা কাটিয়ে, ক্রমে নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ ও নানামুখী উন্নয়নের ধারায় উঠে যাচ্ছে, তা দু'চোখ ভরে দেখতে।

মাইগ্রেশন করে দেশ ছেড়ে যারা ভিন্নদেশে যায়, তাদের মধ্যে কমপক্ষে দু-পুরুষ পর্যন্ত একটা হাহাকার ভরা দেশ-কাতরতা থাকে। হয়তো ঘটা করে সেটা প্রকাশ করার উপায় থাকে না মাইগ্রেট করা এই রকম মানুষ। তবে কষ্টটা থাকে মনের গহিনে লুকিয়ে। স্মৃতি হয়ে ওঠে দীর্ঘ শ্বাসময়।

কৈবল্যর বাবা-মা, আরও কিছু আত্মীয়স্বজন যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে আগে দেশ-ত্যাগ করে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিলেন। আগে থেকে কেনা বাড়ি ছিল পশ্চিম দিনাজপুরেই, নিমপুর থেকে বিশ-বাইশ মাইল দূরে। প্রথম পুরুষের লোকেরা দেশ-ত্যাগের জ্বালায় কী রকম যে ভুগত, তা কৈবল্য নিজেই দেখেছে। দেশ-ছাড়ার অন্তর্জ্বালা তার মধ্যেই কি কিছু কম আছে। তার ধারণা অমূল্য পালের স্মৃতিকাতরতা থাকবে না বাংলাদেশ নামে পূর্বপুরুষের দেশটার জন্য। এর পরও রক্তে আছে, শেকড়ের প্রতি একটা টান এমনকি অমূল্যকে ছাড়িয়ে পরবর্তী প্রজন্মেও ছড়াবে।

সে এবার বাসে চেপে পূর্ব দিনাজপুর-চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত পার হয়ে ইন্ডিয়ায় গেল। প্রথম গেল দিনাজপুর জেলা শহরে, সেখানে নবনীতার বড় ভাই নিরঞ্জন ঘোষ পরিবার-পরিজন নিয়ে বাস করেন। অমূল্য সেই ছ'বছর বয়সের পর থেকেই এই পরিবারের অচ্ছেদ্য অংশ। মামার ল'ফার্মেই আছে, বছরে ছ'মাস ন'বাস কার্যোপলক্ষে তাদের কাটে কলকাতায় তবে দেশের বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা এই শহর পশ্চিম দিনাজপুর।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শহরের কারাগারে থাকতে হয়েছিল। নিরঞ্জন ঘোষ আর অমূল্য নিম্ন আদালত থেকে জেলা আদালত হয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত বিবাদী অর্থাৎ কৈবল্য চরণের জন্য আইন যুদ্ধ করে গেছেন। বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনার আবদুল্লাহ মূর্তিমান আশীর্বাদের মতোই যথাসময় নিজের কর্তব্য মনে করে নিরঞ্জন ঘোষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মানিক চৌধুরী যে ভুয়া, মৃত্যু-মুহূর্তে আবদুল্লাহ আহাদের রেকর্ড করা মোবাইলে 'ঘোষ' শব্দটা যে কোনোভাবেই হত্যাকারী হিসেবে কৈবল্য পালকে বোঝায় না, আর মৃত্যু-মুহূর্তে মানুষ যে সবচেয়ে জরুরি কথাটাই বলে যায়,– এইসব বিষয় মহামান্য আদালত খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।

নিরঞ্জন ঘোষের প্রতি কৈবল্যর শ্রদ্ধা বরাবরই। সব বাধা-বিপদ কাটিয়ে অমূল্যর হয়ে ওঠাটা তারই কারণে। কৈবল্য চিরঋণী তার কাছে।

দিন দুই কাটিয়ে সে গেল কলকাতা। রতনলালের সাথে তার মোকাবেলায় কী হয়, তা কে জানে। খুনির পক্ষে আর একটা খুন করা বিচিত্র নয়। কলকাতা গিয়ে সে দেখা করে মহাজাঁক-চমক নিয়ে বিশাল অফিসের বড় কর্তা হয়ে আবদুল্লাহ আহাদের সাথে।

কথা আর কী। করজোরে আবদুল্লাহ সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কৈবল্য। কথাবার্তা বলার এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ আহাদ জানান নবনীতার সাথে তার কথা হয়েছে দু'চারবার। নিয়মিত কথা বলত সে বাল্য-বন্ধু, আবদুল্লাহর স্ত্রী মুর্শিদা বানুর সাথে। রতনলাল নামে বড়লোকের এক বখাটে ছেলের উৎপাত সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা হতো দুই বান্ধবীর মধ্যে। নবনীতা এও নাকি বলত ছেলেটা এমনিতে ভদ্র। তবে

মাথায় ছিট-টিট আছে বোধ হয়। তা নইলে স্বামী-ছেলের সংসারী সুখী এক বিবাহিতা নারীকে জন্ম-জন্মান্তরের বৃলে ভাবে। মুর্শিদা বানু এবং আবদুল্লাহ আহাদ নিজেও নিমপুর থেকে কলকাতায় কিংবা কলকাতার উপকণ্ঠে কোথাও চলে যেতে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

কলকাতায় বাংলাদেশের মাননীয় উপ-হাইকমিশনার তাকে সহৃদয় কথাবার্তা বলেছেন, চা খাইয়ে আপ্যায়ন করেছেন, মনে মনে এই সম্মানটুকু নিয়ে, উপ-হাইকমিশনারকে অন্তর-ঢালা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিমপুরে ফিরে আসে কৈবল্য।

তালা খুলে বহুদিন পরিত্যক্ত ও অবহেলিত একটা বাড়িতে ঢুকে কৈবল্য যেন নবনীতার সাজানো সংসারে ফিরে এলো। এ রকম একটা অদম্য আবেগ তাকে হৃদয়ের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা একটা উত্তপ্ত ভালোবাসার সন্ধান দিল।

কাজের মাসিকে খবর দিতে সে নিজেই গেল। তখন চারদিকে শীতের মিষ্টি ছড়িয়ে আছে। গোপন আনন্দের ধারাস্রোতে স্নাত ঝিলমিল করছে। কিছু মানুষ রিকশায় চরে যাওয়া কৈবল্যকে দেখল বৈকি। কৈবল্য তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না।

কাজের মাসি এসে ঘর-দুয়ার যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে। বিকেল ছাড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। রান্না করা খাবার টেবিলে বাসন-চাপা দিয়ে রেখে মাসি চলে যায় প্রায় নিঃশব্দে।

খেয়েদেয়ে মশারি ছাড়াই বিছানায় শুয়ে বহুদিন পর ভারি আরামের একটা ঘুম দেয় কৈবল্য।

আগামীকাল থেকে তার মোকাবেলা।

দশ

সকাল সাড়ে আটটার দিকে কৈবল্যর বহুদিন প্রায় নীরব-নিস্তব্ধ থাকা মোবাইলটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে।

ফোন ধরে বিছানা ও ঘুম থেকে সবে উঠে পড়ে কৈবল্য। আশ্চর্য। বিশ্বাস করা যায় না। শিশিরদা। বলতে গেলে ছোট শহরের সবচেয়ে শক্তিশালী লোক। রতনলালের ঘনিষ্ঠ বাল্যবন্ধু।

শিশিরদা বলে : তুই ফিরেছিস, খবরটা খুব রটেছে। রতনলালও জানে। সে তো তোকে পেলে চিবিয়ে খায়।

ভারি অবাক ও মুগ্ধ করা কিছু কথা কৈবল্যকে বললেন শিশিরদা। শহরে আর একটা খুন-খারাপি কিছু ঘটুক তা তিনি আদৌ চান না। কথা আছে। কৈবল্য যেন তৈরি থাকে। যে কোনো সময় তার লোক কৈবল্যকে আনতে যাবে। মানুষের বাঁচা-মরা প্রশ্নে একজন সচেতন নাগরিক এবং ক্ষমতাসীন সরকারি দলের দায়িত্ববান রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কৈবল্য ও রতনলাল, উভয়ের মঙ্গল দেখা তার কর্তব্য।

শেষের কথাগুলো একটু মনমরা করে তোলে কৈবল্যকে। রতনলাল শিশির কুমার ভট্টাচার্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাল্য-বন্ধু। বন্ধু হিসেবে শিশিরদার তো রতনলালকেই দেখার কথা! কৈবল্য চরণ তো নিতান্তই যাকে বলে শুদ্ধ এক পরিচিত লোক।

তাহলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা। মরুক, বাঁচুক, কৈবল্য তো চায় সামনাসামনি রতনলালকে মোকাবেলা করতে। না, মারামারি ধরনের কিছুতে যাওয়ার ইচ্ছে তার নয়। সে শুধু জিজ্ঞেস করবে রতনলালকে নিজের ভেতরে জমে থাকা কিছু প্রশ্ন। হয়তো ক্ষোভ মিশিয়ে, ঘৃণা মিশিয়ে। কিংবা হয়তো স্বাভাবিকভাবে।

এগারোটার দিকে কালো গাড়িতে চেপে একটা ছাত্র বয়সের এসে তাকে নিয়ে গেল শিশির ভট্টাচার্যের বাসায়। অফিসে ম্যালা লোকজনের মধ্যে শিশিরদা। শিশিরদা বললেন কৈবল্যকে নিয়ে ভেতরের একটা ঘরে বসাতে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এসে গেলেন শিশির ভট্টাচার্য। বয়স তো কম হয়নি। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ তো হবেই। বেশি হওয়া বিচিত্র নয়। তবে দেখায় তিরিশের মজবুত শরীরের যুবকের মতো।

ঘর বন্ধ করে শিশিরদা মুখোমুখি হয়ে বসেন। বলেন : তুমি নাকি নিমপুরে এসেছ রতনলালকে নিজ হাতে মারবে বলে?

নিস্পৃহ গলায় কৈবল্য বলে : মারব কেন! তবে আমি রতনলালের মুখোমুখি একটা মোকাবেলা করতে চাই। ও যদি হিংস্র না হয়ে ওঠে তাহলে আমিও শান্ত থাকব।

শিশিরদা কেন যেন একটু মুচকে হাসেন। বলেন : একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেছে তোমার নিমপুরে আসার পরই। রতনলাল এতদিন মুখিয়ে ছিল তোমাকে পাওয়া মাত্র ছুরি, চাক্কু, পিস্তল, যে অস্ত্র দিয়ে পারা যায়, তোমাকে মারবে। তাতে ফাঁসি হলেও সে রাজি... । ... কিন্তু এখন?

কৈবল্য বলে : এখন?

: অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেছে। এখন সে তোমার ভয়ে কাবু। না, রতনলাল তার স্বভাবের ডিগনিটি হারায়নি। সে এখনও বিশ্বাস করে, বলে নবনীতার তুমি ভুল স্বামী। বলে নবনীতার তার জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়া। তবে নবনীতার ভুল স্বামী, ঐ শুয়োরের বাচ্চা, কৈবল্যের হাতে খুন হওয়ার চেয়ে বরং হত্যার স্বীকারোক্তি দিয়ে কোনো আদালতে আত্মসমর্পণ করা ভালো। যার যত বছর সাজা হয় হোক, যাবজ্জীবনের বেশি না হয়। এটা আমার মানে বাল্যবন্ধু শিশিরের কাছে রতনলালের অনুরোধ...

কৈবল্য বলে : তাকে বলুন শিশিরদা, তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি...

শিশির ভট্টাচার্য বলেন : রতনলাল জেলে গেছে, অন্তত সাত-আটটা মাস জেলে থাকলে আমারও যে লাভ আছে। কৈবল্য রতনলালকে হত্যা করতে আসছে, এই আতঙ্কের ক্ষেত্র তো আমিই তৈরি করেছি কি-না ...

একটু থেমে বলেন : রাজনীতি করি, বুঝলে তো। দয়া-মায়া, বন্ধুত্ব, মূল্যবোধ এসব মাঝে মধ্যে একপাশে সরিয়ে রাজনীতি বলো, ব্যক্তিগত বলো, স্বার্থ আদায় করতে হয়।

আশ্চর্য নিস্পৃহতার মধ্যে শিশির ভট্টাচার্য আরও জানায় বউটা মানে রতনলালের স্ত্রী অনেক আগে থেকে তার হাতের মুঠোয়। লীলাখেলা সাত দিনে দশ দিনে একবার হয়। ভালোভাবেই হয়। রতনলাল বিছানায় প্রতিবার মিলনে ময়ূরীর নারীত্ব অপমান করত। নবনীতার নাম ধরে তার আহা-উহু, চিৎকার ও আনন্দ প্রকাশ নবনীতাকেও অপমান করা। না কী? ময়ূরী তার শোধ তোলে শিশিরের সাথে বন্ধুত্ব ও মাঝে মধ্যে একান্তে সময় কাটিয়ে। রতনলালের ম্যালা টাকা-পয়সা ময়ূরীর হাত হয়ে তার কাছে আসে। তা খুনিটা যদি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে আদালতে নিজেকে সারেন্ডার করে তাহলে ইহজগতের কার্যোদ্ধার বেশ খানিকটা হয়ে যায়।

কৈবল্য বলে : আপনার প্ল্যান আপনার। আমার আপত্তি নেই। তা আদালতে সারেন্ডার করার আগে রতনলালের সাথে আমার কি একটু দেখা হতে পারে না?

না বললেন শিশির। খুন হওয়ার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত রতনলাল আগামীকালই কোর্টে সারেন্ডার করবে। কৈবল্যর বাগড়া দেওয়া ঠিক হবে না।

কৈবল্যর জন্যও শিশির ভট্টাচার্যের একটা পরিকল্পনা আছে। সরল পরিকল্পনা। মাসখানেকের মধ্যে বাড়ি ও দোকান বিককিরি করে নিমপুর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। এটাই ফাইনাল। নাটকের বা খেলার শেষ ও চূড়ান্ত।

মন খারাপের একটা বুক চিনচিন করা ব্যথা নিয়ে বাসায় ফেরে। আবার মাঝে মধ্যে খুশিও হয়।

এখন শুধু পশ্চিম দিনাজপুর শহরে যাওয়া। কামিনীর ব্যাপারে সবার সাথে কথা বলা।

বিড়বিড় করে কৈবল্য আপন মনে বলে : এটা ইহজগৎ। সুখ-দুঃখের ছোট-বড় তরঙ্গে জীবন-নৌকা দুলছে। ক্ষমা করো নবনীতা।

নবনীতা তোমাকে ভালোবাসতো ঐ পাগলটা। রতনলাল। ওকে ক্ষমা করে দিও। ভালোবাসা কী যে বিপজ্জনক। কী যে সুখ। বেদনা।

নবনীতা। প্রিয় নবনীতা। আমৃত্যু ভালোবেসে যাব তোমাকে। আমাকে ও কামিনীকে ক্ষমা করো। ❖

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিনায়ক সেন

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিদেশি বন্ধুরা



নিবন্ধ

১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : ব্যক্তিগত সংলাপ?

২০০৩ সালে প্যারিসে এক ক্যাফের টেবিলে বসে আছেন মুস্তাফা শেরিফ। বসন্তকালের শেষ অপরাহ্ণের আলোয় উদ্ভাসিত প্যারিসের পথ-ঘাট। কিন্তু মুস্তাফা শেরিফের সেদিকে মন নেই। ইসলাম ও দর্শন নিয়ে তার অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে তিনি আলজেরিয়ায় খ্যাতিমান। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাতেই অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের একজন। তিনি আজ গভীরভাবে চিন্তামগ্ন। ক্যাফেটিও সাধারণ রেস্তোরাঁ নয়। প্যারিসের ইনস্টিটিউট অব অ্যারাব ওয়ার্ল্ডের টি-রুমে বসে মুস্তাফা শেরিফ বিশেষ একজনের প্রতীক্ষা করছেন। তিনি জাঁক দেরিদাঁ; তাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীর সেরা দার্শনিক-চিন্তাবিদদের একজন দেরিদাঁ। কিন্তু নতুনত্ব রয়েছে তার আজকের আগমনে। দেরিদাঁ ও মুস্তাফা শেরিফ আজ আলাপ করবেন সভ্যতার সংঘাত ও সংলাপ নিয়ে। বিশেষত 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য'– এ দুইয়ের মধ্যকার সভ্যতা সম্পর্কিত বিষয়ে। শেষ পর্যন্ত তারা উভয়েই মানছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বলতে যে একরৈখিক ধারণা দেওয়া হয়, তা ঠিক নয়। প্রাচ্যও বিভিন্ন, পাশ্চাত্যও বিভিন্ন। এই বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘাত যেমন রয়েছে, ঐক্যের যোগসূত্রও রয়েছে। সক্রেটিসের 'নিজেকে জানো' উক্তি মেনে আজ প্রাচ্যকে যেমন তার বিভিন্নতাকে বুঝতে হবে; পাশ্চাত্যকেও তেমনি নিজের ভেতরের ভিন্নতাকে নতুন করে জানতে হবে। আন্তঃসভ্যতার সংলাপের এই আহ্বান জানানোর মাস কয়েকের মধ্যেই ক্যান্সারে মারা যাবেন দেরিদাঁ।

দেরিদাঁ-মুস্তাফা শেরিফের আলোচনা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। নিজেদের বুঝ পরিষ্কার করার জন্যই। কিন্তু তারা সংলাপের যে কথা সেদিন তুলেছিলেন তা একেবারে নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত অর্থে দার্শনিক ছিলেন না হয়তো, কিন্তু সভ্যতার সংঘাত ও সংলাপ– এ বিষয়ে বিস্ময়কর অভিনিবেশ ছিল তার। তার চিহ্ন পাই একেবারে লেখক জীবনের গোড়ার দিকের লেখাগুলোতেই। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশের দিকে। ১৮৯১ সালে 'প্রাচ্য সমাজ' প্রবন্ধে সৈয়দ আমির আলীর প্রবন্ধের সূত্র ধরে 'পাশ্চাত্য ও ইসলাম' নিয়ে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ টেনে আনছেন, যা দেরিদাঁ-শেরিফ সংলাপের কথা মনে করিয়ে দেয়। কোনো এক ইংরেজ মহিলা 'মুসলমান স্ত্রীলোকদের দুরবস্থার বর্ণনা করিয়া নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন' তার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, অনগ্রসরতার কারণ 'ধর্মে নহে, জ্ঞানবিদ্যা সভ্যতার অভাবে।' ইউরোপও এক সময় অনগ্রসর ছিল। ইউরোপেও নারীরা অত্যাচারিত ছিলেন, খ্রিষ্ট ধর্মের উপস্থিতি তাতে পরিবর্তন আনতে পারেনি। ইউরোপে 'তখন কোনো উচ্চ অঙ্গের ধর্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকের অধিকার ছিল না। জনসমাজে মিশিতে, প্রকাশ্যে বাহির হইতে, কোনো ভোজে বা উৎসবে গমন করিতে তাহাদের কঠিন নিষেধ ছিল। ... খ্রিষ্ট ধর্মবৎসল জুষ্টিনিয়নের অধিকারকালে কনস্টান্টিনোপলের রাজপথ স্ত্রীলোকদের প্রতি কী নিদারুণ অত্যাচারের দৃশ্যস্থল ছিল।' তারপর রবীন্দ্রনাথ ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে সুচিন্তিত মন্তব্য করলেন। আজকের যুগের জন্য প্রাসঙ্গিক বিধায় পুরো উদ্ধৃতিটি শোনা দরকার :

'এমন সময়ে মহম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্তালোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থুল বাধাইয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে সময়ে আরব-সমাজে যে উচ্ছৃংখলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রী পরিত্যাগে কোনো বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্যপদবীতে আরোহণ করিলেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন, স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ-প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই জন্য তিনি স্ত্রীবর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।... কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিয়া সমাজকে পথনির্দেশ করিয়াছিলেন। তবু সমাজ সেইখানেই থামিয়া রহিল। কিন্তু সে-দোষ মুসলমান ধর্মের নহে, সে কেবল জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতার অভাব।'

এ দীর্ঘ উদ্ধৃতির পেছনে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগের জায়গা কোথায় তা পরিষ্কার। তিনি চাচ্ছেন যে, ইসলাম সম্পর্কে ইউরোপীয় মতই চূড়ান্ত নয়– তা স্বপ্রমাণিত করতে। অন্ধকার সব সভ্যতার ভেতরেই আছে, প্রয়োজন হচ্ছে সংঘাতের মুহূর্তগুলো এড়িয়ে সংলাপ ও ঐক্যের মুহূর্তগুলোর ওপর জোর দেওয়া। এ কাজটি তিনি বিশেষভাবে শুরু করেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী পর্বে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই বিচ্ছিন্নতার পর্ব তাকে নানা দিক থেকে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল। তার দেশের মানুষের উন্নতি কোন পথে– এ নিয়ে দুর্ভাবনা হচ্ছিল কবির। সে লক্ষ্যে আধুনিকতার ধারণাকে পুনর্নির্মাণ করতে চাইছিলেন তিনি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে নিরন্তর ও অর্থবহ সংলাপ ছাড়া এ আধুনিকতার পুনর্নির্মাণ সম্ভব নয়– এটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল তরুণ বয়সেই। কিন্তু ধন্দ দেখা দিয়েছিল প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। উনিশ শতকের রেনেসাঁর চিন্তকদের মতো তিনি ফিরতে রাজি ছিলেন না ভারতীয় প্রাচ্যের 'প্রাচীন মৌলিকত্বে'। শাস্ত্রের অনুশাসনে বিধির তুলনায় নিষেধেরই বেড়া বেশি করে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তা ছাড়া, উনিশ শতকের রেনেসাঁর চিন্তকরা 'প্রাচ্য' বলতে শুধু স্বজাতীয় প্রাচ্যকেই বোঝাতেন। যেমন– হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা রেনেসাঁর আকর-উৎস বলতে বোঝাতেন বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-কাব্যচতুষ্টয়কে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও প্রায় অবিকল মনোজগতের পথে বারবার ফিরে যেতেন ধর্মীয়-পুরাণ অনুষঙ্গ ও উৎসে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা তো আরও বেশি করে স্বজাতীয় প্রাচ্যের চর্চা করতেন। প্রাচ্য যে বিভিন্ন ধারার এবং তার মধ্যে যে বহুমাত্রিকতা রয়েছে, বহু সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের প্রকাশ রয়েছে, সেটা সুদূর লাতিন আমেরিকা থেকে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য হয়ে দক্ষিণ এশীয় ও দূরপ্রাচ্য অবধি বিস্তৃত ভূপ্রকৃতি ও বিচিত্রবিধ সমাজ-সংস্কৃতি থেকে বেশ বোঝা যায়। তবে এ দেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ কথা মর্মে মর্মে ধারণ করেছিলেন এবং নানাভাবে নিজের দেশে ও বিদেশে গিয়ে সে কথা অন্যদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। আমি সন্দেহ করি, তার বিশ্ব-পর্যটনের যতিহীন প্রয়াসের পেছনে ছিল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের বিভিন্ন ধারাকে প্রত্যক্ষে জানা-বোঝার তাগিদ। এ জন্যই কবি গিয়েছিলেন বিলেত-আমরিকার বাইরে জাপানে, চীন দেশে, জাভায়, সিংহল দ্বীপে, মরুতীর্থে মধ্যপ্রাচ্যে তথা আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, মিসর; এমনকি সুদূর লাতিন আমেরিকায়। কেন এই চরৈবেতি চড়ুয়া স্বভাব? অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, হিউয়েন সাং, ইবনে বতুতা– এসব পরিব্রাজকের মতোই যেন বিশ্ব-পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন কবি। তবে পরিব্রাজনার পেছনে প্রবল ব্যক্তিগত উৎসাহের কারণ নিহিত ছিল অন্যত্র। প্রাচ্যীয় বিভিন্নতাকে স্বচক্ষে সপ্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; নিজের জীবন-চর্চা, বিশ্বাস ও রচনাকর্মের মধ্য দিয়ে।

শুধু প্রাচ্য নয়, পাশ্চাত্যও তো বিভিন্ন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমীকরণের প্রাচ্য অংশটি যেমনটা একরূপ নয়, পাশ্চাত্য অংশটিও তেমনি নানা ধারা, ছক ও স্বভাবের। যে পাশ্চাত্য অনবরত প্রাচ্যকে বশীভূত করে শাসন-শোষণ করতে চায়, সেটি এক ধরনের। যে পাশ্চাত্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমে মানব সভ্যতায় অবদান রাখছে, সেটি অন্য ধরনের– এ কথাও রবীন্দ্রনাথের সটান উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল। তার 'ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজ' লেখাটি এ রকম চেতনা থেকেই উৎসারিত। তাছাড়া পাশ্চাত্য নিজেদের মধ্যেও অনবরত পায়ে লাগিয়ে ঝগড়া বাধাতে পারদর্শী; তার বিগত পাঁচশ' বছরের ইতিহাস সে কথাই বলে (এমনটা যখন রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন তখনও প্রথম মহাযুদ্ধের শুরু হয়নি)। তার ওপর রয়েছে পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের সংস্কৃতিগত ব্যবধান। যেমন রয়েছে ফারাক ইউরোপ ও আমেরিকার ভেতরে। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য– এ দুইয়ের মধ্যকার সংলাপকে অনায়াস বাহাস বলে মনে করা কঠিন। কোন 'প্রাচ্যের' সঙ্গে কোন 'পাশ্চাত্যের' সংলাপের কথা হচ্ছে? সাম্রাজ্য মদমত্ত পাশ্চাত্যের সঙ্গে আত্মসংহারী জাতিবিভেদী প্রাচ্যের সঙ্গে সংলাপে তো কবির উৎসাহ থাকার কথা নয়। তা ছাড়া পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কিছু দান হাত পেতে নেওয়ার পাশাপাশি এটাও তো ভাবতে হবে, পাশ্চাত্যকে দেওয়ার মতো আদরণীয় কিছু আদৌ প্রাচ্যের আছে কি-না? নইলে যে একতরফা বিনিময়ই চলতে থাকবে। আর একতরফা বিনিময় কেবল চলতে পারে পরাধীন সত্তার ক্ষেত্রেই। সব মানব জাতির না করে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কেউ কি পরস্পরের কাছ থেকে কিছু নিতে বা পরস্পরকে কিছু দিতে সক্ষম? এসব ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ১৯১০-৩০ পর্বের নানা লেখায় এসব প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসবে কখনও জাতীয়তাবাদের সমালোচনায়, কখনও সাম্রাজ্য ও যুদ্ধের প্রসঙ্গে, কখনও ধন-বৈষম্য, কখনও জাতি-বৈষম্য, কখনও কলের সভ্যতার বিশ্লেষণে। রাজনীতি, ধর্ম, সভ্যতা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও মানবকল্যাণের পরিণতি নিয়ে এসব উদ্বেগ তার শিল্প-সাহিত্যচর্চায় অনবরত ঢুকে পড়তে থাকবে। এরই মধ্য দিয়ে কবি শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ছায়া পেরিয়ে হয়ে

উঠবেন বিশ্বের বিবেকবান বুদ্ধিজীবীদের একজন।

কিন্তু এই পালাবদলের বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি কবির বিদেশি বন্ধুদের মনোযোগের বাইরে রাখি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যকার সংলাপে সমীকরণ খোঁজার চেষ্টা শুধু ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ সংলাপটি কবির সচেতন উদ্যোগ ও তাগিদে ছড়িয়ে পড়েছিল তার কাছের ও দূরের বলয়ে। স্বদেশের সহচররা যেমন, এই সংলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন বিদেশি পথিকরাও। এর পূর্ণ ইতিহাস এখনও জানা হয়নি আমাদের। কিন্তু এটুকু জানা যে, কবির মননশীল চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলিছিলেন তার বিদেশি বন্ধুরা, ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্টারলকুটর বা সহ-আড্ডাধারীরা। এদের মধ্যে যেমন আছেন ইয়েটস-পাউন্ডের মতো কবি, আইনস্টাইনের মতো পদার্থবিদ, রাসেল-বের্গসঁ-শোয়াইটজারের মতো দার্শনিক, ওয়েলস-বার্নার্ডশ-হামসেনের মতো লেখক, ফ্রয়েড-হ্যাভলক এলিসের মতো মনোবিজ্ঞানী, বুনিন-হিমেনেথ-জিদের মতো তার কবিতার নোবেলবিজয়ী অনুবাদক, এমনকি র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ও উড্রো উইলসনের মতো রাজনীতিক। এ সংলাপে পরোক্ষভাবে ঘটনা-পরম্পরায় যুক্ত হয়েছেন রাইনের মারিয়া রিল্কে, ফেরেরিকো লোর্কা, লুই বনুয়েল, বরিস পাস্তেরনাক, আন্না আখমাতভা ও পাবলো নেরুদা, যারা সরাসরি কবির সান্নিধ্যে আসেননি, কিন্তু বহন করেছেন তার গান, কবিতা ও গদ্য-ভাবনার বীজ। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ অনেকটা স্বউদ্যোগে নিজ হাতেই যেন সম্পন্ন করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার মহাজাতি বৈঠকের। আবার এসবের মধ্য দিয়েই পদ্মা-পারের কবি হয়ে উঠছিলেন এক বিশ্বব্যক্তিত্ব; স্থান করে নিচ্ছিলেন বিশ্বকবির সারিতে। অবশ্যই এই মহাসংলাপ হয়েছিল তার পছন্দের প্রাচ্য ও পছন্দের পাশ্চাত্যের ধারার মধ্যে। এই বৈঠকের ভাষা দ্বিপক্ষীয় সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক ভাব বিনিময়ের হলেও এর প্রেরণা বহুত্ববাদী, একান্তভাবেই জাতীয়তাবাদের বাইরের ভুবনের। সে কথা ম্যানিফেস্টোর মতো কবি ১৯১৭ সালের 'ন্যাশনালিজম' বক্তৃতামালায় সবিস্তারে তুলে ধরছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমদর্শী সমালোচনায়। ১৯৯১ সালে ন্যাশনালিজম গ্রন্থের ভূমিকায় ইংরেজ দার্শনিক ইপি থমসন তাকে 'উত্তর-আধুনিক' বলে অভিহিত করেছিলেন। সেটা রবীন্দ্রনাথের জানার কথা নয়। জার্মান দার্শনিক হাবেরমাস ১৯৯০-এর দশকে খুঁজেছিলেন 'পোস্ট-ন্যাশনালিজম'-এর সম্ভাবনা। সেটাও রবীন্দ্রনাথের জানার কথা নয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, তার রচনা-কর্মই উত্তর-আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তা ও পোস্ট-ন্যাশনালিজম ধারণার সবচেয়ে কাছাকাছি, কী সেই সময়ে, কী এই সময়ে তার সমসাময়িকদের মধ্যে, অন্তত এই ভূখণ্ডে। এটা সম্ভব হয়েছিল তার বহুত্ববাদী মনের কারণে, সেখানে নানা প্রাচ্য ও নানা-পাশ্চাত্যের রঙে ঝিলমিল। এটা তার ভিনদেশি সহ-আলাপফদের তালিকা দেখলেই বোঝা যায়। এনার্কিস্ট, লিবারেল হিউম্যানিস্ট, কট্টর মার্কসিস্ট, ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট, থিওসফিস্ট, ওরিয়েন্টালিস্ট, ফেমিনিস্ট, লজিক্যাল পজিটিভিস্ট, খ্রিষ্টীয় আদর্শবাদী, সুফী মতাবলম্বী, মার্টিন বুবেরের মতো ইহুদি আদর্শের প্রচারক, বৈদান্তিক, নাস্তিবাদী, সংশয়বাদীথ কে নেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই মহাজাতি সংলাপে! আর এই বিদেশি সভায় প্রাচ্যের হয়ে একাই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন কবি। এই সংলাপের যা কিছু ঘটেছে তার অনেকটাই ঘটেছে লোকচক্ষুর অগোচরে, দিশলিপি বা চিঠির নিভৃত পাতায় অথবা দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের মধ্যে। অর্থাৎ এখনকার মতো মিডিয়ার ২৪ ঘণ্টা নজরদারির বাইরে, বলা যায় কবির একান্ত ব্যক্তিগত আলাপচারিতার কাঠামোয়। কখনও কখনও অবশ্য সেসব আলোচনা ও পত্রালাপ প্রকাশ পেয়েছে 'মর্ডান রিভিউ'তে অথবা অনূদিত হয়েছে 'প্রবাসী'র পাতায়। তবু এর মধ্য দিয়েই আমাদের প্রাচ্যকে বহির্বিশ্ব জানতে পেরেছে। বর্ণবাদী ওরিয়েন্টালিজমের বাইরে যে প্রাচ্যকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গর্ব করতেন, তার সঙ্গে বিতর্ক ও আড্ডার সুযোগ মিলেছে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের। এ জন্যই কি কবির প্রাণপাত কষ্ট স্বীকার, ঘুরে বেড়ানো, দেশ থেকে দেশে (কখনও কখনও ছয় মাস-এক বছর ধরেও ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাকে) জাহাজে বা রেলগাড়িতে চড়ে দীর্ঘ যাত্রায়! রুশ চিত্রশিল্পী নিকোলাই রেরিখ তার 'হিমাবৎ' (হিমালয়ের সন্নিকটে) গ্রন্থে লিখেছেন, কবির সাক্ষাৎ মেলা ভার, কেননা 'অক্লান্তভাবে তিনি সারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।' কেন এই কষ্ট স্বীকার, সে কি কেবল ঘরের বাইরের পৃথিবীকে সম্মান জানানোর জন্য, নাকি জাতি হিসেবে 'বাঙালিকে' যাতে কেউ কূপমণ্ডূক মনে করতে না পারে, সে জন্যও? দ্বিতীয়বার আমেরিকা সফরের সময় (১৯১৬-১৭ সালে) টানা ১২১ দিনে প্রায় ৭০০০ মাইল ঘুরে ৫৭টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন কবি। সে তো নিছক খ্যাতির পেছনে দৌড়ানোর জন্য নয় অথবা খ্যাতির বিড়ম্বনার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজাতও নয়। বিবেকানন্দের পর কিন্তু ভিন্ন পন্থায় ধর্মনিরপেক্ষভাবে প্রাচ্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন কবি মার্কিন দেশের জনসমাজের সম্মুখে এক ব্যাপক ব্যক্তিগত উদ্যোগে। মনে রাখতে হবে, অর্থবহ সংলাপ হয় সমকক্ষদের মধ্যে কেবল। সেভাবেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সব সংলাপে অংশ নিয়েছেন নিজের কোনো অসম্পূর্ণতায় কুণ্ঠাবোধ করা ছাড়াই। যখন নোবেল পাননি তখনও আস্থাশীল ছিলেন নিজের সম্পর্কে। এক কথায়, বিদেশি বন্ধুদের সঙ্গে আলাপে-সংলাপে বিতর্কে-বাদানুবাদে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বদা সচেষ্ট, জ্ঞানোৎসাহী এবং উদার-শ্রোতা ও বক্তা উভয় ভূমিকাতেই। এর জন্য প্রতিটি সাক্ষাৎ ও প্রতিটি চিঠির পেছনে তাকে যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিতে হতো। এই বুদ্ধিবৃত্তিক আয়োজন বিপুল ও সর্বব্যাপী, আমাদের আজও তা বিস্মিত না করে পারে না। এরই কিছু অনুচিহ্ন নিয়ে বর্তমান লেখা।

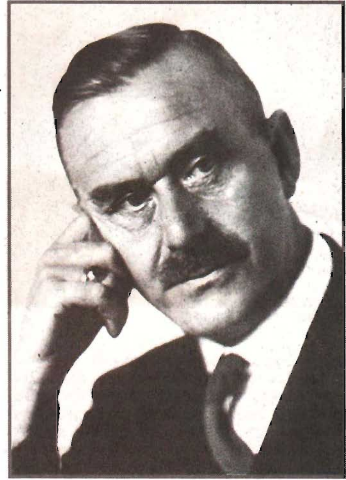
২. তার নোবেলজয়ী অনুবাদকরা

বিদেশি বন্ধুদের সারিতে স্বাভাবিকভাবই প্রথমে চলে আসে তার সৃষ্টিকর্মের অনুবাদকরা। এখানে শুধু তাদেরই উল্লেখ করব, যারা রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুবাদকদের মধ্যে অগ্রগণ্যই ছিলেন না; পরে তারা নিজেরাই পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। তার মানে এই নয় যে, নোবেল যারা পাননি তারা ছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংলাপের বাইরে। টলস্টয় রবীন্দ্রনাথকে চিনতেন না ঠিকই, কিন্তু কবি তার লেখার মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। টলস্টয়ের 'আন্না কারেনিনা' তার তেমন ভালো লাগেনি, তবে টলস্টয়ের আদর্শে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছেন যে, রুশ দেশের কৃষক-মজুররা নিস্তব্ধ হয়ে টলস্টয়ের 'আন্না কারেনিনা' নাটকটির অভিনয় উপভোগ করছে। রবীন্দ্রনাথের নানা লেখার মধ্যে (বিশেষ করে স্বদেশি-সমাজ পর্বের লেখাগুলো) টলস্টয়ের সযত্ন উল্লেখ রয়েছে। টলস্টয়ের মতো রাইনের মারিয়া রিল্কেরও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সরাসরি কখনও দেখা হয়নি। রিল্কে রাশিয়ায় ছিলেন একটা সময়ে ও রুশ ভাষা ভালো জানতেন; কাব্য বিষয়ে পাস্তেরনাক-সিভেতায়েভার সঙ্গে বিখ্যাত পত্রালাপ রয়েছে তার। এটা আমরা ভুলে যাই কী করে যে, জার্মান ভাষায় গীতাঞ্জলি অনুবাদের জন্য রিল্কেকেই প্রথমে অনুরোধ করা হয়েছিল প্রকাশকের পক্ষ থেকে। নোবেলপ্রাপ্তির আগেই রবীন্দ্রনাথের কথা শুনেছিলেন তিনি তার বন্ধু ওলন্দাজ কবি ভন আদেনের কাছে। ১৯১৪ সালে যখন আঁদ্রে জিদের করা গীতাঞ্জলির ফরাসি অনুবাদ বের হলো তখন সে অনুবাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে রিল্কে নিজে থেকে জার্মান প্রকাশক কুর্ট উয়োলফকে চিঠি লিখেছেন। এ বইয়ের দ্রুতই জার্মান অনুবাদ বের হওয়া দরকার– এই ছিল রিল্কের মত। চিঠিটা পেয়ে উয়োলফ বরং রিল্কেকেই অনুরোধ করেন অনুবাদকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য। কিন্তু রিল্কের তখন চলছে প্রেরণার সংকট। ডুইনো এলিজি অর্ধ-সমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে, লেখা আপাতত বেরুচ্ছে না। গীতাঞ্জলির অনুবাদকর্মে হাত দিতে হলে অন্য সব কাজ পিছিয়ে

যাবে– এই আশঙ্কার পাশাপাশি একটি কেজো যুক্তিও দেখিয়েছিলেন তিনি। অনুবাদ যেহেতু করতে হবে ইংরেজি থেকেই, আর ফরাসি ও রুশ ভাষায় অনায়াস দখল সত্ত্বেও ইংরেজি তার তেমন আয়ত্তে নেই। ফলে সুবিচার করা হবে না লেখাগুলোর প্রতি। 'আমি নিজের ভিতরে এই কাজটা করার জন্য অনিবার্য আহ্বান শুনতে পাচ্ছি না আর একমাত্র তা থেকেই একটা নিশ্চিতভাবে ভালো কাজ জন্ম নিতে পারে।' এভাবেই গীতাঞ্জলির অনুবাদকর্মের শ্রমসাধ্য কাজটিকে দায়সারাভাবে না দেখে সৃষ্টিশীল গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন তিনি। অবশ্য এ চিঠির কয়েক বছর বাদে ১৯২১ সালেই জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলি ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এ কাজটি করেছিলেন হেলেন মেয়ার-ফ্রাঙ্ক ও তার স্বামী দার্শনিক ভাষাতাত্ত্বিক হাইনরিশ মেয়ার-বেনফি। কোনো বিদেশি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনাবলির প্রকাশ এই প্রথম। ইংরেজিতে ত্রিশের দশকের শেষেই সিলেক্টেড ওয়ার্কস বেরিয়েছিল কেবল, রুশ ভাষায় আরও পরে, পঞ্চাশের দশকে।

গীতাঞ্জলির ফরাসি অনুবাদের সঙ্গে আঁদ্রে জিদ কী করে জড়িত হলেন, সে গল্পও কৌতূহলোদ্দীপক। সাঁ জ পার্স ফরাসি লেখক, নোবেল পুরস্কার পান ১৯৬০ সালে, জীবনের শেষ তিন দশক কাটিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। আর জিদ নোবেল পান ১৯৪৭ সালে। গীতাঞ্জলির ফরাসি অনুবাদের সঙ্গে দু'জনেই জড়িত ছিলেন : পার্স পরোক্ষভাবে, জিদ প্রত্যক্ষভাবে। ১৯১২ সালে ইয়েটসের ভূমিকা সংবলিত গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কেবল ইংল্যান্ডই নয়, ইউরোপের সমগ্র সারস্বত সমাজেরই দৃষ্টি কেড়েছিল। পার্সের বয়স তখন ২৫, লেখক-জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সংগ্রাম করছেন। আর জিদের বয়স তখন ৪৩, ইতিমধ্যেই ফরাসি সাহিত্যাকাশে দেদীপ্যমান। পত্রিকায় গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে পার্স উচ্ছ্বসিত হয়ে জিদকে সে কথা জানান। শুধু তাই নয়; কবির সঙ্গে উদ্যোগী হয়ে দেখা করেন লন্ডনে এবং গ্রন্থটির ফরাসি অনুবাদের জন্য জিদকেই মনোনীত করতে অনুরোধ করে যান। কেন গীতাঞ্জলির সুর পার্স ও জিদ উভয়কেই এত টেনেছিল সেটা এক চিত্তাকর্ষক আলোচনার বিষয় হতে পারে। কেননা, জিদ গোড়া থেকেই অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট ধারার লেখক; সেটা প্রচলিত নীতিবোধ বা ধর্মবিশ্বাসকে সমালোচনা করার ক্ষেত্রে যেমন দেখা গেছে, তেমনি পরে স্তালিন পন্থাকে তীব্র ভর্ৎসনা করার বেলাতেও সুস্পষ্ট। গীতাঞ্জলির মরমি ভাবাদর্শের প্রতি তার বরং নির্লিপ্ত থাকারই কথা। তারপরও আকৃষ্ট হওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ হিসেবে তিনি যা বলেছিলেন তা হলো, এর সহজ সরাসরি উচ্চারণ তাকে মুগ্ধ করেছিল। এ কাব্যের বক্তব্যকে বোঝার জন্য কোনো অভিধানের প্রয়োজন নেই বা কোনো ভারতীয় পুরাণ বা শাস্ত্রের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয়ের দরকার নেই। এতটাই পাঠক-বন্ধু রচনা এটি। অন্যদিকে পার্স তরুণ বয়স থেকেই অধুনাপন্থি, আভোগার্দ যাকে বলে তা-ই; পরে নাজিবাদবিরোধী বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। হয়তো ফরাসি প্রতীকবাদী কবিতা থেকে এই মিতবাক ছোট ছোট কবিতা ছিল সম্পূর্ণই ভিন্ন স্বাদ ও ঘরানার। ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন হিসেবে কল্পনা করা ছাড়াও একে দিব্যি মানবীয় প্রেরণায় পড়ে ফেলা যায়। গীতাঞ্জলির এটি একটি বড় গুণ। 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' সে রকম সরল সত্যের আহ্বান হয়তো তাদের মনে আলোড়ন তুলে থাকবে। বিশেষ করে অবাক লাগে গীতাঞ্জলির ফরাসি অনুবাদের ভূমিকায় জিদ যখন বোদলেয়ারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করছেন, অথবা উদাহরণ টানছেন গ্যেটের ফাউস্টের। প্রাচ্যীয় বিচ্ছুরণ তখন একান্তভাবে আর প্রাচ্যের একচেটিয়া থাকছে না, পাশ্চাত্য ঐতিহ্যেরও অংশ হয়ে উঠছে। বা অন্যভাবে বললে, বোদলেয়ার, গোটে বা জিদ নিজেও প্রাচ্যীয় অনুষঙ্গের অন্তর্লীন মুহূর্ত হয়ে উঠছেন। 'আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা' এই উন্মাতাল আলো কি কেবল উপনিষদের? বা একে বৈষ্ণব দর্শনের সারাৎসারও বলে মনে করেননি জিদ। বরং এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন মানবীয় ভালোবাসারই দর্শন, যেখানে শাস্ত্রীয় ধর্ম নেই, বরং ভালোবাসাই সেখানে পরম ধর্ম হয়ে আছে। গীতাঞ্জলির এই ব্যাখ্যা জিদের জীবনদর্শন দ্বারা স্পষ্টতই প্রভাবিত। কবির 'জীবনদেবতা'র প্রতিফলন নেই এতে।

গীতাঞ্জলির জিদ-কৃত ভূমিকায় প্রাচ্য-বিষয়ক আরেকটি বহুল উদ্ধৃত অভিযোগের অপনোদন করা হয়েছে। প্রাচ্যীয় শাস্ত্র-সাহিত্যাদি অর্থহীন; 'এর সমগ্র সম্ভারও ইউরোপের এক তাক বইয়ের চেয়ে মূল্যবান নয়'– এ রকম একটি আপ্তবাক্যের তিরস্কার ম্যাকলের কলম থেকে ১৮৩০-এর দশকে নিঃসৃত হয়েছিল। তার পর থেকে এক ধরনের হীনম্মন্যতা প্রাচ্য দেশকে তাড়া করে ফিরেছে। জিদ কিন্তু তা বলছেন না। প্রথমত, তিনি বলছেন যে গীতাঞ্জলির সহজ উচ্চারণ তাকে স্বস্তি দিয়েছে। কেননা, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থরাজি তার পড়া নেই এবং অনন্তকাল হাতে পেলেও তা পড়ে শেষ করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যের ভাবনার মাঝে কেবল দেবত্ববাদ নয়, সেখানে সংশয়বাদও খুঁজে পাচ্ছেন। তার দৃষ্টিতে, 'বহুদেববাদ আসলে প্রকৃত সত্য নয়।' কেননা, অমন যে আকর গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ



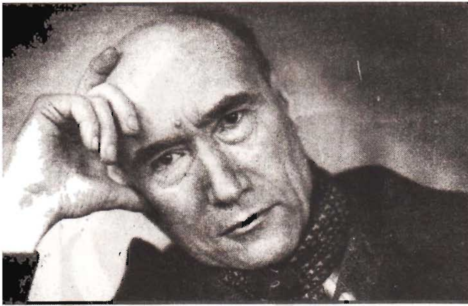
টমাস মান

সেখানেও বলা হচ্ছে : 'এসব তত্ত্ব কে জানে? কে-ই বা এসব নিয়ে কথা বলতে পারে? কোথা থেকে আসে প্রাণী? এই সৃষ্টিইবা কী? এর সামনে দেবতাদেরও বামনের মতো দেখায়। কীভাবে এর আরম্ভ হয়েছিল তা কার জানা আছে?' গীতাঞ্জলি জিদের চোখে এ রকমই মুক্ত প্রেরণায় রচিত এবং এই অনিশ্চয়ের বোধ আধুনিক কাব্যকলারই লক্ষণ।

দেখা যাচ্ছে, ফরাসি দেশেই গীতাঞ্জলি ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের (ইংল্যান্ডের চেয়েও আমি বলব) উচ্চ মূল্যায়ন হয়েছিল বেশি করে। সেটি শুধু জিদের স্থিতধী মূল্যায়নেই প্রকাশ পায়নি। ১৯১৫ সালে রোমাঁ রোলাঁ নোবেল পুরস্কার পান (পুরস্কারটা হাতে পান ১৯১৬ সালে)। রোলাঁ যেভাবে রবীন্দ্রনাথকে আপন করে নিয়েছেন সে রকম উৎসাহ ইংল্যান্ডে

ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। রোলাঁর সঙ্গে গান্ধীর যেমন, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথেরও গুরুত্বপূর্ণ পত্রালাপ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছরপূর্তিতে 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর' সংকলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রোলাঁই। প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিতে ইউরোপ ও এশিয়ার লেখক-শিল্পীদের প্যাসিফিস্ট অবস্থানে একত্রিত করা নিয়ে এদের মধ্যে সহমত ছিল। প্রাচ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বাড়ুক, আর পাশ্চাত্যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা নৈতিক ভিত্তি পাক, এই ছিল রোলাঁর মত। পরে ফ্যাসিবাদবিরোধী জোরালো অবস্থানে যাতে কবি দৃঢ় থাকেন (বিশেষত ১৯২৬ সালে মুসোলিনিঠ ইতালি ভ্রমণের বিতর্কিত অভিজ্ঞতার পর) সে ক্ষেত্রে রোলাঁ বিশেষভাবে সজাগ অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। তবে রোলাঁ বা আঁরি বারবুসের মতো শান্তি-আন্দোলনের নেতারাই নন, বৃহত্তর ফরাসি সারস্বত সমাজে রবীন্দ্রনাথের স্থান ছিল সাধারণভাবেই খুব উঁচুতে। এ ক্ষেত্রে পল ভ্যালেরির উদাহরণ টানা যায়।

ফরাসি প্রতীকবাদী আন্দোলনের পুরোধা কবি ভ্যালেরির প্রভাব আধুনিক কবিতার ওপরে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। আধুনিক বাংলা কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই ভ্যালেরির কাছে ঋণ স্বীকার করে গেছেন। এহেন ভ্যালেরি রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীতে এসে কবির সঙ্গে পরিচিত হয়ে একেবারে বিমোহিত হয়ে গেলেন। ১৯৩০ সালে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্রকর্মের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। এ কাজটি করার জন্য সুদূর আর্জেন্টিনা থেকে এসেছিলেন তিনি। মূল প্রদর্শনীর আগে এক প্রাক-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল এবং তাতেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন ভ্যালেরি। তিনি কবির আঁকা মূর্ত-বিমূর্ত ধারার ছবিগুলো দেখে মন্তব্য করেছিলেন, এসব ছবির প্রদর্শনী এ কারণেও গুরুত্বপূর্ণ যে, তাতে ফরাসি চিত্রকরদের জন্য তা 'এক শিক্ষণীয় বিষয় হবে'। প্রাচ্যের চিত্রকলা মানেই মোগল মিনিয়েচার অথবা বাংলার সনাতনী পটচিত্র– রবীন্দ্রনাথ এ ধারণা ভেঙে দিয়েছিলেন। অবচেতনের অস্বচ্ছ আবহ থেকে ঝিলিক দিচ্ছে মূর্ত অবয়ব, সে-ও মনের অন্ধকার আলোর ঘেরাটোপে আঁকা, যেন অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের অন্য বিচ্ছুরণ। ইউরোপে এক্সপ্রেশনিজম সবে শুরু হয়েছে, পল ক্লি জার্মানিতে এর নেতৃত্বে, ফ্রান্সে তখনও ততটা ছড়িয়ে পড়েনি। তারই মধ্যে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনী। এর তাৎপর্য এ আন্দোলনের অন্যতম তাত্ত্বিক ভ্যালেরির প্রখর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার নয়। কিন্তু আরও একটি কারণে অভিভূত হয়েছিলেন ভ্যালেরি। গীতাঞ্জলির শান্ত-সৌম্য চেহারার সন্ত কবি সর্বাধুনিক এক্সপ্রেশনিজমের মূর্ত-বিমূর্ত চিত্রকলার মাধ্যমে নিজেকে পুনরায় প্রকাশিত করেছেন– সেটি তাকে কিছুটা বিস্মিত না করে পারেনি। কিন্তু প্রধান কারণ ছিল অন্যত্র। ভ্যালেরির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে কবি অনর্গল বলতে থাকলেন ভারতবর্ষের দুঃসহ পরিস্থিতির কথা (ততদিনে ১৯২৮ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছে; দেশজুড়ে চলছে ব্যাপক ধর-পাকড়)। আর বললেন, প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত 'দশ লাখ ভারতীয় সৈন্যের' কথা, যাদের ফ্রান্সের মাটিতে কবর দেওয়া হয়েছে, অথচ কোনো স্মৃতিসৌধ গড়া হয়নি তাদের নামে। কবির বক্তব্য ছিল– 'ফ্রান্সের কাছে এতখানি নিষ্ঠুরতা তিনি আশা করেননি।' দেখা গেছে, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে ১৯৩০ সালেও এসে কবি আবেগে আলোড়িত হয়ে উঠেছেন, যেমনটা হয়েছেন ১৯১৭ সালে ন্যাশনালিজম বক্তৃতামালায়। এই সাক্ষাৎকারে ভ্যালেরি অভিভূত হয়েছিলেন– সে কথা ওকাম্পো তার রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বইয়ে আমাদের জানিয়েছেন।


আঁদ্রে জিদ

ভ্যালেরি অবশ্য নোবেল পুরস্কার পাননি, যেমন মেলেনি লরেন্স, জয়েস বা পাউন্ডের ভাগ্যে। কিন্তু ইভান বুনিন পেয়েছিলেন ১৯৩৩ সালে। রুশিদের মধ্যে সাহিত্যে তিনিই প্রথম এ পুরস্কার পান। সোভিয়েত শলোখভকে প্রথমে না দিয়ে দেশত্যাগী বুনিনকে সাহিত্যে নোবেল প্রদানের মাধ্যমে নোবেল কমিটি এক ধরনের কূট-রাজনীতি করেছিল– এ কথা সুবিদিত। যা হোক, গীতাঞ্জলির নোবেল অনুবাদকদের মধ্যে ইংরেজিতে যেমন ছিলেন ইয়েটস, ফরাসিতে জিদ, আর রুশ ভাষায় বুনিন ও পাস্তেরনাক (আখমাথভাও রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন, তবে ১৯৬৪ সালে তিনি নোবেল তালিকায় থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়ে হয়ে হয়নি)। ১৯১৮ সালে গীতাঞ্জলির রুশ সংকলন প্রকাশ পায় বুনিনের সম্পাদনায়। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার পর রুশ ভাষাতেই গীতাঞ্জলির অনুবাদ হয়। তবে মূল গ্রন্থটি হাতের কাছে না থাকায় এ কথা সঠিক করে বলা যাচ্ছে না, বইটির পুরোটা তারই অনুবাদ কি-না, নাকি অন্য রুশি অনুবাদকও (যেমন টলস্টয়-পুত্র ইলিয়া টলস্টয়) তাতে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালের সংস্করণটি মনে হচ্ছে পুশেনিকভের প্রচেষ্টায় অনূদিত হয়েছিল, তবে সার্বিক সম্পাদনা ছিল ইভান বুনিনের। সেই অনুবাদে বুনিন কতটা হস্তক্ষেপ করেছিলেন, ইয়েটসের মতো কোনো কোনো কবিতা নিজেই ঘষা-মাজা করার চেষ্টা করেছিলেন কি-না, তা জানার সহজ উপায় নেই। বুনিনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কখনও সাক্ষাৎকার হয়নি, যদিও সেটা অনায়াসে হতে পারত। বুনিন অক্টোবর বিপ্লবের পর প্যারিসে চলে যান এবং সেখানে বসেই রুশ বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকাজে সক্রিয় অংশ নেন। তবে বুনিন কবির কাছে একেবারে অপরিচিত নাম ছিলেন না। প্যারিস প্রবাসী রুশ বুদ্ধিজীবীদের গ্রুপ ১৯২৩ সালে কলকাতায় কবিকে চিঠি লিখে অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানায়। উদ্দেশ্য, অক্টোবর বিপ্লবের কারণে বিতাড়িত ভিন্নমতের রুশ বুদ্ধিজীবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান। এই অনুরোধ আসে মধ্যযুগের ইতিহাসবিদ ও অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ভিনোগ্রাদভের তরফ থেকে, যার চিঠিতে প্যারিস প্রবাসী গ্রুপ ও বুনিনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণের আগে থেকেই রুশ অক্টোবর বিপ্লব সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণভাবে উৎসাহী ও জিজ্ঞাসু ছিলেন। ইংরেজদের সব (অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত) প্রচারণা সত্ত্বেও তিনি রাশিয়ার ও রুশ বিপ্লবের বিরোধী দলে নাম লেখাতে চাননি; কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৯৩০ সালে তিনি স্বচক্ষে বিপ্লব-উত্তর কর্মকাণ্ড দেখার জন্য রাশিয়ায় যান। 'রাশিয়ার চিঠি'তে সে ভ্রমণের বৃত্তান্ত রয়েছে। কিছু সমালোচনা সত্ত্বেও বইটির সুর ছিল রাশিয়ার সংস্কার

প্রসঙ্গে অনেকটাই প্রশংসাবাচক। এতে প্যারিস প্রবাসী ভিন্নমতের বুদ্ধিজীবীরা (যার মধ্যে বুনিনও ছিলেন) কবির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন। গীতাঞ্জলি অনুবাদের পর রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে বুনিনের স্তব্ধতা এর থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। রবীন্দ্রনাথের তরফেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে কোনো তাগিদ লক্ষ্য করা যায়নি। কবির রাজনৈতিক বিবেচনা ছিল যে, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ মোকাবেলায় কিছু ভুলত্রুটি সত্ত্বেও সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক অবস্থান মোটের ওপর প্রাচ্যের জন্য কল্যাণকর ও বিশ্বশান্তির সহায়ক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবির এই অবস্থানে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি।

পাস্তারনাক রবীন্দ্রনাথে আকৃষ্ট হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণে। ১৯৩৬ সালে গোর্কির মৃত্যুর পর পাস্তেরনাকই ছিলেন সোভিয়েত লেখক সংঘ রাইটার্স ইউনিয়নের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। কিন্তু মিখাইল বুলগাকভের মতো তিনিও অবস্থার শিকারে পরিণত হন। স্তালিনের সুনজরে থাকার কারণে দু'জনে প্রাণে বেঁচে যান ঠিকই, কিন্তু স্বাধীন চিন্তার লেখা থেকে সরে আসতে হয় এদের। বুলগাকভ নিমজ্জিত হন মস্কো আর্ট থিয়েটার, আর পাস্তেরনাক নিয়োজিত হন অনুবাদকর্মে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৩ সাল (স্তালিনের মৃত্যু হয় যে বছর) অবধি পাস্তেরনাক শুধু অনুবাদের কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। শেকসপিয়র রচনাবলির রুশ অনুবাদ তারই দক্ষ হাতে সুসম্পাদিত হয়। অনুবাদের ধারাবাহিকতায় এক সময় তার চোখে পড়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাকর্ম। এর পেছনে পাস্তেরনাকের প্রেমিকা কবি ওলগা ইভিনস্কায়ার (ড. জিভাগো উপন্যাসের লারার চরিত্র তারই আদলে গড়া) বড় অবদান ছিল। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা তিনিই রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এ বিষয়ে ওলগা লিখেছেন, পাস্তেরনাক পেরেদেলকিনোয় একবার এলে তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা অনুবাদ করে শুনিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি কবিতা শেষ লেখার অন্তর্ভুক্ত, যেটি শুরু হয়েছে 'ঘণ্টা বাজে দূরে' লাইনটি দিয়ে। অনুবাদটি শুনে পাস্তেরনাকের চোখে জল এসে গিয়েছিল। এখানে ছোট্ট একটা তথ্যগত ত্রুটি শুধরে রাখি।

পাস্তেরনাকের জীবনীকার ক্রিস্টোফার বার্নস লিখেছেন, ১৯৩০-এর দিকে পাস্তেরনাক রাশিয়ার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনোমতেই পাসপোর্ট নাকি জোগাড় করা যাচ্ছিল না। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন মস্কো যান তখন তাকে দিয়েও নাকি চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল রুশ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানানোর, যাতে পাস্তেরনাকের পাসপোর্টের একটা সুরাহা হয়। এটা কতটা সত্যি, তা আরও যাচাই করে দেখা দরকার। পাস্তেরনাক ত্রিশের দশকে বেশ কয়েকবারবার 'লিটারেরি ডেলিগেশন'-এর সদস্য হয়ে রাশিয়ার বাইরে গিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে প্যারিসে ইন্টারন্যাশনাল রাইটার্স কংগ্রেসে তিনি সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৯৩৬-৩৮ পর্বে একাধিকবার কবি ওসিপ মান্দেলস্টাম, আন্না আখমাতভা ও মারিনা সিভেতায়েভার জন্য স্তালিনের কাছে পর্যন্ত দেন-দরবার করতে হয়েছিল তাকে। যাদের ওপর দিয়ে ত্রিশের দশকে শুদ্ধি অভিযানের ঝড় বয়ে গিয়েছিল, পাস্তেরনাক তাদের মধ্যে ছিলেন না। বৈষয়িক কোনো কষ্টেও তাকে কখনও পড়তে হয়নি। তার বরং কিছুটা অসুবিধে হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে, স্তালিনের মৃত্যুর পর। কিন্তু সেটা 'ড. জিভাগো' পর্বের কথা।

গীতাঞ্জলির স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও দক্ষ হাতের মধ্যস্থতা ঘটেছে। ইয়েটস, জিদ, বুনিন ও পাস্তেরনাকের মতোই হিমেনেথ পরে নোবেল পুরস্কার পান (১৯৫৬ সালে)। গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ বের হয় ১৯১২ সালে, ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। হিমেনেথ ও তার স্ত্রী জেনোবিয়া মিলে ১৯১৩ থেকে ১৯২০-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাইশটি বই স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেন। এর মধ্যে রয়েছে ক্রিসেন্ট মুন, গীতাঞ্জলি, গার্ডনার, ডাকঘর, স্ট্রে বার্ডস, রাজার ও রানী, মালিনী ও হাংরি স্টোনস গল্প-সংগ্রহ। স্প্যানিশ ভাষায় এদের অনুবাদকর্ম এতই সার্থক যে, পরে হিমেনেথের নিজের বই যেখানে অবিক্রীত অবস্থায় ধুলোচাপা থাকত, রবীন্দ্রনাথের তখন প্রতি বছরে হাজার হাজার কপি বই বিক্রি হতো। ১৯২১ সালে প্যারিস থেকে মাদ্রিদে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত আর স্পেনে যাওয়া হয়নি কবির। ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিমেনেথ-দম্পতির আর দেখা হয়ে ওঠেনি। সেবার স্পেনে গেলে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেতেন কী অসাধারণ আয়োজন করা হচ্ছিল স্পেনে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য। হিমেনেথের ইচ্ছে ছিল স্বীয় জন্মভূমি আন্দালুশিয়ায় কবিকে নিয়ে যাওয়ার। পরিকল্পনা ছিল কত কী! রবীন্দ্রনাথের মুখে বাংলায় কবিতা পাঠ শুনবেন, স্পেনের ছেলেমেয়েরা করবে কবির সামনে তারই লেখা 'বিসর্জন' নাটক, আর সেই নাটকে মহড়া দিচ্ছিলেন রুবেন দারিও, লুই বনুয়েল, আর নামভূমিকায় তরুণ কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোর্কা স্বয়ং। কী চমৎকারই না হতে পারত রবীন্দ্রনাথের স্পেনে আগমন! ঐতিহাসিক এই অসাক্ষাতের অবশ্য প্রভাব থেকে গিয়েছিল তার পরেও বহুকাল অবধি। এই প্রভাব এসে পড়েছিল হিমেনেথ-লোর্কার সূত্রে পরে আরেক নোবেলজয়ী কবি চিলির পাবলো নেরুদার ওপরেও। লাতিন মহাদেশের এই কবি তার সৃষ্টিশীলতার গোড়ার পর্বেই রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেনথ সে কথা আমাদের জানা। তার 'বিশটি প্রেমের কবিতা আর একটি হতাশার সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থের ১৬তম কবিতার স্তোত্র প্রত্যক্ষভাবে শুরু হয় 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' চরণটি দিয়ে। এখানেও দেখতে পাচ্ছি এক প্রাচ্যের সুর কীভাবে অন্য প্রাচ্যকে প্রভাবিত করছে। হিমেনেথ দম্পতি যেখানে রবীন্দ্রনাথের মরমি ছায়ায় আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছেন, নেরুদা সেখানে সেই একই উৎস থেকে খুঁজে নিচ্ছেন অনশ্বর প্রেম ও বিরহের পদাবলি। রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করতে করতে হিমেনেথের এক সময় মনে হয়েছিল, এতে বড় বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন তিনি, ক্ষতি হচ্ছে তার নিজেরই সৃষ্টিকর্মের। সে জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুবাদকর্ম এক পর্যায়ে বন্ধ পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন। হয়তো স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অথবা আন্দালুশিয়ার ভূ-প্রকৃতির মধ্যেই এমন কিছু উপাদান ছিল, যা রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার সমীপবর্তী। লোর্কার সুস্নিগ্ধ গীতিকবিতা বা ব্যালাডগুলো স্মরণ করলে এই সম্ভাবনা দূরান্বয়ী বলে মনে হয় না। এর বহু পরে আরেক নোবেলজয়ী কবি মেক্সিকোর ওক্টাভিও পাজ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ১৯৬৭ সালে লিখলেন, এখানে মেক্সিকোয় 'তরুণরা তেমনই আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পড়ে, যেভাবে তাদের দাদামশায়রা একশ' বছর আগে রোমান্টিক কবিদের রচনা পড়তেন।' পাজ নোবেল পেয়েছিলেন ১৯৯০ সালে।

লাতিন মহাদেশের আরেক নোবেলজয়ী কবি চিলির গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল। গীতাঞ্জলির কিছু কবিতা তিনি অনুবাদ করেন এবং কবির একটি নির্বাচিত কবিতা সংকলনও প্রকাশ করেন। সত্য, মৃত্যু, সুন্দর, পার্থিব এসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে-পদ্যে যা লিখে গেছেন তা নিয়ে প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন মিস্ত্রাল। মিস্ত্রালের 'নির্বাচিত গদ্য ও গদ্য-কবিতা'য় একটি অংশ রয়েছে, যার নাম 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে কয়েকটি মন্তব্য'। রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে তার মনে তাৎক্ষণিক যেসব প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা গদ্য-কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন মিস্ত্রাল। আখেরে সেটি নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। মিস্ত্রাল রবীন্দ্রনাথের মতোই ভাববাদী দার্শনিক ছিলেন– এ কথা মনে রাখলে দুই প্রাচ্যের মধ্যকার যোগসূত্র বুঝতে কষ্ট হয় না। মিস্ত্রালের রবীন্দ্রনাথ-অনুপ্রাণিত মন্তব্যটির অংশবিশেষ এ রকম। 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে বলছেন : 'না, আমার বিশ্বাস হয় না যে আমি হারিয়ে যাব মৃত্যুর পরে। হারাবার হলে তুমি আমাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলে কেন, যদি নিঃশেষিত আখের ক্ষেতের মতো আমাকে এক সময় পরিত্যক্ত ও শূন্য হয়েই পড়ে থাকতে হয়? প্রতিদিন সকালে আমার হৃদয়ে আর কপালে এমন আলো তুমি কেন ছড়াবে, যদি আমাকে আলগোছে বেছে না নেবে,

যেমনটা বেছে নেয় শরতের রোদে ভিজে ওঠা আঙুর ক্ষেত থেকে সবচেয়ে পরিপক্ক আঙুরটিকে? না, মৃত্যুকে বরফহিম বা মমতাশূন্য বলে মনে হয় না আমার, যেমনটা অন্যদের কাছে ঠেকে। বরং মৃত্যু যেন অনর্গল তেজের বিকিরণ এক, শরীরকে ছাই করে দেয় কেবল আত্মাকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য। মৃত্যুর স্পর্শ কঠিন, তিক্ত এবং তীব্র, যে রকম তোমাকে ভালোবাসা, তোমার বিস্ময়-জাগানিয়া ভালোবাসা!' মিস্ত্রাল স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু বিষয়ক নশ্বর-অবিনশ্বর সংক্রান্ত ভাবনাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে বলছেন, 'ওই-যে, চাকা ঘুরছে ঝনঝনি/বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি?' সে ধ্বনি মিস্ত্রালকেও স্পর্শ করেছে। এখানে বলা দরকার যে, ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাপ্তির পর মিস্ত্রালই দ্বিতীয় ব্যক্তি, যিনি ১৯৪৫ সালে নোবেল পেয়েছিলেন তৃতীয় বিশ্ব থেকে। সাহিত্যে প্রাচ্যের তৃতীয় নোবেলপ্রাপ্তি আরও অনেক পরে: জাপানে কাওয়াবাতা পান ১৯৬৮ সালে। রবীন্দ্রনাথের মতোই মিস্ত্রাল সক্রিয় ছিলেন নানা ক্ষেত্রে। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন গোটা লাতিন মহাদেশে। এ নিয়ে ওকাম্পোর সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে চিঠি বিনিময় হয়েছিল তার। আজ পর্যন্ত 'ওকাম্পোর সাথে মিস্ত্রালের পত্রালাপ' একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে রয়েছে লাতিন আমেরিকার সাহিত্য-শিল্প আন্দোলন অনুধাবনের জন্য। এই দুই বিদুষী সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। উল্লেখ্য, কবির লেখার প্রতি চিলির তরুণ কবি পাবলো নেরুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মিস্ত্রালই প্রথম। ষাটের দশকে ওক্টাভিও পাজ যখন মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত ছিলেন ভারতে, তখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক স্মারক বক্তৃতায় তিনি রবীন্দ্রনাথ ও লাতিন আমেরিকা সংক্রান্ত 'সভ্যতার আলাপ' নিয়ে বলতে গিয়ে ওকাম্পো ও মিস্ত্রাল এ দুই অমোচনীয় যোগাযোগের কথা ও সেই সুবাদে তরুণতর প্রজন্মের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তবে রবীন্দ্রনাথ-লাতিন মহাদেশের মধ্যকার উষ্ণ যোগাযোগের ইতিহাসে ব্যতিক্রম ছিলেন একজন। তিনি বরাবরই ব্যতিক্রমী লেখা ও চিন্তার ধরনে। শুধু ধরনে নয়, ধারণাতেও। নোবেল পাননি বটে, কিন্তু অনেক বারই তার নাম এসেছিল। বিখ্যাত না-পাওয়াদের দলে বোর্হেসের নাম সামনের কাতারে। 'স্বর্গ হবে এক বিশাল লাইব্রেরির মতো'– এ কথাটি যিনি বলেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের বই পড়েননি– তা তো হওয়ার নয়। শুধু পড়েই ক্ষান্ত হননি; ১৯৩৭ সালে বেরুনো রবীন্দ্রনাথের সিলেক্টেড ওয়ার্কস-এর ম্যাকমিলান এডিশন হাতে পেয়ে দ্রুত এর একটি সমালোচনাও লিখে ফেলেন বোর্হেস। সমালোচনাটি মধুর ছিল না 'তার সব লেখাই ঘুরেফিরে চন্দ্র আর সূর্যকে নিয়ে।' বোর্হেস এ রকম বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। মহারথীদের মধ্যকার প্রথম সন্দর্শন সব সময় ভালো যায় না। যেমন, রবীন্দ্রনাথ একবার বোদলেয়ারের কবিতা শুনে 'ফার্নিচার পোয়েট' বলে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিলেন। বোর্হেসের কাছেও রবীন্দ্রনাথকে একঘেয়ে পুনরুক্তিপ্রবণ বলে মনে হয়ে থাকবে। বোদলেয়ার সম্পর্কে কবির কটূক্তি বোর্হেস ভোলেননি। ১৯২৪ সালের স্মৃতিচারণ করে তিনি যা লিখছেন তা মোটামুটি এই দাঁড়ায় : 'তেরো বছর আগে নমস্য ও সুকণ্ঠের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলার কিছুটা ভীতিকর সুযোগ হয়েছিল আমার। আমরা তখন বোদলেয়ার নিয়ে কথা বলছিলাম। কেউ একজন পাঠ করছিল বোদলেয়ারের 'ডেথ অব লাভার্স', যেখানে বিছানা, ডিভান, ফুল, চিমনি, ফায়ারপ্লেসের তাক, আয়না এবং দেবদূতের উল্লেখ ছিল। কবি মন দিয়ে শুনছিলেন কবিতাটি। পড়া শেষ হলে মন্তব্য করলেন, 'আমি তোমাদের ফার্নিচার পোয়েটকে পছন্দ করি না।' সে মন্তব্যে আমি মন থেকে সায় দিয়েছিলাম। আজ কবি নিজের লেখাগুলো আবারও পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছে রোমান্টিক কাব্যের প্রায় তাৎপর্যহীন অলঙ্কারের সমারোহ তাকে ততটা বিচলিত করেনি, যতটা তাকে টেনেছিল অস্পষ্টতার প্রতি অপ্রতিরোধ্য মোহ। রবীন্দ্রনাথ অসংশোধনীয়ভাবে অস্পষ্ট উচ্চারণ করে থাকেন। তার এক হাজার একটা লাইনের মধ্যে কোথাও কোনো লিরিক্যাল টেনশন নেই, এক তিলও বাক পরিমিতি নেই। নির্বাচিত সংগ্রহের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'ফর্মের সমুদ্রে ডুবে যেতে হবে এর স্বাদ পাওয়ার জন্য।' এ ধরনের চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথের সহজেই আসে। একাধারে তা অবয়বহীন এবং সহজে যাকে শনাক্ত করা যায় না। অর্থাৎ অস্পষ্টতা, অচিহ্নিত আবেগ এবং নির্মাণে শৈথিল্য।' এই হচ্ছেন বোর্হেসের রবীন্দ্রনাথ। বোদলেয়ার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'ফার্নিচার পোয়েট' মন্তব্যে বোর্হেস সায় দিয়েছিলেন; কেননা কবি হিসেবে বোর্হেসের নিজেরও 'রিয়ালিটি'র চেয়ে 'আন-রিয়ালিটি'র প্রতিই বেশি পক্ষপাতিত্ব ছিল। কিন্তু ১৯২৪ সালে তাকে যতটা রবীন্দ্র-অনুরক্ত হিসেবে পাই, ১৯৩৭ সালে এসে দেখি সেই উচ্ছ্বাস অনেকটাই কমে এসেছে। বোর্হেস যে অনুষ্ঠানের কথা বলছেন তার কিছুদিন বাদেই কবি চলে আসেন আর্জেন্টিনা থেকে। ফিরতি পথে জাহাজ থেকে রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পোকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে মনে হয়, বোদলেয়ার সম্পর্কে কবির কিছুটা হলেও মত পরিবর্তন হয়েছিল। ওকাম্পোর বাসায় বোদলেয়ার চর্চা হচ্ছিল মূল ফরাসি ভাষাতে; সেটা বোদলেয়ারভক্ত ওকাম্পোর আগ্রহেই। রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পোকে লিখেছিলেন, 'বিজয়া, বোদলেয়ারের সেই যে কবিতাটি তোমার সাথে পড়েছিলাম, তার লিরিক্যাল অর্থটি এতদিন পরে আমার কাছে ধরা দিচ্ছে।' ত্রিশের দশকে তরুণতর কবিকুলের সঙ্গে বিশেষত বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর কথা এখানে বলতে হয়– আধুনিক কবিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের তর্কে-বিতর্কে বোদলেয়ার আরও আগ্রহের সঙ্গে পর্যালোচিত হবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে রকম কোনো পুনর্চিন্তা বোর্হেসের মনে পরে জেগেছিল কি-না তা এখনও সহজে জানার উপায় নেই। বোর্হেস রবীন্দ্রনাথকে জেনেছিলেন ইংরেজি অনুবাদের সূত্রেই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলি পড়ার সুযোগ হয়নি। কবির শেষ এক দশকের কবিতা তার সহজে জানার উপায় ছিল না অনুবাদের অভাবে। হতে পারে যে ন্যাশনালিজমের সমালোচনা, রাশিয়ার সমাজতন্ত্র, সভ্যতার সংকট, সাম্রাজ্যবাদ– এসব বিষয়ে বোর্হেসের তুলনামূলক আগ্রহ ছিল কম। ফলে এসব বিষয়ে তিনি ইপি থম্পসন, ইসাহ বার্লিন বা ব্রেখটের মতো উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো কিছু খুঁজে পাননি রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু আমরা যারা নানাদিক থেকে কবিকে দেখার প্রচেষ্টা করেছি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের অস্পষ্টতা ও পিচ্ছিলতার বোর্হেসীয় অভিযোগ ('ইমপ্রেসাইজ অ্যান্ড ফ্লুইড) কিছুটা কষ্টকল্পিত মনে হয় বৈকি। এটা হয়তো কবির কিছু কিছু লেখার ক্ষেত্রে খাটে; সমগ্র রচনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে নয়। বরং সামগ্রিক বিচারে তা অত্যন্ত নির্দয় অভিধা বলেই ঠেকবে।

৩. কাফকার 'ছদ্মবেশী জার্মান'

অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক কবি-সাহিত্যিক বা এমনকি দার্শনিক-বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপচারিতায় আগ্রহী হয়েছেন। অনেকেই কেবল একবার দেখতে চেয়েছেন তাকে বা তার ভাষণ শুনতে চেয়েছেন। যেন তিনি কোনো জনপ্রিয় অভিনেতা বা সঙ্গীতশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ যখন পঞ্চাশ পেরিয়েছেন তখন থেকে পরবর্তী দুই দশক পর্যন্ত তাকে ঘিরে এক ধরনের ক্রেজ বা উন্মাদনা ছিল পাশ্চাত্যের সারস্বত সমাজে। যেন তাকে ব্যক্তিগতভাবে না জানতে পারলে, তার রচনার সঙ্গে অপরিচিত থাকলে ঠিক বিদগ্ধ সমাজে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। অন্তত বিশ্ব-সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতার সঙ্গে সম্যক জানা-শোনা রয়েছে– এ দাবি যেন করাই যায় না। আজকের যুগের ভাষায় যাকে বলে 'স্টার কোয়ালিটি', স্বীকার করতেই হবে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তা কিছুটা বেশি পরিমাণেই ছিল। কিন্তু এ ধরনের গুণাগুণ সাধারণ্যে যতটা বিবেচ্য, যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি রাখেন সেসব দিকপালের জন্য কেন অতটা গুরুত্ব

পাবে? ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, জাপান বা চীনে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা দু'দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছেন। এক দল চাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু তাদের সঙ্গেই মেলামেশা করুন; তাদের ডাকা সান্ধ্য-আড্ডাতেই মধ্যমণি হয়ে থাকুন। আরেক দল আবার অভিযোগ করছেন যে, 'প্রাচ্যের রবীন্দ্রনাথ' বুঝতে পারছেন না আসলে তাকে নিয়ে কী ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যের চোখে হাস্যাস্পদ করে তোলার জন্য। যেমন, রবীন্দ্রনাথের জার্মান প্রকাশক কুর্ট উয়োলফ্ অস্ট্রিয়ান লেখক স্টেফান জোয়াইগকে লিখছেন যে, যদিও কবির জার্মানি ভ্রমণ মোটের ওপর সফল হয়েছে, কিন্তু 'জার্মান' সাংবাদিক মহল তাকে নিয়ে যেসব বোকামি করেছে সেগুলো তিনি বুঝতে পারেননি। অবশ্য 'ভুলাভালা' রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তির বিপরীতে 'চতুর' রবীন্দ্রনাথের অভিযোগও উঠেছিল, বিশেষত তার নোবেলপ্রাপ্তির পর। মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট (মমা)-র ইরিস ব্যারিকে ১৯১৭ সালেই কবি এজরা পাউন্ড লিখেছেন, 'আমাদের সময়কার চতুরতম প্রচারের জন্যই টেগোর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন'। প্রমাণ হিসেবে পাউন্ডের যুক্তি ছিল যে, কবির ঋষিসুলভ রূপ, আধ্যাত্মিকতা ও আশাবাদের প্রচার প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিতে তাকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যায়, যার কাছে টমাস হার্ডি বা হেনরি জেমসের মতো নোবেল প্রত্যাশী লেখকরা 'হেরে যান'। বোকা বা চতুর– এ রকম পরস্পরবিরোধী অভিধার পেছনে অসাহিত্যিক কারণ থাকতে পারে– এ রকম অনুমান অসঙ্গত নয়। সৌরীন্দ্র মিত্রের 'খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে' সত্তর দশকে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে কেবল এই মৌলিক অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই। পরবর্তীকালে এ প্রশ্নও উঠেছে যে, রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে মুগ্ধতা কমে গেছে অনেকের ক্ষেত্রেই সে কি কেবল অসাহিত্যিক কারণে, নাকি তার রচনার ইংরেজি অনুবাদের ক্রমাগত পড়ে যাওয়া মানও সত্যি সত্যি দায়ী?

কিছু কিছু রচনার অনুবাদ নিয়ে কথা উঠতেই পারে, কিন্তু মুগ্ধতা-অমুগ্ধতার পালাবদল শুধু অনুবাদ নিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ১৯১৩ সালের পর থেকেই পাউন্ড রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। অথচ গত শতকের বিশের দশকে বিলেতের উচ্ছ্বাস ততদিনে কিছুটা কমে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন রাসেল শিষ্য দার্শনিক ভিটগেনস্টেইন। ভিয়েনা সার্কেলের অন্যান্য সহকর্মীকে তিনি উৎসাহ নিয়ে নাটকটি পড়াচ্ছেন, এমনকি এক পর্যায়ে নিজেই ইংরেজি থেকে নাটকটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এতে রবীন্দ্রনাথের অনূদিত রচনায় অমুগ্ধতার কোনো প্রমাণ মেলে না। ত্রিশের দশকের গুরুতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে কবি ও সমালোচক পল ভ্যালেরির প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল 'আধ্যাত্মিকতা ও আশাবাদের প্রচার' হয়ে থাকেন; তার নাটক ও চিত্রকলা বস্তুত সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরে। পাউন্ডের দুর্ভাগ্য যে, আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' তার জানার উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নাটক বিশেষত বিশের দশকের নাটকগুলো অনেকাংশে সমাজ-বিদ্ধ, এমনকি সমাজ-রাষ্ট্র বদলে দেওয়ার মন-মানসিকতা থেকে লেখা। এজরা পাউন্ড এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা যে তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার বাইরে বা বেঙ্গল স্কুল অব আর্টের গণ্ডি ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দিকে যাত্রা শুরু করেছিল– যার নিকটতম তুলনা কেবল এক্সপ্রেশনিজম, এমনকি যা কখনও কখনও অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের সন্নিকটে নিয়ে যায়; তা কি পাউন্ডের চোখে পড়েনি? পড়েনি– তা একেবারে বলা যাবে না। ১৯১৩ সালের পর থেকে পাউন্ড রবীন্দ্রনাথকে এক প্রকার 'ধর্মগুরু' হিসেবেই দেখে আসছেন। অথচ কবির চিত্রকলায় সনাতনী ঐতিহ্য বা কোনো অতীন্দ্রিয় চেতনার ছায়া পর্যন্ত নেই; সেখানে তিনি আধুনিকের চেয়েও আধুনিক। পল ক্লি, কান্ডিনস্কি, অন্দ্রে ব্রেতো বরং তার কাছের মানুষ শিল্প-চেতনায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাউন্ডের শেষ সাক্ষাৎ প্যারিসে ১৯৩০ সালে, ঠিক যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনী জার্মানি হয়ে প্যারিসে পৌঁছেছে। সিলেক্টেড লেটার্স থেকে জানা যাচ্ছে, পাউন্ড 'ঘণ্টাদুয়েক ছিলেন' এবং 'প্রচুর কথা' বলেছিলেন। সে ক্ষেত্রে এ প্রশ্নই জাগা স্বাভাবিক নয় কি যে, পল ভ্যালেরি যেটা এক পলক দেখেই বুঝতে পারলেন পাউন্ড সেটা দু'ঘণ্টা থেকেও বুঝতে পারলেন না কেন? রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখার কোনো কৌতূহল তার মনে জেগেছিল কি? চিত্রকলায় সবাই জীবনের সব পর্যায়ে সমানভাবে আকৃষ্ট হন না। সেটা পাউন্ডের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু কবির সঙ্গে দু'ঘণ্টা কথোপকথনের পরও, কি দুঃখের বিষয়, সে কথোপকথনের বিষয়বস্তু আমরা জানি না। তিনি বুঝতে পারেননি যে এই রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির পর্বের রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেকটাই আলাদা? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে অনেক ও বিভিন্নমুখী ঝোঁকের রবীন্দ্রনাথ মিশে আছেন, তা পাউন্ডের মতো পাশ্চাত্যের অনেক পর্যবেক্ষকই ঠিক বুঝতে পারেননি।

জনপ্রিয়তার পেছনে বা তার হ্রাস-বৃদ্ধির পেছনে সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক কারণ যা-ই থাক না কেন, এ কথা মিথ নয়, ভাবা বা বলা যে রবীন্দ্রনাথ এক সময় পাশ্চাত্যে অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন। বাসে-ট্রামে বেস্ট সেলার হিসেবে তাকে পড়ছে এ জিনিস বাংলায় আমরা কখনও দেখিনি বা কেউ দেখেছে বলে বলতে শুনিনি। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ এবং রাশিয়ায় এটা সত্যি সত্যি ঘটেছিল। মার্টিন ক্যাম্পশেনের 'টেগোর অ্যান্ড জার্মানি' বই থেকে সমীর সেনগুপ্তের অনুবাদে যে বিবরণ পাই তাতে এ রকম একটি ছবিই ভেসে ওঠে। অস্ট্রিয়ান লেখক স্টিফেন, জোয়াইগ 'সাধনা'র সমালোচনা লিখতে গিয়ে কথোপকথনের ফর্মকে আশ্রয় করেন। সে প্রবন্ধে কথা হচ্ছিল এক তরুণ লেখক ও এক বয়স্ক লেখকের মধ্যে। একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি, কিছুটা সম্পাদিত করে তা তুলে দিচ্ছি। কিন্তু জনপ্রিয়তার প্রমাণ হিসবে রচনাটি অকাট্য।

তরুণ লেখক : কী বই পড়ছিলেন?

বয়স্ক লেখক : রবীন্দ্রনাথ টেগোরের দার্শনিক তত্ত্ব 'সাধনা'– সবে বেরিয়েছে জার্মানিতে।

তরুণ লেখক : এখনও ওইসব পড়ছেন? সত্যি, আপনাকে বুঝতে পারি না আমি।

বয়স্ক লেখক : কেন, টেগোরের নতুন বই পড়তে ইচ্ছে– কেবল ইচ্ছে নয়, ভিতর থেকে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা– কেন হবে না? এই তো মাত্র মাসদুয়েক আগে আমরা এই ঘরেই বসে 'স্ট্রে বার্ডস' পড়ছিলাম– আমার মতো তুমিও তো ওই কবিতাগুলোর সংহত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলে তখন...

তরুণ লেখক : হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। সে সময়ে আমার সত্যিই মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা বিস্ময়কর প্রকাশ। ... [কিন্তু] এই মুহূর্তে আমি তার নামটাও সহ্য করতে পারছি না। বইয়ের দোকানগুলো এড়িয়ে চলি– ঢুকলেই দেখতে হবে, প্রত্যেকটা বইয়ের মলাট থেকে এই ভারতীয় জাদুকর হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে আছেন, চল্লিশটা দোকানে একই দৃশ্য। ট্রামে বা ট্রেনে চড়তে ভয় করে– কারণ চোখে পড়বেই, কোনো মধ্যবিত্ত ছেলে বা মেয়ে তার কবিতা পড়তে পড়তে চলেছে ট্রেনে– আপনি ভাবুন তো!'

অন্যত্র জোয়াইগ লিখছেন, 'জার্মানিতে– এ দেশটার কোনো মাত্রাজ্ঞান নেই। লোকে ওকে নিয়ে বড়ো বেশি মাতামাতি নাচানাচি করেছে। শুভেচ্ছা দেখাচ্ছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু বড়োই বাড়াবাড়ি।'

সূচনায় সমাদরের আতিশয্য জোয়াইগের মতো টমাস মান (পরবর্তীতে নোবেলজয়ী)-এর মতো ব্যক্তিত্বকেও অস্বস্তিতে ফেলেছিল। জোয়াইগ আর রবীন্দ্রনাথ একই মানসিকতার লোক : তাদের দর্শন-বিশ্বাস মঙ্গল-অমঙ্গলবোধ একই সূত্রে গাঁথা

ছিল। কিন্তু টমাস মানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগতের মধ্যে ছিল অকৃত্রিম দূরত্ব। যেমন দস্তয়েভস্কি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তিনি, যেখানে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল তলস্তয়। শোপেনহাওয়ারের নৈরাশ্যবাদে মানের মানবিক ভুবন আচ্ছন্ন হয়েছিল। তার ওপরে ছিল নিটশের দূরপনেয় ছায়া। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের থিওডর এডর্নোর সঙ্গে টমাস মানের বন্ধুত্ব শুধু সঙ্গীত বোঝার ক্ষেত্রে সীমিত ছিল না; মান দার্শনিক এডর্নোর নেগেটিভ ডায়ালেকটিকস ও বিনাশী পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে বিশ্বাস করতেন। সেজন্যই তিনি লিখতে পেরেছিলেন ড. ফস্টাস-এর মতো উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের পুঁজিবাদবিরোধী প্রকল্প জোরেশোরে শুরু হয় আরও বেশ খানিকটা পরে। 'ন্যাশনালিজম' প্রবন্ধমালা দিয়ে এর প্রবল উচ্চারণ প্রথম শুনতে পাওয়া যায়, তারপর 'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরীর দুর্ব্যবস্থার সমালোচনা 'ছোট ও বড়' বা তারও আগে 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধমালা, যেখানে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রতিতুলনা টানছেন এবং সাম্রাজ্যের প্রতি সমালোচনার তীর সুযোগ পেলেই ছুড়ে দিচ্ছেন, তা টমাস মানের জানার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে বা যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার শান্তিপূর্ণ 'প্যাসিফিস্ট' অবস্থান দেখে মান তাকে মনে করেছিলেন একজন নিরীহ শান্তিবাদী বা নির্বিবাদী মানবতাবাদী হিসেবে। ইউরোপে যুদ্ধের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে মানের মতো মানুষের পক্ষে নিজেকে দার্শনিকভাবে শুধুমাত্র 'মানবতাবাদী' অবস্থানে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব ছিল। সর্বব্যাপী অবক্ষয়কে শুধু মানবতাবাদ দ্বারা পরাস্ত করা যাবে না- মান এটা জানতেন। এডর্নো-হর্কহেইমারের মতো তিনিও মনে করতেন, পুঁজিবাদের আকাশের নিচে 'কালচারও একটি ইন্ডাস্ট্রি'; এনলাইটেনমেন্ট বা রেনেসাঁ তত্ত্ব হচ্ছে এক ধরনের 'জন-প্রতারণা' (মাস ডিসেপশন); 'পপুলার কালচার'-এর মাধ্যমে সাধারণ্যকে কৌশলে সরিয়ে রাখা হচ্ছে হাই-আর্টের বলয় থেকে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মাতামাতির পেছনে আসলে সুকৌশলে 'শান্তির বাণী' ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে দরকার ছিল আরও আক্রমণাত্মক অবস্থানের। পুঁজিবাদ শেষ পর্যন্ত লোভের চক্রে পড়ে যুদ্ধকেই অনিবার্য করে তোলে। ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও জাতি-বৈরীর অবসান এ ব্যবস্থায় রীতিমতো অসম্ভব প্রকল্প। ঋষি-চেহারার রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে সাধারণ মানুষের যুদ্ধবিরোধী ঘৃণাকে আরও শাণিত অবস্থানে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে এক ধরনের সর্ব-পাপঘ্ন সর্ব-মঙ্গলবোধের মধ্যে আটকে ফেলা হচ্ছে। এ ধরনের খ্রিষ্টীয় মানবতাবাদে টমাস মান বা তার নিটশীয় বন্ধুদের প্রায় বিবমিষা ছিল। গীতাঞ্জলি পর্বের রবীন্দ্রনাথকে আদর্শিকভাবে মেনে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। রবীন্দ্রভক্ত কাউন্ট কাইজারলিংকে এক চিঠিতে মান তাই লিখেছিলেন, 'আমি ধরে নিচ্ছি তিনি স্বভাবত একজন ভারতীয় শান্তিবাদী, এক ধরনের নির্বিবাদী মানবতাবাদের দ্বারা উজ্জীবিত, যে প্রচণ্ড আবেগময় দ্বন্দ্বের মধ্যে আমি বছরের পর বছর কাটিয়েছি তার পাশাপাশি রাখলে একে আমার প্রায় বৈরীভাবাপন্ন বলে মনে হয়।'

টমাস মান রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুল ভেবেছিলেন। কাইজারলিংকে চিঠি লিখেছেন ১৯২১ সালে। ততদিনে তার নিশ্চয়ই জানা হয়ে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড ত্যাগ করেছেন। ন্যাশনালিজম প্রবন্ধমালায় নেশনের যে সমালোচনা করা হয়েছে তা নিছক শান্তিবাদী (প্যাসিফিস্ট) অবস্থান থেকে নয়। নেশন হচ্ছে বণিক-ব্যবস্থারই কলের যন্ত্র, যা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। নেশন হচ্ছে এক বিপুলকায় 'অর্গানাইজেশন' (যদিও বণিক-ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদ এ রকম শব্দবন্ধ রবীন্দ্রনাথ তখনও ব্যবহার করতে চাননি)। রক্তকরবীতে যক্ষপুরীর ব্যবস্থা নেশনেরই আকার-প্রকার। রাজা যখন বলছে, আমার যন্ত্র আমার পোষ মানছে না- এই যন্ত্রই নেশনের অর্গানাইজেশন। এখানে পুঁজিতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্র একাকার। তবে মানের চিঠিপত্র থেকে এ ধারণাও মেলে যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জানাশোনার জন্য তার আরও সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু সে সময় তার হাতে নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে 'একটা সত্যিকার জানাশোনা হতে পারবে- যদি সেই জানার অভিঘাত আমার এখনকার দ্বিধাকে পরাভূত করতে পারে,- এমনটাই লিখেছিলেন তিনি কাইজারলিংকে। রবীন্দ্রনাথও মানের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছিলেন সেটা তার আদি রচনা 'বাডেনব্রুকস' উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণে। তবে মানের আরও বিখ্যাত উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হয় আরও পরে; ম্যাজিক মাউন্টেন ১৯২৪ সালে, ড. ফস্টাস ১৯৪৭ সালে এবং কনফেশানস অব ফেলিক্স ক্রুল ১৯৫৪ সালে। মান নোবেল পুরস্কার পান ১৯২৯ সালে মূলত 'ম্যাজিক মাউন্টেন' উপন্যাসটির জন্য। ফলে মানকে সেবার জানার সুযোগ ছিল না তেমন রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু শেষাবধি মানের দ্বিধা কাটেনি। যখন কুর্ট উয়োলফের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত দু'জনার দেখা হলো, রবীন্দ্রনাথকে তার বরং মনে হয়েছিল 'এক চমৎকার ইংরেজ বৃদ্ধা রমণী' হিসেবে! স্পষ্টতই মান এখানে ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথের ঢিলেঢালা আলখাল্লার মতো পোশাকের প্রতি। এটাকে সাক্ষাৎ না বলে অ-সাক্ষাৎই বলা উচিত। কেননা, মান রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে গিয়ে তার স্ত্রীকে সামনে ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন, তার চেয়ে তার স্ত্রীই ভালো ইংরেজি বলতে পারবেন। কিন্তু মার্টিন ক্যাম্পশেনের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, এড়াতে চাইলেও রবীন্দ্রনাথ অন্তত তাকে চিনতে যাতে পারেন সেটি মনে মনে ঠিকই আশা করেছিলেন মান। তাই দিনলিপিতে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'বোধ হয় ঠিক ধরতে পারলেন না- আমি কে।' এতে তার প্রখর আত্মমর্যাদাবোধে সম্ভবত আঘাত পড়ে থাকবে।

মুগ্ধতা-অমুগ্ধতার দোলাচলে আমরা দেখতে পাই আরেকজন ভবিষ্যৎ নোবেল বিজয়ী জার্মান সাহিত্যিক হেরমান হেসেকেও। মান যেখানে দর্শনগত অবস্থানে রবীন্দ্রনাথের থেকে অনেক দূরত্বে, অন্তত গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে, 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের স্রষ্টা হেসে-এর অবস্থান ছিল স্বাভাবিকভাবেই কবির অনেক কাছাকাছি। হেসের চোখে গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথই ছিলেন মুখ্য এবং প্রিয়তর। কবির গীতাঞ্জলি, গার্ডেনার ও ঘরে-বাইরে- এই তিনটি বইয়ের সমালোচনা লিখেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হেসে একটি চিঠিতে এ রকম অভিমত রাখেন যে, পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিতে 'অর্ধ-গ্রহণ'-এর মতো ভাটা পড়েছে, কিন্তু এর জন্য দায়ী আসলে তিনি নিজেই। বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে 'ফ্যাশন' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে এক সময় উৎসাহে ভাটা পড়ারই কথা। একই চিঠিতে হেসে স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন : 'খ্যাতির আকার যত বিশাল হয়, পরবর্তীকালের বিস্মৃতিও ততই অনমনীয় হয়। পাশ্চাত্য জগতে টেগোরের খ্যাতিরও আজ সেই অবস্থা হয়েছে। ইউরোপে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে টেগোর শুধু বিখ্যাত ছিলেন না; তখন তার চর্চা করাটাই ফ্যাশন ছিল। কিন্তু পৃথিবী জায়গাটাই এমন যে, এককালে যাকে নিয়ে হৈ চৈ করা হয়েছিল তাকে পরে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়।' রবীন্দ্রনাথের যে তিনটি বই তিনি সমালোচনা করেছিলেন তার মধ্যে দুটি সমালোচনাতেই এক ধরনের উন্নাসিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, গীতাঞ্জলির আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'এই গানগুলি ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সর্বেশ্বরবাদী ঐতিহ্যে ভরপুর- এদের বিষয় হলো প্রার্থনা, ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, আত্মার মিনতি ও রূপকথা। কিন্তু এইখানেই তার আধুনিকতা লক্ষ্য করার মতো যে, ঈশ্বরের ধারণাকে তিনি প্রায় কোনো ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। এই ক্ষুদ্র বইটি তীব্র ও পবিত্র অনুভূতিতে ভরা। কিন্তু এতে নতুন কথা খুব একটা নেই।' আপাত প্রশংসার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌলিকত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার নয়। কেননা, গীতাঞ্জলির ঈশ্বর-ভাবনায় উপনিষদীয় ছায়া আছে ঠিকই, কিন্তু তারও চেয়ে বেশি আছে কবির নিজস্ব ধারায় ঈশ্বর বা জীবন-দেবতাকে ভাবার

প্রয়াস। এখানে সর্বেশ্বরবাদ বা প্যানথেইজমের প্রকাশ কোথায় পেলেন সে প্রশ্ন হোসেকে করতে ইচ্ছে করে। আবারও প্রচলিত কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথকে ধরার চেষ্টা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ 'পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, কাব্যময় পূজার জগতে দিন কাটান, যার ভারতীয়ত্ব ইউরোপীয় সাহিত্যের রঙে রঞ্জিত'। রবীন্দ্রনাথ গুহা-সুলভ নির্জনে দিন কাটান, কবিতা লেখা তার জন্য পূজার উপচার– এসব ইঙ্গিত গীতাঞ্জলির আগে ও পরের রবীন্দ্রনাথকে যারাই কিছুটা তথ্য-উপাত্তে জানতে চেয়েছেন তাদের কাছেই বিস্ময়কর ঠেকবে। আর কবির 'ভারতীয়ত্ব ইউরোপীয় সাহিত্যের রঙে রঞ্জিত'– এ কথা বলে তিনি সম্ভবত বোঝাতে চাইছেন যে, কবি পাশ্চাত্যে অতটা জনপ্রিয়তা পেতেন না যদি না তার প্রাচীয় বিষয়বস্তুকে প্রতীচ্যের মোড়কে পরিবেশন না করতেন।

এটা যে কষ্টকল্পনা নয়, তার সংকেত মেলে হেরমান হেসে-এর অন্য একটি লেখায়। 'ঘরে-বাইরে'র সমালোচনা করতে গিয়ে হেসে বলছেন : 'টেগোর যে কীভাবে ইউরোপের সাহিত্যিক শিল্পরূপকে আত্মস্থ করেছেন তা তার এই উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যায়। ধরেই নেওয়া যায়, এদেশে তার সর্বাধিক পঠিত বই হবে এটি, যদিও এটি তার আগের বইগুলোর মতো সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। একটি অপরিচিত ছন্দকে অনুসরণ করে চলে এই বই, জনপ্রিয় ইংরেজি উপন্যাসগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়।' এখানেও প্রশংসার পাশাপাশি অবমূল্যায়নের সুর পাচ্ছি। 'সর্বাধিক পঠিত হবে বই'– ঘরে-বাইরে সম্পর্কে এ রকম প্রশংসাবাক্য উচ্চারণের পর পরই মনে করানোর চেষ্টা যে এটা আসলে কোনো মৌলিক উদ্ভাবন নয়, বরং 'জনপ্রিয় ইংরেজি উপন্যাসের ঢঙে' লেখা বলেই এর যত সম্ভাব্য কাটতি। এটা কি হতে পারে যে হেসের প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ এক প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন? হেসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-চেতনার স্ফুরণ দেখেছেন; বিশ্বজোড়া এক অভিন্ন সূত্র খুঁজেছেন আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জন্য। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের জার্মানি ভ্রমণের সময় 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের ওপর কাজ করছিলেন হেসে। উপন্যাসটি বের হয় ১৯২২ সালে। এটিই তার সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা, যা ১৯৪৬ সালে হেসের নোবেলপ্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে।

সিদ্ধার্থ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসন্তান, কিন্তু কোনো কিছুতেই তার স্বস্তি নেই। পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যে তার আস্থা নেই, বাসনা পূরণের ভোগবাদেও তার শান্তি নেই, এমনকি বুদ্ধের তত্ত্বেও সে আশ্রয় খুঁজে পায় না। রবীন্দ্রনাথের মতো সিদ্ধার্থও বলে উঠতে পারত, হেথা নয় অন্য কোনোখানে সত্য রয়ে গেছে বা সর্বত্রই সত্য বিরাজমান– সব মত ও পথ দিয়েই সত্যের দ্বারে পৌঁছানো যায়। সিদ্ধার্থ বলেছেও স্পষ্ট করে : 'সত্য যে খুঁজছে সে কোনো বিশেষ মতকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে পারে না, যদি একান্তভাবে সে সত্যকে পেতে চায়। আর যে সত্যকে খুঁজে পেয়েছে তার জন্য সব পথই খোলা।' জীবনের শেষবেলায় এসে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সম্ভবত হেসের মনোভাব আরও ইতিবাচক হয়েছিল। পাশ্চাত্যে, বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত জনপ্রিয়তা হ্রাসের প্রতি ইঙ্গিত করে হেসে বলেছিলেন, এই বিস্মৃতি সাময়িক। এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'টেগোরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ নয়, কিন্তু আমি তার কথা গভীরভাবে চিন্তা করি– তার সময়কার বৌদ্ধিক পৃথিবীতে তিনি ছিলেন এক মহান ও বিশিষ্ট উপস্থিতি– প্রীতি ও আনন্দের সঙ্গে আমার এই উপলব্ধি হয়। এবং সাময়িক বিস্মৃতির পর আবার যখন তার পুনরভ্যুদয় হবে, তা জীবিত অবস্থায় দেখে যেতে পারলে আমি খুবই সুখী হবো।'

রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত ঈশ্বরবোধ ও মঙ্গল-চেতনা টমাস মানকে আকর্ষণ করতে পারেনি, হেরমান হেসকে আশ্বস্ত করতে পারেনি, আবার স্টিফেন জোয়াইগকে আপ্লুত করেছে। এই মুগ্ধতা-অমুগ্ধতার দোলাচলের মধ্যে আমরা তরুণ ফ্রানৎস কাফকাকেও দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের জার্মানি ভ্রমণের তিন বছর পর কাফকার মৃত্যু হয়। তার বন্ধু গুস্তাভ জানুক 'কাফকার সাথে কথোপকথন' লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। এই কথোপকথনের একটি জায়গায় আকস্মিকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথের জার্মান অনুবাদের প্রকাশক কুর্ট উয়োলফকে নিয়ে গল্প বলছিলেন গুস্তাভ তার বন্ধু কাফকাকে। উয়োলফ বেলা আটটার সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি অনুবাদ বাতিল করেছেন। এর মধ্যে খবর চলে এসেছে– কবি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। খবরটা জেনেই তাড়াতাড়ি ডাকঘরে গিয়ে বাতিলকৃত পাণ্ডুলিপিটা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন আবার। এ কথা শুনে কাফকা রহস্যপূর্ণভাবে বললেন, 'প্রথমে টেগোরকে সে কেন প্রত্যাখ্যান করেছিল সেটা কিন্তু বোঝা গেল না। এক হিসেবে, টেগোর আর কুর্ট উয়োলফের মধ্যে তো খুব বেশি পার্থক্য নেই। ভারতে আর লাইপজিগ যেমন, এদের মধ্যকার দূরত্ব আসলে বাহ্যতই। আসলে টেগোর হচ্ছেন এক ছদ্মবেশী জার্মান।' রবীন্দ্রনাথকে অনেক রকম অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে 'ছদ্মবেশী জার্মান', তাও আবার 'মেটামরফোসিস'-এর লেখকের কাছ থেকে! এর ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। পুরো ব্যাপারটাই কাফকাস্কীয়। এর পরের সংলাপগুলো আরও হেঁয়ালিতে ভরা, প্রায় অ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপের মতো। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বন্ধুকে আরও কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য গুস্তাভ জানুক এক পর্যায়ে বললেন : 'তিনি স্কুলশিক্ষক সম্ভবত এ রকমই, শুনেছি'। 'স্কুলশিক্ষক?' কাফকা গম্ভীর মুখে শব্দটা আবারও বললেন, তার প্রায় সব সময় চেপে রাখা ঠোঁটের কোনা বেঁকে গেল, তারপর মাথা নেড়ে উঠলেন, 'না, তা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু স্যাক্সন হতে পারে– যেমন রিচার্ড ভাগনার ছিলেন। কিছু বোঝা গেল না, প্রকৃতই কাফকাধর্মী সংলাপ। জানুক তারপর বললেন, 'অর্থাৎ টাইরোলিয়ান পোশাকে এক মরমিবাদী'। এবারে কাফকা তাতে সায় দিলেন, 'ধরো ওই রকমই কিছু'। 'টাইরোলিয়ান' পোশাক অস্ট্রিয়ার দিকে চালু, ওটা ওদের জাতীয় পোশাক, আল্পসের চাষিরা এ ধরনের ঢোলা-ঢালা পোশাক পরে থাকে। স্পষ্টতই এখানে রবীন্দ্রনাথের পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত।

'কাফকার সাথে কথোপকথন' বইটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীর্যক মন্তব্যের পেছনের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় : জার্মান অনুবাদে গীতা পড়ে কাফকা জানুককে বলেছিলেন, 'ভারতীয় ধর্ম বিষয়ক লেখাগুলো আমাকে যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করে। বিষ যেমন, তেমনি এদের মধ্যেও প্রলুব্ধকর ও জঘন্য উপাদান দুই-ই আছে। এসব যোগী ও জাদুকররা প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবন কাটায় তা এ জন্য নয় যে, মুক্তির প্রেমে তারা পুড়ছে। এটা তারা করছে কেননা জীবনের প্রতি তাদের গোপনে গোপনে এক ধরনের হিমশীতল ঘৃণা রয়ে গেছে। ভারতীয় ধর্মে ভক্তির যে প্রাবল্য দেখতে পাই তার মূলে রয়ে গেছে এক সীমাহীন নৈরাশ্যবোধ। জানুক এ প্রসঙ্গে শোপেন হাওয়ারের প্রসঙ্গ তুললেন। শোপেনহাওয়ারও তো এক নিখিল নৈরাশ্যবোধে চালিত ছিলেন। উত্তরে কাফকা বলেছিলেন, 'শোপেনহাওয়ার হচ্ছেন ভাষার কারিগর। ভাষাই তার চিন্তার উৎস। শুধুমাত্র ভাষার জন্য হলেও তাকে পড়তে হবে।' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও কি কাফকা এমনটি ভেবেছিলেন– একাধারে আকর্ষক ও বিকর্ষক একজন শিল্পীসত্তা হিসেবে? যেমনটা তিনি ভেবেছিলেন ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে? সে কথা জানার কোনো উপায় নেই। ওদিকে কাফকা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোনো উপায় ছিল না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে। আগেই বলেছি, এ ধরনের কথোপকথন যখন হচ্ছে তখন পর্যন্ত কাফকার মূল রচনাগুলো প্রকাশ হতে শুরু করেনি (একমাত্র মেটামরফোসিস ছাড়া, যেটি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে)। কাফকার কাছে তিনি 'ছদ্মবেশী জার্মান' হিসেবেই থেকে যাবেন। ১৯২৪ সালে কাফকার অকালমৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তার 'ট্রায়াল' ও 'কাসল' উপন্যাস। সেগুলো প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথেরই জার্মান প্রকাশক লাইপজিগের সেই কুর্ট উয়োলফ। ❖

[এই নিবন্ধের বাকি অংশ সমকালের শুক্রবারের সাময়িকী কালের খেয়ায় ২২ শ্রাবণ ১৪২৩ উপলক্ষ্যে প্রকাশ পাবে।]

তথ্যসূত্র : লেখাটির জন্য কয়েকটি তথ্য উৎসের ওপর বিশেষ করে নির্ভর করতে হয়েছে। অবধারিতভাবে সাহায্য নিয়েছি সমীর সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্র-সূত্রে বিদেশীগণ' বইয়ের। সূত্রের মধ্যে রয়েছে 'চিঠি-পত্রের বিভিন্ন খণ্ড ও কবির নানা পর্যায়ের প্রবন্ধাবলী।



উপন্যাস

হাসনাত আবদুল হাই

এপিটাফ

এক

গাড়ি এখন তাদের গ্রামের বাড়ির ঠিক সামনে আসতে পারে, আগের মতো বড় রাস্তায় রেখে বেশ খানিকটা হেঁটে আসার দরকার পড়ে না। পরমা অনেকদিন পর গ্রামে এলো বাবার সঙ্গে। তাই নতুন রাস্তা দেখে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বাবার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, এটাই কি সারপ্রাইজ?

অলঙ্করণ : : সমর মজুমদার

অধ্যাপক নজমুল হক বললেন, হ্যাঁ, মা। সারপ্রাইজ করার মতো না?

অবশ্যই। একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলাম। একটুও হাঁটতে হলো না। আমি তো হাঁটতে হবে ভেবে শঙ্কিত ছিলাম।

নজমুল হক গাড়ির দরজা বন্ধ করে সামনের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, সেই জন্যই তো নিয়ে এলাম তোকে। ছোট থাকতে কত এসেছিস। তারপর নানা অজুহাতে এড়িয়ে যেতিস। আসতে চাইতিস না।

পরমা বাবার হাত ধরে বলল, অজুহাত না, কারণগুলোর পেছনে যুক্তি ছিল। পড়াশোনা। পরীক্ষা। এসবের জন্যই আসা হয়নি। আসতে মন চেয়েছে খুব।

সত্যি বলছিস? নজমুল হক মেয়ের দিকে তাকান।

মিথ্যে বলব কেন?

তোর ভালো লাগে গ্রামে এলে?

খুউব। কী পরিষ্কার আকাশ! চারিদিকে কত সবুজ। ধোঁয়া নেই, ধুলা উড়ছে না। হৈচৈ নেই। ট্রাফিকের হুঙ্কার নেই। স্নায়ুকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে যত সময়। আর লোকগুলো কি সরল।

চমৎকার বলেছিস। তোর মধ্যে একটা রোমান্টিক মন আছে।

পরমা হেসে বলল, ওটা বোধকরি তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

সামনে ১০-১২ জন মানুষ দাঁড়িয়ে, বেশ বিনীত ভাব চোখেমুখে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি। শুধু একজন প্যান্ট-শার্ট পরে আছে, স্বাস্থ্য অন্যদের তুলনায় ভালো। চোখেমুখে সপ্রতিভ ভাব। সে সামনে এগিয়ে এসে সালাম দিয়ে নজমুল হককে বলল, চাচা আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? সে যেন একটু কুণ্ঠিত এমনভাবে বললো।

অসুবিধা? নাহ। কোনো অসুবিধা হয়নি। সকালে রওনা হয়ে বিকেলের মধ্যে পৌঁছে গেলাম মিঠাপুকুর গ্রামে। মাঝখানে বগুড়ায় লাঞ্চের জন্য একটু থেমেছিলাম। চমৎকার জার্নি। তারপর বললেন, তোমরা কি অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছ কামাল?

কামাল যুবকটির নাম। অধ্যাপক নজমুল হকের জায়গা-জমির কেয়ারটেকার। এই গ্রামেরই ছেলে। তার বাবা অধ্যাপক নজমুল হকের বন্ধু ছিলেন। কয়েক বছর হলো মারা গেছেন। কামাল তার বড় ছেলে, আইএ পাস করার পর পড়াশোনা করেনি। গ্রামেই নিজেদের জমিজমা দেখে। নজমুল হকের অনুরোধে তার সম্পত্তিও দেখাশোনা করছে। এর জন্য পারিশ্রমিক পায় সে। নিতে চায় না, লজ্জাবোধ করে। প্রায় জোর করেই দিতে হয়। ছেলেটাকে বেশ পছন্দ নজমুল হকের। পরমার বয়সের সমান হবে। ছোটবেলায় গ্রামে এলে পরমা তার সঙ্গেই বনে-বাদাড়ে, পুকুর পাড়ে ঘুরে ঘুরে ফল-ফুল জোগাড় করত। বেশিদূর পড়াশোনা না করায় কামাল এখন তার সামনে স্বাভাবিক হতে পারে না। কেমন যেন বিব্রতবোধ করে। পরমা লক্ষ্য করেছে।

কামালের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো অধ্যাপক নজমুল হকের জমিতে চাষবাস করে। বিনিময়ে ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ পায়। তার জমিতেই খড়ের ঘর তৈরি করে থাকে পরিবার নিয়ে। প্রত্যেকেরই অনেক ছেলেমেয়ে। তারা তাদের বাবার সঙ্গে ক্ষেতের কাজ করে একটু বড় হওয়ার পর থেকে। এখানে এটাই নিয়ম। চাষির ছেলেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষিই হয়। গ্রামে কোনো স্কুল নেই। তবে কোনো কোনো চাষির ছেলে শহরে চলে যায়।

রাস্তার পাশেই নারিকেল, সুপারিগাছঘেরা টিনের চারচালা বড় ঘর একটা, পেছনে বড় উঠোন। তার পাশে টিনের দোচালা একটা ঘর। উঠোনের একপাশে মস্ত বড় দুটো ধানের গোলা। একটা গোয়ালঘরে চারটে গরু। ছয়টা বলদ। বলদগুলো হাল টানার কাজে লাগে। গরুগুলো বাছুর বিয়োলে দুধ দেয়। দুধ বিক্রি হয়, টাকা হিসাব করে ব্যাংকে রাখে কামাল। নজমুল হক দেশের বাড়ি এলে হিসাব দেয়। জমি-জিরেতের চাষবাস ঠিকমতো হচ্ছে কি-না কামাল তা নিয়মিত দেখে। নিজের জমি না, এজন্য মোটেও অবহেলা করে না। সার কেনা, কীটনাশক দেওয়া, শুকনো মৌসুমে ডিপটিউবওয়েল থেকে সেচের পানি জমিতে নেওয়া– সবকিছু যত্নের সঙ্গে দেখাশোনা করে সে। নিজের জমি না বলে একটুও ফাঁকি দেয় না। তার সবচেয়ে ভালো দিক হলো, চাষাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলা। এ পর্যন্ত তার কোনো কাজে বা ব্যবহারে চাষাদের কেউ বিরূপ হয়নি। রাগারাগি করেনি। কামাল জানে কীভাবে গ্রামের এসব গরিব মানুষকে দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে হয়। তাদের অভাবে-অসুখে পাশেও দাঁড়ায় সে। যতটুকু পারে সাহায্য করে। এর জন্য তারা প্রায় সবাই তার প্রতি খুবই অনুগত। ক্ষেতমজুর পরিবারের নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ উল্টা-সিধা কথা বলে মাঝে মাঝে। ভূমি সংস্কারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে। অভিভাবকদের উত্তেজিত করে তুলতে চায়। তারা শুনে দু'কানে হাত দেয়। সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, এসব কথা মুখেও আনবি না তোরা। হুজুর আমাদের ভালো রাখিছেন। অভুক্ত তো নাই কেউ। থাকবার জায়গাও দিছেন। খোলা আকাশের নিচে থাকতে হতিছে না। ওসব খারাপ কথা মুখে আনিস না তোরা। ক্ষেতের কাম ভালো না লাগলি শহরত যা গিয়া। অন্য কাজ ধর। বাপ-দাদার পেশা নিয়া মন্দ কতা কতি জাস নে। পাপ হবি। শুনে তরুণ যারা ভূমি সংস্কারের কথা বলে, তারা নিজেদের মধ্যে হাসে। বলে, বাপ-দাদারা বদলাবে কি করি? অভ্যেস হয়ি গিছে তো। নতুন কথা শুনতি চায় না। ভয় পায়। যারা এসব কথা বলে তাদের সংখ্যা কম। জমির মালিকদের কানে তাদের কথাবার্তা এলেও তারা গুরুত্ব দেন না।

নজমুল হকের বাড়িতে এখন ইলেকট্রিসিটি এসেছে। রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ডের কংক্রিটের খাম্বা বাড়ির পাশেই। মোটা তার ঝুলতে ঝুলতে চলে গেছে গ্রামের ভেতর। সব বাড়িতে বিদ্যুৎ যায়নি। তবে সিমেন্টের দেয়ালওয়ালা পাকা বাড়ি যেগুলো সেখানে এই সুবিধা পৌঁছেছে। অবস্থাপন্ন কৃষকদের বাড়িতেই বিদ্যুতের কানেকশন হয়েছে।

অধ্যাপক নজমুল হক বাথরুম থেকে বেরিয়ে মেয়েকে বললেন, এবার থেকে বাথরুমে হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটারও থাকবে সবসময়। রানিং ওয়াটার তো বটেই। তোর কোনো কষ্ট হবে না। মনে হবে ঢাকাতেই আছিস।

পরমা ঠোঁট উল্টে বলে, আমি কি কখনো বলেছি গ্রামে এলে আমার অসুবিধা হয়? হ্যাঁ, শুধু বড় রাস্তা থেকে হেঁটে আসতে কষ্ট হতো একটু। এ ছাড়া আর কোনো অসুবিধার কথা বলিনি তোমাকে। হারিকেনের আলো, টিউবওয়েলের পানি এসব আমার ভালোই লাগত। বেশ নতুনত্ব ছিল। এখন গ্রামে আসার অর্ধেক মজাই যেন চলে গিয়েছে।

শুনে নজমুল হক অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকান। তারপর বলেন, গ্রাম যে তোর এত ভালো লাগে তা কখনো বলিসনি। শুনে ভালো লাগল। আমার একজন সঙ্গী পেলাম।

পরমা বলল, ছোটবেলা থেকেই তোমার সঙ্গে গ্রামে এসেছি। তুমি কি জোর করে নিয়ে আসতে? স্বেচ্ছায় আসতাম। কেন আসতাম? ভালো লাগতো বলেই তো।

শুনে নজমুল হক বললেন, হু। আমার মাথায় ঢোকেনি।

রাতের খাওয়া এলো কামালদের বাড়ি থেকে। পোলাও, কোরমা, বড় রুই মাছের ভাজি, গলদা চিংড়ি ভুনা, দই, আম ও কাঁঠাল।

পরমা দেখে বললো, বাব্বাহ। এ তো দেখি ভূরিভোজ। এত খাবে কে? মানুষ তো মোটে আমরা দু'জন।

কামাল দু'হাত ঘষে বললো, মা বললো– অনেকদিন পর এসেছেন, ডাল-ভার্ত খাওয়ালে কেমন দেখাবে?

পরমা বললো, এখানে তো ডাল-ভাতই খেতে আসা। শহরে বিরিয়ানি খেতে খেতে জিভের স্বাদ চলে গেছে। প্রত্যেক মাসে দু'চারটা বিয়ে লেগেই আছে। আর বিয়ে মানেই বিরিয়ানি।

কামাল হেসে বললো, এখন গ্রামেও বিয়েতে বিরিয়ানির খুব চল হয়েছে। শহর থেকে বাবুর্চি ভাড়া করে আনে।

পরমা বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, শহর আর গ্রামের ভেতর কোনো পার্থক্য থাকবে না কিছুদিন পর। গ্রামের চার্ম চলে যাবে। হাউ আনফরচুনেট!

নজমুল হক বিরিয়ানির ডিশ থেকে বড় আলুর টুকরো প্লেটে নিতে নিতে বললেন, দিস্ ইজ প্রগ্রেস। আমি তুমি চাইলেও ঠেকাতে পারবো না।

পরমা বললো, মাও সে তুং বলেছিলেন, গ্রাম ক্রমে শহর অধিকার করে নেবে। দেখা যাচ্ছে তিনি ভুল বলেছিলেন। শহরই গ্রাম অধিকার করে নিচ্ছে।

নজমুল হক মাংস থেকে হাড় আলাদা করে নিয়ে বললেন, তোর এটা পছন্দের না মনে হচ্ছে। গ্রামের এই শহরায়ন।

গ্রামের যে সৌন্দর্য, প্যাসটোরাল বিউটি, সেটা নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক না। গ্রামই আমার আর্কাডিয়া।

নজমুল হক হেসে বললেন, তুই সত্যি সত্যি রোমান্টিক।

তুমি নও? না হলে এত ঘন ঘন গ্রামে আসো কেন?

আমি আসি, আমি আসি বলতে বলতে নজমুল হক থেমে যান। পরমা কামালের দিকে তাকায়। সে তাদের খাওয়া তদারকি করছে। বাবার দিকে তাকিয়ে সে বলে, জানি কেন আসো। জমিজমা দেখতে। ফসল গোলায় তুলতে। ফসলের টাকা নিয়ে ব্যাংকে জমা দিতে। কিন্তু তাই কি সব? গ্রামের জন্য একটুও কি টান অনুভব করো না? তোমার বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের আত্মা তোমাকে কি ডাকে না অবচেতনে? নিশ্চয়ই ডাকে। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই তুমি আসো। বলো তুমি, অস্বীকার করতে পারো?

নজমুল হক খাওয়া বন্ধ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাকে অবাক হয়ে দেখেন। যেন চিনতে পারছেন না।

পরমা বলে, বলো মিথ্যা কিছু বলেছি? যা বললাম তাই কি সত্যি না?

নজমুল হক আস্তে আস্তে বললেন, কি জানি! এভাবে কখনো চিন্তা করিনি। তোর কথায় চিন্তা করতে হচ্ছে।

পরমা বললো, চিন্তা করার দরকার নেই। এই যে তুমি নিয়মিত আসছো, এ থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে গ্রামের মাটি তোমাকে টানছে। এটাই হলো যাকে বলে আতাভিজম। পূর্বপুরুষের ডাক। তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা। রক্তের স্রোতে প্রাচীন আর নতুনের মিশে যাওয়া।

নজমুল হক কামালের দিকে তাকালেন। বললেন, কী মনে হয় তোমার কামাল? পরমা যা বলছে তাই সত্যি? পূর্বপুরুষের টানেই আমি আসি গ্রামে?

কামাল পরমার দিকে তাকিয়ে বলে, বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। যুক্তি আছে কথাগুলোর পেছনে। আমার অল্প বিদ্যা। তা সত্ত্বেও কথাগুলো সত্য বলে মনে হয়।

নজমুল হক বললেন, তুমিও কি তাহলে পূর্বপুরুষের টানে রয়ে গিয়েছ গ্রামে? ভাগ্যের অন্বেষণে মধ্যপ্রাচ্যে যাওনি কিংবা মালয়েশিয়া? নেহায়েত শহরেও যেতে পারতে।

কামাল বললো, আপনার মতো আমিও এ বিষয় নিয়ে ভেবে দেখিনি। একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। সেই অভ্যাস অনুযায়ী জীবন-যাপন করছি। তারপর একটু থেমে পরমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, বড় করে কিছু ভাবার মতো পড়াশোনা করিনি। কী করে বলবো কেন কী হয়?

পরমা জোর দিয়ে বলে, এটা অনুভবের বিষয়। এর জন্য বেশি পড়াশোনার দরকার পড়ে না। বুঝলে কামাল? অনুভব। অনুভবই সব।

রাতে শোবার আগে নজমুল হক বললেন, বিছানায় পড়ার জন্য বই আনতে ভুলে গেলাম। শুধু কয়েকটা ম্যাগাজিন আছে। তুই বই এনেছিস্?

হ্যাঁ। বই ছাড়া আমি কোথাও যাই না। সে তো তুমি জানোই।

কী কী বই এনেছিস?

ফার ফ্রম দি ম্যাডেনিং ক্রাউড। জুড দি অবসকিউর। টমাস হার্ডির বই সব। আমি যখন কোনো লেখকের বই পড়ি, তার সব বই পরপর পড়তে থাকি। লেখক সম্বন্ধে সার্বিক একটা ধারণা জন্মে যায়। এ কথা তো তুমিই আমাকে বলেছো। এইভাবে পড়তে বলেছো। মনে নেই?

আছে। তুই যে এখনো মনে রেখে পড়ে যাচ্ছিস তা ভাবতে পারিনি।

পরমা হেসে বললো, আমার ইন্টেলেকচুয়াল জীবনে তুমি যে কত বড় ইনস্পিরেশন তা তোমার জানা। তারপর সে গানের সুরে বলে, ইউ আর মাই সানশাইন, মাই অনলি সানশাইন, ইউ মেক মি হ্যাপি হোয়েন দি স্কাই ইজ গ্রে। বুঝলে? আমেরিকান এক নির্বাচন প্রার্থী প্রেসিডেন্টের গান। অনেক পুরনো।

বুঝলাম। এখন আমাকে রাতে পড়ার জন্য তোর একটা বই দে। কোনটা দিবি?

পরমা বললো, আমি ফার ফ্রম দি ম্যাডেনিং ক্রাউড পড়ছি। তুমি জুড দি অবসকিউর পড়ো।

বেশ। কিন্তু শোবার আগে একটা নাইট ক্যাপ হবে না।

পরমা বললো, নিশ্চয়ই হবে। কী খাবে? চা, না কফি?

কফিই চলুক। রাত জাগতে হলে অসুবিধা নেই। কাল আমাদের ছুটি। না হয় দেরি করে উঠলাম ঘুম থেকে।

পরমা ছোট মেয়ের মতো নাচতে নাচতে ভেতরে যাবার সময় বললো, পরশুও ছুটি। তার পরদিনও। আমরা দু'জনই এখন ফার ফ্রম দি ম্যাডেনিং ক্রাউড।

সকালে বেশ দেরি করে উঠলো দু'জন। রান্নার জন্য একজন লোক রাখা আছে। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে রান্নাঘরের লাগোয়া ঘরে থাকে। তাদের একটা ছোট ছেলে আছে। সকাল থেকে সে উঠোনে খেলা করে। পরমা তাকে মুড়ি-মুড়কি খেতে দেয়। গল্প করে। ছেলেটি হাসিখুশি স্বভাবের। পরমার সব কথায় হাসে। লজ্জা পায় না।

নজমুল হক বলেন, তোকে ছোট ছেলেমেয়েরা খুব পছন্দ করে দেখি। তুই ওদের সাইকোলজি বেশ বুঝতে পারিস মনে হয়।

পরমা ছোট ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলে, জানো বাবা, বিয়ের পর আমি ছ'টা ছেলেমেয়ের মা হবো।

ছ'টা? হাফ এ ডজন! নজমুল হক অবাক হয়ে তাকান।

হ্যাঁ। হাফ এ ডজন। খুব মজা হবে না? বাড়ি ভর্তি

ছেলেমেয়ে? পরমার মুখে ইনোসেন্ট হাসি।

সকালে নাশতার জন্য বাড়িতে তৈরি করেছে রুটি, সবজি আর ডিমের ওমলেট। ঢাকা থেকে সিরিয়াল নিয়ে এসেছিলেন নাজমুল হক। গরুর খাঁটি দুধ দিয়ে খাবেন, এমন ইচ্ছা ছিল তাঁর। গ্রামের বাড়িতে এলে প্রতিবারই এমন করে থাকেন তিনি। ঢাকায় গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া কঠিন বলেই এই অভ্যেসটা গড়ে তুলেছেন বেশ কয়েক বছর থেকে। খাবার টেবিলে কেলোগের সিরিয়াল বক্স দেখে নাক কুঁচকালো পরমা। বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, এখানে এসে এসব খাবে?

হ্যাঁ। ক্ষতি হবে?

ক্ষতির কথা হচ্ছে না। এখানে এসে ক'দিনের জন্য শহরকে ভুলতে পারো না? কি যে তুমি বাবা?

এতে অন্যায়টা কী বুঝতে পারছি না। নজমুল হক মেয়ের দিকে তাকালেন গম্ভীর হয়ে।

ন্যায়-অন্যায়ের কথা হচ্ছে না। উচিত-অনুচিতের কথা বলছি। গ্রামে এসে এখানকার খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা মেনে চললেই কী স্বাভাবিক হবে না? তাহলে চেঞ্জটা বোঝা যাবে। সবকিছু যদি ঢাকার মতোই থাকে, তাহলে গ্রামে আসা কেন? নজমুল হক মাথা নেড়ে বললেন, খুব বাড়িয়ে বলছিস। সবকিছু কোথায়? শুধু সিরিয়ালটাই ঢাকা থেকে এনেছি।

সে তো দেখছি। কিন্তু এটাই যে আরবান কালচারের মস্তবড় একটা সিম্বল। তুমি একে প্রাধান্য দিয়ে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে খাটো করে ফেলছো। বুঝতে পারছো সেটা? শুনে ভ্রূ কুঁচকালেন নজমুল হক। তারপর সিরিয়ালের বক্সটা সরিয়ে রেখে বললেন, গরম দুধের সঙ্গে এখানকার তৈরি মুড়ি কী খই খাওয়া যাবে? সেই সঙ্গে ঝোলা গুড়?

পরমা দুই হাত দিয়ে তালি বাজিয়ে বললো, চমৎকার! এই তো এতক্ষণে তোমার ব্রেন কাজ করছে। দারুণ একটা সমাধান বের করে ফেলেছো। সুকুমার রায়ের ছড়ার কথা মনে করিয়ে দিলে। বলে পাশে কাত হয়ে নজমুল হকের গালে সশব্দে চুমু খেয়ে পরমা বললো, তুমি অসাধারণ। কি দ্রুত প্রেজেন্স অব মাইন্ড কাজ করে তোমার। এই জন্যেই না তুমি আমার রোল মডেল।

ও কথা আর বলিস না। অনেকবার বলেছিস। তোর রোল মডেল হবার যোগ্যতা আমার নেই। তোর মায়ের থাকতে পারে। আমি খুব ভুল করি।

আদুরে মেয়ের ভঙ্গিতে পরমা বললো, মানো আর নাই মানো, আমার রোল মডেল হিসেবে তুমি চমৎকার মানিয়ে যাও। মা রান্নার জন্য আমার রোল মডেল। তারপর বললো, আমি তোমাকে খুশি করার জন্য বলছি না। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ আছে। কিন্তু তাতে কী? অনেক বিষয়ে তুমি আমার অনুকরণীয়। ছোটবেলা থেকে। যেমন? একটা দৃষ্টান্ত দে শুনি।

তুমি জেদি নও। আপস করতে জানো।

কী করে জানলি?

বা রে, এই যে কেলোগের বক্সটা আমার কথা শুনে সরিয়ে রাখলে। এখন মুড়ি আর খই দিয়ে দুধ খাবে, সঙ্গে ঝোলা গুড়। এর চেয়ে বড় আপস আর কী হতে পারে? দিস ইজ দ্য লেটেস্ট একজাম্পল। পুরনো অনেক আছে।

হু। তুই খাবি মুড়ি-খই-দুধ আর ঝোলা গুড়?

অবশ্যই খাবো। শহরের গন্ধটা মুছে ফেলতে হবে না? বলতে বলতে পরমা তার প্লেটে গরম দুধ ঢাললো। রান্নার লোক রাজু মিয়া কাছেই দাঁড়িয়েছিল। হেসে বললো, আরও দুধ আনবো হুজুর?

পরমা তার দিকে তাকিয়ে বললো, রাজু মিয়া বাবাকে 'হুজুর' বলে ডাকবে না। চাচা বলবে। হ্যাঁ। আরও দুধ আনো। আর ঝোলা গুড়। তোমার ছেলেটাকেও খেতে দিও। রাজু চলে গেলে পরমা বললো, হুজুর বলবে কেন? তুমি কী তার প্রভু? তোমার চাকরি করছে। তাই বলে দাস তো হয়ে যায়নি। 'চাচা' বললে তোমার ভালো লাগবে না? কামাল যেমন বলে?

নজমুল হক ঝোলা গুড় প্লেটে ঢালতে ঢালতে বললেন, কামাল আর রাজু কী এক হলো?

পরমা মাথা দুলিয়ে বললো, সব মানুষই এক। এক হয়েই জন্মায়। তাই না কি?

নজমুল হক বললেন, তোর সঙ্গে কথায় পারবো না। এখন খাওয়া শুরু কর দেখি। দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

নাশতা শেষ করে পরমাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন নজমুল হক। সঙ্গে কামাল। তারা প্রথমে গেল নজমুল হকের পারিবারিক গোরস্তানে, যেখানে তার বাবা-মা, দাদা-দাদিমা, চাচা, চাচিসহ অন্যান্য পূর্বপুরুষ সমাহিত হয়ে আছেন। বেশ পুরনো আর বড় গোরস্তানের চারদিকে ইটের প্রাচীর। কয়েকটা বড় গাছ দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে। অশ্বত্থ, শিমুল, তালগাছ। তালগাছের পাতা থেকে বাবুইয়ের বাসা ঝুলছে। গোরস্তানের ভেতর বড়গাছ নেই, কিছু ডালিম গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বাতাসে চিকন পাতা নড়ছে। ডালিম ফল দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। ফড়িং উড়ছে সবুজ ঘাসের ওপর। একঝাক চড়ুই ওপরে-নিচে ডাইভ দিয়ে উড়ে চলে গেল ডাকাডাকি করতে করতে।

সূর্য একটু ওপরে উঠেছে, রোদে গরম স্পর্শ। কামালের হাতে একটা ছাতা। সে পরমার কাছে এসে বললো, ছাতা মেলে ধরবো?

পরমা অবাক হয়ে বললো, কেন?

কামাল বললো, গরম লাগতে পারে। রোদ তেজি হচ্ছে।

পরমা কামালের দিকে তাকিয়ে বললো, এইটুকু গরম সহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে। ভুলে গেলে নাকি এক সময় দু'জন বন-বাদাড়ে দুপুর বেলায় কত দৌড়েছি। তখন গরম লাগেনি। বরং বাবাকে বলে দেখো তার ছাতা লাগবে কি-না। আমার লাগবে না।

নজমুল হক তাড়াতাড়ি বললেন, আমারও লাগবে না। গোরস্তানে খালি মাথাতেই যাওয়া উচিত। তাতে মৃতদের প্রতি সম্মান দেখানো হয়।

একে একে প্রায় প্রত্যেকটি কবরের সামনে দাঁড়ালো তারা তিনজন। সবগুলোতে নামফলক ছিল এক সময়, এখন এসব কবরে সিমেন্ট প্লাস্টার ভেঙে পড়েছে। কিছু নাম পড়া যায়, কিছু অস্পষ্ট। নজমুল হক কামালকে বললেন, কবরগুলো সংস্কার করা দরকার। নতুন করে নাম-সন-তারিখ লিখে রাখতে হবে। যেন দেখলেই চেনা যায়।

দাদা-দাদির কবরের সামনে এসে পরমা আস্তে আস্তে বললো, কী চমৎকার সবুজ ঘাস জন্মেছে। মনে হয়, সবুজ চাদর দিয়ে মোড়ানো কবর দুটো। তারপর চারদিক তাকিয়ে বললো, খুব শান্তির জায়গা এটা। 'মনে হয় ঘাস হয়ে জন্মাই, ঘাসের ভেতরে।' তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে সে বললো, জীবনানন্দ দাসের কবিতার লাইন। তিনি ঘাস খুব ভালোবাসতেন। আরেক কবিতায় লিখেছিলেন, তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি রবো এই বাংলার পাড়ে। বুঝলে বাবা, তাঁর কবিতা পড়লে একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে যেতে হয়। তাঁর কবিতা টেনে নেয় জাদুমন্ত্রের মতো মাটির কাছাকাছি। মনে হয় বাংলার গ্রামের মতো এত সুন্দর জায়গা আর কোথাও নেই। তারপর কবরের সবুজ ঘাসের দিকে

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে বলে, আমার খুব ইচ্ছা হয় শেষ বিশ্রাম যেন গ্রামেই নিতে পারি। এইখানে। এত শান্তি আর কোথায় আছে? বলে সে দাদা-দাদির কবরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শুনে চমকে ওঠেন নজমুল হক। অবাক হয়ে মেয়েকে দেখেন। তারপর বলেন, অন্তিমশয়ান কার কোথায় হবে সে কথা কেউ জানে না। সব তাঁর ইচ্ছা। বলে তিনি ওপরে তাকান।

পরমা বলল, জানি, আমি শুধু আমার ইচ্ছার কথা বললাম।

শুনে নজমুল হকের মুখে ছায়া পড়ল যেন। অস্ফুটস্বরে বললেন, এখনই এই ইচ্ছার কথা মনে করতে যাবি কেন? তোর তো মোটে জীবন শুরু।

পরমা দাদা-দাদির কবরের দিকে তাকিয়ে বলল, দোয়া পড়বে না? এদের সবার আত্মার শান্তির জন্য?

হ্যাঁ। সে তো পড়বই। সেই জন্যই এখানে আসা। কামাল এসো কাছে।

কবরস্থান থেকে বেরিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেশ কিছুদূর গেল তারা। ক্ষেতে বোরো ধান কাটা হয়েছে। স্তূপ করে রাখা হয়েছে ধানের গোছা। বিকেলে বাড়ির উঠোনে নিয়ে রাখবে। তারপর ঝাড়াই-মাড়াই হবে। ধান শুকালে গোলায় ভরবে চাষিরা। তাদের ভাগ নিয়ে যাবে। মহাজন এলে গোলা থেকে বের করে ধান বিক্রি করা হবে। নজমুল হক গ্রামে এলে ফসল কাটার পর তার সামনেই ধান বিক্রি হয়, কিছু থাকে গোলায় খোরাকির জন্য। ঢাকাতেও নিয়ে যাওয়া হয় কিছু।

পরমা ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বলে, আমাদের জমি কতদূর পর্যন্ত বাবা?

নজমুল হক দিগন্তের দিকে তাকান। তারপর বলেন, ঐ যে দূরে তালগাছ, ঐ পর্যন্ত।

পরমা চোখ সরু করে দেখে। তারপর বলে, অনেক জমি। সব তুমি দাদার কাছ থেকে পেয়েছ?

হ্যাঁ, প্রায় সব। কিছু আমার কেনা।

কত হবে? আয়তনে? পরমা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

তা হবে একশ' বিঘার ওপর। নজমুল হক চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, যেন জরিপ করে নিলেন।

পরমা বলল, আমরা তাহলে জমিদার।

নজমুল হক হেসে বললেন, এখন আর কাউকে জমিদার বলা হয় না।

তাহলে কী বলে? একটা কিছু নাম নিশ্চয়ই আছে।

নজমুল হক হেসে বলেন, নকশালরা 'জোতদার' বলে। শ্রেণীশত্রু। শুনিসনি?

হু। শুনেছি। তারা তো দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে তৎপর। এখানেও আছে নাকি?

থাকতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত ঝামেলা করেনি। ক্ষেতমজুরদের খেপিয়ে তোলেনি।

পরমা কিছু না বলে আদিগন্ত প্রসারিত জমির দিকে তাকিয়ে থাকল।

দুপুরে খাবার সময় পরমা বাবাকে বলল, আমাদের জমিতে ক্ষেতমজুররা সারা বছর কাজ করে। ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ পায়। তাতে ওদের চলে?

চলে নিশ্চয়ই। নাহলে কাজ করছে কেন?

অন্য কোনো উপায় নেই বলে হয়তো কাজ করছে। বলে একটু থেমে পরমা বলল, আচ্ছা এমন করলে কেমন হয়?

কী করলে? নজমুল হক মেয়ের দিকে তাকান।

পরমা বলে, ক্ষেতমজুরদের নামে জমি বর্গা দিয়ে দিলে হয় না? আমাদের তিন ভাগের এক ভাগ দেবে। আমাদের তো বেশি দরকার নেই।

নজমুল হক বলেন, এখানে সে রকম নিয়ম নেই। সব জমির মালিক এভাবেই জমি চাষ করায়। এই সিস্টেমেই জমি দখলে রেখেছে।

রাখুক তারা। তুমি না হয় ব্যতিক্রম হলে।

আমি যেন ব্যতিক্রম না হই তার জন্য অন্য জমির মালিকরা আমার ওপর চাপ দেবে। তারা মানবে না।

তাহলে ক্ষেতমজুরদের তিন ভাগের এক ভাগ ফসল না দিয়ে অর্ধেক ফসল দিয়ে দাও।

নজমুল হক খাওয়া বন্ধ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, তুই সাহিত্যের ছাত্রী। জমি-জমার ব্যাপার তোর মাথায় ঢুকবে না। ভাত খেয়ে নে। এ নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।

দুই

প্রথমে সবাই খবরের কাগজে পড়ল খবরটা। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভ্যাট দিতে হবে। খবরটা পড়ার পর গুঞ্জন শুরু হলো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। অধ্যাপক বা প্রশাসন থেকে ক্ল্যারিফিকেশন দেওয়া হলো। এই করের ভার ছাত্রছাত্রীদেরই বহন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ভ্যাট আদায় করে সরকারকে দেবে।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে ক্যান্টিনে চা খাওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের জটলা শুরু হলো। স্লোগান দিল কেউ কেউ। তারা ভ্যাট দেবে না। এমনিতেই অনেক ফি দিতে হয় তাদের। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা আর পরীক্ষার ফি দিতে হয় নামে মাত্র। তাদের ভ্যাট দিতে হয় না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে কেন? এটা মস্ত বড় অন্যায়। এই অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না। এ বিষয়ে একমত হলো ছাত্রছাত্রীরা।

ক্যান্টিনে ছাত্রছাত্রীদের উত্তেজিত স্বর ফেটে পড়ছে বিস্ফোরকের মতো। এক একটা টেবিলে একদল ছাত্রছাত্রী বসে আলোচনা করছে। পরমা তার সহপাঠিনী মারিয়াকে বলল, কী করা যায়? মানে এর বিরুদ্ধে কী করতে পারি আমরা?

পাশের টেবিল থেকে এক ক্লাস ওপরে পড়া বিবিএর ছাত্র সাঈদ বলল, ক্লাস বর্জন করব আমরা। হরতাল।

পরমা বলল, শুধু আমরা করলে তো হবে না। সব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েদের করতে হবে। না হলে চোখে পড়বে না।

মারিয়া বললো, হ্যাঁ। সলিডারিটি প্রয়োজন। কিন্তু সেটা কেমন করে আসবে? আমাদের কোনো আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় অর্গানাইজেশন নেই।

সাঈদ কিছুক্ষণ ভেবে বলল, গড়ে তুলতে হবে।

পরমা বললো, কে গড়ে তুলবে?

তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই নেতৃস্থানীয় একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে গরম বক্তৃতা দিতে শুরু করল। একটু পর পর সে হাত তুলে বলল, রুখতে হবে। ভ্যাট বন্ধ করতে হবে। সবাই সমস্বরে তাকে সমর্থন জানাল।

সাঈদ চেঁচিয়ে বলল, আমরা একা বন্ধ করতে পারবো না। অন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক জোট হতে হবে।

বক্তা তার দিকে তাকিয়ে বললো, তাই করা হবে।

কে করবে? সাঈদ জানতে চাইলো। সব ছাত্রছাত্রী এখন তার দিকে তাকিয়ে। সে তাদের মনের কথা বলেছে।

বক্তা বললো, আমি, আপনি সবাই করবো।

সাঈদ বললো, আমাদের স্ট্যাটাস? আমরা কার বা কাদের মুখপাত্র? কাদের প্রতিনিধিত্ব করছি?

বক্তা বললো, এখানেই সমবেত ছাত্রছাত্রী ভাইবোনেরা আমাদের দু'জনকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারে। আমরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। যৌথ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তারপর।

সবাই উত্তেজিত স্বরে বললো, তাই হোক। আপনারা আজ থেকে আমাদের প্রতিনিধি।

মারিয়া বললো, জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি থাকছে না। দু'জনই পুরুষ। একজন মেয়ে প্রতিনিধির প্রয়োজন।

সবাই একসঙ্গে বললো, বেশ তাই হোক। কে হবে সেই প্রতিনিধি? কোন ছাত্রী?

মারিয়া পরমাকে উঠে দাঁড় করিয়ে বললো, পরমা হক। সে ভালো বক্তৃতা দেয়। ভালো ছাত্রী তো বটেই।

পরমা একটু বিব্রত হলো। সবার দিকে তাকিয়ে বললো, মারিয়া আমার সহপাঠিনী। একটু বাড়িয়ে বলে। আমার তেমন কোনো বড় গুণ নেই। অন্য কেউ হোক।

প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না? একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

নাকি ভয় পাচ্ছো আন্দোলনের কথা শুনে? আর একজন ছাত্রী বললো, পাশের টেবিল থেকে। শুনে মাথায় রক্ত জমে গেল যেন পরমার। সে টেবিলে সজোরো থাপ্পড় মেরে বললো, বেশ। আমি প্রতিনিধিত্ব করবো। আমার কোনো ভয় নেই।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। তারাও আন্দোলনে যেতে চায়। তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হলো। সব প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠন করা হলো অ্যাকশন কমিটি। অ্যাকশন কমিটির মিটিং হলো পালা করে এক একটা ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হলো ক্লাস বর্জন করা হবে। যে পর্যন্ত ভ্যাট প্রত্যাহার করা না হবে, কেউ ক্লাস করবে না।

পরপর কয়েক দিন ক্লাস বর্জন করলো ছাত্রছাত্রীরা। কাগজে ছবিসহ খবর ছাপা হলো। ইন্টারভিউ নিলো কোনো কোনো কাগজ থেকে। টেলিভিশনেও নিউজ হলো। কিন্তু কর্তৃপক্ষের হাব-ভাব দেখে মনে হলো, তাদের কিছু আসে যায় না। সত্যিই তো, ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করলে তাদেরই ক্ষতি। সেশনজট হবে পাবলিক ইউনিভার্সিটির মতো। ভুক্তভোগী হবে তারাই।

অ্যাকশন কমিটি ক'দিন পর আলোচনা সভায় বসলো। সভায় যোগদানের আগে বাসা থেকে বের হওয়ার মুখে অধ্যাপক নজমুল হক মেয়েকে ডেকে বললেন, এসব করে কিছু হবে না মা। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম। এর চেয়ে ভ্যাট মেনে নে তোরা। কত আর বেশি টাকা যাবে তাতে।

পরমা বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, বাবা তোমার অবস্থা সচ্ছল। পেনশন পাচ্ছো। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পার্টটাইম পড়াচ্ছো। গ্রাম থেকে ধান-চাল আসছে। ভ্যাটের টাকা দিতে তোমার অসুবিধা হবে না। কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রীর হবে। তাদের কথা ভাবো।

নজমুল হক বললেন, তাদের বাবা-মায়ের অবস্থাও খারাপ না। খারাপ হলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে পারতেন না।

পরমা বললো, এটা নীতির প্রশ্ন। পাবলিক ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা ভ্যাট দেয় না। আমরা কেন দেবো?

নজমুল হক বললেন, সব সময় যুক্তি দিয়ে চলে না। সরকার যখন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভেবে-চিন্তেই নিয়েছে।

পরমা বললো, ছাত্রছাত্রীরা তা মনে করে না। করলে আন্দোলনে যেত না।

নজমুল হক বললেন, সেখানেই তো ভুল হচ্ছে। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের একটা বিশেষ ভাবমূর্তি আছে। তারা আন্দোলন করে না। ক্লাস বর্জন করে না। সময় নষ্ট না করে পড়াশোনা করে যায়। সেই ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে এখন।

তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বাবা। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরাও এই সমাজের অংশ। সমাজে অন্যায় কিছু দেখলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তাদের। না হলে সমাজের চোখে তারা ছোট হয়ে যাবে। আমরা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হয়ে যাবো। যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি।

নজমুল হক মেয়ের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, তোর সঙ্গে তর্ক করবো না। তুই ছেলে মানুষ না। তোর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। তোর নৈতিকতাবোধ আর বিষয় জ্ঞানকে আমি শ্রদ্ধা করি। হ্যাঁ, বাবা হয়েও এ কথা বলছি। কিন্তু একটা কথা বল দেখি। ক্লাস বর্জন করে বৃহত্তর কোন জনস্বার্থ রক্ষা করতে চাইছিস তোরা? তোদের নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণীর স্বার্থ জড়িত আছে এখানে?

পরমা চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, আমরা জনগণের অংশ। সমাজ থেকে আলাদা নই। আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে যাওয়া মানেই জনস্বার্থ রক্ষা করতে যাওয়া। আমাদের স্বার্থ জনস্বার্থেরই অংশ।

নজমুল হক হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ এটা একটা যুক্তি বটে। তবে বেশ দুর্বল যুক্তি। বেশ মা, সবাই মিলে যা করতে চাইছিস তাই কর। আমি বাধা দিচ্ছি না। বাধা দিলে পরে তুই আমাকে দোষ দিবি। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বয়স তোর হয়েছে। তোর ওপর আমার বিশ্বাস আছে। তুই ভুল করবি না। মনে এলো বলেই কথাগুলো বললাম। এখন আমি নির্ভার।

অধ্যাপক নজমুল হক সাহেবের স্ত্রী সাবেরা বেগম ঘরের ভেতর থেকে বাবা-মেয়ের সব কথা শুনছিলেন। পরমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর স্বামীর সামনে এসে বললেন, মেয়েকে আটকাতে পারলে না?

নজমুল হক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আটকাতে যাবো কেন? ও কি ছেলেমানুষ? যা ভালো বুঝছে তাই করছে। আমরা তো ওইভাবেই মেয়েকে মানুষ করেছি।

সাবেরা বেগম বললেন, ছেলের ব্যাপারে তুমি কিন্তু বেশ কড়া ছিলে। মেয়েকে যেন একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছো।

তোমার তাই মনে হয়? নজমুল হক হেসে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ। বলো আমার এই ধারণা সঠিক কি-না।

নজমুল হক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। যেন কিছু চিন্তা করছেন। তার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়লো। মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে বললেন, ঠিকই বলেছো। মেয়েকে আমি একটু বেশি প্রশ্রয়ই দিয়ে আসছি। অনেকদিন থেকেই। নতুন কিছু না।

কেন?

কেন? এই জন্য যে, সে আমাদের মেয়ে। মেয়েদের একটু ভিন্ন চোখে দেখতেই হয়। কেননা ওরা একদিন অন্যের বাড়ি চলে যায়।

শুনে সাবেরা বেগম চুপ করে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বলেন, তোমাকে চা দেবো?

চা? হ্যাঁ। দাও। গলাটা শুকিয়ে এসেছে।

পরমা ইউনিভার্সিটি গিয়ে সাঈদকে খুঁজে পেল না। আজকে এক সঙ্গে অন্য এক ইউনিভার্সিটি যাবার কথা দু'জনের। বেশ গোপনভাবে যেতে হবে তাদের। এর মধ্যে গুপ্তচর সব চিনে ফেলেছে তাদের। পিছু নিচ্ছে রাস্তায় বের হলেই। একটা কিছু মতলব হয়তো আছে ওদের। অ্যাকশন কমিটি থেকে বলা হয়েছে, ধরা পড়লে চলবে না। তাতে আন্দোলনের ক্ষতি হবে। ওরা এখন বেশ সতর্ক হয়ে চলাফেরা করছে। সামনাসামনি প্রায়ই দেখা হচ্ছে না।

মারিয়াকে লাইব্রেরিতে নোট নিতে দেখলো পরমা। অবাক হয়ে বললো, সবাই ক্লাস বর্জন করছে। আর তুই লাইব্রেরিতে নোট নিচ্ছিস! তোর কী কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই?

ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। লাইব্রেরি বর্জনের কথা বলা হয়নি। মারিয়ার চেহারায় কোনো পরিবর্তন নেই। খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বললো সে।

পরমা বললো, আমি খুব শক্‌ড হলাম। আমরা সবাই দৌড়াদৌড়ি করছি। আর তুই লক্ষ্মী মেয়ের মতো লাইব্রেরিতে বসে নোট নিচ্ছিস? তোর হয়েছে কী?

মারিয়া উঠে এসে পরমার হাত ধরলো। অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললো, কাউকে বলিস না ভাই। বিপদে পড়েই লাইব্রেরিতে এসেছি।

কী বিপদ? মারিয়া ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

স্যার বলেছেন আমার এমএ থিসিসের সাবজেক্ট তিনি অ্যাপ্রুভ করতে পারছেন না। এত খেটেখুটে সিনোপসিস তৈরি করলাম। রিভিউ অব লিটারেচার লিখলাম। রেফারেন্সের লিস্টি দিলাম। এখন স্যার বলছেন হবে না।

তাহলে? কী করতে চাস তুই? পরমা মারিয়ার চিন্তিত মুখের দিকে তাকালো।

নতুন একটা থিসিসের বিষয় খুঁজে বের করছি। এখনও খুঁজে পাইনি। চেষ্টা করছি। সেজন্যই লাইব্রেরিতে আসা। তারপর পরমার হাত চেপে বললো, বল, কাউকে বলবি না। বললে সবার চোখে ছোট হয়ে যাবো। বলবে, স্বার্থপর।

বেশ বলবো না। কিন্তু কেউ কি তোকে লাইব্রেরিতে পড়তে দেখছে না?

মারিয়া বললো, এখন পর্যন্ত দেখেনি। তুই-ই প্রথম দেখলি। তাছাড়া দেখবে কেমন করে, সবাই তো ক্লাস বর্জন নিয়ে ব্যস্ত। পড়াশোনা নিয়ে কেউ ভাবছে না।

পরমা চারদিকে তাকিয়ে বললো, বেশিক্ষণ থাকিস না। যা করার তাড়াতাড়ি শেষ করে বেরিয়ে পড় লাইব্রেরি থেকে।

মারিয়া অভিভূত হয়ে বললো, তোর মতো একটা মেয়ে হয় না। তারপর কী মনে করে বললো, তোর থিসিসের সাবজেক্ট এপ্রুভ করেছেন স্যার?

না। এখনও করেননি। একদিন শুধু আলোচনা হয়েছে।

বলিস কী। সময় চলে যাচ্ছে। কবে কী করবি? মারিয়া অবাক হয়ে তাকায় পরমার দিকে।

হবে একটা কিছু। আমার জন্য চিন্তা করিস না। পরমার স্বরে কোনো উদ্বেগ নেই। জরুরি ভাবও না।

মারিয়া বললো, তোর জন্য চিন্তা করতে যাবো কেন? তুই আমার চেয়ে ভালো ছাত্রী। অল 'এ' পেয়েছিস। কোথাও আটকাবি না। তাছাড়া তোর বাবা একজন অধ্যাপক।

ফিরে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো পরমা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললো, কী বলতে চাইছিস তুই? বাবা অধ্যাপক মানে?

মারিয়া থতমত খেয়ে বললো, তোর বাবার মাথা পেয়েছিস তুই, এ কথা বললাম।

পরমা খুঁটিয়ে দেখলো মারিয়াকে। মনের কথা গোপন করার চেষ্টা করলো কিনা তা বের করার চেষ্টা করলো। মেয়েটা বেশ জটিল। কমপ্লেক্সে ভোগে। হয়তো তাকে একটু ঈর্ষাও করে। এর জন্য তাকে মাঝে মাঝে করুণার চোখে দেখে সে। যারা দুর্বল, তারা সব সময়ই তার কাছে করুণার পাত্র অথবা পাত্রী। সাঈদ কি দুর্বল? এখনই বলা যাচ্ছে না। এই তো সবে ঘনিষ্ঠ হলো তারা। তা ছাড়া পরমা সাহিত্যের ছাত্রী, সাঈদ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়ছে। দু'জনের মেন্টাল মেকআপ আলাদা। বেচারা জীবনানন্দ দাশের নামই শোনেনি। তার গুরু পিটার ড্রাকার। স্টিভ জবস্‌। জ্যাক ওয়েলস। এইসব। বিবিএ পড়া ছাত্রছাত্রীরা যেমন হয় সাঈদ সে রকমই। খুব প্র্যাকটিক্যাল। ইমোশন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রকাশ হতে দেয় না। নিজের ওপর বেশ নিয়ন্ত্রণ। এমন মানুষ জীবনে উন্নতি করে। সাঈদও করবে– সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মারিয়া চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাঈদের কথা কেন মনে এলো তা ভেবে পেলো না পরমা।

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসতেই সাঈদের মোবাইলের কল এলো। সে একটা রেস্তরাঁয়। তাকে সেখানে যেতে বললো। পরমা বললো, দুপুরে খাবার জন্য? এত আগে? মোটে বারোটা বাজে।

সাঈদ বললো, কথা হবে। জরুরি কথা আছে। এসো তাড়াতাড়ি।

রেস্তরাঁয় পৌঁছুতে একটু সময় নিলো পরমা। পুলিশ রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। মিছিল যেন বের না করে ছাত্র-ছাত্রীরা তার জন্য সতর্কতা। পরমা দেখলো রাস্তায় অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ পুলিশ বেশি। তারা মনে হয় কোনো খবর পেয়েছে।

রেস্তরাঁর এক কোণে বসে সাঈদ কোক খাচ্ছিল। আলো-ছায়ায় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে এলো তাকে শনাক্ত করে পরমা সে দিকে এগিয়ে গেল। সাঈদ বললো, একি? একেবারে ঘেমে গিয়েছো দেখি! এখন এসির ঠাণ্ডায় সর্দি না হলেই হয়।

পরমা হেসে বললো, আমার অত সহজে সর্দি হয় না। অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

সাঈদ বললো, হ্যাঁ। এ ক'দিনে তো কম ঘোরাঘুরি হলো না। আই অ্যাডমায়ার ইওর এনার্জি। একটুও ক্লান্ত হও না। বিরক্তও হও না কোনো কিছুতে। রাগতেও দেখিনি।

পরমা হেসে বললো, তুমি আমার কতটুকু দেখেছো? এই ক'দিনের মধ্যে সবকিছু জেনে যাবে কী করে? আমি অত সরল মেয়ে না।

সাঈদ বললো, তবু আঁচ তো করা যায়।

পরমা প্রসঙ্গ বদলে বললো, ফোনে বললে জরুরি কথা আছে। কী জরুরি কথা? বলো শুনি।

সাঈদ মুখ সামনে এনে বললো, স্ট্র্যাটেজি বদলানো হবে। ক্লাস বর্জন করে লাভ হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের টনক নড়ছে না। তারা কেয়ারই করছে না।

তাহলে কী করা হবে এখন? মিছিল?

উঁহু। সে কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল মিছিল করতে দেবে না। আটকে দেবে পথে।

তাহলে? পরমা তাকালো জিজ্ঞাসু চোখে।

সাঈদ ফিস ফিস করে বললো, সিট ডাউন্‌ স্ট্রাইক।

সিট ডাউন? ইউনিভার্সিটিতে? তাতে করে টনক নড়বে? এখনই নড়ছে না। পরমা বললো।

সাঈদ গম্ভীর স্বরে ফিস ফিস করে বললো, রাস্তায়। সব ছাত্র-ছাত্রী রাস্তা দখল করে বসে যাবে। সিট ডাউন স্ট্রাইক। যে যেখানে পারবে বসে যাবে প্ল্যাকার্ড হাতে। একা। দল বেঁধে।

যদি ধরে নেয়?

ক'জনকে ধরবে? আর ধরার জন্য এক জায়গায় তো সবাইকে পাবে না। সারা শহরে ছড়িয়ে থাকবে ছাত্র-ছাত্রী। সবাইকে ধরতে গেলে নাভিশ্বাস উঠবে। সাঈদ বললো স্বর নিচু করে।

পরমা চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো, হ্যাঁ। দারুণ অ্যাকশন হবে বটে। ট্রাফিক বন্ধ। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ গাড়ি, বাস-টেম্পো অচল হয়ে আছে রাস্তায়। লোকজন দিশাহারা হয়ে হাঁটছে। এতে টনক নড়বে। কিন্তু ...। বলতে গিয়ে সে থেমে গেল।

কিন্তু কি? সাঈদ তাকালো। তার কপালে ভাঁজ।

পাবলিকের বেশ কষ্ট হবে। পরমা বললো।

হ্যাঁ। তা হবে। পাবলিকের বেশ কষ্ট হবে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী?

পাবলিকের কষ্ট দেখে কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে? পরমা তাকালো।

হ্যাঁ। এমনটাই আশা করা যাচ্ছে।

কখন শুরু হবে সিট ডাউন স্ট্রাইক?

আজ দুপুর থেকেই। আমরা যার যার ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বলার পরই তারা বেরিয়ে আসবে রাস্তায়। সব একসঙ্গে। আন্দোলন নাটকীয়ভাবে নতুন মোড় নেবে। সাঈদ বলে।

পরমা ঘড়ির দিকে তাকালো। সাড়ে বারোটা বাজে। সে ব্যস্ত হয়ে বললো, তাহলে চলো যাওয়া যাক। যেতে সময় নেবে। রাস্তায় অনেক পুলিশ।

সাঈদ বললো, মনে হয় খবর পেয়ে গিয়েছে। যাক গে। কতজনকে আটকাবে? আমরা সংখ্যায় অনেক।

রেস্তরাঁ থেকে বের হবার আগে সাঈদ বড় দুই বোতল পানি কিনলো। রাস্তা থেকে কিনলো এক প্যাকেট বিস্কিট। পরমার ব্যাগে একটা বোতল আর বিস্কিটের প্যাকেট রেখে বললো, সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকতে হবে রাস্তায়। সঙ্গে পানি রাখতে হবে সবাইকে। সেই সঙ্গে বিস্কিট কিংবা পপ কর্ন।

সবাই জানবে কী করে সে কথা? পরমা তাকালো জিজ্ঞাসার চোখে।

সাঈদ বললো, আমরা গিয়ে বলবো। অন্যেরা যার যার ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েদের বলবে। তা ছাড়া সব রাস্তাতেই পানি বিক্রি হয়। পপ কর্নও পাওয়া যায়। রাস্তা থেকেই কিনে নিতে পারবে সবাই। খুব একটা পাবলিসিটির দরকার হবে না।

ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি-বাস, বেবিট্যাক্সি সব থেমে গেল। কিছুক্ষণ হর্ন বাজালো কেউ কেউ গাড়িতে বসে বসে। তাতে কোনো ফল না হওয়াতে চুপচাপ বসে থাকলো স্টিয়ারিং হুইলের সামনে। ভেতরে বসে থাকা মানুষগুলো ঘামে ভিজে গেল। বিকেলের দিকে নিরুপায় হয়ে অনেকে হেঁটে রওনা হলো গন্তব্যে। রাস্তাজুড়ে সব বয়সের পুরুষ-মহিলা। স্কুল ফেরত ছোট ছেলে-মেয়েরাও রয়েছে তাদের সঙ্গে।

পরমা সাঈদকে বললো, বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের জন্য কষ্ট হচ্ছে। হেঁটে যাচ্ছে। কতদূর যাবে কে জানে! বেচারারা!

সাঈদ বললো, একটা দিনই তো। সহ্য করতে পারবে।

পরমা বললো, একদিনের সিট ডাউনেই কাজ হয়ে যাবে?

সাঈদ বললো, তাই তো আশা করা যাচ্ছে।

বিকেলের দিকে পুলিশের কয়েকটা দল এসে বসে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের ধরে নিয়ে হেঁটে চললো। তাদের গাড়ি কাছে নেই, কোথায় তাও দেখা যাচ্ছে না। তারা আক্রোশের সঙ্গে হেঁটে চললো। যাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে সাঈদ আর পরমা রয়েছে।

সাঈদ সামনের পুলিশকে বললো, কোথায় নিচ্ছেন ভাই?

পুলিশ তার পাছায় ব্যাটনের আঘাত দিয়ে বললো, শ্বশুরবাড়ি। আর কোথায়?

সাঈদ বললো, এতজনকে শ্বশুরবাড়িতে জায়গা দেবেন কেমন করে?

ব্যাটনের আরেকটা গুঁতো দিয়ে পুলিশ বললো, সেটা আমাদের ব্যাপার।

পরমা মেয়ে পুলিশকে বললো, আপনাদের কষ্ট করতে হচ্ছে। এর জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু আমরা তো এক জায়গায় বসে নেই। প্রায় সারা শহরে ছড়িয়ে আছি। কয়জনকে ধরবেন আপনারা?

মেয়ে পুলিশ বললো, এর উত্তর বলতে পারবো না। আমাদেরকে বলা হয়েছে তাই ধরে নিয়ে যাচ্ছি। কতজনকে ধরতে হবে সে কথা বলা হয়নি আমাদের।

রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। রাস্তায় তখনো হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী বসে আছে। তাদের নিয়ে যেতে দেখে স্লোগান দিলো জোরে জোরে। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে পরমার গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার বাবা দ্রুত হেঁটে আসছেন তাদের দিকে। কী করে খবর পেলেন তিনি? পরমা অবাক হলো।

কাছে এসে পুলিশ অফিসারকে তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি এর বাবা। অধ্যাপক নজমুল হক।

শুনে পুলিশ অফিসার থতমত খেয়ে গেলো। স্বর নামিয়ে বললো, স্যার, আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। এ আপনার মেয়ে জানতাম না। বলে সে পরমাকে দেখালো।

নজমুল হক বললেন, ছেড়ে দেওয়া যায় না? এর আগে এমন কাজ করেনি। এই প্রথম।

পুলিশ অফিসার স্বর নামিয়ে বললো, হঠাৎ করে এখানে ছাড়া যাবে না স্যার। একটু হাঁটিয়ে সামনে নিয়ে যাবো। তারপর ফাঁকা জায়গায় গিয়ে ছেড়ে দেবো। আপনার মেয়েকে বলবেন, সে যেন আগের রাস্তায় গিয়ে না বসে আবার।

নজমুল হক পরমাকে বুঝিয়ে বললেন। শুনে প্রথমে পরমা আমতা আমতা করলো। বললো, শুধু আমাকে ছেড়ে দিলে কেমন দেখাবে? সবাই আমাকে স্বার্থপর ভাববে। আমরা একসঙ্গে বসে ছিলাম। ধরাও পড়েছি একসঙ্গে।

নজমুল হক তাঁর ছাত্রের সঙ্গে আবার কথা বললেন। সে গুনে গুনে দেখলো কয়জনকে ধরা হয়েছে। পরমাসহ সাতজন।

সে নজমুল হককে বললো, বেশ আপনি যখন বলছেন সবাইকে ছেড়ে দেবো। কিন্তু এদের কেউ যেন আবার আগের রাস্তায় গিয়ে না বসে। তাদের ধরা হয়েছে, এটা সেখানে যারা বসে আছে সবাই দেখেছে। এরা ফিরে গেলে অন্য রকম ভাববে।

পরমা শুনে সাঈদকে বললো, এখন কী করা যায়? ছেড়ে দেবে কিন্তু আগের রাস্তায় গিয়ে বসতে দেবে না।

সাঈদ বললো, ঠিক আছে। সেই রাস্তায় বসবো না কেউ। অন্য ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা যেখানে বসেছে সেখানে গিয়ে বসা যাবে। এরা সেখানে থাকবে না। সুতরাং আমাদের

দেখতে পাবে না।

ছাড়া পাবার পর পরমা তাঁর সঙ্গে আসতে না দেখে নজমুল হক অবাক হয়ে বললেন, কিরে, কোথায় যাচ্ছিস? বাড়ি চল।

পরমা তার স্বর নিচু করে বললো, আরেক রাস্তায় গিয়ে বসবো আমরা। সেখানে তোমার ছাত্র পুলিশ অফিসারটি থাকবে না।

কিন্তু আর বসার দরকার আছে? অনেকক্ষণ তো বসলি।

পরমা সাঈদ আর অন্য ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে যেতে যেতে বললো, এখনো দাবি পূরণ হয়নি বাবা। সিটডাউন শেষ হবে কী করে? আমাদের আন্দোলন চলবে যতক্ষণ দাবি মেনে নেওয়া না হয়।

নজমুল হক স্তম্ভিত হয়ে মেয়ের চলে যাওয়া দেখলেন। তার পাশে হেঁটে যাওয়া ছেলেটি হঠাৎ পেছন ফিরে হাত তুলে তাকে সালাম দিলো।

ঠাট্টা করলো কি? ভাবলেন নজমুল হক।

পুলিশ অফিসার দেখে নজমুল হককে বললো, যাক বাঁচা গেল! যেখান থেকে ধরা হয়েছে সেখানে ফিরে যাচ্ছে না।

অধ্যাপক নজমুল হক হঠাৎ করে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে আসেননি। পরমাদের ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপকের সঙ্গে তিনি দুপুর থেকেই যোগাযোগ রাখছিলেন। পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদের ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, যাদের ধরা হয়েছে তার মধ্যে তাঁর মেয়ে পরমাও আছে। শুনে তিনি গাড়ি নিয়ে এসেছেন যতদূর পেরেছেন। তারপর হেঁটে হেঁটে পৌঁছে গেছেন যেখানে পুলিশ পরমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো। রাস্তাতেই মুখোমুখি হলেন তিনি মেয়ের। তাঁর ভাগ্য ভালো, পুলিশ অফিসারটি তাঁকে দেখে শিক্ষক হিসেবে চিনেছে। না হলে পরমাদের নির্ঘাত থানায় নিয়ে যেত। থানা থেকে সেই দিন তাকে বের করা যেত কি-না সন্দেহ। খুব অল্পের জন্য রক্ষা পেল মেয়েটা আর তার সঙ্গীরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে কি-না কে জানে! আবার যে ধরা পড়বে না কে বলতে পারে? সব পুলিশ দলেই তাঁর ছাত্র নেই।

বিকালে বাড়ি ফিরলেন একা নজমুল হক।

সায়েরা বেগম বললেন, মেয়েকে আনতে গেলে; একা কেন? আনলে না?

নজমুল হক কপালের ঘাম রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে সোফায় বসে বললেন, মেয়ে আসলো না। বললো, অন্য জায়গায় গিয়ে বসবে। তাদের আন্দোলন শেষ হয়নি।

সায়েরা বেগম বললেন, খুব জেদি মেয়ে। যা ভাববে তাই করবে। তার স্বরে বিরক্তি।

নজমুল হক জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, করুক। কোনো ক্ষতি না হলেই হলো।

সায়েরা বেগম বললেন, ক্ষতি তো হতে পারে।

নজমুল হক সোফায় পিঠ এলিয়ে দিয়ে বললেন, ও তো একা না। ওর সঙ্গে আরও অনেকে রয়েছে। সবার যা হবে ওরও তাই হবে। এ নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। আমার চেষ্টায় যতদূর করা যায় তা করেছি। এর বেশি আর কী করতে পারি? নজমুল হকের স্বরে ক্ষোভ নেই। বিরক্তি নেই। মনে হলো তিনি ভাগ্য মেনে নিয়েছেন।

পড়ন্ত বিকেলের হলুদ ফ্যাকাসে রোদ জানালার শিক গলিয়ে ঘরের মেঝেতে পানি মেশানো রঙের মতো চলকে পড়েছে। ঘরের সেই জায়গাটুকু অন্য অংশের তুলনায় আলাদা দেখাচ্ছে, যেন ঘরের অংশ না, বাইরের কোনো ছবি আঁকা। নজমুল হক সোফাতেই বসে কিছুক্ষণ ঝিমুলেন। সায়েরা বেগম তাঁকে বিছানায় গিয়ে শুতে বলেছিলেন, তিনি কানে নেননি। তাঁর ভেতরে মেয়ের জন্য হঠাৎ জেগে ওঠা অস্থিরতার জন্য ঘুমনোর কথা তিনি ভাবতেই পারেননি। তবু সোফাতে বসা অবস্থাতেই ক্লান্তিতে ঝিমুনি এসেছিল। তার তন্দ্রা ভাঙলো কিছুক্ষণ পরে টেলিভিশনের খবর শুনতে পেয়ে। অনেকক্ষণ ধরেই ঘরে টেলিভিশন চলছে। তাঁর স্ত্রী একটার পর একটা চ্যানেল দেখছেন। সবটাতেই এক খবর। ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থান ধর্মঘট। তাদের বসে থাকা অবস্থায় দেখাচ্ছে টেলিভিশনে, সেই সঙ্গে সংবাদদাতার কমেন্টারি শোনা যাচ্ছে। ধারা বিবরণীতে বলা হচ্ছে, শহরের কোন রাস্তায় কতজন বসে আছে, তারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের। ধারে কাছে পুলিশ নেই। রাস্তায় আটকে পড়া গাড়ি, বাস, বেবিট্যাক্সি, রিকশা দেখানো হচ্ছে একটু পরপর। ভেতরে বসে থাকা যাত্রীদের ক্লান্ত মুখ দেখাচ্ছে ক্লোজ-আপ শট নিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের মুখের ক্লোজ-আপ শটও দেখানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, সবার কষ্ট আর ক্লান্তির চেহারা স্পষ্ট করে দেখানো। এতে দর্শকদের মনে সহানুভূতি জেগেছে। নানা রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। ইন্টারভিউ নিয়ে পথচারী, আটকে থাকা যাত্রী এবং বসে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের বক্তব্য শোনানো হচ্ছে।

ক্যামেরা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটি মেয়ের মুখের দিকে ফোকাস করলো। চমকে উঠলেন নজমুল হক। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে পরমাকে পথের মাঝখানে বসে থাকতে দেখলেন তিনি। বোতল থেকে পানি নিয়ে মুখে ছিটিয়ে দিচ্ছে। খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। পাশে বসে আছে সেই ছেলেটা, যে তাঁর দিকে ফিরে সালাম দিয়েছিল ছাড়া পাবার পর। পরমার বাবা বলে চিনতে পেরেছিল কি? এই মুহূর্তে তিনি ছেলেটার কথা ভাবছেন না; এমনকি পরমার কথাও না। তিনি ভাবছেন তার ছাত্র পুলিশ অফিসারটির কথা। সে কি এখন টেলিভিশনের পর্দায় পরমাকে দেখছে? দেখলে তাঁর সম্বন্ধে কী ভাবছে সে? তাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন পরমা এবং তার বন্ধুরা পথের ওপরে আবার বসবে না। কিন্তু পুলিশ অফিসারটি এখন স্পষ্ট দেখছে– সে কথা তারা রাখেনি। এরপর যদি কোনোদিন সেই ছাত্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় তাহলে কী কৈফিয়ত দেবেন? তিনি কোন ব্যাখ্যা করবেন? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মন হালকা হয়ে এলো। পরমারা কথা ঠিকই রেখেছে। পুলিশ অফিসারটি বলেছিল, তারা যেন আগে যেখানে বসেছিল সে জায়গায় গিয়ে না বসে। তারা সেখানে বসেনি। অন্য জায়গা বেছে নিয়ে বসেছে। সুতরাং কথার বরখেলাপ হয়নি। তিনি পুলিশ অফিসারটির সঙ্গে দেখা হলে এই কথাই বলবেন। বলতে তার একটুও ইতস্তত করা কিংবা বিব্রতবোধ করার কারণ হবে না। ভাবতেই তাঁর মন শান্ত হয়ে এলো।

সায়েরা বেগমও টেলিভিশন দেখছিলেন। পরমার মুখের ক্লোজ-আপ দেখতেই তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। আর্তস্বরে বললেন, পরমা! আমাদের পরমা! দেখতে পাচ্ছো?

নজমুল হক বললেন, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি।

রাস্তার ওপর বসে আছে। ছেঁড়া কাগজ পেতে বসেছে। মাথার ওপর কিছু নেই। রোদে মুখটা জ্বলে গিয়েছে যেন। কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু খায়নি। সায়েরা এক মনে বলে গেলেন।

নজমুল হক কিছু বললেন না। টেলিভিশনে কী বলছে তা শোনার চেষ্টা করলেন। কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানার জন ব্যস্ত হলেন। ধারাভাষ্যকার বললো, উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। শীঘ্রই সিদ্ধান্ত জানানো হবে। শুনে তিনি আশ্বস্ত হলেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেলো একটু পর। বড় রাস্তায় স্ট্রিট ল্যাম্পের

হলুদ আলো জানালা দিয়ে দেখা গেল। টেলিভিশনে তখনও রাস্তায় বসে থাকা ছেলে-মেয়েদের দেখাচ্ছে। একটু পর তারা জয়ধ্বনি দিয়ে একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। সবাইকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। উত্তেজিত হয়ে স্লোগান দিচ্ছে কেউ কেউ।

অধ্যাপক নজমুল হক সোফার সামনে ঝুঁকে বসে উল্লসিত হয়ে বললেন, পরমারা মনে হচ্ছে জিতে গেল।

কী করে বুঝলে?

দেখছো না কেমন খুশি আর উৎফুল্ল দেখাচ্ছে সবাইকে। যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে রাস্তায়।

তাহলে সে কি এখন বাড়ি আসবে? সায়েরা বেগম তাকালেন স্বামীর দিকে।

হ্যাঁ। কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে যখন, রাস্তায় থেকে কী করবে? সবাই এখন যার যার বাড়ি যাবে। খাবে, বিশ্রাম করবে। বাবা-মা, ভাইবোনদের অনেকের অভিজ্ঞতার কথা বলবে।

সায়েরা বেগম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাব্বাহ্। বলিহারি দিই মেয়েকে। কী করে পারলো এতক্ষণ রাস্তায় বসে থাকতে? এই গরমে, ধুলো-বালি-ধোঁয়ার ভেতর?

নজমুল হক বললেন, তোমার গর্ব হচ্ছে না মেয়ের জন্য?

গর্ব? বুক ঢিপঢিপ করছিল সারা দুপুর, সারা বিকেল। এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। দারুণ শান্তি পাচ্ছি। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরুক ভালোয় ভালোয়।

নজমুল হক উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মেঝেতে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন, যেন শরীরের আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। অনেকক্ষণ সোফায় বসে ছিলেন। পেশিগুলো অচল হয়ে গিয়েছে যেন। জানালার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকালেন। ঘুমন্ত অজগরের জেগে ওঠার মতো ট্রাফিক চলতে শুরু করেছে। তিনি রাস্তার দিকে তাকিয়েই স্বগতোক্তির মতো বললেন, মেয়ের জন্য আমার গর্ব হচ্ছে। ওর মধ্যে একটা আদর্শ আছে। জীবনদর্শন। অন্যায় কিছু মেনে নিতে চায় না।

একটু পর কানাডার এডমন্টন থেকে ছেলে নঈমের ফোন এলো। তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হলো। সে শুনতে পেয়েছে পরমাদের অবস্থান ধর্মঘট সফল হয়েছে। জানতে চাইলো, পরমা বাড়ি ফিরেছে কি-না।

নজমুল হক ছেলেকে বললেন, এখনও ফেরেনি। ফিরলে তোকে ফোন করতে বলবো। নে, তোর মায়ের সঙ্গে কথা বল। সারাদিন খুব দুশ্চিন্তায় ছিল। সায়েরা বেগম ফোন হাতে নিয়ে ছেলেকে বললেন, বাবা, যা একটা দিন গেল; তোকে বলে বোঝাতে পারবো না। এমন কোনোদিন হয়নি। আর যেন না হয়।

ছেলে বললো, পরমাকে ফোন করতে বলো। ওর জন্য সুসংবাদ আছে।

কী সুসংবাদ?

এলবার্টা ইউনিভার্সিটিতে ওর অ্যাডমিশন হয়ে গিয়েছে। এমএ পরীক্ষা দিয়েই সে এডমন্টনে চলে আসতে পারবে।

সায়েরা বেগম বললেন, সুসংবাদ বটে। তবে আমাদের জন্য একটু দুঃখের সংবাদও।

কেন, দুঃখের কী হলো? নঈম জানতে চায় ব্যগ্র হয়ে।

বারে, ছেলে-মেয়ে দু'জনেই বিদেশে থাকবে, তোদের জন্য মন খারাপ করবে না? মেয়েটা কাছে ছিল, সেও দূরে চলে যাবে। বুড়ো-বুড়ি একা পড়ে থাকবো।

ও, সেই কথা। এর সমাধানও আছে। তোমরা কানাডা বেড়াতে আসবে। আমরাও ঢাকায় যাবো। আর মোবাইলে টেলিফোন তো রোজই করা যাবে। স্কাইপ শিখে নিও। তখন কথা বলার সময় আমাদের মুখের ছবিও দেখতে পাবে। নাও, নাতনীর সঙ্গে কথা বলো। সে কখন থেকে কথা বলতে ব্যস্ত হয়ে আছে।

তাদের নাতনী বিদেশি বউয়ের ঘরে। ইংরেজি বলে, দু-একটা বাংলা শব্দ শিখেছে।

টেলিফোন হাতে নিয়ে নাতনী বললো, হাই-ই গ্র্যান্ড মা। হোয়েন আর ইউ কামিং?

সায়েরা বেগম হেসে বললেন, হোয়েন ইউ আর রেডি।

নাতনী বললো, আই অ্যাম রেডি। কাম সুন। অল অফ ইউ। বাই-ই।

সায়েরা বেগম হেসে বললেন, বাই-ই।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, নাতনীটা খুব কথা বলতে শিখেছে। চলো গিয়ে দেখে আসি। নজমুল হক বললেন, পরমার পরীক্ষা শেষ হোক। ওকে কানাডা পৌঁছে দিতে যাবো আমরা। একসঙ্গে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে ফেরা যাবে। পরমা ততদিনে সেটল হয়ে যাবে।

সায়েরা বেগম বললেন, ঐ দেশে সেটল হতে কতদিন লাগে?

কতদিন আর! কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেই হলো।

তিন

সন্ধ্যার বেশ পরে পরমা বাড়ি এলো। সে যতক্ষণ না এলো বেশ উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকলেন সায়েরা বেগম। নজমুল হককে দেখে মনে হলো তার ভেতরকার অস্থিরতা থিতু হয়ে এসেছে। এটা তার স্বভাব; দুশ্চিন্তাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেন না। কালো মেঘের পাশেও রুপোলি রেখা দেখতে পান।

স্ত্রীর অস্থিরতা দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুশ্চিন্তার কারণ নেই। বিপদ কেটে গিয়েছে। দেখছো না টেলিভিশনে দেখাচ্ছে, সব রাস্তা স্বাভাবিক। গাড়ি চলছে, বাস যাচ্ছে। শহরটা থমকে ছিল, এখন দৌড়াচ্ছে।

সায়েরা বেগম জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, তাহলে পরমা আসছে না কেন? অনেকক্ষণ হয়ে গেল রাস্তা স্বাভাবিক হয়েছে।

নজমুল হক বললেন, এত বড় একটা কাণ্ডের পর হুট করে বাড়ি চলে আসা যায়? নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে একে অন্যকে। হয়তো কোথাও বসে চাও খাচ্ছে। সেই সঙ্গে ফুচকা। দে আর সেলিব্রেটিং।

সিঁড়িতে পরিচিত জুতোর শব্দ পেতেই কান খাড়া করলেন দু'জনে। কিন্তু এক জোড়া পায়ের শব্দ না, দুই জোড়া পা যেন ওপরে উঠে আসছে। পরমা না হলে কে বা কারা আসতে পারে এই সময়? দু'জনেরই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। একে অন্যের দিকে তাকালেন।

দরজায় কলিংবেল একবার বাজতেই খুলে সামনের দিকে তাকালেন নজমুল হক। হ্যাঁ, পরমাই, তবে একা না। তার সঙ্গে একটা ছেলেও এসেছে। দেখে চেনা চেনা মনে হলো নজমুল হক সাহেবের। ঠিক কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারলেন না।

ছেলেটি ভেতরে ঢুকে সালাম দিলো দু'জনকে। লাজুক হাসি মুখে। পরমা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, সাঈদ। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আমরা রাস্তায় একসঙ্গে বসে ছিলাম।

এখন অধ্যাপক নজমুল হকের মনে পড়লো। পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এই ছেলেটি পেছন ফিরে তাঁকে সালাম দিয়েছিল। দেখতে ভদ্র, চটপটে স্বভাবের। কিন্তু এর আগে এ বাড়িতে সে কোনোদিন আসেনি।

তিনি ছেলেটিকে বললেন, বসো। বসো। খুব টায়ার্ড হয়ে আছো নিশ্চয়ই। সারাদিন রাস্তায় বসে ছিলে।

সাঈদ হেসে বললো, সবাই একসঙ্গে ছিলাম। উত্তেজনায় কিছু টের পাইনি। কিন্তু পরমা মনে হয় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বলে সে পরমার দিকে তাকালো।

পরমা মাথা তুলে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বললো, মোটেও না। মেয়ে বলে দুর্বল ভাবছো নাকি আমাকে?

সাঈদ বললো, না। তা বলছি না। ছেলেদের মধ্যেও অনেকে ক্লান্ত হয়েছে। ডিহাইড্রেশনে ভুগছে। নিজের চোখেই দেখেছো তাদের।

হ্যাঁ। দেখেছি। ওরা সব দুর্বল শরীর আর মনের মানুষ। কষ্ট সহ্য করতে পারে না। আমি অন্য ধাতুতে তৈরি। আব্বা জানেন সে কথা। আমি ভাঙি কিন্তু মচকাই না।

নজমুল হক বললেন, ওসব কথা এখন থাক। হাত-মুখ ধুয়ে নাও। সাঈদকেও বাথরুমটা দেখিয়ে দাও। তারপর এসে চা-নাস্তা কিছু খাও। দু'জনের দুপুরে হয়তো ঠিকমতো খাওয়া হয়নি। তারপর বললেন, ঠিকমতো কেন, হয়তো একেবারেই খাওনি।

পরমা চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললো, প্রচুর পপ কর্ন খেয়েছি। আর বাদাম। অভুক্ত থাকিনি কেউ।

সায়েরা বেগম ভেতরে যেতে যেতে বললেন, ওসব খেয়ে কি পেট ভরে? হাত-মুখ ধুয়ে আস। দু'জনে চা-নাস্তা খা। সায়েরা বেগমের পিছনে পিছনে পরমা ভেতরে ঢুকলো। বাইরের ঘরে বসে থাকলেন নজমুল হক আর সাঈদ। নজমুল হক সাঈদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি পরমার সঙ্গে পড়ো? এক ক্লাসে?

জি না। আমি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়ছি। ফাইনাল পরীক্ষা দেবো এবার।

নজমুল হক বললেন, তাহলে তোমাদেরকে সহপাঠীই বলতে হয়। পরমাও ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। ওর অবশ্য সাবজেক্ট ইংলিশ লিটারেচার।

সাঈদ বললো, আমি এক বছর ড্রপ করেছি। অসুখ হয়েছিল।

নজমুল হক বললেন, ও, তুমি তাহলে পরমার এক বছরের সিনিয়র। সেই জন্য ওর সঙ্গে তোমাকে এর আগে দেখিনি।

সাঈদ কিছু বললো না। মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

পরমা হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢোকার আগে নজমুল হক সাঈদকে প্রশ্ন করে তার বাপ-মার নাম জেনে নিলেন; তাঁরা কী করেন তা শুনলেন। তাদের দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা কয় ভাই-বোন, কে কী করছে সেসব খবরও জানা হয়ে গেল।

পরমা ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, সাঈদকে জেরা করে সবকিছু জেনে নিয়েছো মনে হচ্ছে। তোমার পুরনো অভ্যাস আর গেল না। আমার বন্ধুদের কেউ আমাদের বাসায় এলে নানা প্রশ্ন করে সব না-জানা পর্যন্ত শান্ত হতে পারেন না বাবা। শেষের কথাটা সে সাঈদকে শুনিয়ে বললো। তারপর বললো, এক্ষেত্রে মাও কম যায় না।

নজমুল হক হেসে বললেন, এটাই কি ভদ্রতা না, নাম-ঠিকানা জানা। পরিবার সম্বন্ধে জানতে চাওয়া, বাবা-মার পরিচয় নেওয়া– এসবই সামাজিকতার অংশ। জেরা হতে যাবে কেন? সাধারণ সৌজন্যবোধ।

পরমা হেসে বললো, আসল কারণটা বলছো না কেন? তুমি জানতে চাও আমি যাদের সঙ্গে মিশি তারা কেমন, তাদের ফ্যামিলি কেমন? অর্থাৎ আমাদের সমকক্ষ কি-না?

বেশ তাই না হয় হলো। এতে দোষের কিছু আছে? সব বাবা-মা'ই এমন করে থাকে।

করুক। কিন্তু তুমি করতে যাবে কেন? আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই? আমি পথভ্রষ্ট হতে পারি– এমন চিন্তা মাথায় ঢুকবে কেন তোমার কিংবা মার?

নজমুল হক হেসে সাঈদের দিকে তাকালেন। স্বাভাবিক হবার জন্য বললেন, পরমা খুব স্বাধীনচেতা। ওর প্রাইভেসিতে সামান্য হাত দিলে প্রতিবাদ জানায়। শুনলে তো ওর কথা?

এ কথা জানোই যখন এমন করো কেন? বুঝতে পারো না এতে আমাকে ছোট করা হয়। পরমার স্বরে ক্ষোভ।

নজমুল হক বললেন, বেশ। এরপর আর এমন করবো না। পরমা কিছুক্ষণ তার বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর উঠে এসে তাঁর কপালে ও গালে চুমু খেয়ে বললো, ব্যস। সন্ধি হয়ে গেল। তারপর চেয়ারে বসে সাঈদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি বাবার ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারি না। হাসি দিয়ে সব ভুলিয়ে দেয়। আপস করে সহজেই। তারপর হেসে বললো, মনে হয় আমাকে ভয় পায়।

সায়েরা বেগম ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে ট্রেতে খাবার, পানির গ্লাস আর চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকলো কাজের বুয়া, আমেনা।

আমেনার হাত থেকে নাস্তার প্লেট নিয়ে পরমা বললো, তোমার ছেলে স্কুলে যাচ্ছে তো?

আমেনা মাথায় ঘোমটা লম্বা করে টেনে সলজ্জে বললো, যায়।

পরমা বললো, আজ ওর পড়া ধরবো। দেখবো কেমন শিখছে, নাকি শেখার ভান করছে। তারপর সাঈদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমেনাকে আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে আনা হয়েছে। ওর স্বামী আমাদের জমিতে ক্ষেতমজুর ছিল। কলেরায় মারা গেলে বেচারীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। কোথাও যাবার জায়গা ছিল না। বাবাকে বললাম, ঢাকায় নিয়ে এসো। আমাদের বাড়ি থাকবে। কাজ-কর্ম করবে। ছোট ছেলেটাকে স্কুলে পড়তে পাঠানো হবে। বাবা রাজি হয়ে গেলেন। তারপর দুই পা দুলিয়ে বললো, বাবা আমার কোনো কথা ফেলতে পারে না।

সাঈদ আমেনার দিকে তাকালো। ঘোমটার জন্য মুখের সবটা দেখা যাচ্ছে না। হাত দেখে মনে হলো বয়স চল্লিশের ওপর হবে। বেশ সাবধানে চলাফেরা করছে ঘরের ভেতর। একটু লাজুকও মনে হলো। হয়তো নতুন লোক দেখে তার এই প্রতিক্রিয়া। সে পরমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি বেশ পরোপকারী। নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকো না। এই বিধবার খুব উপকার করেছো।

পরমা ঠোঁট উল্টে বললো, পরোপকারী না ছাই। সব খরচ তো বাবার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। আমেনার জন্য গ্রামে একটা থাকার ঘরও তৈরি করে দিয়েছে আমার কথা শুনে। বছরে একবার ছেলেকে নিয়ে গ্রামে যায় আমেনা। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করে আসে।

সাঈদ চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললো, আমি শহরেই মানুষ। গ্রামে যাওয়া হয়নি। তোমাদের গ্রামে যেতে ইচ্ছে করছে। তুমি বেশ ক'বার তোমাদের মিঠাপুকুরের গ্রামের কথা বলেছো। ঐ গ্রাম নিয়ে তোমার একটা স্বপ্নও আছে, সে কথা জানিয়েছো।

শুনে নজমুল হক পরমার দিকে তাকালেন। পরমা তার চোখে প্রশ্ন দেখে বললো, গ্রাম যে শহর হয়ে যাচ্ছে, সে কথা বলেছিলাম সাঈদকে। গ্রামের সৌন্দর্য বজায় রেখেই তার



উন্নতি করা যায় কি-না এ নিয়ে কিছুটা আলোচনাও করেছিলাম। ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা বলেছিলাম। গ্রামে গেলে এসব কথা তোমার সঙ্গে প্রায়ই হয় আমার। নতুন কিছু না। স্বপ্ন বলতে আমার পুরনো ধারণাগুলোর কথাই বললো সাঈদ।

নজমুল হক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। পরমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, ছোট বেলায় আমার সঙ্গে প্রায়ই গ্রামে যেত পরমা। বড় হবার পর পড়াশোনার চাপে যেতে পারেনি। ও গ্রাম খুব পছন্দ করে। গ্রাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী হলে হয়তো গবেষণা করে গ্রাম নিয়ে বই লিখে ফেলতো।

পরমা গম্ভীর হয়ে বলে, গ্রাম সাহিত্যেরও বিষয় হতে পারে। গ্রাম-ভিত্তিক উপন্যাস এখন খুব একটা লেখা হচ্ছে না। মনে হচ্ছে লেখকদের অভিজ্ঞতার অভাব।

তুমি লিখে ফেলো না একটা। সাঈদ বললো পরমাকে।

পরমা বললো, সে সময় পাবো বলে মনে হয় না। এমএ পরীক্ষা দিয়েই কানাডা চলে যাবো। সেখানেই পিএইচডি করার ইচ্ছা। তবে হ্যাঁ, আমাদের গ্রাম নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার কথা আমার মনে হয়েছে। হয়তো একদিন লিখবো।

নজমুল হক বললেন, নঈম ফোন করেছিল। বললো, তোর অ্যাডমিশন হয়ে গিয়েছে। ই-মেইলে কাগজপত্র পেয়ে যাবি। তোকে ফোন করতে বলেছে। সে তোদের আন্দোলনের কথা সব জানে। অভিনন্দন জানিয়েছে। পরমা পা দোলাতে দোলাতে বললো, জানবেই তো। ফেসবুকে হাজার হাজার ছবিসহ স্ট্যাটাস। সারা পৃথিবীর লোক জানে আমাদের সিটডাউন স্ট্রাইকের কথা। জানো, আমি কত লাইক পেয়েছি?

কত? নজমুল হক মেয়ের দিকে তাকালেন। পরমা স্মার্টফোন অন করে ফেসবুক ওপেন করে দেখে নিয়ে বললো, পনেরো হাজার। স্টিল কন্টিনিউইং। তারপর হেসে বললো, এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কী দিয়া?

সাঈদ চলে যাবার পর সায়েরা বেগম বললেন, ছেলেটা বেশ। কতদিন থেকে চিনিস?

পরমা অন্যমনস্কের মতো বললো, এই তো সপ্তাহখানেক মাত্র।

সায়েরা বেগম অবাক হয়ে বললেন, দেখে মনে হলো অনেকদিনের জানাশোনা।

একসঙ্গে আন্দোলন করতে গিয়ে মেলামেশাটা বেশি হয়েছে। তাই তোমার মনে হচ্ছে অনেকদিনের জানাশোনা।

সায়েরা বেগম বললেন, ছেলেটাকে তোর পছন্দ?

শুনে ঠোঁট কামড়ে মায়ের দিকে তাকালো পরমা। তারপর বললো, আচ্ছা মা, তোমার কি এই অভ্যেস যাবে না? আমার ছেলেবন্ধু দেখলেই জিজ্ঞেস করো– আমার পছন্দ কি-না? পছন্দ তো বটেই। না হলে বন্ধু হতে দেবো কেন?

সায়েরা বেগম বললেন, না, মানে বলছিলাম, কেমন পছন্দ? এটা জিজ্ঞাসা করা দোষের?

আহ মা! সন্ধ্যেটা মাটি করে দিও না। পছন্দ পছন্দই। কোনো রকমফের আছে নাকি? তোমাকে এ কথা কতবার বলবো? বাবা আছেন জেরা নিয়ে আর তুমি আমার পছন্দের ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছো। তোমরা কী?

বেশ, আর জিজ্ঞাসা করবো না। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায়েরা বেগম বললেন, মা হলে বুঝতিস– কত কিছু ভাবতে হয়!

এত কিছু ভাবতে হবে কেন? আমি কি বোঝা হয়ে যাচ্ছি তোমাদের জন্য? এখনই বিদায় করতে চাও। তারপর একটু থেমে সে বললো, হ্যাঁ, বিদায় তো হবোই। কানাডা চলে যাচ্ছি ক'দিন পর। তোমাদের এসব প্রশ্ন শুনতে হবে না আর।

নজমুল হক নড়েচড়ে বসে বললেন, 'তোমাদের' বলছিস কেন? আমি তো তোকে সাঈদ কেমন বন্ধু– সে কথা জিজ্ঞাসা করিনি। তোর পছন্দ কি-না, তাও না।

তা করোনি। কিন্তু সাঈদকে সরাসরি যেসব প্রশ্ন করেছো তার পেছনের কারণটা কী আমি বুঝতে পারি না মনে করো? তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে এতো দুশ্চিন্তা করো না। আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি। তোমাদেরকে লজ্জায় ফেলবো

না, বিব্রত করবো না। অভিমানে তার স্বর ভারি হয়ে আসে।

নজমুল হক সস্নেহে বললেন, আমরা তোর সম্বন্ধে তেমন চিন্তা কখনো করি না। আমাদের ভুল বুঝিস না।

নজমুল হকের কথা শেষ হতে না হতে পরমার আইপ্যাডে কথা শোনা গেল। সেই সঙ্গে নঈমের মুখের ছবি। পরমা ব্যস্ত হয়ে বললো, ভাইয়া ভাইবারে। তারপর ভাইবারে তাকিয়ে বললো, হ্যাঁ, ভাইয়া। কেমন আছো? আমি? চমৎকার। সব খবর তো পেয়েছো। আমরা জিতে গিয়েছি। অ্যাডমিশন? হ্যাঁ, বাবা বলেছেন। আমি এখনো ই-মেইল খুলিনি। ফর্ম-টর্ম সব পেয়ে যাবো। আমার পরীক্ষা আরো ছয় মাস পর। এর মধ্যে একটা থিসিসও লিখতে হবে। সব হয়ে যাবে সময়মতো। আমার কিন্তু খারাপ লাগছে।

কেন?

বাবা-মাকে একা রেখে যাবো। তুমি নেই, আমিও থাকবো না। তারা বেশ মিস করবে। আমি কিন্তু তোমার মতো কানাডায় সেটল করবো না। পিএইচডি হয়ে গেলেই চলে আসবো। তোমার স্ত্রী, মেয়ে সফি কেমন আছে? তাদেরকে আমার শুভেচ্ছা দিও। রাখি এখন। কাল কথা হবে আবার।

পরমার কথা শেষ হলে নজমুল হক বললেন, কানাডায় সেটল করবে কি করবে না, এখনই সে সিদ্ধান্ত নেবার দরকার কী? আমাদের দু'জনের কথা ভেবে তোমাকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে না। তোমার জন্য যা ভালো তুমি তাই করবে। তাতেই আমাদের আনন্দ। সুখ।

পরমা বললো, জানি সে কথা। কিন্তু বিদেশ আমার পছন্দ না। সব সময় মনে হবে প্রবাসী।

নজমুল হক বললেন, সেখানে গিয়ে বসবাস করার পর ভেবে দেখবে, পছন্দ হচ্ছে কি-না। এখনই পছন্দ-অপছন্দের কথা তোলা প্রিম্যাচিউর। এত তাড়াহুড়া কিসের?

পরমা বললো, আমাকে বড় কিছু করতে হবে।

নজমুল হক বললেন, সেটা বিদেশে থেকে হবে না?

পরমাকে চিন্তিত দেখালো। সে স্বগতোক্তির মতো বললো, মনে হচ্ছে হবে না। মাই ডেসটিনি ইজ হিয়ার।

চার

অধ্যাপক চৌধুরীর অফিস কামরা থেকে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলো মারিয়া। সে মেঝের দিকে তাকিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে করিডর দিয়ে। তখন সব ক্লাস চলছে, তাই করিডরে তেমন ভিড় নেই। সিঁড়ির মাথায় এসে মারিয়া পরমার সামনে পড়লো। পরমা খুব অবাক হয়ে মারিয়াকে অপাঙ্গে দেখলো। তাকে বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল, পাতা ভিজে আছে। বোঝা গেল একটু আগে কেঁদেছে।

পরমা তার হাত চেপে বললো, কিরে অমন করে দৌড়ে যাচ্ছিস কেন? ট্রেন ধরবি? তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, চোখ-মুখের এই অবস্থা কেন? কেঁদেছিস মনে হচ্ছে। কী হয়েছে?

কিছু না। বলে মারিয়া তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। পরমা হাত শক্ত করে ধরে রাখলো। জোর দিয়ে বললো, একটা কিছু হয়েছে। বলতে হবে তোকে। কী হয়েছে বল।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো মারিয়া। যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না আর।

পরমা সন্ত্রস্ত হয়ে বললো, কাঁদিস না। কেউ দেখে ফেলবে। তখন ভিড় জমে যাবে। নানা রকম প্রশ্ন করবে। চোখের পানি মুছে ফেল। ছাদে চল। সেখানে কথা হবে। ছাদ এখন নির্জন।

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে ছাদে এলো। শ্যাওলা পড়ে আছে, পা পিছলে পড়ে যাবার মতো হলো তাদের। সাবধানে পা টিপে টিপে চিলেকোঠার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো তারা। পাশের হাইরাইজের ব্যালকনিতে শাড়ি, লুঙ্গি, ব্রা দড়িতে ঝুলছে। একটা ফ্ল্যাট থেকে বাচ্চার কান্না শোনা গেল। মাথার ওপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার বিকট শব্দ করে উড়ে গেল দক্ষিণে। পরমা মারিয়ার মুখের কাছে মুখ এনে বললো, এখন বল, কী হয়েছে। অমন করছিস কেন? কাঁদবার কারণ কী।

মারিয়া ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললো, অধ্যাপক চৌধুরী। একটু থেমে বললো, একটা স্যাডিস্ট।

স্যাডিস্ট মানে! কী করেছেন? সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্ট গোছের কিছু?

মারিয়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, আমাকে টর্চার করছেন। মেন্টাল টর্চার। থিসিসের জন্য যে সাবজেক্টই নিয়ে যাই রিজেক্ট করে দেন। বলেন যে হবে না। অথচ আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। সাবজেক্টই ঠিক করতে পারলাম না এখনও। এমন পরিস্থিতিতে আমি কাঁদবো না?

পরমা বললো, তাঁকে বল একটা সাবজেক্ট ঠিক করে দিতে। তিনিই বলুন কোন সাবজেক্ট হলে তিনি অনুমোদন করবেন।

মারিয়া বললো, দিয়েছেন। কিন্তু আমার পছন্দ হচ্ছে না।

কেন পছন্দ হচ্ছে না? পরমা স্বর নামিয়ে প্রশ্ন করলো।

অন্য ছাত্র-ছাত্রী শুনলে হাসবে। বলবে তোষামোদ করে লেখা।

তার মানে? খুলে বল। বুঝতে পারছি না। তোষামোদ হতে যাবে কেন?

অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর লেখা বইয়ের ওপর থিসিস লিখতে বলছেন। পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ ফিকশন।

শুধু তাঁর বই কেন? অন্য যেসব লেখকের লেখায় রাজনীতি এসেছে তাদের বইয়েরও আলোচনা থাকবে। সেসব লেখকেরও মূল্যায়ন করা হবে। তাহলেই সাবজেক্টটার ওপর সুবিচার করা যাবে।

কিন্তু তিনি তা চান না। বলছেন, শুধু তাঁর বই নিয়েই থিসিসটা লিখতে হবে। তিনি পরে প্রকাশককে দিয়ে বই হিসেবে ছাপাবেন। মারিয়া ক্ষোভের সঙ্গে বলে।

হু। বেশ ফন্দিবাজ মানুষ দেখা যাচ্ছে। একে কি সেক্সচুয়াল হ্যারাসমেন্ট বলা যায় না? পরমা ভ্রু কুঁচকালো।

কী জানি? অত ঝামেলায় যেতে চাচ্ছি না। আমারই ক্ষতি হবে। সময় নষ্ট হবে। নানারকম রটনা ছড়াবে। কমিটি হবে। ইন্টারভিউ নেবে। আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ চাইবে কমিটি। আমি ওপথে যেতে চাই না।

তাহলে লিখে ফেল তাঁর বইএর ওপরই থিসিস। কে কী বললো তার তোয়াক্কা করিস না। অধ্যাপক চৌধুরী থিসিস অনুমোদন করলেই হলো।

মারিয়া বললো, জানিস তো আরও দু'জন পরীক্ষক থাকবেন। তাঁরা কি একমত হবেন তার সঙ্গে?

পরমা বললো, সেটা অধ্যাপক চৌধুরীর মাথাব্যথা। তিনিই সামলাবেন ওই দু'জন পরীক্ষককে। তোর কিছুই করতে হবে না। তুই তোর কাজ করে যাবি। সব দায়িত্ব পড়বে অধ্যাপক চৌধুরীর ঘাড়ে।

তুই সত্যি করে বলছিস? ঠাট্টা করছিস না তো? মারিয়া যেন পরমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

ঠাট্টা করতে যাবো কেন? আমি কি বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারছি না? আমাকেও তো কয়েক দিনের মধ্যে

থিসিসের সাবজেক্ট ঠিক করে অনুমোদন নিতে হবে। পরমা মারিয়ার কাঁধে হাত রেখে বললো।

তোর অ্যাডভাইজার কে? কোন স্যার?

অধ্যাপক জালাল।

মারিয়া ভেবে নিয়ে বললো, শুনেছি তিনি একটু কনজারভেটিভ।

পরমা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, সিনিয়রদের মধ্যে কে কনজারভেটিভ না বল দেখি? তারা নতুন কিছু পড়েন না। পুরনো যেসব বই পড়েছেন তাই নিয়ে ভেঙে খাচ্ছেন। পোস্ট মডার্নিজম, পোস্ট কলোনিয়ালিজম, এসব সম্বন্ধে তেমন কিছু জানেন না। এরপর কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, দেখা যাক ভাগ্যে কী আছে?

মারিয়া বললো, তুই থিসিসের সাবজেক্ট ঠিক করেছিস?

মোটামুটি। তবে একটা না। দু'তিনটে বিষয়ের নাম দেবো। দেখি কী বলেন।

কী কী নাম? মারিয়া জানতে আগ্রহ দেখায়।

পরমা হেসে বলে, এখন বলা যাবে না। টপ সিক্রেট। পরে জানাবো।

শুনে মারিয়া মনঃক্ষুণ্ন হলো। তাকে মুখ ভার করে থাকতে দেখে পরমা হেসে বললো, বলবো। চল ক্যান্টিনে কফি খাওয়া যাক। খেতে খেতে নামগুলো বলবো। তোর মতামত শোনা যাবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মারিয়া বললো, আমার মতামত নিতে যাবি কেন? তুই আমার চেয়ে ব্রিলিয়ান্ট। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে যাচ্ছিস। তোর সঙ্গে আমার তুলনা হয়? কী যে বলিস!

কে বললো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে যাচ্ছি? পরমার স্বরে কৌতুক।

তুই ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। তুই পাবি না তো কে পাবে?

পরমা বললো, অত নিশ্চিত হওয়া যায় না।

তারা দু'জন যখন ক্যান্টিনে ঢুকলো ভেতরে মাত্র কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী বসে ছিল। তখনও ক্লাস চলছে। একটু পর ঘণ্টা বাজতেই ক্যান্টিন আর খালি থাকলো না। সব চেয়ার-টেবিল দখল হয়ে গেল দ্রুত। হৈচৈ, উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ঘরটা গমগম করে উঠলো। গরম যেন বেড়ে গেল হঠাৎ।

সাঈদ তার এক বন্ধুকে নিয়ে কোনার দিকে যাচ্ছিলো, সেখানে পৌঁছানোর আগেই টেবিলটা দখল হয়ে গেল। তারা দু'জন পরমাদের টেবিলের কাছে এসে বললো, গোপন কোনো কথা হচ্ছে না তো? তাহলে বসতে পারি।

বসো, বসো। ক্যান্টিনে কোনো গোপন কথা হয় নাকি? এ তো বাজার। ফিসফিস করে বললেও শোনা যাবে। কিন্তু অন্যরা ঠিকই শুনবে। কেউ কালা না।

সাঈদ তার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। নাম রকিব। একই ক্লাসে পড়ে তারা। তাকে আগে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়লো না পরমার।

সাঈদ মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, সেদিন সিট ডাউন স্ট্রাইক শেষ হওয়ার পর পরমাকে পৌঁছে দিতে ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তার বাবা আর মায়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। চমৎকার মানুষ। পরমার বাবা অধ্যাপক ছিলেন।

পরমা কপট রাগের ভঙ্গিতে বললো, বাবা যে তোমাকে নানা প্রশ্ন করে জেরা করেছেন তা বলছো না কেন?

সাঈদ কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, সে আর নতুন কী? বাড়িতে বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকলে সব বাবা-মা-ই ছেলে বন্ধুদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেন। তাকে জেরা বলা যায় না। কৌতূহল মেটানো।

পরমা বললো, তুমি একটা ফ্রড।

তার মানে! ফ্রড হতে যাবো কেন? সাঈদের চোখে প্রশ্ন।

এই জন্য যে, চমৎকারভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারো। তুমি যে বাবার সব প্রশ্ন শুনে খুব অস্বস্তিতে ছিলে তা তোমাকে দেখেই বুঝেছি। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ না।

থাক সে কথা। সত্যি বলছি, তোমার বাবা-মাকে আমার ভালো লেগেছে। খুব আন্তরিক মনে হয়েছে। তোমাকে যে খুব ভালোবাসেন তাও বুঝতে পেরেছি।

পরমা বললো, আমরা কফির অর্ডার দিয়েছি। তোমরা অর্ডার দাও।

সাঈদ হেসে বললো, কফির দামও আমাদের দিতে হবে নাকি? তোমাদের টেবিলে অতিথি হয়ে বসলাম।

অতিথি না ছাই। উড়ে এসে জুড়ে বসেছো।

সাঈদ মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, সেই সিটডাউন স্ট্রাইকের দিন থেকে দেখছি এই মেয়েটা মোটেও পাত্তা দিতে চায় না।

পরমা গম্ভীর হয়ে বললো, 'এই মেয়েটা' বলছো কেন? আমার একটা নাম আছে।

ও আছে নাকি? থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ জানাবার জন্য।

পরমা চোখ পাকিয়ে বললো, বাজে কথা বলে মেজাজ খারাপ করো না। নিজেকে খুব স্মার্ট মনে করো, তাই না?

মনে করবো কেন? স্মার্টই তো। তাই না মারিয়া? মারিয়ার উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বললো, যে কোনো মেয়ে তাই বলবে, যাদের কিং সাইজ ইগো আছে তারা ছাড়া।

শাটআপ। কফি দিয়েছে খাও। ফটফট করো না। পরমা প্রায় চেঁচিয়ে বলে।

সাঈদ টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললো, শুধু কফি? সমুচা, সিঙ্গাড়া কিছু হবে না? বি জেনারাস।

পরমা মুখ ভেংচে বললো, পয়সা থাকলে কিনে খাও। আমার কাছে কফির পয়সাই আছে।

সাঈদ রাকিবের দিকে তাকিয়ে বললো, এই মেয়েটার সঙ্গে আগে কেন পরিচয় হলো না? লাইফ খুব ইন্টারেস্টিং হতে পারতো।

পরমা হাতে চামচ তুলে খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, আবার এই মেয়েটা? বলেছি না, তার একটা নাম আছে।

সাঈদ হাতজোড় করে কপট ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললে, সরি, সরি। আই ওয়াজ জাস্ট পুলিং ইওর লেগ।

পরমা বিতৃষ্ণার সঙ্গে বললো, তা বুঝতে পেরেছি। বাট ইউ আর পুলিং দ্য রং লেগ।

তার কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। পরমাও হেসে ফেললো। তার কপট রাগ উধাও।

সাঈদ কফির কাপ টেবিল থেকে কাছে টেনে নিয়ে বললো, তোমার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হওয়া উচিত ছিল।

তাহলে কী হতো? পরমা আবার ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

তাহলে এ ধরনের খুনসুটি দিয়ে কথা বলা, যাকে ইংরেজিতে বলে ব্যান্টারিং, বেশ জমতো।

পরমা সাঈদের বন্ধু রাকিবের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার, মানে আপনার বন্ধু বুঝি এভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলতেই ভালোবাসে? আপনাদের সঙ্গেও তাই করে?

আপনি থাক। তুমিই বলো। সাঈদের বন্ধু যখন হয়েছো তখন আমারও বন্ধু। মাত্র এক বছরের তো তফাৎ। সিট ডাউন স্ট্রাইক সেটাও দূর করে দিয়েছে। হ্যাঁ, যা জিজ্ঞেস

করলে তার উত্তর হলো, সাঈদ সবার সঙ্গেই অমন করে কথা বলে মজা পায়। কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য কিছু বলে না। রাকিব নীরবতা ভেঙে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে।

পরমা হেসে বললো, আমি অত ঠুনকো না। কেউ আঘাত দিতে চাইলেই মচকাই না। ভেঙে পড়া তো দূরের কথা।

রাকিব বললো, তোমার সঙ্গে একটু পরিচয়েই বুঝেছি বেশ স্ট্রং পার্সোনালিটি। নেতা হওয়ার মতো। বলে সে হাসলো।

নেতা হওয়ার মতো! এটা কি নিন্দাসূচক হলো, না প্রশংসা করে বলা? পরমার চোখে কৌতুক। রাকিব ছেলেটাকে তার ভালোই লাগছে। বেশ উইটি কিন্তু সাঈদের মতো লাউড না।

রাকিব বললো, অবশ্যই প্রশংসা করে বলা। নেতা হলেই নিন্দা শুনতে হয় না। দেয়ার আর নেতাজ অ্যান্ড নেতাজ।

পরমা কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললো, হু। তারপর চারদিক তাকিয়ে বললো, এবারে ওঠা যাক। অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে আমরা কখন উঠবো। এক সময় হয়তো এসে বলবে, এই যে, আপনারা দয়া করে উঠুন।

সাঈদ ওয়ালেট থেকে টাকা বার করতে করতে বললো, তুমি আবার কবে গ্রামে যাচ্ছো? আমাকে সঙ্গে নিতে পারবে? তোমার মুখ থেকে তোমাদের গ্রামের কথা শুনে দেখার ইচ্ছা হচ্ছে।

পরমা একটু ভাবলো, তারপর বললো, সেপ্টেম্বরে আমাকে কানাডা যেতে হবে। তার আগে গ্রামে যাবো বাবার সঙ্গে। হ্যাঁ, তখন তুমি যেতে পারো।

সাঈদ একটু অবাক হয়ে বললো, কানাডা যাচ্ছো– এটা আগেও তোমার মুখ থেকে শুনেছি। কিন্তু সেখানে যাচ্ছো কেন? পড়ার কথা বলছিলে। পিএইচডি করবে। এর জন্য কানাডা যাবে?

পরমা বললো, হ্যাঁ, আমার অ্যাডমিশন হয়ে গিয়েছে।

কোথায়?

আলবার্টায়। ইউনিভার্সিটি অব আলবার্টা। এডমন্টনে।

সেখানে কেন?

সেখানে আমার ভাই, ভাবি, তাদের ছোট মেয়ে থাকে। একসঙ্গে থাকা যাবে। হোমসিক ফিল করবো না।

সাঈদ বললো, ইউনিভার্সিটি অব বাফেলোতে আমার অ্যাডমিশন হয়েছে। বাফেলো শহরটা কানাডার বর্ডারে। পার হলেই নায়াগ্রা ফল্‌স। সেখান থেকে তোমার ওখানে যাওয়া যাবে। আমার লেগ পুলিং চলতে থাকবে। কানাডা গিয়েও রেহাই পাবে না তুমি। বলে সে হাসে।

পরমা হেসে বললো, সে দেখা যাবে। তারপর বললো, তুমি কি চা-কফির দাম দিয়ে দিচ্ছো? টাকা বার করলে যে?

তাই তো মনে হচ্ছে। তুমি না হয় আরেক দিন বিল পরিশোধ করো। আজ তোমাকে বেশ বিরক্ত করেছি, তার মাশুল দিচ্ছি মনে করো।

পরমা বললো, আমি অত সহজে বিরক্ত হই না।

পাঁচ

অধ্যাপক জালাল হাতের কাগজটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। সেখানে কয়েকটা প্যারাগ্রাফ টাইপ করা। পরমা তার দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে।

অধ্যাপক জালাল বললেন, এক নম্বরে রয়েছে টমাস হার্ডির লেখায় ওয়েসেক্স অঞ্চলের প্রতিফলন এবং তার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন।

হু। তুমি কি তার সব বই পড়েছো? জালাল না তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

জি।

তার লেখা তোমাকে আকৃষ্ট করলো কেন?

ইংল্যান্ডের গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বই পড়ে। প্যাস্টোরাল বিউটি ফুটে উঠেছে তার লেখায়।

তাঁর কিছু লেখায় সামন্ত প্রথার যে সমালোচনা তা সত্ত্বেও কি প্যাসটোরাল বিউটি প্রধান হতে পেরেছে? অধ্যাপক জালাল এবার পরমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ। আমার তো তাই মনে হয়, পরমা বলে।

গ্রাম, প্যাসটোরাল বিউটি, এসব তোমাকে আকর্ষণ করে মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন? হোয়াই?

বিকজ অব দেয়ার প্রিসটিন বিউটি। এক ধরনের অকৃত্রিম সরলতা রয়েছে সেখানে। মানে এক সময় ছিল, যখন হার্ডি লিখেছেন।

তাহলে এক ধরনের নস্টালজিয়া থেকে আকর্ষণ অনুভব করছো তুমি। তাই মনে হয় না?

পরমা কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, ম্যা বি। হয়তো তাই। সেটা অস্বাভাবিক কিছু?

না। তবে বিষয়টা ঐতিহাসিক হয়ে যাবে। ফার ফ্রম টুডেজ রিয়েলিটি।

ঐতিহাসিক বিষয় নিয়েও তো থিসিস লেখা যায়। যায় না স্যার?

অধ্যাপক জালাল পরমার দিকে তাকালেন। 'স্যার' সম্বোধনে নড়ে চড়ে বসলেন। সম্পর্কটা সম্বন্ধে সচেতন হলেন যেন। তারপর আক্ষেপের স্বরে বললেন, সমস্যা কী জানো? টমাস হার্ডিকে নিয়ে অনেক থিসিস লেখা হয়েছে। অনেকে গবেষণা করেছে। তুমি নতুন কী লিখবে?

আমাদের দেশেও? পরমা তাকায় অধ্যাপক জালালের দিকে।

আমাদের দেশে হয়তো হয়নি। কিন্তু যত লেখা হয়েছে তারপর নতুন করে লেখার কিছু নেই।

পরমা মরিয়া হয়ে বললো, আমি নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি আনতে পারি।

হয়তো পারো। বাট দ্যাট উইল বি ডিফিকাল্ট! বেশ রিস্কি হয়ে যাবে। তোমার হাতে অত সময় নেই। সেপ্টেম্বরে কানাডা যাচ্ছো উচ্চশিক্ষার জন্য। তার আগে এই থিসিস লেখা না হলে এখানকার এমএ ডিগ্রিটা ঝুলে থাকবে। হোয়াই টেক দ্যাট রিস্ক! তার চেয়ে ম্যানেজেবল কিছু বেছে নাও।

পরমা বললো, অন্য প্রস্তাবও দেওয়া আছে কাগজে। পড়ে দেখুন।

অধ্যাপক জালাল কিছুক্ষণ পড়ে একটু থামলেন। তারপর বললেন, তোমার দেখি ভৌগোলিক এলাকার প্রভাব নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহল। প্রায় ফিক্সেসনের মতো হয়ে গিয়েছে। টমাস হার্ডির পর প্রস্তাব দিয়েছো উইলিয়াম ফকনারের লেখায় দক্ষিণের ইয়োকনোফাটায়া অঞ্চলের প্রভাবের ওপর লেখার জন্য।

পরমা বললো, ফকনার এই বিষয়ের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

হ্যাঁ। তা পেয়েছিলেন। নোবেল পুরস্কার দেওয়ার সময় এর উল্লেখ করা হয়েছিল।

তা হলে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সন্দেহাতীত, তাই মনে

হচ্ছে না স্যার?

অবশ্যই। কিন্তু এখানেও একই সমস্যা। ফকনারের ওপর অনেক লেখা হয়েছে। হার্ডির চেয়েও বেশি। গুগলে সার্চ করলেই দেখতে পাবে।

আমি সার্চ করেছি। রিভিউ অব লিটারেচারে সে সবের উল্লেখ আছে।

কাগজটা পড়তে পড়তে অধ্যাপক জালাল বললেন, হ্যাঁ। তাই দেখছি। বেশ হোমওয়ার্ক করেছো। কিন্তু এখানেও আমার একই প্রশ্ন। যাকে নিয়ে এতো লেখা হয়েছে তাঁর ওপর নতুন কী লিখবে তুমি? লেখার স্কোপ কোথায়? ঘুরেফিরে পুরনো কথাই এসে যাবে। তোমার মৌলিকত্ব থাকবে না।

আপনি আমাকে প্রি-জাজ করছেন স্যার। আহত স্বরে বললো পরমা।

অধ্যাপক জালাল ব্যগ্র হয়ে বললেন, না না। তা কেন? ইউ আর এ ব্রাইট স্টুডেন্ট। আমাদের প্রাইড। তোমাকে আন্ডার এস্টিমেট করতে যাবো কেন? দ্যাট ইজ ফারদেস্ট ফ্রম মাই মাইন্ড। আমি শুধু ফকনারকে লেখার ঝুঁকির কথা ভাবছিলাম।

ন্য হয় ঝুঁকি নিলাম। নো পেইন, নো গেইন। তাই না স্যার?

কিন্তু তোমার হাতে যে সময় নেই। তোমাকে এমন বিষয়ে থিসিস লিখতে হবে, যা এক চেষ্টাতেই উতরে যেতে পারো। নো কারেকশন। নো রিভিশন। তেমন যদি তোমাকে করতে বলা হয় তা হলে তা হবে আমার জন্য খুব পেইনফুল। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। নট টু হার্ট ইউ। তুমি বুঝতে পেরেছো?

পরমা বললো, থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর কাইন্ডনেস।

অধ্যাপক জালাল পরমার দিকে তাকালেন। মেয়েটার কথায় কি শ্লেষ মেশানো? না। তা মনে হচ্ছে না। আন্তরিক হয়েই বলেছে কথাটা সে।

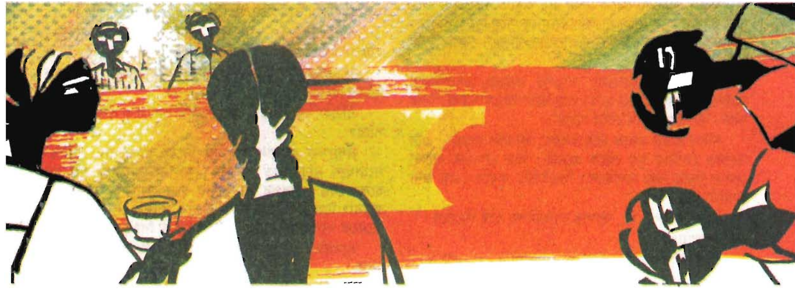
পরমা বললো, তাহলে আমার তৃতীয় প্রস্তাবটা দেখুন। কী মনে হয় স্যার? চলবে?

অধ্যাপক জালাল জোরে জোরে শিরোনামটা পড়লেন : সৈয়দ শামসুল হকের লেখায় জলেশ্বরী। শিরোনামের পর তিনি বাকিটা পড়তে থাকলেন। তাকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছে। আস্তে আস্তে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে এলো। তিনি হাসিমুখে পরমার দিকে তাকালেন। বললেন, হবে। সৈয়দ হকের লেখায় জলেশ্বরী নামের কল্পিত এলাকায় প্রভাব নিয়ে কেউ লিখেছে বলে মনে হয় না। অন্তত থিসিস লেখা হয়নি। তুমি নিশ্চিত হবার জন্য সৈয়দ হককে জিজ্ঞাসা করতে পারো। হ্যাঁ, এটা লেখার মতো বিষয়। জলেশ্বরী আমাদের অপসৃয়মাণ গ্রামীণ সভ্যতার একটা সিম্বল। আমি তাঁর কিছু লেখা পড়েছি। কোনো একটা লেখায় সার্বিকভাবে জলেশ্বরী আসেনি। খণ্ডে খণ্ডে এসেছে। তুমি সব মিলিয়ে লিখবে। তাহলে জলেশ্বরী ফুটে উঠবে একটা অখণ্ড জনপদ হিসেবে।

পরমা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, আপনার পছন্দ হয়েছে স্যার?

হ্যাঁ। না হলে বলছি কেন? তুমি বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লিখতে পারবে। প্রয়োজন হলে সৈয়দ হকের ইন্টারভিউ নেবে। তাঁর সঙ্গে কুড়িগ্রাম যাবে। নিজ চোখে সব দেখবে। তারপর একটু থেমে বললেন, তোমার কি গ্রাম সম্বন্ধে ধারণা আছে? মানে ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স?

আছে স্যার। বাবার সঙ্গে সেই ছোটবেলা থেকে বহুবার রংপুরের মিঠাপুকুর বলে আমাদের গ্রামে গিয়েছি।



সেখানকার মানুষের যাপিত জীবন দেখেছি। তাদের সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট সব আমার জানা।

তাই বলো। এখন বুঝতে পারছি গ্রামীণ অঞ্চলকে পটভূমি করে তুমি কেন থিসিস লিখতে চাও। এ বিষয়ে তোমার আগ্রহ বেশ পুরনো। চমৎকার। শুরু করে দাও কাজ।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বাবাকে বলতেই তিনি অবাক হয়ে বললেন, গ্রামের বিষয় নিয়ে লিখতে চাস তা তো আমাকে কখনও বলিসনি!

গ্রামের বিষয়ে আমার যে গভীর আগ্রহ তা কি তুমি টের পাওনি বাবা?

পেয়েছি। সেই আগ্রহ আর থিসিস লেখা তো আলাদা কথা। তারপর একটু থেমে বললেন, আমাদের গ্রাম নিয়ে লিখলেই পারিস।

শুনে পরমা হাসলো। বললো, বাবা তুমি মাঝে মাঝে বেশ বোকার মতো কথা বলো। আমাদের গ্রাম নিয়ে কেউ তো বই লেখেনি। আমি থিসিস লিখবো কার ওপর? হ্যাঁ, গ্রাম নিয়ে লেখা যায়, কিন্তু সেটা হবে সমাজবিজ্ঞানের, নৃ-তত্ত্বের বিষয়। আমি সাহিত্যের ছাত্রী। গ্রামের সাহিত্য নিয়েই তো আমাকে লিখতে হবে।

নজমুল হক মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তিনি মেয়ের কথা

বুঝতে পেরেছেন। তারপর বললেন, আমাদের গ্রাম নিয়ে কি সাহিত্য রচনা হতে পারে না? কেউ লিখতে এগিয়ে আসবে না? এত বড় গ্রাম, এত মানুষ। এত পুরনো ইতিহাস। সবই এপিক মাপের।

পরমা বাবার কাছে গিয়ে তার হাত ধরলো। হাসিমুখে বললো, লিখবে। অন্তত একজনকে আমি জানি সে লিখবে। সেই লেখার প্রস্তুতি চলছে তার ভেতরে। তাকে একটু সময় দাও। তার কথায় গভীর আত্মবিশ্বাস।

নজমুল হক গভীর দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি কী বোকা দেখ। বুঝতেই পারিনি। পরমা বাবার বুকে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে বললো, তুমি বোকা নও। কিন্তু আমার সামনে এসে বোকা হয়ে যাও। এই জন্যেই তোমাকে আমার এত ভালো লাগে।

নজমুল হক পরমার মাথায় হাত রেখে আবেগ মেশানো গলায় বললেন, তুই দীর্ঘজীবী হ মা।

পরমা হেসে বললো, সে তো হতেই হবে। এত বড় একটা উপন্যাস লিখতে গেলে দীর্ঘজীবী হওয়া ছাড়া উপায় কী? তার স্বরে কৌতুক। সে আদুরে মেয়ের মতো বাবার হাত ধরে রাখলো। তিনি তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলালেন।

ছয়

থিসিস লেখা হয়ে গেল জুন মাসের মধ্যে। পরমাকে কানাডায় গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হবে সেপ্টেম্বরে। হাতে কেনাকাটা আর প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ক'টা মাস। প্রথমেই বঙ্গবাজারে গিয়ে স্যুটকেস ভর্তি করে গরম কাপড় কিনলো সে। নজমুল হক দেখে বললেন, মা এখান থেকে কিনছিস কেন? কানাডায় গিয়ে কিনবি না? লেটেস্ট ফ্যাশনের কাপড়-চোপড়?

পরমা হেসে বললো, কানাডা ও আমেরিকার দোকানে যেসব কাপড় বিক্রি হয়, তার অধিকাংশই 'মেড ইন বাংলাদেশ'। এভাবে কিনে অনেক বাঙালি বোকা বনেছে। আর লেটেস্ট ফ্যাশনের কথা বলছো? ক্যালভিন ক্লাইন থেকে ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটস সব ব্র্যান্ডের কাপড় বাংলাদেশে তৈরি হয়ে বিদেশের বাজারে যায়। সামান্য ডিফেক্ট থাকলে চলে আসে বঙ্গবাজারে। আমি ছাত্রী। আমার গায়ে সামান্য ডিফেক্টঅলা পোশাক দেখলে কে নাক সিঁটকাবে? বিদেশে পোশাকের ব্যাপারে এখন সবাই বেশ ক্যাজুয়াল। টিভি প্রোগ্রামে দেখো না? স্যুট-টাই পরা ক'জন অভিনেতা থাকে? আর গাউন বা স্কার্ট-ব্লাউজ পরা মেয়ে? ভাইয়া আমাকে সব বলেছে। কী কী কিনতে হবে, তার লিস্টও করে দিয়েছে। আমি যা করছি ঠিকই করছি। তুমি মাথা ঘামিও না। তাছাড়া টাকা-পয়সার একটা ব্যাপার আছে না?

কী ব্যাপার? নজমুল হক মেয়ের দিকে তাকান।

বারে, বিদেশে কিনলে ফরেন এক্সচেঞ্জ খরচ করতে হবে। এখানে টাকা দিয়ে কিনছি। আর দামেও সস্তা।

সায়েরা বেগম এতক্ষণ বঙ্গবাজারের ভেতর ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে উঠছিলেন। চারদিকে ধুলো উড়ছে। পচা-বাসি গন্ধ বের হচ্ছে মেঝের মাটি থেকে। হৈচৈয়ে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। তিনি স্বামীকে ব্যস্ত হয়ে বললেন, ও কিনুক যা যা কিনতে চায়। ওকে নিষেধ করো না।

নজমুল হক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললেন, আমি ভাবছিলাম এত ভারী স্যুটকেস নিয়ে যাবে। ওর কষ্ট হবে।

সায়েরা বেগম বললেন, পোর্টার স্যুটকেস প্লেনে তুলে দেবে। ওকে মালামাল নিজে বয়ে নিতে হবে না। কী যে বলো মাথামুণ্ডু নেই। বোঝা গেল তিনি বাজারের ভিড়ে, কোলাহলে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। পরমা তাড়াতাড়ি কেনাকাটা শেষ করুক এটা চাইছেন।

বাড়িতে এসে দুটো স্যুটকেসে কাপড় গুছিয়ে রাখলো পরমা। কেডসের দু'জোড়া জুতোও থাকলো। পুরনো বেশ কিছু কাপড়। শাড়ি নিলো কম, ট্রাউজার, টপস, সালোয়ার-কামিজ, উলের চাদর, কার্ডিগান। উইন্ড চিটার দুটো বেশ জায়গা নিয়ে নিলো। ঠেসে ভরতে ভরতে পরমা বললো, কানাডা খুব ঠাণ্ডা দেশ। ওখানে সারা বছরই গরম কাপড়ে থাকতে হবে। ভাইয়া বারবার সাবধান করে দিয়েছে। এই জন্য এত গরম কাপড় নিচ্ছি। সায়েরা বেগম বললেন, আমরা সামারে যখন গিয়েছি, সে সময় কিন্তু তত ঠাণ্ডা ছিল না।

পরমা স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করে চেইন টানতে টানতে বললো, ওখানে সামার খুব অল্প সময়ের। আমরা যখন বেড়াতে গিয়েছি ঠাণ্ডা টের পাইনি। সেপ্টেম্বরে দাঁত কাঁপানো শীত। তোমরা দু'জনও গরম কাপড় নিয়ে নাও। ক'দিনের জন্য ওখানে দোকান থেকে নতুন গরম কাপড় যেন কিনতে না হয়।

সায়েরা বেগম বললেন, থাকবো তো মাত্র এক মাস। তোকে সেটেল করে দিয়েই চলে আসবো দু'জন। এর মধ্যে কত আর গরম কাপড় লাগবে? আমাদের নিয়ে ভাবতে হবে না। আর তেমন দরকার পড়লে বউমার কাছ থেকে দু-একটা গরম কাপড় ধার নেওয়া যাবে না? ওর হাইট আমার সমান। বেশ মানিয়ে যাবে।

পরমা হেসে বললো, আর না মানালেই বা কী? কে কী বলতে যাচ্ছে? বললাম না, ওসব দেশে এখন ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইকের মতো ব্যাপার চলছে। এনিথিং গোজ। হা হা ...।

জুনের শেষে রংপুরে তাদের গ্রাম মিঠাপুকুরে গেল সবাই। নজমুল হক, সায়েরা বেগম, পরমা, আমেনা, তার ছোট ছেলে। সাঈদও এলো সঙ্গে। তার কথা পরমা বাবাকে আগেই বলে রেখেছিল। শুনে তিনি বলেছিলেন, বেশ তো, যাবে আমাদের সঙ্গে। গেস্ট হাউস তো খালিই পড়ে থাকে।

গ্রামে যাওয়ার জন্য মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিল তারা। প্রায় নতুন। এসিটা চমৎকার কাজ করে। একটুও গরম লাগলো না যদিও বাইরে প্রচণ্ড রোদ। রাস্তায় বগুড়ায় কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতি করলো তারা। নতুন হোটেল হয়েছে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাথরুম-টয়লেট শেষ করে ফ্রেশ হয়ে তারা ডাইনিং হলে এসে খাবারের অর্ডার দিলো। মাছ-ভাত সবজি, ডাল। সব শেষে পাকা পেঁপে।

তারা যখন মিঠাপুকুরে এসে পৌছালো তখন সূর্য পশ্চিম দিগন্ত ছুঁয়েছে। রোদের রঙ ফিকে হলুদ। বাতাস বয়ে যাচ্ছে মাঠের ওপর দিয়ে। তালগাছগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে, নিচে তাদের দীর্ঘ ছায়া। পাখিরা উড়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। নানা রকমের ডাক শোনা যাচ্ছে। গরু নিয়ে মাঠ থেকে ফিরছে রাখাল। ক্ষেতমজুররা গামছা দিয়ে শরীরের ঘাম মুছছে ক্লান্ত হাতে।

টিনের চৌচালা বড় ঘরটার পাশেই পাকা রাস্তা। সেখানে বাস থামলো। কামাল দাঁড়িয়েছিল বাড়ির গেটে। সে কয়েকজন কামিন, ক্ষেতমজুর নিয়ে এগিয়ে এলো। পা ধরে নজমুল হককে সালাম করার পর কামিনরা স্যুটকেস, ব্যাগ নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কামাল নজমুল হককে বললো, পথে কষ্ট হয়নি তো চাচা?

না। খুব আরামের সঙ্গে চলে এলাম। রাস্তা খুব মসৃণ। গাড়ি আগের মতো লাফায় না।

তিনি কথা বলছেন, ক্ষেতমজুররা একে একে এসে তার

পা ধরে সালাম করছে। তিনি দেখেও দেখছেন না, কাউকে উদ্দেশ করে কিছু বলছেন না।

সেই দৃশ্য দেখে পরমার মুখে প্রথমে লাল আভা এবং পরে ছায়া নামলো। সে হঠাৎ অস্থির বোধ করতে শুরু করলো। চুপ করে থাকতে না পেরে একসময় অধ্যাপক নজমুল হকের উদ্দেশে বললো, বাবা, ওরা তোমাকে সালাম দিচ্ছে। ওদের কিছু বলো।

কিছু বলবো? কী বলবো মা? তিনি কিছুটা অসহায় দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। যেন হকচকিয়ে গিয়েছেন। পরমা বললো, বলো থাক থাক। ভালো থাকো সবাই। দোয়া করি।

নজমুল হক যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। পা ধরে সালাম করতে থাকা মজুরদের উদ্দেশ করে বললেন– থাক, থাক তোমরা ভালো থাকো। এই দোয়া করি। এই কথা শুনে পরমার মুখে হাসির রেখা জেগে উঠলো। ক্ষেতমজুররা একটু পর যার যার বাড়ি চলে গেল। সাঈদ পরমাকে একা পেয়ে বললো, তুমি কী তোমার বাপকে এভাবে সব সময় মনে করিয়ে দাও কখন কী করতে হবে, কী বলতে হবে? পরমা অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, হ্যাঁ। প্রায়ই এমন করতে হয়। যত সময় হচ্ছে তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন। কখন কী করতে হবে বুঝতে পারেন না।

পুকুরের ঘাটলায় সিমেন্টের বেঞ্চে বসে কথা বললো সাঈদ আর পরমা কিছুক্ষণ। আজ গ্রাম দেখতে যাওয়া হবে না, রাত হয়ে গিয়েছে। বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে নাশতা করে বের হবে তারা। নজমুল হক সাঈদকে খেতে খেতে বললেন, ঘোড়ায় চড়তে পারো?

ঘোড়ায়? না। কেন জিজ্ঞেস করছেন চাচা? সাঈদ একটু অবাক হয়ে তাকালো।

তাহলে ঘোড়া আনানো যেত। ঘোড়ায় চড়ে তুমি আর কামাল গ্রাম ঘুরে আসতে। কামাল সব বুঝিয়ে বলতো তোমাকে যেতে যেতে। তাতে সময় বাঁচতো, কষ্টও কম হতো।

সাঈদ বললো, অসুবিধা নেই। হেঁটে হেঁটেই গ্রাম দেখবো, আমার হাঁটার অভ্যাস আছে। কষ্ট হবে না। আর সময়? আমাদের হাতে যথেষ্ট সময়। গ্রাম দেখা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। খাওয়ার পর সাঈদ পরমাকে বললো, তুমি ঘোড়ায় চড়েছো? গ্রামে এসে?

হ্যাঁ। যখন স্কুলে পড়তাম। সঙ্গে কামাল থাকতো।

কামাল? বলে সাঈদ তাকালো তার দিকে।

ঐ যে ছেলেটা। আমাদের কেয়ারটেকার। বাবার বন্ধুর ছেলে। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তখন একসঙ্গে গ্রামের বনে-বাদাড়ে খুব ঘুরে বেড়িয়েছি। এই গ্রামের নাড়ি-নক্ষত্র আমার চেনা। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, সব কিছু কেমন পিওর তাই না? বাতাসে একটুও পলুশন নেই। বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়া যায়। সব ধরনের খাওয়াই ভেজালহীন। তারপর সাঈদের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি কী দুধ খাও?

একটু হকচকিয়ে গেল সাঈদ। তারপর সামাল দিয়ে বললো, কেন? হঠাৎ দুধের কথা কেন?

আমাদের দুধের গরু আছে। গ্রামে এলেই খুব দুধ খাই। দুধ দিয়ে নানা রকমের নাশতা তৈরি হয়। তোমাকেও সেই নাশতা দেওয়া হবে। না করো না। সবটা খাবে। না হলে বাবা ভাববেন তুমি গ্রামের খাবার বলে নাক সিঁটকাচ্ছ। পরমা বললো।

বেশ তো দুধ খাবো। এ আর এমন কী কঠিন কাজ? তারপর বললো, তোমাকে ক্ষেতমজুরদের দিকে তাকাতে দেখে মনে হলো, তাদের জন্য তোমার খুব ফিলিংস রয়েছে। প্রায় সমবেদনার মতো।

পরমা পুকুরে একটা মাছের খাদ্য দেওয়া দেখতে দেখতে বললো, হ্যাঁ। আই ফিল এ লট ফর দেম। ওরা এত গরিব। ওদের জন্য একটা কিছু করতে হবে।

কী করবে? সাঈদ অন্ধকারের ভেতর পরমার মুখ দেখার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলো। কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। সেই আলোর আভায় পরমার প্রোফাইল দেখা গেল।

সে কথাই ভাবছি। অনেকদিন থেকেই ভাবছি। পরমা বললো।

সাঈদ বললো, গ্রাম নিয়ে তোমার যে একটা স্বপ্নের কথা বলেছিলে ঢাকায় তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই একটা কিছু করার? যা তুমি ভাবছো?

অন্যমনস্কের মতো পরমা বললো, মনে হয় আছে। ঠিক কোন ধরনের সম্পর্ক তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু দুটোর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।

পরমা আর সাঈদ খাবার পর পুকুরঘাটে বসে কথা বলছিল। কামাল হারিকেন নিয়ে পুকুরের ঘাটলার কাছে এসে বললো, অন্ধকার হয়ে গেছে। এমন সময় সাপ বাইরে বের হয়। চাচা ঘরে যেতে বলছেন। ঘাটলার বেঞ্চ থেকে দু'জন উঠে দাঁড়ালো। কামাল হারিকেনের আলো দেখিয়ে সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। গেস্ট হাউসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকে সাঈদকে বললো, আপনার জিনিসপত্র এই ঘরে। ভেতরে বাতি জ্বলছে। বাইরে বারান্দায় একজন ক্ষেতমজুর থাকবে। সেখানেও বাল্ব জ্বলবে সারারাত। ঘরের বাতি নেভালেও বাইরের সব কিছু দেখা যাবে। সাঈদ বললো, কেন ক্ষেতমজুর থাকবে কেন?

আপনার যদি কিছুর দরকার হয় তাকে বলবেন। তাছাড়া পাহারাও দেবে সে। কামাল বললো।

সাঈদ মাথা নেড়ে বললো, না। আমার কিছুর দরকার হবে না। পাহারা দেবারই বা কী দরকার? সোনাদানা নিয়ে আসিনি। ব্যাগে শুধুই কাপড় কয়েকটা।

পরমা বললো, আমাদের ঘরে টেলিভিশন আছে। দেখতে চাইলে আসতে পারো?

সাঈদ হেসে বললো, শহরের ঐ বদ অভ্যাসটা এখানে এসে না হয় ভুলে থাকলাম।

পরমা হেসে বললো, আই অ্যাম বিগিনিং টু লাইক ইউ।

সাঈদ বললো, এতদিনে?

সাত

পরদিন সকালে নাশতা খেয়ে বের হলো তিনজন। গ্রাম দেখতে গেল সাঈদ, তাকে সঙ্গে নিয়ে গেল কামাল। আমেনাকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষেতমজুরদের বসতবাড়ির উদ্দেশে বের হলো পরমা। তারা সঙ্গে নিলো দুটো বড় ব্যাগ। সেই ব্যাগে দুধের টিন, কার্টনে নানা ধরনের ওষুধ। ক্ষেতমজুরদের কুঁড়েঘরে ঢুকলো পরমা এক এক করে। ঘরগুলো সবই লাগোয়া। নজমুল হকের দেওয়া জমির ওপর তৈরি। কোনো পাকা পায়খানা নেই, টিউবওয়েলের পানি পায় না কেউ। পুকুরের পানি থেকেই সব কাজ চলে। পরমা তার বাবাকে টিউবওয়েল বসাতে বলেছে কয়েকবার। তিনি বসাবেন বললেও এখন পর্যন্ত হয়নি। এ যে তার আপত্তির কারণে না, আলেসেমির জন্য তা পরমা বোঝে। কিন্তু বুঝলেও বাবার ওপর অসন্তুষ্ট হয়। এই যে গুরুত্ব না দেওয়া, এর জন্য সে বেশ মনোক্ষুণ্ন হয়।

পরমার হাতে একটা লম্বা খাতা। সব ক্ষেতমজুর, তাদের বউ, ছেলেমেয়ের নাম লেখা সেখানে। এটা খুলে সে প্রতিটি

কুঁড়েঘরে গিয়ে ক্ষেতমজুরের বউয়ের নাম ধরে ডাকে, তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে আসতে বলে। ক্ষেতমজুররা এই সময় মাঠে কাজ করতে যায়, খুব অসুস্থ না হলে বাড়িতে কেউ থাকে না। সমস্ত পাড়ায় কেবল মেয়েলি কণ্ঠস্বর আর বাচ্চাদের হৈচৈ শোনা যায়।

পরমা ব্যাগের ভেতর থেকে দুধ ও ওষুধ বের করে ক্ষেতমজুরদের পরিবারের হাতে দেয় প্রয়োজন অনুযায়ী। তাদের অসুখ-বিসুখ আর অন্য কষ্টের কথা শোনে। গ্রামে এলে প্রতিবারই সে এমন করে। গরিব-অভাগা পরিবারের বউ-ছেলেমেয়ের মাঝখানে বসে থেকে সে একটা অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে চায়। যত সামান্যই হোক, তাদের উপকার করে অনেক তৃপ্তি পায়। এরা যে তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে তা সে জানে। আগের মতো আজকাল ঘন ঘন আসতে পারে না সে। পড়াশোনার চাপ আর পরীক্ষার জন্য ঢাকাতেই বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয় তাকে। প্রায় চার ঘণ্টা পর আমেনাকে নিয়ে সে যখন তাদের চৌচালা টিনের ঘরে ফিরলো, তার বাবা কাগজ খুলে মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন, মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। দিনের বেলাতেও বাতি জ্বলছে ঘরের ভেতর। ঘরে ইটের সাদা দেয়াল ফকফক করছে আলোয়। পরমাকে দেখে নজমুল হক কাগজ এক পাশে সরিয়ে বললেন, রোদে খুব ঘুরেছিস মনে হচ্ছে। মুখ কালো হয়ে গিয়েছে। শুকনো দেখাচ্ছে। হাত-মুখ ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে নে। তারপর ডাবের পানি খা। আমও রয়েছে কয়েক পদের। চোষা, আম্রপালি। আমাদের বাগানের। নিলামে দেওয়ার পরও অনেক রয়েছে। ঢাকা নিয়ে যাওয়া হবে। অনেক দিন খাওয়া যাবে।

পরমা বাবার সামনে বেতের চেয়ারে বসে অভিযোগের স্বরে বললো, তোমাকে এতবার বললাম, কয়েকটা টিউবওয়েল বসিয়ে দাও। এখনও দিলে না। পুকুরের ময়লা পানি খেয়ে ক্ষেতমজুরদের ছেলেমেয়েগুলো পেটের অসুখে–আমাশয়ে ভুগছে। বউগুলোরও নিশ্চয়ই পেট খারাপ। কিন্তু লজ্জায় কিছু বললো না। যদি কলেরা দেখা দেয়, তখন কী হবে?

নজমুল হক বিব্রত হয়ে বললেন, মনে থাকে না মা। বয়স হয়েছে। এবার টিউবওয়েল বসাতে বলে যাবো কামালকে। টাকা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, তুই অনেক দিন থেকেই বলছিস। আমার ভুলে থাকা উচিত হয়নি। ক'টা টিউবওয়েলই তো। কত আর লাগবে?

পরমা বললো, এদের জন্য আরও দুধের প্যাকেট আনা দরকার ছিল। ছোট ছেলেমেয়েগুলো অপুষ্টিতে ভুগছে। আমি তো চলে যাবো কানাডায়। তুমি এখানে আসার সময় গুঁড়ো দুধ আনতে ভুলো না। ওদের অনেক উপকার হবে তাতে। আনলে কি না আমি কানাডা থেকে সে খবর নেবো। তোমাকে মনে করিয়ে দেবো।

নজমুল হক তাড়াতাড়ি বললেন, আনবো মা, আনবো। মনে থাকবে। দুধের টিন ঢাকা থেকে আনার দরকার কী? রংপুর শহরেই দুধের টিন পাওয়া যাবে। কামালকে সঙ্গে নিয়ে কিনে আনবো গাড়িভর্তি করে। তুই যা শুরু করেছিস তা বন্ধ হয়ে যাবে না।

শুনে খুশি হলো পরমা। বললো, হ্যাঁ। তাই করো। তারপর একটু থেমে বললো, তুমি তো আমার সব কথার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাও। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে ভুলে যাও।

নজমুল হক বললেন, এবারে আর ভুল হবে না।

পরমা বললো, ওষুধও এনো। জানোই তো সাধারণত এদের কী কী অসুখ হয়ে থাকে। সর্দি-কাশি, জ্বর, পেটের অসুখ। তারপর বললো, আমাদের বাড়ির কাছে একটা ডিসপেনসারি-কাম-ক্লিনিক করলে কেমন হয়?

ডিসপেনসারি-কাম ক্লিনিক? অবাক হয়ে তাকান নজমুল হক মেয়ের দিকে।

হ্যাঁ। সপ্তাহে একজন ডাক্তার আসবেন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রোগী দেখবেন। প্রেসিক্রিপশন লিখে দেবেন। কামাল সেই অনুযায়ী ওষুধ কিনে এনে স্টক করবে ডিসপেনসারিতে।

নজমুল হক ইতস্তত করে বললেন, এ তো সরকারের কাজ।

পরমা বললো, আগের দিনে জমিদাররাও এই কাজ করতো। তুমি তো একজন জমিদারই।

জোতদার। নজমুল হক শুধরে দিলেন মেয়ের কথা।

ঐ হলো একই কথা। ওদের কাছে মা-বাবা বলতে তুমিই।

নজমুল হক বললেন, ডিসপেনসারি চালানো বেশ ঝামেলার ব্যাপার হবে।

ডাক্তার পাবো কোথায়? এই অজপাড়াগাঁয়ে ডাক্তার আসবে?

কিসসু ঝামেলা হবে না। কামাল দেখাশোনা করবে। ও ম্যানেজমেন্টে ভালো। দেখছো না তোমার জায়গা-জমি কেমন দেখেশুনে রাখছে। কোথাও ত্রুটি দেখতে পেয়েছো? ডিসপেনসারি চালানো ওর জন্য কিছু না। ও পারবে।

আর ডাক্তার? নজমুল হক মেয়ের দিকে তাকালেন।

ডাক্তার রংপুর শহর থেকে নিয়ে আসতে হবে। ছুটির দিনে আসবেন এখানে। খাবে আমাদের বাড়ি। মাসে একটা অ্যালাউন্স পাবে। ইয়াং ডাক্তার পেতে অসুবিধা হবে না।

নজমুল হক শুনে বললেন, তা চেষ্টা করা যায়। মানে ব্যবস্থা করা যায়। আসুক কামাল।

পরমা বললো, আমি কানাডা যাবার আগেই শুরু করে দাও। প্রথমে একটা ছোট চালাঘর তৈরি করলেই হবে। যেখানে ডাক্তারের বসার চেয়ার-টেবিল থাকবে। রোগীদের জন্য কয়েকটা বেঞ্চ।

ওষুধপত্র? নজমুল হক তাকালেন মেয়ের দিকে।

ওষুধপত্র থাকবে গেস্ট হাউসে দুটো আলমিরায়। ঘরটা খালিই পড়ে থাকে। দুটো আলমারির জন্য সে ঘরে কোনো গেস্টের থাকার অসুবিধা হবে না। ডাক্তার কাজের শেষে সেখানে রেস্ট নেবেন। ভবিষ্যতে ডিসপেনসারি-কাম ক্লিনিকের জন্য পাকা দালান তৈরি করা যেতে পারে।

নজমুল হক বললেন, হ্যাঁ। তা হতে পারে। বেশ তুই কানাডা যাবার আগেই এটা উদ্বোধন করে ফেলবো।

পরমা বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলো কিছুক্ষণ। না, তার মুখে রাগ কিংবা বিরক্তি নেই। তাকে প্রসন্ন দেখাচ্ছে। পরমকে খুশি করতে পারলে তিনি এমন ভাবই দেখান। সুযোগ বুঝে পরমা বললো, আর একটা বিষয় আজও তোমাকে বলিনি। এখন না বলে পারছি না।

কী। বল। শুনি। নজমুল হক সাহেব উৎসুক হয়ে মেয়ের দিক তাকালেন। তিনি আজ বেশ ভালো মুডে আছেন।

কানাডা যাবার আগে তোমাকে সব কথা বলে যেতে হবে। ছুটিতে কবে আসি ঠিক নেই। অবশ্য ফোনে কথা হবে প্রায়ই। কিন্তু ফোনে কথা আর সামনাসামনি কথা বলা কি এক? পরমা অনেকক্ষণ কথা বলে বাবার দিকে তাকায়।

বল না শুনি। কী বলতে চাস। নজমুল হক সাহেবের মুখে তখনও হাসি। ❖

[প্রথম পর্ব সমাপ্ত]

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

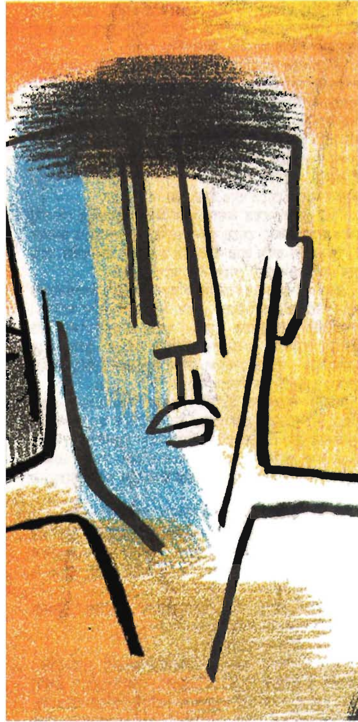
মোহর



গল্প

পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন হারুন সাহেব। এই একটা কাজে তার ভারি আনন্দ, কিন্তু থাকেন ঢাকার শ্যামলীতে, সেখানে পুকুর কোথায় যে মাছ মারবেন? হ্যাঁ, ছুটির দিন ধানমণ্ডি লেকে মাছ মারতে যেতে পারেন; কিন্তু মাছ মারার আনন্দ যখন বন্ধু জুয়েলকে হারানোর বিষাদে তলিয়ে যায়, তখন ভেতরের অসুখটাই তো বড় হয়ে ওঠে।

বন্ধু জুয়েল ছিল, যাকে বলে অন্ধ মাছ শিকারি। এই এক কাজে তার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেয়ে যেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধানমণ্ডি লেকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির উল্টো দিকে, না হয় এখন যেখানে রবীন্দ্রসরোবর মঞ্চ তার পাশে ছিপ ফেলে বসে থাকত। ধানমণ্ডিতেই থাকত সে, চাকরি করত ফিলিপস কোম্পানিতে। যেদিন মাছ মারত না, সেদিনও লেকের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ছিপ ফেলা মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়ে মাছ মারা দেখত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।



অলঙ্করণ : : নাজিব তারেক

হারুন ভাবেন, ওই চুটকিটা কি জুয়েলকে নিয়েই তৈরি হয়েছে? এক লোক জুয়েলের মতো দুই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে মাছ মারা দেখছে বলে মাছ শিকারি তাকে বললেন, ভাই আপনিও ছিপ ফেলে বসুন না। লোকটা বলল, না ভাই, আমার অত ধৈর্য নেই।

ধৈর্য অবশ্য জুয়েলের ছিল, অফুরানই ছিল। ছুটির দিন হলেই ছিপ, টোপ, চারা আর মাছ শিকারের যাবতীয় উপকরণ নিয়ে ধানমণ্ডি লেকে হাজির হতো জুয়েল। হারুন সাহেব তাকে প্রায়ই সঙ্গ দিতেন। কিন্তু হারুন সাহেব নির্মাণবিদ, তার ব্যবসা ঘরবাড়ি বানানো। তার ছুটির দিনগুলো নিরবচ্ছিন্ন অবসরের ছিল না। তারপরও তিনি জুয়েলকে সময় দিতেন।

জুয়েলই একদিন তাকে আইজ্যাক ওয়াল্টনের দি কমপ্লিট অ্যাংলার বইটি পড়তে দিল। বইটি প্রথম ছাপা হয় ১৬৫৩ সালে, যদিও ওয়াল্টন আরো পঁচিশ বছর অনেক কিছু যোগ করতে থাকেন বইটিতে। গদ্যে-পদ্যে মাছ ধরার শিল্পকে উদযাপন করেছেন ওয়াল্টন, এর আনন্দ আর অন্তঃসারকে অভিবাদন জানিয়েছেন। অফিসের কাজে লন্ডন গিয়ে বইটা এনেছিল জুয়েল। হারুনকে বলেছিল, বইটা পড়। ইংল্যান্ডের রেনেসাঁসের অনেক আকর খুঁজে পাওয়া যাবে এ বইতে। কেন বইটির নামে 'কমপ্লিট' কথাটি আছে, তাও বুঝবি।

হারুন মাথা নেড়েছিল। আচ্ছা পড়ব, সে বলেছিল।

না, এভাবে বলিস না, বল, অবশ্যই পড়ব। রেনেসাঁস পরিপূর্ণতায় বিশ্বাস করত, জানিস তো। একজন মাছ শিকারি একজন পরিপূর্ণ মানুষের প্রতিচ্ছবি, প্রত্যয় নিয়ে বলেছিল জুয়েল।

কিন্তু পরিপূর্ণ অ্যাংলার হলেও পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারেনি জুয়েল। মাছ মারার নেশায় সংসারকে ভুলেছে। ছুটির দিনগুলিতে তার স্ত্রী কেকা কত যে অনুরোধ করত, সারাটা দিন তার সঙ্গে কাটাতে; কিন্তু পরিপূর্ণ মাছ শিকারি কেন তা মানবে? কেকার শখ ছিল ঘুরে বেড়ানো, শপিং করা, রেস্টুরেন্টে খাওয়া। সেসব সাধ তার অপূর্ণই থেকে যেত।

দুটি সন্তান হলো। কিন্তু পরিপূর্ণ মাছ শিকারিকে অন্তত অর্ধেক পূর্ণ বাবা হতে হয়, জুয়েলের তা খেয়ালে এলো না। কেকা অনেক দেখল। তারপর একদিন ঘরে তালা দিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল।

জুয়েলের ধ্যান ভাঙল, কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাছ মারা বন্ধ করে জুয়েল কেকার মান ভাঙাতে বসল। কিন্তু মাঝখানে যদি আরেকজন এসে পড়ে, যে হাসিখুশি, দিলখোলা, যার শখও ঘুরে বেড়ানো, দামি জিনিস কেনা এবং সেসবের জোগান দেয়ার মতো চাকরি এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ যা, মার্কিন দেশের গ্রিনকার্ড, তাহলে কেকার মানটা ভাঙার কোনো কারণ কি আর থাকে?

কেকা যদি বিয়েতে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঢাকাতে থেকে যেত, একাই থাকত ছেলেমেয়ে নিয়ে, জুয়েল হয়তো মেনে নিত, কষ্ট নিদারুণ হলেও। কিন্তু কেকা আমেরিকা চলে গেল। ছেলেমেয়ে দুটির অবশ্য এ ব্যাপারে বলা অথবা না বলার কিছু ছিল না। বাবাকে তারা দেখেছে সন্ধ্যার পর, বাতির আলোতে। দিনের আলোয় কৃচিৎ।

আইজ্যাক ওয়াল্টন বলেন, মাছ মারার একটা আনন্দ হলো, প্রকৃতির মাঝখানে অনেকটা সময় কাটানো। তাতে দিনের আলোর অদল-বদল, কাঁপন, রোদ-বৃষ্টি-ছায়ার আনাগোনা মানুষের ভেতরটা সুন্দর করে দেয়। দিনের আলোয় মানুষকে ভালো চেনা যায় ইত্যাদি। জুয়েল তার দিনের আলো অফিস আর ধানমণ্ডি লেকের জন্য রেখে দিয়েছিল।

একদিন ধানমণ্ডি লেকে জুয়েলের লাশ ভেসে উঠল। হয়তো বড় মাছ ধরা পড়েছিল ছিপে, সেটি তুলতে নিচে নেমেছিল। ধানমণ্ডি লেক বলে কথা। এর পানির নিচে কেউ নামলে উঠে আসাটা কপালের ব্যাপার।

হারুন অবশ্য আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারেন। জুয়েল কখনো আলো ফোটার আগে লেকে যেত না। সেদিন গিয়েছিল। তার ছিপটি ঠিকই পাতা ছিল; কিন্তু বড়শিতে কোনো টোপ ছিল না।

দুই

বিরলের শশীদল গ্রামে পৈতৃক বাড়িতে যখন যান হারুন সাহেব, পুকুরের ঘাটে বসেন। ছিপ ফেলেন, কিন্তু মাছ ধরার চাইতে একলা কিছু সময় কাটানোটাই উপলক্ষ। বছরে দু'একবারের মতোই আসা হয়, ব্যবসা থেকে অবসর নেয়ার পর একটু বেশি। কিন্তু মাছ মারতে বসেন প্রধানত জুয়েলকে মনে রেখে। তার কেন জানি এ রকম একটা ধারণা হয়, তিনি যখন ফাতনার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কখন তাতে

টান পড়বে তার অপেক্ষায়, তার পাশে বসে থাকে জুয়েল। সারাটা ক্ষণ। এতে অস্বস্তি হওয়ার কথা নিশ্চয়– কে চায় নিজের পাশে মৃত একজন মানুষের– সে মানুষ যতই বন্ধু হোক– কায়াহীন ছায়া নিয়ে বসে থাকতে, বিরতিহীন? কিন্তু হারুন সাহেবের অস্বস্তি হয় না, তার ভালোই লাগে। জুয়েলের সঙ্গে তিনি গল্প করেন, একজন পরিপূর্ণ মানুষের জীবনের গল্প। জুয়েলের মতো কমপ্লিট অ্যাংলার তিনি হতে পারেননি, কিন্তু কমপ্লিট ম্যান তো হয়েছেন। এটাও তো রেনেসাঁসের একটা আদর্শ ছিল, তাই না জুয়েল? পাশে বসা জুয়েলের ছায়াকে তিনি দু'বছর আগে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন। জুয়েলের ছায়া বলেছিল, হ্যাঁ। তিনি জুয়েলের ছায়াকে বলেছিলেন, আমার ছেলেমেয়েদের বড় হওয়া তুই দেখে যেতে পারিসনি, জুয়েল; কিন্তু তোকে বলি, মাশাল্লা, সোনার টুকরা হয়েছে ছেলেমেয়েগুলি। বড়টার হাতে ব্যবসা ছেড়ে অবসর নিলাম, মেজ ছেলেটা আমেরিকা থেকে ফিরেছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এমএসসি করে। সেও ঢুকছে ব্যবসাতে। মেয়েটা বুয়েট থেকে আর্কিটেকচারে পাস করে বেরোলো। সেও দুই ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসায় নাম লিখিয়েছে। তারা ব্যবসাটার নামে এখন ডিজাইনস শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। নতুন নাম হয়েছে 'ওয়ান্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাইনস।' কেমন, ভালো নাম না?

খুব ভালো নাম, জুয়েলের ছায়া বলেছে।

ও, তোকে ছোট ছেলেটার কথা বলাই হয়নি। ঢাকার আইবিএ থেকে এবার যে বিবিএ করল। বড়গুলোর ইচ্ছা সে বিদেশ যাক, এমবিএটা সেখান থেকে করুক, তারপর ফিরে ওয়ান্ডারের ব্যবস্থাপনা, বিপণন এসবের দায়িত্ব নিক। প্ল্যানটা ঠিক আছে না, জুয়েল?

হ্যাঁ। একদম ঠিক।

তোর দুই ছেলেমেয়েও খুব ভালো করেছে। কেকার সঙ্গে নিউইয়র্কে দেখা হয়েছে। ছেলেটা ডাক্তারি করছে মাউন্ট সাইনাই-এ। ভাবা যায়? মেয়েটাও কম কিসে? গোল্ডম্যান স্যাকস-এ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং অ্যানালিস্ট। বছরে এক লাখ ডলারের মতো বেতন। এসব কথা বলতে বলতে কেকার গলা বুজে আসছিল।

তাই? জুয়েলের ছায়া জিজ্ঞেস করল।

ওর গলা বুজেছিল অন্য আরেকটা কারণে। বছরখানেক আগে ইমতিয়াজ ওয়ালি মারা যান। তিনি যে ডজ ডেটোনা গাড়িটা চালাচ্ছিলেন তা বরফে পিছলে খাদে পড়ে। একটা কনভেনশনে যাচ্ছিলেন আপস্টেট নিউইয়র্কে। এক বরফঝড়ের দিনে। কেকা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না, ইমতিয়াজ ওয়ালি আর নেই। জুয়েল, আমার কথাগুলি শুনছিস? জুয়েল?

হারুন সাহেবের হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, জুয়েলের সাড়া মিলছে না, ফিরে দেখলেন ঠিক। জুয়েলের ছায়াটা নেই।

সেদিন নিজেকে খুব বকা দিয়েছিলেন তিনি কেন জুয়েলের হৃদয়জুড়ে বেদনা জাগিয়ে দিলেন? এসব জুয়েলকে কেন বলতে গেলেন তিনি? ইডিয়ট, নিজেকে একটা গালি দিয়ে ছিপের ফাতনার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, দুঃখিত জুয়েল, মাপ করে দিস।

ফাতনায় টান পড়েছিল।

তিন

আজ পুকুরের ঘাটে বসে তার খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগার অনেক কারণ- এর একটি তার ব্যবসায়ে চার নম্বর সন্তানটির যোগ দেয়া। দ্বিতীয় কারণ, শ্যামলীর বাড়িটা বদলে গুলশানে ওয়ান্ডারের তৈরি করা 'স্বপ্নলোক'-এ উঠে যাওয়া। 'স্বপ্নলোক'-এর মালিকও ওয়ান্ডার। সেখানে পাঁচটা ফ্লোরে সবাই মিলে থাকছেন। চার ছেলেমেয়ে চারটা ফ্লোরে, পাঁচ নম্বরে হারুন সাহেব ও তার স্ত্রী। বাকি দুইটা ফ্লোর তারা ভাড়া দিয়েছেন, একটি বিদেশি কোম্পানির কাছে।

স্ত্রী আপত্তি করেছিলেন, শ্যামলীতে দীর্ঘদিন থেকেছেন, সেখানেই সংসার শুরু করেছিলেন, সুখ-দুঃখের অনেক দিন সেখানে কাটিয়েছেন। ছেলেমেয়ের জন্ম, তাদের মানুষ করা– সবই হয়েছে সেই বাড়িতে। বড় ছেলে আর মেয়ের বিয়েও সেই বাড়ি থেকে। বড় ছেলের ঘরে যে নাতিটা হলো, সেও হাসপাতাল থেকে সোজা এই বাড়িতে এসেছিল। তাও বছর দুই হলো। বাড়িটা প্রবলভাবে স্মৃতিময়। এই স্মৃতিময় বাড়ি ফেলে কোথাও যেতে তার ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু ছেলেমেয়ের কথায় যুক্তি ছিল। শ্যামলীর দোতলা বাসায় জায়গা কম। মেয়ে বলল, জামাই এই বাড়িতে থাকবে না। দেড়খানা রুমে তার হাঁসফাঁস হয়। সে অন্যখানে বাড়ি নেবে। তবে গুলশানে গেলে তার আপত্তি নেই।

তা ছাড়া বাড়িটার তিন দিকে আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট দালান উঠেছে। বাড়িটাতে এখন আলো-হাওয়ার ঘাটতি। আশপাশটা স্যাঁতসেঁতে থাকে। মশার উপদ্রব। বড় বউ বলেছে, বাচ্চাটা ঘোরতর বিপদে আছে ডেঙ্গু আর ম্যালেরিয়ায়। ঘরের দেয়ালে নোনা ধরেছে। কেমন একটা ভাপসা, তামাটে গন্ধ সারা বাড়িতে।

হারুন সাহেবের স্ত্রী ক্ষীণ গলায় বলেছিলেন, একটু সারিয়ে নিলে, নতুন প্লাস্টার-রঙ ইত্যাদি দিলে হয় না? মেয়ে ফারহানার জন্য তিন তলাটা বানিয়ে নিলে হয় না?

এ কথা শুনে বড় বউ হেসে বলেছিল, তাহলে একটা চারতলা তুলতে হবে। আমার আর ফাহাদের আর সোহানের জন্য।

সোহান হচ্ছে ডেঙ্গুর সমূহ বিপদে থাকা সেই নাতি।

শেষ চেষ্টা চালালেন মিসেস হারুন। বললেন, গুলশানে তোমরা তো সব আলাদা থাকবে, আমরা দু'জনও থাকব একটা ফ্লোরে। এটা কেমন হবে? সারা ঘরে আমি ও তোমাদের বাবা?

তা কেন হবে? মেজ ছেলে আহাদ বলেছিল। আমরা সবাই তো থাকবো একই ছাদের নিচে।

এরপর আর কথা চলে না।

গুলশান গিয়ে ভালোই লেগেছে হারুন সাহেবের। ঝকঝকে তকতকে বাড়ি। কী আলো-বাতাস! ছাদে একটা বিরাট বাগান বসানোর কাজ শুরু করেছে ছেলেমেয়েগুলো, তার স্ত্রী একদিকে মরিচ, টমেটো, বেগুন ফলাচ্ছেন। মাস ছয়েক হলো, বাড়িটাকে মনে হচ্ছে সত্যিকারই একটা স্বপ্নলোক।

নামটা মিসেস হারুন দিয়েছিলেন। তিনি যৌবনে কবিতা লিখতেন। বেগম পত্রিকায় তার কবিতা ছাপা হতো। ছবিও ছাপা হতো, ঈদ সংখ্যায়। ওই ছবি দেখেই হারুন সাহেবের মার আগ্রহ জেগেছিল ছেলের বউ হিসেবে তাকে পেতে।

মায়ের সাফল্যটাও আজকের এই পুকুরঘাটের আনন্দে একটা মাত্রা দিয়েছে। মাকে মনে পড়ছে তার দু'দিন থেকে। মা বলতেন, পরিবারের বড় আনন্দ হচ্ছে অটুট বন্ধন– সকলের সঙ্গে সকলের একটা সুতায় বাঁধা পড়া। সবাই থাকবে সবার জন্য। এমনি হবে সেই বন্ধন যে রাত-দুপুরে একজনের জ্বর হলে অনেক দূরে ঘুমিয়ে থাকা আরেকজন জেগে উঠবে। তার মনে তাইশ হবে। মা 'তাইশ' কথাটাই ব্যবহার করতেন। হয়তো ত্রাসের অপভ্রংশ। কে জানে!

আজ দু'দিন হলো শশীদল এসেছেন হারুন সাহেব। বাবার বংশ সচ্ছল ছিল। পূর্বপুরুষ জোতদার ছিলেন, জমিদার না হলেও। একটা একতলা বাড়ি আছে শশীদলে, পুরনো আমলের। একসময় চকমেলানো ছিল– বড় বড় থাম, দরজা,

দশ ইঞ্চি ইটের দেয়াল। এখন অনেকটাই শ্রীহীন। বাড়ির একটা অংশ ধসে গেছে। কিন্তু যা আছে, তাতে সকলে মিলে থাকা যায়। বড় ছেলে গতবার এসে অনেক সংস্কার করে গেছে। লাইট ফ্যান ফ্রিজ টিভি আছে। বাথরুমে মডার্ন ফিটিং আছে।

মাকে মনে পড়ার প্রধান কারণ ছেলেমেয়ে সবাই এসেছে। ছোট ছেলে বলেছে, এটা একটা রি-ট্রিট। ব্যবসার পরিভাষায় রি-ট্রিটে আনন্দের সঙ্গে কাজও হয়। কিন্তু তার মনে হলো ছেলেমেয়েরা শুধুই আনন্দ করছে। তিনি তাদের হৈচৈ-চিৎকার শোনেন, আর পুলকিত হন। মা যাকে অটুট বন্ধন বলেছেন, তার ছেলেমেয়ের মধ্যে তাই দেখছেন হারুন সাহেব।

পুকুরের ঘাটে বসে হারুন সাহেব দেখলেন জুয়েলের ছায়া তার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি খুব খুশি হলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, আজ তার সঙ্গে একদম ভিন্ন কথা বলবেন। আইজ্যাক ওয়াল্টনকে দিয়েই শুরু করবেন। কিন্তু পুকুরের পানিতে ছিপটা ফেলতেই তার ভেতর সুখের কথাগুলি উথাল-পাথাল শুরু করল। তিনি হঠাৎ জুয়েলকে বললেন, বুঝলে জুয়েল, দিনটা খুব আনন্দের। এই আনন্দটা বলে বোঝাতে পারব না।

তার প্রয়োজন নেই, জুয়েলের ছায়া বলল, এখন মাছ মারো। আজ মাছ উজিয়েছে। ভালো মাছ পাবে।

'ও' বলে মাছ মারায় মনোযোগ দিলেন হারুন সাহেব।

চার

হারুন সাহেব মাছ মারছিলেন, আর ঘরের ভেতর রি-ট্রিটে বসেছিল ছেলেমেয়েগুলো। মেয়ের জামাই ওসমানও আছে। সে চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট বা সিএ। সিএরা এমনিতেই এমবিএদের তেমন পাত্তা দেয় না। কিন্তু ওসমান রাহাতকে পাত্তা দেয় না অন্য একটি কারণেও। এই শ্যালকটিকে তার পছন্দ হয় না। ইঁচড়ে পাকা টাইপ। ওসমানকে যখন-তখন থামিয়ে কথা বলতে চায়।

রি-ট্রিটের মূল বিষয় শ্যামলীর বাসা। এই বাসা নিয়ে যে নানা মত দেখা দিচ্ছে সেগুলোর নিরসন করা। ফাহাদ চায় এটি সোনার বাংলা রিয়েল এস্টেটের কাছে বিক্রি করে দিতে। তাতে আশি কোটি টাকা পাওয়া যাবে। আহাদ চায় এখানে নিজেরাই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং বানাতে। ওসমান বলছে, ফ্ল্যাট বানালে এখন আর লাভ হবে না। ফ্ল্যাটের একটা গ্লাট চলছে। তাকে থামিয়ে রাহাত বলছে, বাড়িটা একটু ঠিকঠাক করে ভাড়া দেয়া হোক। পাঁচ বছর পর এই বাড়ির দাম একশ' কুড়ি কোটিতে পৌঁছাবে। ফারহানাও, ফাহাদের মতো, বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চায়, যদিও সে ফাহাদকে বলছে, ভাইয়া, রি-নেগোশিয়েট করো। একশ' পর্যন্ত পাবে। রাহাত বলছে সে চেষ্টা কি করিনি? আশির বেশি এক লাখও পাব না।

তাহলে ইউ আর নট নেগোশিয়েটিং হার্ড এনাফ।

ওসমান বলেছে, নানা, উনি ঠিকই বলেছেন। এই মুহূর্তে– এই মুহূর্তে কেন, আগামী পাঁচ বছরেও এ জমির দাম ...

তাকে থামিয়ে রাহাত জিজ্ঞেস করেছে, দুলাভাই, সিন্স হোয়েন ইউ আর এ ল্যান্ড স্পেকুলেটর?

ওসমানের ইচ্ছা হয়েছে এক থাপ্পড়ে ইঁচড়ে পাকা ছেলেটার দাঁত ভেঙে দেয়। কিন্তু সে জানে আশি কোটিতে বিক্রি হলে সকলের হাতে অর্থাৎ ফারহানারও অর্থাৎ তার হাতেও– নিদেনপক্ষে তিন-চার কোটি টাকা নগদ আসবে। বাকিটা কোম্পানির ফান্ডে জমা পড়বে। সে তার রাগ পুষে উঠে গেল। বারান্দায় বড় বউ মাইশা হুমায়ুন আহমেদ পড়ছিল। সে তার পাশে গিয়ে বলল, ভাবি, এক কাপ চা।

ও, মাইশা বলল, তোমার গিন্নি তো আবার রিট্রিট আছেন। বিজনেস। উনি কী করে চা দেন। ঠিক আছে দিচ্ছি।

কথাটা মিসেস হারুন শুনলেন। তিনি একটু দূরেই ছিলেন। মনোবিশেষজ্ঞরা বলবেন, কথাটা তাকে শোনাবার মতো জোরেই বলেছে মাইশা। তবে মিসেস হারুন যৌবনে কবি ছিলেন। কবিরা সমন্বয়ধর্মী হন, মানবতায় বিশ্বাস করেন। তিনি তাই পুত্রবধূকে বললেন, তুমি বস মা, আমি দেখছি।

পাঁচ

কিছুক্ষণ মাছ মারার চেষ্টা করলেন হারুন সাহেব। কিন্তু উজানো মাছগুলো একটা কামড়ও দিল না টোপে। বিরক্ত হয়ে ছিপ তুলে তিনি দেখলেন বড়শি ফাঁকা। টোপ নেই।

তার সন্দেহ হলো, আদৌ টোপ লাগিয়েছিলেন কি না। পাশ থেকে জুয়েলের ছায়া বলল, কেঁচো লাগাও। এই মাছ কেঁচো খাবে।

নিচু হয়ে তিনি কেঁচো লাগালেন। ছিপ ছাড়লেন।

জুয়েলের ছায়ার দিকে তাকিয়ে তাকে ধন্যবাদ দিলেন। বললেন, আনন্দের কারণটা তোমাকে বলি জুয়েল। আমার ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকাও। কী দেখতে পাবে? আদর্শ! মনুষ্যত্ব! তাদের ভেতর বন্ধনটা এমনই শক্ত যে পৃথিবীর কোনো কিছুই তা আলগা করতে পারবে না।

তোমার ফাতনায় টান পড়েছে, জুয়েল বলল।

তাই তো, হারুন সাহেব বললেন এবং ছিপে টান দিলেন।

একে একে তিনটা মাছ ধরলেন তিনি। শেষটা বেশ বড়। রুই। সেটি মাছ রাখার প্লাস্টিকের বালতিতে ফেলে জুয়েলের ছায়াকে অপেক্ষা করতে বলে ঘরের দিকে দৌড়ালেন। বারান্দায় স্ত্রীকে পেলেন, মাইশা ওসমানকে পেলেন। দেখ, কত বড় মাছ ধরেছি। তিনি বললেন এবং হৈচৈ শুরু করলেন। তার চিৎকারে ছেলেমেয়েগুলো ভেতরের ঘর থেকে বের হয়ে এলো। কী হয়েছে বাবা? ও, মাছ ধরেছ। ওয়াও। রিয়েলি বিগ। কুল, বাবা– এসব বলে তারা আবার ভেতরে চলেও গেল। মাইশা চায়ের কাপ হাতে রান্নাঘরের দিকে হাঁটা দিল। মিসেস হারুন এসে মাছের বালতি নিয়ে রান্নাঘরে খালি করতে গেলেন। তাকে ক্লান্ত মনে হলো।

ওসমানকে জিজ্ঞেস করলেন হারুন সাহেব, ওরা কী করছে?

রি-ট্রিট, সে সংক্ষেপে বলল।

সেতো বুঝলাম; কিন্তু এটি এমনকি জরুরি?

ওরা শ্যামলীর বাড়ি বিক্রি করা নিয়ে কথা বলছে, ওসমান বলল, 'ওরা' কথাটায় জোর দিয়ে।

আচ্ছা? হারুন সাহেব বললেন। শ্যামলীর বাড়ি তো আমি বিক্রি করব না।

ওসমান হাসল। মিসেস হারুন বালতি নিয়ে ফিরলেন। মাছ মারা শেষ করে এসো, কথা আছে, তিনি বললেন। হ্যাঁ, আর আধা ঘণ্টা, হারুন সাহেব বললেন এবং পুকুরের দিকে হাঁটা দিলেন।

ছয়

ঘরের ভেতরের রি-ট্রিটে তখন উত্তেজনা চলছে। ফাহাদ আর আহাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে। ফারহানা থামাতে গেছে। না পেরে ওসমানকে ডেকে এনেছে। ওসমান আহাদকে আলাদা করে অন্যদিকে নিয়ে গেলে আহাদ চটেছে তার ওপর। রাহাত এসে বলেছে ওসমানকে– দুলাভাই, স্টে আউট অব আওয়ার অ্যাফেয়ার্স। ওসমান বলেছে ফারহানাকে, এই অকালকুষ্মাণ্ডকে সামলাও। এতে ফারহানার মাথায় রাগ চড়েছে। সে বলেছে, কাকে বলছ অকালকুষ্মাণ্ড?

অকালকুষ্মাণ্ড? রাহাত চিৎকার করে বলেছে, আপনাকে সরি বলতে হবে। ফাহাদ আর আহাদ এবার রাহাতকে থামাতে গেছে। এরপর দৃশ্যে ঢুকেছে মাইশা। খুব মজা করার মতো করে বলেছে, সবার জন্য ঠাণ্ডা লাচ্ছি বানিয়ে আনি? সবার মাথায় টেম্পারেচার দেখছি বেড়ে গেছে। ফারহানা বলেছে, ঠাট্টা করো না, ভাবি। ওসমান বলেছে, ভাবি, মান বাঁচাতে চাইলে বারান্দায় চলে যান। রাহাত বলেছে, হোয়াই ডোন্ট ইউ ফলো হার?

ইত্যাদি।

রান্নাঘরে মুখে শাড়ি চেপে কেঁদেছেন মিসেস হারুন। কবি মানুষ, মনটা নরম। বছর খানেক থেকে তিনি টের পাচ্ছেন, জমি, সম্পত্তি, টাকাপয়সা– এসব যেন আলগা করে দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের ভেতরের সম্পর্কটা। তিনি অনেকবার হারুন সাহেবকে বলতে চেয়েছেন, কিন্তু মানুষটা কীরকম যে অন্ধ! কিছুতেই কোনো কথা শুনবেন না, বিশ্বাস করা তো দূরের কথা। ছেলেমেয়েরা অবশ্য বাবার সামনে সেই আগের ভাইবোন। কিন্তু মিসেস হারুন লক্ষ্য করেছেন, ওয়ান্ডার কনস্ট্রাকশনটা ওয়ান্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাইনস হয়ে যাওয়ার পরই আসলে ভাইবোনের ভেতর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। কোম্পানির নাম বদলানোর সময় নতুন দলিল-টলিল হয়েছে। মিসেস হারুনের ধারণা, বিপত্তিটা হয়তো ওইখানেই শুরু।

আজ দুদিন থেকে ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে। কালও হয়েছে। কালও চেষ্টা করেছেন হারুন সাহেবকে বলতে। কিন্তু তিনি কয়েক সেকেন্ড শুনে বলেছেন, হৈচৈ তো হবেই। কপট ঝগড়াঝাঁটি না হলে ভালোবাসাটা শক্ত হয় না। এ রকম তো সারাজীবনই তারা করেছে।

কথাটা সত্য। কপট ঝগড়া করা ভাইবোনদের একটা খেলা ছিল। সেই খেলা শেষে সবাই হাসত, মজা করত। গত রাতেও হাসি-ঠাট্টা হয়েছে। হারুন সাহেব তাতে আনন্দ পেয়েছেন। অটুট বন্ধন, তিনি মনে মনে বলেছেন এবং মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করেছেন।

সাত

জুয়েলকে বললেন হারুন সাহেব, দেখলাম ছেলেমেয়েগুলো খুব হাইপার হয়ে গেছে। অতি আনন্দে মানুষ হাইপার হয়, বুঝলে?

হাইপারের নানা কারণ থাকে, অতি আনন্দ এর একটি মাত্র, জুয়েলের ছায়া বলল।

হা হা, হারুন সাহেব হাসলেন। যাই হোক, তিনি বললেন, তারা শ্যামলীর বাসা বিক্রি করতে চায়। আমি তাদের বুঝিয়ে বলব, না। এই বাসায় তুইও তো অনেকবার গিয়েছিস, জুয়েল।

হ্যাঁ, জুয়েলের ছায়া বলল। ভাবির হাতে ডালপুরি খেতে যেতাম। কেকার খুব পছন্দ ছিল সেই ডালপুরি।

দেখি, আজ বিকেলে ডালপুরি বানাতে বলব মামুনাকে, হারুন সাহেব কোমল গলায় বললেন।

আট

ফাহাদ একটা থ্রেট দিয়েছে আহাদকে। সে তাকে বের করে দেবে। রাহাত আর ফারহানা তার পক্ষে। তারা মেজরিটি। আহাদ মাইনরিটি। আহাদ বলেছে, দেখা যাক, কে কাকে বের করে দেয়। ওসমান বলেছে, একটা সল্যুশনে আসতে হবে, এভাবে ঘরের মানুষ একজন আরেকজনের শত্রু হতে ... রাহাত তাকে থামিয়ে বলেছে, ইউ আর অ্যান আউটসাইডার। স্টে আউট। ওসমান বলেছে ফারহানাকে, সে বিকেলের বাসে ঢাকা ফিরবে। ওসমান এরপর রাগ করে বারান্দায় যেতে যেতে বলেছে ভাইবোনদের, এখন হাত চালাও। মুখে মুখে ঝগড়া আর কত? ওসমানের বিদ্রূপ মন্তব্য শুনে রাহাত চায়ের কাপ ছুড়ে মেরেছে। সেটা লেগেছে মাইশার হাতে। মাইশা লাচ্ছি হাতে ঘরে ঢুকছিল। আঘাত সামান্যই, কিন্তু মাইশা 'উফ' বলে এক হাতে আঘাত পাওয়া অন্য হাতটা ধরেছে। লাচ্ছির জগ পড়ে ভেঙে খানখান। সারা ঘরে লাচ্ছির ঢেউ ছড়িয়েছে।

নয়

ফাতনায় জোর কাঁপন দেখে হারুন সাহেব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। জুয়েলের ছায়া তাকে বলল, চতুর মাছ। এটি সহজে ধরা পড়বে না। বড়শিটা খেলিয়ে ধরতে হবে। মনে আছে টেকনিকটা?

হ্যাঁ, হারুন সাহেব বললেন, গভীরে যেতে হবে। বিঁধতে হবে। তিনি ছিপটা তুলে টোপ পরখ করলেন, ছিপটা আবার দূরে মারলেন। রিলটা ছাড়লেন। এবার বড়শি গেল পানির গভীরে। মাছটা এবার রাগবে। টোপের দিকে ছুটে যাবে। আবার ছিপ তুলতে হবে, মাছটাকে আবার খেলিয়ে ছিপটা তুলতে হবে। মাছটা ডেসপারেট হবে। ডেসপারেট হলে মাছই হোক, মানুষই হোক, বুদ্ধি লোপ পায়, জেদটা বাড়ে।

আইজ্যাক ওয়াল্টন বলেছেন, রেইজ ইজ দ্য আনডুইং অব এ ফিশ। অর্থাৎ মাছের জেদ তার ধ্বংস ডেকে আনে। এভাবে দূরে গভীরে কোনো একবার মারার পর ছিপটা কিসের সঙ্গে জানি আটকে গেল। কিছুক্ষণ টানলেন হারুন সাহেব। নাহ্। জিনিসটা টলছে না। মাছ যে না, তিনি বুঝেছেন। তাহলে?

নিশ্চয় কোনো হাঁড়িটাড়ি হবে, ঘটি বা এ রকম কিছু। তাই না জুয়েল?

না। আরো মূল্যবান কিছু, জুয়েলের ছায়া বলল।

তাহলে লতিফকে ডাকি? লতিফ অর্থাৎ বাড়ির দু'জন কেয়ারটেকারের মধ্যে জোয়ানটি।

ডাক, বলল জুয়েলের ছায়া এবং হঠাৎ করে বলল, গুডবাই হারুন। আর দেখা হবে কিনা জানি না। বাট টেক কেয়ার। ভালো থাকিস।

কী আশ্চর্য, জুয়েল কোথায় যাস? কেন যাস? আমার আনন্দের গল্পটা তো তোকে পুরোটা বলা হলো না?

কোনো উত্তর নেই। জুয়েলের ছায়াটা হারিয়ে গেছে।

দশ

লতিফ পুকুরে নামল। কিছুক্ষণ লাগল তার গভীরে পৌঁছাতে। তাকে পথ দেখাতে বড়শির সুতা আছে। হারুন সাহেবের হঠাৎ ভয় হলো। লোকটা পুকুরের গভীরে নেমেছে, কিন্তু সাড়া-শব্দ নেই। কেন?

কিন্তু না, লতিফ উঠে এলো। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন হারুন সাহেব। লতিফ সাঁতরে পাড়ে আসছে। হাতে একটা বাক্স। কাঠের? লোহার? ছোটখাটো ক্যাশ বাক্সের মতো!

লতিফ পাড়ে উঠে বাক্সটা দিল হারুন সাহেবের হাতে। হারুন সাহেব বুঝলেন, এটি পূর্বপুরুষদের আমলের। সম্ভবত পিতলের। পুকুরের পানিতে এর শেষ দশা প্রাপ্তি। তার ব্যবসায়ী মন বলল, সাবধান। লতিফের সামনে খোলা নয়। এটি খুলতে হবে সঙ্গোপনে। তিনি তাকে বাহবা দিয়ে ছিপটিপ জায়গামতো রেখে আসার নির্দেশ দিয়ে বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

এগারো

ঘরে ঢুকে তার মনে হলো, একটা ঠাণ্ডা বাতাস যেন গায়ে লাগল। তিনি দেখলেন সবাই দাঁড়িয়ে-বসে আছে জমাট বেঁধে থাকার মতো। একটা গুরুতর কিছু যেন হচ্ছিল, তিনি আসায় হঠাৎ তাতে ছেদ পড়েছে। কারো মুখে হাসি নেই। তাদের মুখে নানান অভিব্যক্তি, কিন্তু একটাও আনন্দের নয়।

বরাবরের মতো তিনি চলে গেলেন অস্বীকারের রাস্তায়। কী হলো তোমাদের? সব চুপচাপ কেন?

না, তেমন কিছু না, ফারহানা বলল।

গুড, হারুন সাহেব বললেন এবং পরিস্থিতি হালকা করতে বললেন, দ্যাখো, কী মাছ ধরেছি। এই বলে পূর্বপুরুষের ক্যাশ বাক্সটা মাথার ওপর তুলে ধরলেন। নিশ্চয় ভেতরে সোনার মোহর আছে, ঠাট্টা করে তিনি বললেন।

এবার ঘরের জমাট বাঁধা বাতাসে একটা আলোড়ন হলো। হৈচৈ করে উঠল সবাই। খুলে দেখি বাবা? ফাহাদ দাবি জানাল।

সোনার মোহরই বটে। বিকেলে যখন সব মোহর সাফসুতরো করে সেগুলো নিয়ে হারুন সাহেব বসলেন, দেখলেন, সবই সেই সুলতানি না হয় মোগল আমলের। চুয়াত্তরটি মোহর। কত দাম হবে?

ওসমান বলল, প্রাইসলেস।

হারুন সাহেবের মনে পড়ল, একাত্তরে এই বড় চাচাকে যখন খুন করে পাকিস্তানি বর্বরগুলো, তাদের কাছে খবর ছিল এখানে গুপ্তধন আছে। চাচাকে মেরে অনেক খোঁজাখুঁজি তারা করল; কিন্তু কিছুই পেল না। পুরনো কিছু গয়না ছিল পরিবারটির। সেগুলো নিয়েই পাকিস্তানিরা ক্ষান্ত হলো। স্বাধীনতার পর হারুন সাহেবও অনেকবার এসে খুঁজেছেন। ব্যবসায়ে নেমে তার মনে হয়েছিল গুপ্তধন পেলে বিরাট কাজ হয়। চাচার ছেলেমেয়ে ছিল না। বাড়িটা তাই বাবার অধিকারে ছিল। তিনি মারা গেলে হারুন সাহেব এর মালিকানা পেয়েছিলেন। আজ বুঝলেন, চাচাই পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন গুপ্তধনের ওই বাক্সটি।

ওসমানের 'প্রাইসলেস' শুনে হারুন সাহেবের মনে হলো, সত্যিই এগুলো প্রাইসলেস। চাচা মারা গিয়েছিলেন এগুলোর কারণে। একটা মানুষের প্রাণের মূল্যে পাওয়া ধনের তো কোনো মূল্য হয় না, তা অমূল্যই থাকে।

ফাহাদ বলল, চল বাবা, মোহরগুলো নিলামে তুলি?

ফারহানা বলল, না, সবাই ভাগ করে নিই। তারপর যোগ করল, না জানি কত টাকা দাম!

আহাদ বলল, মোহরগুলো নিলামে তোলার প্রয়োজন নেই। তাহলে পুলিশ পেছনে লাগবে। বরং পুরান ঢাকার সোনার দোকানে বিক্রি করে দেই।

হারুন সাহেব গলায় অবিশ্বাস নিয়ে বললেন, বললাম না, এগুলোর জন্য আমার চাচা, একজন আগাগোড়া ভালো মানুষ, প্রাণ দিলেন? এগুলো কি বিক্রি করা যায়? ওসমান ঠিকই বলেছে, এগুলো প্রাইসলেস।

রাহাত বলল, দুলাভাইয়ের কথাই সই? আমাদের কথার কোনো দাম নেই?

হারুন সাহেব নিজের কানেও বিশ্বাস করলেন না। এই কথা তুই বলতি পারলি? তিনি বললেন, আমি আমার চাচার কথাগুলো বলার পরও?

বারো

রাতের খাওয়ার পর বিছানায় গিয়ে সব কথা হারুন সাহেবকে খুলে বললেন মামুনা। অর্ধেক পর্যন্ত শুনে হারুন সাহেব কান চেপে ধরলেন। তিনি বললেন, একটু ঘুমাতে দাও মামুনা।

তোমার পায়ে একটু মালিশ করে দেব? মামুনা বললেন।

দাও, নিরাসক্তভাবে বললেন হারুন সাহেব এবং বুঝলেন, সারারাত তার ঘুম হবে না।

তেরো.

সকাল ৯টায় সবাই নাস্তার টেবিলে বসে দেখল, হারুন সাহেব নেই। বাবা কোথায়? ফারহানা জিজ্ঞেস করল।

ঢাকা গেছেন, একদম ভোরে, গলার স্বর নিচুতে রেখে উত্তর দিলেন মিসেস হারুন।

ঢাকা গেছেন? কেন? ফাহাদ জানতে চাইল।

ছেলের চোখের দিকে স্পষ্ট তাকালেন মিসেস হারুন। তোমার বাবা মোহরগুলো জাদুঘরে দেবেন। আর শ্যামলীর বাসাটা মেরামত করাবেন। আমরা ঠিক করেছি, শ্যামলীর বাসাতেই চলে যাব।

ওসমান চুপচাপ সবাইকে দেখছিল এবং বলা কথাগুলো শুনছিল। একসময় তার মনে হলো, তার হাতে তিন কোটি টাকা যে এলো না, সে দুঃখ ছাপিয়ে এই অপগণ্ড শালা-সম্বন্ধীগুলোর চোখে জমা অবিশ্বাস্য-হতাশাটা যেন অনেক বেশি আনন্দময় হয়ে উঠল। সে বলল, ডালপুরিটা দারুণ আম্মা। আগে তো কখনো খাইনি? ❖



উপন্যাস

সেলিনা হোসেন

সাতই মার্চের বিকেল

রোকেয়া হলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সাবিহা চারদিকে দৃষ্টি ছড়ায়। প্রতিদিনের দেখা চারপাশের দৃশ্যগুলো বদলে জেগে ওঠে ভিন্ন দৃশ্য। রাস্তার অপর পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলোর দিকে তাকালে ওর মনে হয় নিঃসাড় ভবনের দেয়ালগুলোতে ধ্বনিত হচ্ছে স্লোগানের শব্দ। মনে হচ্ছে ভবনের দেয়ালে মানচিত্র আঁকছে মানুষ। ইংরেজ শাসকরা বিদায় নেওয়ার সময় বদলে গিয়েছিল ভারতবর্ষের মানচিত্র। এখন লক্ষ মানুষের হাতে আঁকা হচ্ছে আরেকটি মানচিত্র।

অলঙ্করণ : : নাজিব তারেক

এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সাবিহার বুকের ভেতর স্তব্ধ হয়ে যায়। ও নিজেও বুঝতে পারে না যে, কেন ওর মাথায় মানচিত্রের ধারণা এলো? পয়লা মার্চ থেকে স্লোগান শুনতে শুনতে ও নিজেও স্লোগানের সঙ্গী হয়েছে। শরীরের যেখানে হাত দেয়, সেখান থেকেই স্লোগানের শব্দ টুং করে ধ্বনিত হয়, এমন চিন্তায় ওর হাত উঠে যায় কপালে। বুঝতে পারে বুকের ভেতর তড়পাচ্ছে শব্দ। ও বিড়বিড় করে বলে, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা। দেশের সবখান থেকে এমন ধ্বনিই কল্লোলিত হচ্ছে। সময় এখন এমনই।

মিছিল করে চলে যাচ্ছে মানুষের স্রোত। ছাত্রছাত্রীরা যেমন আছে, তেমন সাধারণ মানুষও আছে। এটা শুধুই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা নয়, সময় তো বসন্ত বাতাসের, কিন্তু চারদিকে আগুনে উত্তাপ– বাতাস এবং রোদ থেকেও তার বিচ্ছুরণ ঘটছে। ও বাম দিকের রাস্তায় আশরাফকে খোঁজে। গতকাল বিকেলে আশরাফ বলেছে, আমরা দু'জনে একসঙ্গে রেসকোর্স ময়দানে যাব। তুমি হলের সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করো।

সাবিহা ঘড়ির দিকে তাকায়। দেড়টা বাজে। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সে আসবেন তিনটায়। সাবিহা চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে বিকেলটা আজ অন্যরকম। আকাশের ভাষা আছে। রোদের গান আছে। চারপাশের গাছপালায় গুঞ্জন আছে। ও কান পেতে থাকে। বুঝতে পারে চারদিকের সবকিছুর মধ্যে বদলে যাওয়ার পদধ্বনি। গণসঙ্গীতের প্রবল মাতমে যেমন চারদিক মেতে ওঠে, তেমন এক জাগরণের ধ্বনি বাজছে সবদিকে। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে রেসকোর্সের দূরত্ব কয়েক পা মাত্র। একছুটে দম না ফেলে পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। মানুষের স্রোত সেখানে গিয়ে মিশে যাচ্ছে। এই স্রোত ওর প্রিয় নদী বিষখালীর মতো গড়াচ্ছে। ঢাকা এখন নদীর শহর– কল্লোলিত, নির্ঝরিত এবং সমুদ্রগামী। চমকে উঠে নিজের দিকে তাকায় ও।

বাবা এসেছে ওকে বাসে তুলে দেওয়ার জন্য। বাসস্ট্যান্ডের শিরীষ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বাবা বলছে, মাগো মন দিয়ে পড়ালেখা করবি। তুই আমাদের ভরসা। গান গেয়ে সময় নষ্ট করিস না। এত গানপাগল হলে হয়?

ও আস্তে করে নিজেকে বলে, বাবা এখন পড়ালেখার সময় না। অন্যকিছু করতে হবে। আপনি তো পয়লা মার্চে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনেছেন।

গণসঙ্গীতশিল্পী সাবিহা বাবাকে বলেনি যে, এখন গানই শক্তি। পড়ালেখা পরে হবে বাজান। আমি এখন গান করব। দেশের গান, মানুষের গান।

সাত দিন আগে বাবা ওকে বিদায় দিতে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়েছিল। এখন সামনে নেই। সামনে আছে ওর গ্রাম, নদী, ঘরবাড়ি, মা, মায়ের চোখের পানি। হাসনা আর ডমরুর হাসিমুখ। সহজে বিদায় দিয়েছিল সবাই। তিন দিনের জন্য বাড়ি গিয়েছিল ও। হাসনার টাইফয়েড হয়েছে শুনে ছুটে গিয়েছিল বাড়িতে। ও এখন ভালো আছে। বাড়ির সবাই ভালো আছে। ও বাবার পায়ে সালাম করে বলেছিল, আমার জন্য দোয়া করবেন বাজান।

মাগো তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে।

আপনার চারপাশে যারা আছে–

এইসব কথা থাক। বাস আসছে উঠে যা।

সাবিহা বাসে উঠলে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাবার হাত ধরে। বলে, বাজান বাড়ি যান। যাওয়ার পথে বোয়াল মাছ কিনবেন। ডমরু বোয়াল মাছ ভালোবাসে।

তুই সবার কথা মনে রাখিস রে মা।

সাবিহা মৃদু হাসে। বাবা ওকে কখনও তুমি করে কথা বলে, কখনও তুই। ওর ভালোই লাগে। গ্রামের অন্য দশটা মেয়ের মতো বাবা ওকে অল্প বয়সে বিয়ে দেয়নি। ঘরে ঢুকিয়ে বলেনি, আর পড়ালেখা না। বিয়ের বয়স হয়েছে। বরং ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট ডিভিশন পেলে খুশি হয়ে বলেছিল, তোকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াব। ভর্তি পরীক্ষার জন্য তৈরি হও। সেদিন ওর মনে হয়েছিল বাবা আকাশ সমান মাথা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ও বুঝেছিল লেখাপড়া শেষ করার স্বপ্ন ও পূরণ করতে পারবে। বাস ছেড়ে দিলে বাবার মুঠি থেকে ওর হাতটা বেরিয়ে এসেছিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছিল বাবা দাঁড়িয়ে আছে। বাসের চাকার ধুলোয় ধোঁয়াশা হয়ে গিয়েছিল ওর বাবার চারপাশ। তারপরও বাবাকে ছায়ার মতো একজন বিশাল মানুষই মনে হচ্ছে ওর। দ্রুতগামী বাসের পেছনে সে ছায়া একসময় মিলিয়ে যায়। ও জানালার দিকে কপাল রেখে নিজেকে একজন সুখী মেয়ে ভাবে এই জন্য যে, বাবার বিশাল ছায়া ওর মাথার ওপরে আছে। ও ভাগ্যবতী মেয়ে। এখন দরকার নিজের পথটা খুঁজে নেওয়া। ওকে যেতে হবে অনেক দূর।

ও আঁচলের কোনা দিয়ে কপালে জমে থাকা ঘামের ফোঁটা আলতো করে মুছে ফেলে। নিজেকেই বলে, বসন্তের বিকেল শুধু প্রেমের নয়, আগুনেরও। আগুন জ্বলেছিল বায়ান্নর ফাল্গুনে। ফুলের রঙে আগুন দিয়েছিল আশ্চর্য ছোঁয়া। সেই রঙে ভরে গিয়েছিল দেশ। সাবিহা চারদিকে তাকায়। সামনে আরেকটি কঠিন সময়। শুরু হয়েছে সে সময়ের পদধ্বনি। স্রোতের মতো মানুষ যাচ্ছে রেসকোর্স ময়দানের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের কাছের বইয়ের দোকানগুলো বন্ধ। প্রায়ই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বই খোঁজে ও। পড়ার পাশাপাশি বই খোঁজাও ওর নেশা। দোকানি ছেলেটি মাঝে মধ্যে বলে, আপনার মতো এত বই কেউ খোঁজে না।

সাবিহা মৃদু হেসে বলে, বই শুধু খুঁজি না। কিনি এবং পড়ি।

হে... হে... করে হেসে বলেছিল, তা তো জানি। যেদিন আশরাফ ভাই আপনার সঙ্গে আসে সেদিন আপনাদের কথা আমি বুঝতে পারি। আপনি একা এলে আমার বেশি ভালো লাগে না। মজা পাই না।

ওরে ছেলে, তোর আবার ভালোমন্দ।

এ মুহূর্তে সাবিহার মনে হয় ছেলেটি এতক্ষণে রেসকোর্স ময়দানে ঢুকে গেছে। নইলে ওকে দেখলে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলতো, আপা যাবেন না? নাকি আজ কেউ কাউকে যাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করবে না? হ্যাঁ, তাই। যে যার মতো যাচ্ছে রেসকোর্স ময়দানে। বাঁয়ে তাকালে সাবিহা দেখতে পায় 'জয় বাংলা' লেখা একটি প্ল্যাকার্ড মাথার উপরে তুলে ধরে আশরাফ দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। দূর থেকে দেখা আশরাফ আজ অন্যরকম। যেন রেসকোর্স ময়দান নয়, ওর সামনে আজ লড়াইয়ের ময়দান। সাবিহা মৃদু হেসে হাত উঁচু করে। নিজেকেই বলে, এ বসন্ত প্রেমের নয়, এ বসন্ত আগুনের। আজকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার আগ পর্যন্ত এই একটি কথা ও বারবারই বলবে। বসন্ত ঋতু ওদের জীবনে আগুন ছড়ায়। সে আগুনে আশ্চর্য ফুল ফোটে। তেমন একটি ফুল হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে আশরাফ। সাবিহা বুঝতে পারে ওর নিজের ভেতরে ভালোবাসার যে ফুলটি আছে, সেটাও আজকে আগুনে ফুল। ও রেসকোর্স ময়দানের দিকে পা বাড়ানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ও নিজেও দু'পা এগিয়ে আশরাফের কাছে যায়। মুখোমুখি দাঁড়ায়।

আশরাফ হাতের প্ল্যাকার্ড সাবিহার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এটাই তোমার জন্য আমার গোলাপ।

প্ল্যাকার্ডটি হাতে নিয়ে সাবিহা বলে, জয় বাংলা।

জয় বাংলা। আশরাফের কণ্ঠে শব্দের ফুল ফোটে।

সাবিহা মুগ্ধ হয়ে বলে, খুব সুন্দর করে বললে। চলো, এগোই।

আমরা কি মানুষের স্রোতের শেষ মানুষ হবো।

মোটেই না। সাবিহা দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, স্লোগান দাও।

না, আমি আলাদাভাবে দেব না। যে স্লোগানটা হচ্ছে তার সঙ্গে আমরা গলা মেলাব।

সাবিহা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে স্লোগানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে।

দু'জনে রেসকোর্স ময়দানে ঢুকলে বিপুল জনসমাগম সাবিহাকে শিহরিত করে।

আশরাফ এত মানুষ!

হবেই তো। মানুষ আজ বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে দিকনির্দেশনা শুনতে জড়ো হয়েছে। দেখছ না কেমন গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

এক তারিখের পর থেকে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। মঞ্চে বঙ্গবন্ধুকে দেখলে আমার মনে হবে তিনি আমাদের মহাত্মা গান্ধী।

আশরাফ নিঃশব্দে ওর হাতে চাপ দিয়ে বলে, খুব ভালো বলেছ। আমি এমন ভাবিনি। আমি ভাবি তিনি আমাদের মার্টিন লুথার কিং। আজ তিনি আমাদের বলবেন না, আই হ্যাভ আ ড্রিম। তিনি বলবেন উই হ্যাভ আ ড্রিম।

শব্দ করে হাসে সাবিহা।

হ্যাঁ, তিনি উই বলবেন, আই বলবেন না। তিনি আমাদের লোক। তিনি আমির বাইরের মানুষ।

আশরাফ মৃদু হেসে বলে, চলো স্লোগান দেই, প্রিয় নেতা উই হ্যাভ আ ড্রিম। আপনার দেখানো স্বপ্ন নিয়ে আমরা জীবন বাজি রেখে লড়াইয়ের মুখোমুখি।

আশরাফ, আমরা জনতার মাঝে না ঢুকে চলো ওই পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তারকাঁটার বেড়াটার কাছে। আমাদের উল্টো দিকে আর্ট কলেজ। মনে হচ্ছে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসানও।

সাবিহা, এসো। তারকাঁটার বেড়ার ওদিকটা এখনও ফাঁকা আছে।

দু'জনে পা বাড়ায় সেদিকে। দেখতে পায় অনেক জায়গায় তারকাঁটা উপড়ে ফেলেছে লোকেরা। কোথাও মাঝখানে বড় ফাঁক করে যাওয়া-আসার রাস্তা বানিয়েছে। কোথাও খুলে একপাশে জড়ো করে রেখেছে। দু'জনে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ায়।

মুহুর্মুহু স্লোগান মুখরিত ময়দান। মাইকে ভেসে আসছে স্লোগানের তরঙ্গ। দু'জনে কখনও স্লোগান প্রতিধ্বনিত করে। কখনও নিজেরা কথা বলে। নেতৃত্বের মানুষটিকে নিয়ে নিজেদের স্বপ্নের কথা।

কখন আসবেন বঙ্গবন্ধু? কী বলবেন তিনি?

কী বলবেন তা শোনার অপেক্ষায় আমাদের সময় সোনালি হয়ে উঠেছে। সাবিহা আকাশের দিকে তাকাও।

এমন আকাশ আমি আগে দেখিনি। আকাশের এমন রঙ হতে পারে তা আমার স্বপ্নেরও অতীত।

যেদিন তাঁকে বঙ্গবন্ধু খেতাব দেওয়া হলো সেদিনও আমরা এখানে ছিলাম।

তার ক'দিন আগেই আমরা প্রেমের সিদ্ধান্তে এক হয়ে গিয়েছিলাম।

যেদিন আসাদের মৃত্যু হলো সেদিন আমরা ভালোবাসার কথা বলেছিলাম।

আমাদের প্রেম রক্ত ও মৃত্যুর। আমাদের প্রেম উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ের।

আহ আমরা দেশ-জাতির সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তি সম্পর্ক এক করেছি।

বুড়োকালে এটা আমাদের প্রিয় স্মৃতি হবে।

আমি অনেক দিন বাঁচতে চাই আশরাফ।

আমিও চাই। নাতি-নাতনিদের প্রাণ ভরিয়ে এই সময়ের গল্প বলব।

ওরা শুনবে তো?

আশরাফ হাত উল্টিয়ে বলে, কে জানে।

আমাদের সময় ওদের অতীত।

সাবিহা ডান হাত দিয়ে আশরাফের বাম হাতে মৃদু চাপ দেয়। দু'জনের এখন চুপ করে থাকার সময়। লোকেলোকারণ্য হয়ে গেছে রেসকোর্স। ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অনেকে। মঞ্চের সামনে বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করা জায়গা নারীদের বসার জন্য রাখা হয়েছে। সে জায়গাও ভরে গেছে।

তখন মাইকে প্রবল স্লোগান শুরু হয়েছে– তোমার নেতা আমার নেতা/শেখ মুজিব শেখ মুজিব/জয় বাংলা।

করতালিতে মুখরিত চারদিক– নেতা এসেছেন নেতা এসেছেন।

লক্ষ কণ্ঠের উচ্চারণে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত রেসকোর্স ময়দান। যেন জনসমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠেছে, প্লাবিত হবে পুরো দেশ। এক নতুন বঙ্গোপসাগর তৈরি করেছে দেশবাসী। মুহূর্তের অপেক্ষা মাত্র– শুধু তিনি একবার বলবেন, হও। তরঙ্গায়িত হয়ে যাবে পুরো দেশ। একবার বলবেন, দাঁড়াও। তরঙ্গায়িত হবে জনসমুদ্র। তারই কল্লোল ধ্বনি আছড়ে পড়ছে। এমন উন্মুখ প্রতীক্ষা মানুষের জীবনে একবারই আসে। আশরাফের বাম হাত মুঠিতে ধরে সাবিহা বলে, শুনতে পাচ্ছ?

নেতার পদধ্বনি?

হ্যাঁ, মাঠজুড়ে সে ধ্বনির গতি ঢুকে যাচ্ছে মাটির ভেতরে। আমার সামনে জেগে উঠছে নতুন স্বদেশ। আমি নিজের ভেতর গতি অনুভব করছি।

আমিও। মনে হচ্ছে, আমাদের সামনে স্বাধীনতার যুদ্ধ।

ঠিক বলেছ, যুদ্ধ। যুদ্ধ। সাবিহা দাঁত কিড়মিড় করে শক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে।

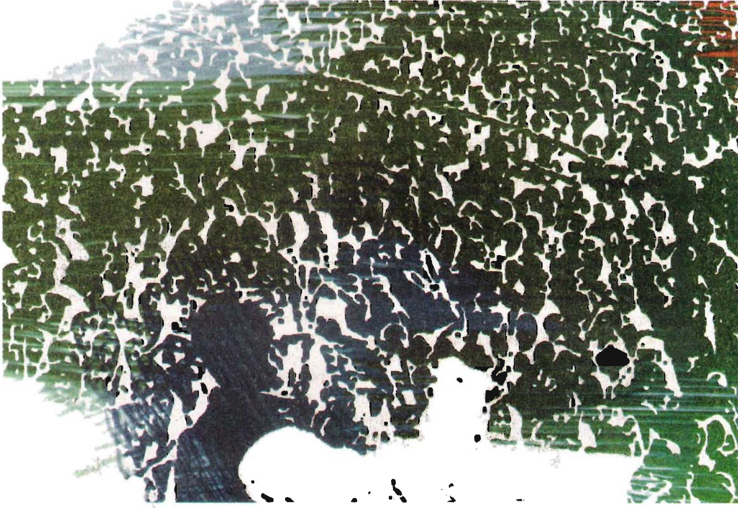
পাশে দাঁড়ানো কেউ একজন বলে, আপনারা ঠিকই বলেছেন। যুদ্ধ। তিনি গলা উঁচু করেই বলেন, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো। বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

সাবিহা হাতের মুঠি উঁচু করে বলে, স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ আমাদের সামনে নেই।

চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই বলে, ঠিক, ঠিক।

সাবিহা বিভিন্ন জনের মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে সাতই মার্চের বিকেল সবাইকে এক করেছে। এখানে কেউ ব্যক্তি নয়। আজ সবাই সমষ্টি। কেউ একা নয়। সবার সঙ্গে আছে লক্ষ মানুষ। প্রত্যেক মানুষ একই জায়গায় জড়ো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এখন এক সম্মিলিত শক্তির মহাসমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে সম্ভাষণ করেন, ভায়েরা আমার! উচ্চারিত হয় প্রিয় সম্ভাষণ।

সাবিহার মাথায় ঘূর্ণি জাগে। নিজেকেই বলে, এই একটি সম্বোধনে তিনি নারী-পুরুষকে এক জায়গায় দাঁড় করালেন। আবার সবাই এক হলো। স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকরা নারী বা পুরুষ নয়। তারা সবাই অমিত যোদ্ধা।



সাবিহা নিজের ভেতরে প্রাণবন্ত চঞ্চলতা অনুভব করে। মনে হয় পুরো রেসকোর্স আজ ওর হাতের মুঠোয়। মুঠো ভরা হাত নিয়েও হেঁটে যেতে পারবে পথে পথে। পথের শেষে পৌঁছাতে ওর ভুল হবে না। ও খুশি মনে কান পেতে ভাষণ শোনে। আশরাফ ওর দিকে তাকিয়ে বলে, নিমগ্ন হয়ে ভাষণটি শোন। প্রতিটি শব্দের অর্থ আমাদের বুঝতে হবে।

সাবিহা মুখে কিছু বলে না। শুধু ঘাড় নাড়ে। ওর মনোযোগ মঞ্চের দিকে। দূর থেকেই দেখতে পায় আকাশ সমান হয়ে উঠেছে নেতার মাথা। পডিয়ামের ওপর রাখা আছে তাঁর কালো রঙের চশমা। ভেসে আসে কণ্ঠস্বর– 'বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।'

দু'হাত বুকের ওপর চেপে ধরে আশরাফ। মনে হচ্ছে ওর সামনে খুলে যাচ্ছে অধিকার আদায়ের লৌহজগতের দরজা। রেসকোর্স মাঠের লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই দরজা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। এত বড় একটি জনসভার আশ্চর্য শৃঙ্খলার সঙ্গে বসে আছে মানুষ। গভীর নিস্তব্ধতায় তাঁর বজ্রকণ্ঠ আজ হ্যামিলনের বাঁশি। প্রতিটি মানুষের নিঃশ্বাস, দৃষ্টি এবং চোখভরা-বুকভরা স্বপ্ন তাঁকে অনুসরণ করছে। চলে যাচ্ছে স্রোতের টানে। তাঁর মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ। তিনি জাদুকরী বাঁশিতে এই সময়ের বাঁশিওয়ালা। ভরে উঠেছে সাতই মার্চের বিকেলে। ভরে উঠেছে রমনার রেসকোর্সের মাঠ। সাবিহার দিকে তাকিয়ে আশরাফ বলে, মনে রেখো এ আমাদের জীবনের এক শ্রেষ্ঠ বিকেল। যারা এ বিকেলে এখানে নেই তাদের বুকে জেগে থাকবে উপস্থিত হতে না পারার কষ্ট।

আমিও তাই মনে করি। সাবিহা মাথা ঝাঁকায়।

তখন ওদের ভেতরে ঢুকতে থাকে শব্দরাজি– 'কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, তেইশ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস।'

আশরাফের মনে হয় দু'কান ভরে ভাষণ শোনারত মানুষের দাঁত কিড়মিড় করে উঠেছে। রমনা রেসকোর্স ভরে উঠেছে ধিক্কার ও হুঙ্কারে। অদৃশ্য বাতাসের শব্দে সে হুঙ্কার-ধ্বনি মিশে ছড়াতে থাকে দেশের সর্বত্র।

আশরাফ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে, এই বিকেলে রমনার রেসকোর্স পুরো বাংলাদেশ। মানুষ ঘর ছেড়ে এসে জড়ো হয়েছে এই মাঠে।

একজন বলে, আমরা সবাই বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের সঙ্গে যোগ করেছি আমাদের নিঃশ্বাস।

আরেকজন যোগ করে, এখনই সময় ক্রোধে জেগে ওঠার।

আরেকজন দু'হাত উপরে তুলে বলে, এখনই সময় প্রতিরোধের শক্তিতে এক হওয়ার।

আপনারা থামুন।

পেছন থেকে কেউ একজন ধমক দেয়।

আশরাফ নিজেকেই বলে, আমার মনে হচ্ছে আমরা এখন বাংলার মানুষের পাশাপাশি সাগর ও নদীকে বয়ে যেতে দেখছি এই মাঠে। সাবিহা কি আমার মতোই ভাবছে?

সাবিহাও নিজেকে বলে, আমাদের ক্রোধ ছড়াচ্ছে নদীর স্রোতে। বঙ্গবন্ধুর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ এক একজন মানুষের সারা জীবন। আজ বাবা কাছে থাকলে আমি বাবাকে একথা বলতাম। একথা শুনে বাবা আমার মাথায় হাত রাখতেন। আর মা বলতেন, আমাদের ঘরে এই মেয়েটা



কেমন করে হলো, যার মাথায় এত বুদ্ধি।

মায়ের কথা মনে করে সাবিহা মৃদু হাসিতে নিজেকে উদ্ভাসিত করে। মা ওকে প্রায়ই এমন কথা বলে। ঢাকায় আসার সময় একটি কথাই বলে, ভালো করে লেখাপড়া করবি মা। গান-বাজনা কম করবি। আগে পরীক্ষায় পাস। আমরা অনেক কষ্ট করে তোকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি।

এসব তো আমি জানি মা। তারপরও নিজের চিন্তার জায়গাজমিন তো রাখতে হয়। নইলে আমরা রাস্তার ধারের ভিক্ষুক হব। যার সাধনা নাই, স্বপ্ন নাই।

এসব কথা শুনে মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কপালের ঘাম মুছে মাথা নেড়ে বলে, তোর কথা বুঝি না।

থাক, বুঝতে হবে না।

মুহূর্তে সাবিহার চেতনায় ফিরে আসে রেসকোর্স মাঠ। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে চারদিক মুখরিত– 'বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছিল।

উফ, সাবিহা দু'হাতে মাথা চেপে ধরে। ওর ভেতরে প্রবল দহন, যেন ইতিহাসের রক্ত ওর ভেতরে নদীর মতো গড়াচ্ছে।

আশরাফ মৃদু স্বরে বলে, কী হলো?

এই ইতিহাস মেনে নেওয়া কঠিন।

দু'জনে আবার স্থির হয়ে বসে। ভেসে আসে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর– ১৯৬৬ সালে ৬ দফার আন্দোলনে, সাতই জুনে আমার ছেলেদের হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সরকার নিলেন তখন তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়; পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম পনেরোই ফেব্রুয়ারি আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না। তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব।

সাবিহা আশরাফের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কিছু বলতে চাইলে আমাকে?

শুনলে বঙ্গবন্ধু কী বললেন?

পুরোটাই শুনেছি। মাথার সব জায়গায় টুকে রাখছি প্রতিটি শব্দ আর বাক্য। তুমি কী বলতে চাইছ?

একটি গভীর ও বিশাল নির্দেশনা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির–

বুঝেছি, বুঝেছি– উত্তেজিত শোনায় সাবিহার কণ্ঠস্বর। বঙ্গবন্ধু বাংলা বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তান বলেননি। এই দেশ তাঁর কাছে পূর্ববাংলা।

সাবিহা দু'হাত জড়ো করে তালি বাজায়। আশপাশে বসে থাকা অন্যরাও মৃদুভাবে নিজেদের হাত যুক্ত করে।

সবাই উচ্ছ্বসিত। মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তোলে।

একজন বলে, তাঁর ভদ্রতা সীমাহীন। তিনি এখন পর্যন্ত ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোকে তুচ্ছ করে কথা বলেননি।

অন্যজন, ঠিক। তাঁদের নামের সঙ্গে সাহেব বলেছেন।

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেননি। তারা যেই ব্যবহার করছে ওনার সঙ্গে দু'চারটি গালির শব্দ ব্যবহার করলে ক্ষতি ছিল না।

আর একজন বলে, তিনি একজন অসাধারণ মানুষ। এই সৌজন্য দেখানোও আমাদের জন্য শিক্ষা। আমরা আজকে থেকে এই শিক্ষার কথা মনে রাখব।

মুহূর্ত সময় মাত্র। রেসকোর্সের লক্ষ মানুষের মাথার উপর উড়ে আসে পাকিস্তান এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টার। শব্দ আসছে উপর থেকে। তাতে কিছু আসে যায় না। লক্ষ মানুষ হেলিকপ্টারের উপস্থিতি গ্রাহ্যই করে না। লক্ষ মানুষের ওপর নজরদারি করার অশুভ তৎপরতা মানুষ উপেক্ষা করে। উল্টো গভীর মনোযোগে নিজেদের চেতনায় প্রবেশ ঘটায়, নেতার বজ্র কণ্ঠস্বর, প্রতিটি শব্দ প্রবল অর্থবহ বাঙ্ময় সচেতনতায় প্রবেশ করছে কোটি মানুষের করোটিতে।

ফিরে যায় হেলিকপ্টার। মানুষ ভ্রূক্ষেপ করে না। প্রত্যেকে অনুভব করে মাথার উপরে নীল আকাশ। বঙ্গবন্ধুর তর্জনী তোলার সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে আসে আকাশ। যেন অবিশ্বাস্য বাংলাদেশের সাতই মার্চের বিকেলের দৃশ্য নিজের ভেতরে গ্রহণ করার ব্যাকুলতা থেকে এই নত হওয়া। যেন বজ্র কণ্ঠস্বরের মানুষটির তর্জনী ছুঁয়ে দেখার বাসনা থেকে এভাবে নত হওয়া।

তখন আবার কণ্ঠস্বরের স্রোত প্রবাহিত হয়– 'আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব, এমনকি আমি এও পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও, একজন যদিও হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব। জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন, বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরও আলোচনা হবে। তার পরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, ওদের সঙ্গে আলাপ করলাম : আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে, তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে।'

গুঞ্জন ওঠে চারদিকে। ক্রোধের গুঞ্জনে ভরে যায় মাঠ। আশরাফ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, শুনলে ভুট্টো শুয়োরের বাচ্চার কথা।

তুমি মুখ খারাপ করছো কেন? শুনলে না বঙ্গবন্ধু–

শুনেছি। কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখতে পারলাম না সাবিহা।

আশরাফ উপরের দিকে তাকায়, যেন সাবিহা নামের কাউকে ও চেনে না। ওর এখন ক্রুদ্ধ হওয়ার সময়। ক্রোধ ওকে নিয়ে যাবে সামনের দিকে, যত দিন না বাংলার মানুষের অধিকার অর্জিত হবে।

পাশ থেকে একজন বলে, ভুট্টোর কথা বঙ্গবন্ধু যা বললেন, তা শুনে আমার শরীরও চিড়বিড় করছে। মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছে।

সাবিহা সেই লোকের দিকে তাকিয়ে বলে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে আমরা নতুন সাহস আর শপথ নিয়ে এই মাঠ ছাড়ব। তারপর লড়াই।

ভেসে আসে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর, 'তারপর হঠাৎ এক তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসেন। তার পরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল। আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।'

পয়লা মার্চের দুপুরের স্টেডিয়ামের দৃশ্য ভেসে ওঠে আশরাফের চোখের সামনে। প্রবল উত্তেজনায় স্টেডিয়াম থেকে রাজপথে বেরিয়ে পড়েছিল ক্রিকেট খেলার দর্শকরা! সেদিন ও নিজেও সেই দর্শকদের স্রোতে ছিল। ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য গিয়েছিল স্টেডিয়ামে। উত্তর দিকের গ্যালারিতে ছিল নয়ন, বাদল, টুটুলসহ আরও কেউ কেউ।

খেলা হচ্ছিল পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও কমনওয়েলথ একাদশের মধ্যে। স্টেডিয়ামে দর্শকের অভাব ছিল না। ক্রিকেট খেলার জন্য টান ছিল শহরের সব ধরনের লোকের। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় মুহূর্তে বদলে গেল স্টেডিয়ামের দৃশ্য। মানুষ রাগে ফেটে পড়ল। খেলোয়াড়রা দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল। স্রোতের মতো মানুষ বের হতে লাগলো স্টেডিয়ামের ভেতর থেকে। যাচ্ছে পূর্বাণী হোটেলের দিকে। সেই দুপুর বেলা বুকের মধ্যে গেঁথে আজ ও এসেছে রেসকোর্স ময়দানে। এই বিকেল বুকের মধ্যে গেঁথে ওকে যেতে হবে দীর্ঘ পথ। ভাবতেই ওর শরীরে ঝাঁকুনি লাগে।

সাবিহা মৃদুস্বরে বলে, কী হলো তোমার?

প্রস্তুতি শেষ করলাম।

কিসের প্রস্তুতি?

যাত্রা শুরু করার।

বুঝতে পারলাম না।

শোনো বক্তৃতা।

বক্তৃতা নয়, শপথ।

ভেসে আসে বজ্রস্বর : 'কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী আর্তমানুষের মধ্যে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

দাঁত কিড়মিড় করে সাবিহা। মুখ ঘুরিয়ে বলে, ঝাঁপিয়ে পড়ার দিন আমাদের এসেছে।

ঠিকই বলেছ। এবার আমরা ওদেরকে বুঝিয়ে ছাড়ব।

সাবিহা বেশ জোরেই আশরাফের মুঠোতে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে।

ভেসে আসে কণ্ঠস্বর 'টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে। কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, দশ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলেছি, কিসের আর. টি. সি.? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর

দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।'

পাশ থেকে একজন বলে, নেতা কখন স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন?

আহ! থামেন। বেশি কথা বলবেন না।

নেতা ঠিকই সময়মতো স্বাধীনতার কথা বলবেন।

সাবিহা অনুচ্চস্বরে বলে, তিনি অনেক কথার মাঝে স্বাধীনতার কথাও বলছেন। আমাদেরকে তা বুঝে নিতে হবে। আশরাফ বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমার বাংলার মানুষের উপরে গুলি করা হয়েছে। ... আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে... সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন। বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।' দেশ আর মানুষই আজকের এই বিকেলের সবচেয়ে বড় কথা। আমি শিহরিত হচ্ছি এটা ভেবে যে, তিনি দেশ ও মানুষকে এক কাতারে রেখে মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। রেসকোর্সের আজকের বিকেল স্বাধীনতার গুঞ্জরণে মুখরিত। সবাইকে বুঝে নিতে হবে এই কথা। ঠিক বলেছি আশরাফ?

একদম ঠিক। পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে এখনও আমরা আছি। নেতাকে বুঝেসুঝে এগোতে হবে।

এবং তিনি তাই করছেন।

আমরাও তাই মনে করছি।

আশপাশের কয়েকজন আশরাফের সঙ্গে হাত মেলায়।

সবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বিজয়ের আনন্দ নিয়ে ঘরে ফেরার হাসি।

সাবিহা সবার দিকে তাকিয়ে ভাবে– এই সময়ই হবে আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। আমরা এক শ্রেষ্ঠ সময়ের মানুষ। আজকের বিকেল আমাদের স্বপ্নকে গাঢ় করার জন্য আকাশে রঙ জড়িয়েছে। তুলোর মতো সাদা ধবধবে মেঘরাজি জড়ো করেছে। পাখিদের কোলাহল সেতারের সঙ্গে এক করে বাজানো হচ্ছে। হাজার হাজার ফুলের অপরূপ পাপড়ি ঝরে পড়ছে রেসকোর্সে উন্মুখ হয়ে বসে থাকা মানুষের মাথার ওপরে। মঞ্চ ভরে আছে এক সমুদ্র পাপড়িতে। বঙ্গবন্ধু ডুবে আছেন ফুলের সৌরভে। তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সে সৌরভ মিশে উড়ে যাচ্ছে দেশের সব প্রান্তে। প্রতিটি মানুষের বুকের ভেতর জমে রয়েছে স্বাধীনতার ঘ্রাণ। প্রবলভাবে শ্বাস টেনে মানুষ সেই ঘ্রাণ টেনে নিচ্ছে বুকের ভেতরে।

আবার গমগম করে বাজতে থাকে ভাষণের শব্দরাজি : 'পঁচিশ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি দশ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।'

ওয়াও–

সাবিহা মুখে শব্দ করে।

বঙ্গবন্ধু দারুণ শর্ত দিয়েছেন।

আশরাফ দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তোলে।

এই শর্ত না মানলে আমরা ঘরে ফিরব না।

শহরের রাস্তা দখল করে রাখব।

আমাদের বায়ু আমাদের নিঃশ্বাসে ঢুকবে।

ওরা এ দেশের বায়ু বুকে টানতে পারবে না।

ঠিক, ঠিক– এর আগে–

মৃদু গুঞ্জনে চারপাশ উল্লসিত হয়।

বেটারা এবার বুঝবে কত ধানে কত চাল।

কেউ কেউ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে চায়। অন্যরা ওদের হাত ধরে টেনে বসায়।

মাইকে ভেসে আসে ছাত্রনেতার কণ্ঠে স্লোগান– বঙ্গবন্ধু এগিয়ে চলো/আমরা আছি তোমার সাথে/বঙ্গবন্ধু এগিয়ে চলো/আমরা আছি তোমার সাথে/বঙ্গবন্ধু ...

ভেসে আসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ 'আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।'

আবার ভেসে আসে স্লোগান–

সব কথার শেষ কথা/বাংলাদেশের স্বাধীনতা

সব কথার শেষ কথা/বাংলাদেশের স্বাধীনতা

রেসকোর্সে উপস্থিত জনতার সমবেত কণ্ঠে স্লোগান ধ্বনিত হয়– সব কথার শেষ কথা/বাংলাদেশের স্বাধীনতা/পিন্ডি না ঢাকা/ঢাকা ঢাকা।

আশরাফের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সাবিহা বলে, বঙ্গবন্ধু কিন্তু এই বাংলাদেশে বলেছেন। এই পূর্ব পাকিস্তানে বলেননি।

ঠিক। দেশের নতুন নাম বলেছেন। স্বাধীনতা ঘোষণার আর বাকি থাকল কী!

সাবিহা উত্তেজনায় বলতে থাকে, স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশ।

আশরাফ দম আটকে রাখা উত্তেজনায় নিজেকে বলে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে একটি দীর্ঘ চুমুতে ভরিয়ে দিই প্রিয়ে। তুমি বঙ্গবন্ধুর চেতনায় ভরিয়ে দিয়েছ আমাকে।

সবার অলক্ষ্যে ও সাবিহার ডান হাত নিজের মুঠিতে চেপে রাখে।

শুরু হয় ভাষণ– 'গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে, শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা– কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।'

হুররে। পাকিস্তানিদের নাকের ডগায় প্রচারিত এই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। হুররে। তিনি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো বললেন, আটাশ তারিখে বেতন নিয়ে আসতে। হুররে। এখন যুদ্ধ।

সাবিহা হাসি মুখে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি তো যুদ্ধের জন্য রেডি আশরাফ?

একশ'বার।

আমিও যুদ্ধ করব।

আমরা এক সঙ্গে।

এক সঙ্গে হবে না।

কেন?

তোমার ফ্রন্ট আলাদা হবে, আমার ফ্রন্ট আলাদা।

এক সঙ্গে হতে সমস্যা কী?

এ সিদ্ধান্ত আমরা পরে নেব।

ভেসে আসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ– 'এরপরে যদি বেতন

দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল : প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।'

হুররে। যুদ্ধ যুদ্ধ।

আশরাফের কণ্ঠস্বর ঢেকে যায় গগনবিদারী স্লোগানের তীব্রতায়– বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

পদ্মা মেঘা যমুনা/তোমার আমার ঠিকানা/বীর বাঙালি অস্ত্র ...

সাতই মার্চের রেসকোর্স ময়দানের এই বিকেল সাবিহার সামনে পৃথিবীর সবক'টি সপ্তম আশ্চর্যের দরজা খুলে দেয়। আমার শরীরে শক্তির দ্বিগুণ জোয়ার এসেছে। আমি আজকের এই বিকেলের, সাক্ষী। এই বিকেল পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য।

অষ্টম আশ্চর্য হওয়ার মতো কাঠামো এখানে নেই।

আছে। বঙ্গবন্ধুর দাঁড়িয়ে থাকার ঋজু ভঙ্গি একটি বিশাল কাঠামো। আর লক্ষ লক্ষ মানুষের কালো মাথা আরেকটি কাঠামো। পডিয়ামের উপরে রাখা বঙ্গবন্ধুর চশমা একটি বিপুল আকারের কাঠামো। কলরেডি দোকানের মাইক্রোফোন আরেকটি কাঠামো। আর পুরো মঞ্চটির আয়তন পৃথিবীর সবটুকু জমিনের সমান। একে শুধু কাঠামো বলা যাবে না।

বুঝেছি।

দু'জনেই মনে করে খুনসুটি করার সময় এই বিকেল নয়।



মনে হয়, চারদিকে তোলপাড় করে ইতিহাসের নানা কিছু ওর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। যে অতীত ওর দেখা হয় না, সে অতীতের বাস্তব দৃশ্য ওর সামনে ফুটে উঠেছে আজকের বিকেলে। মঞ্চে আকাশ সমান মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের সব নেতাকে ছুঁয়ে আছেন। তাঁর দীর্ঘ দেহ, অসাধারণ সুন্দর কান্তি, দিগন্তজোড়া ব্যাপ্ত কণ্ঠস্বর আজকের বিকেলকে আশ্চর্য বিকেল করেছে। ইতিহাসের অমর দিন আজকের এই বিকেল।

তিনি ডাক দিয়েছেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার জন্য। বলেছেন যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য।

হা-হা-হা। বাতাসে মিশে যায় সিদ্ধান্ত। বাতাস পৌঁছে যায় ঘরে ঘরে। বাতাস বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে উড়ে যায় পৃথিবীর সব দেশে। হা-হা-হা। এরপর শুরু হবে নতুন দিন।

তোমাকে খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছে সাবিহা?

এই বিকেলকে বুঝতে হবে দেশপ্রেমের আলোয়। স্বাধীনতার স্বপ্নে। যুদ্ধের জন্য জীবন বাজি রেখে।

ভেসে আসে স্লোগান : জাগো জাগো বাঙালি জাগো। জয় বাংলা।

রেসকোর্সের প্রত্যেক মানুষ হাত তুলে স্লোগান দেয়, জয় বাংলা।

সাবিহা বুঝতে পারে আশরাফের কণ্ঠস্বর যে কোনো দিনের চেয়ে অনেক বেশি গগনবিদারী। যেন ও একাই সমবেত মানুষের সম্মিলিত এক বিন্দু। ওর কণ্ঠস্বর অমিত শক্তির বিস্ময়কর দ্যোতনা।

সাবিহা শিউরে ওঠে। বুঝে যায়, রেসকোর্স ময়দানের প্রত্যেক মানুষ এই শক্তি নিয়ে জয়বাংলা বলছে। প্রতিটি স্লোগানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে। শুধু একক মানুষ যিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরো জাতিকে এক করেছেন তার ভাষণের সময় স্তব্ধ হয়ে যায় রমনার প্রান্তর। শুধু কান দিয়ে নয় সবাই ভাষণ

শোনে হৃদয় দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, মেধা দিয়ে। প্রত্যেকে নিজ নিজ করোটি পূর্ণ করছে ভাষণের প্রতিটি শব্দ দিয়ে।

বজ্রকণ্ঠ আবার প্লাবিত করে রেসকোর্স ময়দান– 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই– তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখবার পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।'

আবার মাঠজুড়ে পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে আসে। সাত কোটি মানুষের আর দাবায়ে রাখবার পারবা না– কণ্ঠস্বরের অমিত তেজ উড়তে থাকে মানুষের মাথার উপরে। দাবায়ে রাখবার পারবা না– দেশের সাত কোটি মানুষের প্রাণস্পন্দন। আঞ্চলিক উচ্চারণে নেতা তার বুকের ভেতরে টেনে নিয়েছেন তার প্রিয় দুঃখী মানুষকে। সবাই তার আপন। সবার সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক। তিনি ডেকে বলছেন, চলো আমরা স্বাধীন দেশ গড়ি। মানুষেরা বলছে, আমরা যেতে তৈরি। আপনি আমাদের মাথার উপরে থাকুন।

আশরাফ তীব্র কণ্ঠে বলে, শুনলে?

শুনেছি।

কী বুঝলে? তোমার ব্যাখ্যা কী?

বোঝা আমার হয়ে গেছে আশরাফ। ভেবে দেখ পাকিস্তান সেনাবাহিনী রমনা রেসকোর্স ঘিরে রেখেছে অস্ত্র নিয়ে। মাথার উপর উড়িয়েছে হেলিকপ্টার। জানান দিয়েছে এই বলে যে, বেশি বাড়াবাড়ি করো না। আমরা আছি।

সাবিহা থামলে আশরাফ বলে, আমারও তাই ধারণা।

এর বিপরীতে আমরা সবাই এখানে নিরস্ত্র জনগণ।

নেতাও নিরস্ত্র। তার পরও তিনি ওদের মুখের ওপর কথা বলছেন। ওদের সাহস নাই এর প্রতিবাদ করার।

পাশের একজন বলে, আমিও মনে করি ভাতে মারব, পানিতে মারব– তিনি বললেন এই চিন্তায় যে, তাঁর আছে বিপুল জনশক্তি।

আশরাফ আর সাবিহা একসঙ্গে বলে, ঠিক। ঠিকই বলেছেন। তাঁর জনশক্তি তাঁর অস্ত্র।

হা-হা-হা হাসিতে চারদিকে হাসির ধ্বনি তুলে আশরাফ বলে, সাত কোটি মানুষরে আর দাবায়ে রাখবার পারবা না। এটি শুধু কথার কথা না। এটি সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস। গণমানুষের অসাধারণ নেতাই পারেন এমন আস্থার সঙ্গে মানুষকে নিজের ছায়ায় এক কাতারে নিয়ে আসতে।

সাবিহা বলে, আমি এই সাত কোটি মানুষের একজন। বঙ্গবন্ধুর কাছে নিজের সাহস জমা রাখলাম।

পাশ থেকে একজন বলে, আমিও সাত কোটি মানুষের একজন। আমাকে কেউ দাবিয়ে রাখতে চাইলে জীবন দিয়ে রুখব।

পাশ থেকে আর একজন, আমিও একজন। আমিও নিজের শক্তির সবটুকু বঙ্গবন্ধুকে দিলাম।

আমিও! আমিও! আমিও! আমিও–

আশরাফ-সাবিহা চারদিকে অবাক হয়ে তাকায়। প্রত্যেকে জনশক্তির অংশ হওয়ার জন্য নিজের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। এই মানুষই তো বঙ্গবন্ধুর আপনজন। এই মানুষই তো বাংলা-বাঙালির। যে বাংলা ও বাঙালির কথা বঙ্গবন্ধু বারবার বলে যাচ্ছেন। এ এক অসাধারণ ভাষণ, যেন ভাষণ নয়, বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কল্লোলিত প্রবাহ। প্লাবিত করে যাচ্ছে দেশের সব নদী, শস্য ক্ষেত্র, পথ-প্রান্তর এবং ঘর-দুয়োর।

এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আশরাফ ও সাবিহা দু'জনে দু'জনের হাত চেপে ধরে। আশরাফের আবারও মনে হয় সাবিহাকে যেন বলে, তোমাকে একটি দীর্ঘ চুমুতে ভরিয়ে দিতে চাই প্রিয়তমা। কিন্তু এই জনারণ্য এমন একটি আবেগ প্রকাশের স্থান নয়। দেশ স্বাধীন হলে এই ভাষণ উদযাপন করার জন্য এখানে আসবে। অন্য কোনো বছরের ৭ই মার্চে। দু'জনে দু'জনকে গাছের নিচে বসে দীর্ঘ মুচুতে ভরিয়ে দেবে। বলবে, স্বাধীনতা যে জন জীবন চায়, তেমন জীবনকে ভরিয়েও দেয়। স্বাধীনতা স্বপ্নের ফুল ফোটায়। বসন্ত দিন ভরিয়ে তোলে। আজ কেমন বসন্ত দিনের বাতাস এই অসাধারণ ভাষণ নিয়ে বয়ে যাচ্ছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। চলে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে। চলে যাচ্ছে মহানন্দার পাড়ে। সোমেশ্বরী নদীর ধারে। এবং কর্ণফুলী হয়ে পিয়াইন নদীর ধারে। যেখানে যত মানুষ আছে তাদের সবার কাছে। পৌঁছে দিচ্ছে পাখির কলতানে। পাহাড়ের মাথায় কুয়াশা এবং মেঘের জমাট বাঁধা ঐক্যের সুর-মূর্ছনায়। পৌঁছে দিচ্ছে চারদিকের সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী দেশের মানুষের কাছে– একদিকে ভারত, অন্যদিকে বার্মা। কেঁপে ওঠে আশরাফের শরীর– ওহ্ পৃথিবী তোমার জয় হোক। কতদিনে জানি না, তোমার মানচিত্রে অচিরেই যুক্ত হবে একটি নতুন দেশ।

বাংলাদেশ– বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে এই বাংলাদেশের কথা বারবার বলে যাচ্ছেন। তুমি কান পেতে থাক পৃথিবী। অপেক্ষা করে থাক পদধ্বনি আসছে বাংলাদেশ!

আমি এই স্বপ্নের দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলাম। আমার সামনে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা। উড়ছে বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে লাল-সবুজের পতাকা।

আবেগে কেঁপে ওঠে আশরাফ!

সাবিহা মৃদুস্বরে বলে, কী হলো? কাঁপছ কেন?

যেদিন পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ যুক্ত হবে, সেদিন বলব কেঁপে উঠছি কেন।

আমার ভেতরেও প্রতিজ্ঞার কাঁপুনি। নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না।

তাহলে বুক পেতে শুনি ভাষণ। আমাদের সামনে বেদবাক্যের মতো ধ্বনিত হচ্ছে।

শোনা যায় ভাষণের পঙ্‌ক্তিরাজি 'আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যতদূর পারি ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছিয়ে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি : আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না। শোনেন– মনে রাখবেন শত্রুবাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি নন-বাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়।'

ভাষণের মাঝখানে গর্জে ওঠে স্লোগান। প্রকম্পিত হয় রমনার রেসকোর্স ময়দান। ব্রিটিশরা এই ময়দানে ঘোড়দৌড় খেলা চালু করেছিল। বাঙালিরা এই মাঠকে নিজেদের প্রকাশের জায়গা করে তুলেছে। জাতিসত্তার নিনাদ ধ্বনিত হয় এখানে। মানুষ নির্মিত মহাসমুদ্র জেগে ওঠে এখানে। স্বাধীনতার মর্মবাণী আজ বুঝতে শেখাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু।

তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা।

সাবিহা নিজের ভেতর কল্লোল অনুভব করে। ও বুঝতে

পারে নেতৃত্বের জায়গা থেকে উচ্চারিত হচ্ছে দায়িত্বের কথা। মাঠজুড়ে বসে থাকা মানুষেরা প্রত্যেকে যদি এক টাকা করেও দেয়, তাহলেও লক্ষ লক্ষ টাকা জমা হবে রিলিফ কমিটিতে। শহীদ পরিবার সহযোগিতা পাবে। আহতরা চিকিৎসার সুযোগ পাবে। রহিমের মায়ের কথা মনে হয় সাবিহার। ফুলবাড়িয়া স্টেশনের কাছে ছেলেটি গুলিতে মারা গেছে। সেই মায়ের বুকভাঙা কান্না এখন এই মুহূর্তের বসন্তের বিকেলকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। ও নিজের বুকের ভেতর আর্তনাদ অনুভব করে।

আশরাফ ওর দিকে তাকিয়ে বলে, কী হলো? তোমার হাত কেঁপে উঠল কেন?

রমিজা খালার কথা মনে হচ্ছে?

রহিমের মা?

হ্যাঁ, আমরা রহিমের দাফনের ব্যবস্থা করেছি। ওর মাকে সাহায্য দিয়েছি।

বঙ্গবন্ধু এই কথাই বললেন।

বুঝতে পারছি। আমাদের এক হয়ে আরও করতে হবে। আমরা পিছিয়ে থাকব না!

তাতো বটেই।

বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মচারীদের বলেছেন, আমি যা বলি তা মানতে হবে।

খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দিতে বলেছেন।

আমি আর একটি গভীর কথা ভাবছি।

কী?

তিনি বলেছেন বাঙালি, নন-বাঙালি সব আমাদের ভাই।

বিহারিরা যেভাবে তড়পাচ্ছে ওদেরকে ভাই ভাবা কঠিন। ওরা আমাদেরকে দূরে ঠেলে রাখছে।

সেজন্যই বঙ্গবন্ধুর এই সতর্ক কথা। তিনি তো সবই জানেন। চব্বিশ বছর ধরে তিনি এদেশকে যেভাবে দেখেছেন, তার মতো আর কেউ সেভাবে দেখেনি।

তিনি মানুষ দেখেছেন। ভূমি দেখেছেন। নদী-পাহাড়-বন দেখেছেন। দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি– সব দেখেছেন।

সেজন্যই তো আমরা এমন অসাধারণ ভাষণ শুনতে পাচ্ছি।

এ ভাষণের অনেক পঙ্‌ক্তি বুকের ভেতর জ্বালিয়ে রেখে যুদ্ধে যাব।

গগনবিদারী স্লোগান ভেসে আসছে। প্রতিটি স্লোগান শেষে ধ্বনিত হচ্ছে 'জয় বাংলা'।

আশপাশের সবাই একসঙ্গে প্রাণভরে স্লোগান দেয়।

স্লোগান থাকলে শুরু হয় বক্তৃতা: 'মনে রাখবেন রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয় কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে– যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নেবার পারে।'

বঙ্গবন্ধু থামলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় স্লোগান।

প্রকম্পিত হয় রেসকোর্স ময়দান।

দ্বিগুণ আভায় বিচ্ছুরিত হয় নীলাভ আকাশ।

বসন্তের বাতাসে মিশে যায় পুষ্পরাজির সমুদয় সুবাস।

এসবের মাঝে শহর রুখে উঠছে স্পন্দিত স্পর্ধার।

প্রলয়ের গর্জন মাথায় নিয়ে জনস্রোতের প্রতিটি মানুষ বলছে, বঙ্গবন্ধু এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে।

দ্বিধাহীন নিঃশঙ্কচিত্ত নিয়ে প্রবল জেগে ওঠার বাদ্যযন্ত্র এখন প্রত্যেক মানুষের শরীর। যেন তারা ৭ই মার্চের বিকেলে এই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীত গাইছে।

সাবিহা মৃদুস্বরে বলে, শুনতে পাচ্ছ?

আশরাফ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, পাচ্ছি।

কী শুনছ?

তুমি যা শুনতে পাচ্ছ আমিও তা শুনতে পাচ্ছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের–

জাতীয় সঙ্গীত সাবিহা। জাতীয় সঙ্গীত। আজকের এই বিকেলের সূর্য সঙ্গীতের সুর নিয়ে অস্ত যাবে।

আকাশে ভেসে বেড়াবে সুরলহরি।

দু'জনে পরস্পরের হাত ধরে।

শুনতে পায় বঙ্গবন্ধু বলছেন, 'কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেশুনে কাজ করবেন।'

বঙ্গবন্ধু থামলে উচ্চারিত হতে থাকে স্লোগান।

শুনলে তিনি পূর্ব পাকিস্তান না বলে বললেন পূর্ব বাংলা।

শাসকগোষ্ঠীর নাকের ডগায় দ্বিধাহীন উচ্চারণ, পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে–

হাঁঃ, এটাই আমাদের শক্তি!

সাবিহা দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে। চেতনায় বয়ে যায় বঙ্গোপসাগর–

আশরাফ জোরে জোরেই বলে, স্বাধীনতা ঘোষণার বাকি থাকল কী? যেভাবে তিনি বলছেন তা ওরা বুঝতে পারছে। আমরা তো শুরু থেকেই বুঝে নিয়েছি।

তিনি বলেছেন, বাংলার মানুষ মুক্তি চায়–

আরও বলেছেন, আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে–

তার অভিধানে পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি নেই।

এই ভাষণে তিনি নিজ মাতৃভূমির নামটাই বারবার বলছেন।

ভেসে আসে স্লোগান– তোমার আমার ঠিকানা। আশরাফ-সাবিহাসহ সকলে চিৎকার করে ওঠে– পদ্মা মেঘনা যমুনা। কত শত শত বছর ধরে নদীগুলো বয়ে চলেছে এই ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে। ফেলেছে পলিমাটি, জন্মেছে শস্য। গড়ে উঠেছে বসতি। এই ভূখণ্ডের মানুষের শরীর এই বিকেলে বাদ্যযন্ত্র। বয়ে যাচ্ছে সুরের নদী।

একই সঙ্গে নদীতে বয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর– পিন্ডি না ঢাকা/ঢাকা ঢাকা। সব কথার শেষ কথা/বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

স্লোগান শেষ করে সাবিহা বলে আমরা স্বপ্নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি।

আশরাফ মাথা ঝাঁকায়। কপালের ওপর চুল পড়লে ওকে দারুণ লাগে। সাবিহা মুগ্ধ হয়। সেই মুগ্ধ চোখে চোখ রেখে আশরাফ বলে, চলো দু'জনে হাত ধরে দরজাটা পার হই।

গর্জে ওঠে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব– এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম–এবারের

সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

অনেকক্ষণ ধরে 'জয় বাংলা' স্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে। তুমুল করতালি চারদিকে। বঙ্গবন্ধু মঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছেন। মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সাবিহা মুখ ঘুরিয়ে আশরাফকে বলে, তুমি আর আমি ওই মঞ্চের সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াব।

তাহলে আমরা এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। ভিড় কমে যাক।

দেখতে পাচ্ছি সামনে খুব ঠেলাঠেলি হচ্ছে।

হবেই, লোকজন বঙ্গবন্ধুর কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছে। মঞ্চের দিকে অনেক বেশি ভিড়। তবে নিরাপত্তার কাজে যুক্ত ছেলেরা প্রাণপণে ভিড় সামলাচ্ছে। ওরা পারছেও। আস্তে আস্তে ভিড় কমছে।

দূর থেকে তাকিয়ে সাবিহা বলে, মানুষ এমন ঠেলাঠেলি

চলো এগোই। চারদিক দিয়ে মানুষ বেরিয়ে গেছে। ভিড় কমেছে।

সাবিহা দেখল ওদের আশপাশে যারা ছিল তারাও নেই। এখানে-ওখানে ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। মানুষের উত্তেজনার শেষ নেই। সাবিহা মঞ্চের দিকে পা বাড়ায়। সঙ্গে আশরাফও। শুনতে পায় স্লোগান : বঙ্গবন্ধু এগিয়ে চলো/আমরা আছি তোমার সাথে স্লোগানের শেষ নেই। কাঁটাতারের বিভিন্ন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া মিছিল এখন রাস্তায়। চারদিক থেকে স্লোগানের ধ্বনি আসছে। উত্তরমুখী মিছিলগুলো বত্রিশ নম্বরে গিয়ে থামবে। বঙ্গবন্ধুর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিছিল।

রাস্তা এখন মিছিলকারীদের দখলে।

মিছিল করা লোকেরা নিজেদের সঙ্গে কথা বলার সময় কেউ কাউকে বলছে, যেতে হবে বহুদূর।



করছে কেন? বঙ্গবন্ধুকে ছুঁয়ে দেখার জন্য?

হতে পারে।

তাঁকে কিছু বলার জন্য?

হতে পারে।

মনে হয় পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার জন্য।

যেভাবে শেষ করলেন, একজন জ্ঞানী মানুষের ভাষণ এভাবেই শেষ হয়।

মুক্তির সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম একই সমান্তরালে আছে।

আগে স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা দেবে মুক্তির স্বপ্ন।

শুধু স্বপ্ন না। স্বপ্ন বাস্তবায়নের আরাধ্য কাজ।

সবাই মিলেই তো কাজটি করতে হবে।

অবশ্যই।

তা তো হবেই। স্বাধীনতার পথে হাঁটা সহজ কথা নয়।

রাস্তা মসৃণ নয়।

অনেক চড়াই-উৎরাই আছে।

সে কথাই তো বলেছেন বঙ্গবন্ধু।

বলেছেন রক্ত যখন দিয়েছি–

রক্ত আরও দেব।

তিনি বলেছেন, রক্তের দাগ শুকায় নাই।

তখন কেউ স্লোগানের মতো বলে, আমরা সবাই শহীদ হব–

অন্যরা প্রতিধ্বনিত করে, রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আনব।

আবার স্লোগান ওঠে, স্বাধীনতা স্বাধীনতা–

স্বাধীনতা ছাড়া ঘরে ফেরা নাই।

যাব যাব–



বহুদূর যাব।

চড়াই-উৎরাই–

সবকিছু ভাঙব!

নতুন নতুন স্লোগানে জেগে ওঠে রাজপথ

নতুন নতুন স্লোগানে মুখরিত হয় মিছিল

আশরাফ আর সাবিহা ততক্ষণে মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেছে। দু'কান ভরে নতুন স্লোগান শুনে মনে করে, ৭ই মার্চের এই বিকেলে এমন একটি ভাষণ শুনে মানুষতো এভাবেই পথে নামবে।

আজ থেকে দেশের মানুষের নতুন যাত্রা শুরু হলো। কেউ আর তাদের পেছন দিকে তাকাতে দেখবে না

তাদের যাত্রায় অমাবস্যা-পূর্ণিমা থাকবে

জোয়ার-ভাটার টান থাকবে

তারা রক্তো নদী পার হয়ে যাবে।

তারা বলবে, যে নদীকে সাক্ষী করেছি, সে নদীর পানি আর রক্ত সমান।

দু'জনে মঞ্চের পিঠে শরীর ঠেকিয়ে দাঁড়ায়।

সাবিহা বলে, মঞ্চটা ছুঁয়ে রোমাঞ্চিত হচ্ছি

আমিও। কতক্ষণ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ছিল

মঞ্চের দিকে না, দীর্ঘদেহী মানুষটির দিকে।

হা-হা করে হাসে আশরাফ। বলে, জ্ঞান দিও না। এমন বিকেলে কখনও মানুষই সূর্য হয়।

কখনও মানুষই আকাশ হয়।

কখনও মানুষই সময় হয়

দু'জনে মঞ্চের গায়ে মাথা ঠেকায়।

এই মঞ্চই আমাদের মিছিল।

তুমি আমি মঞ্চ নিয়ে মিছিলে যাব। রাজপথ যদি নদী হয়, মঞ্চ আমাদের বজরা। আমরা বিদ্রোহী চাঁদ সওদাগর

সাবিহা হেসে গড়িয়ে পড়ে। দেখতে পায় সূর্য পশ্চিম আকাশে গড়িয়েছে। সূর্য ডুববে, কিন্তু জেগে থাকবে আজকের এই অলৌকিক বিকেল।

দুই

ওদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেউ কেউ এগিয়ে আসে ওদের কাছে। সবারই উৎফুল্ল চেহারা। হয়তো ভদ্রঘরে মানুষ ওরা কিংবা শ্রমজীবী। তারা এই জনস্রোতের একজন। প্রথমে বাদাম বিক্রেতা নূরুল এগিয়ে আসে। ঝুড়ির বাদাম অর্ধেক বিক্রি করেছে। একগাল হেসে বলে, আপা বাদাম খাইবেন?

দুই টাকার দ্যান

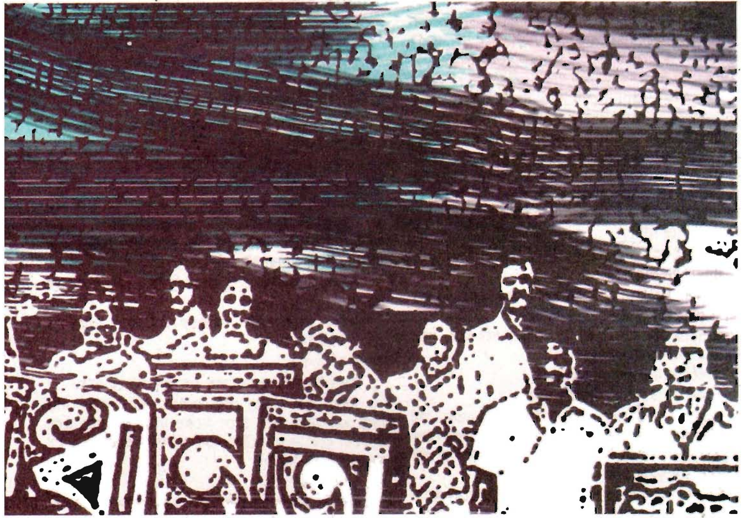
আইজ আর বেচুম না। বঙ্গবন্ধুর কথা না শুনলে বেইচতাম। অহন আর বেইচতে পারুম না। আহেন হগলে মিলা বইয়া খাই

জড়ো হওয়া দশ-বারোজন লোক এলোমেলো বসে পড়ে। আশরাফ আর সাবিহা একপাশে। নূরুল বাদামের ঝুড়ি মাঝখানে রেখেছে।

লন ভাইসাবেরা। নূরুল সবার দিকে তাকায়

কেউ একজন প্রশ্ন করে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কোন জায়গাটা তোমার ভালোলেগেছে নূরুল ভাই?

নূরুল দু'হাত উপরে তুলে চেঁচিয়ে বলে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।



প্রত্যেকে হাততালি দেয়। নূরুল একমুঠো করে বাদাম তুলে প্রত্যেকের হাতে দেয়। সবাই খোসা ছাড়িয়ে টুকটাক মুখে পোরে।

সাবিহা বাদাম চিবিয়ে বলে, নূরুল ভাই আপনি কোথায় থাকেন?

কাঁটাবন বস্তিতে।

বাড়িতে কে আছে?

বাপ-মা, চার ভাইবোন।

দেশের বাড়ি কোথায়?

বরিশালের হরিণঘাটায়। খুব সোন্দর গেরাম। আপা যাইবেন একবার?

হ্যাঁ, যাব। দেশ স্বাধীন হোক, তার পরে।

দ্যাশ স্বাধীন! ওহ্ আল্লাহরে, এই ঝড়ের কিনারে তো কত বছর ধইরা বাদাম বেচি আইজ জীবনডা ধন্য অইয়া গেল।

বাহ্, আপনি তো দারুণ লোক দেখছি।

বাদাম চিবুতে চিবুতে একজন বলে।

নূরুল তাকে জিজ্ঞেস করে, নেতার ব্যক্তিমার কোনডা আপনে মনে রাখছেন?

লোকটি চট করে বলে, তোমরা আমার ভাই– তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। আর্মিকে এভাবে কথা বলা সহজ নয়। বুকের পাটা লাগে।

আর একজন বলে, তাছাড়া দেশের মাটির গন্ধ নিঃশ্বাসে থাকতে হয়। সোঁদা মাটির ঘ্রাণ।

আশরাফ সবার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে বঙ্গবন্ধুর আজকের ভাষণ মানুষের ভেতরটা নাড়িয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকের ভাবনার জায়গা থেকে নতুন চিন্তা করার দুয়ার খুলে গেছে। সবাই একটি করে লাইন বুকে নিয়ে বেরিয়েছে এই মাঠ থেকে। প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে একটি করে লাইনের কথা বলেছে। ওকে প্রশ্ন করলে ও কোন লাইনের কথা বলবে? মনে হয় ও সব লাইনের কথাই বলতে পারবে। সবচেয়ে বেশি করে মনে হচ্ছে, তেইশ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। মাথার ভেতরে একটি জনপদের চিত্র ভেসে ওঠে। আশরাফ মাথা ঝাঁকালে পাশ থেকে একজনে বলে, ভাইজান আপনি কিছু বলছেন না যে?

ও মৃদু হাসি ছড়ায়।

আপনাদের কথা শুনছি। আজকের ভাষণ আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে।

তাইলে আমরা হগলে হগলের হাত ধরি।

সবাই দু'পাশ থেকে দু'হাত বাড়িয়ে দেয়। আশরাফের ডান মুঠিতে সাবিহার বাম হাত। সাবিহার ডান হাত নূরুলের বাম মুঠিতে। নূরুল আলতো করে হাতটা লাগিয়ে রাখে। ও বুঝতে পারে একজন বাদাম বিক্রেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে সম্মান দেখিয়েছে। আজকের বিকেল এভাবে সচেতন করেছে মানুষকে। ও ঘাড় ফিরিয়ে নূরুলের দিকে তাকায়। ওর দৃষ্টি সামনে। গাছের মাথা কিংবা আকাশের দিকে। হাতধরা মানুষেরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নিজেদের করণীয় ঠিক করেছে। তখন 'জয় বাংলা' ধ্বনি বলার সঙ্গে সঙ্গে সবার হাত উপরের দিকে উঠে যায়। আবারও নূরুল আলতো করে সাবিহার হাত ওঠায়, যেন হাতটি কোনো নারীর নয়, একজন সহযোদ্ধার। সাবিহা বাদাম বিক্রেতার আচরণে খুশি হয়। একজন নূরুল ওর কাছে শুধুই নূরুল থাকে না, সময়ের মানুষ হয়ে ওঠে। মানুষের চেতনা কখনও কখনও এমন পরিশীলিত হয়, যখন একজন ব্যক্তি তার স্বাধীনতা স্বপ্নের লক্ষ্য নির্ধারণ

করে।

সাবিহা এমন উপলব্ধিতে স্বস্তি বোধ করে। তবে এ কথা নূরুলকে বলা যাবে না। সে এসবের অর্থ বুঝবে না। ও এই বিকেলের সাক্ষী হয়েছে। ভাষণের সবটুকু বুকের ভেতর টেনে নিয়েছে। এর সামনে এখন ভিন্ন যাত্রা।

'জয়-বাংলা' স্লোগান শেষ করে সবাই দীর্ঘস্বরে গভীর উচ্চারণে বলে, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বাক্যটি একবার বলে চুপ করে যায় সবাই। নিস্তব্ধতা নেমে আসে ওদের চারপাশে। শব্দ ওদের বুকের ভেতর তড়পায়। ওদের আপাত শান্ত নীরবতার মাঝে কলরেডির মাইকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে শব্দ। এই মাইক যে ছেলেরা মঞ্চে কাজ করছিল তাদের একজন বলে, আমাদের মাইক জাদুঘরে যাবে।

হ্যাঁ, তাই তো।

সাবিহা চিৎকার করে ওঠে।

তোমরা যত্ন করে মাইকটা রেখে দিও। এই তারসহ সাউন্ডবক্সসহ সব রাখবে।

আশরাফ উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলে, এখন আমাদের সময়ের অপেক্ষা মাত্র ভাই।

আপনে আমার কথা মনে রাখবেন।

আমরা সবাই সবার কথা মনে রাখব।

তখন শূন্য ঝুড়িটা হাতে নিয়ে লাফিয়ে ওঠে নূরুল। ওর সঙ্গে অন্য সবাইও দাঁড়ায়। নূরুল ঝুড়িটা মাথার ওপর রেখে এক হাত তুলে লাফাতে লাফাতে বলে, আজ থাইকা পূর্ব পাকিস্তান নাম মুইছা গেল। জয় বাংলা।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা নূরুলের সঙ্গে যোগ দিয়ে সুরের মতো টেনে টেনে বলতে থাকে– মুইছা. গেল. মুইছা গেল, পূর্ব... পাকি...স্তান...।

আশরাফ আর সাবিহা দু'হাতে তালি বাজায়। চারপাশ থেকে আরও অনেকে এসে জড়ো হয় সেখানে। পাতাকুড়ানি ছেলেমেয়েরাও দৌড়াতে দৌড়াতে আসে।

আর্ট কলেজের সামনে রিকশা রেখে রিকশাওয়ালারা আসে।

পথচারীরা আসে।

দেখো দেখো, আমাদের মিছিলে কত মানুষ চলে এসেছে।

কলেজের ছাত্রী দোলা বলে, আমার মা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি আছে। সে জন্য মিছিলে যাইনি মায়ের কাছে যাব বলে। কিন্তু দূর থেকে মনে হচ্ছিল যে এখানে কিছু একটা হচ্ছে, তাই দৌড় দিয়ে চলে এসেছি। বাদাম ভাইয়ের সঙ্গে গান করেছি– মুইছা... গেল, মুইছা... গেল...।

অন্যরা চেঁচিয়ে বলে, পূ-র্ব-পা-কিস্তা-ন।

গানের মতো করে বলা স্লোগান থামলে সাবিহা বলে, চলেন, আমরা এই স্লোগান দিতে দিতে রমনার এই সবুজ মাঠটার চারদিক ঘুরে আসি।

হ্যাঁ, চলেন চলেন।

আমরা এই মাঠে মিছিল করব।

আমরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা বলব।

আমরা 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গান গাইব।

আমরা বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে যাব।

ওই ভবনের সঙ্গে আমাদের ভাষাশহীদদের রক্ত আছে।

আমরা বলব, শহীদ ভাইয়েরা যুদ্ধ করব।

আমরা ওদের স্যালুট করব।

আমরা কালীমন্দিরে যাব।

মা কালীর কাছে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ শক্তি চাইব।

ঠিক ঠিক।

এখন থেকে আমরা হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ না, আমরা বাঙালি।

আমাদের সাহস বাঙালি চেতনার সাহস।

আবার স্লোগান ওঠে– তোমার নেতা আমার নেতা। শেখ মুজিব শেখ মুজিব।

আশরাফ দু'হাত তুলে বলে, এই রমনাকে আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তুলে দিলেন আমাদের নেতা শেখ মুজিব।

সাবিহাও একই ভঙ্গিতে বলে, আপনারা অনেকে জানেন না এই রমনা ঢাকার একটি ঐতিহাসিক স্থান। মোগল সম্রাটরা ঢাকা গেট তৈরি করেছিল ওই পাশে। মিছিল করে যাওয়ার সময় আমরা ওই গেট দেখব।

সাবিহা এ কথা বলতেই প্রত্যুষ চিৎকার করে বলে, জয় বাংলা।

সাবিহা আবার বলে, আজকে এই রমনা আরেকটি ঐতিহাসিক স্থান হলো।

ঠিক। ঠিক।

উপস্থিত নানা পেশার মানুষ একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

মুইছা গেল– মুইছা গেল– বলতে বলতে নূরুল দৌড় দিয়ে এক চক্কর ঘুরে আসে মঞ্চের চারপাশ। ঘুরে এসে হাঁফধরা বুকে নিঃশ্বাস টেনে বলে, বঙ্গবন্ধু কইছেন না ভাতে মারব, পানিতে মারব–

হ্যাঁ বলেছেন তো।

এই মঞ্চ হ্যাগো বুক পোড়াইব। হ্যাডা ভাইঙা ফালাইব। আপনেগো কারও ক্যামেরা থাইকলে ছবি তোলেন।

ক্যামেরা?

সবাই সবার দিকে তাকায়।

সাবিহা বলে, বাদাম ভাই একটা খাঁটি কথা বলেছে।

দোলা মাথা নাড়ে।

দেখতে পাচ্ছি আমাদের কারও কাছে ক্যামেরা নাই।

মুই রিকশা লইয়া পেরেস ক্লাবে যামু? ক্যামেরা লইয়া একজন সাংবাদিক ভাইরে আনুম?

সবাই চুপ করে থাকে। কী করা উচিত, তা দ্রুত ভাবতে পারে না।

আশরাফ সিদ্ধান্ত দেয়।

এখন আমরা মিছিল করি। আমি আর সাবিহা ক্যামেরা জোগাড় করে কাল সকালে এসে এই মঞ্চের ছবি তুলব।

কহন আইবেন? নূরুলের উত্তেজনা সবাই টের পায়।

দশটার দিকে।

মুই আমু। দশটা থাইকা বইসা থাকুম। আপনেরা আমার একডা ছবি তুইলা দিবেন। যুদ্ধকরণের সময় মুই ছবিডা গলায় ঝুলাইয়া রাখুম।

পাশ থেকে কেউ একজন বিস্ময় প্রকাশ করে, যুদ্ধ? আপনি যুদ্ধ করবেন?

নূরুল নির্বিকার কণ্ঠে বলে, যুদ্ধ ছাড়া কি স্বাধীনতা অইব? বঙ্গবন্ধু কইছেন না, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। হের লাইগা এই মঞ্চ আমার লাইগা মঞ্চ না, মন্ত্র।

কী বললেন?

মন্ত্র বুজেন নাই মন্ত্র। সন্ত্র। সাধু-সন্ন্যাসীর মন্ত্র না। যুদ্ধের মন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্র।

আশরাফ প্রবল আবেগে নূরুলকে জড়িয়ে ধরে।

ভাই, আজ থেকে আপনি আমার কাছে শুধু একজন বাদাম বিক্রেতা না। আপনি একজন বড় মানুষ।

দাঁড়িয়ে থাকা চারপাশের সবাই করতালিতে পরিবেশ ভরিয়ে তোলে। বলতে থাকে, মন্ত্র মন্ত্র– যুদ্ধের মন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্র। স্বাধীনতার মন্ত্র।

সবার সঙ্গে স্লোগান দিতে দিতে সাবিহার চোখের সামনে বিকেলটা অন্য রকম হয়ে যায়। মনে হয়, এ মুহূর্তে রমনার রেসকোর্স মাঠটা যুদ্ধক্ষেত্রে হয়ে গেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ বুঝি এখান থকেই শুরু হলো। এ মুহূর্তে রঙধনুর সাত রঙ বিছিয়ে আছে মাঠজুড়ে। চারদিক থেকে বিভিন্নজন মাঠের মধ্যে এগিয়ে আসছে। যুক্ত হচ্ছে সমবেত লোকের সঙ্গে। সাবিহার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনে করে, মঞ্চ ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছা থেকে কত বড় একটা পাওনা হলো। মন্ত্র শব্দটার ওপরও নেমে এসেছে রঙধনু।

দু'হাত উঁচু করে ও সবাইকে বলে, চলেন, আমরা মঞ্চটাকে ঘিরে মিছিল করি। তারপর মাঠ প্রদক্ষিণ করব।

হ্যাঁ, চলেন চলেন। আপনারা দুইজন সামনে থাকেন।

সাবিহা আর আশরাফ সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

আশরাফ গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেয়।

এবারের সংগ্রাম...

সমবেত কণ্ঠ– স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জয় বাংলা।

মঞ্চ ঘুরে মিছিল এগিয়ে যায় টিএসসির দিকে। সেখান থেকে বাংলা একাডেমির দিকে মোড় নেয়। নূরুল মাঝেমধ্যে মিছিল থেকে বেরিয়ে সামনে চলে যায়। আবার ফিরে আসে মিছিলে। তার উত্তেজনা অন্যদের মাতিলে তোলে।

আশরাফ ধরে নেয় শহরের আর সব মিছিলের চেয়ে ওদের মিছিলটা আলাদা। যে মাঠে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করলেন বঙ্গবন্ধু সে মাঠে যে মানুষেরা এক হয়েছে তাদের ভেতর মন্ত্রের মতো কাজ করছে তাঁর বাণী। তাঁর জন্য তৈরি মঞ্চ। তখন দু'জনে দেখতে পায় বাংলা একাডেমির কাছের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন একজন নারী। সাবিহা অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে তাকে দেখে।

কাঁটাতারের ওপর দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ি। হাতে ভিক্ষার বাটি। কাঁধে চটের ঝুলি। সাদা রঙের একটি শাড়ি পরে আছে। সঙ্গে কালো ব্লাউজ। খালি পা। মাথার সাদা চুলে ঘাসের কুটো উড়ে এসে পড়েছে। ওদের মিছিল এগোতে থেকে সামনে এসে দাঁড়ায়।

ওরা এগিয়ে এলে সাবিহার হাত ধরে বলে, আমিও মিছিল করুম।

আসেন।

সাবিহা হাত টেনে ধরে। পরক্ষণে বুঝতে পারে ওরা যে স্পিডে হাঁটছে সে স্পিডে তার পক্ষে হাঁটা সম্ভব না।

মাগো তোমাগো লগে আমিতো হাঁটতে পারুম না।

আপনি এখানে বসেন। আমরা মিছিল শেষ করে আসি।

বুড়ি দ্রুত কণ্ঠে বলে, হোন আমি তো ওইহানে বইয়া বঙ্গবন্ধুর কথা হুনছি। বেডার মতো কতা কইছে। বেডা একডা।

সাবিহা বুড়িকে জড়িয়ে ধরে বলে, আল্লাহ আপনাকে হায়াৎ দিক। আপনি এখানে বসে থাকেন। আপনাকে নিয়ে আমি রোকেয়া হলে যাব।

মিছিল ততক্ষণে অনেকখানি চলে গেছে। সাবিহা মিছিলের শেষের অংশে যুক্ত হয়। তখন স্লোগান হচ্ছে মুইছা–গেল – মুইছা– গেল–

সাবিহা সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চারণ করে – পূ-র্ব পা-কি-স্তা-ন–

মাঠ ঘুরে মিছিল এসে শেষ হয় মঞ্চের কাছে। একে একে সবাই চলে যায়। নিজের খালি ঝুড়িটা হাতে দিয়ে নূরুল বলে, ভাইজান মুই কিন্তু আপনের লগে যুদ্ধে যামু। মোরে আপনে ফালাইয়া যাইবেন না।

না-না, রেখে যাব কেন। আমরা দু'জনে একসঙ্গে যাব। আপনি সঙ্গে থাকলে আমার শক্তি দ্বিগুণ হবে।

আশরাফ হাত বাড়িয়ে নূরুলকে কাছে টানে। নূরুল হাতের ঝুড়ি মাটিতে ফেলে জড়িয়ে ধরে আশরাফকে। দৃশ্যটি সাবিহাকে অভিভূত করে। ও চোখ সরাতে পারে না। রোমাঞ্চিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর বাদাম বিক্রেতা এভাবে যুক্ত হলে পাকিস্তানের মিলিটারি ওদের কাছে হারবে। যুদ্ধে ওদের জয় হবেই।

সাবিহা চেঁচিয়ে বলে, জয় বাংলা।

দু'জনে সরে দাঁড়িয়ে সাবিহার দিকে তাকায়।

কি হইচে আফা?

যুদ্ধে আমরা জিতবই।

যুদ্ধে তো মোরা জিতবই। মোগরে ঠেকাইব কে?

কেউ না। কেউ না। আপনে যুদ্ধ কইরবেন না আফা।

করব তো। আমিও যুদ্ধ করব।

কয়েক পা এগিয়ে এসে দোলা বলে, আমিও যুদ্ধ করব আপা। এজন্যই দাঁড়িয়ে আছি। আপনার সাথে রোকেয়া হল পর্যন্ত যাব।

না, আমরা আগে মেডিকেলে যাব। তোমার অসুস্থ মাকে দেখতে যাব।

আচ্ছা ঠিক আছে। দোলা মাথা নাড়ে।

নূরুল দু'পা গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়।

আপনে কোন হলে থাহেন ভাইজান? আপনেরে কোনহানে পামু?

আমি ইকবাল হলে থাকি বাদামভাই।

কোন ঘরে থাহেন?

দোতলার ৪০৩ নম্বর রুমে। বারান্দার মাথায়।

আইচ্ছা ভাইজান, আমি যামু আপনের লগে দেহা করতে। সালাম। সালাম আফারা।

নূরুল বিনীত ভঙ্গিতে কপালে হাত ওঠায়। যেন মানুষগুলো তার কত কালের পরিচিত। কত আপন। ওর ভঙ্গিতে মনে হয় না যে মাত্র আজকের এই বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভবিষ্যতে আর কোনো দিন দেখা হবে কি-না কেউ জানে না।

ঝুড়িটা দু'হাতে মাথার ওপর তুলে নানারকম স্লোগান বলতে বলতে ও চলে যাচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে দোলা বলে, পাগলা। কিন্তু খুব আপন মনে হয়।

খাঁটি মানুষ।

সাবিহার সঙ্গে আশরাফ যুক্ত করে বলে, বোধের মানুষ।

ও আমাদেরকে আরও একটি জিনিস শেখালো আশরাফ।

কী? আশরাফ ভুরু কুঁচকায়।

দূরকে আপন করার বাণী রেখে গেল। বলে গেল, প্রত্যেকের প্রত্যেককে কাছে টানতে হবে।

ঠিক। ঠিক। দোলা মাথা ঝাঁকায়।

পূর্ব পাকিস্তান মুইছা গেল বলে যে অসাধারণ কথাটি বলে



া আমরা কেউ বলতে পারিনি।

শরাফ সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমিও এমনটি ভাবছিলাম।

বিহা কান খাড়া করে বলে, শোনো বাদাম ভাই ওই টই সুর করে বলে যাচ্ছে।

লা সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলে, পাগলা।

রে খাঁটি মানুষ। সাবিহা ওর ঘাড়ে হাত রাখে।

মি বলব বোধের মানুষের। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েনি কিন্তু জায়গা পূর্ণ। চেতনার জায়গা উজ্জ্বল। কোনো য় ঘাটতি নেই। আমার হলে এলে তার সঙ্গে আমি যাগ রাখব। যেন দরকারের সময় একসঙ্গে কাজে নামতে পারি।

আশরাফ আবেগ নিয়ে কথা বলে। চারদিকে তাকিয়ে বলে, রোদ ক্রমে এসেছে।

রোদ কমেনি। রেসকোর্সে আমাদের মাথার ওপর নেমে এসেছে আকাশ।

আমরা কি স্বস্তি বোধ করছি?

অবশ্যই করছি। আমরা কী করব তা আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু।

আমাদের বোঝার দিন শেষ?

চলো এগোই।

আমরা এখন তার কাছে যাব।

আশরাফ অবাক হয়ে বলে, কার কাছে?

একজন মাকে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে বসিয়ে রেখেছি। তিনি আমাদের অপেক্ষায় আছেন।

চলো যাই।

দোলা বলে, আমি আমার মায়ের কাছে যাই সাবিহা আপা।

হ্যাঁ, যাও। আমরা দু'জনে আসছি তোমার মাকে দেখতে।

দোলা আর্ট কলেজের সামনের গেট পেরিয়ে রাস্তায় ওঠে রিকশা নেয়।

আশরাফ আর সাবিহা সামনে এগোলে দেখতে পায় বুড়ি-মা কাঁটাতারের ওপর হাত রেখে বসে আছে। ঘাড় বাঁকা করে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। রমনার সবুজ মাঠে বসে থাকা মায়ের সাদা চুল বাতাসে এলোমেলো হচ্ছে। পেছনে বর্ধমান ভবন। এই ভবন থেকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় গুলিবর্ষণের নির্দেশ হয়েছিল। মায়ের বুক খালি করে শহীদ হয়েছিল সন্তানেরা।

সেই মা এখন দু'হাতে কাঁটাতার ধরে বসে আছে। পটভূমিতে সাতই মার্চের আকাশ। অস্তগামী সূর্য লাল আলো ছড়াচ্ছে। মায়ের বুকের ভেতরে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গমগম ধ্বনি।

আশরাফের হাত টেনে ধরে সাবিহা বলে, দেখো। দেখো বুড়ি-মাকে। আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন।

আমি দেখেছি সাবিহা। আমাদের নিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ভাঙবে বলে মা বসে আছেন।

সাবিহার দু'চোখে পানি ঝরে। দু'হাতে পানি মুছতে মুছতে বলে, এ এক অপরূপ ছবি আশরাফ।

চল আমরা তার কাছে ছুটে যাই।

না, আমি অনেক সময় ধরে দেখতে দেখতে যাব। যা আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশের একক ছবি।

চল দৌড়াই। তার দু'হাত ধরে বলব, তুমি আমাদের মাটি আর মানুষ মাগো।

চল দৌড়াই। সাবিহাও বলে।

কাছে গিয়ে তার হাত ধরে বলব, তুমি বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ। আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন।

দু'জনে এক ছুটে বুড়ি-মার কাছে আসে।

বুড়ি-মা ওদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়ায়। দু'জনেই জড়িয়ে ধরে তাকে। বলে, তোমার হাত ধরে আমরা পথে নামবো। চলো মাগো।

বুড়ি-মার অনাবিল হাসি দেখে সাবিহার বুক ভরে যায়। জোরে জোরেই বলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় থেকে গেলো এই বিকেল। ❖

অলঙ্করণ : : বোরহান আজাদ

নাসরীন জাহান

দিলেম উড়িয়ে ফুঁ


গল্প

ঝকঝকে দিন। চারপাশ থেকে মৃদু হাওয়া ধেয়ে আসছে। রোদও তেমন সতেজ নয়। অদ্ভুত একটা ভালো লাগা, আচ্ছন্নতা মায়াবী পরিবেশকে ঘিরে রেখেছে। রিনু বারান্দায় বসে চুল মেলে দিয়েছে সেই রোদে। এই সকালে রোদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ভঙ্গিটা চমৎকার লাগে বলেই নাশতা খেয়ে-না খেয়ে ছুটে আসে সেতু। বারান্দায় একসঙ্গে মোড়া নিয়ে চুপচাপ গল্প করার ছলে রিনুকে দেখে। রিনু রোদের ঠোঁটে চুলকে ছুঁইয়ে দিতে দিতে নাক কুঁচকে বলল, তুই রোজ এভাবে...

আমাকে তুই তুই করবেন না, আমাদের সম্পর্কটা সেসবের উর্ধ্বে চলে গেছে। সেতু বলল।

রিনু বিষণ্ন হলো। তারপর রোদ থেকে একটু একটু সরে এসে মুখোমুখি বসল, কেমন আছ?

হেসে ফেলে রনজু সম্বোধনটা শোনানোর জন্যই এই প্রশ্ন, না সত্যি সত্যি জানতে চাইছে।

সত্যি সত্যি রিনু অনেক দূর থেকে বলল, আসলেও তুমি কখন কেমন থাকো ইদানীং খুব জানতে ইচ্ছা হয় আমার।

সেতু অহন হয়ে বসল তাই?

তাই না, রিনুও সহজ হয় এমনিই বলার জন্য বললাম। সেতু রিনুকে তীব্র চোখে দেখল তারপর বলল, আমিও বলার জন্য একটা কথা বলি?

রোদটা তেতে উঠছে। রিনু মোড়া সরিয়ে বারান্দার ভেতরের দিকে চলে এলো। এতে করে সেতুর সঙ্গে তার বাহ্যিক দূরত্বটা কমে গেল। সে ইচ্ছে করলেই হাত সোজা না করেই রনজুকে ছুঁয়ে দিতে পারে। ইচ্ছেটা হলোও একবার। কিন্তু নিশুকে এক মুহূর্তের জন্য সামলে নিয়ে বলল, তোমার কোনো কথাই আপাতত ভালো লাগছে না আমার।

সুতরাং অপমানিত হলো। ওর নাক-মুখ লাল হওয়া দেখে রিনুর তা-ই মনে হলো। রিনুর ইচ্ছে হলো কথাটা ফিরিয়ে নেয়া। কিন্তু এক ধরনের আলস্য ওকে গ্রাস করল। তাই সে চুপচাপ উঠোনের দিকে চেয়ে রইল। যেখানে কয়েকটা কাক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠছে। রিনুর রোদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে একটা স্বপ্ন সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল, তখনই সেতুর গলা তাকে সচকিত করল, তুমি না শুনতে চাইলেও কথাটা আমাকে বলতেই হচ্ছে, তা হলো আমি তোমার প্রতি আকর্ষণ ফিল করছি। রিনু মিশ্র অনুভূতির ভেতর পড়ে গেল। ওর বুকের ভেতর দ্রুত শব্দ হতে থাকে। ঘোরের ভেতর থেকে সে বলল, সত্যি বলছ?

ততক্ষণে সেতু বারান্দায় সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর একটু জোরেই বলল, এটাও আমার একটা কথার কথা, সেটা ভুলে যেয়ো না।

রিনু ভাবলো সেতুকে ডেকে বসায়। কিন্তু আলস্য কিংবা মিশ্র অনুভূতির ধাক্কাই পুতুলকে ডাকা হলো না। সে দেখল প্রভুর ছায়াটা উঠোন থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওর মনে হলো সেতুর সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। তবুও সেতুকে ডাকা হলো না। উঠোন থেকে সেতু হাওয়া হলে গেল।

বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিল রিনু। জানালা দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকছে। বইয়ে অসংলগ্ন চোখ রেখে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছিল সে রাতে খুব সম্ভবত কোনো নাজুক স্বপ্ন দেখেছে সে। অর্ধেক দৃষ্টি বইয়ে এবং বাকি অর্ধেকটাকে স্বপ্নের ভেতর ডুবিয়ে একটা মিশ্র অনুভূতির ভেতর পড়ে গেছে সে। স্বপ্নটা আবছাভাবে স্মৃতির শরীরে দাগ কাটছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। রিনু বই রেখে স্বপ্নকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও সবুজ কি লাল রোদ উঠেছিল। সেই পাহাড়ের শরীর বেয়ে একতা মানুষ কি দেবতা রিনুকে টেনে টেনে পাহাড়ে উঠাচ্ছিল। পাহাড়টাকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল তার শরীরে তত বেশি ক্ষতের চিহ্ন ছিল। তাই হোঁচট খেতে খেতে রিনুর মতে, খুব সম্ভবত সারারাতই লেগে গিয়েছিল পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে। যা হোক ভোরের স্বপ্নে রিনুকে অনেক কষ্টে পাহাড়ের চূড়ায় উঠালো মানুষটা। তারপর রিনুর চোখের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকাল এবং এক ধাক্কায় সেই উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিল।

স্বপ্নের মতোই স্বপ্ন বটে। রিনু অবাক হলো এটা তার সারাদিন মনে হয়নি। সারাদিন তো তার কোনো ব্যস্ততাও কাটেনি। হাজব্যান্ড বিদেশে আছে, খরচ পাঠাচ্ছে বাবার বাড়িতে, ওর রাজকীয় ভঙ্গিতেই দিন কাটছে। এতে এমন একটা জটিল সুন্দর স্বপ্নের কথা ওর মনে আসেনি কেন। মা ওয়ারড্রোবে কাপড় গুছিয়ে রাখছেন। রিনু মাকে দেখছেন এবং তারপর মা'র ভেতর স্বপ্নের মানুষটার চেহারা মনে করতে চাইল। কিছুতেই মনে হচ্ছে না। রিনু মরিয়া হয়ে উঠল। তখনই সেতু এলো, রিনু তার স্বপ্নে ফেরা অসম্ভব জটিল মানুষটাকে মনে করতে পারল।

মা বললেন, তোমার পরীক্ষা কবে? একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। সেতুর আগামী মাসে।

প্রিপারেশন কেমন? মা কাপড় গুছিয়ে রান্নাঘরের দিকে চললেন, যেন বলার জন্যই বলা। এর উত্তর দেওয়ার আর প্রয়োজন হলো না। মা রান্নাঘরে পা রেখেছেন। বুকের ভেতর অস্থিরতা টের পেল রিনু। ও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। জ্যাকেটটাকে ঘাড়ে ঝুলিয়ে ঘরে আলো জ্বালালো সেতু। তারপর বিছানায় রিনুর কাছাকাছি বসল।

আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি জানো... রিনু বলতে চাইল। সেতু চুপচাপ চেয়ে রইল রিনুর দিকে। রিনু থেমে গেল। না এমনিই। এসবের সঙ্গে পরিচিত সেতু। সে উঠে দাঁড়াল। তারপর টেবিলের ওপর রাখা ক্যাসেট নিয়ে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। প্লেতে চাপ দিল। সাগর সেন জেগে উঠল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিছানায় কাঁচুমাচু হয়ে বসে থাকে রিনু।

আসলে তোমাকে আমি প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিতে চাচ্ছি। রিনুর প্রশ্নবোধক চোখের সামনে বলতে থাকে সেতু। তার কারণ... সেতু জানালা দিয়ে সন্ধ্যায় চলে যাওয়া দেখে। তারপর হেসে ফেলে, না কোনো কারণ নেই, এমনিই বললাম।

রিনুর একটা কিছু মনে হওয়ায় তোশকের নিচে থেকে একটা ইনভেলাপ বের করে সেতুর দিকে বাড়িয়ে দিল। সেতু একপলক ইনভেলাপের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, তোমাদের ব্যক্তিগত চিঠি আমাকে দেখাচ্ছ কেন!

ফেব্রুয়ারিতে আমার টিকিট আসছে।

রিনু উচ্ছল হলো, এটা খুব ভদ্র চিঠি তুমি পড়তে পারো ইচ্ছে করলে।

সেতুর মুখের দিকে তাকালে ওর প্রতিক্রিয়া কম বোঝা যায়। রিনু সেতুকে পড়াতে চাইল। সেতু চিঠিটা বিছানায় রেখে রিনুর দিকে সরাসরি তাকাল– আমার প্রতি তোমার কোনো ফিলিংস আছে?

রিনু হাসতে থাকল। অসম্ভব রেগে গেল সেতু– তুমি অসভ্যের মতো হাসবে না। আমার ভালো লাগছে না।

রিনু স্থির হলো। সেতু নিজেকে সামলে নিল, আই অ্যাম সরি! রিনু বিপন্ন চোখে সেতুকে দেখল। অনেক দূর থেকে তারপর বলল, জানি না।

সেতু অস্থির হলো। রিনু পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে রইল বিছানায়। তারপর সেতুর অস্থিরতায় চোখ রেখে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি আর এসো না। আর না।

পালাচ্ছ? সেতুর চাহনি তেমনই তীব্র। রিনুর বুকের ভেতর শব্দটা ধাক্কা লাগল। রিনু অস্থিরভাবে বলল, তাই চাচ্ছি। কেননা আর পথ নেই।

সেতু স্থির হলো। তারপর রিনুর কাছাকাছি বিছানায় বসে বলল, তোমাকে ছুঁয়ে দেই?

রিনুর হাত-ঠোঁট কেঁপে ওঠে। তারপর প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে গিয়েও হোঁচট খায়– না, মরে যাব।

লেকের জলে চোখ রেখে উদাস হয়ে যায় রিনু। সেতু

রিনুর হাতে আঙুলের ডগা ছোঁয়ায়। রিনু স্পষ্টভাবে একটু কেঁপে উঠল। রিনু লেকের জল দেখে। সেতু রিনুর উড়ো চুলে চোখ রাখে। তারপর চিবুকের গর্তে। রিনু লেকের জল দেখে। সেতুর চারপাশে মানুষজন থেকে অনেক দূর থেকে বলে, যমুনা হাত ধরো স্বর্গে যাব। রিনু লেকের জল দেখে। সেতু রিনুর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে আলতো চাপ দেয়। রিনুর বুকে আনন্দ শংকরের মিউজিক বাজে। রিনু সেতুর চোখে চোখ রেখে বলে, আর কত কষ্ট দেবে? আর কত? সেতু আসে। সেতু অস্থির হয়। সে দাঁড়ায়। তারপর রিনুর পাশের চেয়ারে গিয়ে বসে তীব্র কণ্ঠে বলে, আমি তোমাকে ভালোবাসি রিনু।

আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় সেতু। রিনু সেতুর দিকে তাকাল। সেতু ঘাড় নাড়ল– ওটা পুরনো কথা।

আমার হাজব্যান্ড ক'দিন পর বিলেত থেকে ফিরছে– রিনু দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল।

সেতু বলল, আমি জানি।



হাসল। ওর হাসির ম্লান ভঙ্গিটা আবারও কাঁপাল রিনুকে। সেতু খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও সবকিছু। সেতুর চোখ জ্বলে। হাসল রিনুও। তারপর সেতুর দিকে সরাসরি তাকাল যে ভালোবাসায় কষ্ট সব... একবিন্দু সুখ নেই কষ্ট ছাড়া, তাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়াই উচিত। হাত বাড়াও সেতু। আমি ফুঁ দেবো আঙুলে তোমার সত্তায়।

সেতু হাত বাড়াল। ফুঁ দিতে গিয়ে সেতুর চোখে চোখ রাখল রিনু। স্থির হয়ে গেল সে। রিনু ভাসতে ভাসতে শেষে মাটিতে এসে নামল। তারপর সেতুর দিকে তীব্র শীতেও ঘামছে যেন। সে চেয়ার থেকে উঠে রিনুর কাছ থেকে একটু দূরত্ব রেখে বসল। রিনু হাঁটুতে মুখ গুঁজে আছে। ওর বুকের ভেতর সমুদ্রের শব্দ। রিনুর চোখ জ্বলছে। এক সময় তা ভিজে

রিনু উত্তেজিতভাবে সেতুর হাত চেপে ধরল, অত জানো তুমি এরপরও এদ্দুর এলে কেন?

আমি একা আসিনি– সেতু বিষণ্ন কণ্ঠে বলল।

রিনু নিজেকে সামলে নিল দ্রুত। তারপর সেতুর হাতে নিজে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল। আসলে সব দোষ আমার নিঃসঙ্গতার। কখনও আমরা আমাদের মধ্যকার উঁচু দেয়ালগুলো ডিঙাতে পারব না। আত্মদহন আর কাকে বলে। রিনু হাসতে থাকে।

মা বাসায় নেই। ছোট বোনটা বাইরে খেলছে। বড় ভাই কোথাও আড্ডা দিচ্ছে। নির্জন বাড়িতে সেতুর উপস্থিতি রিনুকে একটা কষ্টকর অনুভূতিতে ফেলল। এই কষ্টটা নিতে

যেমন কষ্ট হচ্ছে, তেমন ভালোও লাগছে। রিনু ঠিক বুঝতে পারছে না এর পক্ষে না বিপক্ষে যাবে। বয়স এবং সামাজিক বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে কী করে সেতু ওর এত কাছে এলো? ওর নিজের ভেতরই কি প্রশ্রয় ছিল না? শূন্যতাও ছিল কি? রিনু ওর হাজব্যান্ডের চেহারাটা বুকের কাছে নিয়ে এলো। কিছু বুঝতে না পেরে সে সেতুর দিকে তাকাল। সেতুর দৃষ্টি বাইরে। রিনু বলল, কাল তুই ভার্সিটিতে যাবি না?

সেতু রিনুর দিকে পলকহীন তাকাল। তারপর বলল, যাব। ক্লাস ঠিকমতো করিস তো? অনার্সে এসে আমার মতো লাড্ডু মারবি না তো? সহজ হয়ে বসল রিনু।

সেতু দাঁড়াল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে বলল, দেশের বাইরে চলে যাব এবং কোনো দিনই ফিরব না, লাড্ডু মারলেই কী?

শোনো, রিনু তাকালো সেতুর দিকে, এভাবে কথা বলবে না কখনও এসে, বসো।

সেতু বলল, কী বলবে বলো, দাঁড়ালেও আমার কান খোলা থাকে। গোঁয়ার্তুমি ছাড়, রিনু স্থির কণ্ঠে বলল। ছবি আঁকাও ছেড়ে দিয়েছিলাম মনে হয়? প্রেমে পড়ে এমনভাবে মরে যাওয়া তোমাকে মানায় না।

সেতু হাসে। হাসতেই থাকে, ভালোই জানো দেখছি। মরে যাচ্ছি। নিজের সম্পর্কে শিশুর হন্ত, আমার ব্যাপারে তোমার অতটা ধারণা না থাকাই ভালো। আর আমি আবার ছবি আঁকা ধরব কোন শর্তে, সেটা নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হবে না তোমাকে। কেঁপে ওঠে রিনু। সেতু এসে বসেছে। রিনু ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল, তুমি বললেই আমি নির্লজ্জের মতো আমার পুরো শরীর তোমাকে দেখাব– তুমি এতটা আশা কী করে করো?

নির্লজ্জের মতো? সেতু তীব্র কণ্ঠে বলল, তুমি আমাকে চিনতে ভুল করেছ রিনু। শরীরটা আমার কাছে শুধুই শিল্প। এটাতে লজ্জা, নির্লজ্জতার প্রশ্নই আসে না। তুমি আমাকে অতটা ভুল বুঝবে জানলে... আমি যাচ্ছি।

রিনু ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, তোমার আকুলতা হিমালয় হোক সেতু।

রিনুর টিকিট আনার দিন ঘনিয়ে আসছে। রিনুর ভেতরটা ক্রমশ তীব্র অস্থিরতায় ভরে যায়। রিনুর প্রথম প্রেম সেতু। বিয়ের আগেও এমন একটা বন্দিত্বের ভেতর জীবন কাটিয়েছে, যেখানে ইচ্ছে থাকলেও কাউকে ভালোবাসার কথা ভাবতে পারেনি সে। ভাইজান, স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ জীবনেও ওকে রোজ কলেজে পৌঁছে দিত, নিয়ে আসত। বন্ধুদের সঙ্গে কখনোই কোনো সিনেমা বা অনুষ্ঠানে একাকী যাওয়ার স্বাধীনতা পায়নি সে। বিয়ের পর হাজব্যান্ডকে ভালো করে চেনা-জানার আগেই সে বাইরে চলে যায় এবং তার সঙ্গে একটা হাওয়াই সম্পর্ক চলাকালীনই সেতু এদের পাড়ায় ভাড়াটে হয়ে এসে ওর বুকের ভেতরটা তছনছ করে দিল। রিনু বাথরুমে যায়। বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে ওর বুক ঠেলে একটা কান্না বেরিয়ে আসতে চায় চোখ জ্বালা করে। চোখে পানি দেওয়ার সময়ই ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সেতু এসেছে, ও এলেই রিনুর ভেতরে একটা কবুতর লাফায়। রিনু দেখল ভাইজানের সঙ্গে গল্প করছে সেতু। ভাইজান রিনুর দিকে চেয়ে বলল, ইস তুই চলে গেলে খুব খারাপ লাগবে।

সেতু কিছুই না বলে একটা বই উল্টাতে থাকে। রিনু পাশের রুমে যায়। মা কাপড় সেলাই করছেন। রিনু রান্নাঘরে যায়। কাজের বেটি মসলা বাটছে। রিনু বারান্দায় আসে। ছোট বোনটা কুতকুত খেলার দাগ কাটছে বারান্দায়। রিনু মাকে ডিঙিয়ে আবার ড্রয়িং রুমে যায়। ভাইজান বেরিয়ে গেছে। সেতুর চোখ বইয়ে। রিনু ক্যাসেটের প্লেতে চাপ দিল পংকজ জেগে উঠল। সেতু রিনুর চোখে চোখ রাখল, আজ আমার বাসায় কেউ নেই, তুমি এসো। আকুলতা হিমালয়... বলতে চাইল রিনু। হিমালয় ছাড়িয়ে সেটা আকাশ ছুঁয়েছে রিনু, প্রায় চিৎকারের ভঙ্গিতে বলল সেতু। আমি তোমাকে আবিষ্কার করব। বিশ্বাস করো আমার দৃষ্টিতে একবিন্দু অপবিত্রতা থাকবে না। রিনু ঠাণ্ডা চোখে সেতুকে বলল, চলো।

সেতু কাঁপছে। চোখ বুজে শুয়ে আছে রিনু। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত উদাস শরীরে সেতুর দৃষ্টি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। রিনুর ঠোঁট কাঁপছে, সেতু ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। তারপর সে নতজানু হয়ে বলল, তুমি আমার ভাগ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছ ঈশ্বরের মতো। তুমি এত সুন্দর রিনু। রিনু যেন জমে আছে। সেতুর কোনো কথাই তার মনে গেল না। সেতু চোখ বুজে প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে ফেরাল, তারপর পাশের রুমে চলে গেল।

রিনু স্বাভাবিক হয়ে ফিরে এলো সেতুর কাছে। তারপর মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। সেতু রিনুর হাত ছুঁয়ে বলল, পৃথিবীতে এত সুন্দর শিল্প থাকতে আমি শুধু শুধুই বনে বনে ঘুরি। শিল্পের সন্ধানে। রিনু তুমি আসলেই... তুমি...।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সেতু বারান্দায় পা রাখল। রিনু ড্রয়িংরুমে বসে দেখল সেতুর হাতে বড় একটা ক্যানভাস। সেতু আলতো পায়ে এগিয়ে এলো ড্রয়িংরুমের দিকে। রিনু স্থির কণ্ঠে বলল, আমি কালই যাচ্ছি।

আমি জানি সেতু বলল। রিমু সেতুর দিকে তাকিয়ে থাকে। সেতু সোফায় বসতে বসতে বলল, তোমার চোখ খুব সুন্দর। রিনু স্থির বসে থাকে। ক্যানভাসটা রিনুর সামনে মেলে ধরে সেতু। একটা ঘন সবুজ বন এবং সেই সবুজের ভেতর একটা সাদা উদোম শরীর মিশে আছে। মেয়েটার হাত চাঁদের শরীর ছুঁতে চাচ্ছে। চোখ বুজল রিনু।

আমার হাজব্যান্ড নতুন করে জানব আমি– রিনু ঠোঁট কামড়ে বলল এবং ওর বুকের প্রতিটি শব্দ নিয়ে ওকে ভালোবাসতে চেষ্টা করব।

সেতু তুমি...।

সেতু ক্যানভাসটা রিনুর হাতে দিল। তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, তাই করো। আজ থেকে আমি তোমার অস্তিত্বের বাইরে চলে যাব। তোমাকে আর ছুঁতেও আসব না কোনোকালে। তুমি এয়ারপোর্টে যাবে না? রিনুর আকুল কণ্ঠ। ওই সৌজন্যের ভয়েই তো পালাচ্ছি। তুমি যা দিয়েছ তার ভার নিয়ে আজই আমাকে যেতে দাও। রিনু বলল, তবে সমস্ত স্মৃতির মুখে ফুঁ দিই? তুমিও ফুঁ দিয়ে সব সম্পর্কের অস্তিত্ব ভাসিয়ে দিয়ে এত সহজেই ভাসিয়ে দেখা যায় যদি মনে করো তবে রিনুর দিকে তীব্র চোখে তাকাল সেতু, তারপর বলল আগে তুমিও ফুঁ দাও।

রিনু চোখ বুজে সেতুর হাত টেনে নিল ঠোঁটে। ভিজে এলো। সে ঠোঁট দুটো জড়ো করল– ফুঁ। সেতু রিনুর ঠোঁটের বাতাস হাতে পেয়ে সচেতন হলো, সে বিস্ময়ভরা চোখে রিনুর দিকে তাকাল। রিনু সেতুর হাত চেপে ধরল। তুমি ফুঁ দিলে না? সেতু হাত ছাড়িয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। রিনু প্রায় চিৎকার করে উঠল। সেতু আমি হেরে গেছি সেতু, প্লিজ...।

সেতু বারান্দার বাইরে পা রাখল। রিনু দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু অনুভব করল ওর শরীর জমে আসছে। রিনু সেতুর ক্যানভাসে চোখ রাখল, একটা সবুজ বন, উদোম নারীর এবং একটা হাত যে চাঁদের শরীর ছুঁতে চাচ্ছে। রিনু পরাজয় অথবা স্থির অনুভূতির কষ্টে হু হু কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ততক্ষণে সেতুর নীল জ্যাকেটের ছায়া উঠানের বাঁকে মিলিয়ে গেছে। ❖

শিল্পীর চোখে দেখা জিনজিরা প্রাসাদের একাংশ

শামীম আমিনুর রহমান

বিস্মৃত উপাখ্যান : ঢাকার জিনজিরা প্রাসাদ

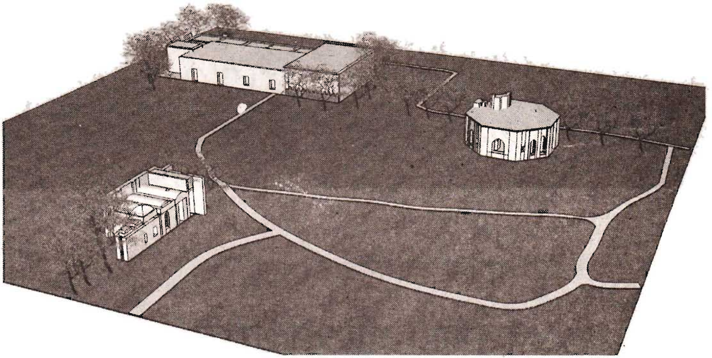


ঢাকা

ঢাকার বিখ্যাত মোগল ইমারত বড়কাটরা বরাবর বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে দক্ষিণ তীরে হাউলী (হাভেলী) গ্রাম। হাউলী শব্দটি ফারসি শব্দ 'হাভেলী'র (আবাসিক এলাকা) আঞ্চলিক বিকৃত রূপ। এই হাউলী গ্রাম আজ অসংখ্য দোকানঘর আর ইমারতের জঞ্জালে পূর্ণ অসংখ্য মানুষের বসবাসের স্থান। এই জঞ্জালের মধ্যে হঠাৎ করেই উঁকি দেবে প্রাচীন কিছু ইমারতের ভগ্নাবশেষ। এমন ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ইমারতের এ অংশগুলো প্রকৃতপক্ষে মোগল ঢাকার বিস্মৃতপ্রায় জিনজিরা প্রাসাদের টিকে থাকা শেষ স্মৃতিচিহ্ন। ঢাকায় বাংলার মোগল রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর থেকে যেসব ইমারতের কথা জানা যায় তার মধ্যে মোগল প্রাসাদ হিসেবে জিনজিরা প্রাসাদ ছিল উল্লেখযোগ্য। ঢাকার

মোগল ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী জিনজিরা প্রাসাদ। ১৬১০ সালে মোগল বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকার শুরু হলে এখানে নানা ইমারত নির্মাণ করা হয়। মোগলদের এখানে গোড়াপত্তনের আগেও ঢাকার অন্তত ব্যবসাকেন্দ্র বা থানা হিসেবে গুরুত্ব ছিল এমনটা ঐতিহাসিকরা মনে করেন। সুলতানি আমলের বেশ কিছু ইমারত মোগলদের আগে এখানে নির্মিত হয়েছিল, যার বাস্তব প্রমাণ মেলে। মসজিদ, দুর্গ, মাজার এসবের কিছু কিছু তখনও পাওয়া গিয়েছিল। তবে মোগল বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকাকে বেছে নেওয়ার পর এ শহরে তৈরি হতে থাকল বাসস্থান, দুর্গ, সরাইখানা, মাদ্রাসা, মসজিদ, প্রাসাদসহ নানা ইমারত। সে সকল ইমারতের অনেকগুলোই ঢাকার ইতিহাসের অমূল্য স্থাপত্য স্মারক। লালবাগ দুর্গ, বড় ও ছোটকাটরা, নানা মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, পুল ইত্যাদির সাথে জিনজিরা প্রাসাদও ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জিনজিরা প্রাসাদটি সম্পর্কে অর্থাৎ এর ইতিহাস এবং স্থাপত্য ও কাঠামোগত ধারণা খুব একটা পাওয়া যায়নি যেমনটি আমরা ঢাকার লালবাগ দুর্গ বা অন্যান্য মোগল ইমারত সম্পর্কে পেয়ে থাকি। জিনজিরা প্রাসাদটি সম্পর্কে কাঠামোগত ধারণা পাওয়া না যাওয়ার বড় কারণ এটি কখনোই কোনো সরকার কর্তৃক সংরক্ষণের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। খনন কাজ ও রক্ষিত হলে বাংলাদেশের একটি মোগল প্রাসাদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেত। জিনজিরা প্রাসাদের প্রতিষ্ঠাতা নিয়েও ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য রয়েছে। জিনজিরা মহলের নির্মাতা ছিলেন সুবেদার ইব্রাহিম খান। এ নামে ঢাকার দু'জন মোগল সুবেদার ছিলেন। প্রথমজন ইব্রাহিম খান ফতেহজং ঢাকায় ১৬১৭ থেকে ১৬২৪ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়জন ইব্রাহিম খান ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত ঢাকার সুবেদারের দায়িত্ব পালন করেন।

এদের দু'জনের কেউই তেমন আলোচিত ছিলেন না। প্রথমজন মোগল সুবেদার ইব্রাহিম খান ফতেহজং ১৬১৭ থেকে ১৬২৪ সাল পর্যন্ত ঢাকার সুবেদার ছিলেন। তিনি মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের তৃতীয় ভ্রাতা বা ভাই ছিলেন। ইব্রাহিম খান প্রথম শাহজাদা খুররম (শাহজাহান) বিদ্রোহী হয়ে বাংলায় এলে প্রথমদিকে তাকে বাধা দেননি। কিন্তু পরিশেষে বাধা দিতে গিয়ে পরাজিত ও নিহত হন। লেখক সৈয়দ আওলাদ হোসেন তার প্রকাশিত বই 'নোটস অন দ্য এন্টিকুইটিজ অব ঢাকা' (১৯০৪), ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত ঢাকা ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার, টপোগ্রাফি অব ঢাকার লেখক জেমস টেইলর, গ্লিমসেস অব ঢাকার লেখক সৈয়দ তৈফুর ও স্থাপত্য-বিশেষজ্ঞ আহমদ হাসান দানী তার 'ঢাকা' বইতে বাংলার তৃতীয় মোগল, সুবেদার ইব্রাহিম খান ফতেহ জং জিনজিরা প্রাসাদের নির্মাতা বলে উল্লেখ করেছিলেন। উল্লেখ করা যেতে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পলাশী যুদ্ধে তার সেনাপতি মীর জাফর আলী খানসহ অন্যদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইংরেজদের কাছে তার পরাজয় এবং স্ত্রী-কন্যাসহ পলায়নকালে যেভাবে ধৃত হন, তা আমাদের কম-বেশি সবারই জানা। সিরাজের পরাজয় ও মৃত্যুর পরই এ দেশে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুরো ভারতবর্ষ ইংরেজ বেনিয়াদের অধীনে প্রায় দুইশ' বছর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। সিরাজের প্রিয়তমা স্ত্রী লুৎফুন্নেসা, কন্যা উম্মত জহুরা, নানা নবাব আলীবর্দির স্ত্রী বেগম শরফুন্নেসা, মাতা আমিনা বেগম ও খালা ঘসেটি বেগমকে যুদ্ধের পর বন্দি করা হয়। তাদের জীবন কেটেছিল দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যে। পলাশী যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর মীর জাফর বাংলার মসনদ দখল করেন। মীর জাফরের পুত্র মীর মিরন শরফুন্নেসা, তার দুই কন্যা ঘসেটি ও আমিনা বেগম এবং সিরাজউদ্দৌলার পত্নী লুৎফুন্নেসা ও তার শিশুকন্যাকে বন্দি করে ঢাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। সময়টা ছিল ১৭৫৮ সালের আগস্ট মাস। মিরন তাদের সবাইকে বাংলার মসনদের দাবিদার ভেবে তার শত্রু মনে করতেন। সে সময়ে ঢাকার ডেপুটি গভর্নর ছিলেন যশরত খান। মীর মদন তাদের সবাইকে গোপনে হত্যা করার জন্য যশরত খানকে নির্দেশ পাঠালেন। কিন্তু যশরত খান এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাতে রাজি হলেন না। যশরত খান রাজি না হওয়ায় মিরন এ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে তার এক অনুচরকে পাঠান। তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলে নৌকাতে তোলা হয়েছিল। মাঝনদীতে সেই অনুচরের কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পেরে ঘসেটি বেগম কান্নায় ভেঙে পড়েন। অনুচরের লোকেরা মাঝ নদীতে কুঠার দিয়ে নৌকার তলদেশ কেটে



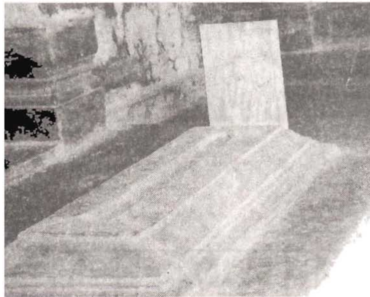


নবাব আলিবর্দি খান



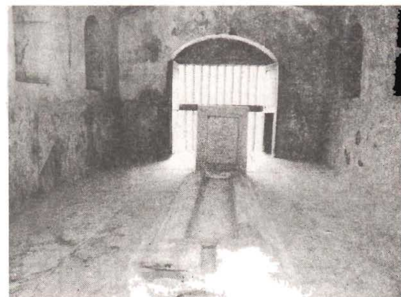
নবাব সিরাজউদ্দৌলা

দিলে তা ডুবতে থাকে। কথিত আছে যে, ওই মুহূর্তে আমিনা ও ঘসেটি বেগম এই বলে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন যে, তারা নিজেরাই জীবনে অনেক পাপকাজ করেছেন। তাই মৃত্যুই তাদের প্রাপ্য আর এই মৃত্যুর মাধ্যমেই তাদের সব পাপ নিশ্চয়ই মিরনের ওপর পড়বে। তাই ঢাকার অদূরে নদীতে এই দুই বোনের সলিল সমাধি হয়েছিল। জনশ্রুতি আছে, দুই বোন মিরনকে এই বলে অভিশাপ দেন যেন বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রে নবাব আলীবর্দির স্ত্রী



সিরাজউদ্দৌলার সমাধি

শরফুন্নেসা, সিরাজের স্ত্রী লুৎফুন্নেসা ও তার কন্যা প্রাণে বেঁচে গেলেও পরবর্তী সময়ে তাদের দুঃসময় কখনও কাটেনি। তাদের চলার জন্য যে সামান্য মাসোয়ারা নির্ধারিত ছিল তাও তারা নিয়মিত পেতেন না। ঢাকার শাসক মোহাম্মদ রেজা খান তার সময়ে তাদের নিয়মিত মাসোয়ারার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকায় প্রায় সাত বছর বন্দি জীবন কাটানোর পর লর্ড ক্লাইভের মধ্যস্থতায় লুৎফুন্নেসা, তার কন্যা ও শরফুন্নেসাকে মুর্শিদাবাদে ফেরত পাঠানো হয়। মুর্শিদাবাদের খোশবাগে আলীবর্দি ও সিরাজউদদৌলার সমাধি তত্ত্বাবধান করার দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল লুৎফুন্নেসাকে। এ জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে ৩০৫ টাকা পেতেন। এ ছাড়া মাসোয়ারা পেতেন ১০০ টাকা করে। যা ছিল খুবই অপ্রতুল। ১৭৭৪ সালে সিরাজকন্যা উম্মত জহুরার মৃত্যু হয়। তার ছিল



লুৎফুন্নেসার সমাধি

চারটি কন্যাসন্তান, যাদের লালন-পালনের দায়িত্ব লুৎফুন্নেসাকে নিতে হয়। লুৎফুন্নেসা আমৃত্যু সিরাজউদদৌলার সমাধির দেখাশোনা করেছিলেন এবং রোজই তিনি সিরাজের সমাধিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতেন। ১৭৯৫ সালের নভেম্বরে লুৎফুন্নেসা মৃত্যুবরণ করেন। ❖

অলঙ্করণ : : সুমন



গল্প

রেজাউর রহমান

টুনটুনির কবিতামালা

নামে আবাসিক এলাকা। বাস্তবতায় তা অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক এলাকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। দৃশ্যত দু'একটি আবাসিক আস্তানার পরপর দু'চারটে বাণিজ্যিক-আধা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যে আছে বা থাকবে, তা নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায়। তা বিশতলা থেকে শুরু করে বেজমেন্ট পর্যন্ত সকল তলা বা কম্পার্টমেন্ট ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে একেবারে ঠাসা। উচ্চ তলা থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন বেজমেন্ট পর্যন্ত এর আগ্রাসী বাণিজ্যিক দৌরাত্ম্য। সবখানে নানা ধরনের ছোট-বড় কায়কারবারের রমরমা বিস্তার।

তেমনি একটা বেজমেন্টে আমি প্রায়শ যাতায়াত করি। প্রয়োজন সামান্য। সেখানকার 'প্যারাডাইস ফটোকপিয়ার' প্রতিষ্ঠানে আমি যাই। তা প্রতিদিন না হলেও দু'চার দিন পরপর আমি ফটোকপি করতে যাই। তা বেশিরভাগই আমার হাতের লেখা কাজের অনুলিপি রাখার প্রয়োজনে। কারণ কম্পিউটার প্রযুক্তির যথাযথ শিক্ষা ও ব্যবহার আমার আয়ত্তে আসেনি।

প্যারাডাইস ফটোকপির দোকানটা উঁচু বিল্ডিংয়ের বেজমেন্টের উত্তর সাইডের প্রায় পুরোটা নিয়ে অবস্থিত। এর ভেতরে লম্বালম্বি পরপর সাতটি অত্যাধুনিক কপিয়ার মেশিন রয়েছে। এককেকটা মেশিনের সঙ্গে একজন বা দু'জন কর্মচারী। এর মধ্যে সিরিয়ালের সাত নম্বর মেশিনটার দায়িত্বে রয়েছেন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মচারী। তিনি তার দায়িত্বে থাকা নির্দিষ্ট মেশিনের কোম্পানির বড় বড় কাজ করেন। তিনি যথেষ্ট গুছিয়ে গাছিয়ে সময় ধরে তার কাজ করেন। তুলনামূলক আমার কাজগুলো ছোট ও অল্পক্ষণের জন্য বলে তার কাছে আমার যাওয়া হয় না তেমন। তবে সেই কর্মচারীর হাত সময় সময় ফাঁকা থাকলে আমারও দু'একটা কাজ করে দেন তিনি। একদিন আমার একটা পুরনো এডিশনের বই কপি করার প্রয়োজন পড়ে। দোকানদারের কাজ ধরা ও দ্রুত শেষ করার তাগিদ থাকে বলে পুরো বই মেশিনে ছাপানোর কাজ তিনি নিতে চান না। এতে মেশিনের ক্ষতি হয়। আমার বেলায়ও দোকানি নারাজ হলে, সাত নম্বর মেশিনের বয়স্ক কর্মচারী আমাকে ডাকেন। 'আমার হাত খালি... আসেন করে দিচ্ছি।'

দোকানি বাঁকাভাবে তার দিকে চাইলেও তিনি সাধারণত সাত নম্বর মেশিনের বহুদিনের কর্মচারীকে ঘাঁটাতে চাইলেন না। বইটা হাতে নিয়ে কর্মচারী একটু অসুবিধায় পড়ে গেলেন। তিনি আমার দিকে তাকান।

'এ যে দেখি বেশি পুরনো... বাইন্ডিংয়ের সুতা-পাতা খুলে গেছে। অগোছালো হয়ে আছে। এ অবস্থায় আপনি বরং আমাকে সাহায্য করেন... ভেতরে চলে আসেন!'

আমি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই। তিনি নিজেই ঠিকঠাক করছিলেন। এরপরও যেখানে নম্বর-পাতা মিলিয়ে সাজিয়ে রাখতে অসুবিধা হচ্ছিল, সেখানে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নেন। এ ছাড়া তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গে টুকটাক কথা বলতে থাকেন।

'আপনি লেখেন... না?'

'হ্যাঁ... অবসরে জীবন... একটা কাজ তো বেছে নিতে হয়। তা না হলে সময় কাটাই কেমনে?'

'আমারও তো একই অবস্থা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে অবসর নিয়ে সুবিধামতো কোনো কাজ পেলাম না। একদিন এই ফটোকপি প্রতিষ্ঠানের মালিক আমাকে ডেকে নিলেন। তিনি আমাকে চিনতেন। তার বাড়ি আমার পাশের গ্রামে। এই লেগে গেলাম। ভাবলাম, বসে থাকার চেয়ে...। তাও-তো অনেক দিন হয়ে গেল এখানে। সাত-আট বছর।'

আমার বইয়ের কাজটা সারতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগে গেল। ততক্ষণে লাঞ্চ ব্রেকেরও সময় হয়ে এসেছে। কাজটা আমাকে গুছিয়ে বুঝিয়ে দিতে দিতে কিছুটা বিনয়ী হয়েই প্রস্তাব করেন তিনি।

'আমি এখন খেতে যাবো। পাশেই এক হোটেলে খাই। বেশি খেতে পারি না আজকাল। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে পানি খাই। আপনি যদি কিছু মনে না করেন... আমার সঙ্গে একটু বসবেন... এক কাপ চা...। আমার সামান্য একটু কথা ছিল।'

আমি ঘড়ি দেখি। আমার হাতেও সময় কম। তারপরও তার অনুরোধ না রেখে পারিনি। তিনি বের হওয়ার আগে নিজের তালা লাগানো শেলফ থেকে পুরনো-বিবর্ণ একটা চটি খাতা নিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখেন। যত্নসহকারে মাঝখানে ভাঁজ করে। হোটেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তিনি জানান, তার নাম নীলাক্ষ রোজারিও। হোটেল বয় তার প্রতিদিনের রুটিনমতো বয়স্ক কর্মচারীর সামনে কম তেলের একটা পরোটা ও সঙ্গে অল্প সুজির হালুয়া রেখে যায়।

'আপনার জন্য কী অর্ডার করবো?'

'কিচ্ছু না... আমি বাসায় গিয়ে ভাত খাবো।'

'এক কাপ চা?'

একটু ভেবে আমি বলি, 'তা হতে পারে। তবে চিনি-দুধ ছাড়া।'

বয়স্ক কর্মচারী যেন হালে পানি পেলেন।

একটু পরোটা-হালুয়া মুখে দিয়ে খানিকটা আমতা আমতা করে বলেন,

'আপনি তো লেখালেখি করেন। পত্রপত্রিকায় দু'একবার আপনার লেখা অবশ্য দেখেছি। তবে পড়া হয়নি। আমি বলছিলাম কি...'

বলতে বলতে তিনি পকেট থেকে বিবর্ণ চটি খাতাটা বের করেন। সযত্নে ভাঁজ খুলে আমার সামনে ধরেন।

'আমি বলেছিলাম কি... ৪৪-৪৫ বছর আগেকার কথা। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে যাওয়ার আগে টুনিকে বলে গিয়েছিলাম, তাকে চিঠি লিখবো। টুনি তখন এই খাতাটা বের করে দিয়ে বলেছিল, এই খাতাটাতে লিখে রেখো তোমার সব কথা... যুদ্ধের কথা। ফিরে এসে সব শুনাবে আমাকে। রাতে নিরি-বিলি বসে বসে শুনবো সে সব।'

আমি বিষণ্ন হাসি হেসে বলেছিলাম, 'এই খাতায় যদি লিখতে হয়... তবে শুধু আমার টুনটুনির (টুনিকে আমি টুনটুনু ডাকতাম) কথাই লিখবো। যদি পারি ... যদি বেঁচে থাকি। আর মরে গেলেও এ খাতা তুমি পাবে কোনোদিন।'

তখন টুনি আমার মুখ চেপে ধরেছিল সেদিন।

'এমন কথা মুখে আনবে না।'

রোজারিও খাওয়ার কথা ভুলে বলে যান। তিনি বলে যান : আমার বাড়ি সাভার যেতে পথে পড়ে। পথের বাঁ পাশে হেমায়েতপুর– সিংগাইয়ের পথ ধরে এক কিলোমিটার গেলে ডান পাশে প্রথম পড়ে ইসাখালী গ্রাম। এর পরেরটা হলো দুধখোলা। টুনির বাড়ি ছিল 'দুধখালী'তে। তার বাবা ছিলেন এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দুধকারবারি। সুব্রত দাস। গাই-গরু যে তার কতগুলো ছিল টুনি বলতে পারতো না। গরু দেখভাল করার জন্য তাদের চারটা রাখাল ছেলে ছিল। আর টুনিদের ছিল অনেকটি খড়ের মাচাং। মেঘ-বাদলাতে এগুলো ছিল গাই-গরুর খাবার। আমি যেতাম ইসাখালী থেকে আর টুনি আমার জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করে থাকতো দুধখোলা গ্রামের খড়ের গাদার আড়ালে। আমি তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলে টুনি কোনো খড়ের গাদা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আমাকে চমকে দিত। আর তখন আমাদের শুরু হতো একে অপরকে জড়িয়ে ধরা, একটানা হাসির তাণ্ডব। তারা সিংগাইর স্কুলে পড়তো। তাদের বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল সেখান থেকেই। টুনি অবশ্য রোজারিওর তিন ক্লাস নিচে পড়তো।

আমি কলেজ পাস দিয়ে কিছুদিন বেকার ঘোরাঘুরি খোঁজাখুঁজি করতে করতে একদিন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়ে গেলাম। চাকরির চিঠিটা হাতে নিয়ে নিজের বাড়ি ছাড়িয়ে প্রথম গিয়েছিলাম দুধখোলাতে। সেই সময়টা আমাদের সচরাচর দেখা-সাক্ষাতের সময় ছিল না বলে টুনির দেখা পেতে আমার কিছুটা দেরি হয়েছিল। টুনি তখন তাদের



অন্দরমহলের শান বাঁধানো পুকুরঘাটে রোদে চুল খুলে শুকাচ্ছিল। রাখালবাড়ির ছোট্ট এক ছেলে খবরটা দিলে টুনি তখন ছুটে এসেছিল। 'ওগোর' কাছে (টুনি তাকে নাম ধরে ডাকতেন না)।

বুক পকেট থেকে রোজারিও চাকরির কাগজটা বের করেন।

'বল-তো এটা কী?'

'কাগজ।'

ব্যাপারটা তিনি খুলে বললে টুনি তাকে খড়ের গাদার আড়ালে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়। তার সারা মুখ, সারা অঙ্গ। টুনি সেদিন এতটা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিল যে, কথা বলতে গলা তার কাঁপছিল।

'এবার আমাদের কথাটা বলা যায়।'

'কী কথা?'

'ওমা, তুমি দেখি ন্যাকা সাজছ... আমাদের বিয়ের কথা। নাকি তোমার অন্য কোনো মতলব...?'

'তা নয়। তবে আমাদের ধর্ম।'

'কিসের ধর্ম? আমরা মানুষ। এটাই তো আমাদের ধর্ম।'

'কিন্তু তোমার বাবা-মা? আমি খ্রিষ্টান... তোমরা সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার।'

'সেই দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেও। আমি আমার বাবা-মার একমাত্র আদরের মেয়ে। আমি যাই বলবো বাবা-মা...।'

'তাই... তুমি যখন এত নিশ্চিত তখন আমারও পরিবারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয়।... রাজি না হলে আমি বাড়ি ছেড়ে দেব। চাকরি-বাকরি করছি... রোজগার আছে... আবার কী?'

রোজারিও কিছুটা দুর্বল হতে হতে যেন শক্তি সঞ্চয় করে ফেলে।

'ব্যাপারটা যদি অসম্ভবের দিকে চলে যায় তখন আছে কোর্ট। দু'জনে দাঁড়াবো কোর্টে। বলবো, আমরা অ্যাডাল্ট...।'

টুনি চোখের জল ছেড়ে দেয়। রোজারিওর বুকে মাথা রেখে বলে,

'এই না পুরুষ... আমাদেরকে এই পৃথিবীর আর কেউ আলাদা করতে পারবে না... পারবে না পরকালেও।'

রোজারিও তার সামনে রাখা খাবারের কথা ভুলে গিয়ে বলে যান : ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাতে ঢাকায় যে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছিল তার সঠিক রূপ। সিংগাইর হয়ে ইসাখালীতে পৌঁছুতে কিছুটা সময় লেগেছিল। তখন এর আশপাশের দু'চার গ্রামের ছেলেমেয়েরা একত্রিত হয়। যে যার যার অবস্থান, লক্ষ্য স্থির করে। তাদের প্রথম সিদ্ধান্ত, গ্রাম-গ্রামবাসীর নিরাপত্তা। তারা তখন জোট বেঁধে চলতে শুরু করে। নিয়মিত রেডিওর খবর শোনে। ভিন্ন সূত্রে আসা সংবাদ, আসন্ন আপদ-বিপদের কথা আলোচনা করে। আরও সাবধান হওয়ার ব্যাপারে সজাগ থাকে। সচেষ্ট হয়।

মাস দেড়েক পর একদিন ভোর রাত থেকে সামরিক যানবাহনের বহর সাভারের দিকে চলতে চলতে সিংগাইয়ের পথের বাঁকে এসে দাঁড়ায়। সামান্য বিরতিতে তা সিংগাইর স্কুল মাঠে এসে জড়ো হতে থাকে। মিলিটারি বাস-লরি-জিপ, টানা কামান-মর্টারে ভরে যায় পুরো স্কুল মাঠ। বাস-লরি-জিপ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামে বেয়নেট-বন্দুক উঁচানো পাকিস্তানি সেনারা।

সূর্য ওঠার আগে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। খবর পৌঁছে যায় ইসাখালী-দুধখোলা গ্রামেও। সবাই সচকিত হয়। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আশপাশের কয়েক গ্রামের শক্ত-সমর্থ যুবক-পুরুষরা সব জড়ো হন কান্দিপাড়ার রুস্তমের বাড়ির উঠানে। অনেকের মধ্য থেকে রুস্তম-কুদ্দুস-সুশীল-এডওয়ার্ডের নেতৃত্বে নিজেদের যার যার বাড়িঘরের মা-বোনদের সুরক্ষিত করা, জমায়েত থাকা পাক-সেনাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা, সম্ভাব্য বন্দুক চালনা ও নিজেদের আত্মরক্ষার কৌশল ইত্যাদি নিয়ে নিচু স্বরে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। আগামীদিনের লক্ষ্য নিয়েও কেউ কেউ ভাবনা-চিন্তার কথা বলেন।

এদিকে পাক-সেনারা হঠাৎ হঠাৎ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আশপাশের গ্রামে ঢুকে নির্বিচারে মানুষ হত্যা, ধর্ষণ, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। তখন যারা বেঁচে গেল তারা আরও দূরে দূরে, ভেতরের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে।

বাড়িঘর ছেড়ে অনেকের সঙ্গে পালিয়ে যায় দুধখোলা গ্রামের টুনির পরিবারসহ অনেকে। পালিয়ে যাই আমিও।

ইসাখালী-দুধখোলা গ্রাম ফাঁকা হয়ে যায়। তখনও টুনির-আমার যোগাযোগ ছিল।

মাসখানেকের মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার বাড়ে। যুবক-কম বয়সী পুরুষরা তখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জিঞ্জিরা হয়ে ভারতে যেতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধাদের এই যাওয়া-আসার দায়িত্বে ছিলেন কুদ্দুস ও সুশীল। একদিন রোজারিওর ট্রেনিংয়ের ডাক পড়ে। যাওয়ার আগে আমি টুনির সঙ্গে দেখা করতে যাই। মনে পড়ে, তখন টুনি আমাকে এই চটি খাতাটা দিয়েছিল। আর তার শেষ আবেগি চুমোয় আমাকে বিদায় দিয়েছিল। এইটুকু বলে রোজারিও তার হাতের চেটোয় চোখের জল মোছেন। যুদ্ধ শেষ হলো। আমি মরতে গিয়েও বেঁচে এলাম। মরে গেলেও এক ভালো ছিল। ফিরে টুনিকে আর পেলাম না। পেলাম না তার পরিবারের কাউকে। বর্বর সেনাদের বেশি রোষ ছিল বিধর্মীদের ওপর। অনেক দিন পর জানতে পেরেছিলাম, কান্দিপাড়ার রুস্তমই নাকি এ এলাকার রাজাকার বাহিনীর বড় নেতা হয়েছিল। তার দলই নাকি প্রথমত হিন্দু-খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েদের ধরে নিয়ে আর্মি ক্যাম্পে নিয়মিত সাপ্লাই দিত। বিনীত হয়ে রোজারিও টুনির দেওয়া সেই খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দেন। টুনির জন্য লেখা আমার কবিতাগুলো সময় হলে পড়ে দেখবেন। আর যদি সম্ভব হয় ... পছন্দ হয়, দু'একটা কবিতা ছাপানোর চেষ্টা করবেন। এতদিন পর...।

সামনে তার রুটি-হালুয়া। খাওয়া হয়নি। আমার সামনে রুটি। রোজারিও দেয়াল ঘড়ি দেখেন। তাড়াহুড়া করে রুটি মুখে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। ডিউটির সময় পার হয়ে গেছে। তিনি বিদায় নেওয়ার আগে তার হাতের চেটোয় আমার ফোন নম্বরটা টুকে নেন। 'যোগাযোগ থাকবে। আসি ...।'

আমি বিষণ্ন-ভারাক্রান্ত হয়ে হাঁটি। ধীর পায়ে বাড়ি ফিরি। রোজারিওর জন্য মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। আমার নিয়ম-সময় ধরে দুপুরের খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। স্ত্রী আফছানা আমার ওপর তার বিরক্তি প্রকাশ করেন।

রাত বাড়ছে। ঘুম আসছে না। একাত্তরের যুদ্ধের সময় আমিও ২৫-২৬ বছরের যুবক। ইচ্ছা থাকলেও সে সময় বর্ডার ক্রস করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নিজের খুব কাছে-কিনারের জান-মালের তেমন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও যুদ্ধের ভয়-ভীতি-আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। সারাক্ষণ স্বচক্ষে দেখেছি অনেক, শুনেছি আরও বেশি। সেই শোনা আজো শেষ হয়নি। রোজারিওর কথা মনে হতে, আমাকে তার দেওয়া চটি খাতাটার কথাই বেশি মনে পড়ে। টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে উঠে বসি। রোজারিওর খাতাটার পাতা উল্টাই। প্রথম পাতা উল্টাতে দেখি, সাজিয়ে-গুছিয়ে সুন্দর করে লেখা 'টুনটুনির কবিতামালা'। এই লাইনটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারি-নি অনেকক্ষণ। পরে পুরো খাতাটা নেড়েচেড়ে দেখি। দু'একটা লেখা সাধারণ হলেও ছাপানো যায় বলে আমার মনে হলো।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে ভাবি, কালই শফিকের কাছে যাব। সে আমার ঘনিষ্ঠ কবি বন্ধু। খুব একটা চলতি নয়, এমন একটা দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক।

শফিক রোজারিওর মতো বিপন্ন এক সৈনিকের কবিতা ছাপাতে রাজি হয়।

পরের সপ্তাহে শুক্রবার 'টুনটুনির কবিতামালা' শিরোনাম দিয়ে বর্ডার টেনে যত্ন করে নীলাক্ষ রোজারিওর তিনটি কবিতা ছাপা হয়। পত্রিকা হাতে পেয়েই আমি প্যারাডাইস ফটোকপিয়ারে গিয়ে হাজির হই। সেখানকার পরপর সাজানো মেশিনের শেষের সাত নম্বর মেশিনটির চেয়ারটি খালি। আমি ভাবি, হয়তো তিনি এখনও আসেননি। নয়তো চা খেতে গেছেন। এসে পড়বেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মালিককে রোজারিওর কথা জিজ্ঞেস করি। মালিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'তিনি গত সপ্তাহে মারা গেছেন। তবে তা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কী গোলমাল হয়েছে শুনলাম!'

এমন একটা খবরের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। প্রচণ্ড এক আঘাত পেলাম। আমি তার সিংগাইয়ের ঠিকানাটা মালিকের কাছ থেকে নিলাম। রোজারিওর ছাপা কবিতার পত্রিকাটি সযত্নে ব্যাগে ভোরে তার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। ইসাখালী গ্রামে গিয়ে এক ছেলেকে রোজারিওর কথা জিজ্ঞেস করতে সে নিজে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়।

জনমানবশূন্য বাড়ি। ছেলেটির ডাকে বৃদ্ধ এক মহিলা বের হয়ে আসেন। ছেলেটি তাকে দেখিয়ে দিয়ে দ্রুত কেটে পড়ে।

'কী দরকার বাবা? আমি রোজারিওর মাসিমা। তুমি কোত্থেকে?'

'ঢাকা থেকে। আমি রোজারিওর বন্ধু।'

'আস বাবা বস। রোজারিওর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তাকে গলা কেটে হত্যা করে গেছে।'

'কী বলেন!'

'হ্যাঁ, তারা চিঠি দিয়ে গেছে। এ এলাকায় মোসলমান ছাড়া বিধর্মীর জায়গা নাই।' আঁচলে চোখ মুছে আবার বলতে থাকেন মাসিমা।

'পাড়ার কয়েকজন কলেজপড়ুয়া ছেলে তাকে সিঙ্গাইয়ের মুক্তিযোদ্ধা গোরস্তানে কবর দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। গোরস্তান কমিটি রাজি হয়নি। মোসলমানের কবরস্থানে খ্রিস্টানকে মাটি দেওয়া ঠিক হবে না। বরং তাকে ঢাকার ওয়ারীর কাছাকাছি খ্রিস্টানদের গোরস্তানে নিয়ে যান।' মাসিমা ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

রোজারিওকে কে নিয়ে যায়? তার তো কেউ নাই। জীবনে বিয়ে-শাদি করেনি... সন্তান-সন্ততিও নেই। অগত্যা পাড়ার সেই ছেলেগুলোর পরামর্শে ও মাসিমার ইচ্ছায় রোজারিওকে তাদের লেবুতলায় কবরস্থ করা হয়। বাড়ির পশ্চিম কোনায়। মাসিমা আমাকে রোজারিওর কবরের কাছে নিয়ে যান। সেখানটায় বেশ কয়েকটা সুন্দর লেবুগাছ। তাতে অসংখ্য লেবু ধরে আছে। রোজারিওর নিজ হাতে লাগানো চারা। সে লেবু দিয়ে চা খেতে পছন্দ করত।

আমি রোজারিওর কবরের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় কাটাই। দাঁড়িয়ে থাকি নীরবে। চোখ আমার বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তার লেখা ছাপানো কবিতার কথা মনে পড়ল। একবার ভাবলাম, পত্রিকাটি কি মাসিমাকে দিয়ে যেতে পারি? আবার ভাবি, এরইবা কী অর্থ তার কাছে! এর মূল্য যে শুধু একজনের কাছেই ছিল। ...

আমি ঘুরে দাঁড়াই।

'আজ আসি মাসিমা।'

তাড়াহুড়ো করে বেশ কয়েকটি কাগজি লেবু তুলে আমার ব্যাগে ভরে দেন মাসিমা।

'বাবা, আর তো কোনোদিন আসবা না। আমি গরিব মানুষ। আমার দেয়ার মতো কী বা আছে? খ্রিস্টের কাছে তোমার জন্য দোয়া করি। বেঁচে থাকো...।'

আমি মাসিমার পা ধরে সালাম করে ঢাকার পথে রাস্তায় নামি। আমি পেছন ফিরে চাইতে পারলাম না। আমি জানি, পৃথিবীতে রোজারিওর জন্য কান্নার একজনই শুধু রয়ে গেছেন। তিনি কাঁদছেন। কাঁদবেন বাকি জীবন। ❖



অলঙ্করণ : : বিপ্লব সরকার



বিপ্রদাশ বড়ুয়া

ভালোবাসা ও স্বপ্নের খেলাঘর

রুবাবার শেষকৃত্য করে বাসায় ফিরে এলাম। ঢাকায়। রাত এগারোটা। রীতি অনুযায়ী নীলিমা দরজা খুলে দিল। পরশুর মতো কিশোরী-তরুণীর অনাবিল মিষ্টি হাসি ওর নেই। বিষাদে মোড়া ওর হাসি ও দাদাবাবু সম্ভাষণ। আপনিতেই আমার মাথা নিচু হয়ে আছে। আমার ঢোকার পর সে দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দেবে। আমি ততক্ষণে জুতো জোড়া বাঁ পাশে রাখব ঠিক ঠিক জায়গায়। রুবাবা প্রথম প্রথম আমার জুতো পালিশ করে দিতে চাইত।

ঝেড়ে-পুছে রাখতে চাইত। অফিসে যাওয়ার সময়ও। আমি দিব্যি দিয়ে ওকে থামিয়েছি। নীলিমাকেও। চান করার পর গামছা-লুঙ্গি ধোয়া ও শুকোতে দেওয়া আমার পছন্দ। জুতো খুলে মাথা তুলতেই দেখি মুরাসাকি। বিষাদিনীর সৌন্দর্য-প্রতিমা হয়ে জাপানি কেতায় জোড় হাতে দাঁড়ানো। তেমনি ঝুঁকে পড়েছে আগের মতো যোগ্য সম্মান দেখানোর ভঙ্গিতে। ওকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব বা প্রশংসা করব আমি কিছুই খুঁজে পাই না। পরে আমি জানতে পেরেছি, নীলিমা থেকে সে মৃতদেহ সৎকারের খুঁটিনাটি জেনে নিয়েছে।

'সবকিছু ঠিকমতো হয়েছে তো?'– মুরাসাকি স্থির আকুলতায় জানতে চাইল। উত্তর দেওয়ার আগে আমার গলা আটকে গেল। সেই ভাসমান ঘূর্ণি-আবেগে ওর চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। রোহণের কথা জিজ্ঞেস করার আগে আমাকে রুবাবার কথাই বলতে হলো। এ রকম পরিস্থিতিতে পড়ে মানুষ কী করে; কোন কাজটি আগে কোনটি পরে করতে হয় তা আমি জানি না। তার মধ্যে মুরাসাকি শিকোবু এসে জড়িয়ে পড়েছে। এসব কি পূর্বনির্ধারিত, পূর্বপরিকল্পিত, নিয়তির খেলা! এই দিন আমার বাবার উপস্থিত থাকার কথা ছিল। বাবা থাকলে সবকিছু অন্যরকম হতো। বাবার পরিকল্পনামতো চলত। বাবা কী চেয়েছিলেন তা এখন একমাত্র মুরাসাকিই জানে। আমি ওর মতো মাথা নুয়ে দু'হাত জোড় করে অভিবাদন জানিয়ে পাশের শৌচাগারে ঢুকে পড়লাম। ওটা আমার স্বভাব। বাইরে থেকে এসে হাত-পা ধুয়ে তবেই অন্য কাজ। এও রুবাবা থেকে পাওয়া প্রশান্ত অভ্যেস।

'রোহণ ঘুমুচ্ছে। তুমি কি ওর কাছে যাওয়ার আগে চানটা সেরে নেবে?' মুরাসাকি তার ইচ্ছের কথা অনুরোধের মোড়কে জানিয়ে দিল। পাথর আবেগে।

'হ্যাঁ, তাই করা উচিত।' যদিও আগে ওকে দেখার বাসনা আমাকে এতক্ষণ ধরে চেপে ধরে আছে। রুবাবার অপূরণীয় অভাব যদি তাতে সামান্যও পূরণ হয়।

আমি চাদর ও পাঞ্জাবি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে চানঘরে ঢুকে গেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেই নীলিমা ঘরে গায়ে দেওয়ার শাল এনে দিল। মুরাসাকি শোবার ঘরে। রোহণ ঘুমুচ্ছে। অপরাধীর গলায় মুরাসাকি থেকে জানতে চাইলাম, 'বাবু ঠিকমতো দুধ খাচ্ছে? তোমাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব বলো?'

'তোমার এই দুঃসময়ে দেখা হওয়াটাই বোধ হয় পূর্বনির্ধারিত। আগেও বলেছি। আবারও তা কেন যে মনে হচ্ছে! তার আগে তুমি কি এক কাপ সবুজ চা...!'

'ঠিক তাই। আমারও মনে হচ্ছে কী যেন আমি চাই... শরীর চাইছে।'

'তোমার আসার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়েছে। সবুজ চা।'

'তুমি এরই মধ্যে ওটাও চিনে নিয়েছ?' বলে আমি হাসতে চেষ্টা করলাম।

'আমার মনে হয়েছে। মনে হয় চিনে নিয়েছি।' বলে সে চলে গেল সবুজ চা বানাতে। খুব সম্ভবত ওদের সবুজ চা বানাতে। নিশ্চিত সে তা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। রোহণ ঘুমুচ্ছে। ও নিজের মায়ের আদর ও স্পর্শ পায়নি। মুরাসাকিই এখন ওর সবকিছু। সে মা এবং অ-মাকে কি অনুভব করতে পারে? মায়ের বুকের দুধ কীভাবে খেতে হয় তাও তো শেখেনি। বোঝেনি। আদরটা তো বুঝতে পারছে অথবা সেই বোধ কি জন্মগতভাবে শিশু বুঝতে পারে? এখন পর্যন্ত আমি ওকে ঘুমের মধ্যে দেখেছি। কাঁদতে এখনও শুনিনি। হাসতেও দেখিনি। কয়বার দুধ খেয়েছে– মুরাসাকির কাছে জানতে চাইতেও পারছি না। ওকে বাদ দিয়ে নীলিমার কাছে জানতে চাওয়াও উচিত নয়; বুঝতে পারি। প্রতিটি মুহূর্ত বা পদক্ষেপে আমি রুবাবার অভাব শুধু নয়, ওর অভাবে অসহায় বোধ করছি।

চায়ের পটে করে ট্রে সাজিয়ে চা নিয়ে এলো মুরাসাকি। টেবিলে রেখে চা ঢেলে নিল এক কাপে। ঘরে দুটো চেয়ার রেখেছে। আমার হাতে তুলে দেবে জানি। তাই আমি টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম। আনত চোখে সে কাপ তুলে দিল আমার হাতে। সৌজন্য প্রকাশে ওর জুড়ি মেলা ভার।

'কাকাবাবু এসেছিলেন, শিশু বিশেষজ্ঞ সঙ্গে নিয়ে।'

ওর কাপে চা ঢেলে দিতে দিতে বললাম, 'ডাক্তার কী বললেন?'

'সবকিছু ঠিকঠাক আছে বললেন।'

সবুজ চা গায়ের উষ্ণতা ফিরিয়ে দিতে লাগল। কোমল তরল সুগন্ধ। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে চাঙ্গা করে দিচ্ছে কোষকণা। কোমল মরমী উত্তেজনা। এত ভালো সবুজ চা আগে চেখে দেখার সুযোগ পাইনি। ওকে ধন্যবাদ জানালাম।

'তুমি একেবারে তোমার বাবার মতো অনুভূতিশীল।' মুরাসাকি বলল।

'বাবার অভাব এখন আমি বেশি অনুভব করছি।'

এ সময় নীলিমা এসে বলল, 'দাদাবাবু, তোমাদের খাওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। খাবার দিচ্ছি।'

'তাই তো। কত রাত হয়ে গেল!' বলে মুরাসাকি কাপ নিয়ে চলল খাবার টেবিলে। আমিও চললাম। যাওয়ার সময় বাবুর দিকে তাকালাম। ওপাশে টেবিলে ওর জিনিসপত্র পরিপাটি করে সাজানো। হঠাৎ মনে হলো, রুবাবা বুঝি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। মুখ ফেরাতেই দেখি সাঁই করে একটা ঢেউ খেলে গেল। আমার কল্পনা, কিন্তু বাস্তবতার খুব কাছের। দেখি রোহণের ঠোঁট নড়ছে দুধ খাওয়ার ছায়া-ভঙ্গিতে। তখন এও মনে হলো, ওকে একা রেখে যাওয়াই ভালো। রুবাবা বাধাহীন স্বাধীনতা যদি চায় তাহলে তাই হোক। মৃত্যুর পর মানুষ ছায়াশরীর নিয়েও পৃথিবীতে বিচরণ করতে পারে না– সেই বিশ্বাস এখনও অটুট সত্ত্বেও। 'ও কি মায়া, কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা।' পৃথিবীতে এমন কিছু এখনও ঘটে, যা যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না। রুবাবার স্বপ্নছায়াও তাই!

এখন থেকে আমাকে রুবাবাকে ছাড়া এই টেবিলে বসে খেতে হবে। সামনে বসেছে মুরাসাকি। চকিতে মনের মধ্যে খেলে গেল– ও কি রুবাবা নয়! তখন ও আমার দিকে তাকাল। চপস্টিক ছাড়া ও খাচ্ছে। আনাড়িপনা খেলছে ওর হাত। ভাত আলাদা, তরকারি আলাদা। আবার দুটো একসঙ্গে মিশিয়েও খাচ্ছে।

'এভাবে খেলে কি পেট ভরে?' আমি বললাম প্রায় আপন মনে।

'বরং বেশিই খাচ্ছি।'

'মোটেই না। চপস্টিক দিয়ে তুমি খেতে পার।' বলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আমাদের সেদ্ধ চালের ভাত ঝুরঝুরে। চপস্টিক দিয়ে খাবে কী করে?

'চেষ্টা করে দেখি। দু'দিনে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে।'

'বরং আমি চপস্টিক দিয়ে খাই?' হাসিমুখে বললাম।

ও হাসল না। হাসি ও লজ্জার মাঝামাঝি একটা ভঙ্গি করল। তাতেই বিষম খেয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'বালাই ষাট'। নীলিমা এসে মাথার পেছনে আস্তে আস্তে থাপ্পড় মারল তিনটা। মুরাসাকি লজ্জা পেল। আমি ওকে বুঝিয়ে দিলাম 'বালাই ষাট' কথার অর্থ। ও

বলল, এই অর্থ ও শব্দ ওর জানা ছিল না।

আবার আমরা চুপচুপ একা হয়ে গেলাম। রুবাবার কথা আমিও তুলছি না, সেও বলছে না। তবুও শেষ পর্যন্ত উঠে এলো। ওর রান্নাশিল্পের কথা। ওর শর্ষে ইলিশ, ভাপা ইলিশ, মাছ ও কাঁচকলার কোপ্তা। সেই সূত্রে মিষ্টি কুমড়োর পাতা বাটা, থানকুনি ও পুদিনা পাতা বেটে ভর্তা– কত কী! কিন্তু ওর হাতে জাপানি রান্না খাব– সেটা বলার সময় এখনও নয় ভেবে বিরত থাকতে হয়। ওর আন্তরিকতার শুরু বা শেষ নেই। তবুও। জাপানি ভদ্রতা বা সৌজন্য বিষয়ে কিছুই জানি না। তেমন কোনো বইও পড়িনি।

মৃত্যুর পর নিরামিষ খাই আমরা। বেগুন, পটোল ভাজা হয়েছে। কচি ঢেঁড়স ও বরবটি সেদ্ধ। ঘন মসুর ডালে নারকোল কুটো। আর ঘরে পাতা টক দই। মুরাসাকি খায় তৃপ্তিভরে। প্রশংসা করে অকুণ্ঠ। নীলিমার দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ জানায়।

আজ যদি রুবাবা থাকত তাহলে সুখের বান বয়ে যেত। খুশির ফোয়ারা। খুব আস্তে আস্তে খায় মুরাসাকি। ওদের ভাত আমাদের বিনি ভাতের মতো আঠালো ও নরম। বেশি চিবুতে হয় না। নীলিমাকে বলে দিয়েছিলাম ভাত নরম করতে।

টক দইয়ের সঙ্গে খেজুরের ঝোলা গুড় ও খুব পছন্দ করেছে। ওর সবকিছুতেই প্রশংসা ও মলিনতাহীন বিস্ময়। সম্মতিসূচক শব্দ প্রকাশ করবে 'হাই' বলে। নাভি থেকে উঠে আসে সেই শব্দ। কিন্তু চাপা ও শোভন। মাদকতা ভরা বলে আমার মনে হয়। ওদের নোহ্ নাটকের সংলাপ তেমনি উচ্চকিত, নাভি থেকে উত্থিত। আমাদের যাত্রাগানের সংলাপের মতো। কাঁপা কাঁপা, ভরাট গলায় আবৃত্তি করার মতো প্রায়। পোশাকও যাত্রাগানের মতো জমকালো। ওদের মুখোশ থাকে, যাত্রাগানে থাকে না– এইটুকু তফাত।

খাওয়ার পর রোহণ উঠল। মুরাসাকির কাজ বেড়ে গেল। দুধ বানানো, খাওয়ানোর পালা। না, ও কাঁদছে না। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি কাঁদবে।

'আমি একটু কোলে নেব?' মুরাসাকির অনুমতি চেয়ে বললাম। সে হাসল পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা মুখে ও শরীরে নিয়ে। আমি এগিয়ে গেলাম বিছানার দিকে। মুরাসাকি আমার দিকে তাকাবে না ভাব করেও আড় চোখে পলকে দেখে নিল। যেন আমি নিতে জানব না, নিতে পারলেও ফেলে দেব বা কিছু একটা অঘটন ঘটাবই। দুধ বানাতে বানাতে নিজের মনে হাসছে। একটুও এদিক-ওদিক দেখছে না। ইচ্ছা করেই কি! আবার বলল, 'নাও'। আমার দিকে না তাকিয়েই বলল। অথচ সবকিছু সে দেখছে। একবার ভাবলাম, ও যখন কাঁদছে না ওকে নেওয়া কি ঠিক হবে? ওর কি খিদে পায়নি? কাঁদছে না কেন? মুরাসাকির হিসাবমতো ওর এখন খাওয়ার সময়; খিদের বয়স হয়েছে। এখন তো ওর সব অনুভূতি পেট ও ঠোঁটে। আর ঘুম। জেগে থেকে হাত-পা নেড়ে খেলার বয়স কি হয়েছে? কত দিনে হয়? আমি কিছুই জানি না। শিশু পালন বইয়ে পেয়েছি কি-না মনে করতে পারছি না। এই মুহূর্তে বইটা নিয়ে পড়ব তাও হবার নয়। আর যখনই ওকে নিতে গেলাম অমনি, ভ্যাঁ। এখন কি আর না নিয়ে পারা যায়! গায়ের ও নিচের কাঁথা-কাপড়সহ বুকে তুলে নিলাম। আর আশ্চর্য! অমনি চুপ। বুক ভরে গেল আবেগ ও সম্পন্নতায়।

মুরাসাকি এবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল। মায়ের সমস্ত ভালোবাসা নিয়ে দুধের বোতল নিয়ে এগিয়ে আসছে। ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক– কোন মাত্রায় সে আমাকে দেখছে বা ভাবছে বুঝতে পারলাম না। ওর হাসিতে একবার মনে হয় খুশি, আবার মনে হয় শাসন, আবার দেখি ভাববিহ্বলতা, আবার দুর্বোধ্যতা, আবার হ্যাঁ-না দুটিই বুঝি একসঙ্গে একাকার। এই যখন আমার অবস্থা সে তখন টিস্যু কাগজে মোড়া দুধের বোতল আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'বসে বসে খাওয়াও তো দেখি!'

আমি তখন হৃতসর্বস্ব এবং একই সঙ্গে গর্বিত বাবার মতো বসে দুধের বোতলের বোঁটা ওর মুখে দিতে গিয়ে এক ফোঁটা দুধ পড়ল বাবুর উপরের ঠোঁটে। সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল প্রায় মুখ খিঁচিয়ে। পাশে দাঁড়িয়ে মুরাসাকি সব দেখছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতের টিস্যু কাগজ দিয়ে মুছে নিল। দুষ্টুটাও বুঝি এ জন্য অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। মুরাসাকি আমার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে কাৎ করে বাবুর মুখে ধরল। দুষ্টুর ধাড়িটাও অমনি খেতে শুরু করে দিল! মুরাসাকি বোতলটা আমাকে ধরতে বলল। বাবুর গায়ের শিশু সুগন্ধ ও মুরাসাকির গায়ের সুরভি আমাকে একই সঙ্গে বিপরীতধর্মী অনুভূতিতে ভরে তুলল। নারী ও শিশুর গায়ের ঘ্রাণ একই আধারে স্পর্শমণি ও বাসনাবিলাসের সংমিশ্রণ। আমার শরীর-মন পিতৃত্বে ভরে উঠল, বন্ধুত্বে পূর্ণ হয়ে গেল। আমার চোখ আর সরে না, বাবুও চেয়ে চেয়ে দেখছে। মুরাসাকিও কিছু না বলে বাবুর দিকে মগ্ন। আমি কোথা থেকে শুরু করব উচ্চতা খুঁজে পাচ্ছি না। নাকি তল পাচ্ছি না বলব! সুখও কখনো কখনো তল খুঁজে পায় না। বিজয়ও উচ্চতা খুঁজে না পেতে পারে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যেমন। কারণ এত উচ্চতা তো আগে কখনো দেখিনি আমরা।

এমন সময় মুরাসাকি নীরবতা ভাঙল, 'তোমার অনুভবের কথা এ সময় বলবে কি?'

'ও মুরাসাকি-সান, ও আমার বন্ধু, আমার কোলে উঠে বাবু কাঁদল না। চুক চুক করে খেয়ে যাচ্ছে! তোমার কোলে তো খায়ই। দেখো দেখো, তোমার দিকে কী দুষ্টু দুষ্টু তাকাচ্ছে! তোমার কোলেও কি এ রকম করে?'

'আর কয় দিন যাক না। তোমাকে নাকানি-চুবানি খাওয়াবে। আমাকে এখনো সমীহ করছে।'

'তার মানে পাজির পা-ঝাড়া হবে বলছ?'

'তা নয় গো। ও বড় হবে না? পৃথিবীর সঙ্গে তাকে লড়তে হবে না? তাকে তৈরি হতে হবে না? সবকিছু তো আর মায়ের পেট থেকে শিখে আসে না। দিনে দিনে শেখে। তোমার পূর্বপুরুষের জিন বয়ে এনেছে। তারপর এই দুনিয়াকে তার চিনতে হবে। তোমার গুণ যেমন পাবে, দোষও ছুঁয়ে যাবে। তারপর বসা, হাঁটা, কথা বলা– কত কিছু তাকে শিখতে হবে একবার ভেবে দেখো। কচ্ছপ দুশো' বছর বাঁচলেও বড় হতে লাগে মাত্র এক বছর। তা কেন, ডিম হওয়ার পর থেকেই সে মা-ছাড়া। একা। বালুচর পার হয়ে সমুদ্রে নামতে পারলে তাকে আর কে পায়! মানব শিশু বড় হতে কত বছর লাগে?'

'ও মুরাসাকি-সান, তুমি আমাকে পাগল করে দেবে। এভাবে আমি কোনোদিন ভেবে দেখিনি কেন বলো তো!'

'তোমার একটা গল্প আজ সকালে পড়েছি। আজকের দৈনিক পত্রিকায় আছে। আমাদের দেশের মাপকাঠিতেও এটি একটি ভালো লেখা। বলা উচিত খুব ভালো।'

'তুমি এত সুন্দর বাংলা শিখেছ! ধন্যবাদ তোমাকে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় আমি স্কুলের ছাত্র। তখন আমরা ভুল করে শিখেছি উর্দু ও ইংরেজিকে ঘৃণা করতে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উর্দু পড়তে হয়েছে বাধ্যতামূলক। কিন্তু ৩০ নম্বর পেয়ে কোনোমতো পাস করা ছাড়া কিছুই শিখিনি। এমনকি উর্দুতে কথা বলাটাও না। ইংরেজিও কোনোমতে পাস করেছি। গ্রামে আলো দেখানোর কেউ ছিল না। আর তুমি কী সুন্দর বাংলা শিখেছ মাত্র তিন-চার বছরে!'

'ওটা বাবার উৎসাহে। তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসবেন বলেছিলেন।'



'সত্যিই!'

'সেসব কথা পরে হবে' বলে সে কী যেন লুকোতে শুরু করে দিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ওর আসার সূত্র খুঁজে পেতে পেতে হারিয়ে ফেললাম। সে নিজেকে গুটিয়ে নিল শামুকের মতো নিজের খোলসে। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'এখন তোমার ঘুম দরকার। সারাদিন অনেক ধকল গেছে তোমার ওপর দিয়ে। আমি কি এই ঘরেই থাকব?' বলতে বলতে বিষণ্ন ঢেউ খেলে গেল ঠোঁটে।

'দোহাই, আর আমাকে অপরাধী করো না। পরিত্রাতার মতো তুমি আমার ঘরে এসেছ। তোমার জন্য রোহংণ মায়ের যত্ন পাচ্ছে। না হয় ওকেও হয়তো হারাতে হতো।'

'না, না! এভাবে বলতে নেই। আমার জীবনে এই সুযোগ এসেছে আশীর্বাদের মতো। বলতে পারো নম্‌বুৎসু (মহাকারুণিক বুদ্ধ)-র ইচ্ছেয়।'

'তোমাকে আহত করার জন্য এ কথা বলিনি। তোমার হৃদয় অনেক বড় তা বুঝতে একটুও ভুল হয়নি আমার। আজ না হয় কাল তুমি ফিরে যাবে। কাকাশ্বশুরকে বলেছি কাল থেকে একজন আয়া বা নার্স দিতে সারাদিনের জন্য। যে কয়টি দিন আছ আমার অতিথি হয়ে থাকলে ধন্য হব। তারচেয়েও বেশি ঘরের মানুষ হয়ে ঘর আলো করে।'

চোখে গোল দুটি ঘূর্ণি তুলে ও বলল, 'আমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাব? বাবা তোমাকে কিছুই বলেননি?'

'কিছু একটা বলবেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম। অন্তর্মুখী বাবার ছেলে তো আমি। আমি অনুমান করেছিলাম।'

'কী অনুমান করেছিলে বলো!'

'সে তো তুমি জানো। একমাত্র তোমার কাছেই সেই সত্য জমা আছে। আমার অনুমান তো শুধুমাত্র অনুমান। সেই অনুমান প্রমাণ করার মতো যুক্তি বা উপাত্ত তো আমার হাতে নেই।'

ওর নিচের ওষ্ঠে রহস্যময় ঢেউ তোলে, আবার তা মিলিয়ে যেতে সময় নিয়ে বলল, 'এখন সত্যিকার অর্থে তোমার শোবার সময় পেরিয়ে গেছে। সারা শরীরে ক্লান্তি তোমার। শোবে চলো। আমি তোমার ঘরের বাতি নিবিয়ে দেব। রুবাবা-সান হয়তো আজ রাতে আমাদের দেখতে আসবেন।'

'তোমাকে আগে দেখেনি। কে ওকে চিনিয়ে দেবে?' বলতে বলতে আমরা চললাম। নীলিমা পড়ার ঘরে শুয়েছে। ছোট ছোট চার কক্ষের একতলা বাড়ি। ছাদের উপর রুবাবার করা টবের ফুলবাগান। নানা রঙের বড় ও ছোট চন্দ্রমল্লিকা। চন্দ্রমল্লিকা ওর খুব প্রিয়। বিশেষ করে পাপড়ির আগা বাঁকানো ফুলগুলো। সাদা তুষার বল, সোনার বাংলা ক্রিম রঙ, ঘন গোলাপ-গোলাপি, গাঢ় ঘন লালের বিপরীতে ব্রোঞ্জ, পিঙ্ক ক্লাউডে গোলাপি আগা বাঁকানো, আজিনা পার্পল বা গোলাপ বেগুনি, ব্রোঞ্জ টার্নার, করোনেশন ফ্যাকাসে গোলাপি– সবার পাপড়ির আগা বাঁকানো। ফুলের মেলা থেকে, নার্সারি থেকে, শৌখিনদের থেকে কতভাবেই না জোগাড় করেছে! রুবাবা নিজের হাতে পানি দিত। নীলিমাও আমাকে শিখিয়েছে। আমার অফিস সাড়ে ৭টা থেকে দুটো। অফিস থেকে এসে খাওয়ার আগে ছাদে গিয়ে ওদের দেখা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করলেও



কোনো একটা দুটো টবের গাছ নেতিয়ে পড়তে দেখলে পানি দিয়ে তবেই আমার খাওয়া। ওদিকে রুবাবা ভাত বেড়ে আমাকে ডাকছে। ও জানে কাজ শেষ করে দু' মিনিটও আমি ওখানে থাকব না। তখন সব তরকারি সুস্বাদু। রাক্ষুসে খিদে ওই করে আমি চিনেছি। তার থেকে নাম দিয়েছি রাক্ষুসে ভালোবাসা। রাক্ষুসে ঝামেলা। রাক্ষুসে উৎপাত। রাক্ষুসে দয়ামায়া। রাক্ষুসে...।

সেই রুবাবার চলে যাওয়ার সময় এসে উপস্থিত মুরাসাকি শিকোবু– বিষাদের ঘরে এক ঝলক দমকা হাওয়ার মতো মূর্তিমান হয়ে। বাতি নিবিয়ে দেওয়ার আগে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলে গেল, 'রুবাবা সান-এর অভাব আমি ওর পোড়া শরীরের মতো অনুভব করছি জেনো।' বলে আমার কপালে ওর দক্ষিণ হাত দিয়ে চন্দ্রমল্লিকা-সাদা পরশ দিয়ে দ্রুত বাতি নিবিয়ে দিয়ে ছুটে গেল নিজের ঘরে। ওর ঘরের দরজা টেনে দিল শুনতে পেলাম। হুক লাগায়নি। আমার ঘরের দরজাও টেনে দিতে ভোলেনি। বাইরে দক্ষিণ পাশে কোথায় একটা লক্ষ্মীপেঁচা ডেকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ছাদের দিকে আরেকটি সাড়া দিল। ঘুমও আসছে ঝুন ঝুন করে উঠোনের কোনো গাছ থেকে যেন। রোহণ কাঁদছে মনে হলো কি? অথবা স্বপ্ন! অথবা বুকের থেকে রুবাবার কান্না! কোথায় কান্না! ও তো ঘুমের শব্দ... ঘুমেরও একরকম শব্দ আছে।

'... রুবাবাকে নিয়ে বেড়াতে গেছি মেঘনা নদীতে। একটা ছোট্ট নৌকো চরে আটকানো। মাঝি নেই, আশপাশেও কেউ নেই। ও বলল, 'চলো, নৌকোয় করে একটু ঘুরে আসি। নৌকোর পেছনে গিয়ে বসলাম আমি। আমার সামনে নৌকোর গোড়ায় সে বসল। সামনের থেকে বৈঠা'খানা আমার হাতে দিল। আমি আবার নামলাম। চর থেকে ঠেলে নৌকো নামিয়ে দিয়ে উঠে বসলাম। চরের পাশ দিয়ে বেয়ে যাচ্ছি। ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়া না, না, বিষাদে মাখামাখি যেন বা! যেতে যেতে অনেক দূর চলে গেলাম। দেখি ওর কোলে রোহণ। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম! ভাবলাম ওর কোলে তো রোহণ থাকবেই। আমি এতক্ষণ খেয়াল করলাম না কেন? আমারই ভুল। মন ভরে উঠল সুখের দেমাগে। এমন সময় দেখি কি সামনে চরের উপর ঘন বেগুনি চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে থরে থরে। একবার মনে হলো কচুরিপানার ফুল। অমনি রুবাবা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বলল, 'থামাও থামাও। চন্দ্রমল্লিকা, আমার প্রিয় ফুল।' ঘ্যাষ করে নৌকো ভিড়িয়ে দিলাম। নৌকো থামতেই সে দাঁড়িয়ে গেল। রোহণকে আমার কোলে দিয়ে বলল, 'বাবুকে তুমি রাখো, আমি যাই।' আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না, না, তুমি বসো বাবুকে নিয়ে। আমি যাচ্ছি।'

'আমাকে থামিয়ে দিয়ে ওর বিষণ্ন সৌন্দর্য ছড়ানো হাসি মেখে বলল, 'রাখো তো! আমাকেই যেতে হবে।' বলে রোহণকে আমার কোলে দিয়ে ছুটল। ওর শাড়ির নীল আঁচল উড়ছে। আর ছুটছে। বাবু তখন আমার কোলে খল খল হাসছে। আমি সেই হাসিতে ডুবে গেলাম। ওদিকে দেখি ফুলের ঝাড়ের পেছনে উঁচু কাশবন হাওয়ায় দুলছে। তার সাদা ফুল জ্যোৎস্নায় মাতামাতি খেলছে। রুবাবা আঁচল ভরে ফুল নিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো কাশবনের দিকে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম, কাশফুল নেবে বুঝি! নিল একটা। তারপর ঢুকে

গেল কাশবনে। আমি অবাক হয়ে বাবুর দিকে তাকালাম। তারপর ডাক দিলাম, 'রুবাবা, রু-বা-বা...রু...বা...বা...'

'সেই ডাকে কাশবন আরো দুলে উঠল।

'আবার ডাকলাম। রু...'

স্বপ্ন ভেঙে গেল। দেখি বাবুকে কোলে নিয়ে মুরাসাকি আমার শিয়রে।

মাথায় এক হাত দিয়ে বলল, 'স্বপ্নে কাকে ডাকছিলে? আমি ও-ঘরে জেগে গেলাম। বাবুও জেগে গেছে।'

আমি ধড়ফড় করে উঠে বাবুকে কোলে তুলে নিলাম। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু।

ও হাত দিয়ে অশ্রু মুছতে শুরু করল। কী মমতামাখা ওর কোমল আঙুলের লহরী! মুরাসাকি বোধ করি বুঝতে পেরেছে রুবাবার স্বপ্নে পড়েছিলাম।

দুই.

সকাল ৯টায় কাকাশ্বশুরের সঙ্গে নার্স এল। মাত্র পাস করেছে নার্স পরীক্ষায়। এখনো চাকরি পায়নি। ওর নাম নাজমা। সকাল ৯টা থেকে ৫টা কাজ করবে। হাসিখুশি চেহারা। রুবাবা-শূন্য ঘরে হাসি-মুখো মানুষই এখন দরকার। নীলিমা একা ঘরের আবহাওয়া পাল্টে দিতে পারবে না। আমিও এক ধরনের অন্তর্মুখী মানুষ। মুরাসাকি হাসির কিছু পেলেই ঝলমল করে বেজে ওঠে। যোগ্য সঙ্গী পেলে ওর হাসিতে ঘর মাথায় তুলতে পারবে। হাসির ছোঁয়া ওর মুখে চাঁদের হাসির মতো লেগেই আছে। তাতে উসকানি দেওয়ার জন্য দেশলাইয়ের কাঠি তো চাই। রুবাবা থাকলে ঘরের পরিবেশ নিমেষে বদলে যেত।

সবুজ চা এনে দিল নীলিমা। কাকাশ্বশুর খুশি হয়ে বললেন, 'এটাই আমার দরকার। অম্বলের ওষুধ এটা। ব্রিটিশরা দুধ-চিনি দিয়ে সরবত বানিয়ে আমাদের নেশা ধরিয়ে দিয়েছে।'

মুরাসাকি ও-ঘর থেকে এসে সুন্দর মোড়কে বাঁধা কৌটো নিয়ে ঢুকল। সেটা কাকাবাবুর হাতে তুলে দিয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। বলল, 'এই চা আমাদের খুব প্রিয়।'

নীলিমা এসে বলল, 'কাকাবাবু, আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব বানানো।'

'তুই মা আসল কথা বলেছিস। চায়ের স্বাদ বানানোর উপর।' তারপর মুরাসাকিকে বলল, 'তুমি মা দূর দেশ থেকে এসে আমাদের সঙ্গে দুঃখের সাথী হয়ে গেলে। আমরা চিরদিন তোমাকে ধরে রাখব।'

'এই কয় দিনে আমার নবজন্ম ঘটে গেল। নীলিমা আমাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিচ্ছে। কাল কত আত্মীয়-স্বজন এসেছে! সবার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করে দিয়েছে।'

কথা বলার সময় মুরাসাকির চোখ থাকে আনত, কাকাবাবুর হাঁটুর দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। হাত দুটি একত্রিত করে সামনের দিকে ঝোলানো।

কাকাবাবু বললেন, 'মা, তুমি নাজমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ভালো করে বুঝিয়ে দিও। রোহণের জন্য এটা খুব জরুরি।

'আমিও তা ভেবেছি। ওর এক প্রস্থ পোশাক এখানে রাখব। ওর অ্যাপ্রনও নিয়ে আসতে বলব আজই। বাবুর দুধ আমি নিজের হাতে বানাব ঠিক করেছি।'

'ব্যস, আমার আর কোনো ভাবনা নেই। এখন বুঝতে পারছি আগের কথাগুলোও তোমাকে বলার দরকার ছিল না।'

'আপনার বলার জন্যই আমার ভাবনাগুলো জোর পেল।'

'আচ্ছা মা, এবার আমাকে উঠতে হবে। এগারোটায় আমাকে অফিসে যেতে হবে।' তারপর আমাকে বললেন, 'তাহলে তোমার কাকা সাপ্তাহিক ক্রিয়ার (মরণোত্তর সপ্তম দিনের) সবকিছু করবেন? নিমন্ত্রিত কতজন হবে?'

'দুশো। ভিক্ষু-শ্রামণ এগারো জন।' বললাম আমি। একটা টিকটিকি বলল, 'ঠিক ঠিক ঠিক।'

'ঠিক আছে। পরে আরো কথা হবে। এখন উঠি।' বলে কাকাবাবু উঠে বেরিয়ে গেলেন। একটার পিছে একটা অগ্নিনির্বাপক গাড়ি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটল। কোথায় কোন বস্তিতে আগুন লেগেছে কে জানে! আসলে বস্তি বা পাটের গুদামে তো আগুন লাগে না; লাগানো হয়। এখন খুব হচ্ছে এরকম। তাহলে কি রুবাবা ভুল চিকিৎসায় মারা গেছে?

তিন.

আমি দশ দিনের ছুটি নিয়েছি অফিস থেকে। রোহণকে দেখে একবার মনে হয়েছিল, ওর জন্যই রুবাবা অসময়ে চলে গেল। কিন্তু না। রোহণের কী দোষ! ও তো আসবেই। সৃষ্টির প্রক্রিয়া তো আদি থেকেই শুরু হয়েছে। প্রকৃতির সন্তান হয়েও মানুষ প্রকৃতিকে হনন করে চলেছে। একদিকে হত্যা, অন্যদিকে রক্ষার তোড়জোড় চেষ্টা। রোহণ এসেছে বলে মা চলে যাবে কেন? তাহলে তাকে কে দেখবে? তাহলে এও কি প্রকৃতির স্বভাবধর্ম! নাকি বিপন্নতা! কেন এই বিপন্নতা আমার বেলায়? জানি এর উত্তর আমাকে কেউ দেবে না। রুবাবার এভাবে চলে যাওয়ার সঠিক জবাব কেউ জানে না বা দেবে না। আর মুরাসাকিও বা ঠিক এ সময় কেন এসে পড়ল? এটা যদিও পূর্বনির্ধারিত তবুও কাকতালীয় নয় কি? আমার বাবারও সময় হয়েছে, জীবনের শেষ সময়ে আমাকে শেষ কথা সম্পূর্ণ বলতে না পারার। মুরাসাকি-সান এত সুন্দর, এত পরিশীলিত, এত স্বল্পবাক যে আমার বাবাকেও হার মানায়। বাবা কেন আমাকে প্রথম থেকেই সব কথা খুলে বলে সাহসী ও উপযোগী করে তোলেনি? আমি রোহণকে এ রকম কখনো করব না। সব কথা আগে থেকে বলে তাকে উপযোগী করে তুলব। আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া অন্তর্মুখী মনের বৃত্ত থেকে আমি বেরিয়ে আসব। কিন্তু সব কথা বলা কি ভালো? কিছু কিছু কথা চিরকাল গোপন রাখা কি দরকার নয়? সত্য যে নিষ্ঠুর কঠিন। অমন নির্মম কঠিনকে ভালোবাসা যায়? কয়জন পারে? যারা পারে না তারাও তো প্রকৃতির সন্তান। এই বহু ও বিচিত্রধর্মিতাই কি সৃষ্টির রহস্য! সংঘাত ও সংঘর্ষই কি সৃষ্টিকে সচল রাখে? এত দূর পাড়ি দিয়ে মুরাসাকি কেন এসেছে? এই আসা এবং না আসাও কি সৃষ্টির ধর্ম?

সেদিন মুরাসাকি এসে বসল। আমি তখন শুয়ে শুয়ে একটি জাপানি উপন্যাস পড়ছিলাম। ঠিক পড়াও নয়, কিছুতেই মন বসছিল না। ইউকিউ মিশিমার 'সাউন্ড অফ ওয়েভ' উপন্যাস। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ অংশে এসে আটকে আছি। নায়ক শিন্‌জি ও নায়িকা হাত্‌সুয়ে তখন সমুদ্রের তীরে বালিয়াড়িতে। সন্ধের অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। সাগরের ঢেউ উঠছে আর ভাঙছে। হাত্‌সুয়ে দৌড়ে এসেছে মাত্র, তার বুক উঠছে আর নামছে, ওই ঢেউয়ের মতো দ্রুত ও প্রাকৃতিকভাবে। শিন্‌জি বলল, 'আমি শুনেছি তুমি ইউসুও কাওয়ামাতোকে বিয়ে করতে যাচ্ছ? এ কথা কি সত্যি?'

মেয়েটি হেসে কুটি কুটি। সেই হাসি পরতে পরতে বাড়ছে এবং সে যেন শ্বাসরোধ হওয়ার আগ পর্যন্ত হাসল। শিন্‌জি বুঝতে পারছে না কী করে তাকে থামাবে। শিন্‌জি আস্তে আস্তে ওর হাত রাখল মেয়েটির নগ্ন কাঁধে।...

এ সময় মুরাসাকি এসে দাঁড়াল শিথানে। ওর আবছা ছায়া পড়ল আমার কাঁধের এক পাশে। তখন নায়িকা হাত্‌সুয়ে শিন্‌জিকে বলছে, আমি এত হেসেছি যে আমার বুকে ব্যথা

উঠেছে। বলতে বলতে সে তার নিজের হাত বাঁ স্তনে রেখে দেখিয়ে দিল। আর টেনে খুলে ফেলল মাছ ধরতে যাওয়া তার পোশাক। সেই খুলে ফেলা পোশাকের কাপড় তখন তার দু' স্তনের মাঝে হাওয়ায় খেলা করছে। শিন্‌জি তখন তার ডান হাত দিয়ে হাত্সুয়ের বাঁ স্তন টিপে দিতে লাগল। ঠিক তখনই শিন্‌জি তার বাঁ হাত দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরল। তাদের দু'জনের মুখ খুব কাছাকাছি চলে এলো। ওরা তখন দু'জনের উষ্ণতা ও বুকের ব্যথা একই সঙ্গে অনুভব করতে লাগল। পরস্পরের শুকনো ঠোঁট স্পর্শ করল। আর একটু নোনা স্বাদ অনুভব করল। অথবা যেন সমুদ্র-শেওলার স্বাদ, সেই সমুদ্র-শেওলা যা প্যাকেটে ভরে বাজারজাত হয়, মূল্যবান পুষ্টি হিসেবে লোকে কিনে খায়। তারপর ওদের অপাপবিদ্ধ সেই মুহূর্ত কেটে গেল, ওরা উঠে দাঁড়াল...।

'এ বই কি তোমার বাবা তোমার জন্য নিয়ে এসেছেন? দেখি তো!' বলে মুরাসাকি হাত বাড়িয়ে দিল।

বইটা ওকে দিতে দিতে উঠে বসলাম। নয়তো ওকে অসম্মান করা হয়। 'হ্যাঁ, বাবা নিয়ে এসেছেন। বইটি তুমি দিয়েছিলে বাবাকে?'

'কেন একথা জানতে চাইছ?' বলে সে চোখে আগ্রহ প্রকাশ করল।

'বইয়ের এক জায়গায় "এল" লেখা আছে ইংরেজিতে।'

'তাতে কী হয়?'

'তোমার "লেডি" নামের আদ্যাক্ষর হতে পারে।'

'ঠিক ধরেছ। আমার বইয়ের বিশেষ পাতায় এভাবে আমার নাম লেখা থাকে। ভেতরেও এক জায়গায় থাকে। নিরান্নব্বই পৃষ্ঠায়। ৯ সংখ্যাটি আমি বিশেষ চোখে দেখি।'

'সত্যি!'

'এভাবে বলছ কেন? তাহলে কি তোমার বেলায় অপয়া!'

'খুব পয়মন্ত মনে করি আমি।'

'কী আশ্চর্য!'

'তাহলে তুমি ৫ ডিসেম্বর তারিখ দিয়েছ কেন বাবাকে?'

'পাঁচ তারিখের পর আসে নয় তারিখ। সে দিন তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে।'

'আমার সঙ্গে! তোমার সঙ্গে তো আমার জানা নেই। এমনকি কোনো ধারণাও।'

'কেন? বাবা কিছু বলেননি?'

'বাবা ভীষণ চাপা প্রকৃতির। পেটের মধ্যে অনেক কথা রেখে দিতেন। দরকারমতো বলতেন। দরকার না পড়লে হিমঘরে রেখে দিতেন। সংরক্ষণ করে, মনের ঘরে। বা পেটে।'

'এজন্যই। এজন্যই তো তোমাকে বুঝতে পারছি না। আমি এই কয়দিন মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছি।'

'কেন? কিসের লড়াই।'

'বাবার একটা অদ্ভুত খেয়াল... বলতে পারো ইচ্ছে ছিল। তোমার-আমার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে দিতে ইচ্ছে করেছিলেন। এই নিয়ে আমাদের অনেক কথা হয়েছিল।'

'আশ্চর্য! আর...'

'তোমাদের পরিবারের কথা প্রায় বলতেন। তোমার কথাও। তুমি তখন পড়াশোনা করছ। দশ বছরের মধ্যে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে চাকরিতে ঢুকে যাবে।'

'এজন্যই দশ বছর পর... অর্থাৎ পূর্বনির্ধারিত দিন। কী অদ্ভুত কাণ্ড, অথচ বাবা আমাকে খেলাচ্ছলেও আভাস দেননি!'

'বললে তুমি কী করতে? বাবার কথা মেনে নিতে?'

'অন্তত আলোচনা করতাম বাবার সঙ্গে। হয়তো তোমার সঙ্গে যোগাযোগও হয়ে যেত।'

'তুমি রুবাবাকে বিয়ে করতে না?' বলতে বলতে ওর চোখে হঠাৎ প্রবল কৌতূহল খেলে গেল।

'একটা ঘটনার মাধ্যমে আরেকটি ঘটনার জন্ম হয়। হয়তো আমার বড় ভাইয়ের মতো জীবনের ধারাই পাল্টে যেত। তুমি তো সামনে ছিলে না, রুবাবা ছিল তখন।'

'তুমি কি নিজের জীবন নিয়ে খুশি নও। অর্থাৎ লক্ষ্য ভিন্ন ছিল?'

'জীবন শুরু করেছি মাত্র। সাহিত্য আমার পড়াশোনার বিষয়।'

'আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। গভীর গভীর। আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এসব কিছুই আমি জানতাম না।'

'সব এলোমেলো হয়ে গেল!'

'আমি এখন নিজের চেয়ে তোমাকে নিয়ে বেশি ভাবছি। রোহণের জন্যও। ও আমার কোলে উঠলেই বুকে লেপ্টে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমার চেয়ে রোহণের জন্য বেশি উদ্বেগ, অনেক বেশি ভাবনা। অথচ এসেছি তোমার কাছে।'

'আমিও নিজের কথা এখন ভাবছি না। ভাবি রোহণের কথা। এমনকি রুবাবাও বোধ হয় না।' বলে একবার ভাবলাম, জিজ্ঞেস করি ও কতদিন থাকতে পারবে। আবার ভাবি, ও-কথা বলার অর্থ যদি চলে যেতে বলা বোঝায়? আবার মনে হয়, ও বুঝি আমার কাছেই চলে এসেছে। অন্তত বাবার ইচ্ছে তেমন ছিল বলে ওর কথায় বোঝা যায়। কিছুই খুঁজে না পেয়ে আমি শূন্য চোখে ওর দিকে তাকালাম। ও ডান হাতখানা দিয়ে নিজের উরুর ওপর ভার রেখে কিছু একটা অবলম্বন খুঁজছে– তেমন কিছু বলতে চাইছে কি? তাও বা কেন হবে! ও-তো অসহায় নয়। ওর তো কিছুই হারায়নি, অন্তত বাবাকে কী কথা দিয়েছে তা সঠিক না জানলেও। শুধু বাবার কথায় অতদূর থেকে ছুটে আসা... অথবা দশ বছর পর আসার কোনো অর্থ হয় তাও আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। কারো সঙ্গে জীবনে একবারও দেখা না হয়েও কি অনুরাগ জন্মাতে পারে? অথবা শুধু রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার! ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে দুর্ঘটনার মতো এক রকম অনুভূতির শিহরণ জন্ম নিয়েছিল নাকি! তখন রুবাবা জীবিত। রুবাবা, আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে এক রকম অনুমতিহীন অনুমোদন দিয়েছিল। সেটা আমার পিতৃসত্য রক্ষার জন্য হলেও। রুবাবা কি কোনো অশুভ কিছু দেখেছিল তার জীবনের ব্যাপারে? অথবা আমার ব্যাপারে!

আমার চুপ করে থাকা দেখে মুরাসাকি চোখ দুটি আমার হাঁটুর দিকে নিবদ্ধ করে রাখল। আমি ভেবেছিলাম, ও অন্তত আমার চোখের দিকে তাকাবে। আর আমিও সেই অবসরে ওর মনের কথা পড়ে নেব। তখন আমার মনে বাবার মুখ ভেসে উঠল। যুদ্ধের কারণে মানসিক বিপর্যয়ে বাবা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। মুরাসাকি তখন আমার শুকিয়ে যাওয়া কথা মনে করিয়ে দিতেই যেন বলল, 'আমি নিজে গত দশ বছর তোমার সঙ্গী ছিলাম। বাবার ইচ্ছে হয়ে। তোমার অজান্তে।...'

এমন সময় রোহণ কেঁদে উঠল। ওখানে নার্স নাজমা আছে। মুরাসাকি একটু অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'দেখি, বাবুর ঘুম ভাঙল। ওর খাবার সময়...' বলতে বলতে ইচ্ছা-অনিচ্ছার দোলায় চলে গেল।

আমি আস্তে আস্তে উঠলাম। রোহণ আর কাঁদছে না। ও কি কোল চিনতে শুরু করেছে? তিন-চার দিনেই? শেখ, শেখ; শিখে নে। তোকে অনেক কিছু শিখতে হবে। জীবনের জন্য,

বাঁচার জন্য, জয়ের জন্য, ভালোর জন্য। জগতের ভালোর জন্য। পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালার জন্য। ওরা ভালো থাকলেই মানুষ ভালো থাকবে। মানুষ ভালো হলে ওরা ভালো থাকবে। মুরাসাকি-সান ভালো থাকলে তুই ভালো থাকবি। তোর মা নেই তো নীলিমা আছে। নাজমা আছে। মুরাসাকি শিকোবু-সান আছে। ঠিক হলো না, লেডি মুরাসাকি শিকোবু হবে।

'বিড়বিড় করে কী বলছ?'

'বলছি তোমার পুরো নামটি। রোহণকে।...ও মা, ও তো দেখি তোমার বুকে মুখ লুকোচ্ছে।' বলে ওর প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় তাকিয়ে রইলাম।

'আমার নামের কী দরকার পড়ল ওর! আমি যখন থাকব না তখন বলো। কই, একটু আগে কত কথা হলো, একবারও তো এরকম কিছু বলোনি?'

'হ্যাঁ, তুমি তো যাওয়ার জন্য আসনি। বাংলায় আছে, অতিথি আসে নিজের ইচ্ছেয়, যায় গৃহস্থের ইচ্ছেয়।'

'তার মানে?'

'রোহণ অনুমতি দিলে তবে তুমি যেতে পারবে। ও বাড়ির সবার ছোট কিন্তু ওর ইচ্ছে সবার উপরে। তুমি আমি সবার। এমনকি নাজমা, নীলিমারও। এমনকি বাড়ির টিকটিকিটারও।'

'মাগো, আমি মরে যাব। ওকে দেখলে কুমিরের কথা মনে পড়ে। ভাগ্যিস এই ঘরে নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও ও-ঘরে তুমি এরকম করে কথা বলোনি তো!' বলেই নাজমাকে ডাকল ফ্ল্যাস্কে গরম পানি নিয়ে আসতে। তারপর আমাকে বলল, 'বাবুকে কোলে নেবে না!'

বলছে বটে, বাবুকে নিতে কিন্তু বাড়িয়ে দিচ্ছে না। তাহলে ওর বুক থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ওটা আমি করতে পারি না। শোভনও হয় না। অথবা পরীক্ষা করছে না তো!

আমাকে নিস্পৃহ উৎসাহী দেখে চোখের পাতা জোড়া একটু কাছাকাছি করে নিয়ে আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে রইল। যেন অন্ধকারে অদ্ভুত কোনো জিনিস হঠাৎ চোখে পড়াতে ভালো করে দেখে নিচ্ছে। অথবা গূঢ় কোনো উদ্দেশ্য! অমনি সব ফেলে বলে দিল, 'দ্য সাউন্ড অব ওয়েভ'-এর কুমারী হাত্সুয়ে মাথায় ঘোরাঘুরি করছে?'

ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে রোহণ, মুরাসাকি ওর দিকে তাকিয়ে উপভোগ করছে। আমি হাত বাড়িয়ে নিতে গেলাম। ও ছাড়ছে না। আমি যে বাবা– তা পাত্তাই দিচ্ছে না। বাবুর সঙ্গে মুরাসাকি তখন জাপানি ভাষায় কথা বলছে। আমি এক বর্ণও বুঝতে পারছি না। কী কী যেন জানতে চাইছে কোনো কিছু সম্পর্কে। আমার অমনি মনে হলো আমার সম্পর্কে কিছু বলছে। অথবা আমাকে উসকানি দিচ্ছে, নাকি ভালোবাসার মহড়া?

আমিও নাছোড়বান্দা। আর বাবুও যেন সব বুঝে নিচ্ছে দাঁড়ি-কমা-কোলনসহ। কী ছেলেরে বাবা! মুরাসাকির দিকে তাকিয়ে সব গিলছে দুধের মতো। একটি বারের জন্যও আমার দিকে তাকাতে নেই তাই বলে! কুলু কুলু করে আস্তে আস্তে ওর ভাষায় এক মনে বলে যাচ্ছে মুরাসাকি। ওকে যেন গল্প বলার নেশায় পেয়েছে। অথবা ছেলেমানুষী, অথবা ওর অনাগত মাতৃত্ব। কল্পিত মা হওয়ার আনন্দে সন্তানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে সুখ। আমারও এক ঐতিহাসিক বিস্ময়কর ঘটনার চলচ্চিত্র দেখা হয়ে যাচ্ছে। বুকটা ভরে উঠল আমার। আমার চোখ টলটল করছে। আমার এই এক স্বভাব-দুর্বলতা। কিন্তু এখন এটা গোপন করা দরকার। কেন জানি মনে হলো মুরাসাকিকে এটা দেখানো যাবে না। কিন্তু কী ছলে মুখ ঘোরাব? আর চোখ মুছব? আই ওর পেছনে চলে যেতে পা বাড়ালাম কচ্ছপের গতিতে। মুরাসাকি অবোধ্য নিপ্পনি ভাষায় আমাকে নিয়ে যেন খোলামকুচি খেলছে। আমি ওর পেছনে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিলাম। আমার মনে হলো সে ঠিক বুঝতে পেরেছে। পেরে বলল, 'আমার বাবুকে জাপানি ভাষা শেখাব। আমি নিয়ে যাব।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'দেবে না তুমি?'

'ও তো তোমারই ছেলে।'

সঙ্গে সঙ্গে ও ঐকান্তিক হয়ে বলে দিল, 'এ কথা মনে থাকে যেন।' একটু থেমে বলল, 'তখন তুমি চোখের জল ফেলে বাধা দিও না যেন। আমি এ কয়দিনে বুঝতে পেরেছি, এই সংবেদনশীলতা তোমার খুব বড় সম্পদ। আমি তোমাকে এজন্য শ্রদ্ধা করি জেনো।'

আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। রুবাবার ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম ওকে পেছন দিয়ে। রুবাবাও আমাকে এ কথা বলেছিল। আমার অনেক দোষের মধ্যেও এর জন্য সে আমাকে প্রত্যেক বার ক্ষমা করে দিত। সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাবলাম, এ কী করলাম আমি! মুরাসাকিকে কথা দিয়ে দিলাম কেন রোহণকে ওকে দিয়ে দেব বলে? সত্যিই যদি সে দাবি করে বসে? পারব আমি মা-হারা রোহণকে দিতে! মৃত রুবাবাকে কী জবাব দেব? নিজেকে কী দিয়ে বোঝাব?

মুরাসাকি বোধহয় আমার অবস্থা অনুমান করতে পারল। আস্তে আস্তে সে আমার কাছে চলে এলো নিঃশব্দে। একটি কথাও না বলে আমার বাঁ পাশে দাঁড়াল। সামনে রুবাবার ছবি। ছবির সামনে সকালে দেওয়া তুষার বল চন্দ্রমল্লিকা। পাপড়ির মাথা বাঁকানো। সকালে হয়তো মুরাসাকি তুলে এনে দিয়েছে। চিনেমাটির ফুলদানিতে। ওটা আমার বাবা জাপান থেকে এনেছিলেন। ফুলদানির গায়ে একদিকে ফানুস ও অন্যদিকে ড্রাগন আঁকা। আরো তিনটি ফুলদানি আছে নানা রঙের। মুরাসাকি এটা পছন্দ করেছে। বলেছে, এক মাস পরে এটি বদলে যে কোনো রঙের ফুলদানি দিতে। মা ও বাবার ছবি ও-ঘর থেকে এখানে নিয়ে আসবে বলেছিল। সেটা রুবাবার মৃত্যুর সাপ্তাহিক ক্রিয়ার পর আনবে বলেছে। মা-বাবার সামনে সে প্রতি সন্ধ্যে সুগন্ধি ধূপকাঠি দেয়। আবার বলেছে, বসার ঘরের এক পাশে একটি পারিবারিক বেদি বানাতে। তার উপরের তাকে থাকবে বুদ্ধ। নিচে মা-বাবার ছবি ও চিতাভস্ম। রুবাবারও থাকবে। কাকা রুবাবার চিতাভস্ম এনে রেখেছেন। বাকি সব নদীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর চিতাও ধুয়ে দিয়েছেন। এই কাজ দ্বিতীয় দিন করে মহিলারা। এই দিন মহিলারা এবং আগের দিন যারা রুবাবাকে পুড়িয়েছে তারা ভাত খাবে। এ ছাড়াও সাপ্তাহিক ক্রিয়ার দিন এরা নিমন্ত্রণে অংশ নেবে। আজ রুবাবার মৃত্যুর চতুর্থ দিন। সারা ঘরে ওর স্পর্শ। ও যেমন করে ঘর সাজিয়ে গেছে ঠিক তেমনটি আছে। শুধু ওর শোবার ঘরে বাড়তি একটি টেবিল ঢুকেছে। রোহণের জন্য একটা দোলনা লাগবে বলেছিল সে। ওটা আনব। দোলনায় তোলার দিন ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান হবে। রুবাবা থাকলে বড় হতো সেই অনুষ্ঠান। মুরাসাকি সমর্থন করল এক বাক্যে।

নীলিমা এসে বলল, 'রাঙাদি, দাদাবাবু, তোমাদের জন্য টমেটোর স্যুপ দিচ্ছি। এসো।' নীলিমা মুরাসাকিকে রাঙাদি ডাকে ওর গায়ের টকটকে গোলাপি রঙের জন্য। ও নিজেই এই নাম দিয়েছে। মুরাসাকি খুব খুশি। সকালে রাঙা আলু পোড়া খেয়ে খুশি হয়েছিল। আবার দেশি রাঙা মুলো খুব ঝাঁঝালো এবং মুলো মুলো তীব্র গন্ধ তাও জানতে পারল। সকালে জাউ রেঁধেছিল মটরশুটি, ফরাসবিন ও আদাকুচি দিয়ে। পাউরুটি সে খেলই না। আগের দিন অষ্টগ্রামের পনির দিয়ে পাউরুটি খেয়েছিল। পনিরটা খুব পছন্দ তার। এর মধ্যে নাকি কাঁচা ও বুনো– একটা মারাত্মক স্বাদ আছে। নীলিমা

বলেছিল, 'মারাত্মক মানে, সাংঘাতিক, জানমারা? নুনওয়ালা অংশটা আমি যত্ন করে বাদ দিয়েছি। তার চেয়ে বলো ব্যাপক স্বাদ ওর।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এমন সুন্দর ও অপূর্ব যে তা প্রাণঘাতীর মতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেরা।' মুরাসাকি বলে দিল ঝপ করে।

আমি ইউসুনারি কাওয়াবাতার উপন্যাসে এরকম উপমা পেয়েছি মনে পড়ল। আর এও জানি মুরাসাকি প্রচুর বই পড়ে। আমার জন্য পাঠাবে বলে নিজে নিজে কিরা কেটে ওর আঙুলে আমার আঙুল ঠেকিয়ে সবার সামনে জানিয়ে দিয়েছে। দুনিয়ার সব দেশেই দেখি একই আচার-বিশ্বাস রাজত্ব করছে এত আধুনিক হয়েও।

চার.

কিন্তু আমার দুঃসময় যে ঘনিয়ে আসছে তা আমি দিবাস্বপ্নের মতো খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছি। মুরাসাকি চলে গেলে আমার নাস্তানাবুদ অবস্থা হবে, তা অন্ধের মতো আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তার ওপর মায়ের শাল-দুধও খেতে পায়নি। বোতলের দুধ খেয়ে খেয়ে কখন যে বাইরের শত্রু এসে চেপে বসে। মায়ের দুধ না পেলেও মা থাকলে একটা শক্তি থাকে মনে। মুরাসাকি তো একদিন চলে যাবে। সাত দিনের জায়গায় না হয় কুড়ি দিন, স্নেহবন্ধনবশত নয়তো চল্লিশ দিন? এত বেশিই-বা আশা করছি কোন সাহসে? বাবার সঙ্গে সখ্য ছিল বলে? কোথায় জাপান, কোথায় বাংলাদেশ। শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনৈতিক-পরিবেশ কোনো কিছুতে পাল্লায় মাপা যায় না। মুরাসাকির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর নৈঃসঙ্গ্যতা বুঝি তীব্র হয়ে গেল! এই দীনতাও কাম্য নয় জানি। কিন্তু ওর উপস্থিতি আমার প্রথম ধাক্কাটা এত সহজে সমাধান করে দিল যে এর পরের সমস্যা তা যেন কেন বেড়ে গেল বহুগুণ। এক সঙ্গে আছি অথচ কত দূরে আমরা। আন্তরিকতায় ফাঁক আছে তাও না।

টমেটোর গরম স্যুপ খেতে গিয়ে ওর মুখ আরো রক্তিমাভ হয়ে গেল। শীতের দিনে আলু ও বেগুন পোড়ার জন্য নীলিমা উঠোনের এক কোণে মাটির একটা চুলা বানাল। মাটির পাত্রে শুঁটকি পুড়ে ভর্তা করে সে। কাঁঠাল বীজ পোড়া, রসুন পোড়া কত কী যে সে জানে! বিনি ভাত, বিনি ধানের খৈ, চাল ভাজা আমারও খুব প্রিয়। লাল ও কালো বিনি চাল আছে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানে। ওখান থেকে আমি আনিয়ে রাখি। জুম থেকে আশ্বিন মাসে নতুন ধান আসে। সেই কালো বিনি যা রাজারা শুধু খাওয়ার অধিকারী ছিল প্রাচীনকালে।

পাঁচ.

'তাহলে তুমি বলছ আমার জন্যই তুমি এসেছ।'

মুরাসাকি চুপ করে রইল আনত চোখে। মৌনতা সম্মতির লক্ষণও নয় বোধ করি!

'শুধু নুন ও রসুন দিয়ে সেদ্ধ মিষ্টি কুমড়োর ফুল তোমার এত পছন্দ?' বললাম। তবুও চুপ করে আছে দেখে অনেক কিছু ভেবে।

'গন্ধভাদালির পাতা বেটে রান্না, পুদিনা পাতা ভর্তা, থানকুনি পাতা বেটে ভর্তা, কাঁঠালের বীজ পোড়া ভর্তা, নানা রকম শুঁটকি ভর্তা ও রান্না– কত বলব! এসব নীলিমার কাজ। তবে আমারও দারুণ পছন্দ।' বলে ওকে ফেরাতে চেষ্টা করলাম। ও আহত হয়েছে!

'তুমি রোহণের জন্য তো আসোনি।' এবার মরিয়া হয়ে বললাম।

'ও যদি আমাকে কেড়ে নেয় আমি কী করতে পারি!' মুখ না তুলে সে বলল।

'রোহণ যে তোমার বুক থেকে আমার কাছেই আসতে চায় না।'

'আমার কী দোষ! আমাকে ও যে ছাড়তে চায় না।'

'দোষের কথা তো নয়। ওরই বা দোষ কোথায় তাহলে?'

'জানি না, জানি না, জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।' –বলতে বলতে মাথা নাড়াতে লাগল।

'তোমাদের বিশাল দুধের খামার। তোমার কাজ এখন কে দেখছে?'

'বাবা ও ভাই আছে। কর্মচারীরা আছে। ঈল মাছের চাষ আছে। সঙ্গে ধানি জমি আছে। এগুলো পরস্পর নির্ভরশীল ব্যবসা। ওখানে সব আছে কিন্তু রোহণ তো নেই। এই অনুভব আমার সদ্য পাওয়া। ওরই বা দোষ কোথায়।'

'তুমি তো রোহণের জন্য আসোনি।'

'এ রকম কথা তুমি বাবা হয়ে বলতে পারো না।'

'রোহণ শুধু তোমাকেই চেনে, আমাকে নয়।'

'কেন নয় সে কথা তোমারই ভালো বোঝার কথা। আমার আসার সঙ্গে ওর এই পৃথিবীতে আসার সম্পর্ক ছিল কি? আমি এসেছি বাবাকে দেওয়া কথা রাখতে। আমার কিশোরী-যৌবনের সন্ধিক্ষণের স্বপ্ন সেটা। আর বাস্তবতা আজকের রোহণ ও তুমি।...' বলতে বলতে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে দিল। আরো কিছু সময় কেঁদে নিয়ে বলল, 'আমাকে একটা চা দেবে?'

আমি ওর কান্না দেখে অস্থির হয়ে পড়লাম। কিছুই বুঝতে পারছি না সে অবস্থা আমার।

'এক্ষুনি। তার আগে জেনে নাও তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা আমি বলিনি। এভাবে বলাটা আমার ভুল হয়েছে। পারো তো ক্ষমা করে দাও।' বলে আমি রান্নাঘরে চললাম। আমারও খুব তেষ্টা পেয়েছে চায়ের। কেতলিতে সবুজ চা দেওয়ার আগে ফোটানো পানিতে ধুয়ে নিলাম। মুছে নিলাম শুকনো কাপড় দিয়ে। তারপর চা-পাতা দিয়ে তার ওপর গরম পানি ঢেলে দিয়ে ঢেকে দিলাম কেতলি। তার ওপর সেলাই করা কাপড়ের টি-কোজি পরিয়ে দিলাম। চায়ের দুটো পেয়ালা গরম পানিতে আচ্ছা করে চুবিয়ে মুছে নিলাম। ততক্ষণে কেতলিতে চা হয়ে গেছে। মুরাসাকি তখনো ফোঁস ফোঁস করছে। রুমালে নাক মুছছে। দেখে আমি ভদ্রতার মরমে মরে যাই। ওর পেয়ালায় চা দিয়ে হাতে তুলে দিলাম। দু'হাতে ধরে আস্তে আস্তে চুমুক দিল। ঠোঁট ফুলে গেছে। আগত কান্নার হিক্কা তখনো সম্পূর্ণ ছেড়ে যায়নি। মুখেও কোনো কথা নেই। চায়ের পেয়ালাগুলোও ওর আনা। খারাৎসু পেয়ালা। ওদের নামজাদা প্রাচীন পেয়ালা। একেকটি পেয়ালা কোনো কোনো পরিবারে হয়তো শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। যত্ন করে রেখে দেয় ঐতিহ্য হিসেবে। এ দুটিরও ইতিহাস আছে। এ রকম শতাব্দীর পেয়ালাও পাওয়া যায় অত্যন্ত চড়া দামে। ওকাকুরা কাকুজো-র 'দ্য বুক অব টি' বইয়ে পড়েছি। ওটাও বাবা এনেছে জাপান থেকে।

আধ পেয়ালা মতো খেতে খেতে ও অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলার পূর্ব মুহূর্তে। হাসিতে ফুটে আসে সৌন্দর্যের প্রতিমা বিষাদিনী। এজন্যই এত সুন্দর। বর্ণনায় তার কতটুকুই বা আঁকা যায়। এজন্যই কি জাপানিরা হাইকু রচনা করেন! ছবিতেও শুধু ইঙ্গিত থাকে। বাকিটুকু পাঠক বা দর্শক কল্পনায় ভরে নেবে। কবির কাজ যা তুলি শিল্পীরও তাই। 'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি' গানের মতো। এখানেও

রবীন্দ্রনাথ হানা দিয়ে যায়। নার্স বাবুকে নিয়ে হাঁটছে। টেবিলের কাছে দু'খানি চেয়ারে আমরা বসে। আমি ওর দিকে দেখার আগে সে চোখের জলে নিজেকে ধুয়ে নিল পুরোপুরি। কোনোদিন সে এমন করে আমার কাছে কিছু চায়নি। আজ সেখানে নিজেকে সুস্থ করতে চা চেয়ে বসল ওর এই অভিমান বুঝতে পারিনি আগে। কোথায় ওর হৃদয়ে আঘাত লাগতে পারে তা একটুও আমি কেন ভাবিনি সেই শোচনায় আমি দগ্ধ হতে থাকলাম। আর তা-ও ওকে বুঝতে দেওয়া বা চোখ মুছে দিতে যাওয়া আরো বোকামো হবে তাও আমি জানি।

'আর একটু দেবে?' বলে দৃষ্টিভারনত চোখে তাকাল। ওতে আমি মরমে আবার নতুন করে পুড়তে লাগলাম। দগ্ধ সেই হৃদয়ে উঠে ওর পেয়ালা ভরে দিলাম। এবার সে ধন্যবাদ

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে জেগে থাকে। মাকে তাই সে খোঁজে। মায়ের সবকিছু সে পেট থেকেই বুঝতে শুরু করেছে। তোমাকে শুধু শুধু আমি আঘাত দিলাম।....'

'না, না, আমিও বুঝতে পেরেছি আমার বলার পরই। উচিত ছিল আগে বোঝা।'

এ সময় আমি রুবাবার কথা, ওকে হারানোর বেদনার কথা তুললাম না। তাতে ওর দুঃখ আরো বেড়ে যাবে বলে। ও এত সংবেদনশীল বলেই সামান্যতে আঘাত পাওয়া খুব স্বাভাবিক। এটা মানবীয়। যে কারণেই ও এসে থাকুক এই পরিস্থিতির জন্য তো সে প্রস্তুত ছিল না। তার ভাবনাতেও থাকার কথা নয়। রোমান্টিক ভাবনা থেকে এসে থাকলে বিপন্নতা আরো অনেক বেশি। ও কি একবারও ভাবতে পেরেছিল এমন পরিস্থিতির মুখে এসে পড়বে? জ্যান্ত দুর্ঘটনায়



দিল মেঘ কেটে ওঠা প্রথম রোদ্দুরের কোমলতায়। এ তো আমার দেখা নতুন অভিব্যক্তি। ওর সুকুমার সারল্য। না, না, নৈর্ব্যক্তিক সরলতা। যা সহজে মেলে না। আবার ভাঙতে ভাঙতেও সহজে মুছে যায় না। অথবা নারীর সংবেদী হৃদয় সম্পদ। 'আমি সত্যিই দুঃখিত ও লজ্জিত আমার ব্যবহারের জন্য। তোমাকে কান্নার কঠিন কষ্ট দেওয়ার জন্য। আমারই দোষ। রোহণের তো কোনো দোষ নেই। আশ্রয় পাওয়া ও চাওয়া ওর অধিকার। ওর মা নেই ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ও তো উপায়হীন। ওকে খুঁজে নিতে হবে কোথায় ওর আশ্রয় আছে। ও অনেক অনেক কিছু বোঝে না, কিন্তু ন্যূনতম প্রয়োজন ও নিরাপত্তা সে বোঝে। ভালোবাসা বোঝে, অনাদরও বোঝে জন্মের পর থেকেই। এমনকি গর্ভে থেকেও সে মায়ের সুখে হাসে, কাঁদে। চার-পাঁচ মাস থেকেই। ডাক্তারেরা বলেন, তীব্র অনুভূতিশীল মায়েরাও বুঝতে পারেন পেটের সন্তানের প্রতিক্রিয়া। হয়তো সে স্বপ্ন দেখে দেখে হাসে। রাতে ঘুমোয়। দিনের বেশির ভাগ সময়

পড়ে জীবন্ত দুঃখে নিপীড়িত হবে? তা হাসিমুখে বরণ করে নেওয়া এতই কি সহজ?

'আমার দীনতা ক্ষমা করে দিও।' মুরাসাকি কোথায় যেন আকাশের ওপার থেকে বলল।

'অমন কথা বলো না মুরাসাকি-সান। এই আবেগ যতদিন আছে ততদিন মানুষ থাকবে মানুষ। শরীর-মন তোলপাড় করা অনুভব নিয়ে মানুষ আজও প্রেমে পড়ে। অন্তত ভালোবাসে। একজন আরেকজনকে চায়। ভুল করে হলেও চায় তো!'

'মানুষের কিছু কিছু আবেগ খুব আগাম আভাস বোধ করি দেয় না। বা দিতে পারে না। কোনো অভিঘাত ছাড়া, অথবা অভিঘাতের জন্য অপেক্ষা করে থাকে মানুষ। শরীর ও মন।' এসব আমার একান্তই মনের কথা মুরাসাকি বলল আচ্ছন্নের মতো। আবার বলল, 'তোমার এই অনুভূতি ও মন বেঁচে থাকুক।' বলে চোখ তুলল রাতের আকাশের হাসি মেখে।

'আমি তোমাকে কাঁদিয়েছি। তোমার মনে আঘাত

দিয়েছি। আসলে আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি সব কিছুতে।' আমি প্রায় আত্মসমর্পণের মতো বললাম।

'আমাকে বলার সময় হয়নি? আমাকে বলতে পারো না?' মুরাসাকি উৎসুক হয়ে উঠল।

'পারি। বলতে চাই।'

'আমিও এখনো বলিনি কোনো কথা। (তোমার) বাবা ও আমার মধ্যে হওয়া কথাগুলোর সময় এখনো আসেনি। বলতে গেলেই কান্না এসে আমাকে থামিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে মনের সামান্য বাধাও টপকে যেতে পারি না। অথচ কত বড় বড় বাধা অতিক্রম করে যাই।' বলে চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে রেখে দিল। উঠোনে দুটি কাক বাসা বাঁধছে, নারকেল গাছের ডালের কোলে, নতুন আসা ডাবগুলো বুড়ো আঙুলের মাথার সমান হয়েছে। দিনে দিনে বাড়ছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। লোহার একটা তার নিয়ে কাকিনী ঠোঁট দিয়ে জুৎসই করে রাখতে চাইছে। পারছে না। নিচে পড়ে গেল। অমনি সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটা তুলে আনল। এবার কাকটা নিয়ে এল একটা তার, ওটা সরু ও দু-তিন ভাঁজ করা।

'জানি সময়মতো তুমি সব কথা বলবে। আমিও বাবার মতো একরোখা অন্তর্মুখী হয়ে পড়ছি দিনে দিনে। রোহণের মধ্যে ওটা বাড়াবাড়ি সংক্রমিত হবে বলে আশঙ্কা হয়।' বলে ওর চোখের দিকে তাকালাম সহানুভূতি চেয়ে।

'আমিও কিছুটা সে রকম বোধ হয়। কে জানে!' বলে একটু হাসল।

তাতে মনের ছবি ধরা পড়ে। উঠে দাঁড়াল। ফুলের ছাপাওয়ালা কিমোনো পরেছে। ঘরে পরার শীতকালীন পোশাক। মানিয়েছে। তীব্র পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি হবে ওর উচ্চতা। মাথার ওপর ওর দীর্ঘ সরল চুলে ঝুঁটি বাঁধলে আরো বেশি হবে। নিন্‌জা তরুণীর মতো মেদহীন ছিপছিপে। পিচ্ছিল ওদের মতো, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যাবে বলে শঙ্কা হয়। হাসলে ওর চোখ ও ঠোঁট জোড়া সঙ্গে সঙ্গে রঙ বদলে নেয়। কাছ থেকে দেখতে মনে হয় পুকুরের মুগ্ধ মৃদু ঢেউয়ের মতো বিভঙ্গ তোলে। খুব কাছে এসে দাঁড়াতেই আজ ওর শরীর সক্রিয় হয়ে উঠল এই প্রথমবার। তবে কি আগে চোখে পড়েনি? রুবাবা কি সরে দাঁড়াচ্ছে এরই মধ্যে। বসন্ত এখনো আসেনি। বসন্তেই রুবাবার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। এখনো রুবাবার মৃত্যুর এক সপ্তাহ ফুরোয়নি। ওর সঙ্গে শেষবার ভালোবাসা করেছি কবে তা মনে পড়ে যায়। মৃত্যুর পর ওর ঠোঁটে চুমু খাওয়া, খুনি-সুন্দর হাসপাতালে... এখনো লেগে আছে আমার ঠোঁটে। একে শেষ ভালোবাসা করা বলবেন না আপনারা? মানুষ নানাভাবে ভালোবাসা করে। আমার কথা আমার মতো। সেক্স বাসে-ট্রামেও হয়। সেক্সি শব্দও এখন অভদ্র ভাষা নয়। সেক্স পবিত্রও।

মুরাসাকি আমার কাঁধে হাত রাখল বন্য কমনীয়তা প্রসারিত করে। ওর আঙুল শরীরের চেয়ে কি বেশি নিটোল! ওর এই হাত রাখা কি নির্ভরশীলতা? সমবেদনা! যথাসুলভ! নতুন কোনো অনুরোধ! সেক্সি! বন্ধুত্ব! বিশ্বাস! আমি ওর দিকে চোখ-মুখ তুলে তাকালাম। অপরাজিতার মতো কোমল ও সংবেদনশীলতা! তেমনি ব্যক্তিত্ব ও অনুভূতিশীল। না-দেখা চেরি ফুলের মতো ভাবপ্রবণ। ওর আঙুল সঞ্চরিত হচ্ছে। সেমিসেং তারযন্ত্রে আঙুল সঞ্চালনের মতো।

বলল যেন ওদের পাহাড়ের পাইন বনে সেমিসেং বা বাঁশির নির্জনতা ভাসিয়ে দিয়ে। বলল, 'তোমার বাবাকে আমি বাবা ডাকতাম। আমার বাবা সেই অনুমতি দিয়েছিলেন। কোথায় একদিন পথ চলতে চলতে আমার দুই বাবার দেখা। সেই দেখা একদিন এমন হয়ে উঠল যে, বাবাকে বাবা ধরে নিয়ে এলেন গিন্‌জা থেকে। আমাদের খামারবাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো এই বিদেশি মানুষকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। অর্থাৎ স্বপ্নের মানুষ। তুমি তো কালো, কিন্তু তোমার বাবা জাপানিদের মতো টকটকে। ফর্সা রঙের ওপর সিঁদুরে রং খেলে যায় কথা বলার আবেগের তারতম্যের ওপর। আমি সবুজ চা এনে তাতামির (বিশেষ মাপের মাদুর। এই মাদুরের মাপ দিয়ে ঘরের বা কক্ষের মাপ বোঝা যায়) ওপর হাঁটু ফেলে বসেছি। অমনি বাবা (তোমার বাবা) কী বললেন জানো?'

'বাঃ! আমি তো ডোম। বাঁশবনে ডোম কানা বোঝ তো! সেই ভেবে নাও আমাকে। বলো, কী বলেছিলেন। নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু নয়। ভালো বলেই তুমি তাঁর বাড়িতে তাঁর কাছে আজ এসেছ। দশ বছর পর আসবে বলে একটি দিন ঠিক করেছিলে দশ বছর আগে। বাবার মুখে শুনে আমিও রোমাঞ্চকর ও রহস্য উপন্যাসের সুগন্ধে মদোন্মত্ত হয়ে পড়েছি। এমনও কি ঘটে তাহলে? আমার বাবার জীবনে? আমার মা-হীন বাবার জীবন ভালোবাসার ঐশ্বর্যে ভরে যেতে বসেছে মনে করে খুবই সুখ অনুভব করেছি। কিন্তু দশ বছর পরে বাবার বয়স হয়ে যাবে সত্তরের অনেক ওপরে। তাহলে!' বলে আমি থামলাম কেতলি থেকে বাকিটুকু চা ঢেলে নিতে। মুরাসাকি ওর চেয়ার তখন আমার সামনে নিয়ে এল। নার্স তখন রোহণকে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর হাঁটছে। নীলিমা মিষ্টি কুমড়োর ফুল রসুন ও নুন দিয়ে ঝোল-ঝোল সেদ্ধ করছে। রাই সর্ষেপাতা ভর্তা করবে বলেছে। কাঁচা জাপানি মুলো কেটেছে ফালি ফালি করে। গতকাল আস্ত মুলো সেদ্ধ করে আলাদা থালায় গরম গরম পরিবেশন করেছে। পাশে কাঁচা লঙ্কাপোড়া ও পিঁয়াজ পাতার ঝাল ভর্তা। নীলিমা এখন রান্নাঘরে আমাকে ঢুকতে দেবেই না। আমার মতো করে রাঁধতে গেলে ওর নাকি সব গোলমাল পেকে যায়। ওটা পারত রুবাবা। আমি ভুলভাল বললেও সে ঠিক আমার আসল চাওয়া অনুযায়ী রেঁধে নিত। ওর মতো হলেও তা হয়ে উঠত আমার না-বলা বা বলতে না-পারা চাহিদামতো। নীলিমা তাওয়ায় টমেটো পুড়ছে। তার সুগন্ধ পাচ্ছি আমি। ওর স্বাভাবিক টক-ঘন ভর্তা হবে। পেঁয়াজ-কুচিও একটু সেঁকে নেবে তাওয়ায়। রসুন বেটে শুকনো লঙ্কা-বাটার সঙ্গে ভর্তা করতে পারে। কোরিয়ান কিমিচি-র মতো প্রায় হবে ওর স্বাদ। কাঁঠাল বীজ এখন নেই; কিন্তু ফরাসবীনের পুষ্ট বীজ আছে। খোসা ফেলে নিরামিষ বা হাঙর-ছুরি শুঁটকি দিয়ে রাঁধা হয়। অথবা চিংড়ি শুঁটকি, বা ছোট্ট সুতা বেগুন দু-দশ টুকরো ফালি করে দিয়ে। নিরামিষ রাঁধত রুবাবা। নীলিমাও এসব ভালো জানে। কচি আমপাতা, অশোকপাতা, জামপাতা, যে কোনো রকম লেবুপাতা কাঁচা ভর্তা করে সে। এসব চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বড়ুয়াদের, আর আমারও প্রিয়। নীলিমা ছাড়া এখন কে দেখবে আমাকে?

মুরাসাকি ছাড়া রোহণকে কে এমন করে বুকে তুলে নিত অপরিচিত হয়েও! প্রচলিত জন্মান্তর আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু শক্তির তো ধ্বংস নেই, রূপান্তর হয়। মানুষের দেহ-মন একটি শক্তি। মৃত্যুর পর তার রূপান্তর হয়। কী এবং কেমন হয় তা আমার জানা নেই। কিন্তু রূপান্তর যে হয় তা অনিবার্য। মহাকাশে নক্ষত্র, বামন নক্ষত্র, কৃষ্ণবিবর, ডার্ক মেটার, ডার্ক পার্টিকেলস লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কি একই আছে? থাকবে? মুরাসাকি কি বাবার টানে এসেছে? নাকি অজানা ও নতুনকে জানতে? ও বুঝি এখন পারলে রোহণকে নিয়ে যায় ওর দেশে! আমাকে নাকানি-চুবানি খাওয়ায়।

আমার বাসনা জাগছে। মুরাসাকি-সান আমার সামনে নতুন একটি অনাবাদী জগৎ, জগচ্চক্ষু, জগতি। রুবাবার আসনে ওকে বসানো যায়। কিন্তু ও তাতে রাজি হবে কেন? চালচুলাহীন সদ্য স্বাধীন দিশেহারা দেশে কেউ আসতে চায়? আমিও বা পালাব কোথায়? মুরাসাকি এসে আমার ভাবনার



জগৎ ওলটপালট করে দিল, আমার ভাবনার পরিসর উপপাদ্যের মতো আরো বাড়িয়ে দিল। উঠোনের কোনো গাছ থেকে একটা কাঠঠোকরা উড়ে যাওয়ার সময় তিনটা ডাক দিয়ে চলে যাচ্ছে। রোহণও শুনতে পেয়েছে, কী বুঝেছে তা শুধু সে-ই জানে। মুরাসাকি জানতে চাইল, 'ওটা কে ডেকে গেল?'

আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, রুবাবা। মুরাসাকির হাত তখন আমার কাঁধে ভর রেখেছে। আমার চাদরের নিচে ওর আঙুল তখন গমনশীল রেণু চড়িয়ে চলেছে। ওর গায়ের আলখাল্লার মতো কিমোনো শান্তিকল্যাণ সুগন্ধ ছড়িয়ে চলেছে। ওর ডান হাতখানার অতুল বৈভব খুঁজছি আমার মনের মাঝে। সেখানে মুরাসাকি নাকি রুবাবা! বাইরে মুরাসাকি, অন্তরে কে! একজন বর্তমান, অন্যজন শারীরিকভাবে অতীত। ওর আঙুলে দুর্বোধ্য কী যেন খেলা করছে। বোঝা যায়, অথচ যায় না কেন? আসলে যায়। সবই সুবোধ্য। অথচ দুর্বোধ্য ভবিষ্যতে ভাবনার কারণে কেবল প্রসারিত হয়ে চলেছে, যেমন ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে বিজ্ঞানীদের মতে। তাহলে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে আরো শূন্যতা আছে? তা কেমন কল্পনাও করতে পারি না।

রুবাবার কাছে শুয়ে আছি আমি। হিমঘরে। চারদিক হিমশীতল শুষ্ক নিস্তব্ধতা। একটির পাশে আরেকটি চাকাওয়ালা ট্রলি। পরপর আটটি। পাশে শুয়ে আছে রুবাবা। অন্যদের পাশাপাশি। সারা ঘর অন্ধকারে ঢাকা। বারান্দার বাইরে এক পাশে আলো জ্বলছে। তার আলো ঘরের আঁধার একটু কমাতে পারেনি। তাতেও আমি দেখতে পাচ্ছি ওর অলৌকিক মুখ। ঘুমে বিভোল সেই মুখ ও শরীর। আবার মনে হলো কোথায় আছি আমি? এমন অচেনা জায়গায় এলাম কেন? ভয় এসে জাপটে ধরল ভয়ের হাতহীন হাতে। পাশ ফিরে তাকাতেই দেখি রুবাবার মুখ। সে ঘুমুচ্ছে। বালিশের পাশে টর্চ রাখা আমার অভ্যেস। হাত বাড়াতেই পেয়ে গেলাম। পেন্সিল টর্চ। রাতে ঘুম ভাঙলে আমি হাতের পাশের সুইচ টিপে বাতি জ্বালাই না। পেন্সিল টর্চ নিয়ে দরকারি কাজ করে নেই। নয়তো ঘুম চটে যায়। বড্ড বেয়াড়া আমার ঘুম।

রুবাবার চোখ বোজা। এতক্ষণ দিব্যি খোলা ছিল। কথা বলছিলাম। 'হঠাৎ একি হলো! আমরা এখানে কেন? তাহলে আমরা স্বপ্নে পড়েছি? চলো উঠি, এখান থেকে ওঠা দরকার। রোহণ ঘরে একা রয়েছে।' রুবাবার দিকে চেয়ে বললাম। রুবাবার কথাই হয়তো আমি বললাম। আমি সঠিক জানি না।

কিন্তু রুবাবা তো ঘুমিয়ে। তখন আমি আমার মতো করে বুঝে নিয়ে বললাম, 'এটা তো লাশঘর! বাইরে তালা দেওয়া। এখানে এলাম কী করে?'

রুবাবাই যেন ঘুমের মধ্যে বলল, 'আমরা এখান থেকে বের হব কী করে?'

'এখানে সাদা চাদর গায়ে দিয়ে এত লোক ঘুমুচ্ছে যখন, বের হওয়ার পথও নিশ্চয়ই আছে?' আমি ওকে অভয় দিয়ে বললাম। অথচ আমি ভয় পাচ্ছি। সেই ঘুম থেকেই সে বলল, 'তুমি তিন দিন ধরে আদরই করছ না আমাকে। এত ভুলো হয়ে গেলে কেন?'

শুনেই ওর গায়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ওর বুকে। সেখান থেকে পেটে। অমনি সে জানিয়ে দিল, 'ওখানে নয়। ওখানে অনেক ব্যথা। জমে আছে শক্ত পানির মতো।'

সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিলাম। ওর গালে, চিবুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'চলো, এখান থেকে পালাই।'

'টর্চটা জ্বেলে নাও। তুমি আমাকে ধরো। নামতে সাহায্য করো।' এক হাত ওর পিঠের নিচে, অন্য হাত হাঁটুর নিচে

দিয়ে কোলে তুলে নিলাম। দেখি ওর গায়ে সাদা চাদর ছাড়া অন্য কাপড় নেই। আমার গায়েও সাদা একখানা চাদর ছাড়া আর কিছুই নেই। টর্চটা নিবে গেল। ওই অবস্থায় টিপ দিলাম। তখন ম্লান আলো দেখা গেল সরু ফিতের মতো। ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে। অন্ধকার জাপটে ধরছে ওই সরু ফিতের বাইরে। ফিতেটাও গিলে খাবে। পাশ থেকে মুরাসাকি ডাক দিল, 'আমি এখানে। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না কোথায় আছি! আমাকে ফেলে যেও না। অন্ধকার সামনে দরজা পড়লে যেন না-খুলেই যায়, না-ঢুকেই ভেতরে ঢোকা যায়।'

'ট্রলি খাট থেকে সাবধানে নামো। টর্চের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে।'

বলতে বলতে দেখি আমার পাশের ট্রলি থেকে মুরাসাকি নেমে পড়ল। আগের চেয়ে ম্লান আলোয় দেখি হালকা ফুল তোলা কিমানো গায়ে দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।

উরু থেকে পায়ের পাতা অব্দি বেরিয়ে আছে। আমারও। যেদিকে যাচ্ছি সেদিকটা অন্ধকারে আরো উলঙ্গ। অন্ধকারে আরো চার-পাঁচটি পায়ের শব্দ অস্পষ্ট ভেসে আসছে আমাদের পেছন পেছন। ওরা একে একে ট্রলি থেকে নেমে পড়েছে। অন্ধকারে ওদের কোনো অসুবিধেই হচ্ছে না। হচ্ছে আমার, রুবাবাকে কোলে নিয়ে আমার আর মুরাসাকির! ওর কিমানোর ফিতে বা এপাশ-ওপাশ খুঁজে পাচ্ছে না। আমার কাঁধ ধরে পিছু পিছু আসছে। ওর পায়ে কি কাঠের খড়ম! খটাখট শব্দ হচ্ছে কেন? ওর হাত এত ঠাণ্ডা কেন? আর রুবাবা উষ্ণ. অথচ ঘুমুচ্ছে কেন! কী কালঘুমেই-না ওকে পেয়েছে! আহা ঘুমোক। ওর ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। ওর ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি বুঝি! কী হালকা-পলকা ওর শরীর! স্বপ্নের মতো ভারহীন, যেন পালকসর্বস্ব বড় এক রক পাখি! ওর কপোলে চুমো-সুখ খেয়ে নিলাম অন্ধকারে। সেই সাহসে ঠোঁটে অনেকক্ষণ! অন্ধকারে কোথায় চলছি জানি না। অন্ধকারে একটা দরজা পার হলাম! মনে হলো নতুন কোনো কামরায় ঢুকে গেলাম। ধাক্কা খেলাম থরে থরে ভাঁজ করা কাপড়ে। রোগীদের চাদর-কম্বল-বালিশ হবে বুঝি! পেছনে আসা পায়ের শব্দগুলো কোথায় হারিয়ে গেল নাকি! বেড়ালের বাচ্চা ডেকে উঠল বুঝি! টিকটিকি, আরশোলা, ইঁদুর...। ওদের অনুচ্চ গীতবাদ্য, সঙ্গীত সম্মেলন।

এখান থেকে কী করে বের হব ভাবলাম। সেই ভাবনা আস্তে আস্তে চেপে ধরতে শুরু করল। স্বপ্ন যেমন কোনো কোনো সময় অচলায়তন হয়ে ঘুরে ফেরে।....

মুরাসাকির নখের খোঁচায়ও সেই প্রশ্ন জেগে উঠল। মুখেও বলল। ওর মুখে উদ্বেগ নাকি রোমাঞ্চকর ভাব বুঝতে পারলাম না।

তার চেয়ে বড় কথা আমাকেই বের হওয়ার পথ খুঁজে নিতে হবে। পা দিয়ে পথ খুঁজছি। কোন দিকে খালি! কোন দিকে কাপড়ের স্তূপ? অথবা দেয়াল বা আলমারিতে গিয়ে ধাক্কা খাই কি-না! আস্তে আস্তে আমার মনোবল সংকুচিত বেলুনের মতো কমে আসতে লাগল। আরো একটা দরজা পার হলাম। এবার আরো কঠিন: পায়ে পায়ে জিনিসপত্র। বালতি, অক্সিজেন, সিলিন্ডার, চাকাওয়ালা চেয়ার, লোহার খাট, আলমারি, হুইলচেয়ার– ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ার অবস্থায় মুরাসাকি বাঘিনীর মতো কামড়ে ধরে, বাচ্চাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার মতো রক্ষা করে।

টর্চ আর একবার মাত্র জ্বলে উঠে নিবে গেল। সামনে একটা শূন্য বিছানা দেখা দিয়ে আঁধারে ডুবে গেল। কোন দিকে পথ বা দরজা বা বারান্দা কিছু দেখতে পেলাম না। সেই একবার দেখা শূন্যে ঝুলন্ত বিছানায় রুবাবাকে শুইয়ে দিলাম সেই সুস্থ অন্ধকারে, আঁধার যত্নে। এমন আঁধার যে তার কোনো দৃশ্যমান রূপ নেই। তবে অদৃশ্য কালো মনোময় রূপ আছে। সেই রূপ আবেগ, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগে ভরা। ভয়ও আছে। বসে পড়ার আগে মুরাসাকি আমাকে নিবিড় করে ধরল। বোধ হয় ভয়ে। এতক্ষণ আমরা কোনো কথাই বলিনি। আরো কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে একা ফেলে যাবে না তো? রুবাবা-সান কিছু মনে করবে না তো?' বলতে বলতে ওর বুকের শব্দ আমার বাহুতে উৎকণ্ঠা ও দুস্থ সৌকর্যে অনুভূত হলো। ওকে সেই অন্ধকারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সাহস ও স্বীকৃতির মোহর দিয়ে বসলাম একসঙ্গে। ওদিকে হাতড়ে দেখি রুবাবা নেই। তাহলে রুবাবাকেই নাকি মুরাসাকিকে সেখানে রেখেছি!

অথবা ভাবলাম মুরাসাকিকে কী বলব। সে আমাকে পাশ থেকে অর্ধেক শূন্যতার আলিঙ্গনে ধরে আছে। তেমনি ওর বুকের স্পন্দন আমার শরীরে করুণাময় বলশালী আবেগে সঞ্চারিত হচ্ছে। আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার অন্ধকারকে গিলে খেয়ে আরো পুষ্ট হচ্ছে, আরো কালো ও গভীর, পীনোন্নত ও সুগোল, স্পন্দনশীল ও আক্রমণশীল। তার মধ্যে মাথায় অবিরাম খেলে যাচ্ছে কী করে বলি, রুবাবা নেই! তাহলে কি ওর মৃত্যুর আপন বলয়ে সে ফিরে গেছে সব শঙ্কা দূর করে দিয়ে। মনে করে দিয়ে গেল, 'জীবন একান্তই অনিত্য। উৎপত্তি মাত্রেরই বিলয় অবশ্যম্ভাবী। সেই উপশমেই সুখ। সমস্ত সত্তা, অর্থাৎ সকল সজীব প্রাণী মরছে, মরেছিল এবং মরবে। তেমনি আমিও মরব। এতে আমার সংশয় বা সন্দেহ নেই।'

ভাবছি এখনই মুরাসাকিকে সব বলা উচিত হবে কি-না! স্বপ্ন ভেঙে গেল। দেখি আমার এক কাঁধে রাতের আলখাল্লা। তাতে ডান হাত গলানো, বাঁ হাত খোলা। অমনি বিছানা হাতড়ে দেখি কাকে ওখানে রাখলাম ভেবে। আর আমাকে অবাক করে দিয়ে দেখি, অর্থাৎ দেখার পর জানতে পারি বিছানায় মুরাসাকি। তাহলে আমি কি মুরাসাকিকে ও-ঘর থেকে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এ-ঘরে নিয়ে এসেছি? এ কী করলাম আমি! কী করে সম্ভব এমন কাজ করা! কী করে পারলাম আমি! স্বপ্নের ঘোরে বাস্তব কাজটি করে বসে আছি ডাকাতের সাহসে।

হাত বাড়িয়ে দিলাম বিছানায়। ওর সিল্কের কিমানো পিচ্ছিল ঠাণ্ডায় থিকথিক করছে আমার স্পর্শে। ভালো করে হাত বুলিয়ে নিঃসন্দেহ হতে চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ, ওর রাত্রিবাসের কিমানোর ভেতরে মুরাসাকি। আমি শিউরে উঠলাম। ও ঘুমে কাতর। লজ্জা ও সংকোচে আমি নিজেকে ধুলোকণার মতো তুচ্ছ ভেবে কুঁকড়ে গেলাম। পলকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেললাম আমার বাকি কাজ। যে কাজ করে ফেলেছি তার বাকিটুকু।

ওর কোমরের কাছাকাছি গিয়ে দু'হাঁটু গেঁড়ে বসলাম। এক হাতে ওর শরীরের ওপরের অংশ তুলে নিয়ে অন্য হাত হাঁটুর নিচে গলিয়ে দিয়ে তুলে নিলাম। রুবাবার চেয়েও হালকা। মানুষ কি ইচ্ছে করে নিজেকে ভারশূন্য করতে পারে!

ও কি ঘুমিয়ে আছে?

ও কি জেগে গেছে? ও কি মটকা মেরে পড়ে আছে?

মনে মনে প্রার্থনা করলাম, ঘুমোও মুরাসাকি-সান। আমি তোমাকে এখন ভালোবাসি। আমি তোমাকে এভাবে আমার বিছানায় তুলে আনব তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ যদি স্বপ্নের ঘোরে এনে থাকি তাহলেও খুব অন্যায় করেছি। তোমাকে অসম্মান করতে পারি না আমি। তুমি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। বরেণ্য। এমনকি বন্ধুর চেয়েও অনেক বড়

বন্ধু। আমার বাবার সম্মান এর সঙ্গে যুক্ত। ছোট্ট রোহণের সম্মানও। মৃত রুবাবারও। সমাজ-সংসারের চোখেও।

নম্রতা, সম্ভ্রম, দীনতা, সতর্কতা ও পবিত্রতার শপথে সিক্ত হয়ে ওকে নিয়ে ফিরে চললাম ওর বিছানায়। রোহণের কাছে। ভাগ্য একদিকে আজ আমাকে সাহায্য করেছে। রোহণ জাগেনি। ঘরের ছোট্ট হালকা নীল বাতি ঘোর সৃষ্টি করে পাহারা দিচ্ছে। ঘুমোও মুরাসাকি-সান। আর কিছুক্ষণ মাত্র। আমার সম্মান এবং তোমার সম্মান। তোমার কোনো দোষ নেই। ক্ষমা করো। না হয় দিনের আলোয় মুখ দেখাতে পারব না। মাথা তুলে নীলিমার সামনে দাঁড়াতে পারব না। ঘুমোও বন্ধু, ঘুমোও। বাবার কথায় তুমি এসেছ। বাবা তোমাকে কী বলেছে এরই মধ্যে আমি নিজের মতো করে প্রভূত জেনে গেছি। সত্যবাদীদের কথা কখনো বৃথা যায় না, সেই সত্য বাক্য দ্বারা অন্যেরও জয় হয়।

নিরাপদে ওর বিছানায় রোহণের পাশে ওকে শুইয়ে দিলাম। ওর প্রস্ফুটিত চেরি ফুল সমৃদ্ধ কিমানো সরে গিয়ে উরু প্রকাশিত হয়ে গেছে। সেই জীবন্ত অপ্রাকৃত সৌন্দর্য চোখ ভরে দেখার, অনুভবসমৃদ্ধ উপভোগ্য মেনেও আমি ঢেকে দিলাম সিল্কে ফোটা চেরি ফুলের অনুকৃতি দিয়ে সেলাই করা কিমানোতে। আমার সমস্ত বাসনা এখন ওর সম্মান ও গৌরবের নিচে চাপা পড়ে গেছে। আতুর চোখে আমি চেয়ে আছি ওর পায়ের মুড়ির দিকে। আমার স্বপ্ন আমাকে কোন পাতালে নিয়ে যেতে বসেছিল আজ! তোমার সুরভিত সৌন্দর্যই আজ আমাকে রক্ষা করেছে। অবদমিত কামনার স্বপ্নের পরাজয় হয়েছে।

আমি চলে আসার সময় দেখি সে ডান কাত হয়ে রোহণের লেপের ওপর সুরক্ষার হাত তুলে দিচ্ছে। হাত বুলিয়ে দিল। আমার মনে হলো ও তখন জেগে গেছে বা জেগে আছে। আমাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষার জন্যই বুঝিবা ও ঘুমের ভান করে এতক্ষণ পড়ে ছিল। পরাজয়েও এত সুখ, তা আমার আজ অভ্রান্ত জানা হলো। এই সুখের গৌরবে নিজের বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়তেই পাই ওর রেখে যাওয়া গায়ের সুরভি। আমার বালিশ ও শয্যা সুখসন্তপ্ত হয়ে আছে গৌরবে! সুধাসাগরের অন্ধকারে, যা একই সঙ্গে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য।

মৃত্যুর পরও রুবাবা আমাকে আজ লজ্জা থেকে সুরক্ষা দিয়ে গর্বিত করে দিয়েছে। রাত্রির দেবী হে নিক্স, তোমার সুসন্তান ঘুমের দেবতা হিপ্নোসকে বলে দেবে? আমাকে ঘুম দিতে বলো। তোমার অন্য ছেলে স্বপ্নদেবতা মরফিউস আমাকে স্বপ্ন ও বাস্তবতা দিয়ে পরীক্ষা করেছে বলে আমি দোষ দেব না। তোমার অন্য সন্তান মৃত্যুদেবতা রুবাবাকে নিয়ে গেছে বলে এখন অভিযোগ করে কী হবে আর! তুমি দেবী, অমরা। রুবাবার অকালমৃত্যু খুব বেদনাদায়ক, মানতে পারি না সে মৃত্যু, তবু মেনে নিচ্ছি তোমার জন্য। মৃত্যুই ধ্রুব সত্য বলে। অসময়ের হলেও। বাবার মৃত্যুও মনে নিয়েছি প্রায় পরিণত বয়সে বলে। রোহণ ও মুরাসাকি-সান-এর দিকে এখন চোখ তুলো না দোহাই। আমার দিকেও না। আমাদের পোষা বেড়াল ও পাশের বাড়ির খাঁচার পাখির দিকেও না। আমি গেলে ময়নাটা আমাকে বসতে বলে, শুভকামনা করে। হাসে। ওদের মৃত্যুর জগতে নিয়ে যেও না।

ছয়.

আরো চার দিন কেটে গেল। রুবাবার পারলৌকিক কাজ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। শীতের এক পশলা বৃষ্টি হয়ে রবিশস্যের উপকার করে গেছে। একটি গাছে আমের প্রথম মুকুল দেখা দিচ্ছে। রোহণ এখন মুরাসাকিকে ভালো চেনে। নাজমা এখন রোহণের কাপড়চোপড় ধোয়া ও প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত। নীলিমা গেছে দোকানে, কাছেই। ওখানে একটা ঝুরি নামা বটগাছ আছে। আমার বয়সী। ফুটপাতের অর্ধেক দখল করে নিয়েছে। ঝুরিগুলো মাটিতে নামতে পারছে না, লোকে যেতে-আসতে শুধু শুধু টেনে ছিঁড়ে ফেলে। ফুটপাতে নেমেও-বা কী করবে? ইট বিছানো। তবুও নামতে পারলেই ঠিক জায়গা খুঁজে নিত। বট-অশ্বথ ওটা পারে। প্রচুর পাখি আসে বটফল খেতে। নীলিমাও গাছটির ভক্ত হয়ে গেছে। বসন্তে কোকিল বসে ডাকে। বসন্ত বৌরির ডাক চলে আসে–পুক্ পুক্ পুক্। সারা বসন্ত-গ্রীষ্ম ডাকবে। কোনো পাখির ডাক শুনতে পেলেই মুরাসাকি জানতে চায় পাখিটার নাম। ও সঙ্গে সঙ্গে জীব অভিধান দেখে বৈজ্ঞানিক নাম লিখে নেয় খাতায়। জাপানে গিয়ে হয়তো জাপানি নাম জেনে নেবে। সবকিছুতে ওর ব্যাপক আগ্রহ। সালিম আলীর পাখির বই আছে আমার, মোট সাত খণ্ড। ওখান থেকে খুঁজে বের করে পাখির ছবি। মাঝখানে একটি খণ্ড নেই।

ভুলেও জানতে চাই না ওর জাপানে ফিরে যাওয়ার কথা। সেও মুখে আনে না। এতে খুব খুশি আমি। নীলিমাও। ওর দেশের সেমিসাং ও বাঁশির কথা বলে। গভীর অরণ্যে বাঁশি ও সেমিসাং-এর সুর ওর খুব প্রিয়। বলতে প্রায়ই সে তার আবেগের রাশ টেনে ধরে। আবেগে ফুলে ওঠা ঠোঁট মুহূর্তে বশ মানিয়ে নেয়। আমিও তাই আর এগিয়ে যেতে পারি না। সেই চা খাওয়ানোর পর থেকে মাঝে মাঝে সে সুযোগ করে নিয়ে নিজে চা করে আনে দু'জনের জন্য। এত উচ্ছল, এত ঝলমল অথচ ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি মনে হয় নির্মমভাবে বেঁধে রাখে বিশেষ বিশেষ সময়ে। ওটা শালীনতা বলে ধরে নিই। মাঝে মাঝে উদ্দামতাও প্রকাশ করে।

সাত.

আমার ছুটি ফুরিয়ে গেল। সেদিন অফিসে যাওয়ার সময় সে সামনে এসে দাঁড়ায়। রোহণ নার্সের কোলে। এসে বলল, 'আমি তোমার টাই বেঁধে দেই?' বলে চোখ নত করে নিল। আমি অবাক হয়ে কী বলব ভাবছি। কিছু বলছি না বলে মুখ টিপে হাসল নত মুখে, যেন কিশোরী। ওর গায়ে ঘুর ঘুর করা প্রজাপতির ছবি আঁকা ওবি (কিমানো জাতীয় পোশাক)। ঝলমলে বসন্তের মতো। শীতকাল হলেও শীতের দাপট একটুও নেই।

'মুরাসাকি-সান, আমি সাধারণত স্যুট-টাই পরি না। শুধু কোট পরি।'

'সত্যি! আমি তো তোমাকে আজই প্রথম দেখছি অফিসে যেতে। এজন্যই।'

'তোমাকে, তোমাকে ভাবছি! আমি তো কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

'কেন কেন? আমি কি আঘাত করলাম?' বলে চোখ বড় করল, গাল ফুলিয়ে রাগত, নাকি অভিমান প্রকাশ করল বুঝতে পারলাম না। দেখি কি রুবাবার মতো প্রথম প্রেমে পড়ার সমস্ত আগ্রাসী লক্ষণ। না, না, অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ! তাও বোধ করি নয়। তা এমন কিছু যা তক্ষুনি আমি ঠিক ঠিক ধরতে পারিনি কিন্তু তার ব্যাপকতা অনুভব করতে পেরেছি।

'আঘাত-প্রত্যাঘাতের প্রশ্ন তো আসেই না। তোমার ঋণ এত বেড়ে যাচ্ছে যে শেষে ডুবেই মরি যদি!'

'কারও কাছে ঋণী হতে তুমি কখনো কি চাওনি? ঋণী হয়ে সুখ অনুভব করোনি?'

'এরই মধ্যে বা এই জীবনে আমি একজনের কাছে আকণ্ঠ ঋণী হয়ে গেছি। কিন্তু সেটা বলারও সুযোগ পাচ্ছি না। তার

পারছি না।' প্রায় আত্মসমর্পণের মতো বললাম।

'আমি কি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারি না! এতই অপাঙক্তেয় আমি!'

'না না, তা কেন? তুমি কেন অবহেলিত হবে? তোমার তো কোনো দোষ নেই।'

'তাহলে আমাকে বলছ না কেন? বলোনি কেন এতদিন? আমি কি এইটুকু দাবি করতে পারি না?'

'পারো। আজ বলব তোমাকে। অফিস থেকে আসি। খেয়েদেয়ে আমরা আলোচনা করতে তো পারিই। তখন তুমি সময় দিতে পারবে তো?'

'তোমার কোটটা অন্তত পরিয়ে দিতে দাও!'

'শিরোধার্য।' বলে হাতে ভঙ্গি তুলে দাঁড়ালাম। মুরাসাকি কোট নিয়ে আমার পেছনে দাঁড়াল। যতখানি আমার পেছনে ঘনসন্নিবদ্ধ হওয়া দরকার ততখানি। আমার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে কম নয়, বেশিও না। ওর গায়ের প্রজাপতি-সুবাস পেলাম। সেই সুগন্ধ দিনে দিনে কি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে, নাকি সৌহার্দ্যপূর্ণ কৌতুককর!

পেছন থেকে দু'হাতে মেলে ধরা কোটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিতেই সে সামনে এসে দাঁড়াল। এবার ওর দু'চোখ আমার চোখে। সেই চোখে অপরাজেয় মৃদু হাসি। সেই হাসি দিয়ে কোট ঠিকঠাক করে দিল। ওর ঠোঁটে কি চুমোর ঢেউ উঠেছে! মুখোমুখি সুগোল ওষ্ঠে কি তাহলে ভ্রান্তিবিনোদ! বারবার ভুল করার আমোদ! আর মনে মনে যেন বলল, তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু সে তো শুধু আমার কল্পনা। আমিও বলতে চাইলাম, তোমাকে ভালোবাসি। সেই মুহূর্তে নাজমা পেছনে এসে দাঁড়াল রোহণকে নিয়ে। মুরাসাকি এগিয়ে গিয়ে ওকে কোলে করে নিয়ে এলো সামনে। ডান হাতে টুসকি দিয়ে বললাম, 'বাবুসোনা, অফিসে যাব?'

কথাটা মুরাসাকিকেও বলা। মুরাসাকি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, 'আদর করো।'

আমার তখন বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, কাকে? রোহণ, নাকি তার বর্তমান মাকে? অনেক দিন যুদ্ধ করেও এ রকম কথা বলতে পারিনি। পারছি না। স্বপ্নের ঘোরে ওকে কোলে করে আমার বিছানায় নিয়ে আসার সময়ও। তখন মনে করেছিলাম রুবাবাকে নিয়ে আসছি। ওর কপোলে চুমো খেয়েছিলাম। আর স্বপ্নের রুবাবা যদি মুরাসাকি হয়ে থাকে তাহলে মুরাসাকিকে প্রথম চুমো খেয়েছিলাম? আর আজ রোহণকে চুমো খাওয়ার বদলে যদি মুরাসাকিকে খেয়ে নিই!

ভুলের বদলে সত্য বেরিয়ে পড়ে! ঝুঁকে পড়ে রোহণকে চুমো খাচ্ছি। মুরাসাকির মুখ তখন আমার মাথার ওপর, ওখানে আমার চুলে সে ঠোঁট চেপে ধরল অপাপবিদ্ধ আবেগে। সেই চুমো ছড়িয়ে পড়ল শিরা-উপশিরায়, প্রশান্তি নিয়ে। কোমলতা ও সখ্য, প্রণয় ও সৌহার্দ্য ধারায়। বাবুসোনাকে চুমো খাওয়ার অবস্থায় ডান হাত দিয়ে মুরাসাকির পিঠ আঁকড়ে ধরলাম। ওর প্রজাপতি ঘুর ঘুর করা কিমানোর নিচে কোনো পোশাক নেই। শরীরের উষ্ণতা অনুভব করা যায়। সেই উষ্ণস্রোত দু'জনেই অনুভব করতে পারি। দেয়াল ঘড়িতে তখন শুরু হয়েছে মাৎজার্তের মধুর সিম্ফনির নিয়মিত অংশভাগ। আমরা তিনজনেই খুব কাছে নিবদ্ধ হয়ে আছি। সিম্ফনি বেজে চলেছে মর্মলোকে।

'আমরা তিনজনে এভাবে আদর ভাগাভাগি করতে পারি মাৎজার্তের সিম্ফনি চলা পর্যন্ত।' বলে মুরাসাকি ঘন নিশ্বাস নিল আমার মাথা থেকে।

রোহণও তখন সাড়া দিল শরীর সঞ্চালন করে। অমনি নিজের মুখ ঘুরিয়ে গুঁজে দিল মুরাসাকির বুকের দিকে। অজান্তে আমার হাতখানি মুরাসাকির পিঠে সংবাহন করছে। আর তখনি রোহণ ছটফট শুরু করল। আমি ছেড়ে দাঁড়ালাম। মুরাসাকির চোখের দিকে তাকাতেই দেখি প্লবমান দুর্বোধ্য বা শালীনতাস্পৃষ্ট উদগ্র টুকরো টুকরো ভালোবাসা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশে উড়ে বেড়ানো চিল, ঈগল, শকুনও সৌন্দর্য বিলিয়ে বেড়ায়। রোহণ মুখ গুঁজে আছে মুরাসাকির বুকে। মা না হয়েও ওর মুখে মাতৃত্বের সুবাস খেলা করছে। ঝরনা ও জলপ্রপাতকে কি কেউ বেঁধে রাখতে চায়! নীলিমা এলো দরজা খুলে দিতে। দূর থেকে নাজমা দেখছে তার ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে।

আট.

সেই রাতে মুরাসাকি খুলে বসল তার স্বপ্নের ঝাঁপি। আতুর চোখেও আছে সুখের আবেশ। সেই স্বপ্নটি– কোলে করে রুবাবাকে আমার বিছানায় এনে রেখেছিলাম, পরে রুবাবা হয়ে গেল মুরাসাকি, আর আমার অনুশোচনা, আবার মুরাসাকিকে রোহণের পাশে বিছানায় নিয়ে যাওয়া...।

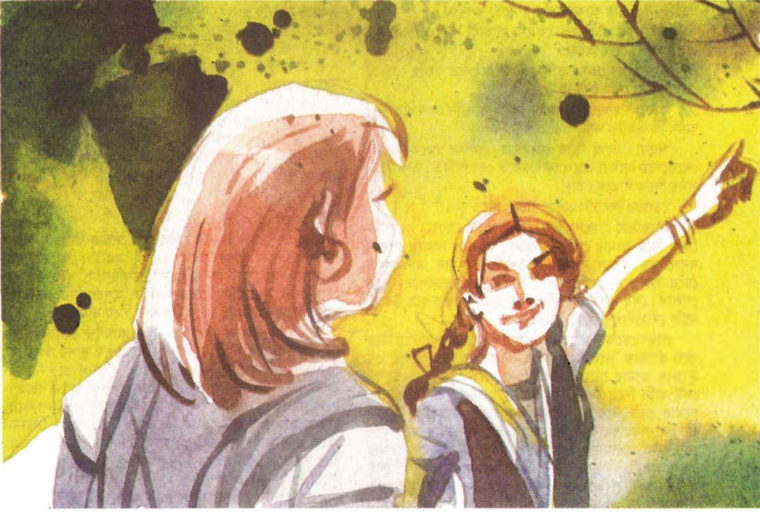
'তুমি কি রুবাবা-সান মনে করে আমাকে কোলে তুলে তোমার বিছানায় নিয়ে যাচ্ছিলে? কী আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন! যে তুমি আমাকে কখনো আলিঙ্গন দাওনি, দু'চোখ ভরে নীরবে ভালো করে তাকিয়ে থাকো না, আমার কোল থেকে রোহণ সোনাকে কেড়ে নাও না, সেই তুমি আমাকে পাঁজাকোলা করে বুকে ধরে নিয়ে আসছ তোমার এ ঘরের অর্থাৎ আমার বিছানা থেকে ও-ঘরের শয্যায়! স্বপ্নের মাঝেও আমি শিহরণ অনুভব করে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম... ও বন্ধু আমার, কেন নিয়ে গিয়েছিলে?' বলতে বলতে ও থামল একটু। আরো একটু। যেন সমস্ত ঘটনার ছায়াছবি সম্পাদনা করছে।

'সত্যিই আমি রুবাবাকে হাসপাতালের শয্যা থেকে নিয়ে আসছিলাম। পাশে ছিলে তুমি। আঁধারে আঁধারে ছিদ্রহীন হাসপাতাল। সেখান থেকে বের হতে গিয়ে ঢুকে পড়লাম তার চেয়ে বেশি এক অন্ধকার কক্ষে। তুমি আমার কাঁধে হাত দিয়ে পিছু পিছু আসছিলে। আর সেই রুবাবাকে আমার এখনকার বিছানায় রাখলাম তখন দেখি তুমি, রুবাবা নয়। তখন আমার ন্যায় ও শালীনতাবোধ প্রবল হয়ে উঠল, এ কী করলাম আমি ভেবে।' বলে ওর চোখের বুক ধরলাম। স্বপ্ন হাতড়াতে লাগলাম।

'কেন শালীনতাবোধ? আমি কি এতই পর তোমার? তোমার মনে কি পাপবোধ ছিল? তা তো মনে হয় না। তুমি তো তেমন মানুষটি নও। আমি অভয় মনে তোমার কোলে করে যাচ্ছি। স্বপ্নের মধ্যে সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে এত সুকুমার স্বপ্নে কখনো পড়িনি আমি। আমি তখন ইচ্ছে করে নিজেকে পালকের মতো হালকা করে তুলছিলাম, যাতে তোমার একটুও কষ্ট না হয়। তোমার কি খুব ভারি মনে হয়েছিল আমাকে?'

'পাখির পালকের মতো। স্বপ্নের মতো প্রিয় কোমল ও ভারহীন।'

'তুমি তো আমাকে রুবাবা ভেবেই নিয়ে যাচ্ছিলে আদর করতে। আমাকে আড়াল করতে। সে তুমি তো করবেই। সে জন্য দুষছি না। আমার ভাবনা অন্যখানে। স্বপ্নে আমি ভাবছি রুবাবা-সান থাকতে আমাকে কেন এভাবে চুরি করে বা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে! তাহলে তুমিও অন্য পুরুষের মতো শালীনতাহীন-ভোগবাদী! তাহলে কার কাছে আমি ছুটে এলাম বাবার (তোমার বাবার) কথামতো? বাবা আমাকে এখানে আসতে বলেছেন ১০ বছর পর। অর্থাৎ ততদিনে তুমি যোগ্য হয়ে উঠবে। বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে চাকরিতে ঢুকবে। আমিও বড় হবো, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে



আসব। আসলে বাবা আমার দেশকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। আমিও সেই সঙ্গে বাংলা শিখতে শুরু করি। তখন আমার এমন অবস্থা বাবা যদি দশ-কুড়ি বছর কম বয়সী হতেন তাহলে হয়তো তাকেই ভালোবাসা নিবেদন করে বসতাম। জীবন মানুষকে যে কোথায় বয়ে নিয়ে যায় কেউ জানে না! আমি তো নইই। তোমার কোলে স্বপ্নের দোলায় দুলে এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছি। হৃদয়ে অঙ্কুরিত হচ্ছে একের পর এক পাপড়ির তরঙ্গ। আমার বাংলা শেখা, বাংলা উপন্যাস পাঠ, এক অদেখা রাজপুত্তুরের দেখা পাওয়া, অর্থাৎ ১০ বছর পর ঢাকায় এসে তার সঙ্গে দেখা হওয়া... কত মানুষের কত স্বপ্ন থাকে... আমারও সেই স্বপ্ন বা অধরা স্বপ্নের দুর্দান্ত বিনম্র এক বাসনা কৈশোর থেকে যৌবরাজ্য দখল করে নেয়। বাবাই সেই স্বপ্ন দেখিয়েছেন।'

'আমি তোমাকে যখন আমার শয্যায় নিয়ে এলাম তখন আমার অতিথি তুমি, সুন্দর মুরাসাকি হয়ে উঠল প্রবল প্রতাপশালী। আমার সম্মানবোধ তীব্রভাবে জেগে উঠল। তোমার সব সৌন্দর্য, ঘুমন্ত সৌন্দর্য, তোমার কোমলতা, লাবণ্যধারা আমাকে নিয়ে গেল তোমার পায়ের কাছে। একটি নিষ্পাপ চুমো পর্যন্ত আমি খুঁজে পেলাম না। তোমার শরীরের ঘ্রাণসাম্রাজ্যও মনে হলো আমি অবৈধভাবে গ্রহণ করছি...।' বলতে বলতে আমি যেন আরো দোষ করে ফেলেছি মনে হলো। অথচ স্বীকারোক্তি ছাড়া কোনো পথ আমার খোলা নেই।

'আমি তা মনে করতে পারি না। আমার প্রসন্ন সায় না থাকলে হোটেল থেকে তোমার ঘরে নিজে থেকে চলে আসতাম না। তোমার ভেতরটা পর্যন্ত আমি এরই মধ্যে দেখে নিয়েছি। আমি একটুও ভুল করিনি। স্বপ্নের মধ্যে আমি তোমাকে বুকের নিবিড় সান্নিধ্যে পেয়েছি। তুমিও পেয়েছ। তোমার বুকের ধুকপুক আমার বুকের শব্দের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়েছিল। তখন আমার অনেক কিছু ইচ্ছা করেছিল। তোমার কী ইচ্ছে করেছিল তা এখন জানতে চাওয়ার আর দরকার নেই। তখন আমি যা অনুভব করেছি সেটিই সত্য, তোমার স্বীকারোক্তিকে সম্মান করেই বলছি। আমি আমার আবেগ, বোধ নিয়ে সুদূরের পিপাসার শক্তিতে এসেছি। তোমাকে দেখা স্বপ্নে আমি প্রথমে আহত হয়েছি কি-না ভেবেছি। একটি বার আদরও প্রকাশ করোনি বলে নিজেকে আহত ভেবেছি। আর সেটিই তোমার সম্পদ। সেই দুর্লভ সম্পদ অবহেলা করার শিক্ষা অথবা যদি বলো সাহস তা আমার নেই। আমি এখন অসহায় শক্তিশালী। অর্থাৎ অসহায় অথচ শক্তিশালী। এখন আমি তোমার কাছে এবং তোমার জন্যই অভয়।'

'সেই স্বপ্নেও আমি তোমাকে চেয়েছি। তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে তোমার সুরভিচূর্ণ দিয়ে জয় করার শক্তি খুঁজে পেয়েছি। এখন আরো বেশি করে জেনেছি তুমি আমার কাছেই এসেছ। এখন আমি তোমাকে চাইতে পারি তোমার কথা অনুযায়ী আমার বাবার দেওয়া কথায়।'

'তোমার স্বপ্নের বা স্বপ্নবাস্তবতার মতো? নাকি আমার স্বপ্নের মতো? তবে এ প্রশ্নও এখন অবান্তর। আমরা এখন বাস্তবতা থেকে স্বপ্নলোকে দেখাশোনা করার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করছি, অর্থাৎ সেখানে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তোমার দেশটিই এক মায়াময় জগৎ। এখান থেকে ভালোবাসা নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বা পালানো কঠিন। আচ্ছা সত্যি করে বলো তো, তুমি কি তুকতাক বা বশীকরণ মন্ত্র জানো? আমার মা আমাকে এ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে



বলেছিলেন। তাবিজ, দারুটোনা ইত্যাদি! আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু তোমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে গান গেয়েছেন–

'আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও,
কে আমারে কী-যে বলে ভোলাও ভোলাও॥
ওরা কেবল কথার পাকে নিত্য আমায় বেঁধে রাখে,
বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও॥
মনে পড়ে, কত-না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথী।
আজকে তুমি তেমনি ক'রে সামনে তোমার রাখো ধরে,
আমার প্রাণে খেলার সে ঢেউ তোলাও॥'

'এই গানটি বাবা আমাকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। তখন আমি বাংলা জানি না। তিনি ইংরেজি অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। এখন আমি বাংলা লিখতে-পড়তে পারি। গীতবিতান বাংলায় পড়েছি। আমার মনে হয়েছে, এটি কবির শ্রেষ্ঠ বই। এর অনেক গান আমি শুনেছি। আমার পুরনো দিনের গ্রামোফোন ও আধুনিক টেপ রেকর্ডার আছে তবুও বলছি– তুমি কি বশীকরণ মন্ত্র জানো?'

'কী বলছ তুমি! আমি? মন্ত্র? তুকতাক? বশীকরণ মন্ত্র খাটিয়েছি তোমার ওপর? অথবা আমার বাবা?'– আমি অবাক বিস্ময়ে ওকেই প্রশ্ন করে বসলাম। কারণ আমি নিজেই তো এসব বিশ্বাস করি না।

'না, তোমার সম্মোহন থেকে বেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। তুমি কাছেও টানো না, দূরেও যেতে দাও না। কাছে মানে স্পর্শ করেও দেখো না, অথচ ভীষণভাবে তুমি আকর্ষণ করো, বশীকরণ মন্ত্রের মতো। জাপানেও এ বিশ্বাস আছে। হস্তরেখাবিদ আছে। রাস্তায়ও বসে দেখে। তারপরও তোমাকে আঘাত করার জন্য নয়, আমার মুগ্ধতা থেকে জানতে চাইছি। বাবার কাছে আমি জেনেছি তোমাদের সবার কথা। তোমার গ্রামখানি, তোমার শৈশব, এমনকি তোমার উড়নচণ্ডী স্বভাবও। আবার তোমার গভীর পড়াশোনা সাহিত্য বিষয়ে। আমি জানি। তোমাদের গ্রামের পাঠাগারের সব বই পড়ে শেষ করেছ উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময়েই। শুনেছি। তখন আমি ভেবে নিয়েছি তোমার চোখে চশমা, সেটা কখনোবা নাকের ডগায় নেমে পড়ে, বইপড়ার সময় তোমার অজান্তে তুমি ঠিক করে নাও। আর আঁতেল আঁতেল দেখায় তোমাকে। বাবা বলেছিলেন, 'মোটেই না। ওর চোখ একশ' বছরেও নষ্ট হবে না। কারণ ও বর্ষার বিলের শামুক ও খাঁদোয়া (বড় গোল লালচে শামুক) খায় খুব তৃপ্তিভরে। শামুক খেলে চোখ খারাপ হতে পারে না বলে আমরা ছেলেবেলা থেকে জেনে আসছি।' আর তুমি কখনো মেয়েদের পেছনে ঘুরঘুর করতে না, মেয়েরাই তোমাকে বশীভূত করতে ঘুরঘুর করত। আর এটা আমাকে খুব মুগ্ধ করে। তার ওপর তুমি ফুটবল, ভলিবল, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, ক্রিকেট, হকি খেলে হাত-পা ফুলিয়ে-ফেটে ঘরে আসো। আবার বর্ষাকালে নৌকাবাইচে অংশ না নিলেও নৌকা নিয়ে ছুটে যাও দেখতে। বানের সময় তুমি ডুবে যাওয়া ঘর-ভিটে পাহারা দাও। সঙ্গে একটা ছোট্ট নৌকা থাকে। আর সেই নৌকায় মাঝি হও তুমি। মাঝি থাকে ছুটিতে। দরকার মনে করলে তুমি মাঝিকে ডেকে নাও। এসব আমার কাছে স্বপ্ন বা কল্পরাজ্যের রূপকথা মনে হতো এবং এখনো তাই মনে করি। কী দুর্দান্ত সমৃদ্ধ তোমার ছেলেবেলা, কৈশোর ও যৌবন! তোমার লেখক হওয়াই তো উচিত। আমি সেই হবু সাহিত্যিকের সম্মোহন জালে পড়ে গেছি। তোমার সেই গ্রামখানিতে আমি আগামী বর্ষায় থাকতে চাই। অবিরাম পাঁচ দিন বৃষ্টি হলে বান হয়ে যায়? আরো পাঁচ দিন পর নেমে

যায়?...' বলে সে তার মুগ্ধতা থামাল অপার অন্য কোনো নিজস্ব মুগ্ধতায়।

'সেই সমৃদ্ধ স্মৃতি বলতে গেলে দু-দশ দিনে ফুরোবে না। যতদিন আমি দেখেছি, যত বছর, তার চেয়ে বেশি বছর কেটে যাবে বলতে গেলে। ততদিন তুমি থাকবে? থাকতে পারবে বা চাইবে?'– বলে গভীর বন্ধুতা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। পাড়াগেঁয়ের মতো হাঁ করে।

'বাবা আমাকে মৌখিক অধিকার দিয়ে বলেছেন...।' কথা শেষ না করে ওর বন্ধুতা মেলে ধরল।

'কী বলেছেন? বলে মুষলধারে বৃষ্টির অপেক্ষায় তাকালাম যেন আমি।'

'এ জন্য আমাকে দশ বছর সময় দিয়েছেন। আমি শেষ দু'বছর অনেক চেষ্টা করেও তাকে পাইনি। শুধু মুখের কথায় আমি এসেছি। 'লে. মু. শি. বি.' সংকেত এখনো তুমি বুঝতে পারনি বলে তোমাকে অভিযোগ করছি না। আমি তার অর্থ জেনে গেছি।'

'বলবে না আমাকে?' আমি প্রার্থনা ও ভালোবাসার কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম। খুশির জোয়ারের পূর্বপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখতে পাব জোয়ারের ঊর্ধ্বগামী স্রোত।

এমন সময় রোহণ চোখ মেলে তাকাল, যেন সে সবকিছু জানে আর আমাকে দেখে হাসল আমার বোকামির জন্য। আর যেন এ মুহূর্তে ওর ঘুম ভাঙাটা অপরিহার্য ছিল।

অমনি মুরাসাকি পরিপূর্ণ হাসি ও ভালোবাসার মতো কোনো এক গূঢ় বেদনায় আনতপ্রায় চোখে বলল, 'এখন রোহণ সোনা ও আমার সময়। তোমার সময় ফুরিয়ে গেছে বোধ করি। এখন রোহণকে ভালোবাসার অবসর দাও আমাকে।...'

'রোহণও শুনুক। ও তোমার পক্ষই নেবে, ভয় নেই।' আমি ওর মতো জমকালো চোখে হাসতে চেষ্টা করলাম।

'আমিও ওর পক্ষে।' বলে নির্জন হাসি মেলে ধরল ঠোঁট ও চিবুকে। তারপর আবার বলল, 'সেই স্বপ্নটা দেখলাম তার অনেক কিছু বলার সময় এখনো দেখছি পরিপক্ক হয়নি। তুমি যে পেটে হাত রেখেছিলে তা রুবাবা-সানকে মনে করেই রেখেছিলে, আমি বুঝতে পেরেছি স্বপ্নেও। ওর ক্ষত কতখানি তা খুঁজে পেতে দেখছিলে তাও মানি। ওখানে ডাক্তার ছোরা-কাঁচি চালিয়েছিল রুবাবা-সানকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে। আসলে আমাকেই যে তুমি নিয়ে গিয়েছিলে তা তুমি বুঝতেই পারোনি, তাই নয় কি? আমি তোমার ভুল ভেঙে দেব ভেবেও দিতে পারিনি। আমিও তাই বলেছিলাম, ওখানে নয় ওখানে অনেক ব্যথা। জমে আছে পানির মতো। সঙ্গে সঙ্গে তুমিও হাত সরিয়ে নিয়ে আমার গালে, চিবুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলে, 'চলো, এখান থেকে পালাই।' আমি সব জেনেও বলেছিলাম, টর্চটা জ্বেলে নাও। তুমি আমাকে ধরো...।'

সেই বুঝতে না পারা ভুলের লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বললাম, 'স্বপ্নের মধ্যে সেটা কী বার ছিল?'

'শনিবার।'

'তাহলে সেই দিন আর কখনো আসবে না। কারণ শনিবার হলো আমার জন্য শুভ বয়ে আনার দিন। ভালো স্বপ্ন খুব ঘনঘন দেখা যায় না। আর তাই যাতে খুব তাড়াতাড়ি আবার সেই স্বপ্নটা দেখা দেয়, বোধ করি সে জন্য পরবর্তী স্বপ্নের হাতে আমি নিজেকে সঁপে দিই। এই স্বপ্নটা আমার জীবনের এক রকম অমর কীর্তি। শুধু তুমি যদি ক্ষমার চোখে দেখো।' মরিয়া হয়ে বললাম মরমে।

'ক্ষমা করলে কি খুব শিগগির ভালো স্বপ্ন দেখা যায়?' বলে সে রোহণের দিকে তাকিয়ে ওর হাসি দেখতে লাগল। যেন ওর হাসি ঝরে ঝরে পড়ছে তা কুড়িয়ে নিয়ে জমিয়ে রাখাটাও মুরাসাকির দৈনন্দিন কাজ। আর আমি অফিস থেকে এসে মুখ-হাত ধুয়ে চা খাওয়ার সময় এবং সেও একসঙ্গে খেতে খেতে রোহণের সবকিছু বলা চাই... যেন ওটাই হবে তার দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ, যা আমাকে না বললে তার দুপুরের খাওয়া হজম হওয়া আটকে যাবে। আমারও চা খাওয়া নয়তো বিস্বাদ হয়ে যাবে। মুরাসাকি কী যত্ন নিতে পারে, কত মমতাময়ী তা আমার এক জীবনে কোথাও দেখিনি! আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছি আগেই। এখন ওর পালা। ওকে এই কয়দিনে কত রূপেই না দেখেছি। একবার মনে হয় ওর রুচি, শিক্ষা, ভদ্রতা ও মমতা। আবার ভালোবাসা। বাবার কথায় চলে এসেছে অজানা এক দেশে, অচেনা আমার অন্বেষণে। বিস্ময়কর ওর এই দূরের পাড়ি। ওর ভাবনা-চিন্তা, সামুরাই-নিনজা যোদ্ধার মতো একান্ত একরোখা।

রোহণ তখন ওর কোলে। বুকের সঙ্গে মিশে আপন মনে খেলছে কিন্তু মুরাসাকির দৃষ্টির বাইরে যেতে একটুও রাজি না। সে কথাই আমি তুলে ধরলাম অর্ঘ্যের মতো মুরাসাকির কাছে। উত্তরে সে হাসল ইচ্ছাকৃত স্বর্গচ্যুত দেবীর মতো, আমার ডান হাতটি টেনে রোহণের গায়ে রাখল। আমি ভেবেছি ওর বুকের কাছেই রাখতে চেয়েছিল আমার ইচ্ছের সম্মান জানাতে। আর বলল, 'তুমি কি কোনোদিন আমাকে ডাকবে না! স্বপ্ন ছাড়া কি বাস্তবের কিছুই তুমি খুঁজে পাও না!'

আমি তখন খুঁজে নিলাম ওর হাতখানি। কী কোমল ও হিমায়িত সংবেদনশীল! আর প্রণয়মাখা অপেক্ষা! সেই অপেক্ষা ফেলে রেখে সে চলে যাচ্ছে যেন নিজের একান্ত কক্ষে।

নয়.

রাতেই সে এলো আমার কাছে। স্বপ্নে নয়। সেই সুসময়ে বাইরে শীতের বৃষ্টি কেন হচ্ছিল জানি না। জানালায় দাঁড়িয়ে অসময়ের বৃষ্টি দেখতে গেলাম। পর্দা সরিয়ে কাচের একটা পাল্লা খুললাম কোনো রকম শব্দ ছাড়া। শব্দেরও তখন শীতের রাতের ঘুমের সময়। বৃষ্টির শব্দেও ঘুমের আমেজ। স্মৃতি থেকে কি শুনতে পেলাম, 'বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারই এ দ্বারে,...!' শীত তেমন নেই। নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়াল মুরাসাকি। গানের রেশ তখন ঘর থেকে বাইরে ছড়িয়ে গেছে জানালা দিয়ে, অন্ধকারে, বৃষ্টির চলমান সুবদ্ধ সঙ্গীতে। ওখানে চলল ওরা কখনো-শেষ-না হওয়া বৃষ্টিগুলো পেরিয়ে, আমাকে একটুও সঙ্গে না নিয়ে। সঙ্গীত বোধ করি কাউকে সঙ্গী করে না।

আমার পেছনে একবারও কোনো শব্দ না তুলে, একবারও বৃষ্টির শব্দে চাপা না পড়ে মুরাসাকির কথাগুলো নীল শিখার মতো আমার বুকে হেঁটে হেঁটে নামছে। গত রাত পর্যন্ত যা সে বলতে চেয়েছিল সেই কথা। গত রাত পর্যন্ত যা বলতে চেয়ে চেয়ে বলা হয়নি সেই কথা বেরিয়ে যাচ্ছে আমার বুক থেকে। পেছনে সে ছোরার ধারের মতো নরম চোখে আমাকে দেখছে, যার দিকে আমি দেখার চেষ্টাও করতে পারছি না। আবার তখন ওর উপস্থিতি জেনেও ওর দিকে না তাকানো প্রকাশ্যে তাকে আহত করার শামিল বুঝে আমি মুখ ঘুরিয়ে নিতেই দেখি ও ঠিক আমার মুখোমুখি। একটুও দূরে নয়, সামান্যের বেশি একটুও ফাঁক নেই। যুক্ত-তারার মতো।

শীতের বৃষ্টির শব্দের চেয়েও মৃদু ও উষ্ণ গলায় বলল, 'তোমার কাছে এসেছি আমার ঘরে নিয়ে যেতে। ঘুমিয়ে পড়লে তোমাকে কোলে তুলে নিয়ে যাব বলেও ভেবে রেখেছি।'

'তোমার কোনো কথা না শোনার মতো নই আমি। রুবাবা গত রাতে স্বপ্নে (নাকি জাগরণে) আমাকে বলেছে, তোমার জন্য সবকিছু করতে।'

'তোমার ঘর থেকে আমার ঘরে এসো এখন' বলে সে আমার হাত ধরল, সুবাস ছড়াল। 'গত দশ বছর ভেবেছি স্বপ্ন বাস্তবতায়। আমার মা-বাবা আমার স্বাধীন ইচ্ছেয় অমত করেননি। ওরা চলে গেছেন একই দিনে একই সময়ে ছয় মাস আগে। আমি আমার একমাত্র স্বপ্ন বাস্তবতার সঙ্গী হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি ৫ ডিসেম্বরের জন্য। এসে পড়লাম রোহণ ও তোমার অপ্রতিরোধ্য শোকসমুদ্রে। সেখানে দেখা পেলাম নিজেকেই...। কই, তোমার কিছু বলার নেই...!'

আমার চোখ দুটো আটকে গেল ওর দূরদৃষ্টি-ভরা গোল চোখে। ওরা বলল, দশ বছরে ভালোবাসার বয়স কত হয়! আর প্রথম দেখায়!...

রুবাবার ভালোবাসার গোপন ও প্রকাশিত দিন-মাস-বছরগুলো থেকে বেরিয়ে এসে, তার আপন প্রবৃত্তিগুলো থেকে ফিরে এলেও গত দশ দিনের হিসাবের কূল-কিনারা খুঁজে পেলাম না। মুরাসাকি তার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বলল, 'ভবিষ্যৎ রচনা করে মানুষ। এসো, আমরা ভবিষ্যৎ রচনা করি। তুমি যখন সেই অবিস্মরণীয় রাতে কোলে তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে... আমার বিছানা থেকে তোমার শয্যায়... আমার বিছানা যে বলছি তাও গভীর অর্থে ঠিক নয়, আসলে ঘরটাই তো তোমার। বিশেষ করে তোমার শোবার ঘর, যা বাবুসোনার জন্য আমাকে ছেড়ে দিয়েছ, যে শয্যা একান্তভাবেই তোমার ও রুবাবা-সানের। আবার আমাকে যখন থাকতে দিয়েছ তখন এই ক'দিনের জন্য আমার বলা যায় বৈকি। তুমি অত্যন্ত মমতাভরে, কোমল সৌজন্যে, নম্র আবেদনে আর যত রকম বিশেষণে ভূষিত করা যায় রাগমালা চিত্রসহযোগে সব ঢেলে দিয়ে সেই রাতে তুমি আমাকে কোলে তুলে নিয়েছ বলে মনে পড়ছে। এত সুন্দর ও সম্মান আমি সেই প্রথম অনুভব করেছি আমার যৌবন দিয়ে, ভালোবাসার সঞ্চিত সঙ্গীতের পাওনা নিয়ে, অত্যন্ত মোহময় সম্মানে ভূষিত হওয়ার মতো, কুমারী-স্বপ্নের মতো তুমি আমাকে নিয়ে চলেছ উড়িয়ে। যুদ্ধ-লড়াই করে নয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার নিয়েও নয়, পণবন্দি হিসেবেও নয়, শপথ ভঙ্গকারী বলেও নয়। কী বিপুল আবেগে আমার বুক ভরে উঠেছে তা শুধু কামী জনেই অনুভব করতে পারে। যেতে যেতে আমি কী ভেবেছি তা বিবেচনার বিষয় নয়। তুমি আমাকে নিয়ে কী করবে তার জন্য কোনো তুচ্ছ ভয়-ভীতিও নেই। আমি শুধু ভেবেছি তোমার আকাঙ্ক্ষা-সম্মান আমি পেতে চলেছি, আমার স্বপ্ন পূরণ হবে তোমার সঙ্গে। তুমি আমাকে বঞ্চিত করবে– সেই ভাবনা আমার নেই। এমনকি তুমি বিবাহিত এবং এক সন্তানের পিতা, সদ্য মৃত তোমার প্রিয়তমা পত্নীর শোক-সন্তাপ সবই আমার চোখের সামনেই ঘটে গেছে। রুবাবা-সানকে তুমি ভালোবেসে ঘরে তুলে নিয়েছ, তাও আমি বুঝতে পেরেছি। তুমিও বুঝতে পেরেছ আমার দশ বছর ধরে প্রতীক্ষার কথা। বাবা বেঁচে থাকলে ঘটনা কোন দিকে গড়াত সেই অনুমানও এখন আমি করতে যাব না। তুমি আমাকে ভালোবেসে কোলে তুলে নিয়ে যাচ্ছ, নারীত্বের এই সম্মান আমি অনুভব করেছি। এই বোধ সম্পন্নতায় এত ভরপুর যে আমি শেষটুকু দেখার অপেক্ষায় অধীর সচল ও স্থির হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে রুবাবা ভেবে নিয়ে গেছ কি-না আমি ভাবিনি। আমি আমাকে ভেবেছি, একজন প্রতীক্ষারত মানুষ যা ভাবে, প্রেমে পড়লে যা ভাবে– সেই ভাবনায় তোমার কোল-কাঙাল হয়ে চললাম; একবার ভাবলাম এই চলার শেষ যেন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়েও শেষ না হয়, কোনো নারী যেন তার জীবনের কাঙ্ক্ষিত জনের কোলছাড়া না হয়, স্বপ্ন-কোলহীন না হয়, প্রিয়জনহীন না হয়, এরকম নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগবঞ্চিত না হয়, এমন এক অনাঘ্রাত রাত্রির অবসান না ঘটে, এরকম আলো-আঁধারের সমাপ্তি না হয়, সুলক্ষুণে ছায়াময় এমন রাত্রি সারা জীবন চলতে থাকে, একটি প্রিয় মুখের কাছে আরেকটি প্রিয় মুখ এরকম দূরত্ব থেকেও চুমোর সুগোল স্বাদ সম্ভোগ ছাড়াও পায়, প্রতি পদক্ষেপে যেন দূরত্ব কমতে থাকে, ভালোবাসাও সমানতালে বাড়তে থাকে, সেই ভালোবাসা বিনামূল্যে কেনা যায়; অর্থাৎ প্রথমেও সম্পূর্ণ দামে নয়, তারপর অর্ধেক দামেও নয়, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিনামূল্যে যা কেনা যায় সেই ভালোবাসা। যা ক্রমবর্ধমান, ক্রমক্ষয়িষ্ণু আবার সহিষ্ণু ও মৃত্যুহীন। তুমি নিয়ে চললে। মাত্র এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। এত কাছে অথচ কত দূরে। ঘরের অন্ধকার তাকে ঠেলে ঠেলে দূরে নিয়ে যায়। মন কত তাড়াতাড়ি কত দূরে চলে যায়! স্বপ্নে এই সামান্য পথ সমুদ্রের মতো বিশাল হয়ে যায়, অলিগলি এসে যায় সামনে একের পর আরেকটি। যে বিছানায় ছিলাম সেটিই তো ভালো ছিল, একটি কামরার পর আরেকটি কামরা অনবরত আসে কেন? তোমার ঘরে এতগুলো কামরা তো ছিল না, নয় তাও বলি কী করে! প্রতিটি কামরা চেনা, চেনা কক্ষ থেকে আবার সেই চেনা কক্ষে ঢুকে পড়ছি। আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ, কী চাও জানতে তপ্ত হয়ে আছি, তবুও পথ ফুরোয় না। না ফুরোক, পথ শেষ না হোক, আমি তো তোমার তপ্ত কোল-জুড়ে থেকে চলতে চলতে সুখসম্ভোগ করছি, তোমার নিঃশ্বাসের গন্ধ নিচ্ছি। জানি না চলার শেষ কোথায়, আবার তোমার বিছানায় নিয়ে যাচ্ছি ভেবে কী আকুলতা, কী অনুভব! স্বপ্নের ভেতরে আমি স্বপ্ন বাঁধছি, আমার কিমোনো ঢাকা বুকে নিজস্ব রোশনচৌকির ঐকতান। তখন আমার কী মনে হয়েছিল তোমাকে বলতে পারিনি। বলা হয়নি। আজ শুধু সেই কথাটিই বলার জন্য এত কথা। চলমান স্বপ্নের কথার শেষটুকু বলতে চাওয়া, আমি মরে যাব না তো? রুবাবা-সানের মতো...!'

'আবার ভাবলাম, বাস্তবতাও এ রকম স্বপ্ন হয়ে যায় কী করে! মাত্র ও-ঘর থেকে এ-ঘরে নিয়ে চলেছে, কত কাছে! অথচ কত দূরে! মনে হলো আমি জেগে জেগে স্বপ্নে পড়ে যাচ্ছি। পালকের মতো ভারহীন হয়ে চলেছি তোমার সঙ্গে, মাত্র এতটুকু পথ, অথচ তোমার কক্ষ দূরে দূরে সরে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে... আবার খুব ভালো লাগছে, তুমি তো আছ, আমি তো আছি, ঘরেই তো আছি, হাঁটতেও হচ্ছে না অথচ চলেছি। তোমার উষ্ণতার সঙ্গে চলেছি, তোমার কোলে অথচ আলিঙ্গন নয়, তোমার মুখের কাছে অথচ অন্ধকারে তেমন দেখতেই পাচ্ছি না, তোমার মুখ থেকে আমার মুখ এক নিঃশ্বাসের দূরত্বে, অথচ পাচ্ছি না তোমার নিঃশ্বাস! তোমার চোখ থেকে আমার চোখের দূরত্ব অন্ধকারেও দৃষ্টিসীমায়, অথচ তোমার চোখের দৃষ্টি খুঁজে পাচ্ছি না, বুকের উষ্ণতার দূরত্বও বুকের সীমায়, কোলের সীমানায় কোল, অনুভবের সীমায় অনুভবের খেয়াতরণি, কথা না-বলার কথাও বলে দিচ্ছে মন, অসহ্য সুখ বলে দিচ্ছে সহ্য করার সহজ পাঠ, জীবন বলে চলেছে জীবনের কথা বলতে বলতে, অন্ধকার বলে দিচ্ছে অন্ধকার চিরসঙ্গী থাকুক, শরীর বলে চলেছে শরীরের কথা বলে দিতে, মন ছুটে যেতে চাইছে না-বলা কথা নিয়ে বহুদূরে, জেগে আছি অথচ ঘুমের মোড়কে, এখন তাহলে কি আমি জেগে জেগে ঘুমিয়ে পড়েছি, জাগরূক ঘুমে, ঐশ্বর্যময় জাগ্রত কম্প্র ঘুমের কোলে... আমি চলি, তুমিও চলো... আমিও চলেছি, তুমিও চলেছ... আস্তে আস্তে আমার হাত খুঁজে নিলে তুমি, তোমার হাত খুঁজে পেলাম আমি... তোমার চোখ দেখতে পেলাম আমি, আমার চোখ দেখতে পেলে তুমি, আমার ঠোঁটের কাছে তোমার ঠোঁট, তোমার ঠোঁটের কাছে আমার...

তোমার চোখ দুটি নীল আলোয় জ্বলে উঠল, আমার চোখেও দেখতে পেলাম নীল আলোর অনবদ্য খেলা... নিজের চোখকে নিজে দেখা... চোখ নয়, চোখের আলো, নীলের দ্যুতি... নীল দ্যুতির সঙ্গে নীল দ্যুতির সম্মিলন... আকাশের নক্ষত্রের আলোর সঙ্গে আরেক নক্ষত্রের আলোর প্রিয় সংঘর্ষ... শব্দহীন বিদ্যুল্লতার মতো... গচ্ছিত রাখা ভালোবাসার মতো... একজনের প্রিয় শরীরের সঙ্গে আরেকজনের প্রিয় শরীরের স্পর্শের মতো... সমর্পণের মতো... সম্প্রসারণের ও সংকোচনের তরঙ্গ... বৃষ্টি ও হাওয়ার সম্মিলন... বজ্র ও বিদ্যুতের আনন্দ ক্রীড়া... মাধবী ও মৌমাছির ক্রীড়াশৈলী– ভাবনার শেষ হয় না।... আমার ভাবনাটাই পাগল হয়ে গেছে মত্ততায় পড়ে।'

'তারপর, তারপর?' ওর শরীরে আমার হাতের তরঙ্গ পাঠাতে পাঠাতে বললাম।

'তারপর নয়, তার আগের কথা বলার আরো অনেক কথা আছে। সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো, আমি তখন ওফুকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। পড়ার নেশার সঙ্গে তোমার দেশের নেশায় বুঁদ। গরমের ছুটিতে সেবার গেলাম হক্কাইদো, জাপানের উত্তরের দ্বীপ। মাত্র এক বছর আগে ওখানে হয়ে গেছে বড় এক দুর্ঘটনা। জাপানি একদল পর্বতারোহী গিয়েছিলেন বিখ্যাত হিদাকা পর্বতের শৃঙ্গে উঠতে। ওরা ছয়জনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আবহাওয়া অফিস থেকে ঘন ঘন বিপজ্জনক সতর্কতা সত্ত্বেও ওরা চলল। ওরা তখন মাত্র ক্লাবের শিক্ষানবিশ। তারপরও পর্বতশৃঙ্গ পোরোশিরি জয়ের বাসনা তাদের উদগ্র। এদিকে আইনু দেবতা কান্না কামুইর ইচ্ছে হলো পোরোশিরি থেকে জলপ্রপাত, শীর্ণ গিরিখাত ও নদীর জলধারা হয়ে নেমে আসে। আবার সমুদ্র থেকে প্রচুর মাছ উজিয়ে যায় নদী বেয়ে পর্বতের দিকে। আমারও ইচ্ছে হয় নদী বেয়ে অন্তত কিছু দূর যদি যেতে পারি। পর্বতারোহী ক্লাবের সদস্য আমি নই, তার প্রাথমিক কলাকৌশলও কিছু জানি না। যাওয়ার আগে তাই বই পড়ে কিছু জেনে নিয়েছি অন্তত নদীর কিছু দূর উজানে যেখানে সচরাচর ভ্রমণবিলাসীরা যায়, হোটেল-পান্থশালা আছে ওই পর্যন্ত যাতে যেতে পারি। নদীর মোহনায় প্রবল বেগে নেমে আসা স্রোতের মুখে ছোট ছোট দু-তিনটি পাথুরে দ্বীপ আছে। তার একটিতে আমার জায়গা হলো। মাত্র এক বছর আগে ১৯৬৫ সালে পোরোশিরির দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সরকার সেই থেকে খুব কড়াকড়ি নজরদারি শুরু করেছে পর্বতারোহী নাবিকদের বেলায়। আমি দ্বীপের চমৎকার এক পান্থশালায় প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে জানালাওয়ালা কক্ষ পেলাম। সেই রাতে আকাশে ভরা পূর্ণিমার, 'বৈশাখ' রাত্রি। তোমাদের বৈশাখী পূর্ণিমা, যেদিন সিদ্ধার্থ গৌতম জন্ম নিয়েছিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। জাপানিরা মহাযানী বৌদ্ধ, তোমরা থেরবাদী। আমি আসার আগে এই বিষয়ে কিছু পড়াশোনা করে এসেছি, যেটা প্রত্যেক সচেতন ভ্রমণকারী করে থাকে। দ্বীপটা ছোট, পাহাড়ের ওপর চিত্রার্পিতের মতো বসে-শুয়ে আয়েশ করছে বলা যায়। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উঠে আসছে পূর্ণচাঁদের মায়া। গীতবিতানে আছে, রেকর্ডে গান শুনেছি। মনে পড়ে তোমার গানটি? শুনবে? ইংরেজিতে পড়েছি। তোমার বাবা আমাকে পড়িয়ে শুনিয়েছেন ইংরেজি ও বাংলায়।'...

'পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা, যায় যায় যায় চলে॥
আলোছায়ার সুরে অনেক কালের সে কোন দূরে
ডাকে আয় আয় আয় ব'লে॥
যেথায় চলে গেছে আমার হারা ফাগুনরাতি
সেথায় তারা ফিরে ফিরে খোঁজে আপন সাথি।
আলোছায়ায় যেথা অনেক দিনের সে কোন ব্যথা
কাঁদে হায় হায় হায় ব'লে॥'

'পুরো গানটি বললাম আমার মনের ভাব প্রকাশ করতে। এত সুন্দর করে এত বিপুল বিস্তারিত অথচ সংক্ষিপ্ত মননশীল বর্ণনা জাপানে মিলবে না। বিশেষ করে জাপানি হাইকু কবিতা প্রবলভাবে সাংকেতিক তুমি জানো। আর এটি সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত, মননশীল অথচ সরল সুন্দর। এজন্যই তিনি বিশ্বকবি। মাত্র সেদিন এসে পৌঁছেছি বাবার (তোমারই বাবার) সঙ্গে। আশ্চর্য মানুষ তিনি। এখন আমার মনে হচ্ছে তুমিও তাঁর মতো প্রবলভাবে অন্তর্মুখী মানুষ। আবার অনেক কথা বলে যাও কিছু কথা না-বলে, আবার কিছু না-বলে অনেক কথা বুঝিয়ে দাও ইঙ্গিতে ও তোমার ব্যবহারে। বাবা আমার তিনগুণ বয়েসী তবুও কী ঝকঝকে মনের অধিকারী। অসাধারণ ও ভালোবাসার যোগ্য বুড়ো যুবক। বাবাকে দেখে তোমার ছবি এঁকেছি মনে মনে। রবিঠাকুরের গান যেমন, এক দুর্দান্ত যুবক, সব গান যেন লিখে গেছেন যুবক বয়সে। তাঁর সত্তর বছর বয়সেও তাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়া যায়। তেমনি দুর্মরভাবে অন্তর্মুখী, মনের গভীরে প্রবেশ করা হিরের মতো জ্বলন্ত কঠিন। পারলে ওই পূর্ণিমার রাতেই যেন বাবা যাত্রা শুরু করেন পোরোশিরি অভিযানে। আমরা খুব খবরাখবর নিতে শুরু করেছিলাম প্রথম বেসক্যাম্পে অন্তত যদি যেতে পারি। কোথায়? ততক্ষণে পূর্ণচাঁদের মায়ায় আমি দ্বীপটি নিয়ে ভেসে চলেছি দক্ষিণ দিকে, অথচ আমাদের যাওয়ার কথা হেঁটে খানিক উত্তর-পশ্চিম দিকে। হক্কাইদোর মূল দ্বীপ আমাদের পশ্চিম দিকে নির্ভুলভাবে রয়েছে। মানচিত্র, অভিজ্ঞতা এমনকি স্বপ্নও তা বলে। বাবাও ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন, সেই ঘুমিয়ে পড়ার ক্ষণ থেকেই দ্বীপটির চলা শুরু, কথায়ও বলে স্বপ্নে ছাড়া কোনো মানুষই তার জীবনের সব ইচ্ছে পূরণ করতে পারে না, তো আমিই দ্বীপটি নিয়ে চলতে শুরু করলাম স্বপ্নে স্বপ্নে প্রশান্ত মহাসাগর ধরে সোজাসাপটা দক্ষিণ দিকে, কিসের জোরে দ্বীপটি চলছে জানি না, সম্ভবত স্বপ্নের জোরেই, প্রত্যেক মানুষ যেমন স্বপ্ন দেখে সামনের কিছু একটা আকর্ষণে চলতে থাকে, মন যেমন চলে ইচ্ছের জোরে অথবা মন ও ইচ্ছে একই, মনকে আকর্ষণ করে ঘটনা, আর ঘটবে বলেই ঘটনার জন্ম হয়, প্রত্যেক জিনিস অন্যকে, বা একে অপরকে আকর্ষণ করে, ওগুলোকে ঠিক মতো সাজানোটাই একটা জ্বলন্ত সমস্যা, সাজাতে জানাও আসল কথা, মন সেটা সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে চলেছে, যদি তা না হতো তাহলে আমার পক্ষে কোনো কালে আস্ত একটা দ্বীপ নিয়ে চলাই সম্ভবপর হতো না। আমার মনও বলছে দ্বীপটা বাবার বলা ঘটনার স্রোতে প্রশান্ত মহাসাগর ঘুরে হন্‌সু, সিকোকু, কিউসু, রিউকিউ এবং তাইওয়ান পেরিয়ে, সেলিবিস সাগর ফেলে ম্যাকাসর প্রণালিতে ঢুকবে, তারপর জাভা প্রণালি হয়ে মালাক্কা প্রণালিতে ঢুকলেই পেনাং তারপর ফুকেট দ্বীপের আশ্চর্য সুন্দর জগৎ। তারপর তো আন্দামান সাগর, বঙ্গোপসাগর, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, মহেশখালী, কুতুবদিয়া পার হলেই তোমার চট্টগ্রাম শহর। চাঁদের আলোয় এ সময় কেউ যদি একটি চলন্ত দ্বীপের ভ্রমণের বিস্তারিত বিষয় লক্ষ্য করছে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে, তার জানা থাকা দরকার মানুষের জীবনে স্বপ্ন ছাড়া এরকম কোনো ইচ্ছে পূরণ করা সম্ভব নয়, আর এ রকম ঘটনা বিমূর্ত তৈলচিত্র ছাড়া দেখানোও সম্ভব নয়, অথবা মায়া-বিভ্রম ছাড়া। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ভালোবাসার স্বপ্ন কুড়োতে কুড়োতে কারও যদি আধ্যাত্মিক চোখের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য হতে শুরু করে এবং এরকম ঘটনার দৃশ্য দেখার সুযোগ পায় তখন তাকে দোষ দেওয়াও কি সম্ভবপর? চাঁদ উঠতে উঠতে প্রশান্ত

মহাসাগরের ঠিক মধ্যবিন্দুতে এসে গেলে তা এরকম খোলামেলা দ্বীপে দাঁড়িয়ে ছাড়া দেখার মতো সুযোগ কী করেই বা পাওয়া সম্ভবপর! খুব প্রাচীন তেজে চাঁদও রাতের পৃথিবীর উদ্দেশ্যে আলো বিলিয়ে দিতে দিতে বলছে, আমি একটা গোল আলো, গোল চাকতির এক পিঠ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হলে অন্য পিঠে কী আছে এত দূর থেকে স্বপ্নে কখনো দেখা, কখনো কল্পনা করার কথা কোনো মানুষের মনে এসেছে কি-না, সে কথা তখন আমার একবারও মনে আসেনি, বরং তখন মনে আসতে পারত ওটা এক পিঠওয়ালা একটা বস্তু, যার অন্য পিঠ বলে কিছু নেই, সে কথা মনে পড়েছে চাঁদটা আকাশ পাড়ি দিয়ে পশ্চিমে ডুবে যাওয়ার ঘটনা না দেখতে পাওয়ার পর। মালাক্কা প্রণালি পার হওয়ার সময় সাদান ক্রশ বা ক্রাক্স মণ্ডল বা ত্রিশঙ্কু মণ্ডল দেখার সময়েও নয়, আকাশে অন্য কোনো মণ্ডল ক্রশ নামে পরিচিত নয়, বাংলাদেশ থেকে দেখাও যায় না, যেটা দক্ষিণ মেরু নির্ণয়ে সহায়তা করে, জাপান থেকে তো নয়ই, জীবনে এই প্রথম স্বপ্নে স্বপ্নে দেখা, যে ক্রশটির উত্তর-দক্ষিণ রেখাটি প্রায় পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিলে দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে পৌঁছে, তুমিও বোধহয় দেখোনি যদি দক্ষিণের কোনো দেশে না গিয়ে থাকো, ক্রশটির তারা বেশ উজ্জ্বল, এই মণ্ডলের বর্গক্ষেত্রের মধ্যে ৩২টি তারা খালি চোখে গুনে গুনে আমি দেখেছি। তোমাকে নিয়ে আমি যখন হুক্কাইদোর ওই দ্বীপের হোটেলে যাব তখনো যদি ওই হোটেলসহ দ্বীপটি আবার দক্ষিণ দিকে তোমার দেশের পথে পাড়ি যখন দেবে তখন এই ত্রিশঙ্কু (সাদার্ন ক্রশ) মণ্ডলের দক্ষিণ-পুবে আকাশের বিখ্যাত, 'কয়লার থলে নীহারিকা' তোমাকে দেখাব। দেখতে আকাশের ভেতরে একটি বিরাট গর্ত মনে হবে। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্শেল দূরবীন দিয়ে এটি আবিষ্কার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বোনকে ডেকে সেটা দেখিয়েছিলেন। বাবা তখন কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে এমন অঘোর ঘুমুচ্ছিলেন যে তাকে ডেকে তুলে দেখাইনি। তুমি তো জানো বাবার ঘুম মাঝ-ঘুমে চটে গেলে তিন ঘণ্টার আগে আর ঘুম আসে না তাঁর। তখন তিনি উঠে বারান্দায় গিয়ে ধূমপান করেন আর আকাশের তারা দেখেন। এখন স্বপ্নেও যদি দেখাতে পারতাম ত্রিশঙ্কুর ঝুলে থাকাটা, যেমন তুচ্ছ কারণেও মানুষের অনেক আশা অপূর্ণ থেকে যায়, তুচ্ছ ঘুমও একেক সময় খুব সুস্বাদু ও অতি প্রয়োজনীয় হয়ে যায়, আবার তারাগুলো ইচ্ছে করলেও অন্য তারার কাছে যেতে পারে না; মানুষ, জীবজন্তু, প্রজাপতি, কীটপতঙ্গ একে অপরের কাছে যেতে পারে; অন্ধ উইপোকাও পারে; তোমার কি কখনো কারো কাছে যেতে ইচ্ছে করেনি ইউনুসারি কাওয়াবাতার উপন্যাসের কোনো চরিত্রের খোঁজে, গেইসা সুন্দরী নারীরত্নের সঙ্গীত-নৃত্যের অভ্যন্তর জগতে। মাকে যে বয়সে বাবা হারিয়েছিলেন সে কথা আমি কখনো তাঁর কাছে জানতে চাইতে পারিনি, তোমার কাছেও চাই না বলব, নাকি তুমি নিজে থেকে একদিন দুঃসময়ের সে বর্ণনা দিয়ে আমার মা-বাবার একই সঙ্গে মৃত্যুর যন্ত্রণার ভাগীদার হতে চাও। আমি জানি না এই সুসময়ে কেন এমন কথা মনে করে সুখের ছিনতাই দেখার ইচ্ছে মনে আসে। এখন আকাশে পূর্ণচাঁদের সুখের সময়, ইচ্ছেগুলো কেন যে তাদের খেয়াল-খুশিমতো চলতে সন্তুষ্ট; কেন শরীরের ভেতরে লুকিয়ে থাকতে বা বিদায় নিতে চায় না অলক্ষ্যে মানুষকে রেহাই দিয়ে, এরকম চকিত ভাবনাও বা কেন যে এমন অস্বস্তিতে ফেলে দিতে তৎপর হয়ে ওঠে, অথচ আকাশের কালো থলের ছিদ্র দিয়ে ঢুকে ওপারে কী থাকতে পারে দেখার ইচ্ছে কেন জাগে না, তাহলে কি ইচ্ছাই মানুষের ঈশ্বর বা পরম আরাধ্য, নাকি নিরাময়ের অযোগ্য ব্যাধি! আকাশের হাজার লক্ষ-কোটি তারা নিয়ে ভালোবাসার রাত্রির কথা কেন মনে এসে দখলদারিত্ব ফলাও করে না! এও কি ইচ্ছার কারসাজি! আহা ইচ্ছে!

মুরাসাকি উপশমের অতীত তার নিজের স্বপ্নস্রোতে ভাসতে ভাসতে দেরি হয়ে যাবে বলে আমার ডান হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের ওপর রাখল, সেখানে বসন্তের চেরি ফুলসমৃদ্ধ ওর রাত্রিবাস কি কোনো আশায় অপেক্ষা করছিল, অথবা বুভুক্ষু রাতে ফোটা তোকিও নগরীর অন্য চেরি বীথি! দর্শক সমাগম না হলে চেরি ফুলেরও কি রাত জাগা ব্যর্থ মনে হয়? আমার হাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেরি ফুলেরা কলহংসীর মতো ডেকে উঠল, জগতের সেরা সুতোয় বোনা পোশাকে চেরি ফুলগুলো সদ্য ফুটেছে আজ রাতে যেনবা, চেরি ফুলগুলো জানে না কেমন করে তুলে ধুনতে বা বুনতে হয়, তার থেকে সুতো হয় এবং সেজন্যই তাদের এত যত্ন করে উৎপাদন করা হয়, জাহাজে করে নিয়ে আসা হয় নিপ্পন দেশের বন্দরে এবং এজন্যই তাদের এত আদর-যত্ন, তার থেকে পোশাক ও অন্তর্বাস হয়, প্রাচীনকালে সামুরাই ও নিন্‌জা মেয়েদের পোশাক তৈরি হতো, সিল্কের হলে রেশম পোকারাও জানত না ওরা কার গায়ের সুবাস পাবে ওদের মৃত্যুর পর, অথবা অন্তরঙ্গ কোমল অঙ্গের ঘাম-রস-গন্ধ ভোগ করতে হবে বাধ্য হয়ে। মুরাসাকি শিকোবু ও প্রজাপতি বা চেরি ফুলের মতো, মানবী অথচ রেশমি কাপড় ও উৎকৃষ্ট তুলোর কাপড়ে আবৃত এবং পোশাক পরা অবস্থায় শিকোবু সে রকমই গৌরবে অতুল, চেরির রঙে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিবর্তনশীল সে। একবার ভাবলাম ওকে বলব ডাকযোগে কিছু চেরিফুল পাঠিয়ে দিতে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতখানিতে বুকের জামার ওপর চেরি ফুলের স্পর্শ পেয়ে গেলাম এবং মৃদু ভূকম্পের মতো কেঁপে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো শিকোবু নয় সে, কাপ্পা অর্থাৎ সুসংস্কৃত জলদেবী। রিউনুসুকে আকুতোগাওয়ার 'কাপ্পা' বই তখনো আমি পড়িনি, ওরা হিংস্র নাকি সুকুমার আসলে কিছুই আমার জানা নেই। আমার হাতের কাঁপন যেন ভূকম্প মাপার যন্ত্রে মেপে নিয়ে সে তার কুসুমকোরকের মতো হাতে চেপে ধরে রাখল নীরব শৃঙ্খলাময় আলসেমিতে অথবা বন্ধুত্বের শাসন শ্লাঘায়। আমিও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে গুণী শ্রোতার মতো ধৈর্য রক্ষায় তৎপর হয়ে পড়লাম। পণ্ডিত রবিশঙ্কর সেতার বাজানোর আগে ধৈর্যশীল আবেগপ্রবণ শ্রোতা হতে বলতেন সকলকে।

কৃষ্ণপক্ষের রাতের অন্ধকারের উদ্দেশে যেমন তারারা বলে– আমরা আলো, তেমন কোনো বাক্যবিনিময় না করেও শিকোবু বলে চলল দ্বীপ নিয়ে চলা অকল্পনীয় বাস্তব ভ্রমণ কাহিনী, কিন্তু পোশাকের অন্তরালে তার শরীর সত্যিই আছে কি-না তা অন্ধকারে দেখা না গেলেও রাতের আঁধারে ফুটতে থাকা ফুলের মতো তা প্রস্ফুটিত হতে চলেছে, অনুভব করা যায়। সে অন্ধকারে শিকোবু-সানের উজ্জ্বল শরীর শেমিসেন বাদ্যযন্ত্রের মতো প্রথম ঝঙ্কার তুলল তার একান্ত অগোচরে! তারপর গভীর অরণ্যে ঢুকে পাহাড়ি ঝরনার সঙ্গে মিশে সেই ঝঙ্কার আস্তে আস্তে রাতের দ্বিতীয় প্রহরে মেঘমল্লার রাগে পরিণত হতে শুরু করল। ওর বলা সব কথা আমার উদ্দেশে সঙ্গীত হয়ে উঠতে থাকে। কারণ আমার হৃৎপিণ্ড রাতের প্রহরে প্রহরে ততক্ষণে ধূমকেতুর মতো প্রবল গতিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। শেমিসেন বাজছে ওর কথায়, গভীর অরণ্যে জাপানি বাঁশি গম্ভীর সুরে যেমন সাত সুরের বদলে চার-পাঁচটি সুর নিয়ে স্বপ্ন নৃত্য করে, ঠিক সে রকম যেনবা। ওদের দেশে পাহাড়ি ঝরনার জলকে কেউ যেমন বাঁশ দোফালা করে গিঁটগুলো ফেলে দিয়ে জল চলার ব্যবস্থা করে, ঠাণ্ডা জল তার ওপর দিয়ে চলে আসে তৃষ্ণার্তের মুখের কাছে, পথিক নিরাপদে পান করে, তারও যেমন একটা নিজস্ব সুর আছে, তেমনি শিকোবু-সান বলে যাচ্ছে তার নিজস্ব কাহিনী সঙ্গীতের মধুর গম্ভীর ভাবের গমকের মতো। বিশেষ একটি

বিষয় হলেও তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়কে টেনে নিয়ে বলে যাচ্ছে তার নিজস্ব কাহিনী সঙ্গীতে মধুর ও গম্ভীর ভাবের অন্য একটি গমকের মতো। শুরুতে বিশেষ একটি বিষয় মনে হলেও তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়কে সঙ্গী করে নিয়ে বলে যাচ্ছে ধ্রুপদ সঙ্গীতের গমকের মতো। ওতে শিকোবু-সান স্ফূরিত, কম্পিত, লীন ও আন্দোলিত হচ্ছে সঙ্গীতের এই গমকের মতো। উল্লসিত এবং পল্লবিতও হচ্ছে আমার হাতখানি নিয়ে। ও হয়তো জানে না ওর শরীরের কোথায় কোথায় এত এত কম্পন ও আন্দোলন চিত্রবৎ লীন হয়ে আছে! সে হয়তো আগে আর কাউকে ভালোবেসে সঙ্গীতের গমকের গাম্ভীর্যে আন্দোলিত হওয়ার অবসর পায়নি সঙ্গীতের মতো তখন হাত নেই, শেমিসেন বাদ্যযন্ত্রের যন্ত্রী হয়ে অবোধ-সুবোধ হাত নির্জনতাকে আরো নির্জনতায় ভরে তুলছে। কোথাও কোনো শব্দ না থাকলে তাকে বলে নির্জনতা! অরণ্যের গভীর নির্জনতায় গাছপালার ওপর দিয়ে হঠাৎ এক প্রস্থ হাওয়া উড়ে যাওয়ার সময় অল্প সময়ের জন্য যে শব্দশিল্প সৃষ্টি করে যায়, তাকেও নির্জনতা বলে! অরণ্য কখনও নিঃশব্দ হয় কি! নিঃশব্দের মধ্যে একটি পোকার ডাকও নির্জনতা! সেই অবস্থায় ঝরনার টানা এক সুরে বয়ে চলা শব্দশিল্প নির্জনতা! জনমানবহীন সমুদ্র সৈকতের গর্জনও নির্জনতা নয় কি! নিস্তব্ধ দুপুরে, হাওয়া বা ঝড়-বৃষ্টিহীন সুসময়ে পাখির আপন মনে ডাকা, গাছ থেকে একটি মরা ছোট ডাল ভেঙে পড়া, ক্রেং পোকার সুরেলা একটানা ডাক, একটি শুকনো বিস্তৃত বিষণ্ন উদাল পাতা লম্বা ডাঁটি নিয়ে শুকনো ঝরাপাতার ওপর পড়ে শব্দ করে; তাকে কি অরণ্যের নির্জনতা ভঙ্গকারী হিসেবে পরোয়ানা জারি করবে বনদেবতা?

দশ.

কী নির্জন, কী নির্জন, আস্ত একটি চলন্ত দ্বীপ নিয়ে ভ্রমণ! গাছপালার আন্দোলন থেকে আসা সুরের অভিঘাত প্রথমে মনের তারে ধরা পড়েনি জ্যোৎস্নার তরঙ্গের জন্য, তারপর বাধা দিল ঢেউয়ের ওপর চিকচিক করে ওঠা ফসফরাসের দেমাগ নিয়ে রাতের আলোর ফুলকি, তারপর তোমার দেশে আসার খবর তোমাকে জানাবার সময় পাইনি বলে, তারপর বাবা অমন মূল্যবান মণিরত্ন পাওয়ার মতো ঘুমুচ্ছেন যে, আমারও ইচ্ছে মাথা ফুঁড়ে এসে বলল ঘুমুতে। কিন্তু তারার আলোয় চারদিক এত ঐশ্বর্যময় উষ্ণ হয়ে আছে যে, কিছুতেই ঘুম আসে না। বাবা যেন ঘুমের মধ্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করতে করতে বা বলার চেষ্টায় বিড়বিড় করে চললেন, নাকি পোরোশিরির আইনু দেবতার সঙ্গে কথা বলছেন, স্থির করতে না পেরে ডাকতে পারলাম না কোন পথে তোমার কাছে যাব; অথবা



ইচ্ছেটা দিচ্ছিল শরীরের সঙ্গে এমন সেঁটে গেছে যে সেটাকে টেনে আনতে গেলে যদি আমার বাবার মৃত্যুর ঘটনা ছুটে আসে সেই ভয়ে বিরত হয়ে গেলাম। দূর আকাশে বঙ্গোপসাগরের ওপর বিশ্রাম নিচ্ছে প্রিয় দুষ্টু চাঁদটা, তখনোও জ্বলজ্বল করছে কিন্তু ধোঁয়াটে সাদা, মায়াবী, পশ্চিম দিগন্তের নিচে ছুটি নিতে যাচ্ছে ওটা, তারপর আগামী দিন পর্যন্ত ওর বিদায়, তার মধ্যে আমাদের যাত্রা শেষ করতে হবে, অথচ তোমার গ্রামের বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না, জানি না কোন দিকে গেলে পেয়ে যাব; স্পষ্টতই এখনও বাবা যেহেতু ঘুমে মত্ত, যেহেতু অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার এখনও ঘটে এবং ভালো কিছুও থাকে তার মধ্যে, সে রকম ঘটনার জন্য আমি অপেক্ষায় বাকি রাতের শরণাপন্ন হয়ে থাকব কি-না ভেবেছি

বলেই-না তোমাকে এতদিন পর পেয়ে গেলাম তোমার এই হাতে, যা তুমি সঙ্গীত শিক্ষার মতো এখন ব্যবহার করছ চেরি ফুল নিয়ে, তা কখনো জীবিত রুবাবা-সান কখনো আমির উপর, হাজার হোক মানুষ কখনো চেরি ফুল নয়, চেরি ফুলও মানুষ নয়, কিন্তু তারা উভয়েই উভয়কে বুঝতে সক্ষম, এই রাতেও স্পষ্ট দিবালোকের মতো, তোমাকে এখন মনে হচ্ছে আমি অশ্লেষা নক্ষত্রের পাশ কেটে বসন্তের চেরি ফুল দেখাতে নিয়ে যেতে পারব, সে রকম অনেক ভালো নক্ষত্র সেই দ্বীপের জাহাজে চড়ে আসতে আসতে দেখা পেয়েছিলাম, কারণ চাঁদটা দূর আকাশ পাড়ি দিতে দিতে হাতে ধরে রেখেছিল সদ্য ফোটা একটি চেরি ও একটি আজেলিয়া। দুটি ফুলই জাপানের প্রতীক, তার কারণ সেই দ্বীপ নিয়ে এতদূর ভ্রমণ করেও বিধ্বস্ত হওয়ার কোনো ভয় কখনো মনে পড়েনি, অনুভূতির শিকার হয়েও, তার উপর তারাগুলো সাগরের উপর নীল লণ্ঠনের মতো দুলছিলও, সাপুড়ের বাঁশির সুরে সুরে সাপ ফণা তুলে দোলে যেমন। সে সময় বঙ্গোপসাগর আচমকা যখন বিড়বিড় শুরু করেছিল, অথবা সে রকমই আমার মনে হয়েছিল কিংবা সমুদ্র দেবীর মায়াও যদি তা হয়ে থাকে কিংবা তা চাঁদের প্রভাব না হয়েও থাকে, আমাদের একটার বদলে তিনটি বা দুটি চাঁদ যদি থাকত তবুও জেনো আমি তোমার কাছে আসতাম, এমনকি তা দু-তিন বছর আগেও ঘটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল। বাবাটা যে ঘুমের মাঝে কী এমন মণিরত্ন খুঁজে পেয়েছিলেন সেই ব্যাপক প্রশংসনীয় অভিযানের রাতে, তার ওপর কিছুই করার ছিল না আমার, তাহলে সেই অভিজ্ঞতার কথা আমার বলা হতো না আজ তোমার হাত দিয়ে, যে হাত আজ এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের প্রস্তুতির তরঙ্গ তুলেছে, সুদিন সুরাত্রির সম্পদ হয়ে, এই জগতে শুধু জীবন আর মৃত্যুই আছে, তার শেষ করার অপেক্ষায় শুধু থাকতে পারি, সেখানে তার ব্যতিক্রম করতে যাওয়া শুধু পাগলামো বরং ওদের বড় হতে দাও, এসবই হচ্ছে জীবনের ভাগ্য বা রহস্যময়তা বা সুখ বা দুঃখ অথবা ঐশ্বর্য বা সম্পদ বা সৌন্দর্য... মৃত্যুকে নিরুপায় হয়ে শুধু আসতে দিতে পারি, রোধ করতে পারি না, জন্মকে রোধ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছে মানুষ, মৃত্যুকে পারেনি, রাত্রিকে আলোকিত করা যায়, দিনকে সুসভ্য কোনো অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া যায় না। আমার কুমারিত্ব তুমি হরণ করতে পার; ফিরিয়ে দিতে পার না। তোমার কৌমার্য একবার বিসর্জন দিলে তুমি ফিরে পেতে পার না। একজন মুক্তিযোদ্ধা যেমন সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যুদ্ধদিন ও বিজয়ের স্মৃতিসুখে স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। আমিও বাবার সব কথায় তোমার কথা যা যা শুনেছি তাতে স্মৃতিভারাতুর হয়ে পড়ি, তার থেকে আমার মুক্তি নেই, গ্রিক দেবী ডেলফির দৈববাণীর মতো, দেবতারা এখন নেই কিন্তু মহৎপ্রাণ মানুষ আছেন, সত্যবাদীর কথা কখনও বিফলে যায় না, তোমার দক্ষিণ হাত আমি নিজে থেকে তুলে নিয়েছি, সেই স্বাধীনতা তুমিও এখন পেয়ে গেছ, আমি আকুল হয়ে যেমন পাগলপ্রায় কথাগুলো বলে যাচ্ছি, আমার আকাঙ্ক্ষার সম্পদ আমি খুঁজে পেয়েছি, আমার ইচ্ছা আমি সমর্পণ করেছি, তার জন্য আমি আনন্দের অশ্রু বইয়ে দিতে পারি; এই দেখো অথবা অনুভব করে নাও আমার চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে, বুকের ঢেউও গুনতে পার হাত দিয়ে, নাভির বিভঙ্গ, কথা দিয়ে ঠোঁটের কম্পন, উরুর স্পর্শে উরুর ঢেউ, তৃষ্ণা দিয়ে তৃষিতের আকাঙ্ক্ষা, জেগে ওঠা স্নিগ্ধতা দিয়ে গোপনীয় নিষিক্ততা, এমনকি হৃদয়ের কোনো গোপনীয় নিষ্ক্রমণও এ সময় গোপন থাকে না। একজন নারী যখন একান্ত শয্যায় তার ভালোবাসার জন খুঁজে পায়, একজন পুরুষ যদি তার ভালোবাসার জনকে সে রকম পায়, তখন নক্ষত্র শয্যায় কেউ কাউকে দেখতে না পেলেও তাদের অন্তরের চোখ সব বুঝতে পারে, কথা না বললেও কিছু যায় আসে না, সেই রাত পূর্ণিমার হোক অথবা অমাবস্যার। পুলকিত জ্যোৎস্না অথবা সর্বনাশা দুর্ঘটনায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ুক, একবার তারা পরস্পরকে কাছে পেয়েছে জানতে পারলেই শুধু হবে, ওদের গায়ের নক্ষত্র গন্ধে ওরা সব সমাধান খুঁজে পেয়ে যাবে, তখন বেঁচে থাকা ও মৃত্যু হবে সবই অপ্রতিহত সহনীয়। এমনকি তাতে মৃত্যুর পরও তাদের ইচ্ছের মিলন চলতে থাকবে।

ওর বলা চলতে চলতে শিকোবুর রাত্রিবাস আপনা থেকেই পরিপাটি হয়ে খুলে গেল এবং স্বর্গও এমন করে ঐশ্বর্যের দুয়ার ভবিষ্যতে কোনোদিন খুলতে পারবে না এভাবে আপনাআপনি, শুধু যদি দুটি ইচ্ছা আপনা থেকে এক হয়ে না যায় আকাশের শিল্পসম্মত সৃজন প্রক্রিয়ায়, ঐকান্তিক বিশ্বস্ততায়, ভূমিকম্পের কাঁপুনিতে এভাবে আক্রান্ত দুটি মানুষের ঐকমত্য যদি না হয়, বেঁচে থাকার বা মৃত্যুর; মৃত্যুও কখনো কখনো দুটি মানুষ একত্রে তৃষ্ণাতুরের মতো আকাঙ্ক্ষা করে, বাঁচার জন্যও লড়াই করে যায় শেষ সামর্থ্য ও সম্বল নিয়ে। মৃত্যুর পরও চলতে থাকে এ রকম জীবন্ত চলার প্রাণময় মৃত্যু ও জীবন।

আমি তখন টেনে নিলাম ওর বিশেষত্ব মাফিক সুস্নাত সুন্দর ছোট ওষ্ঠসম্পদ, ও সাহায্য করল আমাকে বিছিয়ে নিতে, যুদ্ধ করল নিজে উঠতে, আদরে আদরে ভূষিত করল সন্তানের মতো, মুক্তিযোদ্ধার মতো লড়াই করল সম্মুখ সমরে, সাগরে ঢেউ একটা ভেঙে পড়তেই দ্বিতীয় ঢেউয়ের জন্ম হয়ে যায় ভালোবাসার সংক্ষুব্ধতায়, সে রকম অচ্ছেদ্য আগ্রাসী হয়ে কেউ যেন জানান দিল, ব্যাপক গ্রাহী করে তুলল নিজেকে ও আমাকে, এর শেষ কোথায় সুনিশ্চিত জেনেও, নদীদেবতা অ্যালফিউস যেমন সমুদ্রের নিচে অন্তঃসলিলা নদীরূপী অ্যারিথিউসাকে খুঁজে বের করে মিলিত হয়েছিল, শিকোবু অভিনন্দনযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করল আমার অন্তর্মুখী মনকে বের করে স্বরূপে সুপ্রকাশিত হতে। ওর কানের ও পোশাকের চেরি ফুল ঝরে পড়ে ওড়াউড়ি শুরু করল ঘরজুড়ে, রঙিন দেখাল ওদের, ওর হৃদয়ে তখন হার্প বাদ্যযন্ত্রের টংকারের সুস্বর প্রবহমান হয়ে উঠল, লক্ষণীয় ভঙ্গিতে সে তখন নৃত্যশীল ছিল শয্যাসমুদ্রে জলপরীর মতো। আমার তখন সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়ে গেল একমাত্র সঙ্গীতই মানুষকে শূন্যে ভাসাতে পারবে, ওর হৃদয়ের হার্প বাদ্যযন্ত্র শোনার সময় শূন্যে ভাসমান ছিলাম– সেটা মিথ্যা নয় এবং এখন পর্যন্ত আমার কাছে তা দুর্দান্ত গোপন শিল্প হয়ে জীবন্ত ভাসছে। ওর সমুদ্র ভ্রমণের বর্ণনা অনুযায়ী মাথার উপর উত্তর থেকে দক্ষিণে ছায়াপথ লম্বা জামদানি শাড়ির মতো বিছিয়ে পড়ে ছিল, ওরা যেন আকাশপথে পবিত্র তীর্থযাত্রায় চলেছে পায়ে পায়ে, নিজেদের আলোয় অন্ধকার আকাশপথে পথ চিনে। শিকোবুর কোলে ক্রীড়ারত আমি ভাবলাম, এখন আমাকে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে ওর বিখ্যাত জাপানি মোটা পুরু চুলে হাত বুলোতে বুলোতে, কারণ ও তখন আমার কোলে হাতড়াচ্ছিল কিছু একটা অবলম্বনের খোঁজে, সহানুভূতিশীল ইন্দ্রিয়কেও কখনো কখনো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে জর্জরিত করতে হয় বলে যেমনটি কিছুক্ষণ আগে ও একবার বলেছিল। ওর আঙুলগুলো যেন বন্দি সুরমালাকে আমার থেকে মুক্তি দিতে ভেসে ভেসে ডুবে বেড়াচ্ছিল, ভুল সুরগুলো ঝাড়াই-বাছাই করে ফেলে দিয়ে আসল সুর খুঁজে নিতে চাইছে, পছন্দ করছে তালকে তালহীনতা থেকে, ছন্দকে ছন্দহীনতা থেকে, বেসুরো থেকে সুরগুলো একটি একটি করে বেছে নিতে, আর সেই অনুযায়ী সে লক্ষ্যভেদের অভিমুখে বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজেকে, নিয়ে যেতে চলেছে মানবিক বিস্ফোরণশীল অবস্থার মুখোমুখি এবং ওর ইচ্ছেমতো সেই

ভূমিকম্প ঘটাবার আয়োজন সম্পূর্ণ করছে জ্যোৎস্না সূক্ষ্ম পরিপাটিতে, শিকারি ও শিকারের পছন্দসই ক্রীড়া যেমন চলচ্চিত্রের মতো নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়, যেখানে শিকারির গুলিতে শিকার নিহত হয় না বরং পরিপূর্ণ স্বর্গীয় সুখের বিস্ফোরণ ঘটে। অদ্ভুত অপার্থিব কোনো অসূয়া ঘটনা ওর দেখার কোনো ইচ্ছে নেই, শুধু অনুভূতি দিয়ে মনের চোখে দেখা, আর আমার ইচ্ছেও দেখানোর নয়, ঘরের লোকোত্তর সুনিয়ন্ত্রিত আলোর আবছা স্বপ্ন যতটুকু যেখানে আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সম্পন্নতা নেওয়া, কিন্তু এত সহজ নয়, জগতে একমাত্র দু'জনই তা মর্মে মর্মে অনুভব করবে বলে যেন স্বর্গের দোহাই ও শরণাপন্ন। কারণ সবকিছুই মননসমৃদ্ধ দুঃখজাত। আর দুঃখই সুখকে একমাত্র হাতে ধরে টেনে আনতে পারে। আমিদা বুদ্ধেরও এই বাণী। দুঃখমুক্তি।

অবশেষে পরস্পরের দিকে তাকালাম। তখন চোখাচোখি, ওর চোখে তখন নীলের ঝিলিমিলি নীরবে খেলা করছে ভালোবাসাক্লান্তি মুছে ছুড়ে ফেলে, সুখতাড়নার ইচ্ছেয় ঢুকে পড়ে, ভালোবাসার পুনর্জাগরণের সুপবিত্র পুনঃসমর্পণে। এভাবে মনোময় বিহার শেষ হয়, কারণ এমন সময় সে শুনতে পেল রোহণের হাত-পা নাড়ার অশ্রুতপূর্ব তেমন এক মৃদু শব্দ। অমনি সে উঠে গেল গায়ের একান্ত বাসটিও না নিয়ে, আমি দলামোচা করে ছুড়ে দিলাম চেরিখচিত রাত্রিবাসটি ওর গায়ে। নিন্‌জা চিতাবাঘিনীর মতো ছুটে তা লুফে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দরজা ভেদ করে, পাশের কামরায়, তেমনি আগের শান্ত অবস্থায় ফিরে এসে রোহণকে সে বুকে তুলে নিল মায়ের উৎকণ্ঠায়, নগ্ন কোলের বুকে। কুলুকুলু করে ও বলে চলল কথা, শুধু রোহণকে নয়, সব কথা একই সঙ্গে যেন বোধগম্য করে আমাকেও বলছে, যাতে আমি শুনতে পাই, দেখতে পাই, ভালোবাসার বহুমূল্য পাই– পয়সাও যাতে মনের কৌটোর কোথাও পড়ে না থাকে, হারিয়ে যেতে না পারে। হারিয়ে না যায়। রাতের বেলায়ও দিবাস্বপ্ন এ রকম হয় কি-না, মনোবিজ্ঞানীরা তা জানেন খুব ভালো। আমার কল্পনাপ্রবণ মনটি পেয়েছি আমার পিতৃপুরুষ থেকে। শিকোবু-সান সেটা বুঝেছে নিশ্চয়ই।

বিছানায় পড়ে থাকা কিছুক্ষণ আগের সেই অসহায় রাত্রিবাসটি ওর হাত থেকে দেবতার অর্ঘ্যের মতো তুলে নিয়ে ওর লজ্জাকাতর শরীরের পেছনে দাঁড়িয়ে, কোট পরিয়ে দেওয়ার মতো এক হাতে, একটা দীপ্র হাত পরিয়ে দিলাম। সেই হাতে রোহণকে ধরতেই বাকি হাতটাও পরতে দিলাম। ওর পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতার সাদা চেরি রঙের পাপড়ির দেহলতা স্নিগ্ধতা পেল রাত্রিবাসের কোমলতায়, সৌন্দর্যের আকুলতায়। রাত্রিকালীন দিবাস্বপ্ন থেকে আমি জেগে উঠলাম। মানুষ এ রকম কত কি-না ভাবে!

এগার.

দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে মুরাসাকি আমার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আরকি। ওর এই হাসি ও সাবধানতা অদ্ভুত ব্যাপার একটা, দেখানেপনাও নয়, আবার ভরপুর অনাগ্রহও নয়, কোনো কিছু দেখানোর ইচ্ছা তার নেই, আবার যেন লুকোনোর কিছুও নেই, খুব সহজ সমৃদ্ধ আবার একই সঙ্গে কিছু একটা না লুকোনোও তার পক্ষে খুব কঠিন। চোখের মধ্যেও সেটা ফুটে ওঠে। রঙের বদল ঘটে যাওয়ার খেলার মতো। ওর মনের ভাবের বদলের সঙ্গে সঙ্গে চোখের রঙের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রথম দিন ওটা নজরে এলেও বুঝতে পারিনি; গভীরতার পরিমাপ করতে পারিনি। এখন বুঝতে পারি, ওর ইচ্ছে ওর চোখে এসে ভাসতে থাকে শরতের মেঘের মতো, বুলবুল ছানার নিজে নিজে গান শেখার মতো। সেটা যখন অনুভব করতে পারলাম তখন থেকে তার তারুণ্যের দীপ্তিও ধরতে শেখা শুরু হলো আমার। দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসার সময় ও-যেন সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় মার্জারের বিভঙ্গ তুলে হেঁটে আসছিল, মেঝের ওপর মাঝ-বাতাসে শূন্যে ভেসে আসার মতো, মৌমাছিদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে যাওয়ার সময় সঙ্গীতের স্কেলের গুঞ্জনের মতো, এক সুরে তান বিস্তারের মতো, নামজাদা সঙ্গীতজ্ঞের সুর নিয়ে খেলা করার মতো, সেতারের তারে স্বাধীনভাবে চলাফেরার মতো, যেন স্বর্গ নামক কল্পলোকের সুর বেছে নিচ্ছে, অথচ সেতারেও হয়তো এমন সবকিছু নেই, আঙুলের শূন্যে নড়াচড়া দিয়ে যেন তা ভরে তুলছে, যার আদি ও অন্ত নেই, দূরবর্তী নক্ষত্রলোক থেকে তা যেন টেনে নিয়ে আসছে, শিল্পীর তো শুধু দুটি হাত নয়, অনেক হাত আছে আদিগন্ত খুঁজে বের করার জন্য, অথবা তার নিজের ভেতর থেকেই যেন তা খুঁজে খুঁজে বের করে আনছে, অন্য লোকে বা শ্রোতারা যা জানে তার অতীত নতুন সুর যেন আবিষ্কার করে প্রথম পরিবেশন করছে, শ্রোতাদের উপযোগী করে তুলছে, শুনে দর্শকদের পোশাকের ভেতর থেকে বুক ফুলে উঠবে উপচেপড়া জোয়ারের ঢেউয়ের মতো, গভীর নিশ্বাস পর্যন্ত তারা ধরে রাখবে বুকের মধ্যে সাধ্যের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ব্যাকুল পরিমাণে, আর শ্রোতারা হতবাক হওয়ার মতো বাকরুদ্ধ হয়ে চুপ হয়ে গেছে মড়ার মতো, অথচ মরেওনি আবার বেঁচেও নেই। মুরাসাকি সেই অবস্থায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়, ঝাঁপিয়ে পড়ল কিন্তু তখন একটুও ঢেউ ওঠেনি পালঙ্কে, কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে আমার সারা শরীরের কোষে কোষে, যা সারারাত ধরে চলবে দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত, আনন্দের অশ্রুও যেমন সহজে থামে না কান্নার মতো, তার পরিমাপ করার কোনো গোপন ক্ষমতা যদি আমার এই মুহূর্তে আমি লাভ করতে পারতাম, দুরারোগ্য রোগ থেকে সেরে ওঠার মতোই মরে যেতাম, আর ঠিক তখন থেকেই ওর সঙ্গে অবিরাম কথা বলা থেকে উঁকি মেরে, ঘরের সব কাজকর্ম করতে থাকতাম, সবার সামনে! সে প্রমত্ত এক বিপুল কাণ্ড হয়ে যেত।

মুরাসাকি আবার আস্ত দ্বীপে ভেসে এসে, ঘুমন্ত বাবাকে জাগিয়ে তুলে, নাকি একটুও না জাগিয়ে নিজের প্রণয়জ্ঞাপক অভিযানে অংশ নেবে– না ভেবে দ্বীপ থেকে নেমে পড়ল চট্টগ্রামে।

আমি তখন কল্পনায় থেগায় চাকমা লোকসাহিত্যের চান্দবির কৃপায় সেখানকার চাকমা তরুণীদের সঙ্গে ব্যাক্কাস্ দেবতার সুরার প্রেমে মজবুত হচ্ছি। গ্রিক দেবরাজ জিউসের প্রণয়িনী সেমেলির সন্তান ব্যাক্কাস্ (বা ডায়োনিসাস্)। সেই সুরা দেবতার মাথার চুল কুঞ্চিত ও তার চারপাশে আঙুরলতা, হাতে একটি দণ্ড, তার মাথাও আঙুর ও সবুজ আইভিলতায় শোভিত। আমার তখন সে রকম একটি গল্প লেখার বাসনা সমুজ্জ্বল সুপ্ত হয়, কর্ণফুলী নদী যেখানে বাংলাদেশে প্রবেশ করে; তার তীরে একটি মাচায় বসে পানোন্মত্ত হওয়ার প্রাক্কালে। সেটি আমি দীর্ঘকাল লালন করেছিলাম জিউস যেমন সেমেলির গর্ভের তিন মাসের ভ্রূণ নিজের উরু চিরে ভরে রেখে রক্ষা করেছিল, দেবী হেরার রোষ থেকে রক্ষা করার জন্য, সেই সন্তান যথাসময়ে জন্ম নিয়ে নাম হলো ব্যাক্কাস্। সেই আনন্দ ও সুরার দেবতা ব্যাক্কাস্ এখনো আমাকে সঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে তার সৃষ্ট জগৎশ্রেষ্ঠ ফসল সুরা দিয়ে। সেই সুরাস্বরূপ কর্ণফুলীর মোহনায় তখন মুরাসাকি, আর তার উজানে থেগায় আমি, যা মুরাসাকি জানত না, আমিও না; না জেনেই সে বাবাকে ঘুমের মধ্যে দ্বীপে রেখে দিয়াং পাহাড়ের ধারে নেমে পড়ল। আশ্চর্য!

মুরাসাকি আবার শুরু করল তার স্বপ্নযাত্রা, 'মানুষের বাড়াবাড়ি রকম অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারে ক্রুদ্ধ হয়ে

জিউস, যে নিজেও অজস্র ব্যক্তিগত দেবসুলভ অন্যায় করে বেড়ায়, সে পৃথিবীকে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য মহাপ্লাবন সৃষ্টি করে, চেয়েছিল পৃথিবীর সকল মানব-মানবী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। জিউসের ইচ্ছেয় নয়টি দিনের একটানা বৃষ্টিতে নদী-সরোবর-সমুদ্র ছাপিয়ে ভয়াবহ বন্যায় ডুবে যায় সারা পৃথিবীর স্থলভাগ; মানুষ ও জীবজন্তু কেউই রেহাই পেল না, রইল শুধু মানবদরদি টাইটান প্রমিথিউসের পুত্র, যা সবাই জানেন। প্রমিথিউসের পুত্র ডিউক্যালিয়ন ও তার স্ত্রী পিরাও। প্রমিথিউসের সতর্কবাণী শুনে তার পুত্র বানিয়ে নিয়েছিল বিশাল নৌকো, তাতে ভরে নিয়েছিল প্রচুর খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ফলে নৌকোর আরোহীরা বেঁচে যায়। তখন কোন খেয়ালে দিয়াং পাহাড়ের অচেনা পাদদেশে নেমে, একা একা কোন দিকে যাব, পাহাড়ের ডান নাকি বাঁ দিকে ঠিক করতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তখন এক দাঁড়কাকের কা-কা ডাক শুনে সেদিকে এগিয়ে চললাম, যেমন তুমি এগিয়ে এসেছিলে আমার দিকে রূপশ্রী বাংলা হোটেল লবির দিকে, আমাকে গ্রহণ করতে, যে কথা বাবা বলে গিয়েছিলেন; মানুষের জীবনটাই বুঝি এ রকম সুখের সময়ে অপ্রতিরোধ্য সুস্থ ব্যাধি হয়ে এসে খানা গাড়ে। কী দুঃসহ দিনই না আমার গেছে, সেই বছরগুলোও তো ফেলে এসেছি, আবার পড়েছি তেমন দুর্বহ ঘটনার আকস্মিক আগ্রাসে। রুবাবা-সান কি আমার ওপর ওর এবং তোমার বাবুর দায়িত্ব দিয়ে গেছেন কিছু না বলে! না-বলা কথাও যে মানুষের জীবনের সঙ্গে এভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে যায়। মৃত্যু নেমে আসে প্রকাশ্য দিবালোকে চুরি করার মতো, রুবাবা-সানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কি আমাকে দেওয়া বাবার কথা সত্যে পরিণত হবে! তুমি লে.সি.মু.বি. কথার অর্থ বুঝতে পারোনি, আমি পারি। বাবা তোমাকে আমার সঙ্গে বলা কথাগুলো কখনো খুলে বলেননি আমি বুঝতে পারছি। বাবা অন্তর্মুখী হলেও আমাকে তোমার-আমার অনেক কথা বলে গেছেন, যদিও তখনো তুমি-আমি মুখোমুখি হইনি, হওয়ার সুযোগও সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু আমাকে সব কথা বলে সেই কথাগুলো গন্তব্যে পৌঁছার আগে বাবা এখন আলোয় ভরা অন্ধকার মৃত্যুর রাজ্যে, সেই অন্ধকার রাজ্যের ছায়াগুলো আমি এখন সরিয়ে দিতে পারি, সে কথাগুলো আনন্দের স্ফুলিঙ্গ হলেও কষ্টের মোড়কে বাঁধা। ওই শোনো, বাইরে পেঁচা ডাকছে, এজন্য যে রাতই ভালো সে সব কথা বলার উপযুক্ত সময় হিসাবে, একই চাদরের নিচে শুয়ে এবং পাশে রোহণকে রেখে, ঘুমন্ত সাক্ষী হিসেবে, এসো, সেই কথাগুলো বলি প্রাচীন ও অপরিবর্তনীয় রাতে, যে রাতে আমরা মিলিত হয়েছি, শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্বিগ্ন নজর ফেলে, সারা জীবনের মতা নিঃশর্ত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে, সঙ্গীতের পূর্ব পূর্ব বোধের মতো, ঘুমিয়ে পড়ে অন্য কোনো স্বপ্ন দেখার আগে, যাতে সেই স্বপ্ন ভালো হলেও আমার বলতে চাওয়া কথা বিচ্ছিন্ন করতে না পারে, খারাপ হলেও কুসংস্কারের দোহাই দিয়ে আমাদের মতৈক্য যেন অপরিবর্তনীয় থাকে। আর তুমি কি তোমার ও-ঘরের বিছানার শুভ্র চাদরে, সেখানে রক্তের দাগ লক্ষ্য করেছিলে, যার চিহ্ন আমি তোমার বুকে এঁকে দিয়েছিলাম স্বপ্নের কোনো এক মুহূর্তে, তোমার অজান্তে, তা ইচ্ছে করলে এখুনি তোমার বুকে দেখে নিতে পার, তেমন রক্ত আর কোনো দিন আমার শরীরের সেই অপরিহার্য অন্তরঙ্গ অংশ থেকে তিন ফোঁটা হয়ে ঝরবে না, বাবার কথায় আমি তাঁ রেখে দিয়েছিলাম প্রলোভনের ওষুধের মতো ভবিষ্যতে পাশে থাকার ইচ্ছের মতো, আজকের জন্য, রুবাবা-সান বেঁচে থাকলে যা তুমি হয়তো এত ঐশ্বর্যশালী হয়ে আমাকে দিতে পারতে না, সেমিসেন বা হার্প থেকে এমন মিষ্টি আর সূক্ষ্ম সুর অদৃশ্য থেকে এমন করে বেজে উঠত না, আমি তোমাকে একদিন অবশ্যই এই সুরের দৃশ্যমান রূপ জাপানের অরণ্যের গভীরে নিয়ে গিয়ে শোনাব, অরণ্যের হাওয়ায় ভেসে থাকা অবস্থায়, ডানাওয়ালা ও ডানাহীন পোকার স্পষ্ট ও কিংবদন্তির অস্পষ্ট গুঞ্জরণের সঙ্গে, এক সুর থেকে অন্য সুরে যাবার প্রতিটি দৃশ্যমান সূক্ষ্ম পরিবর্তন তুমি নিজেই বুঝতে পারার পরিবেশে, এমনকি তোমার কল্পনাগুলোই তোমার ইচ্ছের সুযোগ্য সঙ্গী হয়ে ভেসে যাবে গাছপালার সুবদ্ধ ফাঁকফোকর দিয়ে তা দেখতে পাবে, যার কোনো আদি-অন্ত নেই, আর সঙ্গীতের কি আসলেই আদি-অন্ত আছে বা থাকা উচিত!

মুরাসাকির হাত টেনে না নিতেই ইচ্ছের সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত আমার বুকে চলে এলো, যেন ওদিক থেকে শেমিসেনের সুর চলে এসে বুকের ভেতর ঢুকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলে যাচ্ছে রক্তপ্রবাহের মতো, তখন আমি সঙ্গীতের সেই সুর দিয়ে ওর এঁকে দেওয়া রক্তচিহ্ন দেখতে পেলাম, মুরাসাকির কপালে গতকাল থেকে পরা ছোট্ট টিপের মতো, আনন্দাশ্রুর বিশেষ ক্ষতের উপশমের মতো, শরতের ধুলোবালিহীন পরিচ্ছন্ন ও মেঘহীন আকাশের সন্ধ্যাতারার মতো, যা হীরক-দ্যুতিতে ঠিকরে পড়ছে, ঘুমন্ত রোহণকে একমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে, বড় হয়েই যা সে প্রত্যক্ষদর্শীর মতো বলে দিতে পারবে আত্মজীবনীতে লিখে যাওয়ার মতো অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে। এমন একটি সময়েই পেঁচা ডেকে উঠল উক উক শব্দ করে, ওটা বোধ করি ওর সঙ্গিনীকে জানিয়ে দিচ্ছে সে কোথায় বসে আছে, প্রতি রাতের মতো আর আজকের মতো যা কখনো এত অভ্রান্ত মনোযোগ দিয়ে শোনার দু'দণ্ড নিরি-বিলি অবসর হয়নি। ওর হাত তখন হাত ছিল না, যেন গভীর বঙ্গোপসাগরে একমাত্র জেলে বৈঠার নীরব শব্দ তুলে নৌকো বেয়ে চলেছে, পেছনে ধেয়ে আসছে মৃত ভয়ঙ্কর পাইলিন ঘূর্ণিঝড়, অভ্রান্তভাবে যা রুবাবাকে নিয়ে যাওয়ার মতো, যে জন্য আমার জীবন্ত ভয় হচ্ছে, তা যদি কোনোভাবে অসময়ে ভবিষ্যতে এই হাতের মালিক মুরাসাকিকে লেহন করতে আসে, তাই ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখি ওর চোখের পাতার পাপড়ি ও ভ্রু প্রজাপতির পাখার মতো ছন্দবদ্ধ হয়ে কাঁপছে, একটু হাওয়াতেও যেমন কাঁপে, তেমনি ওর হাত ছেড়ে চোখের দিকে না তাকালে এ দৃশ্য অন্ধকারেও দেখতে পেতাম না। দেখতে না পেলে কী অবস্থা হতো আমার– এরকম আরো অনেক বার হয়েছিল ওর চোখের মণি ও শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে, যেমন এ মুহূর্তে মনে পড়ছে ওর ঠোঁটের বহু রকম ভঙ্গি, টোলের চারপাশ বা নাভির কম্পন ছাড়াও হাঁটার ভঙ্গি, যা আগে একবার বলেছিলাম। আর হঠাৎ ভাবনা বা ভেতর থেকে হঠাৎ মুক্তির পাওয়া ইচ্ছে যদি ওর মুখের কথা কেড়ে নিতে পারে সেই মুহূর্তের কথা মনে পড়ে যায়। তাই বলে রুবাবাকে আমি ভুলে যাচ্ছি না, অবহেলাও না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিজস্ব সৌন্দর্যের কিছু প্রকাশযোগ্য অথচ অপ্রকাশিত গোপন সৌন্দর্য থাকে অথবা বলা যেতে পারে সৃষ্টি করতে পারার ক্ষমতা থাকে। যেমন কোথাও হাওয়া না থাকলেও রুবাবার এক গোছা চুল হঠাৎ করে নড়াচড়া করে বসত। সে কথা রুবাবাকে বলতে গেলে সে নিজে আমাকে পাগল বলে হাসে। কয়েক বার উড়িয়ে দিয়েছিল, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যাচ্ছে এখন।

এ কথা আবার মুরাসাকিকে বলাতে সেও আমাকে অস্ফুটে পাগল উপাধিতে ভূষিত করেছিল সম্মানজনক কোনো পুরস্কার অর্জনের মতো ভ্রূকুটি করে। সেই কথার মধ্যে ফেলে যাওয়া কোনো গৌরবজনক হতাশা বা অবহেলার ভাব ছিল না, যদিও পাগল বলেছিল তখন আমাকে। তারপর মুরাসাকি বলল, 'রুবাবা-সান মরে গেলেও তার আত্মা বা ইচ্ছে আমাদের ছেড়ে কোথাও যায়নি, যেমন অন্যদের বেলায় হয়ে থাকে। আমি সব সময় ওকে অনুভব করি। মৃত্যু নয়, তার অনুপস্থিতি অনুভব করি। আসলেও ও অনুপস্থিত মাত্র।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি সুখের কথা নিজের কাছে রেখে মুরাসাকিকে বলে দিলাম, 'তাহলে বাবা কি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাই বলতে চেয়েছিলেন?' মুরাসাকিও অমনি বলে দিল, 'এই পৃথিবীতে সুখের ঘটনা ও কথা খুবই কম, তার চেয়ে আরো কম নিজের সুখের কথা, কাজেই সেই সুখ কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়, অথবা যেন হারিয়ে না যায় সেই চেষ্টা করে যাওয়াই বেশি জরুরি। মানুষ চলতে চলতে ভালো কিছু পথে-পথে বা ঘরের এখানে-ওখানে ফেলে রাখে, এমনকি নিজের অজান্তে পাখির গাওয়া গানের সুরের সঙ্গেও, গাছের তলার উষ্ণ ছায়ায়ও, এমনকি দূর আকাশের নক্ষত্রের ছাইচাপা আগুনের সঙ্গেও। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে করতে মরবে জেনেও একজন সৈনিক আর ব্যক্তিগত কিছু অমূল্য সুখস্মৃতি ঘরে রেখে যায়, মুক্তিযোদ্ধাদের বেলায় সেটা আরো বেশি– একথা তোমার মতো অনেকেই মানে।'

মুরাসাকি আবার তার স্বপ্নের কথা শুরু করল, 'বাবা আমাকে বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে আস্ত দ্বীপসহ তোমার কাছে নিয়ে আসছিলেন, তা তুমি বুঝতে পারোনি বলেই কি সেই ঘটনা শেষ পর্যন্ত শুনতে আগ্রহ দেখাওনি একবারও! তারপরও আমি জানি তোমার হাত দুটি তোমার সুখের কথা নিয়ে আমার শরীরে সাদা হয়ে ঘুরে বেড়ায় আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে সংখ্যাতীত তারারা নদী নিয়ে যেমন! আকাশের ভবঘুরে তারাগুলোর আড়ালে কী গোপন কথা লুকিয়ে আছে জানতে চায় মানুষ, খালি চোখে দেখলে মনে হয় ওরা প্রায় অভিব্যক্তিহীন, জেগে থাকা অবস্থায় মানুষের চোখ সবকিছু চারদিকে দেখতে পেলেও আমাদের অজান্তে দু'চোখের পাতা মিটমিট করে খোলা ও বন্ধ হওয়ার কাজ চালিয়ে যায়, কারও বেশি কারও কম, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ওরা ইচ্ছের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে যায়; আড়াল কি গোপন কিছুরই ধার ধারে না, ঘুমের সময় ছাড়া, অথবা ইচ্ছে করে চোখ বুজে থাকার সময়। সেই চলন্ত দ্বীপ যখন এসে কূলে ভিড়েছিল, আমি যখন ওখানে নেমে পথের দিশা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, দেয়াং পাহাড়ের প্রত্নপুরাণ আবাসে, তখন বাবা একসময় এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, ওকে খুঁজতে এসেছ দ্বীপ নিয়ে ভেসে এসে? অনেক বছর আগে আমি এসেছিলাম এখানে, এদিক দিয়ে যাওয়ার কথা আমার মনে আছে, আমিও একা এসেছিলাম, তখন আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমার ছেলে চলে এসেছিল, ঠিক এখানে এদিকে যাবার সময় তোমার মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম দেখতে দেখতে, আমিও এখানকার প্রত্নপুরাণ স্থানে দাঁড়িয়ে পুরনো কালের কোনো মানুষকে দেখতে পাইনি। ছেলে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ, আমি হাঁটতে থাকলে সেও হেঁটে চলেছিল পাশে পাশে, দাঁড়ালে সেও দাঁড়িয়ে পড়েছিল, বইপত্রে পড়ে দেয়াং পাহাড় সম্পর্কে আবছা যা জেনেছি তার কিছু কিছু মিল খুঁজেও পাচ্ছিলাম, কিন্তু আজও উৎখনন হয়নি বলে কিছুই জানার মতো হাতড়ে পাচ্ছিলাম না আমরা, একসময় ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলাম, আমার তখনকার অবস্থা দেখে ছেলেও বসে পড়েছিল, তার কাঁধের থলে থেকে পানির বোতল ও আপেল বের করে আমার সামনে রেখে বলেছিল, 'বাবা, আমাকে চিনতে পারছ না তুমি? আমি তোমার ছেলে।' তারপর বিস্কুটের মোড়ক খুলে ছেলে বলেছিল, 'আগে কোনটা খাবে? আপেল, নাকি অন্য কিছু...?'

'সেই তুমি রোহণ, আমার স্বপ্নে দেখা তরুণ, আশ্চর্য সুন্দর, তোমার সবকিছুই তোমার বাবার মতো; ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, শুধু বাবার মতো ফর্সা নও, শ্যামল তুমি , আকর্ষণীয় ও চুম্বনযোগ্য শ্রদ্ধার, বলা কঠিন নয় বাবার সামনে তা তুমি করতে না। আর প্রথম দেখায় রূপসী বাংলা হোটেল লবিতে আমার পাশে এসে যখন কথা বলছিলে, বেশ লাজুক ও সমীহভরে কথা বলছিলে। আমাদের দেশে মা-বাবার সামনে মেয়েরা অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় নতমুখে থাকবে, সমবয়সী ছেলের সঙ্গেও তখন সমীহভরে কথা বলবে। আমারও সেই অবস্থা, বাবা গুরুজন, সামনে দাঁড়ানো ছেলের সঙ্গে কথা বলতে হয় নম্র হয়ে। আমার বুকে তখন জাপানের উৎসবের ঢোল বাজছে। সেই প্রথম দেখা, কিন্তু কী কথা হয়েছিল সে কথা বলা খুব কঠিন। কারণ তার পরপরই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল আর যেহেতু স্বপ্নভঙ্গের কথায় এসে গেছি তখন অন্যরা হয়তো জেগে আছে অথবা আমোদ-আহ্লাদ করছে আর আমি খুঁজছি আমাকে, আমার ঘরের কোথাও কিছু অঘটন ঘটে গেছে কি-না, বিশেষ করে স্বপ্নের স্মৃতিকাতরতায় যখন আমি আক্রান্ত হয়ে পড়েছি, যেখানে স্বপ্নের এক যুবরাজ বাবার সামনে মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে আমি তার প্রশ্নের উত্তরে কোন ক্লাসে পড়ি, কলেজ নাকি বিশ্ববিদ্যালয়, কোন বর্ষে, অথচ ভেতরে ভেতরে কত অর্থহীন কথা খেলে বেড়াচ্ছে, ধরনা দিচ্ছে, বাবা সামনে না থাকলে সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য ঠোঁট ওল্টানোর মতো আরো কত কিছুই না আছে। একজন তরুণ-তরুণী নির্জনে কথা বলার সুযোগ পেলে জগতের অজন্তা গুহা বা মিসরের মমি তুচ্ছ, আর দু'জনে মিলে একা যেতে পারলে তা স্বর্গ বলতে বাধা দেব না। দেয়াং পাহাড় তখন স্বর্গের সেরা স্বর্গ। আর এখন তুমি সংসারে অভিজ্ঞ, আমি তোমার ও আমার মা-বাবাহীন হয়ে অভিজ্ঞ। তারপরও তোমাকেই বলতে হবে ঘর পাতার কথা! আমার মন কী চায় মুখ ফুটে বলার দরকার পড়ে কি! সব কথা বলে দিলে স্বর্গও মাটির পৃথিবীর মাটিতে গড়িয়ে পড়ে চুপ হয়ে কাঁদবে। নিস্তব্ধ রাতে নিঃশব্দে কান্নার মতো। প্রথম মৌসুমী বৃষ্টিতে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যেমন ধ্রুপদ গানের তানে অঝোরে ভিজতে থাকে। আমি তার পাশ দিয়ে আস্ত একটি দ্বীপ নিয়ে আসার সময় রাজতন্ত্রের কথা মনে পড়ে যায়। জাপান গণতান্ত্রিক দেশ হলেও রাজা আছেন একজন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আছেন রাজা জিরাকে। তার প্রজাসংখ্যা নিজেসহ চার-পাঁচ বা সাতজনের মতো। রাজা নিজের হাতে মাছ ধরেন। গাছের ওপর ঘর বেঁধে বাস করেন পরিবার ও প্রজাদের নিয়ে। রাজার একটি মাত্র কন্যা আছে আর রানী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই দ্বীপ জাপান দখল করে নিয়েছিল...।

বারো.

লক্ষ্মীপেঁচা ডেকে উঠল জোর গলায়। ওদিক থেকে তার সঙ্গিনী ডেকে উঠল একটুও দেরি না করে সুরেলা গলায়। নেই হাওয়ায় ভেসে সেই ডাক চলে এলো ঘরে। আলোয় ডুবে গেল ঘরের দশ দিক, পর্দার প্রান্তের কিংখাব ঝলমল করে বেজে উঠল সুরস হাসিতে। রোহনকে তুলে নিয়ে এলো মুরাসাকি শিকোবু অদম্য আবেগ-বিহ্বলতায়। আবার ডেকে উঠল লক্ষ্মীপেঁচা যুগল। এবার উঠোনে কোথাও নয়, ঘরের বারান্দায়, সেখান থেকে পর্দা ঠেলে পারিবারিক বেদির ওপর, যেখানে মা-বাবা ও রুবাবার দেহভস্ম রাখা আছে সযত্নে আর পারিবারিক ছবি। সেদিকে তাকিয়ে বিশ্বস্ত স্বপ্নের ঘোরে মুরাসাকি-সান বলে চলল, রুবাবা-সানের মতো আমি মরতে চাই না রোহণকে রেখে...।... আর যদি সেই ভাগ্যঘাতী সুনামি-তাইফুন-মৃত্যুও নেমে আসে... আর চিতার দু'মুঠো ছাই বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দিও রোহণ-চানকে সঙ্গে নিয়ে, বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগর ও জাপান সাগর তোমার-আমার মতো অচ্ছেদ্য মায়াবন্ধনে সংযুক্ত জেনো আদ্যিকাল ... অনন্তকাল।

'ও মুরাসাকি, ও শিকোবু, ও আমার পিতৃ-সত্য, দুটি লক্ষ্মীপেঁচা ঘরে চলে এসেছে... আমার খুব ভয় ওদের...।'

মুরাসাকি বলল, 'আমি মরে যাব না তো?' ❖

অলঙ্করণ : : সৈয়দ ইকবাল

রফিকুর রশীদ

না গৃহ, না সন্ন্যাস



গল্প

নয়নতারা ঘুমিয়ে কাদা। ঘরের ভেতরে আধো আলো-আঁধারি। বাইরে ফিক ফোটা ধবল জোছনা। সেই জোছনার একটা সরু ফালি কঞ্চির বেড়ার ফাঁক গলিয়ে এসে পড়েছে নয়নতারার মুখের উপরে। মাত্র ওইটুকু আলো এসে তার মুখে অপার্থিব সৌন্দর্যের সব ক'টা ঘুমন্ত বাতি যেনবা একযোগে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঝোড়ো বাতাস নেই. ফলে আলোকপ্রভা একেবারে নিষ্কম্প স্থির।

মন্টু ফকির নয়নতারার মুখের উপর থেকে সরিয়ে আনে দৃষ্টি তারপর সে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় নিরাবৃত শরীরের বাঁকে বাঁকে। দূরে নদীপারের গ্রামের ছবি যেমন অস্পষ্ট মনে হয়, এই আলো-আঁধারিতে নয়নতারার দেহনদীকে ঠিক সেই রকম কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হয় না। নিকষ কালো অন্ধকারেই সে চিনেছে এই বাঁকা নদী, তার জোয়ারভাটা; চিনেছে সে নদীতে ভাসমান কুমির এবং ত্রিবেণী ঘাট। অমাবস্যা চন্দ্রসাধন প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্বের ভেতর দিয়েই মন্টু ফকির এতদূর এসেছে, তার আবার ভয় কিসের? কিসের বা উদ্বেগ? তবু তার ঘুম আসে না চোখে, এক পলকা ভাবনা হয় এই নয়নতারাকে নিয়ে– আগামীকাল তারা নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সাঁইজির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে তো!

আগামীকাল, এই আকালি সাঁইজির ধামে যাবারই তো প্রস্তুতি চলছে সেই কবে থেকে। মেহেরপুর থেকে সোজা পশ্চিমে মাইল তিন-চারেক গেলে শুভরাজপুর, তারপর ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁষে সাধুর আশ্রম। এক সময় ছিল নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ, এখন আর সেই নির্জনতা নেই। দূরদূরান্তের শিষ্য-সামন্তের নিত্য আনাগোনা লেগেই আছে, এমনকি কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁকফোকর গলিয়ে ওপার থেকেও অনেক সাধু-সাগরেদ চলে আসে। একদা এই আকালি সাঁইজির হাতে মন্টু ফকিরের বাপ মন্তাজ ফকিরেরও চালপানি হয়। চালপানি হওয়া মানে দীক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক স্তর। প্রতিদিন পাঁচটি চাল খেতে হয় পানির সঙ্গে, সকাল-সন্ধ্যা। প্রথমে পঞ্চআত্মার শান্তি কামনা করে পাকপাঞ্জাতনের প্রতীক হিসেবে পাঁচটি চাল শিষ্যের হাতে তুলে দেন গুরু। এটাকে গুরুর প্রথম স্বীকৃতির স্বাক্ষর বলে গ্রহণ করে শিষ্য। মন্তাজ ফকির সেই স্বীকৃতি লাভের পর যেনবা আকাশের চাঁদ হাতে পায়। অন্ধকার রাতে মেঠোপথে বাড়ি ফেরে, বুকের মধ্যে ভয়-তরাসের লেশমাত্র খুঁজে পায় না। বরং আকাশভরা তারার মাঝে ডিগবাজি খেতে ইচ্ছে করে। একতারার তারে টুংটাং ধ্বনি তুলে গান ধরে– ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার...। কিন্তু মন্তাজ ফকিরের এই দীক্ষা গ্রহণকে গ্রামের শরীয়তপন্থি মোল্লারা মোটেই ভালোভাবে মেনে নেয়নি। বিচার-সালিশ বসিয়ে চুল-দাড়ি কেটে দেয় জবরদস্তি করে; তওবা করার জন্য চাপ দেয়, নতুবা একঘরে করার হুমকি দেয়।

এসব সেই কবেকার কথা! আজকের এই মন্টু ফকির তখন তের-চৌদ্দ বছরের কিশোর বৈ তো নয়! এতদিন পর রাতের দুই প্রহর গড়িয়ে যাবার পর বাবার মুখ কেন মনে পড়ছে! সকালের আলো ফুটলেই সূচনা হবে শুভ দিনের। সাঁইজি নিজে থেকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন– বিষ্যুদবার তারা দু'জনে আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলে তবে হবে বাল্যসেবা। মানে সকালের নাশতা, চিড়ে-দই-কলার ফলার। দুপুরবেলা পূর্ণ সেবার আগেই হবে তাদের খিলকা প্রদান। এসবই পূর্বনির্ধারিত। নয়নতারার সঙ্গে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। দু'জনের গুরুদীক্ষা হয়েছে অনেক আগেই, এবার আসছে ভেক বা খিলকা ধারণের অধ্যায়। চূড়ান্ত পর্ব। ধবধবে কাফন-সাদা কাপড়ে মোড়া অন্য এক জীবন। এ জীবনে প্রবেশের দুয়ার হচ্ছেন গুরু। এই দুয়ারে কড়া নাড়ার অধিকার দিনে দিনে নানান পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। তারপর গুরু সদয় হলেই মুক্তি।

এই আকালি সাঁইজিও তো তাদের বাজিয়ে দেখতে কম করেননি! এত চেনাজানা, এত যে মন্তাজ ফকিরের জন্য বুকের মধ্যে হাহাকার, সেই মন্তাজের ছেলে মন্টু যেদিন নয়নতারাকে সঙ্গে নিয়ে তার শরণ নেয়, হাতজোড় করে আশ্রয় প্রার্থনা করে, সেদিন কি তিনি সহজে ছেড়ে দিয়েছেন! কত রকম তার প্রশ্নবাণ, একটার পর একটা ছুড়ে মারেন! বিশেষত নয়নতারার দিকে তাকিয়ে জানতে চান,

এ পাখি তুই কোথায় পেয়েছিস বাপ! পোষ মানিয়েছিস?

শুধু হাতজোড় নয়, মন্টু তখন চোখ ইশারায় নয়নতারাকে ইঙ্গিত দেয় এবং নিজেও আভূমি নত হয়ে সাঁইজির দুই পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ চায়। তারপর নয়নতারার পরিচয় দিতে গিয়ে জানায়, বর্ডারের ওপারে তেহট্ট থানার নন্দীগ্রামের রতন স্যাকরার মেয়ে হলেও সে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তার হাত ধরে পথে নেমেছে। মন্টু আরও নিশ্চিত করে, শান্তিপুরের খুব কাছেই এক শ্রীপাট আশ্রমে গিয়ে তারা উভয়েই গুরুদীক্ষা নিয়েছে। আকালি সাঁইজি চোখ বড় বড় করে দু'জনেরই মুখেমুখে তাকান, তারপর মন্টুর কাঁধে হাত রেখে শুধান,

তা আমার কাছে কেন এসেছিস?

মন্টু বিনয়ের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়,

আমার বাবাও তো এসেছিল আপনার কাছে।

হ্যাঁ, মুন্তাজকে আমি দীক্ষা দিয়েছি। সে কাপুরুষ। নিজেকে চিনতে পারেনি।

আপনাকে চেনা সহজ নয়– সে আমি জানি। কিন্তু কাপুরুষ বলছেন কেন?

ঘন গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে একটুখানি হেসেও ওঠেন সাঁইজি,

নিজেকে নিয়ে এ রকম ইয়ার্কি মারার কোনো মানে হয়! নিজের মাঠ নিজের ফসল ফেলে এভাবে কেউ পালিয়ে যায়!

মন্টু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে,

আপনি কি আত্মহত্যার কথা বলছেন?

তবে আর কী বলছি! নিজেকে চেনাই হলো না যার, সে কেন হত্যা করবে নিজেকে? কোন অধিকারে?

মন্টু হঠাৎ যেন বোমা ফাটায়,

আমার বাবা আত্মহত্যা করেনি। তাকে হত্যা করেছে গাঁয়ের লোক।

বলিস কী বাপ!

আমরা নতুন করে আবার দীক্ষা নেব আপনার কাছে।

কেনরে বাপ! এ লাইনে আসবি কেন?

দু'জনেই মাথা নিচু করে থাকে। কথা বলে না। আকালি সাঁইজি প্রশ্ন করেন,

বাপের হত্যার বদলা নিবি নাকি?

মন্টুর সারা শরীর শিউরে ওঠে। আকালি সাঁইজির চোখে চোখ রেখে বলে,

বদলা আমি নিতে চাই, তবে কাউকে হত্যা করে নয়। খুনখারাবির বদলা নয়।

তাহলে?

আমার বাবা যে কাজ শেষ করতে পারেনি, আমরা সেটা করতে চাই সাঁইজি।

সেটাই হবে বদলা নেয়া। আপনি ফেরাবেন না।

সাঁইজি খুশি হন। দু'জনের মাথায় দুই হাত রেখে বলেন,

বলিস কী বেটা! পারবি তোরা এ পথে দাঁড়াতে? এ বড় পিছল পথ।

নয়নতারা এতক্ষণে মুখ খোলে,

আমরা তা জেনেশুনেই এসেছি বাবা। এখান থেকে আমরা ফিরে যাব না।

আকালি সাঁইজি যেন চমকে ওঠেন,

দাঁড়া দাঁড়া, নন্দীগ্রামের কার মেয়ে তুই?

আপনি চেনেন নন্দীগ্রাম?

ওরে বাবা, আমি তো পাইকপাড়ার ছেলে। পাশাপাশি

গ্রাম। শৈশবজোড়া কত স্মৃতি আছে, কত বন্ধুবান্ধব...

এবার মন্টু যোগ করে,

নন্দীগ্রামের রতন স্যাঁকরার ছোট মেয়ে নয়নতারা।

স্যাঁকরাকে দিয়ে কি গুরুগিরি হয়! একবেলা সে যায় কর্তভজা সম্প্রদায়ের কাছে তো আরেকবেলা সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কাছে। দুই নৌকায় পা দিলে তার এই দশাই তো হয়। নয়নতারাকে জিজ্ঞেস করেন,

কয় ভাইবোন তোমরা? শেকড়-বাকড় কদ্দুর নামিয়েছে তোমার বাবা?



মাথা নিচু করে নয়নতারা জানায়,

পাঁচ বোন, এক ভাই।

ওরেব্বাবা! এ যে লতায় লতায় লতিয়ে একাকার! শেকড়-বাকড় হলো শিষ্যভক্ত।

লতা-পাতা শেকড়-বাকড়– এসব কী যে...

বাক্য শেষ হয় না নয়নতারার। হাঁ হাঁ করে হেসে ওঠেন আকালি সাঁইজি। হাসি থামলে আবার তত্ত্বকথা বলেন,

'আগে শান্তিপুরে চলরে মন তবে গুপ্তিপাড়ায় যাবি।'

এ হচ্ছে তত্ত্বগানের বাণী। এ গানের মর্ম হচ্ছে– দেহমনকে শান্ত করলে তবে গুপ্তিপাড়া অর্থাৎ গুপ্ততত্ত্ব জানা যাবে। লতার কথা শেকড়ের কথা জানা যাবে। কিন্তু রতন স্যাঁকরা তো বাঁধা পড়ে রইল বোধিতনে। এয়োতন থেকে কোথায় নিত্যনের সাধনা করবে, তা নয়; বোধিতনের ফাঁদে আটকে গেল।

এয়োতন-নিত্যন-বোধিতন– এসব গূঢ়ার্থ শব্দের অর্থ অনেক পরে জেনেছে মন্টু এবং নয়নতারা। এই মেহেরপুরের মালোপাড়ার বলরাম হাড়ি লৌকিক যে ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন, তার মর্মমূলে বৈরাগ্য নয়, আছে গৃহীর সাধনা। এ সাধনার গোড়াতে আছে এয়োতন। বলা হাড়ির 'মনের মানুষ' যারা, তারা জন্মদ্বারে যাবে শুধু সৃষ্টির জন্যে। অকারণ বীর্যক্ষয়কে তারা নরহত্যার তুল্য পাপ বলে মনে করে। নারীর ঋতুস্রাবের সাড়ে তিনদিন পরে অর্থাৎ চতুর্থ দিনে সুসন্তান কামনা করে স্ত্রী সহবাসে যাওয়া এয়োতনের বৈশিষ্ট্য। সংসারে অনাসক্তি আর জন্মদ্বারে বিতৃষ্ণা তৈরির মাধ্যমে এয়োতনের পরের স্তর নিত্যনের সাধনা করতে হয়। কিন্তু বাস্তবে হয় উল্টো। প্রতিদিন অকারণ বীর্যক্ষয়ের মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষ বোধিতনের ফাঁদে আটকা পড়ে। আত্মসর্বস্ব ভোগী এই মানুষকে দিয়ে বড় সাধনা হবে কী করে!

এসব তত্ত্বকথার সাধারণ ব্যাখ্যা এবং দেহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনেক পরে জেনেছে মন্টু শাহ এবং নয়নতারা। সেই ব্যাখ্যা ভক্তিভরে তারা গ্রহণও করেছে পরে। কিন্তু সেই প্রথম দিনেই আকালি সাঁইজি দীক্ষাদানের শর্ত হিসেবে কঠিন এক পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। গুরুগৃহে তাদের এক মাস কাটাতে হবে। শোবার সময় কিছুতেই মুখোমুখি নয়, পিঠের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে থাকতে হবে। মুখ ফেরালেই পতন, দুধ নষ্ট এক ফোঁটা গো-চোনায়।

কঠিন সে পরীক্ষায় মন্টু এবং নয়নতারা উৎরে যাবার পর নতুন করে তাদের চালপানি হয়েছে, দীক্ষা পেয়েছে। আকালি সাঁইজির কাছে বিস্তারিত জেনেছে– শরীরকে তারা উপেক্ষা করে না, শাসন করে, পোষ মানায় এবং শরীরের কাছে যা পাবার তা ষোলো আনা বুঝে নেয়। অযথা শুক্রক্ষয় আর সন্তানজন্ম মানে বাউলধর্মে আপ্তমরণ, অন্য কথায় নিজেকে মারা। তবে হ্যাঁ, এ লাইনে পতনও আছে। তারা বারংবার ঘুরেফিরে জন্মদ্বারে যায়। সেই এক মাসের স্মৃতি মনে হলে মন্টুর অন্তরে তড়পায় এক প্রশ্ন– হাতের মুঠোয় অগ্নিপিণ্ড ধরে রাখা কি তার চেয়েও কঠিন? তরঙ্গ-সংকুল বাঁকানদী যতই হাতছানি দিক, কুমিরের লেজ সাপটানোর মধ্যে হাত-পা ছুড়ে সাঁতরানো কি সোজা কথা! হায় বাঁকানদী, মীনরূপে সাঁই বিরাজ করে কোথায়! জল শুকালে আবার সেই মীন নাকি হাওয়ায় ভাসে, এ কী ভীষণ গোলকধাঁধা!

এই গোলকধাঁধার গেরো খুলতে হলে গুরুপদে নিজেকে নিঃশর্ত নিবেদন করা চাই। একদিন সাঁইজি কাচের দুটো টুকরো এনে সামনে ধরেন। প্রথমে স্বচ্ছ কাচের পাত সামনে ধরে জিজ্ঞেস করেন,

কী দেখছিস?

মন্টু এবং নয়নতারা দু'জনেই বলে ওঠে,

আপনাকে দেখছি। কাচের ওপারে তো আপনিই আছেন।

সাঁইজি এবার এক পৃষ্ঠায় পারা লাগানো আয়নার টুকরো সামনে ধরে বলেন,

কী দেখছিস এবার?

খুব সোজা উত্তর– নিজেকে দেখছি।

এক গাল হেসে তিনি জানতে চান,

কেন, আমাকে দেখা যাচ্ছে না?

নাহ!

আমি কি তাহলে নেই?

জিভ কাটে মন্টু, হাত কচলে বলে,

আপনি আছেন কাচের গায়ে লাগানো পারার ওপারে।

আহা, আছি তাহলে! আমি আছি পারার সাথে মিশে। পারা না থাকলে সব ফাঁকা ফকফকা। পারা আছে বলে, মানে তোদের গুরু আছে বলেই তোরা নিজেদের দেখতে পাচ্ছিস, ঠিক তো? এই যে গুরুর মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখা, এটাই কিন্তু সারকথা।

গুরুভক্তির নানাবিধ কন্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে শিষ্যকে পৌছতে হয় চূড়ান্ত গন্তব্যে। সেই পর্বতচূড়ায় আরোহণ যেমন কঠিন, অবতরণও তেমনই কঠিন; পতনের কথা আলাদা। পতন আর অবতরণ কিছুতেই এক নয়। পতনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হবার পর গুরু খিলকা প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যে কোনো শিষ্যের জন্যে সেই ঘোষণা হচ্ছে পরম পুরস্কার। এক জীবনের অন্ধকারে প্রবেশ করে আরেক জীবনের পরিশুদ্ধ আলো। এই আলোকপ্রাপ্তির জন্যেই তো শিষের যতো সাধনভজন! মন্টু শাহ এবং নয়নতারার জীবনে বহু প্রতীক্ষিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যতোই এগিয়ে আসে, দু'জনে ততোই রোমাঞ্চিত, হয়, পুলকিত হয়; আগের রাতে সন্ধ্যাবাতি জ্বালানো হয়ে গেলে হাতে একতারা নিয়ে মন্টু শাহ গান ধরে– বাড়ির কাছে আরশিনগর...। মুখে আহ্বান জানানোই লাগে না, নয়নতারা দুই হাতে প্রেমজুড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে। কান খাড়া করে একতারার তাল ধরতে চেষ্টা করে, তারপর সোমের ফাঁক ধরে টুংটাং করে ঠিকই ঢুকে পড়ে গানের মধ্যে। দু'হাতের আঙুলে বাঁধা খঞ্জনিকে স্থানীয়ভাবে প্রেমজুড়ি বলে। কী যে মিষ্টি ধ্বনি তার! সঠিক মাত্রায় গানের সঙ্গে মিশে গেলে কানে তখন সুধা বর্ষিত হয়।

মন্টু শাহর ভরাট কণ্ঠে আরশিনগরের পড়শির বিবরণ সুরের মূর্ছনায় ভেসে বেড়ায়– 'কী বলব সে পড়শির কথা, ও তার হস্তপদ স্কন্ধ মাথা নাইরে...।' ভাবনার কথাই বটে, আরশিনগরের এই পড়শি তাহলে কোথায় থাকে, কীভাবে থাকে! সেই জবাবও আছে লালনের গানে–'ক্ষণেক ভাসে শূন্যের উপর ক্ষণেক ভাসে নীরে।' সাইকেলে হঠাৎ ব্রেক কষার মতো মন্টু শাহ দুম করে বন্ধ করে দেয় গান। সহসা নয়নতারার দু'হাত জড়িয়ে ধরে প্রেমজুড়ির বাজনা থামিয়ে দেয়। কী যে পাগলামিতে পেয়ে বসে, দু'হাতে নয়নতারার মুখমণ্ডল তুলে ধরে সে প্রশ্ন করে,

তুমি আরশিনগর চেনো?

নয়নতারার শরীর থেকে কী এক সৌরভ ভেসে আসে! সন্ধ্যাবেলায় কোনো সস্তা পাউডার মেখেছে কি-না কে জানে! তার শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে আসে। কোনোমতে সে উচ্চারণ করে,

তুমি চেনালেই চিনি।

তুমি তো নয়নতারা, তুমিই ভালো বুঝবে। দুই চোখের ভুরুর মাঝখানে যে সূক্ষ্ম জায়গা, সেটাই হচ্ছে আরশিনগর। সেইখানে বাস করে অচেনা পড়শি।

তার মানে অচিন মানুষ!

কেন, মনের মানুষ বলা যায় না তাকে?

এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয় না নয়নতারা। দু'হাতে মন্টু শাহর গলা জড়িয়ে ধরে সে গেয়ে ওঠে– 'পড়শি যদি আমায় ছুঁতো, যম যাতনা সকল যেতো, দূরে;' এই পর্যন্ত গাইবার পর তার কণ্ঠে মৃদু ফোঁপানি শোনা যায়। সে আর লালন একখানে থাকার পরও যে লক্ষ যোজন ফাঁক থেকে যায়, সেই হাহাকারই যেন মর্মরিত হয়ে ওঠে। মন্টু শাহ তখন বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নয়নতারাকে, বুঝিয়ে বলে– আরশিনগর পৌছতে হলে ভজতে হবে সোনার মানুষ। সে-ই পড়শি। নড়ে-চড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভর মেলে না।

নয়নতারার কণ্ঠে তখন সাগরতরঙ্গের আছড়ে পড়া জলোচ্ছ্বাস। স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সে দাবি করে,

তুমিই আমার সোনার মানুষ। আমার আরশিনগর তুমি। তুমিই আমার দয়ালচাঁদ। অরূপে স্বরূপে তুমি। আমার আরশিও তুমি, পড়শিও তুমি।

মন্টু শাহ টের পায়– তার দেহভাণ্ডে তিনশ' ষাট রসের নদীর কূল উপচিয়ে ঢেউ উঠছে। প্রবল এই ঢেউয়ের মুখে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সে! অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, মনে পড়ে যায় আকালি সাঁইজির মুখের ছবি, আগামীকাল থেকে তিনি দেবেন শুভ্র কাফনে মোড়া পরিশুদ্ধ অন্য এক জীবন। যাপিত জীবনে সে কেবল মৃত্যুর আরাধনা মাত্র। নয়নতারাকে সকৌতুকে মনে করিয়ে দেয়, সকালের আলো ফুটলেই আজকের এই রাত হারিয়ে যাবে।

নয়নতারা শুধু অস্ফুটে বলে, সকাল হতে এখনও অনেক বাকি।

মন্টু শাহ উপলব্ধি করে, নয়নতারা আজকের এই রাতের প্রহরগুলো রাঙিয়ে তুলতে চায় মনের মাধুরী দিয়ে, দেহনদী তার কানায় কানায় পূর্ণ; সে নদীতে নেমে টের পায়– এ হচ্ছে কূল উপচানো দশা। ওপারে মেঘের ঘটা, কনকও বিজলি ছটা, মাঝে নদী বহে সাঁই সাঁইরে...। বিষম নদীর পানি ঢেউ করে হানাহানি; মন্টু শাহ সেই ঢেউয়ের দাপাদাপির মধ্যেই আরশিনগর পৌছে যায়। কিন্তু পড়শি কোথায়? কী খবর পড়শির?

রাতের প্রহর গড়িয়ে চলে, ঘুম আসে না মন্টু শাহর চোখে। দু'চোখের পাতায় যদি আকাশ-ভাঙা জোছনা এসে গড়িয়ে পড়ে ঘরের বেড়ার ফাঁক গলিয়ে, তখন সে কী করে! এপাশ ওপাশ করে। এ কি শয্যাকন্টকি! নাহ, নয়নতারার ক্লান্ত পরিতৃপ্ত মুখের দিকে চোখ পড়তেই যম যাতনা হারিয়ে যায়। কন্টকি কিসের! না না, যম যাতনাইবা কিসের!

ঘুম নয়, ভোররাতের দিকে হালকা একটু তন্দ্রালু ভাব এসেছিল চোখে, ভয়ানক এক দুঃস্বপ্নে তাও কেটে যায়। চোখ রগড়ে ধাঁ করে উঠে বসে মন্টু। ভাবতে চেষ্টা করে, তার গুরু এভাবে কেন দেখা দিলেন! কী বোঝাতে চাইলেন! ভোররাতের স্বপ্নে নিশ্চয় কোনো তাৎপর্য আছে। আলো-আঁধারির মধ্যে আবারও দৃষ্টি চলে যায় নয়নতারার দিকে। আহা, রমণক্লান্ত শরীর তার ঘুমিয়ে কাদা। কাদা হবে কেন? ওটা কথার কথা। কাদা নয়, ক্ষীর। সাঁইজি তো বুঝিয়েই বলছেন– নারী আমাদের ত্যক্ত নয়। নারীকে নিয়েই তো সাধনা। বিন্দুসাধনা। যাকে বলে রসের ভিয়ান। দুধ জ্বাল দিয়ে হয় ক্ষীর। জ্বাল দিলে তো দুধ উথলে উঠবেই, ক্ষীর হয়ে গেলে স্থির শান্ত, আর উথলানো নেই। গুরু ওই কথাটাই বলেন উপমার আশ্রয়ে– কামকেও পাকে চড়িয়ে শান্ত করতে হয় বৎস! ক্ষীরের মতো শান্ত।

ভোররাতের স্বপ্ন বলে কথা! আকালি সাঁইজি নিজে হাতে তাকে সেলাইবিহীন শ্বেত-শুভ্র খিলকা পরিয়ে দিচ্ছেন, সাদা কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে দিচ্ছেন, হাত বেঁধে দিচ্ছেন; নয়নতারাকে সাজিয়ে দিচ্ছেন গুরুমা। তারা দু'জনেই ভয়ে কাঁপছে। সাঁইজি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন– এখন থেকে তোমরা অন্ধ, হাত থাকতে নুলো, পা থাকতে খোঁড়া, জিভ থাকতেও স্বাদ গ্রহণে অক্ষম। আজ থেকে তোমরা জিন্দা-মরা, জাগতিক সকল লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে তোমাদের অবস্থান। ব্যাখ্যা চলতেই থাকে, গুরুমা হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠেন– ও মা, আমার এ কী হলো! ও নয়ন!

গুরুমার হাতে সাদা ধবধবে খিলকা ধরাই আছে, খিলকার মধ্যে মানুষ নেই। এ কি জাদুমন্ত্র নাকি! জ্বলজ্যান্ত নয়নতারা গেল কোথায়!

তন্দ্রভাঙা চোখে স্বপ্নের অশ্রুকণা নিয়ে মন্টু শাহ আবারও তাকায় নয়নতারার দিকে। সে তখন পাশ ফিরে শোয়। উদোম বুকের স্তনজোড়া হেলে পড়ে বামদিকে। তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয় সোনার মানুষের বিছানার দিকে। কে বলবে– এই মেয়েটিই কিছুক্ষণ আগে স্বপ্নের ভেতর থেকে পালিয়ে এসেছে! ❖

অলঙ্করণ : : নাজিব তারেক

আহমাদ মোস্তফা কামাল

ভয়



গল্প

তখন সন্ধ্যা নামছিল। এ তো নতুন কিছু নয়; সন্ধ্যা তো প্রতিদিনই আসে, নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটিয়েই আসে, শুধু এই শহরেই নয়, আসে পৃথিবীর সব শহরে, সব জনপদে; তবু সেদিনের সন্ধ্যাটা ছিল অন্য রকম। কয়েক দিন ধরে সূর্যটা যেন আগুন ঝরাচ্ছে– রোদ নয়, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এসে লাগল গায়ে– এ রকম মনে হয় বাইরে বেরুলে। তবু না বেরিয়ে উপায় নেই, কেউ তো তাদেরকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে না। যদিও তারা বা তাদের পূর্বপুরুষেরা একদিন, সুদূর অতীতে কোনো একদিন খাদ্যের সন্ধানেই এখানে এসেছিল, শুনেছিল এই শহরে খাদ্যবস্তুর ছড়াছড়ি, কিন্তু এসে দেখেছে, এখানে কেউ কারও জন্য খাবার সাজিয়ে বসে থাকে না, জোগাড় করে খেতে হয়। জোগাড় করতে হলে যুদ্ধ করতে হয়, কাড়াকাড়ি-মারামারি-হানাহানি করতে হয়, নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হয়। তারা ওই যুদ্ধেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

অবশ্য ঘরে বসে কোনো আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করা গেলেও হয়তো তারা তা করত না, বাইরে বেরুতই। কারণ ঘরে শান্তি নেই। তীব্র ভ্যাপসা গরম, এতটুকু হাওয়া নেই কোথাও, কিংবা থাকলেও কোনো ঘরে ঢোকার উপায় নেই, গায়ে-গায়ে লাগানো দালানকোঠা, দোকানপাট, বিদ্যানিকেতন, উপাসনালয়, বাজার-শপিং মল, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পতিতালয় এমনভাবে ঘিঞ্জি হয়ে আছে যে নিশ্বাস আটকে আসতে চায়। তবু দিনশেষে ক্লান্ত শরীর-মন নিয়ে সবাই ঘরের দিকেই ফিরছিল, যেমন ফেরে প্রতিদিন। তবু সেই দিনটি প্রতিদিনের মতো ছিল না, নইলে সন্ধ্যাটা ও রকম হবে কেন?

তখনও ঘরে ফেরা হয়নি সবার। হবেই-বা কীভাবে? রাস্তায় মাছি থিকথিকে ভিড়, মানুষ আর মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ, কোটি কোটি মানুষ, ওপর থেকে তাকালে এতগুলো মাথাকে মাছির ঝাঁক বলে মনে হবে নিশ্চয়ই। জবাই করা পশুর জমাট বাঁধা রক্ত কিংবা কুষ্ঠরোগীর দগদগে ঘায়ের পুঁজে যেমন অসংখ্য মাছি ঝিম মেরে বসে থাকে, ঠিক সে রকম। কিংবা হয়তো ঠিক সে রকমও নয়। কেউ তো আর কখনও উঁচু থেকে তাকিয়ে দেখেনি যে, এই শহরের চলমান জনস্রোতকে দেখতে কেমন লাগে! সুউচ্চ ভবন আছে প্রচুর এই নগরে, কিন্তু ছাদে উঠে আকাশ দেখা বা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখার বিলাসিতা নেই, সময় নেই; ইচ্ছেও নেই কারও। আসলে যে কী আছে নগরবাসীর জীবনে, সে সম্পর্কে কেউ কিছু জানেও না। তারা নিজেরাও ঠিকমতো জানে না। জানবেই-বা কীভাবে? কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না, এমনকি কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকায় না কখনও, গিজগিজে ভিড়ের ভেতরেও হেঁটে যায় একা। ফলে এ রকম চির অচেনা-অনাত্মীয়-অপ্রিয় শহরে কর্মস্থল থেকে বাসায় ফেরা সহজ ব্যাপার নয় কারও জন্য। পথেই কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অনির্দিষ্টকাল। কে যে কখন বাসায় ফিরবে কিংবা আদৌ ফিরতে পারবে কি-না তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

সন্ধ্যার অন্তত ঘণ্টাদুয়েক আগে কর্মস্থল থেকে ছুটি পায় তারা, তবু সন্ধ্যার পর মানুষের স্রোত থেকে যায় রাস্তায়। প্রতিদিনকার ব্যাপার এটা। তবু সেদিনের সন্ধ্যাটা অন্য দিনগুলোর মতো ছিল না। হয়তো তখন সূর্য ডুবছিল, কিংবা কিছুক্ষণ আগেই হয়তো ডুবে গেছে। এ শহরে কেউ তো আর সূর্যাস্ত দেখে না। কখন যে সূর্য ডোবে তার খবরও রাখে না কেউ, তবু সন্ধ্যা যে ঘনিয়ে এলো, সেটি বুঝতে কোনো সমস্যাই হয় না কারও। সত্যি বলতে কি, সন্ধ্যা হলো কি-না, এ নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। এ শহরে সন্ধ্যা তার স্বাভাবিক রূপ-লাবণ্য নিয়ে নামে না বহুকাল হলো; কতদিন তার হিসাবও রাখেনি কেউ; তাদের জীবন এমনিতেই নানা বিদঘুটে হিসাবনিকাশে ভরা। বলা যায়, হিসাব মেলাতে মেলাতে হিমশিম খাওয়া কিংবা মেলাতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়া মানুষ তারা। রূপময়ী সন্ধ্যার কথা ভাবা এদের জন্য নিতান্তই এক বিলাসিতা। ম্যাড়মেড়ে, বৈশিষ্ট্যহীন সন্ধ্যায়, থিকথিকে ভিড়ের ভেতরে, ভ্যাপসা গরমে ঘামতে ঘামতে, ধুলোবালিতে দম-বন্ধ করা গরম বাতাস থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে বাঁচাতে তারা কেবল ভাবতে থাকে, কতদূর, আর কতদূরে গন্তব্য? আর কতটা সময় পার হলে তারা নিজেদের ঘুপচি ঘরে শরীরটাকে সেঁধিয়ে দিতে পারবে? কিন্তু সেদিনের সন্ধ্যায় তাদের ভিন্ন কিছু ভাবতেই হলো। হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই, কারণ এমন হয়নি কখনও তাদের জীবনে এর আগে কোনোদিন। এক তীব্র অচেনা ভয় জাপটে ধরল তাদের।

ছোটবেলায়, অমাবস্যার রাতে, যেমন হঠাৎ ভূতের ভয়ে সিঁটিয়ে যেত তারা, যুক্তিহীন-অসংজ্ঞায়িত-অভাবনীয় ভয়, আগ্রাসী দম-বন্ধ করা ভয়– সেই রকম ভয়ে কুঁকড়ে গেল তারা। চলমান মানুষের স্রোত হঠাৎ থমকে গেল। শিশুরা মায়ের বুকে প্রাণপণে মুখ গুঁজে রইল। মায়েরা আর কোনো আশ্রয় না পেয়ে শিশুটিকেই বুকে চেপে রইল, আর কর্মজীবী মায়েদের শিশুরা তারস্বরে ভয়ার্ত চিৎকার শুরু করল। তাদের মায়েরা তখনও পথে, ভিড়ের ভেতরে, থমকে থাকা জনস্রোতের মাঝখানে। আকাশ বিদীর্ণ করা সেই সম্মিলিত চিৎকারে নগরবাসীর ভেতরে নেমে এলো এক অভূতপূর্ব স্তব্ধতা; একদিকে অচেনা ভয় অন্যদিকে শিশুদের চিৎকার– যেন লক্ষ লক্ষ সাইরেন বাজছে; জানাচ্ছে বিপদসংকেত। সেই চিৎকারে বাসা আর রাস্তার কুকুরগুলো একসঙ্গে বিলাপ শুরু করল। হ্যাঁ বিলাপই, ঘেউ ঘেউ নয়; সুর করে একটানা কান্নার মতো ডাক। এ রকম বিলাপ কেবল মায়ের বুকের ওম পেলেই থেমে যেতে পারে। ওদের তো মা নেই, থামাবে কে? থমকে থাকা জনস্রোত অনুভব করতে পারল– এই অভাবনীয় ভয়টি ক্রমশ আতঙ্কে রূপ নিচ্ছে, কিন্তু আতঙ্কিত মানুষের আর্তচিৎকারটি তাদের কণ্ঠ ফুটে বেরুচ্ছে না। তারা একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু তাতে ভয় আরও বাড়ল। কারণ কারও কাছেই কোনো মুখকে চেনা বলে মনে হলো না। আর হবেই-বা কীভাবে! এই নগরে তো কেউ কখনও কারও দিকে তাকায়ইনি, কিংবা সুদূর অতীতে তেমনটি ঘটে থাকলেও– যেমনটি তারা শুনেছে পিতৃপুরুষের স্মৃতিকথায়, একদা নগরবাসী পরস্পরের দিকে হাসিমুখে তাকাত, বাড়িয়ে দিত সহমর্মিতার হাত, উষ্ণ করমর্দনে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাত– সেসব তারা কোনোদিন দেখেনি। কতকাল আগে এই নগরের বাসিন্দাদের ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেছে! সেখানে এখন বিরক্তি, শঙ্কা আর ভয়। চোখের কোমল ভাষা হারিয়ে গেছে, সেখানে এখানে সন্দেহ ও ক্রূরতা; করতল থেকে উষ্ণতা হারিয়ে গেছে, সেখানে এখন নিরাবেগ শীতলতা; কেউ তার খবরও রাখেনি।

এখন পাশের মানুষটিকেও শত্রু মনে হয়। অচেনা কেউ কথা বলতে এলে শঙ্কা, সন্দেহ ও সংকোচ জাগে, ভাবে– মনে কোনো কুমতলব নেই তো লোকটার? আর এ রকম হবেই-বা না কেন? লোকজন এখন বাজারের ব্যাগে শাক-সবজি-মাছ-মাংসের বদলে চাপাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কে যে কখন কার ঘাড়-গলা-মাথায় কোপ বসিয়ে দেবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। পশু জবাই করার বদলে চাপাতি এখন ব্যবহৃত হয় মানুষ জবাই করার জন্য, কোপাকুপির জন্য; মানুষের রক্তে হোলি খেলার জন্য। তারা এভাবে মরে যেতে চায় না। মরতে একদিন হবেই– তারা জানে, তবু কোপ খেয়ে মরতে তাদের খুব ভয়। কারণ এভাবে মরার জন্য দায় চাপবে তাদের কাঁধেই। তারা কী কী দোষ করেছিল যে চাপাতিওয়ালারা তাদেরকে কোপাতে বাধ্য হলো তা খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশ দেবেন স্বয়ং রাষ্ট্রশৃঙ্খলামন্ত্রী, এমনকি নগরপ্রধানও সেই সুরে সুর মেলাবেন। শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানরা একযোগে তাদের দোষ খোঁজার জন্য মাঠে নামবেন; না খুঁজে পেলে দোষ বানাবেন; খুন হয়ে যাওয়া মানুষটির পরিবার করুণ চোখে এসব কর্মযজ্ঞ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে আর ভাববে, তাদের স্বজনটি কি সত্যিই এমন ছিল? মৃত্যুর পর এসব ঝামেলা কে পোহাতে চায়! তারা তাই যথাসম্ভব নিজেদেরকে চাপাতিমুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাকে। নারীরা থাকে আরও বিপদে। আতঙ্ক ও আশঙ্কায় সর্বদা কাঁপতে থাকে শরীর ও মন। কারণ, এই নগরে পুরুষের হাত সর্বদা খুঁজে বেড়ায় নারীর শরীর; রাস্তা-ঘাট, পার্ক-উদ্যান, যানবাহন– সর্বত্র সেসব হাত সক্রিয়। নারীরা প্রতিদিনই লোলুপ হাতের কুৎসিত স্পর্শ নিয়ে, গ্লানি নিয়ে, অশুচি নিয়ে বাসায় ফেরে। সব সময় যে এত সহজে ফিরতে পারে, তাও নয়। সুযোগ পেলে তাদেরকে ধর্ষণ করা হয়। মাইক্রোবাসে ঘুরে বেড়ায় এক দল পুরুষ, তারা পথ থেকে তুলে নেয় কোনো যুবতী নারীকে, মাইক্রোবাস শহরের ভেতরেই ঘুরতে থাকে, যুবতী ধর্ষিত হতে থাকে সেখানে, কেউ ফিরেও দেখে না; বাসের ভেতরে ধর্ষণ করা হয় কাজ শেষে বাড়ি ফিরতে থাকা কোনো তরুণীকে; খেয়ানৌকায় পার হওয়ার সময় ধর্ষিত হয় কোনো মেয়ে। রাস্তা, পার্ক, বাসা-বাড়ি, এমনকি জনপদের সবচেয়ে নিরাপদ বেষ্টনীর ভেতরেও ধর্ষিত হয় নারীরা। তারপর সমস্বরে সেই অপমানিত-লাঞ্ছিত মেয়েটিরই দোষ খুঁজতে থাকে সবাই– সে নিশ্চয়ই পুরুষদের প্রলুব্ধ করেছিল, নইলে পুরুষেরা অহেতুক তাকে ধর্ষণ করতে যাবে কেন? আবার

যুবকেরা, বয়স্ক মানুষেরা পিটিয়ে মেরে ফেলে শিশুদের। শিশুহত্যার জন্য তারা প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করে অভিনব সব পন্থা; কখনও রসিয়ে রসিয়ে গল্প করতে করতে পিটিয়ে পিটিয়ে, ঠিক যেমন করে সুরাপান করে শীতপ্রধান দেশের লোকেরা; কখনও গুহ্যদ্বার দিয়ে কমপ্রেশার পাইপ ঢুকিয়ে হাওয়া প্রবেশ করিয়ে; কখনও স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে খুঁচিয়ে চোখ তুলে ফেলে; কখনও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তারা। ফলে এই ভয়কাতর সন্ধ্যায় জনবহুল রাস্তায় প্রতিটি মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে একা একা। অনুভব করে– ভয়টি আতঙ্কে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমশ দখল করে নিচ্ছে তাদের, অবশ করে ফেলছে চেতনাকে, পা দুটোকে গেঁথে দিচ্ছে কংক্রিটের ভেতর, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে চলার শক্তি, পাথরের মতো ভারী হয়ে যাচ্ছে নিজেদের পলকা শরীরগুলো, তবু তাদের কিছুই করার নেই।

ভয় পেলে মানুষের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, তারা জানে, যেমনটি তারা পেত শৈশবে বাবা-মায়ের কাছে। জানে যে, একমাত্র মানুষই পারে মানুষকে আশ্রয় দিতে, মানুষই পারে মানুষের ভয় তাড়াতে, কিন্তু চারপাশে এত মানুষ থাকা সত্ত্বেও ভয়টি ক্রমশ বেড়েই চলেছে; এই মানুষরাই ভয়টিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে; পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি যে খুনি নয়, ধর্ষক নয়, ছিনতাইকারী নয়, চোর নয়, ডাকাত নয়– তার নিশ্চয়তা কে দেবে? তাদের ব্যাগ, প্যান্টের পকেট, আস্তিনের তলায় যে চাপাতি লুকিয়ে রাখেনি বা পিস্তল, অথবা নিদেনপক্ষে ছুরি-সেটাই-বা বোঝার উপায় কী? তারা অনুভব করে উঠতে পারে, এতকাল ধরে; কতকাল তার হিসাব কেউ রাখেনি; তারা পরস্পরকে সন্দেহ করে এসেছে, অবিশ্বাস করে এসেছে, এমনকি ঘৃণা করে এসেছে, তাদেরকে মুহূর্তের মধ্যে বন্ধু বলে গ্রহণ করা যায় না, এমনকি বিশ্বাসও করা যায় না। বিশ্বাস এক প্রতারক শব্দ, এক বোকামির নাম এই শহরে, বন্ধুত্ব এক অসম্ভব শব্দ, প্রেম শব্দটিও তারা মুছে ফেলেছে বহুকাল আগেই যার যার ব্যক্তিগত অভিধান থেকে। তারা ঘনায়মান অন্ধকারে নিয়ন-বাতির কৃত্রিম আলোয় দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে আবিষ্কার করে জগতের সবচেয়ে অসহায় মানুষ হিসেবে, যে মানুষ কাউকে বিশ্বাস করতে শেখেনি, কাউকে ভালোবাসতে শেখেনি, কারও দিকে মমতার চোখে তাকাতে শেখেনি। তারা ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যদিও ফিরেও কিছুই করার থাকবে না তাদের, থাকে না কোনোদিন। খায়-দায়-ঘুমায় আর টেলিভিশন নামক বোকা বাক্সের সামনে বসে থাকে। যদিও ওই রঙিন পর্দায় এখন আর কোনো গান বেজে ওঠে না; কোনো সিনেমা নয়, নাটক নয়, তবু ওই বাক্সই তাদের একমাত্র বিনোদন মাধ্যম। পর্দায় এসে নগরের জ্ঞানী লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া বাধায়, তারা মহা-আনন্দে সেই ঝগড়াই দেখে। ভাবে, ঝগড়াই বোধহয় এই জনপদের একমাত্র সত্য, একমাত্র বিনোদন। এই যে দুই দলে বিভক্ত হওয়ার পদ্ধতি, সেটিও বেশ পুরনো। হয় তুমি এই দলে নয়তো ওই দলে, ওই দলে থাকলে এই দলের শত্রু, এই দলে থাকলে ওই দলের শত্রু– এই দুই দলের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগই রাখা হয়নি, তৃতীয় কোনো দলে থাকা বা নিরপেক্ষ থাকার কোনো অধিকারই নেই নগরবাসীর। যদিও এই দুই পক্ষকেই তারা মনে মনে ঘৃণা করতে শুরু করেছে বহুকাল আগেই, তবু তারা তা প্রকাশ্যে বলে না, বলার অধিকারও নেই, এবং ভিন্নতর কিছু বেছে নেওয়ার অধিকার বা সুযোগ না থাকায় এই দুই পক্ষের কোনো একটিকে তারা শাসন ক্ষমতায় বসাতে বাধ্য হয়। কয়েক বছর পরপর এই দু-পক্ষ একটি করে 'বেছে নাও' নাটকের অবতারণা করে, এবং জানায়– বেছে নিতে হবে ওই দুটো পক্ষের যে কোনো একটিকেই। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসিত ভাষায় বিষোদ্গার করে নিজেদের পক্ষে সমর্থন চায়, কিন্তু ওই চাওয়া পর্যন্তই, সমর্থকের ধার তারা ধারে না। কারণ তারা জানে– এই নগরের বাসিন্দারা চিরকালের জন্য নীরব-নিশ্চুপ হয়ে গেছে। বিষকাঁটা দিয়ে তাদের সারা শরীরে খোঁচালেও তারা এমনকি উঁ ধ্বনিটিও করবে না।

ভয়ে। হ্যাঁ ভয়ে। তারা কথা বলতে ভয় পায়, এমনকি কোনো শব্দ করতেও ভয় পায়। এবং এই দুই পক্ষই নগরবাসীর মনে ভয়টি সফলভাবে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। একদিনে নয়, দীর্ঘদিন ধরে এ দুই পক্ষের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে এই ভয়ের প্রাচীর, যদিও দুই দল আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের শত্রু, কোনো বিষয়েই তারা ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি কোনোদিন, তবু এই একটি বিষয়ে তাদের কর্মকাণ্ডে কোনো দ্বিমত ছিল না; নগরবাসীর মনে ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে চিরদিনের জন্য চুপ করিয়ে দিতে তারা যে কত রকম পদ্ধতি অবলম্বন করেছে! ফলে তারা এখন ভাবতেই পারে– এই অথর্ব জনগণ নিয়ে চিন্তার কী আছে? জনতা তাদেরকে বেছে নিলেই কী, না নিলেই কী? আর তাই জনতা ওই 'বেছে নাও' নাটকের সক্রিয় অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করলেও তা হতে পারে না, পরিণত হয় দর্শকে, তাদের হয়ে অন্য কেউ বেছে নেয় কোনো একটি পক্ষকে। অতঃপর মসনদে আসীন হয়ে তারা ক্ষমতার সুরক্ষায় মনোযোগী হয়, কৌশলী হয়। প্রয়োজনে নির্মম হয়ে কারও হাতে তুলে দেয় ছুরি-চাপাতি, কারও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। কথা বললেই নেমে আসে তার যে কোনো একটি। হত্যারও কত কত রূপ, কত কত শিল্পিত উপস্থাপনা হতে পারে তার প্রদর্শনী হতে থাকে বছরের পর বছর। জনপদের মানুষের মনে ভয় জমে, আতঙ্ক জমে, অনিশ্চয়তা জমে। এ সবকিছু জমা হতে হতে যখন প্রাচীরের মতো চারদিক থেকে তাদের পৃথিবীকে ঢেকে ফেলল, তখন এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তাদের কাছে। তারা শুনল, বর্তমান নগরপ্রধানকে সুলতানা রূপে মসনদে অধিষ্ঠিত রেখেই ক্ষমতা-কাঠামোতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, পূর্বতন মন্ত্রীদের বহিষ্কার করা হয়েছে, এই জনপদে শুরু হয়েছে উসমানিয়া খেলাফত। এখন থেকে তাদের নির্দেশেই চলবে সবকিছু। এ আবার কেমন পরিবর্তন? সুলতানাকে মসনদে রেখে নতুন খেলাফত চলবে কেমন করে? এসব প্রশ্ন মনে এলে সঙ্গে সঙ্গে জনতার এ-কথাও মনে পড়ে যে, মহামান্য সুলতানা বহুকাল ধরেই খেলাফতের প্রতিষ্ঠাদের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা এবং যে কোনো অবস্থায় তাদের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়ে আসছিলেন। উসমানিয়ারা অকৃতজ্ঞ নয়, নতুন খেলাফত জারি হলেও পুরনো সুলতানাকে তারা সসম্মানে, স্বমহিমায়, স্বস্থানেই রেখেছে। এসব ভাবতে ভাবতেই নতুন শাসনকর্তাদের প্রথম নির্দেশটি ভেসে এলো জনতার কাছে– 'তোমরা সবাই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকো।'

নির্বিকার-নিশ্চুপ-প্রতিবাদহীন-ভীতসন্ত্রস্ত-ম্রিয়মাণ-মৃতপ্রায় জনতা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের কান শক্ত করে ধরে ভাবল, 'যাক, কানই তো ধরতে বলেছে শুধু; প্রাণ তো আর কেড়ে নেয়নি!' বেঁচে থাকার আনন্দে গভীর তৃপ্তির শ্বাস ফেলল তারা। ভয় কেটে বুকে ফিরে এলো সাহস, লক্ষ কণ্ঠে জয়ধ্বনি শোনা গেল নতুন খেলাফত আর সুলতানার নামে। সেই বিপুল ধ্বনি শুনে ক্রূর-নিষ্ঠুর এক হাসি ফুটে উঠল সুলতানার ঠোঁটে। ভাবলেন, এতদিনে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে এই বেয়াড়া-বেয়াদব মানুষদের; খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারলেও টুঁ শব্দটি করার সাহস হবে না এদের আর কোনোদিন। ❖



হরিশংকর জলদাস

অর্ক

দিবাকর। এগারো পেরিয়ে বারোতে পা দিল। সিক্সে পড়ে। পতেঙ্গা হাইস্কুলে। পড়ত বোর্ড প্রাইমারি স্কুলে। ফাইভ পাস করে ঘরে বসে ছিল সে। বাবা ঠিক করতে পারছিল না দিবাকরকে আর পড়াবে কি-না। ফাইভই যথেষ্ট। এ পাড়ায় ফাইভ পাস কেউ নেই। দিবাকরের বাবা ঠেলেঠুলে ফাইভে উঠেছিল। পাস করার সুযোগ হয়নি।

অলঙ্করণ : : ইমরান হোসাইন পিপলু

দিবাকর ভাগ্যবান। তার সুযোগ হয়েছে। ফাইভ পাস করেছে। বলরাম ভেবেছিল- আর পড়ানোর দরকার কী? ছেলের বিদ্যা ধুয়ে ধুয়ে তো আর জল খাব না। 'মহাভারত' পড়তে জানে, 'মনসাপুঁথি' সুর করে পড়তে পারে। এই-ই তো অনেক। বাপকে ছাড়িয়েই তো গেল ছেলেটা। তাকে তো বানান করে করে পড়তে হয়, আর দিবাকর হড়বড় করে পড়তে পারে। এই পাড়ার সবচাইতে বেশি বিদ্বান আমার দিবাকর। এখন এধার-ওধার বেড়াক। বছরখানেক পরে আরেকটু মাথা তোলা হলে কোনো একটা কামে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

দিবাকরের মা আর কী বলবে? মা তো আর লেখাপড়া জানে না। নিজের নামটাও লিখতে জানে না মা। আরও বেশি পড়াশোনা করলে কী লাভ, না করলে কী ক্ষতি, তা তো মা আর বোঝে না। স্বামী যা বলছে, তাতেই সই। ভাবে- দিবাকরের বাপ তো আর কম বোঝে না! অনেক পড়াশোনা জানা মানুষ তার স্বামী। তার বুদ্ধি-বিবেচনা তো আর কম না! পাড়ার কত মানুষ তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে! মনসাদেবীর ঘট বসানোর তারিখ কখন, আষাঢ় মাসের কত তারিখে গঙ্গাপূজা শুভ, মাঘ-ফাগুন-বোশেখ-অঘ্রাণে শুভবিয়ের দিন আছে কি-না, নবজাতকের কী নাম রাখলে সুন্দর হয়- এসবের জন্য জেলেপাড়ার মানুষরা তার স্বামীর কাছে ছুটে আসে। দিবাকরের বাপ যখন নবযুগ ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা উল্টিয়ে গম্ভীর মুখে এসবের উত্তর দেয়; কী ভালোই না লাগে যোগমায়ার! একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে একনজরে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে। গর্বে বুক ফুলে ওঠে তখন তার। বড় আনন্দ লাগে। তো, এই দিবাকরের বাপ যখন বলছে, দিবাকরের আর লেখাপড়ার দরকার নেই। তো, ঠিকই বলেছে। নিশ্চয় বুঝেশুনেই ছেলের সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিবাকরের বাপ।

কিন্তু ঠাকুমার ভিন্ন কথা, 'অ বলরাম, ছেলের পড়ালেখা বন্ধ করবি ক্যান? শুইনলাম- পড়ালেখায় ভালা দিবাকর। কেলাস ফাইভে ফাসটু না কী যেন একটা হইয়েছে।'

'কী দরকার মা আর বেশি পড়ার? যা পইড়েছে, অনেক পইড়েছে। এই পাড়ায় দিবাকরের মতন বিদ্বান আর নাই।' বলরাম মাকে বলে।

'এইটাই শেষ কেলাস? এই কেলাসের পর আর কুনু কেলাস নাই?'

'ওমা! তুমি বল কী মা? ফাইভের পর আরও কত ক-ত কেলাস আছে!'

'তাইলে ওইসব কেলাসে আমাদের দিবাকর পইড়ব না ক্যান?'

বলরাম ফাঁপরে পড়ে গেল। মায়ের এই নিরীহ প্রশ্নের কী জবাব দেবে, ঠিক করতে পারে না সে। জবাব যে তার কাছে নেই, তা কিন্তু নয়। আছে। তবে মা তার এই জবাব মেনে নেবে কি-না সন্দেহ। গরিব মানুষ সে। ঘরে পাঁচ-ছটা হাঁ-করা মুখ। ওইসব মুখের দু'বেলার অন্ন জোগাতে তার কালঘাম ছুটে যায়। নিজেদের কাপড়চোপড়ের ঠিক নেই। কখন একটা শাড়ি কিনে দিয়েছিল যোগমায়াকে, মনে নেই। দুটো শাড়ির একটাতে গিরা দিয়ে দিয়ে পরে। মায়ের পরনে তো সেই বিবর্ণ ধুতি। এক সুদিনে ঘর ছাইলে পরের বছর ছাইতে পারে না। মাত্র দুইশ' টাকার ছন লাগে। গোটা বছর তা-ও জমাতে পারে না। বর্ষার দিনে চাল ফুঁড়ে বৃষ্টি পড়ে- টুপটাপ, ঝরঝর। এখানে ওখানে, বিছানাপাতিতে। রাতে ঘুমাতে পারে না কেউ। শুধু স্থাননাড়া হতে হয়। এখানে পড়লে ঘরের কোনায়, কোনায় পড়লে মাঝখানে বারবার স্থান বদল করতে হয়। দিশেহারা সবাই জড়ো হয়ে রাত কাটায় দিন কাটায়। গত বছর ঘরের চাল ছাওয়া হয়নি, এ সুদিনে না ছাইলে বড় কষ্টে যাবে বর্ষাকালটা। এত দিন মাগনায় পড়েছে দিবাকর। সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়তে টাকা লাগে না। দিবাকরেরও লাগেনি। হাইস্কুলটা তো আর সরকারি স্কুল না। এখানে পড়তে গেলে মাসে মাসে বেতন দিতে হবে, ড্রেস লাগবে, বই-খাতা লাগবে। এত টাকা পাবে কোথায় বলরাম? তাই তো ঠিক করেছে, ছেলেটাকে আর পড়াবে না। কিন্তু মাকে কি এসব কথা বলা যাবে? মা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে তার সকল যুক্তি।

মায়ের প্রশ্ন শুনে তাই আমতা আমতা করতে লাগল বলরাম। মা কিন্তু ছেলের মনের কথা বুঝে ফেলল। বয়স তো আর কম হলো না তার! সামনের ফাগুনে তিনকুড়ি এগারো বছর পুরাবে। চুলগুলো তো আর শুধু শুধু পাকেনি?

'তোর মনের কথা বুইঝতে পারি আমি বাবা। আমরা গরিব। দিন এনে দিন খাই। তোর আয় ইনকামও তেমন নয়। বাড়িতে অনেক খানেওয়ালা। দিবাকরের পড়ার খরচ মিটাবি কেমনে? এই তো চিন্তা তোর? দেখ রাম, ওপরে ভগমান আছে। ও-ই দেইখবে আমাদের। কুনুদিন খাইছি, কুনুদিন খাই নাই- সত্য। কিন্তু মরে তো যাই নাই আমরা! ভগমান কমবেশি খাইদ্য জোগান দিয়া আমাদের বাঁচাইয়া তো রাইখছে! ঈশ্বররে ধইরে রাখ। পেট চালাইছে যে, দিবাকরের টাকাও জোগাইব সে।' বলে দম নেওয়ার জন্য থামল ঠাকুমা।

'মা, তুমি আবেগের কথা কইলা, বাস্তবতা কিন্তুক ওই রকম না। কঠিন, বড় কঠিন।' বলে একটু করে হেসে দিল বলরাম। বলল, 'ওই চাও, কারে আমি বাস্তবতা শিখাচ্ছি। তোমার জীবনটাই তো মা কঠিন বাস্তবতার ঘষায় ঘষায় ক্ষয় হইয়া গেল।'

ঠাকুমা বলল, 'রাখ তো এখন অইসব কথা। আসল কথা বলি- দিবাকরের পড়ালেখা বন্ধ করিস না বাপ। ও যতদূর হাঁইটতে চায়, ততদূর হাঁইটতে দে তারে।'

মায়ের কথায় হ্যাঁ বা না কিছুই বলে না বলরাম। আনমনে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে- না বললে মা ভীষণ কষ্ট পাবে। মা যে দিবাকরকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সেটা বলরামের চেয়ে কে বেশি ভালো জানে! আর হ্যাঁ বললে দারিদ্র্য-অভাব-অনটন তাকে আরও বেশি করে গলা টিপে ধরবে। এত বড় সংসার সে চালাবে কী করে? ওই যে বলে না, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সে রকম অবস্থা হলো বলরাম জলদাসের।

'কী বাপ, কিছু বইলছস না যে!' ঠাকুমা একটা উত্তর চায়ই চায় ছেলের কাছ থেকে।

বলরাম উদাস গলায় বলে, 'কী ঠিক কইরব মা বুঝতে পারছি না! বছর বছর এতগুলো টাকা কীভাবে জোগামু!'

'তুই দিবাকররে নিয়া যা-ই ভাবস আর তা-ই ভাবস, দিবাকর কিন্তুক বড় ইশকুলে পইড়বে- এই আমার শেষ কথা, বইলে দিলাম।'

'একটু মাথা ঘামাইয়া ভাইবা দেখ মা। অনেক টাকার মামলা। ভাতকাপড় জোটাতে পারি না, তার উপর নতুন খরচ। এক-দুই মাসের খরচ তো না, অনেক বছরের খরচ।' কাঁধের ময়লা গামছাটা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলে বলরাম।

ঠাকুমা পানের রসটা মুখ থেকে পিক করে দাওয়ার বাইরে ফেলে বলে, 'এখনো তো আমার রথ থাইমা যায় নাই বলরাম। মাছ বেইচতে তো বাইর হই। তোর বাধার কারণে দুই বেলা যাইতে পারি না এখন। বলস- বয়স হইয়া গেছে মা তোমার। দুই বেলা যাওনর দরকার নাই। যা কামাই তা-ই খাব। বহদ্দারের কাছ থেইকা মাছ কিনা সকালবেলা তো যাই?'

বলরাম মাথা নিচু করে থাকে। এরপর মা কী বলবে মনে মনে আন্দাজ করতে থাকে সে। এই সময় ঠাকুমা বলে, 'বলস না ক্যান? যাই কিনা?'

'যাও তো মা। তুমি মাছ বেইচা কিছু টাকা কামাই করে না আইনলে দুই বেলা খাইতে পারতাম না আমরা।' মাথার পেছনে চুলকাতে চুলকাতে বলে বলরাম।

'কাল থেইকা দুই বেলা মাছ বেইচতে যামু আমি।' ঠাকুমা বলে।

'কী বলো মা! এই শরীল নিয়া দুই বেলা মাছ বেইচতে যাইবে তুমি?' চমকে মায়ের দিকে তাকায় বলরাম।

'হ, যামু। একবেলার লাভ পরিবারের জইন্য, আরেক বেলার লাভ দিবাকরের জইন্য। দিবাকরের পড়ালেখার খরচ আমি চালাইমু।' ঠাকুমার গলায় একটু রাগ যেন। সেই রাগকে তাড়াতাড়ি সামাল দেয় ঠাকুমা। নরম কণ্ঠে বলে, 'তোমার ঘরে আরও দুইটা পোলামাইয়া আছে। তারা কতদূর পড়ালেখা কইরতে পাইরবে কে জানে! যে পারছে তারে আটকাইও না বাপধন। ওরে পইড়তে দাও। দিনক্ষণ দেইখা ইশকুলে ভর্তি করাই দাও।'

মায়ের কথায় বলরামের ভেতরটা ওলটপালট করতে থাকে। চোখে জল বেরিয়ে আসবে বেরিয়ে আসবে অবস্থা তার। মনে মনে বলে– কোন বাপ চায় মা তার ছেলে লেখাপড়া না করুক? এই পাড়ার অন্য বাবাদের কথা জানি না মা, আমি বাবা চাই– দিবাকর আইএ-বিএ পাস করুক। আমি তো একটু-আধটু লেখাপড়া করেছি মা। বিদ্যা যে অমূল্য ধন– জানি। লেখাপড়া না জানা তুমি মা বলতে– ধনসম্পদ চুরি হয়ে যায়, নাও জাল দরিয়ায় ভেসে যায়, কিন্তু লেখাপড়া চুরি হয় না, ভেসেও যায় না। তুই তো পারলি না বলরাম লেখাপড়া করতে, তোর ছেলেমেয়েকে পড়াশোনা করাস। তাহলে তাদেরকে তোর মতো রাক্ষসী সমুদ্রে যেতে হবে না, আমার মতো মাথায় খাড়াং নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মাছ বেচতে হবে না। হিন্দুপাড়ার বাবুদের মতো তারা অফিস-আদালতে চাকরি করবে। কত দুঃখ আর কত আনন্দ থেকে যে মা তুমি কথাগুলো বলতে, তা আমি বুঝতাম। আমার দিবাকরও বেশি বেশি পড়ে স্কুলের মাস্টার হোক– কত দিন কত রাত যে ঈশ্বরের কাছে হাতজোড় করে এই প্রার্থনা করেছি মা, তা তোমাকে এখন বললে হেসে উঠবে। যতই বলো মা, সংসারের হাল ধরবার জন্য দুই বেলা মাছ বেচতে বের হবে তুমি, তোমার শরীরের অবস্থা তো মা আমি জানি। তোমার গায়ের সোনার বরণ কোথায় হারিয়ে গেছে মা। তোমার হাতের, পায়ের, মুখের চামড়া কীরকম কুঁচকে গেছে! একটু কুঁজো হয়ে গেছ তুমি। আগের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে হাঁটতে পারো না। মাছের খাড়াং মাথায় নিয়ে তরতরিয়ে হেঁটে যেতে পারো না। কিছুদূর গিয়ে গিয়ে জিরাতে হয় তোমাকে। বেশি খাটুনি খাটতে গিয়ে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি চোখে আঁধার দেখব মা। তুমি যে আমার বাতিঘর মা। তোমাকে কোনোভাবেই দু'বেলা খাটতে দেব না আমি।

মায়ের চোখে চোখ রেখে বলরাম বলে, 'দুইটা দিন ভাইবতে দাও মা আমাকে।' বলে মাথা নিচু করে বলরাম।

ছেলের কথা শুনে মা তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু সেই সন্ধ্যার একটি ঘটনা বলরামকে ভাববার অবকাশ দিল না।

সে সন্ধ্যাটা জোছনায় ভরা ছিল। পূর্ণিমা ছিল। আশ্বিনের মাঝামাঝি। আকাশে তেমন কোনো মেঘ ছিল না। দু'এক টুকরা সাদা মেঘ আকাশের এদিক থেকে ওদিকে খেয়ালখুশি মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। দূর-আকাশে তারাদের ফিকফিক হাসি। আঁধার লাগার আগেই পুবাকাশে গোল চাঁদটা উঠেছিল। লালচে। আঁধারটা ঘন হয়ে এলে চাঁদের লালচে ভাবটা কেটে গিয়েছিল। ধবল জোছনা চাঁদের গা থেকে ছিটকে পড়ছিল গাঁ-গেরামের রাস্তাঘাটে, গাছগাছড়ায়, পুকুরঘাটে, ঝোপেঝাড়ে, উদাম মাঠে, নদীর কিনারায়, সমুদ্রজলে আর দিবাকরদের উঠানে।

দিবাকরদের উঠানটা বেশ বড়। রাজা-জমিদারদের উঠানের মতো বড় নয়, অন্য জেলেদের উঠানের চেয়ে বড়। জেলেদের ঘরবাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি, ঠেসাঠেসি। অনেক মানুষ ছোট্ট একটা জায়গায় দাঁড়ালে যেমন দমবন্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়, জেলে ঘরগুলোরও একই অবস্থা। ঘরগুলো শ্বাসবন্ধ করে উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে আছে যেন। কোনো কোনো ঘরের সামনে একচিলতে ভূমি। ওই অতি অল্প পরিসরের ভূমিটিকে উঠান বলে গর্ব করে জেলেরা। অনেকের তা-ও নেই। তুলনায় বলরামের বাড়ির উঠানটা বেশ প্রশস্ত।

সেই উঠানের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে মাটির চুলা, দুই পাকের। মানে দুটো পাতিল পাশাপাশি চুলার দুটো মুখে বসিয়ে রান্না করা যায়। লাকড়ি-পাতা-গোভা– এসব জ্বালানি ঢোকানোর মুখ আলাদা। জ্বালানি থেকে আগুন বেরোয় চুলার দু'দিকে। এ রকম মাটির চুলাকে দো-পাইক্যা চুলা বলে ওরা।

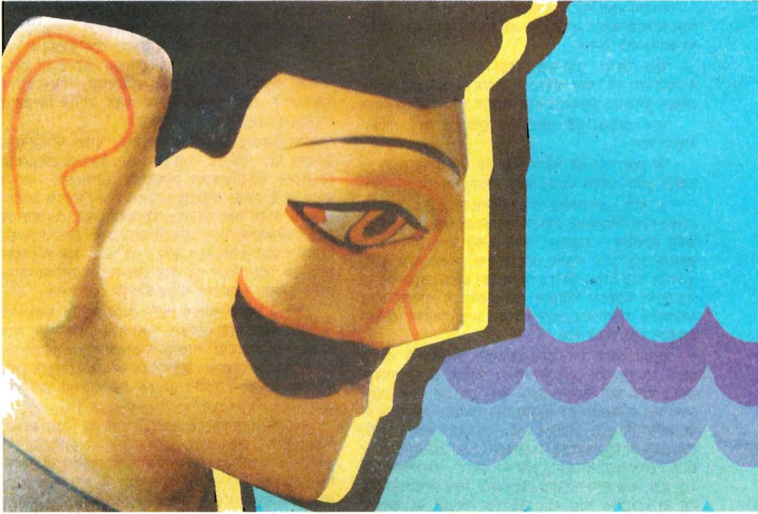
বর্ষাবাদলে পাকঘরের ভেতরেই রান্না হয়, কেনা লাকড়ি দিয়ে। শীতের আগে আগে জেলে নারীরা উঠানে মাটির চুলা বানায়– এক পাইক্যা, দো-পাইক্যা। শীতকালজুড়ে সকাল-সন্ধ্যা রান্না হয় উঠানের চুলায়; রাস্তা থেকে, পুকুরপাড় থেকে কুড়িয়ে আনা লাকড়ি আর শুকনাপাতা দিয়ে। সন্ধ্যাকালে বাড়ির সবাই চুলা ঘিরে বসে। আগুন পোহায়। বড়রা সংসারের কথাবার্তা বলে।

সেই সন্ধ্যায় যোগমায়া চুলায় তরকারি চড়িয়েছে। একদিকে খেসারির ডাল, অন্যদিকে রাঙা আলু। নাতি-নাতনিরা রাঙা আলু খেতে খুব পছন্দ করে। সে বিকেলে ঈশান মাঝির হাট থেকে রাঙা আলু এনেছে ঠাকুমা। ঠাকুমা বউকে রান্নাবাটির এটা-ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। অন্য ভাইবোন দুটি খুনসুটি করছে। বলরাম চুলায় হাত সেঁকছে। দিবাকর বাপের পাশ ঘেঁষে বসেছে। তার চোখ আগুনের শিখার দিকে। শিখাটি এই ধপ করে জ্বলে উঠছে তো আবার এই নিবু নিবু। জ্বলা-নিবার এই খেলাটি দেখতে দিবাকরের খুব ভালো লাগছে।

'বলরাম, অই বলরাইম্যা, বাড়িতে আছস নাকি?' মেম্বারের কণ্ঠ চিনতে ভুল হলো না বলরামের।

ভেতরটা কেঁপে উঠল তার। সেদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল মেম্বার সাবের সঙ্গে। বলেছিলেন, 'কীরে বলরাম, তোর জালে পাঙাশটাঙাশ ধরা পড়ে না, নাকি? শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে আসছে, ষোল তারিখ জামাই আইসবে। অন্যদিন না পাইরলেও ওই তারিখে মাছটা পৌঁছে দিস।'

বলরাম জানে– মেম্বার সাব কাউকে মাছের দাম দেন না। দাম চাইলে বলেন– সরকারি রিলিফ যখন আসে, ওগুলো মক্ত-আলা দিই না তোদের? ওই রিলিফের দাম নিই আমি তোদের কাছ থেকে, বেটারা? এরপর মা-বোন তুলে দুই চারটা গালি দেন। জেলেরা পারতপক্ষে তার সামনে যায় না, এড়িয়ে চলে। কপাল খারাপ, সেদিন ছোবান মেম্বারের সামনে পড়ে গিয়েছিল বলরাম। এর মধ্যে তার জালে পাঙাশ মাছ যে দু-একটা ধরা পড়েনি এমন নয়, কিন্তু ওই যে দাম দেবে না বলে, মনে থাকা সত্ত্বেও মেম্বারের বাড়িতে মাছ পৌঁছায়নি বলরাম। আজ কত তারিখ? ষোল তারিখ নয় তো?



মাছ দিইনি বলে নির্ঘাত বাড়ি বয়ে অপমান করতে এসেছেন ছোবান মেম্বার। 'আজ কয় তারিখ দিবাকর? মা, তুমি জানো আজ আশ্বিন মাসের কত তারিখ? ষোল তারিখ নয় তো?' বলতে বলতে কলজের পানি শুকিয়ে গেল বলরামের। বউ-পোলা-মায়ের সামনে মেম্বার সাব যদি তার গায়ে হাত তোলেন!

বক্তাকে এখনো চোখে দেখা যাচ্ছে না। ঝোপঝাড় আর গাছগাছালির আড়াল পেরিয়ে দিবাকরদের উঠানে আসতে হয়। মেম্বার সাব ঝোপঝাড়ের ওপাশ থেকে ডাকটা দিয়েছিলেন।

পিড়া ছেড়ে বলরাম দ্রুত উঠে দাঁড়াল। গামছাটা ঝেড়ে আবার কাঁধে রাখল। পরনের ধুতিটা টেনেটুনে একটু নিচে নামাতে চাইল। হাফহাতা গেঞ্জিটা কাঁধের দিকে ছিঁড়ে গেছে। গামছাটা দিয়ে ছেঁড়া অংশটি ঢেকে দিল। সামনের দিকে পা বাড়াতে যাবে, ওই সময় ছোবান মেম্বার উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। পেছনে আরও তিনজন লোক। জোছনায় বলরাম স্পষ্ট দেখতে পেল– ওরা তিনজনই ভদ্রলোক। কেতাদুরস্ত। ভালো জামাজোড়া তাদের গায়ে। বেঁটে ফর্সামতন একজনের চোখে চশমা। বলরাম আরও বেশি ভয় পেয়ে গেল। ভয়ের কণ্ঠে বলল, 'হুজুর, মাছটা...।'

ছোবান মেম্বার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'থাক থাক! ওই কামে আসি নাই আমি!'

'তাইলে...?' ধরাগলায় বলল বলরাম।

'তাইনেরা তোর লগে কথা বইলতে চান। তুই তাইনেদের সাথে কথা বল।' মেম্বারের কণ্ঠ একটু অস্থির। সঙ্গের লোকদের কাছ থেকে কী যেন লুকাতে চাইছেন। ওরা কিছু বলবার আগেই ছোবান মেম্বার আবার বললেন, 'তাইনেদের সাথে তোর তো পরিচয় করাইয়া দিই নাই।'

বলরামের ভেতরটা কৈছালি করতে শুরু করল। মেম্বার সাব তো এরকম মিষ্ট কথা বলেন না কখনো। দুষ্টলোকের মিষ্ট কথা বলে যে একটা কথা আছে, ছোবান মেম্বারের বেলায় সে কথা খাটে না। উনি যেমন শয়তান, তেমনি খারাপ ব্যবহার তার। দুর্ব্যবহারকারী যখন মিষ্ট কথা বলে, তখন সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। বড় কোনো ক্ষতি করবার জন্য ছোবান মেম্বার দলবল নিয়ে তার বাড়িতে আসেননি তো? প্রথমে মিষ্টি কথা, তারপর সর্বনাশ।

'ইনি হলেন পতেঙ্গা হাইস্কুলের হেডমাস্টার সত্যব্রত চক্রবর্তী, আর ইনি ওই স্কুলের সেরকেটারি আর আমার বামপাশের ইনি হাইস্কুলের এজিস্টেন হেডমাস্টার। হেডমাস্টার সাব তোর লগে কথা কইবেন।' মেম্বার বললেন।

মেম্বারের কথা বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করা শুরু করল বলরাম। অন্যরা প্রণাম নিলেও সত্যব্রতবাবু বলরামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বেশ কিছুক্ষণ জড়িয়েই ধরে রাখলেন। সত্যব্রতবাবুর বুকে বেশ অস্বস্তিবোধ করতে লাগল বলরাম। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য মৃদু মোচড়ামুচড়ি শুরু করল। সত্যব্রতবাবুর বুক থেকে ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বলরাম। দু'কদম পিছিয়ে এসে হাত কচলাতে শুরু করল। পিলপিল করে ঘামতে লাগল সে। কাঁধ থেকে গামছাটা নিয়ে যে মুখ মুছবে, তাও ভুলে গেল বলরাম।

এই সময় সত্যব্রত চক্রবর্তীর কথা বলরামের কানে এলো, 'আপনার বড় ছেলেটা নাকি ফাইভ পাস করেছে। ফার্স্ট হয়েছে নাকি সে?'

বলরাম আকাশ থেকে পড়ল– বলেন কী লোকটা? তার মতো সাধারণ একজন মাউছ্যারে আপনি বলছেন? পাগল না তো? এই গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সবাই তাদের সঙ্গে তুই-তোকারি করে। বলে– মাউছ্যা, ডোম। আর এই লোকটা



বলছেন– আপনার বড় ছেলেটা...।

'আমি আপনার কাছে আপনার ছেলের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।' সত্যব্রতবাবু বললেন।

কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল বলরাম। হেডমাস্টারের কথায় সংবিৎ ফিরে পেল। বলল, 'হ হুজুর, দিবাকর ফাইভ পাস করছে।'

'এত মাস কেটে গেল, হাইস্কুলে ভর্তি করাননি যে?' সত্যব্রত চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করলেন।

বলরাম কোনো জবাব দিল না। জবাব আছে তার কাছে। কিন্তু ওই জবাব বিশ্বাস করবেন না তারা। তাই দু'হাত জোড় করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

ছোবান মেম্বার ধমকে উঠলেন, 'কী রে বেটা রাইম্যা, স্যারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছস না ক্যান? হাঁদারামের মতো দাঁড়াইয়া আছস!'

হেডস্যার বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আহ মেম্বার সাহেব, ওরা নিরীহ মানুষ। ধমকালে আরও ভয় পেয়ে যাবেন। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আমার ওপর ছেড়ে দেন।' বলে মেম্বারের দিকে তাকিয়ে মধুর করে একটু হাসলেন। 'তা ভাই, ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাননি কেন এত দিন?' বলরামকে উদ্দেশ করে কথা শেষ করলেন সত্যব্রত চক্রবর্তী।

'না, মাইনে হুজুর, কী যে বইলব বুঝে উইঠতে পারছি না।' আমতা আমতা করে বলল বলরাম।

'কী মানে মানে করছস? স্যারের প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দে না।' আবার ধমকে উঠলেন ছোবান মেম্বার।

এবার স্কুল সেক্রেটারি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'একটা ভালো কাজে এসে এত ধমকাধমকি করছ কেন ছোবান? ধমকাধমকি করে সাধারণ মানুষকে শাসন করা যায়, বশে আনা যায় না। এত দিন মেম্বারগিরি করে তাও শিখলে না তুমি!'

সেক্রেটারি এমদাদ মিয়া দীর্ঘদিন পতেঙ্গার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। বয়সী মানুষ। চুল-দাড়ি সাদা। দু'দুবার হজ করেছেন। শেষবার মক্কা শরিফ থেকে ফিরে বললেন– বহুদিন করলাম চেয়ারম্যানগিরি। সংসারের ঝুটঝামেলা আর ভালো লাগে না। গাঁয়ে খারাপ মানুষের অভাব নেই। ওদের শাসন করতে গিয়ে মুখ খারাপ করতে হয়, গায়ে হাতও তুলে হয় মাঝেমধ্যে। গুনাহ, কবিরা গুনাহ এসব। পরের বার তিনি আর ইলেকশনে দাঁড়ালেন না। ভালো লোক হিসেবে তার সুখ্যাতি আছে গাঁয়ে। যখন এই অজপাড়াগাঁয়ে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হলো, গণ্যমান্যরা এমদাদ মিয়াকেই সেক্রেটারি নির্বাচন করলেন। তিনি আজ হেডমাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারকে নিয়ে ছাত্রসংগ্রহে বেরিয়েছেন। ছোবান মেম্বার স্কুলের হোমরাচোমরা কেউ নন। স্কুল কমিটির সাধারণ একজন সদস্য। এমদাদ মিয়া ছোবান মেম্বারকে পছন্দ করেন না। জেলেপাড়াটা মেম্বারের এলাকায় বলে ছোবানকে সঙ্গে করে এনেছেন এমদাদ মিয়া। ছোবান মেম্বারের কাণ্ডকারখানা দেখে, কথাবার্তা শুনে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন তিনি। বিচক্ষণ মানুষ তিনি। বলরামের 'হুজুর, মাছটা...' অসমাপ্ত বাক্যটির অর্থ বুঝতে তাকে বেগ পেতে হয়নি। এ রকম খান্ডাশ জাতের মেম্বাররা যে অসহায় মানুষদের শোষণ করে, তা বোঝার অভিজ্ঞতা ষাটোর্ধ্ব এমদাদ মিয়ার আছে।

হাত কচলাতে কচলাতে বলরাম বলল, 'আমরা গরিব মানুষ হুজুর। স্কুলে ভর্তি করালে অনেক খরচ। ওই টাকা আমার কাছে নাই হুজুর। দুই বেলা ঠিকমতো খাইতে পারি না।'

'তুই খাইতে পারস না– আমার কাছে যাস নাই কেন?

আমার এলাকার মানুষ না খাইয়া থাকে, নাউজুবিল্লাহ।' ছোবান মেম্বার বলেন।

'শোন ছোবান, এরা না খেয়ে মরে, মাগতে বের হয় না। এত দিনেও চিনতে পারোনি তুমি ওদের?' এমদাদ মিয়া কঠিন গলায় বলেন।

ছোবান মেম্বার গলায় কৃত্রিম বিস্ময় ঢেলে বলেন, 'সরকারি রিলিফ যখন আসে, তখন ওরা ভিক্ষুকের মতো আমার উঠানে ভিড় করে। তাই বলছিলাম....।'

ছোবানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এমদাদ মিয়া বলেন, 'সরকারি রিলিফ ভিক্ষা নয়; সাহায্য। সরকারি সাহায্য নেওয়ার জন্য টাকাওয়ালা লোককেও লাইনে দাঁড়াতে দেখেছি। ওরা তো গরিব মানুষ। তুমি সরকারের প্রতিনিধি। তাই রিলিফ এলে তোমার কাছে যায়। রিলিফের বাহানায় এইসব গরিবকে এক্সপ্লয়েট করা ঠিক নয়।'

সত্যব্রত চক্রবর্তী দেখলেন– উদ্দেশ্যটাই ভেস্তে যাচ্ছে। চেয়ারম্যান-মেম্বারের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হলে ছাত্রসংগ্রহের কাজটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এই গ্রামটা চট্টগ্রাম শহরের বাইরে, বঙ্গোপসাগর ঘেঁষে। এখানে খুব বেশি ধনী ব্যক্তি নেই। যে দু'চারজন আছে, তাদের অনেকেই স্মাগলার। শিপ থেকে মদ-আফিম-সোনা, রেডিও, সিগারেট নামায়; শহরে চালান করে। কাঁচা টাকা হাতে আসে তাদের। টাকা দিয়ে টাকা বাড়ায় তারা। যে দু'চারটা পরিবারের ছেলেরা পড়াশোনা করেছে, চাকরি পেয়ে শহরে চলে গেছে। কেউ গ্রামের দিকে ফিরে তাকায় না, তাকায়নি। গোটা তিনেক সরকারি প্রাইমারি স্কুল ধুঁকে ধুঁকে চলে। ফাইভ পাস করে এসব স্কুল থেকে যারা বের হয়, তাদের অধিকাংশই থেমে যায়। সাত মাইল দূরের বেগমজান হাইস্কুলে গিয়ে পড়বার দম ও অর্থ নেই ছাত্র আর অভিভাবকদের। দু-দশজন যারা যায়, শহরেরই অধিবাসী হয়ে যায়।

হঠাৎ করে পতেঙ্গার কিছু অল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে জোয়ার এলো। হাইস্কুল বানাবে তারা। বহু বৈঠক-টৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হলো– স্কুলের নাম হবে পতেঙ্গা হাইস্কুল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পতেঙ্গার কাটগড়ে আমেরিকান সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছিল। খানাপিনার জন্য একটা বড় হলরুম বানিয়েছিল তারা। এত দিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। গাঁয়ের মানুষরা প্রস্রাব-পায়খানা করত ওই হলরুমে। একদিন টিনশেডের হলরুমটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হলো। মানুষ যাতে ওখানে নিত্যদিনের প্রাতঃকৃত্য সারতে না পারে, পাহারা দেবার জন্য দারোয়ান রাখা হলো। এক সকালে ঘরটির সামনে সাইনবোর্ড টাঙানো হলো– পতেঙ্গা হাইস্কুল, স্থাপিত : ১৯৬২ খ্রি.। ওই বছরেই পড়ানো শুরু হয়েছিল। হলরুমটিকে বেড়া দিয়ে ভাগ ভাগ করা হয়েছিল। শিক্ষক সর্বসাকল্যে পাঁচজন। প্রথম বছর ছাত্র পাওয়া গেল না তেমন। এগারোজন ভর্তি হলো সিক্সে। পরের বছর কুড়িজন, পরের বছর তেইশজন, তার পরের বছর সাতাশজন। ছেষট্টি সালে ছেচল্লিশজন ভর্তি হয়েছে। মাস চারেক ক্লাস হয়ে গেছে। হঠাৎ এক বিকেলে লেদু মুন্সি খবর আনল, জেলেপাড়ায় একটি ছেলে আছে। নাম দিবাকর। ফাইভ পাস করে ঘরে বসে রয়েছে। বাবা বলরাম খুব গরিব। ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো। বাপ ঠিক করেছে– ছেলেকে আর পড়াবে না। সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন, দিবাকরকে তার চাই। তাকে ঝরে যেতে দেওয়া যাবে না। তাই সেক্রেটারি এমদাদ মিয়া আর অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার রফিকুল হককে নিয়ে বলরামের বাড়িতে আসা তার। মাঝখানে সেক্রেটারি সাহেবের আগ্রহে ছোবান মেম্বার এসে জুটলেন। কিন্তু লোকটার কথা বলার ধরন-ধারণ শুরু থেকেই ভালো লাগছিল না সত্যব্রত বাবুর। মেম্বার বলে কিছু বলাও যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মেম্বার-চেয়ারম্যানে লেগে গেল। জল আরও ঘোলা হয়ে উঠলে বলরাম ভীষণ ভড়কে যাবে। ছেলেকে কিছুতেই হাইস্কুলে ভর্তি করাতে চাইবে না।

মেম্বার-চেয়ারম্যানের বাকবিতণ্ডা থামানো দরকার। দু'জনের কথাকাটাকাটির মাঝখানে সত্যব্রতবাবু বলে উঠলেন, 'আপনার ছেলের বেতন দিতে হবে না। এখনই আমি তাকে হাফ ফ্রি দিয়ে দিলাম। মাসিক বেতন ছয় টাকা। তিন টাকা মাসে মাসে দিতে পারবেন না বলরামবাবু?'

মৃদুকণ্ঠে বলরাম বলে, 'পারব হুজুর।'

'তোকে ওই তিন টাকাও দিতে হবে না। আমি দেব। মাসে মাসে গিয়ে আমার কাছ থেইকে নিয়া আসবি।' অতি উৎসাহে ছোবান মেম্বার বলে ওঠেন।

সত্যব্রতবাবু ছোবান মেম্বারের উৎসাহে বরফশীতল জল ঢেলে দিলেন। তাকে উপেক্ষা করে তিনি বললেন, 'তাও মাস দুয়েক দিবেন। সামনে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা, কী যেন নাম আপনার ছেলের, ভুলে গেছি।'

বলরাম বলল, 'দিবাকর হুজুর।' বলরামরা সারাজীবন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হুজুর বলতেই শিখেছে, স্যার বলতে শিখেনি।

'হ্যাঁ, দিবাকর। দিবাকর যদি হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে, তাহলে তাকে ফুল ফ্রি দেওয়া হবে।' বললেন সত্যব্রত চক্রবর্তী।

'ফুল ফ্রি মাইনে!' অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বলরাম।

'ফুল ফ্রি মানে দিবাকরের জন্য কোনো বেতন দিতে হবে না।' মৃদু হেসে সত্যব্রত চক্রবর্তী বললেন।

'তাহলে সিক্সের সমস্ত বই আমি কিনে দেব বলরামের ছেলেকে।' দানবীর সাজতে চাইলেন ছোবান মেম্বার। মুখে ব্যঙ্গের হাসি ছড়িয়ে এমদাদ মিয়া বললেন, 'তাও লাগবে না। সরকার সিডিউল কাস্টের ছাত্রছাত্রীর জন্য বই ফ্রি দিয়েছে। অলরেডি দুই সেট বই স্কুলে পড়ে আছে। ওখান থেকে দিবাকরকে এক সেট দিয়ে দিলে কেমন হয় হেডমাস্টারবাবু?'

'ঠিক বলেছেন সেক্রেটারি সাহেব।' সত্যব্রতবাবু এবার মুখ ফেরালেন বলরামের দিকে। বললেন, 'তাহলে বলরামবাবু, আপনার ছেলের ভর্তিসমস্যা মিটে গেল। কালকে স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে দিন দিবাকরকে। স্কুলের একটা ড্রেস আছে– পাঞ্জাবি-পাজামা। মাসখানেকের মধ্যে সেলাই করে দিলেই হবে। কী, পারবেন না?'

বলরাম উত্তর দিবে কী, তার গলা যে কান্নায় আটকে গেছে। হঠাৎ হু হু করে কেঁদে দিল বলরাম। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ভগমানরে, মাইনষের বেশে আমার বাড়িতে আইলারে ভগমান।' তারপর ঝুপ করে সত্যব্রত চক্রবর্তীর পায়ে পড়ল বলরাম। 'আপনি আমার স্বপ্নটারে মরতে দিলেন নারে হুজুর। আপনি আমার ভগমান, আপনারা আমার দেবতা হুজুর।'

সত্যব্রতবাবু দ্রুত বলরামকে বুকে টেনে নিলেন। এমদাদ মিয়া কাছে এগিয়ে এলেন। পরম মমতায় বলরামের পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, 'দেখ বলরাম, কেউ কারও খোদা বা ভগবান নয়। মানুষের উছিলায় আল্লাহর রহমত নেমে আসে। তোমার ছেলে না পড়ে ঘরে বসে ছিল; আমরা তাকে পড়বার একটু সুযোগ করে দিলাম, এই যা।'

'আপনাদের ঋণ আমি কুনুদিন ভুইলব না হুজুর।' বিনীত গলায় বলল বলরাম।

ছোবান মেম্বার দেখলেন– তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। এই সময় নিজেকে জাহির করা দরকার। তাচ্ছিল্যের কণ্ঠে বললেন, 'ঋণটিন কিছু নারে বলরাম। স্কুলে ফ্রি দেওয়ার সিস্টেম আছে, তাই তোর ছেলেকে ফ্রি দেওয়া

হচ্ছে। আর তুই তো নিজকানেই শুইনলি– স্কুলে সিক্সের দুই সেট বই পইড়ে আছে। তোরা সিডিউল কাস্ট। এই বই তোদের পাওয়ার অধিকার আছে। তাই তোর ছেলে এক সেট পাবে।'

বলরাম এবার দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এই খবর তো আপনি জানতেন হুজুর। আমার ছেলের খবরও জানতেন। যেদিন পাঙাশ মাছের কথা বললেন, সেইদিনই আমার ছেলের পাসের কথা বইলেছিলাম আপনাকে। কই, সেদিন তো কিছু বলেন নাই? আজকে এনারা সেই খবর নিয়া আমার কাছে আইছেন। এনাদের কাছে তো আমার হাজার বার ঋণ।'

এমদাদ মিয়া দেখলেন– যে অপমানের জবাবটা তার দেওয়ার কথা, তা বলরাম দিয়ে দিল। এই মুহূর্তে তার আর কিছু না বলাই ভালো। তিনি করুণার চোখে ছোবান মেম্বারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সত্যব্রত চক্রবর্তী বুঝলেন– পরিবেশ ভারি হয়ে উঠেছে। হালকা করা দরকার। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'যাকে নিয়ে এত কথা, সেই দিবাকর কোথায়? তাকে ডেকে আনেন বলরামবাবু।'

বলরাম পেছন ফিরে দু'চার কদম সামনে এগিয়ে গেল। গলা একটু উঁচু করে বলল, 'দিবাকর, অ দিবাকর। একটু এইদিকে আয় তো বাপ।'

দিবাকর এগিয়ে এলে হেডস্যারের কাছে নিয়ে গেল বলরাম। প্রণাম করার আগেই দিবাকরকে কাছে টেনে নিলেন সত্যব্রতবাবু। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'তাহলে বলরামবাবু, অই কথা। কালকে দিবাকরকে স্কুলে নিয়ে আসুন।'

বলরাম বলল, 'আমার ঘরে বসতে দেওয়ার মতো তেমন কিছু নাই হুজুর। তাই বসাইতে পারি নাই আপনাদের। মাফ কইরে দিবেন।'

বলরামের এই কথার কোনো জবাব না দিয়ে চারজনই পেছন ফিরলেন।

বলরাম চুলার কাছে এলে ঠাকুমা বেদম আনন্দে ফেটে পড়ে বলল, 'কী, বলছিলাম না রাম– ঈশ্বররে ধরি রাখ, দিবাকরের টাকা ভগমানে জোগাইব। জোগাইল তো এখন? আয় আয় নাতি, আমার কাছে আয়। তোর কপালে একটা চুমা খাই।'

দুই

পরদিন দিবাকর পতেঙ্গা হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেল, সিক্সে। বলরামই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। টাকা-পয়সা কিছুই দিতে হয়নি। শুধু নামটা সই করতে হয়েছে ফরমে। স্বাক্ষর করতে দেখে হেডস্যার বললেন, 'নিজের নাম লিখতে পারেন নাকি বলরামবাবু?'

কাঁচুমাচু বলরাম বলল, 'আমারে আপনি বললে বড় লজ্জা পাই হুজুর। আমারে তুমি বললে খুব আনন্দ পাব।'

হেডস্যার স্মিতমুখে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'হুজুর, কিছুদূর পড়ালেখা করছিলাম। বাপটা মারা যাওয়ায় বেশিদূর পড়তে পারি নাই।' বলরাম বলল।

'তা ভালো ভালো।' বলে সত্যব্রতবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন।

ছোট্ট একটি রুমে বসেন তিনি। ঠেলেঠুলে একটা টেবিল ও তিন চারটে চেয়ার বসানো হয়েছে। সব শিক্ষক একসঙ্গে এক রুমে বসেন। অন্যরা এখন ক্লাসে গেছেন। তাই রুমে এখন সত্যব্রতবাবু আর বলরাম-দিবাকর ছাড়া আর কেউ নেই। দিবাকরের সর্বাঙ্গে ভালো করে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সত্যব্রতবাবু। তারপর বলরামের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'দেখ বলরাম, যুগ যুগ ধরে তোমরা তুই-তোকারি, গালিগালাজ শুনে আসছ। তোমাদের কাছ থেকে ভালো আর বড় মাছগুলো ছলেবলে হাতিয়ে নিচ্ছে ওরা। তোমরা এসব অন্যায়কে ঈশ্বরের বিধান বলে সহ্য করে আসছ। এসব ঈশ্বরের বিধানটিধান কিচ্ছু না। এর জন্য দায়ী তোমাদের প্রতিবাদহীনতা।'

হেডস্যারের সকল কথা বলরাম ভালো করে বুঝতে পারছে না। বোকা বোকা চাহনি নিয়ে হেডস্যারের কথা শুনে যাচ্ছে শুধু। হেডস্যার তা বুঝতে পারেন; এর চেয়ে আর কীভাবে সহজ করে বলতে হয়, তা তার জানা নেই। এই অশিক্ষিত, দরিদ্র জেলেটির সঙ্গে তার বিদ্যাবুদ্ধির যে আসমান-জমিন ফারাক! নিজেকে ভেতরে ভেতরে গুছিয়ে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, 'এই অপমানের, এই বঞ্চনার প্রতিশোধ নিতে হবে তোমাদের।'

'পতিশোধ!!' বিস্মিত বলরাম তাড়াতাড়ি বলল।

'হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে হবে। তবে মারপিঠ করে নয়; কৌশলে।' কোমল দৃষ্টিতে দিবাকরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সত্যব্রত চক্রবর্তী। বললেন, 'তোমাদের বাহুবল নাই, বুদ্ধিশুদ্ধিও কম। সহজ-সরল মানুষ তোমরা। অর্থবলও নাই তোমাদের। মেম্বারদের মতো অমানুষদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে হবে বিদ্যাবল দিয়ে।'

'মাইনে বুঝতে পারছি না হুজুর।' সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলরাম বলে।

'তোমার ছেলে দিবাকর যখন লেখাপড়া শিখবে, বিএ-এমএ পাস করে কোনো অফিসের বড়সাহেব হবে, তখন ছোবান মেম্বারদের মতো মানুষরা তোমাকে, তোমাদেরকে কথায় কথায় আর গাল দেওয়ার সাহস করবে না। বড় মাছটি কেড়ে নেওয়ার হিম্মত হারাবে তখন ওরা। কারণ, তারা জানবে– নিরীহ জেলেদের পেছনে দিবাকরদের মতো শিক্ষিতরা আছে।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেলেন হেডস্যার। বলে তাঁর হুঁশ হলো। বললেন, 'জানি, আমার সব কথা তোমরা বুঝে উঠতে পার নাই। এখন না হলেও পরে একদিন বুঝবে।' তারপর স্নিগ্ধ চোখে দিবাকরের দিকে তাকালেন সত্যব্রতবাবু। বললেন, 'বুঝেছ দিবাকর। লেখাপড়া করতে হবে। অ-নে-ক লেখাপড়া করতে হবে তোমাকে। পাল্টে দিতে হবে জেলেপল্লীর চেহারা।'

বারো বছরের ছেলে দিবাকরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হেডস্যারের কথাগুলো তার ভেতরে হাতুড়ির আঘাত করে যেতে লাগল। বলরাম নিজেকে নতুন করে দেখতে শুরু করল। সত্যিই তো, বংশানুক্রমে এতটি বছর তারা মুখ বুজে হিন্দু-মুসলমানের অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করে এসেছে। কথায় কথায় জাইল্যা-ডোম বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। ঘরে আসন পেতে বসতে দেয়নি কোনোদিন। নৌকা থেকে পাঙাশ মাছটি, ইলিশ মাছটি, কোরাল মাছটি হাতে ধরে নিয়ে গেছে, দাম চাইবার সাহস করেনি। কখনো বা দাম চাইলে ছাতার বাঁট দিয়ে মাথায়, গায়ে বাড়ি মেরেছে। এসব অত্যাচারের কোনোই তো প্রতিবাদ করেনি তারা। প্রতিবাদ করবার কথা মনেই আসেনি কোনোদিন। আজকে, এই মানুষটি তার ভেতরের সুপ্ত অপমানিত-বলরামকে জাগিয়ে দিলেন।

ছেলেকে আর পড়াবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে কী ভুলটাই না করেছিল বলরাম! না পড়ালে কী হতো দিবাকর? দাতারাম, অমরকৃষ্ণ, ক্ষীতিশের ছেলেদের মতো একজন হতো। ওদের ছেলের মতো দিবাকর মাথায় একটু উঁচু হলে তার সঙ্গে সমুদ্রে মাছ মারতে যেত– এই তো। ঈশ্বর বড় বাঁচা বাঁচিয়েছেন– হেডস্যার, চেয়ারম্যান সাহেবের মতো মানুষরা তার উঠানে

গেছেন। হেডস্যারের কাছাকাছি না এলে জেগে ওঠবার এইসব কথা, প্রতিশোধ নেওয়ার কথা তাকে কে শোনাতেন? ঠিকই তো; প্রতিশোধ নিতে হবে। দিবাকরকে দিয়ে অপমানের বদলা নিতে হবে।

দিবাকর প্রতিদিন স্কুলে যায়-আসে। পাঞ্জাবি-পাজামায় কী সুন্দর দেখায় তাকে! মা যোগমায়া আড়চোখে তাকায় ছেলের দিকে। সোজা চোখে তাকায় না। শাশুড়ি বলেছে– আপন ছেলেমেয়েদের দেখতে সুন্দর লাগলে তাদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে নেই। তাতে নজর লাগে। আপনজনের নজর বড় সাংঘাতিক। সন্তানের খুব ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তখন। বলে, 'বুঝলা বউ, নিজ সন্তানের দিকে পূর্ণ চোখে তাকাইও না কোনোদিন। ঠাকুর রাগ করে। বলে– তোরে সুন্দর পোলামাইয়া দিছি অন্যজনে দেখবার জইন্য, তুই দেখস ক্যান?' সেইজন্য দিবাকরের দিকে আড়চোখে তাকায় যোগমায়া। পান্তাভাত খেয়ে দিবাকর স্কুলের দিকে যখন রওনা দেয়, ছেলের নিকটে যায় যোগমায়া। দিবাকরের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুলে ছোট্ট একটা কামড় দিয়ে থু থু করে থুতু ছিটায় দিবাকরের গায়ে। বলে, 'মা কালী, আমার ছেলেরে ভূতপেরতের কুনজর থেইকে বাঁচাইয়া রাইখো।'

দিবাকর অবাক হয়ে মায়ের কাণ্ড দেখে। সে অবাক চোখে আরও অনেক কিছু দেখে– পিঁপড়ার সারি দেখে, বাঁশঝাড়ের মাথায় বকের বাচ্চা দেখে, টুনটুনি পাখি দেখে, বেজি দেখে, কলমিঝোপের ওপর ডাহুকের ঝটপট ওড়াউড়ি দেখে, আর দেখে নানা রকম গাছ।

পতেঙ্গা হাইস্কুলটি জেলেপল্লী থেকে দেড় মাইল দূরে। মেটে রাস্তার দুই পাশে ঝোপঝাড়, মাদার গাছ, ভাদিগাছ, নানা কিসিমের ঘাস। জেলেপাড়ার মানুষজনই এই রাস্তা দিয়ে হাঁটে বেশি। ভদ্রপাড়ার হিন্দু-মুসলমানকে এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয় না। কোনো প্রয়োজন না থাকলে হাঁটবে কেন তারা? জেলেপল্লীতে তাদের কোনো কাজ নেই। তারা তাই এই রাস্তাটি মাড়ায় না। দিবাকর এই রাস্তা দিয়ে নিত্য দু'বার করে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে সে গাছ দেখে, ঘাস দেখে, ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু দেখে। আর দেখে কেয়াফুলের ওপর প্রজাপতির ওড়াউড়ি। দিবাকর ভাবে, কেয়াফুল দিয়ে প্রজাপতির কাজ কী? কেয়াফুল দিয়ে তাদেরই তো যত কাজ-কারবার। কোনো কোনো বিকেলে পাড়ার আরও দু'একজন মিলে কেয়াফুল ছেঁড়ে। কেয়া ফুলে খুব সুবাস। ফুলরেণুগুলো হলদে ধরনের পাউডারের মতো। জেলে পরিবারে পাউডার তো কেনা হয় না কোনোদিন। তাই ফুলের রেণু দেখে মুখে পাউডার লাগাবার ইচ্ছে জাগে সকলের। তারা শুনেছে– কেয়াফুলের রেণু পাউডারের মতো মুখে লাগালে খুব সুন্দর দেখায়। দিবাকরও সেই রেণু মুখে মাখে। বন্ধুরা খলখলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'দিবাকররে, তোমারে খুব সোন্দর লাগছে, একেবারে মাইয়াপোয়ার মতো।' শুনে দিবাকর খুব লজ্জা পায়। ভাবে– সত্যি কি সে দেখতে মেয়ের মতো? সবাই তাকে সুন্দর বলে। সে যে দেখতে একটু সুন্দর তা সে মানে। কিন্তু ফুলরেণু মুখে মাখার পর তাকে দেখতে মেয়েদের মতো লাগবে কেন? বন্ধুরা বুঝি আর উদাহরণ খুঁজে পেল না! তার খুব অভিমান হতে থাকে। কিন্তু সেই অভিমান সে বন্ধুদের দেখায় না। হাসি হাসি মুখ করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রজাপতিরা মধু খায়। কিন্তু কেয়াফুলে তো প্রজাপতি খাওয়ার মতো মধু নেই। ফুলরেণুও তো মুখে মাখবে না তারা। তারপরও ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি কেয়াফুলগুলো ঘিরে উড়তে থাকে কেন ? এই রহস্যের কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পায় না দিবাকর।

ওই যে কালো কালো পিঁপড়ারা সারি বেঁধে রাস্তার এপার থেকে ওপারে যায়, যায় কোথায় তারা? কোথাও নিমন্ত্রণ আছে তাদের? না তারা যুদ্ধে যাচ্ছে? ওপারের কোনো জায়গায় কোনো পিঁপড়েবউকে কি কোনো দস্যুপিঁপড়া লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে? সেই পিঁপড়েবউকে উদ্ধার করতে যাচ্ছে তারা? বাপের কাছে রাম-সীতা-রাবণের কাহিনী শুনেছে দিবাকর। একটু একটু করে যখনই সময় পেয়েছে বলরাম, দিবাকরকে রামায়ণকাহিনী শুনিয়েছে। বলেছে– রাম বড় অভাগা। সদ্য বিয়ে করেছে। জনক রাজার হিমালয়ের মতো ভারী প্রকাণ্ড ধনুকটি ভেঙে জানকিকে বিয়ে করল রাম। বউকে নিয়ে সুখে ঘর করার কথা রামের। কিন্তু সৎমা বলে কথা। পিতা দশরথ অযোধ্যার রাজা। তিন বউ তাঁর– সুমিত্রা, কৌশল্যা ও কৈকেয়ী। সুমিত্রার দুই ছেলে– লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। কৌশল্যার গর্ভে রাম ও কৈকেয়ীর পেটে ভরত জন্মায়। সব ভাইয়ের মধ্যে রাম বড়। রাজা দশরথের পরে অযোধ্যার রাজা হবার কথা রামেরই। কিন্তু কৈকেয়ী তা হতে দেবে না। বৃদ্ধ অসহায় দশরথকে কৈকেয়ী বাধ্য করল নিজ পুত্র ভরতকে পরবর্তী রাজা হিসেবে ঘোষণা করতে। পুত্রকে শত্রুমুক্ত করতে রামকে চৌদ্দ বছরের বনবাসে পাঠাল কৈকেয়ী। বনবাসে রাম যাবে তো লক্ষ্মণও যাবে। লক্ষ্মণ যে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে রামকে। আর সীতা তো স্ত্রী। স্বামী যেখানে স্ত্রীও সেখানে। রামকে একা বনবাসে যেতে দেবে না সীতা। সেও সঙ্গে সঙ্গে চলল। অনেক বন-অরণ্য, নদী-সরোবর, পাহাড়-টিলা পেরিয়ে অবশেষে তারা ঠাঁই নিল পঞ্চবটী বনে। এইখানে কথা থামিয়ে বলরাম দিবাকরকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'পঞ্চবটী মাইনে কী দিবাকর?'

দিবাকর চটজলদি উত্তর দিয়েছিল, 'পাঁচটা বটগাছ যে বনে, তাকেই তো পঞ্চবটী বন বলে। তাই না বাবা?'

"নারে বাবা, তুমি যেরকম ভেইবেছ ব্যাপারটা তা নয়। পঞ্চবটী মাইনে পাঁচটি বটগাছ নয়। পাঁচ রকমের গাছ বুঝাতেই 'রামায়ণে' পঞ্চবটী বলা হয়েছে।"

'কী কী গাছ বাবা?' দিবাকর জিজ্ঞেস করেছিল।

বলরাম ছেলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলেছিল, 'গাছগুলো হলো– অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, আমলকী ও অশোক। যাক গে, আসল কথা শুন।' বলে মূলকথায় ফিরে গিয়েছিল বলরাম।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণ সেই বনে অনেকটা বছর কাটাল । এক বিকেলে শূর্পণখা এসে উপস্থিত হলো রামের কুটিরের সামনে। শূর্পণখা রাক্ষসী, রাবণ রাজার বোন। তো এই রাক্ষসী রামের সঙ্গে দেখা করতে চায়। লক্ষ্মণ কিছুতেই দেখা করতে দেবে না। দেবে কী করে, বড় ভাই এবং বউদির নিরাপত্তার দায়িত্ব যে তার ওপর। এই রাক্ষসী যদি দাদা-বউদির কোনো ক্ষতি করে? শূর্পণখা রেগে গেল। অনেক কথাকাটাকাটি হলো দু'জনের মধ্যে। একপর্যায়ে সীতাকে খেয়ে ফেলবার জন্য শূর্পণখা ধেয়ে গেল। লক্ষ্মণের মাথা গরম হয়ে গেল। 'তবেরে রাক্ষসী' বলে খড়্গ হাতে শূর্পণখার দিকে ছুটে গেল লক্ষ্মণ। খপাখপ কোপ মেরে শূর্পণখার নাক-কান কেটে ফেলল। শূর্পণখা নাকিসুরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মঁানুষের বেঁটা, দেঁখাচ্ছি মঁজা তোঁকে। কাঁর নাঁক-কাঁন কাঁটলি তুঁই জাঁনিস না। আঁরে বেঁটা, আঁমি রাঁবণের বোঁন। যাঁর নাঁম শুঁনে দেঁবতারাও কেঁপে ওঁঠে, যেঁ তুঁড়ি মেঁরে ত্রিঁভুবন জঁয় কঁরে, সেঁই রাঁবণের সঁহোদরা আঁমি।'

কাঁদতে কাঁদতে লঙ্কায় ফিরে গেল শূর্পণখা। গিয়ে মিথ্যে-টিথ্যে বলে রাবণকে চেতাল। বলল– দাদা, আমি পঞ্চবটী বনে বাতাস খেয়ে বেড়াচ্ছিলাম। ওই সময় কোত্থেকে এক মানুষের ছাওয়াল এসে আমার নাক-কান কেটে নিল। আর সে কী গালিগালাজ! বলে কিনা– লঙ্কার রাজা আবার একটা রাজা নাকি? রাক্ষসের জাত তোরা। মানুষের চেয়েও অধম। তোরা আমাদের পায়ের চটি বইবার যোগ্যতাও

রাখিস না।

বোনের কথা শুনে রাবণের চক্ষু তো চড়কগাছ। সামান্য মানুষ, হীনশক্তির মানুষ এ রকম কথা বলতে পারে রাক্ষস জাতি সম্পর্কে? তাকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারে? তো রাবণের মাথা যখন রাগে গুলিয়ে গেল, ওই সময় শূর্পণখা আস্তে করে রাবণের কানে এই কথাটি বলল– দাদা, ওই মানুষের বাচ্চা দুইজনের সঙ্গে একজন নারীও আছে। খুবই সুন্দরী। তোমার রাজপ্রাসাদেও সেরকম সুন্দরী নারী নাই। বোনের কথা শুনে রাবণের চোখ-মুখ চকচক করে উঠল।

এক বিকেলে রাবণ মামা মারীচকে পাঠিয়ে দিল পঞ্চবটী বনে। বলল, 'সোনার হরিণ সেজে রাম-লক্ষ্মণকে দূর পাহাড়ের ওপারে নিয়ে যাবে মামা।'

যেই আদেশ, সেই কাজ। মারীচ রাম-লক্ষ্মণকে সাতপাহাড়ের ওপারে নিয়ে গেলে রাবণ সন্ন্যাসীবেশে সীতাকে অপহরণ করল। লঙ্কার অশোকবনে বন্দি করে রাখল সীতাকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রাম জানতে পারল– রাক্ষস রাজা রাবণই তার বউকে হরণ করে নিয়ে গেছে। এত বড় অস্পর্ধা রাবণের? সবংশে নিধন করে রাবণের হাত থেকে বউকে উদ্ধার করে আনতেই হবে। কিন্তু কীভাবে? উপায় খুঁজে বের করতে পারে না রাম-লক্ষ্মণ। দিশেহারা অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে রাম-লক্ষ্মণ কিস্কিন্ধ্যা নগরে উপস্থিত হলো। কিস্কিন্ধ্যা কপিরাজা বালীর রাজধানী। রাজা সমেত এ দেশের সকল অধিবাসী বানর। বালীর সঙ্গে আবার তার ভাই সুগ্রীবের আড়াআড়ি সম্পর্ক। মহারাজ বালী রাজ্য থেকে সুগ্রীবকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্যশাসন করছিল। কিস্কিন্ধ্যার অরণ্যে সুগ্রীবের সঙ্গে রামের দেখা। বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজা হবার সুযোগ করে দিলে সীতা-উদ্ধারে সহায়তা করবে সুগ্রীব– এই শর্তে রাম নিরপরাধ বালীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল।

পরে বানরসৈন্য নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করল রাম-লক্ষ্মণ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর রাবণকে হত্যা করে সীতাকে উদ্ধার করেছিল রাম।

পিঁপড়ার সারি দেখে এইসব কথাই ভাবছিল দিবাকর। পিঁপড়ার মতো সারি বেঁধেই তো একদিন লঙ্কা আক্রমণ করেছিল বানরসৈন্যরা। পিঁপড়েসৈন্যরাও নিশ্চয় কোনো পিঁপড়েরামের বউকে উদ্ধার করতে যাচ্ছে।

এই রকম ভাবতে ভালো লাগে দিবাকরের। এই রকম ভেবে ভেবেই তার দিন কাটে, রাত কাটে। রাতে ঠাকুমার সঙ্গেই শোয় সে। মাটির মেঝেতে চাটাইয়ের বিছানা। শীতকালে সেই চাটাইয়ের নিচে খড়। ঠাকুমা বলে বইজ্যাল খের। রমজান কসাইয়ের খামার থেকে চেয়েচিন্তে খড় নিয়ে আসে ঠাকুমা। কঠিন শীতে বিছানার নিচে বিছিয়ে দেয়।

ঠাকুমার সঙ্গে না শুলে ঘুম আসে না দিবাকরের।

দিবাকরের একটু বুদ্ধি বাড়লে আলাদা শোয়ার ব্যবস্থা করেছিল ঠাকুমা। অর্ধেক রাতে দেখে– নিজ বিছানা ছেড়ে



দিবাকর গুটিসুটি মেরে ঠাকুমার বুকের কাছে শুয়ে আছে। সেই থেকে ঠাকুমার সঙ্গেই তার থাকা, পাকাপাকিভাবে।

ঠাকুমা বলে, 'দেখ দিবাকর, সারাদিন মাছ বেচি। খাড়াং থেইকে পচা মাছের পানি টপাটপ পরনের কাপড়ে পড়ে। সেই কাপড় পরেই শুই আমি। আমার গা থেইকে, কাপড় থেইকে মাউছ্যা মাউছ্যা গন্ধ। আমার সয়ে গেছে। তোর তো অসুবিধা রে বাবা।'

'আমার কোনো অসুবিধা নাই।' ঠাকুমার আঁচলে মুখ গুঁজে বলে দিবাকর। 'তোমার গন্ধ না পেলে ঘুম আসে না আমার।'

'মাইনে মাছের গন্ধ তোকে পেতেই হবে! তুই তো জমিদারবাড়ির মাছওয়ালির মতো হলিরে দিবাকর।' ঠাকুমা বলে।

গল্পের গন্ধ পেয়ে ছট করে বিছানায় উঠে বসে দিবাকর। বলে, 'বলো না ঠাকুমা, কোন জমিদারবাড়ির মাছওয়ালি?'

'আজ থাক। আজ খুব কেলান্ত লাইগছে। কাইল বইলব।' ইচ্ছে করে ঠাকুমা বলে।

'না ঠাকুমা, না। আজকেই তোমাকে বলতে হবে। না হলে আমার ঘুম আসবে না।'

এইভাবে দিবাকর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অতীতের অনেক কাহিনী জেনেছে। চাঁদ সওদাগরের কাহিনী, মা-মনসার গল্প, মা-গঙ্গা আর ভীষ্মদেবের কাহিনী। ঠাকুমা যেন আস্ত একটা গল্পের ভাণ্ডার। কী সুন্দর করে যে অতীতকাহিনী বলে ঠাকুমা!

ঠাকুমা বুঝল– মাছওয়ালির গল্পটি না বললে দিবাকর তাকে সারারাত ঘুমাতে দেবে না। গল্পটি শুনেই সে শান্ত হবে। শেষ পর্যন্ত গল্পটি বলতে বাধ্য হয় ঠাকুমা।

এক জেলেপল্লীতে থাকে ভাগ্যরানি। নাম ভাগ্যরানি হলে কী হবে, দুর্ভাগ্য সারাজীবন তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। সোয়ামির নাও-জাল ছিল একসময়। ভারে ভারে মাছ আসত উঠানে। আশ্বিনের ঝড়ে গহিনগাঙে নৌকাটি উল্টে গেল। স্বামী-পুত্র দু'জনেই স্রোতের টানে কোথায় যে ভেসে গেল, কেউ বলতে পারল না। বেশ কিছু বছর কেটে গেল। ভাগ্যরানি বুঝতে পারল– বিধবা হয়েছে সে। কী আর করা– সহায়সম্পত্তি বেচে বেচে পেট চালাল কিছুদিন। তারপর নামল মাছ বেচতে। বেঁচে তো থাকতে হবে। বহদ্দারদের কাছ থেকে মাছ কিনে হাটে-পাড়ায় বেচে। বড় কষ্টের জীবন তার। অসুখ-বিসুখে ঘরের দাওয়ায় পড়ে থাকে। দেখার কেউ নেই। অনন্তবালার পুতের বউটি এসে মাথা ধুইয়ে দেয়, কবিরাজি ওষুধটা মুখের কাছে তুলে ধরে। এইভাবেই জীবন চলে ভাগ্যরানির। অনন্তবালার পুত্রের বউটি একদিন বলে, 'অ মাসি, শুনছি গাঁয়ের জমিদারবাবুর খুবই দয়ার শরীল। তো তুমি একদিন যাও না মাসি তার কাছে। গিয়ে কিছু সাহায্য-টাহায্য চাও।'

বউটির কথা খুব মনে ধরল ভাগ্যরানির। কিন্তু জমিদারের সঙ্গে তো আর খালি হাতে দেখা করা যায় না। হাজার হলেও এই গাঁয়ের জমিদার। তার তো আলাদা একটা ইজ্জত-সম্মান আছে। ভাগ্যরানি করল কী, মস্তবড় একটা রুই মাছ কিনে নিল জীবন বহদ্দারের কাছ থেকে। খাড়াঙে মাছটি ভরে মাথায় নিয়ে জমিদারের কাছারিতে উপস্থিত হলো ভাগ্যরানি। সে সন্ধ্যায় জমিদারের মন ভালো ছিল। কলকাতা থেকে খবর এসেছে– তাঁর ছেলের ঘরে নাতি হয়েছে। জমিদারের বড় ছেলেটি কলকাতা শহরে থাকে কি-না।

রুই মাছটি দেখে জমিদারবাবু খুব খুশি হলেন। অনেক দিন এত বড় রুই মাছ দিয়ে ভাত খাননি। 'এত বড় মাছ পেলে কোথায় তুমি?' প্রীতচোখে জমিদার জিজ্ঞেস করলেন।

ভাগ্যরানি বলল, 'আমার নাম ভাগ্যরানি। ওই যে দুইগ্রামের ওপারে জেলেপাড়াটি, ওখানেই থাকি আমি। জমিদারমশাই আমি অতি গরিব জেলেনি। আপনার দয়া চাইতে এসেছি।' এর পর জীবনের সকল প্রকার ভাগ্য-দুর্ভাগ্যের কথা জমিদারবাবুকে খুলে বলল ভাগ্যরানি।

ভাগ্যরানির সব কথা শুনে জমিদার বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এত দূর থেকে এসেছ, আজ রাতটা থেকে যাও। দেখি সকালে তোমার জন্য কী করতে পারি।' প্রধান দাসীকে ডেকে বললেন, 'ভাগ্যরানিকে নিয়ে যাও ভেতরে। ভালো একটা ঘরে শুতে দেবে আজ রাতে। আর দেখ, ওর খাওয়া-ঘুমানোতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। আর হ্যাঁ, এই মাছটি গিন্নিমার কাছে নিয়ে যাও। ম-মসলা দিয়ে উত্তমরূপে রাঁধতে বলো। রাতের খাবারটা যাতে তৃপ্তি নিয়ে খেতে পারি।

প্রধান দাসী ভাগ্যরানিকে ভেতরবাড়িতে নিয়ে গেল। রাতে খেলোদেলো ভাগ্যরানি। দাসী সুন্দর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে শুতে দিল। বিছানার চাদর ধবধবে সাদা, দরজা-জানালায় রঙিন পর্দা। আহা, বালিশটা কী তুলতুলে! শিমুল তুলার বালিশ। সারাজীবন ধরে ছেঁড়া কাপড়চোপড় দিয়ে তৈরি তেল-চিটচিটে বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে ভাগ্যরানি। বিশাল বিছানার মাঝখানে একটা লম্বাটে ধরনের বালিশও দেখা যাচ্ছে। দাসী বলল, কোলবালিশ ওটা। আচ্ছা, কোলবালিশ কী? মানুষ তো বালিশে মাথা রাখে। কোলবালিশে কী রাখে? কোনো দিশা পায় না ভাগ্যরানি। বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করে। কী রকম যেন একটা মধুর গন্ধ ঘরজুড়ে! যেন গোলাপের সুবাস, যেন আতরের মোহন একটা গন্ধ ঘরের বাতাসে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। কিছুতেই ঘুম আসে না ভাগ্যরানির চোখে। একটা কিসের যেন অভাব! কী যেন একটা নেই ঘরের মধ্যে! ফুল-আতরের গন্ধ নাকে লাগলেই তার তন্দ্রা কেটে কেটে যাচ্ছে। অনেকটা রাত পেরিয়ে গেলে ভাগ্যরানি বুঝতে পারল– অভাবের বস্তুটা কী।

ভয়ে আর অস্বস্তিতে এত রাত পর্যন্তও ঘরের আলো নেভায়নি ভাগ্যরানি। আলো জ্বলতে দেখে প্রধান দাসী এসে জিজ্ঞেস করল, 'এখনো ঘুমাওনি তুমি? ঘুমাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে তোমার?'

ভাগ্যরানি উকুনেভরা কাঁচাপাকা চুলের মাথাটি চুলকে বলল, 'হ ঘুমাই নাই। ঘুমাইতে পারতেছি না।'

'কেন, কেন ঘুমাতে পারছ না?' ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল দাসী। ভাগ্যরানির দেখভালের দায়িত্ব যে তাকেই দিয়েছেন জমিদার মশাই।

'ঘুমাইতে আমার একটা জিনিস লাইগব। ওইটা আনলেই ভালা করি ঘুমাইতে পাইরব।' ভাগ্যরানি বলে।

উৎসুক দৃষ্টিতে প্রধান দাসী জিজ্ঞেস করে, 'কী জিনিস?'

'আমার মাছের খাড়াঙটা।'

'খাড়াং মানে?'

'ওই যে তোমরা চুপড়ি না টুপড়ি বলো যাকে, ওটাকে আমরা খাড়াং বলি। আরে বাবা, যেইটার মইধ্যে ভইরে রুই মাছটা আনলাম।'

'তা খাড়াং দিয়ে কী করবে তুমি?'

'বাবা, তোমাকে আইনতে বইলছি, আন না খাড়াঙটা।'

প্রধান দাসী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর মেছোগন্ধমাখা বহুব্যবহৃত জীর্ণ খাড়াঙটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। নিমেষেই ঘরের পরিবেশ পাল্টে গেল। কোথায় গেল গোলাপ আর আতরের গন্ধ! ঘরজুড়ে মাছের আঁশটে গন্ধ ভুরভুর করতে লাগল। দাসী আঁচল দিয়ে দ্রুত নাকচাপা দিল। ভাগ্যরানি জোরে একটা পরিতৃপ্তির শ্বাস টানল। তার চোখেমুখে গভীর আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল।

প্রধান দাসী অনেকটা কঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খাড়াঙটা কোথায় রাখব?'

ভাগ্যরানি সুখী সুখী চেহারা করে বলল, 'আমার শিয়রের পাশে রাখ।'

প্রধান দাসী ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচল। ঘরজুড়ে তখন ভুরভুরে মেছো গন্ধ। অল্প সময়ের মধ্যে ভাগ্যরানি গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। কখন রাত কাবার হয়ে সূর্য উঠল বুঝতে পারল না ভাগ্যরানি!

হি হি হো হো করে হেসে উঠল দিবাকর। বলল, 'মাছের গন্ধ ছাড়া ভাগ্যরানির চোখে ঘুম আসেনি। সুন্দর গন্ধ তার সহ্য হচ্ছিল না। ঘুমাতে তার মাছের গন্ধ চাই-ই চাই। এই তো?'

'ঠিক ধইরেছিস ভাগ্যরানি।' সুমধুর হেসে ঠাকুমা বলল।

'ভাগ্যরানি! ভাগ্যরানি কাকে বলছ ঠাকুমা?' অবাককণ্ঠে জিজ্ঞেস করে দিবাকর।

'আর কাকে? তোকে। তুই তো এই পাড়ার ভাগ্যরানি। ঠাকুমার গায়ের মাছের গন্ধ শুঁকতে না পারলে তোর তো ঘুম আসে না।' হাসিকে পেটের মধ্যে চেপে রেখে বলে ঠাকুমা।

'ঠাকুমা...।' বলে ঠাকুমাকে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে দিবাকর।

ঠাকুমা দিবাকরের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মমতা মাখানো গলায় বলে, 'ঘুমা ঘুমা। এবার ভালো করে ঘুমা দিবাকর।'

দিবাকরদের ছনে-ছাওয়া ঝুঁকেপড়া বাড়িটির পেছনে বড় একটা পুকুর। সেই পুকুরটা দিবাকরদের। দক্ষিণপাড়ে পাশাপাশি দুটো খেজুরগাছ ফেলে ঘাটলা বানানো হয়েছে। সেই ঘাটলায় পাড়াপড়শিরা গা-গতর ধোয়, জাল-দুইজ্যা পরিষ্কার করে, কাপড়চোপড় কাচে। উত্তরপাড়টা দিবাকরদের ব্যবহারের জন্য। সেই পাড়ে বড় বড় শিরীষ গাছ, বিরাট একটা শিমুল গাছ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের মধ্যিখানে একটা আমগাছ। সেই আমগাছের অনেক ডালপালা। ডালপালা আবার বাঁশঝাড়ের মাথা ছুঁয়ে আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে কোথা থেকে কোথা থেকে দলে দলে বক এসে বাঁশে বাঁশে বাসা বাঁধে। তাদের কলকলানিতে ঘরে থাকা দায় হয়ে পড়ে তখন। মা বলে, 'লক্ষ্মীছাড়া বগাগুলার জ্বালায় আর থাইকতে পারি না। বগাগুলোর চিল্লাচিল্লিতে কানে তালা লাগার অবস্থা।'

দিবাকর পাশ থেকে বলে, 'মা বগারা চিল্লায় না, ডাকে।'

'দাঁড়াও। তোমার বাবা আসুক, ঝাঁটাইয়া বাইর করমু সবাইকে বাঁশের ঝাড় থেইকে।'

বাবা কিন্তু মায়ের প্রস্তাবে রাজি হয় না। বলে, 'মাস দুয়েকের জন্য এইসেছে ওরা। এই গেরামে কত গাছগাছালি! কোথাও বসে না। আমাদের বাঁশঝাড়ে বাসা বাঁধে। বাচ্চা ফুটাইয়া চইলে যাইবে। তুমি একটু ধৈইয্য ধরে থাক দিবাকরের মা।'

একসময়ে বকেরা ডিম পাড়ে। বাচ্চা ফুটায়। মা-বকের আওয়াজের সঙ্গে বাচ্চা-বকের চিকন আওয়াজ মিশে যায়। মা-বাবা উড়ে যায় দূরে। কিছুক্ষণ পরে ঠোঁটে আধার নিয়ে ফেরে। গলা বাড়িয়ে বাচ্চারা বাবা-মায়ের মুখ থেকে খাবার কাড়াকাড়ি করে। এসব দৃশ্য খুব কাছ থেকে দেখে দিবাকর। যে-দুপুরে স্কুল থাকে না, মা-বাবা-ঠাকুমা ঘুমায় বা কাজে ব্যস্ত থাকে, আমগাছটায় উঠে বসে দিবাকর। মগডালে চড়ে বকদের এইসব কাণ্ড কারখানা দেখে।

গাছে চড়ে আরও অনেক কিছু দেখে দিবাকর। আমগাছটির মগডালে চড়লে জেলেপাড়াটির চারপাশটা স্পষ্ট করে দেখা যায়। পাড়াটির পুবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে বিরান ভূমি। পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর খলবল করে। বড় বড় নীল ঢেউ আছড়ে পড়ে কূলে। সাগর থেকে জেলেপাড়াটি খুব বেশি দূরে তো নয়। উত্তরে-পুবে ধানখেত।

ধানখেতের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ তখন কচি ধানগাছের মাথায়। মাথায় মাথাল দিয়ে চাষিরা উপুড় হয়ে খেতে কাজ করে, কেউ বা হালের পেছনে হেরে থি থি করে চিৎকার দেয়। এই সময় চাষির হাতে থাকে কঞ্চি। গরুর পিঠে দু'একটা বাড়ি মারে। মাঝেমধ্যে লেজ মুচড়ে দেয়। তখন গরুগুলো জোরে জোরে হাল টানে।

এগুলো দেখতে কী যে ভালো লাগে দিবাকরের! ইচ্ছে করে ধানখেতের চাষি হতে। মাঝেমধ্যে ভাবে, গরুগুলোকে মারে কেন চাষিরা? জোরে জোরে হাল টানে না বলে? টানবে কী করে? হাড্ডিসার গরুগুলোর গায়ে শক্তিই বা কতটুকু! সেই ভোরসকাল থেকে হাল টানছে না ওরা?

বউ শানকিতে করে পান্তাভাত, বাসি তরকারি, দুটো পোড়া মরিচ পাঠায়। ওগুলো খেয়ে ঢগঢগ করে এক পেট পানি খায় চাষি। বল ফিরে পায় তারা। বলে না– পেটে দিলে পিঠে সয়। ঠাকুমাই তো কথাটা বলে। আরও কত কী যে বলে ঠাকুমা! বাবা যেদিন সবার জন্য যথেষ্ট ভাত জোটাতে পারে না, দুপুরে মা পাতে কম কম ভাত দেয় আর শাক দেয় বেশি করে, পাশে বসে ঠাকুমা নরম সুরে নাতি-নাতনিদের উদ্দেশে বলে, 'আজকে একটু ভাত কমরে ভাইবোনেরা। রাতে বেশি বেশি হবে। এই বেলা একটু কম খাও। কম খাইলে ক্ষেতি নাই, বেশি খাইলে ক্ষেতি বেশি। শোন নাই –উনা ভাতে দুনা বল, অধিক ভাতে রসাতল। রসাতল বুঝ তো? সর্বনাশ আর কি। বেশি বেশি খাইলে শরীলে নানা রোগবালাই।' ভাত দিয়ে শাক খেতে খেতে ঠাকুমার কথাগুলো শোনে দিবাকররা।

তো চাষি তো কামের মাঝখানে পান্তাভাত খায়, একটু জিরিয়েও নেয়। গরুগুলো কী খায়? সেই রাতে চারপায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেতে খেতে যা দু'চার গোছা খড় চিবিয়েছে। গোটা সকালটা তো উপোস। চাষিবউ দুপুরে চাষির জন্য আবার ভাত-তরকারি পাঠায়। আলে বসে গেরাসে গেরাসে সেই ভাত গেলে চাষি। তো গরু কী গেলে? সেই ভোরসকাল থেকে পশ্চিমে সূর্য-গড়ানো বিকেল পর্যন্ত তো শুধু হেরে থি থি ব ব আর পিঠে কঞ্চির বাড়ি।

এত করেও যদি চাষির মুখ থেকে দু'একটা মিষ্ট কথা শোনা যেত, তাহলে ভালো লাগত গরুদের। না, জমির মাঝখানে একটু থমকে দাঁড়ালে বা একটু ধীরে হাঁটলে কী বিশ্রী বিশ্রী গালাগালি! মালিকের মুখে সেই গালি শুনে গাভীর মুখে গভীর দুঃখের মধ্যেও হাসি দেখা যায়। গরুর সঙ্গে মানুষের অই রকম সম্পর্ক হয় নাকি? হলে তো চাষিবউ রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে যেত। কোন নারীটি আর গাভী সতীনের ঘর করতে চায়? বড় হলে দিবাকর চাষি হবে। গরুদের এরকম করে মারবে না। গালিও দেবে না। বউয়ের পাঠানো খাবার সে যখন আলের ওপর খেতে বসবে, গরুদেরও ঘাস খেতে দেবে তখন।

গাছের ডালে বসে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে থাকতে দিবাকরের বড় ভালো লাগে। ওই তো কাছেই কর্ণফুলী এসে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ভূগোলের শিক্ষক রশিদ স্যার বলেছেন– 'নদী যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মেশে তারে কয় মোহনা। বুইঝোনি তোমরা?' রশিদ স্যারের বাড়ি ভোলার চরভাটায়। আঞ্চলিক ভাষায় মজার মজার কথা বলেন তিনি। 'মোহনা কী বুইঝতে পাইচ্ছোনি তোমরা? মোহনা মাইনে মিলন। অই ছালামত, মিলন– বুঝসনি?' পেছনের বেঞ্চিতে বসা ছালামতকে জিজ্ঞেস করেন রশিদ স্যার।

বোকাসোকা ছালামত উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। রশিদ স্যার আবার বলে উঠলেন, 'তুই কত্তুন উত্তর দিবি? তোর মাথায় ঘিলুটিলু আছেনি কিছু? বেয়াগ্গিন তো গোবর। বেটা তুই কী বুইঝবি মিলনের অর্থ?'

তার পর অন্যান্য ছাত্রের দিকে মুখ ফিরান রশিদ স্যার। মাথার গোল টুপিটা নেড়েচেড়ে জুতসই করে মাথার ওপর আবার বসান। বলেন, 'উৎসবের সময় একজন মানুষের লগে আরেকজন মানুষ কোলাকুলি করে না? সেই বুকের লগে বুক মিলানরে কয় মিলন। অই যে বিয়ের পর নতুন দুলার লগে বিবির যে দেখা হয়, তারে কয় মিলন।' শেষের লাইনটা ডান চোখ ছোট করে বলেন রশিদ স্যার। কী রকম কী রকম হাসি যেন তখন তার চোখেমুখে।

দিবাকর ভাবে– শেষের কথাটি বলবার সময় স্যার চোখ ছোট করলেন কেন? হাসিটা শেয়াল শেয়াল কেন? খারাপ কিছু কি? স্যারের শেষের কথার নিশ্চয়ই অন্য একটা অর্থ আছে। বুঝতে পারে না দিবাকর। রশিদ স্যারের কথায় রাগ করে না কেউ। মজা পায়। ছোটখাটো রশিদ স্যার সারা ক্লাসে নেচে নেচে পড়ান। দু'হাত নাড়িয়ে, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে

পড়া বোঝান তিনি। বলেন, 'একদিন গিয়া দেইখ্যা আসিও মোহনাটা। কী সোন্দর ছোড ছোড ঢেউ খেলে! ফুরফুরে বাতাইস চাইরদিকে।'

একদিন মোহনা দেখতে গিয়েছিল দিবাকর। স্যার যা বলেছিলেন, তার চেয়েও সুন্দর কর্ণফুলী আর বঙ্গোপসাগরের মোহনা।

তো গাছে চড়ে সেই মোহনার দিকে তাকিয়ে থাকে দিবাকর। জোয়ার হলে কর্ণফুলীর পানি ফুলে ওঠে। তখন ভোঁ বাজিয়ে বড় বড় জাহাজ নদীতে ঢোকে। চিমনি দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ে। ওই জাহাজগুলো নিচু নিচু, পানিতে চুবানো। কত জিনিসপত্তর তখন ওইসব জাহাজের পেটে! যেই জাহাজগুলো জেটিতে মাল খালাস করে বেরোয়, তখন ওগুলোকে কী প্রকাণ্ড দেখায়! খোলে মালপত্র নাই বলে গোটা শরীরটা ভেসে থাকে জলের ওপর। জাহাজগুলো যতক্ষণ চোখের আড়াল না হয়, তাকিয়ে থাকে দিবাকর। কোন সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় ওসব জাহাজ? নীল নীল জল। চারদিকে পাহাড় সমান ঢেউ। ওসব ঢেউয়ের মাথায় চড়ে চড়ে দূরদেশে চলে যায় জাহাজগুলো। আহা, নাবিকদের কী আনন্দ! জাহাজের ডেকে হাঁটতে হাঁটতে জল দেখে, বড় বড় মাছ লাফিয়ে উঠতে দেখে। আর দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে গাঙচিল। জাহাজের পেছনে পেছনে ক্যাঁক ক্যাঁক ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে তারা। ওই গাছের ডালে বসেই দিবাকর ঠিক করে– বড় হলে সে নাবিক হবে। নাবিকের ইংরেজি কী যেন?

ওহ্, মনে পড়েছে। একদিন ক্লাসে মিলন স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন। 'নাবিকের ইংরেজি কী জানো?'

ছালামত হাবাগোবা ধরনের। বিদ্যাবুদ্ধি তার তেমন নেই। রশিদ স্যারের মতো সব স্যারই বলেন। দক্ষিণ পতেঙ্গায় বাড়ি তার। দক্ষিণ পতেঙ্গাটা উত্তর পতেঙ্গার চেয়ে অগোছালো। মানুষজন সহজ-সরল। লেখাপড়ায় পিছিয়ে তারা। খেতখামার করে, গাছগাছালির যত্নআত্তি নেয়। ওরকম করেই জীবন কেটে যায় দক্ষিণ পতেঙ্গার লোকদের। উত্তর পতেঙ্গার মানুষজন তাদের তুলনায় চালাকচতুর। হাইস্কুলটাও উত্তর পতেঙ্গায়। ওরা দক্ষিণের মানুষদের বলে– গাছের মানুষ। মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় দক্ষিণের মানুষগুলো। কিন্তু তারা বড় ভালো। মনের দুঃখ মনে চেপে উত্তর পতেঙ্গার লোকদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। ক্লাসেও দক্ষিণের ছাত্রদের প্রতি অবহেলা। শিক্ষকরা যেমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলেন তাদের সঙ্গে, উত্তরের ছাত্ররাও তাদের নিয়ে উপহাস করে। তা সেই দক্ষিণের ছালামত হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, 'সেইলর স্যার।'

মিলন স্যার এমনিতে বাংলা পড়ান ক্লাস সিক্সে। ইংরেজির টিচার বাবুল হক স্যার মাঝেমধ্যে ছুটিতে থাকলে ইংরেজি ক্লাস নিতে আসেন মিলন স্যার। সে সময় নিজের ইংরেজি জ্ঞানটা জাহির করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। আজও বাবুল হক স্যারের ক্লাস নিতে এসেছেন তিনি। ছালামতের উত্তর শুনে চমকে তাকালেন তার দিকে। ওর তো নাবিকের ইংরেজি জানার কথা নয়! কাউ-এর বাংলা গাভী না ষাঁড়, জানে না সে। সে-ই কিনা বলে 'সেইলর'! সেই দিন ছালামতকে বাহবা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন মিলন স্যার।

পরে ছালামতকে দিবাকর জিজ্ঞেস করেছিল, 'নাবিকের ইংরেজি জানলি কী করে ছালামত?'

উদাস ভঙ্গিতে ছালামত বলেছিল, 'আমার বাবা সারেং, তার বাবাও সারেং ছিল। শুনেছি– দাদার বাবা বিদেশি জাহাজে চাকরি করত। নাবিকের বংশধর আমি। আমি জানব না?'

ছালামতের কাছে নিজের জ্ঞানগম্যিটা একটু খাটো হয়ে যাওয়ায় সেদিন তেমন খুশি হননি মিলন স্যার। আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সেইলর বানান করতে পারিস?'

ছালামত অবলীলায় বলেছিল, 'S-a-i-l-o-r।'

কিছুক্ষণের জন্য কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল স্যারের। পরে বলেছিলেন, 'নাবিকের আর কী কী ইংরেজি আছে বল তো?'

বোকাসোকা ছালামত ডানে-বাঁয়ে মাথা নেড়েছিল।

ছালামতের অপারগতায় বেশ খুশি হয়ে উঠেছিলেন মিলন স্যার। উৎফুল্ল চোখে গোটা ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'খাতা-কলম বের করো তোমরা। লিখে নাও সেইলর ছাড়া নাবিকের আর আর ইংরেজি হলো– boatman, navigator. শব্দগুলোর বানান করে দিয়েছিলেন স্যার।

সেদিন মিলন স্যারকে জ্ঞান বিতরণে পেয়ে বসেছিল। বলেছিলেন, 'নৌ শব্দটি থেকে নাবিক শব্দটি এসেছে– নৌ+ইক। নৌ মানে নৌকা। জানো তো? নৌকার আর কী কী প্রতিশব্দ আছে? জান না তো, বলছি। তরণী, তরী, ডিঙি, শালতি। এই নৌকারও আবার নানা ধরন– গহনার নৌকা, পানসি, ডোঙা, ভেলা।' ছাত্ররা উত্তর দেওয়ার আগে গড়গড় করে বলে গিয়েছিলেন মিলন স্যার।

নৌকার প্রতি দিবাকরের বড় দুর্বলতা। তারও নৌকা আছে। তার নৌকাটি পাল তুলে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেয়। হাল ধরে তখন নৌকার পাছায় বসে থাকে সে। দিবাকরদের বাড়িতে বেশ কয়েকটি নারকেল গাছ আছে। নারকেল ফুলের গোছাটা থোড় থেকে বেরিয়ে এলে খোলটা আলাদা হয়ে যায়। প্রথমদিকে হলদেটে খোলটা নরম থাকে। ফুল ফলে রূপান্তরিত হলে খোলের রঙও পাল্টাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত খোলটির রঙ হয়ে যায় ধূসর। শক্ত খোলটি গাছ থেকে কৌশলে কেটে নামায় দিবাকর। তার পর শিরীষ গাছের ছোট ছোট ডাল দিয়ে হাল, দাড়, বাঁকা, কলবাঁশ, মাস্তুল এসব বানায়। ঠাকুমার পুরনো ধুতি কেটে পাল বানায়। নৌকা তৈরি হলে পর দক্ষিণপাড়ে নিয়ে যায়। ঠিকদুপুরে দক্ষিণ দিক থেকেই হাওয়া বয়। ছোট ছোট ঢেউ ওঠে পুকুরজলে। দিবাকর মনপবনের নৌকাটি জলে ভাসিয়ে দেয়। পালে হাওয়া লাগে। পেছনের হালটি জলে ডোবা থাকে। নৌকাটি তরতর করে সোজা উত্তরপাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। মনে মনে তখন দিবাকর নাবিক। তার নৌকাটি যেন মস্তবড় জাহাজ। ভোঁ বাজিয়ে চিমনি দিয়ে গলগলে ধোঁয়া ছেড়ে দিবাকরের জাহাজটি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কার দিকে এগিয়ে যায়। দিবাকর জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে অদৃশ্যমান লঙ্কার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাবার মুখে রামায়ণের কাহিনী শুনে শুনে লঙ্কার জন্য দিবাকরের মনে গভীর টান।

তিন

নতুন বছরের প্রথমে ক্লাস পাল্টে যায় দিবাকরদের। সিক্স থেকে সেভেনে। ভালোই পাস দেয় দিবাকর। ফার্স্ট হয়েছে সে। ঠাকুমার কাছে ফার্স্ট-এর চেয়ে পাস বড়। 'ঠাকুমা, আমি ফার্স্ট হয়েছি' শুনে ঠাকুমা বলে, 'আগে বল পাস করছস কি-না?'

ঠাকুমার কথা শুনে দিবাকর মিষ্টি হাসে। ফার্স্টের অর্থ বাবা বোঝে। মা যোগমায়া দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'মা চণ্ডিকা, তোমার চরণে একজোড়া বড় মোমবাতি মানস করলাম, আমার দিবাকররে বছর বছর পাস করাইও মা।'

সকাল নয়টায় দিবাকরদের স্কুল শুরু হয়। স্কুলের সামনে একটুখানি খালি জায়গা। ক্লাস শুরুর আগে ওইখানে ছাত্ররা সারি করে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর স্কুল শুরু করার নিয়ম। সরকারের কড়া নির্দেশ। জাতীয়

সঙ্গীত হলো একটা দেশের, একটা জাতির বীজমন্ত্র। পাকিস্তানি জাতীয় সঙ্গীত গাইলে সারাদিন আর দেহমনে ক্লান্তি থাকবে না।

দিবাকর বড়দের মুখে শুনেছে– পাকিস্তান রাষ্ট্র এমনি এমনি হয়নি, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এই স্লোগানে ভয় পেয়ে ইংরেজরা কায়েদে আযমের হাতে পাকিস্তানকে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। জওহরলাল নেহরু এবং গান্ধী কি আর বাধা দেননি? জান-প্রাণ দিয়ে বাধা দিয়েছেন। তখন পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানরা ভাই ভাই। ওদের তখন রক্ত গরম। জান দেব, কিন্তু পাকিস্তানকে হিন্দুস্তানের সঙ্গে মিশে যেতে দেব না। এইজন্যই তো স্বাধীনতা। এই জন্যই তো কায়েদে আযম জিন্দাবাদ, আইউব খান জিন্দাবাদ।

এসব কথা দিবাকরের জানার কথা নয়। তফজলের দোকানের সামনে দুপুরছুটিতে দাঁড়ালে এসব কথা শোনা যায়। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বা টুলে বসে গ্রামের বয়স্ক মানুষরা এসব কথা বলে। গান্ধী কে, জওহরলাল নেহরুই বা কে– দিবাকর জানে না। শুনেছে, পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। শুনেছে– এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান। আইউব খানের কারণে পাকিস্তান এখন উন্নতির পথে মোটরগাড়ির গতি নিয়ে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে।

'পাকসার জমিন সাদ বাদ, কিশোয়ারে ন-ন-ন-ন।' গলায় গলা মিলিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গায় দিবাকর। প্রথম দু'চারটা শব্দ মুখস্থ করেছে, শেষের কথাগুলো কিছুতেই মনে থাকে না। অপরিচিত জটিল শব্দ। শুনেছে– এসব শব্দ উর্দু ভাষার। শব্দগুলো মানে দিবাকরের মতো অন্য ছাত্ররাও জানে না। গলার সঙ্গে গলা মিলায় শুধু। যে দু'জন ছাত্র পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত শুরু করে তাদের কিন্তু গোটাটা মুখস্থ। প্রথম লাইনটির পর শেষের শব্দগুলোর সঙ্গে ন-ন-ন-ন করে কণ্ঠ মিলায় দিবাকর। জোরে জোরে ঠোঁট নাড়ে। কেউ বুঝতে পারে না দিবাকর কী গাইছে।

ওই সময় পতাকাদণ্ডে পতপত করে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে। সাদা-সবুজে মেশানো পতাকা। সবুজ কাপড়ের মাঝখানে চান-তারা। পতাকায় সবুজ অংশ বেশি। সাদা কাপড়ের পরিমাণ সামান্য। পাকিস্তানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, তাই সবুজ অংশ দিয়ে মুসলমানদের বোঝায়। এদেশে হিন্দু-বৌদ্ধের সংখ্যা কম। তাই কম কাপড়ের সাদা অংশটি দিয়ে সংখ্যালঘুদের বোঝায়। এইসব কথাবার্তা ধর্মশিক্ষক ক্লাসে ক্লাসে বোঝান। তার মাথায় সব সময় জিন্নাহ টুপি, মুখে লম্বা দাড়ি। সেই দাড়িতে মেহেদির রঙ। দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে পাঠ্যবই না পড়িয়ে রাজনীতির কথা বলেন সিরাজুল ইসলাম খোন্দকার স্যার। হঠাৎ একদিন ছালামত জিজ্ঞেস করে বসে, 'স্যার, পতাকাদণ্ডটি পতাকার সাদা অংশ দিয়ে ঢোকানো হয়েছে কেন?' ছালামত যে শুদ্ধ করে বাংলা বলতে পারে এমন নয়, সেদিন বলেছিল।

খোন্দকার স্যার বলেছিলেন, 'সাদা বা সবুজ কোনো না কোনো অংশ দিয়ে দণ্ডটা তো ঢুকাতে হবে। জাতির পিতা জিন্নাহ সাহেব সাদা অংশটি দিয়ে ঢোকাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

ছালামত বসতে বসতে চাপাস্বরে বলেছিল, 'সংখ্যালঘুদের পাছা দিয়ে ডাণ্ডা ঢুকাতে তো সুবিধা বেশি।'

দিবাকরের মতো আরও দু'একজন, যারা ছালামতের কাছাকাছি ছিল, চোখ বড় বড় করে ছালামতের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। খোন্দকার স্যার বলে উঠেছিলেন, 'কিছু বলছ ছালামত?'

ছালামত বলেছিল, 'কিছু না স্যার।'

'কিছু যে একটা বলেছ, আন্দাজ করতে তো পারছি। কী বলেছ তা শুনিনি শুধু।' ধর্মস্যার বলেছিলেন।

নির্বিকারভাবে ছালামত বোকা বোকা চেহারা করে বলেছিল, 'বলছিলাম স্যার, আমাদের জাতির পিতা কায়েদে আযমের কী বুদ্ধি!'

'তা-ই বল। জাতির পিতার মেধার সঙ্গে পৃথিবীর কারও মেধার তুলনা হয় না।' পরিধানের পাঞ্জাবিটা ঠিক করতে করতে বলেছিলেন খোন্দকার স্যার।

স্কুলে সনাতন ধর্মশিক্ষক নাই। মাঝে মাঝে হেডস্যার ক্লাস নেন। যেদিন তিনি ক্লাসে আসেন না, হিন্দু ছাত্রদের ক্লাসেই বসে থাকতে হয়। এই জন্য দিবাকর খোন্দকার স্যারের কথাগুলো শুনতে পায়। একদিন দুপুর ছুটিতে দিবাকর দেখল– স্কুলের সামনের বড় রাস্তা দিয়ে লম্বা একটা মিছিল যাচ্ছে। সবাই যেন কী রকম মারমুখী! হাত উঁচিয়ে রাগী রাগী কণ্ঠে স্লোগান দিচ্ছে– নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর। পাকিস্তান জিন্দাবাদ, হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ।

দিবাকরের মতো অনেকে মিছিল দেখে, স্লোগান শোনে। পথের পাশে দাঁড়ানো ছাত্রদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ বলে ওঠে– পাকিস্তান জিন্দাবাদ, হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ।

দিবাকর পরে শুনেছে– পাকিস্তান-ইন্ডিয়া যুদ্ধ লেগেছে। হিন্দুস্তান মানে যে ইন্ডিয়া– দিবাকর জেনে গেছে এর মধ্যে। ইন্ডিয়াই নাকি প্রথম আক্রমণ করেছে পাকিস্তানকে। রাতের আঁধারে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছিল ইন্ডিয়ার সৈন্যরা। পাকিস্তানি সৈন্যদের শক্তি-সাহসের খবর তো আর রাখে না নেহরু সাহেব। পাকসেনারা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়েছে দখলি জায়গাগুলো। ইন্ডিয়ার কত শত মাইল জায়গা যে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিমিষে দখল করে নিয়েছে, তার কোনো সীমা-পরিসীমা নাই। এখন যুদ্ধ চলছে প্লেনে-প্লেনে। ইন্ডিয়ার একটা যুদ্ধবিমানও আকাশে উড়তে দিচ্ছে না পাকিস্তানি সৈন্যরা। ইন্ডিয়ান প্লেন যেই না আকাশে ওঠে, অমনি দ্রুম। পাকিস্তানি কামানের গোলা গিয়ে লাগে উড়োজাহাজে। আগুনলাগা প্লেনটি চক্কর খেতে খেতে মুখ থুবড়ে পড়ে পাকিস্তানে। পাইলট নামে প্যারাসুটে। সঙ্গে সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয় ইন্ডিয়ান পাইলটকে।

এই রকম কত কথা পতেঙ্গাজুড়ে! চা-দোকানে চা খেতে খেতে, হাটে-বাজারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তফজলের দোকানের সামনে বসে বসে এসব কথা বলাবলি করে গ্রামের মানুষরা। চা-দোকানে, স্কুলের দেয়ালে, তফজলের দোকানের গায়ে, বড় বড় গাছের কাণ্ডে রঙিন পোস্টার সাঁটানো হয়। বছরের মাঝখানে চটজলদি ক্যালেন্ডার ছাপানো হয়। ওইসব ক্যালেন্ডারে, সাঁটানো পোস্টারে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্য হত্যার ছবি, আকাশে আগুনধরা ইন্ডিয়ান বিমানের গোত্তা খাওয়ার ছবি। ভিড় করে এসব পোস্টার দেখে গ্রামের মানুষজন। তাদের চোখে-মুখে আনন্দের বন্যা। তফজলের দোকানে এক আনার চানাচুর কিনতে কিনতে চোরা চোখে ক্যালেন্ডারের যুদ্ধছবি দেখে দিবাকর।

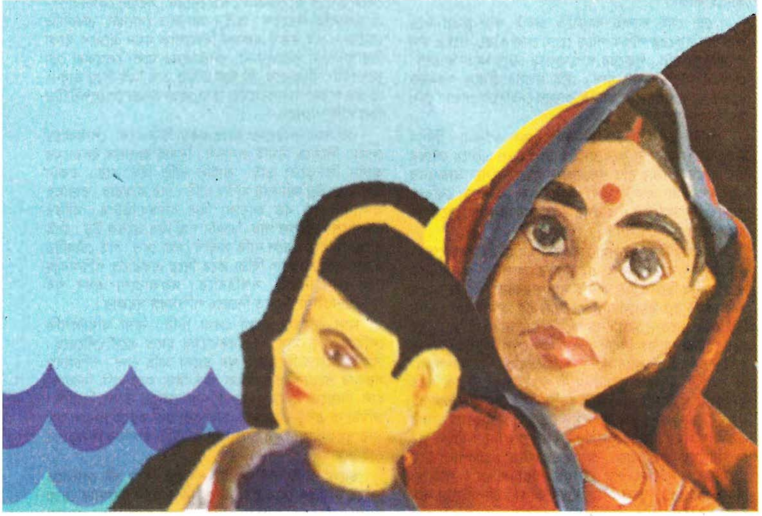
মুসলিম ক্লাসমেটেরা এখন কেমন কেমন চোখে তাকায় হিন্দু ক্লাসমেটদের দিকে। ওই কটাক্ষ থেকে দিবাকরও বাদ যায় না। ছুটির আগে আগে একদিন স্কুলে ভীষণ হইচই পড়ে গেল। মিলন স্যারকে গ্রেফতার করতে এসেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। মিলন স্যার নাকি থার্ড পিরিয়ডে ক্লাস নাইনে বলেছেন– ইন্ডিয়া চাইলে এক থাবায় পাকিস্তান কেড়ে নিতে পারে। ক্লাসের এক ছাত্র দুপুরছুটিতে ভাত খেতে গিয়ে তার বাবাকে বলে দিয়েছে কথাটা। ছাত্রের বাবা তো বেজায় খাপ্পা– পাকিস্তানের খেয়েদেয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলা!



এতবড় সাহস মালাউনটার! একটু দূরের মিলিটারি ক্যাম্পে গিয়ে আগুন উসকে দিয়ে এলো বাবাটা। এর ফলেই পাকিস্তানি মিলিটারির স্কুলে আসা। ইন্ডিয়ার চরটাকে শায়েস্তা না করে ছাড়া যাবে না। টেনেহেঁচড়ে তারা মিলন স্যারকে জিপে তুলল। মিলন স্যার যতই বলছেন– আমি ওকথা বলিনি, ছাত্রটি মিথ্যে কথা বলে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। সে আজ পড়া শিখে আসেনি বলে শাস্তি দিয়েছিলাম, তাই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যেকথা বলেছে সে। ষণ্ডামার্কা মিলিটারিটি হাত চেপে ধরে ধমক দিয়ে বলছে, 'চোপ রহো মালাউন। তোমহারা পাছওয়ারে মে ডাণ্ডা ঘুচা দুঙ্গা।'

দিবাকরের মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এসেছিল। এ কেমন হলো? গাঁয়ে হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাইয়ের মতো বসবাস করত। পথেঘাটে দেখা হলে সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞেস করত। পাশাপাশি জমিতে চাষ করতে করতে সন্তানাদির খোঁজখবর নিত। যদুর চা-দোকানে পাশাপাশি বসে চা-পুয়া খেত। ঈদেচাঁদে হাত ধরাধরি করত। এখন কী রকম যেন রেষারেষি। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ। পতেঙ্গার মুসলমানরা ভাবছে– হিন্দুরা ইন্ডিয়ার গুপ্তচর। পূর্ব পাকিস্তানের সকল গোপন তথ্য ভারতে চালান করে দিচ্ছে। পাকিস্তানের অধিবাসী হয়ে ইন্ডিয়ার সেবা করছে হিন্দুরা। এই যুদ্ধে, আল্লাহ না করুন, পাকিস্তান যদি হারে, তাহলে এইসব মালাউনদের জন্যই হারবে। এদেশে এসব বিশ্বাসঘাতক হিন্দুদের থাকার অধিকার নেই। ইন্ডিয়ার মাল ইন্ডিয়াতে চালান করে দেওয়া ভালো। এই হিন্দুরাই যুগযুগ ধরে আমাদের ঘৃণা করে এসেছে। সব সময় জাতের বড়াই করেছে। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে অবিরাম। ঘৃণাটা তারা চুপেচাপে করেনি, করেছে প্রকাশ্যে। চা-দোকানের কথাই ধরো না। কাটগড়ের বটতলায় কী সুন্দর একটা চা-দোকান দিল রুস্তম আলী! কী সুন্দর কাপ-পিরিচ! টেবিল-চেয়ার চকচকে। নাস্তাও কী! পরোটা-ভাজি-হালুয়া, আমিত্তি-জিলাপি-মিহিদানা। কিন্তু ওই রুস্তমের দোকানে চা-নাস্তা খাবে না হিন্দুরা। বলে কিনা মোছলমানের দোকানে চা খাই কী করে? মোছলমানের ছোঁয়া-নাস্তা খেয়ে জাত খোয়াব নাকি? মোছলমানের চা-হালুয়া পরোটা দিয়ে আমরা কী করব? তার চেয়ে আমাদের যদু সেনের দোকান ভালো। ভাঙাচোরা টেবিল চেয়ার, নোংরা কাপ-পিরিচ তাতে কী? যদুর ভাঙা কাপের ময়লা চায়ে পুয়া-পুরি চুবিয়ে খাওয়ার যে স্বাদ, তা ওই মোছলমানের দোকানে মিলবে নাকি? জাতের হিন্দুরা কখনো ওই রুস্তমের দোকানে চা-নাস্তা খাবে না। হিন্দুজাতের মান-মর্যাদা কি এমনি এমনি এসেছে?

এই যে সন্দেহ, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, পাক-ভারতের যুদ্ধের সময় হিন্দু আর মুসলমানের মনের মধ্যে হঠাৎ করে চাগিয়ে উঠল। মহাজনরা বলেন– জল ও অনুরাগ নিম্নগামী। এই কথাটা ঠিক আছে। তবে এর সঙ্গে আরও একটা কথা বোধ হয় যোগ করা যায়– বিদ্বেষ-ঘৃণাও নিম্নগামী। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে ঘৃণাবোধ কমবয়সিদের মধ্যে চলে আসে। নইলে কেন মুসলিম আর হিন্দু ছাত্রদের মধ্যেও এই ঘৃণা-হিংসা দেখা যায়? আগে হিন্দু আর মুসলমান ছাত্ররা ক্লাসে এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসত। হঠাৎ হিন্দু আর মুসলমান ছাত্ররা আলাদা আলাদা বেঞ্চে বসা শুরু করল। মিলন স্যারের গ্রেফতারে হিন্দুছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ প্রকট হয়ে দেখা দিল। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে মিলন স্যারকে নিয়ে কানাঘুষা বেড়ে গেল। দিবাকর পড়ে গেল উভয় সংকটে। এমনিতে জাতের হিন্দুছাত্ররা তাকে খুব বেশি আমল দিত না। খুব বেশি কথাও বলত না তার সঙ্গে। কেমন জানি এড়িয়ে এড়িয়ে চলত।



দিবাকরের যত বন্ধুত্ব তোফায়েল, মান্নান, শামসু, দিদার, জসিম– এদের সঙ্গে। প্রথম প্রথম শিশির, শৈবাল, রামবিলাস, উৎপল, সাধনরা তাকে সামনের দিকের বেঞ্চে বসতে দিত না। পেছনের বেঞ্চে তাকে ঠেলে দিয়েই তাদের যত রাজ্যের সুখ। এই তোফায়েলই তাকে একদিন সামনের বেঞ্চিতে বসতে দিল নিজের পাশে। বলল, 'আজ থেকে দিবাকর আমার পাশেই বসবে।' সেদিন বড় আনন্দ পেয়েছিল দিবাকর। আজ সেই আনন্দের কথা, সেই পাশে বসতে দেওয়ার কথা ভুলে যায় কী করে দিবাকর? তাই হিন্দুছাত্ররা একান্তে কানের কাছে মুখ এনে চাপাস্বরে যখন বলে 'মোছলমানদের সঙ্গে এত খাতির কিসের তোর? দেখস না, ওরা আমাদের মালাউন ডাকে? কাল থেকে তুই আমাদের পাশে বসবি', তখন ক্রোধ উছলে ওঠে দিবাকরের মনে। কখনো হিন্দু বলে স্বীকার করেনি যে দিবাকরকে, জাইল্যা বলে উপহাস করেছে, আজ তাকে পাশে বসার মধুর আহ্বান! কী চমৎকার না? দিবাকর ওদেরকে এড়িয়ে চলে। ভাবে– এমন একদিন আসবে, মুসলমানদের মন থেকে সন্দেহ ঘুচে যাবে, হিন্দুদের 'ভাই' বলে সম্বোধন করবে, সংকটকালে হিন্দু-মুসলমানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

এই সময় এক রাতে খুন হয়ে গেলেন কানাই কাকা। কানাই কাকা দর্জির কাজ করতেন। নির্বিরোধী মানুষ। কারও সাতেপাঁচে নেই। দোহারা গড়ন। মাথায় টাক। সেলাই মেশিন চালাতে চালাতে ডান হাতের তালু দিয়ে ঘনঘন টাকের জায়গাটা ঘষতেন। বাড়ি থেকে মাইল দেড়েক দূরে ঈশান মাঝির হাটে সেলাইদোকান তাঁর। রবি বুধে হাট। ওই দিন-দুটোতেই কাস্টমার বেশি। টুপিটা, লুঙ্গিটা, ব্লাউজটা, ফতুয়াটা ওই দুইবারেই সেলাই করে দিতে হয় বেশি। অন্যান্য দিন সন্ধেনাগাদ ফিরলেও হাটবারের দিনগুলোতে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে যায় কানাই কাকার। মেটেরাস্তার দুই ধারে জঙ্গল। গাছগাছালি, লতাগুল্মের ভিড় দুপাশে। দূরের কাছের দু'একটা বাড়িতে টিস টিক করে চেরাগ জ্বলে। চেরাগ থেকে অল্পস্বল্প আলো এসে পড়ে রাস্তায়। সেই আলো-আঁধারি পথ দিয়ে দিব্যি হেঁটে হিন্দুপাড়ায় ফিরেন কানাই কাকা। নেপাল চৌধুরীর বাড়ির পাশেই তাঁর ছনে-ছাওয়া ঘরটি। কানাই কাকা না ফেরা পর্যন্ত পিদিম জ্বালিয়ে দাওয়ায় বসে থাকেন কাকিমা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগেভাগে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কাকা ফিরলে কাঁধের ঝোলাটা হাতে নিয়ে কাকিমা বলেন, 'পুকুরঘাটে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে আস। আমি ভাত দিচ্ছি।'

কাকা খেয়ে উঠলে কাকি খেতে বসেন।

সেই নির্ভেজাল কানাই কাকাকেই কে বা কারা খুন করল বুধবার রাতে। সে সন্ধ্যায় কাজের চাপ ছিল বেশি। হাতের কাজ সারতে সারতে নয়টা বেজে গিয়েছিল। আসবার সময় কাকিমা বলেছিলেন, 'দেশের অবস্থা ভালো না। কেমন কেমন কথা শোনা যায়। বটগাছতলায় গত পরশু দেবেনদাকে কে যেন বেশ গালাগাল দিয়েছে। ইন্ডিয়ার গুপ্তচর বলে কে নাকি গায়ে হাত দিতে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছি না কী দোষ করলাম আমরা। ভালো ঠেকছে না আমার। তাড়াতাড়ি ফির। দেরি কর না।' পেছন থেকে দুগ্গা দুগ্গা বলেছিলেন কাকিমা।

পেছন ফিরে কাকিমার দিকে তাকিয়ে কাকা বলেছিলেন, 'আমি গরিব মানুষ। কারও কাঁচা আলে পা দিই না। সবাই আমাকে ভালোবাসে। আমার আবার কী হবে?' তারপর মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'তাড়াতাড়িই ফিরব আজকে। ডিমের ঝোল খেতে ইচ্ছে করছে খুব। রেঁধে রাখিও। এসে খাব।' দোকানের ঝাঁপ ফেলতে ফেলতে এসব কথা ভাবছিলেন

কানাই কাকা।

তো সেই কানাই কাকাকে জবাই করে হত্যা করে কাউয়ার পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রেখে গেল কারা। পথের ডান পাশেই পুকুরটা। পুকুরের পশ্চিমপাড়ে চটান মতো জায়গা। সেখানে মানুষ সমান ঘাস। সেই ঘাসের জঙ্গলে থকথকে রক্তের মধ্যে গলাকাটা কানাই কাকার দেহটাকে পাওয়া গেল পরদিন সকালে।

গোটা রাত ছটফট করে কাটিয়েছেন কাকিমা। পিদিম হাতে উঠান-বারান্দা করেছেন। ঘাটা পর্যন্তও এগিয়ে গেছেন বার কয়েক। গভীর রাত পর্যন্ত কাকা ফিরলেন না। আজানের পর সকালটা একটু ফর্সা হলে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন কাকিমা। তারপর তো কাকার লাশ দেখে 'ও মারে' বলে মূর্ছা গেলেন।

পতেঙ্গার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে খুব হইচই পড়ে গেল। কে করল, কারা করল এই নিষ্ঠুর কাজটা? আহা, বড় ভালোমানুষ ছিলেন এই কানাই লাল সরকার! কখনো কারও ক্ষতি বা কারও সমালোচনা করেননি এই কানাইলাল। মাথা নিচু করে যেতেন, মাথা নিচু করে আসতেন। এই মানুষটার গলা কাটল কারা? দিবাকর খুব কষ্ট পেল কানাই কাকার হত্যায়। কী যে ভালোবাসতেন কাকা তাকে! পাজামা-পাঞ্জাবি সেলাই করার ঘটনাটা মনে পড়ে তার। সিক্সে ভর্তি করানোর পরদিনই বাবা দিবাকরকে নিয়ে গিয়েছিল কানাই কাকার দোকানে। স্কুলড্রেস সেলাতে হবে। যদিও হেডস্যার এক মাস সময় দিয়েছিলেন, কিন্তু বলরামের তর সইছিল না। হেডস্যারের কথা শুনে তার ভেতরটায় তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। দুইদিন পর সেলাই করা পাঞ্জাবি-পাজামা দিবাকরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কাকা। সেলাইয়ের দাম চুকাতে চাইলে কাকা বলেছিলেন, 'বলরাম, অনেক কষ্ট করে ছেলেকে পড়াচ্ছ। তোমার ছেলেকে তো কিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। সেলাইয়ের দামটা না হয় আমি উপহার দিলাম তোমার ছেলেকে।' বলে দিবাকরের মাথায় গভীর মমতায় ডান হাতটা বুলিয়ে দিয়েছিলেন কানাই কাকা। সেই কানাই কাকা খুন হয়ে গেলেন! মনের দুঃখে সেদিন না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল দিবাকর।

সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছিল বলরাম। কানাই কাকাকে খুব পছন্দ করত বলরাম। ঈশান মাঝির হাটে মাছ বেচতে গেলে দু'দণ্ড কাকার দোকানে কাটাত। কাকাই একমাত্র লোক, যিনি দিবাকরের পড়াশোনার খোঁজখবর নিতেন। বলতেন, 'বলরাম, তোমার জীবন তো গেল জলে ভিজে আর নেংটি পরে, তোমার ছেলের যাতে নেংটিপরা জীবন না হয়। লেখাপড়া না করালে তোমার মতো নেংটি পরে খালে-সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে দিবাকর।'

এই রকম খোলামেলা কথাই বলতেন কানাই কাকা। কানাই কাকার কাছ থেকে সাহস নিয়ে ফিরত বলরাম। বলরামকে সাহস জোগানোর লোকটা একরাতেই শেষ হয়ে গেলেন! সাম্প্রদায়িকতার বলি হয়ে গেলেন কানাই কাকা!

বলরাম একেবারে চুপসে গেল। কারও সঙ্গে কথাবার্তা তেমন বলে না এখন। নিত্যদিনের কাজকর্ম করে যায়, কিন্তু কেমন যেন আনমনা, উদাসীন। একা একা কী যেন ভাবে। বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে। মাস দুয়েক পরের এক সন্ধ্যায় বলরাম খবর আনল– কানাই কাকার বউ সন্তানদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছেন। পরের খবর আরও খারাপ। হিন্দুপাড়ার ধরবাবু তার বসতভিটেটা মোশতাক সওদাগরের কাছে বেচে দিয়েছেন। আগামী যে কোনো দিন ওরা ভারতে চলে যাবেন। ওখানে শেষ হলে ভালো হতো, দেবেন দে, যতীনবাবুও নাকি কাস্টমার খুঁজছেন, ভালো দাম পেলে তারাও জমিজিরাত বেচে দেবেন। ধরবাবু কোর্টবিল্ডিং-এ ওকালতি করতেন। আইন-আদালত বোঝেন, রাজনীতি বোঝেন। এই রকম একজন বিজ্ঞলোক যখন এদেশে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না, বলরামদের মতো লোকেরা তো চুনোপুঁটি। কী করবে, কী করা উচিত তার, এই নিয়ে ভাবনার অন্ত থাকল না বলরামের; তার মতো অবস্থা জেলেপল্লীটির অন্য বাসিন্দাদেরও।

এই সময় বলরামের কাছে একটা চিঠি এলো, পোস্টকার্ডে লেখা। লিখেছে নিমাই জলদাস। নিমাই জলদাস বলরামের আপন পিসতুতো ভাই। কাট্টলি বাড়ি ছিল তার। একটা টিলামতন উঁচু জায়গায় মাটির বাড়ি। চার কামরার। রান্নাঘর আলাদা। বড় বড় জানালা ছিল বসতবাড়িটার। বাড়ির চারপাশে নারকেল গাছ। একটা গাছ ছিল অনেক উঁচু। সেই গাছের মাথায় চড়লে নাকি সন্দ্বীপ দেখা যেত। গত চৌষট্টির দাঙ্গায় বাড়িটি হঠাৎ বিক্রি করে দিয়ে একরাতে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেল নিমাই, সপরিবারে। দণ্ডকারণ্যে এসব পূর্ব পাকিস্তানত্যাগী থাকতে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মাস দেড়েক আগে লেখা চিঠি। নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে দেড় মাস পরে বলরামের হাতে এসে পৌঁছেছে। নিমাই চিঠিতে লিখেছে– খুব ভালো আছি দাদা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ বিঘা করে জমি দিয়েছে, হাল দিয়েছে একটা, হালের গরু কেনার টাকা দিয়েছে। জমিটা যা একটু কঙ্করময়। চাষ করা শুরু করতে পারলে সুখ আর সুখ। আমরা খুব ভালো আছি। ইতি আপনার পিসতুতো ভাই নিমাই।

ভালো আছি এই কথাটা দু'দুবার লিখে কী বোঝাতে চাইছে নিমাই? বোঝাতে চাইছে কি– আমি আপনার চেয়ে ভালো আছি? যদি সুখে থাকতে চান চলে আসুন কিন্তু সে তো এটা লিখেনি– সারাজীবন মাছ ধরে মধ্যবয়সে কঙ্করময় পাঁচ বিঘা জমি দিয়ে সে কী করছে? সে কি চাষাবাদ করতে পারছে? দণ্ডকারণ্য তো স্বাভাবিক জায়গা নয়। রাম-বনবাসের সেই দণ্ডকারণ্য। সেই বাঘ-ভালুকের অরণ্যে নিতাইরা কীভাবে জীবন কাটাচ্ছে? বলরাম ভাবল– নিশ্চয় ভালো কাটাচ্ছে, নইলে ভালো আছি, খুব ভালো আছি লিখল কেন? আর যা-ই হোক, সেখানে তো প্রতিবেশীর গলাকাটা হয় না। পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে না। গালিগালাজও করে না।

বলরাম ঠিক করল– এদেশে আর থাকবে না। সবকিছু বেচেবুচে পশ্চিমবাংলায় চলে যাবে। ও দেশের সরকার যেখানেই থাকতে দেয়, সেখানেই থিতু হবে। দেশছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বলরাম আবদুল গফুরের কথা ভাবল না, মল্লিক সওদাগরের কথা ভাবল না, এমদাদ মিয়ার কথা ভাবল না, ভাবল না শফি চাচার কথা। নানা বিপদে-আপদে আবদুল গফুর জেলেদের হয়ে বুক পেতে দাঁড়ায়, ফাগুন-চৈত্রের অভাবের দিনে মল্লিক সওদাগর চালটা-ডালটা বাকিতে দেয়। এমদাদ মিয়া বাড়ি বয়ে এসে দিবাকরকে হাইস্কুলে টেনে নিয়ে যান। শফি চাচা খামার থেকে ফিরবার সময় নানা শাকসবজি বলরামের হাতে গছিয়ে যান। এসব বান্ধবকে পশ্চিমবঙ্গে পাবে কোথায়– দেশত্যাগের সিদ্ধান্তের সময় একবারও ভাবল না বলরাম। মা-স্ত্রী-পুত্রকন্যা কারও সঙ্গে বলরাম আলোচনা করল না। সিদ্ধান্তটা মনের মধ্যে রেখে দিল।

এক দুপুরে পাটনাইয়া ছাগলগুলো বেচে দিল বলরাম। ছায়ে-মায়ে মিলে তেরটি ছাগল। পাটনাইয়া ছাগল পোষার বড় শখ বলরামের। লম্বা লম্বা কান, মাটি পর্যন্ত ঝুলানো। সাদা,কালো, খয়েরি, লালচে নানা রঙের ছাগল। নানা আকারের, নানা বয়সের। কসাইরা এসে কতবার ঘুরে গেছে।

বলরামের এককথা– কিছুতেই ছাগল বেচবে না। যেদিন তার একশটি ছাগল হবে, সেদিন তার মনের আশা পূরাবে। সেই আশাবান বলরাম এক দুপুরে ছাগলগুলো রমজান কসাইয়েল কাছে বেচে দিল। তিন ভাইবোন মিলে দিবাকররা আকুল হয়ে কাঁদল। ছাগলগুলোকে বড় ভালবাসতো দিবাকররা।

যোগমায়া আর ঠাকুমা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। কাউকে জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস না করে হঠাৎ ছাগলগুলো বিক্রি করে দিল কেন বলরাম? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ঠাকুমা জিজ্ঞেস করল, 'তোর তো এখন কোনো অভাব নাই বলরাম। দুইবেলা তো ভাত-তরকারি জুটতেছে। টাকাপয়সার টানাটানিও নাই সংসারে। তারপরও শখের ছাগলগুলা বেইচে দিলি! কারণ তো বুঝলাম না।'

শান্তস্বরে বলরাম বলল, 'কারণ আছে মা। পরে বলব।' বলে মায়ের সামনে থেকে দ্রুত সরে গেল বলরাম।

সপ্তাহখানেক পরে কাঠুরিয়া এসে পুকুরপাড়ের বড়বড় শিরীষ গাছ দুটো কেটে নিয়ে গেল। ঠাকুমা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল। যোগমায়া ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল স্বামীর মুখের দিকে।

সেই রাতেই মা-স্ত্রী আর দিবাকরকে নিয়ে বসল বলরাম। বলল, 'ভারতে চইলে যামু মা।'

'ভারতে চইলে যাবি!' আকাশ থেকে পড়ল মা। স্তম্ভিত চোখে পুত্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ঠাকুমা। রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কেন? ভারতে চইলে যাবি কেন?'

'এই দেশে আর থাকা যাইবে না।' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল বলরাম।

'কেন থাকা যাইবে না?' আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে মা।

'যে হানাহানি কাটাকাটি শুরু হইয়েছে দেশে, এই দেশে বসবাসের কোনো উপায় আছে মা?' উদ্বিগ্ন গলায় বলে বলরাম।

'তোমার আবার কী ক্ষেতি কইরল মাইনষে? কেউ তোমার বাড়াভাতে ছাই দিল? তোমার কোন জমিটা কাইড়ে নিল? কোন পুকুরের মাছ জোর কইরে লইয়ে গেল? কোন গাছগাছড়া কাইটে নিয়ে গেল?' ঠাকুমার গলায় তীব্র ঝাঁঝ।

বলরাম মাকে বোঝানোর জন্য নরম সুরে বলল, 'বুইঝবার চেষ্টা কর মা। যে কানাই কাকার কোনো শত্রু ছিল না, ভালোমানুষ বইলে সবাই তারে জানত, সেই কানাই কাকার গলাটা কাইটে দিল! ভবিষ্যতে দেশের অবস্থা আরও খারাপ অইবে। খারাপ যদি না হয় তবে হিন্দুপাড়ার ধরবাবুর মতো চালাকচতুর উকিল দেশ ছেইড়ে যাইবে কেন? দেবেনবাবু, যতীনবাবুও কি মা কম বুদ্ধিমান? তো ওদের মতন মানুষ যখন পূর্ব পাকিস্তান ছেইড়ে চইলে যাচ্ছেন, আমরা তো সামান্য মানুষ। আমাদেরকে কখন কচুকাটা শুরু করে তার কোনো গ্যারান্টি আছে মা?'

'কোথায় যাবি? কোথায় গিয়া থরকূল পাবি?' মা কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করে।

'ভারতে যাব, পশ্চিম বাংলায় যাব। দেখ নাই নিতাই চিঠি লিইখা জানাইল ওখানে সুখে আছে ওরা।' স্বস্তির কণ্ঠে বলল বলরাম।

'ওই ভারতে না ফারতে গেলে এত বড় একটা পুকুর পাবি? পুকুরপাড়ে এত এত গাছ পাবি? এত বিরাট একখান উঠান পাবি? পাশের খাল পাবি? সমুদ্র পাবি? মাছ পাবি? পাড়ার শুধাংশু, কাজল, সর্বানন্দ– এদেরে পাবি? পাবি নারে পুত, কিচ্ছু পাবি না। পথের ফকির হবি। রেলস্টেশনে স্টেশনে ঘুইরে বেড়াবি। মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবি না। বস্তিতে গিয়া থাইকতে হইবে আমাদের। তোর বউ বাড়ি বাড়ি গিয়া দাসীগিরি কইরবে। তোর পোলামাইয়ার দিকে চাইয়া দেখ– ওদের কী হাল হইবে? রাস্তায় ভিক্ষা কইরবে। দিবাকরের কী অবস্থা হইবে? তুই না বইলেছিলি দিবাকররে আইএ-বিএ পাস করাবি? বিদেশ-বিভূঁইয়ে গিয়া আমরা সকলে মইরে যাবরে পুত।' বলতে বলতে আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করল ঠাকুমা।

এই সময় সপ্তম শ্রেণির ছাত্র দিবাকর চিৎকার করে উঠল, 'যাব না আমি, এই দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না আমি। এই দেশ আমার। এই দেশ আমাদের। আমার দাদা-পরদাদার জন্মভিটা ছেড়ে আমি ভারতে গিয়ে পরগাছা হব না।'

ছেলের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল যোগমায়া। আঁচল দিয়ে ঘন ঘন চোখের জল মুচতে লাগল।

ঠাকুমা শান্তস্বরে বলল, 'দেখ বলরাম, প্রত্যেক দেশে কিছু না কিছু গণ্ডগোল হয়। সেই গণ্ডগোল একটা সময়ে থাইমাও যায়। তুই দেইখা নিস– এই যে হানাহানি, রেষারেষি চলতাছে হিন্দু আর মুসলমানে, একদিন সব থাইমা যাইবে। দেশে শান্তি ফিইরা আইসবে। আঁধার রাইতের পর সূর্য উঠে।'

'মা, ধরবাবু, দে বাবুরা যে চইলে যাচ্ছেন, না বুইঝা যাচ্ছেন?' ধীরে ধীরে বলে বলরাম।

'ওদের মনের খবর জানি না। হয়তো ওইখানে ওদের আত্মীয়স্বজন আছে। গিয়া একটা স্থান পাইব। তা ছাড়া শিক্ষিত মানুষ ওরা। বিদ্যা ভাঙাইয়া কিছু না কিছু একটা জোটাইয়া লইব। তোর কী আছে বল? বিদ্যা তো না-ই নাই, বুদ্ধিও কম আছে। নইলে কী মা-বউয়েরে না জানাইয়া গাছ-ছাগল বেইচা ফেলাস।' ঠাকুমা বলে।

'আমার হাতে টাকা থাইকব মা। ঘরবাড়ি-পুকুর-নাও-জাল-গাছগাছালি বেচার টাকা। টাকা দিয়া কিছু একটা কইরা নিমু।' আমতা আমতা করে বলল বলরাম।

'বর্ডার পার হওনর সময় দালালরা যদি ওই টাকা কাইড়া লয়? যদি ওপারের কেউ তোর লগে বাটপাড়ি কইরা সমুদয় টাকা হাতাইয়া লয়? কী করবি তখন? এই দেশে ফিইরাও আইতে পারবি না, ওই দেশে না খাইয়া না খাইয়া মরতে হইবে। সকলে মিলে বিষ খাওন ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাইকবে তখন?' ঠাকুমা বলল।

বলরাম থতমত খেয়ে গেল। অস্থির ভাব ফুটে উঠল তার চোখেমুখে। এই সময় দিবাকর বলে উঠল, 'আমার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে বাবা। হেডস্যারের স্বপ্ন পূরণ করতে পারব না।' তারপর এই ছোট ছেলেটি দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল। বলল, 'এই দেশের মাটি খেয়ে পড়ে থাকব বাবা, তারপরও এই দেশ থেকে যাব না।'

সেরাতে আর কথা বাড়াল না বলরাম। দেশত্যাগের পরিকল্পনা যে সে মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, তার চোখমুখ দেখে তা-ও মনে হলো না। এর মধ্যে পাটনাইয়া ছাগলগুলো বিক্রি করে দিয়েছে, বড় বড় গাছ দুটো বেচে দিয়েছে। শিমুল গাছটা আর বাঁশঝাড়ের দরদাম চলছে। ছোবান মেম্বারের সঙ্গে বাড়ি বিক্রির কথাবার্তা প্রায় পাকা করে এসেছে। এই রকম অবস্থায় ইন্ডিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করে কী করে বলরাম? কিন্তু ছেলের গোঁয়ার্তুমি, মায়ের একরোখামি দেখে বেশটুকু ভড়কে যায় বলরাম। মায়ের যুক্তিগুলো একেবারে ফেলনা নয়। ওদেশের জীবন যে আগোছালো, অনিশ্চিত এবং আরও বেশি অভাবের হবে, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তার। মা অশিক্ষিত হলে কী হবে, তার দূরদৃষ্টি আছে, তার কথার মধ্যে বাস্তবতা আছে। ভীষণ দোটানায় পড়ে গেল বলরাম। কী করবে ঠিক করতে পারছে না সে। গভীর একটা আশঙ্কা তাকে চেপে ধরল।

সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। পরে আস্তে আস্তে

যার যার ঘরে চলে গেল।

এক সাধুবাবা বলরামের পরিবারকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। দু'তিন বছর পর পর হঠাৎ হঠাৎ আসেন সাধুবাবা। এ পাড়ার সবাই তাকে সাধুবাবাই ডাকে। তার নাম যে কী, কেউ তা জানে না। কার্তিক-অঘ্রাণের দিকেই আসেন তিনি। কামরূপ কামাক্ষ্যায় নাকি তিনি থাকেন। বছরের অধিকাংশ সময় ধ্যানে-জপে কাটান। মাঝেমধ্যে দূরদেশে চলে আসেন। পূর্ব পাকিস্তান এলে উত্তর পতেঙ্গার জলদাসপাড়ায় তিনি একবার আসেনই আসেন। বলরামের বাড়িতে ওঠেন তিনি। যা দু-একদিন থাকেন, বলরামের বাড়িতেই থাকেন। জেলেপল্লীর মানুষজন তখন বলরামের বাড়িতে ভেঙে পড়ে। সাধুবাবার কোনো ভড়ং নেই। যোগমায়ার হাতের রান্নাই খান। ওই দু'দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়ামিষ রান্না করে যোগমায়া।

কুচকুচে কালো রং সাধুবাবার। তেমন লম্বা বা তেমন বেঁটে নন। মাথার মাঝখানে চূড়া করে জটাবাঁধা। মুখে পাতলা দাড়ি। ধারালো নাক। তীক্ষ্ণ চোখ। তীব্র আলো বেরোয় সেই চোখ থেকে। পরনে গৈরিক বসন। একখণ্ড গায়ে জড়ানো। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় ওই রকম ব্যবহার করেন সাধুবাবা। কম কথা বলেন। যখন বলেন মোক্ষম কথাটিই বলেন।

বছর তিনেক আগে এসেছিলেন। এ বছর যে আসবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। হঠাৎ করেই এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। বলরামের ভীষণ মানসিক সংকটকালে সাধু-বাবা যেন আবির্ভূত হলেন।

দিবাকরকে দেখে বেশ খুশি হলেন সাধুবাবা। তিন বছর আগের দিবাকর আর এখনকার দিবাকরের মধ্যে অনেক পার্থক্য। এখন সেই ছোট্ট দিবাকরটি আর নেই। বেশ বড়সড় হয়ে গেছে সে। বয়সের তুলনায় সে কিছুটা লম্বাটেও। গায়ের রং আরও ফর্সা হয়েছে। কোঁকড়ানো লম্বা চুলে বেশ মানিয়ে গেছে দিবাকরকে।

সাধুবাবা দিবাকরকে কাছে টেনে বলরামের উদ্দেশে বললেন, 'বলরাম, বেশ দেখতে হয়েছে তোমার ছেলেটা। তা লেখাপড়া করছে তো?'

'হ্যাঁ সাধুবাবা। সাত কেলাসে পড়ে।' গলায় গামছা জড়িয়ে করজোড়ে বলল বলরাম।

'তা বেশ, তা বেশ। বিদ্যা মানুষের চোখ খুলে দেয়। মানুষ নিজেকে চিনতে পারে তখন। আর যে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে, সে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ই হয়। তোমার ছেলে জয়ী হবে।' বলে দিবাকরের লম্বা চুলের মাথায় নিবিড় মমতায় হাত বুলাতে থাকেন।

একদিন পরে, সাধুবাবাকে একা পেয়ে নিজের সংকটের কথা বলল বলরাম। মাও এসে সাধুবাবার পায়ের কাছে বসল।

সব শুনে সাধুবাবা গম্ভীর মুখে মাটির দিকে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর মাথা তুললেন। বলরামের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি মস্তবড় ভুল করতে যাচ্ছিলে বলরাম। মনে রেখ– নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস; মনে রেখো, ওপারেও কোনো সুখ নেই। তুমি যে দুঃখের কথা ভেবে ভারতে চলে যেতে চাইছ, সেখানে হয়তো স্বস্তি আছে, কিন্তু সুখ নেই। রিফিউজি ডাকে ওরা দেশত্যাগীদের। রিফিউজিদের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য আর অপমানের সীমা নেই। ওপারে তোমাদের মতো মানুষদের মাথা গোঁজার জায়গা নেই।' তারপর একটু থামলেন সাধুবাবা। তার পর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ভুল। অনেক বড় ভুল করতে যাচ্ছিলে তুমি। বলরাম তোমার মায়ের কথা ঠিক। তোমার ছেলের অস্বীকৃতি যথার্থ। তুমি মন পরিবর্তন কর। ওদেশে যেও না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

সাধুবাবার কথা শুনে বলরামের সকল দ্বিধা কেটে গেল। সে ঠিক করল– এই দেশ ছেড়ে, এই জন্মভূমি ছেড়ে সে কখনো কোথাও যাবে না।

চার

পাক-ভারতের যুদ্ধ থেমে গেল। ধীরে ধীরে চারদিক শান্ত হয়ে এলো। মানুষ আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করল। তবে পতেঙ্গা গ্রামের মানুষ একেবারেই যে শান্ত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলো এমন নয়, কিছু মানুষের মধ্যে বিষবৃক্ষের শেকড়টা প্রোথিতই থেকে গেল। তাদের মনের ভেতর বিষের ক্রিয়া সঞ্চরণশীল থাকল। কিন্তু গলা উঁচিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলবার সাহস করল না কেউ। অধিকাংশ মানুষ তাদের উন্মত্ততার জন্য আফসোস করল। ভাবল– কী ভুলটাই না করে ফেলেছে ওরা! নিত্যদিনের দেখা দেবেনবাবুর সঙ্গে, সত্যানন্দবাবুর সঙ্গে, অজিত শীলের সঙ্গে, রাধামাধব ধোপার সঙ্গে, হরিলাল জলদাসের সঙ্গে কী দুর্ব্যবহারই না করে ফেলেছে তারা! বড্ড বদ কাজ করেছে। পাকিস্তানি উন্মাদনায় যুগযুগান্তরের প্রতিবেশীদের সঙ্গে অভব্য ব্যবহার করা তাদের উচিত হয়নি। দেখা হলে, এখন তারা নরম সুরে কথা বলে। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'কিছু মনে করো না ভাই তোমরা। ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে শুনে মাথা ঠিক ছিল না আমাদের। সাময়িক উত্তেজনায় বড় খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি তোমাদের সঙ্গে। মনে কিছু রেখ না।

হিন্দুদেরও পরিতাপের অবধি নেই। সাময়িক উত্তেজনার বশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কীসব আকথা-কুকথা বলে ফেলেছে তারা। দু'চারজনের দুর্ব্যবহারে গোটা গ্রামবাসীকে ভুল বুঝেছে তারা। কিছু কিছু মানুষ হয়তো খারাপ, 'সবাই তো না। বহু পুরুষ আগে থেকে হিন্দু আর মুসলমানে মিলে মধুর জীবন কাটিয়ে আসছে তারা। আজ কতিপয় মানুষের উস্কানিতে এত দিনের সৌভ্রাতৃত্ব ভেঙে পড়বে? না, কিছুতেই আর হানাহানিকে প্রশ্রয় দেবে না তারা। এইভাবে ধীরে ধীরে গ্রামজীবনে স্বস্তি ফিরে আসতে শুরু করল। জেলেপাড়ায় গানবাজনা শুরু হলো, শ্রাবণ মাসে মনসাপুথি পাঠ করতে লাগল তারা। নাপিতপাড়ায় 'রামায়ণ', 'মহাভারত' সুর করে পড়া শুরু হলো আগের মতো। হিন্দুপাড়ায় দুর্গোৎসবের তোড়জোড় আরম্ভ হলো।

এরই মধ্যে যারা যাওয়ার তারা চলে গেলেন। ধরবাবু চলে গেলেন, দে বাবু গেলেন, গেলেন আরও দু'চারটি হিন্দু পরিবার। তাদের চলে যাওয়ায় হিন্দুপাড়ার জীবনচর্চায় খুব বেশি ব্যাঘাতের সৃষ্টি হলো না। তবে পাড়াজুড়ে ছেঁড়া তারের একটা সুর মৃদু লয়ে বাজতে লাগল।

দিবাকরের স্কুলের পরিবেশও স্বাভাবিক হয়ে এলো। আগের মতো পড়াশোনা চলতে থাকল।

মিলন স্যার কীরকম যেন হয়ে গেছেন। অদ্ভুত রকমের প্রাণখোলা মানুষ ছিলেন তিনি। ছেলেদের নিকটে গিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে, আঙুলগুলো নাড়িয়ে দিয়ে, পকেট থেকে চিরুনি বের করে উশকুখুশকো চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে পড়াতেন। মিলিটারি ক্যাম্প থেকে ফিরে এসে ভীষণ রকম চুপসে গেলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা দুইদিন রেখে দিয়েছিল তাকে। মারধর করেছিল কিনা কে জানে। গাড়িতে তোলার সময় যে অসভ্য ব্যবহার করেছে, তাতে মনে হয় মারধর করা স্বাভাবিক। হেডস্যারের শত জিজ্ঞাসাতেও মুখ খোলেননি মিলন স্যার। দুইদিন পর স্কুল-সেক্রেটারি এমদাদ মিয়াকে

নিয়ে কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন হেডস্যার। প্রথম দুইদিন চেষ্টা করেও বিফল হয়েছিলেন। প্রাক্তন চেয়ারম্যান এমদাদ মিয়া বন্ডসাইন দিয়ে মিলন স্যারকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। সেই থেকে প্রাণখোলা মানুষটি একেবারে মিইয়ে গেলেন। সত্যব্রত চক্রবর্তী ভাবনায় পড়লেন। তিনি শুধু ছাত্রদের নিয়ে ভাবেন না, শিক্ষকদের নিয়েও ভাবেন।

বছর শেষ হয়ে এলো। বার্ষিক পরীক্ষাও হয়ে গেল। হেডস্যার ঘোষণা দিলেন– আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে স্কুলে নাটক হবে। স্কুলের ছাত্ররাই অভিনয় করবে এই নাটকে। বাবুল হক স্যারকে বললেন, 'আপনিই একটা নাটক লিখুন হকসাহেব। ভাষা আন্দোলনের ওপর। আগামী বছরের একুশ ফেব্রুয়ারিতে স্কুলমাঠেই মঞ্চস্থ হবে নাটকটি।'

বাবুল হক স্যার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'আমি কী নাটক লিখব স্যার! ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র আমি। আমি নাটকের কী বুঝি স্যার?'

'আপনি না ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র? ইংরেজি আর বাংলার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য। ভাবগত নয়। সাহিত্যের ছাত্র তো আপনি। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ করা। মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরেই তো ভাষা আন্দোলনটা হয়েছিল। এই আন্দোলনে বাংলাভাষাপ্রেমীদের মনে স্বাজাত্যবোধের জোয়ার এসেছিল। লিখুন আপনি। পারবেন। মেয়ে চরিত্র কম রাখবেন। ছেলেদের স্কুল আমাদের। যে কটি চরিত্র মেয়েদের হবে, ছেলেদের দিয়েই অভিনয় করাতে হবে।'

বাবুল হক স্যার হেডস্যারের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। এক ঘণ্টার একটা নাটক লিখে দিলেন। নাম দিলেন– 'ফাগুনের আগুন'। হেডস্যার দু'একটা জায়গায় জোড়াতালি দিলেন।

মিলন স্যারকে ডেকে বললেন, 'এই নাটকটা পরিচালনা করবেন আপনি। না বলবেন না। ছাত্রদের ঘুম ভাঙানো দরকার। শুধু এই স্কুলে না, গোটা পতেঙ্গা গ্রামে কোনোদিন নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। আপনি দেখিয়ে দিন মিলনবাবু।' মিলন স্যারকে আগের মিলন স্যারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এর চেয়ে উত্তমপন্থা খুঁজে পেলেন না সত্যব্রত চক্রবর্তী।

মিলন স্যারের মনমরা ভাব কেটে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। মন দিয়ে কয়েকবার পড়লেন 'ফাগুনের আগুন'। নায়িকার মুখে একটা গান জুড়ে দিলেন– ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বন ফুল গো। হেডস্যারকে বোঝালেন– গ্রাম স্যার। একটা গান না থাকলে কেমন দেখায়। গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ। গোটা অডিয়েন্স ফেটে পড়বে স্যার। গানের সঙ্গে নাচটা অবশ্য আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে স্যার। ওটা আমার তেমন আসে না।' মিলন স্যারের তৎপরতা দেখে মনে মনে বেজায় খুশি হলেন হেডস্যার। তিনি মিলন স্যারকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন।

নায়িকার রোলটা এসে পড়ল দিবাকরের ঘাড়ে। অনেক অনুনয়ের পরও মাফ পেল না সে। মিলন স্যার হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার চেয়ে সুন্দর আর কে আছে এই স্কুলে? তোমার নাক, চোখমুখ, হাতের আঙুল মেয়েদের মতো।'

স্যারের কথা শুনে অপরাপর চরিত্ররা হেসে উঠল। মিলন স্যার ধমক দিলেন, 'এই, হাসছ কেন তোমরা? আরেকবার যে হাসবে তাকেই দেব নায়িকার রোলটা।'

চুপসে গেল সবাই। ছেলে হয়ে মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করা! ওরে বাপরে! পথেঘাটে হাঁটা যাবে না। অনেক চেষ্টা করেও মিলন স্যারের হাত থেকে রেহাই পেল না দিবাকর। রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল জোরেশোরে। প্রতি বিকেলে মহড়া চলতে লাগল। দিন পনেরোর মহড়ায় পোক্ত হয়ে উঠল অভিনেতারা। দিবাকরও গড়গড়িয়ে পার্ট করে যেতে লাগল। মিলন স্যারও খুশি। কিন্তু একটা জায়গায় খটকা থেকে গেল। দিবাকর কিছুতেই নাচটা আর গানটার মধ্যে সমন্বয় করতে পারছে না। গানের তাল কেটে যাচ্ছে বারবার।

হেডস্যারকে গিয়ে বললেন মিলন স্যার। হেডস্যার বললেন, 'দেখছি। কাল সন্ধ্যার রিহার্সালে আমি উপস্থিত থাকব। সবাইকে হাজির রাখবেন।'

হেডস্যার দেখলেন, সব ছাত্রের মুখ হাসিখুশি। শুধু দিবাকরের মুখ বেজার। স্কুলে নাটক হবে– বিপুল আনন্দ সবার চোখেমুখে। দিবাকর শুধু জোর করে মুখটা হাসি হাসি করে রাখবার চেষ্টা করছে– ব্যাপারটা হেডস্যারের বুঝতে অসুবিধা হলো না। তিনি ভিন্ন পথ ধরলেন। মিলন স্যারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রিহার্সাল তো করালেন অনেকদিন, খাওয়ালেন কী অভিনেতাদের?'

মিলন স্যার মাথা চুলকে বললেন, 'তেমন কিছু না স্যার। এই বিস্কুট-চানাচুর।'

'চা-টা?' হেডস্যার আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'এই এলাকার পড়ুয়ারা স্যার চা খায় না। বলে– মা-বাবা-দাদি-নানি বলেছে চা খেলে নাকি গায়ের রং জ্বলে যায়, রাতে ঘুম আসে না।'

হেডস্যার মিষ্টি করে হাসলেন। বললেন, 'হায়রে দাদি-নানি! সারা পৃথিবী যেখানে চায়ের অনুরাগী, পতেঙ্গার মানুষগুলো শুধু....।' কথা অসমাপ্ত রেখে দিলেন তিনি। একটু থেমে বললেন, 'দপ্তরিকে রুস্তমের দোকানে পাঠান। গরম গরম পরোটা আর মিহিদানা নিয়ে আসুক। প্রত্যেকের জন্য দুটো করে পরোটা। আর হ্যাঁ, ফ্লাস্কে ভরে চা আনার ব্যবস্থা করুন। ছাত্রদের চা খাইয়ে দেখি, তাদের গায়ের রং কতটুকু কালো হয়। চা-তে পরোটা চুবিয়ে খাওয়ার সুখ তো ওরা পায়নি!'

দপ্তরি হাবিব মিলন স্যারের নির্দেশে চা-নাস্তা আনতে গেল। সত্যব্রত চক্রবর্তী দিবাকরের দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, 'তোমার মন খারাপ কেন দিবাকর?'

এই স্কুলে দু'বছর পড়ে ফেলেছে দিবাকর। মাসখানেক পর এইটে উঠবে। জড়তা অনেকটা কেটে গেছে তার। শিক্ষকদের সঙ্গে একটা সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এরই মধ্যে। হেডস্যারের জিজ্ঞাসায় দিবাকর বলল, 'পথেঘাটে মানুষরা লজ্জা দেয় স্যার। ডাকে অঞ্জনা বলে। মাইয়াপোয়া বলেও কেউ কেউ পেছন থেকে আওয়াজ দেয়।'

'দেখ দিবাকর, প্রত্যেক ভালো কাজে বাধা আসে। খারাপ কাজে সহযোগিতা পাবে অনেকের। কিন্তু ভালো কাজে নানা প্রতিবন্ধকতা, কুরুচিপূর্ণ সমালোচনা। এইগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে আমাদের। তোমাদের স্কুলটা কো-এডুকেশনের নয়। গ্রামের মেয়েরা এখনো গৃহবন্দি। কবে তারা মুক্তি পেয়ে হাইস্কুলে পড়তে আসবে, জানি না। ছাত্রী থাকলে মেয়েদের পার্ট ছাত্রীরাই করত। ছাত্রী নাই বলে অঞ্জনা চরিত্রটা তোমাকে করতে হচ্ছে। এটাও তোমার জীবনে একটা চ্যালেঞ্জ। ছেলে হয়ে মেয়ের পার্ট করা চাট্টিখানি কথা নয়। অনেক দক্ষতা, অনেক সাহস থাকলেই ছেলে হয়ে মেয়ের পার্ট করা সম্ভব। তোমার মধ্যে সেই গুণ আছে। মিলনবাবু এমনি এমনি অঞ্জনা চরিত্রের জন্য তোমাকে সিলেকশন দেননি। তোমাকে দেখিয়ে দিতে হবে– তুমিও পারো। দেখে নিও, তোমার অভিনয়-দক্ষতা দেখে তোমারই গ্রামের মানুষ ধন্য ধন্য করবে একদিন।' সত্যব্রত দেখলেন দিবাকরের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লজ্জিত দিবাকরের

জায়গায় আত্মপ্রত্যয়ী দিবাকরকে দেখতে পেলেন তিনি।

কণ্ঠে সহানুভূতি মিশিয়ে এরপর হেডস্যার বললেন, 'দেখো ছাত্ররা, তোমাদের এই গ্রামটি চট্টগ্রাম শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আট-দশ মাইলের মতো হবে। এই আট-দশ মাইলের তফাতে কতটুকু ব্যবধান দেখো। শহরে নারী-পুরুষে মিলে কত না নাচ-গান, কত না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর তোমাদের গ্রামটা এখনো অন্ধকারে। এই সেদিন হাইস্কুলটা হল। এই হাইস্কুলের বিরুদ্ধেও যে কত বিরোধিতা, সেটা তোমাদের বলতে চাই না। মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে না। ছেলেদের মধ্যেও সবাই স্কুলে যায় না। যারা যায়, প্রাইমারি স্কুল শেষ করে হাইস্কুলের দিকে পা বাড়ায় না। মা-বাপরা মনে করে আর কী দরকার পড়াশোনা করার? চিঠিটা তো লিখতে পারে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাকে ছাত্র সংগ্রহ করতে হয়। সেখানেও নানা ঝুটঝামেলা।' দিবাকরের ওপর চোখ রেখে কথা শেষ করলেন হেডস্যার। দেখলেন– দিবাকর মুগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

অধ্যাপককে জেলে যেতে হয়েছে। সেখানে বসেই তিনি 'কবর' নাটক লিখেছেন। পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে এই নাটকটি। আইউবি শাসকরা ভালো নজরে দেখছে না এই নাটকটিকে। বলছে– এটা একটা বিদ্রোহের নাটক। পাকিস্তানি দেশপ্রেম খর্বিত হয়েছে এই নাটকে। কিন্তু এই নাটকে তো দেশপ্রেমকে ছোট করা হয়নি। এই নাটকে বলা হয়েছে– দেশপ্রেমের চেয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা কোনো অংশে কম নয়। দেশপ্রেম আর মাতৃভাষা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তো সেই বিষয়টিকে নিয়ে তোমরা নাটক করতে যাচ্ছ। কালের কুশীলব হতে যাচ্ছ তোমরা। জানি, গানের ব্যাপারটাও তোমাদের গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মেনে নেবে না। অনেকে নাউজুবিল্লাহ বলবেন। গানের মধ্যেও যে প্রাণ আছে তোমাকে তা দেখিয়ে দিতে হবে দিবাকর। মিলনবাবু বলেছেন, তোমার গানের গলা আছে। সেটাতে একটু দরদ দিয়ে সুর লাগাতে হবে। তাহলেই বাজিমাত।' এক গ্লাস পানি খেলেন হেডস্যার। সবার মুখের ওপর ভালো করে একবার



এই সময় হাবিব চা-নাস্তা নিয়ে এলো। খাওয়া শেষ করে হেডস্যার বললেন, 'এই সব অন্ধকার থেকে তোমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। পতেঙ্গার সুপ্ত প্রতিভাকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। নিজেদের ভুল এরা একদিন বুঝতে পারবেন। তখন আর দিবাকরকে অঞ্জনা বলে পেছন থেকে টিটকারি দেবে না। স্বচ্ছন্দে কন্যাদের স্কুলে পাঠাবে। এই অন্ধকার পতেঙ্গা আলোয় ভরে যাবে একদিন। দেখে নিও তোমরা।'

হঠাৎ ছাত্ররা জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। সবাই বলল, 'এই অন্ধকারকে একদিন সবাই গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেব স্যার।'

ছাত্রদের কথা যেন শুনতে পাননি সত্যব্রত চক্রবর্তী। তিনি যেন কোন সুদূরে ভেসে গেছেন। সেখান থেকেই যেন তিনি বললেন, 'এই যে নাটকটা, ভাষা আন্দোলন নিয়ে। তোমাদের কেউই হয়তো ৫২'র ভাষা আন্দোলন কী, জানো না। ভাষার মর্যাদার জন্যও যে মানুষ প্রাণ দেয়, সেটা বাঙালিরাই দেখিয়ে দিয়েছেন। মুনীর চৌধুরীর মতো মাননীয়

চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জানো গানের সাতটি স্বর কী কী?'

দিবাকর দাঁড়িয়ে বলল, 'সা-রে-গা-মা-পা-দা-নি।'

'ঠিক বলেছ। তুমি এক একটা স্বরের প্রথম বর্ণ বলেছ। পুরো শব্দগুলো বলতে পারো?'

দিবাকর ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে।

'আমি পারি স্যার। একটা। একটা স্বরের নাম ঋষভ। ঋষভ থেকে 'রে' হয়েছে।' হঠাৎ দাঁড়িয়ে শিশির বলল। শিশির একটু মোটাসোটা। তার শরীরজুড়ে মেদের বাহার।

হেডস্যার হঠাৎ হেসে উঠলেন। নিজেকে সংযত করে বললেন, 'শিশির, ঋষভ শব্দের অর্থ জানো?'

শিশির বোকা বোকা চেহারা করে বলল, 'জানি না স্যার। আমার বড় জামাইবাবু আমাকে আদর করে ওই নামে ডাকেন। বলেন– শিশির, তুই গানের দ্বিতীয় স্বররে ঋষভ।'

এবার পারিপার্শ্বিকতা ভুলে দমফাটা হাসিতে ফেটে পড়লেন হেডস্যার। হাসতে হাসতে বললেন, 'ঋষভ অর্থ

বৃষরে শিশির। তোমার বড় বোনজামাই তোমাকে তাহলে ষাঁড় নামেই ডাকে!! যা হোক, তোমার মন খারাপ করবার কোনো কারণ দেখি না।' বলতে বলতে আবার হেসে দিলেন তিনি।

সবাই হো হো হি হি হাসিতে ফেটে পড়ল। হেডস্যার বাধা দিলেন না। তিনিও হাসির মেলায় যোগ দিলেন। তিনি চাইছিলেন– দমবন্ধ পরিবেশটা কেটে যাক।

মিলন স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা স্বর ঋষভ জানলাম স্যার। অন্যগুলো?'

হেডস্যার বললেন, 'স্বরের পুরো নামগুলো হলো– ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ।' তারপর ছাত্রদের দিকে মুখ ফেরালেন তিনি। বললেন, 'মজার তথ্য আছে তোমাদের জন্য। এই স্বরগুলো কিন্তু পশুপাখির ডাক থেকে নেওয়া হয়েছে।'

'কী বলেন স্যার? ভেরি ইন্টারেস্টিং তো!' মিলন স্যার হেডস্যারের কথার মাঝখানে বলে উঠলেন।

সত্যব্রত চক্রবর্তী এবার মৃদু হেসে স্নিগ্ধ চোখে বললেন, "সত্যিই তা–ই। নানা পশুপাখির আওয়াজই মানুষের গানের সাতটি স্বরের উৎসস্থল। 'ষড়জ' মানে ময়ূরের ডাক, 'ঋষভ' মানের ষাঁড়ের, 'গান্ধার' ছাগলের ডাক, 'মধ্যম' বকের ডাক, 'পঞ্চম' বসন্তকালের কোকিলের ডাক। আর ঘোড়ার ডাককে 'ধৈবত' বলে। 'নিষাদ' মানে হাতির ডাক।"

সবাই একমনে হেডস্যারের কথা শুনে গেলেন। সবাই বেজায় খুশি হেডস্যারের আজকের কথাবার্তা শুনে।

তারপর দীর্ঘসময় ধরে হেডস্যার রিহার্সাল করালেন। বারবার করে মহড়ার কারণে দিবাকরের সকল জড়তা কেটে গেল। কিছুদিনের মধ্যে নাট্যদলটি 'ফাগুনের আগুন' মঞ্চায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

কিন্তু নাটকটির মঞ্চায়নে বাধা দিল স্থানীয় এয়ারফোর্স। কেন বাধা দিল, তার একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের কথা একটু পরে। তার আগে দিবাকর আর ঠাকুমার কথা।

তো, সেই সন্ধ্যায় হেডস্যারের কথা শুনে মনে খুব জোর পেয়েছিল দিবাকর। এত গম্ভীর একজন মানুষের মধ্য দিয়ে যে হাসির এমন একটা ঝর্ণাধারা বয়ে যায়, কলকল ছলছল, জানতো না দিবাকররা। শুধু কী লাস্যহাস্যের ব্যাপার? জ্ঞান কী স্যারের! যে কণ্ঠসঙ্গীত দিয়ে গায়করা মানুষের মন জয় করেন, তা যে পশুপাখির আওয়াজ থেকে ধার করা, কে জানতো? স্যারই তো বললেন আজ। দিবাকর রাতে ঠাকুমার পাশে শুয়ে শুয়ে ভাবে– যে পশুপাখিকে আমরা তোড়াই কেয়ার করি, সেই ইতর প্রাণীদের কাছে মানুষের কী গভীর ঋণ! আর ওই যে বললেন– পতেঙ্গার অন্ধকার দূর করতে হবে, ওর মতো করে কে ভেবেছেন আগে, কে-ই বা এরকম করে বুঝিয়েছেন পতেঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্রদের?

দিবাকর ঠাকুমাকে বলল, 'জানো ঠাকুমা, মেয়েদের পার্ট করতে বড় শরম লাগত। এখন লাগে না। হেডস্যারের কথা শুনে এখন আমার নাচতেও আপত্তি নাই।'

ঠাকুমা বলল, 'উত্তরপাড়ার ওই যে কানকাটা স্বপন, তার বাপও একসময় খুব ভালা নাইচত। মানুষরা তারে নাউট্যা বংশী নামে ডাইকত।'

'নাউট্যা কী ঠাকুমা?'

'যে পুরুষপোলা নাচে, তারে নাউট্যা বলে। বংশীদাদা ছোটবেলা থেকেই নাইচত। শাওন মাসে গেরামে গেরামে ভাড়া যেত নাকি। মুখে পাউডার–সোনো মাইখা শাড়ি পইরা মনসাপুঁথি পাঠের আসরে নাইচত। যখন যুবক হইল, নাইচন ছাড়ি দিল। ঢোল বাজাইতে পারত খুব। ঢোল কাঁধে লইয়া পুঁথিপাঠের আসরে ঘুইরা ঘুইরা নাচতে দেখছি বংশীদাদারে।' ঠাকুমা থামল। কী যেন ভাবল একটু। তারপর আবার বলল, 'নাচন দিয়া আর ঢোল বাজাইয়া তো সংসার চলে না। বউ-পোলার খাওন জোগাড় কইরতে হয়। পরে গাঙের কূলে কূলে হুরিজাল ঠেইলতে শুরু করল।'

'স্বপনকাকা কোনো সাহায্য করত না বাপকে?' দিবাকর জিজ্ঞেস করে।

'কানকাটা স্বপনের বয়স সতেরো-আঠারো। বাপেরে কোনো সাহায্য করে না। আয়-ইনকামে ধ্যান নাই। বাহারি রুমাল গলায় জড়াইয়া শুধু এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়ানো। বংশীদাদার দুঃখের সীমা-পরিসীমা ছিল না। শেষের দিকে শরীল দুর্বল হইয়ে পড়ছিল বংশীদাদার। না খেইয়ে না খেইয়ে শরীল হাড্ডিসার হইয়ে গেছিল। বংশীদাদার বউটি মাঝেমধ্যে চাইল ধার লইয়া যাইত। আক্ষেপ কইরে বইলত– সোয়ামিটা আমার একদিন সমুদ্রেই মারা যাইবে দিদি, দেখিও তুমি। তারপর মাথায় চাপড় মেরে মেরে বলত, ওই বেজন্মা স্বপইন্যাটা যদি কিছু উপার্জন কইরত, পেরানে বেঁচে যেত লোকটা।' বলে থামল ঠাকুমা।

দিবাকর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থামলে কেন ঠাকুমা? তোমার বংশীদাদার কী হলো বলো না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ঠাকুমার বুক চিরে বেরিয়ে এলো। বলল, 'আশঙ্কাই সইত্য হইল একদিন। হুরিজাল ঠেইলতে গেছিল বঙ্গসাগরের কূলে। ওখানে পইড়ে মইরে থাকল।' তারপর বলল, 'বাপের অভিশাপ লাইগছে ভাদাইম্যা স্বপইন্যার ওপর। জীবনে কিছুই কইরতে পারে নাই। বিয়া একখান কইরছিল। লাথি মাইরা বউটা চইলে গেল একদিন। এখন ঢোলটোল পিডাইয়া জীবন চালায়।'

দিবাকরের ভালো মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল। আহারে, বংশীদাদার এই কপাল! ছেলে বড় হলে মানুষের বুক বড় হয়। সংসারের দুঃখ ঘোচে। বংশীদাদার বুকও বড় হলো না, কপালের দুঃখও গেল না। শেষ পর্যন্ত অঘোরে প্রাণ হারাল!

ঠাকুমা বলল, 'তোরে যা বইলছিলাম দিবাকর, এই নাচনের ব্যাপারটা আমাদের সমাজে ছিল কিন্তুক। খুব বেশি দিনের কথা তো নয়, তৃতীয় সনেও তো চুনতির গৌরাঙ্গ নাউট্যা এই পাড়ায় মাস ধইরা নাইচা গেল। তো, সেই নাচনের রক্ত তো তোর মইধ্যেও আছে। সমাজের রক্ত বইলে কথা। লজ্জা বা ভয় পাওনর কী আছে?'

'একসময় তোমাকে আমার লজ্জার কথা বলছিলাম ঠিক, আজকে হেডস্যারের কথা শুনে সাহস বেড়েছে। এখন লজ্জা বা ভয় কোনো কিছুই লাগছে না।'

'ভালা, ভালা।' দিবাকরের কথা শুনে তৃপ্তির হাসি হাসল ঠাকুমা।

নাটক মঞ্চায়নের তারিখ ঠিক হয়েছিল, ২১ ফেব্রুয়ারি। মঞ্চ বাঁধাছাঁদাও হয়ে গিয়েছিল। স্কুলমাঠেই দক্ষিণমুখী করে মঞ্চটি তৈরি করা হয়েছিল। নাটক করতে গেলে নিকটবর্তী এয়ারফোর্স দপ্তরের অনুমতি লাগে। সাত দিন আগে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি কমান্ডার আশ্বাস দিয়েছে, 'হো জায়েগা।' সেই আশ্বাসের কারণে 'ফাগুনের আগুন' মঞ্চায়নের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সকালে মেকআপম্যান এসে বলল, 'অভিনেতাদের মুখে রুজ-পাউডার লাগানো যাবে না।'

মিলন স্যার বলে উঠলেন, 'কেন কেন?'

'সবার মুখে লম্বা-বেঁটে কেশ। ওই মুখে মেকআপ করা

চলবে না।'

'কী করতে হবে?' মিলন স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

'সবাইকে শেভ করতে হবে।' নির্বিকারভাবে মেকআপম্যান বলল।

'শে-ই-ভ!!' সবাই সমস্বরে বলে উঠল। তাদের তো বয়স কম। মুখে এখনো দাড়িগোঁফ গজায়নি। শুধু শুধু শেভ কেন? কিছুতেই শেভ করবে না অভিনেতারা।

'দেখ ছেলেরা, কূলে এসে তরী ডুবাস না। কোনো ঘেচাংপেচাং করিস না। সুশীল নাপিতকে আনিয়ে নিচ্ছি স্কুলে। শেভ করেনে সকলে।' মিলন স্যারের কথায় সবাই একে একে সুশীলের হাতে মুখমু ন করাল। সন্ধে হয় হয়। রাত আটটায় নাটক। শেষবারের মতো রিহার্সালটা দিতে হবে। মিলন স্যারের আফসোস শোনা গেল, 'এখনো হেডস্যার আর সেক্রেটারি সাহেব এলেন না। সেই কবে অনুমতিপত্রটা আনতে গেছেন।'

শেষ পর্যন্ত তারা ফিরলেন। তবে ভীষণ বিষণ্ন মুখে। ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে হেডস্যার বললেন, 'সব শেষ মিলনবাবু। হারামিরা পারমিশনটা দিল না।' এই প্রথম সবাই হেডস্যারের মুখে গালি শুনলেন। সমবেত সবাই চিৎকার দিয়ে উঠল, 'কেন, কেন স্যার? কেন পারমিশন দিল না?'

'ঘরের শত্রু বিভীষণ।' হেডস্যার বললেন।

সেক্রেটারি এমদাদ মিয়া বললেন, 'নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা মারা গেছেন, কিন্তু এখনো মীর জাফরের মৃত্যু হয় নাই।'

খবর পেয়ে স্কুলমাঠে ধীরে ধীরে মানুষজন জমতে শুরু করেছে। অভিনেতারা হেডস্যারের রুমে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষকরা বিষণ্ন মনে যার যার চেয়ারে বসে আছেন। শুধু বসেন নাই মিলন স্যার। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'আপনাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।'

এমদাদ মিয়া অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, "আমাদের গ্রাম থেকে কে একজন গিয়ে কমান্ডারকে বুঝিয়ে এসেছে– নাটকটির মধ্যে পাকিস্তানের বিরোধিতা আছে। বায়ান্নতে পাকিস্তান ভাঙবার জন্য ঢাকায় যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, দেশপ্রেমী পাকসেনাদের চাবকানিতে যে আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 'ফাগুনের আগুন' নাটকে নাকি সেই ভাষাপ্রেমকে নতুন করে উসকে দেওয়া হয়েছে।"

'তা ছাড়া নাটকে নাকি নাচ-গানও আছে। এটা সম্পূর্ণ শরিয়তবিরোধী।' বললেন হেডস্যার।

সেক্রেটারি বললেন, 'আরও নাকি বুঝিয়েছে ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে কোমর দোলানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটা কবিরা গুনাহ।'

'বলেছে– এই সবকিছুর পিছনে দুইজন মালাউন সক্রিয়। আমার সামনেই আমাকে গালি দিতে দ্বিধা করল না কমান্ডারটি।' বললেন হেডস্যার।

'কমান্ডারটির কান ভারি করবার জন্য এ-ও বলেছে– নাচ-গানের মাস্টার হয়েছে ওই পাকবিরোধী মালাউনটি, যাকে মাস কয়েক আগে অ্যারেস্ট করেছিলেন স্যার।' এমদাদ মিয়া বললেন।

'যতটুকু তাতা দরকার, তার দ্বিগুণ তেতে গেছে পাকুটি। পারলে আমাদের ঘাড়ে ধাক্কা দেয় হারামিটা। কুকুরে তাড়ানো বিড়ালের মতো পালিয়ে এসেছি। পেছন থেকে কমান্ডার বলেছে– মাদারচোদ বাঙালি।' মাথা নিচু করে বললেন হেডস্যার। তারপর তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তার দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াতে লাগল।

বর্বর পাককমান্ডারের এক ধমকে পতেঙ্গার প্রাণপ্রদীপটি নিবে গেল। জনমানুষের বিপুল উজ্জীবন পাকুদের অসভ্য সিদ্ধান্তে স্তব্ধ হয়ে গেল।

পাঁচ

'মৎস্যের শরীরে শল্ক আছে। বলত দেখি শল্ক মানে কী?'

বক্তার দিকে দিবাকর একবার ফিরে তাকিয়ে হাঁটতে থাকল।

'কীরে বেটা উত্তর না দিয়ে যাস কোথায়?' এক লাফে দিবাকরের সামনে এসে বললেন, 'তোরে জিজ্ঞেস করেছি, তোরে।'

দিবাকর থমকে দাঁড়াল। লোকটির ধমকে ভয় পেয়ে গেল সে। থতমত চোখে লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

লোকটি দীর্ঘদেহী। ছ'ফুট পেরোনো শরীর। গায়ের রং যমকালো। সত্তর ছুঁই ছুঁই বয়স। পরনের কাপড়টা লুঙ্গি না ধুতি বোঝার উপায় নেই। বিবর্ণ, ধূসর। উদোম গা। দাড়ির মতো শরীর। তবে একেবারে দাড়ির মতো নয়। দাড়ি দেওয়ার সময় মশা হুল ফুটিয়ে দিলে হাতটা একটু কেঁপে যায়। দাড়িটাও সামান্য বেঁকে যায়। লোকটার শরীরও সেরকম সামান্য বাঁকানো দাড়ির মতো। একটু কুঁজোটে বলা যায় তাকে। বাটিছাঁটা চুল। এত বয়সেও চুল পুরোপুরি পাকেনি। শরীরটা ধুলোমলিন। উনি যে স্নান করেন, দেখে আন্দাজ করা যায় না। লোকটির বাড়ি কোথায়, নাম কী– কেউ জানে না। মানুষের হাজারো জিজ্ঞাসার কোনো জবাব দেন না। যখন ইচ্ছে করে কথা বলেন, ইচ্ছে না করলে বলেন না। যেদিন প্রথম পতেঙ্গার বটতলায় এলেন, কৌতূহলী মানুষ ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তাকে। হাতে একটা চক ছিল লোকটির। একমনে রাস্তার ওপর লিখে যাচ্ছিলেন। হাতের লেখা অসম্ভব সুন্দর। ইংরেজিতেই লিখছিলেন তিনি। গাঁয়ের অশিক্ষিত মানুষরা এই লেখার অর্থ বুঝছিল না। স্কুলের হেডস্যারের কাছে খবর গিয়েছিল। বাবুল হক স্যারকে পাঠিয়েছিলেন হেডস্যার। ফিরে চোখ ছানাবড়া করে হক স্যার বলেছিলেন, 'দেখতে পাগলাছাগলা মনে হলো স্যার লোকটিকে। নির্ভুল বানানে ব্রিটিশ স্টাইলে শেকসপিয়রের নাটক থেকে লিখে যাচ্ছিলেন স্যার, লাইনের পর লাইন। 'কিং লিয়ার' নাটকের রাজা লিয়ারের সংলাপ।'

'বলেন কী হকসাহেব? আশ্চর্য তো!' অবাক কণ্ঠে বললেন সত্যব্রত চক্রবর্তী।

'বিস্ময়ের আরও বাকি আছে স্যার। এরপর রাবীন্দ্রিক ভঙ্গিতে লিখতে শুরু করলেন রবীন্দ্র-কবিতা। ওই স্যার শেষ কবিতাটি– তোমার সৃষ্টির পথ।'

হেডস্যার অবাক চোখে বললেন, "তোমার সৃষ্টির পথ!' ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাইতে লিখা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। সকাল সাড়ে ৯টায়। এর ছয়দিন পরেই তো রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন। আগস্টের ৭ তারিখে। তো, সেই কবিতা লিখেছেন লোকটা? হতভম্ব হবার মতো কাণ্ড।"

হক স্যার বললেন, 'স্যার আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। লোকটি লিখে গেলেন–

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী!
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।

হেডস্যার বললেন, 'হকসাহেব, আপনি তো একের পর

বিস্ময় সৃষ্টি করে যাচ্ছেন!'

বাবুল হক স্যার এবার কেন যেন হেঁয়ালি গলায় বললেন, 'বিস্ময়ের কী দেখেছেন স্যার? এর পরের ব্যাপারটা শুনলে স্তব্ধ হয়ে যাবেন আপনি।'

'স্তব্ধ হয়ে যাব!' হেডস্যার বললেন।

বাবুল হক স্যার বললেন, 'হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল– সিআইডি, সিআইডি। ইন্ডিয়ার গুপ্তচর। পাকিস্তানের গোপন খবর নেওয়ার জন্য পাগলা সেজে এসেছে। শুনে মানুষের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। বেশিরভাগ মানুষ লোকটির কথার বিরোধিতা করল। কিন্তু খারাপ লোকের তো অভাব নেই স্যার। খেপে গিয়ে কয়েকজন মারতে গেল লোকটিকে। আমি রুখে না দাঁড়ালে লোকটিকে চিড়েচ্যাপটা করে ফেলত। হাইস্কুলের টিচার বলে আর আমার বাড়ি এই গ্রামে বলে এ যাত্রা বেঁচে গেলেন লোকটি।'

শেষের দিকে হক স্যারের কণ্ঠ বেদনায় চুরচুর হয়ে গেল।

হেডস্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটি কী করলেন তখন?'

'সেই তো আশ্চর্যের ব্যাপার স্যার! মারমুখী লোকগুলোর দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকলেন শুধু। পালানোর চেষ্টা তো দূরের কথা, একটু নড়াচড়াও করলেন না। যেখানে বসে ছিলেন, সেখানেই বসে থাকলেন।'

'কিচ্ছু বললেন না?'

'না। একটি শব্দও মুখ দিয়ে বের হলো না তার। আমি দাবড়িয়ে মানুষগুলোকে সরিয়ে দিলাম। লোকটির বললাম– আমার সঙ্গে চলেন। কোনো ভাবান্তর হলো না তাঁর। শুধু ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।'

'নিশ্চয়ই মস্তবড় জিনিয়াস হবেন। নজর রাখুন তো ওর ওপর।' বলে নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সেদিন সত্যব্রত স্যার।

এর পরও পতেঙ্গা ছেড়ে চলে গেলেন না লোকটা। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকলেন। কখনো গাঁয়ের ভেতরদিকে চলে যান, কখনো কাটগড় এলাকায় ঘোরেন। বেশির ভাগ সময় বটগাছটির তলায় মাথার নিচে একটা ইট রেখে ঘুমান। ধীরে ধীরে মানুষের সন্দেহ কেটে যায়। মানুষরা এটা সেটা খেতে দিতে থাকে তাকে। খিদে থাকলে হাত পেতে নেন, না থাকলে নেন না।

যে দুপুরে দিবাকরদের পাড়ায় এলেন লোকটি, লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেল। পুরুষরা সবাই সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে। ফাগুন-চৈত্রের কোনো একটা দিন হবে। খাওয়ার পাট চুকিয়ে মহিলাদের কেউ গাছতলায়, কেউ ছায়াময় উঠানের কোণে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। দিবাকর স্কুলে। বুড়া লক্ষ্মীচরণ এসে রটিয়ে দিল– পাড়ায় ছেলেধরা ঢুকেছে। সে নিজ চক্ষে সাঁকো পেরিয়ে ছেলেধরাকে পাড়ায় ঢুকতে দেখেছে। কাঁধে মস্তবড় একটা বস্তা। অন্যপাড়ায় ছেলেধরা শেষ করে জেলেপাড়ায় ঢুকেছে। আজ যে কোন অভাগী মায়ের কপাল পোড়ে কে জানে!

শোনামাত্র গোটা পাড়ায় হইচই পড়ে গেল। বাচ্চাকাচ্চার হাত ধরে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। লক্ষ্মীচরণের কথা ঠিক কিনা– যাচাই করার ধৈর্য আর সাহস নেই তাদের। আগে সন্তান বাঁচানো, তারপর তো যাচাই। ঝোপজঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল নারীরা। তাদের বুকের কাছে সেঁটেধরা সন্তানরা। গোটা পাড়া সুনসান, ফাঁকা। লোকটি সমস্ত পাড়া ঘুরে বেরিয়ে গেলেন। ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল সবাই। ওই সময়ে দিবাকরের স্কুল থেকে ফেরা। দিবাকর এর আগে বটতলায় লোকটিকে দেখেছে। সেদিন বাবুল হক স্যারের কাছে লোকটির কথা শুনে তাদের ক্লাসের সবাই ছুটির পর দেখতে গিয়েছিল লোকটিকে। লোকটির কাণ্ড আর চেহারা দেখে দিবাকরও অবাক হয়েছিল। ভয়ও লেগেছিল একটু একটু। যদি ইন্ডিয়ার গুপ্তচর হন!

সেদিনের পর আজকে দেখা। সূর্য বিকেলের বাড়িতে যাওয়া শুরু করেছিল। প্রচণ্ড খিদে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল দিবাকর। মাথা নিচু করেই হেঁটে আসছিল। কোন সময় লোকটি তার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছেন, খেয়াল করেনি। খেয়াল করল তখন, যখন শল্ক মানে কী জিজ্ঞেস করলেন। ভয়ে জোর কদমে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল দিবাকর। কিন্তু লোকটি এক লাফে তার পথ আটকে দিলেন। বললেন– তোরে জিজ্ঞেস করেছি, তোরে।

দিবাকর 'শল্ক' শব্দের মানে জানে। বাবার কাছেই 'রাম-সুন্দর বসাকের আদি বাল্যশিক্ষা পড়া। ওই বইয়ের সব কথার, সকল শব্দের মানে বাবা বুঝত না। যেগুলো যেগুলো বুঝত, বুঝিয়ে বলত। বাবাই তাকে বুঝিয়ে বলেছে– খল জন ছল মন, ভাবনা যত যাতনা তত, বয়ঃ বাড়ে পয়ঃ ছাড়ে, দিলে বিধি মিলে নিধি– এসব কথার মানে কী। 'বাল্যশিক্ষা'য় নয় লাইনের যে 'রামায়ণ'কথা আছে তা যেমন বলেছে, তেমনি বলেছে সাত লাইনের 'মহাভারতে'র কথা। বাপের একদিনের কথায় একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল দিবাকর। বাবা বলরাম বলেছিল, 'তোমারে তো সাতলাইনের 'মহাভারতে'র কথা বলেছি আগে। আজ বইলব একলাইনের 'মহাভারতে'র কথা। আর একলাইনের 'রামায়ণে'র কথা। গোটা 'রামায়ণ' বা 'মহাভারত' যে ওই লাইন দুইটাতে সমপূর্ণত বর্ণিত হইয়েছে এমন নয়, তবে সারকথাটা উইঠে এসেছে ওই চরণ দুইটাতে।' বলরামের সেদিন কী হয়েছিল কে জানে, সমপূর্ণত বর্ণিত, চরণ– এই রকম সংস্কৃত শব্দ বলে গিয়েছিল পুত্রের কাছে।

দিবাকর বলেছিল, "ধুর বাবা, এই লাইনে 'মহাভারত' আর 'রামায়ণ' হয় কী করে? কত বড় 'মহাভারত', আঠারোটি পর্ব! আর 'রামায়ণ'ও কি কম বড়? সপ্তকাণ্ডের 'রামায়ণ!"

বাপ বলেছিল, 'মিছা কই নাই পুত। লেখাপড়া কম জানি সইত্য, কিন্তুক যা জানি ভালা কইরে জানি। 'রামায়ণে' রাবণই তো সব? দশমাথা ছিল তার। বিশাল শরীল। রাবণের মৃত্যুর মইধ্য দিয়াই তো 'রামায়ণ'কথা শেষ? শিবের কাছ থেইকা বর হিসাবে পাওয়া তীক্ষ্ণ মরণ বাণেই মারা গিয়েছিল রাবণ। সেই রাবণের মৃত্যুর কথা আছে এইভাবে– খরতর বরশর হতদশ বদন। আর 'মহাভারতে'র মূলকথা– অহংকারই ধ্বংসের মূল। অহংকারী কৌরব বংশ পা বদের হাতে নির্বংশ হইয়েছিল। বাইল্যশিক্ষায় লেখা আছে– গৌরব করে কৌরব মরে।"

এই-ই হলো বলরাম। এই বলরামের কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল দিবাকরের। তাই এই বলরামের পুত্র দিবাকর 'শল্ক' শব্দের অর্থ জানবে না তো কে জানবে? দিবাকর বুঝল– লোকটির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার বাঁচোয়া নেই। কিছুতেই যেতে দেবেন না তাকে। তাই দিবাকর বলল, 'শল্ক মানে মাছের আঁশ। এর আর একটা অর্থ আছে, বাকল।'

লোকটি বেশ খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো। বললেন, 'বাঃ! আচ্ছা কয়েকটি ফুলের নাম বলো তো।' তুই থেকে তুমিতে চলে এলেন লোকটি।

এটা তো সোজা। ছোটবেলায় বাবার কাছে বসে বসে ফুলের নাম মুখস্থ করেছে দিবাকর। আজ এত বছর পরও ভোলেনি। গড়গড় করে সে বলে গেল–

'কামিনী মালতি যূথি কেতকি মল্লিকা।
গোলাপ টগর চাঁপা জবা শেফালিকা ॥
গন্ধরাজ সূর্যমুখী কুন্দ কৃষ্ণচূড়া।
বকুল পলাশ পদ্ম কদম্ব ধুতুরা॥'

হঠাৎ দীর্ঘ হাত দুটো বাড়িয়ে দিবাকরকে নিজের দুর্গন্ধময় ময়লাযুক্ত বুকে টেনে নিলেন লোকটি। চাপাস্বরে বললেন, 'এক্সিলেন্ট মাই বয়। ব্রিলিয়ান্ট।'

কতক্ষণ বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন তিনি, দিবাকর হিসেব রাখেনি। হয়তো এক মিনিট, হয়তো পাঁচ মিনিট, হয়তো বা তার চেয়েও বেশি। লোকটির বুকে দিবাকর ভীষণ জড়সড় হয়ে গুটিয়ে ছিল। খেয়াল হলো তখন, যখন ঝট করে দিবাকরকে বুক থেকে সরিয়ে দিলেন। বললেন, 'যা যা, দূরে যা। মায়া, সব মায়া। সব ছলনা।'

পেছন ফিরে হাঁটা শুরু করার আগে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তোকে সাবধান করে দিচ্ছি- খবরদার, আর কোনোদিন আমার সামনে পড়বি না। সামনে পড়বি না।' বলতে বলতে দৌড় দিলেন তিনি। মনে হলো দিবাকরের কাছ থেকে বাঁচবার জন্যই দৌড় দিলেন।

দিবাকর সেই পড়ন্ত বিকেলে জঙ্গলে আকীর্ণ ধূলিমলিন পথের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে লোকটির চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না- এ রকম করে দৌড়ে চলে গেলেন কেন লোকটি? তিনি কি তার সামনে থেকে পালাতে চাইছেন? ভয়ে? কিন্তু পালাবেন কেন? ভয়ও বা পাবেন কেন? যাকে দেখে মানুষরা ভয় পায়, সেই লোকটি দিবাকরের মতো সামান্য একটা কিশোরকে ভয় পাবেন কেন? হঠাৎ রেগে গিয়ে কেন বললেন- খবরদার, আর কোনোদিন আমার সামনে পড়বি না। তাহলে কি লোকটি তাকে ঘৃণা করেন? কিন্তু ঘৃণিত কাউকে কি কেউ বুকে জড়িয়ে ধরেন? বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেন- এক্সিলেন্ট মাই বয়, ব্রিলিয়ান্ট? কিছুতেই হিসাব মিলাতে পারে না দিবাকর। নিথর হয়ে জড় ভরতের মতো পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে দিবাকর।

দূর থেকে জেলেপাড়ার নারীরা দু'জনের কা কারখানা লক্ষ করে। থর থর করে তাদের বুক কাঁপতে থাকে। যোগমায়ার তো মূর্ছা যাবার অবস্থা। কী হবে তার বাছার? যদি ছেলেধরাটি তার পুত্রের কোনো ক্ষতি করে বসে? যদি তার ছেলেকে নিমিষে বস্তায় পুড়িয়ে নেয়? লোকটির হাতে বস্তা আছে কিনা, থাকলেও সেই বস্তায় এইটে পড়া দিবাকরকে ঢুকানো যাবে কিনা, ভাববার অবকাশ নেই যোগমায়ার। শুধু দুই হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এইটুকু আর্তনাদ করবার অবকাশ পেল- ও ভগমানরে, ও ঈশ্বররে, ওই দুষ্ট লোকটার হাত থেইকে আমার বাছারে বাঁচাও রে ভগমান।

লোকটি পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলে, জেলেপাড়ার নারী, বৃদ্ধ, বাচ্চারা দিবাকরের নিকটে দৌড়ে এসেছিল। তাদের প্রশ্নের অন্ত ছিল না- ছেলেধরাটি কী বইল্যা তোমারে? একা পেইয়েও বস্তায় তোমাকে ভইরল না কেন? জাপটে ধইরেও ছেড়ে দিল কেন তোমারে দুষ্ট লোকটি?

দিবাকর শুধু বলল, 'ছেলেধরা নন উনি, দুষ্টলোকও নন।'

'তাইলে কী?' সমস্বরে সবাই জানতে চাইল।

'জানি না। তবে এইটুকু জানি- তিনি ভালো লোক।' মাথা নিচু করে জবাব দিল দিবাকর।

পরদিন লোকটিকে আর বটতলায় দেখা গেল না। দিবাকর ভাবল- স্বভাবমতো গ্রামের অন্য কোথাও ঘুরতে গেছেন বোধ হয়। ঘোরাঘুরিই তো তার কাজ। নিশ্চয় কিছুক্ষণ পর ফিরে আসবেন। কিন্তু দুপুর ছুটিতে গিয়েও দেখল- লোকটি বটতলায় নেই। বিকেলে স্কুলছুটির পরও তাকে সেখানে দেখা গেল না। বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল দিবাকর। কোনো অসুখ-বিসুখ করল না তো তার? কোনো খানাখন্দে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন না তো? মরে পড়ে থাকলেন না তো কোথাও? বুকটা থরথরিয়ে উঠল দিবাকরের। ধুর, কীসব আজেবাজে কথা ভাবছে সে? লোকটি মরবেন কেন? তার কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞাসার যে রয়ে গেছে তার। কোথা থেকে এসেছেন? নাম কী? পরিচয় কী? ছেলেমেয়ে ক'জন? পাগল তো না তিনি। তারপরও পাগলবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? গতকাল হঠাৎ করে তাকে এরকম করে বুকে টেনে নিলেন কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর যে তার জানা দরকার। তার বয়সী কোনো পুত্রসন্তান ছিল কি তার? হারিয়ে গেছে? তাকেই কি খুঁজতে বেরিয়েছেন তিনি? এইসব প্রশ্ন দিবাকরের মাথায় বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল।

সেই বেলা বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে এলো দিবাকর। রাতে ভালো ঘুম হলো না তার। বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ-ওপাশ করল। ঠাকুমা জিজ্ঞেস করল, 'কীরে দিবাকর, ঘুমাস না ক্যান? শুধু চাইট্যাচাইট্টি করতাছস?'

দিবাকর সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, 'ঘুমাব ঠাকুমা। পিদিমটা নিবিয়ে তুমি ঘুমিয়ে পড়।'

পরদিন সকালে অনেক আগে স্কুলে চলে গেল দিবাকর। বটতলায় লোকটিকে পেল না। স্কুল শুরুর আগে যতটুকু সম্ভব আশপাশে খুঁজে দেখল। কিন্তু পেল না। পরদিন স্কুলে গেল না দিবাকর। সারা গাঁয়ে তন্নতন্ন করে লোকটিকে খুঁজে বেড়াল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না তাকে। কেন এসেছিলেন লোকটা? উচ্চশিক্ষিতই হবেন তিনি। তার চেহারা দেখে মোটেই অভাবী মানুষ বলে মনে হতো না। নিশ্চয় ধনী ব্যক্তি। তাহলে কোন দুঃখে এই শিক্ষিত ধনী লোকটি ঘর ছেড়েছিলেন? কেন ছন্নছাড়া ধূলিমলিন জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন?

এইসব রহস্যময় প্রশ্নগুলোর উত্তর অজানাই থেকে গেল দিবাকরের কাছে।

সন্তান হারানোর যে কী ব্যথা, তা ছিদামের মাকে দেখে বুঝেছে দিবাকর। ছিদামের মায়ের নাম ছিল তীর্থবালা। তীর্থবালার পাড়াটি ছিল একেবারে সাগরকোলে। মানুষরা এই পাড়াকে বলত- দক্ষিণপাড়া। সেই দক্ষিণপাড়ায় বিশ-বাইশটি ঘর ছিল। সাগরে মাছ ধরেই জীবন চলত তাদের। বালির টিলার ওপর ঘরগুলো। তো, ওই ধুমবালিতে খেলেদুলে দক্ষিণপাড়ার বাচ্চাকাচ্চারা বড় হতো। এক বর্ষার রাতে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ঝড় বইল। সমুদ্রজল ফুলেফেঁপে উঠল। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ল পাড়ে, জেলেপাড়াটিতে। এ রকম ঘটনা পুস্তপুরুষে কোনোদিন ঘটেনি। কত ঝড়তুফান, কত বর্ষাবাদল এসেছে, আবার গেছেও। কোনোদিন জেলেপাড়াটি ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি। এবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যারা পেরেছে গাছগাছালিতে চড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, অনেকে ভেসে গেছে। তীর্থবালার দুই ছেলে। ছোট ছোট। সেই রাতের ঝড়-জলে কোথায় যে ভেসে গেল ওরা! পরদিন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও পাওয়া গেল না তাদের। আস্তে আস্তে পাগল হয়ে গেল তীর্থবালা। সমুদ্রের কূলে কূলে, জেলেপাড়ার গলিতে গলিতে ছেলে দুটোকে খুঁজে বেড়াত। আর বলত, 'আমার পুত। আমার পুত ছিদাম-শিমুলকে দেখছ তোমরা?' বলত আর দু'হাত দিয়ে জোরে জোরে নিজের মাথায় আঘাত করত। গায়ে কাপড় রাখত না তীর্থবালা। স্বামী নগরবাঁশি পাছে পাছে থাকত। গা থেকে তীর্থবালা শাড়ির আঁচল ফেলে দিলে পরম যত্নে তা বউয়ের

শরীরে পেঁচিয়ে দিত। বলত, 'দেইখা নিও ছিদামের মা, তোমার ছেইলেরা একদিন ফিইরা আইসব।'

বিপুলা জেঠিও কি কম কেঁদেছে ছেলের জন্য? প্রতি সন্ধ্যায় দাওয়ায় বসে বসে কাঁদত বিপুলা জেঠি। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বিলাপ করত। সুর করে কাঁদতে কাঁদতে বলত– ও নন্দলালরে, আমাদের ফেইলে তুই কোথায় গেলিরে বাছা? তোরে আমরা ভালোবাসার খাঁচায় পুরাইয়া রাখছিলামরে বাছা। সেই তুই আমাদেরে ফেলাইয়া থুইয়া কোন বিদেশে বিবাগী হইয়া ঘুইরা বেড়াইতেছস রে পুত। আমি যদি পাখি হইতাম, উইড়া গিয়া দেইখা আইসতামরে বাছা।' পাশে বসে বিপুলা জেঠির দুইচোখ মুছিয়ে দিতে দিতে সুবল জেঠা বলত, 'এমন কইরে কাইন্দ না তুমি। তোমার নন্দলাল একদিন তোমার বুকে ফিইরা আইসব।'

ছিদাম–শিমুল তীর্থবালার বুকে ফিরে না এলেও নন্দনাল কিন্তু সত্যি একদিন বিপুলা জেঠির কাছে ফিরে এসেছিল।

বয়সে নন্দলাল দিবাকরের অনেক বছরের বড়। নন্দলাল যখন জাহাজে গেল, তখন দিবাকরের জন্মও হয়নি। দুই কলম লেখাপড়া শিখেছিল নন্দলাল। নামধাম ঠিকানা লিখতে পারত। বয়স যখন আঠারো–উনিশ, বিদেশ যাওয়ার পোকা ঢুকল নন্দলালের মাথায়। সে নাকি জাহাজের নাবিক হবে। নানা দেশ দেখবে। গভীর বিশাল সমুদ্র দেখবে। কিন্তু কীভাবে জাহাজের চাকরি পাওয়া যায়, জানত না নন্দলাল। আর নন্দলাল না জানলে তার অশিক্ষিত বাপ সুবল জেঠা জানবে কোত্থেকে?

নন্দলাল একদিন খবর আনল– পাওয়া যাবে, ফজল বল্টনকে ধরলে বিদেশি জাহাজে চাকরি পাওয়া যাবে। বল্টন মানে বাটলার। আবুল ফজল ব্রিটিশ জাহাজে রান্নাবান্নার কাজ করে। গড়গড় করে ইংরেজি বলে। সাহেবসুবাদের সঙ্গে ফজল বল্টনের অনেক খায়খাতির। ফজল বল্টন অনুরোধ করলেই নন্দলালের চাকরিটা হয়ে যাবে। সুবল জেঠা নন্দলালকে নিয়ে বল্টনের পায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ল। বল্টন যতই এড়িয়ে যেতে চায়, ততই বাপে-পুতে বল্টনের দুই পা জোরে চেপে ধরে। শেষ পর্যন্ত বল্টনের চেষ্টায় তারই জাহাজে খালাসির চাকরি জুটে গেল নন্দলালের। মা-বাবা আর পাড়াপড়শির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একদিন জাহাজে গিয়ে উঠল নন্দলাল। এবং প্রথমবারেই টেমস নদীতে ঝাঁপ দিল সে।

বাংলাদেশ থেকে নানা দেশ ঘুরে এক সন্ধ্যায় ইংল্যান্ডের টেমস নদীতে ঢোকে জাহাজটি। এমভি হ্যামিলটন। মোহনা ছাড়িয়ে জাহাজটি একটু ভেতর দিকে ঢুকতেই ডেক থেকে ঝাঁপ দেয় নন্দলাল। মরবার ভয় নেই তার। মরব অথবা তীরে উঠব– এই ছিল নন্দলালের পণ। লন্ডনে তাকে থাকতে হবেই। তখন সাঁঝবেলা। গ্রীষ্ম চলছিল তখন ইংল্যান্ডে। তাই নদীজল উষ্ণ উষ্ণ। অন্যসময় হলে বরফজলে জমাট বেঁধে যেত নন্দলালের শরীর। ওর ঝাঁপ দেওয়াটার ব্যাপারটার নাবিকদের মধ্যে তখন কেউ টের পেল না, টের পেল যখন জাহাজটি জেটিতে ভিড়ল। সাঁতার জানত নন্দলাল। বঙ্গোপসাগরের বড় বড় ঢেউ আর খরস্রোতকে অতিক্রম করে বহুবার মাছ ধরতে গেছে সে। ভাগ্য ভালো ছিল তার। পুলিশের চোখ এড়িয়ে কেমনে কেমনে একদিন লন্ডনের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গেল নন্দলাল। তবে তার আগে অনেকটা বছর গা-ঢাকা দিয়ে লন্ডনে থাকতে হয়েছে তাকে। ধরা পড়ার ভয়ে মা-বাবাকে কোনো চিঠিপত্র লিখত না সে।

বহু বছর পরে, যখন কাঁদতে কাঁদতে বিপুলা জেঠির চোখের জল ফুরিয়ে এসেছে, পতেঙ্গায় উপস্থিত হয়েছিল নন্দলাল। তখন সে সাহেব নন্দলাল। মাথায় হ্যাট, হাতে দামি ঘড়ি, চোখে রোদচশমা, গায়ে কোট-প্যান্ট। আর শরীরে ভুরভুরে সেন্টের গন্ধ। গোটা পাড়া ভেঙে পড়ল নন্দলালকে দেখার জন্য। বাংলা অনেকটা ভুলে গেছে নন্দলাল। ইংরেজির সঙ্গে ভাঙা ভাঙা বাংলা মিশিয়ে কথা বলে; চামচে করে ভাত খায়। দূরে দাঁড়িয়ে চোখে বাঘ দেখার কৌতূহল ও ভয় নিয়ে নন্দলালকে দেখে যায় পাড়ার মানুষ।

নন্দলাল দিবাকরদের পুকুরের দক্ষিণপাড়ে একটা ইট-সিমেন্টের ঘাটলা বানিয়ে দিল। ঘাটলা পেয়ে জেলেপাড়ার মানুষরা বর্তে গেল। মন্দিরও গড়ে দিল একটা। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল– নন্দলালের মতো ছেলে হয় না। গরিবকে কাপড় কিনে দেওয়া, সুরধ্বনির মাকে দামি কম্বলটা দিয়ে দেওয়া, বস্তায় বস্তায় চাল কিনে দরিদ্র জেলেদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, নন্দলাল ছাড়া আর কে করেছে?

চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নন্দলালকে দেখে দিবাকর। একদিন দিবাকরের ওপর চোখ পড়ে নন্দলালের। হাত-ইশারায় কাছে ডাকে। নাম, বাবার নাম জিজ্ঞেস করে। তারপর আনন্দে ফেটে পড়ে বলে– ও, টুমি বলরাম কাকার ছেলে? পড়ালেখা করো হাইস্কুলে? গুড, ভেরি গুড।'

কিন্তু জেলেপাড়ায় কি দুষ্টলোকের অভাব আছে? তারা প্রচার করা শুরু করে নন্দলাল এখন আর হিন্দু নয়, খিরিষ্টান হইয়ে গেছে। দেখ না, গরুর মাংস খেইয়ে খেইয়ে সাহেবদের মতো গায়ের রং হইয়েছে তার? প্রায়চিত্ত করতে হবে নন্দলালকে। মাথা মুড়িয়ে গোবর খেইয়ে পুনরায় জাতে উইঠতে হইবে তাকে। নইলে তারাও দেখে নেবে নন্দলালের পরিবারকে।

পঞ্চানন খুড়োই জলঘোলা করল বেশি। ভাদাইম্যা ধরনের লোক। কোনো কামকাজ করে না। বউয়ের কামাই দিয়ে পেট চালায়। বউটি বহদ্দারের কাছ থেকে মাছ কিনে হাটে-পাড়ায় বেচে। পাড়ার লোকেরা পঞ্চানন খুড়োকে ভাউর্গা ডাকে। ভাউর্গা মানে বউয়ের কামাই খায় সে স্বামী। পঞ্চাশ পেরোনো পঞ্চানন খুড়োর কাজই হলো বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্যাঁচ লাগানো। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে গণ্ডগোল লাগিয়ে সে আনন্দ পায়। পাড়ায় ভাদাইম্যা জাতের লোকদেরও কিছু সাকরেদ থাকে। তিলকে তাল করার কাজে তারা উস্কানি দেয়। তো পঞ্চানন খুড়ো বাড়ি বাড়ি ঘুরে নন্দলালের বিরুদ্ধে বলে বেড়াতে লাগল, 'তোমরা বইল্লে বইলতে পার নন্দলাল ভালা মানুষ, আমি বইলব না। চাইল-ডাইল দিছে কী হইছে, মন্দির-ঘাটলা বাইন্ধা দিছে কী হইছে, বলি জাতের চেয়ে কি ওইগুলা বড়? কখনো না। আগে জাত, তারপর ভাত। খিরিষ্টান নন্দলালের বিচার হওন দরকার। তোমরা রাজি থাইকলে আমি শালিস ডাইকতে পারি।'

বলরামকে একদিন এসব কথা বলতে এলো খুড়ো। নন্দলালের প্রসঙ্গ তুলবার আগে ভূমিকা করে বলল, 'কেমন আছ বলরাম?'

বলরামের কানে এর আগে পঞ্চানন খুড়োর কীর্তিকাণ্ডের কথা পৌঁছে গেছে। খুব বিরক্তও হয়েছে বলরাম। খুড়ো একটু প্যাঁচাটে বলে আগবাড়িয়ে কিছু বলতে যায়নি খুড়োকে। আজ যখন বাড়ি বয়ে নন্দলালের দুর্নাম গাইতে এসেছে, ছাড়া যাবে না।

বিরক্ত গলায় বলরাম বলল, 'ভালা আর থাইকতে দিলা কই খুড়ো? যেভাবে সাদা মানুষটির বদনাম কইরে বেড়াইচ্ছ।'

খুড়োর বুঝতে অসুবিধা হলো না, বলরাম নন্দলালের কথাই বলছে। শ্লেষ মেশানো গলায় বলল, 'নন্দলাল আবার সাদা মানুষ হইল কবে? আঠারো বৎসর আগের নন্দলালেরই তো দেখতাছি। যেই শামলা, সেই শামলা।'

'তাহলে তুমি বইলে বেড়াইচ্ছ কী কইরে যে, নন্দলাল সাহেব হইয়ে গেছে? সাহেবেরা তো গোরা। আরও বইলতাছ গরুর মাংস খেইয়ে খেইয়ে গোরা হইয়ে গেছে নন্দলাল?' গরুর মাংস খাইলে মানুষ গোরা হয়নি? যদি অইতো, তাইলে তোমার কথা মতো নন্দলালও গোরা মাইনে ফর্সা হইয়া যাইতো। হে তো দেখি– আগের মতোই শামলা। জিজ্ঞেস করল বলরাম।

'বিদেশ গেইলে গরুর মাংস না খেইয়ে পারেনি মানুষ?' খুড়ো জোর গলায় বলল।

'বিদেশে গেইলে যে মানুষ গরুর মাংস খায়, কোথায় পেইলে এই খবর? গরুর মাংস খেইলে যে জাত যায়, সেই তথ্যও পাইলে কোথায় খুড়ো? 'মহাভারতে'র কালে মাইনে দ্বাপর যুগে তো মানুষ কচি গরুর মাংস দিয়া অতিথির সেবা কইরত।'

একটু চুপসে গেল যেন পঞ্চানন খুড়ো। আমতা আমতা করে বলল, 'তারপরও পাপী নন্দলালেরে ছাড়ন যাইব না।'

'শুন খুড়ো, সেই পাপীর কাছ থেইকাই কিন্তুক তোমার বিধবা মাইয়াটি উমের কম্বলটা নিছে।' তারপর দূরের আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বলরাম। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'দেখ খুড়ো, বিপুলা জেঠির বিলাপ তো তুমি শুন নাই? বুক চাপড়ে চাপড়ে কী কান্না যে কাঁইদতো জেঠি। বহু বৎসর পরে মায়ের খালি বুকে পোলাটা ফিইরা আইছে, গণ্ডগোল পাকাইয়া মায়ের বুকটা আবার খালি করার ব্যবস্থা নিও না।'

সুবিধা করতে না পেরে বলরামের বাড়ি থেকে সেদিন ফিরে এসেছিল পঞ্চানন খুড়ো। কিন্তু তার কার্যকলাপে ইতি টানেনি।

নন্দলালের কানে পঞ্চানন খুড়োর কথাগুলো পৌঁছায়– নন্দলালের জাত গেছে। গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে আবার জাতে উঠতে হবে। বিষণ্ন মনে ঘরে বসে থাকে নন্দলাল। আগে যেভাবে এর ওর সঙ্গে কথা বলত– কাকিমা, মাম্মিমা, কেমোন আছ টোমরা? অথবা আজ কী দিয়া ভাত খাইছ চৌরাশির বাপ ডাড়ু? সেরকম কিছু জিজ্ঞেস করে না এখন। দাওয়ায় বসে উঁচু শিরীষ গাছটির মাথার দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু। একদিন দিবাকর নন্দলালের বাড়িতে যায়। তাকে পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে নন্দলাল। বলে, 'এস এস ডিবাকর।'

দিবাকর কাছ ঘেঁষে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে, 'মন খারাপ কেন আপনার?'

এক টুকরা বিষণ্ন হাসি হেসে নন্দলাল বলে, 'কই না টো!'

'আপনি মিথ্যেটাও বলতে শিখেননি দাদা। চেহারাকে স্বাভাবিক রেখে, কণ্ঠে জোর দিয়ে মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে হয়।'

'টুমি টো বেশ চালাক আছ দেখি ডিবাকর।' দীর্ঘদিন লন্ডনে থাকতে থাকতে নন্দলালের বাংলা উচ্চারণও ইংরেজদের মতো হয়ে গেছে।

'আপনার চোখমুখ দিয়ে কষ্ট ঝরে ঝরে পড়ছে দাদা। যাদের জন্য এত কিছু করলেন, তারাই বদনাম করছে আপনার। যাদের জন্য অনেক কিছু করলেন, তাদেরই কেউ কেউ আপনার বিরুদ্ধে লাগল!'

নন্দলাল কিছু বলল না। ম্লান একটু হাসল।

'আপনি কিছু মনে করবেন না দাদা। ওরা এরকমই। যে পাতে খায়, সেই পাতে হাগে।' বলে জিহ্বায় কামড় দিল দিবাকর। বলল, 'মাফ করবেন দাদা, কুকথা বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে।'



'ডিবাকর, আজ ওসব কথা থাক। চল আমরা অন্য গল্প করি।' বলে লন্ডনের সাহেব-মেমদের গল্প বলতে শুরু করল নন্দলাল। কিন্তু সে গল্প জমল না। দু'চার লাইন বলে হঠাৎ হঠাৎ থেমে যেতে লাগল নন্দলাল। কী রকম উদাসী আনমনা একটা ঘোর যেন নন্দলালকে পেয়ে বসেছে। একটা সময়ে গল্পবলা একেবারে থামিয়ে দিল নন্দলাল। বলল, 'আজ আর ভালো লাগছে না। আজ টুমি যাও ডিবাকর।'

এর দিন ছয়েক পরে দিবাকরের সকালের ঘুম ভাঙল বিপুলা জেঠির বিলাপে। তিন বাড়ি পরেই নন্দলালদের বাড়ি। ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল দিবাকর। গত রাতে শুতে

শুতে অনেক দেরি হয়ে গেছে তার। দু'দিন পর গণিত পরীক্ষা। পাটিগণিতের সুদকষার চেপ্টারটা রিভিশন দেওয়া বাকি। অঙ্কগুলো নিয়ে বসেছিল গতরাতে। শুতে গেল যখন, তখন গভীর রাত। সকালে ঘুম ভাঙতে তাই বেশ বিলম্বই হয়ে গেল। ঘুম পাতলা হয়ে এলে বিপুলা জেঠির বিলাপ কানে এসে আছড়ে পড়েছিল। পড়ি কি মরি করে নন্দলালের বাড়িতে ছুটে গিয়েছিল দিবাকর। গিয়ে দেখে ছিল উঠানভর্তি মানুষ। সবারই চেহারা কাঁদো কাঁদো। কী হয়েছে জানতে চাইলে একজন বলল, 'আইজ ভোরসকালে নন্দলাল দাদা চইলে গেছে?'

'চইলে গেছেন!! কোথায় গেছেন? কেন গেছেন?' দিবাকরের প্রশ্নের কেউ জবাব দিল না। শুধু গামছা দিয়ে, আঁচলের কোনা দিয়ে চোখ মুছতে লাগল সবাই।

দিবাকর বিপুলা জেঠির দিকে তাকাল। দেখল– জেঠি হাপুস নয়নে কেঁদে যাচ্ছে আর সুবল জেঠা আগের মতো চোখ মুছিয়ে যাচ্ছে জেঠির। দিবাকর সামনে গেলে আরও আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করল বিপুলা জেঠি। বিলাপে যা বলল, তার মর্মার্থ হলো– বেশ কিছুদিন ধরে ভীষণ মনখারাপ নন্দলালের। আগের মতো কথা বলে না। মা বলে জড়িয়ে ধরে না। যেন বোবা হয়ে গেছে নন্দলাল। শুধু গত পরশু বলল– আমাদের পাড়ার মানুষগুলোর কোনোই পরিবর্তন হয়নি মা। প্রায়শ্চিত্ত করতে বলল আমাকে! গোরব খেতে বলল! তারপর আরও জোরে কাঁদতে কাঁদতে বিপুলা জেঠি বলল, 'আইজ সকালে উইঠে বাছা আমারে বইল্য– যাই মা। আমি বইল্যাম– কই যাস পুত? পুতে কইল– ফিইরা যাই মা। লন্ডনে ফিইরা যাই। এইখানে থাকা যাইবে না। বইলা পা ছুঁইয়া পেন্নাম কইল্য আমারে আর তার বাপেরে। তার পর হাঁটা দিল। একবারের জইন্যও পিছন ফিইরা তাকাইল না আর।' এরপর চিৎকার দিয়ে বিপুলা জেঠি বলল, 'পঞ্চানইন্যারে, আমার পুতে কখন তোর নৌকার মাথায় কুড়াল মারছিল?

দিবাকর তাকিয়ে দেখল– উঠানের এককোণে দাঁড়িয়ে পঞ্চানন ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে।

ছয়

রাতে চুপচাপ ঠাকুমার পাশে শুয়ে থাকে দিবাকর।

ঠাকুমা জিজ্ঞেস করে, 'কী রে দিবাকর, কথা কইছিস না যে?'

'এমনি এমনি।'

'তুই ঠিক কইলি না দিবাকর। তোর মনে দুঃখ আছে কুনু। জন্মের পর থেইকা তোরে আমি চিনি।'

দিবাকর ম্লান একটু হাসল। পিদিমের আলোয় সেই হাসি দেখে ঘাবড়ে গেল ঠাকুমা। 'কী হইয়েছে রে তোর, আমারে বল।'

'আচ্ছা ঠা মা, আমাদের পাড়ার পঞ্চানন খুড়োরা এমন কেন?'

এর মধ্যে নন্দলালের চলে যাওয়া, পঞ্চানন খুড়োর কীর্তিকলাপ, বিপুলা জেঠির আর্তনাদ– এসব কিছু ঠাকুমা জেনে গেছে। দিবাকর যখন স্কুলে, তখন নন্দলালদের বাড়িতে গিয়ে বিপুলা জেঠির সঙ্গে দেখাও করেছে ঠাকুমা। তাই দিবাকরের কথা বুঝতে বেগ পেতে হলো না ঠাকুমার।

সংসারে কিছু লোক আছে, বেচাল চাইল্যা চলে। ওতেই ওদের সুখ। মানুষেরে বিপদে ফেলাইয়ে, ভাইয়ে ভাইয়ে অশান্তি সৃষ্টি কইরে, সোয়ামির কাছ থেইকে স্ত্রীরে আলাদা কইরে, মায়ের ভরা বুক খালি কইরে এদের অশেষ শান্তি। শকুনি মামার কথা চিন্তা কর– পাশার ঘুঁটির চালে কৌরব আর পা যুদ্ধ লাগাইয়া দিল। কৌরবপক্ষ ধ্বংস হইল, পা বপক্ষ অনাথ হইল। কারও লাভ হইল না। দুই দলের ক্ষেতি হইলে কী হইবে, শকুনির লাভ হইল। শকুনি সেইরকমই বিশ্বাস করে। ধ্বংসেই তো শকুনির আনন্দ।' দিবাকরের দিকে মলিন চোখে তাকিয়ে থাকল ঠাকুমা। তারপর ঘৃণা মেশানো গলায় আবার বলল, 'পঞ্চাননও শকুনি ধরনের লোক। নিজের জীবনের তো কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। বউ কামায় করে আনলে খায়, না আনলে উপোস থাকে। ঘরভর্তি আন্ডাবেন্ডা। বিধবা মেইয়েটি ঘরে। সুখ নাই তো তার জীবনে। অন্যের সুখ মানবে কেন সে! আহারে, আকথা-কুকথা প্রচার কইরে নন্দলালরে তাড়াইল! মায়ের কাছে এর চাইতে নিদারুণ কষ্ট আর কী হইতে পারে বল।'

'আচ্ছা ঠাকুমা, গরুর মাংস খেলে কি জাত যায়? নন্দলাল দাদা বিলাতে গোমাংস খেয়েছেন কি না তার কোনো তথ্য আছে পঞ্চানন খুড়োর কাছে? যদি নন্দলাল দাদা গোমাংস খানও, তাতে অসুবিধা কী? সে দেশে হয়তো গোমাংসই সস্তা এবং সহজে পাওয়া যায়।'

ঠাকুমা এবার স্তিমিত কণ্ঠে বলল, 'গোমাংস খেইলে জাত যায়, এমুন কথা কুনু শাস্ত্রে লেখা নাই। তবে এদেশের হিন্দুরা গরুর মাংস না খাওয়াতেই অভ্যস্ত হইয়ে গেছে। মুখে মুখে একটা বিধান প্রচার কইরেছে বামুনরা। সেইটাই নিয়ম এখন।'

'বিদেশে কী খেলো না খেলো, কী পরল না পরল– এ নিয়ে তো আমাদের মাথাব্যথা হওয়ার কারণ নেই। এই পাড়ায় এসে তো নন্দলাল গোমাংস খায়নি?'

'ঠিকই বইলেছিস তুই। প তি মানুষরা কী যেন একখান কথা কয়– বিদেশে নিয়ম নাস্তি। বিদেশে নিজ দেশের নিয়মনীতি চলে না।'

'তাহলে তো নন্দলাল দাদা কোনো অপরাধ করেননি।'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়। অপরাধ কইরবে কেন?'

'তাহলে পঞ্চানন খুড়োর কুকাজের একটা প্রতিবাদ করা উচিত– কী বলো ঠাকুমা।' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল দিবাকর।

'পঞ্চানন দুষ্টলোক। পাড়ায় পাড়ায় ঘুইরে বেড়িয়ে মাইনষের বদনাম করে। কী প্রতিবাদ কইরতে চাস? মারামারি কইরবি নাকি ওর লগে?' ঠাকুমা চিন্তাযুক্ত মুখে জিজ্ঞেস করে।

এবার হেসে দিল দিবাকর। 'ধুর ঠাকুমা, কী যে বলো না তুমি! পঞ্চানন খুড়োর সঙ্গে মারপিট করতে যাব কেন? এমন প্রতিবাদ করব, দেখে পঞ্চানন খুড়ো কিছু বলতেও পারবে না, করতেও পারবে না।'

'তো কী কইরবি শুনি।' ঠাকুমা বলে।

দিবাকর রহস্যভরা চোখ দুটো নাচিয়ে বলল, 'হুঁহো, এখন বলা যাবে না। শুধু বল– তুমি আমার সাথে থাকবে।'

ঠাকুমা দিবাকরের মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'তোর সাথে তো থাইকব, তোর সাথে থাইকবার জইন্যই তো নিজে চলে গিয়ে তোর ঠাকুরদা তোরে পাঠাইয়া দিছে আমার কাছে।' বলতে বলতে উদাসীন হয়ে গেল ঠাকুমা। তারপর মিষ্টি একটু হেসে বলল, 'তবে তুই এমুন কাম করবি না, যাতে সমাজে তোর বাপের মাথা হেঁট হয়ে যায়।'

দিবাকর চাপাস্বরে বলল, 'বাবার মাথা থেকেই তো বুদ্ধিটা এসেছে, বাবার মাথা হেঁট হবে কেন?'

'কী বইল্যি দিবাকর?' ঠাকুমা জানতে চাইল।

'ও কিছু না ঠাকুমা। তুমি ঘুমাও। আমিও ঘুমাব।'

ঠাকুমা ফুঁ দিয়ে পিদিমটা নিবিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শোয়।

দিবাকর জেগে থাকে। বাবার কথা মনে পড়ে তার। আজ বিকেলে বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে তার। নন্দলালের অপমানিত হয়ে চলে যাওয়ায় বড় কষ্ট পেয়েছে বলরাম। পঞ্চানন খুড়ো শুধু বিপুলা জেঠির ক্ষতি করেনি, অন্যদের আরও আরও ক্ষতি করেছে। সেদিন কমল বহদ্দারের নৌকার পালটা সরিয়ে ফেলেছে, বহদ্দারের কী কষ্টটাই না হয়েছে সেদিন সাগরে-পাতানো জালের কাছে যেতে, অমূল্য চরণের মেয়েটির বিয়েতে ভাংচি দিয়েছে, গৌরাঙ্গের বউটির চরিত্র নিয়ে নোংরা কথা ছড়িয়েছে সারা জলদাসপাড়ায়। তার একটা শাস্তি হওয়া দরকার দিবাকর। শেষে বলরাম বলেছে 'এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে হবে, যাতে সইতেও না পারে, কইতেও না পারে।'

তারপর পিতাপুত্র মিলে একান্তে কিছুক্ষণ কথা হয়েছে। কথার পর বাপ ফিরে গেছে নিজের কাজে, দিবাকর পাঠাভ্যাসে।

পরদিন সকালে দুই বাপে-পুতে মিলে কাটগড় বাজারে গেল। বাজার থেকে একটা মোরগ কিনল। মুরগিওয়ালা শমসের বলল, 'কী রে বলরাম, তুমি কিনতাছ মোরগ! এটা না রামপক্ষী? তোমাদের ধর্মে না রামপক্ষী খাওয়া পাপ? গরুর গোস্ত আর মুরগি তো মুসলমানদের জইন্য। খাসির গোস্তও তো খাওনা তোমরা। মায়ের ভোগের পাঁঠার মাংসই শুধু খাও তোমরা। আজ যে নিয়মনীতি ভাইঙ্গা মোরগ নিয়া যাইতাছ ঘরে।'

বলরাম নির্বিকারভাবে বলল, 'খুব মোরগ খাইতে ইচ্ছে করতাছে শমসের দাদা। তাই নিলাম। আমার পোলাটাও খাইতে চাইল।' দিবাকরকে দেখিয়ে বলল বলরাম।

শমসের বলল, 'তোমাদের সমাজে তো মোরগ মুরগি খাওয়া গুনাহ। ওই যে তোমরা যারে পাপ কও, মোরগ খাইলে সেই পাপই তো হবে তোমার।'

'এতগুলা কথা তুমি জাইনল্যে কী কইরে শমসের দাদা?' বলরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'আজ এতদিন হইল মুরগির দোকান দিছি, মুসলমান ছাড়া কুনু হিন্দু কুনুদিন একটা মুরগি কিনল না। সেদিন সুভাষ সেনকে মুরগি নিতে কইলাম। তিনি বড় বড় চোখ কইরে কী বইল্যোন জান? বইল্যোন— রাম রাম! এইসব তুমি কী কও শমসের দাদা? রামপক্ষী হইল হিন্দুদের কাছে পবিত্রপক্ষী। আমাদের ঠাকুরের নাম ওই পক্ষীর লগে জড়ানো। আমাদের জইন্য এই পক্ষী খাওয়া মহাপাপ। রাম রাম রাম রাম! তই সেই জইন্য কই, জাইল্যা হইয়া হিন্দুর বাড়া কাম কইরতাছ! কারণ কী?'

'কারণটা না-ই বা জানলে শমসের দাদা। তবে এইটা জাইনা রাখ, এই মোরগ আইজ তেল-মসল্লা দিয়া রাইন্ধা খামু আমরা।' ছেলের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করল বলরাম।

তারপর মোরগের দাম মিটিয়ে দিবাকরের হাতে মোরগটাকে উল্টো করে ধরিয়ে দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল বলরাম। এই অবস্থায় যারাই দেখল, চোখ বড়বড় করে তাকাল। ছোট্ট গাঁ, এখানে সবাই সবাইকে চেনে। জেলের হাতে মোরগ! এ তো বিরাট অবাক করা কাণ্ড!

জলদাসপাড়ায় ঢোকার মুখে পঞ্চানন খুড়োর বাড়ি। তার বাড়ির সামনেটা পেরিয়ে পাড়ায় ঢুকতে হয়। খুড়োর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলরাম গলা উঁচিয়ে বলল, 'মোরগটা ভালা কইরে ধর দিবাকর। হাত থেইকে যেন না ছুইট্যা যায়। পঞ্চানন খুড়োর বাড়িতে ঢুইক্যা পড়লে আবার খুড়োর জাত চইলে যাইবে।'

শুনে তড়িঘড়ি করে পঞ্চানন খুড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খুড়োর পরনে একখানা গামছা। আলতো করে গিঁট দিয়ে কোমরে বাঁধা। মাথা গা থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। এইমাত্র বুঝি স্নান সেরেছে খুড়ো। মুছবার অবকাশ পায়নি। বলরামের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসেছে উঠানে। তার চোখ দুটো কোটর থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, রাম রাম, ঠাকুর ঠাকুর! বলরামের ছেলের হাতে রামপক্ষী! সমাজে তো রামপক্ষী পালার নিয়ম নাই। নিশ্চয় খেতে....। আর ভাবতে পারছে না পঞ্চানন খুড়ো। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম হলো তার।

এই সময় দিবাকর তার হাতের বাঁধনটা একটু আলগা করল। মোরগটা হাত থেকে ছুটে দিল এক লাফ। কক কক করে পঞ্চানন খুড়োর উঠানের দিকে ছুটে গেল মোরগটা। পেছনে বলরাম প্রয়োজনাতিরিক্ত ত্রস্ততায় চিৎকার করে উঠল, 'ধর, ধর দিবাকর। মোরগটা ধর।'

বলরামের জোর আওয়াজে মোরগটা আরও ভয় পেয়ে গেল। উঠান পেরিয়ে খুড়োর রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল পঞ্চানন খুড়ো। তার পরনের গামছাটা আউলা-ঝাউলা। মুখ দিয়ে কথা সরছে না তার।

খুড়ি ত্বরিতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। স্বামীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে? কী হইছে?' এমনু করতাছেন ক্যান?

পঞ্চানন খুড়ো কোনো কথা বলতে পারল না। শুধু ডানহাতের তর্জনীটা রান্নাঘরের দিকে উঁচিয়ে ধরল।

একটা ক্রূর হাসি বলরাম আর দিবাকরের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

ওই যে বলরাম একদিন ইন্ডিয়া চলে যেতে চেয়েছিল, মা-ছেলেদের চাপে তো যেতে পারল না। সেই সময় পাটনাইয়া ছাগল বেচল, পুকুরপাড়ের শিরীষগাছ বেচল, বাড়িভিটে আর পুকুরটা বেচে দেওয়ার জন্য কথা প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছিল ছোবান মেম্বারের সঙ্গে। মেম্বার মেহেদিরাঙা দাড়িতে হাত বুলিয়ে চকচকে চোখে বলেছিলেন, 'তুই বেইচতে চাইলে আমি নিমু না ক্যান? উচিত মূল্য দিয়া নিমু।'

শেষ পর্যন্ত বলরাম ভারতে গেল না। ছোবান মেম্বারকে বলাতে তেড়েমেড়ে বলেছিলেন, 'ক্যান, যাবি না ক্যান? চইলে যা, চইলে যা। কত স্বপ্ন দেখলাম তোর বাড়িটারে লইয়া। একটা মসজিদ...।' বাক্য শেষ করলেন না ছোবান মেম্বার। বাক্যের পরের অংশটা গিলে ফেলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, ' যাউক, যা হইছে, হইছে। এখন তুই এক কাজ কর বলরাম। তোর পুকুরটা পাঁচ বছরের লাইগা আমার কাছে লিজ দিয়া দে। বছর বছর টাকা পাবি, মক্তমানা মাছ পাবি।'

'লিজ মাইনে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল বললাম।

'পাঁচ বছর ধইরে তোর পুকুরে আমি মাছের চাষ কইরব। বছরের শেষে এক হাজার কইরে টাকা পাবি তুই। খাওনর মাছও দিমু তোরে মাঝেমইধ্যে। আর হ্যাঁ, এই পাঁচ বছর পুকুরটা আমার হইয়ে থাইকবে।' আস্তে ধীরে কথাগুলো বললেন মেম্বার। কিন্তু এমন কণ্ঠে আর এমন চোখে বললেন, না দিলে সমূহ ক্ষতি করবেন বলরামের। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেদিন ছোবান মেম্বারকে পুকুরটা লিজ দিতে রাজি হয়েছিল বলরাম।

এর পর থেকে বলরামের পুকুরে বছর বছর মাছের চাষ করেন মেম্বার। কোনো সময় মাছ দেন, কোনোদিন মাছ বেশি ধরা পড়েনি— এই অজুহাত দেখিয়ে দেন না। বছর চুক্তির টাকারও একই হাল। দশ-বিশ-পঞ্চাশ-একশ করে করে

দেন। বলেন, 'তুই আমার উপর আস্থা হারাইস না বলরাম। তুইও হিসাব রাইখলে রাইখতে পারিস, কিন্তু এই দেখ, আমি রাইখতাছি।' বলে একটা লম্বা খাতা বের করেন। বলরামের সামনে লিখেও রাখেন। কিন্তু দশের জায়গায় বিশ, বিশের স্থানে পঞ্চাশ, পঞ্চাশের জায়গায় একশ' লেখেন।

পঞ্চানন খুড়োর ঘটনার দিন কয়েক পরে, এক সকালে বলরামদের পুকুরের সকল মাছ মরে ভেসে উঠল। এত ভোরসকালে ছোবান মেম্বারের তা জানার কথা নয়। কিন্তু তিনি জেনে গেলেন। পঞ্চানন খুড়োই বাড়ি বয়ে গিয়ে মেম্বার সাহেবকে দুঃসংবাদটা জানিয়ে এলো। কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপাস্বরে আরও কী কী যেন বলল, শোনা গেল না।

ওই ভোরেই বলরামের উঠানে দাঁড়িয়ে জঘন্য ভাষায় গালাগাল শুরু করলেন মেম্বার। তরাসে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বলরাম, পেছনে দিবাকর, ঠাকুমা এবং যোগমায়া। বলরামকে সামনে পেয়ে রাগ দ্বিগুণ বেড়ে গেল মেম্বারের। ইচ্ছেমতন গালি দিয়ে হয়রান হবার পর ছোবান মেম্বার বললেন, 'তুই আমার পুকুরে বিষ ঢাললি ক্যান বলরাইম্যা? সব মাছ মইরা ভাইসা উঠছে। সব মাছের দাম তোরে মিটাইতে হইবে। তোরে আমি ছাড়ুম না।' বলে আবার জোরসে গালিগালাজ শুরু করলেন মেম্বার।

বলরাম শান্তকণ্ঠে বলল, 'আমি পুকুরে বিষ দিই নাই মেম্বার সাব। আমি কুন দুঃখে আমরই পুকুরে বিষ ঢাইল্যা পেরানি হত্যার পাপ নেব।'

'আমার কাছে খবর আছে, তুইই বিষ দিছস পুকুরে।' ছোবান মেম্বারের রাগ কিছুতেই থামে না।

এবার দিবাকর শক্ত গলায় বলল, 'আপনার পাওয়া খবর মিথ্যা। মিথ্যা কথা বলে আমাদের ফাঁসাতে চাইছে। যে আপনাকে সংবাদ দিয়েছে, সে-ই আপনাকে মিথ্যা খবর দিয়ে চেতাতে চাইছে। সে-ই বিষ দিয়েছে পুকুরে। তার সঙ্গে আমাদের লাগালাগি আছে।'

'হ হুজুর, আমার পোলা ঠিকই কইছে। পঞ্চানন খুড়োর সঙ্গে আমার লাগালাগি আছে।' বলরাম কারণ খুঁজে পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ছোবান মেম্বারের ক্রোধ মাছনিধনের বেদনা থেকে দিবাকরের ওপর এসে পড়ল। চেঁচিয়ে বললেন, 'বড় সেয়ানা হইয়ে গেছস পোলা। দুই কলম পইড়া মাথার উপর উইঠা গেছস? স্কুলে আবার রাষ্ট্রবিরোধী নাটক করস? পাকিস্তানি কওমের বিরুদ্ধে নাটক! ২১ ফেব্রুয়ারি! আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো!' তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, 'দেখ আমি তোর কী ক্ষতিটা করি হারামজাদা। তুই কীভাবে হাইস্কুলে পড়স, দেইখা নিমু আমি। সেক্রেটারিরে কইয়া নাম কাটার ব্যবস্থা করতাছি তোর।'

বলরাম ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। দুই কদম সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দোহাই আপনার হুজুর, আমার ছেলের এত বড় ক্ষেতিটা আপনি কইরেন না। ওর বেয়াদবি মাফ কইরে দেন হুজুর।'

দিবাকর দ্রুত তার বাপের পাশে গিয়ে হাত আঁকড়ে ধরল। বলল, 'এসব তুমি কী করছ বাবা? সেদিন তুমি দেখ নাই, মেম্বারের ক্ষমতা কতটুকু? সেক্রেটারি এমদাদ মিয়া যে মেম্বারকে দুই পয়সার মূল্য দেন না, সেই সন্ধ্যায় বুঝতে পারনি তুমি? উনি আমার কিচ্ছুটি করতে পারবেন না। তুমি দেখে নিও।' বলে বাপকে টেনে পেছন দিকে নিয়ে এলো দিবাকর।

ছোবান মেম্বার উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। তাঁর মুখের জবান একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। যাওয়ার আগে ছোবান মেম্বার বলল, 'তোরে মাইরলে বদনাম হইব আমার। নইলে আইজ তোরে পিষে ফেলতাম আমি বলরাইম্যা। তবে তোরে আমি ছাড়ুম না।' বলে পেছন ফিরে হন হন করে হাঁটা দিলেন ছোবান মেম্বার।

পেছন থেকে দিবাকরের কণ্ঠ ছোবান মেম্বারের কানে ভেসে এলো, 'যান, যান। কী করতে পারেন করেন গে।'

সাত

'বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ– ছয় দফা, ছয় দফা।'

'উর্দু না বাংলা– বাংলা বাংলা।'

'আমার তোমার ঠিকানা– পদ্মা মেঘনা যমুনা।'

'পিন্ডি না ঢাকা– ঢাকা ঢাকা।'

এইসব স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ মুখরিত হতে থাকে। বাঙালিরা এখন ঘরে বসে বসে অলস দিন কাটাতে চায় না। নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আজ পথে নেমেছে। বলছে– আইউবী শাসন মানি না, মানব না। আমার নেতা তোমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব।

পঁয়ষট্টির লোক দেখানো নির্বাচনে আইউব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলো। তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল ফাতেমা জিন্নাহ। বাঙালিরা ফাতেমা জিন্নাহকে সেই নির্বাচনে সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু কারসাজি করেই জিতল আইউব খান। বাঙালিরা সেই চক্রান্ত ধরে ফেলল।

এরপর লাগল পাক-ভারত যুদ্ধ। যুদ্ধে পাকিস্তান পিছু হটল। ওই সময় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বুঝে গেল– পিন্ডি থেকে হাজার মাইল দূরে কতটুকু নিরাপত্তাহীনতায় আছে তারা। এরপর অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠল বাঙালিদের সামনে। ওই সময় কে বা কারা রাতের আঁধারে চট্টগ্রাম শহরের দেয়ালে দেয়ালে বিশাল একটা পোস্টার সাঁটাল। পোস্টারে বড় দুধেল গাভীর ছবি। গাভীটির বড় বড় বাঁট। গাভীটির মুখ পূর্ব পাকিস্তানে, ফসলি জমি থেকে ফসল খাচ্ছে গাভীর সেই মুখটি। গাভীটির পেছন অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে। জিন্নাহ টুপি পরা একজন পাঞ্জাবি বাঁট থেকে বালতি ভর্তি করে দুধ দুইয়ে নিচ্ছে। সেই পোস্টার পতেঙ্গার কাটগড় এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। দলে দলে মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই পোস্টার দেখতে লাগল। আরেকদিন সাঁটানো হলো ছয় দফার পোস্টার। এসব পোস্টার দেখে খুব খেপে গেলেন ছোবান মেম্বার। তিনি হাহাকার করে উঠলেন– পাকিস্তান শেষ হয়ে গেল। ইংরেজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সাধের পাকিস্তান এবার ইন্ডিয়ার দালালদের খপ্পরে পড়ে ছারখার হয়ে গেল। ইসলাম গেল, মুসলান সমাজ হিন্দুস্থানের গোলাম বনতে আর বেশি দেরি নাই। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। এইসব কথা নিজস্ব ভাষায় বিশেষ ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত পোস্টার ছেঁড়ার কাজে লেগে গেলেন তিনি। কাটগড় এলাকায় গাভীর আর ছয় দফার যত পোস্টার লাগানো হয়েছিল, সবগুলো তিনি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ মিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিলেন।

তাঁর এই কার্যকলাপে পতেঙ্গার কিছু মানুষ খুশি হলেও অধিকাংশ বেজার হলো। এদিকে পূর্ববাংলার বাঙালিদের মধ্যে হইচই পড়ে গেল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিপদ গুনল। ছয় দফাকে আঁতুড়ঘরেই নুন খাইয়ে দিতে হবে। নইলে বাঙালিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। সবকিছুর প্রথমেই দরকার ছয় দফার উদ্‌গাতার দফারফা করা। আইউবী গোষ্ঠী শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে পঁয়ত্রিশজন বাঙালির বিরুদ্ধে অদ্ভুত এক মামলা ঠুকে দিল– 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। অভিযোগ– আসামিরা ভারতের আগরতলায় বসে পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। ভারতের

মদতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে চাইছেন।

তাদের ধারণা ছিল– পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার কথা শুনে বাঙালিদের মধ্যে মুসলমানি জোশ উতলে উঠবে। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়বে জনগণ। তাতে শেখ মুজিব গোটা পাকিস্তানের শত্রুতে পরিণত হবেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। বাঙালিরা বুঝে গেল– এ ষড়যন্ত্রের মামলা, শেখ মুজিবকে দাবির মঞ্চ থেকে হটানোর মামলা, বাঙালি চেতনাকে গলা টিপে হত্যা করার মামলা। এই মামলা বাঙালিকে জাগিয়ে তুলল। তারা ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামল। স্লোগান দিল– আমার নেতা তোমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব।

মামলা কোর্টে উঠল। সরকারপক্ষের রাজসাক্ষীরা বলল, শেখ মুজিবের ষড়যন্ত্র আজকের নয়। সেই চৌষট্টি সাল থেকে তাঁর ষড়যন্ত্রের শুরু। ঢাকায় আর চট্টগ্রামে গোপন বৈঠকের মাধ্যমে শেখ মুজিব এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ষড়যন্ত্রের ভিতকে পাকাপোক্ত করেছেন। সাতষট্টির বারোই জুলাই উস্কানিদাতা ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে শেখ মুজিবের বৈঠক হয় আগরতলায়। ভারত অস্ত্র দিতে রাজি হয়েছিল। সেই অস্ত্র দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছিলেন ষড়যন্ত্রকারীরা। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি। অঙ্কুরেই জেনে ফেলেছে পাকিস্তানি গোয়েন্দারা। এই মোনাফেক ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁতভাঙা বিচার হওয়া উচিত মহামান্য আদালত।

'ইত্তেফাক' আর' 'সংবাদ' পত্রিকায় ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ প্রকাশ হতে থাকে। বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকরা আকারে ইঙ্গিতে এও জানিয়ে দিতে থাকেন যে, এ মামলা ভুয়া, এ মামলায় বাঙালি চেতনাকে ধ্বংস করার বীজ লুক্কায়িত। বয়স্কদের পাকিস্তানপ্রীতি বজায় থাকল। কিন্তু তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই প্রীতি শিথিল হয়ে এলো।

ঢাকার পত্রিকা পতেঙ্গায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধে হয়ে যায়। স্কুলে 'সংবাদ' নেওয়া হয়। হেড স্যার স্কুলসংলগ্ন একটা ছোট্ট রুমে থাকেন। বিয়ে-থা করেননি। রাতে হারিকেনের আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে 'সংবাদ' পড়েন। রাজনীতির বিষয়-আশয়গুলো জানবার আগ্রহ বেশি তাঁর। পরদিন সকালে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষকরা পড়েন। দুপুরছুটিতে ছাত্রদের পড়তে দেওয়া হয়। ছাত্রদের কেউ সিনেমার পাতা দেখে, কেউ গ্রামগঞ্জের খবর পড়ে, অধিকাংশই খেলাধুলার পাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। দিবাকর নিবিষ্ট মনে রাজনীতির খবর পড়ে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে তার আগ্রহের শেষ নেই। সে এর মধ্যে জেনে গেছে শেখ মুজিব কে, তাঁর বাড়ি কোথায়, কোথায় তিনি লেখাপড়া করেছেন? ছয় দফা দিবাকরের মুখস্থ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যে কল্পিত কাহিনী, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে দিবাকর।

উনসত্তরের জানুয়ারির গোড়াতে ছাত্ররা এগারো দফা দাবি ঘোষণা করল। এগারো দফা শেখ মুজিবের ছয় দফাকে পূর্ণতা দিল। বাঙালিরা আর ঘরে বসে থাকতে চাইল না। রাজপথই বাঙালির ঠিকানা হলো। পূর্ববাংলার মুসলমানরা স্পষ্টত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। উনসত্তরের গণআন্দোলন দানা বাঁধল। পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে বাঙালিরা স্লোগান দিতে থাকল– জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব। একদল ক্ষিপ্ত বাঙালি মন্ত্রী-নেতাসহ আগরতলা মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব ও অন্যান্য আসামিকে জেল থেকে বের করে আনল আন্দোলনকারীরা। পাকিস্তানি সেনারাও পিছিয়ে থাকল না। তারা মিছিলে লাঠিচার্জ করল, গুলি চালাল। তাদের গুলিতে নিহত হলেন ছাত্রনেতা আসাদ, স্কুলছাত্র মতিয়ুর এবং শ্রমিক রুস্তম। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে নির্মমভাবে হত্যা করল পাকু সেনারা। এই সময় তারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শামসুজ্জোহাকে।

এইসব খবর সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। একদিন পরে হলেও নিষ্ঠুর হত্যার এই সংবাদগুলো জানতে পারে দিবাকর। তার মধ্যে অস্থিরতা বাড়ে। ছটফট করতে থাকে সে। স্কুলছাত্র মতিয়ুরের আত্মত্যাগের ঘটনাটি তাকে সবচাইতে বেশি আলোড়িত করে। সে মনে মনে বলে– ছাত্রনেতা আসাদ, সার্জেন্ট জহুরুল হক, শিক্ষক শামসুজ্জোহার কথা বাদ দিলাম, তাঁরা সচেতন মানুষ। তাঁরা প্রতিবাদী। বাঙালিচেতনাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কথা বলা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মতিয়ুর বা রুস্তম? তাঁরা প্রাণ দিলেন কেন? নিশ্চয় তাঁরাও পাকিস্তানি চালাকির কথা বুঝতে পেরেছিলেন। নইলে পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন কেন? বিশেষ করে মতিয়ুর তো তার মতোই স্কুলছাত্র। তাঁর মধ্যে বাঙালিচেতনা দানা বাঁধল কী করে? একজন ছাত্র ক্লাস বর্জন করে রাজপথের মিছিলে শামিল হলেন। তাঁর কচিকণ্ঠ গর্জে উঠল– পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র মানি না, মানব না। পুলিশের উদ্যত বন্দুকের সামনে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করে কোন সাহসে তিনি চিৎকার করে বললেন– মারো গুলি, আমার বুকে গুলি মারো। দেখি কেমন তোমাদের সাহস। জামার বোতাম খুলে বুক পেতে দিয়ে বার বার ধিক্কার দিচ্ছিলেন তিনি পাকিস্তানি সেনাদের। কাঁহাতক এই বালকটির ধিক্কার সহ্য করা যায়? তাদেরও তো ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

পাকুরা মানুষ বটে, কিন্তু পশুরও অধম। নরপশুরাই তো নিরস্ত্র মানুষের বুকে গুলি চালাতে দ্বিধা করে না। তাদের কাছে নারী, বালক, শিশু, অসহায় বৃদ্ধ আলাদা কিছু নয়। সবাই চুতিয়া বাঙালি। তারা বিশ্বাস করে প্রত্যেক বাঙালি পাকিস্তান কওমের বিরুদ্ধশক্তি। এদের বাঁচিয়ে রাখতে নেই। যেখানেই দেখো, হত্যা করো। এ রকম কর্ণমন্ত্র দিয়েই তাদের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে। তাদের আরও বলা হয়েছে– মানুষ বড় নয়, দেশ বড়। বাঙালি হত্যা বড় কিছু নয়, ইসলাম বাঁচানোই তোমাদের জন্য ফরজ। তাই তো তাদের বন্দুকের গুলি থেকে স্কুলছাত্র ,হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শ্রমিক হতে ছাত্রনেতা কেউ রেহাই পাননি।

দিবাকর ভাবে– মতিয়ুর যদি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন তবে সে পারবে না কেন? সেও তো ছাত্র। সেও তো শেখ মুজিবকে পছন্দ করে, সেও তো চায় বাঙালিরা নিজেদের সুখ-দুঃখ বাংলাভাষায় প্রকাশ করার অধিকার পাক। প্রতিদিন বিকৃত উচ্চারণে দুর্বোধ্য ভাষার জাতীয় সঙ্গীত গাইতে এখন আর তার মোটেই ভালো লাগে না। মন তার উড়ে যায় ঢাকার রাজপথে। জীবনে সে কোনোদিন ঢাকা যায়নি। ঢাকা দেখতে কেমন, রাজপথ কেমন– কিছুই জানে না সে। তারপরও চট্টগ্রামের ছোট্ট এই গ্রামের ততোধিক ছোট্ট জেলেপাড়াটিতে তার মন আর বন্দি হয়ে থাকতে চায় না। রাজপথ ঘুরে ঘুরে শুধু আওয়াজ তুলতে ইচ্ছে করে– আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে।

এসব কথা বসে বসে ভাবে দিবাকর। কী করবে, কার কাছে যাবে– কিছুই ঠিক করতে পারে না সে। পতেঙ্গার বুক চিরে উত্তর থেকে দক্ষিণে একটা রাজপথ চলে গেছে। সে পথ দিয়ে মাঝেমধ্যে মিছিল যায়। খুব বেশি মানুষের মিছিল নয়। বিশ-পঞ্চাশ-একশ' জনের মিছিল। মানুষ কম হলে কী হবে, তাদের কণ্ঠে হাজারো মানুষের শক্তি– আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। স্বল্পসংখ্যক মানুষের জোরালো

কণ্ঠ ক্লাসে বসে বসে শোনে দিবাকর। তার মন চলে যায় মিছিলে। সেই মন ঊর্ধ্বাকাশে ডান হাত প্রসারিত করে বলতে থাকে– আমাদের দাবি মানতে হবে। কোনো কোনোদিন তার সামনে দিয়েই মিছিল যায়। স্কুল ছুটি হয়েছে তখন। কেউ কেউ মিছিলের পাশ দিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়, আবার কেউবা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে মিছিল দেখে।

দিবাকর এক দুপুরছুটিতে দেখল– লম্বা একটা মিছিল যাচ্ছে। সেই মিছিলের সামনে স্কুল-সেক্রে‌টারি এমদাদ মিয়া, পতেঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের দীর্ঘকালের চেয়ারম্যান। দিবাকর ভাবে– আরে, ইনি তো আর রাজনীতি করবেন না বলে গত ইলেকশনে দাঁড়াননি! তাহলে আজ তিনি মিছিলে কেন! নিশ্চয় এর মধ্যে ভালো কিছু আছে। তিনি তো এই গ্রামের সবচাইতে ভালো লোক। ভালো লোক ভালো কাজই তো করেন। তাহলে চেয়ারম্যান সাহেব ভালো কাজই করছেন। এই ভালো কাজ থেকে নিজেকে আলাদা রাখবে কেন দিবাকর? সে দৌড়ে গিয়ে মিছিলে যোগ দেয়। অন্য দশজনের মতো সেও হাত উঁচিয়ে বলতে থাকে– আমাদের দাবি মানতে হবে।

ঘণ্টাখানেক ধরে পতেঙ্গার বড় রাস্তা, ছোট্ট রাস্তা ঘুরল মিছিলটি। বটগাছতলায় এসে মিছিলটি ভাঙল। সবাই চলে যাওয়ার আগে এমদাদ মিয়া বললেন– আমরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নস্যাৎ করেছি, আমাদের নেতা শেখ মুজিবকে জেলে থেকে ছিনিয়ে এনেছি। কিন্তু এখানেই আমাদের আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। আমরা কি ভুলে গেছি ছাত্রনেতা আসাদের হত্যার কথা, আমরা কি ভুলে গেছি মতিয়ুর; প্রফেসর শামসুজ্জোহার নিধনের কথা, সার্জেন্ট জহুরুল হকের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার কথা? কখনো নয়। আমাদের আপাতত জয় হয়েছে সত্য, কিন্তু এই জয়কে দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে। বর্তমানে আমরা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অধিকারের জন্য আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। যেদিন আমরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের মতো সকল সুযোগ সুবিধা পাব, সেইদিন আমাদের আন্দোলন থামবে। ভাইসব, এটা আমার কথা নয়, আমাদের বড় বড় নেতাদের নির্দেশেই আপনাদের আমি এই কথাগুলো বললাম।

দিবাকরের এমদাদ মিয়ার মিছিলে অংশ নেওয়ার কথা ছোবান মেম্বারের কানে পৌঁছল। পরদিন তিনি দু'চারজন সাঙাৎ নিয়ে হেডস্যার সত্যব্রত চক্র‌বর্তীর রুমে উপস্থিত হলেন। হেডস্যারের সামনের চেয়ারটায় পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন। পরনে তাঁর রুহিতপুরি লুঙ্গি। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। মাথায় জিন্নাহ টুপি। আগে সাদা গোল টুপি পরতেন, ইদানীং জিন্নাহ-টুপি পরা শুরু করেছেন। চোখে গাঢ় সুরমা। ডান কানের ফোকরে আতরমাখা তুলা গোঁজা। আতরের ভুরভুরে গন্ধে রুমের বাতাস তোলপাড়। সাঙাৎরা দূরে–কাছে দাঁড়িয়ে।

ছোবান মেম্বার স্থির চোখে হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'আপনি কি আপনার ছাত্রদের কোনো খবর রাখেন?'

হেডস্যার হাতের কলমটা গুটিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'কী খবর রাখব? কী বিষয়ে কথা বলছেন বুঝতে পারছি না মেম্বার সাহেব।'

'জাইগা ঘুমাইলে বুইঝবেন কেমনে? এই স্কুলটা কি রাজনীতির আড়তখানা?'

'আড়তখানা হতে যাবে কেন?'

'তাইলে আপনার ছাত্ররা স্কুল ফাঁকি দিয়া রাষ্ট্রবিরোধী মিছিলে যায় কী কইরে?'

সত্যব্রত চক্র‌বর্তী দিবাকরের বিষয়টি কাল বিকেলেই জানতে পেরেছেন। দিবাকরের স্কুলব্যাগটি হেডস্যারের কাছে নিয়ে এসেছিল দপ্তরি হাবিব। ক্লাসরুমে তালা দিতে গিয়ে হাইবেঞ্চের ওপর ব্যাগটি পেয়েছে সে। খাতায় নাম দেখে হেডস্যার বুঝেছেন– এটি দিবাকরের ব্যাগ। তারপর খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন– দুপুরছুটির পর দিবাকর আর ক্লাসে ফিরে আসেনি। তিনি এও জেনেছেন– এমদাদ মিয়ার মিছিলে যোগ দিয়ে সে স্লোগান দিয়েছে। মিছিল শেষে ক্লাসরুম বন্ধ দেখে ব্যাগ না নিয়েই বাড়ি ফিরে গেছে সে।

হেডস্যার মনকে শক্ত করলেন। বললেন, 'মিছিলটা স্কুলের বাইরে হয়েছে। সেই মিছিলে যদি স্কুলছাত্ররা যোগ দেয় আমার করার কিছুই নেই। একটা মিছিলে যদি কৃষক যোগ দিতে পারে; শ্রমিক যোগ দিতে পারে, দিনমজুর, চেয়ারম্যান, ড্রাইভার যোগ দিতে পারে, তাহলে একজন ছাত্র পারবে না কেন? এটা তাদের মৌলিক অধিকার।'

কণ্ঠকে সামান্য বিকৃত করে ছোবান মেম্বার বলে উঠলেন, 'আমাদের আইউব খান মৌলিক অধিকার কম দিছেন নাকি? দেশ এখন গণতন্ত্রের পথে চইলছে। কুনু মানুষেরে অসুখে রাইখছেন নাকি আমাদের মহান প্রেসিডেন্ট?' জিন্নাহ-টুপিটা নেড়েচেড়ে মাথায় ঠিকঠাক মতো বসাতে বসাতে বললেন মেম্বার।

'ওসব তো আমি ভালো বুঝি না। আমার কাজ ছাত্র পড়ানো।' সত্যব্রত নির্বিকার কণ্ঠে বললেন।

'এইটা ঠিক বইল্যেন না মাষ্টারবাবু। আপনি শুধু ছাত্র পড়ান না, ছাত্রদের রাজনীতিতেও ঠেইলে দেন।'

'আপনার কথা ঠিকঠাক মতন বুঝতে পারলাম না মেম্বার সাহেব।'

'বুইঝবেন কেমনে, আপনি তো জেইগে জেইগে নাক ডাকেন।'

'যা বলতে চান, কেশে বলুন মেম্বার সাহেব।'

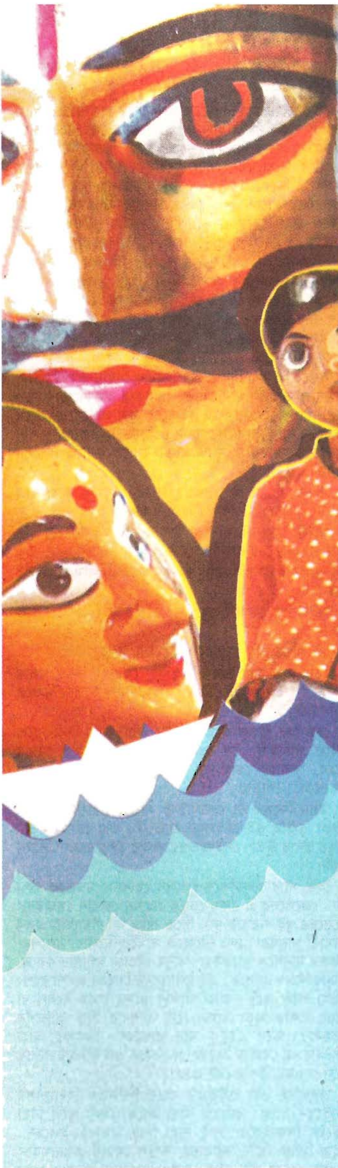
হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন ছোবান মেম্বার। উত্তপ্ত গলায় বললেন, 'কাইলকে ওই ডোমের বাইচ্চাটাকে আপনি মিছিলে পাঠান নাই?'

হেডস্যার শীতল কণ্ঠে বললেন, 'না। আমি দিবাকরকে মিছিলে পাঠাইনি। সে স্বেচ্ছায় গেছে। আর হ্যাঁ মেম্বার সাহেব, দিবাকর ডোম নয়, জেলে। তারাই ডোম, যারা শ্মশানে মড়া পোড়ায়।'

'জ্ঞান দিয়েন না হেডমাষ্টার সাব। সারাজীবন ডোম ডাইকা আইছি ওই জাইল্যার জাতকে। ওরা ডোমই তো। পায়ের তলার জুতা। সেই জুতারে মাথার উপর জায়গা দিছেন আপনি।'

হেড স্যার হকচকিয়ে গেলেন ছোবান মেম্বারের কথা শুনে। জেলেদের এ রকম চোখে দেখেন ছোবান মেম্বাররা! জেলেদের দুই পয়সার দাম দিতে রাজি নন সমাজের এসব গণ্যমান্য মানুষরা। দ্রুত নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, 'একজন মানুষকে আরেকজন মানুষ কীভাবে মূল্যায়ন করবে, তা তার নিজস্ব ব্যাপার। এই মূল্যায়নের পেছনে অবশ্য বংশ-ঐতিহ্য কাজ করে। আজ আপনি ওদের ডোম বলেন বা পায়ের তলার জুতা বলেন, সে আপনার নিজ আদর্শের প্রতিফলন। তবে এইটুকু মনে রাখবেন– দিবাকর আজ অশিক্ষিত নয়। নাইনে উঠেছে সে। তাকে এক ঝটকায় নালায় ফেলে দেওয়ার উপায় নেই আর।'

'আপনিই তো কইরছেন তারে শিক্ষিত। বিদ্যাসাগর বানাইছেন তারে। বাড়িতে গিয়া কাঁধে তুইলা স্কুলে নিয়া আইছেন দিবাকররে। লাই দিয়া দিয়া মাথায় তুইলছেন। আইজ মিছিল মিটিং করতাছে, কাইল মেম্বার চেয়ারম্যানে দাঁড়াইব। পরশু মন্ত্রী হইব। তরশু দেশটারে ইন্ডিয়ার হাতে



তুইলা দিব।' কঠোর কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেলেন ছোবান মেম্বার। 'শুনেন হেডমাস্টার সাব. এই ডোমের পোলাটারে স্কুল থেইকে বাইর কইরে দেন। নাম কাইটে দেন কেলাস থেইকে। হারামজাদা তারপর বুঝইবে মিছিল কারে কয়।'

এই সময় সাঙাৎরা সমস্বরে বলে উঠল. 'মেম্বার সাব ঠিকই কইছেন। হারামির নামটা কাইটে দেন স্যার।'

হেডস্যার বললেন. 'তা সম্ভব নয়। বিনাদোষে একটা ছেলেকে স্কুল থেকে বের করে দেব? তা কী করে হয়!

'হইবে। হইবে না কেন? শুনেন মাস্টার. এই স্কুল কমিটির আমিও একজন মেম্বার। আগামী কমিটি-মিটিং- এ আমি হের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলুম। দেখি আপনি কী কইরে ঠেকান।'

'আমি ঠেকানোর তো কেউ না। আপনি ছাড়াও এই কমিটিতে সুবিবেচক. শিক্ষিত মানুষরা আছেন। তাঁরা যদি বিবেচনা করেন যে. দিবাকর আর এই স্কুলে পড়ার যোগ্য নয়. তাহলে তার নাম কাটা পড়বে। এর মধ্যে সেক্রেটারি এমদাদ মিয়ার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমি আলাপ করে রাখব।'

সত্যব্রতের মুখে এমদাদ মিয়ার নাম শুনে একটু যেন চুপসে গেলেন মেম্বার। কিন্তু ব্যাপারটি মনের মধ্যে চেপে রেখে বললেন. 'দেশ রসাতলে যাইবে এইবার। ইন্ডিয়ার দালালদের হাতে পইড়ে পাকিস্তানের বারোটা বাইজতে বেশি দেরি নাই আর।'

হেডস্যার দিবাকরকে কিছু বললেন না। শুধু এমদাদ মিয়ার সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন। সবকিছু শুনে এমদাদ মিয়া বললেন. 'ছেলেটিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন হেডমাস্টার বাবু।'

এক বিকেলে স্কুল-সেক্রেটারি এমদাদ মিয়ার সঙ্গে তাঁর কাছারিতে গিয়ে দেখা করল দিবাকর।

তিনি ভূমিকা ছাড়া দিবাকরকে বললেন. 'আগে পড়াশোনা. তার পর রাজনীতি। তোমার সামনে অনেকটা পথ পড়ে আছে। সেই পথ সমতল নয়. উঁচুনিচু। ওই পথ মাড়িয়েই তোমাকে সামনে এগোতে হবে। তোমার অরিজিনকে ভুললে চলবে না। আমরা যেমন দেশের জন্য সংগ্রাম করছি. বিদ্যার জন্যও তোমার সংগ্রাম তেমনি। মনে রেখো. যে অন্ধকার জগৎ থেকে তুমি উঠে আসবার চেষ্টা করছ. সেই জগতে আলো জ্বালাতে হবে তোমাকে।' দীর্ঘক্ষণ কথা বলে একটু হাঁপিয়ে উঠলেন এমদাদ মিয়া।

দিবাকর চুপ করে তাঁর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল। এমদাদ মিয়া বললেন. 'তোমাকে রাজনীতি করতে নিষেধ করছি না আমি। কিন্তু বলছি– রাজনীতির আগে শিক্ষা। আচ্ছা. তোমার তো আগামী মাসের সাত তারিখে রেজিস্ট্রেশন। ওই সময় বেশ কিছু টাকার দরকার হবে তোমার। স্কুল থেকেও তোমাকে কিছু টাকা সাহায্য করা হবে. কিন্তু ওই টাকা দিয়ে হবে না। আরও কিছু টাকা দরকার হবে। তুমি এক কাজ করো. কাল সকালে ছোবানের কাছে যাও। সরকার থেকে কিছু অনুদানের টাকা এসেছে। ছোবানের এলাকার টাকা তাকে দেওয়া হয়েছে শুনলাম। টাকাগুলো গরিব দুখিদের জন্য। রেজিস্ট্রেশনের কথা বলে ওর কাছে টাকা চাইবে।'

এবার দিবাকর বলল. 'স্যার. শুনলাম– উনি আমার ওপর খুব রেগে আছেন। টাকা চাইতে গেলে যদি অপমান করেন?'

'দেখা যাক। যা বলছি তাই কর। ও হ্যাঁ. বয়স্ক কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেও।' স্কুল-সেক্রেটারি বললেন।

পরদিন সকালে দিবাকর ছোবান মেম্বারের বাড়িতে গেল। সঙ্গে ঠাকুমা। বাপকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল. বলরাম

মেম্বার সাব! মারার বাকি রেইখেছেন শুধু। হাতের কাছে পাইলে সেইটেও সাইরে নিতেন।' তারপর ম্লান মুখে বলেছিল, 'কী দরকার মেম্বারের কাছে টাকা চাইতে যাওয়ার? টাকা আমি জোগাড় করমু। দরকার হইলে দুইবেলা ভাত খামু না।'

দিবাকর বলেছে, 'আমিও বলেছি সেক্রেটারি স্যারকে এই কথা। তিনি বলেছেন– যা বলছি, তাই কর। নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু হেতু আছে। যাওয়া ভালো বাবা।'

'তারপরও তুমি যদি যেইতে চাও, ঠাকুমারে লগে লইয়ে যাও। আমি যামু না।' বলেছিল বলরাম।

সেই মতো ঠাকুমাকে সঙ্গে নিয়ে দিবাকরের ছোবান মেম্বারের বাড়িতে যাওয়া। একতলা বাড়ি। উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি। মস্তবড় উঠান। উঠানের এক পাশে চাতাল। এই চাতালের এককোণে জড়সড় হয়ে বসল নাতি–ঠাকুমা। কামলা গিয়ে ভেতরবাড়িতে মেম্বারকে খবর দিল। কামলার বিবরণ শুনে দিবাকরদের চিনতে পারলেন মেম্বার। দীর্ঘসময় পরে গদাইলস্করি চালে ছোবান মেম্বার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, কী সৌভাগ্য আমার আইজ! গরিবের দুয়ারে হাতির পা!'

ঠাকুমা ছোবান মেম্বারের উপহাস বুঝতে পারল না। হাত জোড় করে বলল, 'আমার নাতির নাকি কী জইন্যে ইস্কুলে টাকা লাইগব। অত টাকা আমাদের নাই হুজুর। আপনি যদি কিছু সাহাইয্য করেন, তাইলে বড় উপকার হয় আমাদের।'

'টাকা! আমি কইত্তুন টাকা দিমু! জমিদারের রাজকোষ খুইলা দিছিনি? না গুপ্তধন পাইছি!' আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বললেন মেম্বার সাহেব।

এবার দিবাকর বলল, 'আপনার কাছ থেকে টাকা চাইতে আসি নাই। সেক্রেটারি সাহেব বললেন– দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করার জন্য সরকারি টাকা আসছে আপনার কাছে। ওই টাকায় আমাদের হক আছে। ওখান থেকে টাকা দেওয়ার কথা বলছে আমার ঠাকুমা।'

'বাপরে বাপ, কী বক্তৃতারে! টাকা আইছে, তো? সেই টাকা ইন্ডিয়ার দালালদের দিবার জইন্য না। পাকিস্তানের আদর্শে যারা বিশ্বাসী, তাদের জইন্য ওই টাকা।' মেম্বার বললেন।

'আমরা যে ইন্ডিয়ার দালাল, কোনো প্রমাণ আছে আপনার হাতে?' দিবাকর চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল।

'প্রমাণ! প্রমাণ শুধু আমার হাতে থাকবে কেন, গোটা পতেঙ্গাবাসীর হাতে আছে। অই বেড অই, সেইদিন তুই পাকিস্তানবিরোধী মিছিলে যাস নাই? এমদাইদ্যার পিছন পিছন হাঁইট্যা বলস নাই– আমাদের দাবি মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে? পাকিস্তানের মহান প্রেসিডেন্ট আইউব খানেরে গদি থেইকা টাইনা নামাইতে চাস? মালাউনের বাইচ্চা কোনখানকার! ডোমের পোলা, এখনই বাইর হ আমার বাড়ি থেইকা। নইলে....।' কথা শেষ না করে রাগে কাঁপতে লাগলেন ছোবান মেম্বার।

মাথা নিচু করে অপমানিত নাতি–ঠাকুমা মেম্বারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

যেতে যেতে দিবাকর বলল, 'তোমাকে একটা অনুরোধ করি ঠাকুমা।'

শুনে ঠাকুমা দিবাকরের দিকে তার করুণ চোখ দুটো তুলল। ঠাকুমা পোড়খাওয়া মানুষ। জীবনের এই যে দীর্ঘ পথটি, এমনি এমনি তো হেঁটে আসেনি। বিপুল অসম্মান আর সামান্য আনন্দিত মুহূর্তকে সঙ্গী করে তিন কুড়ি পনেরোটি বছর কাটিয়ে দিয়েছে এই মহিলা। এই নারীটি বুঝতে পারে দিবাকর কী বলতে চায়। তাই মুখে কিছু না বলে বেদনাদীর্ণ চোখে তাকাল নাতিটির দিকে।

'আজকের এই অপমানটা শুধু তোমার আর আমার। বাবাকে না জানিয়ে পারব না। চতুর্থ কোনো কানে যাতে এই তিরস্কারের কথা না যায় ঠাকুমা। ভেবে দেখেছ– এই লাঞ্ছনা-র সংবাদটি যদি পঞ্চানন খুড়োর কানে যায়, তাহলে গোটা পাড়া ছড়িয়ে দেবে।' বলে নিবিড় চোখে ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে থাকল দিবাকর।

ঠাকুমা ধীরে ধীরে বলল, 'তোর বাবাকে বলারও দরকার নাই। এই কষ্টের কথা তোর আর আমার মইধ্যে থাউক।'

'বাবাকে না বললে.....।'

দিবাকরের কথা কেড়ে নিল ঠাকুমা বলল, 'তোর বাপটা বড় অভাগারে বাপধন। ছোটবেলায় বাপটা মারা গেইল। সেই বয়সেই সংসারের জোয়ালটা কাঁধে চাইপল। তারপর সমুদ্র আর বাড়ি, বাড়ি আর হাট-বাজার, পাড়ামহল্লার অলিগলি। দুঃখ ছাড়া সারাজীবন তেমন কুনু কিছু পায় নাই বাছা বলরাম। এই দুখি ছাওয়ালটার মনে কষ্টের আর বোঝা চাপাইস নারে বাপ।'

'কিন্তু বাপকে না বলা কি ঠিক হবে ঠাকুমা?' ইতস্তত করে বলল দিবাকর।

'অপমান যা হবার তা তো হইয়ে গেছেরে দিবাকর। আমাদের কপালে আইজ লাঞ্ছনা লেখা ছিল। এই অপমানের কথা তোর বাপেরে কইলে, অপমান তো আর কইমবে না, বরং বাইড়বে। দুইজনের অপমান তিনজনের মইধ্যে ছড়াইয়া পইড়ব। তোর বাপ থেইকে তোর মাও একদিন জাইনে যাইবে। সমস্ত পরিবার তখন এই অপমানের জ্বালায় জ্বইলতে থাইকবে। তার চাইতে এই-ই ভালা, ছোবান মেম্বারের তিরস্কারটা তোর আর আমার হইয়ে থাউক।' ঠাকুমা হাঁটতে হাঁটতে করুণ কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেল।

দিবাকর কিছু না বলে মাথা নিচু করে ঠাকুমার পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর অনেকটা স্বগতকণ্ঠে দিবাকর বলল, 'বাবাকে না হয় আজকের অপমানের কথা বললাম না, কিন্তু বাবাতো সাহায্যের কথা জিজ্ঞেস করবে, তখন কী বলবে তাকে?'

'বলবে মেম্বরে সাইয্য দিছেন।'

'কী সাহায্য দিয়েছেন! টাকা?' হেঁয়ালি করে বলল দিবাকর।

'হ, টাকা সাইয্য দিছেন মেম্বার সাব।' রহস্যময় গলায় নাতিকে বলল ঠাকুমা।

এবার হা হা করে হেসে উঠল দিবাকর। বলল, 'কী যে বল না তুমি ঠাকুমা! যদি বাপ জিজ্ঞেস করে– কত টাকা দিয়েছেন? কই দেখি দেখি টাকাগুলো। তখন কী হবে বল।'

এবার ঠাকুমা হাঁটা বন্ধ করল। কোমর সোজা করে সকালের রোদ ঝলমল আকাশের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'তোদের কাউকে না জানাইয়ে চারআনা আধুলি কইরে কইরে বাঁশের খোঁপে কিছু টাকা জমাইছি। সেই টাকা বাইর কইরে নিমু আইজ। সেই টাকা দেখিয়ে বলবি– এই তো, এই টাকাগুলাই দিছেন মেম্বার সাবে। তোর বাপ ঘোরপ্যাঁচের মানুষ না। যা বইলবি, তা-ই বিশ্বাস কইরব। কাগজের টাকা না দিয়া ভাঙতি টাকা দিলেন কেন মেম্বরে, সেই প্রশ্নও কইরবে না।'

এত বড় অপমানের মধ্যেও দিবাকরের হাসি পেল। ঠাকুমার প্রতি তার ভালোবাসা ও ভক্তি আরও গাঢ় হয়ে এলো।

আট

আজ সাত তারিখ। নাইনের রেজিস্ট্রেশনের দিন আজ। বেলা এগারোটা। ক্লাসরুমে নাইনের ছাত্রদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসানো হয়েছে। প্রত্যেকের সামনে একটি করে ফরম। ইংরেজিতে লেখা। বাবুল হক স্যারের ওপর দায়িত্ব পড়েছে ছাত্রদের ভালোমতো বুঝিয়ে দিয়ে স্বহস্তে ফরমটা পূরণ করিয়ে নেওয়ার। এর আগে রেজিস্ট্রেশনের টাকা ছাত্ররা পরিশোধ করে দিয়েছে। দিবাকরসহ আরও ক'জন দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রকে স্কুল থেকে টাকা সাহায্য করা হয়েছে। সব টাকা নয়, কিছু কিছু। বাকি টাকাগুলো দিবাকর ক্যাশ কাউন্টারে জমা দিয়েছে আজ সকালে। ফরমটি পড়ে পড়ে বাবুল হক স্যার ছাত্রদের বাংলা তর্জমা করে দিচ্ছেন। বলছেন, 'গোটা ফরমটা বুঝে ফেলার পর তোমরা লেখা শুরু করবে, তার আগে নয়। আর যে যেখানে বুঝবে না, তৎক্ষণাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করবে। ভুল করা চলবে না। বুঝেছ?'

এই সময় দপ্তরি হাবিব এসে জানাল– হেডস্যার দিবাকর দাদাকে ডাকছেন। বাবুল হক স্যার একটু বিরক্ত হলেন। মুখ বেজার করে চাপাস্বরে বললেন, 'এই সময় আবার ডাকা পাঠানো কেন?' তারপর দিবাকরকে যাবার অনুমতি দিলেন।

হেডস্যারের রুমে কেউ নেই। হেডস্যারকে কিছুটা বিষণ্ন দেখাচ্ছে। একটু ঘাবড়ে গেল দিবাকর। ছোবান মেম্বারের গালাগালির কথাটা জেনে গেলেন না তো? অথবা নিজের অজান্তে স্যারের মনে কষ্ট দেওয়ার মতো কোনো কাজ করে ফেলেনি তো সে? সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল দিবাকর। ত্রস্ত গলায় বলল, 'স্যার, আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ দিবাকর। কাছে এস। রেজিস্ট্রেশনের বাকি টাকা জোগাড় করতে অসুবিধা কষ্ট হয়নি তো তোমার বাবার?'

দিবাকর বুঝল– ছোবান মেম্বারের কাছে তাকে যে সেক্রেটারি স্যার পাঠিয়েছেন, সেটা হেডস্যার জানেন না। জানলে প্রশ্নটা এভাবে করতেন না। হয়তো বলতেন– ছোবান মেম্বার কত টাকা দিয়েছেন? মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দিবাকর। আস্তে করে বলল, 'টাকা জোগাড় হয়ে গেছে স্যার। সকালে ক্যাশ কাউন্টারে জমাও দিয়ে দিয়েছি।'

হেডস্যার বললেন, 'ভালো ভালো।' বলে চুপ মেরে গেলেন হেড স্যার। তিনি আর কোনো কিছু বলছেন না। দিবাকর উসখুস করতে লাগল। শেষে বলল, 'স্যার আমার ফরম পূরণের কাজ চলছে। এখন যাই?'

'না। দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।' বলে আবার চুপ মেরে গেলেন সত্যব্রত চক্রবর্তী। চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবতে লাগলেন। বহুক্ষণ পর চোখ খুললেন। সেই চোখ জ্বলজ্বলে, জলার্দ্র। বললেন, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না দিবাকর। তোমাকে একটা কথা বলব বলে ডেকে আনিয়েছি। এখনই বলা দরকার বলে ক্লাসরুম থেকে উঠিয়ে এনেছি। ফরমটা পূরণের আগেই তোমাকে কথাটা বলা দরকার।' এরপর একটু থামলেন। তারপর চট করে বললেন, তোমার পদবিটা পাল্টে ফেল দিবাকর।' বলে দ্রুত অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে ফেললেন হেডস্যার।

'পদবি পাল্টাব!!' বিস্মিত কণ্ঠ দিবাকরের।

'হ্যাঁ, জলদাস পদবিটা পাল্টে অন্য একটা কিছু লিখ ফরমে। এই ফরমে যা লিখবে সারাজীবন ধরে তা–ই হবে তোমার পদবি। শুধু তুমি না, তোমার ছেলেমেয়ে নাতিনাতনি– এদেরও।'

'কী পদবি লিখব স্যার?'

'যা তোমার মন চায়– সেন, চৌধুরী, দাশগুপ্ত, মজুমদার, সরকার, রায়, দেব, যা মন চায় তা-ই লিখ। শুধু নামের শেষে জলদাস লিখ না।'

দিবাকর জিজ্ঞেস করল, 'কেন স্যার? জলদাস বাদ দিয়ে অন্যকিছু লিখব কেন?'

দিবাকরের এই কেনর কী উত্তর দেবেন সত্যব্রত চক্রবর্তী? এই কেনর উত্তর তাঁর ভালো করেই জানা। যুগ যুগ ধরে বর্ণবাদী হিন্দুরা তাদের অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছে। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। মানুষ বলে কোনোদিন গণ্য করেনি তাদের। বরং এই জলদাসদের, এই মুচি–মেথর–ধোপাদের, ডোম–ব্যাধদের ছোটলোক হিসেবে, মানবেতর প্রাণি হিসেবে প্রতিপন্ন করে উঁচুজাতের মানুষদের উল্লাসের সীমা থাকেনি। এই ঘৃণা-অবহেলার ব্যাপারটি শুধু বর্ণবাদী হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সাম্যবাদী মুসলমানদের মধ্যেও জঘন্যভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। নইলে কেন সেদিন ছোবান মেম্বার জেলেদের জাত ধরে এরকম গালাগাল করলেন? পায়ের তলার চটির সঙ্গে দিবাকরকে তুলনা করে তিনি মনের ঝাল মেটালেন। তার চেয়ে এ-ই ভালো। পদবি পাল্টে ফেলা। তাতে দিবাকরের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। গালিগালাজ-তুচ্ছতাচ্ছিল্য থেকে অন্তত রেহাই পাবে ছেলেটা। পতেঙ্গা নামের এই ছোট্ট গ্রামটির বাইরেও সমাজজীবন আছে, সেইখানে গিয়ে ছেলেটি অন্তত স্বস্তির শ্বাস ফেলতে পারবে। নিত্যদিনের অপমানের হাত থেকে বেঁচে যাবে দিবাকরটা। তাই দিবাকরকে ডেকে পদবি পাল্টানোর কথাটি বললেন সত্যব্রত চক্রবর্তী।

দিবাকরের বিষণ্ন কণ্ঠ তাঁর কানে ভেসে এলো, 'স্যার, আমার জন্ম-উৎসকে অস্বীকার করব স্যার?'

'তা বলছি না দিবাকর। এবং তা আমি চাইও না।'

'তাহলে স্যার?'

হেডস্যার করুণ চোখে দিবাকরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কোনো জবাব তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো না।

'দিবাকর বলল, 'স্যার, আমি যদি পদবি পাল্টাই, আমার পাড়ার লোকেরা আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। বলবে– দু'কলম পড়ালেখা শিখে নিজের জাতটাকে অস্বীকার করছে দিবাকর। আর আজকে যে সাম্প্রদায়িক মানুষরা আমাদের ঘৃণা করছে, আরও বেশি করে ঘৃণা করার সুযোগ পেয়ে যাবে তারা। একূল ওকূল– দু'কূলই হারাব তখন। স্যার, মানুষ যে মাটিতে আছাড় খায়, ওই মাটি ধরেই উঠে দাঁড়ায়। আমি স্যার যে সম্প্রদায়ে জন্মেছি, সেই সম্প্রদায়কে আঁকড়ে ধরেই কিছু একটা করতে চাই স্যার। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন স্যার।'

সত্যব্রত চক্রবর্তী হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলেন। চেয়ার ছেড়ে দ্রুত দিবাকরের কাছে এগিয়ে এলেন। জাপটে ধরে বুকের কাছে টেনে নিলেন দিবাকরকে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তুমি আজ আমার চোখ খুলে দিলে বাবা। আমি আশীর্বাদ করছি– একদিন তুমি সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।' তারপর নিজেকে সংযত করলেন তিনি। দিবাকরের পিঠে স্নেহের হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'যাও, ক্লাসরুমে যাও। রেজিস্ট্রেশন ফরমটা পূরণ করো। জলদাসই লিখবে তোমার পদবি।'

দিবাকর হেডস্যারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ঊনসত্তরের পর সত্তর এলো। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঢেউ কিন্তু তখনও স্তিমিত হয়ে যায়নি। আইয়ুব খান বাঙালিদের সামনে মৌলিক গণতন্ত্রের টোপ ফেলল। কিন্তু এই টোপে জাতীয়তাবাদী বাঙালিরা বিভ্রান্ত হলো না। তারা মৌলিক গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করল। কারণ ততদিনে বাঙালির স্বপ্ন ভেঙে গেছে। বাস্তব সচেতন বাঙালিরা

মরীচিকার হাত থেকে মুক্তি চাইল। পঁয়ষট্টির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আর পাক-ভারত যুদ্ধের মর্মার্থ তখন তারা বুঝে গেছে। এই জন্য ছেষট্টির ছয় দফা আর পরবর্তী এগারো দফার দাবির প্রতি তারা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। উনসত্তরের জেগে ওঠা বাঙালিরা সত্তরে নির্বাচন চাইল। নেতা কে? আবার কে– শেখ মুজিবুর রহমান। ততদিনে শেখ মুজিব বাঙালির প্রাণের নেতায় রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। আওয়ামী লীগ তাঁর দল। নৌকা তার প্রতীক।

পাকিস্তানের গদিতে তখন ইয়াহিয়া খান। কিছুদিন আগে পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খানকে হটিয়ে ইয়াহিয়া ক্ষমতা দখল করেছে। তার গোয়েন্দারা তাকে তথ্য দিল– এখন নির্বাচন দিলে ভয়ের কিছু নেই। পূর্ব পাকিস্তানে ইন্ডিয়ার কিছু দালাল হইচই করছে সত্য। তাদের সংখ্যা সামান্য। অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান কওমের পক্ষে। তাদের বুকে ইসলামি জোশ। এই সময় নির্বাচন দিলে শেখ মুজিবের নৌকায় ভরাডুবি হবে। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয় অবধারিত। নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগকে ধূলিসাৎ করা যাবে। শেখ মুজিবকে চিরজীবনের জন্য স্তব্ধ করে দেওয়া যাবে। সুতরাং জাতীয় নির্বাচনই শ্রেয়। গোয়েন্দাদের কথা বিশ্বাস করল ইয়াহিয়া খান। ঘোষণা দিল– ১৯৭০ এর ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনের ঢেউ চট্টগ্রামের ছোট একটি গ্রাম উত্তর পতেঙ্গায়ও এসে পৌঁছাল। নির্বাচনের হাওয়া লাগল গ্রামবাসীদের গায়ে। এমদাদ মিয়া আওয়ামী লীগের পক্ষে আর ছোবান মেম্বার মুসলিম লীগের পক্ষে জোরেশোরে কাজ শুরু করলেন। মিছিলে মিছিলে পতেঙ্গার অলিগলি, রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল। এমদাদ মিয়ার মিছিলে শত শত মানুষ। তাদের মুখে স্লোগান-তোমার আমার মার্কা কী, নৌকা নৌকা। আমার নেতা তোমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। নৌকা মার্কায় দিলে ভোট, সুখে থাকবে দেশের লোক। আমার তোমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা। পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

ছোবান মেম্বার মিছিল বের করেন। তাঁর মিছিলে শতলোক। অধিকাংশের মুখে দাড়ি, মাথায় জিন্নাহ টুপি। হাতে লাঠি, মুখে পাকিস্তান বাঁচাও ধ্বনি। তারা স্লোগান দেয়– নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর। বঙ্গবন্ধুর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়। রাস্তায়, গলিতে ঘুরে ঘুরে একটি স্লোগান খুব জোরসে দিতে লাগল ছোবানের মিছিল– জয় বাংলা জয় হিন্দ, লুঙ্গি খুইল্যা ধুতি পিন্দ।

বটগাছতলায় ছোবান মেম্বার বক্তৃতা দেন– ভাইয়েরা আমার, কাফেরদের সাথে মিইশ্যা কিছু বিপথগামী মুসলমান আইজ পাকিস্তান ভাঙার পরিকল্পনা কইরতাছে। কত কষ্টের এই স্বাধীনতা! ভাইবে আমি খুব বেদনা পাইচ্ছি– এত সহজে বাঙালিরা জাতির পিতা কাইদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নারে ভুইল্যা কী কইরে! আমাদের নেতা জিন্নাহ একজন পরহেজগার মানুষ ছিলেন। মুসলিম উম্মার জইন্য জান কোরবান করে দিয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের গরিব মানুষদের সুখের জইন্য দিনের আরাম আর রাতের ঘুম দুইটেই হারাম কইরে ফেলেছিলেন তিনি। কী কইরে গরিব মানুষেরা দুইবেলা খাইতে পারবে– হেই কথাই হরহামেশা ভাইবতেন তিনি। ওই যে অনাড়ম্বর জীবন না কী কয় না, সেই অনাড়ম্বর জীবন কাটাইতেন আমাদের জাতির পিতা। সেই কাইদে আজম জিন্নারে ভুইলে গেল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ!!

কথায় জোর লাগিয়ে ছোবান মেম্বার বলতে লাগলেন– যে বাঙালিরা লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান বইলেছিল, সেই বাঙালিরা কী কইরে আজ হিন্দুস্থানের সঙ্গে হাত মিলাইল! ইন্ডিয়ার সিআইডি আইজ পূর্ব পাকিস্তানে ঢুইকা পড়ছে। তাদের উস্কানিতে বেইমান মুসলমানরা আইজ পাকিস্তান ভাঙার স্লোগান দিচ্ছে। ভাই বেরাদারগণ, ওইসব মীরজাফরের কথায় কান দেবেন না আপনারা। মুসলিম লীগের প্রার্থীরে ভোট দিয়া পাকিস্তানের হাতকে জোরদার করেন মুসলমান ভাইরা। পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁতভাঙা জবাব দেন।

তারপর জোরগলায় চিৎকার দিয়ে ওঠেন– নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর। এরপর বলেন, 'ও হ্যাঁ একখান কথা কইতে ভুইলে গেছি, আপনারা যদি আওয়ামী লীগেরে মাইনে নৌকা মার্কায় ভোট দেন, তইলে এই পূর্ব পাকিস্তান হিন্দুস্থান হইয়ে যাইবে। লুঙ্গি ছাইড়ে ধুতি পইরতে হইবে আপনাদের। মাইয়ালোকগো পইরতে হইবে শাঁখা-সিঁদুর। পানি বইলতে দিবে না আপনাদের এই আওয়ামী লীগ, পানিরে জল বইলতে বাইধ্য কইরবে।'

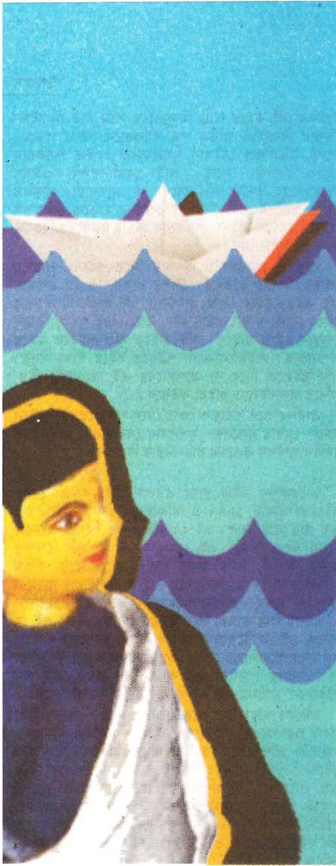
তারপর কণ্ঠে সর্বাত্মক জোর ঢেলে সুর করে টেনে টেনে ছোবান মেম্বার বললেন– মুসলমান বেরাদাররা, এইবারের নির্বাচন মুসলিম কওমের বাঁচা-মরার নির্বাচন।

আরেকদিন একই স্থানে এমদাদ মিয়া বক্তৃতা দেন– ভাইয়েরা আমার, ১৯৪৭-এ পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল। ২৩ বছর পার হতে চলল। এই ২৩ বছরে কী পেয়েছি আমরা? হিসেব করে দেখুন। এই যে আমাদের কর্ণফুলী পেপার মিলের কাগজ, তৈরি হবার পর জাহাজে করে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। সিল মেরে সেই কাগজ আবার পাঠানো হয় পূর্ব পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা কাগজের দিস্তা কেনে ছয় আনায় আর আমরা কিনি বারো আনায়। কেন? ওই যে শোষণ, ওই যে নিষ্পেষণ। জাহাজ ভাড়া, কাগজের বান্ডিলে সিল মারা পাঞ্জাবিদের বেতন কাগজের গায়ে লেপ্টে দেওয়া হয়। তারপর পাঠানো হয় বাঙালিদের কাছে, এই পূর্ব পাকিস্তানে'। আমাদেরই কাগজ আমরা কিনি ডবল দামে।

সমবেত মানুষ উচ্চ স্বরে ধিক্কার জানায়। এমদাদ মিয়া আবার শুরু করেন, 'আমাদের নেতা শেখ মুজিব এই রকম হাজারটা পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ওরা বায়ান্নতে বাংলা মায়ের ভাষাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। পঁয়ষট্টিতে পাক-ভারত যুদ্ধের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। উনসত্তরে আসাদ, শামসুজ্জোহার মতো মানুষকে গুলি করে মেরেছে। ভেবেছে বাঙালির মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। মুখ বন্ধ করা যায়নি।'

এইসময় সমবেত মানুষ স্লোগান দিয়ে ওঠে– বাঙালিকে দমন করা যায়নি, যাবে না।

এমদাদ মিয়া বলতে থাকেন– ভাইসব, ছোবান মেম্বার জিন্নাহ সাহেবের কথা বলে। বলে জিন্নাহ পাকিস্তানের জাতির পিতা, জিন্নাহ পরহেজগার। পরহেজগার মানে তো খোদাভক্ত। জিন্নাহ কীরকম খোদাভক্ত ছিলেন শোনেন। জিন্নাহ ধর্মে মুসলমান হলে কী হবে, তিনি কিন্তু কোনোদিন মসজিদে যাননি। রোজা কী জিনিস জানতেন না তিনি। আরও মজার কথা শোনেন আপনারা, কোনো মুসলমান-নারীকে বিয়ে করেননি জিন্নাহ। বিয়ে করেছিলেন রতি পেটিট নামের এক পার্শি কন্যাকে। পার্শি কারা তো জানেন আপনারা। পার্শি মানে অগ্নি-উপাসক। মুসলিম হয়ে অগ্নি-উপাসককে বিয়ে করেছেন তিনি। এর চাইতে নাজায়েজ কাজ আর কী হতে পারে বলুন। স্ত্রীর সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক। খুব বেশিদিন বাঁচেনও নি ওই মহিলা। জীবনে কোথাও সুখ পাননি জিন্নাহ। না দাম্পত্য জীবনে, না শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুরবাড়ির



লোকেরা জিন্নাহকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত। কোনোদিন তাদের বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি জিন্নাহকে।

ছোবান মেম্বার বলে, জিন্নাহ সাহেব নাকি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। মিথ্যা, ডাঁহা মিথ্যা। কোট-প্যান্ট-টাই ছাড়া জিন্নাহ সাহেবের অন্যকোনো ছবি দেখেছেন আপনারা? দেখেননি। দেখবেন কী করে? তিনি তো শৈশব ও কৈশোর জীবন কাটিয়েছেন লন্ডনে, সাহেব সুবোদের সঙ্গে। ভাইয়েরা, বিলাসী জীবন ছিল তাঁর। পাকিস্তানের গরিব মানুষরা যখন না খেয়ে মরছে, ওই সময় জিন্নাহ সাহেব ফার্স্ট ক্লাসে ট্রেন ভ্রমণ করছেন।

এতটুকু পর্যন্ত বলে এমদাদ মিয়া দম নিলেন। তারপর আবার বললেন– বড় দুঃখে কেটেছে শেষ জীবন তাঁর। মৃত্যুকালে তাঁর পাশে কেউ ছিল না। এমন কি একমাত্র কন্যা দিনাও বাপের পাশে ছিল না। ক্ষমতালোভী ফায়দাবাজ পাকিস্তানি নেতারা জীবনের শেষদিকে পুলিশ দিয়ে ঘিরে রেখেছিল জিন্নাহকে। তাঁর একমাত্র বোন ফাতিমা জিন্নাহকে পর্যন্ত তাঁর কাছ ঘেঁষতে দেয়নি। এই-ই ছোবান মেম্বারদের জিন্নাহ সাহেব, এই-ই পাকিস্তানের জাতির পিতা!!

সমবেত মানুষদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন এমদাদ মিয়া। তারপর আবার শুরু করেন– আমাদের হাতে সুযোগ এসেছে সামরিক শাসক ইয়াহিয়াকে উচিত জবাব দেওয়ার। আমরা সবাই ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দেব। এই আমাদের প্রতিজ্ঞা, এই আমাদের সংকল্প। এর পর জোরসে বলে ওঠেন– নৌকা মার্কায় দিলে ভোট, শান্তি পাবে দেশের লোক। জয় বাংলা।

দিবাকর টেনের ছাত্র এখন। সামনে নির্বাচনী পরীক্ষা। পরীক্ষার বেশি দেরি নেই। সাধারণত স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা হয় ডিসেম্বরে। ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচন বলে সরকার আদেশ জারি করেছে– ডিসেম্বরের পরিবর্তে নভেম্বরেই বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে নিতে হবে, সঙ্গে নির্বাচনী পরীক্ষাও। তা-ই পড়াশোনা করে যাচ্ছে দিবাকর। পড়ার কারণে মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নিতে পারে না সে। এমদাদ মিয়া বলে দিয়েছেন– দিবাকর, মিছিলে আসার দরকার নেই তোমার। তোমার জন্য পরীক্ষা আগে। এই গ্রামে শিক্ষিত সচেতন লোকের বড় অভাব। আগে এসএসসিটা দাও। তারপর তোমাকে ডেকে নেব আমি।

দিবাকর মিছিলে যায় না। কিন্তু সকল খবর রাখে। এমদাদ মিয়ার বক্তৃতার কথা, ছোবান মেম্বারের প্রতিক্রিয়াশীল ভাষণের কথা– সবই তার কানে আসে। মনে মনে সে প্রস্তুত হতে থাকে।

নয়

হাজারো বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সত্তরের নির্বাচন হয়ে গেল। ডিসেম্বরে। শত-সহস্র মানুষের মৃতদেহ মাড়িয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। ভোটের মাসখানেক আগে, নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূলে প্রলয়ঙ্করী ঝড় হলো। ভয়াবহ এই সমুদ্রঝড় সমুদ্রজলকে ঝেঁটিয়ে তুলে আনল উপকূলে। ঝড় আর নোনাজলের তা বে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাল। হাহাকার–আর্তনাদে জনজীবন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল। পাকিস্তান সরকার বিপর্যস্ত অঞ্চলে কোনোরূপ মানবিক সাহায্য পাঠাল না। উপরন্তু আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার জন্য যতটুকু চালাকির দরকার, তাদের সবটারই আশ্রয় নিল ইয়াহিয়া সরকার। সরকারের এই সীমাহীন ঔদাসীন্য ও দায়িত্বহীনতা বাঙালির চোখকে আরও বেশি করে খুলে দিল। তাদের জাতীয় চেতনা আরও অধিক পরিমাণে সোচ্চার হয়ে উঠল। তারপরও এই গণবিপর্যয়ের কথা বলে ইয়াহিয়ার কাছে মানবিক আবেদন করল বাঙালিরা– জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক।

কিন্তু ইয়াহিয়া খানের এককথা– জাতীয় নির্বাচন কোনোমতেই পিছানো হবে না, ডিসেম্বরেই অনুষ্ঠিত হবে। গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিয়েছে, এই সময় নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি নিশ্চিত।

হলো নির্বাচন। দলে দলে মানুষ ভোট দিতে গেল। নির্বাচনে জয়লাভ করল শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ। নিরঙ্কুশ বিজয়। উল্লাসে ফেটে পড়ল বাঙালিরা। এখন থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে তারা। এখন থেকে বারো আনায় কাগজের দিস্তা কিনতে হবে না। বড় বড় সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদে পাঞ্জাবি আর বেলুচদের বদলে

এখন থেকে বাঙালিরাই বসতে পারবে। বাংলায় চিঠি লিখে নিজেদের দুঃখ-বেদনার কথা এবার থেকে মন্ত্রীদের নির্ভয়ে জানাতে পারবে তারা। দিকে দিকে জয়ধ্বনি উঠল– জয় বাংলা, বাংলার জয়।

আওয়ামী লীগ ঘোষণা করল– পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস বিলুপ্ত করা হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রদেশে ওই অঞ্চলের মানুষদের চাকরি দেওয়া হবে। মানুষের ওপর শোষণ করা চলবে না। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা হবে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয়করণ করা হবে। এইসব ঘোষণা শুনে বুঝে ইয়াহিয়ার চক্ষু তো চড়কগাছ! বলে কীরে বেটা শেখ মুজিব! একে তো নৃশংস ইয়াহিয়া, তার সঙ্গে এসে জুটল ভুট্টো। যেন দুর্যোধনের সঙ্গে শকুনি। শকুনি যেমন দুর্যোধনের ভেতরের অসৎবুদ্ধিগুলোকে চাগিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিল, তেমনি পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো ইয়াহিয়ার ভেতরের পশুত্বকে জাগিয়ে তুলল। ইয়াহিয়ার কানে কানে ভুট্টো বলল, বাঙালির হাতে কখনো রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এই শেখ মুজিবটা

মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। এই অধিবেশনে যোগ দেবে ভুট্টোর পিপলস পার্টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যসব দল। মানে! মানে এই নির্বাচনের ফলাফল ইয়াহিয়া মেনে নিয়েছে। তিন তারিখেই জননেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন।

মানুষ রাস্তায় নেমে এলো। স্লোগান দিল– আমার তোমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।

কিন্তু বাঙালির স্বপ্ন ওলটপালট হয়ে গেল মার্চের এক তারিখে। সেদিন দুপুরে পাকিস্তান রেডিওতে ইয়াহিয়া খানের একটি বিবৃতি প্রচার করা হলো। বিবৃতিতে বলা হলো– জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হলো।

পূর্ব পাকিস্তানে জনসমুদ্র জেগে উঠল। বাঁধভাঙা জোয়ারে শহর-নগর-গ্রাম, অলিগলিরাজপথ ভেসে যেতে থাকল। গোষ্ঠীচেতনা আর দলীয়চেতনাকে পেছনে ফেলে জনতার মিছিল পাকিস্তানের নিশানা মোছার দক্ষযজ্ঞে মাতোয়ারা হলো। সবার মুখে ধ্বনিত হতে থাকল– বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।



পাকিস্তানকে ইন্ডিয়ার কাছে বেচে দেবে। মানুষ সৎ পরামর্শের চেয়ে কুপরামর্শ বেশি শোনো। আর শ্রোতা যদি নরাধম হয়, তাহলে অসৎ পরামর্শ তার মাথা দ্রুত গুলিয়ে দেয়। তাই চক্রান্তকারী ভুট্টো নামের অধমের কথা শুনে নরাধম ইয়াহিয়া জ্বলে উঠল। বলল– কিছুতেই পাকিস্তানের শাসনভার শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেব না। বিনিময়ে যা হবে হোক।

ভুট্টো ইয়াহিয়ার খানের হাত চেপে ধরল– ধীরে জেনারেল, ধীরে। বুদ্ধি দিয়ে পথের কাঁটা দূর করতে হবে। তারপর দু'জনে নিবিষ্ট মনে রুদ্ধ ঘরে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করল। আলাপ শেষে খুশিমনে ভুট্টো গাড়িতে উঠল। ভাবল– যে বুদ্ধি ইয়াহিয়াকে দিয়েছি, তা কার্যকর করলে পাকিস্তানের পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী হবে সে নিজে। পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট তো তার দলই পেয়েছে।

পরদিন ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিলেন– একাত্তরের তিন

এমদাদ মিয়ার নেতৃত্বে পতেঙ্গার অধিকাংশ মানুষ নেমে এলো রাজপথে। দিবাকর এইসময় ঘরে বসে থাকে কী করে? পড়ে থাক লেখাপড়া, ভেসে যাক পরীক্ষা। সামনের এপ্রিলে তাদের এসএসসি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার কথা তার মনে থাকল না। মিছিলে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে স্লোগান দিল– বীর বাঙালি অস্ত্র ধর...।

৭ মার্চ, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে বললেন– এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তার পর ২৫ মার্চের কালরাত্রি। আগুন। খাণ্ডবদাহ। খাণ্ডবদাহে মরেছিল– সহস্র লক্ষ মানবেতর প্রাণী। হত্যাকারী ছিল কৃষ্ণ আর অর্জুন। অগ্নিদেবতার ক্ষুধা নিবারণের জন্য কৃষ্ণ আর অর্জুন অগ্নিসম মরণাস্ত্র তুলে নিয়েছিল হাতে। সেই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল

খাণ্ডব নামের অরণ্যে।

ঢাকাদাহে প্রাণ গেল হাজার হাজার মানুষের। ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হায়েনারা ঢাকার নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ চালাল। বর্বর পাকসেনাদের লেলিয়ে দিল ইয়াহিয়া খান। দ্বাপর যুগের অগ্নিদেবতার মতো ইয়াহিয়ার পেটে বাঙালির পোড়া মাংস খাওয়ার ক্ষুধা। তাই তো তার নির্দেশে হাজার হাজার পাকসেনা বাঙালি নিধনে উন্মত্ত হয়ে উঠল।

স্বৈরতন্ত্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে গণতন্ত্রের শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। নেতারা আত্মগোপনে গেলেন। বঙ্গের বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হলো। যাওয়ার আগে তিনি বলে গেলেন– তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

পতেঙ্গায় এমদাদ মিয়ারা আত্মগোপন করলেন। রাজপথের দখল নিল ছোবান মেম্বার। তার চারদিকে চেলা-সাঙ্গাতরা। গলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে একে তাকে ধমকাতে শুরু করল ছোবান মেম্বার। শোনা গেল– সে এখন শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান হয়েছে। পতেঙ্গায় পাকিস্তানি ঝান্ডাকে উঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নাকি তাকেই দিয়েছে স্থানীয় মিলিটারি কমান্ডার।

স্কুলকমিটি ভেঙে দিয়েছে সে। এখন স্কুলের সর্বময় কর্তা ছোবান মেম্বার। একদিন স্কুলে গিয়ে মিলন স্যারের গায়ে হাত তুলে এসেছে। সত্যব্রত চক্রবর্তীকে মালাউন বলে জোরসে ধমকে দিয়েছে।

একদিন দিবাকর শুনতে পেল– হেডস্যার রাতের আঁধারে চলে গেছেন। যাওয়ার আগে দপ্তরি হাবিবের হাতে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়ে বলেছেন– দিবাকরের হাতে পৌঁছে দিও। তাতে লেখা– চোরের মতো পালিয়ে গেলাম। ছোবান মেম্বাররা দানব হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে। যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করার বড় ইচ্ছে ছিল। পরিস্থিতি প্রতিকূল। তাই রাতের আঁধারে চলে গেলাম। নিজের দিকে খেয়াল রেখো। বেঁচে থাকার চেষ্টা করো। ইতি সত্যব্রত চক্রবর্তী।

ছোবান মেম্বার আবদুর রশিদ স্যারকে পতেঙ্গা হাইস্কুলের হেডমাস্টার বানালেন।

আরেকদিন শোনা গেল– মিলন স্যার সপরিবারে কোথায় যেন চলে গেছেন। চলে গেছে হিন্দুপাড়ার আরও অনেক পরিবার।

ছোবান মেম্বারের সঙ্গে ঈশান মাঝির হাটে একদিন দেখা হয়ে গেল বলরামের। লইট্যা মাছ বেচতে গিয়েছিল বলরাম। মাছ ধরে না বেচলে বাঁচবে কী করে বলরামরা? তাদের যে বড় খিদে। প্রত্যেক বাড়িতে যে পাঁচ-দশটা হাঁ-করা মুখ। তাই জীবন বাজি রেখে মাছ ধরতে যায় জেলেপাড়ার জলদাসরা।

সমুদ্রকূল ঘিরে পাকসেনারা অবস্থান নিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের দিকে কামান আর বন্দুক উঁচিয়ে আছে তারা। যদি ভারতের সৈন্য আর মুক্তিরা সমুদ্রপথ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে!

ওদের পেরিয়ে সমুদ্রজলে নামতে হয় জেলেদের। যাওয়া-আসার পথে বর্বর পাকুরা নানারকম লাঞ্ছনা দেয় জলদাসদের। কখনো নেংটা করে হিন্দু না মুসলমান পরীক্ষা করে, কখনো আপাদমস্তক বুটজুতা দিয়ে মাড়িয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। এতসব কিছু সহ্য করেও মাছ মারতে যায় মেছোরা। এই তো সেদিন দুপুরে চৌরাশির বাপকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল পাঞ্জাবিটা। অপরাধ? হল্ট বলার পরও দাঁড়ায়নি চৌরাশির বাপ। সে যে বয়রা, হাজার বার বোঝানোর চেষ্টা করেছে চৌরাশির বাপ। পাকুরা মানেনি। উপরন্তু কল্পিত মুক্তিযোদ্ধাকে মারতে পেরে তাদের আনন্দের সীমা থাকেনি।

হিন্দুদের মতো গ্রাম থেকে পালাতে পারেনি জেলেরা। বড় রাস্তাগুলো পাকসেনারা আর রাজাকাররা মিলে ঘিরে রেখেছে। সমুদ্রপথ দিয়ে পালানো যেত। দিবাকররা একবার উদ্যোগও নিয়েছিল। পাকসেনাদের নজর এড়িয়ে চরপাড়ার ঘাটে নৌকাগুলো প্রস্তুতও রেখেছিল। অধিকাংশ নারী-পুরুষ নৌকায় উঠেছিলও। শেষ পর্যন্ত পঞ্চানন খুড়ো ধরা পড়ে গেল বেলুচ কমান্ডারটির হাতে। পালিত তিনটে ছাগল আর বউ-সন্তান নিয়ে বেড়িবাঁধ পেরোতে যাবে, অমনি পাঁঠাটি বিকট শব্দে ডেকে উঠেছিল। ওই বিকট শব্দ জেলেদের কাল হলো। দু'চারটা বাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কথা বলে দিল পঞ্চানন খুড়ো। ছাগলগুলো তো গেলই, উপরন্তু নৌকা থেকে সবাইকে ধরে আনা হলো। কমান্ডারটি বলল– ফের পালাতে চাইলে সবার লাশ ফেলে দেব। সবাইকে পাড়ায় পাঠিয়ে দিয়ে সেনাদের ওপাড়ার ওপর কড়া নজর রাখতে বলল।

সেই থেকে জলদাসদের বন্দিজীবন। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় জেলেরা। দু'বেলার অন্ন জোগাড় করার জন্য মাছ বেচতে যায় পাড়ায়-মহল্লায়, ঈশান মাঝির হাটে। ওই হাটেই পতেঙ্গার বর্তমানের বিধাতা ছোবানের সঙ্গে বলরামের দেখা।

ছোবান মেম্বার বললেন, 'কীরে বলরাইম্যা, কেমুন আছস? তোর পোলা, ওই যে দিবাকর না শালকর, কী যেন নাম, হে কেমুন আছে? জিজ্ঞেস করিস তো তার বাপ এমদাইদ্যা এখন কোথায় আছে? সাগরেদ আছিল তার। অন্য কেউ না জানুক, ওস্তাদের কথা তোর পোলা তো জাইনব। একদিন রাজাকার লইয়া জিগাইতে আসমু তারে।'

বলরামের তো চিৎকার দিয়ে কাঁদার বাকি। কুঁজো হয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলরাম বলল, 'কী যেন কন হুজুর! আমার পোলা এমদাদ মিয়ার সাগরেদ হইতে যাইবে কুন দুঃখে? হে তো এখন পড়ালেখা করে। সামনে নাকি ফাইনাল পরীক্ষা।'

'ছোবান মেম্বার ধমক দেওয়া ভুলে গিয়ে হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ও, একটা ভালো কথা মনে করাই দিছস তুই। সব মালাউনের পোলারা তো দেশ ছেইড়ে পলাইছে। হিন্দুছাত্র নাকি একজনও আসে না ইস্কুলে। সামনের এসএসসি পরীক্ষাও দিব না কুনু হিন্দু পোলা। কুনু হিন্দু পোলা পরীক্ষা না দিলে দেশ যে স্বাভাবিক আছে, তা বিশ্বরে বুঝান যাইব না। একজন হিন্দু পরীক্ষা দিলেও চইলবে। তো তোর পোলারে কইবি– ভালা করি লেখাপড়া কইরতে। তারে সামনের মাসে এসএসসি পরীক্ষা দিতে হইবে।' বলে বেশ রূঢ় চোখে বলরামের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলল, 'আর তোর পোলারে কইবি ইন্ডিয়ার দালাল এমদাইদ্যার সংবাদ পাইলে যাতে ত্বরিত আমারে জানাইয়া যায়।'

দুরু দুরু বুকে বাড়ি ফিরে দিবাকরকে সব খুলে বলল বলরাম। কইছালি করতে করতে বলল, 'অ পুত, তোমারে বুঝি আর বাঁচান যাইব না ছোবাইন্যার হাত থেইকে।'

দিবাকর বাবার হাত ধরে বলল, 'তুমি ঘাবড়ে যেও না বাবা। ছোবান মেম্বার আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। শোন নাই, বাঘের বল বারো বছর? বারো বছর পর বাঘ যেমন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যায়, ছোবানরাও একদিন নেড়িকুত্তা বনে যাবে। তাদের বল ফুরিয়ে এসেছে। চারদিকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে বাবা।'

'জানি না বাপ, আমাদের কপালে শেষ পর্যন্ত কী লেখা আছে জানি না।' বলে উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকাল বলরাম।

যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে স্রষ্টার কাছে তাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের কথা জানতে চাইছে। তারপর আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বলরাম। বলল, 'তুমি সাবধানে থেইকো বাপ। আমি তো সবসময় ঘরে থাকি না। কুন সময় ছোবান মেম্বার আইসে হানা দেয়।'

'ঠিক আছে বাবা। তুমি আমার জন্য চিন্তা কর না। আমি এরপর থেকে সাবধানে থাকব।' পিতাকে আশ্বস্ত করে দিবাকর।

এপ্রিল মাসের পরীক্ষায় ছোবান মেম্বার দিবাকরকে হাজির রাখতে পারলেন না। তিন চারবার রাজাকার পাঠাল দিবাকরদের বাড়িতে, কিন্তু দিবাকরকে খুঁজে পেলেন না। এজন্য পাকু কমান্ডার খুব গালিগালাজ করল ছোবানকে। এর প্রতিশোধ নিতে ছোবান রাজাকার আর পাকসেনাদের জেলেপাড়ার প্রতি লেলিয়ে দিল ।

একদিন কিছু পাকসেনাকে পথ দেখিয়ে জেলেপাড়ায় নিয়ে এলেন ছোবান মেম্বার। সঙ্গে পাঁচজন রাজাকার। তাদের হাতে গাদা বন্দুক। দিবাকর মা-ঠাকুমা-ভাইবোনকে নিয়ে পুকুরপাড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নিল। বলরাম তখন সমুদ্রজলে।

পরদিন সন্ধ্যার আগে আগে সর্বানন্দের কুমারী মেয়েটাকে বলাৎকার করে গেল চারজন পাকসেনা। সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গেল। নিথর পাথর হয়ে গেল জেলেপাড়ার প্রত্যেক মানুষ। কী করবে, কোথায় যাবে, কোথায় গেলে মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে পারবে- ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়ে পড়ল সবাই। সে রাতে ভাত রাঁধল না কেউ, চেরাগ জ্বালাল না কেউ। উঠানে, দাওয়ায় পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকল পতেঙ্গা জেলেপাড়ার বাসিন্দারা।

গভীর রাতে কোথা থেকে উপস্থিত হল রহমালি। কোমরে পিস্তল। এই সেদিনও পতেঙ্গার রাস্তায় রিকশা চালিয়েছে রহমালি। মাঝারি গড়ন। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। বেতের মতো শরীর। ত্রিশের মতো বয়স। রিকশা টানতে টানতে হাতের তালুতে চাট পড়ে গেছে। খুব গরিব রহমালিরা। রহমালিরা মানে রহমালি আর তার বুড়ি মা। মা বাড়ি বাড়ি ধান ভানত। হঠাৎ তাকে হাঁপানি জাপটে ধরল। পাঁচ কদম হাঁটলে মাথা ঘোরায়। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল তার জন্য। নিষ্কর্মা রহমালি এখানে ওখানে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরত। মায়ের অবস্থা দেখে একদিন হঠাৎ তার মত ঘুরে গেল। মাকে বলল, 'তুই কুনু আর কাজ করিস না মা। কাল থেইকে আমি টাকা কামামু।'

ছেলের কথা শুনে অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়েছিল রহমালির বুড়ি মা-টা। রহমালি কিন্তু তার কথা রেখেছিল। পরদিন মুরশিদ সওদাগরের কাছ থেকে একটা রিকশা ভাড়া নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল। রহমালির কঠোর পরিশ্রমে বুড়ি মায়ের মুখে হাসি ফুটেছিল একটা সময়ে।

তো ছোবান মেম্বার এক সকালে বেদম মারলেন রহমালিকে। রাস্তার ওপর ফেলে জুতা দিয়ে বেধড়ক পেটালেন। তিন মাইল পথ রহমালির রিকশায় পেরিয়ে এসে পাঁচ টাকা দিতে চাইল মেম্বার। রহমালি সাত টাকা দাবি করল। এতেই রক্ত মাথায় উঠল ছোবানের। রহমালিকে পিটাতে পিটাতে বললেন, 'জানিস হারামজাদা আমি কে? তোর বাপের বাপ আমি শালার বেটা। এই ইউনিয়নের শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান আমি। এই গেরামের হত্তাকত্তা। তোরে চাইলে এখনই ধরাইয়া দিতে পারি মুক্তিযোদ্ধা বইলা। তোর চামড়া যখন তুইলা নিব পাকিস্তানি সইন্যরা, তখন বুইঝতে পারবি আমি কে।'

হয়রান না হওয়া পর্যন্ত রহমালিকে পিটিয়ে গেলেন ছোবান, মেম্বার। আশপাশের লোকেরা নির্বাক দর্শক হয়ে থাকল। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস করল না। রহমালি কিন্তু এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলল না, একমুহূর্তের জন্যও কঁকাল না। মাটি থেকে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়ল। তারপর রিকশাটা টানতে টানতে মুরশিদ সওদাগরের গ্যারেজে নিয়ে গেল।

পরদিন থেকে রহমালিকে আর পতেঙ্গায় খুঁজে পাওয়া গেল না। গ্রামের মানুষরা কানাঘুষা করতে লাগল- রহমালি নাকি মুক্তি হইছে, সে নাকি বর্ডার পার হইয়ে ট্রেনিং নিতাছে। সে নাকি দেশকে মুক্ত কইরব। রহমালির বুড়ি মা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে আর দাওয়ায় বসে দলা দলা থুতু ফেলে।

সেইদিনের পর জেলেপাড়ার মানুষরা আজ দেখল রহমালিকে। রহমালি এখন আর আগের রহমালি নেই। তার পরনে লুঙ্গির বদলে প্যান্ট, গায়ে বগলকাটা ছেঁড়া গেঞ্জির বদলে কালো হাফ হাতা শার্ট। কোমরে পিস্তল গোঁজা। আঁধারেও তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে ।

পটিয়ার ধলঘাটে অপারেশন চালাতে এসেছিল সে। কার কাছে খবর পেয়েছে- মা-টি তার মারা যাবে। হাঁপানি খুব বেশি বেড়ে গেছে মায়ের। এখন তখন অবস্থা। সে এও শুনল- ছোবান মেম্বার মায়ের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। যখন তখন গিয়ে গালিগালাজ করে, রহমালির সন্ধান চায়। মাকে দেখবার জন্যই আজ সন্ধ্যায় রহমালির গ্রামে আসা। এসেই দুঃসংবাদটি শুনেছে সে। তাই গভীর রাতে গা-ঢাকা দিয়ে জেলেপাড়ায় এসেছে।

রহমালিকে দেখে সবাই হাউমাউ করে উঠল। সুবল জেঠা রহমালির হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমাদের বাঁচাও বাবা। আমাদের মেইয়েদের ইজ্জত-শরমান রক্ষা কর।'

রহমালি বলল, 'আপনারা ভেইঙ্গে পড়বেন না জেঠা। কালা রাত্রির শেষ হইব একদিন। সূর্য উঠব। সূর্যের আলোতে চাইরদিক ঝক ঝক কইরব।' বলতে বলতে কেঁদে দিল রহমালি। নিজেকে সংযত করে বলল, 'মনরে শক্ত করেন। আর দুইটা দিন ধৈইয্য ধরেন। দেখি কী করা যায়।'

দিবাকর সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'আমি দিবাকর। এই পাড়ার ছেলে।'

'তোমারে আমি চিনি দিবাকর। এই পাড়ার সম্পদ তুমি।' রহমালি বলল।

রহমালির কাছ ঘেঁষে চাপাস্বরে দিবাকর বলল, 'আমি দেশের জন্য কিছু একটা করতে চাই দাদা। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।'

চুপচাপ কী যেন একটা ভাবল রহমালি। তারপর আস্তে করে ডান দিকে ঘাড়টা কাত করল। আবছা অন্ধকারে রহমালির ঘাড় কাত করাটা অন্য কেউ দেখল না, শুধু দেখল দিবাকর।

পরদিন সকালে পতেঙ্গা গ্রামের মানুষরা জানল- রাতের আঁধারে কে বা কারা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছোবান মেম্বারকে খুন করেছে। পিস্তলের গুলিতে মেম্বারের মাথাটা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেছে। দরজার চৌকাঠে তাঁর বিশাল দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার পায়ের কাছে জিন্নাহ টুপিটা গড়াগড়ি খাচ্ছে।

ওইদিন থেকে রহমালি আর দিবাকরকে পতেঙ্গা গ্রামে আর দেখা গেল না। ❖

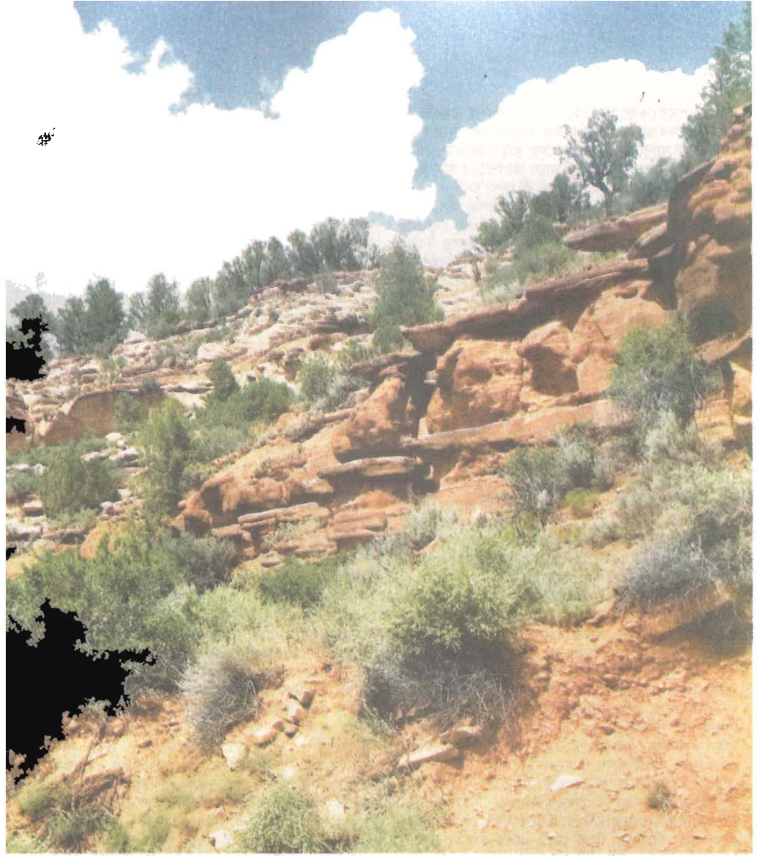
বিশাল সব পাথরখণ্ড যেন একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা



ভ্রমণ

ফারুক মঈনউদ্দীন

হুডুদের গ্রাম থেকে মরমন পল্লীতে



ইউটাহ রাজ্যের কানাব শহরের এক জনবিরল রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা যখন ব্রাইস ক্যানিয়নের উদ্দেশে রওনা হই তখন বিকেল প্রায় তিনটে। রওনা হওয়ার আগে, রেস্তোরাঁর বাইরে ছড়ানো ছিটানো চেয়ারে বসে ঝকঝকে হালকা রোদে কিছুক্ষণ ভাতঘুমে ঝিমিয়ে নেওয়ার পাঁয়তারা করছিলাম, ম্যানুয়েলের তাড়ায় তা আর হয়ে ওঠে না। সবাইকে প্রায় খেদিয়ে বাসে তুলে দেওয়ার পর ম্যানুয়েলের সহকারী মেয়েটি যাত্রীসংখ্যা গুনতি করে ইশারা দিলে বাস হেলেদুলে রওনা হয়। ম্যানুয়েলের লেকচার শুরু হলে বাসের হালকা দুলুনিতে ঝিমানোর আমেজটা উপভোগ করা হয় না। ক্লাসের সিরিয়াস ছাত্রটির মতো নোট নিতে হবে। কানাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ম্যানুয়েল জানায়, স্থানীয়ভাবে শহরটিকে 'লিটল হলিউড' বলে পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ এখানে বহু ওয়েস্টার্ন ছবির শুটিং হয়েছে। 'লোন রেঞ্জার,' 'এল ডোরাডো,' 'প্ল্যানেট অব দ্য এইপস'সহ বহু ছবির নাম বলে ও। এর মধ্যে কয়েকটার নাম পরিচিত হলেও একমাত্র 'মেকানাজ গোল্ড' ছাড়া কোনোটাই দেখা নেই আমার। সড়কদ্বীপের ওপর পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে ৪৫ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করা সওয়ারি পিঠে একটা সাদা ঘোড়ার মূর্তি, আর তার পায়ের কাছে বড় বোর্ডে 'লিটল হলিউড' উৎকীর্ণ সাইন পোস্ট দেখে বোঝা যায়, নামটি কেবল স্থানীয় মানুষের মৌখিক আবেগ নয়; শহরের পৌরপিতারাও বিশ্বাস করেন এই অভিধা।

শহর ছাড়াতেই রাস্তার ধার ঘেঁষে মরচে ধরা লোহার রঙের পাহাড়, বিশাল সব পাথরখণ্ড যেন একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা। পাহাড়ের গায়ে নাছোড় বৃক্ষরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, ওগুলোর মাথার ওপর নীল আকাশ, তার নিচে সাদা কার্পাস তুলার পাহাড়। কোথাও আবার মসৃণ সাদা পাথরের পাহাড়, তার গায়ে রুল টানা কাগজের মতো সূক্ষ্ম রেখায় পাথরের স্তর দৃশ্যমান। ঢেউ খেলানো সেই রেখা

আঁকতে পারে কেবল প্রকৃতিই: মানুষের সাধ্য নয় এমনকি যন্ত্র দিয়েও সেসব আঁকা। ঘণ্টাখানেক এসবের মধ্য দিয়ে চলার ঘোর কাটে ম্যানুয়েলের কণ্ঠে, আমরা ব্রাইস ক্যানিয়ন পৌঁছে যাবো কিছুক্ষণের মধ্যে। তার আগে আপনাদের বাম পাশে নজর রাখতে বলি, এখনই বলছি না কী দেখা যাবে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে বামে তাকায়, কেবল ইসরায়েলি তরুণী সাই বাইরে চোখ ফেরানোর আগে এই হেঁয়ালির জবাবে একটা ভ্রূকুটিপূর্ণ কটাক্ষ হানে ম্যানুয়েলের দিকে। তরুণ যিশুর মতো ম্যানুয়েলের চেহারায় এমন বক্ষভেদী কটাক্ষেও কোনো হেলদোল নেই। ঠিক তখনই বাইরে দেখা যায় অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্য। রাস্তা থেকে উঠে গেছে লাল পাহাড়ের ঢাল, তার চূড়ায় পোড়ামাটির মূর্তির মতো পাথরের ভাস্কর্য, আগে থেকে জানা না থাকলে কেউ গলা কেটে ফেললেও বিশ্বাস করবে না– এগুলো প্রকৃতির গড়া। কোথাওবা একটা মাত্র মূর্তি দাঁড়ানো, আবার কোথাও সারিবদ্ধ গায়ে গা লাগানো মনুষ্যমূর্তির মতো সেই সব পাথরের বিন্যাস নির্বাক তাকিয়ে আছে দূর পাহাড়ের দিকে। যাত্রীদের কারো মুখ থেকে বিস্ময়ধ্বনি বের হয়ে এলে ম্যানুয়েল তার হেঁয়ালির সার্থকতার স্বীকৃতি উপলব্ধি করে একটা প্রাপ্তির হাসি উপহার দেয় সবার উদ্দেশে, এবং অবশ্যই সাইয়ের দিকে। ও বলে, বিচিত্র এই রক ফর্মেশনকে বলা হয় হুডু। আপনারা এটির জিওলজিক্যাল অর্থ খুঁজে পাবেন সহজেই, কিন্তু নেটিভ আমেরিকানরা বিশ্বাস করে, হুডুরা হচ্ছে বদ লোক। খারাপ কাজের জন্য তাদের পাথর বানিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর। পৃথিবীর অনেক জায়গায় এরকম পাথরের দেখা পাওয়া যায়, তবে সবচেয়ে বেশি ব্রাইস ক্যানিয়নে।

ব্রাইস ক্যানিয়নের পার্কিং এরিয়া থেকেই বহু নিচে বিকেলের ঠিকরানো আলোয় টেরাকোটা রঙের খাড়া অরণ্যস্তম্ভ চোখে পড়ে। পাথর বিছানো হাঁটা পথ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলে পাহাড়ের পায়ের কাছে একনজরে উদ্ভাসিত হয় শত শত লাল পাথুরে মূর্তির অবিশ্বাস্য বিশাল সমাবেশ। গভীর গিরি খাতের মধ্যে চারপাশ ঘেরা পাহাড়ের নিচে দাঁড়ানো খাড়া পাথরের মূর্তিগুলো যেন রেড ইন্ডিয়ান বিশ্বাসমতে সত্যিই তাদের কৃতকর্মের বেদনায় মুহ্যমান। ব্রাইস ক্যানিয়নের এই অংশটাকে বলা হয় 'অ্যাম্ফিথিয়েটার।' ওপর থেকে অর্ধচন্দ্রাকার পাহাড়ের ঢালু গায়ে শত শত হুডু, তার নিচের সমতলে কিছু জায়গা ছেড়ে উঁচু মঞ্চের ওপর কুশীলবের মতো দাঁড়ানো আরেক দল হুডু। নিচের গেরুয়া রঙের পাথরমানবের ভাস্কর্য থেকে উল্টোপাশে চোখ ফেরালে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে মেটে রঙের স্থাপত্য নকশা, ধনুকাকৃতি খিলান। তার ভেতরের অংশ দেখা যায় না। মনে হয়, পাহাড়ের পাথর কেটে কুঁদে বের করা গির্জার দরজা; ভারতের ইলোরাতে পাথর কেটে যেমন মন্দির তৈরি করেছে মানষি, তেমনি কোনো ধর্মভীরু ভক্ত হয়তো বিশাল খাড়া পাহাড়ের গা থেকে কুঁদে বের করেছে এরকম স্থাপত্য। গেরুয়া পাথরের ঠিক পাশে মেটে রঙের পাথরের কারুকাজ দেখে তার মাজেজা বুঝতে যে কোনো ভূতাত্ত্বিকের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। টানা দেয়ালের মতো সেই পাথুরে মানবস্তম্ভের একজায়গায় লুই কানের স্থাপত্যের মতো গোলাকার শূন্যতা দেখে আমি যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হই। তোরণসদৃশ সেই পাথুরে ভাস্কর্য কেবল আমেরিকান ইন্ডিয়ান কেন, চরম বস্তুবাদী মানুষের মনেও জাগাতে পারে পরম ঈশ্বরভক্তির।

ব্রাইস ক্যানিয়নের এই সব হুডু যে কেবল আদিবাসী আমেরিকানদের বিশ্বাস অনুযায়ী মন্দ লোকের প্রস্তরীভূত মূর্তি তা নয়, এটি দিয়ে বালা-মুসিবত দূর করা কিংবা রোগ সারানোর জন্য তুকতাকের কায়দাও বোঝানো হয়। আফ্রিকা থেকে আমদানি হওয়া শব্দটির আরও কিছু আভিধানিক অর্থ আছে, যেমন ডাকিনী-বিদ্যা, অপয়া ব্যক্তি ইত্যাদি। এটির ভূতাত্ত্বিক অর্থ হচ্ছে নদীর অববাহিকা থেকে উঠে আসা বা পাহাড়ের ওপর খাড়া হয়ে থাকা পাথুরে স্তম্ভ। লাখ লাখ বছর ধরে জল, হাওয়া, বৃষ্টি, তুষারের ঘষায় অপেক্ষাকৃত নরম মাটি ও শিলা ক্ষয়ে যেতে যেতে তৈরি হয় এরকম স্তম্ভ। এই সব খাড়া স্তম্ভ ছাড়াও কোথাও কোথাও তৈরি হয় ধনুকের মতো বাঁকানো তোরণ।

সমুদ্র সমতল থেকে ৮,৩০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপারে সূর্য নেমে যাচ্ছিল ধীরে। নিচের অ্যাম্ফিথিয়েটারে তাই ছায়াচ্ছন্ন মৌনতা, হাজার হাজার বছর আগে যখন থেকে মানুষের পদচারণা শুরু হয়, এখানে তাদের আত্মারাই বুঝি ঘুরে বেড়ায় সেই অরণ্য স্তম্ভের ভেতর। দূরের পাহাড়ে তখনো উজ্জ্বল রোদের উদ্ভাস, পাথর মানবদের ছায়া লম্বা হচ্ছে। সেখানে হুডুদের মাথার ওপর অতিকায় গিরগিটির মতো শুয়ে আছে ধূসর পাথরের একটা ছাদ। এমনকি সেটির বাহুর কাছে অবিকল চামড়ার মতো ভাঁজ। আরো দূরের গিরি খাতে সবুজ গাছের হালকা অরণ্য, সেখানে হুডুরা নেই।

১৯২০-এর দশক পর্যন্ত এমনকি ইউটাহ রাজ্যের মানুষের কাছেও ব্রাইস ক্যানিয়ন খুব পরিচিত জায়গা ছিল না। ত্রিশের দশকে ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেল কোম্পানির প্রচারের কারণে মানুষ এটির কথা জানতে পারে। ভূতাত্ত্বিকদের হিসাবমতে, ব্রাইস ক্যানিয়নের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় ডাইনোসর যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর। লেক পাওয়েল যার নামে, সেই মেজর পাওয়েল ১৮৭২ সালে তার অভিযাত্রী দল নিয়ে প্রথম এখানে ভূতাত্ত্বিক জরিপে এসেছিলেন। তার পরই মরমন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অল্প কিছু মানুষ এখানে বসতি গড়ার উদ্যোগ নেয়। ১৮৭৫ সালে স্কটিশ অভিবাসী কারিগর এবেনেজার ব্রাইসকে পাঠানো হয় এখানে। তার দক্ষতা ওরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কাজে আসবে বলেই তাকে নির্বাচন করা হয়েছিল। এখন যেটা অ্যাম্ফিথিয়েটার হিসেবে আমরা চিনি, তার কাছেই সপত্নীক এবেনেজার তার ডেরা তুলে নিয়েছিলেন। এখানে তিনি গরু-মেষ পালতেন, ফসল ফলাতেন। এখান থেকে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত একটা পথ তৈরি করে নিয়েছিলেন; জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য নালাও কেটেছিলেন। ব্রাইস ক্যানিয়নের অরণ্যস্তম্ভের গোলকধাঁধা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি নাকি বলেছিলেন, গরু হারিয়ে ফেলার মতো দারুণ জায়গা একটা। তার নামেই লোকমুখে এ অঞ্চলের নাম হয়ে যায় ব্রাইস ক্যানিয়ন।

সূর্য আরো কিছুটা ঢলে পড়লে পুরো এলাকায় পাহাড়ের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় নিয়ে অবিশ্বাস্য সেই সব পাথরের প্রাকৃতিক ভাস্কর্য দেখে পার্কিং এরিয়ায় ফিরে এলে দেখা হয়ে যায় আমাদের সহযাত্রী জেমস বন্ডের লেডি বস ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের মাথা এম-এর মতো সেই বৃদ্ধার সাথে, ঢোকার মুখে একটা দেয়ালের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ছিলেন তিনি তার ভ্রমণসঙ্গিনীর সাথে। আমার সাথে প্রথম দিন বাসে ওঠার আগে একবার কথা হয়েছিল তার। তিনি বলেন– কী, ছবি তোলা শেষ? তুমি তো একা এসেছ দেখছি। তোমার কয়েকটা ছবি তুলে দেব? আমি সানন্দে রাজি হলে তিনি কয়েকটা ছবি তুলে দেন পেছনে হুডুদের এক ফ্রেমে নিয়ে। ফটো তোলার সূত্র ধরে আলাপ করে জানা গেল ইনি ইসরায়েলি, সাথের জন তার পুত্রবধূ। আমি বলি, এই প্রথম কোনো ইসরায়েলি নাগরিকের সাথে পরিচয় হলো আমার। এম বলেন, হ্যাঁ, আমরা কিন্তু কুকুর নই, মানুষকে কামড়ে দিই না। আমি মনে মনে বলি, বটে! এম বলেন, আমার নাম শুলা, শুলা ওফার। আমার সাথে এটি আমার ছেলের বউ। আমি তাকে 'হাই' বলি। বুড়ি কথা থামান না। বলেন, ও একজন

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট। বউটি হাসলে ভ্যাম্পায়ারের মতো তার বেজায় বড় গজদন্ত দেখা যায়। বুড়ি তার ঠিকুজি পূর্ণ করে বলেন, আরেক ছেলের বউ তেলআবিব ওপেন ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়ায়। বউদের সম্পর্কে পূর্ণ বায়োডাটা দিলেও লক্ষ্য করি তার সুপুত্ররা কে কী করে কিছুই বলেন না তিনি। তাদের দু'জনই হয়তো প্যালেস্টাইনিদের শায়েস্তা করার মহান ব্রত নিয়ে সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করছে। তাই বিষয়টা চেপে যান তিনি।

আমি বলি, বাহ, ছেলের বউ নিয়ে বেড়াতে এসেছেন! মজার ব্যাপার তো! ভারতীয় টেলিভিশনে একটা সিরিয়াল হতো– 'কিঁউ কি সাস ভি কভু বহু থি'; আপনার দেখার কথা নয়। শুলা বলেন, এটার অর্থ কী? নামটা ইংরেজি করে বললে তিনি বলেন, ও আচ্ছা বুঝলাম। জানি, তুমি শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্কের কথা মীন করছো তো? না বাবা, আমার দুই বউয়ের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। আমি এ বিষয়ে খুব সচেতন। কারণ আমার শাশুড়ির সাথেই তো আমার সম্পর্ক খুব শীতল ছিল। তাই আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম, আমি হবো অন্য রকম শাশুড়ি। দুই বউকেই নিজের মেয়ের মতো মনে করি আমি। আমি বলি, হ্যাঁ। আপনি হয়তো আলাদা। তা না হলে কেবল ছেলের বউয়ের সাথে একা বেড়াতে আসতেন না। কিছু মনে করবেন না, আপনার হাজবেন্ড কি ইচ্ছে করেই এলেন না? শুলা বলেন, আমি এখন একা; নো হাবি। আমি 'সরি' বলি; উনি কি মিলিটারিতে ছিলেন? শুলা বলেন, না না। হঠাৎ মিলিটারি মনে হলো কেন তোমার? বললাম, নাহ, এমনিতেই। আজ সকালে বাসে আপনি ম্যানুয়েলকে টাইম সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরকম কিছু একটা বলছিলেন, মনে হলো। শুলা বলেন, আসলে বিভিন্ন সময়ে আমার একাধিক স্বামী ছিল বলে এ প্রসঙ্গে কিছু বলি না আমি।

আবারও 'সরি' বলে জিজ্ঞেস করি, তাহলে আপনি কী করছেন এখন? নাকি রিটায়ার্ড? শুলা সংক্ষেপে কিছু বলতে পারেন না দেখলাম। বলেন, আমি বহু বছর হয় রিটায়ার করেছি; প্রায় পনের বছর। তার আগে এক কসমেটিকস কোম্পানিতে সেক্রেটারির কাজ করতাম। এই কোম্পানি ডেড সি-র মিনারেল দিয়ে নানান ধরনের কসমেটিকস বানায়। তুমি হয়তো জানো, ডেড সি-র এই সব খনিজ স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। শুলা কি আদতেই কোম্পানির সেক্রেটারি ছিলেন, নাকি মার্কেটিং এজেন্ট; বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। কী কথা থেকে কী কথা! তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলেন, এখন এই অবসর জীবন কাটে ঘুরে ঘুরে দুনিয়া দেখে, ঘরে থাকলে সেলাই-টেলাই করে, বই পড়ে। আর প্রচুর সিনেমা দেখা হয়। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে আসার আগে বেশ কয়েকটা ওয়েস্টার্ন ফিল্ম দেখে এসেছি এই এলাকা সম্পর্কে একটা আগাম ধারণা পাওয়ার জন্য।

বুড়ির বকবকানি থামানোর জন্য বলি, তাহলে 'মেকানাজ গোল্ড'ও দেখেছেন?

– নাহ, এটা দেখা হয়নি।

আমি তাকে কোণঠাসা করার জন্য বলি, হায় খোদা, এটা দেখেননি! গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের নানান চেহারা ও আদিবাসীদের দেখতে চাইলে এটা দেখা ফরজ।

তারপর তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলি, শেরিফ মেকানা অর্থাৎ গ্রেগরি পেক কীভাবে অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের গুপ্তধন সোনার ভাণ্ডারের গোপন নকশা দেখতে পায়। ওটা নষ্ট করে ফেললেও মেক্সিকান ডাকাত সর্দারের ভূমিকায় ওমর শরিফ তার সাথে সেই সোনার খোঁজে যাত্রা শুরু করে। তাদের সাথে যোগ দেয় আরো স্বর্ণলোভী মানুষ। বহু বাধা-বিপত্তি, আদিবাসীদের আক্রমণ এড়িয়ে তারা যখন সেই সোনার ভাণ্ডার খুঁজে পায় এবং পাগলের মতো সোনার তাল কুড়িয়ে নিচ্ছিল, সেই সময় চারপাশের পাহাড়ে শুরু হয় প্রবল ভূকম্পন, ধসে পড়া পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে যায় গুপ্তধনসহ স্বর্ণলোভী মানুষেরা।

সংক্ষেপে গল্পটা শুনে শুলা কিছুটা অনিশ্চিতভাবে বলেন, বহু আগে দেখেছিলাম বোধ হয়। আবছা আবছা মনে পড়ছে।

তাকে আরো একটু চাপানোর জন্য বলি, তাহলে এবার আসার আগে দেখে না এসে ভুলই করেছেন মনে হয়। আমরা এ-দুদিন যেসব জায়গায় ঘুরলাম সেসব জায়গায় ছবিটার শুটিং হয়েছিল। গ্লেন ক্যানিয়ন, কানাব, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নসহ এখানকার বহু লোকেশনের চমৎকার সিনেমাটোগ্রাফি দেখা যায় ছবিটাতে।

শুলা বলেন, তেলআবিব ফিরে গিয়ে দেখতে হবে ছবিটা।

একটু কোণঠাসা হলেও নতুন উদ্যমে তার কথা বলা শুরু করেন তিনি। আমি ওর কথা শোনার ফাঁকে চারপাশ দেখতে দেখতে 'ও আচ্ছা,' 'তাই' এসব বলে তার কথার তোড়ের সাথে সঙ্গত করার চেষ্টা করছিলাম। বিশাল গজদন্তের পুত্রবধূটি পাশে বসে মিট মিট করে হাসছিল। তার হাসির অর্থ ধরতে দেরি হয় না আমার। তবেই বোঝেন কী চিজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি!

শেষ বিকেলের আলো ব্রাইস ক্যানিয়নের একদম নিচের সমতলে দাঁড়িয়ে থাকা হুডুদের পাড়ায় পৌঁছে না বলে সেখানে আঁধার জমছে ধীরে। পাহাড়ের ওপরদিকের আলোও মরে এসেছে। আমাদেরকে ফিরতি যাত্রায় রওনা করিয়ে দিয়ে ম্যানুয়েল জানায়, আমরা আজ রাত কাটাবো কানাব শহরে। তারপর ওর প্রফেসারি ভঙ্গিতে বলে, আপনাদের জানা আছে কি-না জানি না, গবেষণায় পাওয়া গেছে এই ইউটাহ রাজ্যের মানুষরাই আমেরিকার সবচেয়ে বিষাদগ্রস্ত। বিষাদসূচকে এই রাজ্য এক নম্বরে, আর আত্মহত্যাসূচকে সাত নম্বরে। বহু গবেষণার পর আবিষ্কার হয়েছে– আত্মহত্যার এই প্রবণতার মূল কারণ রকি পর্বতমালার উচ্চতা। আমেরিকার অন্য কিছু রাজ্য, যেগুলো সমুদ্র-সমতল থেকে অনেক উঁচু, সেখানে আত্মহত্যার হার বেশি।

আরেকটা তথ্য জানিয়ে রাখি, যদিও আপনাদের কোনো কাজে আসবে না এখন আর। ইউটাহ রাজ্যে এক সময় বহুগামিতা বৈধ ছিল। একজন পুরুষ অনেক বিয়ে করতে পারতো। পরে আমেরিকান সরকার বহুবিবাহ-বিরোধী আইন পাস করলে মরমন চার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রথা বন্ধ ঘোষণা করে। গোঁড়া মরমন, যারা এই আইন মানতে রাজি ছিল না, তারা তাদের বউদের সাথে নিয়ে কোনো দুর্গম অরণ্যে গিয়ে থাকতে শুরু করে। যাত্রীদের ভেতর থেকে কে একজন বলে ওঠে, সেটা কি তারা বউদের ভালোবাসে বলে, নাকি অন্য কারণে? ম্যানুয়েল একটা সুন্দর হাসি দিয়ে বলে, উভয় কারণেই বোধ হয়।

তারপর কথার খেই ধরে বলে, ইউটাহ রাজ্যের এই বহুবিবাহ প্রথা এসেছিল মরমন ধর্মীয় গোষ্ঠীর কাছ থেকে। আপনারা কেউ কেউ মরমনদের কথা আগে কখনো শোনেননি, তাই না? জোসেফ স্মিথ নামে একজন ১৮৩০ সালে এই ধর্মের পত্তন করেছিলেন। তার দাবি– এক দেবদূত এসে তাকে সোনার পাতে লেখা কিছু প্রাচীন লিপি দিয়ে যান, সেগুলোর মর্মার্থ উদ্ধার ও অনুবাদ করে স্মিথ প্রচার করেন বুক অব মরমন। নিজেকে পয়গম্বর দাবি করে তার অনুসারীদের জন্য তিনি স্থাপন করেছিলেন চার্চ অব যেসাস ক্রাইস্ট অব লেটার ডে সেন্ট। তার মতে, নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ছিল কলি যুগ। তাই শেষ জমানার সাধুদের নামে এই নাম দিয়েছিলেন তিনি। তার দাবি অনুযায়ী, স্বর্গীয় নির্দেশবলে তিনি প্রচলন করেছিলেন বহুবিবাহের। নিজেও বিয়ে

করেছিলেন প্রায় ৩০টি। পরবর্তী সময়ে তার বিরুদ্ধে যখন বহুগামিতার অভিযোগ আসে, তিনি এসব বিয়ের কথা অস্বীকার করেন। এ জাতীয় নানান খামখেয়ালি নির্দেশের কারণে তিনি হয়ে ওঠেন চরম বিতর্কিত। যদিও ততদিনে বহু চেলা জুটে গেছে তার। তাদের সাথে গোঁড়া খ্রিষ্টানদের সংঘাত বেড়েই চলে। তাই অনুসারীদের নিয়ে ভিনরাজ্যে চলে যান তিনি। ১৯৪৪ সালে মরমন-বিরোধীদের হাতে খুন হন স্মিথ, সাথে তার ভাইও। তার স্থলাভিষিক্ত হন ব্রিগহাম ইয়ং। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমেরিকায় মরমনদের টিকে থাকা সম্ভব হবে না। কারণ মরমনরা প্রতিনিয়ত নিপীড়িত হচ্ছিল গোঁড়া খ্রিষ্টানদের হাতে। তাই তিনি নিবেদিতপ্রাণ মরমনদের বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মেক্সিকান অধ্যুষিত

না। শুটিং করবে অথচ ড্রিংক করবে না, এটা কী করে হয়! কী বলেন?

আমাদের বাস 'ডেজ ইন' মোটেলে পৌঁছে সন্ধ্যার আগেই। ম্যানুয়েল বলে, যে রেস্তোরাঁয় আমরা দুপুরে লাঞ্চ খেয়েছিলাম, 'স্পার্স গ্রিল,' ডিনারটা ওখানেই সারতে পারেন। রাতেই জমে ওটা। সাথে কানাবের বিখ্যাত বিয়ার নিতে ভুলবেন না। তারপর সাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, ডিনারের সময় আপনাদের কারো কারো সাথে আবার দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়? মেয়েটিকে দেখলাম প্রায় ভেংচি কাটার মতো একটা কটাক্ষ করতে। এ মেয়ে সেমিটিক বলেই। তা না হলে ইউরোপ-আমেরিকার মেয়েদের কম্মো নয় এরকম নিখুঁত ভেংচি কাটা।



অঞ্চলে পাড়ি দিয়ে আইওয়াতে সাময়িক বসতি গড়েন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তারা ইউটাহ রাজ্যের গ্রেট সল্টলেক এলাকায় স্থায়ী আবাস তৈরি করে। কিন্তু মরমনদের নিরাপদ আবাস বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৪৮ সালে মেক্সিকান যুদ্ধে আমেরিকার বিজয়ের পর এ অঞ্চল আমেরিকান ভূখণ্ড হয়ে যায়। ততদিনে মরমনরা ঝাড়ে-বংশে অনেক বেড়ে গেছে। ১৮৭৭ সালে ইয়ং যখন মারা যান, এই এলাকায় বাস করছিল লাখখানেক মরমন।

বলে রাখা ভালো, মরমন সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেও ম্যানুয়েল এত বিস্তারিত বলেনি। টুকে রাখা ওর বর্ণনার সাথে পরে অন্তর্জাল থেকে আহরিত তথ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ম্যানুয়েলের অধ্যাপকসুলভ চেহারা, তার সরস বাকভঙ্গির কারণে সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ে জানতে পারার ব্যাপারটা বাসের প্রায় সবাই উপভোগ করছিল। অনেকেই এটা-ওটা প্রশ্ন করে কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করে। ম্যানুয়েল বলে, আরো একটা মজার তথ্য দিই। মরমনদের জন্য মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু লিটল হলিউড নামে পরিচিত এই শহরে যারা সিনেমা বানানোর কাজে আসতেন, তাদের যথার্থ আপ্যায়নের জন্য বার-রেস্তোরাঁ খোলায় কোনো বাধা ছিল

দুই.

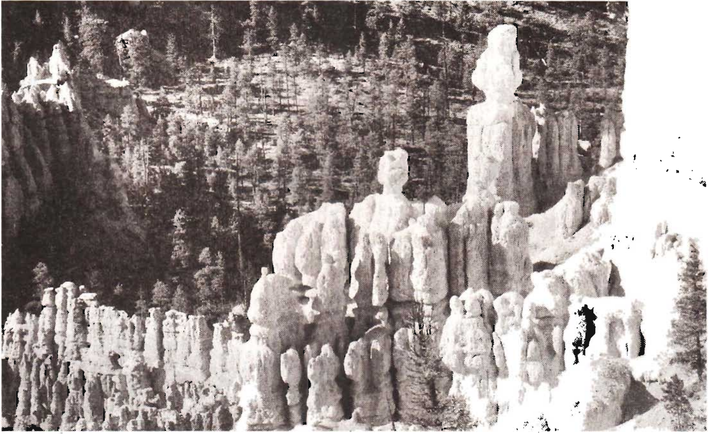
সকাল বেলায় 'ডেজ ইন' মোটেলের পার্কিংয়ে জায়ন ন্যাশনাল পার্কে যাওয়ার বাসে ওঠার আগে আমাদের দলের কয়েকজন রাত্রিনিবাসটির খুব বদনাম করছিল। নোংরা পরিবেশ, মলিন বিছানা, ব্রেকফাস্টের গরিবি হালত ইত্যাদি। শেষ অভিযোগটি সঠিক হলেও বাকিগুলো আসলে তেমন কিছুই নয়। একটা রাত কাটানোর জন্য ট্যুরিস্টদের এতো খুঁতখুঁত করলে চলে? তবুও এরকম জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করার জন্য এদের কেউ ম্যানুয়েলকে কিছুই বলে না। আমাদের দেশে দূরপাল্লার লাক্সারি বাসে গান শোনার যন্ত্রটি ঠিকমতো কাজ না করলেও প্যাসেঞ্জাররা যা অবস্থা করেন!

আজ জায়ন ন্যাশনাল পার্কে যাওয়ার পর আমাদের সিডিউল খুব ঢিলেঢালা। ঘণ্টা দুয়েকের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন সবাই। ম্যানুয়েল বলে, দুই ঘণ্টার মধ্যে ট্রেকিং করে বাসে ফিরে আসার কথা যারা ভাবছেন, তাদের জন্য বলি, আমাদের পরের ট্রিপ এখানে আসবে আগামী হপ্তায়, ততদিনের জন্য আটকা পড়তে চাইলে ট্রেকিংয়ে যেতেও পারেন। তাদের লাগেজ আপাতত বাসেই থাকবে। এখানে গাঁটের পয়সা খরচ করে জায়ন লজে থেকেও যেতে পারেন ততদিন। পরের ট্রিপে

লাস ভেগাস যখন ফিরে যাবেন, তাদের আবার ধর্না দিতে হবে আমাদের লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড অফিসে। ওর এই ঘোষণা প্রথমদিকে নির্দোষ মনে হলেও রসিকতাটা ধরতে একটু সময় লাগে। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেলে বলে, আজ আমাদের ট্রিপের শেষ দিন এবং শেষ দিনে একটা ভালো খবর আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত। আপনারা কেউই জানেন না যে, আজ আমাদের চ্যানের জন্মদিন। এই খবরে বাসের সবাই হই হই করে ওঠে। চ্যান ঘাড় ফিরিয়ে একটু লাজুক হাসে। ম্যানুয়েল এসময় 'হ্যাপি বার্থডে' গেয়ে উঠলে সবাই ওর সাথে গলা মেলায়, তারপর হাততালি। ম্যানুয়েল ওর রমণীমোহন হাসি দিয়ে বলে, ডিনারের আগেই আমরা যে যার পথে চলে যাবো। তা না হলে আজকের ডিনারের সাথে চ্যানের উপলক্ষে ককটেলের ব্যবস্থা করা যেতো।

হাসি-ঠাট্টা শেষে ম্যানুয়েল তার বর্ণনা শুরু করে, আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেই জায়ন হচ্ছে ইউটাহের সবচেয়ে পুরনো পার্ক। এটার শিলা ক্যানিয়নের সবচেয়ে পুরনো। আট হাজার বছর আগে থেকে এখানে প্রাচীন মানুষের দেখা পাওয়া যায়। নেটিভ আমেরিকানরা এসেছে মাত্র ১৪ শতাব্দীতে। তারও কয়েকশ' বছর পর, ১৮৪৭ সাল থেকে মরমনরা সল্টলেক এলাকা ছেড়ে ধীরে ধীরে এদিকে আসা শুরু করে। এখানকার কাঠ, পশু চরানোর মাঠ, ক্যানিয়নের খাল থেকে জমি সেচের সুবিধা– এসব কারণে মরমনরা ইউটাহর এ অঞ্চলজুড়ে তাদের প্রভাব ও অবস্থান শক্তিশালী করে তোলে। ওরা যখন প্রথম এখানে আসে, ওদের কাছে মনে হয়েছে এই অঞ্চলের কথাই তো বাইবেলে ওরা পড়েছে এতদিন। এই বিশ্বাসের সাথে মিল রেখে না হলেও এখানে পাশাপাশি তিনটে পাহাড়ের চূড়ার মিলিত নাম দেওয়া হয়েছে 'কোর্টস অব প্যাট্রিয়ার্ক'। এগুলোর প্রত্যেকটার আলাদা নাম হচ্ছে আব্রাহাম, আইজাক এবং জেকব। এক মেথডিস্ট যাজক ১৯১৬ সালে এখানে এসে এগুলো দেখে এতই তাজ্জব হয়েছিলেন যে, পাহাড়চূড়াগুলো তার কাছে বাইবেলের ইব্রাহিম, ইসহাক এবং ইয়াকুব নবীর মতো মনে হয়েছিল।

মরিচা পড়া লোহার রঙের নাভাহো পাথরের পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে ভার্জিন নদীর কোলের কাছে এই জায়ন পার্কের আয়তন প্রায় ২৩০ বর্গমাইল। এটার আগের নাম ছিল মুকুন্তউইপ, যার অর্থ 'সরল গিরি খাত।' ইন্ডিয়ান এই নামটি এতই খটোমটো যে, এটা হয়তো অনেকে ঠিকভাবে উচ্চারণই করতে পারবে না। যে জায়গার নাম উচ্চারণ করতে মানুষের দাঁত ভাঙতে পারে, সেই জায়গায় তারা আসতেও চাইবে না ভেবে এটার নাম রাখা হয় 'জায়ন।' নামটি কী ভেবে দেওয়া হয়েছিল, এটা এক কথায় বলা যায় না। বাইবেলে হিব্রু ভাষায় যে 'জায়ন' শব্দটি আছে, তার অর্থ 'আশ্রয়।' মরমনরা যখন এখানে আসে তখন নতুন বসতি স্থাপনকারী হিসেবে তাদের হয়তো আশঙ্কা ছিল, আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা তাদেরকে এখান থেকে ভাগিয়ে দেবে। এখানে সেই নিরাপত্তাবোধের কারণে তাদের কাছে এটিকেই নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে হয়েছিল। এই জায়গাকে 'বেহেশতি নগর' নামেও উল্লেখ করতো কেউ কেউ। আবার অনেকের ধারণা, চারদিকে উঁচু পাথুরে পাহাড়ের দেয়াল থাকার কারণে এ জায়গার রয়েছে বাড়তি প্রাকৃতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।



ম্যানুয়েল বলে, আপনাদের জন্য একটা নতুন তথ্য দিই। ২০০১ সালের নাইন ইলেভেন যেমন ছিল নিউইয়র্কের কেয়ামতের দিন, তার ঠিক ১৪৪ বছর আগে ঠিক এই দিনে ইউটাহেও ঘটেছিল প্রায় একই রকম এক ঘটনা। সেদিন মরমন মিলিশিয়ারা ক্যালিফোর্নিয়াগামী মানুষভর্তি একটা ওয়াগন ট্রেন আক্রমণ করে বসে। টানা পাঁচদিন আটকে রাখার পর মোট ১৪০ জন নারী-পুরুষ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক যাত্রীকে হত্যা করে তারা। কেবল আট বছরের কম বয়সী ১৭ জন শিশুকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। কারণ মরমন বিশ্বাসমতে, আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা নিষ্পাপ থাকে। আমেরিকার ইতিহাসে ধর্মীয় সহিংসতার এত বড় ঘটনা এটাই ছিল প্রথম।

যাত্রীদের কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, এই ঘটনার কোনো বিচার হয়নি?

ম্যানুয়েল বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, হয়েছিল, তবে সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। এরকম একটা ঘটনার পর মরমন ধর্মীয় নেতারা এটার দায় ইন্ডিয়ানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সব সাক্ষ্য-প্রমাণ মরমনদের বিরুদ্ধে গেলে তারা স্মিথের গদিনশিন ব্রিগহাম ইয়ং-এর পালিত পুত্র লি'র ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়। তারও প্রায় বিশ বছর পর বিচারের রায়ে লীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। মরমন নেতারা এর পর থেকে প্রচার করা শুরু করে– লি ছিল ধর্মদ্রোহী।

বাসের মধ্যে এক ধরনের বিষণ্ন আবহ তৈরি হয়, গত দুদিন ধরে ম্যানুয়েলের কথার পেছনে নানান টিপ্পনী শোনা যেতো, কিন্তু এই ঘটনা শোনার পর সবাই কেমন যেন চুপ মেরে যায়! বাসের যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

এ পর্যায়ে হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এভাবে ম্যানুয়েল বলে আমরা জায়নের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এখন আমাদেরকে ভালো করে দেখার সুযোগ করে দেয়। ম্যানুয়েল মজা করে বলে, আজ রাতের বেলায় আমাদের থাকার প্রোগ্রাম থাকলে এগুলোর একটা দিয়ে বারবিকিউ করা যেতো। খাওয়াতে পারবে না বলেই চ্যান স্পিড কমিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিল ছাগলগুলো।

এক সময়ের মরমন পল্লী জায়ন পার্ক এলাকার বিশাল যে খোলা চাতালে আমাদের নামিয়ে দেয় বাস, তার চারপাশে উঁচু খাড়া পাথরের পাহাড়, মরিচা ধরা লোহার মতো সেই পাথুরে দেয়ালে যেন বিশাল ছেনি দিয়ে কেউ খোদাই করেছে নানান ভাস্কর্য। পাহাড়ের এক জায়গায় পাথরের আকৃতি অবিকল দোচালা ঘরের মতো মনে হয় বলে ভালো করে দেখতে হয় ওটা মানুষের সৃষ্টি কি-না বোঝার জন্য। পাহাড়ের নিচের দিকে বৃক্ষের দেখা মিললেও ওপরের অংশ নিরেট পাথরের।

এখানে অনেক সময় নিয়ে এসে মানুষ হাইকিংয়ে যায়। আমাদের হাতে সময় দুই ঘণ্টা, তাই সবচেয়ে সহজ ও



মরিচা ধরা লোহার মতো পাথুরে দেয়ালে যেন কেউ খোদাই করেছে নানান ভাস্কর্য

আপনাদের দুটো টানেল দেখাবো, ওগুলোর ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় এক ঝলকের জন্য বড় কয়েকটা জানালা দেখতে পাবেন, ক্যামেরা এবং হাত ভালো থাকলে চলন্ত বাস থেকে একটা মোটামুটি ছবি পেয়েও যেতে পারেন; বাস কিন্তু থামানো যাবে না।

প্রথম টানেলটা ছিল ছোট। দেখতে দেখতে পার হয়ে যায়। দ্বিতীয়টা, জায়ন-মাউন্ট কারমেল টানেল; দৈর্ঘ্য এক মাইলেরও বেশি। বাস অন্ধকার টানেলে ঢুকে পড়ার আগেই সবাই ক্যামেরা তাক করে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিছুদূর ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতর চলার পর ডান পাশে একটা জানালা পড়ে। সেটা দিয়ে এক ঝলক খোলা গিরিপথ দেখা যায় পলকের জন্য। ছবি তোলার চেষ্টা করা বৃথা, তবুও সবাই শাটার টেপে অনর্থক।

টানেল থেকে বের হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার ঠিক পাশে পাথরের মাথায় তিনটা পাহাড়ি ছাগলকে উৎসুক হয়ে বাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চ্যান গতি কমিয়ে কাছের একটা লোকেশন বাতলে দেয় একজন।

রাস্তার পাশ ঘেঁষে ছোট খাল মতো যে স্বচ্ছ পানির ধারা, সেটিই ভার্জিন নদী। তার ওপর একটা পুল পার হয়ে গেলে পাহাড়ের গায়ে সরু হাঁটা পথ। বাম পাশে পাহাড়ের খাড়া শরীর উঠে গেছে অনেক ওপরে, ডান পাশে বয়ে চলেছে ক্ষীণকায় নদী। কোথাও নুড়িপাথরে বাধা পাওয়া জলের শব্দ ভেসে আসে। ফেরার তাড়া না থাকলে এখানে কোনো কটনউড গাছের নিচে বসে জলধারার এই মিষ্টি সঙ্গীত আর পাতার মর্মর শুনে সময় কাটিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু আমার গন্তব্য আপাতত আধামাইল দূরের উইপিং রক। সেখান থেকে আরও উজিয়ে গেলে পৌঁছা যাবে এমারেল্ড পুল। এমারেল্ড পুলে যাওয়া-আসায় সময় কুলোলেও ভরসা পাই না। তাই কিছুটা শখের হাইকিংয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে কাছের ক্রন্দসী পাথরই যথেষ্ট। ম্যাপল আর কটনউড গাছের ছায়া ধরে এগিয়ে কিছুদূর গেলে মাথার ওপর বিশাল কুঁজের মতো ঝুলে থাকা পাথরের চাঁই দেখে ভয় হয়– এক্ষুণি বুঝি ওপর থেকে

নেমে আসবে ওটা! পথের পাশে ধুতুরা ফুলের মতো সাদা ফুল ফুটে আছে; ধুতুরা কি-না কে জানে! আরো সামনে পায়ে চলা পথটি যেখানে দীর্ঘ বাঁক নিয়েছে তার মাথার ওপর রাস্তার ওপর সমান্তরালভাবে ঝুলে থাকা লম্বা রোলের মতো পাথর বেরিয়ে আছে। তার নিচে বড় খোঁদলের শেওলা জমা স্যাঁতসেঁতে দেয়াল। ওপর থেকে পাথরের গা বেয়ে নেমে আসা চোয়ানো পানির ক্ষীণ কয়েকটা ধারা ঝরে যাচ্ছে অবিরাম। সেই ধারা ছাপিয়ে আরো ওপর থেকে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মতো নেমে আসছে জলের ছিটা। উজান থেকে থেকে নেমে আসা জলের স্বচ্ছ আধারে গিয়ে মিশে যায় পাথরের অশ্রু। আমাদের সফরসঙ্গীদের কেউ কেউ এমারেল্ড পুলে এক চক্কর মেরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে চলে। কেবল শুলাকে দেখলাম তার ছেলের বউকে নিয়ে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিতে। আমাকে দেখেই বলেন– এই, তোমার সাথে কথা আছে। আমি মনে মনে এইরে সেরেছে 'কী কথা তাহার সাথে' ভেবে এগিয়ে গেলে তিনি বলেন, আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে ম্যানুয়েলদের টিপস হিসেবে কিছু দেওয়া উচিত নয় কি? আমি বলি, অবশ্যই। আমি তো দেব ভেবেও রেখেছি, তবে একসাথে তুলে দিলে তো ভালোই হয়। আলাদা দিলে বরকত পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, তুমি কত দিতে চাও?

একটু ভেবে বলি, পঞ্চাশ ডলার? গরিব দেশের মানুষ হলেও বকশিশের হাত যে দরাজ– এটা প্রমাণ করতে হবে না?

শুলা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলেন, ফিফটি একটু বেশি হয়ে যায় বোধ হয়। আমি ভেবেছি, বিশ ডলার দেব। আমি বলি, আচ্ছা তা-ই সই। মহিলা বলেন, আমি আরো কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি। সবাই রাজি। বাসে ওঠার সময় টাকাটা তুলে ফেলতে হবে। আমি কিছুটা উমেদারির ভঙ্গিতে বলি, আপনি মুরুব্বি মানুষ। আপনাকেই সবাই দিক। আপনি আমাদের হয়ে ওদের হাতে তুলে দেবেন। শুলা মনে হয় কিছু একটা কাজ পেয়ে মনে মনে খুশিই হন।

আমি বলি, আপনি কি জানেন, এই জায়ন পার্কে 'বুচ ক্যাসিডি অ্যান্ড সানডেন্স কিড' ছবির কিছু সিনের শুটিং হয়েছিল?

শুলা এবার হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, নাহ, আমার কাছে অত ইনফরমেশন নেই। তুমি ট্রাভেল স্টোরি লেখ বলে তোমাকে এসব খবর রাখতে হয়; ঠিক?

আমি, 'হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন' বলে ফিরতি পথ ধরে ভদ্রতা করে বলি, আপনারা ধীরে-সুস্থে আসেন। কথা বাড়ালেই আবার শুরু হবে। পার্কের চাতালে দলের অনেককেই দেখলাম গাছের নিচে দল বেঁধে পিকনিক পার্টির মতো বসে আছে বাসের অপেক্ষায়। আমাদের কেউ কেউ 'ব্রিউ পাব'-এর খোলা বারান্দায় উঠে বিয়ার ডিসপেনসারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভর দুপুরে পাবটির ভেতর লোকজন থই থই করছে। উল্টোদিকে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে টেরাকোটা রঙের পাহাড়, তার পাথুরে দেয়ালে নানান প্যাটার্ন, কোথাও সারি বাঁধা খাড়া স্তম্ভের মতো, কোথাও বিরাট কুলুঙ্গির মতো, কোথাওবা ধনুকাকৃতি তোরণের মতো। তার মাঝে সবুজ গাছেরা প্রাণপণে লড়ছে বেঁচে থাকার জন্য। কোথাও পাথুরে পাহাড়ের মাথায় নবজাতক বাচ্চার মাথার হালকা চুলের মতো কিছু গাছ কীভাবে যেন জন্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দুপুর একটা নাগাদ আমরা যখন বাসে ফিরে আসি, তখন রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ম্যানুয়েল লালচে দাড়ি আর কালো ফ্রেমের চশমায় চিন্তাশীল প্রফেসরের মতো মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছিল! ওর চিন্তাসূত্র ছিন্ন না করার জন্য ওকে ডাকি না আর। বাসে উঠে বসার পর ফিরে যাওয়ার বেদনায় কিছুটা ভারাক্রান্ত মনে হয় নিজেকে। জায়নের পার্কিং ছেড়ে বাস যখন মূল সড়কে ওঠে তখনো দু'পাশের পাহাড় সারি আমাদের ছেড়ে যায়নি, তবে পাহাড়ের রঙ বদলে গেছে। লাল পাথুরে পাহাড়ের জায়গায় ধূসর ও সাদা পাথরের পাহাড়। তার মাঝে আচমকা কিছু ক্যাকটাস আর কাঁটা ঝোপ। ভার্জিন নদীর ঊষর গিরি খাতের ভেতর দিয়ে সর্পিল হাইওয়ে এক সময় গিয়ে পড়ে চ্যাপ্টা সমতল মরুভূমিতে। চলন্ত বাস থেকে দেখা যায় সেই ছড়ানো মাঠের দূরের অংশ গাড়ির সাথে এগিয়ে যাচ্ছে আর কাছের অংশ পিছিয়ে যাচ্ছে। তার মাঝ বরাবর চোখ রাখলে মনে হয়, পুরো মাঠটা ঘুরছে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ডের মতো। দিগন্ত বিস্তৃত ছড়ানো মাঠের মধ্যে যতদূর চোখ যায় কেবল ছোট ছোট ঝোপ, বৃক্ষহীন, মরুময়, তবে খাঁটি মরুভূমির মতো বালিয়াড়ি নেই। এটা মোহাভি মরুভূমির অংশ হলেও হতে পারে। এক সময় সেই মরু প্রান্তরে থেমে যায় বাস। সামনে যানবাহনের দীর্ঘ সারি, কখনো সরীসৃপ গতিতে এগোয়, আবার থেমে যায়। যেন ড্রাইভারদের কারো কোনো তাড়া নেই। আমাদের দেশে সামান্য বাধা দেখলেই সবাইকে ঠেলে আইন ভেঙে পাশ কাটিয়ে সবার আগে চলে যাওয়ার একটা দুর্মর চেষ্টা দেখা যায়। এখানে সেরকম কিছুই দেখলাম না। চ্যান এর মধ্যে টেলিফোনে খবর পেয়ে গেছে– একটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাই সামনের একটা মাত্র লেন চালু বলে যানজট লেগে গেছে। ওসব দেশের হাইওয়ের সব অ্যাক্সিডেন্টই মারাত্মক। এই জ্যাম ছাড়াতে কত সময় নেবে বলা যাচ্ছে না। চ্যান কারো সাথে কোনো কথা না বলে এক জায়গায় আচমকা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামিয়ে দিয়ে উল্টোদিকের হাইওয়ে ধরে। ম্যানুয়েল ধরতে পারে ঘটনাটা। ওরা এপথে হপ্তায় দু'বার আসা-যাওয়া করে। তাই মজা করে বলে, চ্যান মনে হয় আমাদের আবার জায়ন পার্কে ফেরত নিয়ে যাচ্ছে। ওখানে ওর বার্থডে পার্টিটা সত্যিই দেবে মনে হয়। চ্যান পেছন দিকে তাকিয়ে হাসে।

মাইল বিশেক উল্টো পথে চলার পর আমাদের বাস আবার লাস ভেগাসগামী রাস্তায় উঠে আসে। ম্যানুয়েল এবার বলে ওঠে, সরি লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। চ্যান আমাদের পার্টি দিচ্ছে না। কারণ এই মাত্র সে আবার লাস ভেগাস যাবার রাস্তায় উঠে এলো। ওর মতিগতি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে পার্টি না দিলেও ওকে আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হবে। কারণ ওর উপস্থিত বুদ্ধির জন্যই আমরা অনির্দিষ্ট সময়ের একটা যানজট এড়িয়ে আসতে পেরেছি। তা না হলে কত সময় ওখানে আমাদের পড়ে থাকতে হতো কে জানে! বাসের সবাই একযোগে চ্যানকে সাবাসী দেয়।

শুলা এসময় উঠে বাস কন্ডাক্টরের মতো সিটে সিটে ঘুরে চাঁদাবাজি করতে থাকেন। সবার কাছ থেকে তোলা আদায় শেষ হলে বুড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে গলা তুলে বলেন, সিনর ম্যানুয়েল, আমাদের সবার তরফ থেকে তোমাদের তিনজনের জন্য সামান্য কিছু বকশিশ। তারপর সামনে গিয়ে ম্যানুয়েলের হাতে তুলে দেন টাকাগুলো। ম্যানুয়েল সামান্য বাউ করে বলে, বহোত শুকরিয়া সিনোরা। মেনি মেনি থ্যাংকস এভরিবডি। বকশিশ পাওয়ার প্রতিদান হিসেবেই বোধ হয় চ্যান গাড়ির গতি আরেকটু বাড়িয়ে দেয়, তবে মাত্রা ভেঙে নয় নিশ্চয়ই। তা না হলে আচমকা শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে লাল বাতি জ্বালিয়ে-নিভিয়ে এসে হাজির হতো পুলিশ। আমাদের পেছনে ফেলে আসা নেভাদার মরু প্রান্তরের কাঁটাগুল্ম আর নুড়িপাথর তখনো তীব্র রোদে কাবাবের মতো ঝলসাচ্ছে। তখন সামনের দিগন্তের কাছে আবছা ভেসে ওঠে লাস ভেগাসের স্কাইলাইন। ❖

অলঙ্করণ : : বোরহান আজাদ

ইমতিয়ার শামীম

নিজেকে খোঁজার দিন



নিবন্ধ

প্রাচীন যুগের জ্ঞানীদের কুলঠিকুজি ঠিকমতো না জানাতে আমরা দলবদ্ধভাবে শপাং শপাং বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হই উচ্চ বিদ্যালয়ে; বিনিময়ে 'নিজেকে জান.'– সক্রেটিসের এই বাণী ভারী সুগভীরভাবে গেঁথে যায় মনের ভেতর। নিজেকে জানার এই আর্তি অবশ্য বছরখানেক আগে থেকেই ফুটে উঠছিল আমাদের বাড়িতে লজিং থাকতে আসা মামাতো ভাইয়ের কল্যাণে। ভারী 'ডানপিটে, উচ্ছন্নে যাওয়া' এই ভাইটিকে তার বাবা বা আমাদের মামা তার বোনের বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন এই বিবেচনাতে, বিদ্যুৎহীন গ্রামগঞ্জের আশপাশে সিনেমা হল কিংবা আড্ডা জমানোর মতো চা-বিড়ির দোকানপাটের কোনওটাই নেই; অতএব তার সন্তানের সুকুমারবৃত্তি নষ্ট হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। যদিও পরিচয়ের প্রথম দিনেই ভাইটা লাজুককণ্ঠে আস্তে করে জেনে নেয়, এই গাঁ থেকে মানুষজন সিনেমা দেখতে যায় কেমন করে।

তারপর সিনেমা দেখার একটা চক্র গড়ে ওঠে আমাদের গাঁয়ে। যদিও ফুপু-ফুপার কাছে পড়াশোনায় নিবেদিতপ্রাণ প্রমাণে মামাতো ভাইটি চক দিয়ে দরজা আর জানালার কার্নিশ ভরিয়ে ফেলে 'নো দাইসেলফ' 'নিজেকে জানো' এইসব লিখে লিখে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে মামাতো ভাইটি নবম শ্রেণির পরীক্ষায় প্রথম হলে মামা এসে খুব হতাশ কণ্ঠে বলে, 'আমার ছেলে এইখানে এসে ফার্স্ট হয়েছে– তোমাদের স্কুলে লেখাপড়ার মান তো দেখছি খুব খারাপ হয়ে গেছে!' আমাদের কাছে এই হতাশার কথা জেনে মামাতো ভাইটি কূট কূট করে হাসে আর আবারও তার পাঠ্যবইয়ে শেখা দর্শনবাক্য ছুড়ে মারে আমাদের দিকে, 'আই টু ডাই, ইউ টু লিভ, হুইচ ইজ বেটার দ্যাট গড নোজ।'

মাত্র এক বছর পরেই এই দার্শনিকের সেই 'নিজেকে জানো' আপ্তবাক্যকে আমরাও খুব গভীরভাবে জানতে পারি মারাত্মক বেত্রাঘাতের মধ্য দিয়ে। আন্তর্জাল নেই, স্যাটেলাইটের ঝলকানিও নেই তখন। কানকথার বিস্তারই একমাত্র সহায় কোনও কিছুকে 'ভাইরাল' করে তুলতে। তাই একদল শিক্ষার্থীকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে তুলেছেন সক্রেটিসের 'নো দাইসেলফ' ঠিকমতো না জানার অপরাধে,– এই ঘটনা আর 'ভাইরাল' হয় না। ডেটল, জাম্বাক কিংবা শান্তি মলম অথবা সবুজ ঘাস চিবিয়ে কিংবা জংলি খয়েরিপাতা ডলে রস দিয়ে আঘাত দূর করার ক্ষীণ প্রচেষ্টার সুবাদে যে দু'চারজন এসব জানতে পারে, তাদের কাছ থেকেও সহানুভূতি জোটে না আমাদের কপালে। বরং তাদের চোখেমুখে প্রশান্তির ছাপ ফুটে ওঠে শিক্ষক তার যথার্থ ভূমিকা রেখেছেন বলে।

নিজেকে না-জানতে পারি, কোনও কিছু জানার প্রক্রিয়াটাই যে খুব ভয়ানক, সেটা আমরা জানতে পারি বোধহয় স্কুলে যাওয়ার প্রথম দিনটি থেকেই। কিংবা খুব ভয়ানকও নয়– তবু ভয়ানক করে তোলা হয় বলেই কি আমরা অনুভব করতে থাকি, শিখছি একটা কিছু? তবু সক্রেটিসের এই নিজেকে জানার পরামর্শ কৈশোরে ভারী অদ্ভুত লাগে। কী এক বিপন্ন বিস্ময়ে ডুবে যাই, নিজেকেও জানি না! এ কেমন মানবজন্ম আমাদের সকলের? কোথায় কোথায় খুঁজে ফিরি নিজেকে। কিন্তু খোঁজা আর শেষ হয় না। বয়সের উপযোগী আনন্দের স্রোতে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করি, 'ভয়াল', 'কুয়াশা' আর 'মাসুদ রানা' এইসব পড়ার ঘোরে ভুলে থাকি। কিন্তু একদিন দেখি বিদ্যুৎ মিত্রও লিখেছেন, 'নিজেকে জানো'। অদ্ভুত এক কৌতূহলে সে বইয়ের পাতা উল্টে চলি, নিয়মানুবর্তিতা, আত্মসম্মোহন, শরীরচর্চা আর সিগারেট খাওয়ার 'খপ্পরে' পড়ার হাত থেকে বাঁচতে নিজেকে জানা! হাসাহাসি করি নিজেদের মধ্যে, 'সিগারেট টানতে টানতে এই বই পড়তে হবে– না হলে বুঝতে পারব না।' কিন্তু সে তো নিছকই হাসাহাসি করা, এটা কি আর দিব্যি দিয়ে বলতে পারি, আমার আমিকে আমি নিজে ঠিক এইটুকু চিনি, এইটুকু জানি? কিংবা এ-ও কি অস্বীকার করা যায়, সময়ই মানুষকে তার জানবার পথ তৈরি করে দেয়? স্কুলে যাওয়ার আগেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেতে হলো আমাদের মতো যেসব শিশু-বালক-কিশোরদের, তাদের বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথ আতে কতটুকু সিধা হলো, কতটুকু এঁকেবেঁকে গেল, এসব নিয়ে তখনকার কোনও শিক্ষাবিদ কি কোথাও বলেছিলেন কিছু? মনে হয় না। বলুন বা না-বলুন, নিজেদের আমাদের জেনে নিতে হয়েছে নিজেদের মতো করে। সময় নতুন নৈতিকতার জন্ম দেয়, আমরা তা অনুভব করেছি নিজেদের মতো করে। এতদিন পর কয়েক বন্ধুর আর্কাইভ ঘাঁটাঘাঁটি করার সুবাদে জানি, ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি দৈনিক বাংলার শিশু-কিশোরদের পাতা 'সাত ভাই চম্পা'য় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অদ্ভুত সুন্দর এক লেখা লিখেছিলেন 'নতুন করে গড়ব এ দেশ' শিরোনামে। সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার তখন ঘোষণা করেছে, রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। এসব নিয়েই সেই ছোট শিশু-কিশোরোপযোগী নিবন্ধটি। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সরল ভাষায় লিখেছিলেন, 'প্রথমটাই ধরা যাক, ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কি? তোমরা জান আমাদের দেশে নানা ধর্মের লোক আছে। তোমাদের স্কুলের কি পাড়ার বন্ধুদের কথাই ভাবো না কেন– তারা কি সবাই এক ধর্মের? মোটেই না। কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিস্টান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সবাই তো বন্ধু। মুসলমান, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি খ্রিস্টান বলে তো আর বন্ধুত্ব কমে যায় না! কেননা সকলের সবচেয়ে বড় পরিচয় কী? বড় পরিচয় হচ্ছে : সকলেই মানুষ। বাংলাদেশে আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় : আমরা মানুষ, আমরা বাঙালি। এই যে চিন্তা– এর মানেই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হচ্ছে : এক ধর্মকে অন্য ধর্মের চেয়ে বড় করে না দেখা। সব ধর্মকে সম্মান করা।' এরকমভাবে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকেও চেনানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি তার এ লেখাটিতে। হয়তো এ লেখাকে আরও সরল করা সম্ভব, আরও উপযোগী করা সম্ভব, সরলমতি শিশুরা যাতে ধর্মচেতনার দূরত্ব নির্বিশেষে নিজেকে খুঁজে নেয়ার পথ তৈরি করে নিতে পারে, সেই পথ নির্মাণ করা সম্ভব। কিন্তু কখনোই সে চেষ্টা করা হয়নি। যখনই এ লেখাটির কথা মনে পড়ে, তখনই ভাবি, এটি যদি সদস্য স্বাধীন দেশের চতুর্থ-পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠ্য হতো, তা হলে অন্তত বেশ কয়েকটি প্রজন্ম পাওয়া যেত, যারা সদ্য স্বাধীন দেশের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়টিতেই বুঝে নিতে পারতেন, প্রবল রক্তের কলরোলে কী কারণে আমাদের বছরের পর বছর সংগ্রাম করতে হচ্ছে আর নয় মাস যুদ্ধও করতে হয়েছে। এতদিন পরে বুঝি, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে নয়, অনুকূলতার মধ্যে সাহচর্য আর সামাজিকতা খোঁজার জন্য নয়, আমাদের বরং শিক্ষা দেয়া হয়েছে বাধ্য করে তোলার লক্ষ্য থেকে– ঠিক যেমন এখনও দেয়া হচ্ছে। যদিও মুক্তিযুদ্ধ বুঝিয়েছিল, ন্যায়ের জন্য অবাধ্য হওয়ারও আগ্রহ আর সাহসটা থাকা চাই। কিন্তু বাধ্য হওয়ার এই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমরা না পারছি পৃথিবীকে জানতে, না পারছি নিজেকে চিনতে। নিজেকে জানতে না পারায় আরও অনেক পরে বেদনায় লীন কোনও সন্ধ্যায় মুগ্ধ হই রবীন্দ্র-অনুভবে, 'আপনারে এই জানা আমার ফুরাবে না...'। একদিকে নিজেকে জানার সুতীব্র আহ্বান, আরেকদিকে জানার মরিয়া প্রচেষ্টার পরও সংবিধিবদ্ধ অনিবার্য ভবিতব্যলিখন; কী এক অব্যাখ্যাত উপলব্ধিতে থির হয়ে যাই। তবুও 'আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই।' মনে হয় অস্কার ওয়াইল্ড ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি বলছেন আমাকেই, 'We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.' একটু সান্ত্বনাই কি অর্জন করি তাতে? 'জানার কোনো শেষ নাই/জানার চেষ্টা বৃথা তাই'–রাজা মশাইদের এরকম রাশভারী পরামর্শ পাওয়ার পরও তাই নিজেকে জানার ইচ্ছেটা বেঁচে থাকে আর মিছিল-মিটিংয়ের দিনগুলোতেও কখনও কখনও ভর দুপুরে ভার্সিটির লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখি, বিশাল মোটা এনসাইক্লোপেডিয়া খুলে কী যেন খুঁজছেন আমাদের এক নিরিবিলি শিক্ষক। কী দেখেন তা জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কী করে জানা যাবে কোন কোন পাতায় চোখ বুলিয়ে গেছেন তিনি! তবু সেই বই-ই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করি আরেকদিন। অনুভব করি, আমার ভেতরেও তা হলে কোনও কুসংস্কার আসন পেতেছে ভীষণভাবে। নাকি একে কুসংস্কার বলা যায় না, এ কেবলই কাউকে শ্রদ্ধা জানানোর অব্যক্ত একটি ধরন? এরকম এলোমেলো কথাবার্তা জমতে শুরু করলে একদিন মনে হয়, তা হলে তেমন কোনও বেহেড মাতালই হয়ে উঠছি নাকি, নর্দমায় হাবুডুবু খেতে খেতেও যে-তাকাচ্ছে দূর আকাশের ওইসব তারাদের দিকে মিটমিটিয়ে? এখনই সে উঠে দাঁড়াবে দুর্দমনীয় কী এক আকাঙ্ক্ষাতে?

কিন্তু কেবল এটুকুই তো নয়। আসলে এমন একটি বয়স থাকে, মানুষ নিজেকে জানতে থাকে, নিজেই নিজের হয়ে ওঠা অনুভব করতে থাকে, প্রত্যেকের সঙ্গে নিজের পার্থক্যটা বুঝে নিতে চায় ও বুঝিয়ে দিতে চায় কড়ায়গণ্ডায় হিসাব-নিকাশ করে। জন্মের পরপরই মানুষ একটি নাম পায় পারিপার্শ্বিকতা থেকে আর সেই নামটিকে সে নিজে শনাক্ত

করতে করতে নিজেকেও আলাদা করতে থাকে। কিন্তু অচিরেই সে এটাও বুঝতে পারে, 'আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে।' বুঝতে পারে সে, তেমন কোনও কথা অপরকেও বলতে হয় প্রতিনিয়ত, 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো তোমার আপন রাগে'। এইভাবে মানুষ ঐতিহ্যের অংশীদার হয়ে ওঠে, সামাজিক হয়ে ওঠে আবার স্বকীয়তাও অর্জন করে। সে অনুভব করে, 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী–কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ!' একসময় তার এই অনুভূতি এমন এক গভীরতা পায় যে, সে নিজেই গেয়ে ওঠে, 'নিজেরে করিতে গৌরবদান, নিজেরে কেবলি করি অপমান, আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া, ঘুরে মরি মিছে পলে। সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।'

দুই.

যাঁর পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করে এই নিজেকে খোঁজার আবার নিজেকে কী এক অনন্তের মধ্যে অন্তর্লীন করার এই পরম্পরা উপলব্ধির চেষ্টা করি, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশকে লিখেছিলেন, 'তোমার কবিত্ব শক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে।...বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে।' নিজেকে খুঁজতেই কি জীবনানন্দ দাশ 'ভাষা প্রভৃতি নিয়ে জবরদস্তি' করেছিলেন, যা একদিন খুব বড় হয়ে বেজেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রাণে? অনুভব করেছিলেন কি, এমন এক 'জবরদস্তির' নাকি প্রতিভার অভ্যুদয় ঘটছে, যার দিকে ফিরে চাইবে সবাই, ফলে নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে পারে তার কবিতা? নাকি এ-ও সেই পরিস্থিতি, সরল অঙ্কের মতো জটিল আবর্তন যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় প্রতিটি প্রজন্মকে? জীবনানন্দের মৃত্যুর পর, তার ক্রমশ অভাবনীয় পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির পর 'বড়ো জাতের রচনা' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তা হলে কি মিথ্যে হয়ে গেছে? শান্তিই অনুভব করি বটে আমরা জীবনানন্দ দাশে, কিন্তু সেই শান্তি-প্রশান্তি কেন অনুভব করতে অসুবিধা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের?

কালের দীর্ঘ পরিক্রমায় এরকম বহু ঘটনাই আমাদের অদৃশ্যে চলে যায়, যা নিয়ে সমকালে হয়তো তরঙ্গের পর তরঙ্গ বয়ে গেছে। এরকম 'উত্তেজনাকর' কথাবার্তা রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকজনের সঙ্গেই হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি লিখেছিলেন, '...ইনটেলেক্টের ইট সাজিয়ে তুমি যদি কাব্যরূপ গড়ে যাও তবে সেই সৃষ্টিতে প্রত্যেক ইট ঠিক আপন পরিমাণটির চেয়ে আর কিছু দিতে পারে না।' আবার বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে ব্যাপারটি দেখছি একেবারেই অন্যরকম। জীবনানন্দের ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল, আপত্তি ছিল বুদ্ধদেবের ভাষা নিয়েও। নিদারুণ বেদনা নিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন তার কাছে, '...বিশেষ করে, আমার কাছে আপনি দেবতার মতো। আপনার কাছ থেকে আমি ভাষা পেয়েছি। সে-ভাষা আপনার পছন্দ হয় না। আমারই দুর্বলতা, আমারই অক্ষমতা।' যার কাছ থেকে তিনি ভাষা পেয়েছে আর ভাষা নির্মাণের আনন্দে মেতে উঠেছিলেন, তার কাছেই যখন সে ভাষা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়ে তখন আসলে কোন রসায়ন থাকে এর পেছনে? পরস্পরের সঙ্গে চিন্তার দূরত্বের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়তে দেখি 'মার্কসিস্ট' কবি বিষ্ণু দে আর কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দোপাধ্যায়কেও। 'গল্প-উপন্যাসে সাবালক বাংলা' শিরোনামে বিষ্ণু দে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন শারদ *পরিচয়*-এ (১৩৫৪)। সমসাময়িক তিন কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাতে তিনি অচিন্ত্যকুমার সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'তাঁর পরিণতির সার্থকতা ঐতিহাসিক তুলনায় জাগায় হেমিংওয়ের সঙ্গে।' একই পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'পত্রিকা প্রসঙ্গে' শিরোনামে নীহার দাশগুপ্তের একটি আলোচনা–যাতে তিনি বিভিন্ন পত্রিকার (আনন্দবাজার, যুগান্তর, স্বাধীনতা, বসুমতী, স্বরাজ, কৃষক, অরণি, দেশ, পরিচয় ও অভ্যুদয়) শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। নীহার তার আলোচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যুগান্তরে প্রকাশিত মানিকের 'গায়েন' ও বসুমতীতে প্রকাশিত অচিন্ত্যর 'মুচিবায়েন' নিয়ে তুলনামূলক আলোচনাও করেন তিনি এবং প্রসঙ্গত লেখেন, 'অচিন্ত্যকুমারের তীক্ষ্ণধার ভাষা ও গল্প বলার কায়দার জোরে গল্পগুলি সুখপাঠ্য হয়ে উঠলেও কোনো এক কবি-সমালোচকের মতো তাঁকে হেমিংওয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারবো না। বলতে পারবো না, 'তাঁর গল্পের জীবন জীবনেরই মত বিচিত্র, তিক্ত, মধুর, বিস্ময়কর মিশ্রাবেগ।'' পরের মাসেই (পৌষ) *পরিচয়*-এর 'পাঠকগোষ্ঠী' বিভাগে এ আলোচনার প্রতিবাদে পত্র লেখেন বিষ্ণু দে। পরবর্তী মাঘ মাসে প্রকাশিত হয় বিষ্ণুদের এ প্রতিবাদপত্রের উত্তরে নীহার দাশগুপ্তের নিজের এবং অনিলকুমার সিংহের দুটি লেখা। এর পরের মাস ফাল্গুনে লেখেন মানিক তাঁর অন্যতম পত্র-নিবন্ধ 'গায়েন' ও 'মুচিবায়েন'। এ নিবন্ধে তিনি বিষ্ণুদের মার্কসীয় 'দৃষ্টি' ও 'জ্ঞান'কে আখ্যায়িত করেন 'বিকৃত' ও 'অপরিচ্ছন্ন' হিসেবে।

কিন্তু এই 'উত্তেজনাকর' প্রেক্ষাপটের কারণেই কি মানিকের এ লেখাটিকে মনে করছি? তা তো নয়, নিবন্ধটি পড়তে পড়তে এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে যায়, দেখি তিনি উদ্ধৃত করেছেন বিষ্ণু দের এই বাক্য : 'অচিন্ত্যকুমার হাকিম কিনা তা জানবার প্রয়োজন গল্প-সমালোচনায় নেই, তিনি কৃষক সভার রিপোর্ট থেকে গল্প লেখেন কিনা তাও জানবার প্রয়োজন নেই।' তারপর মানিক শ্লেষসমেত নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন, 'অর্থাৎ শুধু লেখার বিচার কর, লেখককে বাদ দিয়ে। লেখা যেন আকাশ থেকে পড়ে–লেখক সম্পর্কে কিছুই না জেনে যেন লেখার সমালোচনা সম্ভব।' এখন আমরা যারা একটু-আধটু লেখালেখির চেষ্টা করি, তাদের বোধকরি এই বাক্য মেনে নেয়ার আগে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে জেনে নিতে হবে, লেখকসমেত লেখার বিচার করা বলতে তিনি আসলে কী বোঝাতে চান আমাদের। আর তখন তো অনেকেই ছিলেন, যারা এ কথা মেনে নেননি। এ সম্পর্কে মানিকের নিজের অভিযোগ, 'প্রকৃতপক্ষে, বিষ্ণুবাবু এখানে 'আর্টের জন্যই আর্ট'-এর পক্ষেই একটু ঘুরিয়ে ওকালতি করেছেন।' এইসব তর্ক-বিতর্ক এখন ইতিহাসের অংশ, কথিত 'মার্কসীয় সাহিত্যবিতর্কের' অংশ। কিন্তু বললে কি ভুল হবে, একই সঙ্গে এ বিতর্ক একজন লেখকের নিজেকে খুঁজে বেড়ানোরই অংশ? লেখকরা কখনও কখনও এই অভিযোগ করেন এবং তা নিশ্চয়ই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে, 'এমন অনেক পাঠক আছেন, যাদের প্রবণতাই হলো লেখার মধ্যে গল্পকার/ঔপন্যাসিককে খুঁজে বেড়ানো' এবং নিশ্চয়ই পাঠকের উচিত এ ধরনের প্রবণতামুক্ত হওয়া। কিন্তু একটি লেখা শেষ পর্যন্ত লেখকের এবং সেটির পাঠকের নিজেকেই খুঁজে ফেরা, এ সত্যও কি অস্বীকার করা যায়? এই বিতর্ক সেই অন্বেষণকে গভীর থেকে গভীরতর করে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে। যদিও সমকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইস্যুগুলো মিইয়ে যাওয়ার পর মানিকের এই কথাগুলো এতদিন বাদে পড়ে এমনটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, যেভাবে এইসব বাক্যে তিনি এত গুরুত্ব দিয়েছেন, তাতে একটি লেখাকে অযথাই লেখকের ব্যক্তিজীবনের জলছাপে দুষ্ট করে তোলা হচ্ছে;

একজন লেখক যে দীর্ঘ পরিভ্রমণের মধ্যে দিয়ে নানাভাবে নিজের অভিজ্ঞতাকে পরিশ্রুত করে তোলেন, তা অস্বীকার করার পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করা হচ্ছে।

মনে করা যাক, অমিয়ভূষণ মজুমদারের সেই কথাগুলোকে, তিনি তার এই জীবনে স্যাটিসফায়েড নন। যে-জীবন তিনি দেখছেন, অনুভব করছেন, তাতে যেন কোথায় কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছেন না। যে জাগরণ ঘটছে তার ভেতরে, তার চারপাশে তাতে তার বৃদ্ধি নেই, বিকাশ নেই– বরং এই জাগরণ মনে হচ্ছে যে খর্ব করে দিচ্ছে তাকে। বলেছেন তিনি, একটি সুনির্দিষ্ট পলায়ণপরতা খুঁজে ফিরছেন তিনি, ঠিক যেমনভাবে মায়ের জঠরে এস্‌কেপ করেছিলেন তিনি, জীবনকে ছুঁতে, জীবনকে আদিরূপে দেখতে, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতে ঠিক তেমনভাবেই এস্‌কেপ করতে চাইছেন তিনি। যতদূর বুঝি, তাতে নিশ্চিত, কবি আবুল হাসানও ঠিক এরকম অনুভূতি থেকেই 'ভ্রূণ' কবিতায় লিখেছিলেন, 'আমাকে তুই আনলি কেন ফিরিয়ে নে।' তার অর্থ, এই অনুভূতি শুধু এক অমিয়ভূষণের নয়, আরও অনেকেরই। অমিয়ভূষণ নিজেও তা জানতেন, কেননা জীবন নিয়ে অমন অতৃপ্তি প্রকাশের পর এস্‌কেপ করার প্রত্যাশা জানানোর পর তিনি আরও লিখেছেন, 'আর লিখি তাদেরই জন্য যারা 'সহৃদয়-হৃদয় সংবাদী।' অর্থাৎ যারা আমারই মতো অনুভব করে : দূর! আমি এ পৃথিবীতে কিছুই পাচ্ছি না, আমার নিজস্ব একটা পৃথিবী দরকার, যেখানে আমি আনন্দ পেতে পারি। যে-মন নিয়ে আমি লিখতে বসি, সে-মন তো আমার পাঠকের থাকতেও পারে। সে তো অন্বেষণ করছে আমাকে। সেই অন্বেষণকারীর জন্য লিখি।' এইভাবে নিজেকে খোঁজার কিংবা ব্যক্তির অন্বেষণের সঙ্গে সামষ্টিক অন্বেষণের যে অদৃশ্য চালচিত্র আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে, তাই কি তবে শেষ পর্যন্ত উঠে আসে কথাসাহিত্যে? নিজেকে তারা খুঁজে পান কেবল নিজের মধ্যে নয়, অপরের মধ্যেও?

অমিয়ভূষণ 'ক্ষুধার্ত' নামের একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর এই নিজস্ব অন্বেষণকে আরও স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন। সেখানে তিনি বলছেন, 'যখন আমি প্রথম লেখা শুরু করি এবং এখন যখন আমি লিখছি এই দুই আমি এক। কিন্তু এই দুই আমির মধ্যে তফাৎ হল এই : প্রথম যখন আমি লেখা শুরু করি তখন লিখেছি স্বীকৃতির জন্য, আজ লিখি আনন্দের জন্য–যে-আনন্দ আমি আর কোথাও পাই না। অত্যন্ত দামি মদ খেলে, কিন্তু মাতাল না-হলে যে-অনুভূতি হতে পারে কলম হাতে আমার চরিত্রগুলোর মধ্যে আমি যখন বলতে থাকি তখন আমার সেই অনুভূতি হয়। কখনও মনে হয় মাথায় একটা পদ্ম আছে, যা থেকে মধুস্রাব হচ্ছে এবং সে-মধু অ্যালকোহলের চাইতেও তীব্র আনন্দে আমাকে ভরে তোলে।' আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এইভাবে নিরেট নিজস্ব আনন্দের জন্য যা লেখা হচ্ছে, নিজেকেই খুঁজে ফিরে যা সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার সঙ্গে পাঠকের সম্পর্ক আর কতটুকু ঘটবে। কিন্তু সেটাও তো ঘটে, নিশ্চয়ই ঘটে। আর কেনই-বা ঘটে, তা বোধকরি তাঁর ওপরের কথাগুলোতেই খুঁজে পাওয়া যায়।

তিন.

আরও একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক, কাজী নজরুল ইসলামের লেখা চিঠিটার এই অংশে : 'ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি ও কবিতা বাঁচে না, জন্মলাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ আরব দেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর থেকে আর সেথায় কবি জন্মাল না।' আবাল্য শুনে এসেছি, অনুভবও করেছি, নিজেকে খোঁজার এই পরিভ্রমণ, তা কবিতাতেই অনুভব করা যায় সবচেয়ে গভীরভাবে। কিন্তু কবিতা কি আর আগের মতো টানে আমাদের? নাকি কবিতা আর জন্ম নিতে পারছে না আমাদের দেশে? কবিতার সঙ্গে আমাদের ঘরগেরস্থি উঠে যাওয়ার এই যে নীরব আয়োজন, তার সঙ্গে আমরাও গাটছড়া বেঁধেছি? যে কড়াকড়ি অর্ধশত বছরেরও আগে নজরুল অনুভব করেছিলেন, নব্বইয়ের দশক পেরিয়ে তা যেন হঠাৎ করেই আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে শুরু করেছে। স্পর্শাতীত আনন্দ নিয়ে কবিতা এখনও আমাদের মনে ঝড় তোলে বটে–কিন্তু সেই আনন্দের ভাগিদার ক্রমশই কমে আসছে। অন্য কথায়, আমরা বোধকরি কবিতায় নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি না নতুন করে। আমাদের ক্ষুধা জমছে, কবিতার ক্ষুধা, নতুন কবিতাকে পাওয়ার ক্ষুধা–কেননা নিজেকে খোঁজার, নিজেকে জানার অন্বেষণ তো কখনোই শেষ হয় না।

কবিতার অনাহার নিয়ে বসবাস করতে করতে মাঝেমধ্যে নিজেকে আবারও জানার চেষ্টা করি, নিজেকেই প্রশ্ন করি–চারপাশে তাকাতে, এমনকি ঘরের মধ্যেও, আজকাল ভয় করে না? উত্তর পাই, করে বৈকি। প্রশ্ন করি, কেন ভয় করে? উত্তর পাই, নিজেকে জানার কী এক মোহে এতদিন ধরে যে-বইগুলো কিনেছি, কোথাও তা রাখবার মতো স্থান নেই। দূরযাত্রার ধাক্কায়, বাসা বদলের ধাক্কায় বইসমূহ শেষ পর্যন্ত নিছক প্যাকেট হয়ে যায়, তাদের আর নিজস্ব কোনও পরিচয় থাকে না, তাদের আর অহঙ্কারী এই ঘোষণাও থাকে না–দেখ, আমাকে দেখ। প্যাকেটের পর প্যাকেটগুলোর দিকে তাকাতেই মনে হয় সেগুলো বলছে, 'আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। হয় আমাদের মৃত ঘোষণা কর, না হয় আমাদের মুক্ত কর।' তাদের দিকে তাকিয়ে আমার নিজেরও দম বন্ধ হয়ে আসে, সত্যিই তো, আমার উচিত এখন তাদের হয় মুক্ত করা, না হয় মৃত ঘোষণা করা। কী যে দুর্বিষহ এই অনুভূতি তা কেবল তাদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব, যারা এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন যে, বই মানুষের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব দূর করে সুন্দর একটি জগতের বাসিন্দা করতে পারে, অব্যাখ্যাত প্রতিকূলতা, সহিংসতা, দৈন্য আর অসুস্থতার মধ্যে দিয়েও সুন্দর করে বেঁচে থাকার আর নির্ভাবনায় ঘুমানোর বসতিতে নিয়ে যেতে পারে। কোনও কোনও দিন মানিকের এই কথা মনে পড়ে, 'বই কেন ভালোবাসি? মানুষকে ভালোবাসি বলে।' মানুষকে ভালোবেসে মানুষকে খুঁজতেন তিনি, খুঁজতেন নিজের মধ্যে মানুষকে, মানুষের মধ্যে নিজেকে। তাই বই-ও খুঁজতেন তিনি, খুঁজতেন বইয়ের মধ্যে নিজেকে কিংবা মানুষকে। জানিয়েছিলেন তিনি, মানুষকে ভালোবাসলে বইয়ের প্রতিও ভালোবাসা আসে, মানুষকে ভালোবাসতে না শিখে কোনোমতেই বইকে ভালোবাসা যায় না। দিনরাত খুব হোঁচট লাগে, তাহলে কি মানুষকে ভালোবাসতেই ভুলে যাচ্ছি আমি? বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ে; শুধু বই কেনার জন্যেই নাকি বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাদুড়বাগানে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। অত বড় লাইব্রেরি করলেও বই চুরি যাওয়ার ভয়ে পড়তে দিতেন না কাউকে। বই বাঁধিয়ে আনতেন সেই ইংল্যান্ড থেকে। মেট্রোপলিটান স্কুলের ছাত্র শরৎকুমার মিত্র নাকি এত বই দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সেই বাড়িতে গিয়ে? প্রশ্ন না করে থাকতে পারেননি, 'এত বই পড়েছেন আপনি?' বিদ্যাসাগরের মুখে নাকি রহস্য খেলা করেছিল ওই প্রশ্ন শুনে। বলেছিলেন, 'সব কি আর পড়েছি নাকি? তবে বইয়ের হাওয়া ভালো।' অনুভব করি, সেই হাওয়াটুকুও প্যাকেটে প্যাকেটে বন্দি হয়ে পড়ে আছে এখানে-সেখানে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের জটিলতার এই শহরে, সরল সম্পর্কের ঘন সুস্বাদু রসায়নেও সময় না মেলার এই শহরে, যানজটের এই শহরে, সন্ত্রাস-সহিংসতা-ভূমিকম্প ত্রাসিত এই নগরে মানুষকে ভালোবেসে মানুষকে তা হলে কোথায় খুঁজি? কোথায় হত্যা করি বলো নিজের নিঃসঙ্গতাকে? জন্ম দেই আর লালন করি সঙ্গকে? কোথায় খুঁজি নিজেকে?

শাহাবুদ্দীন নাগরী

মকবুল ক্রাইসিস



আ খ্যা ন

মকবুলকে ড্রাইভার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে জিনাত।
বললাম, 'কাগজপত্র সব দেখেছ তো?'
জিনাতের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'দেখেছি।'
আর কিছু বলল না। আমিও কথা বাড়ালাম না। অফিসের কাজে আমাকে প্রচুর ব্যস্ত থাকতে হয়, বাসার গাড়িটার জন্য ড্রাইভার খুঁজে এনে কাজে লাগানোর মতো সময় আমার নেই।



অলঙ্করণ : : সৈয়দ ইকবাল

কাগজপত্র পরীক্ষা করা, লাইসেন্স চেক করা, রেফারেন্স দেওয়া লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলা, ড্রাইভিং টেস্ট ইত্যাদি কাজগুলো জটিল এবং ঝামেলার। আমি সময় করতে পারি না।

জিনাতই আমার সংসারটা আগলে রেখেছে। মাসের শুরুতে আমি জিনাতের হাতে টাকা তুলে দিয়েই খালাস। আর কিছু দেখি না আমি। বাথরুমের ফ্লাশ সচল রাখা থেকে দা-বঁটি ধার করানোর সব কাজই জিনাত করে। এমন স্ত্রী পাওয়া সত্যিই গৌরবের। আমি অফিস থেকে বাসায় ফিরে ডিনার করি, পত্র-পত্রিকা পড়ি, টিভি দেখি, তার পর ঘুমিয়ে যাই। খাবার টেবিলে মাছটা কোথা থেকে এলো বা দাম কত, কে কিনেছে, কোন্ বাজার থেকে কিনেছে এগুলো আমি জিজ্ঞেস করি না। জিনাত ইচ্ছে হলে বলে, না হলে নয়।

জিনাতই একবার কখন জানি বলেছিল, পুরনো ড্রাইভারটা চলে গেছে, নতুন একজন ড্রাইভার লাগবে। ছেলেমেয়েদের ভার্সিটি যেতে-আসতে কষ্ট হচ্ছে। তার পর ওর চলাফেরা তো আছেই।

আমি শুধু বলেছিলাম, 'নিয়ে নাও।'

আমি যত সহজভাবে নিয়ে নেওয়ার কথাটা বলেছিলাম, আসলে বিষয়টা অত সহজ ছিল না। জিনাত আমার ভাইবোন, ওর ভাইবোন, চাচা-মামা, আত্মীয়-স্বজন, দু-চারজন পরিচিত ড্রাইভারসহ প্রায় বিশজনকে একজন ভালো-বিশ্বস্ত ড্রাইভার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। বেশ কয়েকজন এসেছিল। কারও লাইসেন্স ঠিক নেই, কারও জুতসই রেফারেন্স নেই, কারও চোখের সমস্যা, কারও বয়স বেশি, কারও আবার কম– এইসব যাচাই-বাছাই করতে করতে নাকি মকবুল টিকে যায়।

জিনাত ওকেই নিয়োগ দিয়ে দেয়।

আমি অফিসের গাড়িতে আসা-যাওয়া করি। এ কারণে মকবুলের ড্রাইভিং আমার দেখা হয়নি। তবে ওকে দেখেছি। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের হবে। বেশ সুঠাম শরীর। পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরে, পায়ে জুতাও দেখেছি, যেটি সব ড্রাইভারের পায়ে সাধারণত দেখা যায় না। আমাকে দেখলেই সালাম দিয়ে সটান দাঁড়িয়ে যায় ট্রাফিক পুলিশের মতো, বিচারপতিদের গাড়ি দেখলে ট্রাফিক পুলিশরা যেমন করে। আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি, করার প্রয়োজন পড়েনি। নিয়োগকর্ত্রী জিনাত, ওই দেখবে এসব।

ছেলেটা বলেছে, মকবুল ভালো গাড়ি চালায়।

মেয়েটা বলেছে, মকবুল কম কথা বলে। স্টিয়ারিং ধরে বকবক করে না। আগের ড্রাইভারটা নাকি প্যাঁচাল করত বেশি।

তিন দিনের মাথায় জিনাতকে জিজ্ঞেস করলাম,

'মকবুল কোথায় থাকে?'

'বাড্ডা।'

'বউ-বাচ্চা নিয়ে থাকে?'

'হ্যাঁ, ফ্যামিলি নিয়ে থাকে।'

'বেতন কত দিচ্ছো?'

'বারো হাজার টাকা।'

আগের ড্রাইভারটা এগারো হাজার টাকা নিত।

আমি বললাম,

'ঠিকই আছে। জিনিসপত্রের দামও তো বেড়েছে।'

জিনাত কোনো মন্তব্য করল না। আমিও আর কিছু জানতে চাইলাম না।

আজকাল বিশ্বস্ত ড্রাইভার পাওয়া কঠিন। গাড়িটা যে ওর রুটি-রুজির ব্যবস্থা করছে, এটা বুঝতে চায় না। গাড়ি ফ্রি পেলে রাস্তা থেকে লোকজন তুলে ট্রিপ দিয়ে টু-পাইস কামিয়ে নেওয়া অনেক ড্রাইভারের অভ্যাস। আর যারা খুব বেশি লোভী এবং সাহসী, ওরা গাড়ির তৈল বিক্রি করার মতো অনৈতিক কাজও করে। এদিক দিয়ে মকবুল কেমন হবে, আরও কিছুদিন না গেলে বোঝা যাবে না।

জিনাতের এক দূরসম্পর্কের মামা মকবুলের খোঁজ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'শোনো মা, ছেলেটা ভালো, সৎ, বিশ্বস্ত। অভাবের কারণে লেখাপড়া করতে পারেনি, ম্যাট্রিক পাস করে ড্রাইভিং শিখে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে।'

তিনি জিনাতের ঠিকানা দিয়ে মকবুলকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

'মামা, গাড়ি ভালো চালায় তো?'

'ওদিকে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো। ঠাণ্ডা মাথা। আমাদের গার্মেন্টে ছিল। পাঁচ বছর খুব ভালো সার্ভিস দিয়েছিল। পরে মালিক ছাঁটাই শুরু করলে ও অন্য কোথাও চলে যায়। আমাকে ওর টেলিফোন নম্বর দিয়ে রেখেছিল এই আশায় যে ভালো কোনো চাকরি পেলে আমি যেন ওকে খবর দিই। ওর সঙ্গে কথা বলেছি। তুমি দেখতে পারো।'

মামার কথাই ঠিক। মকবুল গাড়ি চালায় ঠাণ্ডা মাথায়। জিনাত মকবুলকে একটা শার্ট কিনে দেয়।

ও নেব না, নেব না করতে করতে শেষ পর্যন্ত নেয়। এসব বিষয়ে জিনাত আবার খুবই উদার। যাকে ভালো লেগে যায়, তার জন্য উজাড় করে দিতে কার্পণ্য করে না।

বলে, 'গরিব মানুষ, দিলে আমাদের কমে যাবে না।'

আমরা একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের তিনতলায় থাকি। নিচতলায় ড্রাইভারদের জন্য আলাদা একটা রুম-বাথরুম আছে। মকবুল সকালে এসে চাবি নিয়ে যায় দরজা থেকে, বাজার-টাজার করে আনলে গাড়ি থেকে তিনতলা পর্যন্ত এনে দিয়ে যায়, ঘরের ভেতর কখনও ঢোকে না। ওর খাবার ছোট কাজের ছেলেটা নিচে সার্ভিস রুমে দিয়ে আসে। ওর খাওয়া হয়ে গেলে গ্লাস-প্লেট সব ওয়াশ করে ওপরে দরজায় এসে দিয়ে যায় মকবুল নিজেই।

এভাবে দেখতে দেখতে কয়েক মাসে মকবুল আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যায়।

একদিন রাতে জিনাত আমাকে বলে,

'এই শোনো, মেয়েটা ভীষণ কাঁদছে।'

মেয়েটা মানে আমাদের মেয়ে, রুবাই।

'কেন, কী হয়েছে?'

'কানের দুল একটা খুঁজে পাচ্ছে না। সকালে দুল পরে ভার্সিটিতে গিয়েছিল, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে কানে হাত দিয়ে দেখে, এক কান খালি। মনে হয় ভার্সিটিতে হারিয়েছে।'

আমি বলি,

'তুমি নিশ্চয়ই বকাঝকা করেছ?'

'একটু তো করেছিই। হারাবার হারিয়েছে, কিন্তু একটু শাসন না করলে ওরা হারাতেই থাকবে।'

'ভাত খেয়েছে?'

'না, খায়নি। খাবে না। আমি অনেক ডাকাডাকি করেও খাওয়াতে পারিনি।'

গত জন্মদিনে রুবাইকে আমি একজোড়া দুল গিফট করেছিলাম।

সেই দুলেরই একটা কোথাও খুলে পড়েছে কান থেকে। জিনাতের কাছ থেকে আমি যতটুকু জেনেছি, রুবাই দুলজোড়া সব সময় পরত না, ভার্সিটিতে যেদিন কোনো অনুষ্ঠান থাকত, ও সেদিন সেটা পরে যেত। আজকে ওদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান ছিল, তাই পরে গিয়েছিল। দৌড়ঝাঁপ করতে গিয়ে কোথাও পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।

আমি রুবাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে আসি। বলি,

'ওটা আমি কাল স্বর্ণের দোকানে নিয়ে গিয়ে আর একটা বানিয়ে আনব। আমি কিছু মনে করিনি।'

মেয়েটা আমার কথায় আরও যেন কষ্ট পায়, জোরে জোরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে।

'বাবা, ওটা তোমার জন্মদিনের গিফট, আমি হারিয়ে ফেলেছি বাবা। আমাকে মাফ করে দাও।'

আমি ওর মুখটা চেপে ধরি আমার বুকের কাছে।

'কাঁদিসনে মা, যেটা হারাবার সেটা হারায়, কাঁদিসনে, বলেছি তো, আমি কিচ্ছু মনে করিনি।'

দুল হারাবার কথা মকবুল জানত না। পরদিন সকালে চাবি নিয়ে নিচে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর আবার ওপরে উঠে আসে।

জিনাত দরজা খুললে মকবুল একটা দুল ওর সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে,

'ম্যাডাম, এই দুলটা গাড়ির পেছনের সিটটার কোনায় আটকে ছিল। মনে হয় আপার দুল।'

জিনাত দুলটা হাতে নিয়ে মকবুলকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠিয়ে দেয় নিচে। তারপর আমাকে এসে বলে,

'তোমাকে বলেছিলাম না, ছেলেটা ভালো? এই দেখো গাড়ির সিটে আটকে থাকা দুলটা পেয়ে দিয়ে গেল।'

আমি অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমি ওর হাতের দিকে দেখলাম শুধু।

'ও তো দুলটা মেরেও দিতে পারত। তাই না?'

আমার জবাব শোনার জন্য অপেক্ষা করল না ও। বেরিয়ে গেল রুবাইকে ওটা দেওয়ার জন্য।

মকবুলের সততা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে দিল।

কিন্তু কয়েক দিন পরেই ঘটল ঘটনাটা।

ছেলেকে নিয়ে ধানমণ্ডির ভার্সিটিতে গিয়েছিল মকবুল।

জিনাতের বাইরে যাওয়ার কোনো কাজ ছিল না বলে মকবুলকে বলে দিয়েছিল, ক্লাস শেষ হলে একবারই যেন ওদের দু'জনকে তুলে নিয়ে বাসায় চলে আসে।

কিন্তু দুপুরের দিকে মকবুল ফোন করে জানাল, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি বটে, কিন্তু গাড়ির সামনের বনেট চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

আতঙ্কিত হয়ে জিনাত জিজ্ঞেস করল,

'গাড়ি দেখে চালাও না? আমার ছেলেটার যদি কিছু হয়ে যেত?'

মাথা ঠিক ছিল না তখন জিনাতের। গালাগালি করতেও বাদ দিল না মকবুলকে। যাচ্ছেতাই বলল।

'যাও, ছেলেকে ট্যাক্সিতে পাঠিয়ে দিয়ে গাড়ি ওয়ার্কশপে দিয়ে এসো।'

তার পর আমাকে ফোন করে বিস্তারিত জানাল। আমি হুঁ-হাঁ করে কথা শুনলাম। গাড়ির ক্ষতি যখন হয়েই গেছে, তখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

বিকেলের দিকে ওয়ার্কশপের মালিক জিনাতকে ফোন করে জানাল, প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে গাড়ি মেরামত করতে।

আমি অফিস থেকে ফেরার পথে ওয়ার্কশপে গিয়ে গাড়িটা দেখলাম।

মকবুল আমতা আমতা করে বলল,

'স্যার, সামনের বাসটা এমনভাবে ব্যাক করল যে আমি গাড়িটা পেছনে নেওয়ার সুযোগ পেলাম না। স্যার, আমি দুঃখিত স্যার।'

আমি কিছু বললাম না।

ওয়ার্কশপ মালিককে দ্রুত গাড়িটা ঠিক করে দেওয়ার কথা বলে মকবুলকে আমার গাড়িতে তুলে নিয়ে বাসায় এলাম। আমি মকবুলকে কিছু বললাম না এই কারণে যে, যা বলার জিনাতই বলবে।

মকবুল গাড়িতে আমার অফিসের ড্রাইভারের পাশের সিটে বসল বটে, কিন্তু পুরো পথ সে মাথা নিচু করে বসে থাকল, আমি পেছনের সিটে বসে সেটা লক্ষ্য করলাম। হয়তো অপরাধবোধ, হয়তো লজ্জা। কিন্তু জিনাত ছেড়ে কথা বলল না। ড্রাইভারদের কীভাবে গাড়ি চালাতে হয়, তা নতুনভাবে শিখিয়ে দিল মকবুলকে। নিজে ভালো ড্রাইভিং জানলেও রাস্তায় আরেকজন ড্রাইভার যে ভালো ড্রাইভিং জানে না, বাংলাদেশে সেটা মাথায় রেখে গাড়ি চালাতে হয়, তির্যকভাবে এ কথাটাও শুনিয়ে দিল মকবুলকে। মকবুল দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হজম করল সব গালাগালি।

ওর যাওয়ার সময় আমি বলে দিলাম, ও যেন প্রতিদিন ওয়ার্কশপে গিয়ে গাড়িটার কাজ তদারকি করে। যত দ্রুত সম্ভব গাড়িটা ঠিক করে আনতে হবে।

কিন্তু পরদিন মকবুলকে ওয়ার্কশপে পাওয়া গেল না।

ফোন করলাম ওয়ার্কশপের মালিককে।

'স্যার, আপনার ড্রাইভার তো এখানে আসেনি।'

জিজ্ঞেস করলাম,

'কয়দিন লাগবে গাড়িটা ঠিক করতে?'

'স্যার, কার্বুরেটর আর কয়েকটা পার্টস পাল্টে ইঞ্জিনটা চালু হলে ডেন্টিং-পেন্টিং করে ঠিক করতে ছয়-সাত দিন তো লেগেই যাবে।'

আমার পরিচিত মালিকটা। বললাম,

'যত তাড়াতাড়ি করা যায়, করে দেন।'

মধ্যবিত্তের এই এক হ্যাপা। গাড়িতে চড়তে চায়, কিন্তু গাড়ি মেরামতের জন্য ওয়ার্কশপে পাঠালে তাদের সময় কাটতে চায় না। যতক্ষণ না গাড়ি ঠিক হয়ে আসছে, ততক্ষণ ওরা মনে করে বন্দি জীবন কাটাচ্ছে। আমিও ওই বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারিনি, আমার পরিবারের মানুষগুলোও।

জিনাতকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম যে মকবুল ওয়ার্কশপে যায়নি।

জিনাত সারাদিন কিছুক্ষণ পরপর মোবাইলে মকবুলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। কিন্তু মকবুলের ফোন বন্ধ। 'দ্য মোবাইল ক্যা-নট বি রিচ্‌ড...' শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেল সে।

গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করার পর থেকে আমার ভার্সিটিপড়ুয়া ছেলেটা বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। একটা আতঙ্ক চোখেমুখে।

জিনাত কাল রাতে আমাকে বলেছিল,

'রূপমকে বেশ নার্ভাস দেখছি। মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে।'

আমি বলেছিলাম, 'ভার্সিটিতে যাওয়ার দরকার নেই কয়েক দিন। বাসায় থাকুক। এমন অ্যাক্সিডেন্টে আতঙ্কিত না হয়ে কেউ পারে?'

জিনাত ছেলের ঘরে গিয়ে ওর মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল।

বলেছিল,

'এমন অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে বাবা। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন, এ জন্য হাজার শুকরিয়া।'

এমন কথায় ছেলে মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদেছিল, আমার ঘর থেকে আমি তা স্পষ্ট শুনেছিলাম।

কিন্তু মকবুলের লাপাত্তা হয়ে যাওয়া নিয়ে জিনাত নানা কিছু ভাবতে শুরু করেছে। হয়তো ও আর এখানে কাজ করবে না, গালাগালিটা হয়তো একটু বেশিই হয়ে গেছে, গাড়ি ভালো চালালে নতুন কাজ খুঁজে নেওয়া মোটেও কঠিন নয়। আর যা-ই হোক, মকবুল গাড়ি চালায় ভালো। কিন্তু কাজ ছেড়ে চলে যাবে! একবার বলেও যাবে না?

শেষ পর্যন্ত সেই দূরসম্পর্কের মামার কাছে ফোন করল জিনাত।

'মামা, মকবুল তো লাপাত্তা।'

'কেন, কী করেছিল? কিছু চুরি-টুরি করে...?'

মামার কথা শেষ হতে দেয় না জিনাত। সবিস্তারে খুলে বলে গতদিনের দুর্ঘটনার কথা। একটু গালাগালি করেছে এটাও বলে।

সব শুনে মামা কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে যান।

'আচ্ছা দেখি' বলে মামা শেষ পর্যন্ত ফোনটা কেটে দেন।

মামার শেষ কথাটায় একটু বিব্রত হলো জিনাত। মনে হলো, মকবুলকে বকাবকি করায় মামা নাখোশ হয়েছেন। কথাটার ভেতর তেমন কিছুর ইঙ্গিত ছিল।

রুবাই জিজ্ঞেস করল,

'মকবুল ভাই কি আর আসবে না মা?'

ওরা দুই ভাইবোনই শুনেছে, মকবুলকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।

ওর ফোন বন্ধ।

বিকেলের দিকে রূপম এসে জিনাতকে বলল,

'মা, মকবুল ভাইয়ের বাসার ঠিকানাটা দাও দেখি। একটু খোঁজ নিয়ে আসি।'

মকবুলকে যথেষ্ট গালাগালি করলেও গত চব্বিশ ঘণ্টায় জিনাত অনেকটা নরম হয়ে এসেছে।

তবুও বলল,

'থাক বাবা, যাওয়ার দরকার নেই। ও কাজ করতে চাইলে অবশ্যই আসবে।'

'না মা, আমি ভাবছি অন্য কথা। বাসায় ফেরার সময় ওর বিপদ-আপদও তো হতে পারে। আমরা শুধু আমাদের দিকটাই ভাবছি, ওর দিকটা কিন্তু আমরা কেউ ভাবছি না।'

তবুও বলল,

'আজ থাক, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে। কাল না হয় যাস্?'

রূপম চুপচাপ মেনে নিল মায়ের কথাটা।

কিন্তু বাইরে থেকে ওকে সুস্থির মনে হলেও ভেতরে ওর উত্তাল সাগরের অস্থিরতা। পড়াশোনায় মন বসাতে পারছে না, বই খুলতেই চোখে ভেসে উঠছে অ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্যটা।

পরদিন সকালে আমি আমার অফিসের ড্রাইভারকে পাঠালাম মকবুলের খোঁজ নিয়ে আসতে। কিন্তু ও ফিরে এসে যা বলল, তাতে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। বহু খোঁজাখুঁজি করে মকবুলের বাড্ডার বাসা উদ্ধার করেছে ও। এসব বাসার নম্বর থাকলেও তার চিহ্ন কোথাও দেওয়া নেই। ড্রাইভারটা যখন বাসা খুঁজে পেয়ে ওর বউয়ের কাছে মকবুলের খবর জানতে চাইল, তখন নাকি অবাক হয়ে ওর বউ ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল।

'উনি তো পরশু থাইকা আর বাসায় আসে নাই!'

'ফোন করেনি?'

'না। আমি বহুবার উনার ফোনে মিলাইতে চাইছি, মিলে না, কয় ফোন বন্ধ।'

'তাইলে কই গেল মকবুল? স্যার তো পরশু সন্ধ্যায় অরে ছুটি দিয়া দিছে।'

'আমি তো ভাবছি, উনারে নিয়া আপনারা ঢাকার বাইরে-টাইরে গেছেন। আগেও অমন হইছে।'

'কোনো খবর পায়া বাড়ি-টাড়ি যায় নাই তো?'

'বাড়ি গেলে তো আমারে কইয়াই যান্। আমার শ্বশুরজান অসুস্থ মানুষ, বয়স হইছে। কুনু খবর পাইয়া গেলে আমারে তো উনি কইয়াই যাইতেন।'

তার পর নাকি বউটা হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। ড্রাইভারটা মকবুলের বউকে আশ্বস্ত করে এসে আমাকে বিস্তারিত জানায়।

আমি অল্প কথায় জিনাতকে বিষয়টা জানিয়ে দিই।

জিনাত অস্থির হয়ে যায়।

'এই শোনো, তুমি লোকজন দিয়ে হাসপাতালগুলোতে একটু খবর নাও। রাস্তাঘাটে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেও থাকতে পারে। ইমার্জেন্সিতে খবর নিলেই জানা যাবে সব।'

একটু মিনতি করেই জিনাত আমাকে বলে। ওর গলাটাও কেমন ভারী ভারী মনে হয় আমার কাছে।

জিনাত কি কষ্ট পাচ্ছে? পেতেও পারে। মানুষের দুঃখ-কষ্টে, আপদে-বিপদে জিনাতের মতো সহমর্মী মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। সেদিন যে সে মকবুলকে বকাবকি করেছে, সেটা যে সে মন থেকে করেনি তা আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝেছি। তার ভেতরে সোহাগী অন্তর আছে বলেই মিথ্যা শাসন সে অবলীলায় করতে পারে।

আমি লোকজন লাগিয়ে হাসপাতালগুলোতে খবর নিলাম। কিন্তু মকবুল নামে কেউ এ দু'দিনে কোনো ইমার্জেন্সিতে যায়নি বা হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। মকবুল আহমেদ নামের বঙ্গবন্ধু হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে একজন পরশু রাতে এসেছিলেন, তবে তার বয়স ষাট। মকবুলের সঙ্গে বয়স মেলে না। ঢাকায় তো এখন আবার মহল্লায় মহল্লায় বেসরকারি হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, ওসব জায়গায় গিয়ে থাকলে তা আমার দ্বারা উদ্ধার করা সম্ভব নয় বলে আমি জিনাতকে জানাই। জিনাত বিষয়টা বোঝে।

আমি ওকে বলি,

'এখন অফিসের কাজ করি। রাতে বাসায় বসে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

রাতে খাবার টেবিলে জিনাতই কথা শুরু করে। সারাদিন যে ও মকবুলের বিষয়টাই ভেবেছে, ওটা আমি বুঝতে পারি।

'ওর গ্রামের বাড়িতে কি লোক পাঠানো যায়?'

আমি একটু চিন্তা করে উত্তর দিই।

'দেখো, বাড়িতে লোক পাঠালাম, ওকে পাওয়া গেল, তাহলে বিষয়টা নিয়ে আর ঝামেলা-টেনশন থাকল না, ঘটনার সমাপ্তি হয়ে গেল। কিন্তু যদি ও বাড়ি গিয়ে না থাকে তবে ওর বাবা, আত্মীয়স্বজন সবাইকে টেনশনে ফেলে দেওয়া হবে। বয়স্ক মানুষ ওর বাবা, এ ধরনের একটা খবরে কতটুকু বিচলিত হবে বুঝতে পেরেছ?'

আমার কথাটায় প্রচ্ছন্ন সায় দিল রূপম ও রুবাই।

'বাবা কিন্তু একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো কথা বলেনি, মা।'

জিনাত খুব স্বল্পসময়ে বিষয়টার সুরাহা চেয়েছিল। ওর বদ্ধমূল ধারণা, মকবুল বাড়ি চলে গেছে। কেন গেছে, কখন আসবে, ফোন বন্ধ কেন এসব দ্বিতীয় স্তরের বিবেচনার বিষয়।

কিন্তু আমার উত্তরটা শোনার পর ও আমার কথাটার গুরুত্ব বুঝল।

'তাহলে আমরা কী করতে পারি?'

'আরও দু-তিনটি দিন অপেক্ষা করা যেতে পারে।'

আমি খুব স্বাভাবিকভাবে বললাম। আমাকে স্বাভাবিক দেখলে জিনাত স্বস্তি পায়। আমি কথার ধরনে সে পথটাই বেছে নিলাম। তবুও বললাম,

'ওর বায়োডাটা থেকে ওর বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে লিখে দাও। সময়মতো লোক পাঠাব।'

জিনাত খাওয়া শেষ করে ওর ফাইল থেকে মকবুলের স্থায়ী ঠিকানাটা কাগজে লিখে আমাকে ধরিয়ে দিল। আমি কাগজটা ভাঁজ করে আমার মানিব্যাগে রেখে দিলাম।

রাতে বিছানায় গিয়ে মনে হলো, সকালে হয়তো দেখব কলিংবেল বাজছে, মকবুল দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথা চুলকে বলছে,

'স্যার, বাবার অসুখের খবর পেয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। মোবাইলটা চুরি হয়ে যাওয়ায় আপনাদের খবর দিতে পারিনি। সরি স্যার।'

কিন্তু সকালটা তেমন হলো না। সব ভাবনার সঙ্গে বাস্তবতার মিল ঘটে না।

নাশতা খেতে খেতে ওয়ার্কশপে খবর নিলাম। মালিকটা বলল, সব কাজ নাকি শেষ হয়েছে, এখন ডেন্টিং-পেন্টিং বাকি। আরও দু-তিন দিন লাগবে।

'দু-তিন দিন!'

'দেখি স্যার, যত তাড়াতাড়ি পারি, করে দিচ্ছি।'

গাড়িটা চার বছর আগে খুব প্রয়োজনীয় মনে করে জিনাত কিনেছিল।

আমি যখন বলেছিলাম,

'একটা গাড়ি কেনা যায় এখন তোমাদের জন্য। পছন্দ করে কিনে নাও।'

মধ্যবিত্তের জীবনে গাড়ি একসময় শখের বস্তু থাকলেও এখন প্রতিদিন গাড়ির প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠছে। বাসে ওঠা যায় না, ট্যাক্সি পাওয়া যায় না সময়মতো, রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রূপম-রুবাই তখন ট্যাক্সি-বাস, যখন যেটা রাস্তায় পাওয়া গেছে, সেটাতেই স্কুল-কলেজে চলে গেছে। জিনাত সপ্তাহে দু'দিন বেরোত। কাজের লিস্ট তৈরি করে রাখত। যেদিন বেরোত, সেদিন আমি অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দিতাম। সেটা কখনও কখনও সম্ভব না হলে জিনাত হলুদ ক্যাব ডেকে সেটাতেই বেরিয়ে পড়ত। সে সময় জিনাত ক্যাব-ট্যাক্সির অভাবে বাসেও উঠেছে, এটা আমাকে সগর্বে জানিয়ে দিত।

আমি গাড়ি কেনার কথা বলতে জিনাত তাই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। গাড়ির পেছনে মাসে মাসে যে খরচ হবে, সেটা আমি হিসাব করেই বলেছিলাম। আমার তখন একটা প্রমোশন হয়েছিল চাকরিতে। প্রমোশন মানেই নতুন উচ্চতর পদ ছাড়াও আর্থিক দিক দিয়ে মোটামুটি একটা ভালো প্রাপ্তি ঘটে। সে প্রাপ্তি থেকেই আমি সাহস করেছিলাম গাড়ি কেনার। মধ্যবিত্তের জীবনে অনেক শখ থাকে, সব শখই অর্থসংশ্লিষ্ট। ফলে এই জীবনে সব শখ পূরণ হয় না। মধ্যবিত্তের জীবন মানেই হাহাকারের জীবন। একটা স্বপ্ন পূরণ হলে আরেকটা স্বপ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমাদের জীবনে গাড়িটা তখন আর স্বপ্নের বা শখের পর্যায়ে ছিল না, প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আমি নিজে অফিসের গাড়িতে আসা-যাওয়া করলেও আমার পরিবারের আর তিনটি মানুষ বর্ধিষ্ণু ঢাকা মহানগরীর যানজট, ভোগান্তি আর নানা উপদ্রবে কীভাবে চলাচল করে, তা আমাকে দুশ্চিন্তায় রাখত সারাক্ষণ।

নয়াপল্টনের গাড়ির শোরুমগুলোতে আমি আর জিনাত ঘুরেছিলাম কয়েক দিন। ওসব জায়গায় রি-কন্ডিশন্ড গাড়ি দেখেশুনে কেনা যায়। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে যেসব শোরুম আছে, ওখানে প্রায় সবই নতুন গাড়ি আমদানি করে রাখা হয়। নতুন গাড়ির অনেক দাম। আর কারও না হলেও আমার জন্য ছিল নাগালের বাইরে। গাড়ি কিনতে গিয়ে মুম্বাইয়ের 'বাগবান' ফিল্মটার কথা মনে পড়ছিল আমার। রিটায়ার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অমিতাভের বেঁচে থাকার অবলম্বন ছিল না, কিন্তু শোরুমের মালিকটা তাকে গাড়ি চালিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ এবং শেষতক বাধ্য করে। অমিতাভ গাড়িটা চালিয়ে এসে চাবি ফেরত দিতে গেলে তাকে গাড়ির দরদাম করার জন্য মালিক অফিসে আমন্ত্রণ জানায়। অমিতাভ যখন বলে যে, এ গাড়ি কেনার সাধ্য তার নেই, তখন শোরুম মালিক তাকে এমন ভাষায় অপমান করে যে স্ত্রীর সামনে সে অপমান সহ্য করার মতো ক্ষমতা অমিতাভের ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দীর্ঘদিন পর দেখা পাওয়া তার পালক পুত্র সালমান খান সেই গাড়িটা কিনে এনে তার পিতা-মাতাকে উপহার দেয়।

আমি তাই জিনাতকে বলেছিলাম, শোরুমওয়ালারা গাড়ির দরজা খুলে ফিরিস্তি দেওয়ার আগেই আমরা গাড়ির দাম জেনে নেব। আমাদের নাগালের মধ্যে হলেই তখন আমরা গাড়ি খুলে দেখব, ড্রাইভারকে দিয়ে চালিয়ে পরীক্ষা করাব, সরাসরি অপমানিত হওয়া ঠিক হবে না।

জিনাত সেটাই করেছিল।

রূপম ও রুবাই তখন মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে। গাড়িতে কলেজ যেতে পারবে, এতেই ওরা মহাখুশি। পনেরশ' সিসির ঝকঝকে সাদা রঙের গাড়িটা আমারও খুব পছন্দ হয়েছিল। আসলে জিনাতের চয়েস এবং ভাগ্য দুটোই ভালো ছিল। পছন্দসই গাড়িটা আমি আমার সাধ্যের ভেতর কিনতে পেরেছিলাম। পরে আত্মীয়স্বজনরা বলেছিল, আমরা নাকি গাড়িটা কিনে জিতে গেছি।

সাদা গাড়ি বলে ড্রাইভারের প্রতি জিনাতের নির্দেশ ছিল, প্রতিদিন গাড়িটা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে, সপ্তাহে একদিন শ্যাম্পুওয়াশ, মাসে একদিন পলিশ এবং তিন মাস অন্তর সার্ভিসিং অবশ্যই করতে হবে। ড্রাইভার যেন তাকে বিষয়গুলো মনে করিয়ে দেয়, যদি দৈবাৎ সে ভুলেও যায়। কাজগুলো নিয়মিত প্রতিপালন করায় গাড়িটা বহুদিন নতুন গাড়ির মতোই মনে হতো। তার পর একসময় টুকটাক কাজ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু এবার যে ক্ষয়ক্ষতি গাড়িটার হলো, আগে কখনও এমন হয়নি।

রূপম যখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ করেছিল, তখন সে এই গাড়িটা দিয়ে ড্রাইভিং প্র্যাকটিস শুরু করেছিল। সব বাড়ির ছেলেদের মনে হয় এমনই হয়। বাইরে কাজের নাম করে ড্রাইভারকে নিয়ে ও খোলা মাঠে চলে যেত, তারপর শুরু করত ড্রাইভিং প্র্যাকটিস। ড্রাইভার এটাকে সহজভাবেই নিয়েছিল। ভেবেছিল, যাদের গাড়ি তারা যদি প্র্যাকটিস করে, তার কী বলার আছে? কিন্তু কয়েক দিন যেতেই জিনাতের কানে আসে বিষয়টা। এ জন্য রূপমকে কড়া শাসন করে সে এবং ড্রাইভারের প্রতি কড়া নির্দেশ জারি করে, তার অনুমতি ছাড়া গাড়ি যেন অনুশীলনীর সামগ্রীতে পরিণত করা না হয়। তার শাসনের ভাষায় অবশ্য ছেলেকে নিরুৎসাহিত করার প্রয়াস ছিল না। বলেছিল, 'ড্রাইভিং শিখতে হলে ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়ে শিখবে, এতে গাড়ি চালনা সহজভাবে শেখা যায় এবং সড়কে যানবাহন চলাচলের আইন-কানুন জানা যায়। আকাশ উদার হওয়ার শিক্ষা দিতে পারে সত্য, কিন্তু সব শিক্ষা প্রকৃতি দিতে পারে না। গাড়ি চালানোর কৌশল বা পদ্ধতি এবং আইন-কানুন জানতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান কেন্দ্র থেকে। তবে তা হবে প্রকৃত এবং টেকসই শিক্ষা।'

রূপম মাথা নিচু করে মায়ের শাসন হজম করেছিল এবং তার পর থেকে বাসার-গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত দেয়নি সে। ড্রাইভার গাড়ির চাবি রূপমের হাতে দেওয়ার কথা আর মনেও আনেনি।

সকালে বাসায় মনটা খারাপ থাকলেও অফিসে এসে কাজের চাপে মন খারাপের বিষয়টা হারিয়ে যায়। বেসরকারি অফিসের কাজের নিয়মটাই এমন। এখানে একটি মুহূর্ত অপচয় করার সুযোগ নেই। কাজের সিস্টেমটা এমনভাবে গড়ে ওঠে যে চক্রের ভেতর নিজেকে ফেলে দিতে হয়, কাজ

স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিস্কুট-পাউরুটির মতো ফিনিশ্‌ড প্রোডাক্ট হয়ে বেরিয়ে আসে।

হঠাৎ সেলফোনটা বেজে ওঠে। আমি চোখ ঘুরিয়ে তাকাই। আমি জিনাতের ফোনকলকে মুহূর্তে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে ফেলি। হাতের কাগজগুলো পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে ফোনটা কানের কাছে ধরি।

'হ্যালো।'

'এই, তোমার রুমে কি টিভি চলছে?'

টিভি সেট আমার রুমে একটা আছে বটে, কিন্তু চালিয়ে দেখার সুযোগ আমার হয় না।

'না। কেন, কী হয়েছে?'

'না, স্ক্রলে একটা খবর দেখাচ্ছে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর।'

মকবুল কি কোনো ক্রাইসিস সৃষ্টি করল আমাদের পরিবারে?

'কী দেখাচ্ছে?'

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলি।

'ক্যান স্যার? মকবুলের কোনো খবর মিলছে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। টিভির স্ক্রলে নাকি দেখাচ্ছে টঙ্গীর তুরাগ নদী থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবকের বস্তাবন্দি লাশ পুলিশ উদ্ধার করেছে। নাম-পরিচয়হীন যুবকের গলিত লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ টঙ্গী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রেখেছে।'

ড্রাইভারটা আঁতকে ওঠে।

'মকবুলের লাশ!'

'নাম-পরিচয়হীন যুবকের লাশ মকবুলের লাশ কীভাবে হয়? তোমার মাথায় একটু ঘিলুও নেই?'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে জিহ্বা কামড়ে ধরে সে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় যাওয়ার তাগিদ দিয়ে ডুবে যাই কাজে। ভুলে যাই চিন্তা করতে, লাশটা মকবুলের লাশও তো হতে পারে!



আমার প্রশ্নে জিনাত আমাকে যা বলল, তা যথেষ্ট ভাবনা উদ্রেক করার মতো।

আমি জানতে চাইলাম,

'কী করতে চাও এখন?'

'হাসপাতালের মর্গে একটু যেতে চাই। যাবে তুমি?'

আমার জন্য এখন অফিস থেকে বের হওয়া মুশকিল। তা ছাড়া চেয়ারম্যান সাহেব অফিসেই আছেন, কখন কী কাজে ডাক দেন তার কি ঠিক আছে? আমি একটু আমতা আমতা করি। ফোনের ভেতর দিয়ে জিনাত আমার কথা বুঝতে পারে।

'আমি তাহলে একলাই যাই। তুমি গাড়িটা একটু পাঠিয়ে দাও। নাকি সেটাও দেওয়া যাবে না?'

জিনাতের এমন কথার পর গাড়ি না পাঠিয়ে উপায় আছে? আমি ড্রাইভারকে ডেকে বেগম সাহেবকে টঙ্গী

জিনাত যখন টঙ্গী থানায় পৌঁছে, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

ওসি সাহেব ছিল না। সেকেন্ড অফিসার লাঞ্চ সেরে পানের একটা খিলি মুখে ঢুকিয়ে চেয়ারে বসে বসে দিবানিদ্রাটা সেরে নেওয়ার জন্য টেবিলের ওপর সটান পা তুলতে যাচ্ছিল, অমনি জিনাতকে দেখে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসে।

'অ্যানি প্রবলেম ম্যাডাম?'

জিনাত সামনের চেয়ারটায় মুখোমুখি বসে। তার মুখভরা উদ্বেগ দেখে যে কোনো মানুষ যে প্রথমে এ প্রশ্নটাই করবে, তা বলা বাহুল্য। থানায় একটা ঝিমধরা ভাব, কেমন শান্তশিষ্ট চারপাশ। টঙ্গী শিল্পাঞ্চল নিয়ে গঠিত থানায় এমন নিরামিষ ভাব চিন্তাই করা যায় না। এসব থানায় দালাল,

মাস্তান, ইনফরমার আর ৫৪ ধারায় আটক করা মানুষজনের আত্মীয়স্বজনের ভিড়ে হাঁটার জন্য জায়গা পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। কেমন একটা গুজগুজ-ফিসফিস শব্দ হয়, করমর্দনের আড়ালে হাতবদল হয়ে যায় ভারী ভারী নোট।

জিনাত টিভি-স্ক্রলের তথ্যটা বলতেই সেকেন্ড অফিসার গা-ঝাড়া দিয়ে বলে ওঠে,

'আপনার কোনো রিলেটিভ?'

জিনাত হ্যাঁ-না জবাবের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলে,

'আমি মর্গে গিয়ে লাশটা একটু দেখতে চাই।'

'লাশ দেখে কি চেনার আছে কিছু? তিন-চার দিনের বস্তাবন্দি লাশ, পচে-গলে একাকার হয়ে গেছে। তবে পরনের কাপড়চোপড় ঠিক ছিল। লাশ শনাক্ত করা যায় এমন কোনো কাগজপত্র আমরা কোনো পকেটে পাইনি।'

'কাপড়চোপড়গুলো কি এখানে আছে? দেখা যাবে?'

দেখায়া দিবা। গার্ডরে বলবা, আমি পাঠাইছি। বুঝছ মিয়া?'

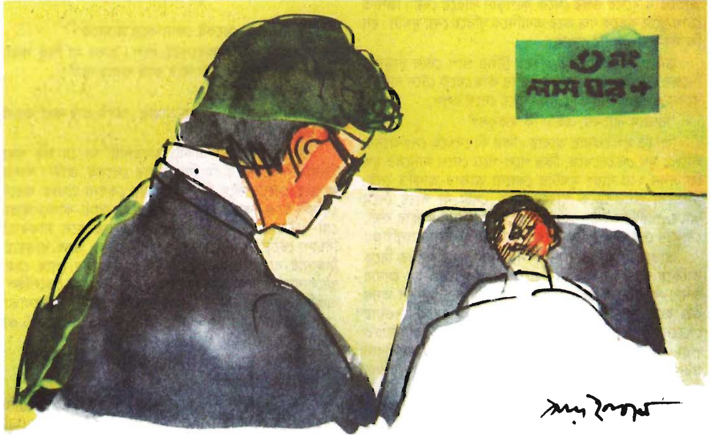
মাথা নাড়ায় আশুতোষ।

জিনাত উঠে দাঁড়ায়।

সেকেন্ড অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত হেঁটে এসে গাড়িতে ওঠে। আশুতোষ ড্রাইভারের বাঁ পাশের সিটটায় বসে।

টঙ্গীর কিছুই জিনাত চেনে না। কোনোদিন কি এসেছিল? মনে পড়ে না। সবটাই ওর কাছে নতুন। ড্রাইভারটা চেনে, ও-ই নিয়ে এসেছে থানায়।

আশুতোষকে পথঘাট বলে দিতে হলো না। ড্রাইভার হাসপাতালের পাশ দিয়ে পৌঁছে গেল মর্গে। গাড়ি থেকে নেমে মর্গের কল্যাপসিবল গেটের সামনে দাঁড়াতেই প্রথমে স্যাভলনের গন্ধ, তারপর মড়ার গন্ধ এসে লাগল জিনাতের নাকে। বমি হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। হাতব্যাগ খুলে দ্রুত রুমালটা বের করে নাকের ওপর চেপে ধরল সে। আশুতোষ



'জি না ম্যাডাম। ময়নাতদন্তের জন্য ওগুলো আমরা মর্গে জমা দিয়ে এসেছি। ময়নাতদন্ত হয়ে গেলে ওগুলো আমরা সিজ করে একটা আনন্যাচারাল ডেথের মামলা করে থানায় রেখে দেব।'

জিনাত উশখুশ করতে থাকে।

পুলিশটা বলে,

'আপনি মর্গে যাবেন?'

জিনাত মাথা নাড়ে।

'তাহলে আমি একজন কনস্টেবল দিয়ে দিই আপনার সঙ্গে। ও গিয়ে আপনাকে দেখাক।'

বলেই সেকেন্ড অফিসার বেল টেপে।

বুড়োবয়সী এক কনস্টেবল এসে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ায়।

'শোনো আশুতোষ, ম্যাডামকে নিয়ে তুমি মর্গে যাবা। গত রাইতে যেই লাশটা নদী থাইকা তুইলা আনলাম, ওইটা

সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডিউটিরত গার্ডের সঙ্গে কী সব কথা বলল, ড্রাইভারটাও এসে পিছে দাঁড়াল ওর।

লাশ হয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলোর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মনে হয় বেশি কথাবার্তা বলতে নেই, যারা মর্গে আসে তারা বুকভরা কষ্ট নিয়েই আসে, তাদের কষ্টের ভার বাড়ানো ঠিক নয় ভেবেই হয়তো গার্ডগুলো অনেকটা নিস্পৃহ থাকে। তারাও মুখের ওপর কষ্টের সিলমোহর বসিয়ে নেয়। এই গার্ডটাকে দেখে জিনাতের তেমনই মনে হলো। পকেট থেকে চাবি বের করে গার্ড তালাটা খুলে গেটটা সরিয়ে দিল দু'পাশে।

ভেতরে গন্ধটা আরও তীব্র। শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। এগিয়ে যাওয়ার সময় পাশের রুমটায় জিনাত খেয়াল করল, মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে কয়েকটা লাশ। চার-পাঁচটা তো হবেই। ভালো করে গুনে দেখার সময় এটা নয়।

নদী থেকে উদ্ধার করা লাশটা যদি মকবুলের হয়ে থাকে,

তবে জিনাত কীভাবে সামাল দেবে নিজেকে? কী করতে হবে তাকে? ও কি কিছু না বলেই চলে যাবে? বাসায় গিয়ে মকবুলের বউয়ের কাছে সংবাদটা পৌঁছে দিয়ে দায়মুক্তি নেবে? মকবুলের এই মৃত্যুর জন্য সে কি কোনো কারণ হতে পারে? সে কি প্ররোচনাকারী হবে? ইংরেজিতে যাকে প্রোভক করা বলে?

কয়েক মুহূর্তে নানা প্রশ্ন এসে জাপটে ধরে জিনাতকে। হঠাৎই সে যেন থমকে দাঁড়ায়। পা দুটো আর চলতে চায় না। মনে হয়, শরীর থেকে পা দুটো তার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ঠিক পড়ে যাওয়ার আগে জিনাত পাশের দেয়ালটা ধরে সামলে নেয় নিজেকে।

আশুতোষ সামনের রুমটার দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দেয়।

'ম্যাডাম আসেন।'

ততক্ষণে মর্গের সিমেন্ট করা মেঝেতে ফিরে এসেছে জিনাতের পা। সে একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে রুমটায় ঢোকে। ট্রলির ওপর সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা লাশটা। আশুতোষ মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দেয়। জিনাত চোখ দুটো কুঁচকে বন্ধ করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয় মুখটা। সে কি মকবুলের মুখটা দেখল?

ড্রাইভারটা আরেকটু এগিয়ে ট্রলির পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। নিজের হাতেই সাদা কাপড়টা গলার কাছ থেকে টেনে নামিয়ে বুকের ওপর রাখে। তার পর খুঁটিয়ে দেখে বলল,

'ম্যাডাম দ্যাখেন, এইটা কি মকবুল?'

জিনাত মুখ ফেরায় আবার। কিন্তু কী দেখছে সে? অনেক লাশের মুখ সে দেখেছে, কিন্তু গলে-পচে গেলে মানুষের মুখ কি এমন হয়ে যায়? মুখটার কোনো আকার-আকৃতি নেই, চুলগুলো ওপর দিকে থাকার কথা, সেটা বাঁ পাশে নেমে আছে, শারীরিক গঠন অনুযায়ী যে অঙ্গ যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। মনে হচ্ছে খাবলে খাওয়া একদলা মাংসপিণ্ড।

আশুতোষ লাশটার দিকে নয়, ম্যাডামের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ড্রাইভারের প্রশ্নে তার কি উত্তর হয় জানার জন্য। লাশটার পরিচয় পাওয়া গেলে তাদের পুলিশি তদন্ত শুরু হবে। খুন করে বস্তায় ঢুকিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়ার পেছনে যে বিরাট একটা কাহিনী আছে, সেটা তো নিশ্চিত সত্য। তদন্ত শুরু হওয়া মানেই লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু। নানান কিসিমের লোক তখন থানায় আসা-যাওয়া শুরু করে। স্যারদের মুখে হাসি ঝিলিক মারে।

কিন্তু জিনাত কোনো মন্তব্য করল না।

মর্গে ঢোকার সময় সেই যে সে রুমালটা নাকের ওপর ঠেসে ধরেছিল, সেটা আর সরায়নি। সে সরে আসে দরজার কাছে।

'লোকটির পরনের কাপড়গুলো কি দেখা যাবে?'

কনস্টেবল আশুতোষের কাছে জানতে চায় জিনাত।

'জি, যাবে।'

বলেই সে জিনাতকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে অফিস রুমের দিকে যেতে থাকে। ওরাও ওর পিছু নেয়। অফিসে ঢুকে আশুতোষ কী সব নম্বর-টম্বর বলে। কর্মচারী লোকটা রেজিস্টার খুলে নম্বর মেলায়। তারপর ড্রয়ার টেনে চাবি নিয়ে একটা আলমারি খোলে। আলমারির ভেতর হালকা একটা দৃষ্টি যায় জিনাতের। তাকের ওপর পলিব্যাগে মোড়ানো আলাদা আলাদা নম্বরের ট্যাগ করা সব জিনিসপত্র। একটা পলিব্যাগ নামিয়ে নিয়ে আসে লোকটা। তার পর হাতে গ্লাভস পরে পাশের টেবিলের একটা ট্রের ওপর ব্যাগ থেকে বের করে একটা শার্ট আর একটা প্যান্ট রাখে। সাদা ফুলহাতা শার্ট, প্যান্টটা কালো রঙের। মকবুল এ ধরনের কাপড় পরে, ঠিক আছে; কিন্তু যেদিন সন্ধ্যায় ও শেষবারের মতো বেরিয়ে যায় ওদের বাসা থেকে, তার পর থেকে লাপাত্তা, সেদিন কি সে এই পোশাক পরে ছিল? জটিল ভাবনায় জড়িয়ে যায় জিনাত।

ড্রাইভারটা বলে,

'কাপড় দেইখা তো ম্যাডাম মকবুলের কাপড়ই লাগে।'

'তোমার কি মনে হয় ও যেদিন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে সন্ধ্যায় তোমার গাড়িতে করে ওয়ার্কশপ থেকে এসেছিল, সেদিন কি ও এই শার্ট-প্যান্ট পরে এসেছিল?'

'জি ম্যাডাম, একেবারে কনফার্ম।'

হু-হু করে ওঠে জিনাতের বুক। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না সে। মাথাটা ঘুরে ওঠে। সবকিছু কেমন অন্ধকার ঠেকে। গলাটা শুকিয়ে যায়। ড্রাইভারকে ইশারা করে দ্রুত ও বেরিয়ে আসে মর্গ থেকে। ড্রাইভার ম্যাডামের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় হাসপাতাল থেকে। আশুতোষ কিছু জানার সুযোগ করতে পারে না আর।

জিনাত রাস্তা থেকেই ফোন করে আমাকে।

'শোনো, ওটা মকবুলেরই লাশ। এখন যা কিছু করার তুমি করো। আমার মাথা আর কাজ করছে না।'

'দেখি কী করা যায়।'

বুকটা ধড়াস করে ওঠে আমার। আমি আর কথা বাড়াই না, ফোনটা কেটে দিই।

জিনাতের ভেতর একটা মমতাময়ী মা যে সব সময় ক্রিয়াশীল, সেটা আমি বিয়ের পর থেকেই জানি। বাসার কাজের মেয়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের কোনো তফাত করতে দেখিনি ওকে। কাজের মেয়ের জন্যও সে জামা-কাপড়-জুতা-স্নো-পাউডার সবকিছু কেনে। ওদের জ্বর হলে মাঝরাতে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে মাথায় পানি ঢালে, ওষুধ খাওয়ায়, বিছানায় বসে থাকে। বুঝতে পারি, যত দিন গেছে স্নেহ-ভালোবাসায় রূপম আর মকবুলকে সে এক করে ফেলেছিল। একদিন বলেছিল, 'জানো, মকবুলের বাবা নাকি মুক্তিযোদ্ধা, খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা, বীরপ্রতীক, সরকারি গেজেটে ওর বাবার নাম আছে।'

উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল জিনাতের মুখটা।

আমি বলেছিলাম,

'যুদ্ধ তো আমিও করেছিলাম, যদিও অস্ত্রের ট্রেনিং করিনি। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের দলের সঙ্গেই ছিলাম, ছোট ছিলাম বলে আমি খেতাব পাইনি, এই যা।'

বিয়ের পর প্রথম রাতে জামা খুলে পিঠের নিচের দিকে চার ইঞ্চি লম্বা একটা কাটা দাগ দেখিয়ে ওকে বলেছিলাম,

'এটা কিসের দাগ জানো?'

'কিসের?'

'মুক্তিযুদ্ধের।'

'কী হয়েছিল?'

'পাকিস্তানিদের বাঙ্কার থেকে গুলির বাক্স চুরি করে নিয়ে রাতের বেলা পালিয়ে আসার সময় ওদের এলোপাতাড়ি গুলির একটা এসে পিঠে লেগেছিল। আমাদের দলের খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ভাই আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে চার মাইল পথ রীতিমতো দৌড়ে নিয়ে গিয়েছিল সীমান্তের মেডিকেল সেন্টারে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আমার জীবন নাকি তখন যায় যায়। ডাক্তারদের অক্লান্ত চেষ্টায় আমি বেঁচে যাই। প্রায় পঁচিশ দিন পর আমি সুস্থ হয়ে ফিরে এসে দলের সঙ্গে যোগ দিই।'

আমার আহত হওয়ার গল্প শুনে সে রাতে খুব আহা-উহু করেছিল জিনাত। শফিকুল ভাইকে স্মরণ করে সালাম জানিয়েছিল।

এখন সে আর ওটা বিশ্বাস করে না। হাসতে হাসতে বলে,

'যুদ্ধ না ছাই করেছ। কোথায় গুলি লাগবে বুকে, তেনারটা লাগে পিঠে। পলাতক সৈনিকরা আবার মুক্তিযোদ্ধা হয় কী করে?'

জিনাতের ফোনটা পাওয়ার পর থেকে কাজে আর মন বসাতে পারছি না। যদিও মকবুলের সঙ্গে আমার কথাবার্তা তেমন খুব একটা হতো না; কিন্তু ওর মৃত্যুর খবর শুনে ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি হতে থাকে। আমি ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ও এলেই আমি বাসায় চলে যাব। রূপম ও রুবাইকেও জিনাত খবরটা জানিয়েছে। যে মামা মকবুলকে তার কাছে দিয়েছিল, তাকেও জানায় সবকিছু। খবরটা শোনার পর থেকে রূপম হাউমাউ করে কাঁদছে আর চিৎকার করে বলছে, 'মম, আই অ্যাম গিল্টি মম, আই অ্যাম গিল্টি।'

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আসি আমি। মামাও আসেন। সবাই মিলে বসে পরামর্শ করি, আমাদের কী কী করণীয় আছে। সিদ্ধান্ত হয়, আমার ড্রাইভার যেহেতু বাসা চেনে, সেহেতু ও গিয়ে মকবুলের বউ-বাচ্চাকে আমার বাসায় নিয়ে আসবে। অফিস থেকে রিকুইজিশন দিয়ে আরও দুটো গাড়ি এনেছি আমি। ওর বউ এলে তাকে বিষয়টা জানানো হবে। ধাক্কাটা সামলে উঠলে মামা ওর বউকে সঙ্গে নিয়ে টঙ্গী থানায় যাবে লাশটা গ্রহণ করার জন্য। পুলিশ মামলা করতে বললে সেটাও করবে। টঙ্গীতে মামার এক বন্ধু আছেন, তিনিও থানায় আসবেন। লাশ যেহেতু মকবুলের গ্রামের বাড়ি জামালপুরে দাফন করা হবে, সেহেতু কফিনের ব্যবস্থা করে একটা অ্যাম্বুলেন্সে বা ফ্রিজার ভ্যানে ঢাকায় আমার বাসায় আনা হবে, সেখান থেকে পরে আমরা সবাই যাব জামালপুরে। মামা বললেন, ওর বাবাকে মৃত্যুর খবরটা দেওয়া ঠিক হবে না, বলতে হবে মকবুল অসুস্থ। আর অন্য আত্মীয়দের বলতে হবে দাফন-কাফন-জানাজার ব্যবস্থা করে রাখার জন্য।

আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে গেল মকবুলের বউ-বাচ্চাকে নিয়ে আসতে। জিনাতের এখন রান্না করার মতো মানসিক অবস্থা নেই। রুবাই বলল, ও রুটি বানাতে পারবে। কালকের রান্না করা গরুর গোশত আছে, সবজি আছে, সবাই খেয়ে নিতে পারলে ওর অসুবিধা নেই।

মামা বললেন,

'আমি রাতে রুটিই খাই। বানাও নানু, আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

রুবাই রান্নাঘরে চলে গেল।

আমি টেলিফোন করে চেয়ারম্যান সাহেবকে বিস্তারিত বললাম।

দু'দিনের ছুটি চাইলাম। তিনি মঞ্জুর করে দিলেন। দুটো গাড়ি অন-পেমেন্ট জামালপুর নিয়ে যেতে চাইলে তিনি না করলেন না। শুধু বললেন,

'যেহেতু লাশের গাড়ির সঙ্গে যাবেন, ড্রাইভারকে একটু সাবধানে চালাতে বলবেন।'

মকবুলের বউ নার্গিস ভেবেছিল, আমার বাসায় এসে মকবুলকে দেখবে অথবা অসুস্থ থাকার কোনো খবর পাবে; কিন্তু জিনাত যখন ওকে মকবুলের মৃত্যুর খবর দিল তখন নার্গিসের কান্না আর চিৎকারে হাহাকার করে উঠল আমার বাসা।

তার বুকফাটা আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল চারপাশের বাতাস। তার মাথায় পানি দেওয়া হলো। পরে একটু সুস্থির হলে আমি নার্গিসের কাছে জানতে চাইলাম, মকবুলকে হত্যা করতে পারে এ রকম কোনো আশঙ্কার কথা সে মকবুলের কাছে কখনও শুনেছিল কি না।

'না ছার, না। কহনও শুনি নাই। আমারে কয় নাই কিছু।'

মামাকে বললাম,

'মামা, থানা কিন্তু ওর স্টেটমেন্ট নেবে মামলা করার জন্য। আপনি ওসিকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। বলবেন, লাশ দাফন করে এসে পুলিশের সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তা ছাড়া ওর দাফনের জন্য যেহেতু আমরা ওর গ্রামের বাড়ি যাব, ওখান থেকেও কিছু জানা যেতে পারে।'

মামা নার্গিসকে নিয়ে যখন টঙ্গী থানায় পৌঁছালেন, তখন রাত ৯টা পেরিয়ে গেছে। মামা তার বন্ধুকে পেয়ে গেলেন ওসি সাহেবের রুমে। বন্ধুটি অনেক কাজ প্রায় গুছিয়ে রেখেছিলেন। থানায় কাজ হয়ে গেলে যেতে হবে হাসপাতালের হিমঘরে। লাশের ময়নাতদন্ত হয়ে গেছে। থানা বলছে, রিপোর্ট নাকি ওদের হাতে আসেনি। পেলে বোঝা যাবে, কীভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মোটিভ জানার জন্য পরিবারের লোকজনের সহায়তা দরকার। তা ছাড়া বাড়িঘর, কর্মক্ষেত্র এসব জায়গায় ব্যাপক তদন্ত করে ওরা মোটিভ জানার চেষ্টা করবে।

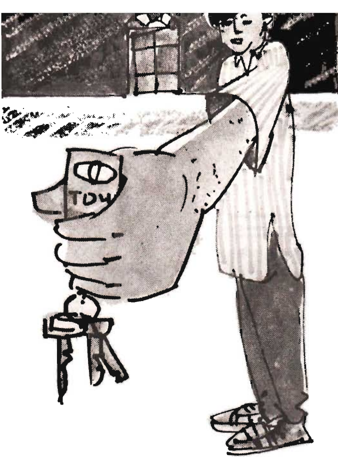
ফাইল চালাচালি হলো ঘণ্টাখানেক। ওসির গার্ডটা একটা কনস্টেবল বোধ হয়। একবার ফাইল নিয়ে ঢুকছে একবার বেরোচ্ছে। এ ধরনের কাজে এলেও নানা নিয়মনীতি অনুসরণ করে কাজ করতে হয়। মামা দেখছিলেন সব। তার কাছে বিষয়টি নতুন মনে হলেও থানার পুলিশকে এ ধরনের কাজ নিয়মিত করতে হয়।

সব কাজ যে দ্রুততার সঙ্গে হয়েছে, এটি হয়েছে মামার বন্ধুটির জন্য। তিনি ঢাকার একটি প্রভাবশালী দৈনিকের গাজীপুর প্রতিনিধি। ওসি সাহেবও তাকে খুব খাতির করে কাজ করছিলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কয়েক দফা চা-বিস্কুটও হয়ে গেছে। কনস্টেবলটা হাসিমুখে সব করে যাচ্ছে; বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই ওসি সাহেবের মুখে। লাশটার সব ছাড়পত্র ক্লিয়ার করে হিমঘর থেকে বের না করা পর্যন্ত পুলিশের সব কাজ শেষ হবে না। সাংবাদিকদের একটু তোয়াজ করে না চললে কাজ করা মুশকিল, ট্রান্সফারের কাগজ এসে হাজির হবে মেইলে, নতুবা ফ্যাক্সে।

সেকেন্ড অফিসার সব কাগজ মামার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'স্যার, লাশটা নিয়ে ফেরার সময় একটু থানা হয়ে যাবেন। লাশটা যে বুঝে পেলেন, তার জন্য একটা স্বাক্ষর করতে হবে রেজিস্টারে।' কী মনে করে মামার বন্ধু মানে সাংবাদিকের চোখে চোখ পড়ল তার, তখন সে আবার বলা শুরু করল,

'স্যার, এই রেজিস্টারটা আমরা থানার বাইরে নিতে পারি না। অবশ্য আপনি বললে সেটা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে হাসপাতালে যেতে পারি।'

মামা 'না-না, দরকার নেই, আমরা আবার আসছি' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনজন। হাসপাতালের হিমঘরে বেশি সময় লাগল না। মাত্র ১০ মিনিট। কিন্তু এটাও লাগত না, যদি না হিমঘরের চাবি থাকে যে লোকের কাছে, সে উপস্থিত থাকত। মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো সে বলল,



'আমি স্যার দুঃখিত। বাসায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওসি স্যার আমাকে ফোনে ডেকে তুলে পাঠিয়েছেন। যদিও আমি স্যার হাসপাতালের কোয়ার্টারেই থাকি। সরি স্যার, দুঃখিত স্যার।'

মামা মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন, নার্গিসকে তিনি লাশ দেখতে দেবেন না, কবরে শোয়ানোর আগ পর্যন্ত। দেখাদেখি-কান্নাকাটি যা হওয়ার তা জামালপুরেই হবে। এখানে লাশ দেখালে তাকে নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। নার্গিস মাথার দিকের বাঁধনটা একটু খুলে মুখটা দেখতে চেয়েছিল। এখন হাতে সময় নেই জাতীয় কথা বলে তিনি নার্গিসকে নিরস্ত করেছিলেন।

লাশবাহী ফ্রিজারটি নিয়ে থানার সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে স্বাক্ষর করল নার্গিস বুঝে পাওয়া রেজিস্টারে। এমন মানসিক অবস্থায় অশিক্ষিত মানুষ স্বাক্ষর করলে যা হওয়ার তাই হলো। মামা তো বুঝলেন না, সেকেন্ড অফিসারও কিছু বুঝল না। কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা অঙ্কিত হয়ে থাকল রেজিস্টারে।

মামা তার বন্ধুকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন। নার্গিস কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে গাড়িতে বসল, মামা গাড়ির দরজা খুলে উঠতে যাওয়ার মুহূর্তে ছুটে এলো ওসির গার্ডটা।

'স্যার, কিছু বকশিশ দিয়া যাবেন না?'

মামা যেন একটু থমকালেন।

'কিসের বকশিশ?'

'স্যার, আপনাদের এত এত কাজ এক ঘণ্টায় কইরা দিলাম, কিছু বকশিশ তো আমরা পাই, তাই না স্যার?'

মামাকে উল্টো প্রশ্ন করে যেন বেকায়দায় পড়ে গেল কনস্টেবলটা।

মামা বললেন,

'শোনো মিয়া, তুমি আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি করে দিয়েছ, যদিও এটাই তোমার কাজ, সরকার এ জন্য তোমাকে বেতনও দেয়, সে জন্য আমরা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু খুশি নই। আমরা এখানে কোনো খুশির কাজ করতে আসিনি, আমরা লাশ নিতে এসেছি।'

শেষের কথাগুলো একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন মামা। এ ধরনের কথা শোনার পর কেউ আর দাঁড়িয়ে থাকে না। কনস্টেবলটাও তাই করল, হাঁটতে হাঁটতে সে যে কথাটা বলে আপাতসন্তুষ্টি লাভ করল, তা মধ্যরাতের নিঃস্তব্ধতায় উড়ে এলো মামার কানে...

'শালার বাঙালির কোনো উপকার করতে নাই।'

মামা গলা উঁচু করেই বললেন, ছাড়লেন না, 'শোনো মিয়া, তুমি আমার উপকার করো নাই, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ।'

এসব কথা পরে মামা আমাদের বেশ মজা করেই বলেছিলেন।

ফ্রিজার ভ্যান আর মামাদের গাড়িটা প্রায় একসঙ্গেই এসে থামল আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। রাত ১২টা। এখন স্টার্ট করতে পারলে ফজরের পরপর জামালপুরে পৌঁছে যাওয়া যাবে। জিনাত-নার্গিস, ওর বাচ্চা আর রূপমকে নিয়ে এক গাড়িতে উঠল, আমি, মামা আর রুবাই উঠলাম অন্য একটা গাড়িতে। আমার অফিসের ড্রাইভার গাড়ি বন্ধ করে রেখে ফ্রিজার ভ্যানের ড্রাইভারের সঙ্গী হলো। তিনটে গাড়ি আশুলিয়া বেড়িবাঁধ ধরে ছুটে চলল জামালপুরের পথে।

রূপম জামালপুরে মকবুলের চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। রূপম আমাকে ওদের গাড়ি থেকে ফোন করে জানাল, দাফন-কাফনের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মকবুলের বাবাকে শুধু জানানো হয়েছে, মকবুল অসুস্থ, ওকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বীরপ্রতীক খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধা মানুষটি ঠিকই হয়তো বুঝে নিয়েছিলেন, তার ছেলে আর বেঁচে নেই। কিন্তু সেই সত্য কথাটি কেউ তাকে বলছিল না। তার চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। সারাজীবনে মানুষটি এত কেঁদেছেন আর কষ্ট পেয়েছেন যে, চোখের পানিও বুঝি তার শুকিয়ে গেছে।

ড্রাইভারদের ঘুম ঘুম ভাব কাটানোর জন্য এলেঙ্গায় মাত্র ১০ মিনিটের বিরতি দিয়েছিলাম আমরা। ওরা চা খেয়ে নিলে শরীরটা চাঙ্গা হবে, ওই আশায়। নার্গিস শেষ পথটুকু চিনিয়ে দিয়েছিল আমাদের।

ওর বাড়ির সামনে যখন আমাদের গাড়ি থামল, তখন ফজরের নামাজ শেষ হয়েছে মাত্র। লাশ ধোয়ানোর কাজটা করা হলো। কাফন পরানো হলো। তার পর জানাজায় দাঁড়াল সবাই। মকবুলের বাবাকেও আনা হয়েছে জানাজায়। তিনি যে এক ধরনের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন, সেটা বোঝা গেল। জিনাত-রুবাইরা কোথায়-কোনদিকে গেছে জানা হলো না আমার, চেষ্টাও করলাম না। নিশ্চয়ই নার্গিসের আত্মীয়স্বজন ওদের দেখছে।

জানাজা শেষে ইমাম সাহেব 'মকবুল একজন ভালো লোক ছিলেন' বলে ঘোষণা দিল। কারও কোনো দাবি-পাওনা থাকলে তা মাফ করে দেওয়া বা তার বাবার কাছ থেকে শোধ নেওয়ার কথাও বলা হলো।

আমার ছেলে রূপম ঠিক কোথায় ছিল আমি খেয়াল করিনি। সে পা-পা করে লাশের পাশে এসে দাঁড়াল। তার পর করজোড়ে সবাইকে উদ্দেশ করে বলল,

'মকবুল ভাই খুব ভালো মানুষ ছিলেন, আমাদের গাড়ি চালাতেন। তার সততা প্রশ্নাতীত, এ কথা বলে আজ আমি আনন্দ পাচ্ছি। যেদিন রাতে তিনি উধাও হয়ে যান, সেদিন দুপুরে আমাদের গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করে। আমার মা-বাবার কাছে মকবুল ভাই বলেছিলেন, তিনি গাড়িটা চালাচ্ছিলেন, সামনের বাসটা হঠাৎ পেছনে চলে আসায় গাড়িটার বনেট চ্যাপ্টা হয়ে যায়। গাড়িটা মেরামত করতে খরচ পড়ছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা।'

সবাই এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। আমি মামার

মুখের দিকে তাকালাম। মামাকে বললাম,

'মামা, রূপম বেফাঁস কিছু বলে দেবে না তো?'

মামা আশ্বস্ত করলেন আমাকে

'এ যুগের ভার্সিটিপড়ুয়া ছেলে রূপম, তুমি ওদের কথার ইলাস্টিসিটি জানো না।'

রূপম একটু থেমে আবার শুরু করল।

'আসলে মকবুল ভাই গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেননি। সেদিন দুপুরে আমার ক্লাসটা না হওয়ায় আমি ধানমণ্ডি মাঠে মকবুল ভাইকে পাশে বসিয়ে ড্রাইভিং প্র্যাকটিস করছিলাম। ব্রেকে পায়ের চাপ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তখন, আমি ভুল করে হড়বড়িয়ে এক্সিলেটরে জোরে চাপ দিয়ে দিই। গাড়িটা উড়ে গিয়ে সামনে থাকা বিশাল লোহার পিলারের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সামনের বনেটটা পুরো ভেতরে ঢুকে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। এ কাজের জন্য মা-বাবার বকুনি খেতে হবে আমাকে, এটা ভেবেই তিনি মিথ্যা গল্পের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমি বেঁচে যাই, মায়ের তিরস্কার শুনতে হয় মকবুল ভাইকে। মকবুল ভাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে হয়তো এ ঘটনার কোনো সংযোগ নেই। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহের যে উপহার তিনি রেখে গেছেন, তা আমি কখনও ভুলব না। আপনারা আমাকে মাফ করে দেবেন।'

চোখ মুছতে মুছতে রূপম গিয়ে মুসল্লিদের সারিতে দাঁড়াল। গ্রামের লোকজন অনেকে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, তা দেখে আমার নিঃশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হলো।

দাফনের আগে মুখটা খোলা হলো সবার জন্য। সারিবদ্ধভাবে হেঁটে হেঁটে ওকে দেখল সবাই। আমি এসব দেখতে পারি না, কষ্ট হয় খুব। নার্গিস বাচ্চা কোলে এসে মকবুলের উন্মুক্ত অংশটি ধরে চিৎকার করে আবার কাঁদতে শুরু করল।

'কেঁদো না মা, কেঁদো না, এতে মুর্দার কষ্ট হবে।' মুরুব্বিরা এমন কথা বলে নার্গিসকে নিবৃত্ত করল। সবশেষে এলো মকবুলের বাবা। কেউ একজন জোরে জোরে তার পরিচয় তুলে ধরল, বলল, 'মকবুল পাঁচ দিন আগে বাড়িতে এসে পৈতৃক ভিটেটা বন্ধক রেখে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে গিয়েছিল। বীরপ্রতীক শফিকুল ইসলামের ছেলে সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিল বলেই তার বাবা তাকে বাড়ি বন্ধক রাখতে নিবৃত্ত করেননি। ছেলে যাওয়ার সময় বাবা তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন,

'এই মাথাটা সব সময় উঁচু রাখবা।'

বীরপ্রতীক শফিকুল ইসলাম নামটা শোনার পর থেকেই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন আমাকে সংকেত পাঠাতে লাগল। আমি এগিয়ে গেলাম তার কাছে। তখন চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে। মুখভর্তি দাড়ি থাকলেও স্পষ্টই চেনা যাচ্ছে মানুষটিকে।

বৃদ্ধের মুখটা আমি দু'হাতে তুলে ধরে বললাম,

'শফিক ভাই, আমাকে চেনা যায়? চিনতে পারছেন?'

ঘোলা চোখে তাকালেন তিনি আমার দিকে। কিন্তু বোধ হয় চিনতে পারলেন না। আমি সূত্র ধরিয়ে দিয়ে বললাম, '১৯৭১ সালে আপনার দলের সর্বকনিষ্ঠ যোদ্ধাটি যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তক্ষরণে মরতে বসেছিল, তখন তাকে কাঁধে তুলে পাঁচ মাইল দৌড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মেডিকেল সেন্টারে। মনে পড়ে?'

'তুমি হারুন? হারুন-উর-রশীদ?'

ঝলমল করে উঠল মুখটা তার।

'জি শফিক ভাই, মকবুল আমার বাসার গাড়ি চালাত, ভুল করেও কোনোদিন বুঝতে পারিনি ও আপনার ছেলে। আমাদের মাফ করে দেবেন শফিক ভাই।'

লাশ দাফন হয়ে গেল। আমি শফিক ভাইকে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। সবাই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। আমি হঠাৎ শফিক ভাইকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেললাম। যিনি একদিন আমাকে দ্বিতীয় জীবন দিয়েছিলেন, আজ তার সন্তানকে আমি লাশ হিসেবে তার কাছে নিয়ে এলাম। এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে?

সকালে নাশতা করে আমরা ঢাকার পথে রওনা হলাম। জিনাত বিদায় মুহূর্তে শফিক ভাইকে কদমবুসি করে গাড়িতে উঠল, আমার ছেলেমেয়েরাও।

বিকেলে ঢাকার বাসায় পৌঁছে যাই।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে মনে হলো, শরীর-মাথা কোনোটাই আর কাজ করছে না আমাদের। রূপম-রুবাই তবু পারে, আমার আর জিনাতের জার্নির ধকল হাড়-মাংসকে এক করে দিয়েছে। মামা তার বাড়িতে চলে গেছেন, উত্তরায় থাকেন। ড্রাইভারটিকে পাঁচশ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাল ছুটি দিয়ে দিয়েছি। ওয়ার্কশপে গাড়িটার কাজ হয়তো শেষ হয়েছে। থাকুক আরও দু'দিন, পরশু আনা যাবে।

টেলিফোন করে পাশের একটা রেস্টুরেন্টে রুটি আর কাবাব হোম-ডেলিভারি দিতে বলে সবাই গোসল করি। গিজারের গরম পানি শরীরের ক্লান্তি অনেকটাই দূর করে দেয়। রাত ৮টার মধ্যে ডিনার শেষ করে ৯টার মধ্যে আমরা সবাই যে যার ঘরে বিছানায় আশ্রয় নিই। মকবুল-ক্রাইসিসটা মিটেছে। আমাদের প্রত্যেকের প্রচুর ঘুমের দরকার এখন।

রাত ঠিক কতটা তখন, আমার মনে নেই। হঠাৎ দরজার কলিংবেলটা বেজে ওঠে। একবার, দু'বার, তিনবার। উঠতেই হলো জিনাতকে। ও-ই এসব সামলায়।

ঘুমঘুম চোখে চাবি নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বলল,

'কে? কে বেল দিচ্ছেন?'

কিছু হয়তো ওপাশ থেকে বলল, জিনাত শোনেনি, আমিও শুনতে পাইনি। ও চাবি ঢুকিয়ে দরজা খুলে একেবারে অবাক। দরজার সামনে তাদের গাড়ির চাবি হাতে দাঁড়িয়ে মকবুল। হাসতে হাসতে বলল,

'ম্যাডাম, ওয়ার্কশপ থেকে, গাড়িটা নিয়ে এলাম। পার্কিংয়ে রেখে দিয়েছি। চাবিটা নেন।'

জিনাত প্রায় অস্ফুটস্বরে ভীত হয়ে জিজ্ঞেস করল,

'তুমি কোথায় থেকে এলে এখন?'

'ওয়ার্কশপের মালিক সকালে বলছিল গাড়িটা কালকে দেবে। আমি সারাদিন ওদের সঙ্গে থেকে কাজ কমপ্লিট করে পেমেন্ট চুকিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে এলাম।'

জিনাতের মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল বোধ হয়।

চাবিটা ওর হাত থেকে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

'কাল সকালে আসব ম্যাডাম?'

'আসবে। ভাইয়া-আপার ক্লাস আছে তো।'

জিনাত ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলাম,

'কে এসেছিল?'

ততক্ষণে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। জিনাত টেবিলের ওপর চাবিটা রাখতে রাখতে বলল,

'মকবুল এসেছিল, গাড়ির চাবি দিয়ে গেল।'

লিফট নিচে নেমে যাওয়ার শব্দ পেলাম আমি। ❖





উপন্যাস

শেখ আবদুল হাকিম

মরণঘুম

পান ভরা মুখে ওটা কি উর্দু জবান?

নেইপলস, ইটালি।

বুম বুম নাইটক্লাবের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো অস্থির পাপারাৎসিদের কর্কশ ফ্লাশলাইটের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো জাকি আজাদ, কন্টেসা সুজানি রনডির কোমরের চারদিকে হাত জড়াল, যে সুন্দরী অপরূপা এইমাত্র ওর কোল থেকে নেমেছে, এই মুহূর্তে শেয়ার করছে ওর চেয়ার।

অলঙ্করণ : : আনিসুজ্জামান সোহেল

চেয়ারের কিনারায় নড়েচড়ে বসল কন্টেসা, ওর মুখে আঙুল বুলাল, কানের লতিতে চুমো খেলো, চুমো খেলো ওর দু'চোখের পাতায়– অথচ সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে ডাসার মেয়েটার দিকে।

কামরার মাঝখানে, টেবিলের ওপর, ভারি মেকআপ নেয়া ইটালিয়ান মেয়েটি নাচছে, যার চুল কয়লা-কালো, ঠোঁট রক্তলাল, আর পরে আছে শুধু দু'টুকরো বিকিনি আর হাইহিল লাগানো স্প্যানিশ ডান্সিং শু, পপ ব্যান্ডের তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লাফাচ্ছে, পা ঠুকছে, পায়ের তলা তুলে দিচ্ছে যত উঁচুতে পারা যায়, আবার কখনো একপায়ে ভর দিয়ে শরীরটাকে ঘূর্ণি বানিয়ে ফেলছে। মেয়েটি তার নাভিতে মূল্যবান রত্ন প্রকাণ্ড উপলা পরেছে। প্রতিটি নড়াচড়ার সঙ্গে তার স্তন দুটো যেন সিল্কের ফিতে ছিঁড়ে পালাবে, যে ফিতে ওগুলোকে বেঁধে রেখেছে।

ওই মেয়ে ইটালি সিনে আকাশের ঝলমলে তারকা, মাত্র ক'দিন হলো হলিউড থেকে আংশিক শুটিং সেরে ফিরেছে, অভিনয় করছে এমন একটা ফিল্মে, যাতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে যৌন সম্পর্কের কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তার ভয়াবহ পরিণতির কথাও জানতে পারবে দর্শকরা। ওই ফিল্মের নায়িকা হওয়ায় রোম, প্যারিস, রিভেয়েরা আর নেইপলসে একটা হইচই ফেলে দিয়েছে সে। পাপারাৎসিরা, ট্যাবলয়েড পত্রিকার ফটোগ্রাফার ছায়ার মতো তার পেছনে লেগে আছে। নেইপলসের সামাজিক মঞ্চের টোস্ট সে।

দামি শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছে আর নেইপলস নাইট স্পটের বিলাসবহুল সাজসজ্জা দেখছে আজাদ। কামরাটা আভিজাত্য, অর্থ আর স্ট্যাটাসের গন্ধ ছড়াচ্ছে। পুরুষরা নামকরা সব টেইলারিং শপ থেকে তৈরি করা স্যুট পরে এসেছে, তাদের সবাই ধনী, সবার গর্ব করার মতো বংশমর্যাদা আছে, তা না হলে নিজের ক্ষেত্রে বড় কোনো অর্জন আছে, কেউ হয়তো বিরল মেধার অধিকারী, কেউ নাম করা থ্রিলার লেখক বা শিল্পী। মেয়েরা কেউ কারও চেয়ে কম সুন্দরী নয়। আসলে বলা উচিত কেউ কারও চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়, কারও ড্রেস কম দামি নয়; প্রায় কেউই সঙ্গীবিহীন নয়।

উপস্থিত দর্শকরা মন দিয়ে নায়িকার নাচ দেখছে। বাজনার তাল যখন উদ্দাম হয়ে উঠল, অনেকেই তালি দিলো, তার মধ্যে একটু যেন শ্লেষাত্মক ভাবও আছে। আবার কেউ কেউ নীরবে শ্যাম্পেন পান করছে, নাচ দেখছে নির্লিপ্ত চোখে; মাজাঘষা করা, রঙ লেপা প্রতিটি মুখে একঘেয়েমি বাসা বেঁধে আছে। নৈতিকতা বিবর্জিত ভোগবিলাসজনিত ক্লান্তি আর গ্লানিও ওইসব চেহারায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

হঠাৎ আজাদের মনে হলো, চলতি মাসে ও যদি নেইপলস আর ক্যাপ্রিতে থাকার পরিবর্তে রিভেয়েরার খোলামেলা জগতে এবং ওখানে ওর নিজের ভিলায় থাকতে পারত, তাহলে ওকে হয়তো এই একঘেয়েমির শিকার হতে হতো না। পাশে বসা তরুণীর কানে ফিসফিস করল ও, 'কন্টেসা, চলো উঠি।'

কচি পুঁইডগার মতো তাজা আর লকলকে তার দেহসৌষ্ঠব, সোনালি বরণ পরী, চিনা আদা রঙের চোখ, লাল মাখানো ঠোঁট ঢেকে রেখেছে বিড়ালের দাঁত। তার কাঠামো উত্তর ইটালির মেয়েদের মতো; লোকগাথায় বলা হয় ওদের ভেতর ঈশ্বর নিজের হাতে সৌন্দর্যের খনি ভরে দিয়েছেন; আর মনমেজাজ দক্ষিণ ইটালির মেয়েদের মতো, অসম্ভব আবেগপ্রবণ, চলাফেরায় দেখা যায় মোহ জাগানো ছন্দ।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক– ইটালিয়ান সমাজের এরকম এক অভিজাত মক্ষিরানির সঙ্গে জাকি আজাদের মতো এক বঙ্গসন্তানের এত ঘনিষ্ঠতা কীভাবে সম্ভব হলো?

কন্টেসা সুজানির স্বামী কাউন্ট কার্লোস গোপনে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। তার মাধ্যমেই ইসরায়েল সরকার সিরিয়া আর ইরাকে গজিয়ে ওঠা ইসলামিক স্টেটকে দফায় দফায় নগদ আর্থিক সহায়তা দিচ্ছিল– এসব অগ্রিম পেমেন্ট, তেলখনি দখল করার পর ইসরায়েলের পছন্দসই দেশগুলোকে তেল সরবরাহ করবে আইএস। কাউন্ট কার্লোস ইটালিয়ান যে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করছিলেন, সেই ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তা হ্যাকারের ভূমিকায় নেমে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ আরও অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জমা করা টাকা মার্কিন রিজার্ভ ব্যাংক থেকে চুরি করে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশ কাউন্টার এসপিওনাজ তাদের অন্যতম সেরা এজেন্ট, নাগরিকত্ব নিয়ে ইটালিতে বসবাসরত জাকি আজাদকে এই কেস তদন্ত করার দায়িত্ব দিয়েছিল। আজাদ কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের করে ফেলেছে। কী ব্যাপার? মোসাদ আইএসকে অগ্রিম যে টাকা দিচ্ছিল, সে টাকা ইসরায়েল সরকারের কোষাগার থেকে আসছিল না; তারা অন্য অনেক রাষ্ট্রের কোটি কোটি মার্কিন ডলার চুরি করে কাউন্ট কার্লোসের মাধ্যমে আইএসকে দিচ্ছিল।

কাউন্ট কার্লোস শুধু যে নিজ দেশের বিরুদ্ধে অক্ষমনীয় একটা অপরাধ করছিলেন, তা নয়; তিনি অকুণ্ঠচিত্তে নিজ স্ত্রীর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করছিলেন। বিভিন্ন ব্যাংক থেকে চুরি করা যে টাকা মোসাদ তাকে দিচ্ছিল, সেই টাকা তিনি স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করছিলেন, এবং ওই অ্যাকাউন্ট থেকেই আইএসকে পেমেন্ট করছিলেন। এই কাজ করতে গিয়ে স্ত্রীর অজ্ঞাতে তার স্বাক্ষরও নকল করছিলেন তিনি। অর্থাৎ, তিনি জানতেন, ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায় তাহলে তিনি ফাঁসবেন না; ফাঁসবে তার তরুণী স্ত্রী কন্টেসা সুজানি। তার হয়তো আশা ছিলো, সুজানির মা-বাবা যেহেতু ইটালির রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী, বিপদে পড়া মেয়েকে ঠিকই তারা সংকট থেকে টেনে বের করে আনবেন।

তদন্ত রিপোর্ট স্বভাবতই ইটালিয়ান ইন্টেলিজেন্সকেও জানায় আজাদ। তারা কাউন্টের প্রাচীন দুর্গে গিয়ে হাজির হন কন্টেসা সুজানিকে গ্রেফতার করার জন্যে। খবর পেয়ে পুলিশ ও তাদের গ্রেফতার করা দু'জন ব্যাংক কর্মকর্তাকে নিয়ে ওই দুর্গে হাজির হয় আজাদও। ব্যাংক কর্মকর্তারা সাক্ষ্য দেন– কন্টেসা সুজানির স্বাক্ষর নকল করে তার অ্যাকাউন্ট অপারেট করছিলেন কাউন্ট কার্লোস– এ ব্যাপারে কন্টেসা কিছুই জানে না।

ছ'মাস পর দ্রুত বিচারে কাউন্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন– বারো বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

নির্ঘাত জেল খাটা ও চরম অপদস্থ হবার হাত থেকে কে তাকে বাঁচাল– এটা জেনে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি কন্টেসা সুজানির। আধবুড়ো স্বামীর কথা ভুলে যেতেও খুব একটা সময় নেয়নি সে। জাকি আজাদের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে দু'একদিন পরপরই ফোন করে, ওকে নিজের দুর্গে দাওয়াত দেয়, কিংবা ওর ভিলায় উপযাচক হয়ে বেড়াতে আসতে চায়।

আজাদ বুম বুম নাইটক্লাব ছেড়ে চলে যেতে চাইছে শুনে দেহভঙ্গিমায় যৌনাবেদন ফুটিয়ে কামরার চারদিকে চোখ বুলিয়ে গালভাঙা অভিজাত অতিথি আর পাপারাৎসিদের একবার দেখে নিলো কন্টেসা। শেষের দলটা আধুনিক ইটালির লজ্জা আর অমঙ্গলের ছবি তুলতে ব্যস্ত।

'এক মিনিট,' ফিসফিস করল সুজানি। শরীর আঁকাবাঁকা করল, কেউ যেন তাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আজাদের শরীরে সেঁধিয়ে যাবার একটা ঝোঁক দেখা গেল। গায়ে সিল্ক গাউন থাকা সত্ত্বেও তার শরীরের তাপ অনুভব করছে আজাদ। একটু

উত্তেজনা হচ্ছে ওর। আঙুল বুলাচ্ছে শ্যাম্পেনের গ্লাসে।

টেবিলের মাথায় অশ্লীল নাচ চরম উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। বহুরঙা অভিনেত্রী আচমকা মোচড় খেলো, স্তন ঢাকা ব্রার সিল্ক ফিতে একটানে খুলে ছুড়ে দিলো শূন্যে। নিজেকে আরও উদার ভঙ্গিতে মেলে ধরেছে দর্শকদের সামনে। পাপারাৎসিরা যেন পাগল হয়ে গেল, কৃত্রিম বাজ পড়ার শব্দে কান ঝালাপালা, আগুনের ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। কেউ একজন বোতল ভাঙল। পেছনদিকে উল্টে পড়ল চেয়ার।

ঝনঝন প্রতিধ্বনি তুলে মিউজিক থামল। নিভে গেল সব আলো। টেবিলের মেয়ে লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়ল, তারপর এক ছুটে ক্লাবের পেছনদিকে চলে গেল।

নাচ শেষ হয়েছে।

জাকি আজাদ কন্টেসা সুজানিকে দাঁড় করাল। 'অনেক হয়েছে। এবার চলো।'

'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করল কন্টেসা।

আজাদকে ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল কন্টেসা, নিজের নরম শরীর দিয়ে ওর গায়ে চাপ দিচ্ছে, তাকে নিয়ে কাছাকাছি করে ফেলা টেবিলের মাঝখান দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে আজাদ। লোভাতুর চোখ নিয়ে কন্টেসাকে গিলছে লোকজন, তাদের চেহারা হোৎকা আর মুখ তোবড়ানো, হয় ব্যাংকার, নয়তো ব্যবসায়ী। মেয়েরা সবাই একযোগে চোখ বড় করে দেখছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে তারা : কে যায়, সঙ্গে কে, কন্টেসা সুজানির সঙ্গে এত থাকতে কৃষ্ণাঙ্গ কেন?

একজন ফটোগ্রাফার, চোখে প্রকাণ্ড সানগ্লাস, এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত চওড়া ব্যান্ড দিয়ে আটকানো, হুট করে ওদের পথে এসে থেমে গেল, হাতের ক্যামেরা উঁচু করে আজাদের ফটো তুলতে যাচ্ছে।

'সরি!' দ্রুত বাধা দিলো আজাদ। 'ফটো তুলবেন না!'

কাঁধ ঝাঁকাল ফটোগ্রাফার। সানগ্লাসের ব্যান্ড অস্বাভাবিক চওড়া হওয়ায় সেটাকে মুখোশের মতো লাগছে। তারপরও তার চেহারায় সদ্য ফুটে ওঠা বিতৃষ্ণা আর তাচ্ছিল্যের ভাব গোপন থাকল না। পরক্ষণে ঝট করে হাতের ক্যামেরা উঁচু করল; পপ করে ঝলসে উঠল ফ্ল্যাশ।

হাতের এক ঝাপটায় ক্যামেরাটা মেঝেতে ফেলে দিলো আজাদ। নিচের দিকে ঝুঁকল, খুলল ওটা, ফিল্মটা রোল করাল দ্রুত, তারপর টান দিয়ে ছিঁড়ে বের করে আনল।

'কী ঘটছে এখানে?' মেয়েলি গলায় চেঁচিয়ে উঠল ফটোগ্রাফার।

'কোনো ফটো নয়,' বলল আজাদ, পুরো শান্ত। 'আপনাকে তো ভদ্রভাবে বললাম।'

গুঁতো মারার ভঙ্গিতে, চেহারায় রাগ আর জেদ নিয়ে, আজাদের দিকে ছুটে এলো ফটোগ্রাফার, ওর শার্টের সামনেটা মুঠোয় ভরে ঝাঁকাচ্ছে। প্রথমে এক ঝটকায় তার সরু হাত সরিয়ে দিলো আজাদ। তারপর আরেক ঝটকায় লোকটাকেই ফেলে দিলো।

পড়ে যেতে গিয়ে মেঝেতে হাঁটু গাড়ল নিউজ ফটোগ্রাফার, তার সানগ্লাস বাঁকা হয়ে এক কান থেকে ঝুলছে। চোখ নগ্ন, সেখানে অপরাধবোধ ছাড়াও কী যেন গোপন করার চেষ্টা আছে!

বুম বুম নাইটক্লাব হঠাৎ নীরব হয়ে গেল।

আজাদ গম্ভীর, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল, একতাড়া নোট ছুড়ে দিলো মেঝেতে। 'আপনার সমস্যা হওয়ায়, সিনর!' তারপর ওর দিকে ঘুরে যাওয়া টান টান মুখগুলোর ওপর চোখ বুলাল। আর কোনো কথা না বলে কন্টেসাকে আবার কাছে টেনে নিলো, হাঁটা ধরল দরজার দিকে। রাজকীয় নীরবতা ও প্রশান্ত ভাব একশ' ভাগ অটুট রেখেছে সুজানি।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে মুখ খুলল সে। 'আজাদ,' ফিসফিস করে, ওর গালে একটা চুমো খেয়ে। 'ওর সঙ্গে তুমি ওরকম করলে কেন?'

'কেউ আমার ছবি তুলুক– এটা আমার পছন্দ নয়'– সুর নরম করে বলল আজাদ।

আর সবকিছুর চেয়ে আজাদের বড় নেশা ইটালির পরিচ্ছন্ন রাস্তায় নিজের অফ-হোয়াইট ল্যান্সিয়া চালানো। মুখে এসে লাগা বাতাসের প্রবল প্রবাহ ভালো লাগছে ওর, ঠাণ্ডা করছে ওকে, ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে নাইটক্লাবের গুমোট ভাব, ধনী আর অসুস্থদের দুর্গন্ধ। কন্টেসার নিরাবরণ হাঁটুতে হাত রাখল। রত্নখচিত বারো হাজার ইউরো মূল্যের গাউনে টান পড়ায় অনাবৃত হয়ে পড়েছে তার রাঙা ঊরুর কিছুটা।

'সুজানি,' মৃদু গলায় ডাকল।

নিজের মাথা পেছনদিকে হেলিয়ে রেখেছে সুজানি, বাতাসকে সুযোগ করে দিচ্ছে লম্বা চুলের নাগাল পেতে। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' আলিস্যিভরা গলায় জানতে চাইল।

'বিছানায়,' বলল আজাদ। 'আমি ক্লান্ত।'

'সেই বিছানাটা ঠিক কোথায়?' আবার প্রশ্ন করল কন্টেসা, একটু হাসি ফুটছে ঠোঁটে।

'অ্যাভালিনোর কাছে, লালচে এক বিশাল প্যাল্যাৎসো। তুমি ওটা চেনো?'

'আমার দ্বিতীয় কাজিন জুলি ওখানে জন্মেছিল বলে শুনেছি। পরে সরকার ওটাকে পাঁচতারা হোটেল বানাবার অনুমতি দেয়।'

'ওটার পেছনের সুইটগুলো থেকে ভারি সুন্দর একটা লেক দেখা যায়। চাঁদের আলোয় বোট নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি, চাই কি তুমি ছোট কোনো দ্বীপে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেও রাত কাটাতে পারো।'

'কিন্তু হোটেলে কেন, আজাদ? আমি তো জানি তুমি ক্যাপ্রি দ্বীপের কোথাও থাকো।'

'হ্যাঁ, থাকি মাঝেমধ্যে। ওরকম জেনেভা, রিভেয়েরা, আইল অভ ক্রিটেও থাকা হয়। দৃশ্য বদলাতে ভালো লাগে আমার।'

'আর প্যাল্যাৎসো?'

'ওখানে ক'দিনের জন্যে উঠব, একটা সুইট ভাড়া নিয়েছি তোমার আর আমার জন্যে।'

'তুমি সত্যি কী ভালো' বলে আজাদকে চুমো খেলো সুজানি।

ওদের মাথার ওপর অনন্ত বিস্তৃত আকাশ, মিটমিট করা তারাগুলো ওদেরকে যেন দেখছে।

'আজাদ?'

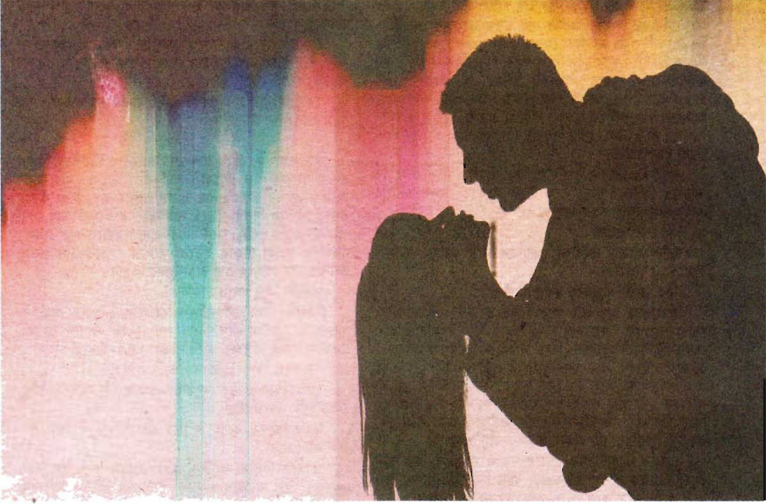
'ইয়েস?'

'প্যাল্যাৎসোর একটা সুইট ক'দিনের জন্যে ভাড়া করা মানে পুরো সুটকেসভর্তি ইউরো খরচ হবে।'

'তা হবে।'

'অথচ আমি শুনেছি, বাংলাদেশ খুব গরিব একটা দেশ।'

একটু ধাক্কা খেলো আজাদ। বলল, 'ক'দিন পর তা বলার আর সুযোগ থাকবে না; আমরা তরতর করে ওপরের কাতারে উঠে যাব। তবে এটা ঠিক যে, আমাকে দেখে বাংলাদেশকে বোঝা যাবে না। এটা আমার দ্বিতীয় দেশ, এখানে যা কিছু আমি করছি, সব একটা ক্যামোফ্লেজের অংশ, আমার পেশার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।'



'তুমি তোমার প্রথম দেশে যাও না?'

'যাই, হয় কোনো কাজে, নয়তো বেড়াতে। থাকতে নয়।'

'যতটুকু দেখেছি, তোমাকে আমার আন্তর্জাতিক মনে হয়।'

'তা বলতে পারো।'

'আজাদ?'

'ইয়েস?'

'এত টাকা। আসে কোত্থেকে?'

মৃদু হেসে সুজানির দিকে তাকাল আজাদ। 'কী বিব্রতকর একটা প্রশ্ন! বাচ্চারা কোত্থেকে আসে, ক্যারিশমা? ইউরো আর ডলার আসে পাখি আর মৌমাছি থেকে।'

'না, ঠাট্টা নয়; আমি সত্যি জানতে চাই।'

'বুঝেছি। শোনো। যে টাকা আমাকে সবাই দু'হাতে ওড়াতে দেখে তার সবই আমার নিজের রোজগার করা এবং সেটাও আমার ওই ক্যামোফ্লেজেরই অংশ।'

'উত্তরটা তুমি এড়িয়ে না যাওয়ায় আমি খুশি। ধন্যবাদ। আরেকটা কথা, তোমার স্টাইল আছে।'

'সেটা একসময় দু'জন একসঙ্গে চর্চা করা যাবে,' প্রতিশ্রুতি দিলো আজাদ।

সুজানির হাসির মধ্যে তৃপ্তি আর প্রত্যাশা।

নেইপলস শহর থেকে অনেক দূরে, গ্রাম্য এলাকায় চলে এসেছে ল্যান্সিয়া। ঢাল বেয়ে একটা পাহাড়ে উঠছে ওরা। ওদের চারপাশে শুধু শূন্যতার বিস্তৃতি, তাও গভীর অন্ধকারে ঢাকা, কোথাও একটু আলোর রেখা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। খোলা প্রান্তরের গন্ধ এসে লাগছে ওদের নাকে।

'আজাদ, এক মিনিটের জন্যে একটু থামবে?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে সুজানির দিকে ফিরল আজাদ।

'শ্যাম্পেন বেশি হয়ে গেল কি-না বুঝতে পারছি না। আমার একটু খারাপ লাগছে।'

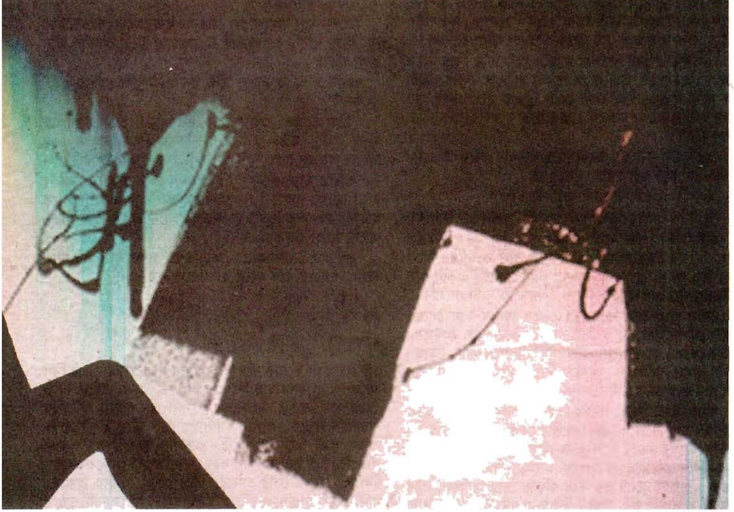
'সরি।' গতি কমিয়ে এনে রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল আজাদ। আলো নেভানো, চুপচাপ বসে আছে দু'জন। কাছাকাছি কোথাও অনবরত ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। নিশাচর কোনো প্রাণী ঝোপ ভেঙে ছুটে পালাল।

'আগের চেয়ে ভালো লাগছে,' ম্লান গলায় বলল সুজানি। 'স্রেফ বসে থাকি এসো।'

দু'মিনিটও পেরোয়নি, ভটভট আওয়াজ ঢুকল আজাদের কানে। ইঞ্জিনের শব্দ, সম্ভবত ভেসপার; ওদের পেছন থেকে ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখল ও। দেখল অন্ধকার ফুঁড়ে একটা হেডলাইট এগিয়ে আসছে, রূপকথার সেই একচোখো দানবের মতো। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দ তুলে ওদেরকে পাশ কাটাল ভেসপা, বিশ ফুট এগোবার পর রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে নামল। আজাদ ওর ল্যান্সিয়া থামিয়েছে পাহাড়ের ঢালে। ওরা তাকিয়ে আছে বিশাল ও নীরব উপত্যকার দিকে।

ভেসপার হেড ল্যাম্পের সরু আলোর টানেল ধীর গতিতে মেঠোপথ ধরে নেমে যাচ্ছে। এক তরুণ চালাচ্ছে ওটা। গলিটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়েছে, ভেসপার আলোয় কঙ্কালের মতো দেখতে কাঠের সেতু উদ্ভাসিত হলো, নিচে ঝরনা। আরও সামনে গাছপালার ভিড়, তারপর পরবর্তী পাহাড়ের ঢাল শুরু।

আজাদ আর সুজানি অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। হঠাৎ দু'জন প্রায় একই সঙ্গে ভেসপার সামনে কয়েকটা খালি ড্রাম পড়ে থাকতে দেখতে পেলো। ওগুলো ফেলে রাখা হয়েছে পথের একেবারে মাঝখানে, যেন রাস্তা বন্ধ করাই লক্ষ্য। পথের



পাশের একটা গাছ একদিকে অসম্ভব কাত হয়ে আছে, যেন তীব্র বাতাস ওটাকে সিধে হতে দিচ্ছে না।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত না?' ফিসফিস করল সুজানি।

'কোনটা, ডার্লিং?'

'ব্যারিকেডটা। এরকম নির্জন জায়গায়...'

দু'জনেই ওদিকে তাকিয়ে আছে, ভেসপা থামিয়ে নিচে নামল তরুণ। হেড ল্যাম্পের আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল নয়, রাস্তায় পড়ে থাকা এক গোছা রশির ওপর পা ফেলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে।

হঠাৎ জাকি আজাদের চোয়াল ঝুলে পড়ল। সিটের ওপর ঝট করে সিধে হলো, নিমেষে সচকিত হয়ে উঠেছে। উন্মাদের মতো বারবার ল্যান্সিয়ার হর্ন বাজাচ্ছে।

'এই! কী করছ তুমি?' জানতে চাইল সুজানি।

'ওটা একটা গর্দভ! ব্যাটা কানা নাকি, দেখতে পাচ্ছে না?'

'কী দেখতে পাবে?'

রাস্তার পাশের কাত হয়ে থাকা গাছ সপাং শব্দের সঙ্গে চোখের পলকে সিধে হলো, যেন একটা রশি ওটাকে টেনে রেখেছিল, সেটা খুলে নেয়া হয়েছে। একই সময়ে তরুণের পায়ের চারপাশে স্তূপ হয়ে থাকা রশি তার শরীরটাকে পেঁচিয়ে ধরল, প্রকাণ্ড এক জালের মতো। ওই জাল তাকে মাছের মতো আটকে নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

ফাঁদে আটকা পড়ে শূন্যে ঝুলতে লাগল তরুণ। সব রশির মাথা এক হয়ে গাছের মগডালে আটকানো।

'মাই গড!' হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করল সুজানি, সে যেন তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

'এরকম ফাঁদ আজকাল খুব একটা দেখা যায় না!' বিড়বিড় করছে আজাদ। 'ভাবছি...'

ভাবনা থামিয়ে ল্যান্সিয়া স্টার্ট দিলো আজাদ, হেডলাইট জ্বালল, মেঠোপথের মুখ লক্ষ্য করে ছেড়ে দিয়েছে গাড়ি।

'কী ঘটল বলো তো?' জিজ্ঞেস করল সুজানি।

'কী জানি, বুঝতে পারছি না!' বলল আজাদ। 'তবে যাই চলো, জানতে চেষ্টা করি।'

'ওই লোক...বাতাসে ঝুলছে! একটা জালের ভেতর!' অদম্য হাসিতে আড়ষ্ট হয়ে উঠল সুজানির শরীর। 'মজাই লাগছে আমার!'

গলিতে ঢুকল ল্যান্সিয়া, গতি বাড়ল, কাঠের কঙ্কাল দ্রুত কাছে চলে আসছে। সেতুর ওপর ওঠার পর কাঠের তক্তাগুলো এমন কাঁপতে লাগল, মনে হলো সেতু না নিচের ঝরনায় ভেঙে পড়ে!

'দেখো! এই সময় আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সুজানি, হাত তুলে আকাশ দেখাচ্ছে। 'আজাদ! আমার ভয় করছে!'

রাস্তা থেকে চোখ তুলে ওপরে তাকাল আজাদ। দেখল গাছগুলোর মাথার অনেক ওপর প্রকাণ্ড একটা কালো আকৃতি ঝুলে রয়েছে। আকৃতির ভেতর কোথাও কোনো আলো নেই, শুধু একটা নীলচে আভা। তারপর চোখ কুঁচকে ভালো করে তাকাতে, ধীরে ধীরে একটা হেলিকপ্টারের আকার ধরা দিলো চোখে– কালো পেইন্ট করা, গায়ে কোথাও কোনো রকম মার্কিং নেই, রাতের শূন্য আকাশে ভেসে আছে নেভিগেশন লাইট ছাড়াই। গাছের সঙ্গে বাঁধা জালে আটকে থাকা তরুণের সরাসরি মাথার ওপর একটা হামিংবার্ডের মতো ঝুলছে ওই যান্ত্রিক কালো ফড়িং।

হেলিকপ্টারের খোলা হ্যাচ থেকে লোহার এক প্রস্থ চেইন নেমে আসছে, শেষ মাথায় মস্ত হুক। কপ্টারের ভেতর থেকে

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চেইন নাড়াচাড়া করে জালের ওপরের অংশের গায়ে হুকটা আটকানো হলো। তারপর টান পড়ল চেইনে, তরুণসহ জাল উঠে যাচ্ছে কপ্টার কেবিনের দিকে।

ভেসপার পেছনে ল্যান্সিয়া থামিয়ে লাফ দিয়ে নিচে নামল আজাদ। ও নামছে, তখনও পা পড়েনি মাটিতে, কর্কশ একটা শব্দ হলো বাতাসে। রাইফেল থেকে শিখার একটা বিন্দু ছুটে এলো কপ্টারের ভেতর থেকে। আজাদের পায়ের কাছে মাটিতে বিঁধল বুলেট।

'ওরা গুলি করছে!' কন্টেসাকে সাবধান করল আজাদ। 'গাড়ির মেঝেতে শুয়ে পড়ো! নড়বে না!'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, আজাদ। তুমি কী করছ?'

'আমাকে যখন কেউ গুলি করে, আমি পাল্টা গুলি চালাই!'

ছুটে গাড়ির পেছনদিকে চলে এলো আজাদ, বুট খুলে হাতে নিলো নিজের উইনচেস্টার। ওটা কাঁধে তুলে কপ্টারের নাকে লক্ষ্য স্থির করল, ট্রিগার টানল পর পর তিনবার। একটা গুলি প্লেক্সিগ্লাসের কোন ফাটিয়ে দিলো, কিন্তু বাকি দুটো লাগেনি।

তরুণ আর জাল কপ্টারের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটা মেশিন পিস্তলের কুৎসিত নাক বেরিয়ে এলো কপ্টারের ভেতর থেকে। বুলেটগুলো আজাদের চারপাশে মাটি খুঁড়ছে। একটা লাগল ল্যান্সিয়ায়। কন্টেসা নিজের মুখে হাতচাপা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, ভোঁতা লাগল শুনতে।

দাঁতে দাঁত পিষে গাছের আড়াল পাবার জন্যে ছুটল আজাদ; শুধু নিজেকে নয়, ল্যান্সিয়াকেও বাঁচাতে চাইছে। কপ্টার আগের মতো ঝুলে আছে মাথার ওপর, আরও বরং একটু নিচে নেমেছে। ভেসপার আলোয় পথ দেখে ছুটছে আজাদ। একটা বুলেট ওর কাঁধ গুঁড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, তবে ভাগ্যক্রমে লাগল ওর পেছনে দাঁড়ানো গাছের কাণ্ডে। লাফ দিয়ে জঙ্গলের সবচেয়ে গভীর জায়গায় চলে এলো আজাদ, ক্ষিপ্র বেগে শরীরটাকে মোচড় খাইয়ে কপ্টারকে গুলি করল আবার।

একই সঙ্গে গর্জে উঠল মেশিন পিস্তল, আজাদের চারপাশে গাছের ছাল আর পাতা বৃষ্টি হচ্ছে। পাল্টা গুলি চালাল ও। আরও নামল একটু কপ্টার, ওটার নাক ওর দিকে, ফিউচারিস্টিক কোনো দুঃস্বপ্নে প্রকাণ্ড এক যান্ত্রিক ডাইনোসর। যতটা পারা যায় পিছু হটে ঝোপের ভেতর গা-ঢাকা দিলো আজাদ। তবে ওখান থেকে আবার একটা গুলি করল। এবার প্লেক্সিগ্লাস মাকড়সার জাল হয়ে গেল। গলার ভেতর ঘড়ঘড়ে আওয়াজ নিয়ে গালি দিলো এক লোক।

'আরে শালে মার ডালা!'

লোকটার মুখে কী যেন আছে– পান? আর ওই ভাষা? আজাদ নিশ্চিত নয়– ওর শুনতে ভুল হয়েছে কি-না। হিন্দি শুনল, নাকি উর্দু? সঙ্গে সঙ্গে স্যাঁৎ করে ওপরে উঠে গেল কপ্টার, দ্রুত গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে পুবদিকে।

ছুটে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো আজাদ, আরও ক'টা গুলি করল কপ্টার লক্ষ্য করে। পাহাড়ের চূড়া টপকে দ্রুত নিচু হলো ওটা, হারিয়ে গেল কালো আকাশের গায়ে।

ভেসপাটা দ্রুত একবার পরীক্ষা করল আজাদ, কিন্তু তরুণের পরিচয় জানার মতো কিছু পেলো না। বোতাম টিপে হেড ল্যাম্প অফ করল। তারপর ঘুরল কন্টেসার দিকে।

'তুমি ঠিক আছ?' জিজ্ঞেস করল সুজানিকে, সে এখন সিটে বসে ফোঁপাচ্ছে।

'হ্যাঁ। এসব কী ঘটল ওখানে?'

রাইফেলটা বুটে রেখে দিলো আজাদ। 'আমার কোনো ধারণা নেই।' পুব আকাশের দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকল দু'সেকেন্ড। ব্যাপারটা কী...?

আপন মনে মাথা নাড়ল। জল্পনাকল্পনার মধ্যে যেতে চাইছে না। আজ রাতটা শুধু আনন্দ উপভোগের জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করল। 'প্যাল্যাৎসোয় তো, কন্টেসা?'

'প্লিজ আজাদ,' বলল সুজানি, ওর গায়ে গা ঠেকিয়ে কাঁপছে একটু একটু। তাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল আজাদ, কিন্তু নিজের অজান্তে চোখ দুটো আবার উঠে গেল আকাশের দিকে।

ভাবছে জালে জড়ানো ওই লোকটা কে হতে পারে। মার্কিং ছাড়া কপ্টার চালানো বেআইনি, তাহলে কার এত সাহস যে ইটালির আকাশে ওড়াউড়ি করছে কোনো রকম চিহ্ন ছাড়া, আলো ছাড়া? কে এবং কেন?

ওর কাঁধ টনটন করছে। এটা ভালো লক্ষণ নয়। এর মানে হলো, শিগগির ওকে কাজে হাত দিতে হবে।

দুই

মরণঘুম

এই বিপ-বিপ শব্দের সঙ্গে সাবমেরিনে থাকা সোনার-এর মিল আছে; পালা করে হাই সি আর হাই ডি টোন। একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভাঙল আজাদের। সিলিংয়ে পানির প্রতিবিম্ব নাচানাচি করছে। লালচে প্যাল্যাৎসোর বাইরে একটা লেক থাকার কথা, মনে পড়ল ওর। কন্টেসার কথাও মনে পড়ল। পাশ ফিরতেই সুজানির নিরাবরণ সোনালি কাঁধ দেখতে পেলো, নীলচে পশমের তৈরি চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে রয়েছে। মাথা থেকে চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছাই আর সোনালি রঙের রাশি রাশি চুল।

বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল আজাদ। সঙ্গে সঙ্গে ওর দিকে ফিরল সুজানি, ঘুম লেগে থাকা চোখ মেলে দেখল ওকে, হাত দুটো এগিয়ে এলো ওর দিকে। আবার কন্টেসার কোমল আলিঙ্গনে আটকা পড়ল আজাদ।

কিন্তু এখন আবার বিপ-বিপ আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছে। এক হাতে সুজানিকে জড়িয়ে রেখে খুদে রেডিও টেলিফোনটা নিজের পেছন থেকে সামনে নিয়ে এলো, দেখতে লাইটারের মতো, তারপর বালিশের তলায় গুঁজে রাখল। বিপ-বিপ, বিপ-বিপ সুরটা এখন ভোঁতা শোনাচ্ছে।

হেসে উঠে ওকে চুমো খেলো কন্টেসা।

বিপ-বিপ, বিপ-বিপ থামছে না।

বালিশের তলা থেকে বের কের যন্ত্রটাকে নামিয়ে রাখল মেঝেতে। তারপর ওটার ওপর ভাঁজ করা একটা চাদর চাপা দিলো।

আওয়াজ কমে গেল, তবে শোনা যাচ্ছে।

কন্টেসাকে চুমো খেলো আজাদ। কাত হয়ে ওর মুখোমুখি হলো সে। হাসিমুখে চোখ বুজল, আজাদের চারপাশে শক্ত করল নিজের বাঁধন।

এবার আওয়াজের ধরন পাল্টে গেল, অনেকটা উলুধ্বনির মতো শোনাচ্ছে।

বিপ-বিপ-বিপ-বিপ...

'এক্সকিউজ মি' বলে কন্টেসার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াল আজাদ, তারপর ভাঁজ করা চাদরের তলা থেকে বের করল যন্ত্রটা। পরিবর্তিত আওয়াজের অর্থ, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স জরুরি কোনো কারণে ওকে ডাকছে। বিছানার কিনারায় বসে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল। বোতামে চাপ দিতেই বন্ধ হলো শব্দ।

'আজাদ।'

'ঠাকুর।'

'স্বভাবতই।' মোসলেউদ্দিন ঠাকুরের গলা চিনতে পারল আজাদ। ভদ্রলোক বাংলাদেশ কাউন্টার এসপিওনাজের অপারেশনাল ডিরেক্টর। তার চকচকে টাক মাথাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। 'হ্যাঁ, বলুন।'

'ইমার্জেন্সি। রিপিট, ইমার্জেন্সি। ডিনো এখানে। তোমার সঙ্গে মিটিংয়ে বসতে চাইছেন।'

'ডিনো?'

'মার্শাল ডিনো।'

'তিনি এখানে মানে কোথায়?'

'ক্যাপ্রিতে।'

'আমি ভেবেছিলাম, আপনি জেনেভার একটা সেফ হাউসে আছেন।'

'আমি কাল ইটালিতে এসেছি। তুমি কোথায়?'

'অ্যাভালিনোর কাছাকাছি।'

'এখানে পৌঁছাবে কখন?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'গুড। চলে এসো।'

যোগাযোগ কেটে গেল।

হাতের যন্ত্র নামিয়ে রেখে হাই তুলল আজাদ, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর দাঁড়াল। ইন্টারকম অন করে নিচু গলায় কিছু বলল ও।

'ডার্লিং,' এলোমেলো বিছানা থেকে ঘুম-ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল সুজানি, 'কী করছ?'

'তোমার জন্যে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলাম। তোমাকে একা রেখে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে।'

'জানোয়ার!'

'অতি নীচ প্রকৃতির।'

'আমার সঙ্গে অন্তত ব্রেকফাস্টও করবে না?'

কন্টেসার চিবুক ধরে উঁচু করল আজাদ, চুমো খেলো ঠোঁটে। 'সত্যি দুঃখিত। কাজ, তুমি জানো।'

বিছানায় উঠে বসল সুজানি, হাত দুটো উঁচু করে চুলে আঙুল চালাচ্ছে, তার বুক থেকে খসে পড়ল চাদর। একটু একটু করে ওটা আবার তুলল।

হাসল আজাদ। 'প্যালমিরা থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে স্ট্রবেরি। তরমুজ এসেছে দামেস্ক থেকে। ডিম ভাজা হয়েছে ১৯৭১ সালের কনিয়্যাক দিয়ে। কফি রোস্ট করা হয়েছে গতকাল লেবাননে, আর গুঁড়ো করা হয়েছে আজ সকালে। তাজা ক্রিম গরুর দুধ থেকে...'

'বিলাসিতা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুজানি। 'অথচ তোমাকে মিস করতে হচ্ছে।'

'ব্রেকফাস্ট ছাড়াও আমার চলবে,' বলল আজাদ। 'কিন্তু তোমার অভাব আমি অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করতে পারব না।'

'ডার্লিং।'

ল্যান্সিয়া চালিয়ে নেইপলস ডকে চলে এলো আজাদ, ওখানে লা বন চান্সে চড়ল, ওটা ওর নিজের লঞ্চ। কিছুক্ষণ পরই ক্যাপ্রির দূর প্রান্তে দেখা গেল ওকে, ওর ভিলা সংলগ্ন জেটির সঙ্গে শিশুর নার্সকে রশি দিয়ে বাঁধছে–অন্তত বন (Bonne) শব্দের সেটাই মানে। এই ভিলা এক সময় এক ফ্যাসিস্ট মিলিওনেয়ারের সম্পত্তি ছিলো, ১৯৪৫ সালে মুসোলিনি মঞ্চ থেকে বিদায় নেয়ার পর দেনা শোধ করতে বিক্রি করে দেয়া হয়। প্রসঙ্গত, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মিলানের সেই বিখ্যাত চৌরাস্তায় মাথা নিচে আর পা ওপরে তোলা অবস্থায় মুসোলিনির বিদায় পর্ব শুরু করা হয়েছিল।

জাকি আজাদ লাফ দিয়ে লঞ্চ থেকে নামল, পাথুরে ধাপ বেয়ে লম্বা পথ পেরোচ্ছে। ধাপগুলোর মাথায়, ভিলার উঠানে, মোসলে ঠাকুর আর ডিউক মারবেনিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে, অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

জন্মসূত্রে সিসিলিয়ান মারবেনি, কিন্তু দেখতে একদম সাধারণ কোনো সিসিলিয়ানের মতো নয়। তার চুল আশ্চর্য হলুদ, পাকা লেবুর মতো, রোদ লাগলে পুরো সাদা দেখায়। গাট্টা-গোট্টা অ্যাথলেট শরীরের পরিবর্তে একহারা সে, তার আকৃতি ও আকারে লুকিয়ে আছে ক্ষিপ্রতা। কড়া ধমকের সুর নয়; সে কথা বলে খাঁটি অক্সফোর্ড উচ্চারণে। সবাই তাকে ডিউক বলেই ডাকে। জাকি আজাদের মতো সিনিয়র না হলেও, সে-ও বাংলাদেশ কাউন্টার এসপিওনাজের একজন এজেন্ট, আজাদের সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে, ওর অন্ধ ভক্ত, তথ্যের ভাণ্ডার, আন-আর্মড কমব্যাটে ওস্তাদ, টেকনিক্যাল যে কোনো বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান রাখে।

'আজাদ,' মোসলে ঠাকুর বললেন, 'তুমি লেট।'

'না, আপনি আগেভাগে পৌঁছেছেন, বরাবরের মতো।'

উঠানে দাঁড়িয়েই করমর্দন, কুশল বিনিময় ইত্যাদি চলছে; পেছন দিকে ম্লান হলুদ রঙের রাজকীয় ভিলা হেলান দিয়ে আছে আকাশের গায়ে। ভিলার ওপর দিকে পাহাড়ি ঢালে আঙুর খেত।

'ডিনো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'তুমি আসছ শুনে আমি তার ঘুম ভাঙিয়েছি। প্যারিস ফ্লাইট ক্লান্ত করে তুলেছে তাকে।'

'সমস্যাটা কী?'

'প্রথমে কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাকে আমরা খানিক ধারণা দিতে চাই,' বললেন ঠাকুর।

'বেশ,' বলল আজাদ। 'আমরা তাহলে ভেতরে বসি?'

ভিলার লিভিং রুমে চলে এলো তিনজন। যারা বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত তাদের রুচি আর আরামের কথা মনে রেখে ফার্নিচার বানানো হয়েছে। পারস্য থেকে আনা কার্পেট, দেয়াল মখমল দিয়ে ঢাকা, অলঙ্কৃত ঝাড়বাতি আর সারি সারি অসংখ্য ল্যাম্প।

'আশা করি, দোস্ত, ভারি সুন্দর কিছুতে বাগড়া দিইনি আমরা,' বলল ডিউক, সে হাসছে না।

'এন্টারটেইনমেন্টে বাধা, সেটাকে বড় করে দেখি না,' বলল আজাদ। 'কিন্তু ওই রেডিও-ফোনের টোন অবশ্যই বদলাতে হবে। ওটা আমার নার্ভে খোঁচা মারে। ইআরএফ ন্যাচারাল হলে কেমন হয়?'

'তোমার মিউজিক্যাল সেন্স একটা কালা গরুর মতো!' প্রতিবাদের সুরে বললেন মোসলে ঠাকুর। 'আমরা ওটা সি আর ডি করে দেব, তুমি তোমার টিন কানকে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ো।'

'তথাস্তু' বলে ইমেডিয়েট বসের সিদ্ধান্ত মেনে নিলো আজাদ। ওদের এই ঝগড়াটা বেশ প্রাচীন, সেই যখন থেকে ওরা লং রেঞ্জ রেডিও-টেলিফোন ব্যবহার করছে, একাধিক মহাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পরস্পর ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষার কাজে।

দেয়াল ঘেঁষে ফেলা একটা কাউচে বসল আজাদ, জানালা দিয়ে টাইরেনিয়ান সাগর দেখা যাচ্ছে। 'নিন, শুরু করুন।'

সিগারেট ধরিয়ে কাছাকাছি সোফায় বসলেন মোসলে

ঠাকুর। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রিন্স ফিলিপো রিমিনি। নামটা শুনেছ?'

ভ্রূ কুঁচকালো আজাদ। 'আপনি আমার মেমোরিকে ওভারটাইম করাচ্ছেন। তার সম্পর্কে কোথাও পড়েছি বোধ হয়। ঠিক মনে করতে পারছি না; মুসোলিনির খুব প্রিয় ছিলেন? শরীরে রাজবংশের রক্ত? মিত্রপক্ষের হয়ে কাজ করার জন্যে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান। প্যারিসের লোকজনকে এক করার কাজে অবিশ্বাস্য সাফল্য পেয়েছিলেন। তার কথা বলছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ঠাকুর, চোখের তারায় খুশির ঝিলিক– প্রিয় এজেন্টের কাছ থেকে এর চেয়ে কম কিছু তিনি আশা করেননি। 'যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন পরই কমিউনিস্টদের হাতে খুন হয়ে যান ইটালির অভিজাত এই রাজনীতিক। তারা সন্দেহ করছিল তাদের পার্টিজিয়ানি দখল করার লক্ষ্যে তলে তলে বাধা সৃষ্টি করছেন তিনি। সত্যি তাই করছিলেন।'

'এই খুন আক্রমণাত্মক একটা রাজনৈতিক কেলেঙ্কারির জন্ম দেয়, যেমনটি বইয়ে লিখেছে?'

'একদম। এবার খানিকটা পারিবারিক ইতিহাস। প্রিন্স ফিলিপোর একটিমাত্র ছেলে। ছেলে প্রসব করার সময় স্ত্রী মারা যান। সেই ছেলে, প্রিন্স ফেরানিস রিমিনি, সত্তর বছর বয়সে বিয়ে করেন, তাঁর স্ত্রী যমজ সন্তান প্রসব করেন, এবং দুদিন পর মারা যান। এই যমজরাই রিমিনি পরিবারের এখন একমাত্র বংশধর। তাদের বাবাও, তারা ছোট থাকতেই মারা যান। সহায়-সম্পত্তির অভাব ছিলো না, তবে তারা বড় হয়েছেন চাকরবাকর আর দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনদের কাছে। যমজরা– একটা ছেলে আর একটা মেয়ে– পলা রিমিনি আর ম্যারিয়ো রিমিনি। সম্ভবত যমজ বলেই ভাই-বোন পরস্পরের প্রতি সাংঘাতিক আবেগপ্রবণ; একেবারে সেই ছোটবেলা থেকে।'

আবার ভ্রূ কুঁচকাল আজাদ। 'এক মিনিট। নামটা, পলা রিমিনি, রিং দিচ্ছে। তার না বিয়ে হয়েছে?'

উত্তর না দিয়ে ডিউকের দিকে তাকালেন মোসলে ঠাকুর।

ডিউক মারবেনি বলল, 'হ্যাঁ আজাদ, তার বিয়ে হয়েছে– এ কথা বলা যায়, কিন্তু সে বিয়ে কোনো চার্চে দাঁড়িয়ে বা কোনো ফাদারকে দিয়ে পড়ানো হয়নি।'

'ও, হ্যাঁ! ডক্টর ক্লাইভ কাসলার, আমেরিকান কেমিকেল টাইকুন! তিনি আর পলা রিমিনি লিভ-টুগেদার করছেন– কেউ বলে বান্ধবী, কেউ বলে মিসট্রেস; আবার অনেকে দ্বিতীয় স্ত্রীও বলে।'

'ভেরি গুড,' বললেন মোসলে ঠাকুর। 'ডক্টর ক্লাইভ কাসলার সম্পর্কে আর কী জানো?'

'জানি। কাসলার আমেরিকা ছেড়ে এসেছেন, তার কারণ বিয়ে নিয়ে একটা জটিলতা। তার স্ত্রী কোনোভাবেই তাকে ডিভোর্স দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। আরও একটা কারণ, ওষুধের পেটেন্ট নিয়ে মার্কিন এক কেমিকেল কোম্পানির সঙ্গে আইনগত ঝামেলা বেধে যায়। তিনি দাবি করছিলেন, ওটা ওই



কোম্পানি তার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

দু'কান পর্যন্ত লম্বা হাসি নিয়ে ডিউক বলল, 'আমেরিকানরা না সব সময় ভুল সব জিনিস নিয়ে ফাইট করে। কল্পনা করো– বিয়ে আর পেটেন্ট!'

'বন্ধু এক কেমিস্টের অনুরোধে ইটালিতে আসেন কাসলার, তারপর নেইপলসের বাইরে বিশাল প্ল্যান্ট তৈরি করেন– কেমিসি কনসলিডেটি। শুরু থেকেই ফাইন্যান্সিয়াল জাদু হিসেবে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ওটা।'

'তোমার স্মরণ করার দৌড় ঈর্ষা করার যোগ্য', বললেন মোসলে ঠাকুর। 'একশ ভাগ নির্ভুল।'

'এসব মিলে কী দাঁড়াচ্ছে?'

ডিউকের দিকে তাকালেন মোসলে ঠাকুর।

নড়েচড়ে বসে ডিউক বলল, 'আরও একটা পয়েন্ট, আজাদ। বোন পলা রিমিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে ওই কেমিকেল প্ল্যান্টে ভাই ম্যারিয়ো রিমিনির জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেকশন হেড হিসেবে। পলা দায়িত্ব নিয়ে এবং সচেতনতার সঙ্গে সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন, যাতে তিনি চিরকালই অভ্যস্ত। কিন্তু ম্যারিয়ো, যদিও তিনি একজন প্রিন্স, তার ধারণা ইটালির অভিজাত মহল নৈতিকতা

আর সংস্কৃতির অবনতি ঘটাচ্ছে, তাদের ঘটে বুদ্ধি বলতে কিছু নেই, এবং তারা অসুস্থ।'

'আমি তার সঙ্গে একমত,' বিড়বিড় করল আজাদ।

'হ্যাঁ, কিন্তু বলাবলি করে তো সেটা বদলানো যাচ্ছে না। নেইপলসের বাইরে ছোট্ট এক খামারবাড়িতে থাকেন ম্যারিয়ো, অনেক আগে সেখানে তাদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়কে থাকতে দেয়া হয়েছিল। জায়গাটা অ্যাভালিনোয় যাবার রাস্তায় পড়ে। লোকজনের ভিড় এড়িয়ে একা থাকতে পছন্দ করেন আর কি। সন্দেহ নেই, অদ্ভুত একটা টাইপ। স্পোর্টস কারের ভক্ত, নিজের ভেসপা আছে, স্কিন ড্রাইভ ভালোবাসেন, প্লেন চালাতে জানেন, সাগরে বোট নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়েন ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'অ্যাভালিনো?' জিজ্ঞেস করল আজাদ। অ্যাভালিনো আর ভেসপা, শব্দ দুটো শুনে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠেছে।

বাইরে থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এলো, এক মুহূর্ত পর এক ভদ্রলোক লিভিং রুমে ঢুকলেন। জাকি আজাদ দাঁড়াল; দাঁড়াল ডিউক মারবেনি। সোফায় বসা মোসলে ঠাকুর তার উদ্দেশে শুধু একটু মাথা ঝাঁকালেন। হাত লম্বা করে দিয়ে আজাদের দিকে হেঁটে আসছেন ভদ্রলোক।

মার্শাল ডিনো শীতল, আত্মবিশ্বাসী, শান্ত এবং দেখতে অতি সাধারণ; বয়স পঁয়তাল্লিশ; তিনি শোল্ডার প্যাডিং ছাড়াই সুট পরেন, তার শার্টে থাকে উঁচু কলার, ট্রাউজারে কোনো হিপ থাকে না। লম্বায় মাঝারি, মুখের সবকিছু সাইজমতো, চোখ নীল, মুখে কোনো দাগ বা তিল নেই, মাথায় কমতে শুরু করা লালচে চুল। আজাদের উল্টোদিকে বসে তিনি তার টুইড জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা পাইপ বের করলেন, প্লাস্টিক পাউচ থেকে নিয়ে ম্যাপেল-গন্ধী তামাক ভরলেন তাতে।

'আমাদের দেখা হয়েছিল বেলজিয়ামে,' আজাদকে মনে করিয়ে দিলেন মার্শাল ডিনো। 'ইয়েমেনি আর পাকিস্তানি কিছু ইসলামী জঙ্গি নেতা নতুন একটা সংগঠন খুলে বাংলাদেশি স্বেচ্ছাসেবক রিক্রুট করছিল, লক্ষ্য ছিলো একাধিক সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে একদিকে পেন্টাগনে হামলা চালানো, আরেকদিকে বাংলাদেশ সরকারের নীতিনির্ধারক মন্ত্রীদের হত্যা করা, যাতে বর্তমান সরকারের পতন ঘটে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল আজাদ। 'আমরা অতর্কিতে হানা দিয়ে ওই নেতাদের ধাওয়া করে ধরি, তুলে দিই পাকিস্তান আর ইয়েমেনি পুলিশের হাতে।'

'দু'দেশের সরকারই তাদের ছেড়ে দেয়,' গম্ভীর সুরে বললেন ডিনো।

'সেটা অবশ্য আরেক ঘটনার জন্ম দিয়েছে,' মন্তব্য করল আজাদ।

ডিনো হাসলেন, তাকে তৃপ্ত মনে হচ্ছে। 'সেই আরেক ঘটনাও এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে, মিস্টার জাকি আজাদ। সে প্রসঙ্গে আসছি আমি। অতীতের কথা স্মরণ করে শুধু এটুকু বলতে চাই, সেবার আপনি পেন্টাগনের খুব বড় একটা উপকার করেছিলেন। আর তাই, গতরাতে যখন এই ব্যাপারটা আমাদের নলেজে এলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়ে বলেছি আপনার সাহায্য চাইতে। মাত্র আজ সকালে সবুজ সংকেত পেয়েছি। এবং এখন আমি এখানে।'

'আমি তাহলে ধরে নেবো আপনি পেন্টাগনের প্রতিনিধিত্ব করছেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আর সেজন্যেই, আপনি জানেন, আপনাকে এখন যা বলব সেটা গোপন রাখতে হবে।'

'আর কী?' জানতে চাইল আজাদ।

পাইপে টান দিয়ে নীলচে ধোঁয়া ছাড়লেন ডিনো। 'আপনি সাহায্য করছেন তো?'

'তার আগে সমস্যার ধরন সম্পর্কে আভাস পেতে হবে আমাকে।'

'অবশ্যই।' মার্শাল ডিনো নিজের বক্তব্য গুছিয়ে নিলেন। 'সমস্যার নাম মরণঘুম।'

'মরণঘুম?' সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল আজাদ। 'আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন।'

'সিরিয়াসলি। মরণঘুম হলো যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে লাগবে এরকম একটা গ্যাসের যথাযোগ্য টাইটেল, যেটা ডেভলপ করেছেন ডক্টর ক্লাইভ কাসলার নামে একজন কেমিস্ট। তাকে আপনি চিনতে পারেন।'

আজাদ আর মোসলে ঠাকুর দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'মরণঘুমের প্রপার্টিজ এক কথায় ফ্যানট্যাস্টিক। এটা একটা নক-আউট গ্যাস, কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য হলো হিউম্যান সিস্টেমে এটা নাক বা মুখ দিয়ে প্রবেশ করে না, প্রবেশ করে লোমকূপ দিয়ে।'

মৃদু শিস বাজাল আজাদ।

'মরণঘুমের খানিকটা এক্সপেরিমেন্টাল ডোজ নিয়ে দেখেছি আমি,' মার্শাল ডিনো বলে যাচ্ছেন। 'ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। প্রথমে আমি শুধু ত্বকে শিরশিরে একটা ভাব অনুভব করলাম। তারপর, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, প্রবল জ্বালাপোড়ার অনুভূতি, প্রায় পয়জন আইভি লাগার মতো প্রতিক্রিয়া, গ্রাস করল আমাকে। এর কিছুক্ষণ পরই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙল দু'ঘণ্টা পর– এতটুকু পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ছাড়াই!'

মাথা ঝাঁকাল আজাদ।

'আপনি এর সম্ভাবনাগুলো দেখুন। গ্যাস স্প্রে করুন, এক ফোঁটাও রক্ত না ঝরিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে যাবেন, তারপর আরামসে নিরস্ত্র করুন শত্রুকে!'

'সমস্যাও নিশ্চয় আছে। কী সেটা?' জানতে চাইল আজাদ।

'যুদ্ধের সময় গ্যাসের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয় মাস্কের সাহায্যে। আপনি গ্যাস স্প্রে করলেন, শুইয়ে দিলেন শত্রুকে, গ্যাস মাস্ক পরলেন, যারা ধরাশায়ী হয়েছে তাদের দিকে হেঁটে গেলেন। মরণঘুম গ্যাসের বেলায় সমস্যাটা সেভাবে সমাধান করা যাবে না। ওই গ্যাস যেহেতু লোমকূপ দিয়ে শরীরের ভেতরে ঢোকে, কাজেই একটা প্রতিষেধক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এয়ারটাইট প্লাস্টিক ওভার্ক ক্লথের কথা ভাবা হয়েছিল, স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্রিদিং ডিভাইসসহ, কিন্তু বাতিল করা হয়েছে। কারণ ওটা জবড়জং হওয়ায় সেভাবে নড়াচড়া করতে দেবে না। তাই এটার একটা প্রতিষেধক বের করার জন্যে আরও গবেষণা করছিলেন ডক্টর কাসলার...কিন্তু তিনি আর সেটা আমাদের দিতে পারলেন না!'

মার্শাল ডিনোর তীব্র হতাশা লক্ষ করল আজাদ। 'আপনি এমন সুরে কথা বলছেন...ডক্টর কাসলার কি মারা গেছেন?'

'না। দু'রাত আগে নেইপলসের রাস্তায় তার ওপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় একটা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। গভীর কোমায় চলে গেছেন ভদ্রলোক। কবে তার জ্ঞান ফিরবে, আদৌ ফিরবে কি-না, কিছু বলতে পারছেন না ডাক্তাররা। শুধু যে তার ওপর হামলা করা হয়েছে, তা নয়। ওই একই সময়ে তার প্ল্যান্টের ভেতর কড়া পাহারায় রাখা ভল্টের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করা হয়েছে মরণঘুমের ফর্মুলা চুরি করার জন্যে। ডক্টর কাসলার ছাড়া আর কারও জানা নেই ওটা বানাতে কী কী উপাদান দরকার হয়। তিনি নিজে সেটা আবিষ্কার করেছেন, রেখেছেনও

একা শুধু নিজের মগজে আর ওই ভল্টের ভেতর।'

'আপনি বলতে চাইছেন ফর্মুলা ওই এক কপিই, আর সেটা আছে ওই ভল্টে?' জিজ্ঞেস করল আজাদ, গলায় অবিশ্বাসের সুর।

'ঠিক তা নয়। ফর্মুলার একটা ডুপ্লিকেট কপি পেন্টাগনেও আছে, তবে সেটার সঠিক অবস্থান এতটাই টপ সিক্রেট, ঠিক কোথায় আছে জানতে এক ডজন কম্পিউটারের সাহায্য লাগবে। ওটা ওখানে রাখা হয়েছে এ-কথা ভেবে যে, কেমিসি কনসলিডেটির যদি কিছু ঘটে– ফিজিক্যাল ডেস্ট্রাকশন বা ওরকম কিছু। পয়েন্টটা হলো, মরণঘুমের ফর্মুলা আমাদের হাতে থাকার মানে আমরা নিরাপদ। কিন্তু শত্রুরা যদি ওটা পেয়ে যায়– বিঙ্গো!'

'চোর কি ফর্মুলাটা নিয়ে যেতে পেরেছে?'

'না। একজন গার্ড গুলি করে তার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে।'

'আহ! চোর কে, তার পরিচয় জানা গেছে? আমরা জানি কারা ওটা পেতে চাইছে?'

'লোকটা সাধারণ একজন গানম্যান। এটা জানার কোনো উপায় নেই যে কে বা কারা তাকে ভাড়া করেছিল।'

হতাশায় ভ্রূ কুঁচকাল আজাদ।

'রাশিয়ার ওপর আমাদের সিকিউরিটি চেক থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, এ বিষয়ে ওরা কিছু জানে না। জানে না চীন আর উত্তর কোরিয়াও।'

'ইসলামিক স্টেট?'

মাথা নাড়লেন ডিনো। 'মিনি অ্যাটম বোমা সংগ্রহের চেষ্টা করছে– এরকম রিপোর্ট পাবার পর থেকে গোটা ইউরোপ আর আমেরিকায় আইএস'কে দৌড়ের ওপর রাখা হয়েছে।'

'তাহলে বাকি থাকল কারা?'

'আমার মনে হচ্ছে ফর্মুলাটা হাতে পাবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে কোনো ইন্ডিপেনডেন্ট এজেন্সি– উদ্দেশ্য পুব এবং পশ্চিম, দু'পক্ষকেই ব্ল্যাকমেইল করা।'

'আইএসআই?' মোসলে ঠাকুরের দিকে তাকাল আজাদ, তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন। মার্শাল ডিনোর দিকে ফিরল আজাদ। 'সমস্যাটা তাহলে কড়া পাহারায় রাখা ভল্টে ঢুকে ফর্মুলাটা নষ্ট করা?'

'সমাধান এত সহজ হলে তো কথাই ছিলো না,' ম্লান সুরে বললেন ডিনো। 'সমস্যা আরও জটিল। কাল রাতে আরও একটা ডেভলপমেন্ট ঘটেছে। ম্যারিয়ো রিমিনি, ডক্টর কাসলার প্ল্যান্টের একজন সেকশন হেড, কাল রাতে কেমিসি কনসলিডেটি থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় কোথাও থেকে কিডন্যাপ হয়েছেন।'

চোখ মিটমিট করল আজাদ। 'ঠিক কীভাবে, বলবেন?'

'প্ল্যান্ট ছেড়ে যাবার পর তিনি স্রেফ বাড়িতে পৌঁছেননি। ভল্টের ওই ঘটনার পর থেকে আমরা প্ল্যান্টের পাহারা আরও জোরদার করেছি, এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষের বাড়িতেও ঢিলেঢালা সিকিউরিটি চেকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ম্যারিয়ো রিমিনিও আছেন।'

'দেখা যাচ্ছে খুব বেশি ঢিলেঢালা চেক,' বিড়বিড় করল আজাদ। 'প্ল্যান্টটা নেইপলসের বাইরে, অ্যাভালিনোয় যাবার পথে পড়ে; তাই তো?'

মার্শাল ডিনোর ভ্রূ কপালে উঠে গেল। 'হ্যাঁ। কেন?'

'আমার ধারণা, ম্যারিয়ো রিমিনিকে ইটালি থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে,' বলল আজাদ। তারপর কাল রাতে অচিহ্নিত হেলিকপ্টার নিয়ে ঘটে যাওয়া বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলো।

মার্শাল ডিনো দুঃখ রাখার জায়গা পাচ্ছেন না। 'কী ভাগ্য আমাদের! আপনার থিয়োরি নিঃসন্দেহে সঠিক। তা না হলে, হেলিকপ্টার কেন? ফিউজিলাজে কোনো মার্কিং নেই কেন? কপ্টার পুবদিকে যাবে কেন?

'কট্টর ইসলামিক দল ক্ষমতায়, এর সঙ্গে তুরস্ক জড়িত নয় তো?' বিড়বিড় করলেন মোসলে ঠাকুর।

'সরাসরি জড়িত কিনা সন্দেহ আছে আমার,' বলল আজাদ। 'তবে এমন হতে পারে যে কেউ বা কোনো এজেন্সি তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করছে, আর তারা হয়তো দেখেও না দেখার ভান করছে। সময়মতো কাজ হাসিল হলে নিজের ভাগ বুঝে নেবে। এখানে হয়তো প্রাসঙ্গিক নয়, তবে কথাটা আমার মনে বারবার উঁকি দিচ্ছে– যুদ্ধাপরাধী নিজামীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা নিয়ে তুরস্ক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বেআইনিভাবে নাক গলাতে শুরু করেছে।'

শরীরের ভার বদল করলেন মার্শাল ডিনো। 'এখন আপনি বুঝতে পারছেন কেন আমরা ভল্টের ভেতর হেঁটে গিয়ে মরণঘুম ফর্মুলা ধ্বংস করতে পারি না। ম্যারিয়ো রিমিনিকে যারাই ধরে নিয়ে যাক, তার জীবনের মুক্তিপণ হিসেবে ফর্মুলাটা চাইবে তারা। আর এটা প্রায় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, এই দাবি তারা জানাবে প্রিন্সেস পলা রিমিনির কাছে, তার যমজ বোন, ডক্টর কাসলারের মিসট্রেস।'

'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?'

'ডক্টর কাসলার ভয় পাচ্ছিলেন তার নিজের ওপর ওরকম একটা আঘাত আসতে পারে। তিনি পলা রিমিনিকে কঠিন নির্দেশ দিয়ে গেছেন ভল্ট খুলে ফর্মুলাটা ধ্বংস করে ফেলতে হবে, যদি কখনো তাকে খুন করে ফেলা হয়।'

'এসব আপনারা যখন জানতেনই, ম্যারিয়ো রিমিনিকে তাহলে কড়া পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করেননি কেন?'

'না, আগে থেকে এসব আমরা জানতাম না। জেনেছি কাল রাতে, পলা রিমিনিকে রিপোর্ট করার সময় যে তার ভাইকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'শুনে কি তিনি ভল্টে ঢুকে ফর্মুলা ধ্বংস করতে চাইলেন?'

'না, তা তিনি চাননি, চাইবেন বলে মনেও হয় না, কারণ ডক্টর কাসলার তো মারা যাননি, শুধু হামলার শিকার হয়েছেন।'

'তারপরও আমি এটা বুঝতে অক্ষম কেন আমরা ভল্টে ঢুকে ফর্মুলাটা ধ্বংস করব না।'

'রিমিনিরা জাতীয় বীর, মিস্টার আজাদ।' মার্শাল ডিনোকে সামান্য হলেও নার্ভাস দেখাচ্ছে। 'ইটালির সব মানুষ এখন পর্যন্ত তাদের দাদুকে মনে রেখেছে। তা ছাড়া, ওদের শরীরে রাজপরিবারের রক্ত বইছে। ম্যারিয়োর যদি কিছু ঘটে কিংবা পলার– ডক্টর কাসলার আর আমেরিকাকে দায়ী করা হবে। বিপজ্জনক একটা মার্কিন গ্যাস ফর্মুলা ইটালির মাটিতে রাখতে দেয়া, ইত্যাদি...আরে, কী বলেন, ব্যাপারটা ন্যাটোকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে।'

'তার মানে আপনি বলছেন, মুক্তিপণ চাইতে দিই ওদেরকে, ম্যারিয়ো রিমিনিকে উদ্ধার করি, তারপর ফর্মুলা ফিরে পাবার চেষ্টা করব?'

'ঠিক তাই। শুধু ম্যারিয়ো রিমিনি আমাদের হাতে নিরাপদে ফিরে আসার পর।'

'আমরা ওদের হাতে একটা নকল ফর্মুলা ধরিয়ে দিতে পারি না?'

প্রবলবেগে মাথা নাড়লেন মার্শাল ডিনো। 'না, কোনো অবস্থাতেই না। একজন কেমিকেল এক্সপার্ট এক মুহূর্তে নকল কি-না ধরে ফেলবে। না, ওদেরকে আসলটাই দিতে হবে।'

'ধরুন আমরা উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছি, এবং

ফর্মুলাটা তারা পেয়ে গেল। তার কী পরিণতি হতে পারে?'

'জানা কথা, ওটা তারা দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে, এবং এশিয়া থেকে আমেরিকাকে খেদিয়ে দেবে!' মার্শাল ডিনো বিস্ফোরিত হলেন। 'কোনো অবস্থাতেই এটা ঘটতে দেয়া যাবে না!'

'না, এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই, আমি স্রেফ সম্ভাবনার দিকগুলো বিবেচনা করে দেখছি,' বলল আজাদ। 'এবার ধরুন, এর পেছনে যদি আইএসআই থেকে থাকে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, পাকিস্তান সরকারকে আমরা গ্রাহ্য করি না। প্রায় প্রতিদিনই আমরা ওদের আকাশে ড্রোন পাঠিয়ে জঙ্গিদের আস্তানায় বোমা ফেলছি, অনুমতি নেয়ার ধার দিয়েও যাই না– কই, ওরা কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে?'

মাথা নাড়ল আজাদ। 'আমি কিন্তু আপনাকে পাকিস্তান সরকারের কথা বলিনি।'

হাসলেন মার্শাল ডিনো। জানি, আপনি বলতে চাইছেন আইএসআই অনেক সময় নিজ সরকারকে গোপন করেও অনেক কাজ করে, এবং ওদের একটা অংশ সরকারের নয়, বরং শিয়াবিরোধী জঙ্গিদের প্রতিনিধিত্ব করে।'

'শুধু যে শিয়াবিরোধী, তাও নয়; কিছু আইএসআই কর্মকর্তা নিজেদের আখের গোছাবার জন্যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র পাকায়, এমন দৃষ্টান্ত আছে। তারা সভ্যতাবিরোধী কাজ করে।'

হাসিটা আরও উজ্জ্বল হলো ডিনোর মুখে। 'আমার ঠিক তাই সন্দেহ– আইএসআই এখানেও সেরকম একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে থাকতে পারে। আর সেজন্যেই পেন্টাগনকে আমরা পরামর্শ দিয়েছি, আপনার সাহায্য নেয়া হোক। ওদের সম্পর্কে আপনার চেয়ে ভালো খুব কম এসপিওনাজ এজেন্টই জানে। ওদের বিরুদ্ধে লাগার অভিজ্ঞতাও আর সবার চেয়ে বেশি আপনার।'

'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বলল আজাদ। 'প্রথমে আমরা কী করব? আপনি কি কোনো প্ল্যান অব অ্যাকশন তৈরি করেছেন?'

'পলা রিমিনিকে সার্ভেইলান্সের মধ্যে রাখা। কিডন্যাপাররা যখন তার সঙ্গে মুক্তিপণের জন্যে যোগাযোগ করবে, তার ওপর এমনভাবে নজর রাখতে হবে, তিনি যেন তার ভাইয়ের মুক্তি নিশ্চিত করার পরই শুধু ফর্মুলাটা হাতছাড়া করেন। যখন জানা যাবে ম্যারিয়ো রিমিনিকে আমরা বহাল তবিয়তে নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়েছি, তখন আমরা ফর্মুলা উদ্ধারের চেষ্টা করব; তার আগে নয়।'

'আমার পরামর্শ,' ডিউক মারবেনি তিক্ত সুরে বলল, 'কিডন্যাপাররা যখন যোগাযোগ করবে তখনই ওদেরকে আটক করা দরকার, গলায় ছুরি ধরে বলতে হবে– ম্যারিয়ো রিমিনিকে ছেড়ে দে।'

'প্রশ্নই ওঠে না!' প্রায় ধমকে উঠলেন মার্শাল ডিনো। 'তারা স্রেফ আরও লোক পাঠাবে। আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য ফাঁস করে দেবো, ফলে প্রিন্সেস রিমিনির ওপর সেভাবে নজর রাখাও সম্ভব হবে না। লেজেগোবরে অবস্থা দাঁড়াবে।'

মাথা ঝাঁকাল আজাদ। 'কিন্তু যারা যোগাযোগ করবে তারা যদি প্রিন্সেসকে আটক করে ফেলে, তখন?'

'এই ক্যালকুলেটেড রিস্কটা আমাদের নিতে হবে যে, তা তারা করবে না। পেন্টাগনের বড় বড় মাথা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন– খেলাটা এই নিয়মে খেলতে হবে, এটা ধরে নিয়ে যে বিনিময় পর্বটা সাধারণত যেভাবে সম্পন্ন হয় এক্ষেত্রেও সেভাবে হবে। আপনি শুধু প্রিন্সেসের দেখভাল করার জন্যে ওখানে থাকবেন, তার বেশি কিছু না, তার কমও কিছু না।'

'আপনি বলছেন ভল্টটাকে যথেষ্ট কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে?'

'সাইক্লোন ফেন্সের ওপর হাই টেনশন লাইন। অ্যালসেশিয়ান পুলিশ ডগ টহল দিচ্ছে, অচেনা কাউকে দেখামাত্র তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। গেটের গার্ড আর ভেতরের গার্ডদের নতুন নির্দেশ দেয়া হয়েছে আগে গুলি করতে হবে, কথা হবে পরে। প্রিন্সেস পলা ছাড়া আর কারও পক্ষে ওই ফর্মুলার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।'

সাবধানে দম ছাড়ল আজাদ। 'কঠিন কাজটা এখনই সারতে চাই আমি। অসম্ভব কাজটায় খানিক পরে হাত দেবো।'

নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল মার্শাল ডিনোর ঠোঁটে। 'সেটা খুব বেশি পরে হবে না, আমার বিশ্বাস। আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

তিন

আইএসআই

নেইপলস শহরতলি। অ্যাপার্টমেন্টি ডিননিউর্থসির বিলাসবহুল লবি। আধো মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছে জাকি আজাদ। গদি-মোড়া চেয়ারে বসে আছে, মাথার ওপর ঝুলছে রাশি রাশি রঙচঙে কাচের সমষ্টি– ঝাড়বাতি। সময় সকাল সাড়ে দশটা। বাইরে প্রখর রোদ। চোখ মেলে চারদিকে তাকালে গ্রাম ও শহর, দুটোই এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। গাছে গাছে প্রচুর পাখি, সবই যেন গানের প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়ে গলা সাধছে।

কাউন্টারে একটা টেলিফোন এলো। রিসিভার তুলল কেরানি। মুহূর্তে তার মুখের পেশি টান টান। লবিতে হঠাৎ নীরবতা। সারি সারি এলিভেটরের দিকে ছুটে গেল কেরানির দৃষ্টি, লাল এবং আলোকিত একটা তীর চিহ্ন দেখছে।

'লা প্রিন্সিপেশা!' কেরানি বলল, গলায় চাপা জোর এনে।

একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী হুট করে পিছিয়ে আড়ালে চলে গেল। করণিক তার টাই টেনেটুনে ঠিক করল, সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে এলিভেটর ইন্ডিকেটরের দিকে।

এলিভেটরের দরজা খুলে যাচ্ছে, হাতের কাগজ নিচু করল আজাদ। এলিভেটর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তার মাথায় রাশি রাশি কালো সিল্ক চুল, মুখে প্রকাণ্ড আকারের কালো চোখ, দৃষ্টি বলে দিচ্ছে ওই চোখের মালিকের ওপর অশরীরী কিছু ভর করেছে। লবিতে পা রাখলেন, তাকিয়ে আছেন নাক বরাবর সোজা, মাথা রাজকীয় ভঙ্গিতে উঁচু করা, তিনি যেন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহারানি। তার পরনে ডাইঅর স্ট্রিট থেকে সংগ্রহ করা কোট, মাথায় ব্লু-ব্ল্যাক চুলে পরেছেন কমলা রঙের ছিটা দেয়া হ্যাট। উজ্জ্বল প্রবালের তৈরি কানের দুল তার চোখের কালো মণির সঙ্গে ম্যাচ করা।

কোমরের কাছে শরীর ভাঁজ করে বো করল কেরানি, সরাসরি তাকাতে পারছে না। তার দিকে তিনি তাকালেন কি তাকালেন না। সদর দরজায় একজন দারোয়ান দৃঢ় ভঙ্গিতে কবাট ধরে পিছু হটল, দাঁড়াল সদ্য খোলা দরজার আড়ালে। এক সেকেন্ড পর লোকটাকে পাশ কাটিয়ে ধাপ ক'টা বেয়ে নামলেন তিনি, দাঁড়িয়ে থাকা একটা ক্যাবে ঢুকলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা চলতে শুরু করল।

নিচু করা হাতের কাগজ এখনও পড়ছে আজাদ।

মেকানিকের ইউনিফর্ম সাদা পুলওভার পরা এক লোক ঢুকল লবিতে, হাতে সার্ভিস ব্যাগ। পায়ের শব্দ পেলেও আজাদ কাগজ থেকে মুখ তুলল না। লোকটা ডেস্কের দিকে হাঁটছে।

'টেলিফুনো,' বিড়বিড় করল লোকটা।

'সি,' বলল কেরানি। 'সোজা ওপরে উঠে যাও।'

মাথা ঝাঁকাল মেকানিক, আজাদের পাশ ঘেঁষে এলিভেটরের দিকে হাঁটছে। ওই লোক ডিউক মারবেনি।



দু'জনেরই ভান, কেউ কাউকে খেয়াল করবে না।

ডিউকের সুচিন্তিত ছদ্মবেশের কথা স্মরণ করে মনে মনে হাসল আজাদ। তার সাদা পুলওভারের ল্যাপেলে কালো হরফে স্টেনসিল করা আছে 'গিয়াকোমো সালজিনো' নামটা।

এখানেই ডিউক মারবেনির নেপথ্যের সৌন্দর্য। একজন সিসিলিয়ান হিসেবে তার অনেক কাজিন আন্তর্জাতিক মাফিয়ার সঙ্গে জড়িত। জীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে মাফিয়ার সদস্যদের খুঁজে পাওয়া যাবে। গিয়াকোমো সালজানি নেইপলস টেলিফোন কোম্পানির একজন চাকুরে।

বিশ মিনিট পর হাতের কাগজ ভাঁজ করে চেয়ার ছাড়ল আজাদ, কেরানিকে পাশ কাটিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনের দিকে এগোচ্ছে। লোকটার সঙ্গে শুকনো হাসি বিনিময় হলো।

ল্যান্সিয়ায় ফিরে হেলান দিয়ে বসল আজাদ, যেন ছুটি কাটাতে এসে অলস ভঙ্গিতে রোদ পোহাচ্ছে, দুনিয়ার কিছুই তার গ্রাহ্য করার দরকার নেই। সাড়ে সাত মিনিট পর ওর পকেটের আর/টি থেকে পরিচিত বিপ-বিপ আওয়াজ বেরিয়ে এলো।

'এ মাথায় ডিউক। সব কাজ শেষ। তার ফোনে ছারপোকা ঢোকানো হয়েছে।'

'গুড। টেপ রেকর্ডার কোথায়?'

'বেজমেন্টে আমার এক লোক আছে। আমার এক মাফিয়াসো।'

'ওখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। আমরা তাকে চার ঘণ্টার পালায় দু'ভাগ করে নেবো। তার প্রতিটি নড়াচড়া লিখিত চাই আমি।'

'ঠিক আছে, আজাদ।'

একটা ফোন কল পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিলো ওরা, সেটা এলো রাত দশটায়। নিজের ভিলায় ছিলো আজাদ, বিবিসি লন্ডনের খবর শুনছিল, এই সময় উঠান হয়ে ভেতরে ঢুকল ডিউক। হাতে ছোট্ট একটা টেপ রেকর্ডার। 'এই যে!'

টিভি বন্ধ করে দিলো আজাদ। ডিউকের বাড়ানো হাত থেকে টেপ রেকর্ডার নিয়ে প্লেব্যাক বোতামে চাপ দিলো।

প্রথমে একটা নারীকণ্ঠ শোনা গেল। 'প্রন্টো।'

সামনের দিকে ঝুঁকল আজাদ। প্রিন্সেসের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার এবং প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। তার বাচনভঙ্গির মধ্যে ইটালিয়ান সুর স্পষ্ট, তবে নোংরা নেইপলিটান সুর একেবারেই নেই।

'আমি কি প্রিন্সিপেসা পলা রিমিনির সঙ্গে কথা বলছি?' এটি একটি পুরুষকণ্ঠ, ভরাট আর ভারি, ভায়োলেন্স চেপে রাখার চেষ্টা থাকায় বেসুরো শোনাচ্ছে। তার উচ্চারণের মধ্যে অদ্ভুত এক বিচ্যুতি আছে, শব্দের শেষদিকে টানা সুর থেকে যায়। এই লোকের মাতৃভাষা ইটালিয়ান নয়, একজন বিদেশি হিসেবে ভাষাটা শিখেছে। ভারতীয়? পাকিস্তানি? তার মাতৃভাষা উর্দু, নাকি হিন্দি?

'হ্যাঁ। আপনি কে, প্লিজ?' প্রিন্সেসের গলা সামান্য কাঁপল। আজাদ বুঝতে পারছে, পলা জানেন কারা ফোন করেছে, এই ফোন কল পাবার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি।

'যদি জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপারটা আপনার ভাইকে নিয়ে আর কি।'

কঠিন একটা ঢোক গিললেন পলা। তারপর আবার যখন কথা বললেন, দম প্রায় নিতেই পারছেন না। 'সি।'

'আমার কাছে তার খবর আছে। কাল সন্ধ্যায় অবশ্যই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হতে হবে, ভায়া সান কার্লোর ডা গিয়াকোমিনোয়। ওটা আপনি চেনেন?'

'সি।'

চেনে আজাদও। ছোট, সুন্দর একটা রেস্তোরাঁ, বিশেষ করে নামকরা খেলোয়াড়দের আড্ডা হয় ওখানে। ওই ভিড়ের মধ্যে প্রিন্সেসকে প্রটেকশন দেয়া সম্ভব নয়। তার কনট্যাক্টকে যদি সহজে চিনতে পারা না যায়, লোকজনের ওপর চোখ বুলিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়ার আশা খুবই কম। জায়গাটা বড় বেশি অভিজাত।

পুরুষকণ্ঠ কথা বলে যাচ্ছে। 'সময় ঠিক সাড়ে ছ'টা, ঠিক আছে? ডা গিয়াকোমিনোয়, ঠিক আছে?'

'সি,' সাড়া দিলেন প্রিন্সেস।

'আপনি যদি এই বিষয়টা কাউকে জানান, জীবনে আর কখনো ভাইকে দেখতে পাবেন না– জীবিত।'

'আমি বুঝতে পেরেছি,' ফিসফিস করলেন প্রিন্সেস, তার গলা এখন বিরতিহীন কাঁপছে। যতোই সাহস আর আত্মবিশ্বাস থাক, এই মুহূর্তে প্রবল হতাশায় হাল ছেড়ে দেয়ার কিনারায় পৌঁছে গেছেন তিনি।

রাগে নিজের ঠোঁট কামড়াল আজাদ।

কলার যোগাযোগ কেটে দিলো।

টেপ রেকর্ডার বন্ধ করল আজাদ।

'ডা গিয়াকোমিনোর ওই শেডিউলড মিটিংয়ে যে কথাবার্তা হবে তার প্রতিটি শব্দ আমি শুনতে চাই,' নির্দেশের সুরে ডিউককে বলল আজাদ।

'ওদের কিচেনে আমার বন্ধু আছে। এক কাজিন।'

'গুড। লিসনিং ডিভাইস বসাতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে সে। ওখানে কুলঙ্গি টাইপের কিছু নেই, দৃষ্টিপথের বাইরে বসে সবকিছু দেখতে পাবো আমি? কনট্যাক্ট লোকটাকে দেখতে চাই আমি।'

'আছে।'

'তাহলে আমার জন্যে ব্যবস্থা করো।' উঠল আজাদ। 'টেপ রেকর্ডার নিচে নিয়ে এসো। ওটা আমি চেক করে দেখতে চাই। এটা খুবই সম্ভব লোকটার ভয়েস প্রোফাইল থাকতে পারে আমাদের কাছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডিউক। 'অসম্ভব নয়।'

হেলিকপ্টার থেকে ভেসে আসা গলার স্বর শুনে ওর মনে হয়েছিল, পাক-ভারত উপমহাদেশের টান আছে; বিশেষ করে হিন্দি বা উর্দু ভাষার। তবে এই লোক সেই একই লোক নয়।

'কথার মধ্যে টানটা নিঃসন্দেহে ভারতীয় বা পাকিস্তানি,' বলল আজাদ।

'আমার কোনো ধারণা নেই। তবে কম্পিউটার জানতে পারে।'

যে এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নামল দুজন, সেটা এঁকেবেঁকে ক্যাপ্রির নিরেট পাথরে পৌঁছে দিলো ওদেরকে। দেয়ালের গায়ে ভেজা ভাব চকচক করছে। সিলিংয়ে আলো। ওয়াইন সেলারে ঢুকল ওরা। একদিকের দেয়ালের ওপর দিকে ছোট্ট একটা জানালা আছে, গরাদের ওপারে সমুদ্র দেখা যায়। পরিষ্কার আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে।

দেয়াল ঘেঁষে সাজানো সারি সারি ওয়াইন ভর্তি বোতল। প্রকাণ্ড সব কাঠের পিপেও দাঁড় করানো। নিঃসঙ্গ পিপেটা উঁচু পাথুরে বেদির ওপর শুয়ে। হাত বাড়িয়ে ওটার মুখ খুলল আজাদ, যেভাবে আলমারির দরজা খোলে। আসলে ওটা ওয়াইন ভর্তি পিপে নয়। কম্পিউটার, সামনের প্যানেলে বোতাম, আলো আর পোর্ট।

একটা পোর্টে টেপ রেকর্ডারের তার ঢোকাল ডিউক, তারপর অন বোতামে চাপ দিলো। এক মিনিট কিছুই ঘটল না, শুধু কম্পিউটারের পর্দায় বিচিত্র রঙের আলো জ্বলল আর নিভল। তারপর প্রিন্টারের সরু ফাটল গলে একটা কার্ড বেরিয়ে এলো। সেটা নিয়ে আজাদের দিকে বাড়িয়ে ধরল ডিউক। তাতে লেখা:

পরিচয় অজ্ঞাত।
পুরুষ, বয়স সাতচল্লিশ।
ইটালিতে বিদেশি।
মূল ভাষা সম্ভবত হিন্দি, উর্দু বা পাঞ্জাবি।
শক্ত-সমর্থ কাঠামো। পেশিবহুল
আইকিউ কম।
সহ্যগুণ আর জেদ বেশি।

শিস বাজাল আজাদ। 'দেখলে? আমি ঠিক ধরেছি। সম্ভবত উর্দু। চলো যাই, ডিউক। আমি চাই তুমি আমার জন্যে ডা গিয়াকোমিনোয় মঞ্চ সাজিয়ে রাখবে।'

'চলো দোস্ত।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আবার আমরা আইএসআইর বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছি।' চিন্তাটা ওকে মোটেও খুশি করতে পারছে না।

ছ'টা ত্রিশ মিনিট, নেইপলস। ডা গিয়াকোমিনো রেস্তোরাঁর মূল ডাইনিং রুমের পাশে, ছোট্ট ঝুল-বারান্দার আরও ছোট টেবিলে বসে রয়েছে জাকি আজাদ, মাঝেমধ্যে আস্ত জলপাই ডোবানো কালো কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। কানে ডিভাইস আটকানো, হেয়ারিং এইডের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। ওর বসার জায়গা থেকে মূল ডাইনিং রুম দেখা যাচ্ছে, তবে ওখান থেকে ওকে দেখা যাবে না, যদি না কেউ খুব সতর্কতার সঙ্গে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

একজন ওয়েটার হুট করে কোত্থেকে উড়ে এসে ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল। অস্বস্তি নিয়ে তার দিকে তাকাল আজাদ। ডিউককে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে কেউ যেন ওকে বিরক্ত না করে। ওয়েটার লোকটা কে বুঝতে পেরে হাসল ও।

'তুমি একেবারে নিখুঁত ফরাসি ওয়েটার হতে পেরেছ, ডিউক। এটাকে তোমার প্রফেশন হিসেবে নেয়া উচিত।'

'কিন্তু আমরা যে সুইসাইড গেমটা খেলি তাতে আরও অনেক বেশি মজা,' মন্তব্য করল ডিউক। 'তিনি চলে এসেছেন। আজ বিকেলে আমি নিজে তার পিছু নিয়েছিলাম। ভায়া সিআইয়া-য় দুটো দোকানে শপিং করেছেন। ভায়া রোমা-য় একবার গেছেন, রেনফ্রো থেকে জুতো কিনেছেন। তারপর সোজা এখানে চলে এসেছেন।'

মাথা ঝাঁকাল আজাদ। 'ডিভাইসটা? রোপণ করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।' আড়ষ্ট হয়ে গেল ডিউক। 'ওই তিনি আসছেন!'

হাত ঝাপটা দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলো আজাদ।

ধীর পায়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল ডিউক, দেখল হেড ওয়েটার যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে প্রিন্সেসকে একটা টেবিলে বসাচ্ছে।

উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকা কামরায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বিরাট চাপের মধ্যে আছেন। ম্লান দেখাচ্ছে তাকে, চোখের চারপাশে কালো বৃত্ত। অপরূপ সুন্দর তিনি, উপলব্ধি করল আজাদ, কেতা-কায়দা আর হাবভাবে রাজকীয় সৌন্দর্য আর মর্যাদার প্রতিফলন।

হাতের দস্তানা ধীরে ধীরে খুলে ফেলছেন, কামরার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে। অভিজাত খদ্দেরদের দু'চারজন চিনতে পারলেন তাকে। হাতের আড়াল নিয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর উদ্দেশে ফিসফিস করছেন তারা।

হেড ওয়েটার যখন টেবিলের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, তখন

প্রিন্সেসের একটা আঙুল মেন্যু বেয়ে নিচে নামছে। তারপর তিনি মাথা ঘুরিয়ে ডিউক মারবেনির দিকে তাকিয়ে একটা অর্ডার দিলেন। বো করল ডিউক, বার লক্ষ্য করে হন-হন করে হাঁটছে। এক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলো, ট্রেতে মার্টিনি, তাতে আস্ত জলপাই ভাসছে।

প্রিন্সেসের সামনে মার্টিনি নামিয়ে রেখে আজাদের দিকে হেঁটে আসছে ডিউক। পকেটে থাকা সুইচে চাপ দিলো আজাদ, সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল কানে। তারপর ধরতে পারল প্রিন্সেসের সঙ্গে কথা বলছে হেড ওয়েটার।

'আপনার অতিথি এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সার্ভ করব, প্রিন্সিপেসা,' ইটালিয়ান ভাষায় বলল সে।

ডিউকের চোখাচোখি হতে মাথা ঝাঁকাল আজাদ। হাঁটার গতি না বদলে আজাদকে পাশ কাটাল ডিউক, রেস্তোরাঁর পেছনে কিচেনে ফিরছে। খুদে মাইক্রোফোন-ট্র্যান্সমিটার জলপাইয়ের আকৃতি নিয়ে প্রিন্সেসের মার্টিনিতে ভাসছে। একদম নিখুঁত কাজ করছে ওটা। আজাদ নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলো ইলেকট্রনিক্সের এ থেকে জেড পর্যন্ত সবকিছু ডিউকের জানা থাকায়।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর, মাথায় মেহদি রাঙানো চুল, সারা শরীরে শ্বেতি, গাট্টা-গোট্টা কাঠামো, চোকৌ মুখ, বুলডগের মতো চিবুক, হেঁটে এসে প্রিন্সেসের টেবিলের সামনে থামল।

আজাদ দেখল লোকটার মধ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তের ছাপ স্পষ্ট।

'মাই ডিয়ার প্রিন্সিপেসা,' তার গলার আওয়াজ বাজল আজাদের কানে। 'এত সুন্দর একটা পরিবেশে আপনাকে একা পেয়ে কী ভালো যে লাগছে!' এই গলা আগেও শুনেছে আজাদ, প্রিন্সেসকে এই লোকই ফোন করেছিল।

'আপনাকে ধন্যবাদ,' স্পষ্ট স্বরে বললেন প্রিন্সেস, গলায় অবাধ্য হতে চাওয়ার লক্ষণ।

'আমি আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারি?' ভরাট, ভারি গলায় প্রশ্ন করল লোকটা, কথায় উর্দু টান।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন প্রিন্সেস, চেহারায় কোনো ভাব প্রকাশ পেলো না।

ঝুল-বারান্দার পর্দা এক চিলতে ফাঁক করে তাকিয়ে আছে আজাদ। ওর দিকে পেছন ফিরে প্রিন্সেসের টেবিলে বসেছে লোকটা। পলা রিমিনি তার ড্রিঙ্কস নাড়াচাড়া করছেন।

'আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, প্রিন্সেস,' লোকটাকে বলতে শুনল আজাদ। 'প্রথম কথা, ব্যাগ থেকে বের করে আপনার মোবাইল ফোনটা আমার সামনে রাখুন।'

এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন প্রিন্সেস। জানতে চাইলেন, 'কেন?'

'আমি বলছি, তাই। বলছি আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবেই। ব্যাগ খুলুন, প্লিজ।'

আরও এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ব্যাগ খুলে মোবাইল ফোনটা টেবিলে রাখলেন প্রিন্সেস। সেটা হাতে নিলো কিডন্যাপার, নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর নিজের পকেটে ভরে রাখল।

'আমি শুধু এখানে এসেছি আপনাকে একটা অ্যাসাইনমেন্টের বিশদ বিবরণ জানাতে,' বলল সে। 'যেটা আপনি আমাদের হয়ে করে দেবেন।'

'অ্যাসাইনমেন্ট?' সাহস করে হাসলেন প্রিন্সেস।

'ডক্টর কাসলার আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। আমরা জানি ডক্টর কাসলার গুরুতর অ্যাক্সিডেন্ট করলে, সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেয়া আছে– আপনিই তখন কেমিসি কনসলিডেটিতে বসানো ভল্টে রাখা একটা ডকুমেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্ব পাবেন।'

'আপনি কী বলছেন আমি বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করলেন প্রিন্সেস।

'আমি নিশ্চিত আপনি সব বুঝতে পারছেন। ডক্টর কাসলারের অফিসে আসা-যাওয়া করার অনুমতি আছে আপনার, আর ভল্টটা ওখানেই। গার্ড আপনাকে ঢুকতে দেবে। তাদেরকে সেরকম নির্দেশই দেয়া আছে। আপনি ওই ভল্ট থেকে আমাদের জন্যে একটা বিশেষ ফর্মুলা সংগ্রহ করবেন, যেটার নাম মরণঘুম। ওটার বিনিময়ে আমরা আপনার ভাইকে মুক্ত করে দেবো। সরাসরি তুলে দেবো আপনার হাতে।'

চেয়ারে বসা প্রিন্সেসের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। ঝুল-বারান্দা থেকে আজাদ দেখতে পেলো তার চোখে এক ফোঁটা পানি চিকচিক করছে। তার ভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে, মরণঘুম ফর্মুলা সম্পর্কে সবই তিনি জানেন, আর তাই এই ভেবে আতঙ্কিত বোধ করছেন জিনিসটা শত্রুদের হাতে পড়লে তার দেশের জন্যে পরিস্থিতি কী বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

'এ কাজ আমি করতে পারব না,' ফিসফিস করলেন তিনি।

পেশিবহুল, শক্তিশালী লোকটা তার দিকে ঝুঁকল; আশপাশে যারা এই বেমানান জোড়াটাকে লক্ষ্য করছে তাদের কথা ভেবে মিটিমিটি হাসছে।

'আপনার সামনে কোনো বিকল্প নেই। আপনি যদি আমাদের কথামতো কাজ না করেন, আপনার ভাই– আপনার যমজ এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবেন।'

কনট্যাক্ট আর প্রিন্সেস, দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রিন্সেস অটল থাকতে পারলেন না, ভেঙে পড়লেন। 'হ্যাঁ,' অবশেষে বললেন তিনি, আবেগে কাতর হয়ে মাথা নত করলেন। 'আপনি যা বলেন...।'

ধবল বলদের মতো দেখতে গাট্টা-গোট্টা লোকটা প্রিন্সেসের হাত চাপড়ে দিলো। 'গুড।'

রাগের সঙ্গে ঝট করে হাতটা টেনে নিলেন প্রিন্সেস। তার মুখ আগুনের শিখা হয়ে উঠল। 'আমাকে ছোঁবেন না!'

প্রিন্সেসের টেবিল থেকে আরও দু'টেবিল পেছনে চলে গেল আজাদের দৃষ্টি, ডাইনিং রুমে আরেক লোককে ঢুকতে দেখছে, প্রিন্সেসের সঙ্গে যে কিডন্যাপার বসে রয়েছে তার মতোই কাপড়চোপড়– সস্তা, ভাঁজ নষ্ট সুট, পায়ে বিরাট জুতো। প্রথম লোকটার চেয়ে একটু বেশি লম্বা সে, শরীর সবটাই হাড় আর পেশির সমষ্টি।

টেবিল ছেড়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে আজাদ। মার্শাল ডিনোর ক্যালকুলেটেড রিস্ক সুফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। কনট্যাক্ট বলে ধারণা করা হলেও, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এটা একটা পিক-আপ। এই আয়োজন অবশ্যই এই মুহূর্তে বাতিল করতে হবে।

'বাইরে আমাদের লিমুজিন অপেক্ষা করছে। এখন আমরা যাব, প্রিন্সিপেসা। আপনি বুঝতে পারছেন?'

আকস্মিক আতঙ্কে নিজের চারদিকে তাকালেন প্রিন্সেস। টেবিলের কিনারা চেপে ধরেছেন, আঙুলের গিঁট সব সাদা হয়ে গেল। তবে ফিসফিস করলেন তিনি। 'হ্যাঁ।'

মার্শাল ডিনোর অতিরিক্ত আশা আর দূরদৃষ্টির অভাবকে নীরবে অভিশাপ দিচ্ছে আজাদ। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক করছে, এই সময় পকেটে থাকা আর.টি. সতর্ক করে দিলো ওকে। এর মানে হলো, ডিউকও বিপদটা টের পেয়েছে। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি লাইটারটা বের করে আনছে, হঠাৎ একটা আচ্ছন্ন ভাব অনুভব করল আজাদ। চোখ নামিয়ে নিজের মার্টিনির দিকে তাকাল, মাথা নাড়ছে। ডিউক নিশ্চয়ই ওকে একটা ডাবল দিয়েছে। ওকে মার্টিনি দেয়া স্রেফ লোক দেখানো

ব্যাপার ছিলো। তা না হলে ঝুল-বারান্দায় ওর উপস্থিতি মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করত। কিন্তু ডাবল কেন?

বোতাম টিপে রেডিও-টেলিফোন অন করল আজাদ। সঙ্গে সঙ্গে ডিউকের চাপা উত্তেজিত গলা ঢুকল কানে। 'আজাদ! আইএসআই। ওদের একজনকে আমি চিনতে পেরেছি। সে এইমাত্র কিচেনে ঢুকেছে। তুমি প্রিন্সেসকে ধরো, তারপর টেনে বের...'

ক্লিক করে শব্দের সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল যন্ত্র। আজাদ এখন একা। ডিউককে তারা অচল করে দিয়েছে। প্রিন্সেসের টেবিলের দিকে তাকাতে চাইছে ও, বেশ কষ্ট করতে হলো, ভাবছে ওর রিফ্লেক্সের আবার কী হলো। প্রথম লোকটার সঙ্গে যোগ দিয়েছে দ্বিতীয় জন, এখন তারা দু'জন মিলে প্রিন্সেসকে দাঁড়াতে সাহায্য করছে।

আজাদের পায়ের নিচে কামরাটা ঘুরতে শুরু করেছে। ওর হাঁটু দুটো দুর্বল। যাতে পড়ে না যায় সেজন্যে ইচ্ছেশক্তি খাটাচ্ছে। টেবিলের ওপরটা খামচে ধরতে গেল, চেষ্টা করছে চিন্তাশক্তি যাতে হারিয়ে না ফেলে। ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে সবচেয়ে সহজ কৌশলটা প্রয়োগ করা হয়েছে ওর ওপর– ককটেলে ড্রাগ মিশিয়ে। যারা নজর রাখছিল, তাদের ওপরই এখন নজর রাখা হচ্ছে।

ওর পেছন থেকে হাসির শব্দ ভেসে এলো। কোনো রকমে ঘুরে তাকাল আজাদ। হাসিতে ফেটে পড়া একটা কদর্য চেহারা। এই লোককে আগেও কোথাও দেখেছে ও, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না কোথায়। তারপর মনে পড়ল, মার্শাল ডিনো যে ঘটনার কথা স্মরণ করছিলেন– বেলজিয়ামে। হাস্যরত এই লোক আইএসআই এজেন্ট, একই সঙ্গে একজন জঙ্গি নেতাও বটে।

'আজকের দিনটা আপনার নয়, জনাব আজাদ!' বলল সে, গলার স্বরে বিতৃষ্ণা ও বিদ্রূপ।.

নিজের পতন ঠেকাতে দম আটকে রেখেছে আজাদ। বাঁ হাত দিয়ে মারার ভান করে ডান হাত চালাল লোকটার গলা লক্ষ্য করে। এক পা পিছাল আইএসআই। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে মুঠো দুটো এক করে মাথার ওপর তুলল সে, নামিয়ে আনছে আজাদের পেটে। ওগুলো ধরে ফেলল আজাদ, নিচের দিকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নামাল লোকটার ঘাড়ে। তারপর দু'জনেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে।

আজাদের দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। এখন প্রায় কিছু দেখতেই পাচ্ছে না। চারদিক থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে ওর দৃষ্টিপথ দখল করে নিচ্ছে ঘন কালো মেঘ। টলমল করতে করতে সিধে হলো, মাতালের মতো হাঁটছে।

আজাদকে লক্ষ্য করে লাথি চালাল লোকটা। ঘুরে গেল আজাদ, ঝুল-বারান্দার পর্দা ধরে টান দিলো। পেছন থেকে খসখসে একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। আঘাত এড়ানোর জন্যে ঘুরতে যাচ্ছে, কিন্তু ওর হাঁটু নরম জেলি হয়ে গেল। এখন কিছু দেখতে বা শুনতেও পাচ্ছে না।

'প্রিন্সেস!' চেঁচিয়ে উঠতে চাইল আজাদ। 'থামুন! আপনি বিপদে আছেন!'

চার

ফর্মুলা

ডা গিয়াকোমিনোর সামনের রাস্তায় কালো একটা ক্যাডিলাকের পেছনের সিটে বসে আছেন লা প্রিন্সিপেসা পলা রিমিনি, ধরে রাখার চেষ্টা করছেন নিজের সাহস, বুদ্ধি আর সতর্কতা। খুব ভয় পাচ্ছেন তিনি, জীবনে এত ভয় আগে কখনো পাননি, তবে সেটা প্রকাশ না করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'এখন আমরা নেইপলসের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখব,' তৃপ্তির সুরে বলল ড্রাইভার। রেস্তোরাঁর ভেতর এই লোকই প্রিন্সেসের সঙ্গে টেবিলে বসে ছিল। 'রাত ঠিক দশটায় আপনি ভল্টে ঢুকবেন, প্রিন্সেস।'

'হ্যাঁ, ঠিক দশটায়, ইউসুফি,' প্রিন্সেসের পাশে বসা লোকটা বলল।

ক্যাডিলাক স্টার্ট দিলো ইউসুফি, হঠাৎ আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে। 'কাজটা, বুঝলে মালিকি, ব্রিটিশরা যেমন বলে, আ পিস অব কেক!'

প্রিন্সেসের ওপর চোখ বুলাল মালিকি। 'অতটা নিশ্চিত হয়ো না ইউসুফি। ওই ব্যাটা বাংলাদেশির কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।'

'ননসেন্স। তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' কর্কশ একটু হেসে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলো ইউসুফি। 'ঝুল-বারান্দা থেকে আমাদের ওপর নজর রাখছিল, আমি তাকে ওখানে ঢলে পড়তে দেখেছি।'

'আর তার সঙ্গী, কিচেনে ঘুরঘুর করছিল?'

হাসিমুখে নিজের গলার ওপর আঙুল চালাল ইউসুফি, জবাই করার ঢংয়ে। 'বাংলাদেশি হারামজাদাকে মিনিট কয়েকের মধ্যে জনাব মখমলের ইয়টে নিয়ে যাওয়া হবে। বিনিময় পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই আটকে রাখা হবে শালাকে।'

শিউরে উঠলেন পলা রিমিনি। ওদের আলাপের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি। তার প্রতিটি নার্ভ চিৎকার করছে। মনে হচ্ছে শুধু তীব্র টেনশনের কারণে তিনি না জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তবে নিজেকে অনেক চেষ্টায় সোজা করে রেখেছেন।

'রিল্যাক্স, প্রিন্সেস,' বলল ইউসুফি, ভারি ট্র্যাফিকের ভেতর দিয়ে সাবধানে ক্যাডিলাক চালাতে চালাতে কর্কশ স্বরে হাসল। তার যত্ন না নেয়া দাঁতগুলো দেখতে পাচ্ছে পলা। 'আপনার পালা আসতে এখনও দেরি আছে।'

ক্যাডিলাকের পেছনের সিটে হেলান দিলো মালিকি। চোখ বুজলেন পলা। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেছেন এই দু'জন ইতর প্রাণীকে তার চোখের পানি দেখতে দেবেন না।

যেন বহু বছর পেরিয়ে যাবার পর প্রিন্সেসের ঘড়িতে দশটা বাজল। রাতের নেইপলসকে শুধু আলোকিত নয়, উৎসবমুখরও মনে হয়। অনেকক্ষণ হয়ে গেল ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা, কিন্তু লোক দু'জনের সঙ্গে একটা কথাও বলেননি তিনি। ইউসুফি আর মালিকি নিজেদের মধ্যে বেশিরভাগ সময় উর্দুতে আলাপ করছে।

তারা যখন বকবক করছে, প্রিন্সেস তখন একটা কঠিন সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছেন। এই পেশাদার খুনিদের হুমকি-ধমকির কাছে নতি স্বীকার করা সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার সহজ সমাধান। তিনি নেহাতই একজন নারী, তবে তিনি একজন প্রিন্সেসও বটেন। ইটালির কাছে তার কিছু ঋণ আছে। তিনি লড়বেন– ঠিক তার দাদু, প্রিন্স ফিলিপো রিমিনির যেভাবে লড়েছিলেন। তখন, শুধু তখন, ম্যারিয়ো, তার ভাই, তাকে নিয়ে গর্ব বোধ করবে।

'আমরা পৌঁছে গেছি,' মালিকি চাপা গলায় যেন গজরাচ্ছে। 'প্রিন্সেস, মন লাগিয়ে কথাগুলো শুনবেন। গার্ড আমাদেরকে থামাবে। তখন ওদেরকে বলবেন, আপনি ভেতরে ঢুকতে চান। আপনাকে তারা বিনা বাধায় ভেতরে ঢুকতে দেবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?'

কেমিকেল প্ল্যান্টের মূল গেটের দিকে এগোচ্ছে গাড়ি। লম্বা

শেডের মতো দেখতে বিল্ডিংয়ের পাশে বড় বড় হরফ পেইন্ট করা হয়েছে, দ্বিগুণ উঁচু করা একটা সাইক্লোন ফেন্সের কাছে:

CHIMICI CONSOLIDATI

ফেন্সের মাথায় দু'প্রস্থ ইলেকট্রিফায়েড তার, উঁচু করে ঝোলানো হয়েছে কেউ যাতে টপকানোর চেষ্টা না করে। সাইক্লোন ফেন্সের পেছনে প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান হাউন্ড গোটা প্ল্যান্টে টহল দিচ্ছে। ওটাকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে অচেনা কাউকে দেখামাত্র ধরবে, এবং যতক্ষণ তার মনিব নির্দেশ না দেবে ততক্ষণ তাকে ছাড়বে না।

এসব তথ্য মার্শাল ডিনোর মুখ থেকে শুনেছেন পলা।

ধবল বলদ, ইউসুফি, মাথা ঘোরাল। 'শুনুন, প্রিন্সেস। গার্ড যদি সন্দেহবশত কোনো প্রশ্ন করে, আপনি বলবেন ডক্টর কাসলার জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, এবং তিনি আপনাকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছেন– ভল্ট থেকে জরুরি কিছু ফাইল বা কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে। আমরা কেন তাঁর অফিসে ঢুকতে চাইছি, তার একটা ব্যাখ্যা দেয়া হবে।'

'হ্যাঁ।'

প্ল্যান্টে বহুবার যাওয়া হয়েছে প্রিন্সেসের। প্রতিবার তার সঙ্গে ক্লাইভ ছিলেন। গার্ডরা সবাই তাকে চেনে। বিশেষ লিখিত অনুমতি ছাড়াই ভেতরে ঢোকা তার জন্যে কোনো সমস্যা নয়। কেমিসি কনসলিডেটির কেউ জেনেশুনে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেবে না তাকে। মরণঘুম ফর্মুলা সংগ্রহ করার জন্যে কিডন্যাপাররা পুরোপুরি ফুলপ্রুফ একটা প্ল্যান ধরে এগোচ্ছে।

প্ল্যান্টের গেটে থামল লিমুজিন। উইন্ডশিল্ড দিয়ে সরাসরি গাড়ির ভেতর উজ্জ্বল স্পটলাইটের আলো ঢুকল। চোখ ধাঁধিয়ে যাবার ভয়ে হাত তুলে ঠেকাবার চেষ্টা করল ড্রাইভার ইউসুফি। একজন গার্ড, লোহার জাল লাগানো ইস্পাতের গেটের ভেতর থেকে, চোখ কুঁচকে ওদেরকে দেখার চেষ্টা করছে। বেল্টে আটকানো হোলস্টার থেকে পিস্তল টেনে নিয়ে ইঙ্গিতে ড্রাইভারকে ক্যাডিলাক থেকে নিচে নামতে বলল সে।

মালিকির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল ইউসুফি। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো মালিকি। সিটে, নিজের পাশে, একটা ধাতব আওয়াজ শুনতে পেলেন প্রিন্সেস পলা। চোখের কোন দিয়ে তাকাতে দেখতে পেলেন জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তল বের করে তাতে ছোট ব্যারেল আকৃতির সাইলেন্সার ফিট করছে মালিকি।

আবার একবার শিউরে উঠলেন তিনি।

ঝাঁকিবহুল হাঁটার ভঙ্গি, গেটের দিকে এগোচ্ছে ড্রাইভার। 'গুড ইভিনিং, গার্ড!' সারামুখে উজ্জ্বল হাসি নিয়ে বলল সে। 'আমার গাড়িতে প্রিন্সেস পলা রিমিনি রয়েছেন। প্ল্যান্ট গ্রাউন্ডে ঢুকতে চান তিনি, ডক্টর কাসলারের জন্যে একটা প্যাকেজ নেবেন।'

ভ্রূ কুঁচকাল গার্ড। 'প্রিন্সেসকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।' হাতের পিস্তল তুলল সে, লক্ষ্য স্থির করল ইউসুফির পেটে। পিস্তলটা দেখেও না দেখার ভান করল ইউসুফি, গাড়ির দিকে একটা হাত তুলল।

'প্রিন্সেস? প্লিজ, নিজেকে একবার দেখাবেন?'

পলা নড়লেন না। সিদ্ধান্তহীনতা তাকে বরফের মতো জমিয়ে ফেলেছে। তিনি যদি চেহারা দেখাতে রাজি না হন, কিডন্যাপার দু'জনকে ফিরিয়ে দেবে গার্ড। অর্থাৎ যুদ্ধ জেতার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটা ফর্মুলা ওদের হাতে পড়বে না।

'প্রিন্সেস?' চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল মালিকি। 'নিজের যমজকে স্মরণ করুন!'

নিজের পাঁজরে কঠিন ধাতবের স্পর্শ পেলেন প্রিন্সেস। সাইলেন্সার লাগানো আগ্নেয়াস্ত্র তার পেটে দেবে যাচ্ছে।

ঢোক গিললেন তিনি। এই পাষণ্ডদের সঙ্গে সাহসিকতার পরিচয় দিতে যাওয়ার মানে দাঁড়াবে ম্যারিয়োর তাৎক্ষণিক মৃত্যু। হাত বাড়িয়ে দরজা খুললেন, বাইরের দিকে ঝুঁকলেন, হাসলেন, তারপর গার্ডের উদ্দেশে হাত নাড়লেন। স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চিনতে পারলেন তাকে– মধ্যবয়স্ক মানুষ, মাথায় টাক, তিন মেয়ে নিয়ে সুখী পরিবার। তাকে অনেকবার দেখেছেন তিনি। মনে পড়ছে একবার তার ছোট মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলেছেনও। অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং নিজের কাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ মানুষ।

এই লোক দু'জনকে সে যদি প্ল্যান্টে ঢুকতে দেয়, কী ঘটবে তার কপালে? তার কি চাকরি যাবে? তার কি সম্মান বলে আর কিছু থাকবে না?

'সব ঠিক আছে তো, প্রিন্সিপেসা?' প্রায় মিনতির সুরে জানতে চাইল গার্ড।

পলা সাড়া দিতে পারছেন না। না! তার চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিছু ঠিক নেই! প্রিন্সেসের আরও কাছে সরে এলো মালিকি। পিস্তলটা এখন তার বুকে চেপে ধরা হয়েছে। 'মুখ খুলুন! তা না হলে ম্যারিয়ো শেষ!'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে,' হঠাৎ বিস্ফোরিত হলেন পলা, এখন প্রায় ফোঁপাচ্ছেন।

অনুগত গার্ড সবিনয়ে তালার দিকে হেঁটে এলো, সেটা বন্ধ গেটের ঠিক মাঝখানে ঝুলছে। গোছা থেকে চাবি বেছে নিয়ে তালার দিকে হাত বাড়াচ্ছে, লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন প্রিন্সেস, গার্ডের দিকে ছুটছেন, হাত নাড়ছেন ঘন ঘন। 'না! না! ওদেরকে ঢুকতে দিয়ো না!'

ঘুরল গার্ড, বিস্ময়ে স্তম্ভিত, ভাষা এবং নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বিদ্যুতের গতি নিয়ে প্রিন্সেসের কানের পাশে পরপর তিনটে বিস্ফোরণ ঘটল। আড়ষ্ট হয়ে গেল গার্ড, চাবি ধরা হাত দিয়ে খামচে ধরল নিজের বুক। তারপরও হাতের অস্ত্র তুলল গুলি করবে বলে। কিন্তু হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্র, সেটার পিছু নিয়ে সে নিজেও পাকা চত্বরে ঢলে পড়ল।

চেঁচাতে শুরু করলেন পলা। তার মুখে হাত চেপে ধরল মালিকি, আরেক হাতে তার কোমর পেঁচিয়ে রেখেছে, ছুটে যাতে পালাতে না পারে। রাগের সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে ইউসুফিকে ইশারা করল মালিকি। গেটের দিকে ছুটল ইউসুফি, ঝুঁকে গেটের ভেতরে আঙুল ঢোকাল, গার্ডের ইউনিফর্মের নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। গুলি খেয়ে লোকটা এমনভাবে পড়েছে, তার শরীর পাকা উঠান আর গেটের মাঝখানে একটা গোঁজের মতো কাজ করছে।

লোহার জাল লাগানো গেটের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে গার্ডকে কাত করতে চাইছে ইউসুফি, যাতে মৃত গার্ডের চাবি ধরা হাতটা বুক থেকে খসে তার দিকে পড়ে। পড়তেই এক গাল হাসল সে। চাবি আর আঙুল বের করে নিয়ে সিধে হলো। চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে খুলে ফেলল তালা, ঘুরে মালিকিকে ইঙ্গিত করল– মেয়েটিকে নিয়ে এগিয়ে এসো।

প্রিন্সেসকে ঠেলতে ঠেলতে হাঁটিয়ে আনছে মালিকি। গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকল তারা। আলোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, প্রায় অন্ধকার উঠানে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে তিনজন।

'কুত্তা! অ্যালসেশিয়ান কুত্তা!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল মালিকি। 'রওনা হয়ে গেছে!'

জ্যাকেটের পকেট থেকে নগ্ন তারের একটা কয়েল বের করল ইউসুফি। প্রিন্সেস পলা দেখতে পাচ্ছেন তারের একটা মাথায় অনেক হুক লাগানো, আলগাভাবে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। চোখ তুলে ইলেকট্রিফায়েড তারের দিকে তাকাল ইউসুফি।

ছায়ার ভেতর গজরাচ্ছে অ্যালসেশিয়ান। প্রবল হতাশায় চোখ বুজলেন পলা। মালিকি তাকে পুরো অচল করে রেখেছে, এক হাতে মুখ চেপে ধরে আছে, আরেকটা দিয়ে পলার ডান হাত মুচড়ে পিঠে নিয়ে আটকে রেখেছে। প্রিন্সেসের সারা শরীরে ব্যথার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন।

গলার ভেতর একটা শব্দ করল ইউসুফি। ছায়ার ভেতর থেকে আবার ভেসে এলো হাউন্ডের চাপা গর্জন। ইউসুফিকে রাবারের গ্লাভ্স পরতে দেখছেন পলা। তারপর দেখলেন হাতের নিরাবরণ তারের হুক লাগানো প্রান্তটা সাইক্লোন ফেন্সের মাথায় টাঙানো ইলেকট্রিফায়েড তারের দিকে ছুড়ে দিলো। প্রথমবারই আটকাল ওটা। হুকের সঙ্গে ঝুলতে লাগল, মৃদু দোল খাচ্ছে।

এতক্ষণে ছায়া থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসছে অ্যালসেশিয়ান, মুখ খোলা, আলো লাগায় দু'সারি ধারাল দাঁত ঝিকমিক করে উঠল; কালো জিব লকলক করছে। চোখের পলকে ইউসুফির নাগাল পেয়ে গেল ওটা কিংবা নাগাল পেয়ে গেল যেটাকে মনে হচ্ছে ইউসুফির গ্লাভ্স পরা হাত। পরক্ষণে বিদ্যুতের প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। আতঙ্কভরা একটা মুহূর্তে নীল আলোয় যেন গোসল হয়ে গেল কুকুরটার।

পলা ফোঁপাচ্ছে।

কুকুরের দাঁত শক্ত হয়ে বসল 'গ্লাভে', ফেন্সের মাথায় টাঙানো গরম তার থেকে বিদ্যুতের দশ হাজার ভোল্ট ইলেকট্রিসিটি ঢুকল ওটার শরীরে, নকল ধাতব হাতের মাধ্যমে, যেটা ইউসুফি রাবারের গ্লাভ্স পরা হাতে ধরে আছে। পোড়া চামড়া আর মাংসের দুর্গন্ধে ওখানে টেকা দায় হয়ে উঠল। পুড়ে ছোট হয়ে গেছে কুকুরটা, পড়ে আছে প্রায় একটা স্তূপের মতো। সম্ভবত মারা গেছে, কিন্তু এখনও ওটার পোড়া মুখ ধীরে ধীরে একটু খুলে যেতে দেখলেন পলা। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলেন তিনি।

'চলুন চলুন!' চেঁচিয়ে উঠল ইউসুফি। জ্যান্ত তার থেকে নিজের নগ্ন তার খুলে নিয়ে দ্রুত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে নীরব প্ল্যান্টে ঢুকে পড়ল ওরা। অফিস বিল্ডিং বেশ খানিক দূরে, মূল গেটের কোনো শব্দ সেখানে পৌঁছেনি। এখানে কুকুর নেই, তবে রাইফেল হাতে গার্ডদের পাহারা দেয়ার কথা।

'আগে এখানে পাহারার ব্যবস্থা ছিলো না,' বলল মালিকি। 'আপনি জানেন, ক'জন পাহারা দেয়, প্রিন্সেস?'

'ক'জন আবার, একজনই হবে,' বললেন পলা। 'আমার আসলে জানা নেই।'

একটা বাঁক ঘুরে হন-হন করে এগোচ্ছে ওরা– সবার সামনে রাখা হয়েছে প্রিন্সেস পলাকে। দালানের সামনে একজন গার্ড পায়চারি করছে, আর কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

প্রিন্সেস পলাকে দেখে চিনতে পারল গার্ড, পায়চারি থামিয়ে অ্যাটেনশন হলো। পলার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে গার্ডের বুকে গুলি করল মালিকি। অবিশ্বাস ভরা চোখ নামিয়ে নিজের বুকে সদ্য তৈরি ফুটোটা দেখছে গার্ড। মালিকির দ্বিতীয় বুলেট লোকটার খুলি উড়িয়ে দিলো। সটান পড়ে গেল লাশ।

নিহত গার্ডের পকেট থেকে চাবি নিয়ে অফিস বিল্ডিংয়ের গেট খুলল ইউসুফি, তারপর পলার কব্জি ধরে হিড়হিড় করে টেনে ভেতরে ঢোকাল, ধাক্কা মারতে মারতে ডক্টর কাসলারের অফিস কামরার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে গেটের কাছে ঘাপটি মেরে দ্বিতীয় গার্ডের অপেক্ষায় রয়েছে মালিকি, আদৌ যদি তার অস্তিত্ব থাকে। এক মিনিট কাটল। দু'মিনিট। তারপর তিন মিনিটও পার হলো। দ্বিতীয় গার্ডের দেখা নেই।

ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে মালিকি। প্রথম গার্ডের লাশ গেটের ভেতর টেনে নিলো সে; পাকা মেঝেতে, যেখানে রক্ত জমেছে, সিঁড়ির তলা থেকে কয়েকটা খালি চটের বস্তা এনে চাপা দিলো। তারপর ছুটল ভেতর দিকে।

ডক্টর কাসলারের অফিস। প্রিন্সেস পলাকে নিয়ে তার খাস কামরায় ঢুকল ইউসুফি, বোতাম টিপে আলো জ্বালল। আলো জ্বলতেই প্রিন্সেস দেখলেন লোকটার হাতে একটা ছুরি।

ছুরির ডগা তার দিকে তাক করল ইউসুফি। 'যা করার তাড়াতাড়ি! যদি বুঝতে পারি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন, এই ছুরি দিয়ে কানের লতি, নাকের ডগা, দু'একটা আঙুল কেটে নেব। নিন, ভল্ট খুলুন।'

'বললেই খোলা যাবে?' রেগে আছেন প্রিন্সেস। একের পর এক লাশ পড়তে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারছেন না। 'আগে তো ভল্টের কম্বিনেশন জানতে হবে আমাকে! সেটা কোথায় আছে আমি জানি।'

'ওরে হারামজাদি, খানকির জন্ম, জলদি!'

গালিটা বুঝতে না পেরে এক সেকেন্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন প্রিন্সেস পলা। তারপর ডেস্কের দিকে এগোলেন, ওপরের দেরাজ খুললেন। দেরাজের তলায় টেপ দিয়ে আটকানো একটা কাগজ দেখা যাচ্ছে। এখানে, এভাবেই পাওয়া যাবে বলে তাকে জানিয়ে ছিলেন ক্লাইভ। আলোর নিচে এসে কাগজের ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়লেন তিনি।

এই সময় হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল নিয়ে ভেতরে ঢুকল মালিকি। ইউসুফির সঙ্গে চোখাচোখি হতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল।

দ্রুত পা চালিয়ে প্রিন্সেসের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল মালিকি, কাঁধের ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে কাগজে কী লেখা।

কাগজে লেখা: 'F-F-D-O।'

'এটা কোনো কম্বিনেশনই নয়!' প্রচণ্ড রাগে গর্জে উঠল মালিকি। 'প্রিন্সেস, আপনি আমাদের সঙ্গে খেলতে চেষ্টা করছেন?'

ছুরি হাতে এগিয়ে এলো ইউসুফি। 'সরে দাঁড়াও, মালিকি, খ্রিষ্টান বেশ্যার এক কানের লতি কাটি।'

ইউসুফির উর্দু বুঝতে পারলেন না প্রিন্সেস, কাজেই ভয়ও পেলেন না। মালিকিকে বললেন, 'না, খেলছি না। এটাই কোড।'

তার কথা শুনে পিছিয়ে গেল ইউসুফি। 'ভল্ট যদি না খোলে রে! এই ছুরি দিয়ে তোকে যদি আমি খুলে না ফেলি তো আমি এক বাপের পয়দা না!'

'এটাই কোড? আপনি বলছেন?' মালিকি বিস্মিত। 'প্রতিটি অক্ষর আসলে একটা সংখ্যা? এফ হলো ৬, ইংরেজি বর্ণমালার ছ'নম্বর অক্ষর। এভাবে?'

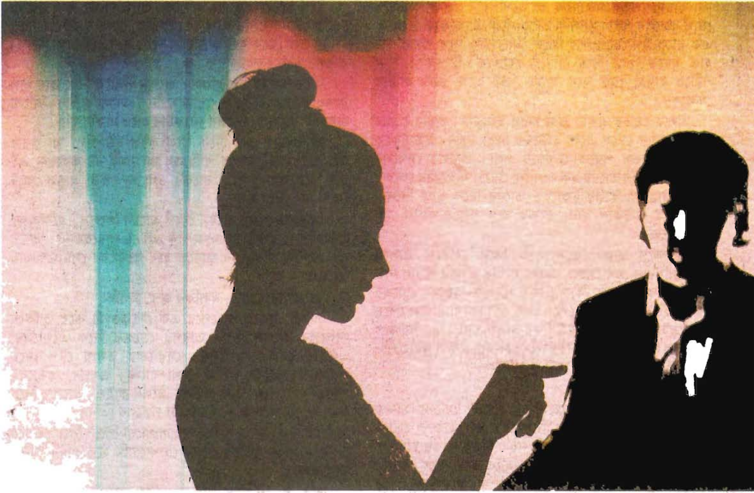
কথা না বলে হাতব্যাগ থেকে বলপয়েন্ট বের করে কাগজে লিখলেন প্রিন্সেস। '6-6-4-15।'

মাঝখানের হাইফেন তুলে দিয়ে ছেষট্টি হাজার চারশ' পনেরকে ৫ দিয়ে ভাগ করবেন। অঙ্কটা এখন ১৩২৮৩। সংখ্যাগুলোকে আলাদা করা হলো : ১৩-২৮-৩।

কাগজটা হাতে নিয়ে অফিসের এক কোনে চলে গেলেন, ওখানে ভল্টের প্রবেশপথ দেখা যাচ্ছে।

পিছু নিলো মালিকি, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল প্রিন্সেসের শিরদাঁড়ায় তাক করা।

হাত কাঁপছে, ভল্টের ডায়াল ঢেকে রাখা দরজা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিলেন। তারপর কাগজে লেখা সংখ্যাগুলো ঘোরালেন।



কোনো শব্দ নেই, ঝাঁকি দিয়ে খুলে গেল দরজা

'জলদি! জলদি!' ইউসুফি খুব নার্ভাস। 'আরেক গার্ড কোথায় টহল দিচ্ছে কে জানে!'

প্রিন্সেস পলার মনে আশা জাগল, যদিও তা মুহূর্তের জন্যে। মনে পড়ল দুই গেটে দু'জন গার্ডকে কীভাবে খুন করা হয়েছে। তিনি চান না আর কেউ মারা যাক।

ভল্টের ভেতর বেশ ক'টা ফোল্ডার রয়েছে, তার একটায় লেখা মরণঘুম–টপ সিক্রেট। ভল্ট থেকে বের করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছেন।

চোখে সন্দেহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে ইউসুফি। 'ওটাই কি সেই ফর্মুলা?'

প্রিন্সেস আশা করলেন তার গলা কাঁপবে না 'লেখা তো রয়েছে মরণঘুম '

ছোঁ দিয়ে ফোল্ডারটা নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে ইউসুফি। নিশ্বাসের সঙ্গে কাকে যেন অভিশাপ দিলো, তারপর মালিকিকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা তুমি পড়তে পারছ?'

ফোল্ডারের ভেতরটা কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল মালিকি 'না ' তার চোখ প্রিন্সেসের চোখে উঠে গেল। তারপর ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে এগোল তার দিকে, হাতের পিস্তল চেপে ধরল পাঁজরের ওপর। প্রিন্সেসের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'প্রিন্সেস, এটা যদি আসল জিনিস না হয়, আপনার ভাই একটা মরা মানুষ '

চোখ বুজলেন তিনি

জ্যাকেটের পকেট থেকে পেন্সিল টর্চ বের করে ভল্টের ভেতর আলোর সরু টানেল তাক করল ইউসুফি। 'ওটা কী, মালিকি?'

প্রিন্সেসের পাঁজরে এখনও পিস্তল ধরে আছে মালিকি, তাকে ঠেলে আরও সামনে নিয়ে গেল, সে-ও যাতে ভল্টের ভেতরটা দেখতে পায়। 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি ওটা ফিল্ম ক্যানিস্টার '

'জনাব মখমল আমাকে বলেছেন ফর্মুলা রাখা আছে একটা ফিল্মে!' দাঁতে দাঁত পিষল ইউসুফি।

'না ও ওটা!' খেঁকিয়ে উঠল মালিকি। 'ছিনাল প্রিন্সেস আমাদের সঙ্গে খেলছেন '

প্রিন্সেসের প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। ওটা ছিলো শেষ সেফগার্ড, তাও বানচাল হয়ে গেল খুদে, পেন্সিল সরু, এক ইঞ্চি লম্বা ওই ক্যানিস্টারেই ফর্মুলাটা রাখা আছে, এই মুহূর্তে যেটা ইউসুফি তার মুঠোয় ভরে রেখেছে। কাগজের ফোল্ডারটা ছিলো ভুয়া

'এটাই আসল, ঠিক কি-না?' জিজ্ঞেস করল ইউসুফি

ঠোঁট কামড়ালেন প্রিন্সেস

'অবশ্যই এটা!' চেঁচিয়ে উঠল ইউসুফি। 'চলো যাওয়া যাক!'

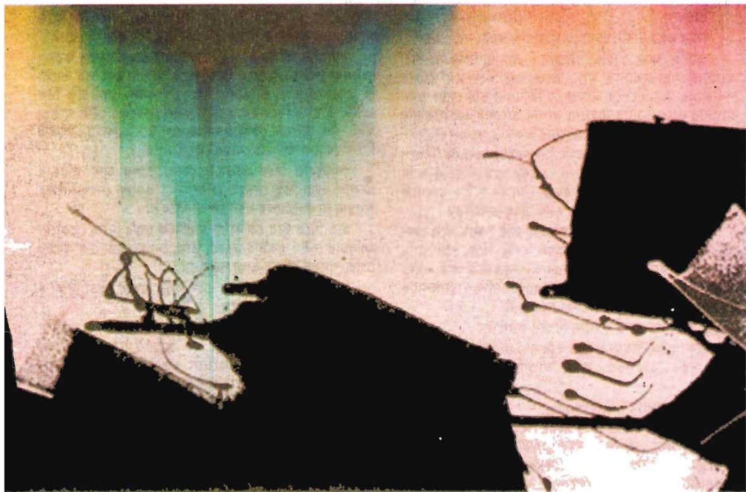
ইউসুফির হাত থেকে ক্যানিস্টারটা নিজের হাতে নিলো মালিকি, বাঁ হাতের শক্ত মুঠোয় ভরে রাখল। সেটার দিকে হাত বাড়াল প্রিন্সেস, বলল, 'ওটা আমার . আমার ভাই...'

'এই ফিল্মের জন্যেই আমরা এসেছি, প্রিন্সেস আপনার ভাইকে আপনি একসময় দেখতে পাবেন, যদি আপনার ভাগ্যে থাকে আর কি!'

মালিকির কথা শুনে হেসে উঠল ইউসুফি।

প্রিন্সেসকে ছেড়ে দিয়ে পিছু হটছে মালিকি, হাতের পিস্তল তার দিক থেকে এক চুল সরছে না মালিকির সঙ্গে পিছু হটছে ইউসুফিও। দু'জনেই ধীরে ধীরে দরজার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে প্রিন্সেসের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে অমূল্য ফর্মুলা

'ফ্রিজ!' অফিসের বাইরে থেকে গর্জে উঠল কেউ



পিস্তল হাতে বন করে আধপাক ঘুরল মালিকি ইউসুফি পড়ে যাচ্ছে, মেঝেতে নামছে, একই সঙ্গে জ্যাকেট হাত ভরে দিয়েছে অস্ত্রের নাগাল পাবার জন্যে অফিসের বাইরে গার্ডদের একজনকে দেখতে পাচ্ছে পলা, তার পিস্তল মালিকির দিকে তাক করা।

প্রথমে মালিকি গুলি করল, প্রায় নীরবে বিস্ফোরিত বুলেট হিসস করে ছুটল গার্ড মালিকিকে একটা গুলি করল, তারপর ইউসুফিকে গুলি করার জন্যে মোচড় খেলো ইউসুফিকে একের পর এক গুলি করছে সে, যে কিনা তার নিজের পিস্তল পকেট থেকে প্রায় বের করে এনেছে

এক গুলিতেই মরে ভূত মালিকি ঢলে পড়ল

মেঝেতে হাঁটু গাড়লেন প্রিন্সেস, ঝুঁকে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলেন ফিল্ম ক্যানিস্টার, এইমাত্র নিহত মালিকির মুঠো থেকে বেরিয়ে গড়াতে শুরু করেছিল সিধে হওয়ার আগে মালিকির পিস্তলটাও তুলে নিলেন

স্বস্তির বন্যা বয়ে যাচ্ছে তার চেহারায় 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ!' গার্ডকে বললেন।

বলার পর লক্ষ্য করলেন লোকটা ধীরে ধীরে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে দড়াম করে আছাড় খেলো মেঝেতে, তারপর আর নড়ল না।

প্রিন্সেসের গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, ছুটছেন, বেরিয়ে গেলেন করিডরে। যদি বা চিৎকারটা থামল, ফোঁপানি হয়ে উঠল অদম্য।

তার অ্যাপার্টমেন্টে না আছে আলো, না শব্দ বেডরুমে, বিছানার ওপর, একই জায়গায় অনেকক্ষণ হলো বসে আছেন তিনি, সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছেন এখন তার কী করা উচিত যারা ভাই ম্যারিয়োকে কিডন্যাপ করেছে, তাদের এরকম ইচ্ছে কখনোই ছিলো না যে ওকে ছেড়ে দেবে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ভল্ট থেকে তিনি ফিল্মটা বের করার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে ওটা ছিনিয়ে নেয়া তাদেরকে তিনি আর বিশ্বাস করতে পারেন না

এখন তিনি একটা সুবিধের জায়গায় আছেন, কারণ মরণঘুমের ফর্মুলাটা তার দখলে আছে কাজেই এই ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি তার ভাইকে মুক্ত করতে পারবেন।

এই মুহূর্তে মালিকির পিস্তলটা রয়েছে তার হাতে, ওটার ওজন অনুভব করছেন জিনিসটা ভারী আর বড়, উদ্ভট লাগছে তার, তবে এটা দিয়ে মানুষ খুন করতে দেখেছেন তিনি।

আতঙ্কে দিশেহারা ছিলেন, নিজের ঠিকানায় ফেরার পর খেয়াল করেছেন কিডন্যাপারদের ক্যাডিলাক নিয়ে চলে এসেছেন অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার পর দ্রুত খুঁজে নিয়েছেন বিকেলে রেনফ্রো থেকে কেনা নতুন জুতো জোড়া ডান পাটি জুতোর তলায়, পেছনের অংশ, চাপ দিলে খানিকটা একপাশে সরে যায়, সেখানে একটা অগভীর গর্ত তৈরি হয় ফিল্ম ক্যানিস্টারটা সেখানে চমৎকার ফিট করে গেছে রেনফ্রো যারা পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে তার বিশ্বস্ত এক বন্ধু আছেন, তাকে অনুরোধ করে নিজের জন্যে এই বিশেষ সুবিধে আদায় করে নিয়েছেন ক্যানিস্টারটা ওখানে থাকায় কেউ আর ওটাকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না যমজ ভাইয়ের জীবন এখন তার ওপর নির্ভর করছে। নিজের প্রাণ থাকতে এই ফিল্মের কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না তিনি।

নকল গোড়ালিসহ জুতোটার কথাই এই মুহূর্তে ভাবছেন। ওই তো, নিজের ক্লজিটে যত্ন করে তুলে রেখেছেন, সেদিনের কেনা বাকি সব জিনিসের সঙ্গে। ড্রেস, কোট, জুতো, কসমেটিক্স– সবই খুব নির্দোষ আইটেম সত্যটা কেউ আন্দাজ করতে পারবে না

লিভিং রুম থেকে ভেসে আসা ঝনঝন শব্দ চমকে দিলো তাকে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল ছুটে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন 'হ্যালো?'

'প্রিন্সেস?'

গলার ভারি টানটা চেনা চেনা লাগল, স্বরটা নয়। 'হ্যাঁ।'

'আমরা ক্ষমা চাইছি, প্রিন্সেস। আমার কিছু সহকারী আপনার মান-মর্যাদার মূল্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের নির্বুদ্ধিতার ফল হিসেবে আমরা যে জিনিসটা চাই সেটা এখন আপনার কাছে। ওটার সাহায্যে আপনি আপনার ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা করতে পারেন। এটাই আপনার একমাত্র সুযোগ।'

পলা রেগে গেলেন। 'আমি আপনাদের কাউকে বিশ্বাস করি না! যাদের বিশ্বাস করি না, তাদের সঙ্গে কীভাবে আমি সমঝোতায় আসব? আপনার বন্ধুরা তিনজন নিরীহ মানুষকে খুন করেছে!' গলা চড়ছে, ইচ্ছে হচ্ছে চিৎকার করার।

'আসুন আমরা নাটকীয়তা পরিহার করি,' নরম সুরে বলল লোকটা। 'সিচুয়েশন প্র্যাকটিকেবল হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নতুন একটা রদেভোর ব্যবস্থা করব আপনার ভাই আর ফর্মুলা বিনিময় করার জন্যে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি– আপনাকে হয়রানি করার আর কোনো চেষ্টা হবে না।'

'আমি আপনাদের কক্ষনো বিশ্বাস করব না!'

'ঠিক আছে, বিশ্বাস করতে হবে না,' লোকটা আরও নরম করল সুর। 'তারপরও, আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।'

'আমি কোনো যোগাযোগ...'

প্রিন্সেস পলা হাতের রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কথা বলা বৃথা। অপর প্রান্তের লোকটা যোগাযোগ কেটে দিয়েছে। আর ঠিক এই সময় বেডরুম থেকে ভেসে আসা আওয়াজটা প্রথম শুনতে পেলেন। ক্লজিট! আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন।

অন্ধকার লিভিং রুমের ভেতর দিয়ে ছুটছেন প্রিন্সেস। ধাক্কা দিয়ে বেডরুমের দরজা খুললেন, হাতে মালিকির উদ্যত পিস্তল। দেয়াল হাতড়ে আলো জ্বাললেন তাড়াতাড়ি। সাদা উজ্জ্বলতার বন্যা বয়ে গেল কামরায়।

ঘরে কেউ নেই। কিন্তু দেখলেন ক্লজিট হাঁ হাঁ করছে; ভেতরে সব জিনিস তছনছ করা।

কী ঘটেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। টেলিফোনটা করাই হয়েছিল জুতো আর ফিল্ম থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে। এই লোকগুলো কীভাবে যেন সব জেনে ফেলছে। তিনি যখন টেলিফোনে কথা বলছিলেন, ওদের লোক তখন অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে তল্লাশি চালিয়ে জুতোর ভেতর লুকানো ফিল্মটা দেখে ফেলেছে, এবং নিয়েও গেছে।

তারপরও জুতোটা একবার পরীক্ষা করা দরকার। ক্লজিটের দিকে পা বাড়ালেন প্রিন্সেস। পেছন থেকে এক লোক জড়িয়ে ধরল তাকে, ভারি একটা হাত দিয়ে প্রথমে তার মুখ চেপে ধরল, তিনি যেন কোনো শব্দ করতে না পারেন।

পাঁচ.

জনাব মখমল

জ্ঞান ফেরার পর শুধু মৃদু একটা নীল আলোর আভা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলো না জাকি আজাদ। তারপর, চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে, চৌকো একটা কামরার আদল দেখতে পেলো, যেন একটা সেল, যেখানে ওকে আটকে রাখা হয়েছে। একদিকের দেয়ালে চৌকো জানালা, লোহার গরাদ লাগানো। ওর নিচে মেঝেটা মন্থর বেগে দোল খাচ্ছে।

এক মুহূর্ত পর আজাদ উপলব্ধি করল, না, ওকে কোনো সেলে আটকে রাখা হয়নি– আটকেই রাখা হয়েছে, তবে সেটা কোনো জলযানের কেবিনে। জলযানটা লঞ্চও হতে পারে, আবার জাহাজও হতে পারে, কিছু না দেখে বলা মুশকিল। নীল আলোটা স্রেফ নাইট লাইট। কাঁধে ধাক্কা খাওয়ায় প্রচণ্ড মাথাব্যথায় ভুগছে ও। কাঁধ দুটো টাটিয়ে বিষ হয়ে আছে।

সাবধানে শরীরে হাত বুলিয়ে আঘাতগুলো অনুভব করল। বেধড়ক পেটানো হয়েছে ওকে, তবে ভাগ্যটা নেহাতই ভালো যে কোথাও হাড় ভাঙেনি। সাবধানে বসল, হামাগুড়ি দিল একটু, তারপর সিধে হবার চেষ্টা করল। ডেকের দোল খাওয়া খুবই তুচ্ছ, জলযান কোথাও যাচ্ছে বলে মনে হলো না। সম্ভবত নির্জন কোনো খাঁড়িতে নোঙর ফেলে আছে।

পোর্টহোল দিয়ে তাকাতে খোলা সাগর আর পরিষ্কার আকাশ ছাড়া কিছু দেখতে পেলো না। ওগুলো দেখে নিজের অবস্থান বা জলযানের ধরন বোঝা যাবে না।

হাত দিয়ে ছুঁয়ে কেবিনের চারদিকে চক্কর দিচ্ছে। কোনো ফার্নিচার নেই। একটাই দরজা, তালা দেয়া। ভারী ওক কাঠের তৈরি, গায়ের জোরে ভাঙা সম্ভব নয়।

ডেকের মাঝখানে ফিরে এসে বসল, ছেঁড়া ছেঁড়া চিন্তাকে জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে।

ও জানে যে কোনো এক ধরনের জলযানে বন্দি করে রাখা হয়েছে ওকে। জানে ডিউক হয় মারা গেছে; কিংবা ডা গিয়াকোমিনো রেস্তোরাঁর কিচেনে গুরুতর আহত হয়ে পড়ে আছে। প্রিন্সেস পলা রিমিনিও সম্ভবত তার ভাইয়ের কিডন্যাপারদের হাতে গিয়ে পড়েছেন। জানা কথা, তার কাছ থেকে মরণঘুমের ফর্মুলা আদায় করে নেবে তারা।

তা করতে হলে প্রিন্সেসকে নিয়ে ডক্টর ক্লাইভ কাসলারের প্ল্যান্টে যেতে হবে ওদেরকে। কারণ ওখানেই একটা ভল্টে ফর্মুলাটা আছে।

শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল আজাদ। আরও একটা ব্যাপার। আক্রান্ত হবার আগে ডিউক একজন আইএসআই এজেন্টকে না চিনতে পেরেছিল? এর সঙ্গে তাহলে আইএসআই জড়িত। এর অর্থ পাকিস্তান সরকার জড়িত– এমন নাও হতে পারে। ওদের কিছু কর্মকর্তা এসপিওনাজ গেম পছন্দ করে; টাকার বিনিময়ে গোপন তথ্য বেচাকেনার রমরমা ব্যবসা চালায়।

আইএসআই ম্যারিয়ো রিমিনিকে কিডন্যাপ করেছে মরণঘুমের ফর্মুলা হাতে পাবার জন্যে। একবার ওটা হাতে পেতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা হিসেবে বেছে নেবে আইএস'কে। সেই মুহূর্ত থেকে বিশ্বশান্তির কোনো নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না।

হতাশায় দু'হাত এক করে ঝাঁকাচ্ছে আজাদ। এই কেবিনে যতক্ষণ বন্দি হয়ে থাকবে ততক্ষণ ওই অশুভ এসপিওনাজ এজেন্সির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না ও।

এই সময় ওকে চমকে দিয়ে ঝট করে খুলে গেল কেবিনের দরজা। বাইরের করিডর থেকে হলুদ আলো ঢুকল ভেতরে। আলোটা চওড়া হয়ে ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

'সিধে হও!' ইটালিয়ান ভাষায় বলল কেউ।

আজাদ দাঁড়াল।

'আমার পিছু নাও।'

কম্পানিয়নওয়ে ধরে একটা সাজানো কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, বড় আকৃতির পোর্টহোল দিয়ে শান্ত উপসাগর দেখা যাচ্ছে। নেপথ্যে নেইপলসকে চিনতে পারল আজাদ, দূরে বিশাল আকার নিয়ে ভিসুভিয়াস যেন নীরবে ফোঁস ফোঁস করছে। দ্রুত হিসেব কষে আন্দাজ করে নিলো নেইপলসের মোটামুটি পশ্চিমে, ইসকিয়া দ্বীপ থেকে খুব একটা দূরে নয় ওর অবস্থান।

কেবিনের মাঝখানে প্রকাণ্ড ডেস্ক। তার সঙ্গে মানানসই বিশালকায় এক ব্যক্তি বসে আছেন তাতে। তার গায়ের রঙ সাদাই বলা যায়, ঠোঁট গোলাপের কুঁড়ি, বুদ্ধির ঝিলিক নিয়ে

নীল চোখ, মোম দিয়ে পাকানো লম্বা-চওড়া গোঁফ। তার মাথা পুরো টাক। খুলিতে অনুজ্জ্বল চকচকে ভাব।

আজাদের এসকর্ট গায়েব হয়ে গেল, ওর পেছনে বন্ধ করে দিলো কেবিনের দরজা।

'বসুন, জানাব জাকি আজাদ, প্লিজ,' প্রকাণ্ডদেহী বললেন, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল চওড়া হাসি।

গদি-মোড়া একটা চেয়ারে বসল আজাদ। গায়ের রঙ বাদে লোকটার সবই প্যাকিস্তানি বলে মনে হলো ওর। গলার আওয়াজে অবশ্য আঞ্চলিকতার টান নেই। ভালো ইংরেজি জানেন। গলার স্বর গুরুগম্ভীর বা গমগমে নয়, কিছুটা মেয়েলি। এই ব্যক্তির চরিত্রে পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য আছে, খুবই বিপজ্জনক একজন মানুষ।

'আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শোনা হয়েছে আমার,' বললেন তিনি, হাত দুটো তুলে ডেস্কের ওপর রাখলেন, তালু নিচে। 'এই মিটিংয়ের আয়োজন করতে প্রচুর এনার্জি খরচ করতে হয়েছে। পোহাতে হয়েছে খানিকটা ঝামেলাও।' জোড়া গোলাপ কুঁড়িতে হাসি ফুটল একটু।

জাকি আজাদ একটা হাত নাড়ল। 'হ্যাঁ, মানছি, আপনি আমাকে নিজের সুবিধেমতো জায়গায় পেয়েছেন।'

'সেটা অর্জন করা মোটেও সহজ নয়,' প্রকাণ্ডদেহী নিচু গলায় বললেন। ঠোঁট দুটো এমন ভঙ্গিতে গোল পাকালেন, বয়সের তুলনায় অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা শিশুর মতো লাগল তাকে। 'আমি জনাব মখমল।'

হাসল আজাদ।

'আমি কিসের সঙ্গে যুক্ত তা যদি আপনি জেনে না থাকেন, স্যার,' বললেন মিস্টার মখমল, 'আমি আইএসআইয়ে আছি।'

কেবিনের চারদিকে চোখ বুলাল আজাদ, চোখের ভাষা ব্যবহার করে ফার্নিচারের প্রশংসা করছে। 'আইএসআইর সঙ্গে? নাকি স্রেফ আইএসআই?'

আপনমনে মুচকি একটু হাসলেন মিস্টার মখমল। 'ওহ্, দারুণ, জনাব আজাদ, ছবিটা আপনি ধরে ফেলেছেন। হ্যাঁ, আমিই আইএসআই। তার মানে এই নয়, প্রধানমন্ত্রী যাকে প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন আমি তিনি। না, আমি প্রধান নই। আমাকে নিয়োগ দিয়েছে সেনাবাহিনী-প্রধান, আর তাই যিনি আইএসআই-প্রধান তার মাথায় চাঁটি মেরে বলে দিয়েছি, আমার পথ ছেড়ে দিয়ে বিদেশি কোনো ক্লিনিকে শুয়ে থাকো, যাও। আমাকে সেনাবাহিনীর স্বার্থ দেখতে দাও। আমার নিয়ন্ত্রণে আইএসআই অনেক দূর এসেছে, সবাই সেটা স্বীকার করে।'

'দূরত্ব পার হওয়াটা কিন্তু সব সময় গুরুত্ব বহন করে না, জনাব মখমল, বরং দিকটা করে,' আজাদের শান্তশিষ্ট পর্যবেক্ষণ।

প্রশংসা করার ভঙ্গিতে হাত দুটো পরস্পর সশব্দে ঘষছেন মিস্টার মখমল। 'ভাগ্য আজ যথেষ্ট প্রসন্ন দেখতে পাচ্ছি, শেষ পর্যন্ত রসবোধ আছে এমন কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমার জীবনের করুণ দিক কী জানেন? শুধু যে অধস্তনরা বুদ্ধিহীন, তা নয়; আমার ওপরঅলারাও মানসিক প্রতিবন্ধী, মগজে কল্পনাশক্তির ছিটেফোঁটাও ধারণ করে না। আপনি বসন্তের একটা নিশ্বাস, স্যার।'

'আমি ঠিক মেলাতে পারছি না, জনাব মখমল, এরকম একজন ইন্টেলিজেন্ট মানুষ হয়ে এত নীচুমানের একটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কেন আপনি নিতে গেছেন!'

'এবার, স্যার, আমি দুর্বোধ্যতার শিকার। আইএসআই'কে আপনি নীচু বলছেন?'

'আপনি জানেন না? শুধু পাকিস্তানিরা বাদে দুনিয়ার সবাই আইএসআই'কে গেস্টাপোর সঙ্গে তুলনা করে।'

'এসব পশ্চিমা দুনিয়ার অপপ্রচার– একদম কান দেবেন না।' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন মিস্টার মখমল। 'কাজের কথায় আসি। কোনো প্রয়োজন নেই, অথচ আপনি মরণঘুম অপারেশনের সঙ্গে জড়ালেন কেন?'

হাসি চাপল আজাদ। 'আমার জড়ানোটাকে আপনি ফ্রিডম অব চয়েস বলতে পারেন।'

'ওহ্, আবার বলতে হচ্ছে– সত্যি দারুণ, জনাব আজাদ।' আনন্দে ভদ্রলোকের গলা চড়ে গেল।

'জানি না আমার সে অধিকার আছে কি-না, তবে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে কাছাকাছি ভবিষ্যতে কী রাখা আছে আমার জন্যে?'

ডেস্কের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করলেন মিস্টার মখমল। আজাদ লক্ষ্য করল জ্যাকেট পরেছেন তিনি, তারপরও গলায় একটা স্কার্ফ জড়িয়েছেন। 'পুরো ব্যাপারটাকে আপনি একেবারে সামনে এনে ফেললেন।'

'হ্যাঁ, সেটাই আমি চেয়েছি।'

'নিজেকে আপনি আমার প্রাইভেট ইয়টে সম্মানিত মেহমান হিসেবে ভাবতে পারেন। আমার ইয়ট– পানি কি চিড়িয়া।'

বিষম খেতে গিয়ে কোনো রকমে সামলে নিলো আজাদ। 'ও।'

'অন্তত, মরণঘুম অপারেশনের সফল না হওয়া পর্যন্ত আর কি।'

উজ্জ্বল ঠাণ্ডা চোখ আজাদের চোখ ভেদ করে যাচ্ছে। বাইরে যতই কোমলতা আর ভদ্রতা দেখান, মিস্টার মখমলের মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই। ভেতরে তিনি পুরোদস্তুর কঠিন ও সামরিক, এবং খানিকটা ভয় পাবার মতো অশুভ।

'সফল?'

'আমি বলতে চাইছি ফর্মুলাটা যখন আমাদের হাতে চলে আসবে এবং ম্যারিয়ো যখন তার বোনের কাছে ফিরে যাবে।'

'বিনিময় পর্বটা আপনি সম্পন্ন করতে চান?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' মৃদু সুরে বললেন মিস্টার মখমল। 'আমি কথা দিলে রাখার লোক।'

নাক টানল আজাদ।

চেয়ারে হেলান দিলেন মিস্টার মখমল, হাসছেন। 'আমি এখনও কাউকে কোনো কথা দিইনি, আপনি তা জানেন।'

'জানি।'

'এখন আমি প্রতিশ্রুতি দিতে যাচ্ছি, জনাব আজাদ।' বিশালত্বের তুলনায় অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চেয়ার ছাড়লেন তিনি, নড়াচড়ার মধ্যে প্রকাণ্ড জংলি বিড়ালের দৃষ্টিনন্দন নমনীয়তার সঙ্গে সাবলীলতা। ঘুরলেন, তার পিঠ আজাদের দিকে, লম্বা পা ফেলে পোর্টহোলের সামনে চলে গেলেন, ওখান থেকে নেইপলস বে দেখতে পাওয়া যায়।

আজাদ এখন দেখতে পাচ্ছে দৈত্যাকৃতি লোকটার স্কার্ফ উজ্জ্বল নকশা করা মখমলের তৈরি। পায়ে রাজকীয় লাল রঙের জুতো। ট্রাউজারও সুতি মনে হচ্ছে না, আরেক রকম মখমল। হাত দুটো পেছনে বাঁধা, ওগুলোর রঙও, মুখের মতো, সাদা।

পোর্টহোলের কাছে পৌঁছে ঘুরলেন মিস্টার মখমল। চেয়ার ছেড়ে তার সঙ্গে যোগ দিলো আজাদ। ইয়টের মালিক খোলা ডেকের দিকে তাকিয়ে তারপুলিনে ঢাকা বড়সড় একটা আকৃতি দেখছেন। একবার চোখ বুলিয়েই আজাদ বুঝতে পারল, তারপুলিনের তলায় ওটা মেশিনগান বসানো রয়েছে।

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, জনাব আজাদ, আপনি যদি

আমার এই ছোট্ট জাহাজের বাইরে পা রাখেন. বিশেষ করে আমার আহ্বান ছাড়া. আপনার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। ওগুলো সত্যিকার মেশিনগান. স্যার: খেলনা নয়।'

গম্ভীর আজাদ মাথা ঝাঁকাল। 'আপনার কথায় আমার সন্দেহ নেই।'

'আপনি খুব পরিষ্কার একটা মাথা দেখার বিরল সুযোগ করে দিচ্ছেন আমাকে। আপনাকে আমি আরও একটা জিনিস দেখাতে চাই. এদিকের পানিতে যা দেখা যায় না।' ঘুরে ডেস্কের একটা বোতাম স্পর্শ করলেন তিনি। 'অবজার্ভ।'

এক নিমেষে ইয়টের চারধারের পানি উজ্জ্বল আলোয় ভেসে গেল। 'দারুণ না? চারপাশের পানি আমরা আলোময় রাখতে চাই।' মিস্টার মখমলের হাসি অদৃশ্য হলো। 'এটা আমাদের মেহমানদের মনে রাতের গোসল সম্পর্কে অনীহা জাগায়।'

'গোসল. তার সঙ্গে ধরে নিচ্ছি দূরে কোথাও বেড়ানোর ঝোঁক.' সুরে সুর মেলাল আজাদ।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই হাসিখুশি চেহারায় ফিরে গেলেন মিস্টার মখমল। 'আমার মেহমান আসলেও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।' ইঙ্গিতে আজাদকে আবার আসন গ্রহণ করতে বললেন। আজাদ বসার পর ডেস্কে ফিরলেন তিনি. ঝুঁকলেন ওর দিকে।

'আমার কাপড় পরার অভ্যাসকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে অনুরোধ করছি। শক্ত কিছু বা কর্কশ কিছু. হোক মসলিন বা সুতি. আমার ত্বক গ্রহণ করে না। আমাকে শুধু মখমল পরতে হবে। এবং আমি কখনো দিনের বেলা এই কেবিন ছেড়ে বেরোই না। সূর্য আমার সহ্য হয় না। আসলে বলা উচিত আমার ত্বক সহ্য করে না। বিরল একটা অ্যালার্জি. যেটা আমাকে মেরে ফেলতে পারে। চুক্তি বলুন সমঝোতা বলুন সব আমি রাতে পছন্দ করি। অন্ধকারের একটা জীব. বলতে পারেন।' কাঁধ ঝাঁকালেন মিস্টার মখমল। প্রত্যেকেরই তার নিজস্ব বিশেষ অ্যালবাট্রস আছে। আছে ব্যক্তিগত খেয়াল।'

'যেমন খুন.' সরাসরি বলল আজাদ।

মিস্টার মখমলের ভ্রূ বিস্ময়ে ওপরে উঠে গেল। 'খুন! প্রশ্নই তো ওঠে না। আমি ভায়োলেন্স ঘৃণা করি।' অত বড় শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। 'আপনি ঠিক কোন প্রসঙ্গে কথাটা বললেন. জনাব আজাদ?'

'আমার বন্ধু মারবেনির ভাগ্য প্রসঙ্গে।'

'আহ্-হা. আহ্-হা.' হাসিমুখে বললেন মিস্টার মখমল। 'মিস্টার ডিউক মারবেনি। এরকম কথা প্রচলিত আছে যে রাজবংশের লোকজন একটা পাবলিক কিচেনে ঢুকে বিশেষ সুবিধে করতে পারেন না।'

'যুদ্ধের মধ্যে অদ্ভুত পেশা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়. সেটা তখন আর ব্যতিক্রম থাকে না।'

'যুদ্ধ? আমরা শান্তিতে রয়েছি। গোটা দুনিয়া শান্তিতে ফেটে পড়ছে.' বিদ্রূপের সুরে বললেন মিস্টার মখমল। 'আপনি শোনেননি?'

'ডিউককে আপনি খুন করলেন কেন?' রাগে কেঁপে গেল আজাদের গলা।

মিস্টার মখমল হাত তুললেন। 'আমার রিপোর্ট বলছে না তিনি মারা গেছে। তাকে স্রেফ অচল করে রাখা হয়েছে।'

'তাহলে কি পানি কা চিড়িয়াতে আছে সে? প্রসঙ্গত. আপনার ইয়টের যে নাম রেখেছেন. তাতে আপনাকে একটা ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। এতে আপনার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।'

'বাঙালিরা মনে করে শিল্প-সাহিত্য তারাই শুধু বোঝে. আর সবাই জংলি। আপনি যদি আমাকে ব্যঙ্গ করে থাকেন. তাহলে থ্যাঙ্কস. বাট নো থ্যাঙ্কস। না. আপনার বন্ধু পানি কা চিড়িয়াতে নেই। তিনি. আমি যতদূর জানি. এখনও নেইপলসেই আছেন।'

চেয়ার ছাড়ল আজাদ। 'বেশ. আপনার যদি শেষ হয়ে থাকে. জনাব মখমল।'

'অবশ্যই। আজকের দিনের শিক্ষা. কী যেন ছিলো? একদম সাঁতার নয়। নিজের কেবিনে বসে তার পরিণতি কী হবে চিন্তা করতে পারেন. আপনার হাতে আর যেহেতু কোনো কাজ নেই।'

দরজা খুলে গেল. সেই একই লোক কেবিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজাদকে. এবার মিস্টার মখমলের ইঙ্গিত পেয়ে আজাদের কনুই ধরেছে।

এই কেবিনের সঙ্গে পারা মুশকিল. ঠেকে শিখল আজাদ। ক্লান্ত হয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল. যতটা পারা যায় বিশ্রাম পাবার চেষ্টা করছে। বেশ কিছুক্ষণ কোনো রকম নড়াচড়া নেই ইয়টের। আইএসআইর পুরো কনটিনজেন্টই মনে হচ্ছে ঘুমকাতুরে।

আরও কিছুক্ষণ পর ওর মনে হলো. ইয়টের সামনের দিকে একটা শব্দ হয়েছে. তবে নিশ্চিত হতে পারল না। শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গিয়েছিল. আবার বাঁকা হলো পিঠ। তারপর ভোঁতা খসখস আওয়াজ ঢুকল কানে. কেবিনের দরজায়। ঝট করে সিধে হলো. দরজার পাশ থেকে টোকা দিলো কবাটে। একবার।

সঙ্গে সঙ্গে পরপর তিনটে টোকা মধুবর্ষণ করল কানে।

ডিউক মারবেনি।

'এক মিনিট. আজাদ.' ফিসফিস করল ডিউক। 'পিছু হটো।'

আজাদ পোর্টহোলের কাছে সরে গিয়ে বাল্কহেড আলিঙ্গন করল। বিশ সেকেন্ড পর কর্কশ ফিসফিস শোনা গেল। 'এখন।'

তিন পর্যন্ত গুনতেই আলোর ঝলক দেখা গেল. একই সঙ্গে হিসহিস শব্দ। দরজার হাতল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কটু গন্ধে ভরে উঠল কেবিনের বাতাস। ভেতর দিকে দ্রুত সরে এলো দরজা. জ্বলন্ত পেস্টের তীব্র উত্তাপে পুড়ে গেছে তালা। হাজির হলো ডিউক মারবেনি. পরনে কালো ওয়েট সুট। সঙ্গে খালি আরেকটা ওয়েট সুট নিয়ে এসেছে: ভোলেনি একটা ব্রিদিং স্কুবা অ্যাপারাটাস আনতেও।

'তোমার ট্যাঙ্ক কই?' জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'ইয়টের ওয়াটার লাইনের সঙ্গে ঝুলছে.' দ্রুত ব্যাখ্যা করল ডিউক। 'আবর্জনা ফেলার শাফট হয়ে গ্যালিতে উঠেছি।'

'আমি ভেবেছিলাম. ওই কিচেন থেকে সোজা হেভেনে চলে গেছো তুমি।'

'কাজিন ডাম্পি যেতে দিলো না। আইএসআই ভেবেছে. আমাকে তারা মেরে ফেলেছে। ডাম্পির বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই ওকে আমি কেমিসি কনসলিডেটিতে পাঠিয়েছি. ওখানকার খবর জানার জন্যে। তারপর সোজা চলে এসেছি এখানে. তোমার কাছে। তোমাকে রিপোর্ট করতে ভালো লাগছে. তোমার হোমিং ডিভাইস এ-ওকে কাজ করছে।'

আজাদের ঠোঁটে নীরব হাসি। 'ওগুলো সঙ্গে রাখলে নিজেদের সব সময় বোকা বোকা লাগে আমার.' বলল ও।

আজাদের হোমিং ডিভাইস. খুদে একটা রেডিও ট্রান্সমিটার. যেটা সারাক্ষণ আলট্রাহাইফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ একটা নির্দিষ্ট ওয়েভ লেন্থে পাঠাচ্ছে : ওই সিগন্যাল ধরা যাবে রেডিও ডাইরেকশন ফাইন্ডারে. যেটা ডিউকের হাতঘড়িতে আছে. ওই

একই ওয়েভ লেন্থে টিউন করা। একটা আরডিএফ, হাতঘড়ির কাঁটা, ডিউককে তখন পথ দেখিয়ে সরাসরি আজাদের কাছে নিয়ে আসবে। হোমিং ডিভাইসটা লুকানো আছে আজাদের পিঠে, একটা নকল জরুলের ভেতর।

ডিউকের কাছেও একই রকম হোমিং ডিভাইস আছে; আজাদ ওর আরডিএফ বহন করছে নিজের হাতঘড়িতে। পরস্পরকে ওরা খুঁজে বের করতে পারবে, ইলেকট্রনিকের সাহায্যে, বিপজ্জনক মুহূর্তে যখন পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে দু'জন।

'চলো যাই,' নার্ভাস সুরে বলল ডিউক।

'প্রথমে আমি ইয়টে তল্লাশি চালাব, দেখব ম্যারিয়োকে পাওয়া যায় কি-না,' বলল আজাদ।

বন্ধুর দিকে তাকাল ডিউক। 'সে কাজ আমি ইতিমধ্যে করে ফেলেছি, আজাদ। এখানে তিনি নেই।'

'তোমাকে স্রেফ একবার চেক করলাম,' আজাদের মুখে নীরব হাসি। 'তোমার সঙ্গে একমত, কেটে পড়ার সময় হয়েছে। এই ইয়টে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা আছে, আশপাশের কয়েক মাইল দিনের মতো করে ফেলে। আমাদেরকে অনেকটা গভীরে থাকতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

'নিজেদের ট্যাঙ্ক হুক দিয়ে আটকে নেবো, সাঁতরাবো দোস্তি সিস্টেমে,' ব্যাখ্যা করল আজাদ।

সাবধানে, পা টিপে টিপে, করিডর হয়ে গ্যালিতে পৌঁছল দু'জন। কোনো শব্দ না করে শাফট হয়ে নিচে নামল, স্কুবা ট্যাঙ্কের সঙ্গে হুক দিয়ে আটকাল নিজেদের, তারপর পেছন দিকে হেলান দেয়ার ভঙ্গিতে পানিতে পড়ল।

চল্লিশ মিনিট পর আজাদের ভিলায় শুকনো কাপড় পরে বসে আছে ওরা, আর.টি. ব্যবহার করে ডিউকের কাজিন ডাম্পির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।

এক সময় সাড়া পাওয়া গেল। 'ডিউক?' উত্তেজনায় দম প্রায় বন্ধ।

'ডাম্পি?'

'হ্যাঁ। আমি কেমিসি কনসলিডেটিতে। এখানে পাঁচজনের লাশ পড়ে আছে। দু'জন কিডন্যাপার, তিনজন গার্ড।

আজাদের দিকে একবার তাকাল ডিউক, লাশের সংখ্যা শুনে ছোট্ট ঝাঁকি খেলো আজাদ।

'প্রিন্সেস চলে গেছেন। আমার ধারণা, তারা যে জিনিসের খোঁজেই এসে থাকুক, সেটা এখন প্রিন্সেসের কাছে। এখানে একটা ম্যানিলা ফোল্ডার পেয়েছি, গায়ে লেবেল লেখা মরণঘুম। তবে ছুড়ে একধারে ফেলে দেয়া জিনিস।'

'তুমি কি এইমাত্র ওখানে পৌঁছলে?' জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'হ্যাঁ।'

'সবাই জেনেছে, কী ঘটেছে ওখানে?'

'কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু জানে না।'

'একটা টেলিফোন বুথ থেকে পুলিশে খবর দাও, তারপর হারিয়ে যাও।'

'ঠিক আছে,' বলল ডাম্পি।

'তোমার কোনো ধারণা আছে প্রিন্সেস কোথায় গেছেন?'

'না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জানালার বাইরে, অন্ধকার সাগরের দৃশ্য দেখছে আজাদ।

কথা না বলে আর.টি. বন্ধ করল ডিউক।

'প্রিন্সেস এখনও মুক্ত, ধরে নিচ্ছি আমরা,' আন্দাজ করছে আজাদ। 'সেক্ষেত্রে তিনি সম্ভবত আতঙ্কিত হয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেছেন।' ঠোঁট কামড়াল। 'ঠিক ওখানটাতেই তার থাকা উচিত নয়। খবরটা যখন আইএসআই মখমল জানবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরার জন্যে রওনা হবে।'

ডিউকের চোখ সরু হলো। 'তোমার ধারণা, ফর্মুলাটা নিজের কাছে রেখেছেন তিনি?'

'হ্যাঁ। ম্যানিলা ছুড়ে একধারে ফেলে দেয়ার মানে ফর্মুলাটা রাখা আছে আরও কমপ্যাক্ট অবস্থায়। এই ধরো, একটা ফিল্ম প্যাকে। আর তার মানে হবে...'

আঙুল তুলে আজাদকে থামিয়ে দিলো ডিউক। 'প্রিন্সেস যখন শপিং করছিলেন, আমি ছায়ার মতো লেগে ছিলাম তার পেছনে, আজাদ। একটা ড্রেস কিনলেন, কোট কিনলেন, তারপর ভায়া রোমায় গিয়ে ঢুকলেন রেনফ্রোতে। ওখানে তিনি অনেকক্ষণ ছিলেন। অর্ডার দেয়া জুতো, পায়ে ঠিকমতো ফিট করছে কি-না দেখে তারপর ডেলিভারি নিয়েছেন।'

'আচ্ছা, আচ্ছা...' আপনমনে বিড়বিড় করছে আজাদ, '...অবশ্যই! এসপিওনাজের ইতিহাসে এটা সবচেয়ে পুরোনো ট্রিকস যদিও এর মধ্যে দশ বছরের একটা ছেলেকে বোকা বানানোর মতো ইন্টেলিজেন্সও নেই। ওই ফিল্মটা তিনি অর্ডার দেয়া জুতোর চোরা-কুঠরিতে লুকিয়ে রেখেছেন। চলো চলো, আইএসআই মখমলের চেয়ে আগে তার কাছে পৌঁছতে হবে আমাদের!'

প্রিন্সেস পলার অ্যাপার্টমেন্ট গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে, জানালা ভেঙে তার বেডরুমে ঢুকল আজাদ। দ্রুত ক্লজিট সার্চ করে নতুন জুতো জোড়া পেয়ে গেল, গোড়ালির অংশে চাপ দিয়ে উন্মুক্ত করল অগভীর গর্ত, তারপর পেন্সিল টর্চের আলো জ্বালতেই দেখতে পেলো ভেতরে ফিল্ম ফিল্ম ক্যানিস্টার শুয়ে রয়েছে।

তাড়াতাড়ি জানালার কাছে ফিরল আজাদ। 'ডিউক?'

ওর দিকে মাথা তুলল ডিউক। কারনিসে ভারসাম্য রক্ষা করছে সে, সেটা গোটা দালানকে ঘিরে রেখেছে।

'জলদি নাও এটা। কী করতে হবে তুমি জানো। আমি প্রিন্সেসকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকাল ডিউক, লাফ দিয়ে নিচতলার ঝুল-বারান্দায় পড়ল। জানালার দিকে পেছন ফিরল আজাদ, দরজার দিকে পা বাড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ একজন খুলল ওই দরজা। সঙ্গে সঙ্গে আলোয় ভেসে গেল বেডরুম। ভেতরে ঢুকে নিজের চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন প্রিন্সেস পলা। ক্লজিটের ভেতরটা তছনছ করা হয়েছে দেখে রক্তশূন্য হয়ে গেল চেহারা। ভেতরের কাপড়চোপড় মেঝেতে ফেলে দেয়া হয়েছে।

দরজার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছিল আজাদ, সেখান থেকে বেরিয়ে এলো, পেছন থেকে প্রিন্সেসের মুখে হাতচাপা দিলো।

'প্রিন্সেস!' ফিসফিস করল আজাদ। 'একটুও শব্দ করবেন না। এখান থেকে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। আপনি বুঝতে পারছেন?'

চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে, পলা চিৎকার দিতে চেষ্টা করছেন। আজাদ শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে তাকে। হাতের অস্ত্র ফেলে দিলেন তিনি। নির্মম একটা ঝাঁকি দিলো আজাদ।

'কোনো শব্দ নয়। শুনতে পাচ্ছেন?'

আজাদের বাহুর ভেতর নেতিয়ে পড়লেন পলা, আজাদ বুঝল তিনি আর চিৎকার করবেন না। মুখ থেকে সরিয়ে নিলো নিজের হাত।

'আমি বন্ধুদের একজন। আমরা আপনার ভাইয়ের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করছি। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন?'

চোখে-মুখে হতাশা নিয়ে আজাদকে দেখলেন প্রিন্সেস। 'আর কোনো উপায় আছে?' এক মুহূর্ত পর বললেন।

'তাহলে চলুন যাওয়া যাক। আপনি আপনার নতুন জুতো ফিরে পাবেন। আমাকে আপনার বিশ্বাস করতে হবে, প্রিন্সেস! প্লিজ, প্লিজ!'

তিনি তার ঠোঁটের সাহায্যে শব্দ তৈরি করতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। এক সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হলেন। 'সে কি আবার কাল আমাকে ফোন করবে? জানাবে ম্যারিয়োকে বাঁচাতে হলে কোথায় দেখা করতে হবে আমাকে?'

'আজ রাতে আপনাকে ফোন করেছিল সে?'

'ক'মিনিট আগে।'

'তাহলে যে কোনো মুহূর্তে এখানে চলে আসতে বাধ্য সে। ওই ফোন কল ছিলো স্রেফ একটা চালাকি, আপনি এখানে আছেন কি-না জেনে নিয়েছে।'

হাত ধরে প্রিন্সেসকে লিভিং রুমে টেনে নিয়ে এলো। সদর দরজার দিকে এগোল, ওখানে দাঁড়িয়ে নিভিয়ে দিলো সব আলো। দরজা সামান্য ফাঁক করে হলওয়েতে চোখ বুলাল। যায়। প্রথমে প্রকাণ্ডদেহীকে টার্গেট করা হলো। কিছুটা ছুটে গিয়ে শূন্যে লাফ দিয়েছে, দু'পা সামনে রেখে গোটা শরীর ক্ষিপ্রগতি বর্শা। দুটো পা-ই বড়সড় মানুষটার পেটে নামল। লাফ দিয়ে পিছিয়ে এলো আজাদ, এখনও খাড়া। মিষ্টার মখমল ফুসফুস খালি করে ফেলেছেন, তার শরীর কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে রয়েছে। পেছনে দাঁড়ানো লোকটার গায়ে ধাক্কা খেলেন, দু'জনেই পড়ে গেলেন খোলা এলিভেটরের ভেতর। পেছনের দেয়ালে দুম করে বাড়ি খেলো মিষ্টার মখমলের মাথা। অচল হয়ে ওখানে পড়ে থাকলেন আপাতত। দ্বিতীয় লোকটা দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, করিডরে বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু তার আগেই দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল দরজা, দু'জনকেই খাঁচার ভেতর আটকে নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

প্রচণ্ড রাগে গর্জন করছেন মিষ্টার মখমল। ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। খপ করে প্রিন্সেসের হাত ধরে করিডরের শেষ মাথার দিকে ছুটছে আজাদ। জানালার সামনে থেমে একটা ফায়ার স্কেপ দেখতে পেলো। জানালার কাচ খুলে প্রিন্সেসকে ঠেলে তুলে দিলো লোহার প্ল্যাটফর্মে।

লোহার সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে দুটো তলা নামল ওরা।



কেউ নেই, কিছু নড়ছে না।

'আসুন!'

করিডর হয়ে দ্রুত একসারি এলিভেটরের দিকে হাঁটছে দু'জন। এই সময় একটা দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। এক লোক বেরোল করিডরে। লম্বা-চওড়া, পেশির সমষ্টি, ট্রেঞ্চ কোট পরে আছে। ট্রেঞ্চ কোটের নিচে মখমলের ট্রাউজার দেখতে পেলো আজাদ। ইনি মিষ্টার মখমল স্বয়ং।

টান দিয়ে প্রিন্সেসকে নিজের পেছনে সরিয়ে দিলো আজাদ, পা চালিয়ে মিষ্টার মখমলের দিকে এগোচ্ছে। তিনি ঘুরলেন, পায়ের শব্দে চমকে গেছেন, তারপর আজাদকে দেখে হাঁ হয়ে গেলেন। পকেটে কী অস্ত্র আছে কে জানে! আধ সেকেন্ড দেরি করে হাত ভরতে গেলেন। তার পেছনে এক লোক রয়েছে, এর আগে যাকে ইয়টে দেখেছে আজাদ।

ক্লাসিক্যাল ফরাসি আক্রমণ শুরু করল আজাদ। এটা এক ধরনের বক্সিংই, তবে এতে শুধু হাত নয়, পা-ও ব্যবহার করা

এরপর একটা জানালা ভাঙল আজাদ, প্রিন্সেসকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ওখান থেকে, ভেতরের এক প্রস্থ সিঁড়ি ব্যবহার করে নেমে এলো বেজমেন্টে। তারপর দালানের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীর স্টোর রুম খুঁজে নিলো। এক কোনে মান্ধাতার আমলের কয়লা আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহারযোগ্য ট্রলি দেখা যাচ্ছে, সরু রেলপথের ওপর বসানো; এখন আর ব্যবহার করা হয় না। ওটায় চড়ে হাতল ঘোরাল ওরা, দু'মিনিট পর বেরিয়ে এলো অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের পেছনের বাগানে। বাগান ধরে হাঁটার সময় একটা পাথুরে পাঁচিল দেখতে পেলো আজাদ।

'আসুন টপকাই!' প্রায় ধমকে উঠল আজাদ, প্রিন্সেসকে দু'হাতে ধরে তুলে দিলো পাঁচিলের মাথায়। লাফ দিয়ে অপরদিকে পড়লেন তিনি। তার পিছু নিয়ে আজাদও।

ওরাও নামল, সেই সঙ্গে একটা অ্যাপার্টমেন্টের পেছনের ঝুল-বারান্দা থেকে শুরু হলো বুলেট বর্ষণ। নীরব রাতের বাতাসে ভর করে ভেসে এলো মিষ্টার মখমলের অশ্রাব্য খিস্তি

আর অভিশাপ।

'পাকড়ো শালে কো, বুড়বাক কাঁহিকে! টুড়ো, মার ডালো, মাগার প্রিন্সেস ঠিকঠাক র‍্যাহে! মাদারফাকার দশ হাজার ইউরো ইনাম পাওগো! দশ লাখ!'

প্রিন্সেসের দিকে ফিরে তিক্ত একটু হাসল আজাদ। 'আপনি কি আশা করেছিলেন আমাদের ভদ্রোচিত একটা দাম ধরবেন তিনি!' মুখ বাঁকাল। 'ব্যাটা হাড়কিপটে!'

ছয়

রঁদেভো তুরস্ক

ভোর হতে তখনও খানিক দেরি, ছোট ও কদর্য চেহারার একটা মাছধরার যান্ত্রিক নৌকো নেইপলস হারবার থেকে রওনা হলো, তাতে নিয়াপলিটান কাপড় পরা তিনজন আরোহী। স্কিপারের নাম সিজার মার্কোজা। ডিউক মারবেনির কাজিন মার্কোজা, ডিউক নৌকোর দ্বিতীয় আরোহী। তিন নম্বর ক্রু জাকি আজাদ, পরনে ওদের মতো একই কাপড়, গলা থেকে বিনোকিউলার ঝুলছে।

হারবার শান্ত, নীরব; ডকে মালপত্র খালাস করতে লাইন দেয়া ফ্রেইটারগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে ওদের নৌকো। এগোচ্ছে পশ্চিম দিকে, যেদিকে ইসকিয়া দ্বীপ মাথা তুলে আছে। নৌকোর কিনারায় একটু ঝুঁকে পড়েছে আজাদ, বিনকিউলারে চোখ রেখে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে।

'ওই দেখা যাচ্ছে!' একসময় ওকে বলতে শোনা গেল।

ওর পাশে চলে এলো ডিউক। 'পানি কি চিড়িয়া? মিস্টার মখমল?'

'দেখো।' ডিউকের হাতে বিনকিউলার ধরিয়ে দিলো আজাদ।

ফোকাস করল ডিউক, 'হুম!' করল, গ্লাস ফিরিয়ে দিলো আবার।

'অয়্যায়েরলেস গরম করো, হে,' নির্দেশ দিলো আজাদ।

ওদের ডানে নেইপলস শহর শান্তিমতো আধডোবা হয়ে আছে। বিস্তৃত মেট্রোপলিসে প্রাণের ইঙ্গিত বলতে মিটমিট করা কিছু বাতি।

নেইপলসের রাস্তা ধরে প্রিন্সেসকে নিয়ে ছুটে পালানো কোনো বিপদ ছাড়াই সম্ভব হয়েছে। ডকে পৌঁছে দ্রুত তাকে নিজের লঞ্চে তুলেছে আজাদ, সেখানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিলো; তারপর ভিলায় নিয়ে গেছে, নিজের বেডরুমে ঢুকিয়ে শুইয়ে দিয়েছে।

খানিক পর ওখানে পৌঁছল ডিউক, সঙ্গে তিনজন সশস্ত্র গার্ড, যারা এখনও ভিলার চারদিকে রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় লুকিয়ে আছে, আইএসআইর যে কোনো সম্ভাব্য আক্রমণ বানচাল করে দেবে।

পোর্টেবল অয়্যায়েরলেস নৌকোয় তুলে, মার্কোজার মাছ ধরার নৌকোকে দিকনির্দেশনা দিয়ে মিস্টার মখমলের ইয়ট পানি কি চিড়িয়ার কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে আজাদ। কাছাকাছি পৌঁছে, আবার খুব বেশি কাছে নয়, অতিকায় ওই আইএসআইর সঙ্গে যোগাযোগ করবে, ম্যারিয়ো রিমিনির মুক্তিপণ সম্পর্কে একটা সমঝোতায় আসার ইচ্ছে নিয়ে।

'অয়্যায়েরলেস রেডি, আজাদ,' একসময় জানাল ডিউক, পোর্টেবল রিসিভার-ট্রান্সমিটারের ওপর থেকে মুখ তুলল। 'পানি কি চিড়িয়াকে জাগানো যায় কি-না চেষ্টা করে দেখব আমি?'

'দেখো। আমার লেখা মেসেজটা দাও ওদেরকে।' চোখে বিনকিউলার নিয়ে প্রায় অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে ইয়টের ওপর নজর রাখছে আজাদ। 'সিজার, তুমি এবার বোট থামাও।'

মাথা ঝাঁকাল সিজার মার্কোজা। নৌকো ধীরে ধীরে থামল,একটা ছন্দ ধরে ঢেউয়ের সঙ্গে উঁচু-নিচু হচ্ছে।

'কলিং পানি কি চিড়িয়া, কলিং পানি কি চিড়িয়া,' ডাকতে লাগল ডিউক একঘেয়ে ইটালিয়ান ভাষায়। 'হারবার পেট্রল কলিং পানি কি চিড়িয়া। সাড়া দাও, পানি কি চিড়িয়া।'

প্রায় দু'মিনিট লাগল ইয়টের রেডিও অপারেটরের ঘুম ভাঙাতে। 'হ্যাঁ, আমরা এখানে পানি কি চিড়িয়া,' পোর্টেবল সেট থেকে উর্দু টানসহ একটা গলা ভেসে এলো। 'গো অ্যাহেড, প্লিজ।'

'মেসেজ ফর মিস্টার মখমল। আর্জেন্ট মেসেজ ফর পানি কি চিড়িয়ার মালিক মিস্টার মখমলের জন্যে।'

'মেসেজে কী বলা হয়েছে?'

'মেসেজ পড়ছি : "ফিল্মটা আমাদের হাতে। আপনি আপনার প্রপার্টি ডেলিভারি দেবেন তার গ্যারান্টি চাই আমরা। সময় এবং স্থান এই মুহূর্তে নির্ধারণ করুন। স্বাক্ষর: জাকি আজাদ"।'

মুচকি হাসল আজাদ। আদর করে ওর কাঁধে ঘুষি মারল ডিউক। 'আর এক মিনিট। আমি বাজি ধরে বলতে পারি মিস্টার মখমলের গলা শুনতে পাবো।'

নৌকো একই ছন্দে দোল খাচ্ছে। আজাদের চোখে গ্লাস। ওরা কেউ নড়াচড়া করছে না। তিন মিনিট পার হতে চলেছে, এই সময় সাড়া পাওয়া গেল। তবে সেটা কোনো মেসেজ নয়, অপর প্রান্তে স্বয়ং মিস্টার মখমল হাজির হয়েছেন। ডিউকের ধারণাই সত্যি হলো।

'জনাব জাকি আজাদ?' গলার আওয়াজে বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট।

ডিউকের হাত থেকে মাইক্রোফোন নিলো আজাদ। 'দিস ইজ জাকি আজাদ।'

'পাঁজরে ওই লাথি মারার জন্যে আপনাকে দাম চুকাতে হবে!' ঘেউ ঘেউ করে উঠল মিস্টার মখমল।

হেসে উঠল আজাদ। 'দূর সাহেব, মার খেলে সেটা বেমালুম হজম করে ফেলতে হয়– লজ্জার কথা কেউ বলে বেড়ায় নাকি! আমি আরও অনেক বড় বিষয়ে প্রস্তাব দিতে চাইছি। ফিল্মটা আমার কাছে।'

অল্প একটু বিরতি। 'আলোচনায় রাজি আছি,' রাগে কষকষ করতে করতে বললেন মিস্টার মখমল। 'ফিল্মের বদলে যমজটা।'

'কোথায় এবং কখন?'

'আজ, মাঝরাতে। ফিল্মটা নিজের হাতে ডেলিভারি দেবেন প্রিন্সেস পলা রিমিনি। আমার নিজের লোকজন যমজকে ডেলিভারি দেবে। আমাদের দেখা হবে নিউট্রাল গ্রাউন্ডে।'

'বিনিময় পর্বটা আমি দেখব লোড করা রাইফেল নিয়ে,' প্রতিজ্ঞা করল আজাদ।

'আমারও ওই একই প্ল্যান,' পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিলেন মিস্টার মখমল।

'কোথায়?'

'ইটালি আমাকে নিস্তেজ বানিয়ে রাখে।'

'সিরিয়া আর ইরাকও আমার বিরক্তিকর লাগে,' বলল আজাদ। 'অন্য কোথাও।'

'একটা নিরপেক্ষ দেশ,' মিস্টার মখমল বললেন।

'নাম বলুন।'

'তুরস্ক। সি অভ মারমারা, বসরা স্ট্রেইট, ইস্তানবুল, ইজমিটকে পেছনে ফেলে নির্জন পাহাড়ি এলাকায়। মাউন্ট কুরুগ্লুতে। কো-অর্ডিনেটস দিচ্ছি, লিখে নিন। ওই পাহাড়ে

আকাশপথেও পৌছানো যায়।' ধীরে ধীরে কো-অর্ডিনেটস বলে গেলেন মিষ্টার মখমল, যাতে ভুলভাল না হয়। তারপর বললেন, 'ডু ইউ রিড মি?'

'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার,' বলল আজাদ, কো-অর্ডিনেটস পুনরাবৃত্তি করল। 'আমি পৌছে যাব।'

'মাঝরাতে,' মিষ্টার মখমল বললেন। 'পরিত্যক্ত একটা ল্যান্ডিং স্ট্রিপ আছে, সেটার শেষ মাথায় আগুন জ্বলবে। ওটাই রদেভো সাইট।'

প্রিন্সেস পলা রিমিনি কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তার পরনে কালো সিল্ক নাইটগাউন, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড্রোব থেকে সংগ্রহ করেছে আজাদ। এই মুহূর্তে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছেন তিনি। আজাদ সিদ্ধান্ত নিলো, সুখবরটা জানানোর জন্যে তার ঘুম ভাঙানোর প্রয়োজন নেই। কামরা থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসবে, এই সময় তাকে নড়ে উঠতে দেখল। চোখ দুটো খুলল বিস্ফারিত হয়ে, আতঙ্ক ভরাট হয়ে আছে, শরীরটা কাঁপতে শুরু করল। তারপর খেয়াল করলেন কোথায় রয়েছেন, এবং আজাদকেও চিনতে পারলেন। স্বস্তিতে দুর্বল লাগল, বালিশে মাথা নামালেন।

বিছানার কিনারায় বসল আজাদ। বাইরে এইমাত্র সূর্য উঠেছে। গ্রিল লাগানো ক'টা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে সোনা রোদ, টেরাকোটা মেঝেতে তৈরি করেছে বিচিত্র নকশা। লোহার বারে জড়াজড়ি করে ঝুলছে আঙুরলতা। একটা বাতাস এসে পাতাদের অস্থির করে তুলল, সে বাতাসে খোলা সাগরের মাদকতা ভরা গন্ধ।

'আমি খুব ক্লান্ত,' বললেন প্রিন্সেস, সুরটা প্রায় অনুতাপের, বিছানায় উঠে বসে রাশি রাশি কালো চুলে হাত চাপড়ালেন।

'আপনার সামনে পুরোটা দিন পড়ে আছে,' অভয় দিয়ে বলল আজাদ। 'তবে আজ সকালবেলাই আমাদের জন্যে ভালো খবর আছে।'

'তাই?'

'আপনার ভাইকে আজ মাঝরাতে ফেরত দেবে ওরা। বিনিময়ে আমরা ফিল্মটা ওদেরকে দেবো।'

প্রিন্সেসের চোখে পাশুটে মেঘ জমল। 'ফিল্ম? কোথেকে দেবো? ওটা তো আমার কাছে নেই।'

পকেট থেকে বের করে ফিল্ম ক্যানিস্টারটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরল আজাদ। 'রাখুন এটা। নিজের কাছে না রাখলে মন শান্ত হবে না।'

'ধন্যবাদ।' প্রিন্সেসের গাঢ় চোখে হঠাৎ পানি চলে এলো। 'আপনার এত ভালো ব্যবহার আমি কখনো ভুলব না।'

তার সরু হাতটা নিজের হাত দিয়ে ঢাকল আজাদ। 'আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আবার ঘুমানোর চেষ্টা করুন।'

আজাদকে দেখছেন প্রিন্সেস, চেহারায় অস্বস্তি।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল আজাদ।

'আমি আসলে গুলিয়ে ফেলেছি,' ফিসফিস করে বললেন প্রিন্সেস। 'সব সময় ভেবেছি সব পুরুষই সমান—সে স্বামী হোক, ভাই হোক, বাবা হোক।'

'আর এখন?' আজাদের মুখে নরম হাসি।

'আমি যে ক্যাটাগরির কথা বললাম, আপনি তার একটাতেও পড়েন না। আপনি...' হতাশায় মাথা নাড়লেন প্রিন্সেস।

'প্রেমিক?' শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে আজাদের ঠোঁট বেঁকে গেল।

'এটা আপনার বলা উচিত না,' তিরস্কার করলেন প্রিন্সেস। ডক্টর কাসলার খুব ভালো একজন মানুষ। একজন আদর্শ স্বামীর মতো। আপনার মতো না।'

তার দিকে ঝুঁকল আজাদ, খুব নরম করে তার ঠোঁটে চুমো খেলো। 'ঘুমোন। আপনি আমাকে খুব বেশি প্ররোচিত করছেন।'

নিজেকে পিছিয়ে নিলেন প্রিন্সেস, চোখে উষ্ণতা, পুরোটা খোলা। 'সম্ভবত আপনি একা প্ররোচিত হচ্ছেন না।'

'বিশ্রাম নিন, প্রিন্সেস,' বলল আজাদ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছে নিজেকে।

'আমার বিশ্রাম দরকার নেই।' হেসে উঠলেন তিনি। হাত দুটো লম্বা করলেন। আজাদের কাঁধ স্পর্শ করলেন। টেনে নিজের আরও কাছে নিয়ে এলেন ওকে, দুটো শরীরকে এক হতে দিলেন, দু'জনের ঠোঁটও বাদ গেল না।

প্রিন্সেসকে শক্ত করে বুকে টেনে নিলো আজাদ, চুমো খেলো যেন কতদিনের ক্ষুধার্ত। সেভাবেই সাড়া দিলেন প্রিন্সেস, আর এভাবেই ওদের বোকা বোকা আলাপের ইতি ঘটল।

মাথার ওপর চিক চিক করছে পাখিরা। নীল আকাশে ছাড়া ছাড়াভাবে স্তূপ হয়ে আছে তুলোর মতো মেঘ। লাল, নীল, সাদা আর সবুজ পাল নিচের দিগন্তে ঝিলমিল করছে। পাহাড়-প্রাচীরের গা ঘেঁষে ওড়ার সময় চেঁচামেচি করছে গাঙচিল। ভিলার নিরিবিলি উঠানে বসে আজাদ আর ডিউক একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলে কুরুগ্লু পাহাড়ের নির্দিষ্ট জায়গাটা খুঁজে বের করে গবেষণা করছে; দু'জনের মাঝখানে লোহার টেবিল।

'ওরা চালাক,' বিড়বিড় করল আজাদ। 'এখান থেকে তুরস্ক একটা লাফ আর দুই হড়কানি দূরে। যে হেলিকপ্টার সেদিন রাতে ম্যারিয়ো রিমিনিকে নিয়ে গেছে সেটার জন্যে আরেকটা ট্রিপ কোনো ব্যাপারই না।'

'আমরা কিন্তু বিদেশের মাটিতে থাকব,' ডিউকের গলায় অসন্তোষ।

'ঠিক তাই। এটাই জনাব মখমলের রণকৌশল।'

'তুমি নিশ্চিত, ম্যারিয়ো রিমিনি এখনও ওখানে?'

'তুমি না বললে আমাকে খুঁজে পাবার আগে ইয়ট সার্চ করেছে?'

'পানি কা চিড়িয়াতে তিনি নেই,' জোর দিয়ে বলল ডিউক।

'তাহলে তিনি অবশ্যই তুরস্কে। কুরুগ্লু পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও।'

'এটা একটা ফাঁদও হতে পারে।'

'অবশ্যই। আর তাই পুরো এক সিরিজ ডিফেন্স প্ল্যান রেডি রাখব আমি,' বলল আজাদ।

'আমার কাছ থেকে কী চাও তুমি?'

'আমার ব্ল্যাক বক্সটা দরকার। আর দরকার মডিফায়েড ডিএক্স পেস্ট ও কয়েক বান্ডিল স্টিক।'

'ঠিক আছে, আজাদ।'

'সেসনা খুব ভালো করে চেক করা হয়েছে?'

'একদম।'

নিজের প্রাইভেট প্লেনের কথা বলছে আজাদ। ওটা প্যাসেঞ্জার প্লেন, বিশেষ কিছু ইকুইপমেন্ট যোগ করা হয়েছে। সেটা সম্প্রতি সার্ভিসিং করানো। ফলে নেইপলস এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে উঠতে পুরোপুরি তৈরি।

'গুড। আমরা অন্তত জানি যে ব্ল্যাক বক্স কাজ করে। শেষবার তো কাজ করেছিল। কাজেই ফ্লাইটের জন্যে আমরা তৈরি।'

ম্যাপের দিকে ঝুঁকল ডিউক, কপালে মনোযোগের রেখা ফুটল। 'এসো অ্যাকশন নিয়ে আবার একবার কথা বলি, স্টেপ

বাই স্টেপ। আমি চাই না কিছু একটা মিস হয়ে যাক।'

মাথা ঝাঁকাল আজাদ, নিজের একটা আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণের প্ল্যান ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করছে।

গোধূলির খানিক আগে আজাদ, ডিউক আর প্রিন্সেস পলা আলআমিনো হোটেলে নাম লেখালেন। ওখান থেকে নেইপলস হারবার দেখা যায়। নিজেদের সুইটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চোখে বিনকিউলার সেঁটে জানালা দিয়ে হারবারের দিকে তাকাল আজাদ।

'আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে,' বিড়বিড় করল ও।

'আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন, আমি কি তা জিজ্ঞেস করতে পারি?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করলেন প্রিন্সেস।

'না।'

হাসিমুখে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

গ্লাস অ্যাডজাস্ট করে হোটেলের পাশ দিয়ে এগোনো রাস্তার ওপর তাকাল আজাদ। এই রাস্তা ইটালির উত্তর দিক, রেগিও আর কালাব্রেরিয়া থেকে এসেছে, হাইওয়ে রোড নাম্বার নাইনটিন নামে; চলে গেছে সেই একেবারে রোম পর্যন্ত।

'ওই সেই গাড়ি,' বলল ও।

জানালা দিয়ে ঝুঁকে নিচের রাস্তার দিকে তাকাল ডিউক।

জাকি আজাদের অফ-হোয়াইট ল্যান্সিয়া এক ঝাঁক গাড়ির সঙ্গে ছুটে আসছে ওই রাস্তা ধরে।

আপন মনে হাসল আজাদ। 'তোমার দুলাভাই মোটেও আমার মতো দেখতে নয়, ডিউক। তবে কুচকাওয়াজে পার পেয়ে যাবে।'

'তাড়াহুড়োর মধ্যে এর চেয়ে ভালো আর কী করতে পারতাম বলো।'

'মেয়েটি দেখছি প্রিন্সেসের চেয়ে একটু মোটা,' ঘাড় ফিরিয়ে প্রিন্সেস পলা রিমিনিকে একবার দেখে নিলো আজাদ। চেহারা রাঙা হয়ে ওঠায় আরও সুন্দর দেখাল তাকে।

'আমার সম্পর্কেও কিছু বলো,' বলল ডিউক। 'আমাকে তুমি দেখতেই পাচ্ছ না?'

'তুমি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নও কিনা।' হেসে উঠল আজাদ।

'তারপরও, ভালোই মিল পাওয়া যাচ্ছে। ওরা তিনজন আমাদের মতোই দেখতে– কোনো সন্দেহ নেই।'

'বোকা বানানোর জন্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে, ল্যান্সিয়া। ওটাই ওখানে একমাত্র সাচ্চা জিনিস।'

'কিন্তু বুঝব কীভাবে ওদেরকে আমরা বোকা বানাতে পারলাম কি-না।' ডিউক উদ্বিগ্ন।

এখনও হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে আছে আজাদ। ল্যান্সিয়ার এক ব্লক পেছনে নীল একটা ফিয়াট দেখতে পেলো, দু'জন লোক রয়েছে তাতে।

'ওদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি,' ডিউককে বলল আজাদ। 'নীল একটা ফিয়াট? ডাম্পি তাই বলেছিল না?'

'দু'জন লোক আছে তাতে,' যোগ করল ডিউক।

'ওটা ল্যান্সিয়াকে ফলো করছে,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল আজাদ, চোখ থেকে গ্লাস নামিয়ে কালো ব্যাগে রেখে দিলো। 'প্রিন্সেস, আবার আমাদের পথে নামার সময় হয়েছে।'

খুব সুন্দর করে ভ্রূ কুঁচকালেন প্রিন্সেস। 'কী ঘটল আমার বোঝা হলো না।'

'ল্যান্সিয়া একটা টোপ, প্রিন্সেস,' খুশিমনে ব্যাখ্যা করছে আজাদ। 'ডিউকের এক লোক জানিয়েছে, সেই ক্যাপ্রি থেকে কেউ একজন আমাদের পিছু নিয়েছে। কাজেই আমরা তাদেরকে নকল একজন জাকি আজাদ আর ভুয়া এক প্রিন্সেস পলা দিয়েছি হাইওয়ে নাইনটিন ধরে ফলো করার জন্যে। শুধু ফলো নয়, পথের কোথাও ওদেরকে অ্যামবুশও করা হবে।'

'আর তারপর?'

'এদিকে আমরা, আসল লোকজন, সেসনায় চড়ে তুরস্কের কুরুগ্লু পাহাড়ে আইএসআইর সঙ্গে দেখা করার জন্যে পৌঁছে যাব।'

'কিন্তু কিডন্যাপাররা আপনার সেসনা সম্পর্কে জানে না?'

'জানে বৈকি,' নরম সুরে বলল আজাদ। 'তবে কিছু ইউরোর বিনিময়ে ইন্টারেস্টেড আইএসআই এজেন্টের কাছে রিপোর্ট পৌঁছে যাবে আমার সেসনা মেরামত কাজে হ্যাঙ্গারে পড়ে আছে, ওড়ার অবস্থায় নেই। জাকি আজাদ যদি আজ প্লেনে চড়ে, তাকে রোম থেকে চড়তে হবে। সেজন্যেই অফ-হোয়াইট ল্যান্সিয়া উত্তর দিকে ছুটছে।'

'একদম সহজ একটা টোপ,' বলল ডিউক।

প্রিন্সেস বিষণ্ন মনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমার কাছে এসব গ্রিক লাগছে।'

আজাদ হাসল। 'আমরা স্রেফ নেইপলস এয়ারপোর্টে যাব, বারিতে যাবার একটা নকল ফ্লাইট প্ল্যান ফাইল করব, তারপর উড়ে যাবে তুরস্কে।'

সেসনার কন্ট্রোলে বসে প্লেক্সিগ্লাসের ভেতর দিয়ে ওর নীচে গাঢ় নীল অড্রিয়্যাটিক সাগরে চোখ বুলাচ্ছে আজাদ। সামনে দেখা যাচ্ছে তুরস্ক উপকূল, মারমারা সাগর আর বসফরাস প্রণালি। ডিউকের দিকে তাকাল ও, প্রিন্সেসের সঙ্গে পেছনে বসে আছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল কেউ কোনো কথা বলছে না, যে যার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মগ্ন।

'কুরুগ্লু পাহাড়,' বলল আজাদ, হাত লম্বা করে নিচের দিকটা দেখাল।

দূরের পাহাড়টা দেখার জন্যে গলা লম্বা করে আছেন প্রিন্সেস, ফিসফিস করলেন, 'ম্যারিয়ো।'

আশ্বস্ত করার সুরে ডিউক বলল, 'খুব শিগগির আপনি তাকে দেখতে পাবেন।'

'চারপাশে কোনো এলিয়েন প্লেন?' ডিউককে প্রশ্ন করল আজাদ।

'কই, না।'

'কপ্টার?'

'নাহ্।'

'ওদেরকে আমি বিশ্বাস করি না। অবজেক্টিভের এত কাছে এসে যদি গুলি খেয়ে পড়ে যেতে হয়, তারচেয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না।'

প্লেনের ডেক থেকে একটা মেশিন পিস্তল তুলে সেটার গায়ে হাত বুলাল ডিউক। 'আসুক না কেউ ফেলে দিতে, আমরা তো অপেক্ষা করছি।'

মন দিয়ে সেসনা চালাচ্ছে আজাদ, আবার কম্পাস চেক করল, পাশে ভাঁজ খোলা চার্টে নিজের লোকেশন চিহ্নিত করল।

'আর বিশ মিনিট।'

কালচে আকাশের দিকে তাকাল ডিউক, তার চোখ আকাশ চষে বেড়াচ্ছে।

নিচে পাহাড়ি ঢাল দেখতে পাচ্ছে আজাদ। ওই ঢাল আরও সামনে খাড়া পাহাড়-প্রাচীরে পরিণত হয়েছে। আরও দূরে আরও অনেক উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, তারা-জ্বলা আকাশের গায়ে এবড়োখেবড়ো।

'নাক বরাবর,' শান্ত সুরে বলল ও, আঠারো মিনিট পর, উইন্ডশিল্ডের দিকে আঙুল তাক করে। ওর পাশে চলে এলো ডিউক।

'কুরুগ্নু পাহাড়শ্রেণী।'

ওদের নিচে, স্তূপ আকৃতির একটা পাহাড়ের পাশে, আগুনের বিন্দু দেখা গেল। মিস্টার মখমল যেমনটি বলেছেন, একটা পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপের শেষ প্রান্তে আগুন জ্বালা হয়েছে। ফ্ল্যাপ নামিয়ে দিয়ে সেসনাকে নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আজাদ। আন্দাজ করছে এয়ারস্ট্রিপ আছে, কিন্তু দেখতে পায়নি এখনও। ১৮ ডিগ্রি বাঁক ঘোরার মধ্যে রয়েছে, সেটা পুরো করতে পারেনি। হঠাৎ সরু ফাঁকা জায়গাটা দেখতে পেলো। বোঝা গেল ওটাই এয়ারস্ট্রিপ।

'আমরা নামতে যাচ্ছি। নিচে নামার পর আমি চাই সবাই যেন পুরোপুরি সশস্ত্র থাকে,' ডিউককে নির্দেশ দিলো আজাদ। 'তবে আমার কাছ থেকে সংকেত না পেলে গুলি করবে না। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না।

ভ্রূ কুঁচকালো ডিউক, কালো সুটকেস আর মেশিন পিস্তল বহন করছে। কেবিনের দরজায় উদয় হলেন প্রিন্সেস, তাকে ধরল আজাদ, সাহায্য করল নামতে।

হঠাৎ এয়ারস্ট্রিপের এক ধারে চোখ ধাঁধানো স্পটলাইট জ্বলল। একই সঙ্গে লাউড হেইলারে তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল– 'দারুণ সময়জ্ঞান আপনার, জনাব জাকি আজাদ। দয়া করে হেঁটে সামনে আসুন, আমরা যাতে আপনাদের দেখতে পাই।'

'ওকে,' ফিসফিস করে ডিউককে বলল আজাদ। 'উনি জনাব মখমল আইএসআই।' প্রিন্সেসের দিকে তাকাল। 'ভয় লাগছে?'

'এত বেশি যে মরে না যাই,' আটকে রাখা দম ছাড়লেন তিনি।

তার হাত ধরল আজাদ, তাকে নিয়ে স্পটলাইটের অসহ্য



'ব্ল্যাক বক্স তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, সুটকেসে।'

'শক্ত করে ধরে থাকো।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল ডিউক।

ওদের চারপাশে ঝুলে আছে পাহাড় আর পাহাড়। সেসনা অবিরত নিচে নামছে। নাক সোজা করে নিয়ে এয়ারস্ট্রিপের দিকে তাক করল আজাদ। নিচে গাছপালা দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে, সামনে আরও গাছপালা দৃষ্টিপথে চলে আসছে, ঢেকে ফেলছে ওদের আকাশ। দু'পাশেই পাইন গাছ। এয়ারস্ট্রিপের শেষদিকে আগুনটা উল্লাসে যেন নাচানাচি করছে, আকাশে উঠে যাচ্ছে কালচে ধোঁয়া।

সেসনা ইতস্তত করল, খসে পড়ল অনেকটা, সিধে হলো, তারপর জমিন স্পর্শ করল চাকা। উঁচু-নিচু মাটির ওপর দিয়ে খানিক দূর ছুটে দাঁড়িয়ে পড়ল আকাশযান। কেবিনের দরজা খুলল আজাদ, হোলস্টার থেকে হ্যান্ডগান টেনে নিলো, তারপর লাফ দিয়ে নিচে নামল। চারদিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে

আলোয় হেঁটে এলো।

এখানে পৌঁছাতে যত জটিলতাই দেখা দিয়ে থাকুক, বিনিময় পর্বটা হাস্যকর রকমের সহজ লাগছে। একধারের পাইন জঙ্গলে, স্পটলাইটের পেছনে, মিস্টার মখমল আর তার দল দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাকি আজাদ আর ওর দল দাঁড়িয়েছে সেসনার পাশে।

স্পটলাইটের পেছন থেকে দু'জন লোক এগিয়ে এলো, থামল জঙ্গলের কিনারায়।

'ও ম্যারিয়ো!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রিন্সেস পলা, আনন্দে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে।

'আপনি নিশ্চিত?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল আজাদ।

একটা দৃষ্টি ছুড়ে ওকে পাথর বানিয়ে দিলেন পলা রিমিনি। 'ও আমার যমজ ভাই!'

লোক দু'জন আবার সামনে এগোচ্ছে। ম্যারিয়োর পেছনের লোকটার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নেই। চোখে শিংয়ের তৈরি চশমা, যেন তুর্কি এক ইন্টেলেকচুয়াল।

'দয়া করে প্রিন্সেসকে আমার লোকের সঙ্গে দেখা করতে আসতে দিন,' নির্দেশ দিলেন মিস্টার মখমল।

'প্রিন্সেস,' তাকে সামনে এগোবার উৎসাহ যোগাচ্ছে আজাদ। 'আপনার কাছে ফিল্মটা আছে?'

তিনি তার জুতো তুলে গোড়ালি থেকে ফিল্মটা বের করলেন। 'এই যে।'

'যান।'

ম্যারিয়ো আর তার সঙ্গের লোক সেসনার দিকে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে, এতক্ষণে তাদের দিকে হাঁটা ধরলেন প্রিন্সেস।

'ম্যারিয়ো রিমিনির সঙ্গে ওই লোক একজন কেমিস্ট, জনাব আজাদ,' বললেন মিস্টার মখমল। 'ওর কাজ ফিল্মটা পরীক্ষা করা। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না।'

হেসে উঠল আজাদ। 'আমি আহত বোধ করছি।'

ম্যারিয়োর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার হাতে ফিল্মটা ধরিয়ে দিলেন প্রিন্সেস। ম্যারিয়ো ঝট করে পলাকে নিজের বাড়ানো বাহুতে টেনে নিলেন। পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন তারা, প্রিন্সেস ফোঁপাচ্ছেন, উত্তর তুরস্কের এই পাহাড়ি জঙ্গলে তার কান্নাই একমাত্র শব্দ।

কেমিস্ট ঘুরে গেল, স্পটলাইটের দিকে চোখ রেখে হাত ঝাপটা দিয়ে সংকেত দিচ্ছে।

'ঠিক আছে,' ভেসে এলো মিস্টার মখমলের উল্লসিত গলা। 'আপনি আপনার লোককে নিতে পারেন, জনাব আজাদ।'

হনহন করে হেঁটে নিজের দলের কাছে ফিরে যাচ্ছে কেমিস্ট। পরস্পর হাত ধরে সেসনার দিকে ছুটে ফিরে আসছেন প্রিন্সেস, তার পাশে ভাই ম্যারিয়ো রিমিনি। উড়োজাহাজের ডানার পাশে উবু হয়ে বসে রয়েছে আজাদ, হাতের অস্ত্র শত্রুদের দিকে তাক করা, অপেক্ষা করছে মিস্টার মখমল চমকে দেয়ার মতো কোনো চাল দেন কি-না দেখার জন্যে।

স্পটলাইটের পেছনে গাঢ় অন্ধকার, সেখানে হারিয়ে গেল কেমিস্ট। ওটা প্রায় যেন দীর্ঘক্ষণ ধরে অপেক্ষায় থাকা একটা সংকেত, পাইন জঙ্গল থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে আসতে লাগল ওদের দিকে।

হ্যান্ডগানের ট্রিগার টেনে স্পটলাইট গুঁড়িয়ে দিলো আজাদ। এরকম কিছু একটা যে ঘটবে, ওর ধারণায় ছিলো। মুক্তিপণের কর্মসূচিতে যারা অংশ নেবে তাদের সবাইকে মিস্টার মখমল প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেবেন না– এরকম সন্দেহ করার জোরালো যুক্তি আছে। বিনিময় পর্বটা বর্ণনা করার জন্যে কেউ যদি বেঁচে থাকে, আইএসআই পরিচয় ফাঁসের ঝুঁকির মধ্যে চলে যাবে। তার ব্যক্তিগত বিপদের কথা না হয় নাই ভাবা হলো। আজাদ, প্রিন্সেস, ম্যারিয়ো, ডিউক– সবাইকে নিশ্চিহ্ন করাই মিস্টার মখমলের উদ্দেশ্য।

হোঁচট খেতে খেতে সেসনার আড়ালে পৌঁছলেন প্রিন্সেস পলা আর ম্যারিয়ো।

'ডিউক,' আজাদ চেঁচিয়ে উঠল, গলায় জরুরি তাগাদা। 'এখন!'

'রাইট!' সেসনার পেছন দিকের কোথাও থেকে বলল ডিউক।

জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে আজাদ, ঠিক যেখানে কেমিস্ট ঢুকেছে, এবং যেখান থেকে মিস্টার মখমলের গলা ভেসে এসেছে। তারপর, বিস্ময় জাগানোর মতো একটা ব্যাপার, অন্ধকারকে চিরে দিয়ে উজ্জ্বল নীল আলোর বিচ্ছুরণ ঘটল, নিভে গেল এক পলকে।

'দারুণ কাজ!' আজাদের গলায় অকুণ্ঠ প্রশংসা। আফটার-ইমেজের কারণে চোখ মিটমিট করছে।

'ওটা কী দেখলাম?' জানতে চাইলেন প্রিন্সেস।

ছুটে সেসনার দিকে ফিরে আসছে ডিউক, হাতে কালো সুটকেস।

'ডিউকের ছোট একটা ডিভাইস,' গর্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করছে আজাদ। 'এক্সপ্লোসিভ পেস্ট ডিটোনেট করার জন্যে একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র। যে ক্যানিস্টারে ফিল্মটা আছে ওটার গায়ে মডিফায়েড ডিএক্স পেস্ট লেপটে দিয়েছে ও। সেটাই বিস্ফোরিত হতে দেখলাম আমরা। ওই বিস্ফোরণে ফর্মুলা নষ্ট হয়ে গেছে।'

'আর কপি আছে?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যারিয়ো রিমিনি।

'হ্যাঁ,' বলল আজাদ। 'আসল কপিটা আমার কাছে, এই দেখুন।' হাতের মুঠো খুলল আজাদ। 'জনাব মখমলকে হুবহু এটারই একটা কপি আমরা পাঠিয়েছি, বিসর্জন দেয়ার জন্যে। চলে আসুন, আমরা প্লেনে চড়ি।'

জঙ্গলের দিক থেকে হা-হুতাশ ভেসে আসছে, পিছু নিয়ে গালিগালাজ, অভিশাপ, হুমকি। জানা কথা মরণঘুমের ফর্মুলা হাতে পেয়েও না পাওয়ায় রাগে দিশেহারা হয়ে পড়েছে তারা। জ্যান্ত হলো লাউড হেইলার। মিস্টার মখমলের গলা থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো : 'Into the valley of Death rode the six hundred!'

ভ্রূ কুঁচকাল আজাদ। ওটা শুনতে লাগল ঠিক যেন...

ম্যারিয়ো রিমিনি ঘুরল, আজাদের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলো ফিল্মটা, সেসনা লক্ষ্য করে খিচে দৌড়াচ্ছে, লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল কেবিনে।

'ডিউক! জলদি! থামাও ওকে!' চিৎকার করছে আজাদ, এইমাত্র মাথায় ঢুকেছে কী ঘটছে এখানে।

ডিউক কিছু করার আগে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল কেবিনের দরজা, ভেতর থেকে ম্যারিয়ো রিমিনি তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

'ম্যারিয়ো!' চেঁচাচ্ছেন প্রিন্সেস। 'কী করছ তুমি?'

সেসনা গর্জে উঠল, দ্রুত ইঞ্জিনের শক্তি বাড়ছে।

'গাছের আড়ালে,' নির্দেশ দিলো আজাদ। 'ম্যারিয়ো প্লেন ছোটার সময় আমরা খোলা জায়গায় থাকব না!'

তিনজন ছুটল আড়াল লক্ষ্য করে। পাইনের জঙ্গল থেকে গর্জন করছে রাইফেল। এয়ারস্ট্রিপ ধরে ছুটতে শুরু করেছে সেসনা, এপাশ-ওপাশ দুলছে। শেষ মাথায় গিয়ে, আগুনের কাছাকাছি, ঘুরে গেল। অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রিন্সেস পলা। আজাদ তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে।

'কী ঘটল?'

'পোস্ট-হিপনোটিক সাজেশন। আপনার ভাইয়ের ব্রেনওয়াশ করা হয়েছে। ''চার্জ অব দা লাইট ব্রিগেড''-এর ফ্রেইজ ছিলো ট্রিগার মেকানিজম, যেটা আবার তার নিয়ন্ত্রণ ওদের হাতে তুলে দিয়েছে। তিনি প্লেন চালাতে জানেন। আগে থেকে ঠিক করা কোনো গন্তব্যে যাচ্ছেন, ওখান থেকে ফিল্মটা সংগ্রহ করবেন মখমল।'

'ও মাই গড!' ফুঁপিয়ে উঠলেন প্রিন্সেস পলা। 'আমার নিজের ভাই!'

স্ট্রিপ ধরে ছুটে এসে আকাশে উঠে পড়ল সেসনা। তারপর মিস্টার মখমলের হাসি শুনতে পেলো ওরা। হাসি থামিয়ে তিনি বললেন, 'কিস্তি মাত, জনাব আজাদ। কী, ঠিক বলিনি?'

আজাদ জবাব দিলো না। প্রিন্সেস আর ডিউককে নিয়ে ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে ঢুকছে ও।

সাত

ফেরার পথে

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাকি দু'জনকে নিয়ে পাইন জঙ্গলে মোড়া

একটা ঢালে নেমে এলো আজাদ, সেখান থেকে চলে এলো খোলা মাঠে। এই মাঠ বা ফাঁকা জায়গা ল্যান্ডিং স্ট্রিপের চেয়ে খানিক নিচে। ওদের ওপর দিক থেকে এখনও গুলি বর্ষণের শব্দ ভেসে আসছে। দেখা যাচ্ছে ধাওয়া না করে ফাঁকা গুলি করেই সন্তুষ্টি বোধ করছেন মিস্টার মখমল।

ঘাসের ভেতর ঢলে পড়ল ওরা, ক্লান্তিতে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

প্রিন্সেসের গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'ম্যারিয়ো! নিজেও জানে না কী করছে। মিস্টার আজাদ, কী আছে ওর কপালে?'

'পোস্টহিপনোটিক সাজেশন খানিক পর ছেড়ে যাবে তাঁকে, প্রিন্সেস। সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন আপনার ভাই।'

'কিন্তু আমি আর কখনো দেখতে চাই না ওকে!' গুঙিয়ে উঠলেন প্রিন্সেস পলা। 'আমার নিজের ভাই...বিশ্বাসঘাতক!'

তার হাতে মৃদু চাপড় দিলো আজাদ। 'বিশ্বাসঘাতক নন। ধোঁকাবাজির শিকার। তা ছাড়া, আশা কখনো ফুরোয় না।'

'আর কিসের আশা!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'পৃথিবীতে একমাত্র ওই একজনই ছিলো আমার। সে-ই যদি চলে যায়...'

'তিনি চিরকালের জন্যে যাননি,' আজাদ একদম শান্ত।

তার চোখ হঠাৎ রাগে জ্বলে উঠল। 'আপনি বিষয়টা নিয়ে শান্ত থাকতে পারেন। আপনার কাছে এটা একটা কাজ, যেটা কেঁচে গেছে। তার বেশি কিছু না। আপনি এক বিন্দু কেয়ার করেন না। কিন্তু এখানে একজন হিউম্যান বিং জড়িত। আমার ভাই। কীভাবে আপনি এতটা হিম আর নির্লিপ্ত থাকতে পারছেন?'

'আমি তো বললাম আপনাকে, সব এখনও শেষ হয়ে যায়নি, প্রিন্সেস।' আজাদ তার কাঁধে একটু চাপ দিলো।

ব্ল্যাক বক্স থেকে মুখ তুলল ডিউক, ওখানে বসে ওটার নব, ডায়াল আর লিভার নাড়াচাড়া করছে।

'আজাদ, তুমি ফর্মুলার কপি বানাতে গেলে কী কারণে? একমাত্র কপিটা বিস্ফোরিত হওয়ায় ম্যারিয়োর তাহলে প্লেন চুরি করার কোনো কারণ থাকত না।'

'আইএসআই'কে এখনও এটাই ভাবতে দেয়া ভালো যে মরণঘুমের মাত্র একটা কপিই আছে।' হাসল আজাদ। 'বিশেষ করে তারা যেটাকে আসল বলে ভাবছে সেটা যখন তা নয়।'

ডিউকের চোখ আলোকিত হয়ে উঠল। 'তুমি বলতে চাইছ, ম্যারিয়ো রিমিনি একটা মূল্যহীন ফিল্ম নিয়ে ভেগেছেন?'

'মূল্যহীন বলো কী করে? নাচুনে এক মেয়ের ন্যুড কালার ফটো আছে ছটা, পোজগুলো ভোলার মতো নয়।'

'তুমি সত্যি জিনিস একখান, আজাদ!'

'আমার কি শুনতে ভুল হলো? তুমি জিনিয়াস বললে?'

'না, বলিনি; কারণ তাতেও বোঝানো যায় না তুমি আসলে কী।'

হাত ঝাপটা দিয়ে বন্ধুর কৌতুক বাতিল করে দিলো আজাদ। 'যদিও সেসনাকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে; নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে।' ব্ল্যাক বক্সের ওপর ঝুঁকল। 'ডিউক, আমি চাই তুমি প্রিন্সেসকে দেখাও কী নিয়ে কাজ করছ তুমি।'

'আমার সময় নেই, আজাদ।' ভ্রূ কুঁচকাল ডিউক। 'ইতিমধ্যে পাঁচ মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। আর চার মিনিটের মধ্যে যোগাযোগ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলব।'

'ঠিক আছে,' শান্ত সুরে বলল আজাদ। 'আমি ওকে জানাচ্ছি। আপনি কালো বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন তো, প্রিন্সেস?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' সাড়া দিলেন পলা। 'প্লেন থেকে নামার পর দেখছি সারাক্ষণ ওটাকে বয়ে বেড়াচ্ছেন আপনার বন্ধু। কী ওটা?'

'ওটা একটা জটিল ডিভাইস। ওটার কাজ সহজ করে বোঝাতে হলে আমাকে বলতে হবে– জিনিসটা রিমোট কন্ট্রোল্ড অটোমেটিক-পাইলট, সেসনার জন্যে।'

'বুঝলাম না।'

'আমার প্লেনকে এখানে ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাকে শুধু ওই ব্ল্যাক বক্সের সাহায্যে ওটাকে গাইড করতে হবে।'

'কিন্তু প্লেনটা তো আমার ভাই চালাচ্ছে!'

'রিমোট দায়িত্ব নিলে ম্যানুয়েল কাজ করবে না, ম্যারিয়ো যত চেষ্টাই করুন না কেন। আমি তাকে খুব সহজেই এখানে নামিয়ে আনতে পারব। রিমোট কিটটা আমরা সঙ্গে করে এনেছি, তার কারণ আমাদের সন্দেহ ছিলো জনাব মখমল প্লেনটাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করবেন। তবে ভুলেও ভাবিনি তিনি আপনার ভাইকে ব্যবহার করবেন! ডিউক, সেসনার দায়িত্ব নিয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ।' ব্ল্যাক বক্সটা আজাদের হাতে ধরিয়ে দিলো ডিউক।

ওটার সামনে বসে নব ঘোরাল আজাদ, ডায়ালের কাঁটার ওপর নজর রাখছে।

মাথা তুলল ডিউক। 'আমার যেন মনে হচ্ছে প্লেন ইঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছি।'

'আমিও,' বলল আজাদ। 'আমাকে ওটা ল্যান্ড করাতে হবে মখমল বুঝতে পারার আগেই যে ওটা আমি নিয়ন্ত্রণ করছি।'

'আমার মনে হচ্ছে, তিনি ইতিমধ্যে ট্রেইল ধরে এগোতে শুরু করেছেন,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বিড়বিড় করল ডিউক, এক কানে হাত দিয়ে কাপ বানাল।

'তুমি আর দেরি করো না, জঙ্গলের কিনারায় আগুনের পাঁচিলটা দাঁড় করিয়ে ফেলো,' নির্দেশ দিলো আজাদ। 'তাহলে পাশ ঘেঁষে আমাদের পেছনে চলে যেতে পারবে না আইএসআই।'

'ঠিক,' বলে চলে গেল ডিউক।

ব্ল্যাক বক্সের ওপর ঝুঁকে পড়ল আজাদ, মন দিয়ে অপারেট করছে ওটা।

'আপনি ঠিক জানেন প্লেনটা নিরাপদ আছে?' প্রিন্সেস পলার গলা কাঁপছে। 'আমার ভাইয়ের যেন কিছু না ঘটে।'

'আমি এটা সেসনায় আগেও টেস্ট করেছি, প্রিন্সেস। আমার ওপর আস্থা রাখুন।'

সেসনার ইঞ্জিন এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। মুখ তুলে তাকাতে উজ্জ্বল লাল আর সবুজ নেভিগেটিং আলো দেখতে পেলো আজাদ, দূরের আকাশে মিটমিট করছে।

এর আগে টেস্ট করার জন্যে সেসনাকে যখন নামিয়েছে, কেউ ওকে মারার জন্যে খুঁজছিল না, সেসনায় কোনো প্যাসেঞ্জারও ছিলো না– এখন যেমন আছে। ডায়ালে কাঁপছে ওর হাত।

জঙ্গলের ভেতর গুলির আওয়াজ। প্লেনের আওয়াজকে ছাপিয়ে হঠাৎ মিস্টার মখমলের গলা শোনা গেল। 'স্টপ!' লাউড হেইলারে নিজের লোকজনকে নির্দেশ দিচ্ছে। 'জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ো না। গুলি করো আড়াল নিয়ে।'

আজাদের চারপাশে চাবুকের মতো শব্দ করছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট।

'লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন!' প্রিন্সেসকে বলল আজাদ।

অন্ধকার থেকে ক্রল করে ওদের কাছে ফিরে আসছে ডিউক। থেমে হাতের মেশিন পিস্তল কাঁধে তুলল, লক্ষ্য স্থির করল জঙ্গলের দিকে যে জঙ্গল থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে সে, তারপর গুলি ছুড়ে আগুনের একটা লম্বা পাঁচিল তৈরি

করল।

'গুড,' আজাদ খুশি। 'আর কী করতে হবে জানো তো?'

'সে আর বলতে...।'

'তবে আমি বলার পর।'

'অবশ্যই।'

ধীরে ধীরে নিচে নামছে সেসনা। ব্ল্যাক বক্সের ডায়ালগুলো দেখছে আজাদ, খানিক পরপর চোখ তুলে দেখে নিচ্ছে প্লেনটা ঠিকমতো আচরণ করছে কি-না।

জঙ্গলের গুলি আরও বাড়ছে। খোলা জায়গায় ছুটন্ত এক মানুষের ছায়া দেখা গেল। গুলি ছুড়ল ডিউক। চিৎকার শুনে বোঝা গেল পটল তুলেছে একজন আইএসআই। কে জানে, ভাবল আজাদ, এর মুখেও হয়তো তামাক পাতা ভরা পান আছে!

'খোলা জায়গায় বেরিয়ো না!' মিষ্টার মখমলকে শঙ্কিত মনে হচ্ছে। 'ওদেরকে আমরা কাবু করব ওরা যখন প্লেনে চড়বে।'

মনে মনে অভিনন্দন জানাল আজাদ মিষ্টার মখমলকে। হেরে গেছে বুঝতে পারাটা ইন্টেলিজেন্ট লোকের লক্ষণ। তবে এটাও পরিষ্কার যে, একটা শেষ চেষ্টা করে দেখবেন।

সেসনা ল্যান্ড করতে যাচ্ছে, দোল খাচ্ছে এপাশ-ওপাশ। কোথায় ওটা থামবে আন্দাজ করল আজাদ। দশ সেকেন্ড পর ডিউককে বলল, 'এখন! ডিটোনেট করো ওটা।'

ডিউকের হাতের যন্ত্রে বসানো বোতামে আঙুল ঠেকে ছিলো, চাপ দিলো সেটায়। সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু কাঁপিয়ে দিয়ে জঙ্গলের কিনারায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। ধুলো আর গাছের কাণ্ড উড়ে গেল আকাশে। বহু গাছ শাখা হারিয়ে ন্যাড়া হয়ে গেল। চারদিক ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ধোঁয়ায়।

'সাধারণ একটা ডিনামাইট চার্জ,' প্রিন্সেস পলাকে বলল আজাদ, হাত ধরে দাঁড় করাল তাকে। স্মোক স্ক্রিনের আড়াল নিয়ে ঘাসের ভেতর দিয়ে ছুটল তিনজন সেসনার দিকে।

কেবিনের দরজায় ঘুষি মারছে আজাদ।

জাদুর মতোই খুলে গেল সেটা।

প্লেনে চড়ল ওরা। আচ্ছন্ন অবস্থায় ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ম্যারিয়ো রিমিনি, প্লেনে নিজেকে একা দেখতে পেয়ে পুরো হতভম্ব। ট্রিগার ফ্রেইজ তাকে পোস্ট-হিপনোটিক অবস্থায় ফেলে দেয়ার পর থেকে কী করেছেন না করেছেন তার কিছুই মনে করতে পারছেন না।

তার হাত থেকে ফিল্ম ক্যানিস্টারটা নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিলো আজাদ। সেসনার দরজা বন্ধ করল ডিউক, আজাদ চড়ল সেসনার কন্ট্রোলে। প্রিন্সেস আর ম্যারিয়ো আবার একবার পরস্পরকে আলিঙ্গন করছেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন পলা রিমিনি, তবে এবার আনন্দে।

মাথা তুলল সেসনা, আকাশে উঠল।

আজাদ যখন নেইপলস এয়ারপোর্টকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে, অপেক্ষা করছে ল্যান্ড করার অনুমতি পাবার জন্যে, পুব আকাশ তখন রাঙা হতে শুরু করেছে। অনুমতি পাওয়া গেল, কিন্তু ওকে বলা হলো নিচে নামার পর টাওয়ারে রিপোর্ট করতে হবে।

'ইটালিয়ান এয়ার কমিশন তদন্ত করবে,' বিড়বিড় করল আজাদ।

সাবলীল ভঙ্গিতে ল্যান্ড করল সেসনা। নিচে নেমে টাওয়ারের দিকে হাঁটছে চারজন।

জালের তৈরি বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল মার্শাল ডিনোকে। আমেরিকান ভদ্রলোক পাইপের পেছনে হাসছেন।

'এয়ার কমিশন লাল ফিতেয় জড়াবে আপনাকে,' আজাদকে বললেন তিনি। 'তবে আমি খানিকটা ঠাণ্ডা করেছি ওদেরকে। ছোট্ট যে সারপ্রাইজের প্রতিশ্রুতি আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, সেটা এনেছেন?'

'এই তো এখানে,' বলে পকেটে হাত ভরে একটা ফিল্ম বের করল আজাদ, মার্শালের হাতে গুঁজে দিলো সেটা। এরকম আরও দুটো ফিল্ম ক্যানিস্টার আছে ওর দু'পকেটে।

ক্যানিস্টার খুলে ফিল্মটা বের করলেন মার্শাল, সূর্যের দিকে তুলে ধরলেন। তারপর সেটা নিজের পকেটে রেখে দিলেন। মুখের হাসি চওড়া হলো। 'পেন্টাগন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। এই উপকার তারা আপনাকে সুযোগমতো অবশ্যই ফিরিয়ে দেবে।'

'আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুরোদস্তুর একটা রিপোর্ট জমা দেবো,' বলল আজাদ।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। ও, ভালো কথা সিনোরিনা,' বলে প্রিন্সেস পলার দিকে ঘুরে গেলেন মার্শাল ডিনো।

'প্রিন্সিপেসা, ডিনো,' শুধরে দিলো আজাদ। 'প্রিন্সেস, ইনি মার্শাল ডিনো, একজন বন্ধু।'

'জি।' বিনয়ের সঙ্গে মাথা ঝাঁকালেন পলা রিমিনি।

'মিষ্টার কাসলারের কাছ থেকে আপনার জন্যে একটা মেসেজ এনেছি আমি।'

প্রিন্সেসের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নিজের বুকে হাত রাখলেন। 'ওর অবস্থা কি আরও খারাপ হয়েছে?'

'তার জ্ঞান ফিরে এসেছে,' ডিনো বললেন। 'তিনি বলেছেন দেরি না করে আপনি যেন তার কাছে চলে যান।'

স্বস্তির পানি ঠেকিয়ে রাখার জন্যে চোখ মিটমিট করছেন পলা।

'আমি যে কী খুশি!' বলল আজাদ, তাকিয়ে আছে সোজা ডিনোর চোখে। দু'জনের একজনও কথা বলছে না।

'আজাদ,' প্রিন্সেস বললেন। 'আমি আপনাকে কখনোই ধন্যবাদ দিয়ে ঋণ শোধ করতে পারব না।' সামনের দিকে ঝুঁকলেন, পলকের জন্যে আজাদের গালে ঠোঁট ঠেকালেন। ভাই ম্যারিয়োর দিকে ঘুরলেন। 'ম্যারিয়ো, আমাকে এখনই ক্লাইভের কাছে যেতে হচ্ছে। এসো!'

ভাই-বোন দ্রুত চলে গেলেন।

জালের গায়ে আবার হেলান দিলেন ডিনো। 'বিদায় পর্বটা আমার ঠিক যথেষ্ট উষ্ণ বলে মনে হলো না, মিষ্টার আজাদ। দেখা যাচ্ছে প্রিন্সেসকে আপনি খুব একটা মুগ্ধ করতে পারেননি।'

দার্শনিক ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল আজাদ। 'আমার রক্তের জন্যে খুব বেশি সমৃদ্ধ, সম্ভবত।'

'মাই ডিয়ার ফেলো, তিনি শুধু প্রিন্সেস, রানি তো আর নন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে আমি এই মুহূর্তে কন্টেসা লেভেলে পড়ে আছি,' জাকি আজাদ জালের বেড়া টপকাল, প্রধান ভবনের দিকে হাঁটছে। 'লালচে এক বিশাল প্যাল্যাৎসো আর মার্টিনি এনগেজমেন্ট। আপনার সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখব। এয়ার কমিশনারের ব্যাপারটা তুমি একটু দেখবে, ডিউক?'

ডিউককে পাশে নিয়ে হাঁটার সময়, তার হাতে কালো সুটকেস দেখে, ভ্রূ কুঁচকালেন ডিনো, তবে কোনো মন্তব্য করলেন না। মন্তব্য করলেন জাকি আজাদকে নিয়ে।

'ভদ্রলোক একটা পাগল, তাই না?'

'ঠিক উল্টো, আমার ধারণা,' বলল ডিউক। 'একদম উল্টো। ❖

অলঙ্করণ : : নাজিব তারেক

শিহাব সরকার

জুলি শামসির লড়াই


গল্প

মিনহাজ মুস্তাফির নতুন বইটা দারুণ যাচ্ছে। মারমার কাটকাট অবস্থা। প্রকাশক ইঙ্গিত দিলেন সেদিন, দ্বিতীয় এডিশনে যেতে হবে শিগগির। তৃতীয়, এমনকি চতুর্থ সংস্করণেও যেতে হতে পারে গত বইটার মতো। স্ক্রিপ্টে ছোটখাটো ভুল আছে। মিনহাজ ভাবছিল, এগুলো ঠিক করে নেবে। সমস্যা হচ্ছে, ও সময় বের করতে পারবে কি-না। একটা নতুন গল্পে ডুবে আছে ও। দিনরাত মাথাজুড়ে রয়েছে সামনের বইটার কাহিনীর আউটলাইন। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই, জীবনযাপনের রুটিন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে।

দিন পনেরো আগে বেরিয়েছে 'ছোবল'। ওর থ্রিলার সিরিজের নতুন বই। ওর মোট পাঁচটা বই এখন বাজারে। প্রথম দুটো খুব একটা চলেনি। তৃতীয়টা থেকে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়া পাঠকদের মুখে-মুখে ওর নাম ফিরতে শুরু করে। চতুর্থটা সুপারহিট। বলতে গেলে সে-ই অজন্তা প্রকাশনীর প্রথম ক্রিয়েটিভ লেখক। এ প্রকাশনীর লেখক আরও আছেন। তারা সবাই স্কুল বা কলেজের সিনিয়র শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তকের নোটবই লেখেন। কেউ কেউ লেখেন বেনামে। কিছু খাঁটি লেখকও আছেন তালিকায়। ছদ্মনামে নোট বই লিখে দফায় দফায় বহু টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। এখন নোট বইয়ের বাজার মন্দা যাচ্ছে। পরীক্ষার ধরন পাল্টে গেছে, নোট বই তেমন কাজে আসে না। অজন্তা প্রকাশনীর ব্যবসা প্রায় উঠে যাচ্ছিল, এমন সময় প্রকাশনীর কর্ণধার আবুল বাশার মিনহাজ মুস্তাফির খোঁজ পেলেন। তার কথায় ওটা ছিল এক অলৌকিক যোগাযোগ। মিনহাজ তাকে রীতিমতো তলিয়ে যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছে। আবুল বাশারের চোখে মিনহাজ এখন নিছক লেখক নয়, সে একটি বাতিঘর। সেদিন কথায় কথায় বললেন, ও তার আলোর দিশারি।

অজন্তা নোট বইয়ের ব্যবসা নামমাত্র রেখে পুরোপুরি গল্প-উপন্যাস এবং জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশনায় নেমে যাচ্ছে। কিছু উপন্যাস বেরও করেছেন আবুল বাশার। মোটামুটি বাজার পেয়েছে। এখন তাদের দরকার মিনহাজের মতো লেখক, যারা শুরু থেকেই পাঠকদের মাতিয়ে রাখতে পারে। এ জন্য চাই এমন কিছু রাইটার, যারা লেখেন থ্রিলার, হরর এবং অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় বই। এসব বিষয়ে চৌকস লেখকের খুব অভাব। কিন্তু মিনহাজ আবিষ্কার করল, এ বিষয়গুলো নিয়ে ও স্বচ্ছন্দে লিখে যেতে পারে। এসব বই এককালে পড়েছেও প্রচুর। তবে আপাতত ও থ্রিলার নিয়ে থাকবে। বিষয়টা নিয়ে ও নতুন আঙ্গিকে গল্প বলতে চায়। ওর সব কিছুই হবে চলতি থ্রিলারের চেয়ে ভিন্ন। ছকের বাইরে। প্রাইভেট ডিটেক্টিভ-কেন্দ্রিক গোয়েন্দা কাহিনী বা স্পাই থ্রিলারের সিক্রেট এজেন্টদের মিশন নিয়ে অনেক কাজ করার সুযোগ আছে। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে ও আবুল বাশারকে বিপদে ফেলবে না। এখনই ওসব করলে পাঠক হারাবে। আপাতত ও চলতি ধারায়ই লিখে যাবে। মাঝে মাঝে গল্প এবং চরিত্র নিয়ে কিছু মজা।

সামনের বইটায় হালকাভাবে কিছু কাজ করতে চাইছে মিনহাজ। অবশ্য ও এরই মধ্যে একটা বড় কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে। ওর সিরিজের সিক্রেট এজেন্ট জুলি শামসি। ঢাকায় বড় হওয়া এক টগবগে তরুণী। শ্যামলা এবং সুশ্রী।

পড়াশোনা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সাবজেক্ট ছিল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স। ওর মতোই। জুলি দুঃসাহসী এবং বেপরোয়া, কমান্ডো ট্রেনিং আছে। কামান ছাড়া যে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারে। কারাতে-কুংফু জানে। কাহিনীতে কখনও ও সিক্রেট এজেন্ট বা স্পাই, কখনও প্রাইভেট ডিটেক্টিভ। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ।

ঢাকায় এবার মার্চের মাঝামাঝিতেই প্রচণ্ড গরম। রোদের জন্য বাইরে যাওয়া যায় না, ঘরে বসে অনবরত ঘামতে হয়। লেখা দূরে থাক, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাও করতে পারছে না মিনহাজ। বাড়িওয়ালাকে অফিসের কাজে সাত দিনের জন্য বাইরে যাওয়ার কথা বলে ও রাঙামাটি চলে এসেছে। ও যে এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি লেখক, এটা তাকে বলা হয়নি এখনও। প্রকাশককে ও বলেছে, রাঙামাটিতে বসে ও নতুন বইটার কাজ করতে চায়। শুনে আবুল বাশার খুশি। বেশ কিছু টাকাও দিয়ে দিলেন রয়ালটির অ্যাডভান্স হিসেবে।

এনজিওর একটি রেস্ট হাউসে উঠেছে মিনহাজ। এনজিওর লোকজন ওর অনেক দিনের বন্ধু। পাড়াটা নির্জন। কয়েক পা হেঁটে গেলে কাপ্তাই লেকের একটা বড় ঘাট। এখান থেকে ছোট-বড় বোট ছাড়ে, পর্যটকরা বোট ভাড়া করে দুর্গম অঞ্চলে যান। নৌকা আসে দূরের পাহাড়ি গ্রাম থেকে। বেশ কয়েক বছর পর রাঙামাটি এসেছে মিনহাজ। শহরে এবং আশপাশের গ্রামে ওর কিছু আদিবাসী বন্ধু আছে। এ যাত্রা ওদের থেকে দূরে থাকতে হবে। খোঁজ পেলে দলবেঁধে চলে আসবে। তারপর শুধু হৈহল্লা, লেকে-পাহাড়ে ঘোরাঘুরি। লেখাটা হবে না।

১০টার ওপর বাজে। রাঙামাটি শহরে অনেক রাত। মিনহাজের খিদে লাগছে না। দুপুরে চট্টগ্রাম থেকে বাসে ওঠার আগে ওখানকার বন্ধুরা ঠেসে খাইয়ে দিয়েছে। কমলের বাসায় বিশাল লাঞ্চের আয়োজন হয়েছিল। পেট এখনও ভরা। সঙ্গে আনা বড় আকারের কলা দুটো খেয়ে রাতের খাবার সেরে নেবে কি-না ভাবছে মিনহাজ। রুমে ঝকঝকে এলসিডি টিভি। মিনহাজ রিমোট হাতে নিয়ে চ্যানেল ব্রাউজ করে। টিভি খুব একটা দেখে না ও। বিবিসি, সিএনএনের নিউজ এবং ডকুমেন্টারি, আর ডিসকভারি চ্যানেল দেখে সময় পেলে। আর দেখে স্টার মুভিজ এবং দু-তিনটা ইন্ডিয়ান চ্যানেল। বাংলাদেশি চ্যানেলের কয়েকটায় ওর বন্ধু-বান্ধব আছে। ওগুলো সময় পেলে দেখে। পর্দায় ইন্দ্রানী হালদারকে দেখা যাচ্ছে। ঘড়ি দেখল মিনহাজ। জি বাংলায় 'গোয়েন্দা গিন্নি' হচ্ছে সিরিজটা জমেছে খুব। ইন্দ্রানীও দারুণ কাজ করছে। শহুরে মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন চটপটে গৃহবধূ কীভাবে সংসার সামলে শৌখিন গোয়েন্দা হতে পারেন, এ নিয়ে সিরিজের গল্পগুলো। কলকাতার মতো ঢাকায়ও খুব জনপ্রিয় হয়েছে এটি। ইন্দ্রানীর চরিত্র পারমিতা মিত্র খালি হাতে ক্রিমিনালের মুখোমুখি হয়। গহনা চুরির ঘটনা থেকে শুরু করে সম্পত্তি দখল বা ঈর্ষা-প্রতিহিংসাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র ধরনের খুনের রহস্য উন্মোচন করে পারমিতা। ওর মূল অস্ত্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি। একজন বড় মাপের শিল্পী ইন্দ্রানী। যখন ও সন্দেহভাজন কারও দিকে হালকা বিদ্রূপ ও করুণা মেশানো মুখে স্থির তাকিয়ে থাকে, ওর মুখখানা কিন্তু তখনও হাসি-হাসি। এ অভিব্যক্তির তুলনা নেই। মিনহাজ ক্লোজআপে ধরা ইন্দ্রানীর এই মুখের নাম দিয়েছে মোনালিসা-মুখ।

'গোয়েন্দা গিন্নি' সিরিজে পারমিতার ডানহাত পুলিশ অফিসার অরূপ, ওর দূরসম্পর্কের ভাই। যখন আসামির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বা ধাওয়া-তল্লাশির প্রয়োজন হয়, ভাইটি ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। কোনো কেসে ব্যর্থ হয় না পারমিতা। হুমকি বা চোখ রাঙানির পরোয়া করে না ও। আজকের গল্পটাও জমে উঠেছে। একই পরিবারের তিনজন খুন হয়েছে এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায়। ছুরি, বন্দুক নয়, ওদের মারা হয়েছে দূর থেকে ছুড়ে মারা এক ধরনের ছোট তীর দিয়ে। ওগুলো এসে বিঁধেছে তিনজনেরই ঘাড়ে। খুনির অবিশ্বাস্য হাতের নিশানা পারমিতার মাথা গুলিয়ে দিচ্ছে। কী ধরনের মানুষ হতে পারে এই খুনি, কী তার বয়স? পারমিতা কূলকিনারা পাচ্ছে না। এদিকে জুলি শামসি তুখোড় নারী, সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে জানে। হাত-পায়ের প্যাঁচ কষে কাবু করতে পারে শত্রুকে।। দুর্দান্ত অভিনয় জানে। রাস্তার বোবা পাগলি, ছেলে-মাস্তান বা হাই সোসাইটির কলগার্ল থেকে শুরু করে ডাকাত দলের নাচনেওয়ালি অথবা মক্ষীরানী– সব ধরনের চরিত্রে স্বচ্ছন্দে ঢুকে যেতে পারে। একবার শুভ্রকেশী, অভিজাত এক বৃদ্ধার বেশ ধরেছিল জুলি। ওর একটা বড় গুণ, ও বাংলার বাইরে ইংরেজি এবং স্প্যানিশ বলতে পারে অবলীলায়। সদ্য কৈশোর-পেরোনো ছেলেমেয়ে এবং তরুণ-তরুণীদের কাছে রোল মডেল হয়ে গেছে জুলি। বয়স্ক পাঠকও আছে মিনহাজের। যেমন ওর ছোট খালা। দুই সন্তানের মা। পাঁচটা মাত্র বই। কিন্তু এরই মধ্যে জুলি বাংলাদেশের নারীশক্তির এক জীবন্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'গোয়েন্দা গিন্নি' শেষ হয়ে গেল। গল্প শেষ হয়নি। আগামীকালের পর্বে শেষ হবে। সেটা মিনহাজের দেখা না-ও হতে পারে। টেলিভিশন সিরিজ নিয়ে এক সমস্যা। ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। ফলে অনেক সময় কোনো কোনো গল্পের পুরো স্বাদ নেওয়া যায় না। জুলি শামসি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে দেশের বাইরে মাত্র যেতে শুরু করেছে। যে ক'টায় ও গেছে, সব সার্ক অঞ্চলের দেশ। একবার গেছে শ্রীলংকা, আরেকবার বার্মার গভীর অরণ্যে। মিনহাজ ক'দিন ধরে ভাবছে জুলিকে দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশে পাঠাবে। ঠিক করতে পারছে না কোন দেশে। ব্রাজিলে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। বিশাল আমাজান বন, আমাজান নদী, দীর্ঘ সি বিচ– সব আছে। দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় দেশ এটি, নানা ধরনের ক্রিমিনাল সিন্ডিকেটও ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন অঞ্চলে। সব বড় শহর জমকালো মহানগরী, কী নেই ওখানে।

আধুনিক স্থাপত্যের বিস্ময়-জাগানো বহুতল অফিস ভবন, হোটেল, শপিং মল, চওড়া এভিনিউ যেমন আছে, তেমনি আছে বস্তি। সামনে আসছে অলিম্পিক গেমস। হবে রিও ডি জেনিরোতে। ওখানে একটা মিশনে বড় দেশের কোনো গোয়েন্দা সংস্থার সহযোগী এজেন্ট হিসেবে পাঠানো যায় জুলিকে। একটা সমস্যা আছে। ব্রাজিল স্প্যানিশভাষী দক্ষিণ আমেরিকার দেশ। কিন্তু দেশটির প্রধান ভাষা পর্তুগিজ। কারণ ব্রাজিল এক সময় পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল। জুলি স্প্যানিশ ভালো জানে, পর্তুগিজ একেবারে না। এখন ওকে পর্তুগিজ শেখাতে গেলে ঝামেলা হবে। কারণ ও এখন তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে প্রায় সুপারস্টার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনস্টিটিউটে হয়তো পর্তুগিজ ডিপার্টমেন্ট আছে। ওখানে ও যাবে কীভাবে। ছাত্রছাত্রীরা ওকে চিনে ফেলবে। প্রতি বইয়ের প্রচ্ছদের এক কোনায় ওর ছবি। এক হাতে জেমস বন্ড স্টাইলে খাড়া করে রিভলবার ধরা মুখের এক পাশে, মাথায় চে গুয়েভারা ক্যাপ। কিন্তু জুলির মুখটি পরিষ্কার বোঝা যায়। ক্যাম্পাসে ও ঢুকলে ঝামেলা ঠেকানো মুশকিল হয়ে যাবে। অটোগ্রাফ দেবে, না ক্লাস করবে? প্ল্যানটা বাদ দিতে হলো।

চিন্তায় পড়ে গেছে মিনহাজ মুস্তাফি। পেছনের ব্যালকনিতে রেলিং ধরে দূরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে ও। দোতলায় রুমের এ জায়গা থেকে লেকটা পরিষ্কার দেখা যায়। এখন বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মধ্যে লেকে লালচে-হলুদ আলো দেখা যায়। ওগুলো ইঞ্জিন-বোট বা দেশি নৌকার লণ্ঠন। কিছু আসছে, কিছু যাচ্ছে। বারান্দার পাশে একটা অচেনা ঝাঁকড়া গাছের মাথা। প্রচুর জোনাকি পাতার ফাঁকে ফাঁকে। একটা-দুটো দলছুট হয়ে চলে আসছে অন্ধকার ব্যালকনিতে। কলম্বিয়ার জঙ্গলে ড্রাগের আস্তানা, এগুলোর বিরুদ্ধে অপারেশন, বর্ডারে গেরিলা যুদ্ধ ইত্যাদি নিয়ে অনেক থ্রিলার লেখা হয়েছে। সিনেমা তৈরি হয়েছে। ওসব এখন চলবে না। পেরু আপাতত ঠাণ্ডা। শাইনিং পাথ গেরিলাদের কোনো খবর নেই বহুদিন। বরং জুলিকে ভেনিজুয়েলা পাঠানো যাক। কমিউনিস্ট প্রেসিডেন্ট শাভেজ মারা যাওয়ার পর দেশটি এখন নাজুক অবস্থায়। অর্থনীতি ধসে যাচ্ছে। মানুষের অসন্তোষ বাড়ছে। নতুন বামপন্থি প্রেসিডেন্ট মাদুরো এসব সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। দেশি-বিদেশি চক্রান্তের কথা শোনা যাচ্ছে। মিলিটারি ক্যুর আশঙ্কা করছেন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা। এ রকম এক জটিল এবং ঘোলাটে পরিস্থিতিতে কোনো একটা মিশনে জুলি শামসিকে পাঠানো যায়। কিন্তু কোন বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে ও কাজ করবে, মিনহাজ ঠিক করতে পারছে না। ভেনিজুয়েলায় সুবিধা না হলে মিনহাজ জুলিকে সোজা পাঠিয়ে দেবে বলিভিয়ায়। ওখানে সম্প্রতি মূল্যবান ধাতুর খনি পাওয়া গেছে। ক্ষমতায় বাম-ঘেঁষা সরকার। অনেক আঞ্চলিক শক্তির শ্যেনদৃষ্টি এখন দেশটির ওপর।

মোবাইলে রিংয়ের শব্দে চমকে উঠল মিনহাজ। ও ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল।

হ্যালো, মিনহাজ ভাই, শুয়ে পড়েননি তো?

আবুল বাশারের গলা। ভারী, গমগমে। ফোনে এই কণ্ঠ নতুন কেউ শুনলে ভড়কে যাবে। অথচ ভদ্রলোক নরম ধরনের মানুষ।

না ভাই, জেগে আছি। আমার শুতে শুতে একটা-দেড়টা বেজে যাবে। কিছু কাজ আছে। মিনহাজ বলল।

শোনেন ভাই, আপনার 'ছোবল' সাপ্লাই দিয়ে কুলাতে পারছি না। স্টক শেষ। এ সপ্তাহেই সেকেন্ড এডিশন বের করতে হবে।

রাইটারের জন্য এটা গ্রেট নিউজ।

রাঙামাটি কত দিন থাকবেন? আবুল বাশারকে উদ্বিগ্ন শোনাল।

মাত্র এলাম। দুই সপ্তাহ তো থাকবই। বান্দরবান, খাগড়াছড়িও যেতে পারি। মাথাটা জ্যাম হয়ে আছে। একটু হালকা করে আসি।

বুঝলাম, কিন্তু ...

কিন্তু কী?

দু'দিনের জন্য একটু ঢাকা আসা যায় না?

খুব জরুরি? প্রকাশকের মনের অবস্থা জেনেও মিনহাজ বলল।

বুঝতেই পারছেন। দেরি হলে পাঠক ছুটে যাবে। এ রকম চান্স জীবনে কম আসে।

লেখালেখি বা বই বিক্রির সঙ্গে চান্স কথাটা মেলানো যায় না। কেমন একটা বাজারে ব্যাপার মনে হয়। এখন ও পপুলার লেখক। কমার্শিয়াল রাইটার। ওর তিনটা কবিতার বইয়ের মধ্যে প্রথমটা গোটা ত্রিশেক বিক্রি হয়েছে গত ১০ বছরে। বাকিগুলোর কথা ভাবলে কান লাল হয়ে যায়। দুটো প্রেমের উপন্যাস বের করেছিল নিজের খরচে। প্রায় সব কপি বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। এখন ওর বই ছাপা হচ্ছে হাজার হাজার। নতুন এডিশন হচ্ছে। পাবলিশার ঘাড়ের ওপর চড়ে বসে আছেন। ওর জীবনের ফ্রিডম শেষ। অবশ্য এতে এক্সাইটমেন্ট আছে। ওর জীবন এখন জুলি শামসির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দিনরাত কাটে ওই তরুণী সিক্রেট এজেন্টের সঙ্গে। ওর দুঃসাহসিক মিশনগুলো তৈরি করতে হয়, ওকে নানা কৌশল শেখাতে হয়। জুলির সব মিশনে ও আছে প্রচ্ছন্নভাবে। আবুল বাশারকে নিরাশ করার প্রশ্নই ওঠে না।

বাশার ভাই, আমি ঢাকা আসছি। তবে কাল-পরশু না। দু'দিন পর। আপনি ট্রেসিং বিছিয়ে রাখুন। আমি শুধু পেজগুলোতে একবার করে চোখ বুলিয়ে যাবো। টুকটাক বানান ভুল আছে। বেশির ভাগ বিদেশি শব্দ। ওগুলো ঠিক করতে হবে।

ঠিক আছে, তাই হবে ভাই। দেখবেন, ডেট যেন মিস না হয়। বাসে চিটাগাং গিয়ে ঢাকার প্লেন ধরবেন। তাহলে প্রায় একটি দিনের সময় বাঁচবে। ঠিক আছে? রাখি তাহলে।

না, না, আরেকটা কথা। আপনার প্রথম বই দুটোর জন্যও অর্ডার আসছে। কিছু ছেপে দেব নাকি? আবুল বাশার দ্রুত বললেন।

সেটা আপনি ভালো বুঝবেন। দেখেন ডিমান্ডের জোর কেমন। রাখি। মিনহাজ ফোন রেখে দিল।

ও পরশুই ঢাকা যেতে পারত। ইচ্ছে করে একদিন পরে যাচ্ছে। প্রকাশক তো টাকা গোনেন। লেখে ও। লেখার কষ্ট উনি কী বুঝবেন? এ যাত্রা বিশ্রাম না নিলে ও শিগগির আর সুযোগ পাবে না। মাথার কলকব্জা বিগড়ে যাবে। জুলিকে এবার ও নতুন ধরনের মিশনে পাঠাচ্ছে। তা-ও আবার অন্য এক মহাদেশে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার আছে। সূক্ষ্ম প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার আছে। দুটো দিন একা থাকলে জুলি কাজটা কতদূর পারবে, সেটা আন্দাজ করা যাবে। যদি খাগড়াছড়ির ভেতরের দিকে যাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক থাকে, ওকে সঙ্গে নেবে মিনহাজ। জুলিকে ও কখনও পাহাড় বা অরণ্যের ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখেনি।

দুই

রেস্টহাউস থেকে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে মিনহাজ ব্রেকফাস্ট সেরে এসেছে। ছিমছাম, ছোট রেস্তোরাঁ। আশপাশের রেস্টহাউসের টুরিস্টরাই মূল খদ্দের। ম্যানেজারের কাউন্টারে মাথায় ফুল গোঁজা এক আদিবাসী তরুণী। ভারি নাশতার পর চায়ের সঙ্গে সিগারেট। সারাদিনে মিনহাজ একবারই সিগারেট ধরায়।

সিগারেট না হলে সকালের চা পানসে লাগে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এতটা সুন্দর অভিজ্ঞতা হলো। কোথাও আজকের পত্রিকা পাওয়া যায় কি-না দেখার জন্য একটু সামনে এগিয়ে গিয়েছিল ও। ওর মন বলছিল এদিকে কোথাও পত্রিকা পাওয়া যাবে। নিউজস্ট্যান্ড না থাকলেও এসব ছোট শহরে পান-সিগারেটের দোকান দৈনিক পত্রিকা রাখে। মিনহাজের জন্য একটা বড় চমক অপেক্ষা করছিল।

বেশ কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর ও দেখল কড়া হলুদ রঙের একতলা একটি বাড়ির গেটে পাঁচমিশালি দোকান। দোকানের সামনে লম্বা টুলের ওপর সারি সারি দৈনিক পত্রিকা বিছানো। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের। মাথার ওপর লম্বা দড়িতে ক্লিপে আটকানো সাপ্তাহিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন। উত্তেজনায় মিনহাজের দম আটকে আসার উপক্রম হলো, যখন সে দেখল একটা কাঠের র‍্যাকে সারি দিয়ে সাজানো পেপারব্যাক মাসুদ রানা এবং অন্যান্য থ্রিলারের সঙ্গে ওর জুলি শামসি

মনে হলো নিজের পরিচয়টা বলে দেয় মিনহাজ। অনেক কষ্টে ইচ্ছেটা দমাতে পারল ও। নিজেকে গোপন রাখার একটা মজা আছে। দূর থেকে নিজেকে দেখা যায়। নিজের ওজনটাকে নিরাসক্তভাবে যাচাই করা যায়। হঠাৎ ওর মনে হলো, সবা বইয়ের ব্যাক কভারে ওর ছোট একটা ছবি আছে। ভদ্রলোক বোধ হয় ব্যাপারটা লক্ষ্য করেননি। করলেই বা কী। অনেক সময় হালকাভাবে দেখা ছবির সঙ্গে হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ানো মানুষটার চেহারা মেলানো যায় না। এখন প্রৌঢ় ভদ্রলোক অতি উৎসাহে ওর বই র‍্যাক থেকে নামিয়ে না আনলেই হয়। আটটার ওপর বাজে। রাস্তায় এখনও তেমনভাবে লোক চলাচল শুরু হয়নি। দোকানে ও ছাড়া আর কোনো খদ্দের নেই। ভদ্রলোক মনে হয় দোকানের মালিক। হয়তো অবসর জীবন কাটাচ্ছেন চাকরিবাকরির পর। নিজের বাড়ির সামনে ছোট একটা দোকান দিয়েছেন। চললে ভালো, না চললে ক্ষতি নেই। সময়টা তো কাটে।



সিরিজ। সব বই-ই আছে। 'ছোবল'ও। মিনহাজকে বইয়ের র‍্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কাউন্টারে বসা হালকা-পাতলা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বললেন, 'বই দেব?'

এখন থাক। আচ্ছা, ওই সিরিজটা বুঝি নতুন বেরিয়েছে? ওই যে, জুলি শামসি? মিনহাজ বলল।

হ্যাঁ। খুব চলছে। কলেজের ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে কিনছে। আমি নিজেও পড়ি। নতুন ধরনের লেখা। মাসুদ রানার চেয়ে আলাদা।

তাই নাকি? বলতে বলতে মিনহাজ খেয়াল করে র‍্যাকে ওর সব বই আছে কি-না। 'ছোবল' আছে মাত্র একটা। প্রকাশক ভুল বলেননি। আসলেই কাটছে বইটা। একবার

রাঙামাটি বেড়াতে এসেছেন বুঝি? ভদ্রলোক সোজাসুজি তাকালেন মিনহাজের দিকে।

হ্যাঁ, এই আর কী। দু'দিন একটু ঘুরে বেড়াব।

ফ্যামিলি আনেননি? ভদ্রলোক চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন।

জি না। কথা না বাড়িয়ে মিনহাজ জানতে চাইল ঢাকার দৈনিকগুলো ক'টা নাগাদ আসবে।

ন'টা-সাড়ে ন'টার দিকে এসে যাবে। চিটাগাং থেকে আসবে তো। প্যাসেঞ্জার বাসে। চাটগাঁয়ের পত্রিকা নিন না। ওগুলো এসে গেছে। 'আজাদী' আছে, 'পূর্বকোণ' আছে। এগুলো ঢাকার পত্রিকার মতোই।

জানি। হাসল মিনহাজ। দুটো পত্রিকাতেই ওর চট্টগ্রামের বন্ধুরা আছে। ও টুল থেকে একটা 'পূর্বকোণ' তুলে নিয়ে মেলে ধরে।

ভাই, আমার কিন্তু অনেক বয়স। দেখে হয়তো মনে হয় না। সিক্সটিএইটে এসএসসি। ভদ্রলোক মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন।

তাই নাকি? ফিগারটা বেশ মজবুত রেখেছেন। দেখে মনে হয় বয়স ফিফটির সামান্য ওপরে-নিচে।

ভদ্রলোক মুখ ছড়িয়ে হাসলেন, 'আমি সিক্সটিফোর ক্রস করেছি গত মাসে।'

বাহ্, আপনি এইটিতেও এ রকম থাকবেন। টাইট ফিগার।

দোয়া করবেন।

অবশ্যই। মিনহাজ পত্রিকার ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো খুলল না। পত্রিকাটা টুলে রেখে ও মানিব্যাগ বের করল।

বয়সের কথা কেন তুললাম জানেন? আমি মাসুদ রানা সিরিজের প্রথম দিকের সব বই পড়েছি। তখন স্কুলে ক্লাস এইট-নাইনে পড়ি। কী সব বই! 'ধ্বংস পাহাড়', 'ভারত নাট্যম', 'স্বর্ণমৃগ', 'বিস্মরণ'। একটার চেয়ে একটা এক্সাইটিং। আমরা বই ভাগাভাগি করে পড়তাম। এমনকি দু'জন একসঙ্গে বসে এক এক পাতা করেও পড়তাম। এ নিয়ে আবার ঝগড়া। যেমন একজন খুব দ্রুত পড়ে, অন্যজন স্লো। এতে অন্য ধরনের মজা ছিল। আপনি বুঝবেন না। ভদ্রলোক আনমনা হয়ে গেলেন। হয়তো বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে।

মিনহাজ চুপ করে রইল। ও নিজেও প্রচুর বই পড়ে। মাসুদ রানা পড়ে নিয়মিত। কিন্তু ও সিরিজটা ধরেছে অনেক পরে। কাজী আনোয়ার হোসেনের প্রথম দিকের এ বই ক'টার নাম ও শুনেছে। পড়েনি। পকেটের মোবাইল বেজে উঠল। একটা অচেনা নম্বর। ও ধরল না। কয়েকবার রিং হয়ে থেমে গেল। পত্রিকার দাম দিয়ে মিনহাজ হাত তুলে বলল, 'চলি ভাই, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগল।' ও ফেরার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ভাই সাহেবের পরিচয়টা জানা হলো না।'

আমি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। ঢাকায় থাকি। নাম মিনহাজ মুস্তাফি। ওর নামটা শোনার পর ভদ্রলোকের মুখে কোনো ভাবান্তর হওয়ার আগেই মিনহাজ জোরে হাঁটা শুরু করল। ফোন আবার বাজল। বাজতে থাকুক। রুমে গিয়ে ধরবে।

'দৈনিক পূর্বকোণ'-এর সব পাতায় চোখ বুলিয়ে সামনের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে মিনহাজ, এমন সময় মোবাইল বাজল।

সেই নম্বরটা, যেটা আগে দু'বার বেজেছে।

হ্যালো।

ভাইয়া, আমি সুমি।

হ্যাঁ সুমি, কী খবর? মিনহাজ একটু অবাক হলো। সুমি বন্ধু কমলের ছোট বোন। এদের চট্টগ্রামের বাসায়ই মিনহাজ উঠেছিল রাঙামাটি আসার আগে।

ভাইয়া, আমি আপনার লেখার খুব ভক্ত।

জানি তো। মিনহাজ শব্দ করে হাসল।

আপনি যখন আমাদের বাসায়, আমি তখন আপনার 'ছোবল' পড়ছিলাম। কাল রাতে শেষ করলাম। উফ্, কী যে বলব। এত ভালো লেগেছে যে, ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।

থ্যাংক ইউ, সুমি।

আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আপনার অটোগ্রাফটা পর্যন্ত নিতে ভুলে গেছি। আপনার পরের বইটা কবে আসবে ভাইয়া?

আসছে, তবে একটু সময় লাগবে। এবারের গল্পটা অন্য ধরনের হবে। তাই কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছে। মিনহাজ দূরে খোলা মাঠটার দিকে তাকিয়ে বলল। মাঠের এক পাশে স্কুল ইউনিফরম পরা ছোট সোনামণিদের এসেম্বলি হচ্ছে। 'আমার সোনার বাংলা ...' গাইছে ওরা। সামনে একটা বাঁশের মাথায় বাংলাদেশের পতাকা। পাশে দাঁড়ানো কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ। খুব সম্ভব টিচার।

ভাইয়া, জুলি শামসির ফাইটিং স্পিরিটটা কিন্তু রাখবেন। দারুণ। বড় বড় মিশনে যায়, পুরুষ স্পাইদের সঙ্গে এনিমি পজিশন অ্যাটাক করে– আবার দেশের নারীদের নিয়ে চিন্তাও করে। আমি আগে এ রকম শুনিনি।

ওর কিন্তু ছোট মেয়েদের একটা গানের স্কুল আছে। ঢাকার মগবাজারে। মিনহাজ বলল।

হ্যাঁ ভাইয়া, জানি। মাস্তানরা স্কুল উঠিয়ে দিয়ে বাসাটা দখল করতে চেয়েছিল। কী সাহসের সঙ্গেই না জুলি ওদের ঠেকাল। সেই সঙ্গে বুদ্ধির প্যাঁচ। ও কারাতে-কুংফুর নমুনা দেখাতে পারত ওদের। সেটার দরকার হয়নি অবশ্য। কোন বইয়ে যেন এটা পড়লাম? নামটা মনে আসছে, ঠোঁটে আসছে না।

'মৃত্যুকূপ'। জুলির দ্বিতীয় মিশন। সেবার ও টেকনাফ দিয়ে বার্মায় ঢুকেছিল। গানের স্কুলের ঘটনাটা হয় মিশনে যাওয়ার আগে। মিনহাজ কথা শেষ করতে পারে না, সুমি কলকল করে বলে ওঠে, ইয়েস, 'মৃত্যুকূপ'। এ বইটা আমার কালেকশনে নেই। এক ফ্রেন্ড পড়তে নিয়ে গিয়ে ফেরত দেয়নি। পরে মার্কেটেও পাইনি।

ঠিক আছে, তোমাকে ঢাকা থেকে এক কপি পাঠিয়ে দেব।

কমলের এই বোনটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনার্সের ছাত্রী। প্রচুর বই পড়ে, আর ইউটিউবে সিনেমা দেখে। অধিকাংশ ভারতীয় ছবি। থ্রিলার ওর প্রিয় বিষয়। ইদানীং কলকাতায় গোয়েন্দা গল্প নিয়ে খুব ছবি হচ্ছে। মিনহাজ নিজেও দেখে। কিন্তু সময় করে উঠতে পারে না। ঢাকার ফিল্মমেকাররা কেন থ্রিলার বানাতে শুরু করছে না, বুঝতে পারে না মিনহাজ। অথচ এসব গল্পের প্রচুর ভক্ত বাংলাদেশে।

ভাইয়া, আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবেন? আবদারের সুরে বলল সুমি।

রাখার মতো হলে অবশ্যই রাখব। বল কী রিকোয়েস্ট।

ফেসবুকে আপনার ফ্রেন্ডলিস্টে আমাকে অ্যাড করে নিন না। আমি কিন্তু আপনাকে অনেক আগে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি।

ওহো, সরি। এখনই ল্যাপটপ খুলে ট্যাগ করে নেব। আসলে কী জানো, আমি খুব ফেসবুক বা কম্পিউটার-ফ্রেন্ডলি না। বিনা প্রয়োজনে বসি না। মাসে বড়জোর দু-তিনবার। তবে লেখার জন্য বা গুগলে সার্চ দেওয়ার জন্য বসতে হয়। ফেসবুকে খুব সময় নষ্ট হয়। তাই বসি না।

ভাইয়া, আপনার ফ্রেন্ডলিস্ট কী বিশাল! জুলি শামসিকে নিয়ে সবার কত কৌতূহল। আমার নিজেরও।

আচমকা মিনহাজের মনে হলো বান্দরবান, খাগড়াছড়ি যাওয়ার জন্য সময়টা উপযোগী কি-না এটা কমলের কাছে জেনে নিতে হবে।

আচ্ছা সুমি, তুমি কি জানো এখন কমল কোথায়? মিনহাজ জানতে চাইল।

ভাইয়া, ও তো বাসায়। অফিসে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে। ডাকব?

থাক। আমিই ফোন করছি।

ভাইয়া, আমাকে কিন্তু আজকেই ট্যাগ করবেন।

শিওর।

মিনহাজ মোবাইলে কমলের নাম বের করে কল দেয়।

তিন

খাগড়াছড়িতে কী একটা হাঙ্গামা হচ্ছে। কমল ওদিকে যেতে মানা করল। অগত্যা মিনহাজ দক্ষিণে বান্দরবানেই রওনা হলো। চট্টগ্রামে ফেরার পথে সময় একটু বেশি লেগে যাবে।। তবু সুযোগটা ও নষ্ট করতে চাইল না। তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে বান্দরবানকেই সবার ওপরে ধরা হয়। সবুজ ঘন অরণ্যে ছাওয়া গিরিশ্রেণী ঢেউয়ের মতো জেগে আছে প্রায় পুরো জেলায়। ছোট শহরটিও রাঙামাটি, খাগড়াছড়ির চেয়ে আলাদা চরিত্রের। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি নদী শঙ্খ। রাঙামাটি থেকে জিপে কিছু দূর না যেতেই ঝুম বৃষ্টি। পাহাড়ের বৃষ্টি বুনো, খুব তোড়ে নামে। ভালো লাগে মিনহাজের। বৃষ্টির জন্য গাড়ির গতি কমাতে হয়েছে। বান্দরবান পৌঁছাবার পর ভোজবাজির মতো বৃষ্টি থেমে গেল। দেখতে দেখতে আকাশে রৌদ্র-মেঘের খেলা। পড়ন্ত বিকেলের স্নিগ্ধ গোলাপিতে জেলা শহরটিকে মায়াবী মনে হয়।

শহরে মিনহাজের কয়েকজন বন্ধু আছে। এদের দু'জন আদিবাসী, ঢাকায় ওর সঙ্গে কলেজে পড়ত। অনেকদিন দেখা হয় না। এদের বাড়ি গ্রামের দিকে। খোঁজ নিয়ে জানল দু'জনের একজনও এখন বান্দরবানে থাকে না। একজন থাকে কক্সবাজার, একজন ঢাকায়। শফিককে পাওয়া গেল অবশ্য। বন্ধুটি শহর থেকে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে। বনরূপা। মাঝে মাঝে ও মিনহাজের ঢাকার ঠিকানায় কুরিয়ারে পাঠায় পত্রিকাটা।

শফিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ ওর অফিসে আড্ডা দিয়ে, কিছুক্ষণ শহরে ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত ১০টা বেজে গেল। খেতে হয়েছে শফিকের বাসায়। ওর স্ত্রী মানসী কিছুতে না খাইয়ে ছাড়বে না। বেশ মজা করে আদিবাসী রান্না খাওয়া হলো। শফিকের কিছু প্রিয় পদ রেঁধেছে মানসী। ওগুলোর মধ্যে ওর প্রিয় বৈসাবি নিরামিষ এবং শুঁটকিও ছিল।

বাইরে চারদিক ভেসে যাচ্ছে বৃষ্টিধোয়া নির্মল চাঁদের আলোয়। হোটেলটা নদীর পাড়ে। রুম থেকে নদী দেখা যায়। ব্যালকনি থেকে মিনহাজ দেখল পাহাড়ের গাছগাছালির ওপর চাঁদ। ফিনফিনে মেঘ ছুটে এসে ঢেকে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। তখন আলো কমে আসে, আবার পরক্ষণেই চারদিক ফকফকে। চাঁদের আলোয় নদীর পানি চিকচিক করছে। কোনো দেশি নৌকা বা বোট চোখে পড়ছে না। হোটেলের ম্যানেজার জানিয়েছে, নদীর উজানে দু'দিন থেকে প্রচণ্ড স্রোত। স্রোতের জন্যই মিনহাজকে থানচি যাওয়া বাদ দিতে হয়েছে। শফিক বলছিল, এ সময় বার্মার আরাকান পাহাড় থেকে বৃষ্টির কারণে পানির ঢল নামে। সে জন্য নদীতে স্রোতের তোড় বেড়ে যায়। থানচি এবং দূর-দূরান্তে যাওয়া-আসা কঠিন হয়ে পড়ে। এ নদীতে লঞ্চ চলে না। কোনো কোনো জায়গায় পানি হাঁটু সমান। তার ওপর নদীর মাঝখানে পড়ে থাকে বিশাল বিশাল পাথর।

পরশু খুব সকালে ওকে চট্টগ্রাম রওনা হতে হবে। কমল প্লেনে ঢাকা যাওয়ার টিকিট কেটে রেখেছে। বিকেলে ফ্লাইট। কালকের দিনটা খুব ব্যস্ততায় কাটবে। শফিককে সঙ্গে নিয়ে ও যাবে বগা লেকে। জায়গাটা দুর্গম এলাকা। সামনের কোনো বইয়ে ও জুলি শামসিকে একটা মিশনে এই অঞ্চলে আনতে চায়। ফোনে মেসেজ আসার শব্দ হলো। প্রায়ই শব্দটা শুনতে পায় না মিনহাজ। এখন শুনল। স্ক্রিনে জুলির নাম। সঙ্গে সঙ্গে মেসেজটা খুলল ও। লেখা ভাসছে, 'স্যার, আমি খুব বিপদে। কী করব বুঝতে পারছি না। হেলপ মি।' মিনহাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখল, 'কী ধরনের বিপদ? কোথায় তুমি?' জুলি লিখল, 'স্যার, আমি একটা বাসে। লোকাল বাস। আমি ছাড়া আর কোনো প্যাসেঞ্জার নেই।' মাথাটা চক্কর দিল মিনহাজের। এবার মেসেজ না লিখে ও জুলির নম্বরে ফোনে করল। একবার রিং হতেই ফোন ধরল জুলি। ফিসফিস করে কথা বলছে ও।

হ্যালো, স্যার।

কী হচ্ছে এসব? তুমি বাসে, তা-ও এত রাতে। ঘটনা কী? কোথায় যাচ্ছো? উৎকণ্ঠায় মিনহাজের গলা শুকিয়ে আসছে।

স্যার, আমি মানিকগঞ্জে আমার গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি। আমার দাদু মৃত্যুশয্যায়। বাবা-মা খুন হওয়ার পর উনিই আমাকে বড় করেছেন। আপনি তো সব জানেন।

এই গভীর রাতে কেন যাচ্ছো? তার ওপর তুমি একা।

খবরটা পেলাম সন্ধ্যার পর। আমার মাথা ঠিক ছিল না স্যার। টার্মিনালে যে বাসটা সামনে পেয়েছি, সেটাতেই উঠে পড়েছি।

তারপর?

আমি জানতাম না এটা লোকাল বাস। কয়েকটা স্টপেজ পার হতেই দেখি বাস খালি। বাসে আমি একা। আর আছে কন্ডাক্টর, হেলপার আর ড্রাইভার।

এখন প্রবলেম কী? বাসের কোন দিকে তোমার সিট?

পেছনের দিকে। স্যার, বাসের লোকগুলো ...

সবাই তো খারাপ লোক না। তুমি এর চেয়ে ভয়ঙ্কর সিচুয়েশন ফেস করেছো। ইউ আর এ সিক্রেট এজেন্ট।

কিন্তু স্যার, এ ধরনের সিচুয়েশনে কখনও পড়িনি।

কেন তুমি অফিসের গাড়ি নিলে না আমি বুঝতে পারছি না। সঙ্গে আর্মস আছে তো?

জি স্যার, রিভলবার আছে। হ্যান্ডব্যাগে।

কী ড্রেস পরে আছো এখন?

সালোয়ার-কামিজ। গ্রামে যাচ্ছি। প্যান্ট-শার্ট কীভাবে পরি।

ঠিক আছে, একদম ঘাবড়াবে না। লোকগুলো হয়তো খারাপ নয়। তুমি অযথা সন্দেহ করছ। আর খারাপ হলেও তুমি ঠিক ফেস করতে পারবে।

কিছু বুঝতে পারছি না, স্যার। দুর্বল আর অসহায় শোনায় জুলিকে।

শোনো, বাসটা এখন কোন রোড দিয়ে যাচ্ছে?

এতক্ষণ তো আরিচা রোড দিয়ে যাচ্ছিল। এখন এটা কোন রাস্তা বুঝতে পারছি না। দু'পাশে জঙ্গল মনে হচ্ছে।

মিনহাজকে দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল। মানিকগঞ্জ যাওয়ার পথে কোথায় জঙ্গল, ও মনে করতে পারল না। সাভারের দিকে জঙ্গল আছে কি? নাকি গাড়ি কোনো অচেনা রাস্তা ধরে যাচ্ছে।

স্যার, ওরা বাসের জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে। ভয়-খাওয়া গলায় জুলি বলল। কন্ডাক্টরটা আমার দিকে আসছে।

বোধ হয় বৃষ্টি। তোমার দিকের জানালা বন্ধ করতে চায়। ঝড় আসছে নাকি? রিভলবারটা হাতে ধরে রাখো, তবে ওরা যেন বুঝতে না পারে।

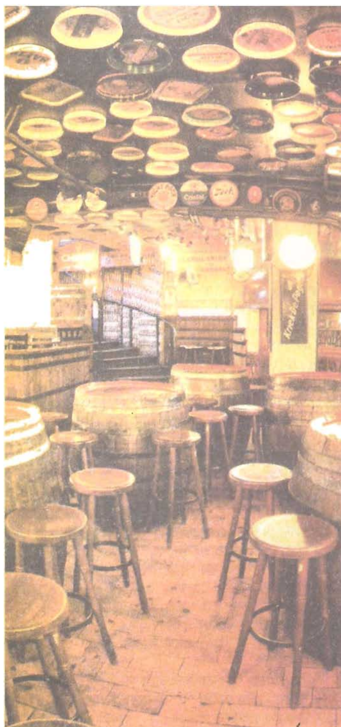
জুলি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কথা বোঝা যায় না। ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। লাইন কেটে গেল। নেটওয়ার্ক নেই বোধ হয়।

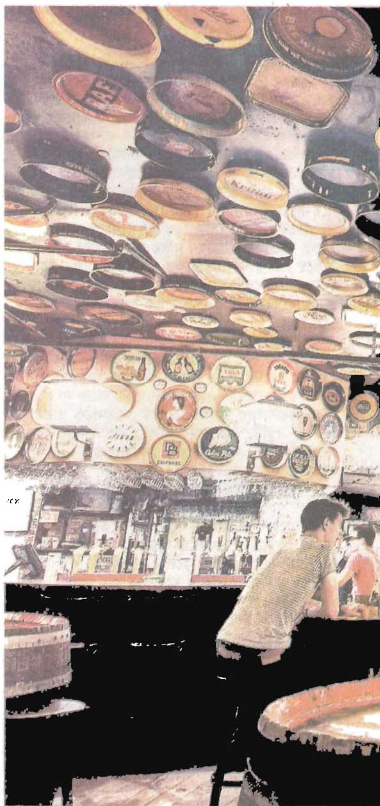
কিছুক্ষণ আগেও ঝিরিঝিরি হাওয়া বইছিল। এখন মিনহাজের গরম লাগছে। ওর শরীর ঘেমে গেছে।

নারীকণ্ঠে উচ্ছল হাসির শব্দ ভেসে এলো নদীর দিক থেকে। একটা দেশি নৌকা ভাসছে। চাঁদের আলোয় দেখা যায়, দু'জন নারী নৌকার দু'পাশে বসে একে অপরের দিকে পানি ছিটাচ্ছে। পেছনের দিকে বৈঠা হাতে এক পুরুষ।

নদীতে আর কোনো নৌকা নেই। চারদিক সুনসান।

মিনহাজ মুস্তাফির মনে হলো ও কোনো অ্যাবসার্ড নাটকের দৃশ্য দেখছে। ❖

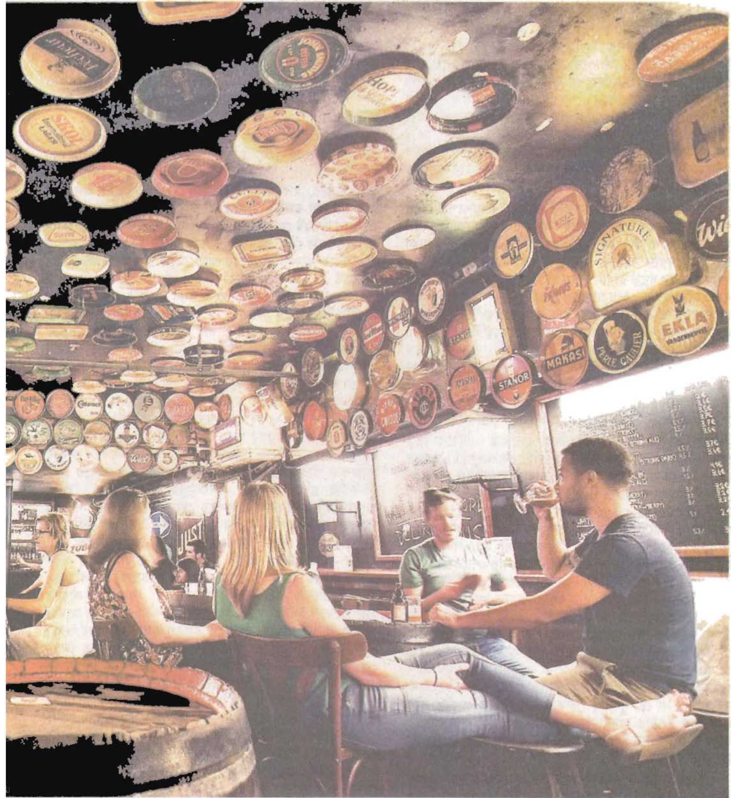






মঈনুস সুলতান

ব্রাসেলসের মাতংগি ও ডিলিরিয়াম ক্যাফে



ডিলিরিয়াম ক্যাফে

মাতংগি ও ফ্লোরাল কার্পেট

মাতংগি বলে ব্রাসেলসের কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত নেইবারহুডে পৌছানো দুরূহ না হলেও ঝকমারি হলো বিস্তর। ঘণ্টাতিনেক আগে আমি ইবোলা আক্রান্ত দেশ সিয়েরালিয়ন থেকে ব্রাসেলসে এসেছি; আমি ট্রেনে চড়ে ইউরোপে ঘোরাফেরা করতে চাই। সিয়েরালিওন থেকে অনলাইনে টিকিট কিনতে গেলে আমাকে একটি ঠিকানা দিতে হয়। ব্রাসেলসে বাস করছে আমার সুহৃদ লুকাস। আমি তার ঠিকানা ব্যবহার করে টিকিট কিনেছি, এখন ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে যাচ্ছি মাতংগি এলাকার কিনসাসা রেস্টুরেন্টে লুকাসের তালাশে। উদ্দেশ্য, তার কাছ থেকে ইউ রেলের টিকিট সংগ্রহ করে ট্রেনে প্যারিসের দিকে যাওয়া। মাতংগিতে হাঁটতে হাঁটতে দেখি কালো গাত্রবর্ণের দশাসই জওয়ানরা ক্যাবোল স্টোন বিছানো আস্ত রাজপথ ব্লক করে দোকানপাট খুলে বসেছেন। আমি মালসামান সামলে একটি দোকানের মাঝ বরাবর পথ করে নিতে নিতে ফুটপাতে কার্টন ভরে সাজানো পণ্যগুলো নিরিখ করে দেখি। সোনালি পিকচার ফ্রেমের পাশে পড়ে আছে কয়েকটি ওজন মাপার স্কেল। তৈলচিত্রগুলোর আবডালে পাল তুলে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রগামী জাহাজের রেপ্লিকা। কয়েকটি মেয়েলি স্যান্ডেলের জমকালো সজ্জা দেখে মনে হয়- এসব যেমন নারীদেহের রূপ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে, ঠিক তেমনি দরকারমতো জুতাপেটার কাজেও এদের এস্তেমাল হবে অব্যর্থ। বোরকা পরা এক নারী কিবোর্ডে খুটখুট করে কী যেন পরীক্ষা করছেন। পাশেই রোলার স্কেটের জুতা পরে কেবলই লাফিয়ে উঠছে দুটি কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর।

আমি আফ্রিকান বাটিকের জোব্বা ঝোলানো কয়েকটি দোকান অতিক্রম করতেই ভিড় এমন ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, মনে

হয় ব্রাসেলসের ছোট এ স্ট্রিটটি যেন জাদুবলে রূপান্তরিত হয়েছে আফ্রিকার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর কিনসাসা শহরের জনবহুল বাজারে। সবাই কঙ্গোলিজ ভাষায় কথা বলছে, হাঁকডাক করে বিক্রি হচ্ছে তাজা মাছ, কমলালেবু, সাপখোপ ও বুনো জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বয়াম ভর্তি আচার। চড়াক চড়াক করে চাটি পড়ছে ঢোলকে। পাশেই কাচে সূর্যমুখীর জৌলুস ছড়ানো রোদচশমা পরে এক আধবুড়ো বিক্রি করছেন গুরু নিতম্বে চাটি মারার জন্য চামড়ায় তৈরি হাতিয়ার। তিনি মেগাফোনে বুঝিয়ে বলছেন– কামশীতল ব্যাধিতে ভুগছে যেসব রমণী, তাদের গতরে এ দ্রব্যের ব্যবহারে কামিয়াবির হার হানড্রেড পারসেন্ট।

আমি পকেটে খুচরা ইউরো ভর্তি ওয়ালেট ও পাসপোর্ট চেপে ধরে ভিড় থেকে বেরিয়ে আসতেই কিছু লোক খামোকা উলুধ্বনি করে ওঠে। ঘটনা কী? একটু উঁকিঝুঁকি দিতে হয়। সড়কে বাঁকা চাঁদের ফরমেশনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট সমাবেশ। মাথা মোড়ানো দুই কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের ঘাড়ে রাখা পেল্লায় সাউন্ড বক্স। তা থেকে ছড়াচ্ছে 'চরো চেরো চচ চ.. চাচ চা ররো রেরো' ধ্বনি। হাঁটু বাঁকা করে 'দ' অক্ষরের ভঙ্গিতে নেচে ওঠে এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী। তার দেহে খেলছে নৃত্যময় দারুণ জোশ। তার তাড়নে মেয়েটির সুতি টপের স্লিভ নেমে এসেছে কনুই অব্দি। আর অন্তর্বাস অতিক্রম করে লাফিয়ে উঠছে স্তনযুগল। ভিড়ে দাঁড়িয়ে দু'তিনজন পর্যটক চশমা কপালে তুলে বিষয়টি অবলোকন করছেন। একজন পিম্প আমার দিকে নগ্নিকাদের হরেক কেতার দেহভঙ্গির এক তাড়া তসবির এগিয়ে দিলে আমি জোর কদমে ভিড় অতিক্রম করে সামনে চলি।

চলে আসি মাতংগির আবাসিক এলাকায়। এদিকে ভিড় তেমন নেই। তবে আছে বেশ কিছু স্থায়ী দোকানপাট। তাদের দেয়ালে ঝুলছে ফরাসি ও কঙ্গোলিজ ভাষায় লেখা কিছু পোস্টার। কথাবার্তা হয় পথযাত্রীদের সঙ্গে। সাদা হ্যাট মাথায়, ওভারকোট গায়ে, ছাতিওয়ালা এক লোক পরিষ্কার ইংরেজিতে আমাকে কিনসাসা রেস্টুরেন্টের নিশানা বাতলে দেন। বেলা বাজে ১টা ৫৫। কিনসাসা রেস্টুরেন্ট খুঁজে পেতে খানিক সমস্যা হয়। গলির মুখে পড়ে একটি পরচুলার দোকান। ওখানে আয়নার শোকেসে থরে-বিথরে সাজিয়ে রাখা মিনিকিন। তাদের করোটিতে কৃত্রিম চুলের রকমারি বিন্যাস। বিমর্ষ চেহারার এক ব্ল্যাকম্যান আমাকে থামিয়ে ফিসফিসিয়ে জানতে চান– আমি নাইরোবি থেকে আমদানি করা হাশিশ কিনব কি-না? আমি নেতিবাচকভাবে মাথা ঝাঁকালে তিনি চটে উঠে লিংগালা ভাষায় বলে ওঠেন, 'টুফি মামা না ইয়ো'। এ লব্জ আমার বোধগম্য না হলে তিনি কানের কাছে মুখ এনে পরিষ্কার ইংরেজিতে তর্জমা করেন। এবার বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ আমার প্রয়াত জননীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করছেন। তাকে পাশ কাটিয়ে পরচুলার দোকানের পেছনে আসতেই চোখে পড়ে কিনসাসা রেস্টুরেন্টের নামফলক।

ভেতরে ঢুকতেই বাটিকের চক্রাবক্রা ডিজাইনের জোব্বা পরা স্বয়ং ম্যানেজার ছুটে এসে আমাকে 'মঁশিয়ো সুলতান' বলে সেলেউটি কায়দায় হাত তুলে সংবর্ধনা জানান। বোধ করি তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটি টেবিল দেখিয়ে দিলে আমি জানতে চাই– লুকাস জানসেনের বৃত্তান্ত। তিনি আমাকে কাঠের স্ক্রিনের ওপাশে নিয়ে আসেন। দেখি– গদি পাতা মেঝেতে পদ্মাসনে বসে এক শ্বেতাঙ্গ সাহেব। তিনি ছাদে ঝুলানো ঝাড়বাতির দিকে নিমীলিত নেত্রে তাকিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। ভালো করে তাকিয়ে আমি তার মাঝে লুকাসকে আবিষ্কার করি। বেজায় তাজ্জব হই– লুকাস চুল-দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলাতে তার এমন হালত হয়েছে যে, তাকে গলা-ছোলা মুরগির মতো চাঁছাছোলা দেখায়। তার মুণ্ডুটিও খুরে মোড়ানোর ফলে তার করোটিকে দেখাচ্ছে উটপাখির আন্ডার মতো। আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'হ্যালো লুকাস, হোয়াট দ্য হেল ইজ গোয়িং অন?' রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার ইশারায় আমাকে কথা বলতে বারণ করেন। কিন্তু আমি ডেসপারেট। আবার মুখ খুলতেই লুকাস নোটবুক বের করে খসখসিয়ে তাতে লেখে, 'আই অ্যাম ডুয়িং সাম সিটিং মেডিটেশন, কাইন্ডলি পনেরো-বিশ মিনিট অপেক্ষা করো। ধ্যান শেষ হলে পরে কথা বলব।' এ তো মহাযন্ত্রণায় পড়া গেল। আমার মেজাজ বিলা হয়ে ওঠে। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার আমাকে একটি টেবিলে বসিয়ে চটজলদি সার্ভ করেন লাঞ্চ। লেবুর চাকতি মেশানো পিনাট সসে সিদ্ধ মুরগির মাংস দিয়ে যবের মণ্ড খেতে খারাপ লাগে না।

আহারাদি শেষ হতেই লুকাস এসে আমার সঙ্গে যোগ দেয়। তার ঢুলু ঢুলু চোখ ও নিমাই সন্ন্যাসীসুলভ চেহারা দেখে আমি মনে মনে ভিরমি খাই। কিন্তু বাইরে স্বাভাবিক আচরণ বজায় রেখে জিজ্ঞেস করি, 'হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন মেডিটেটিং অ্যান্ড অল দিস? আর ইউ অল রাইট?' লুকাস জবাব দেয়, 'সিয়েরালিয়ন থেকে ব্রাসেলস ফিরেই যেন জলে পড়ি, যেসব তথ্য জোগাড় করেছিলাম তা দিয়ে তৈরি লেখা পত্রিকায় ছাপা হয় বটে, কিন্তু শরীরে কাঁটার মতো বিঁধে থাকা অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে রেহাই পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। তো একজন ইন্ডিয়ান গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। তুমি চাইলে ব্রাসেলসে থেকে যাও দিন কয়েক, গুরুর সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেবো।' আমি এ প্রস্তাবে কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে কাজের কথায় আসি। বলি, 'হোয়ার ইজ মাই ইউ রেল টিকিট? ব্রাসেলসে থাকার আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। টিকিট দাও, বিকেলের ট্রেনে প্যারিস যেতে চাচ্ছি।' আমার চাহিদাকে আমলে না এসে লুকাস বলে, 'হোয়াই অল দিস হারি, টিকিট তো আছে এঞ্জেলিকের ফ্ল্যাটে, তার সঙ্গে বিকেল ৫টার পর দেখা হবে, সেও তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায়, তার সঙ্গে দেখা করো, গল্পগুজব করো, তারপর নিয়ে নিও টিকিট।' লুকাস ড্রিংকসের ইশারা দিলে টেবিলে আদার রস মেশানো শরবত জাতীয় আফ্রিকান পানীয় পরিবেশন করা হয়। আমি চুমুক দিয়ে ঠোঁট কুঁচকাচ্ছি দেখে লুকাস এনকারেজ করে বলে, 'আমি অ্যালকোহলিক ড্রিংকস একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, গুরু পরামর্শ দিয়েছেন সাত্ত্বিক জীবনযাপন করার। দিস ইজ আ ভেরি গুড ড্রিংকস। খেয়ে দেখো– মাথা ঠাণ্ডা রাখে।' আমি বিরক্ত হই। আমার মাথা উত্তপ্ত হয়নি। এঞ্জেলিক ভারমিউলিন বলে বেলজিয়ামের মিষ্টি মেয়েটি আদতে লুকাসের গার্লফ্রেন্ড। সিয়েরালিয়নের ফ্রিটাউনে বসবাসের সময় লুকাসের অ্যাপার্টমেন্টে ইন্টারনেটের কানেকশন ছিল না। তাই সে আমার কটেজে আসত এঞ্জেলিকের সঙ্গে স্কাইপে কথাবার্তা বলার জন্য। স্কাইপে সে আমাকে এঞ্জেলিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। লুকাসের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে কখনও সে স্কাইপে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার খোঁজখবরও নিয়েছে। নীল চোখের সদা সতর্ক মেয়েটি সদালাপী, তাকে আমার একটু ভালোও লেগেছে। কিন্তু আমি ব্রাসেলসে এসে তার সঙ্গে গল্পগুজব করতে যাব কেন? আমার প্রয়োজন টিকিট সংগ্রহ করে এখনই প্যারিসের দিকে রওনা হওয়ার। ৫টার পর টিকিট হাতে এলে রাতের ট্রেনে প্যারিস যাওয়ার হাঙ্গামা করতে চাই না। আর রাতে ট্রেন ধরতে না পারলে ব্রাসেলসে হোটেল খুঁজতে হবে। লুকাস অভয় দিয়ে বলে, 'হোটেলের প্রয়োজন পড়বে না। তুমি এঞ্জেলিকের ফ্ল্যাটে না হয় এক রাত কাটিয়ে দাও।' আমি অবগত যে, এঞ্জেলিক মাত্র এক কামরার ফ্ল্যাটে বাস করে। তাই প্রশ্ন করি, 'তাহলে তুমি কোথায় ঘুমাবে লুকাস?' বার কয়েক তার সঙ্গে উতোর চাপান করে যা বুঝতে পারি তা হচ্ছে– রাত সাড়ে ১১টা অব্দি লুকাস শহরের একটি সেমিটারির আধো অন্ধকার কবরের পাশে বসে শবাসন জাতীয় যোগব্যায়ামে মাতবে; তারপর সে যাবে রাতের ডিউটিতে। সিয়েরালিওনে মাস তিনেক কাটানোর ফলে তার যে রেগুলার জব ছিল তা সে খুইয়েছে। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে ইবোলা বিষয়ক দু-তিনটি স্টোরি লিখে তার আয়ে দিন গুজরান করা দুরূহ। তাই সে একটি ফার্মে নাইট গার্ডের কাজ নিয়েছে। আমাকে আশ্বস্ত করে লুকাস বলে, 'আমি ভোর ৭টার আগে ফ্ল্যাটে ফিরছি না। অ্যান্ড টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি... এঞ্জেলিক তোমার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে, তুমি ব্রাসেলস এসেছ শুনেই বলে

তোমার সঙ্গে কী যেন আলাপ করবে, তো গল্পগুজব করে তোমাদের ভেতরকার কেমেস্ট্রি যদি একে অন্যের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়– চাই কি এঞ্জেলিক হয়তো তোমাকে তার বিছানায় আমন্ত্রণ করবে, আর যদি আমন্ত্রণ না-ও করে তুমি কাউচে কম্বল মুড়ি দিয়ে এক রাত তো কাটিয়ে দিতে পারবে।' আমি এবার সরাসরি তাকে প্রশ্ন করি, 'লুক লুকাস, শি ইজ ইয়োর গার্লফ্রেন্ড, আমি তার সঙ্গে জড়াতে যাব কেন?' সে এবার নিমাই সন্ন্যাসীর মতো মিহি হেসে জবাব দেয়, 'ইয়েস, শি ওয়াজ মাই গার্লফ্রেন্ড, আই লাভড্ হার এজওয়েল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমি দীক্ষা নিয়ে সেলিবাসির ব্রত নিয়েছি, তার সঙ্গে বা অন্য কারও সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি। দিন কয়েকের, জোর মাস দিনের মধ্যে তার সঙ্গে সম্পর্ক আমার ভেঙে যাচ্ছে। সুতরাং সে যদি তোমার বা অন্য কারও সঙ্গতে আনন্দ পায়, দেন ইট ইজ নো লংগার মাই বিজনেস।' আমি অধৈর্য হয়ে বলি, 'ফর গড সেইক লুকাস, আমি এঞ্জেলিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চাই না। আমাকে কাইন্ডলি তার ফ্ল্যাটে নিয়ে চলো। টিকিটটি হাতে আসামাত্র আমি প্যারিসের ট্রেনে চাপব, লেটস গেট আপ অ্যান্ড গো টু এঞ্জেলিকস ফ্ল্যাট রাইট নাও।' লুকাস যেন গীতা পাঠ করে আমাকে কোনো বিশেষ শ্লোকের সারমর্ম বোঝাচ্ছে– এ রকম ধীরস্থির স্বরে বলে, 'এঞ্জেলিক গ্র্যান্ড প্লেসে এখন ফ্লোরাল কার্পেট তৈরি করছে। ৫টার আগে তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমার কাছে তার ফ্ল্যাটের কোনো ডুপ্লিকেট চাবি নেই। সো, মাই ফ্রেন্ড, ডোন্ট বি ইমপেসেন্ট, ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু ওয়েট।'

রেস্টুরেন্টে দু'জন পৃথুলা কঙ্গোলিজ নারী ও চুলদাড়িতে জটাজুটওয়ালা এক পুরুষ এসে ঢোকেন। তারা বড় বড় তিনটি ব্যাগে করে বয়ে নিয়ে এসেছেন প্রচুর আফ্রিকান কাপড়-চোপড় ও হস্তশিল্পের নমুনা। স্টেরিওতে বেজে ওঠে 'ইনডিপেনডেন্স চা চা তো/ ওহ কিম্পওয়ানজা চা চা তুবাকিডে' বলে খুব জোশালো একটি সঙ্গীত। লুকাস এ গান সম্পর্কে ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে বলে– কঙ্গোর লিংগালা ভাষায় এ জনপ্রিয় লিরিকটি ১৯৫৬ সালে কম্পোজ করেন বিখ্যাত শিল্পী কাবাসেলে কালে। 'তা লোকাস, তুমি কঙ্গোলিজ কালচার সম্পর্কে আগ্রহী হলে কখন?' জবাব পাই, 'এ রেস্টুরেন্টে খাবার বিক্রি ছাড়াও বেচাকেনা চলে কঙ্গোলিজ বস্ত্র ও অলঙ্কারাদির। আমি এদের হালচাল পর্যবেক্ষণ করে একটি স্টোরি তৈরি করছি'– বলে লুকাস উঠে গিয়ে ব্যাগভর্তি পণ্য বয়ে আনা পুরুষ ও মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। তারা বর্ণাঢ্য বাটিকের বস্ত্র মেলে ধরলে সে ডিজিটাল ক্যামেরায় নকশার ছবি তুলে নেয়। আমি বিমর্ষ মুখে চুপচাপ বসে থাকি। স্কিন টাইট জিন্স পরা দুটি কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে আসে। তারা দামদর করে খরিদ করে দুটি আফ্রিকান কেতার ড্রেস। একটু পর বাথরুম থেকে পোশাক পরিবর্তন করে বেরিয়ে এসে তারা দেয়ালে ফ্রেস্কো করে আঁকা কঙ্গোর কোনো এক বনানীর ছবির সামনে দাঁড়ায়। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার একটি ট্যাক্সিডার্মি করা রঙচঙে পাখি ও তালের পাখা তাদের হাতে তুলে দিলে মেয়ে দুটি তা নিয়ে পোজ দেয়। ম্যানেজার আইফোনে তাদের ছবি তুলে দেন। লুকাস এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলে।

লুকাস মেয়ে দুটিকে নিয়ে বেশ গুছিয়ে অন্য একটি টেবিলে বসে। মনে হয় সে সিরিয়াসলি তাদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে। আমি তার সেলিবাসি ব্রত নেওয়ার বিষয়টি ভাবি। সেলিবাসি হচ্ছে সকল সময় সতর্কভাবে সেক্স পরিহার করে চলা। ফ্রিটাউনে মাস তিনেক তাকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। তথ্য সংগ্রহের যে কাজে সে লিপ্ত ছিল, তাতে স্ট্রেসের মাত্রা ছিল ভয়াবহ। তাই রূপজীবী নারীদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে সে হয়ে উঠেছিল উদ্দাম। তার একটি ঘটনাকে আমার মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ অনৈতিক। ফ্রিটাউনে অফিস থেকে ফেরার পথে আমি তার অ্যাপার্টমেন্টে থেমেছিলাম। কলিংবেল কাজ করছিল না, তাই একটু জোরে টোকা দিতেই দরোজা হাট হয়ে খুলে গিয়েছিল। নোটবুক হাতে কাউচে বসে ড্রেসিং গাউন পরা লুকাস। আমি দোরগোড়ায় পা দিতেই একটি মেয়ে কোমরে র‍্যাপার জড়িয়ে তার দেহের নগ্নতা সামলাতে সামলাতে ছুটে যায় বেডরুমে। নিট ভোদকার গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে লুকাস আমাকে নোটবুক দেখিয়ে বলেছিল– মেয়েটির নাম মানুসোমা তুরে। ইবোলা সারভাইবার। মৃত্যু হয়েছে তার মা-বাবা ও দুটি ছোট ছোট ভাইয়ের। চল্লিশ দিন করিনটিন থাকার পর সে ইবোলা-ফ্রি ঘোষিত হলেও তার চাচার পরিবার তাকে দত্তক নিতে অস্বীকার করে। মানুসোমা বাস করছে ফ্রিটাউনে তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে। কাউচে পড়ে থাকা প্যান্টি ও ব্রেসিয়ার দেখিয়ে আমি বলি, 'লুকাস, তুমি নিশ্চয়ই চাও না মেয়েটি আমার সঙ্গে অন্তর্বাসহীন অবস্থায় দেখা করুক।' সে প্রসঙ্গ পাল্টে বলে, 'জাস্ট ইমাজিন, দিস ইজ ফার্স্টটাইম আমি একটি ইবোলা সারভাইবার মেয়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছি।' আমি কোনো জবাব দেই না, কিন্তু মনে মনে ভাবি– যে মেয়েটি তথ্য সরবরাহ করেছে, সাংবাদিক হিসেবে... ইজ ইট ও-কে টু এনগেজ উইথ হার সেক্সুয়েলি?

ওই দিন মানুসোমার সঙ্গে আমার যৎসামান্য কথাবার্তাও হয়। ফেরার সময় লুকাস বলে, 'টেক দিস গার্ল উইথ ইউ, অ্যান্ড প্লিজ ড্রপ হার অ্যাট দি কান্ট্রি লজ গেস্ট হাউস।' মেয়েটির আত্মীয় কান্ট্রি লজের বাইরে মোটরবাইক নিয়ে অপেক্ষা করবে। মানুসোমাকে লিফট দিতে গিয়ে একটা বিষয় খেয়াল না করে পারি না, তা হচ্ছে মেয়েটির বয়স। শরীর বাড়ন্ত হলেও তার বয়স হবে মেরে-কেটে ষোলো, জানতে পারি সে ক্লাস টেনের ছাত্রী ছিল। ইবোলার কারণে সারাদেশের সব স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। কান্ট্রি লজ গেস্ট হাউসে তাকে ড্রপ করতে গিয়ে মনে মনে লুকাসকে অভিশাপ দেই, বলি– শালা, তুমি তথ্য সংগ্রহের অজুহাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক একটি মেয়ে, যে মাত্র মাস দেড়েক আগে পরিবারের সবাইকে খুইয়ে অরফ্যান হয়েছে তার শরীরের সুযোগ নিলে, দিস ইজ টোটালি আন অ্যাকসেপটেবল।

সপ্তাহ দিন পর বিকেল বেলা মানুসোমাকে আবার দেখি দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলের পেছন দিকের বাগানে। তার উদভ্রান্ত দৃষ্টি দূরের সমুদ্রে নিবদ্ধ। আমাকে দেখতে পেয়ে সে ছুটে এসে কব্জি চেপে ধরে আন্তরিকতায়। জিন্সের সঙ্গে চকোলেট কালারের একটি টি-শার্ট পরেছে, তাতে লেখা– ইউ লুক ওয়ান্ডারফুল হোয়েন ইউ স্মাইল। সে ডেসপারেট হয়ে বলে, 'মিস্টার, উইল ইউ বাই মাই টাইম, আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে চাই।' তার শুকনা ঠোঁট-মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তাকে আউটডোর বারে নিয়ে গিয়ে কিনে দিই হ্যামবার্গার ও কোক। কথাবার্তা শুরু করার ছলে বলি, 'ইউ লুক নাইস ইন দিস টি-শার্ট।' সে বিষণ্ণভাবে জানায়, 'ইয়োর ফ্রেন্ড মি. লুকাস বট মি টি-শার্ট অ্যান্ড দিস পেয়ার অব জিন্স। আজকে কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।' তার কাছ থেকে আরও জানতে পারি– সকাল বেলা তার কাজিন তাকে কান্ট্রি লজে নিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গ কেউ ক্রয় করেনি। যে পরিবারে সে বাস করছে, সেখানে টাকা-পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে; দুপুর বেলা বাড়ি ফিরলে তার আন্ট কোনো ইনকাম না নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য বকাঝকা করে আবার তাকে র‍্যাডিসন ব্লুতে পাঠিয়েছে। কড়া করে বলে দিয়েছে– আজ সন্ধ্যায় খালি হাতে ফিরলে ঝামেলা হবে। আমি টেবিলের তলা দিয়ে তাকে তার সঙ্গ দেওয়ার বিনিময়ে পেমেন্ট করে জানতে চাই, 'মানুসোমা, প্লিজ আনসার মি ট্রুথফুলি, তুমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিলে?' সে জবাব দিতে বেশ সময় নিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সামলে বলে, 'মায়ের কথা ভাবছিলাম, মা অসুস্থ হয়ে ইবোলা হল্ডিং সেন্টারে যেতে চায়নি, হেলথ ওয়ার্কাররা তাকে যখন জোর করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে, সে চিৎকার করে বলছিল আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডাই রাইট নেক্সট টু মাই ডটার। আমার যখন সময় খারাপ যায়, তখন আমি সমুদ্রের দিকে তাকাই, আর মায়ের মুখ পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। মনে হয় ইবোলা হল্ডিং সেন্টারে তাকে জোর করে ধরে না নিয়ে গেলে আমার শুশ্রূষায় সে হয়তো ভালো হয়ে উঠত।'

কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ে দুটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ হলে পরে আমরা বেরিয়ে পড়ি কিনসাসা রেস্টুরেন্ট থেকে। ট্রাম ধরে গ্র্যান্ড প্লেসে

এসে পৌঁছাই ঠিক ৪টা ৪৫ মিনিটে। শহরের মেইন স্কয়ারে ফ্লোরাল কার্পেট তৈরির কাজ প্রায় শেষ। বিগোনিয়া বলে অত্যন্ত বর্ণাঢ্য ফুলের সমাহারে তৈরি হতে যাচ্ছে ফ্লোরাল কার্পেটটি। লাখো ফুলের বিশাল এ পুষ্প-গালিচাটি দৈর্ঘ্যে ৭৫ ও প্রস্থে ২৪ মিটার। এর নকশা তৈরিতে ব্যবহার হচ্ছে ১০ লাখের মতো বিগোনিয়া ফুল। ব্রাসেলসে এ ধরনের পুষ্প-গালিচা প্রথম তৈরি হয় ১৯৭১ সালে। এর আকর্ষণীয় ডিজাইন দেখনেওয়ালাদের এতই পছন্দ হয় যে, নগর পরিকল্পকরা সিদ্ধান্ত নেন প্রতি দু'বছর পরপর তৈরি করা হবে একটি প্রকাণ্ড ফুলের ফরাশ। কার্পেটটি আকারে বিপুল হলেও এটি তৈরি করতে সময় লাগে মাত্র চার ঘণ্টা। একশ' জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত ভলান্টিয়ার সুসমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মাত্র মিনিট দশেক বাকি আছে। তাই টাউন হলের কাছাকাছি এক জায়গায় স্বেচ্ছাসেবকরা গভীর মনোযোগে ফিনি-শিং টাচ দিচ্ছেন। আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে এঞ্জেলিককে স্পট করার চেষ্টা করি। লুকাস আমরা যে টাউন হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তা উল্লেখ করে টেক্সট পাঠায়। কার্পেট বোনা শেষ হওয়া মাত্র টাউন হল থেকে ট্রাম্পেট জাতীয় কিছু বাজানো হয়। হাততালি দিয়ে ওঠে দেখনেওয়ালারা। হিড়িক পড়ে যায় ছবি তোলার। দর্শকরা ছবি তোলার জুতমতো স্পট পেতে ছোটাছুটি শুরু করে। আমরা এঞ্জেলিকের তালাশে তাকাচ্ছি চারদিকে। পেছন থেকে এসে সে আমার কাঁধে হাত রাখলে আমি চমকে উঠি। স্কাইপের মারফতে কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখে মেয়েটাকে মনে হয়েছিল সাবধানী ও প্র্যাকটিক্যাল। সে স্যাফায়ার পাথরের মতো নীলরঙের মিহি দ্যোতি ছড়িয়ে আমার চোখে চোখ রাখলে– কাছ থেকে তাকে আন্তরিক মনে হয়। খুব খাটো ঝুলের শর্টস পরা এঞ্জেলিকের হাতের কব্জি, গ্রীবা ও হাঁটুতে লেগে আছে বিগোনিয়া ফুলের তাজা রেণু। তার কাঁধ থেকে ঝুলছে বেতে বোনা একটি ব্যাগ, তাতে রাখা– ফ্লোরাল কার্পেটে ব্যবহার করা হয়নি এ রকম বেশ কিছু বাড়তি ফুল। পর্যটকদের জন্য আজ টাউন হলের কপাট খুলে দেওয়া হয়েছে। এঞ্জেলিক হাত ধরে বলে, 'চলো, লেটস্ গো টু দি টাউন হল। আমি একটু উঁচু জায়গা থেকে তোমাকে কার্পেটটি দেখাতে চাচ্ছি।' ওদিকে হাঁটতে হাঁটতে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, লুকাসের সঙ্গে এঞ্জেলিকের তেমন কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। লুকাস তার পেছন পেছন নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে খানিকটা মানসিক দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে।

টাউন হলের ভেতরে আরও দশ-পনেরো জন পর্যটকদের সঙ্গে ঢুকতে ঢুকতে আমি পনেরো শতকে নির্মিত গথিক স্থাপত্যের মাস্টারস পিস বলে মশহুর দালানটির দিকে তাকাই। একটি দীর্ঘ করিডোরের দু'পাশে যেন শ্বেতপাথর ও ব্রোঞ্জে তৈরি ভাস্কর্যের মিছিল চলছে। ছাদজুড়ে ফ্রেস্কো করে আঁকা ওল্ড টেস্টামেন্ট। দেয়ালে ঝুলছে প্রচুর টাপেস্ট্রি। একটি হলকক্ষে ঝোলানো তৈলচিত্রের সমাবেশ থেকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন কিংখাব মোড়া আলখাল্লা পরে তলোয়ার হাতে বিগত জমানার রাজপুরুষরা। আমি রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের লাইফ সাইজ পোর্ট্রেটের দিকে তাকাই। একটি বেদির ওপর অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁর চিত্রের অবস্থান। লিওপোল্ডের বিল্ডার বা নির্মাতা হিসেবে খ্যাতি আছে। আফ্রিকার কঙ্গোকে তিনি উপনিবেশে রূপান্তরিত করে আহরণ করেন বিপুল সম্পদ। প্রথম দিকে হাজার হাজার বুনো হাতি হত্যা করে আইভরি সংগ্রহে তার আগ্রহ ছিল। কিন্তু তাতে যথেষ্ট উপার্জন না হলে তিনি কঙ্গোলিজদের বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে চাষ করান রাবারের। অনেকটা বাংলায় ইংরেজদের নীল চাষের মতো। রাবার চাষিদের খাদ্য উৎপাদনের অবকাশ ছিল না। এতে কঙ্গোতে দুর্ভিক্ষ চলে বছরের পর বছর। মৃত্যু হয় কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন মানুষের। রাজা লিওপোল্ডের জুলুমের তথ্য পাওয়া যায় কঙ্গোতে ভ্রমণরত ইউরোপীয় মিশনারিদের বর্ণনায়। কঙ্গোতে বেলজিয়ামের উপনিবেশবাদ নিয়ে আলোচনায় জনৈক হ্যারিস অব বারিঙ্গা বলে এক মিশনারির নাম রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলে নির্যাতনের যে বিররণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে ওঠে এসেছে শ্রমিকদের বশ করার জন্য শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে হাত কেটে ফেলার চিত্র। খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়, বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কঙ্গোতে গড়ে ওঠে রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের ব্যক্তিগত উপনিবেশ। তার অত্যাচারে হাতকাটা কঙ্গোলিজদের কিছু ফটোগ্রাফও পাওয়া যায়। টাউন হলের বেলকনির দিকে যেতে যেতে আমি রাজা লিওপোল্ডের আরও কয়েকটি তৈলচিত্র, ফটোগ্রাফস ও মূর্তি দেখতে পাই। বিলাতের রাজপরিবারের আত্মীয়তার সূত্রে ঘনিষ্ঠ এ রাজাটি নাকি স্রেফ ঈর্ষাবশত গড়ে তুলেছিলেন কঙ্গোতে তার প্রাইভেট কলোনি। ছোটবেলা থেকে তিনি হীনম্মন্যতায় ভুগতেন– তার ইংলিশ কাজিনদের দুনিয়াজুড়ে এত উপনিবেশ আছে, তার একটিও নেই, তা কীভাবে হয়? তাই তিনি নাকি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেলজিয়ামের চেয়ে আয়তনে ৭৬ গুণ বড় কঙ্গোকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরান।

আমার পাশে পাশে এঞ্জেলিক এক ধরনের মুগ্ধতা ছড়িয়ে নীরবে হাঁটছে। লুকাস মাঝে মাঝে মন্তব্য করে আমাকে টাউন হলে সাজিয়ে রাখা শিল্পকর্মের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝাচ্ছে। খেয়াল করেছি, সে এঞ্জেলিকের সঙ্গে সরাসরি কোনো কথা বলছে না। একটি বিষয় জানতে আমার খুব আগ্রহ হয়– বেলজিয়ামের এ দুই বন্ধুস্থানীয় নাগরিক তাদের বিগত রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের কঙ্গোলিজদের সম্পর্কে আচরণকে কী দৃষ্টিতে দেখে? আমাদের টাউন হলের ছাদে চলে আসার অনুমতি দেওয়া হয়। এখান থেকে আকাশের দিকে ওঠে যাওয়া তিনশ দশ ফিট বা ছিয়ানব্বই মিটারের টাওয়ারটি পরিষ্কার দেখা যায়। আমরা নীরবে নিচের চত্বরের দিকে তাকাই। লাখো ফুলের নকশা করা বর্ণাঢ্য জলসায় গোধূলিজুড়ে দিয়েছে সম্মোহনী ব্যঞ্জনা। আমরা অজস্র ফুলে ফুলে তৈরি জাদুময় গালিচার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকি। এমন পরিবেশে রাজা লিওপোল্ডের অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলে আমি তালভঙ্গ করতে চাই না। তবে কেন জানি মনে হয়– আমরা তাকিয়ে আছি গ্রান্ড প্লেসের যে সুসমন্বিত স্থাপত্যকলার দিকে, আমার চোখের সামনে প্রদর্শিত হচ্ছে বেলজিয়ামের যে পুষ্পিত সম্পদ, এর পেছনে আফ্রিকান কালো মানুষের শ্রম, রক্ত ও ঘামের সম্পর্ক নিয়ে পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করতে না পারলে ব্রাসেলস ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যায়।

মরোক্কান পল্লী ও ডিলিরিয়াম ক্যাফে

টাউন হলের ব্যালকনি থেকে নেমে এসে কিছুক্ষণ গ্রান্ড প্লেসের ফ্লোরাল কার্পেট ঘিরে ঘুরপাক করনেওয়ালা পর্যটকদের উল্লাস দেখি। দিন শেষ হয়ে এলেও সর্বত্র মোলায়েম আলো খেলছে প্রচুর। তাতে মচ্ছবের আমেজ এসেছে ট্রাইপডওয়ালা ক্যামেরাম্যানদের আচরণে। টানা চার ঘণ্টা খুব কনসেনট্রেটেডভাবে ফ্লোরাল কার্পেট তৈরিতে মেহনত করে এঞ্জেলিক ক্লান্ত। তার খিদে পেয়েছে। সে ডিনার না করে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে চায় না। যেহেতু তার ডেরাতে রাত কাটাতে যাচ্ছি, তাই সৌজন্যবশত আমি লুকাস ও তাকে ডিনারে নিয়ে যেতে চাই। মরোক্কান রেস্টুরেন্টের প্রস্তাব করলে এঞ্জেলিক প্রাচ্যদেশীয় খাবারের মসলাদার খোশবুর কথা ভেবে এক্সাইটেড হয়। গ্রান্ড প্লেসের মিনিট তিরিশেকের হাঁটা দূরত্বে আছে ব্রাসেলসের মরোক্কান পল্লী মলেনবেক। ওদিকে যাওয়ার ডিরেকশন মৌখিকভাবে দিয়ে লুকাস কেটে পড়তে চাইলে– এঞ্জেলিক অনুনাসিক স্বরে আবদার করে, 'কাম-অন ম্যান, বেচারা সুলতান কতদূর সিয়েরালিয়ন থেকে এসেছে, লেটস হ্যাভ অ্যা মিল টুগেদার।' লুকাস মিনমিনিয়ে কী যেন একটা অজুহাত দিতে গেলে আমিও তাকে অনুরোধ করি, 'ইউ রোউট এন ইনফরমেটিভ আর্টিকেল অ্যাবাউট মরোক্কানস লিভিং ইন মলেনবেক। মূলত তোমার প্রবন্ধ পড়ে আমি ব্রাসেলসে মরোক্কান পল্লীটি দেখতে আগ্রহী হয়েছি। সো প্লিজ টেক আস টু মলেনবেক।' অনিচ্ছায় পথ দেখিয়ে আমাদের সামনে খুব নিরাসক্তভাবে হাঁটে লুকাস।

এঞ্জেলিক আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলে, 'সিয়েরালিয়ন থেকে ফিরে আসার পর থেকে সে এ রকমের মুডি আচরণ করতে শুরু করেছে।' আমি কোনো জবাব না দিয়ে চোখের ইশারায় এঞ্জেলিককে বলতে চাই– লুকাসের উপস্থিতিতে আমি তার সঙ্গে এ ধরনের সেনসেটিভ কথাবার্তায় এনগেজ হতে চাই না। সে ঠোঁট বেঁকিয়ে অবজ্ঞা করার ফেমিনিন ভঙ্গি করে।

গ্র্যান্ড প্লেস ছাড়িয়ে একটি ব্লক অতিক্রম করতেই দেখি মধ্যবিত্তদের এক সাদামাটা আবাসিক এলাকার পার্কিং লটজুড়ে বাজছে মস্ত মস্ত সাউন্ড বক্সে স্টেরিও। মন চনমন করা সুর-তালে নাগরিকরা মেতেছে নৃত্যে। অবস্থা দেখে মনে হয় সারা ব্রাসেলস আজ মেতেছে ফ্লোরাল কার্পেট নির্মাণের আনন্দে। জোড়ায় জোড়ায় যুগলরা স্টেপ ফেলে ছন্দিত দেহে নিমজ্জিত হয়েছে নারী।

স্ট্রিটের দু'পাশে পরপর কয়েকটি মরোক্কান রেস্তোরাঁ। আমাদের কেউ একজন যেন দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি, আর লুকাস অনুগ্রহ করে অনিচ্ছায় আমাদের নিয়ে এসেছে ডেন্টিস্টের চেম্বারে, এ রকম ভঙ্গিতে সে আমাদের নিয়ে ঢুকে পড়ে একটি রেস্তোরাঁয়। ক্যানোপির চাঁদোয়াতলে সাজিয়ে রাখা অনেকগুলো বেতের সোফা। কাবাবের সুরভি নাকে লাগতেই বাতাসে এরোমা শুঁকে এঞ্জেলিক বলে, 'লেটস হ্যাভ গুড টাইম উইথ ওরিয়েন্টাল ফুড।' দেখি বেতের সোফায় খুব রিলাক্সড কায়দায় বসে এক মরোক্কান প্রৌঢ় কাপোল সিসা হুঁকায় ধূমপান করছেন। স্যুট পরা আরব বংশোদ্ভূত সুদর্শন পুরুষের চুল পেকে সম্পূর্ণ রূপালি। তার সঙ্গী সম্ভবত কঙ্গোলিজ কোনো গোত্রের এক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা।



নেচে ওঠে কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী

সোয়িং ড্যান্সের রিদমিক আবহে। এঞ্জেলিক দাঁড়িয়ে পড়ে কোমরের ঊর্মি ছড়িয়ে নীরবে জানতে চায়– যুগল ডান্সে কারও আগ্রহ আছে কি-না? 'আই ডোন্ট রিয়েলি হ্যাভ মাচ টাইম, ডিনার সেরেই আই রিয়েলি হ্যাভ টু রান,' বলে এঞ্জেলিকের দেহমনে জ্বলে ওঠা নৃত্যপ্রবণ শিখাতে পানি ঢেলে দেয় লুকাস। তার নিরাসক্ত আচরণে স্যাফয়ার পাথরে আলো পড়ার মতো এঞ্জেলিকের নীল চোখ থেকে ঠিকরে বেরোয় ক্রোধ ও হতাশা মেশানো দ্যুতি। লুকাস আগ বাড়তে বাড়তে বলে, 'আমরা এবার মরোক্কান পল্লী মলেনবেকে ঢুকতে যাচ্ছি। ব্রাসেলসে লক্ষাধিক মরোক্কানের বাস। টু বি স্পেসিফিক, ২০০৭ সালে নেওয়া আদমশুমারিতে নাম ওঠে দুই লাখ চৌষট্টি হাজার মরোক্কান বংশোদ্ভূত মানুষের। তাদের অনেকের জন্ম হয়েছে বেলজিয়ামে।' আমরা চলে আসি মলেনবেকের একটি সড়কে। সড়কে প্রচুর হিজাব পরা নারী দেখে এঞ্জেলিক মন্তব্য করে, 'সিমস লাইক উই আর ওয়াকিং থ্রু অ্যা স্ট্রিট অব মিডিলইস্ট।' আমারও মনে হতে থাকে আমরা যেন চলে এসেছি মুসলিমপ্রধান কোনো দেশে। হাঁটতে হাঁটতে শুনি পথচারীদের আইফোনে বাজছে মাগরিবের আজানের ধ্বনি। আমাদের ঠিক সামনে সড়ক অতিক্রম করছে একটি মরোক্কান পরিবার। দাড়িওয়ালা পুরুষ ঠেলছে খালি স্ট্রলার। পেছনে শিশুর হাত ধরে হাঁটছে খয়েরি রঙের বোরকা পরা

আমাদের দেখতে পেয়ে তারা দু'জনে মাথা মৃদু ঝুঁকিয়ে বাও করেন। রেস্তোরাঁর ভেতর সম্পূর্ণ নির্জন। এঞ্জেলিক খুব উৎসাহ নিয়ে ম্যানুতে খাবারের ছবি দেখে। স্টার্টার হিসেবে চটজলদি পরিবেশন করা হয় সাত ধরনের সিদ্ধ করা সবজিতে তৈরি সালাদের সঙ্গে গরম গরম রুটি। বেশ তারিয়ে তারিয়ে আমরা স্টার্টার চাখি। মেইন কোর্স হিসেবে এঞ্জেলিক ফিশ চারমৌলা বলে গ্রিল করা মাছের সঙ্গে কুসকুসের অর্ডার করে। আমি সবুজ অলিভের সঙ্গে চাকতি করে কাটা লেবু মেশানো তাজিন পদ্ধতিতে রান্না করা চিকেনের কথা ভাবি। এঞ্জেলিক ফিসফিসিয়ে বলে– মেইন কোর্সের পর আমি কিন্তু হেভি একটা ডেজার্ট নিচ্ছি। আমার চাই সিনেমন মেশানো তিন-তিনটি বাকলোবা। তার চোখেমুখে খেলছে এক ধরনের চটুল অভিব্যক্তি। আন্দাজ করি– ফ্লোরাল কার্পেট বুনটের জটিল কাজ সুন্দরমতো সমাপ্ত হওয়ায় সে সেলিব্রেশনের মুডে আছে। আমি 'হাউ অ্যাবাউট অ্যা অ্যারোমেটিক সিসা আফটার দ্য মিল' বললে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার কব্জি চেপে ধরে বলে, 'লেটস গো ফর আ ওয়ার্ম স্মোক।' আমাদের হালকা মুডের মিথস্ক্রিয়া বোধ করি লুকাসের পছন্দ হয় না। সে হুমাস ও রুটির ভেজিটারিয়ান কোর্স টেক-আউট হিসেবে প্যাকেট করে দিতে বলে। স্টাইরোফোমের প্যাকেট হাতে আসতেই সে 'হ্যাভ অ্যা ফেবুলাস ইভিনিং... ইউ টু .' বলে

কবরখানায় শবাসনের ক্রিয়াকলাপে যাতে দেরি না হয় এ অজুহাত দিয়ে উঠে পড়ে। লুকাস চৌকাঠ অতিক্রম করে রেস্তোর-ার বাইরে যেতেই এঞ্জেলিক বিষণ্ন চোখে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'লেট হিম স্ক্রু হিমসেলফ ইন দ্য গ্রেভইয়ার্ড, আমি চাই না তার মুডের জন্য আমাদের সন্ধ্যাটা রুয়িন্ড হোক।' আমি তার চোখের ভাষা পড়ে নিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হাত মুঠো করে ধরে একটু পর তা আলতো করে ঠোঁটে ছোঁয়াই। সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জেলিকের গণ্ডদেশ ভরে ওঠে গোধূলির রক্তিমাভায়।

নিরিবিলিতে আমরা খাবারের স্বাদ চাখি। গ্রিল করা ফিশ চারমৌলা খেতে খেতে মাঝে মাঝে চোখের ঘন পাপড়ি তুলে আমার দিকে তাকাচ্ছে এঞ্জেলিক। মনে হয় তার মনে জমছে কিছু কথা কিংবা কৌতূহল, কিন্তু কীভাবে বিষয়টা পাড়বে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। অলিভ মেশানো চিকেনের স্বাদ চমৎকার, তা তারিয়ে খেতে খেতে অনুভব করি শরীরে হঠাৎ করে জ্বর আসার মতো তার চমৎকার দেহবল্লরীর প্রতি আমার মধ্যে তৈরি হচ্ছে

জবাবে আমি বলি, 'আই ডোন্ট রিয়েলি নো, রেস্তোরাঁর ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করো।' সে এবার আমার চিবুক ছুঁয়ে আবদার করে, 'আই নো ইউ আর অ্যা মুসলিম, ইউ মাস্ট নো দ্য মিনিং, আমাকে গানের অর্থটা বলবে না।' আমি তার হাত মুঠো করে উঠে দাঁড়ালে– সেও আমার শরীর সংলগ্ন হয়ে হেঁটে আসে জানালায়। স্ট্রিট সিঙ্গারদের থালায় আমরা দু'জনে দরাজ হাতে ইউরোর কিছু কয়েন ছুড়ে দেই। খুশি হয়ে কেবল আমাদের দু'জনের জন্য এক বাদক বাঁশরিতে বিশেষ টিউন বাজায়। তন্ময় হয়ে শুনতে গিয়ে খেয়াল করি– আমার হাত আলতো করে পেঁচিয়ে আছে এঞ্জেলিকের কোমর।

সাবওয়ে ধরে আন্ডারগ্রাউন্ডের দুটি স্টেশন পাড়ি দিয়ে আমরা চলে আসি এঞ্জেলিকের অ্যাপার্টমেন্টের কাছাকাছি। স্টেশনের পাশেই ফুটপাত থেকে সামান্য দূরে পার্ক করে রাখা তার মিনিয়েচার মডেলের ইলেকট্রিক কার। কায়ক্লেশে কেবল দু'জনের বসার উপযোগী গাড়িটিকে কিউট দেখায়। আমি



ফ্লোরাল কার্পেট

এক ধরনের আকর্ষণ। লুকাস আমার খুব কাছের লোক, ইবোলা আক্রান্ত সিয়েরালিয়নের কঠিন দিনগুলোতে তার সঙ্গে আন্তরিকভাবে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছি, তার সঙ্গে এঞ্জেলিকের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যাওয়ার আগে তার গার্লফ্রেন্ডের শরীর নিয়ে ভাবা আপত্তিকর মনে হয়। তাই মেয়েটির কাঁধের নিচে ভি শেইপের নিরাবরণ ত্বকে ছড়াচ্ছে লাবণ্যের যে জোছনা, তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি বাকলভা ও মিন্ট টির অর্ডার করি। খানিক পর পরিবেশিত হয় সিসা হুঁকা। তার ছিলিম থেকে ছড়াচ্ছে এপ্রিকটের ফ্লেভার মেশানো তামাকের সৌরভ। চায়ে চুমুক দিয়ে সিসায় দম দিতে গেলে দেখি– কেন জানি অবাক হয়ে এঞ্জেলিক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ঠিক তখনই রেস্তোরাঁর জানালাজুড়ে বেজে ওঠে নানা ধরনের বাদ্য-বাজনা। খোলা শার্সি দিয়ে দেখি– ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে জরির জবরজং পোশাক ও লাল রঙের ট্যাসেল ঝোলানো টুপি মাথায় স্ট্রিট সিঙ্গারদের ছোট্ট একটি দল। তার খুব জোশে বাজায়– 'ওয়া লাললা ফাতেমা/জার রাব্বি গির কালিমা...।' এঞ্জেলিক আমার হাত থেকে হুঁকার নল সরিয়ে নিয়ে জানতে চায়, 'টেল মি দ্য মিনিং অব দিস সঙ।'

ব্যাকপ্যাক কোলে নিয়ে তার পাশে বসলে এঞ্জেলিক স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে বিমর্ষ ভঙ্গিতে জানতে চায়, 'ক্যান আই আস্ক ইউ ওয়ান স্ট্রেইট কোয়েশ্চেন?' আমি মাথা হেলিয়ে সম্মতি দিয়ে বলি, 'প্লিজ গো অ্যাহেড।' ব্লক হয়ে যাওয়া ওয়াটার টেপে হঠাৎ করে তোড়ে জল এসে যাওয়ার মতো আবেগ নিয়ে সে জানতে চায়, 'হোয়াট হেপেন্ড টু লুকাস। সিয়েরালিয়নে সে কী করে সময় কাটিয়েছে? ডু ইউ নো হোয়াই হি লষ্ট ইন্টারেস্ট ইন মি?' আমি সরাসরি এ প্রশ্নের জবাব না দিলে সে মন্তব্য করে, 'ইউ নো দ্য হৌল থিং, বাট ইউ আর নট টেলিং মি দ্য ট্রুথ। নিশ্চয়ই সে কারও সঙ্গে জড়িয়েছে।' কথা না বলে আমি নিশ্চুপ থাকলে সে আমার হাত মুঠো করে চেপে ধরে। তার করতল ছড়াচ্ছে শরীরে জ্বর আসার মতো উত্তাপ। সে আমার চোখে চোখ রেখে জানতে চায়, 'বাঁ গাল ও গলার এক পাশ পুড়ে যাওয়া ব্লন্ড চুলের নারীটি কে? টেল মি হু দ্য হেল ইজ শি?' বর্ণনা থেকে আমি চিনতে পারি এঞ্জেলিক লরা শেলক্রসের কথা বলছে। আমি জবাব দেই, 'লরা সিয়েরালিয়নে ইবোলা রিকভারি প্রোগ্রামে কাজ করছে। এর আগে কয়েকবার সে ইরাকে ত্রাণ সরবরাহের কাজে যুক্ত ছিল।

আগে কয়েকবার সে ইরাকে ত্রাণ সরবরাহের কাজে যুক্ত ছিল। রোড-সাইড বোমার বিস্ফোরণে তার শরীরের বাঁদিকের বেশ খানিকটা ঝলসে গেছে।' তারপর উল্টো জানতে চাই, 'তুমি লরার কথা জানলে কীভাবে?' এঞ্জেলিক জবাব দেয়, 'লুকাসের আইফোনে আমি তার ছবি দেখেছি. নাউ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি উইথ লরা?' আমি রেসপন্সে বলি, 'অনেস্ট টু গড আই ডোন্ট নো, তবে লরা তার কটেজে নানা ধরনের মেডিটেশনের আয়োজন করে থাকে। শুনেছি লোকাস তার সঙ্গে মেডিটেশন প্র্যাকটিস করত।' এঞ্জেলিক এবার প্রশ্ন করে, 'লরা কি হিপনোটিজমের চর্চা করে?' আমি জবাব দেই, 'ইয়েস, শুনেছি সম্মোহনের অনেক কলাকৌশল তার জানা আছে। ইবোলা দূরীকরণের কাজ করতে গিয়ে যারা স্ট্রেসড আউট হয়েছে, এদের কাউকে কাউকে লরা আত্মসম্মোহনের প্রসেস শিখিয়েছে, যাতে তারা স্ট্রেস ম্যানেজ করতে পারে।' এবার হিস্টিরিয়া রোগীর মতো ঝরঝরিয়ে কেঁদে এঞ্জেলিক বলে, 'নাউ আই নো দ্য ট্রুথ, দ্যাট বিচ্ লরা লুকাসকে



মাতংগির ফুটপাতে বেজায় ভিড়

হিপনোটাইজ করেছে, সে এখনও সম্মোহনের ঘোরের মাঝে আছে। দিস ইজ অ্যাবাউট সিক্স মান্থ, সে আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি... আই অ্যাম শিওর কবরখানায় শবাসনে বসে সে লরার ধ্যান করছে। আই রিয়েলি হেইট হিজ মেডিটেশন অ্যান্ড স্টুপিড সেলিবাসি বিজনেস।'

ব্যাকরোড ধরে গলিঘুঁজির ভেতর দিয়ে ভ্রমর গুঞ্জনের মতো ধ্বনি তুলে ছোট্টমোট্ট ইলেকট্রিক কারটি মিনিট বিশেকের মাঝে চলে আসে এঞ্জেলিকের অ্যাপার্টমেন্টের কাছে'। পার্ক করে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে সে আফসোস করে মন্তব্য করে, 'লুকাস আবহাওয়া দূষণ পরিহার করার জন্য পেট্রোলচালিত গাড়ি পছন্দ করে না। তাই খুব আগ্রহ নিয়ে বিদ্যুৎচালিত ছোট্ট এ গাড়িটা কিনেছিলাম। ভেবেছিলাম দেশে ফেরা লুকাসকে হোমকামিং হিসেবে সারপ্রাইজ দেব। সে কিন্তু একদিনও পাশে বসে এ গাড়িটা ট্রাই করেনি। এয়ারপোর্টে আমার চুমো ফিরিয়ে না দিয়ে কোল্ড ভয়েসে জানাল সে সেলিবাসির দীক্ষা নিয়েছে। আই গিভ অ্যা ড্যাম টু হিজ স্টুপিড সেলিবাসি।' তারপর অ্যাপার্টমেন্টের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমার দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে বলে, 'আমি তো সেলিবাসির দীক্ষা নেইনি, কয়েক মাস তার জন্য অপেক্ষা করলাম, নাউ টেল মি হোয়াই শুড আই স্টার্ভ?' আমিও হেসে হালকা মুডে জবাব দেই, 'তোমার অনাহারে থাকার তেমন কোনো কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।' 'হিয়ার ইউ গো', বলে এঞ্জেলিক অ্যাপার্টমেন্টের তালা খুলে।

তার অ্যাপার্টমেন্টটি আয়তনে খুব ছোট্ট। কাঠের হালকা পার্টিশনের ওপারে বেডরুম। ছোট্ট সিটিং স্পেসে শুধু একটি সোফা, তার টিপয়তে রাখা এঞ্জেলিকের ল্যাপটপ এবং জানালার তলায় কিচেনেট ও রেফ্রিজারেটর। ল্যাপটপের পাশেই পাওয়া যায় এনভেলাপে আমার নাম লেখা ইউ-রেল এর কাগুজে টিকিট। শাওয়ার সেরে পিচ রঙের কুঁচকানো সুতি টপের সঙ্গে খাকি কাটআউট প্যান্ট পরে এঞ্জেলিক সিটিং স্পেশে এসে আমার পাশে কাউচে বসে। কথাবার্তার সূত্রপাত ঘটিয়ে আমি বলি, 'লুকাস বলল তুমি নাকি আমার সঙ্গে কী আলাপ করবে?' সে উঠে দাঁড়িয়ে 'ওহ ইয়েস, কাম উইথ মি', বলে আমাকে নিয়ে চলে আসে বেডরুমে। বিছানার উল্টোদিকে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি গাছের মরা ডাল, তাতে বসে দুটি রঙচঙে প্যারাকিট পাখি। ডাল থেকে ঝুলছে তিনটি আফ্রিকান উইভার বার্ডের নীড়। একটি নীড়ে চুপটি করে বসে আছে সোনালি পালকের ছোট্ট একটি উইভার পাখির ছানা। আমি ছানাটিকে কাছ থেকে দেখছি বলে প্যারাকিট দুটি চিঁউ চিঁউ করে প্রতিবাদ জানায়। লুকাসের কাছে শুনেছিলাম এঞ্জেলিকের বার্ড ওয়াচের নেশা আছে। সে তার অ্যাপার্টমেন্টে পুষছে এক জোড়া প্যারাকিট। তাই লুকাস সিয়েরালিয়ন ছেড়ে আসার সময় তাকে উপহার হিসেবে পাঠাই ঝড়ে খসে পড়া তিনটি উইভার পাখির নীড়। নীল চোখে তীব্র কৌতূহল ফুটিয়ে এঞ্জেলিক এবার জানতে চায়, 'নীড়ের সঙ্গে তুমি দুটি পাখির ডিম পাঠিয়েছিলে কেন?' উইভার পাখির নীড় দেখতে অনেকটা আমাদের বাবুই পাখির বাসার মতো। তো একটি নীড়ের খড়বিচালির খাঁজে যে দুটি উইভার পাখির ডিম ছিল তা আমি খেয়াল করিনি। বিষয়টি এঞ্জেলিকেরও প্রথমে নজরে আসেনি। প্যারাকিট পাখি দুটি নাকি নীড়ে ডিমের সন্ধান পেয়ে পালা করে তা দিতে শুরু করে। তা থেকে জন্ম নেয় একটি উইভার বার্ডের

সোনালি ছানা। প্যারাকিট জুটিই নাকি উইভার ছানাটির লালন-পালন করছে। বিষয়টি আমাকে দারুণ অবাক করে। এঞ্জেলিক তাকে ডিম পাঠানোর জন্য বারবার ধন্যবাদ দিলে আমি জানতে চাই, 'সো, আই নো ইউ আর অ্যা বার্ড ওয়াচার, হোয়াট কাইন্ড অব বার্ড ইউ ওয়াচড় লেইটলি?' সে জবাব দেয়, 'গেল সামারে আমি সিরিয়াসলি কিছু বার্ড ওয়াচ করি। বার্নাকোল গুজ বলে এক ধরনের হাঁসের হেবিটাট দেখতে চলে গিয়েছিলাম ফিনল্যান্ডে। এ প্রজাতির হাঁস নর্থ আটলান্টিকের শুধু আর্টিক আইল্যান্ডগুলোতে ব্রিড করে থাকে। এরা নীড় বাঁধে পাথুরে পাহাড়ের সুচালো রক আউটক্রপিংয়ে। তো আমাকে ক্লাইম্ব করে উঠে যেতে হলো রক ফরমেশনের ওপর। ওখানে বসে দেখলাম মা বার্নাকোল গুজরা তাদের ছানাদের পাথুরে চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে নিচের লেয়ারে নামা শেখাচ্ছে।' বেডরুম থেকে সিটিং স্পেসে এসে কাউচে বসতেই লাজুক মুখে এঞ্জেলিক বলে, 'ইউ সেন্ড মি সাচ অ্যা বিউটিফুল গিফট, এগস্ অব আফ্রিকান উইভার বার্ড... আমি কি বিনিময়ে তোমাকে কিছু গিফট করতে পারি?' আমি রেসপন্সে বলি, 'টেল মি হোয়াট আইডিয়া ইউ হ্যাভ ইন ইয়োর মাইন্ড।' সে নতমুখী


ডিলিরিয়াম ক্যাফেতে বিয়ারের পাত্র হাতে তরুণী

হয়ে বলে, 'দেয়ার আর মাউন্টেনস ইন বেলজিয়াম, তুমি চাইলে পুরো একটি উইকএন্ড আমরা হাইক করে ওয়াচ করতে পারি অভিবাসী পাখিদের উড়ে যাওয়া ঝাঁক।' শৌখিন বার্ড ওয়াচার আমি, প্রস্তাবটি চমৎকার কিন্তু ঠিক পজিটিভভাবে সাড়া দিতে পারি না। আমার দেহমনে খেলছে ইবোলার এপিসেন্টার থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়ার এনার্জি। বেলজিয়ামে সময় কাটানোর আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমি রেলগাড়িতে চড়ে ফ্রান্স পাড়ি দিয়ে ঢুকে পড়তে চাই ইতালিতে। ট্রেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। তাই আমি হাঁটুর কন্ডিশন ভালো নয়, এ অজুহাতে হাইকিংয়ের প্রস্তাব ইগনোর করে বলি, 'ক্যান আই সাজেস্ট অ্যান অলটারনেটিভ গিফট?' সে 'হোয়াট' বলে নীল চোখে দ্যুতি জ্বেলে তাকালে আমি বলি, 'মে আই টেক ইউ আউট টু নাইট?' এঞ্জেলিক উচ্ছ্বসিত হয়ে জবাব দেয়, 'দ্যাটস্ ইজি, লেটস গো', কোনো সমস্যা নেই আমি তোমাকে রাতের ব্রাসেলস এক পাক ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি এখনই।

আন্ডারগ্রাউন্ডের সাবওয়ে চড়ে আমরা মিনিট বিশেকে চলে আসি গ্র্যান্ড প্লেসের প্রান্তিকে। হাঁটতে হাঁটতে দেখি কিছু দোকানের ভেতর থরে থরে সাজিয়ে রাখা অ্যান্টিক ও শিল্পিত হোম ডেকোরেশন। পরপর কয়েকটি চকোলেটের দোকান। একটি দোকানের ছাদে ঝুলছে হোয়াইট চকোলেটে তৈরি তিনটি ছুটন্ত রেইন ডিয়ার। এঞ্জেলিক ওদিকে তাকিয়ে 'ম্যান, লুক অ্যাট দি ক্রেজি লুকিং চকোলেট শপ' বললে আমি তার হাত ধরে ঢুকে পড়ি ওখানে। আমাদের বিনা পয়সায় চকোলেটের স্যাম্পল চাখতে দেওয়া হয়। আগামীকাল সকালে এঞ্জেলিকের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কথা ভেবে আমি কিনে নেই ইকুয়েডর থেকে আমদানি করা এক প্যাকেট সুস্বাদু ডার্ক চকোলেট। আরও ব্লক দুই হেঁটে অবশেষে আমরা ঢুকে পড়ি ডিলিরিয়াম ক্যাফেতে।

ডিলিরিয়াম নামে ক্যাফে হলেও আদতে ব্রাসেলসের বিয়ার পানের একটি মশহুর পাব। এর অবস্থান মাটির একটু নিচে আঠারো শতকে তৈরি একটি দালানের বেজমেন্টে। ঢোকার মুখে দেখি চৌকাঠের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা ক্যাফের প্রতীকী মাসকট গোলাপি রঙের হাতি। আসা-যাওয়ার পথে, পাঁড় মাতালরা তার শুঁড় জড়িয়ে ধরে আদর করছে। ক্যাফের ভেতরে খুবই ব্যতিক্রমী কিসিমের সজ্জা। চতুর্দিকে ছড়ানো বিয়ার ফারমেন্ট করার অনেকগুলো ব্যারেল। ছাদে গেঁথে রাখা রকমারি সব পরিবেশনের ট্রে। পেছন দিকে আধো অন্ধকার স্টেজে লাইভ বেন্ডে বাজছে জনপ্রিয় গায়িকা বিয়ন্সের গাওয়া 'ড্রাংক ইন লাভ' গানটি। শোনামাত্র এঞ্জেলিক খুব কাছে ঘেঁষে আমার শরীর ছুঁয়ে সুর মেলাতে শুরু করে, 'লাস্ট থিংক আই রিমেমবার ইজ আওয়ার বিউটিফুল বডিজ গ্রাইনডিং আপ ইন দ্য ক্লাব/ড্রাংক ইন লাভ...।' প্রতিদানে আমি তার কোমর পেঁচিয়ে ধরলে দীর্ঘ চুল-দাড়িওয়ালা জলদস্যুদের মতো দেখতে বিশালদেহী এক বারটেন্ডার আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরিচিত হন। নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে ফ্লেন্ডার সম্প্রদায়ের এ দশাসই ভদ্রসন্তানের নাম জেসপার ব্রেন্ট। তার কাঁধে বসে একটি কাকাতুয়া সমস্ত কিছু নজর করে দেখছে। জেসপারের মাতৃভাষা ডাচ, আদতে উত্তর বেলজিয়ামের লোক। মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি ইসপানিওল, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় খদ্দেরদের আপ্যায়ন করে থাকেন। একটি টেবিলে বসিয়ে সদ্যাগত হিসেবে তিনি

আমার দিকে বিশেষ নজর দিয়ে ডিলিরিয়াম ক্যাফেতে পান-াপানের জন্য কী কী পাওয়া যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিররণ দেন। জানা যায় যে, আজ রাতে এখানে মজুদ আছে মাত্র দুই হাজার চৌষট্টি কিসিমের বিয়ার। বিশ্বাস না হলে আমি বইপত্র ঘেঁটে দেখতে পারি, ২০০৪ সালে তামাম দুনিয়ার ষাটটি ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা দুই হাজারের ওপর ভ্যারাইটির মজুদের জন্য এ ক্যাফের নাম গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে ওঠে। আমি ইবোলা আক্রান্ত একটি দেশ থেকে এসকেপ করে এসেছি শুনে তিনি কাকাতুয়াটি আমার কাঁধে বসিয়ে দিয়ে আমাদের জন্য নিয়ে আসেন স্পেশাল ড্রিংকস, তা পরিবেশিত হয় বিশাল আকারের একটি কাচের মগে– যা দেখতে ছোটখাটো বুট জুতার মতো। সোনালি আরেকটির নাম চিমানি বিয়ার। জেসপার ব্রেন্ট 'ওয়ান অব দি বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' বলে নাটমেগের মসলা মেশানো ফেনা ওঠা তরলে শর্টগ্লাসে করে ঢালেন খানিকটা আইরিশ হুইস্কি। তারপর ফিসফিস করে বলেন, ডিলিরিয়ামের ট্র্যাডিশন হচ্ছে– মগটি বটমস আপ করে পরস্পরকে বলতে হবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া ছোট্ট একটি পার্সোনাল সিক্রেট। সিক্রেটটি এমন হতে হবে, যা তোমরা তোমাদের পার্টনারের সঙ্গে কখনও শেয়ার করোনি।

নিজের সম্পর্কে সিক্রেটটি কে প্রথম বলবে তা নিয়ে সমস্যা হলে আমরা একটি কয়েন টস করি। এঞ্জেলিকের পালা এলে সে লাজুক মুখে বলে, 'ইস্ট ইউরোপ থেকে বার্ড ওয়াচ করে ফিরছিলাম রাতের ফ্লাইটে। ইস্তাম্বুল থেকে ওঠে টার্কিশ এক যুবক। পাশাপাশি বসেছি, প্লেন টেক অফ করতেই পরিবেশিত হয় কমপ্লিমেনটারি ড্রিংকস। কথাবার্তায় জানতে পারি– জার্মানির মিউনিখে অভিবাসী এ অত্যন্ত সুদর্শন যুবক মাস দেড়েকের ভ্যাকেশনে ইস্তাম্বুল ফিরে গিয়েছিল বিয়ের কাজ সম্পন্ন করতে। সে পার্স থেকে বের করে তার কনের ছবিও দেখায়। তখনই কেন জানি মনে হয়– তাকে যদি অল্প করে হলেও স্পর্শ করা যেত। কেবিনের বাতি নিভে যেতেই আমরা গায়ে কম্বল জড়াই। তখনই তার একটি হাত ছুঁয়ে যায় আমার বাহু। আমার ভেতরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। আমি তার ছোঁয়াতে মৃদুভাবে সাড়া দিতেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে চুমো খায় আমার ঠোঁটে।' আমি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাই, 'ওয়াজ দ্যাট অল এঞ্জেলিক?' সে অনেকখানি বিয়ার এক ঢোকে পান করে বলে, 'হোয়াই ইউ থিংক ইট ওয়াজ অল। অবকোর্স ফ্লাই করতে করতে আমাদের শরীর পরস্পরের কাছাকাছি আসে। মাঝরাতে প্লেন থামে জুরিখ বিমানবন্দরে। চার ঘণ্টা পর তার মিউনিখের দিকে কানেকটিং ফ্লাইট। আমি ব্রাসেলসের দিকে উড়ব আরও ঘণ্টা তিনেক পর। অ্যান্ড বিলিভ মি উই মেড দ্য ওয়ান্ডারফুল ইউজ অব আওয়ার টাইম টুগেদার ইন জুরিখ এয়ারপোর্ট।' আমি এবার জানতে চাই, 'কী করেছিলে? তোমরা একত্রে ডিনারে গেলে?' 'ওহ হেল নো,' বলে ঠোঁট বাঁকিয়ে এঞ্জেলিক বলে, 'শেষ রাতের নিরিবিলি বিমানবন্দরে সিঁড়ির নিচে যেখানে জেনেটাররা তাদের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইত্যাদি রাখে তার আড়ালে পরস্পরের আরও কাছে আসি আমরা।' 'হাউ ওয়াজ ইট এঞ্জেলিক?' বলে আমি উদগ্রীব হয়ে তাকালে সে আমার কব্জিতে চাপ দিয়ে বলে, 'ইট ওয়াজ সো ড্যাম গুড অ্যান্ড রিফ্রেশিং যে আমি আমার স্টুপিড বয়ফ্রেন্ড বর্তমানে সেলিবাসি করনেওয়ানা লুকাসকে তা বলার প্রয়োজন বোধ করিনি, বিকজ ইট ওয়াজ ভেরি সেটিশফাইয়িং।' আমি গল্পকে আরও দীর্ঘায়িত করার জন্য জানতে চাই, 'অ্যানিথিং ইউ রিগ্রেট অ্যাবাউট দিস রোমান্টিক এনকাউন্টার?' সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দেয়, 'হেল নো, নট রিয়েলি... আততায়ীরা যে রকম কপাট ভেঙে ঢুকে পড়ে ভিকটিমের বেডরুমে– সে রকম ডাকাতসুলভ ভঙ্গিতে সে পেছন থেকে ঢুকে পড়ে আমার ভেতরে। শুধু একটাই আফসোস... ওই সময় খুব ইচ্ছা হচ্ছিল চোখে চোখ রেখে চুমো খাই অজানা সেক্সি টার্কিশের সুপার হ্যান্ডসাম মুখে।'

আমার পালা এলে আমি দুবাই বিমানবন্দরের একটি ঘটনা বেছে নেই। আমেরিকা থেকে উড়ে যাচ্ছি ফিলিপাইনের মিন্ডানাওতে। দুবাইতে আট ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। সহযাত্রী আফগান তরুণীটি আমেরিকা থেকে আমার পাশে বসেছে। স্পষ্টত সে কোনো কারণে আপসেট হয়ে আছে। আমি আফগানিস্তানে বসবাস করেছি শুনে সে জানতে চায় ওখানকার বিষয়-আশয়– বিশেষ করে কান্দাহারে অবিবাহিত মেয়েদের লিভিং কন্ডিশন। আমি চার ঘণ্টার জন্য রিটায়ারিং রুম ভাড়া করলে সে আমার সঙ্গে আসে শাওয়ার নিয়ে একটু ফ্রেশ হতে।' 'হাউ ওয়াজ ইট, টেল মি অল,' বলে এঞ্জেলিক কৌতূহল দেখালে আমি জবাব দেই, 'হার আইজ ওয়ার ভেরি ডার্ক, খুব ছোটবেলা মেয়েটি আফগানিস্তান ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে মা-বাবার সঙ্গে ইউরোপে আসে। ওখানে যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হলে পরে তার পেরেন্ট ফিরে যান কান্দাহারে। কিন্তু ফেরার দিন সে রান-এ-ওয়ে হয়ে পালিয়ে যায়। তার পর কীভাবে যেন এক বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে পাড়ি জমায় আমেরিকায়। মাস কয়েক লিভ টুগেদারের পর তাদের ছাড়াছাড়ি হলে সে আমেরিকান ইমিগ্রেশনের পাল্লায় পড়ে। তারা তাকে ডিপোর্ট করতে চাইলে সে স্বেচ্ছায় ফিরে যাচ্ছে আফগানিস্তানে।' 'ইউ ফরগেট টু টেল মি দ্য মেইন থিংক, দ্য ডার্ক সিক্রেট, হাউ ওয়াজ ইট?' বলে এঞ্জেলিক কৌতূহল ছড়ালে আমি জবাব দেই, 'না, বলার মতো বিশেষ কিছু হয়নি আমাদের মাঝে। রিটায়ারিং রুমে ঢুকে সে প্রথমেই একটি সিগারেট ধরায়। তারপর প্যাকেটটি দলামোচা করে ফেলে সে সাবান মেখে শাওয়ার নেয়। কারণ আমেরিকা থেকে আসার পথে সে প্লেনে বেশ খানিকটা ড্রিংক করেছে। খুব নার্ভাস হয়ে আছে সে– কান্দাহারে পৌঁছার পর যদি তার মা বা পরিবারের অন্য কেউ তার গায়ে অ্যালকোহল বা সিগারেটের গন্ধ পায়। মাকে সে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়। তার যখন প্রথম বয়ফ্রেন্ড জুটে তখন মা তাকে বেধড়কভাবে পিটিয়েছিল। তো সে কাউচে আধশোয়া হয়ে নার্ভাসভাবে বলে যে, তাকে কান্দাহারে সময় কাটাতে হবে একেবারে স্মোক না করে, তখনই তার দীর্ঘ চুল ছুঁয়ে যায় আমার কাঁধ। শি ওয়াজ সো আপসেট। বাড়ি ফিরলেই হয়তো তার মা-বাবা তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে; শি ওয়াজ টোটালি স্ট্রেসড, ইয়েস, আই কিসড হার গুডবাই। নো, দেয়ার ওয়াজ নট এনি রোজওয়াটার স্মেল অন হার চিক, চুমো খেতে গিয়ে চোখের জলের তপ্ত নোনা স্বাদে ভরে উঠেছিল আমার ঠোঁট।'

জেসপার ব্রেন্ট ড্রিংকস নিয়ে এসে বিয়ারের মগে আইরিশ হুইস্কির শট ঢেলে দিয়ে বলেন, 'ইউ হ্যাভ অ্যাবাউট থার্টি মোর মিনিটস টু বটমস আপ।' বুঝতে পারি রাত বারোটার দিকে ডিলিরিয়াম ক্যাফে বন্ধ হয়ে যাবে। সোনালি ফেনায় ঠোঁট ভরিয়ে নিয়ে এঞ্জেলিক আমার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বলে, 'আর ইউ অ্যা কোল্ড ফিশ অর হোয়াট?' আমি হেসে জবাব দেই, 'কোল্ড ফিশ না, টার্মটি হবে ওয়েট ক্যাট, ভেজা বিড়াল বলা চলে।' লাইভব্যান্ডে এবার বাজছে বিয়ন্সের আরেকটি গান, 'টু নাইট আই অ্যাম গোনা ড্যান্স ফর ইউ/আই অ্যাম গোনা পুট মাই বডি অন ইয়োর বডি/বয় আই লাইক ইট হোয়েন ইউ ওয়াচ মি...।' এঞ্জেলিক জোরালো ঢোকে অনেকখানি বিয়ার পান করে আমার হাত টেনে ধরে বলে, 'কাম-অন ওয়েট ক্যাট, লেটস ড্যান্স।'

আমাদের পা টলছে, স্টেপ ফেলতে গিয়ে পরস্পরের ওপর ঢলে পড়ছে শরীর, এ হালতে বেশিক্ষণ ড্যান্স করা যায় না। তো ক্যাফে থেকে বেরিয়ে আসার পথে এঞ্জেলিক বলে, 'আমি লেবু ও পুদিনা পাতার ফ্লেভার মেশানো চকোলেট বার খাওয়ার মুডে আছি। চলো, তোমাকে ছোট্ট একটি দোকানে নিয়ে যাই, এটি মাঝরাত অব্দি খোলা থাকে।' অতঃপর আমরা চকোলেটেরিয়ার তল্লাশে ব্লকের পর ব্লক হাঁটি। কিন্তু এঞ্জেলিক কিছুতেই খুঁজে পায় না মাঝরাতে চকোলেটের ছোট্ট দোকানটি। একসময় দেখি হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি গ্র্যান্ড প্লেসে। ল্যাম্পপোস্টের তলায় আজস্র ফুলের কার্পেটটিচবির ক্যাপশন নিশুতি রাতের তীব্র নির্জনতায় যেন অপেক্ষা করছে গ্রহান্তর থেকে আসা দেবদূতের। এঞ্জেলিক একটি বেঞ্চে বসে পড়ে বলে, 'আই অ্যাম টু টায়ার্ড,' আমি তার পাশে বসে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকি ফুলের ফরাসের দিকে। তার মাথা ঝুলে পড়ে ছুঁয়ে যায় আমার কাঁধ। ❖



উপন্যাস

বুলবুল চৌধুরী

কহ তব

মাটির প্রকারভেদে এক এক অঞ্চলে যেমন এক এক ধারার আবাদ ওঠে, গাছগাছালির বেলায়ও প্রজাতির তেমন লক্ষণ বিরাজমান। শুধু কি তা-ই! ওই আবহে দূরের তো দূরের, পাশাপাশি এলাকায় লালিত-পালিত অধিবাসীরাও আলাদা ধরন-ধারণ পেয়ে থাকে।

তবে নিজেকে চেনার মতো আত্মানুসন্ধান দিয়ে নয়, এই বোধ শাহাদাত মিয়ার একখানা উক্তির বদৌলতে আরমানের ধার্যে এসেছে। শেষবারে বোলদিয়া গ্রামে পিতৃকুলের আদিনিবাসে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, আন্দাজ করি, লাল মাটি হওনে এইহানকার মানুষগুলান চলে উড়া-পিটা স্বভাবে। আবার দেখতে পাইবি উজানি খালের পুব পারের ঝুরঝুরা বাল্লা মাটির হেরা কেমুন তমিজের।

মিয়াদের পুরান বাড়ির কাজে দিনমান পার করে দিলেও আরমান রাতের ঘুম পুরা করে তাদের উজানি খালের পুব পারের নতুন বাড়িতে। তবে পাখি-ডাকা বিহান লাগতেই সে শয্যা ছাড়ে। তারপর উজানি খাল পাড়ি দিয়ে তাকে যেতে হয় মাইল আধেক পশ্চিমে বোলদিয়া গ্রামে। সেখানকার পুরান বাড়িতে সকালের আলো ফুটে উঠবার সময়ে মিয়াদের দুধের গাইগুলোর দোহানো দুধ নিতে আসে নগেন্দ্র ঘোষের কর্মচারী গোপাল ঘোষ। কোনো কোনো দিন কয়েক ঝাঁকা শাকসবজি, ফল, হাঁস-মুরগির ডিম বেচতে তাকে যেতে হয় দড়াবান্ধা বাজারে। সেখান থেকে ফিরে গরু-ছাগল চরানো, হাঁস-মুরগির খাবার জোগান দেওয়া ছাড়াও চাষবাসের কাজেও সে কামলাদের পিছু লেগে থাকে। কেননা, সুযোগ পেলেই এ বাড়ির অনেকে হাত-পা গুটিয়ে আলস্য পোহায়। তবে দুপুরের দিকে দৌড়ঝাপে ভাটা নামলে খাওয়া-দাওয়া সেরে পুব দিকের কোঠাঘরের বিছানায় ভাত-ঘুমের চাইতেও বেশিক্ষণ গড়াগড়ি যায় আরমান। আজ ঘুম ভাঙতেই তার কানে পৌছল তাস খেলারত বুড়ো কাছেদ আলীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। সে বলল, যা, তেইশে ডবল...।

যতক্ষণ ঘুম, ততক্ষণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবহমান সত্ত্বেও জীবনের অতীত, বর্তমান, কি ভবিষ্যৎ চেতনা হারায়। কিন্তু জাগর অবস্থায় যে কারও চৈতন্যে জীবনের হরেক কিসিম আঁক কাটতে পারে। তাই বুড়োর কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আরমানের মনে পড়ল মাটিভেদে মানুষের লক্ষণ বদলে যাওয়াবিষয়ক শাহাদাত মিয়ার নিরীক্ষণটুকু। সেই বিচার মাঝেমধ্যেই সে বিবেচনায় নেয়। এখন বিছানা ছেড়ে ঘরের দুয়ার ডিঙাতেই সর্বাগ্রে পুবমুখী বারান্দার দক্ষিণ দিকে তার দৃষ্টি গেল। সেখানকার মেঝেতে পাতা খেজুরপাতার পাটিতে বসে কাছেদ আলী ও তার বড় ছেলে হরমুজ একপক্ষ হয়ে তাস খেলছে। বিপক্ষে দু'জনের একজন হলো হরমুজের পিঠাপিঠি বোন জয়তুনের স্বামী নেকাবউদ্দিন আর প্রতিবেশী যুবক জমসর। দর্শকের সারিতে আছে হরমুজের বড় ছেলে মোদাব্বর ও নেকাব্বরের ছেলে জোবেদ। কাছেদ আলী তার উপস্থিতি টের পেয়ে জিজ্ঞেস করল, ঘুম বুঝি ভাঙল তোমার?

হঁ দাদা, উঠলাম।

এই জবাব টেনে আরমান বসল দরজার দক্ষিণ দিকে পাতা লম্বা বেঞ্চখানায়। দলটার দিকে তাকিয়ে শাহাদাত মিয়ার উক্তিখানা ফের সে মনে মনে মিলিয়ে নিল। হ্যাঁ, তাই তো ব্যাপার। এখানকার প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই তাসের আড্ডা হয়। তারা টোয়েন্টি নাইনের হার-জিতে কখনও বিড়ির প্যাকেট, কখনও এক-দুই টাকা বিনিময় করে। অথচ ঘন গাছগাছালিতে ছাওয়া উজানি খালের পুব পারের এলাকায় তাস খেলার প্রচলন থাকলেও কম লোকই তাতে হুমড়ি খায়। অন্তরে অমন বিচার এসে যেতেই সে যেনবা নিজের অজান্তে বলে উঠল, কথায় আছে তাসে নাশ। হেও ক্যান যে ওইতেই গড়াগড়ি।

কাছেদ আলী উত্তর করে, বাহে রে, কাম-কাইজের অবসর বুইঝাই তাস খেলি। কত্ত কইলাম, হিগ খেলাডা। হিগলে মালুম পাইতা এইতে কেমুনের নেশা।

অদৃশ্যের লেখনে নিরতিশয় অপমান এবং বেদনা কবলিত জীবন আরমানের। ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে নিশ্চয়ই তার মা সুজুনি বেগম আত্মহত্যা করবে। অন্যে কোত্থেকে জানবে তার সেই পীড়নের কাছে তাসের নেশা কোনো মূল্যই বহন করে না। আবার যুক্তি-তর্ক দিয়ে এই মানুষগুলোর পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। কেননা, নদীতে ভাসমান নৌকা প্রবল ঝড়-ঝাপটায় গোত্তা খাওয়ার মতোই তারা তাসের নেশায় একাত-ওকাত হয়। অনেকেই বউ পেটানো ছাড়াও তালাক দেওয়ার ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটায়। বয়স কিংবা সম্পর্কের বাছ-বিচার ছাপিয়ে অনেক নারী-পুরুষ পাশাপাশি বসে হুঁকো টানে। বাচ্চাদের স্কুলে দেওয়া গেলেও খুব কম জনের বিদ্যা এগোয়। কিন্তু ওপারের প্রায় প্রত্যেক ঘরে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে। বোলদিয়ার তুলনায় উজানি খালের পুব পারে সচ্ছল গৃহস্থের সংখ্যা বেশি। টেকজঙ্গলে ছাওয়া বোলদিয়ার কঠিন লাল মাটিতে গাছপালা জন্মালেও পানির অভাবে আবাদ ওঠানো যায় না। বর্ষাতল হওয়া কিছু জমিজমা যা আছে তাতে আমন-খামা ধান অবশ্য ফলে। বিনিময়ে বছরের খোরাক মেটানো দায় বলেই তারা এগ্রাম-ওগ্রামে কামলার কাজে যায়। আসলে অভাবের ধকল সইতে গিয়েই বোলদিয়ার মানুষজন জীবনের চইন খোয়ায়। ভাবনার অমন অতলে পৌঁছে আরমান খেয়াল করে, তাসের আসর ছেড়ে মোদাব্বের এসে দুয়ারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আরমান জিজ্ঞেস করল, কি রে, আইজ যেমুন তুই খেলায় নাই?

কাকা গো।

কী?

ফাঁকে-ফোঁকে তাস লইয়া বইলেও হেগো মতো আমি গাবুইরা না।

মোদাব্বেরের মা স্বপ্ন দেখে ছেলে লেখাপড়া শিখে চাকরিতে ঢুকবে। এক্ষেত্রে আরমান উৎসাহ জুগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, গৃহশিক্ষক হয়েও তাকে পড়িয়েছে। কিন্তু পরপর দু'বার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেও পাসের খাতায় মোদাব্বেরের নাম আসেনি। পরিণতিতে নিজের ব্যর্থতায় তৃতীয়বার সে ওদিকমুখো না হবার ঘোষণা দিয়েছে। পড়াশোনায় তার আগ্রহ এবং অধ্যবসায়ের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু সমস্যা হলো নিজ থেকে সে বিশেষ কিছু লিখতে পারে না। পড়া মুখস্থ করলেও দু-একদিনের মাথায় সবই গুবলেট পাকায়। তবে এমন ছাত্র আবার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে কামিয়াব হবার খবর অনেক স্কুলেই আছে। সেদিক ভেবে আরমান বলে, লেখাপড়া আবার তুই শুরু করলে পারস।

হঁ কাকা।

হঁ কি রে? যাবি তাইলে স্কুলে?

যামু।

তর মায়রে কইছস?

না।

ক্যান?

আমি মায়ের লগে রাগ।

আরমান চমকে জানতে চায়, ক্যান?

টের তো পাও নাই, গোলাপিরে বিয়া করনের লাগি বারেবারে মায় আমারে কেমুন বেইড়া বেইড়া ধরে।

মাঝ ফাল্গুনের আকাশে ইতিউতি ছিন্ন মেঘের ওড়াউড়ি যদিও, তা ছাপিয়ে বৃষ্টি গড়াবার নয়। তবে দোহারা গড়নের এই সুদর্শন ও দীর্ঘকায় যুবক মোদাব্বেরের সুমতিতে আরমানের মনের আকাশে খুশির ঢল নামে। তাই সে জবাব দেয়, তর কি আর হেমুন বয়স হইছে যে, এখনই বিয়া করন দরকার।

কাকা গো।

কাকা গো।

কী?

তুমি এইডা মায়রে বোঝাও।

কমুনে তর মায়রে।

মিয়াদের পুরান বাড়ির পুব দিকের বিস্তৃত চটানে মৌসুমের ধান মাড়াইয়ের ধুম লাগে। তারই আশপাশে তাদের ছ-খানা গোয়ালঘর, পাঁচখানা গোলাঘর আর খড়ের কয়েকটা মস্ত গাদার অবস্থান। সেখানকার চাঙ্গারিতে দেওয়া ঘাসে গরু-ছাগলগুলো মুখ লাগিয়েছে। ভিটেবাড়ির শেষ পুব সীমানা ছড়ানো বাঁশঝাড়ের হাজারো বাদুড় দিনমানে আস্তানা গাড়ে। এমন দৃশ্য এলাকার অন্য কোথাও নেই। সন্ধ্যা লাগামাত্রই নিশ্চয় নিশাচর প্রাণীর কোনো কোনো দল উজানি খালের পুব পারে উড়ে গিয়ে মিয়াদের নতুন বাড়ির ফল খেয়ে আসে। বাঁশঝাড়ের পেছন দিকটায় টগুইরা বিলের মিয়াদের চড়ানো হাঁসগুলো মাঝেমধ্যেই প্যাঁক প্যাঁক ডাকে নির্জনতা ভঙ্গ করে। এখন যেন কোত্থেকে দু-ঝাঁক কানি বক ও একঝাঁক সাদা বক উড়ে এসে পড়ল সেখানে। এই বাড়ির চৌদিকে আম, জাম, কাঁঠাল, বেল, লিচু গাছ এবং তাল গাছ চারখানা কোঠাঘরকে আড়াল দিয়েছে। কোথাও কোথাও কতবেল, জাম্বুরা, তেঁতুল, নিম, শিমুল ছাড়াও কয়েক রকমের গাছপালা মাথা তুললেও সংখ্যার হিসাবে বড়জোর গোটা চল্লিশেক হবে। বিকেলের এই সময়টা সেসবের ডালে ডালে পাখিরা যেমন ভিড় করে আসে, কূজনে কূজনেও যেন ভরিয়ে দেয় আশপাশ। তারই মাঝে আছর ওয়াক্তের আজান শুরুর, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' ধ্বনি কানে এল। তার পাশে বসা মোদাব্বের বলল, কাকা, নমাজের সময় হইল।

আরমান দাঁড়ায়। এ বাড়ির কেউ নিয়মিত না হলেও মোদাব্বের ঠিকই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। জুম্মাঘরের পথে পা বাড়ানোর মুহূর্তে তাসের আড্ডার দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, নামাজে যাওনের কেডা কেডা?

এতে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে কাছেদ আলী উত্তর করল, যাও তুমি, আমি পাড্ডিডা মাইরাই তাইতাছি।

আরমান হতাশ স্বরে জবাব দিল, হেইসমে গিয়া তো তুমি নামাজ পাইবা না দাদা।

এইতে কী, কাজা পড়লেই হইল।

আরমান চুপ করে যায়। তাকে কে বোঝাবে যে, উপায় থাকা সত্ত্বেও নামাজে না দাঁড়িয়ে পরে কাজা পড়লে তা খোদার দরবারে মঞ্জুর হয় না। এখানকার মানুষগুলোর ধর্মে মন কম। তাদের অনেকেই আজান শুনে কখনও-সখনও মসজিদে যায় অবশ্য। তবে জুম্মাবারে দলবেঁধেই সেখানে জমায়েত হয়। এতে ভাবতে হয়, কী আর করা! তাই সে মোদাব্বেরকে নিয়ে বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জুম্মাঘরের দিকে এগোয়। সেখানে পৌঁছে লাগোয়া পুকুরের বাঁধানো ঘাটলায় বসে দু'জন অজু সারে। তাদেরসহ এগারোজন নামাজি ইমামের পিছনে দুই কাতার হয়ে আছর ওয়াক্তের নামাজ আদায় করল। বাইরে বেরিয়ে মোদাব্বের ডাকল, আইও আমার লগে।

কই?

আমার মায়ের সামনে।

জুম্মাঘর পেছনে ফেলে তারা ঢুকল ভেতরবাড়িতে। এখানকার উত্তর-দক্ষিণ এবং পশ্চিমের চারখানা কোঠাঘরে দূর অতীতে মিয়াদের বসবাস ছিল। বর্তমানে রাজওয়ার মিয়ার আমলে নিয়োজিত কামলা কাছেদ আলীর উত্তরাধিকাররা তাতে জায়গা নিয়েছে। দক্ষিণ ঘরের উত্তরমুখী বারান্দায় বসা কাছেদ আলীর বউ রুপু বিবির চুলে চিরুনি চালাতে থাকা নেকাব্বরের ছোট মেয়ে সালেহা বলে উঠল, ওই যে দেখেন কেডায়।

বুড়ি আরমানকে দেখতে পেয়ে ডাকল, আইও, আমার লগে আইসা বসো।

মোদাব্বের বাদ সাধল, না দাদি, কাকায় তোমার কথা পরে শুনবনে; তাইনে আইছে মায়ের খোঁজে।

ওই উত্তর কানে যেতেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দুয়ের মাঝখানে দাঁড়াল হরমুজের বউ শরিফা বেগম। সেইসঙ্গে বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করল, ওমা, আমারে কেন খোঁজেন গো আরমান ভাই?

ভাবি, আপনের খোঁজে আমি আসি নাই। আপনের পোলাই যে আমারে ধইরা আনল।

মোদাব্বের বলল, হঁ, তোমার সামনে কাকারে আনাইলাম ছাফ-ছাফ জানায় যাইতে যে, গোলাপিরে বিয়া করনে আমার কোনো মত নাই।

এতে কোনো জবাব না টেনে আরমানের দিকে ফিরে শরিফা বেগম ডাকল, আসেন তো, ঘরে বইসা আলাপ করি।

আরমান ও মোদাব্বের পশ্চিম ঘরে ঢুকে বসল চৌকিতে। শরিফা বেগম মুখ খুলল, শোন পোলা, ম্যাট্রিক পাস করনের পরই গোলাপির লগে তর বিয়া দেওনের মনস্থ আছিল। হে তো দুইবারও পারস নাই; তাও হেরা মাইয়া দিতে রাজি। অখন আমি তাগো কেমনে মানা করি?

সেই মুহূর্তে এক বাসনভর্তি কাটা পেঁপে এনে তাদের সামনে রাখল কাছেদ আলীর মেজ ছেলের বউ খুরশিদা। তার দিকে ফিরে আরমান জিজ্ঞেস করল, ছোট ভাবি, আপনের মাইয়ার জ্বর কি গেল?

হঁ ভাই, সুবল ডাক্তারের মিকচার পেডে যাইতেই জ্বরটা মরল।

উঠানে ঘুরে চলা দুটো মুরগি সবে ফোটানো বাচ্চাগুলোকে কীভাবে খাবার খুঁটে খুঁটে খেতে হয় তাই যেন শেখাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে একটুকরো পেঁপে হাতে তুলে নিতে নিতে আরমান ডাকে, বড় ভাবি।

কন ভাই।

আমি কই কি, জোরের বিয়া করাইলে হেই সংসারে কি সুখ নামনের উপায় আছে! মোদাব্বেরের লগে তো গোলাপির কোনো লেনা-দেনা নাই। তাইলে হেরা মাইয়ারে আরহানে বিয়া দিলেই সারে।

আপনে এমুনের কন?

হঁ বড় ভাবি।

শরিফা বেগম কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠল, হেইডা নাইলে মানলাম। অখন আপনে পোলায় পড়া যে থামাইল হেই বিচার করেন।

মায়ের বেদনায় বিহিত মেলাতেই ছেলে জবাব দেয়, দিমু গো, আবার আমি পরীক্ষা দিমু মা।

আরমান তাতে সায় জানায়, হঁ বড় ভাবি, অখন তো আপনের চিন্তা ফুরাইল।

তিন টুকরো পেঁপে খেল আরমান। তারপর হাতধোয়া হয়ে যেতেই সে বলল, আসি আমি তাইলে।

যাওন নাই ভাই।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে উত্তর দিকের পথ ধরতেই আরমানের পিছু নিল মোদাব্বের। তা লক্ষ করে সে জানতে চাইল, আমার লগে লগে যে তুই?

হঁ কাকা, আইলাম।

ক্যান?

চুপে চুপে আপনেরে একখান কথা কওনের আছিল আমার।



শোনা তাইলে।

কাকা গো, এইবারে ম্যাট্রিক পাস করলে টুলটুলিরে কি বিয়া করন সম্ভব?

অমন জিজ্ঞাসায় আরমান বিস্ময় মানলেও দ্রুতই বিষয়টার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। মিয়াদের কোনাচলের নতুন বাড়িতে অনেকের মতো মোদাব্বেরেরও গতায়ত আছে। টুলটুলিকে নিয়ে স্বামী পরিত্যক্তা মনোয়ারা বেগম সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল বহু বছর আগে। তার মেয়ে টুলটুলি বর্তমানে ক্লাস নাইনের ছাত্রী। নিশ্চয়ই নয়াবাড়িতে যাওয়া-আসার সুবাদে তার দিকে এই ছেলের নজর গিয়েছিল। তাতে ভালোলাগার ঘোর জন্মানোর ফলে সে প্রথমবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সময়ে আজকের মতো একই প্রশ্ন তুলেছিল। সেদিন আরমান তাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিল, তা কখনও হওয়ার নয়। কেননা, নওশিন খানম এবং সানজিদা বিনু ওকে এমএ পাস করিয়েই তবে বিয়ের কথা ভাববে। অবশ্য সেদিনের পর ব্যাপারটা নিয়ে কোনো রা না করলেও বহুদিন বাদে পুরনো প্রশ্নটাই তুলল মোদাব্বের। তবে বাস্তবতার নিরিখে আরমান সত্য জবাবটাই ফেরায়, ক্যান মিছা আশার পিছে দৌড়াস? পড়া ধরবি কইলি, হেইডাই কর। এই যে আমারে দ্যাখ, পড়া দিয়াই জীবনের হগল দুঃখু ভুললাম। তুইও হেমুনের হইলে আমি খুশি।

এই মানুষটার কাছে মোদাব্বেরের হাতেখড়ি। লেখাপড়া এগিয়ে নেওয়া, কি আচার-আচরণে সুন্দর হওয়ার শিক্ষা তার সান্নিধ্যে এসেই সে পেয়েছে। আরমান নিজেও বিএ পাস। সে কত গল্প-উপন্যাস পড়ে। শাহাদাত মিয়াও মারা গেলেন সেই কবে। সেই থেকে তার মামাতো ভাই আরমান এই বংশের সয়-সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। আশপাশের সবাই তাকে আপনজনের মতো খাতির দেখায়। এমন মানুষের কী দুঃখ আবার! সেই রহস্য ভাঙতেই মোদাব্বের প্রশ্ন করে, তোমার কী দুখ কাকা?

কখনও-সখনও অন্তরের অন্তবাহ কখন অজান্তেই উপচে আসে। তাই হলো আরমানের দশা। তবে তার গোপনের গভীর প্রবেশে অপার বেদনার মোচড় ক্ষণে ক্ষণেই অনুভূত। ফলে যেন-বা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সে কৌশলী জবাব টানে, দুনিয়াতে দুঃখ ছাড়া মানুষ কই পাবি তুই! শোন, শাহাদাত ভাই যে সাপের বিষে মারা গেল হেই দুঃখ কি কোনোদিন ভুলনের আমার। যা, তুই ঘরে যা।

মোদাব্বের ফিরতি মুখ করতেই আরমান এগিয়ে গিয়ে থামে বাড়ির পশ্চিম-উত্তর কোণের কবরস্থানের সামনে। এখানে মিয়াদের গতায়ু তিন পুরুষের মোট সাতাশ জনকে সমাহিত করা হয়েছে। সবগুলো কবরই বাঁধানো। শাহাদাত মিয়াও আজ তাদের কাতারে শায়িত। লোকে বলে, শাহাদাত মিয়া যে সাপে কাটায় মারা গেল তা তার বংশের পাপেই।

ঠিক যে, নারীলোভে শাহাদাত মিয়ার বাবা খুরশিদ মিয়া নিহত হয়েছিলেন। তাকে খুন করেছিল আরমানের মামা উমেদ মাঝি। কিন্তু সে নিজে, তার মা সুজুনি বিবি, মামা উমেদ মাঝি, ফুফু নওশিন খানম এবং জন্মকানা মানুষ সিরাজুলের বাইরে এসব কারও জানা নেই। তবে ভাবাবেগটুকু রোধ করে সে এগোয় পুব দিকের দড়াবান্ধা বাজারের পথে। চলতে চলতে শাহাদাত মিয়ার একখানা উক্তি সে স্মরণ করতে পারে। তিনি বলেছিলেন, অতীত কী জানস? এই যে, তর বড় ভাবি মারা গেল, হেইডাই হইল অতীত। তুই আর আমি যে খাড়াইয়া রইছি একলগে, হেইডা বর্তমান। আবার আতকা খবর পাবি যে আমি নাই। ওইরকম কিছুই হইল ভবিষ্যতের লেখন।

সত্যি, তাই হলো ঘটনা। এক সন্ধ্যায় হাসনাহেনা ফুল

তুলতে গিয়ে গাছের ডালায় জড়িয়ে থাকা বিষাক্ত সাপের দংশনে প্রাণ হারালেন শাহাদাত মিয়া। তা যে অতীতই এক্ষণে। তাকে হারিয়ে নওশিন খানম বেদনার এক স্রোতে যেমন ভাসলেন, সানজিদা বিনুও আরেক লেখনে বিধবা হয়ে বেদনার স্রোতেই পাক খাচ্ছেন।

তারপর লাল মাটির পথ ধরে চলতে চলতে সে ভাবল, দড়াবান্ধা বাজারের ঘাটে বাঁধা নৌকায় চড়ে ওপারের মিয়াবাড়িতে পৌছে এই ভাবনার কি বিরতি ঘটবে! আসলে জীবন যতক্ষণ, ততক্ষণ অনুভবের এই দোলাচলে যতি টানবার নয়।

দুই

বছরের ছয় ঋতু প্রত্যেক সকালে পুকুরের পানিতে গোসল সারেন নওশিন খানম। জ্ঞান হবার পর থেকে এতে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। তাছাড়া শীত মৌসুমে অন্যেরা গায়ে গরম কাপড় চড়ালেও তার ওসবে বিশেষ তোয়াক্কা নেই। যৌবনে কখনও-সখনও এমনও হয়েছে, মাঘ মাসের তীব্র শীতে শাড়ি পরিহিত অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে ঘন কুয়াশায় তার খানিক মাখামাখি চলেছে। তাতে গায়ে শীত-ঠা া জাঁকিয়ে বসতেই ঘরে ফিরে অবশ্য লেপ-মুড়ি হয়েছেন। তার নাম উঠলে সবাই বলাবলি করে, কেমুন মাইয়াগো মিয়ার ঝিয়ে, হ্যারে ক্যান জ্বরে পায় না।

সে সব দিন এখন অতীতলিপি। আবার মনের আকুতি সত্ত্বেও এখন রোজ ভোরে পুকুরের পানিতে নামা হয় না নওশিন খানমের। কেননা, বয়স সাতাত্তরের কোঠা ছুঁয়ে যাওয়ায় বার্ধক্যের ভারে তিনি নুয়ে পড়েছেন। বাবা রাজওয়ার মিয়ার আপন বার্ধক্যে রূপার যে লাঠিখানা-নির্ভর চলাফেরা করতেন বর্তমানে একই প্রয়োজনে মেয়ে সেখানা তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শক্তি খুইয়ে আসার ফলে আগের নিয়মে রোজ রোজ পুকুরের পানিতে নামা না হলেও মাঝেমধ্যে মনোয়ারাকে নিয়ে তিনি যান পুকুরঘাটলায়। আজ ওরকম নাওয়া থেকে উঠে নওশিন খানম খুঁজলেন আরমানকে। নেই সে। কেননা, আরও সকালে তাকে যেতে হয় বোলদিয়ার পুরান বাড়িতে। পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের কাঠ আর টিনে গড়া বাংলাঘরের বাহির দুয়ারে তোলা শিকল দেখে ওই হিসেব মিলাতে পারেন তিনি। ঘরে ফিরে নওশিন খানম ফজর ওয়াক্তের নামাজ আদায় করলেন। মনোয়ারাও তার পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ শেষ করে বলল, যাই আমি নাস্তা বানাইতে রান্ধনঘরে।

ছোট বউ সানজিদা বিনু গতকাল মামাবাড়িতে গেল। এখানে থাকলে তার তৈরি নাস্তা পেতেন তিনি। ছোট বউয়ের অনুপস্থিতিতে মনোয়ারা রান্নাঘরের দিকে ছুটে যেতেই তিনি লাঠিতে ভর রেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন দক্ষিণ দিকের ফুলবাগানে। তার বাবার আমলে ঢাকার বলধা গার্ডেনের কর্মচারী সুবল দাসকে বেশি পয়সার বিনিময়ে এখানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর ছেলে মনীন্দ্র দাস সেই দায়িত্ব পালন করছে। তাকে দেখতে পেয়েই বাগানের পরিচর্যারত মনীন্দ্র এগিয়ে এসে প্রশ্ন তুলল, ফুফু, আপনের না একলা চলন মানা, তাও যে আইলেন?

দোতলা ছেড়ে নওশিন খানমকে একাকী নিচতলায় না যাওয়ার বারণ দিয়েছেন ছোট বউ। এখন কিন্তু নিজের অজান্তেই বাগানে তার পা পড়ল। তবে তিনি বললেন, চিন্তা নাই, গতরে জোর কম পাইলেও মনের তাগদে এইতক আইলাম।

মনীন্দ্র ফুলগাছের গোড়ায় নিড়ানি হাতে বসেছিল। পুকুর থেকে কলসিতে করে পানি এনে গাছের গোড়ায় জোগান দিচ্ছিল তার স্ত্রী শোভারানী। মনীন্দ্র তাকে বলল, জল পরে আনলেও চলব। তুমি ফুফুর লগে থাকো।

স্বামী-স্ত্রীর এই মমতায় নওশিন খানমের অন্তর যেনবা খানিক সবুজ-সতেজ হয়ে উঠল। পর মুহূর্তে তার দৃষ্টি ধায় মিয়াদের দোতলা দালানের পুব-পশ্চিমের পুরোভাগ ছাওয়া গাছে গাছে ফুটে ওঠা কত না বাহারের সাদা ফুলে। মুহূর্তেই আবার বিষণ্ণতা পেয়ে বসে তাকে। শাহাদাত মিয়ার প্রথমা স্ত্রী ফারজানা ইয়াসমিনের সাদা ফুল পছন্দ ছিল। তার খুশির জন্যই প্রায় সব প্রজাতির সাদা ফুলের সমাহার ঘটিয়েছিলেন স্বামী। এক সন্ধ্যায় সবের মাঝে ঝেঁপে ওঠা হাসনাহেনা গাছের ফুল তুলতে গেলে ডালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সাপের দংশনে মরতে হলো তাকে। তার শেষ মুহূর্তের চিৎকার শুনে অনেকেই সেখানে ছুটে গেলেও ভাইপুত্রকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ভাবতেই তার দু'পা বেজায় টলে উঠল। মনীন্দ্রর বউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে পেরে জড়িয়ে ধরে বুড়িকে বলল, চলেন তো ফুফু, উপরে চলেন।

নওশিন খানমের ডান হাত নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আর বাঁ হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে মনীন্দ্রের বউ যায় ওপরতলায়। মনোয়ারার মেয়ে তাদের দেখতে পেয়ে ছুটে আসে সামনে। বলে, ঘরে গিয়া আপনেরে না পাইয়া ভাবলাম কই গেলেন! ওমা, শোভা বউদি যে আপনের লগে! একলা একলাই নিচে গেছিলেন বুঝি।

মনীন্দ্রের বউ জবাব দিল, একলাই তো গিয়া উঠলেন বাগানে।

নওশিন খানম স্বীকার করলেন, আমার একলা চলনের শক্তি কবেই ফুরাইছে। আইজ যে নিচে নামলাম, মনীন্দ্রের বউ লগে না থাকলে কপালে বুরাই হইতে পারত।

টুলটুলি ডাকল, শোভা বউদি।

কও।

আসেন, বসবেন।

না গো।

ক্যান?

গাছগুলানে জল দেওয়া বাকি।

পর মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায় মনীন্দ্রের বউ। নওশিন খানম লাঠিতে ভর দিয়ে ঢুকলেন দোতলা দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরে। জ্ঞান হবার পর থেকে এখানেই তিনি জীবনের বহুটা দিবস-রজনী একাকী পেরিয়ে এলেন। ঠিক যে, বার্ধক্যের কোঠায় পৌছে মানুষের মৃত্যুচিন্তা জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে তাকে তারও বেশি অবশ-দিবস হতে হয় বয়সের ভারে জীবনীশক্তি প্রায় তলানিতে এসে ঠেকার কারণে। তার পিছু নিয়ে আসা টুলটুলি জিজ্ঞেস করল, আইচ্ছা গো দাদি, ছোট ভাবি যে বাপের বাড়িতে গেলেন, কবে ফিরবেন?

ক্যামনে কমু মাইয়া! আমিও কি তারে হেইডা জিগাইছি আর!

তাইনে ছাড়া বাড়িডা কেমুন উদলা উদলা ঠেহে।

এতে কোনো জবাব না টানলেও নওশিন খানম টুলটুলির কথায় যেন এক ধরনের নাড়া খান। ভাইপুত্রের অকালমৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই বংশের কোনো উত্তরাধিকার আর রইল না। এ যে বাড়ি উদলা হওয়ার চাইতেও অনেক সর্বনেশে বিষয়আশয়। তবে তিনি তার জন্মান্ধ মামাতো ভাই, তার স্ত্রী, আরমানের মামা এবং আরমান জানে, আছে, আছে উপায়। তা দিয়ে মিয়াবংশ রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু সেই সত্য জনসমক্ষে প্রকাশ পেলে নিশ্চিন্তভাবে আরমানের মা আত্মহত্যার দ্বারস্থ হবে। বর্তমানে সবকিছু ছাপিয়ে নওশিন

খানম একটা প্রশ্নে বিশেষ ঘুরপাক খাচ্ছেন. হায়, মিয়াবংশ রক্ষার কী-বা উপায়!

চোখ বুজে জীবনের ওই তাপ-অনুতাপ তিনি পুহিয়েই যাচ্ছেন। এখন তাকালেন টুলটুলির গলা শুনে। ও বলল, তাইলে আমি রান্ধনঘরে গিয়া দেইখা আসি মায় নাস্তার কদ্দূর করল।

বড্ড চঞ্চলমতি স্বভাবের কিশোরী টুলটুলি দপে দপে বাড়ির এমাথা-ওমাথা করে। তবে কি-না পড়াশোনায় প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে ক্লাস নাইন অবধি প্রথম স্থান পেয়ে আসছে মেয়ে। স্বামী পরিত্যক্তা তার দুখিনী মায়ের আপন যাতনায় এতে কিছু লাঘব নেমেছে। মনে পড়ে মামার বাড়ি মুগারকুর গ্রামের স্বামী নিগৃহীতা এবং ছ-মাসের মেয়ে কোলে ওই নারীকে নওশিন খানম এবাড়িতে এনে ঠাঁই দিয়েছিলেন।

রান্নাঘর ঘুরেফিরে আসে টুলটুলি। বলে, মায় আপনের পছন্দের বউভাত চড়াইছে গো দাদি। লগে কচুপাতা আর হউরার ভর্তা, আ া বিরান, মুসুর ডালের ঝরাও আছে।

কচুপাতার ভর্তা নিয়মিত খেয়ে থাকেন নওশিন খানম। এতে শরীরের বিষ বেদনায় রোধ আসে। বউভাত তার পছন্দের তালিকায় লিপিবদ্ধ। মুখে আগের স্বাদ নেই। কমে এসেছে আহারের পরিমাণ। তাও যেটুকু অন্ন গ্রহণ, এই দালানে বসবাসকারী অন্য তিনজনকে পাশে বসিয়ে নেওয়ার মধ্যেই তৃপ্তির আস্বাদন জিভে যত নয়, ততরও বেশি অন্তরে বাঁধা হয়।

উঠলেন তিনি। তার হাত ধরে শোবার ঘরের লাগোয়া পেছনের খাবার ঘরে ঢুকল টুলটুলি। ইতিমধ্যে মনোয়ারা বেগম সেখানকার শ্বেতপাথরের গোল টেবিলের ওপর সকালের নাস্তা সাজিয়ে নিয়েছে। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে খাবার সারল তারা। মনোয়ারা বেগম বলল, চুলার নিভানিভা আগুনে দুধ চড়াইয়া আসছিলাম। যাই গো আপনের লাগি গরম দুধ আনি।

মনোয়ারা বেরিয়ে যেতেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি। নাস্তা খেয়ে প্রতিদিন পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে আরাম কেদারায় গা ছাড়ার অভ্যাস তার। সেদিকে পা বাড়াতেই টুলটুলি এগিয়ে তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, কই যান।

কই আর আমার যাওনের জায়গা! বসমু গিয়া বারান্দায়।

টুলটুলি তাও নওশিন খানমের পিছু নিয়ে পশ্চিমের বারান্দা অবধি গেল। তিনি আরাম কেদারায় আসন নিতেই ও বলল, তাইলে আমি যাই গো দাদি।

পুব আকাশে সূর্য মুখ তুলবার ভেতর দিয়ে আলো-আঁধারের মাখানো প্রথম সকালের অবসান ঘটেছে। কমেছে গাছের ডালে আশ্রয় নেওয়া পাখ-পাখালির ডানা ঝাপটানো, কি কলকাকলি। রোদের পরশ পেয়ে সকালের ঠা া বাতাস বুঝি কিছুটা থমকানো ভাব ধরেছে। প্রকৃতি চলে সৃষ্টির নিয়মে। জীবনের প্রবাহও একই ধারায় নির্ণীত হয় সৃষ্টিকর্তার বিধানে। তাই তো নওশিন খানম এ জীবনে কন্যাকুমারী রয়ে গেলেন ওই অদৃশ্য কর্তারই লেখনে। তা নিয়ে দুঃখবোধে কখনই উতলা হননি তিনি। কিন্তু শাহাদাত মিয়ার অকালমৃত্যুতে কঠিন এক জিজ্ঞাসা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। সেইসঙ্গে প্রশ্ন জাগে, ছোট বৌকে নিয়ে যেমন, আরমানকে নিয়েও কম নয়। ছোট বৌ জানিয়ে দিয়েছেন এই বৈধব্যই হলো তার অবশিষ্ট জীবনের ধারণ। আরমানও যে মিয়াবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে আটকে গেল, তা থেকে কবে ফিরবে মায়ের বুকে! এক রাতে এসে উমেদ আলী নাকি আরমানকে শাসিয়ে গেছে, তুই এই বাড়ি না ছাড়লে খুরশিদ মিয়ার লাহান তর ফুফুরে খুন কইরা শোধ লমু।

এতে জীবনের আতঙ্ক বিরাজ করে। আর দেরি কেন! আরমান তার মায়ের কাছে ফিরে গেলেই উমেদ মাঝি শান্ত হয়। কিন্তু সে চলে গেলে মিয়াদের সয়-সম্পত্তি তদারক করার কেউ অবশিষ্ট রইল না। মনোয়ারা বেগম দু-হাতে দু-খানা গ্লাসভর্তি দুধ হাতে নিয়ে নওশিন খানমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে একটা গ্লাস তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনে মানা দেওনের পরেও কাইল রাইতে টুলটুলির বাবা পলাইয়া আমার লগে দেখা করতে আইছিল।

নওশিন খানমের কানে গভীর হয়েই বাজল মনোয়ারার অসহায় কণ্ঠ। ফের অনুভব করলেন দুখিনী নারীর ওই বেদনা কিংবা অপমানের সুরাহা মেলানো সম্ভব নয়। তার স্বামী ইজাবুদ্দিন দ্বিতীয় বিয়ে করবার ফলেই অশান্তির আগুনে দগ্ধ হলো মনোয়ারা। দু-বছরের মাথায় তার দ্বিতীয় বউ পরপুরুষের হাত ধরে লাপাত্তা হবার কারণে মানুষটা আধপাগলাটিই হলো। তাই ওরকম দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বললেন, বোঝো তো, ইজাবুদ্দিন আধপাগলা মানুষ। এমুন মানুষের বিচার টানি কেমনে?

মনোয়ারা অসহিষ্ণু স্বরে জবাব দিল, আমার কী দোষ আছিল গো বুবু, যেইতে পেডের মাইয়া লইয়া জামাইয়ের ঘর ছাড়তে হইল!

অভাগিনী ওই নারীর মতো নিজের ক্ষেত্রেও নওশিন খানম ওই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, তার কী দোষ ছিল যে সংসার পর্যন্ত বাঁধা হলো না। আবার তার মনের গহনে ছোট বউ, আরমান, আরমানের মা, আরমানের মামাকে ঘিরেও একই রকম প্রশ্নের আবর্তন খেলা করে। তাই তিনি মনোয়ারার দিকে মুখ বাড়িয়ে বলে ওঠেন, কী দিমু তোমারে জবাব! এই জগতে তুমি একরহমের দুখিনী তো আমিও সব কিছু খুওয়াইয়া দুখিনীই হইলাম।

গ্লাসের দুধে মুখ লাগালেন নওশিন খানম। সবাই জানে, রাজওয়ার মিয়ার ঔরসে বাঁদির গর্ভে তার জন্ম। এককালে লোকজন তা নিয়ে গুঞ্জন চালিয়েছে। রূপ-গুণে ভরা কন্যা তাতে অভিমান মেনেই কারও ঘরণী না হয়ে এতটা বয়স পার করে দিলেন মিয়াবাড়ির চৌহদ্দীতে।

মনোয়ারা বেগম ডেকে উঠল, বুবু গো।

কী হইছে?

মনোয়ারা ডান হাতের তর্জনী তুলে দেয় পশ্চিম দিকে। বলে, ওই যে দ্যাখেন, আপনের মামাতো ভাইয়ের পোলা কিরণে।

দালানের সম্মুখটা ফলফলাদির গাছে এমন ঢাকা পড়েছে যে, সীমানাপ্রাচীরের পশ্চিম দিক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণের বহমান উজানি খাল পর্যন্ত নজরে আসে না। তবে সেদিকের কাঠের ফটক পেরিয়ে বাঁধানো রাস্তা এসে ঠেকেছে দালানের গায়ে। তার মামাতো ভাই কিরণ এসে দাঁড়াল সামনে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, তুই যে এত্ত সকাল-সকাল?

হঁ ফুফু, নায়ে উঠছি ফজর আজানের ওয়াক্তে। ছোড শালারে লইয়া দুধের গাই কিনতে যামু উলুখোলার হাটে।

এত্ত বিয়ানে যে আইলি, পেটে দানা-পানি পড়ছেনি।

না ফুফু।

মনোয়ারার দিকে ফিরে নওশিন খানম জিজ্ঞেস করলেন, নাস্তা যা রানলা, আছেনি কিছু পোলারে খাওনের?

হঁ গো বুবু, খাওন আছে। চুলায় বেশি কইরা বউভাত দিছিলাম মনীন্দ্রের বউয়েরে কদ্দুরা দেওনের আশায়। হেগো পরে কিছু রাইন্ধা খাওয়ান যাইবোনে। যাই আমি, যা আছে দেই খাওনের লাগি।

কিরণ জবাব দিল, হেফি আর না গেলাম। বাসনে কইরা কয়ডা খাওন এইহানে আইনা দিলেই ভালা। খাইতে খাইতে

ফুফুর লগে আলাপটুকুও সারলাম।

মনোয়ারা দুধের খালি দুখানা গ্লাস নিয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতেই কিরণ ডাকল, ফুফু।

কী?

চাচি তোমারে নজদিক যাইতে কইছে। জরুরি আলাপ আছে নাকি।

বিষণ্ণ হাসির প্রলেপ লাগল নওশিন খানমের ঠোঁটে। বললেন, যাইতে চাইলেও আগের চলাফেরা কি আছে আমার! জানি তো, হেইখানে গেলেই আরমানের বিয়ার কথা কইব তর চাচি।

ফুফু।

কী?

আরমান ভাইয়ের তিন বছরের ছোট হইয়াও আমি বিয়া করলাম। হেই ঘরে এক পোলাও পাইছি। আমার বউ কয়, তুমি যেমুন অনবিয়াইস্তা থাইকা গেলা, তাইনেও কি হেমুনের খেয়াল লইছেন?

ধ্যাৎ! থো দিহি ওইসব আলাপ। হুনি তর বাবায় কেমুন আছে?

মায় মরণের পরে বাবারে আউলায় পাইছে। কেউরে কিছু না কইয়া কই কই যে হেয় যায়। হে ছাড়া বাড়ির বেকতেই ভালা আছে। আরমান ভাইয়ে কই?

আর কই! পুরান বাড়িতে গেলেই পাবি তারে।

ছোট ভাবির যেমুন কোনো আওয়াজ নাই।

ছোট বউ গেছে দিঘাছড়ি।

আত্মীয়তার সুবাদে এ বাড়িতে কিরণের দীর্ঘদিন ধরে আসা-যাওয়া। সম্পর্কের ওই দাবিতে সে প্রায় সময়ে নওশিন খানমের সামনে পুরনো দু-চার জিজ্ঞাসা ফিরিয়ে আনে। এখনও অমন খেয়ালে কিরণ বলে, বাড়িতে কওয়া-কওয়ি করে যে, ছোট ভাবি নাকি মিয়াবাড়িতেই থাইকা যাওনের ইচ্ছা লইছে।

নওশিন খানম উত্তর করলেন, তরে যে কয়বার কইরাই কইছি, মাইনষের কথায় কান না দিলেই পারস। আরে, শাহাদাত যে মারা গেল, আমরা কি হেই দুখ অখনও ভুলতাম পারলাম!

কিরণ চুপ থাকে। নওশিন খানমেরও কথা যেন ফুরাল। তারই মাঝে ট্রেতে করে খাবার এনে টেবিলের ওপর রাখে মনোয়ারা। চুপচাপ খাওয়া সারে কিরণ। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে বলে, ফুফু, এলা যে আমার যাওন লাগে।

এত্ত হুড়াহুড়ি লাগাইছস ক্যান? দুপুরের খাওয়া লওয়া সাইরা বাইর হবি।

না ফুফু।

ক্যান?

হউর বাড়ির রাস্তা তো কম না। ওইহান থেনে ফিরা শালারে লইয়া উলুখোলার হাটে যাইতে দুইফর নামব। বেশি দেরি হইলে ওই ফাঁকে ভালা গরুগুলান হাতছাড়া হইব।

আচ্ছা বাবা, যাওন নাই।

কিরণ বেরিয়ে যেতেই মনোয়ারা এসে এঁটো বাসনপত্র তুলে নিল। নওশিন খানম আরাম কেদারায় গা ছেড়ে তাকালেন পশ্চিমের বারান্দায় যেখানে গিয়ে পুব দিকে বাঁক নিয়েছে সেখান অবধি। ওখানকার পশ্চিম কোণে কাঠের দোলনাখানা বাতাসের তোড়ে মৃদুমন্দ দুলছে। ভালোবেসে বিয়ে করা বউকে নিয়ে ওখানে বসে কথা কইতেন শাহাদাত। ওই বউ মারা যাওয়ার পর ঘরে এলেন সানজিদা বিনু। প্রথম বউয়ের মতো দ্বিতীয় বউকে নিয়ে শাহাদাত মিয়া কাঠের দোলনায় প্রথমের মতো না বসলেও বসতেন হঠাৎ হঠাৎ। শাহাদাত মিয়ার অকালমৃত্যুতে এক অলিখিত নিয়মেই বুঝি এখন সেই দোলনায় চড়ে কেউ দোল খায় না।

সত্যিই, জীবনের ভাবনা বহুতর শাখা-প্রশাখা ছড়াতেই পারে। তবে বেশি হয়ে বাজে মিয়াবংশ ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারশূন্য হওয়ার বিষয়টি। লোকে জানে, তাই হলো মিয়াদের পরিণতি। কিন্তু তিনি জানেন আরমানকে দিয়ে মিয়াবংশ রক্ষা করা সম্ভব। কেননা, সে হচ্ছে খুরশিদ মিয়ার ঔরসজাত কিন্তু অবৈধ সন্তান। আজ যেন মনে হয়, জ্বলে জ্বলে মোমবাতি তলানিতে চলে আসার মতো তার আয়ুও ফুরলো প্রায়। তাই চিরনিদ্রায় চোখ মুদে আসবার আগে আরমানকে দিয়ে সেই সমাধান নিশ্চিন্ত করা অতীব জরুরি ব্যাপার।

তিন

কোনাচলের মিয়াবাড়ি থেকে সানজিদা বিনুর মাতুলালয় দিঘাছড়ির দূরত্ব সাত মাইলেরও কিছু বেশি পথ। স্বামীকে হারাবার পর শ্বশুরালয়কে তিনি একান্ত ঠিকানা মেনেছেন। তাই গত এক বছরে এ নিয়ে তার দু'বার দিঘাছড়িতে আসা হলো। গতকাল বিকেলে পালকিতে চড়ে তিনি মামাবাড়িতে এসে নামলেন। এই পরিবারের সদস্য মাত্র তিনজন। তাদের মধ্যে বড়মামা সাকীক মির্জা আর বড়মামি মালিহা বেগম ঘরেই আছেন। তবে ভবঘুরে এবং চিরকুমার ছোটমামা সাকীব মির্জার দেখা মিলল রাতে। এই মানুষটার ঘটকালিতে শাহাদাত মিয়ার সঙ্গে সানজিদা বিনুর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু তাতে সুখ আসেনি। মেয়ে স্বামীহারাও হলো এক বছর না পুরাতেই। সে জন্য নিজেকে দায়ী ভাবেন সাকীব মির্জা। তাই বোনঝিকে প্রায়-ই বলে থাকে, মনে মনে খালি কই, তরে ওইখানে বিয়া দেওনেই কপালে এমুন বুরাই লাগল।

বড়মামা এবং মামির মুখে অন্য সুর। তারা বারবার করেই সানজিদাকে ফের বিয়ের পিঁড়িতে বসবার জন্য চাপ দিচ্ছে। কিন্তু মেয়ে স্পষ্ট স্বরেই জানিয়ে দিয়েছে, ওসব আলাপে তার অপমানবোধ জাগে।

এই উত্তরে আপনজনরা খুশি হয়নি সত্য। সেইসঙ্গে বিষয়টা নিয়ে নতুন করে আগুয়ান হওয়ার চিন্তাটুকুও ছাড়তে বাধ্য হয় তারা। এবারে দিঘাছড়ি আসার পর নিজে 'কেমুন আছ মামা-মামি' আর মামা-মামি 'কেমুন আছস মা' এ ধরনের পারস্পরিক মাত্র কয়েকটা আলাপই উঠল। তবে রাতের খাওয়া-দাওয়া অন্তে সাকীব মির্জা বোনঝিকে ডাকলেন, আয় আমার লগে।

এই ভিটায় চারখানা ঘর কাঠের বেষ্টনের ওপর টিনের ছাউনি দিয়ে তোলা। দিনের রোদতাপ ঠেকাবার জন্য সব ঘরেই আছে কাঠের মজবুত পাটাতন। সাকীব মির্জা ঘুমান ভিটার দক্ষিণ ঘরে। সানজিদা বিনুকে নিয়ে তিনি সেই ঘরের দক্ষিণখোলা বারান্দায় পাতা দু-খানা চেয়ারে পাশাপাশি বসে জিজ্ঞেস করলেন, আছস তো কয়দিন?

না মামা।

ক্যান?

জানো তো মামা, কোনাচলের মিয়াবাড়িতে ফুফু কেমুন একলা।

এই উত্তর আগেও পেয়েছেন সাকীব মির্জা। তার ছোট বোন পেটের তিন বছর বয়সের মেয়ে সাদিয়াকে নিয়ে উঠে এসেছিল বাপের বাড়িতে। পরে আর ওমুখো হয়নি কেন সেই নির্ণয় পাওয়া যায়নি। মেয়ের চার বছরের সময় কলেরায় ভুগে মারা গেল বোন তাহমিনা। সেই থেকে সানজিদা এ-বাড়ির একজন হলো। তাহমিনার ছোট বোন ফাহমিদার বসবাস ঢাকায়। সেখানে পাঠিয়ে মেয়েকে বি.এ. পাসও

করাল আপনজনরা। এ সময় তার বিয়ের জন্য সুপাত্র হিসেবে সাকীব মির্জা মিয়াবাড়ির একমাত্র উত্তরাধিকার শাহাদাত মিয়ার নাম করেছিলেন। তার বংশমর্যাদা, শিক্ষা, বিনয়ে কনেপক্ষের আস্থা মিললেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কেউই রাজি হলো না। কেননা, প্রথমা স্ত্রী মারা যাওয়ার ফলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে যাচ্ছে সেই পাত্র। সানজিদা বিনু সেদিন অভিমত দিয়েছিল, না মামা, ভালোবাইসা যে মানুষ সংসার কইরা তারে হারাইল, সেই মানুষ আমারে কী চিনব, কী জানব আর।

সাকীব মির্জা ভেবেছেন, ভাগ্যের লেখন অন্যরকম হলে সানজিদা বিনুর অন্য জায়গায় বিয়ে হতে পারত। একই নিয়মে ওই জামাই মারা যেতে পারত। সে ক্ষেত্রে মেয়েকে দ্বিতীয়বার বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন সমাজের স্বীকৃত। জগতের কত সংসারেই তো কারও স্বামী, কারও স্ত্রী অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। সেই দোষ কি তাদের দেওয়া সাজে! তাতে ধারণা হয়, শাহাদাত মিয়ার মতো দুঃখীকে কোনো নারী ভালোবেসে বরণ দিলে তার মধ্যে নতুন করে ভালোবাসা অঙ্কুরিত হতে পারে।

শেষে হলো কি, সানজিদা এ বিয়েতে সম্মতি প্রদান করলেন। তবে যে আশা নিয়ে সংসার পাতা, তাতে সুখ মেলেনি। ফের স্বামীও অকালে ঝরে গেল তার জীবন থেকে। তারচেয়ে বড় বিষয় ছিল, বাসররাতে শাহাদাত মিয়া বললেন যে, বংশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে তুলেছেন তিনি।

সানজিদা বিনু সেই সত্য কাউকে না জানতে দিয়ে সঙ্গোপনে পুষলেন। স্বামীর কথায় তিনি উত্তর করতে পারতেন, যদিবা আপনার গৃহিণী হলাম, বুঝলাম আপনার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য। আপনার সন্তানের জননী হওয়া আমার দায়িত্বে পড়ে।

মুখে সেই উচ্চারণ না আনলেও তিনি আগল আগল থাকলেন শাহাদাত মিয়ার কাছ থেকে। তবে এতকিছুর পরও স্বামীকে যদি মমতা দিতেন তাহলে সেই পুরুষ স্ত্রীর ঠোঁটে মমতার চুম্বন আঁকতেন-ই আঁকতেন। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি অমন আচরণ যে বিধেয়, শাহাদাত মিয়া বেঁচে থাকতে এই বোধ জ্ঞানে এলে দায়িত্ব পালন সম্ভব ছিল। আজ ভুলের শোধ মেলাতে স্বামীর স্মৃতিতে ফিরে ফিরে মথিত হচ্ছেন তিনি। জীবনের এইসব অনুভব নিজের বাইরে কাউকে জানতে দিতেও মনে সায় নেই। পাশে বসা সাকীব মির্জা বোনঝির নীরবতা লক্ষ করে জানতে চাইলেন, কি গো, চুপ যে মা।

ছোটমামা।

কও মা।

আমারে লইয়া তোমার চিন্তার বুঝি ফুরান নাই?

সে তো নিশ্চয়। তারচেয়েও বড় সত্য হলো, সানজিদা যে আজ বিধবা সাকীব মির্জা ওই দায় কোনোমতেই মন থেকে সরাতে পারছেন না। বোনঝির সঙ্গে এককালে কলেজ সহপাঠী খুরশিদ মিয়ার ছেলে শাহাদাত মিয়ার বিবাহবন্ধনের মূলে একমাত্র তারই যোগসূত্র ছিল। আপনজনরা সানজিদার পাত্র ঠিক করেছিল অন্যত্র। কিন্তু সবাইকে ডিঙিয়ে সাকীব মির্জা বোনঝির সম্পর্ক স্থাপন করলেন কোনাচলের মিয়াবাড়িতে। কেন, সেদিনে মেয়েটিকে ওখানে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ওকালতি না করলেই ছিল ভালো। সেদিক ভেবে নিয়ে সাকীব মির্জা জবাব দিলেন, চিন্তা, সে তো আমি একলা না, বেকতেরই আছে।

ছোটমামা।

কী?

তুমি যা কও সবই কান পাইতা শুনি। তবে তলে তলে আমি কী খেয়াল পাকাই, শুনবা?

সাকীব মির্জার অন্তরেও বেদনার স্রোত বহমান। তারই মাঝে মেয়েটির জিজ্ঞাসায় খানিক চমক লক্ষ করে জানতে চাইলেন, কী খেয়াল গো মা?

তোমারে দিয়া আমি গল্প-উপন্যাস পড়া শিখছি। জানো তো, এই বাড়ির দশগুণেরও বেশি বই আছে মিয়াগো আলমারিতে। পড়তে পড়তে মন কয়, আমিও যেমুন হেমুনের বই লেখতাম পারি। আবার ওই লেখার কাহিনী তো এক্কেরে সোজা।

সাকীব মির্জা এই উত্তরের অতলে পৌঁছতে না পারায় প্রশ্ন করলেন, কী সোজা কাহিনী?

ক্যান, মিয়াবাড়ির কাহিনী তো আমার জানাই আছে।

সাকীব মির্জা চুপ রইলেন। দক্ষিণ ঘরের দক্ষিণ খোলা বারান্দা লাগোয়া একফালি ফুলবাগানে ফুটে থাকা ফুলের ঘ্রাণ ভাসছে বাগানে। তারও খানিক ওপারের পুকুরের পানিতে দু'দিন ক্ষয়ে আসা পূর্ণিমার চাঁদ প্রতিফলিত যদিও, বাতাসে মৃদু ঢেউলাগা পানিতে প্রতিবিম্বিত ওই চাঁদও কিন্তু ঢেউয়ের তোড়ে পড়েছে। মানুষের বেঁচে চলা তারও বেশি ঘটনার তোড়ে ক্ষণে ডোবে, ক্ষণে ভাসে। এক্ষণে তাতে ভাসমান সাকীব মির্জা বললেন, মিয়াবাড়িতে বিশ বছর ধইরা যাওয়া-আসা করি, বুঝি, গল্প-উপন্যাসে যেমুন পাই, হেগো অন্দরে হেমুন কাহিনী ডালপালা মেইলাই যাইতাছে। আইজ তুইও তো হেই বাড়ির বউ। তাগো লইয়া লেখতে গেলে তর নামও আসব। হেইখানে তুই-ই নাকি নায়িকা?

ছোটমামা।

কী?

কেমনে কই এত্ত আগে। আদতে আমি তো লেখক না, তাও ক্যান যে কলম লওনের ইচ্ছা হইল। তয় কোনোদিন হেমুনের পারলে হইতেও পারি ওই কাহিনীর নায়িকা।

বোনঝির এই ভাবাগোনায় মিশে গিয়ে সাকীব মির্জা জিজ্ঞেস করেন, হেই কাহিনীর নায়ক কি শাহাদাত মিয়া?

সানজিদা বিনু উত্তর ফেরায় না। প্রকৃতপক্ষে স্বামীর মৃত্যুর পর তার অন্তরে এই বংশের ঘটনাবহুল আখ্যান লিখে রাখবার খেয়াল হঠাৎ হঠাৎ অবশ্য চকিত উঁকি ফেলেছে। তবে কার্যক্ষেত্রে তিনি কাবিয়াব হবেন তা হয়তো আদৌ নয়। অবশ্য ওরকম আকাঙ্ক্ষার কাহিনীতে নায়িকা হওয়া তাকেই মানায়। পাশে নায়ক হিসেবে শাহাদাত মিয়া আসতেই পারেন। তা না হয় হলো। সে ক্ষেত্রে লেখাটায় আরমানের গতায়ত বড়ই অনস্বীকার্য। নওশিন খানমের মামাতো ভাইয়ের ছেলে সে। মিয়াবাড়ির আবহে লালিত-পালিত এই যুবক শাহাদাত মিয়ার নিত্যসঙ্গী হয়ে পাশে রয়েছে সারাক্ষণ। সে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভালো চাকরিতে ঢুকবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু নওশিন খানম তাকে আটকে দিলেন।

আরমান শিক্ষিত যুবক। তার সদালাপ, সততা, মমতা ও বিনয়ে লোকজন মুগ্ধ মানে। স্বামীর দু'চোখে যেমন ছিল কালো কালোয় অথৈপনা, তেমন সদৃশ দু'খানি চোখের অধিকারী আরমান। তার দীর্ঘদেহ ও টানটান দেহের বরণ ঘোর কালো। মনে পড়ে বৌ হয়ে মিয়াবাড়িতে গিয়ে পালকি ছেড়ে মাটিতে পা ফেলবার মুহূর্তে আরমানের দিকে সানজিদা বিনুর দৃষ্টি গিয়েছিল। সেদিন সে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ মেলেছিল নতুন বৌয়ের দিকে। পরেও যতবার মুখোমুখি হওয়া, ততবারই পলক না পড়া চাহনি দিয়ে যেন তাকে পরখ করে নিতেই উদগ্রীব হয় ওই যুবক। যে কোনো মেয়েরই নারীলোভী পুরুষকে মুহূর্তেই চিনে নেওয়ার সহজাত ক্ষমতা



। এই বিচার দিয়ে তিনি বুঝে নিয়েছেন আরমান ওই য়র পুরুষ নয়। আবার কেউ কেউ বলে, মিয়াদের ত্তি আত্মসাৎ করতেই বাবা-মাকে ছেড়ে আরমান এখানে ট মেরেছে।

র্জনেরা এসব বাক্য ছড়াতেই পারে। তবে গত রের পর্যবেক্ষণে সানজিদা বুঝে নিয়েছেন, অর্থলোভী নয় মান। দিনে দিনে তার বিয়ের বয়স ভাটার দিকে কখানি গড়িয়ে যাওয়ায় কেউ কেউ প্রশ্ন ওঠায়। এসব ত্র লাজুক হেসে সে জবাব ফেরায়, আমার বিয়ার ফুল যে ও ফুটে নাই।

নত্যি, মিয়াদের নিয়ে যদি কখনও লেখা সম্ভব হয়, তখন মানের গতিবিধি কোনখানটায় গিয়ে ইতি টানে তাও যে চাই তার।

সানজিদা ডাকলেন, মামা।

কি গো?

মাইজ তোমারে আমি একখান প্রশ্ন করি?

করো।

আমার ফুফু শাশুড়ি যেমুন, তুমিও তেমুন আন বিয়াইস্তা । খালি কি তাই, ঘরে থাকো না মোডেও। কেমুন জানি ই-পলাই স্বভাব। ক্যান গো?

মা গো।

কী?

এই জগতে কোনো মানুষের কি পলানের উপায় আছে? খানেই গেলাম, পাইলাম হেই মানুষ, গাছপালা, বিল-ঝিল, গাঙ– তাইলে!

সেই উত্তর শুনে এতকাল মামাকে দেখে দেখে এতটা বড় হওয়া সানজিদা বিনুর মনে হলো, তাই তো ঠিক। আজ ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় তিনি স্বেচ্ছাবন্দিনী হলেন ঠিকই। তবে মামা যেমন বললেন, তেমন মানুষজন, গাছপালা, বিল-ঝিল, গাঙই তাকে ডাকে, আয়, আয়, আয়।

চার

ফজরের নামাজ আদায় করে মিয়াদের নতুন বাড়ি কোনাচলের ঘাট থেকে নৌকায় চড়েছে আরমান। অনেকদিন পরে মায়ের কাছে যাচ্ছে সে। উজানি খালের স্রোত সামলে বৈঠা চালাতে চালাতে তার মনের আকাশে জীবনের বহুতর ভাবনা মেঘময় হয়ে ওড়ে। স্কুলে পাঠ্য 'শিশুশিক্ষা' বইয়ের একটা ছড়ায় 'খোকন খোকন ডাক পাড়ি, খোকন গেল কার বাড়ি'র মতো করে ছেলে আরমানকে কাছে পেতে মা সুজুনি বেগম ওপরওয়ালার দরবারে অমন ডেকে ফিরছে। তাও আরমানের দেরি হয়ে যায়। তার অন্তরে মায়ের যে ছাপ রয়েছে তা অমোচনীয়ই আসলে। অথচ সেদিকে মুখ ফেরাতে চাইলেও সে আগে বাড়তে পারছে কই!

বৈঠার টানে টানে নৌকা এগোয়। চলতে চলতে আকাশে মেঘের আনাগোনা বয়ে যাওয়ার মতো মনেও ভাবনার আনাগোনা বইতে থাকে। ব্যাপার হলো, শাহাদাত মিয়া মারা যাবার পর নওশিন খানম সঙ্গত কারণেই আরমানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। আবার মিয়াবাড়ির রহস্যে তার জীবনের একান্ত গোপন যে জড়িয়ে গেল তা থেকে বেরিয়ে



আসার পথ সুদূরপরাহত। ভাবনা খেলে যায় নওশিন খানমকে ঘিরেও। তিনি বাঁদির ঝি। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও যদি ওই হয় ডাক-পরিচয়, এই লজ্জায় তিনি বিয়ে করলেন না। বর্তমানে তার পাশে বিধবা সানজিদা বিনুর নামও এল। সমাজের অনেকেই তাদের কাহিনী নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়ায়। গতকাল মিয়াবাড়ির আলাপ উঠলে কাছেদ আলী বলেছিল, মাইনসে কয়, ছোট বৌ নাকি মিয়াবাড়ি ছাইড়া কোনোখানে যাওনের না। আরে, বিধবা হইলেও তার কাঁচা বয়স। ক্যান, তাইলে আবার বিয়া করতে কী অসুবিধা?

সেই জিজ্ঞাসায় আরমান বিব্রতবোধ করলেও বিনম্র জবাব দিয়েছিল, ছোট ভাবিরে আমি কি হেই কথা কইতাম পারি?

পর মুহূর্তে কাছেদ আলী মন্তব্য করেছিল, যেইডাই কও খুরশিদ মিয়ার পাপে যে মিয়াবংশ নির্বংশ হইল, হেইডা কইলাম হাছা।

কাছেদ আলীর মতো অনেকেই এ ধরনের প্রশ্ন সামনে আনে। তাতে বিরূপ মনোভাব সত্ত্বেও আরমান নির্বিকার থাকে। ঠিক যে, নারীলোভের বলি হয়েছিল খুরশিদ মিয়া। ধরে নেওয়া যাক, সেটুকু ছিল তার কর্মফল। কিন্তু সেই দায় কেন পড়বে বংশের অন্যদের ওপর! এখন যে আরেক দুশ্চিন্তা গেড়ে বসেছে তার মাঝে। কেননা, মিয়াবাড়ির সংস্রব পরিত্যাগ না করলে উমেদ মাঝি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে নওশিন খানমকে খুন করবার ঘোষণা দিয়েছে। সেই আতঙ্ক নিয়ে ভাইপুত্রকে তিনি আদেশ দেওয়ার মতো করে বললেন, যা, বিয়া কর। এরপরে মায়ের পোলা হইয়া থাক গিয়া মায়ের লগে।

বিয়ে করলে কেমন হবে তার বউ সেই প্রশ্ন নিজেকে নিজে সে শোনায়। এতে উত্তর মেলাতে গিয়ে ভাবে, কোনো মেয়েকে ভালোলাগা কিংবা ভালোবাসা বলতে যেমনটা বোঝায়, তা যে ঠিক ঠিক মনেই আসেনি তার। ফলে মায়ের পছন্দই হবে ছেলের পছন্দ। কিন্তু আজ ভাসমান নৌকায় হাল ধরে বসা আরমানের মনে হলো, সানজিদা বিনুর মতো নরম-কোমল স্বভাবের হোক সেই বউ।

উজানি খালে এখন যাচ্ছে ভাটার প্রভাব। সেই টানে বৈঠার মোচড় যত নয়, ভাটার টানে তরতর গতিতে চলছে নৌকা। স্বীকার করতে হয়, সানজিদা বিনু সুন্দরী নারী। তবে ওই সুন্দর ঝলমলে হওয়া কেন, বরঞ্চ স্নিগ্ধ অপার। খুব মনে পড়ে, বৌ হয়ে এ-বাড়িতে এসে পালকি থেকে নামার সময় ওই লাবণ্য-ধরা রূপ আরমান অপলক চোখে ভরপুর নিরিখ করেছিল। এও মনে পড়ে, ক'দিন পর পুকুরে মাছ ধরতে জেলে নামানো হলে, শাহাদাত মিয়া বলেছিলেন, যা তর ছোট ভাবিরে ডাক, মাছ দেখব।

দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে সংসার পেতেছেন শাহাদাত মিয়া। সেখানে গিয়ে দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে আরমান ডেকেছিল, ছোট ভাবি, মিয়াভাই আপনেরে মাছ ধরা দেখতে যাইতে কইলেন।

সানজিদা বিনু কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরোলেন না। বারান্দায় দাঁড়ানো আরমান সেদিন খেয়াল করেছিল, চেয়ারে গা ছেড়ে তিনি বই পড়ছেন। অনুমান হয় মিনিট দেড়েক শেষে বই বন্ধ করে যাওবা উঠলেন তাতে অনীহার ছাপই স্পষ্ট ছিল।

দুয়ারের বাইরে বেরোবার সময় তিনি মাথা এমন নুইয়ে ফেললেন যে, নইলে বুঝি দরজার চৌকাঠ তার মাথায় ঠেকবে। সেই হলো দ্বিতীয়বার চোখ তুলে তাকে মিলিয়ে নেওয়া। এতে কইতে হয়, চলতে গিয়ে মাটিও যাতে ব্যথা না পায়, অমন আলতো পা ফেলেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর সারাক্ষণ বইয়ের পাতায় নিজেকে লুকিয়ে যাচ্ছেন বিধবা বৌটি। আবার বলা যায়, সধবা থাকাকালে তার বইপড়া হতো কম। শাহাদাত মিয়া প্রথম স্ত্রী ফারজানা ইয়াসমিনকে নিয়ে জোড়বাঁধা চলাফেরা করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী সানজিদা বিনুকে স্বামীর পাশে পাওয়াই যেত না প্রায়! তাতে জানতে ইচ্ছে করে, সংসারে ছোট বৌয়ের কি সুখ হয়নি?

আবার এও স্বীকার্য যে, প্রেমে পাওয়া প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে শাহাদাত মিয়া দ্বিতীয়বার সানজিদা বিনুকে বউ করে আনলেন। না হোক তা প্রেমের বিয়ে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থান বলে তো একটা ব্যাপার আছে। অথচ দ্বিতীয় বৌয়ের হাবভাবে সবাই বুঝতে পারছিল, এই দম্পতির মাঝে কোনো শূন্যতা বিরাজ করছে। পরে তো তিনি বৈধব্যের শিকার হলেন। স্বামীকে দিয়ে যদি সুখ না মিলল, তাহলে বিধবা ছোটবৌ কেন মিয়াবাড়ির মায়ায় বারবার মুখ মেলাচ্ছেন। সত্যি, কী-বা বয়স হলো সানজিদা বিনুর? তাই এই বৈধব্যে আপনজনরা তো বটেই, ফুফুও বারবার করে তাকে ফের সংসার বাঁধবার যুক্তি দেখাচ্ছেন। তবে প্রতিবারই তিনি একই উত্তর করেন, না, এই আছি আমি ভালা।

উজানি খালের দক্ষিণমুখ গিয়ে মিশেছে শীতলক্ষ্যা নদের বুকে। অন্তরে কথন তরতর বয়ে চলার মাঝে নৌকা একসময় গিয়ে পড়ল তারই স্রোতে। নদী পাড়ি দিয়ে মুগারকুরে পৌঁছে নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে লক্ষ্যার কোল ঘেঁষে দাঁড়ানো শেখবাড়িতে ঢুকতেই কিরণের বছর চারেকের ছেলে রশিদ ডেকে উঠল, মাগো, ওই যে কাকায় আইছে।

রান্নাঘরের চুলায় দুধ চড়িয়েছে কিরণের বউ সাবিনা। ছেলের কণ্ঠ শুনে জ্বাল নামিয়ে ও দৌড়ে গিয়ে আরমানের সামনে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, এত্তদিনে বুঝি আমগো এইখানে আওনের মনে পড়ল আপনের? যান, গিয়া দেখেন চাচা-চাচি উত্তরের ঘরে বইসা নাস্তা খাইতাছেন।

এককালে অভাবের সামাল দিতে না পেরে নওশিন খানমের নানা হাবিল শেখ একমাত্র মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন সুতাজোড়া গ্রামের জোতদার সাদেক খানের হাতে। পরে তার মেয়ে সুলতানা পারভিনের সঙ্গে রাজওয়ার মিয়ার বিয়ে উপলক্ষে অনেক উপঢৌকনের সঙ্গে বাঁদি হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ওই মেয়েকে। শেষে কি-না স্ত্রীকে ভুলে বাঁদিকে প্রিয়তমার আসনে বসিয়েছিলেন রাজওয়ার মিয়া। নওশিন খানম তারই গর্ভজাত একমাত্র সন্তান। তারচেয়ে বড় ঘটনা হলো, তাবৎ ঘটনা অবহিত হয়েই ধর্ষিতা সুজুনি বেগমকে বিয়ে করল শেখ বাড়ির জন্মান্ধ সিরাজ শেখ। জন্মের পর আরমান জেনেছিল সে-ই তার জন্মদাতা। কিন্তু একদিন সিরাজ শেখ তাকে জানিয়েছিল যে, বাবা বাবা ডাকলেও আমি আসলে তর বাবা না।

উঠান ডিঙিয়ে উত্তরের ঘরে ঢুকে সে দেখল জন্মান্ধ মানুষটাকে সকালের নাস্তা খাওয়াচ্ছে মা। নিজেও খাচ্ছে মুঠো মুঠো। ছেলেকে কাছে পেয়ে তার কণ্ঠে খুশি উপচে এল। বলল, আইলি তাইলে? শোন, একটু আগেও তর বাবায় তর নাম লইছিল।

আরমান চৌকিতে বসা বাবার পাশে জায়গা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, খবর দেওনের পরেও আইতে যে এত্ত দেরি করলাম, আরবারের মতোন এইবার বকলা না যেমুন!

ঠিক যে, মিয়াবাড়ি ছেড়ে হঠাৎ হঠাৎ মুগারকুর আসামাত্রই জন্মান্ধ সিরাজ শেখ আরমানের প্রতি এমন সব অনুযোগ প্রথমেই তোলে। আজ কিন্তু সেই জিজ্ঞাসায় সিরাজ শেখ মুখের লকমা চিবুনি বন্ধ করে বাঁ হাত দিয়ে আরমানের মুখে, গালে, বুকে আঁতিপাঁতি হাত বুলাতে থাকল। তা খেয়াল করে সুজুনি বেগম স্বামীকে বলল, পোলারে বোঝান, ওই বাড়ি ছাইড়া যেনে আমগো লগে আইসা থাকে।

কিরণের বৌ ঢুকল ঘরে। বলল, পাইল্লায় ভাত যা আছে হেই দিয়া আরমান ভাই সকালের নাস্তা খাইতে পারব। লগে বেগুন ভর্তা, হুঁটকির লারা, হিং মাছের ভুনাও আছে। যান, কলতলায় গিয়া আপনে হাত-মুখ ধুইয়া আসেন, আমি খাওন আনি।

আরমান জিজ্ঞেস করল, আরে, আইলাম যে, দাদার খবরই তো লওয়া হয় নাই, তাইনে কই?

সুজুনি বেগম উত্তর করল, তাইনে যে কাইল রাইতে বাইর হইছেন অখনও ফিরেন নাই।

কও কী মা, রাইত গিয়া দিন নামল হেও যে তোমরা তার খোঁজ পাও নাই।

চিন্তার কিছু নাই। হইবো গিয়া তাইনে উঠছে মাইয়ার ঘরে। তয় বিয়ানে বিছানা ছাইড়াই কিরণ বাইর হইছে হের খোঁজে। যা, কলতলায় গিয়া হাত-মুখ ধুইয়া আয়।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে নাস্তা খেতে বসল আরমান। তার পাতে খাবার তুলে দিয়ে কিরণের বৌ জিজ্ঞেস করল, চাচি, খবরডা কি আরমান ভাইয়েরে শোনাইছেন?

না গো বউ। হেয় হপায় আইসা উঠল। কওনের ফাঁক পাইলাম কই!

তাতে অবাক মেনে আরমান জিজ্ঞেস করল, কী খবর গো কিরণের বৌ?

উত্তর এল, গেছেবারে আপনে কথা দিছেন বিয়া করবেন। এমুনের রাজি হওনেই আমি খুঁইজা খুঁইজা আপনের উপযুক্ত একখান পাত্রী পাইছি।

পাতের ভাতে বেগুন ভর্তা মাখিয়ে আরমান মুখে প্রথম লকমা তুলল। ঠিক যে এতকাল নিষেধ দিলেও এবারে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে সে। তাই বলল, ঠিক আছে। মায়েরে দেখাও হেই মাইয়া। ফুফুরেও দেখাও। তাগোর মত থাকলে করমু আমি হেইখানে বিয়া।

সিরাজ শেখ বলল, হঁ বাবা, তর মায় খালি আমার লগে প্যান প্যান করে। কয়, পোলায় গিয়া পইড়া রইছে খেসি বাড়িতে। এত্ত যে বয়স হইল, তার বিয়ার নাম নাই। বেকতে মিল্লা তারে বাড়িমুখী করেন।

ছেলে উত্তর করল, যাও তাইলে। দেখো মাইয়া।

কিরণের বউ বলল, বাপ-মায়েরে ছাইড়া এত্তদিন রইলেন খেসি বাড়িতে। এইবার বিয়া কইরা আমগো মানুষ আমগো লগে আইসা থাকেন।

উত্তরে আরমান মাথা নাড়ল।

সিরাজ শেখ জিজ্ঞেস করল, কি রে, বউ লইয়া থাকবি আমগো লগে, না ফুফুর ওইখানে গিয়া উঠবি?

সবাই জানে সিরাজ শেখের ছেলে আরমান। কিন্তু সত্য হলো, খুরশিদ মিয়ার ঔরসে তার জন্ম। তবে কি-না সমাজের বিচারে সে অবৈধ সন্তান। এখন সিরাজ শেখের জিজ্ঞাসায় বিয়ের পর বউ নিয়ে মিয়াবাড়িতে এসে থাকার প্রসঙ্গ উঠে আসায় সে জবাব দিল, কী যে কও বাবা, মিয়াবাড়িতে ক্যান গেছিলাম, অত্ত দিন ক্যান-ইবা ওইখানে আটকা পড়লাম, হে তো তোমার আর মায়ের ভালাই জানা। শাহাদাত ভাই মারা যাওনে ফুফু আন্ধাইরে পড়ল। কও, তাইলে ওই বিপদে তারে ছাইড়া ফিরি কেমনে। আবার ঘরের পোলা ঘরে না ফিরলেও

চলে কেমনে! সব বুইঝাই ফুফু কইলেন, বিয়া কইরা থাক গিয়া তর মায়ের লগে।

কিরণের বউ জিজ্ঞেস করল, ফুফুরে আনলেন না যে?

এতকাল মুগারকুর আসার সময়ে নওশিন খানমকে নিয়েই আরমান নৌকায় চড়েছে। শামুক যেমন আশপাশ বুঝে মুখ বোজে, শেষ বয়সে এসে শুধু বয়সের ভার নয়, দুশ্চিন্তায়ও তিনি নিজের মধ্যে নিজে তেমন গুটিসুটি মেরেছেন। তবে সেই ব্যাখ্যায় যাওয়া দায় বিবেচনা করে সে বলল, দুইবার কইরা ফুফু জ্বর বাইয়া উঠল। তারে লইয়া এই সময়ে বাইর হই কেমনে!

সুজুনি বেগম জিজ্ঞেস করল, ওই পোলা, ছোডো বউডায় কি বিয়ায় মত লইছে?

না মা। হেমুনের কিছু তো পাই নাই। ফুফু কয়, ছোড ভাবি নাকি পুরা জীবন থাইকা যাইতে চায় মিয়াবাড়িতে।

খাওয়া শেষে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে আরমান ডাকল, মাগো।

কী?

তোমগো দেওনের লাগি ফুফু কয়ডা টেকা গুঁইজ্জা দিছে আমার মুডে। রাহো তোমার কাছে।

মুগারকুর আসার হলে নওশিন খানম প্রতিবারই মামার গোষ্ঠীর জন্য কিছু টাকা দিয়ে থাকেন। আর প্রতিবারই সেটুকু মায়ের হাতে তুলে দিতে গেছে ছেলে। তাতে প্রতিবারই যেমন, এবারও তার তেমন উত্তর এল, আমি কি হিসাব-হুসাব বুঝি? দে, কিরণের বৌয়েরে রাখবো নে।

কিরণের বৌ বলল, আরমান ভাই, টেকা থাকুক আপনার কাছে। পরে নিমুনে। আগে হাডর-হোডরগুলান ভাঙি।

তারপর দু'হাত ভর্তি বাটি-পেয়ালা নিয়ে কিরণের বৌ গেল কলতলায়। সেদিকে খেয়াল করে আরমান ডাকল, মা।

কি রে?

আসলে কি ফুফু আমারে ছাড়নের! শাহাদাত ভাইরে হারাইয়া তাইনে পড়ছে অকুলে। আমি ওই বাড়ি ছাড়লে তাগো সয়সম্পত্তি খাইব বারো ভূতে। আর আমি ওইহানে থাকলে মামায় যদি খুন করে ফুফুরে!

সুজুনি বেগম ছেলেকে সাবধান করে, ওই, অস্তে রা কর। বাতাসে তর আওয়াজ উড়াইয়া নিয়া যদি ঠেকাইল গিয়া কিরণের বৌয়ের কানে।

সেই আলাপে জন্মান্ধ মানুষটার মধ্যেও আতঙ্ক এসে যাওয়ায় বিচলিত স্বরে প্রশ্ন করল, কেউনি শুনতাছে আমগো আলাপ?

ঘরের চারদিকের জানালা গলিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল আরমান। দেখল, কিরণের বৌ ছেলেকে নিয়ে বারবাড়িতে মুরগি তাড়িয়ে ফিরছে। নিশ্চয় আরমানের আগমন উপলক্ষে কোনো একটাকে জবাই করা হবে। সেদিক খেয়াল করে সে বাবার দিকে ফিরে নিশ্চয়তার স্বরে জানাল, কেউ আমগো আলাপ শোননের নাই।

পোলা রে।

কী?

তুই যে খুরশিদ মিয়ার লউয়ে জন্মাইছস হেই খবর কেউরে না জানানের কসম দিছিল নওশিন বুবু। কিন্তুক আমি ভাবছিলাম কি, জীবনে মিছা কই নাই। তাইলে তর পরিচয় লুকাইলে যদি পুলসিরাতের পুল পার হওন আটকাইল। হেই চিন্তায় কসম ভাইঙ্গা বেবাক কিছু ফাঁস করছিলাম তর সামনে।

সুজুনি বেগম স্বামীর দিকে ফিরে অনুনয় জানাল, থামেন তো, থামেন। হেই দিন আপনে পোলারে হেই সন্ধান না দিলেও পরে তো খবর হইয়া যাইত। ওই যে ফুফু কয়, 'কপালের লিখন না যায় খ ন।' আমরাও পড়ছি হেই প্যাচে।

বৈঠা চালিয়ে উজানি খালের প্রায় মাইল চারেক পথ পাড়ি দিল আরমান। তাতে দেহের ক্লান্তি যত নয়, মনের যাতনায় তারও বেশি ভার নেমে এল। অমন বোধ জাগতেই চৌকিতে পিঠ ছাড়ে সে। তা খেয়াল করে সুজুনি বেগম জিজ্ঞেস করল, এতখানি রাস্তা নাও বাইয়া কাহিল বুঝি? না জ্বরে পাইল।

ছেলে জবাব দিল, হেমুনের কিছু না মা। এমনে এমনেই শুইলাম তোমগো লগ দিয়া।

সুজুনি বেগম হাতপাখা দিয়ে ছেলে এবং স্বামীর গায়ে বাতাস দিতে থাকল। আরমানের দৃষ্টি পড়ল সিরাজ শেখের দিকে। ফুফুর মুখে শোনা, জন্মান্ধ হওয়ায় ইহজীবনে সে বিয়ে না করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল। কিন্তু খুরশিদ মিয়ার হাতে ধর্ষিতা নারীকে তিনি নিজের বউ করে নিয়েছিলেন নওশিন খানমের অনুরোধে। সবাই জানল মিয়াবাড়িতে আশ্রিতা ওই নারীর আপনজন কেউ নাই। প্রকৃতপক্ষে এর অন্তরালে অন্য সত্য লুকায়িত। কেননা, খুরশিদ মিয়ার হাতে ধর্ষিতা হওয়ার পর ওই লাঞ্ছিতা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। ব্যাপারটা বাড়ির লোক আঁচ করতে পেরে তাকে বাঁচাতে পেরেছিল। খবর পেয়ে নওশিন খানম ওই ধর্ষিতাকে উদ্ধার করে তার বাপের বাড়িতে পাঠাতে গেলে উত্তর এসেছিল, আপনাজনগো এই মুখ দেহানের আগে গলায় দড়ি লইয়া মরণ ভালো।

সেদিন সিরাজ শেখের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নওশিন খানম। তাকে সব জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, যেন এই ধর্ষিতাকে বিয়ে করে। কেননা, একমাত্র ওভাবেই তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। মামাতো ভাইয়ের ছেলেকে তিনি কসমও খাইয়েছিলেন যে, এই গোপন কাউকে প্রকাশ করা যাবে না। শেষে যে দশ মাস দশ দিনের নিয়মে সুজুনি বেগমের গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম নিল, তা ছিল খুরশিদ মিয়ার ধর্ষণের ফসল।

মিয়াদের পাঁচটা বড় আলমারিতে ঠাসা বইয়ের অনেকই পড়া হলো আরমানের। সে সব লেখায় জীবনের বেঁচে থাকা নিয়তির খেলায় বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট। এই যে সিরাজ শেখ, সুজুনি বেগম, আরমান, উমেদ মাঝি, নওশিন খানম, ফারজানা ইয়াসমিন কিংবা সানজিদা বিনু– সবাই তো দুর্ভাগ্যের শিকার। প্রতিশোধপরায়ণ উমেদ মাঝি যে তার বোনের ধর্ষক খুরশিদ মিয়াকে খুন করল তারও মূলে নিয়তিই মূল ক্রীড়নক।

কিরণের বৌ ফিরে এসে বলল, চাচি গো, চাচারে খেওরি করাইতে নাপিত আইছে।

এই কথার পর ও নিজেই ঘরে ঢুকে চাচাশ্বশুরের হাত ধরে নিয়ে বসাল পশ্চিম ঘরের বারান্দায় অপেক্ষারত নাপিতের সামনে। ফাঁক পেয়ে ছেলে প্রশ্ন করল, মাগো, তুমি চুপ যে! কও, কিছু কওনের থাকলে কও আমারে।

সুজুনি বেগম কোনো উত্তর টানবে কি, বরঞ্চ তার দু'চোখ জলে ভেজা ঠেকে। সেটুকু আড়াল করতেই মাথা নুইয়ে বাঁ হাতে পাখা নাড়তে নাড়তে ডান হাতে ছেলের মাথায় গভীর পরশ মাখিয়ে চলে। তাতে ঘুমের ভর অনুভব করে আরমান। আর ঘুম জড়ানো কণ্ঠেই ডেকে ওঠে, মাগো।

কী?

কোনো সময়ে আমি খাওনের কিছু আনলে তুমি মুখে লও না। কও, হেইগুলান মিয়াগো টাকার জিনিস। হে নয় বাদ দিলাম, কিন্তু কত্তবার কইরা সাধলাম, লও যাই মা, নায়ে কইরা তোমারে ঘুরাইয়া আনি। হেও কি নড়লা কোনোদিন।

পোলারে, তর তো অজানা না কোনোডাই। আমারে কেউ চিইন্না ফালায় যদি হেই ডরে কি বাইর হইলাম কোনোখানে? হইত যদি তর বাবার টাকায় নাও, যাইতাম তর

লগে।

আইচ্ছা গো মা, বাবারে কইয়া নাও কিননের কয়ডা টাকা লইও তাইলে।

এক হাতে তালপাখার বাতাস, অন্য হাতে ছেলের চুলে পাঁচ আঙুলের বিলি কাটতে কাটতে সুজুনি বেগম চোখ বুজে থাকা ওই মুখ একান্ত নজরে মাখিয়ে নিল। খুরশিদ মিয়ার চেহারা তার স্মরণে নেই, রংও না। তবে ছেলে পেয়েছে মায়ের মতোই গভীর কালো বরণ। মাথাভর্তি ঝাঁকানো কালো চুল আরমানের। শাহাদাত মিয়ারও তাই ছিল। তারই মতো টলটলে কালো দু-খানা চোখ পেয়েছে এই ছেলে। তাই সম্ভব। একই পুরুষের রক্ত প্রবহমান কি-না তাদের দেহে।

তারপর মনে পড়ে, এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর সুজুনি বেগম ভেবেছিল, মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসার আগে ও মরল না কেন। কিন্তু মাতৃস্তনে নবজাতক মুখ ঠেকিয়ে শোঁ শোঁ হাওয়া লাগার মতো শক্তিতে দুধ শুষে নিতে থাকলে প্রাণের ওই স্পন্দন সুজুনি বেগমের প্রাণে-লাগা হলো। তাতে জীবনের দুঃখে কিছুটা শান্ত হতে পেরেছিল মা।

তারপর মনে পড়ে, এক রাতে সুজুনি বেগমের উপস্থিতিতে সিরাজ শেখ বলে বসল, আমারে বাবা ডাকলেও আমি তর বাবা না। তর বাবার নাম খুরশিদ মিয়া।

পরদিন সকালে কাউকে কোনো জানান না দিয়ে আরমান গেল কোনাচলের মিয়াবাড়িতে। ব্যাপার আঁচ করতে পেরে নওশিন খানম থামালেন আরমানকে। বললেন, আইছস যখন, তখন থাইকা যা এইহানেই। তয় খুরশিদে যে তর বাবা, হেই কথা কইলে জানবি তর মা গলায় ফাঁস লইয়া মরব।

চলছিল এমনই। শেষে দুর্ভাগ্যের আরেক পাঁক উঠল তাদের ভাগ্যে। কেননা, এক রাতে ঝড়-ঝঞ্ঝায় নৌকাডুবিতে সাঁতরে সাঁতরে উমেদ মাঝি গিয়ে উঠল সিরাজ শেখের বাড়িতে। না জেনে, না বুঝে সেখানে ঢুকতেই হারানো বোনকে পেয়ে গেল সে।

হ্যাঁ, এই তো সুজুনি বেগমের জীবন। তার গর্ভের সন্তান এতকাল যে দূরে গিয়ে রইল, এবার ফিরে এলে মায়ের চিত্ত বুঝি শান্ত হয়।

পাঁচ

সাকীব মির্জার কাছে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলার মতো করে মিয়াবাড়ির ঘটনা নিয়ে কিছু লিখবার অভিলাষ সানজিদা বিনুর মুখ থেকে ব্যক্ত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু শ্বশুরালয়ে ফিরে ভাবলেন, জীবৎকালে মানুষে মানুষে কত কি সাধ জন্মালেও বাস্তবে তা মেলাতে ব্যর্থ হয় অনেক পাত্র-পাত্রী। সত্যিই, মিয়াদের কথন অক্ষরে অক্ষরে তুলে আনবার খেয়ালতাড়িত যে তিনি হলেন শেষাবধি তা ফলানোই যাবে না হয়তো। কেননা, কাহিনীর চয়ন লেখকের কলমেই শোভা পায়। সানজিদা বিনু কী-বা গুণ ধরেন। তবে কি-না মামা বলেছিলেন, না হোস লেখক, তাও ডায়রি লেখনের মতো কইরা মিয়াগো লইয়া যা মনে আসে তুইলা রাখ। কোনোদিন সেইটার পাতা খুইলা মাইনষে পাইব মিয়াবাড়ির ইতিহাস।

ছোটমামার কণ্ঠনিঃসৃত উচ্চারণটুকু হুবহু হয়ে মাঝেমধ্যে সানজিদা বিনুর কানে বাজে। অমন বশ জাগায় যেমন আবেগ-উদ্বেল হয়েছেন তিনি, তেমনই এসবের সন্ধান পেতে দ্বারস্থ হচ্ছেন নওশিন খানমের সামনে। মিয়াবাড়ির একমাত্র প্রাচীন তিনি। বয়সের আঁচড়ে তার স্মৃতিশক্তি ক্ষয়ে এসেছে। জবাব দিতে গিয়ে প্রসঙ্গের খেই হারিয়ে ফেলেন ফুফু শাশুড়ি। আবার কখনও-বা চুপটি মেরে যান। মিয়াবংশের উথান নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানিয়েছিলেন, রাজওয়ার মিয়ার দাদা চিটাগাং চাকরি করতে গিয়ে বার্মায় কাঠের ব্যবসা দিয়ে ধনী হওয়া এক পিতার একমাত্র কন্যার প্রেমে পড়েছিলেন। বিয়েও হলো তাদের। শ্বশুরের কাঠ ব্যবসায় হাত লাগালেন জামাই। সেই সংসারে জন্ম নেওয়া ছেলেও গিয়ে থাকল দেশ ছেড়ে বিদেশে। তারই ঔরসে রাজওয়ার মিয়া এবং তার ছোট ভাই বখতিয়ার মিয়ার জন্ম। তারাও কাঠ ব্যবসায় সফল ছিল। কিন্তু বখতিয়ার মিয়া ওখানকার এক মেয়ের প্রেমে পড়ে ঘর বাঁধলেন। তিনি বাঁচলেন না বেশিদিন। কেননা, ওই মেয়ের ব্যর্থ প্রেমিক এক রাতে এসে ছুরিকাঘাতে তাকে হত্যা করেছিল।

তারপর রাজওয়ার মিয়া ব্যবসা গুটিয়ে দেশে ফিরে কিনে নিলেন কোনাচলের জমিদার শশাঙ্ক পালের দোতলা বাড়িখানা। বিয়ে করলেন কুমিল্লার কলিমদাদ খানের মেয়ে শেফালি বেগমকে। ওই বিয়েতে বাঁদি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল নওশিন খানমের মা পরী বানুকে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নওশিন খানম মাঝেমধ্যেই উদাস দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে কী কী যে দেখে চলেন, নিজেই বুঝি বুঝতে পারেন না।

শেষ বিকেলের আলোয় দোতলা দালানের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণের বারান্দায় পাশাপাশি বসা সানজিদা বিনুর মধ্যে ভাবনার খ -বিখ উড়াল বারেবারে নাগাল দিচ্ছিল। তাতে আপনাতেই আপনার নীরবতা নেমে আসে। অমন যেন হয়ে আসছে নওশিন খানমের বেলায়ও। তাই কি সানজিদা বিনুর মতো তিনিও চুপচাপ মুহূর্ত পেরিয়ে যাচ্ছেন! এখানকার সব গাছপালায় রাতের আশ্রয় নিয়ে আসা পাখ-পাখালির দিনমানের ঘোরাঘুরি সেরে ফিরতে শুরু করেছে। হরেক পাখির হরেক কূজনে মুখরিত হচ্ছে প্রাঙ্গণ। সর্বত্র চৈত্রের দাবদাহ, যদিও শেষ বিকেলের রোদ কমে যাওয়ায় তাপ কমেছে। দক্ষিণ দিকের ফুল বাগান ছুঁয়ে আসা খানিক জমাটবাঁধা বাতাস ফুলের গন্ধ তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে শূন্যে। আম, জাম, লিচু ইত্যাদি অনেক রকম ফলের বোল তাতে আপন আপন ঘ্রাণ ঢেলে দিচ্ছে। এমন আবহে মগ্ন হওয়াই সাজে। তাও ওই অবস্থায় বিয়ে করে মুগারকুরে মায়ের কাছে আরমানের ফিরে যাওয়ার খবরটা তাকে বিষণ্ণতার ঠোকা দিয়েছে। তাই ফুফু শাশুড়ির দিকে ফিরে তিনি বললেন, আরমান নাকি বিয়া কইরা গিয়া থাকব মুগারকুর। সে না দেখলে এত্ত এত্ত সয়-সম্পত্তির দিশ রাখব কেডা?

নওশিন খানম উত্তর করলেন, শাহাদাতই বাঁইচা নাই, সয়-সম্পত্তির দিশ লইয়া তয় আমার চিন্তা কিসের।

সেই উচ্চারণ ধক করে ঠেকল সানজিদা বিনুর বুকে। সত্যিই, স্বামী বেঁচে থাকতে তার উচিত আচরণ করা হয়নি। তাকে প্রকৃত শিক্ষিত পুরুষের স্বীকৃতি দিতে হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. করেছেন। রেডিও পাকিস্তান ঢাকার নাটকে অভিনয় করার জন্য নিয়মিত ডাক পেত মানুষটা। প্রচুর গল্প-উপন্যাস পড়ার পাশাপাশি অংশ নিতেন আবৃত্তিতে। রেডিওতে আসা-যাওয়ার মাঝে গায়িকা ফারজানা ইয়াসমিনের সঙ্গে তার প্রণয় এবং প্রেম সম্পন্ন হয়। এও বিচার্য যে, শাহাদাত মিয়ার মতো পুরুষের দিকে নিজের প্রেম অঙ্কুরিত হতে পারত। চাই কি সম্পন্ন হতে পারত দুইয়ের পরিণয়ও। আর যে লেখনে তিনি প্রথমা স্ত্রীকে হারালেন, সেই লেখনে সানজিদা বিনু প্রথমা স্ত্রীর মতোই অকালে প্রাণ হারাতে পারতেন। তারপর সেই পুরুষ জগতের খেলায় দ্বিতীয় স্ত্রীকে যদি বলেই বসতেন, প্রথমাই ছিল আমার প্রেম, তাহলে দোষ কেন হবে ওই প্রেমিক প্রবরের। সে তো সত্য। তবে শাহাদাত মিয়ার দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে সেই সত্য যে তার উপলব্ধে আসেনি।

তারপর ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে নওশিন খানম যেমন এই

বংশ রক্ষার পথ রুদ্ধ পেলেন, তেমন কোনো ধারায় বৈধব্যের সাজ উঠল ছোট বৌয়ের অঙ্গে। গল্প-উপন্যাসে লিখিত সমাজের বিধিনিষেধের শিকার প্রেমিক-প্রেমিকা কিংবা বিরহকাতর প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য পাঠকের দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হওয়ার প্রমাণ সানজিদা বিনু নিজেকে দিয়ে পেয়েছেন। সব জেনেশুনেই শাহাদাত মিয়াকে বরণ দিয়েছিলেন তিনি। তাহলে কেন প্রেমিকাকে হারানোর বেদনায় অহর্নিশ পুড়তে থাকা স্বামীকে বুঝতে ভুল হলো তার। আবার পাশে আসীন ফুফু শাশুড়ি বললেন কি-না, 'আমগো শাহাদাতই যে বাঁইচা নাই।'

ভাইপুত্রকে হারানোর মধ্য দিয়ে এই বংশের শেষ উত্তরাধিকারীকে হারানোর শোকে কাতর নওশিন খানম। তবে সেই ভাইপুত্রকে যদি স্বামী করে পাওয়া হলো সানজিদা বিনুর, কী-বা মমতা বুঝলেন তার জন্য। বিয়ের পর কোনো শয্যাতেই একবারও হাত বাড়িয়ে স্বামীকে বাহুবন্ধন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি তার। এখন মন বলে, ওরকম পারলে নিশ্চয় প্রথমা স্ত্রীকে ভুলে অন্যতর ভালোবাসায় দ্বিতীয় স্ত্রীর ঠোঁটে চুম্বন বিলাতেনই বিলাতেন শাহাদাত মিয়া। তবে সবটাই অতীত যদিও, স্মৃতির আকাশে কিন্তু ওসবের মেঘমেদুর চলাফেরা সততই পরিলক্ষিত। নওশিন খানমও বুঝি অমন বৃত্তায়নে ঘোরে বলে উঠলেন, কপালের লেখনই হইল আসল। নাইলে কি শাহাদাত আমগো ছাইড়া যায়!

সানজিদা বিনু এতে কোনো উত্তর করলেন না। তবে মনে মনে ভাবলেন, তাই তো সত্য। নিজেও এই লেখনের শিকার তিনি। ফুফু শাশুড়িরও শেষাবধি একাকী জীবন হলো।

টুলটুলি এসে ডাকল, ছোট ভাবি।

কি গো?

শোভা বৌদি কইতাছিলেন, কত্তদিন ধইরা কলের গান শোনা হয় না। আইজ বাজাইবেন?

সানজিদা বিনু বললেন, তরই তো গান শোনার বেশি নেশা। শোভারে বুঝি লইছস দলে?

হ' গো ছোট ভাবি, গান আমার বহুত পছন্দের।

স্বামী বেঁচে থাকতে রোজ রাতে গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়াতেন। কাঠের সাত বাক্সভর্তি রেকর্ড আছে মিয়াদের ঘরে। একে একে সবই শোনা হয়েছে সানজিদা বিনুর। শুনতে শুনতে গানের কথা আর সুরের মোহজালেও বাঁধা পড়লেন কত। স্বামীর মৃত্যুর পর না নওশিন খানম, না তিনি নিজ থেকে গ্রামোফোন নিয়ে বসেন। তবে কখনও-সখনও টুলটুলি, মালি আর মালির বউ, কি প্রতিবেশীদের অনুরোধে অবশ্য গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়ানো হয়। তাদের পাশে থেকে নিজেও তো তাতে কান পাতেন তিনি। তাই সানজিদা বিনু বললেন, রাইতের খাওয়া সাইরা আইতে কইস শোভা রে। বাজামুনে কলের গান।

নওশিন খানম ডাকলেন, ছোট বৌমা।

জি ফুফু।

কলের গানের কথা উডনে পুরান দিনের স্মৃতি মনে পইড়া গেল আমার।

এসবের খোঁজেই ফিরছেন সানজিদা বিনু। ফলে ভারি উত্তেজনা নিয়ে তিনি বললেন, শোনান গো ফুফু।

আমি তহন ছোড। কোনোখানে যাওনের হইলে বাবা আমারে কাঁধে চড়াইয়া লইতেন। হেইদিনে এইপাড়া-হেইপাড়ার ডাক পাইয়া তাইনে কলের গান শোনাইতে যাইতেন হেইখানে। শুনতে শুনতে আমিও কত্ত গান গলায় তুইলা লইছিলাম।

টুলটুলি ডাকল, খালা।

কী?

কোনোদিন তো গান শুনলাম না আপনের গলায়।

ধ্যাৎ মাইয়া।

ক্যান?

হেই বয়স কবে ফুরাইছে আমার। আমি বলে অখন ঠিকঠাক মতোন কত্ত কথা মনেই আনতে পারি না।

আলাপের এই পর্যায়ে মিয়াবাড়ির দুয়ার পেরিয়ে ভেতর বাড়িতে প্রবেশ করল আরমান। তার দুই হাতে দুটি মিষ্টির পাতিল। পায়ে পায়ে সে উঠে এল দোতলায়। তারপর নওশিন খানমের পাশে বসে জিজ্ঞেস করল, ফুফু, তোমার জ্বর তো আর ফিরে নাই?

না বাবা, দুদিন ধইরা আমি ভালোই আছি। অখন ভুখ লাগে। খাওনেও রুচি ফিরছে।

তারপর সে টুলটুলির দিকে দই আর মিষ্টির পাতিল এগিয়ে দিয়ে বলল, যা, নিজেও খা, আমগোও খাওয়া।

টুলটুলি তা-ই করল। নওশিন খানম ডাকলেন, আরমান রে।

জি ফুফু।

তর বিয়ার মাইয়া দেখনের কী হইল?

মায় কইল ছোট ভাবিরে থাকতে হইব মাইয়া দেখনের দিনে। উনি সময় দিলেই হেইখানে যাওন যায়।

সানজিদা বিনু লক্ষ্য করলেন, আরমান তাকে দেখে নিচ্ছে সময়ে সময়ে। তবে তিনিও তাকে দেখে নিয়ে বললেন, যামু তোমার বিয়ার মাইয়া দেখতে। ফুফুও বাদ থাকবেন ক্যান।

না ছোট ভাবি।

ক্যান?

মাইয়া থাকে বোলদিয়ার মতো ত্যাগজঙ্গইলা মুলাদি গাঁওয়ে। হেইখানে ফুফুর আসা-যাওয়া করতে হইলে লাগব পালকি। তাইনে অত্ত ধাক্কা সামলাইবেন ক্যামনে?

নওশিন খানম বললেন, হ বাবা, যামু যে কোনোহানে গেলে আবার আতকা যদি জ্বরডা পাইয়া বসল আমারে।

আরমান জিজ্ঞেস করল, ওষুধ ঠিক মতোন খাইতাছ তো?

হ', আমার ভুল হওনের আগে ছোট বৌমা ওষুধ খাওয়াইয়া যায়। তয় ওষুধে কী লাভ।

আরমান জিজ্ঞেস করল, ক্যান ফুফু?

বয়স তো আর কম পার হইলাম না। এই সময়ে মানুষ আতকা চোখ মুনদায়। হের আগে তর বউ দেইখা যাইতে পারলেই খুশি।

তারপর তাদের দিকে ফিরে নওশিন খানম বললেন, কেউ রে কই নাই, হইছে কী জানোস।

কী?

কয়দিন ধইরা মা-বাবায় আইসা খোয়াবে দেখা দিয়া যাইতাছে। হেইতে বুঝতাসি, হেপার যাওনের ডাক পরসে আমার।

আরমান জবাব দিল, কী যে কও ফুফু! খোয়াবে মানুষ কত কী দেখে। হেইতে হেপার যাওনের ডাক পড়ব ক্যান?

তুই তো জানোস না, শেষকালে বাবায় পরায়ই কইতেন, আমার দাদা-দাদি নাকি খোয়াবে আইসা তারে দেখা দেন। হের কয়দিন পরেই তো বাবায় চোখ মুঞ্জায়লেন।

না আরমান, না সানজিদা বিনু এতে জবাব টানলেন। প্লেটে করে দই-মিষ্টি এনে তাদের সামনে রাখল টুলটুলি।

বলল, খাও গো ফুফু, খান গো আপনেরা।

আরমান জিজ্ঞেস করল, টুলটুলি, এই মিষ্টি কই পাইলাম জানোস?

কই?

আরে আমি নাও কিনছি একখান। হেই মিষ্টি আইজ আনলাম।

নওশিন খানম বললেন, মিয়া গো ঘাটেই তো ছয়-ছয়ডা নাও ভাসে। তাইতে তুই নাও কিনতে গেলি ক্যান?

আরমান জবাব দিল, মায়ের ইচ্ছা নয়া নাওয়ে কইরা ঘুরতে বাইর হইবেন তাইনে।

টুলটুলি ডাকল, আরমান ভাই।

কী?

হেই কবে আমারে, ভাবিরে নাওয়ে কইরা ঘুরাইয়া আনলা। এইবার তোমার নয়া নাওয়ে চড়াইয়া কোনোখানে ঘুরাইয়া আইনো কইলাম।

যাবি নে। খা, দই-মিষ্টি খা।

মিষ্টি খাওয়া হয়ে যেতেই আরমান বলল, ছোট ভাবি, ধান বেইচা ভালা টাকাই আইসে হাতে। গেছে দুইদিনের এইডা-হেইডা বেইচাও পয়সা পাইসি। খাতাডা দিলে হিসাব লেইখা দিতাম পারি। টেকাগুলানও থুইয়া দিতাম পারি আপনের হাতে।

খাতা তো আলমারিতে। লেখনের হইলে চলো আমার ঘরে।

সানজিদা বিনু উঠলেন। আরমান তার পেছন নিয়ে দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম ঘরে ঢুকে বসল খাটের একপ্রান্তে। তারপর খুঁটিতে করে আনা টাকাগুলো বের করে বলল, রাখেন। খাতাডা দেন আমারে।

আরমান।

কী ছোট ভাবি?

ঘরে অনেকগুলান টাকা জমল। কাইল নিয়া ব্যাংকে তুইলা দিও।

জি ছোট ভাবি।

টাকাগুলো আলমারিতে ঢোকালেন সানজিদা বিনু। তারপর জানতে চাইলেন, কবে তোমার বউ দেখনের তারিখ ফালাইবা?

আপনের সুবিধা মতোন গেলেই হইব ছোট ভাবি।

এতকাল মানুষটার অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে মিয়াবাড়িতে। এখন তার চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল ভেবে খানিক শূন্যতা যেন বোধ করেন তিনি। তাই বললেন, সংসার পাতলেও ফুফুরে দেইখা যাইও রোজ আইসা। ওনারে লইয়াই যত্ত চিন্তা।

ছোট ভাবি।

বলো।

আমি যেইখানেই থাকি, ওনার যতনের কোনো কমতি হইব না।

আজ যে হঠাৎ খেয়াল গেল লেখার দিকে, সেই কাহিনীর বিষয়-আশয় জানতে সানজিদা বিনু প্রথমেই নওশিন খানমের শরণাপন্ন হয়েছেন। তবে আরমানও মিয়াদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সুবাদে অনেককাল এ-বাড়িতে বসবাস করছে। তাই সে মিয়াদের অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীও নিশ্চয়। ফুফুর সামনে বসে অতীত নিয়ে কিছু প্রশ্ন তোলা হলেও খুরশিদ মিয়ার খুন হবার ব্যাপারটা তিনি এড়িয়ে গেলেন। কেননা, ওই প্রসঙ্গ উঠলে তা তাকে বেদনাহত করতে পারে। তাই আরমানকে কাছে পেয়ে যেন হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল কথাটা এমন স্বরেই তিনি জানতে চাইলেন, খুরশিদ মিয়ারে যে খুন করা হইল, তা কি তোমার খেয়াল আছে?

কারও কোনো জিজ্ঞাসায় কিংবা কোনো কোনো বিশেষ ঘটনায় চমকবোধ করেছে আরমান। কিন্তু এ কী জিজ্ঞাসা ছোট বৌয়ের মুখে। শ্বশুরের ব্যাপারে এই কৌতূহলের কোনো উৎস কী আছে! সত্যি, কোনো কারণে কিংবা কোনোভাবে তার জীবনের আখ্যান কি বিধবা বৌটির কানে গেল! তবে মনের ওই ভাব চাপা দিয়ে সে জবাব দিল, জি ভাবি, খেয়াল আছে।

তারে কে খুন করেছিল?

এবারে অজানা আশঙ্কায় আরমান বড় বড় চোখ করে তাকাল ছোট বৌয়ের দিকে। তার চিন্তা হলো ফুফু কি কোনো দুর্বল মুহূর্তে ভুল করে গোপন ঝেড়ে দিয়েছেন বিধবা বৌটির সামনে! ওই দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও সে জবাব দিল, তার নাম উমেদ মাঝি।

বিয়ার আগেই ছোটমামায় এই বাড়ির অনেক কিছুই শোনাইছে আমারে। তাও মাঝে মাঝে ক্যান যে ফিরা সেইসব জানতে ইচ্ছা করে।

সানজিদা বিনুর উত্তরে স্বস্তি মিলিয়ে নিল আরমান। বলল, জি ভাবি, তাই কন।

আচ্ছা, যে মেয়েটাকে নিয়ে এত ঘটনা তার কি কোনো খোঁজ জানে কেউ।

আজ অবধি নিজের জন্মবৃত্তান্ত গোপনে বয়ে বেড়ালেও কখনও কাউকে মিথ্যা বলার প্রয়োজন পড়েনি আরমানের। যাকে নিয়ে এত ঘটনা, সেই নারী তো তার মা। ধর্ষণকারী খুরশিদ মিয়াকে খুন করেছে তারই আপন ভাই। এসব খোঁজ জ্ঞাতে থাকলেও সে প্রাণপণ চেষ্টায় মিথ্যা উত্তর ফেরাল, না, তার খোঁজ নাই।

আরমান।

জি ছোট ভাবি।

কোনোদিন কোনোকিছু তোমারে জিগান হয় নাই। আইজ দুইডা কথা তোলনে তুমি কি আর কিছু ভাবলা?

তা ক্যান? আপনে যার নাম কইলেন তারে আমারও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। চিন্তাও করি, মানুষ ক্যান যে এমুন ভুল করে। দুনিয়াতে এইরকম কত্ত কী ঘইটাও চলতাছে।

সানজিদা বিনু মানুষটার দিকে নিজের সমস্ত দৃষ্টি ঢেলে দিলেন। কালো সে। কিন্তু সেই কালো মোহময় হয়ে ওঠে সময়ে সময়ে। তার উত্তরেও ভাবনা-চিন্তার ছাপ ফোটে। দুনিয়াতে একের পর এক ঘটনা তো ঘটেই যাচ্ছে। এ জীবনে তিনি নিজেও যে ঘটনার নায়িকা হয়ে মিয়াবাড়িতে ঘুরপাক খাচ্ছেন।

আরমান ডাকল, ভাবি।

জি।

যাই তাইলে।

সানজিদা বিনু মাথা নাড়লেন। আরমান বেরিয়ে যেতেই তিনি গিয়ে বসলেন দক্ষিণ দিকের খোলা বারান্দায়। মালি আর মালির বউ বাগানের কাজে ডুবে আছে। তিনি দেখলেন আরমান সেদিকটা পেরিয়ে পুকুর পারের বাংলাঘরে গিয়ে উঠল। ওখানেই তার বসবাস। অনেক রাতে বাতি জ্বেলে বই পড়ে। বইয়ের নেশা লেগেছে ছোট বৌয়েরও। তাতে জীবনের যেসব উত্তর পেতে তিনি মাথা কুটছেন, সেসব প্রসঙ্গ কিছু সময়ের জন্য ভুলে থাকতে পারেন।

তারপর সানজিদা বিনু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেন, তাই কি ব্যাপার! বইপড়ার মাঝে ওরকম কিছুই পড়ে থাকে নাকি! আরমানেরও তাই! অথবা স্বামীরও যে বইয়ে হাত ছিল, তারও

মূলে দুঃখ ভুলে থাকার ব্যাপার-স্যাপারই কাজ করে নাকি!

শাহাদাত মিয়া বলতেন, রূপ না, পড়া দিয়েই মানুষ সুন্দর হয়।

তাহলে কি আরমানের কালো রং কোনো ব্যাপারই নয়! সুন্দর সে হয়েছে পড়া দিয়েই?

দক্ষিণ ঘুরে সূর্য এগিয়ে গেছে পশ্চিম আকাশের প্রায় মাঝপ্রান্তে। এখন তাতানো তাপ নেই সূর্যের গায়ে। অদৃশ্যের বিধাতা যে নিয়ম দিয়েছেন, সেই নিয়মে রাতের আকাশে সূর্য বিলীন হয়ে যাবার আগে কোমল আলোয় আলোয় ভরা হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাতে রক্তিম আভা ধরবে। নামবে রাত। রাত গিয়ে ফের সকালের সূর্য মুখ তুলবে পৃথিবীর দিকে। প্রকৃতির লীলায় বিশেষ বশীভূত ছিলেন শাহাদাত মিয়া। বৃষ্টি এলে অনেক সময়ই তাতে নেমে ভিজতেন তিনি।



জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিতেন বৃষ্টির পানি। পূর্ণিমার চাঁদ তাকে ডাকত। বলতেন, পূর্ণিমার চাঁদ কি খালি রূপবতী হয়, তার টানে জোয়ার-ভাটাও বায়।

তার বোধে আবেশায়িত হতেন সানজিদা বিনু। তাও কেন যে তিনি বেঁচে থাকতে সেটা মনে হয়নি! ফলে তাপ-অনুতাপ এসে যায় ঠিক। কিন্তু এখন যে এ নিয়ে নিজের কাছে স্বীকারোক্তি দিলেও ক্ষমা মিলল কি মিলল না জানবার উপায় নেই। তবে স্বামীর ছবির সামনে তিনি নিয়মিত দাঁড়ান। সাদা ফুল পছন্দ ছিল শাহাদাত মিয়ার প্রথমা স্ত্রী ফারজানা ইয়াসমিনের। পেটের বাচ্চা নিয়ে সেবারে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গেলে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। তাতে মৃত্যু হলো তার। সেই থেকে মৃতার ছবিতে শাহাদাত মিয়া সাদা ফুল এনে রাখতেন। পরে ওই সাদা ফুল তুলতে গিয়েই তো তিনি সাপের দংশনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তার অবর্তমানে ফারজানা ইয়াসমিনের স্বামীর ছবির সামনে প্রতি বিকেলেই তিনি বাগান থেকে সাদা ফুল তুলে এনে সাজান। আপনজনরা তার দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে সম্মতি আশা করে। কিন্তু নিজের মনে হয়, তা কেন! নতুন সংসার বাঁধলে সেই স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলে তিনি বলে উঠতেও পারেন, তোমার না আগে একবার বিয়ে হয়েছিল।

কী জানি কী। এসব হয়তো সানজিদা বিনুর নিছক দুর্ভাবনা। টুলটুলি এসে ডাকল, ছোট ভাবি।

কী?

বাগানে যাইবেন তো চলেন।

এ বাড়ির সবাই জানে প্রতিদিন বিকেলে সানজিদা বিনু বাগানে গিয়ে কেন সাদা ফুল তোলেন। এসব সময়ে টুলটুলি তার সঙ্গী হয়। মেয়েটার ফুল পছন্দ। রোজ বিকেলে ও কোনো না কোনো ফুল ঠিকই মাথার চুলে গোঁজে। টুলটুলি ডাকল, ভাবি।

কী?

একটা আবদার করি?

কর।

আরমান ভাইয়ের বউ দেখতে যাইবেন যেইদিন, হেইদিন আমারে লগে নিয়েন।

আরে, আমারে ক্যান ধরস। বৌ দেখতে যাওনের দিন আরমান কি তরে বাদ ফালাইব ভাবোস?

ছোট ভাবি।

কী?

ছোটকালে আরমান ভাইয়ের কাঁধে চইড়া কতবার বোলদিয়ায় গেছি। আইজ যে লেহাপড়ায় এতদূর আগগাইলাম হেই বর্ণটাও তাইনে আমারে হাতে হাত ধইরা শিখাইছেন। কন তো, তাইনে বিয়া কইরা মায়ের লগে গিয়া

থাকলে খালার কী দশা হইব ভাবলেন? তাইনে তো পোলার মতো কইরা আরমান ভাইয়েরে পালছেন-ললছেন। আমি কই কি, বিয়ার পরে বউ লইয়া তাইনে মায়ের লগে কয়দিন থাকলেন, মাঝে আইসা আমগো লগে থাকলেন।

সানজিদা বিনু হেসে জবাব দিলেন, ওই প্রস্তাব আমারে ক্যান, তর আরমান ভাইয়েরে দিলেই ফয়সালা পাবি।

হ, আমি কমু তারে। উডেন তো, উডেন বাগানে যাই।

কয়েক ধাপ দক্ষিণা বাতাস ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল চারদিকে। তাতে বারান্দার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঝোলানো কাঠের দোলনাখানা এমনই দুলে উঠল, যেন কেউ দুলিয়ে দিল। স্বামীর ডাক পেয়ে কখনও কখনও ওই দোলনায় বসে দুলেছেন সানজিদা বিনু। এখন সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে টুলটুলিকে নিয়ে তিনি বাগানে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

সত্যি, স্মৃতি যত মধুরই হোক, কি যাতনাময়– ওসবের আনাচ-কানাচ বাতাসে দোলনা দুলে উঠবার মতো করে অদৃশ্যের নিয়মে মানুষে মানুষে দোল খেলিয়েই যাচ্ছে।

ছয়

প্রতিশোধপরায়ণ বোনের ধর্ষক খুরশিদ মিয়াকে খুন করেছিল উমেদ মাঝি। এক রাতের অন্ধকারে আশেপাশে কোথাও ঘুরতে গেলে বাগে পেয়ে ঘাড়ে ধারালো রাম দায়ের এক কোপে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করেছিল খুনি। শুধু মিয়াবাড়ি কেন, এলাকার সব লোক বুঝেছিল খুনি কে! থানা-পুলিশ হলো। উমেদ মাঝিকে ধরা যায়নি; কেননা, সে এলাকাছাড়া হয়েছিল তারও আগে। কিন্তু অনেক বছর বাদে ঝড়ের তাড়া খেয়ে সে ছুটে গিয়ে হাজির হয়েছিল বোনের বাড়ির সামনে। পরের একরাতে অন্ধকার বুঝে মানুষটা এসে উঠল কোনাচলের মিয়াবাড়িতে। সেবারে ঘুমন্ত ভাগনেকে জাগিয়ে সে বলেছিল জোরে, আমি তর মামা রে।

তার ইচ্ছা নয়, মিয়াবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রাখুক আরমান। তাই ভাগ্নেকে মায়ের কাছে ফিরে যাবার আদেশ করল সে। অন্যথা হলে নওশিন খানমকে খুন করবার হুমকিও দিল। এ অবস্থায় মায়ের কাছে ফিরে যাওয়াই উচিত সাব্যস্ত বিবেচনা করলেন নওশিন খানম। সুজুনি বেগম এবং সিরাজ শেখেরও তাই মত।

তা না হয় হলো। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে মিয়াদের সয়-সম্পত্তি আগলে রাখার কাউকে তো চাই। এই প্রশ্নে নওশিন খানম উত্তর করেছিলেন, বংশের কেউ যেইখানে নাই, হেইখানে এই সম্পত্তির কী দাম!

আজকাল বোলদিয়ার পুরান বাড়ির মানুষগুলোর কাছে আরমান সংসার করে মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার খবরটা চাউর হয়েছে। সেসব জিজ্ঞাসার ঠিক উত্তর কাউকে দিতে গেলে যে সে ধরা পড়ে যায়। এখন যা হচ্ছে, সবই ভবিষ্যতের ধার ধারে।

সত্যিই, চলতি পথে নিজের ছায়া যেমন প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে থাকে, তেমন করেই এইসব ভাবনা তাকে ছাড়ান দেয় না। সকালে কোনাচল ছেড়ে নৌকায় করে দড়াবান্ধা বাজারে পৌছতেই নগেন্দ্র ঘোষ তাকে নিয়ে বসাল নিজের মিষ্টির দোকানে। দই-মিষ্টি দিল সামনে। বলল, খাও। কাছেদ আলী কইয়া গেল তুমি নাকি মায়ের ওইখানে গিয়া থাকবা? বিয়াও করতাছ। আরে, মিয়ার ঝিয়ে তো তোমারে ছাড়নের না বুঝি।

তার জিজ্ঞাসায় সঠিক উত্তর টানা সম্ভব নয়। তাই সে জবাব দিল, কী কমু। তয় ফুফুর মত পাওনেই আমি মায়ের কাছে গিয়া থাকনের ইচ্ছা লইছি।

দই-মিষ্টি খেল আরমান। তারপর ডাকল, নগেন।

কী?

মুগারকুর গিয়া থাকলে কি মাঝে মাঝে তোমার লগে দেখা-সাক্ষাৎ না হইব।

নগেন উত্তর করল, আগিলা দিনের মতো ভালা মানুষ এ জগতে কয়জন আর বাঁইচা রইছে। মিয়াগো সয়-সম্পত্তি কেউরে যে সামাল দিতে লাগাইবা, হিসাবে দেখবা ফাঁক আছে।

আরমান বুঝতে পারে নগেনের আলাপে কোনো ভান নেই। তাই সে জবাব দিল, তোমার মতো চিন্তা আমারও।

আরমান।

কী?

তোমার দিকে চাইয়া মাঝে মাঝে ভাবছি, এত্তডা বয়স হইল তাও বিয়ার নাম নাই ক্যান মুখে। কিন্তু কোনোকালে কওয়া হয় নাই। অখন কই, করো বিয়া।

আরমান হাসল। বলল, আইচ্ছা, হেই দিন যাইও আমার বরযাত্রায়।

দোকান থেকে বেরুবার মুখে দই আর মিষ্টির দাম দিতে গেলে গোপাল জবাব দিল, যখন যা খাও, মানা দিলেও জোর কইরা পয়সা দিয়া যাও। আইজেরটা না হয় বাকি থুইলা।

মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে আরমান বোলদিয়ার পথ ধরল। বিয়ে নিয়ে অনেকেই উৎসাহ জোগালেও আরমান এর অতলে পৌছতে পারছে না। সে দুর্ভাগ্যের শিকার। তারও মূলে লাঞ্ছিতা মায়ের নাম আসে। দুর্ভাগ্যের শিকার তো উমেদ মাঝিও। নওশিন খানম তা থেকে বাদ নন। শেষে এসে শাহাদাত মিয়ার অকালমৃত্যু এবং সানজিদা বিনুর বৈধব্য ধারণ সেও কি দুর্ভাগ্যের কম কোনো খেলা! আর একমাত্র ভবিষ্যতে গিয়েই কি এসবের বিনাশ নামবে।

খালি পায়ে মাটিমাখা হওয়ার মতোই কত কি জিজ্ঞাসা তাকে মাখামাখি দেয়। তাও মাঝে একটা উত্তেজনা তাকে চঞ্চল করতে থাকে। মায়ের ইচ্ছায় জন্মান্ধ সিরাজ শেখ অনেকগুলো টাকা তুলে দিয়েছে আরমানের হাতে। সেই টাকায় ইতিমধ্যে নাও কেনা হয়েছে। মিয়াদের পুরান বাড়িতে ফেলে সেটির গায়ে গাবের দুই প্রস্থ লেপও দেওয়া হলো। আজ বিকেলে সেটা মাথায় করে নিয়ে নামানো হবে উজানি খালে। তাতে মাকে চড়িয়ে বাড়ির বাইরে যেয়ে কত আলো তা দেখাবে ছেলে।

মিয়াদের পুরান বাড়িতে পৌছে সে দেখল কাছেদ আলী পুব ঘরের বারান্দায় বসে হুঁকো টানছে। তাকে সামনে পেয়ে বলল, গোলার ধান যে বেচতে কইলা হেই খবর দিছি মুনসুর ব্যাপারীরে। আইব সে।

গোলার ধান ক'দিন পরে বেচলেও চলত। কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজের পরামর্শ দিয়েই আরমান ধান বেচতে যাচ্ছে। সামনে যা সময় আসছে তাতে ফাঁক করে এদিকে তার আসাই হবে না হয়তো। ক'দিন আগেও পাট বেচে সে পয়সা তুলে দিয়েছে ছোট বৌয়ের হাতে। তার অনুপস্থিতিতে পুরান বাড়ির দায়দায়িত্ব বর্তায় কাছেদ শেখের দিকে। কিন্তু মানুষটার সেই যোগ্যতা নিয়ে সংশয় আছে। এসব চিন্তাও আরমানকে তাড়া করে।

মোদাব্বের এসে থামল পুবঘরের বারান্দায়। জিজ্ঞেস করল, কাকা, আইজ না তোমার নাও নামাইবার তারিখ?

হ রে বাবা।

নাও যে নামাইবা, ছাপ্পর তা অখনও লাগাও নাই।

লাগামু রে, লাগামু। ছইয়াল রে কইয়া থুইছি। দুইদিন পরে কোনাচলে গিয়া হেয় ছাপ্পর বুনাইয়া দিব কইল।

কাকা।

কী?

লও যাই. নাস্তা খাইবা। দাদা. তুমিও উডো।

রোজই উত্তরের ঘরে বসে সকালের খাবার খায় আরমান। আজ কাছেদ আলী আর মোদাব্বেরকে নিয়ে সেখানে ঢুকে দেখল. হরমুজ খাওয়া সেরে হাত-মুখ ধুচ্ছে। সে বলল. তোমগো থুইয়াই খাওয়া সারলাম। দুইডা গরু বহুত ছেইরাইছে! যামু কবিরাজ আনতে।

হরমুজ বেরিয়ে যেতেই তিনজনের পাতে ভাত বেড়ে দিল তার বৌ। রান্না করা হয়েছে শুঁটকির ভর্তা. শোলমাছ দিয়ে বেগুনের ঝোল. আর মসুরির ডাল। দুধ. কলা. গুড়ও আছে। সবাই খেল তৃপ্তিসহকারে। হরমুজের বউ ডাকল. আরমান ভাই।

জি ভাবি।

আপনে যদি মুগারকুরে যাওনডাই ঠিক করলেন. তাইলে পোলাডারেও লইয়া যাইয়েন ওইহানে।

ক্যান বড় ভাবি?

আপনে না থাকলে হের পড়া দেখব কেডা?

শোনেন ভাবি. আমি না থাকলেও স্কুলের দুইজন মাস্টার আইসা পড়াইয়া যাইব আপনের পোলারে।

মোদাব্বের বলে উঠল. এইবার আমি পাস করমুই গো কাকা। যেইখানেই যাও তুমি আমারে খালি হেই দোয়াডা দিও।

ছেলের আকুতি খেয়াল করে ভিজল মায়ের দু'চোখ। সেদিকে তাকিয়ে আরমানের চোখও জল ভেজা হলো। কাছেদ আলীও কাঁদো কাঁদো গলায় বলল. আমিও আল্লারে কই. এইবার নাতি রে পাস করাও গো তুমি।

সেই দৃশ্যে আরমানের দু'চোখে আর্দ্র ছাপ পড়ে।

সাত

জ্বর আসে. জ্বর নামে। কয়দিন ধরে এই যাচ্ছে নওশিন খানমের। কমেছে তার খাওয়া-দাওয়া। হাঁটতে গিয়েও পায়ের তীব্র ব্যথায় কখনও-সখনও হাঁটু ভেঙে বসে পড়েন। চোখের দৃষ্টি হঠাৎ করেই অনেক বেশি ঝাপসা হয়ে এল। সবচেয়ে বড় ডাক্তার ভবতোষ রায় তার চিকিৎসা দিচ্ছেন। কিন্তু তাতে উপশমের লক্ষণ নেই। তাই ওই ডাক্তারের পরামর্শেই ঢাকায় নিয়ে তার রক্ত. কফ. বুক ইত্যাদি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছোট বৌ। এতে আরমানেরও বেজায় সমর্থন মিলেছে। কিন্তু নওশিন খানম বেঁকে বসলেন। বললেন. ঢাকায় নিয়া ডাক্তারি পরীক্ষা করাইলে কী হইব. এই ভাঙা গতর কোনো ওষুধেই সোজা কইরা খাড়ানের না।

তিনদিনের জ্বর পেরিয়ে গত দু'দিন নওশিন খানমের গায়ে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় ছিল। কিন্তু আজ সকালে নাস্তা সেরে তার জ্বর কাঁপুনি দেখা দিলে শয্যাশায়ী হলেন। প্রলাপও বকতে থাকলেন। তাতে আরমানের খোঁজ বিশেষভাবে ছিল। অনেকক্ষণ মাথায় পানি দেওয়ার পর রোগীর জ্বর একশ' সাড়ে চার থেকে একশ' একের কোঠায় নামল। তার দিকে তাকিয়ে সানজিদা বিনু বললেন. আপনেরে আগেই ঢাকা নিয়া ডাক্তার দেখান দরকার আছিল ফুফু।

না ছোট বৌমা।

ক্যান?

যামু যে. আমার গতরে কি আগের শক্তি আছে!

আপনে কি হাঁইটা যাইবেন ঢাকায়. যে গতরে শক্তি দরকার!

তাও না।

ক্যান?

বয়সের ভাঙন ওষুধে সারনের না গো মা।

তা হয়তো ঠিক। তবুও চিকিৎসায় শরীরের বিষ-বেদনা কিছুটা হলেও সারানো যায়। কিন্তু তাতে ফুফু শাশুড়ির সায় নেই। তার পেছনে নিশ্চয় হতাশার প্রভাবই মুখ্য কারণ। সানজিদা বিনু খেয়াল করলেন. আসলে আরমান মুগারকুরে গিয়ে স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলবে। বৃদ্ধা মুষড়ে পড়েছে এই খবরে। ভাইয়ের ছেলে হলেও তাকে তিনি কাছে নিয়ে এসে মায়ের মতো যতন দিয়েই এতটা বড় করলেন। ভাইপুত্র মায়ের কাছে চলে গেলে মিয়াদের সয়-সম্পত্তি অনেকাংশে অরক্ষিত হয়ে পড়বে এই দুশ্চিন্তা নিশ্চয় তার মধ্যে আসে। তাই ওদিকটা নিয়ে ফের কোনো আলাপ না তুলে ছোট বৌ বললেন. এত্ত বেইল হইলেও আধা গ্লাস দুধ খাইছেন মোটে। পেটের ভুখ না থাকলেও অসুখে জোর কইরা হইলেও এইডা-হেইডা মুখে দেওন দরকার। আপনার পছন্দের ছানার সন্দেশ আছে ঘরে। খান একটু!

না গো ছোট বৌমা। আমার ভুখ যেমুন মইরা রইছে। আরমানে কই?

হে তো সকালে ঘুম থেকে উইঠা আপনের লগে দেখা কইরা বোলদিয়ায় গেল।

ও. অখন বুঝি সকাল!

সানজিদা বিনু তার জিজ্ঞাসায় অনুমান করেন. জ্বরের ঘোরে ফুফু শাশুড়ির মনে এক-আধটু ভ্রান্তি কাজ করছে। তবে তিনি জবাব দিলেন. হঁ ফুফু. সকাল কি. বাইরে চাইয়া দেখেন কেমুন রোইদ উঠছে।

জবাবে নওশিন খানম বরঞ্চ চোখ বুজে ডেকে উঠলেন. ছোট বৌমা।

জি ফুফু।

মানুষের মরণ তো ঠিক। আমিও হেই সময়ে আইসা ঠেকলাম। আল্লার বান্দা আল্লা আপনা নিয়মে ফিরাইলা লইব নিজের কাছে। মাঝে জীবনের নানা তুফানে ভুগলাম। তাও দিশ হারাই নাই। আইজ বিছনায় শুইয়া শেষ ভাবনাটা কী ভাবলাম শুনবা?

কন ফুফু।

জ্ঞানে কোনো মিছা কই নাই। তাও একখান ভুল আমারে বহুত ঘায়েল করতাছে।

ফুফু শাশুড়ির মুখে একি আলাপ! কথা কইতে গিয়ে তার কণ্ঠ কণ্ঠের সঙ্গেই যেন লেগে গিয়ে ঠোকর খাচ্ছে। কেমন ভাঙা ভাঙা স্বর। সানজিদা বিনু এতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন. কী ভুল গো ফুফু?

ব্যাপারটা খুব গোপন। কেউ শুনলে বিপদ। দেখো লারেবিত্তে টুলটুলি. কি টুলটুলির মায়নি?

সানজিদা বিনু জানলার বাইরে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে জবাব দিলেন. না. কেউ নাই।

ছোট বউমা।

জি ফুফু।

আমি কখন না কখন চোখ মুনজি ঠিকনি আছে। তার আগে তোমার কাছে আমার একখান মিনতি আছে।

সানজিদা বিনু জবাব দিলেন. কী যে কন ফুফু. মিনতি কি. আপনে আমারে আদেশ করেন।

তুমি এমুন কইলেই কি. আসলেই এইডা তোমার জাননের বুঝনের ব্যাপার।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন অস্থির স্বরে প্রশ্ন করল. কী জাননের-



এই উত্তর শুনে সানজিদা বিনু হতবাক হলেন। নওশিন খানম তার ডান হাতখানা নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে বললেন, হ ছোট বৌমা, অবৈধ। অবৈধ সন্তান তো আমিও, পরে আমার মায়রে বাবা বিয়া কইরা ঘর দিছিলেন। অবৈধ হইলেও আমি যেমুন, আরমানেও হেমুন তোমগো মতোনই এই দুনিয়ার মানুষ।

ছোট বৌয়ের চট করে মনে পড়ল, নারীলোভে খুরশিদ মিয়ার খুন হওয়ার ঘটনাখানা। তাহলে যে নারীরে ভোগের আওতায় আনার ফলে শ্বশুর খুন হলেন, আরমান সেই গর্ভের সন্তান। তবে এই কৌতূহল সত্ত্বেও তা নিয়ে তার মুখে কোনো প্রশ্ন সরে না। নওশিন খানম এসব প্রকাশ করতেই বদ্ধপরিকর হওয়ায় বললেন, আরমানের মায়েরে তুমি চিনো, ওই যে আমার কানা মামাতো ভাই, তার বৌ সুজুনি। ওই হইল গিয়া আরমানের মা।

হঠাৎ খেয়ালে মিয়াবাড়ির আদ্যোপান্তের সন্ধানে নেমেছেন সানজিদা বিনু। আজ ফুফু শাশুড়ির আলাপে চমকে ভাবলেন, এ যে গল্প-উপন্যাসের অবিশ্বাস্য এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী ছাড়িয়ে এক সত্য আখ্যান। কিন্তু এও যে প্রশ্ন, কেন ছোট বৌয়ের সামনে নওশিন খানম এসব সত্য প্রকাশ করলেন। নওশিন খানম ডাকলেন, ছোট বৌ।

জি।

জানো তো মিয়া বংশ শেষ হইছে শাহাদাত মিয়া মরণের লগে লগে। এখন তুমি তো জানলা তা না। আমরা চাইলে আরমানরে দিয়া এই বংশের নতুন শুরু করতাম পারি। আর ওইসব খবর তোমার বাইরে কেউরে দেওনেরও না। হের পরেও আমার কী ইচ্ছা, শুনবা?

জি ফুফু, কন, কন আপনে।

ছোট বৌমা।

জি।

আমি এমুনও দেখছি স্বামী মারা যাওনের পর হেই বউয়ের বিয়া হইছে দেবরের লগে। এই বিপদে তুমি আরমানের হেমুনের বউ হইলে বংশডার বিনাশ ঠেকান যায়।

সানজিদা বিনু বাক্য হারালেন। তার ভাবনাগুলো যেন পাত্তা নেই হয়ে পড়ল। দু'চোখ ছাপিয়ে এল কান্না। কিন্তু তিনি বুঝলেন, সেই অশ্রু চোখের কোল না ছাপিয়ে চোখের ভেতরেই টলমল হয়ে আছে।

বুঝনের আমার?

শোনো, আরমানরে যে দেখতাছ, হেরে আমার মামাতো ভাইয়ের পোলা হিসেবে চিনলেও আসলে তা না।

এই জবাবে সানজিদা বিনু পা হড়কে পড়ে যাওয়ার মতো করে প্রশ্ন করলেন, তাইলে তার কী পরিচয়?

শোনো, তার জন্ম তোমার শ্বশুরের ঔরসে। এতকাল হেই কথা লুকাইয়া গেলেও আইজ তোমার কাছে স্বীকার করলাম বড় আশায়।

ফুফু, আরমান তাইলে এই বংশের পোলা?

হ ছোট বৌমা। তবে বৈধ না, অবৈধ সন্তান।

আট

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর মাথায় করে আটজন মানুষ আরমানের নৌকা বয়ে নিয়ে নামিয়ে দিল উজানি খালের পানিতে। সেই উপলক্ষে পুরান বাড়ির জন্য দশ সের মিষ্টি আর ছয় পাতিল দই কিনেছে আরমান। নৌকায় চড়ে কোনাচলের দিকে মুখ করতেই সবাইকে ছেড়ে মোদাব্বের এসে থেমেছিল তার পাশে। সেই সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বলেছিল, জানছি তো মিয়া দাদিরে জ্বরে পাইছে। কত্তদিন দেখি না ওনারে। তোমার লগে যাওনের ইচ্ছা আছিল। তাও থামলাম আরেক চিন্তায়। আমি ওইখানে গেলে তুমি তো কইবা, ও টুলটুলিরে দেখনের ইচ্ছা বুঝি।

ওই কথার পর মোদাব্বেরকে নৌকায় ওঠাতে চেয়েছিল আরমান। ছেলে তাতে উত্তর করেছিল, না গো কাকা, যারে পাওনের না, তার সামনে পইড়া নিজেরে হুদাহুদি ক্যান উসকাইতে যাই।

গয়না নাওয়ের মতো করে আরমানের নৌকাখানা বৈঠার টানে তরতর গতিই নিয়েছে। কোনাচলের পথে এগুতে

এগুতে মোদাব্বেরের মুখটা তার স্মরণে স্পষ্ট হচ্ছিল। মেয়েটাকে ভুলতেই পারছিল না ছেলেটা। নিজের তো তার কোনো মেয়েকে ভালো লাগার ঘটনা নেই। থাকলে আরমান অনুভব করতে পারত সেই আবেদন।

চলতে চলতে নওশিন খানমকে ঘিরে দুশ্চিন্তার ঝড়-ঝঞ্ঝা পোহায় আরমান। কঠিন রোগভোগে মানুষের দেহ যেমন হাড়সর্বস্ব হয়ে যায়, তেমন ভাঙন যেন নেমে এল তার দেহে। সুজুনি বেগমকে বাঁচিয়ে রাখলেন তিনিই।

উজানি খালের ভাটা গিয়ে মিশেছে দক্ষিণের শীতলক্ষ্যা নদে। তারই টানে নৌকা গিয়ে ঠেকল কোনাচলের মিয়াবাড়ির ঘাটে। আরমান প্রথমেই ঢুকল নওশিন খানমের ঘরে। তিনি ঘুমোচ্ছেন। তার পাশে বসা টুলটুলির মা জানাল, তুমি হেপার হাওনের পরে বুবুর গতর কাঁপানি জ্বর উডছিল। তয় অখন পুরাপুরি ভালা।

কী খাওয়াইছেন ফুফুরে।

নরম ভাত, লগে কই মাছের বিরান, শিং মাছের ঝোল, মুগ ডাইল, দইও দিছিলাম। খাইলেন তো বেবাকই একটু একটু। পেটটা আতাইত থাহনেই তাইনে এমুন পইড়া পইড়া ঘুমাইতেছেন। ডাকমু বুবুকে?

না।

ওখান থেকে বেরিয়ে আরমান গেল সানজিদা বিনুর দুয়ারের সামনে। ডাকল, ছোট ভাবি।

তাতে ওইপক্ষে সাড়া এল না। আরমান ভাবল, হয়তো এই ডাক তার কানে পৌঁছায়নি। সে দেখল তিনি দুয়ারের দিকে পেছন দিয়ে চেয়ারে বসে কোনো একটা বই পড়ছেন। এবারে সে উঁচু গলায় বলে উঠল, ছোট ভাবি, ফুফুর যা অবস্থা, তারে ঢাকায় নিয়া চিকিৎসা দেওন দরকার।

সানজিদা বিনু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। মুখও ফেরালেন দরজার বাইরে দাঁড়ানো আরমানের দিকে। সে কি না জানে আর নওশিন খানমের ইচ্ছা! অন্য সময় হলে তাকে সাদর দিয়ে বসাতেন নিয়ে ঘরে। আজ যে মিয়াবাড়ির এক অপার রহস্য তাকে জড়িয়ে ফেলেছে। তাও ছোট বৌ জবাব দিলেন, ফুফুরে নেও তাইলে ঢাকা।

ছোট ভাবি।

কী?

একখান আবদার আছিল আপনের কাছে।

কও।

না, ব্যাপার হেমুনের কিছু না। জানেন তো, মায়রে চড়ানের লাগি একখান নয়া নাও কিনছি। ওই নাওখান ঘাটে বান্ধা। আমি কই কি, চলেন, টুলটুলি, টুলটুলির মা, ফুফুরে লইয়া আপনে হেই নাওয়ে চড়বেন।

মিয়া বউ কোনো উত্তর করলেন না। কেমন যেন অস্থিরতা প্রকাশ পেল তার আচরণে। ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরে গেলেন কয়েক পা। আলনায় কাপড় গোছানো আছে, তাও এগিয়ে গিয়ে সেগুলো আরও অগোছালো করে ফেললেন। তারপর আরমানের দিকে ফিরে কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করলেন, তোমার নায়ে চড়তে যামু ক্যান? মিয়াগোই তো কত্ত কত্ত নাও।

আরমান মুখ ফেরালো। এগুতে গিয়ে দু'পায়ে এত ভার ঠেকল যে, তাতে পানি এসে ফোলা ফোলাই হয়েছে এমন ভাব। নিজেকে ওরকম টেনে টেনেই আরমান গিয়ে ঢুকল পুকুর পাড় লাগোয়া বাংলাঘরে। গা ছাড়ল বিছানায়। আর আকাশে ঘন ঘন মেঘ গর্জে ওঠার মতোই নিজের মধ্যে থাকা নিজের একটা প্রশ্ন এমন ঘন ঘন আওয়াজ তুলছিল, হায়, এ কোন ছোট বৌ!

নয়.

নওশিন খানম ঘুম থেকে সজাগ পেলেন সন্ধ্যাকালীন নামাজের আজান শুনে। দাঁড়াবার শক্তি খুইয়েছেন তিনি। তাই বিছানায় বসেই নামাজ সারেন। তারপর তিনি টুলটুলির মাকে কাছে পেয়ে জানতে চাইলেন, আরমানে কি ফিরে নাই?

বুবু, হেয় দুইবার কইরা আইসা আপনেরে ঘুমে পাইছে।

টুলটুলিরে পাঠাইয়া তারে আনাও।

ডাক পেয়ে আরমান এসে বসল নওশিন খানমের পাশে। বলল, যেয় যেইডায় কউক, তোমারে ঢাকায় নিয়া চিকিৎসা করানটাই সাব্যস্ত।

না রে পোলা।

ক্যান?

আমার বুইড়া গতর হেঁছড়াইরা ঢাকায় নিলে আগেই আমি আধমরা হইয়া যামু। থাক, হেই আলাপ থাক। আইজ যে তর লগে একখান ফায়সালা করনের আছিল।

আর কী ফায়সালা বাকি রইল নওশিন খানম এবং আরমানের মাঝে। তারই ভাইপুত্র জিজ্ঞেস করল, ফায়সালা কী গো ফুফু?

তিনি বললেন, আয় তুই আমার লগে।

কই?

আমারে লইয়া নিয়া বসা বারান্দায়। ওইখানে গিয়া শুনবিনে কী ফায়সালা।

খানিক আগে সানজিদা বিনুর নিষ্ঠুর আচরণের হেতুর তল খুঁজলেও এর কিনারা পেল না আরমান। এখন ফুফুর মুখে ফায়সালার কথা শুনে সে বেশ ধন্দেই নিপতিত হলো। তবে বিষয়টা পরিষ্কার করার প্রয়োজনে ফুফুকে ধরে নিয়ে বসালো বারান্দার উত্তর-পশ্চিম কোণে পাতা আরাম কেদারায়। নওশিন খানম বললেন, চোখের জ্যোতিও কমল। দেখ তো, দেখ, আছেনি আমগো আগে-পিছে কেউ?

সন্ধ্যা এখন প্রগাঢ় হয়েছে। সেই আলো-আঁধারে এদিকে-ওদিকে কাউকেই নজরে করতে পারল না আরমান। তাই বলল, না ফুফু, অখন কও, তুমি কী এমুন কথা কইতে আইলা আড়ালে।

পোলা রে।

কী ফুফু।

তরে কিছু কইতেই ডাইকা আনছি আড়ালে। তুই কি জানস বড় ভাই মারা গেলে হের বিধবা বউরে ছোট ভাই বিয়া করনের চল আছে মুসলমান সমাজে?

ও রকম উত্থাপনে ভড়কে গিয়ে সে প্রশ্ন করল, আইজ তোমার কী হইছে ফুফু? কী কী সব উতলা আলাপ জুড়লা যে?

উডলা না রে, উতলা না। হাছা।

কী হাছা?

আমি ছোট বৌরে জানাইয়া দিছি তর লগে তার হেমুনের বিয়া হইলে তগো দুইজনের যেমুন, মিয়া বংশেরও তেমুন বাঁইচা যায়।

এইডা কী করলা ফুফু! তারে তুমি তো অপমান করতে পারো না। আমিও না। অখন বুঝলাম, ছোট ভাবির মুখখান ক্যান এত্ত মেঘ থমথম।

আরমান।

কও ফুফু।

রাগ করলে রাগ করতে পারোস। তয় যা করছি, হেতে আমার ভুল নাই। ছোট বৌ শিক্ষিতা মাইয়া, তাইনে তরে না

বুঝনের কী আছে?

এতে প্রতিউত্তর ফেরাল না আরমান।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা এগিয়ে গিয়ে রাতের সীমানায় পা ফেলেছে। ক্রমে ক্রমে রাতের অন্ধকারে ঢাকা পড়বে চরাচর। সেদিকে চোখ রেখে আরমান শুধু ভেবে চলে, হায়, এবারে ছোট বৌয়ের মুখোমুখি হয়ে কিবা হবে তার উত্তর।

রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে আরমান কোনো না কোনো বই খুলে বসে। আজও একই নিয়মে বই পড়তে পড়তে ক্লান্তিবোধ করায় সে বিছানায় গা ছেড়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল। তবে জাগতে হলো ছোট বৌয়ের কণ্ঠ শুনে। তিনি ডাকলেন, আরমান, ও আরমান।

মুহূর্তেই বিছানায় উঠে বসল আরমান। তাকাল ছোট বৌয়ের দিকে। শোয়ার আগে হারিকেনের আলো কমাতে ভুলে গিয়েছিল সে। এখন সেই আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল সামনে দাঁড়ানো ছোট বৌ। টেবিলের ওপর রাখা টেবিল ঘড়িটায় টিকটিক আওয়াজে চোখ গেল। সেটির ঘণ্টার কাঁটা গিয়ে ঠেকেছে রাত তিনটার ঘরে। আর সেকেন্ডের কাঁটা এইমাত্র সাঁইত্রিশ মিনিটের ঘর ছাড়িয়ে গেল। এ স্বপ্ন নয় তো! সত্যি, গভীর রাতে তিনি কেন এসে উঠবেন আরমানের ছোটঘরখানিতে! তাই সে চমকে জানতে চাইল, ছোট ভাবি, আপনে যে! ফুফুর কি কোনো অসুবিধা?

না আরমান।

তাইলে?

আম, জাম, কাঁঠাল ফল পাকনের গরম পড়ছে। গাছের কোনো পাতারও নড়াচড়া নাই। তাই ভাবলাম কি, নায়ে কইরা উজানি খালে গেলে এট্টু ঠা া বুঝি পাওয়া যায়। তুমি না নাও কিনছ, চলো, এই সুযোগে তোমার হেই নায়ে চড়ি।

এতকাল যে সানজিদা বিনুকে দেখে আসা এখন যে তলে তলে তার অন্য রূপ। তবে এর শেষটা বুঝে নেওয়ার তীব্র নেশায় আরমান অনেক দূর পর্যন্ত ছুটতে রাজি। তাই ছোট বৌকে নিয়ে সে মিয়াদের ঘাটে বেঁধে রাখা নতুন নৌকায় চড়ে হাতে বৈঠা তুলে নিল। মিয়াবউ ডাকল, আরমান।

জি, ছোট ভাবি।

বাড়িতে এইসব আলাপ করতে গেলে কেউর কানে যাইতেই পারে। তাই তোমারে লইয়া আসলাম এইখানে।

হাল ধরে বসে থাকা মাঝি তাতে কী উত্তর করবে বুঝতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সে তো শ্রোতা। আর কথকের ভূমিকায় আছেন সানজিদা বিনু। তার বয়ান শুনবার অপেক্ষা যে আরমানের। তিনি ডাকলেন, আরমান।

জি, ছোট ভাবি।

ফুফু আমারে জানাইছেন সবই।

আরমান জবাব দিল, ফুফু আমার লগে আপনের বিয়ার আলাপ না তুললেই ভালা করতেন।

তোমার পরিচয় পাইয়া আমি মুখ ঘুরাইয়া নিছি তা কিন্তু না। ফুফুরও অবৈধ সন্তান পরিচয় আছিল। তবে কি-না শিক্ষা দিয়া, ব্যবহার দিয়া তিনি বড় হইছেন। মানুষ তো মানুষই আরমান। হেতে বৈধ-অবৈধ কী?

নিরুত্তর আরমান। তবে বৈঠা চালাতে চালাতে ছোট বৌয়ের কথাগুলো মরমে বাঁধে সে। আকাশে প্রথমপক্ষের ফালি চাঁদকে ঘিরে কিছু নক্ষত্র দৃশ্যমান অবশ্য। কিন্তু ওই আলোয় রাতের অন্ধকার একটুও পরিষ্কার হবার নয়। মাঝে এক-আধটু মেঘও যেন জমছে। বাতাস না থাকায় গুমোট গরম ক্রমে ক্রমে আরও বাড়ছে। সানজিদা বিনু সেদিকে তাকিয়ে বললেন, বৃষ্টি যদি হইত।

আরমান ভাবল, শুধু বৃষ্টি কেন! আসুক এখনি মেঘ তুফান। তাতে দুজন নৌকায় ভাসতে ভাসতে কোনো অজানায় গিয়ে পড়লে কেমন হয়!

পর মুহূর্তে সে সচেতন হলো। ছি। এ কেমন ভাবনা। আরমানের মনে ও রকম তো কখনো আসেনি।

ছোট বৌ ডাকলেন, আরমান।

জি।

বিকালে তোমার সাথে যে ব্যবহারটা করলাম হেইডা মাফ দিও ভাই।

ব্যাপারটা আমি ভুইলাই গেছি ছোট ভাবি।

আরমান।

জি।

তুমি যে এই বাড়ির সন্তান হেই সংবাদ লুকাইয়া চলা বাদ দিয়া বুইঝা লও তোমার অধিকার।

না ছোট ভাবি।

ক্যান?

ওইতে আমার মায়ের পরিচয় লইয়া টান পড়ব। ওনার এক কথা, তুই কেমনে মিয়াবাড়ির পোলা হইলি হেই কথা কেউ জানলে আমি গলায় দড়ি লইয়া মরুম। জানেন তো না, খুরশিদ মিয়ারে খুন করল আমার মামা উমেদ মাঝি। তারও এক কথা, তুই এই বাড়ি ছাড়।

দশ

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সানজিদা বিনু। কিন্তু গুমোট গরমে ঘেমে ওঠার ফলে তার ঘুম ভাঙল। দেয়ালঘড়ির টিকটিক আওয়াজ এলো কানে। সেদিকে তাকাতেই টেবিলের ওপর রাখা হারিকেনের আলোয় দেখা গেল ঘণ্টার কাঁটা তিনটার ঘরে পৌঁছেছে। আর সেকেন্ডের কাঁটা এইমাত্র ১০ মিনিটের ঘর পেরোল। শয্যা ছেড়ে দক্ষিণের বারান্দায় গেলেন সানজিদা বিনু। খানিক বাতাস পেলে দেহের স্বস্তি মিলত নিশ্চয়। কিন্তু বাতাসের কোনো নাগাল নেই। তাই পাতা-লতাও স্থির। জ্যৈষ্ঠ শেষের ক্ষয়ে আসা চাঁদের টিমটিমে জ্যোৎস্নার কী-বা জোর যে, ওই আলোয় ভুবন ধুয়ে দেয়। আকাশে আধা আধা মেঘ দৃশ্যমান হলেও ওড়াউড়ির বদলে কেমন যেন অনড় হয়ে পড়েছে। রাতের এ রকম অন্ধকারের খানিক ওপারের বাংলা ঘরের জ্বলতে থাকা হারিকেনের দিকে চোখ গেল ছোট বৌয়ের। নিজের কেনা নৌকায় পছন্দের ছোট ভাবিকে চড়াতে চেয়েছিলেন তিনি। অথচ জবাবে বললেন কিনা, তোমার নায়ে চড়মু ক্যান? মিয়াগো ঘাটেই না কত্ত নাও? পরে বোধ হলো, ভালো মানুষটার প্রতি খুবই অন্যায় আচরণ করলেন সানজিদা বিনু। ফুফুশাশুড়ির মুখে তার জন্মবৃত্তান্ত শুনে বিস্ময়ের গভীর অতলে গিয়ে ঠেকেছিলেন তিনি। তার ওপর তাকে বিয়ে করার প্রস্তাবে দিশেহারা হয়ে সানজিদা বিনু ছুটে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে। আরমানের সঙ্গে যে আচরণ তিনি করে বসছেন, একান্তভাবে তা ছিল ভ্রান্তির ফসল।

অল্পক্ষণ বাদেই চেতনা ফিরে আসার মতো করে ভ্রান্তির অবসানে তার মুখোমুখি হয়ে ক্ষমা চাইবার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। তবে তাকে আলাদা করে নিয়ে কথা বলার সুযোগ মিলল না। এখন আরমানের ঘরে গিয়ে বিষয়টা উপুড় ঢেলে দিতে পারলে নিশ্চয় সানজিদা বিনুর বুকে লাগা ভার সরানো যায়।

সিঁড়ি ভেঙে নিচতলায় নামলেন তিনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে থামলেন বাংলা ঘরের দুয়ারে। মানুষটা ঘুমুচ্ছে।

যখন জেগে নেই, তখন ফিরে গেলেই ভালো। কিন্তু তাও নিজের অজান্তেই তিনি ডেকে উঠলেন, আরমান, ও আরমান।

জাগল আরমান। একি, মিয়াবৌ যে! মুহূর্তেই অবাক-মানা-স্বরে সে বলে উঠল, ছোট ভাবি আপনে যে!

আরমান।

জি।

কী ভ্যাপসা গরম। ঘরে টিকতি পারলাম না। তুমি না নাও কিনছ, চলো হেই নাওয়ে আমারে চড়াইবা।

জি ভাবি, চলেন।

ঘরের দুয়ার পেরোল আরমান আগে। তার পেছন নিয়ে চলতে থাকা সানজিদা বিনু বললেন, তোমারে কয়ডা কথা শোনানের ইচ্ছা। তয় ওই যে কয় না, দেয়ালেরও কান আছে। তাই ঠিক করলাম, যাই উজানি খালের পানিতে তোমারে লইয়া ভাসতে ভাসতে ওইসব আলাপ সারি।

আরমান জবাব দিল না। তবে মনে পড়ে গেল, তার অতীত। কিশোরকালে জন্মান্ধ সিরাজ শেখের মুখে খুরশীদ মিয়ার প্রসঙ্গ পরিষ্কার হওয়ার পর সে বিচার চাইতে ছুটে গিয়েছিল কোনাচলে। আচ্ছা, ছোট বৌ কি ও রকম আশপাশ ভুলে ছুটে এসেছে আরমানের কাছে কোনো জবাবদিহি করতে।

সানজিদা বিনু চড়লেন নৌকায়। বসলেন নৌকার পাটাতনে গলুইয়ে হাল ধরে থাকা মাঝির দিকে মুখ করে। বললেন, নাওখান তো বেশ বড়সড়।

জি ছোট ভাবি। বড় কিনলাম, যাতে অনেকরেই নাওয়ে চড়াইতাম পারি।

আরমান।

জি।

বিকেলে তোমারে যা কইছি, তা কিন্তু আমার মনের কথা না। ওই যে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া একটা গান আছে না, 'ভুল, ভুল সবই ভুল। এ জীবনের পাতায় যা লেখা সবই ভুল' ওই রকম ভুলই যেমুন ধরা হইল আমার জীবন। ফুফু তোমার লগে আমার বিয়ার আলাপ দিতেই হেই ভুলের মাঝে ভুলই লাগছিল আমার। আজ বিকেলে তোমার লগে যা করলাম, হেইডা ভুলেরই দায়। ক্ষমা দিও ভাই।

ক্ষমা কি ছোট ভাবি। এই লইয়া আমি তো উল্টা ফুফুরে দোষলাম। ঠিকই তো, তাইনে আপনেরে ওমুন অপমান করলেন ক্যান?

ভুল কইলা।

ভুল ক্যান ছোট ভাবি।

তার জায়গায় আমি হইলে এই রকমই কইতাম।

আরমান রাহীন হয়ে বৈঠায় চাড়ি তোলে। তবে জোয়ারের টানে নৌকা বেশ তড়তড় বয়ে চলে। সানজিদা বিনু ডাকলেন, আরমান।

জি ছোট ভাবি।

তোমার পরিচয় পাইয়া আমি মুখ ঘুরাইয়া লইছি, তা কিন্তু না। ফুফুও তো অবৈধ সন্তান। তবে কিনা শিক্ষা ব্যবহার দিয়া তিনি বড় হইলেন। মানুষ তো মানুষই। হেতে বৈধ-অবৈধ কি! তাই কই কি তোমার মতো পুরুষের লগে সংসার হইলে আমার আপত্তির কিছু আছিল না। কিন্তু সত্য হইল, এই রকম কখনও হওনের না। ক্যান, শুনবা?

সেই জিজ্ঞাসা কানে গেলেও হাল ধরে থাকা মাঝি না করে রা, না নাড়ে মাথা। তবে তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই ছোট বৌয়ের। তাই বলেন, সংক্ষেপে কইতে পারি, এই বেদন বহুত তলের। জানো তো, প্রথম বৌয়ের জন্য ছিল তোমার ভাইয়ের সব ভালোবাসা। সেই অভিমানে অভিমানী হইলাম আমি। স্বামীরে হারাইয়া পরে মন কি কইল শুনবা?

কী?

শোনো, স্বামী মারা যাওনের পরে মন কইল, এইডা কী করলাম! আপনা অভিমান ছাইরা তারে মমতা-ভালোবাসা দিলে কিছু কিছু বিরহ ভুইলা থাকতে পারতেন। হইতে পারে, আমি লগে থাকলে হেইদিন উনি যে সাদা ফুল তুলতে গেলেন, হেই সময়ের আগপিছ হইতে পারত। তাতে হাসনুহেনার ডালে আড়াল নেওয়া সাপ দংশাইতে না পারারই কথা। আইজ ওই ভুলের দায় ফিরা ফিরা মনে পড়ে।

আরমান এতে কোনো জবাব টানল না। দূরে কোথাও মেঘ গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সানজিদা বিনু বলে উঠলেন, মেঘের ডাক শুনলাম।

জি ছোট ভাবি।

নামুক। বৃষ্টি নামুক।

আরমান ভাবল, শুধু বৃষ্টি কেন! উঠুক ঝড়-বাদলা। তাতে পথ হারিয়ে নৌকা গিয়ে পড়ুক দূর অজানায়। পরমুহূর্তে সে লজ্জিত হলো এই ভেবে যে, ছি-ছি। এ কেমন ভাবনা তার। আসলে ছোট বৌকে নিয়ে এমন স্বপ্ন কল্পনায় কখনই জাগেনি আরমানের। তাই সে ভুলে ক্ষমা চাওয়ার মতো করে বলে উঠল, আপনের লগে সংসার করন দূরে থাক, ওই চোখও করি নাই ছোট ভাবি।

দূর থেকে বাতাস ধেয়ে এলো। প্রথমে মন্থর গতি ছিল যদিও, প্রবল আকার নিতে দেরিও করল না সেই ঝড়। আশপাশে লুকিয়ে থাকা মেঘও হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল আকাশের গায়ে। সেদিকে তাকিয়ে সানজিদা বিনু চমকে বলে উঠলেন, এ যে তুফান। নাওয়ের মুখ ফিরাও আরমান।

আরমান তাই করল। উজানি খালের পানিতে বৈঠাখানা সে শক্ত হাতে তুলছে ফেলছে। আজ ছোট বৌয়ের অদ্ভুত এক খেয়ালের শিকার হতে হলো তাকে। সেই কথা দু'জনের বাইরে কাউকে জানতেও দেওয়ার নয়। অবার ভুলবারও নয় ইহজীবনে। সানজিদা ডাকলেন, আরমান।

জি ছোট ভাবি।

ক্যান যে এতদূর আসতে গেলাম! কেউ জানলে সেই জবাব দেওনের থাকব না তোমার-আমার।

মেঘ ডাকল, বিদ্যুৎ চমকাল। বাতাস ধাওয়া লাগাতেই গাছগাছালির ডালা যেমন উতলা হলো, উজানির খালের পানিতে তেমন ফেঁপে উঠল। তাতে নৌকা সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল মাঝি। আর সানজিদা বিনু নৌকার কাঠ দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ভাবছিলেন, আরমানকে কথা শোনাতে এতদূর ডেকে আনা কেন! তার ঘরে বসে শোনালেই হতো।

ঢল নামল। বাতাসের ক্ষিপ্রতা বাড়ছে তো বাড়ছেই। ঢেউ এতই উন্মাতাল যে তাতে উতলে ওঠা নৌকার গতি বৈঠায় বাধা যাচ্ছিল না। আবার তারই ধাক্কা খেয়ে সানজিদা এসে ছিটকে পড়লেন আরমানের বুকে। তা না হয় হলো, কিন্তু ছোট ভাবি যে তার বুকে বারবার করেই মুখ গুঁজছেন! আরমান তাতে দ্বিধান্বিত হয় সন্দেহ কী! সে সঙ্গে ঝড়ের তা বে নৌকা নিয়ন্ত্রণ হারাতেই ছোট বৌকে রক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনেই বুঝি দু'হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে সে। ওই স্পর্শে সানজিদা বিনু কেন হু-হু কেঁদে উঠলেন! ❖

অলঙ্করণ : : বোরহান আজাদ

ফারুক আলমগীর

ঢাকার রোজা ও ঈদ পুরোনো দিনের কথা



ঢাকায় রোজার দিনে একটা আলাদা আনন্দ আছে। বিশেষ করে পুরোনো ঢাকায় পুরোনো দিনের রোজার বৈশিষ্ট্য আগেও যেমন ছিল অনন্য একটা আকর্ষণ, এখনও সময়ভেদে তেমনি আছে। এই যেমন চকবাজারের ইফতারির সমাহার। উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্বে সম্প্রসারিত ঢাকা বিশাল আকার ধারণ করলেও মোগলশাহীর প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা গড়ে উঠেছিল একদা বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে পশ্চিমে। বুড়িগঙ্গার তীরে পশ্চিমের জনপদে অনেক পরিবর্তন এলেও মূলধারার মানুষের মনন ও মানসিকতার পরিবর্তন তেমন ঘটেনি।

ঢাকায় উত্তর-দক্ষিণে দুই মেয়র এখন। অত্যাধুনিক নানা শপিং মল, আকাশছোঁয়া ভবন, বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে; সমাহার ঘটছে দেশি-বিদেশি নানা ধরনের খাবারের, টিভি চ্যানেলগুলোও রন্ধন প্রণালির বিশারদ হয়ে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে, কিন্তু ইফতারির উপাচার আর আয়োজনে পুরোনো ঢাকার ঐতিহ্যকে কেউ ছাপিয়ে যেতে পারেনি। ইফতারির সময়টা যেন আনন্দ কলরব আর খাবারের সমাহারও পুরোনো ঢাকায় সত্যি অনির্বচনীয়, যার একটা সম্প্রসারণ ঘটেছে এখন মধ্য ঢাকার বেইলি রোডে।

পুরোনো ঢাকায় মানুষ হয়েছি পুরো পঞ্চাশ দশকে। প্রথমে গোপীবাগ, তারপর আমলীগোলা বুড়িগঙ্গার পশ্চিম তীরে, এর পরে পলাশী-আজিমপুরে। রমজানের চাঁদ উঠলে তার খবর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে, বাজি ফুটিয়ে, টিনের বাক্সে আওয়াজ তুলে, চোঙ্গা বাজিয়ে এলাকায় এলাকায় শহরবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হতো। বেতারেও সেই খবর পাওয়া যেত ঘোষণা আকারে। গ্রাহকযন্ত্র গুটিকয়েক মানুষের ঘরে ছিল, কিংবা রাস্তার ধারের হোটেল-রেস্তোরাঁয় বেতার-যন্ত্র রাখা হতো ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্য। সাধারণ মানুষ সেখানেই ভিড় করতেন। মধ্য পঞ্চাশ কিংবা তারপরে ট্রানজিস্টর রেডিওর প্রচলন ঘটলে বেতারযন্ত্র তখন অনেকটা সহজলভ্য হয়ে যায় এবং নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তদের ঘরেও বেতার শোনার নিয়ম গড়ে ওঠে। ইফতারের আগে ঢাকার এলাকাবিশেষে সাইরেন ধ্বনিতে জানিয়ে দেওয়া হতো সূর্যাস্তের বার্তা এবং সেই সঙ্গে ধারে-কাছের মসজিদে মসজিদে মুয়াজ্জিনের আজান ধ্বনি শুনে ইফতার করা হতো। দুই পর্বে ইফতার সমাপনের রীতি দেখা যেত। প্রথমে পানি কিংবা শরবত খেয়ে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে ধর্মভিরু রোজাদাররা মাগরিবের নামাজ আদায় করতেন। পরে বাড়ির সকলকে নিয়ে জম্পেশ করে মজাদার ইফতারি সারতেন। পুরোনো ঢাকার ঐতিহ্য হচ্ছে পিঁয়াজু, ছোলা বা ঘুগনি, আলুনি, বেগুনি ইত্যাদি মুড়ির সঙ্গে মাখিয়ে একটা বড় পাত্রে পাড়া-পড়শি সকলকে নিয়ে একসঙ্গে খাওয়া। এতে রোজাদারদের সওয়াব নাকি বেশি হাসিল হয়। ঢাকার পুরোনো আমলের সর্দাররা এই রীতি চালু করেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত আদি ঢাকাইয়ারা তা চালু রেখেছেন। আমি ছোটবেলায় শেখ সাহেব বাজার, আজিমপুর, পলাশী, বখশীবাজার, লালবাগ থেকে চকবাজার পর্যন্ত এসব দৃশ্য দেখেছি। তবে আজকাল বায়তুল মোকাররম, ঢাকা কেন্দ্র অঞ্চল ও সম্প্রসারিত অঞ্চলে সুন্নত পালনের অংশ হিসেবে নব্য ঢাকাইয়ারা কোথাও কোথাও এ ধরনের ইফতারের আয়োজন করেন এবং শামিল হন। এ ধরনের ইফতার ছাড়াও নব্য ঢাকায় প্রায় প্রতিদিন ইফতার পার্টির আয়োজন এখন লক্ষ্য করা যায়, যাকে অনেকটা সার্বজনীন ইফতার নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

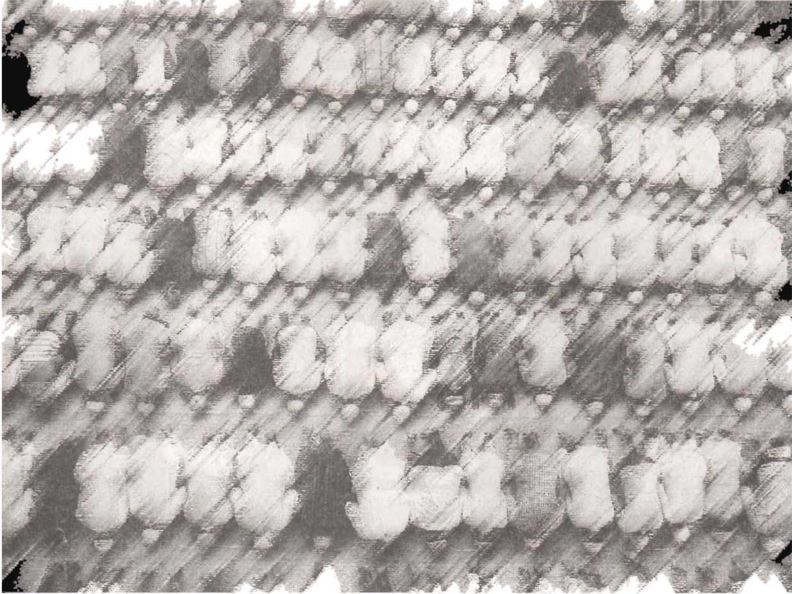
ইফতারের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় হচ্ছে ঠাণ্ডা পানীয়, বিশেষ করে গরমের দিনে লম্বা রোজার সময় ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের ঠাণ্ডা পানির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ঢাকায় মধ্য পঞ্চাশের সেই সময়ে ক'জনের বাসায় ফ্রিজ ছিল, আমার জানা নেই। হাতেগোনা কোনো কোনো বাড়িতে হয়তো ছিল এবং তা খুবই উচ্চবিত্ত স্বল্পসংখ্যক মানুষের ঘরে। ঠাণ্ডা পানির একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরবরাহক হচ্ছে বরফকল এবং তাও হাতেগোনা ও বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ছিল কলগুলোর অবস্থান। আমার মনে আছে, চকবাজারের বরফকল থেকে লালবাগ এলাকায় ছালার ব্যাগে ভুসি মাখিয়ে অনেক বিক্রেতা রাস্তায় বসত। আজিমপুর-পলাশীর ছোটরা সেই সব জায়গা বিশেষ করে আজাদ পত্রিকা অফিসের সামনের রাস্তায় বসা ক্রেতাদের কাছ থেকে বরফ কিনে দৌড়ে বাসায় আসত, যাতে বরফ গলে না যায়। পরবর্তীকালে ষাটের গোড়ার দিকে আজিমপুরে বেবি আইসক্রিমের কারখানা হওয়ার পর আমাদের এলাকায় বরফের চাহিদা সহজে মিটে যায়। আমাদের ছোটদের ইফতারের ১০-১৫ মিনিট আগে গেলেই চলত এবং বরফ কিনে দৌড়ে বাড়ি ফেরার কষ্ট দূর হয়।

ওই সময়ে সবচেয়ে কঠিন ছিল সেহরির জন্য ঘুম থেকে ওঠা। পত্র-পত্রিকায় তখনও ইফতার-সেহরির বিজ্ঞানভিত্তিক সময় দেওয়া থাকত না। যেমন সেহরির শেষ সময়টা কখন তার একটা সর্বসম্মত ধর্মীয় ও বিজ্ঞানভিত্তিক রজমান মাসের যে ক্যালেন্ডার এখন পাওয়া যায়, তখন তার প্রচলন ঘটেনি। সাধারণ মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী জানত যে (এবং এখনও জানে) ফজরের আওয়াল ওয়াক্তের আগ পর্যন্ত ভোর রাতের খাওয়া বা সেহরি খাওয়া যায়। আমাদের পলাশী-আজিমপুর এলাকায় একজন জনপ্রিয় ফকির ছিলেন। তিনি প্রতি রাতে একটা হারিকেনে আঁধার কাঁপিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে চলতেন আর বলতেন, 'ওঠো রোজাদারো, দু'বাজ্‌গিয়া।' ঢাকাইয়া এই ফকির আরও গান ধরতেন, যেমন পুরোনো ঢাকার কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও কসীদা গাওয়া রাত-জাগানিয়া গায়েনরা ঘুরে ঘুরে মানুষকে জাগায়। এই ফকিরের গানের মধ্যে নিজের নামটাও উচ্চারণ হতো– 'চুনুয়া ফকির'। এখনও যেন কান পাতলে শুনি মধ্য যামিনীতে তার ঘুম-জাগানিয়া গান 'আল্লার কাছে দোয়া মাগে চুনুয়া ফকির।' পলাশী-আজিমপুরের ছোটদের আর রোজাদার ধর্মভীরু মানুষদের প্রিয় চুনুয়া ফকিরের পরনে থাকত কালো লম্বা জোব্বা, মাথায় লাল পাগড়ি। আমাদের কৈশোরের তারুণ্যের মাঝামাঝি একটা সময়ে এই চুনুয়া ফকির হারিয়ে গেলেন; আর এলেন না ফিরে। আমাদের ছোটবেলায় বাসি খাবার খাওয়ার প্রচলন একেবারেই ছিল না। চুনুয়া ফকিরের ডাকে মায়েরা জেগে উঠতেন রাত দুটো কিংবা তিনটার মধ্যে। হাঁড়িতে চাপাতেন চাল। ঝরঝরে টাটকা শাদা ভাত প্রস্তুত হয়ে যেত তিনটার মধ্যে। সেই সঙ্গে দূরে সাইরেনও পড়ত সেহরি খাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে। আমাদের সাইরেনটা বুঝি লালবাগ কিল্লার দিক থেকে আসত। পলাশীতে একটা ফায়ার ব্রিগেডের স্টেশন ছিল, সেখানে ঘণ্টাধ্বনি বাজত। লালবাগ থেকে পুরো ঢাকা তথা চকবাজার, মিটফোর্ড, ইসলামপুর, সদরঘাট ও লক্ষ্মীবাজার সেহরি পর্যন্ত জাগত নানা কলহাসে জীবন মুখরিত করে। চকবাজারের ইফতারির ঐতিহ্যবাহী বাজারও বন্ধ হতো না। নতুন উপাচার নিয়ে সেহরি পর্যন্ত জেগে থাকত।

একটা মজার কথা হলো, রেডিওতে ইফতারের আজান অনেক পরে চালু হয়। মনে হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে, আইয়ুব খাঁর আমলে। আমার মা রেডিওর আজান শুনে কোনোদিন ইফতার করতেন না; করেননিও। মসজিদের মুয়াজ্জিনের আজান শুনলেই করতেন কিংবা সাইরেনের জন্য অপেক্ষা করতেন। যান্ত্রিক আজানের প্রতি তার আস্থা ছিল না। আমরা এটা নিয়ে অনেক মজা পেতাম ও হাসাহাসি করতাম।

ঢাকায় তখনও বায়তুল মোকাররম হয়নি। ঈদের বড় জামাত বলতে লালবাগ শাহী মসজিদ ও চকবাজার শাহী মসজিদে হতো, যেখানে ঢাকাবাসীর অধিকাংশই শামিল হতেন। তবে ঢাকা ছিল মসজিদের শহর, অন্যদিকে বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলির শহর। এলাকাবিশেষে অনেক সুন্দর ও চটকদার মসজিদ তখনও ছিল, এখনও রয়েছে। সেখানে যার যার এলাকায় নামাজ পড়তে ঢাকাইয়ারা পছন্দ করতেন। ঢাকার এখনকার ধানমণ্ডি এলাকা পঞ্চাশ দশকের শেষদিক থেকে গড়ে উঠতে শুরু করে। সুতরাং মোগল আমলের বিখ্যাত সাতগম্বুজ মসজিদ রোডের ঈদগাহে তখন পর্যন্ত সাধারণ্যের নামাজ পড়া শুরু হয়নি। অবশ্য পল্টন ময়দান ও

ধূপখোলা মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হতো আবহাওয়া ভালো থাকা সাপেক্ষে। পল্টন ময়দান সেই সময়ে বিবেচিত হতো পুরনো ঢাকার দক্ষিণাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে অনেক দূরে। সুতরাং খোলা ময়দানে ঈদ-জামাতে জনসমাগম তেমন হতো না। আমি অধিকাংশ সময় বাবার সঙ্গে এসএম হলের মসজিদে ঈদের নামাজ পড়েছি। আজিমপুরে তখন একটা ছোট ছাপড়ার মসজিদ ছিল, যা এখন দালান ও সম্প্রসারিত হয়েও ছাপড়া মসজিদ নামেই পরিচিত। পলাশী



ও ঢাকেশ্বরীর মাঝখানে একটি মসজিদ ছিল, যা খুবই ছোট। ইকবাল হল (এখন সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) তখন ছিল বাঁশের তর্জা দিয়ে তৈরি কিছু ব্যারাক। সেই ব্যারাকগুলোর মাঝখানে বড় মাঠ ও পুকুর ছিল। হলের ময়দানে নিয়মিত ঈদের জামাত হতো। কিন্তু বাবার পছন্দ এসএম হল। কারণ মধ্য ত্রিশে তিনি এসএম হলের ছাত্র ছিলেন, আর তাই পুত্রকে নিয়ে সেখানেই নামাজ পড়ে তার হল জীবনের স্মৃতিকে বোধ করি মনে করতেন। পঞ্চাশের ঢাকাইয়াদের জন্য শুধু নয়; ঈদ সর্বকালের পুরোনো ঢাকাবাসীর জন্য বড় উৎসব ছিল। ছোটরা ঝলমলে পোশাক পরত। বড়দের লম্বা জামা কিংবা পাঞ্জাবিতে অবশ্যই জরির কাজ থাকতে হবে। আর খাওয়া? সেমাই জর্দা ফিরনি ইত্যাদির সঙ্গে নানা বাহারি খাবার তথা কোর্মা, কোপ্তা, কালিয়া আর পোলাও ছিল আরাধ্য। ঈদে ঢাকাইয়া বন্ধুদের বাসায় খেতে যাওয়া কৈশোর থেকে আমার প্রিয় গন্তব্য ছিল এবং কোনো বাসায় বিরিয়ানি বা এখনকার মতো কাচ্চি বিরিয়ানি খেয়েছি বলে মনে হয় না।

আর একটি ঘটনা মনে আছে। একবার ঈদের পরের দিন মিটফোর্ডে গিয়েছিলাম, যেখানে বড় রাস্তার দোতলায় আমার মায়ের পাতানো এক বোনের বাসায় সারাদিন আমরা ছিলাম। মা কিংবা খালা কেউ আমাদের ছোটদের কাছে বলেননি কেন অতি আগ্রহে সারা দিনমান আমাদের এই অপেক্ষা! বিকেল হলেই দোতলা বাড়ির ছাদে খালা আমাদের নিয়ে গেলেন আর দূরে ইসলামপুরের দিক থেকে তাকিয়ে আমরা অবাক হলাম ঢাক-ঢোল-নহবৎ বাজিয়ে আসছে বিরাট মিছিল। ঈদের এই ধরনের বর্ণাঢ্য মিছিল আমি আর কোনোদিন দেখিনি। শুনেছি, ঢাকায় মোগল আমল থেকে এই ঈদ মিছিলের রেওয়াজ ছিল, যা কি-না প্রকৃতপক্ষেই সার্বজনীন। আজকাল 'আমরা ঢাকাবাসী' নামক একটি সংগঠনের ব্যানারে ফুলবাড়িয়া থেকে রমনা, শাহবাগ পর্যন্ত মিছিল বের করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যেখানে খুবই স্বল্পসংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সেই সার্বজনীন বিশাল মিছিলের যে নমুনা আমি ছোটবেলায় দেখেছিলাম, মাথা যার মিটফোর্ড থেকে তার লেজ ছিল তখন ফরাশগঞ্জে। সেই মিছিল আর কখনও দেখিনি। ঢাকার সেই সার্বজনীন ঈদের আনন্দ মিছিলকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় না? ❖

মুস্তাফিজ শফি

ঈশ্বরের সন্তানেরা



আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। মনে হচ্ছে, পুরো ঢাকা শহরটাই আজ ভেসে যাবে। কাকরাইল হয়ে শান্তিনগরের দিকে যেতে যেতে নিজেকেও কচুরিপানার মতো ভাসমান মনে হয় সোমার। মা-বাবা দু'জনেই অফিসে। ভাইয়াও তার নতুন চাকরিতে, এই সুযোগে সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়েছে সে। বের হওয়াটা কি আর চাট্টিখানি কথা। ব্যাগ গুছাতে দেখে কাজের মেয়েটি ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছিলো। তার হাতে একশ' টাকার একটি নোট গুঁজে দিয়ে বলেছে, 'কাউরে কিছু বলবি না। আমি একটু জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি; সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবো।' তারপরও কথা থামে না মেয়েটির।



অলঙ্করণ : : নাজিব তারেক

–'সন্ধ্যার আগে ফিরবেন তো এতো জামাকাপড় নিয়া যাইতাছেন কেন? কই যাইতাছেন, সত্যি কইরা কন। আমারে নিবেন আফা, আমিও রেডি হই?' বকবক থামাতে গিয়ে মেয়েটিকে একটি ধমক লাগিয়ে বসে সোমা।

কলোনির নিচে নামতেই হাঁটুপানি। ফকিরাপুল মোড়ে এসেও স্কুটার মিললো না। বাধ্য হয়েই রিকশায় উঠতে হলো। সোমা মনে মনে বলে, অন্তত শান্তিনগর যাই, সেখান থেকে আফসানাকে নিয়ে তারপর আবার স্কুটার খুঁজি।

বৃষ্টির দিন মতিঝিল এজিবি কলোনি থেকে মহাখালী পৌছাতেই অনেক ঝক্কি। মাঝখানে কয়েকবারই গুলিয়ে এসেছে মাথা। স্কুটার থেকে নেমে ব্যাগ টেনেটুনে বাসে উঠে জানালার পাশের সিটে বসে সোমা। অন্যপাশে আফসানা। বেশ কয়েকবারই চোখের নদীতে বান ডেকেছে। তবে সেই দাগ মুছে গেছে বৃষ্টির ছটায়। আর ফোলা ফোলা চোখ সে ঢেকে রেখেছে সানগ্লাসে।

এর মধ্যে আত্মীয়স্বজন কেউ বাসায় না এলে বিকেল ৫টার আগে বাবা-মা টেরই পাবে না– সে বাসা ছেড়েছে বাসা ছাড়াটা কি খুব জরুরি ছিলো সোমার?

ডাক্তার আন্টির সঙ্গে তিন দিন আগে মায়ের কথোপকথনের পুরোটাই শুনেছে সে– 'মেয়েটারে নিয়ে আমি খুব বিপদে আছি। তুমি একটু সাহায্য করো বোন।'

'সোমার আবার কী হয়েছে'– আন্টির প্রশ্নে মায়ের গলা আরও নিচু হয়ে আসে। 'কীভাবে কী হয়েছে বুঝতে পারছি না! মুখ খুলে কিছু বলে না, যখন তখন বমি করছে। ওষুধের দোকান থেকে স্ট্রিপ এনে পরীক্ষা করে দেখেছি– পজিটিভ অবিবাহিত মেয়ে, মানসম্মান কোথায় রাখি! আর এখন আমি কী করি বলো?'

আন্টি কী বলেন, সোমা সেটা শুনতে পায় না। তবে মা এভাবে শেষ করেন, 'যেভাবে হোক পাড়ার লোক জানাজানি হওয়ার আগেই তুমি আমায় মুক্তি দাও বোন। শুক্রবার আমি সোমাকে নিয়ে আসবো শুধু এই কাজটাই করতে। শুক্রবারে ক্লিনিকে তো তোমার রোগী কম থাকে। বুঝতেই তো পারছো বেশি লোকের সামনে আসতে চাই না। দেয়ালেরও কান আছে।'

সোমা দাঁড়িয়েছিলো বারান্দার আবছা আলো-অন্ধকারে। আন্টির সঙ্গে মায়ের টেলিফোন কথোপকথন শুনতে শুনতে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে– 'না, এ হবে না, এ হতে পারে না। এ ভ্রূণ আমি নষ্ট করবো না। এটা হত্যার শামিল। আমি ওকে হত্যা করতে পারি না।'

ভালোবেসেই নাসিমের কাছে গিয়েছিলো সোমা। তবে ওর ভেতরে এতো কদর্য লেপ্টে আছে, বুঝতে পারেনি আগে। মায়ের সঙ্গে আন্টির কথাগুলো শুনে প্রথমেই সে নাসিমের কাছে গিয়েছিলো। হল গেট থেকে ওকে টেনে নিয়ে টিএসসি পেরিয়ে বসেছিলো উদ্যানের নিরিবিলি স্থানে।

নাসিমের হাত ধরে সোমা বলে, 'চলো, আমরা বিয়ে করে ফেলি। তাইলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ইটস্ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। তুমি কেন বুঝতে চাচ্ছ না? মায়ের কথামতো আন্টির কাছেই যাওয়া উচিত তোমার।' সোমার কথার উত্তরে বলে নাসিম। সে আরও বলে, 'আমরা তো বিয়ে করার সিদ্ধান্ত কোনো সময়ই নিইনি। মাস্টার্স শেষ করবো, প্রতিষ্ঠিত হবো, তারপর তো আসবে বিয়ের চিন্তা। বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে আজকাল কতো কিছু ঘটে, তুমি এটা নিয়ে এতো সিরিয়াস হচ্ছো কেন? মায়ের সঙ্গে আন্টির ক্লিনিকে যেতে না চাইলে আমার সঙ্গে চলো। আমার পরিচিত জায়গা আছে। এটা ওয়ান-টুর ব্যাপার।'

'ও, তার মানে তুমি এসব জায়গাও আগে থেকে চিনে রেখেছো। কয়জনকে এরকম নিয়ে গেছো, বলো তো?' সোমার কথায় একটু ঘাবড়ে যায় নাসিম– 'তুমি ক্ষেপে যাচ্ছ কেন?'

কথা কেড়ে নিয়ে সোমা বলে, 'ক্ষেপবো না মানে! আমি তোমার সঙ্গে যা কিছু করেছি ভালবেসে করেছি। আর তুমি এটাকে নিয়েছো ফান হিসেবে? তোমার সঙ্গে কথা বলতেই আমার ঘৃণা হচ্ছে।'

'না না, বিষয়টাকে এভাবে দেখো না। তোমারও তো ভবিষ্যৎ আছে। এখনই একটা বাচ্চার মা হয়ে গেলে ক্যারিয়ারের কী হবে একবার ভেবেছো? আমি আমার ক্যারিয়ার যেমন নষ্ট করতে চাই না, তেমনি তোমারটা নষ্ট হোক– সেটাও চাই না।'

'আর এক মুহূর্তও আমি এখানে থাকতে চাই না। শুধু জানিয়ে যেতে চাই, আমার কাছে ক্যারিয়ারের চেয়ে একটা শিশুর জীবন অনেক বড়। আমি আর তোমার কাছে আসবো না। শুধু জানিয়ে যাই– আমার সন্তান অবশ্যই পৃথিবীর মুখ দেখবে, আমার নামেই বড় হবে। আর যদি না পারি নিজেও এই পৃথিবীতে থাকবো না।' নাসিমকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়ে হন হন করে উদ্যান থেকে বেরিয়ে এসে রিকশায় ওঠে সোমা।

তারপর সে উদ্ভ্রান্তের মতো রোকেয়া হলের ভেতর ঢোকে। ভ্রূণটিকে রাখতে চায়– এটা জানার পর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আফসানাও বিরোধিতা করেছে। 'এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আবেগের বশে তুই এই সিদ্ধান্ত নিস না সোমা। এখন না বুঝতে পারলেও পরে বুঝবি– জীবনটা কতো কঠিন!'

শুক্রবার হতে আরও তিন দিন বাকি। নাসিমের কথা শুনবে না; মায়ের সঙ্গে আন্টির ক্লিনিকেও যাবে না সে। আফসানাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আমি কঠিনেরেই ভালোবাসলাম। যদি পারি ওকে নিয়ে বাঁচবো, আর মারতে হলে সঙ্গে আমিও মরবো। তুই যদি আমার মৃত্যু না চাস তাহলে হেল্প কর, প্লিজ। অনার্স পরীক্ষা দিয়েছি, আর না পড়লেও নিশ্চয় ছোটখাটো কোনো চাকরি করে পরিবারের বাইরে বাঁচতে পারবো। আমি পালিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবো, নিভৃত গ্রামে।'

আফসানা বুঝতে পারে না কী করবে। হঠাৎ তার কানে ভেসে আসে একটি শিশুর কান্না– 'আমাকে মেরে ফেলো না; আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।' আফসানা ঠিক থাকতে পারে না। সোমাকে জড়িয়ে ধরে সে– 'অবশ্যই আমি তোকে হেল্প করবো। অবশ্যই।'

আফসানার দেওয়া ঠিকানা অনুসারে তাকে সঙ্গে নিয়েই নিবেদিতাদির কাছে যাচ্ছে সোমা। দিদি রাজি হয়েছেন সোমাকে রাখতে। ওখানে একটি চাকরিও পাবে সে।

বাস ছেড়েছে সবেমাত্র। আবারও মাথা চক্কর দিয়ে উঠে সোমার। সে তার পেটে হাত দেয়; বাইরে থেকে এখনও কোনো প্রাণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। তারপরও হাত বুলাতেই থাকে। এই সন্তানের পিতা কে– নাসিম? বাসের জানালা ঠেলে একদলা থুথু বাইরে উগলে দেয়। না, কোনো প্রতারকের নামে পরিচিত হবে না তার সন্তান। তার তখন যিশু খ্রিস্টের কথা মনে পড়ে যায়। আস্তাবলে পড়ে থাকা সন্তানটির পিতা কে– জানতো না মানুষ। তারা তাকে গ্রহণ করেছে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে।

দুই

তখন সন্ধ্যা নেমে আঁধার ঘন হয়েছে। কারো পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বাইবেলের পাতা থেকে নিবেদিতা গোমেজ দৃষ্টি প্রসারিত করেন বাইরে। সোমা আর আফসানাকে এগিয়ে নিয়ে আসছে কেয়ারটেকার আবদুল আলী। ঘরে ঢুকতেই তিনি তাদেরকে বসতে বললেন। উঠে এসে সোমার মাথায় হাত বুলালেন। একটু হেসে কুশল বিনিময় করলেন আফসানার সঙ্গেও। তিন বছর পর দেখা। এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পর আফসানা এখানে তিন মাস স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছে।

ওদের সামনে পানির গ্লাস এনে দেওয়া হলো। ওয়াশরুমও দেখিয়ে দেওয়া হলো। ওরা হাতমুখ ধুয়ে ডরমিটরি বিল্ডিংয়ের দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। সেখানে খাওয়া-দাওয়া এবং রাত্রিযাপন। নিবেদিতা বললেন, 'বাকি কথা হবে কাল সকালে। ভোরের আলোয় যখন নতুন করে জাগবে পৃথিবী। ঈশ্বর আমাদেরকে সেই ভোরের দিকে নিশ্চয় নিয়ে যাবেন।'

মাদার তেরেসা মাতৃসদন ও অনাথ আশ্রম। নিবেদিতা গোমেজ এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন সেই বাহাত্তর সালে। ঈশ্বরের সন্তানদের সবাই যখন ফেলে যাচ্ছিলো তখন তাদেরকে কুড়িয়ে এনে শুশ্রূষা দিয়েছেন। মাদার তেরেসার মূল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এইসব শিশুকে দত্তকও দিয়েছেন তারা। তখন ওদের বাঁচিয়ে রাখাটাই ছিলো প্রথম কাজ। বিদেশে যাওয়া

বেশিরভাগ শিশুই ভালো আছে, বড় হয়েছে। বিয়ের পর তাদের সন্তান-সন্ততিও হয়েছে। এদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে এদেশে আসে। মাতৃসদনের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে। তাদের মাকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু কীভাবে পাবে মায়ের খোঁজ? বেশিরভাগ মায়ের তো পরিচয়ই জানা যেতো না। ওই সময় কতো শিশু তারা পেয়েছেন চটের বস্তায়, কাগজের প্যাকেটে। অনেকে রাতের আঁধারে এইসব মানব সন্তানকে এনে ফেলে গেছেন মাতৃসদনের গেটে। যাদের পরিচয় জানা ছিলো তারাও গোপন রেখেছেন খাতা-পত্রে। একটা তীব্র হাহাকার বুকে নিয়ে মায়ের দেশ থেকে ওরা আবার ফিরে যায় দত্তক বাবা-মায়ের দেশে।

চাইল্ড কেয়ার সেন্টার পার হয়ে ডরমিটরি বিল্ডিংয়ে যেতে হয়। বারান্দা দিয়ে যারাই যায়, ভেতরের শিশুরা তা দেখতে পায়। একের পর এক 'মা' 'মা' শব্দে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সোমা ও আফসানা। দিদি ভেতরে ঢুকলেন; ওরাও। একসঙ্গে কমপক্ষে দশটি বাচ্চা দৌড়ে এলো। কেউ দিদির কোলে উঠতে চাইছে, কেউ জড়িয়ে ধরেছে কোমর। কেউবা আবার হাত ধরে টানছে। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য!

দিদির কোলে বসে দুই গালে হাত বুলাচ্ছে একটি শিশু। দিদিও তার গাল চেপে ধরলেন, 'আমি ওদের সবার মা। এই যে দেখছো মিষ্টি মেয়েটি, কতো বয়স? সর্বোচ্চ চার বছর। ঢাকার আগারগাঁওয়ে রাস্তার পাশে এক ঝোপের ভেতর তাকে ফেলে রাখা হয়েছিলো। কুকুর কামড়ে খাওয়া শুরু করেছিলো। কান্নার শব্দ পেয়ে দুই টোকাই তাকে উদ্ধার করে। এই দেখো হাতের একটি আঙ্গুল নেই। কুকুরের কামড়ে নাকটিও ক্ষতিগ্রস্ত। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসার পর ওকে আমরা নিয়ে এসেছি। নাম দিয়েছি অপরাজিতা।'

নিবেদিতা বলতেই থাকেন- 'এই যে দেখছো আমার আঁচলে মুখ গুঁজে আছে, ওর নাম সর্বজয়া। জন্মের পরপরই রাতের আঁধারে পাঁচ তলার উপর থেকে ওকে ফেলে দেওয়া হয়। ঈশ্বর সহায় ছিলেন বলেই জীবনকে জয় করতে পেরেছে। এজন্যই আমরা নাম দিয়েছি সর্বজয়া।'

একটু দূরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে শান্ত। নিবেদিতা কেন খেয়াল করেননি, তাই অভিমান করেছে। নাম ধরে ডাকতেই কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। 'খেয়াল করিনি বাবা; আমি তোমায় খেয়াল করিনি।' একটু মুচকি হেসে সোমা ও আফসানার দিকে তাকিয়ে নিবেদিতা বললেন, 'এ আমার বড় আদরখেকো ছেলে।'

তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী বাচ্চারা থাকে এখানে। একেবারে শিশু থেকে শুরু করে তিন বছরের নিচের বাচ্চারা থাকে পাশের কক্ষে। সাত থেকে ১০ বছরের বাচ্চারা থাকে ওপাশে। এর চেয়ে বড়রা পরের বিল্ডিংয়ে। সেটা অনেকটা হোস্টেলের মতো। তারা কেউ পড়ে প্রাইমারিতে, কেউ হাই স্কুলে। মাতৃসদনের ভেতরেই দুটি স্কুল রয়েছে। ইউনিভার্সিটি ও কলেজ পড়ুয়াদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। ওদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করা হয় বাইরে। যারা এগিয়ে যেতে পারে তারা জীবনের আসল মানে খুঁজে পায়। আর যারা পারে না, পিছিয়ে পড়ে; তাদেরকেও অবহেলা না করে সামনে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে মাতৃসদন।

তিন

আপাতত চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের কক্ষগুলোতে ঘোরাফেরার কাজ পেয়েছে সোমা। দিদি বলেছেন, 'বিভিন্ন কক্ষেই আমাদের কর্মীরা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজগুলোকেই সমন্বয়ের দায়িত্ব দেবো তোমাকে। তবে আগে কাজটা বুঝে নাও।'

সোমা আজ একেবারে নবজাতকদের কক্ষে ঢুকেছে। কক্ষটি অনেকটা হাসপাতালের ওয়ার্ডের মতো। একজন ডাক্তারও আছেন। একপাশে ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে কয়েকটি বাচ্চাকে। হাড়-জিরজিরে একটি বাচ্চার সামনে দাঁড়াতেই এতো বছর পর আজ আবার জিমি পাগলিকে মনে পড়ে যায় সোমার। কেন মনে পড়ে? প্রতি বছরই অবিকল এই বাচ্চাটির মতো একেকটি বাচ্চা কোলে নিয়ে পাগলি তাদের পাড়ায় আসতো। রাতের বেলা কোথায় থাকতো কেউ জানতো না। তবে দিনের প্রায় পুরোটা সময়ই সে কলোনির সামনের বটতলায় বসে থাকতো আর আপন মনে বিড়বিড় করতো। হাসতো। গলা ছেড়ে কাঁদতোও মাঝে মাঝে।

ছোটবেলা দোতলার বেলকনিতে বসে জিমি পাগলির সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করতো সোমা। অন্য কারো কথা না শুনলেও মাঝে মাঝে পাগলি তার কথা শুনতো। নিজের সবচেয়ে পছন্দের খাবারটিও সে দিয়ে দিতো। তবে পাগলি খেতে চাইতো না। সোমা ভাবতো, দূরের কোনো এলাকা থেকে বিশাল পেট ভরে খাবার নিয়ে এসেছে পাগলি। কতো না মজার সে খাবার! সেই খাবার খেয়ে জিমি পাগলির মতো বড় পেট করতে ইচ্ছে হতো তার। বুঝতেই পারতো না; স্ফীত পেটে খাবার নয়, পাগলি বয়ে বেড়াচ্ছে সন্তান। কিছুদিন পর আবার দেখতো পেট খালি। আর কোলে ছোট্ট একটি শিশু। জিমি নিজে এগুলোকে বলতো পুতুল। বেলকনির নিচ থেকে উপরে উঁচিয়ে ধরে প্রায়ই বলতে থাকতো- 'পুতুল নিবি, পতুল'। সোমা হাত বাড়ালে সঙ্গে সঙ্গেই দূরে সরে যেতো আর চিৎকার করতো, 'আমার পুতুল আমি কাউরে দিমু না; কাউরে না। তোরা কেউ আমার পুতুলের দিকে নজর দিবি না।' আবার দুয়েকদিন গেলেই সোমা দেখতো পুতুলটি জিমির সঙ্গে নেই; 'আমার পুতুল নিয়া গেছে রে, নিয়া গেছে'- তখন বটতলায় বসে হাউমাউ করে কাঁদতো আর বিলাপ করতে থাকতো পাগলি।

দিন যেতো মাস যেতো। এক সময় কান্না থামতো। আবার উধাও হতো সে। কিছুদিন পর ফিরতোও ভরাপেটে। সোমা এখন বোঝে; জিমির পুতুলগুলোও ছিলো ঈশ্বরের সন্তান। সেই সন্তানগুলো হারাতো কোথায়? কারা নিয়ে যেতো সেগুলোকে?

অনেকক্ষণ বাচ্চাটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন কক্ষে দায়িত্ব পালনকারী ডা. নার্গিস। সোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বললেন, 'খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে এই বাচ্চাটিকে আমরা উদ্ধার করেছি। ওর মা একজন মানসিক রোগী। জন্মের পর বাচ্চাটিকে এক ফোঁটা দুধও খাওয়ানোর বোধ ছিলো না। অভুক্ত বাচ্চা আর মা পড়ে ছিলো কমলাপুর রেল স্টেশনের আউটার সিগন্যালের পাশে। গত সপ্তাহে উদ্ধার করেছি আমরা। ইমম্যাচিওর বেবি। স্পেশাল কেয়ার নিতে হচ্ছে। ওর মাকেও হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'বাচ্চাটি বাঁচবে তো!' সোমার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। ডাক্তার বলেন, 'সেটা তো আল্লাহ বা ঈশ্বর জানেন। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না। তারপরও সবাইকে বাঁচানো যায় না। এই যেমন গত সপ্তাহে একটি বাচ্চাকে হারালাম আমরা। ড্রেনের মধ্যে পড়েও বেঁচে ছিলো সে। আসলে উদ্ধার করতেই দেরি হয়ে যায়। ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিলো। তিনদিন হাসপাতালে থেকে চলে গেলো না ফেরার দেশে।'

চার

বাবা-মাকে কিছুটা দ্বন্দ্বের ভেতরেই ফেলে এসেছে সোমা। মায়ের ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে রেখে আসা চিরকুটে সে লিখেছে– 'ভালোবাসার টানেই চলে গেলাম। আমাকে তোমরা খোঁজার চেষ্টা করো না।' ভেতরে ভেতরে কাঁদলেও প্রথম দিন মা কাউকে কিছু বুঝতে দেননি। তিন দিন পর আজ ডাক্তার আন্টির পরামর্শে সিদ্ধান্ত নিলেন চিরকুটের বিষয়টি আশেপাশের কাউকে না কাউকে জানিয়ে দেবেন; এক মুখ থেকে আরেক মুখে তখন ছড়িয়ে যাবে– সোমা ভালোবেসে কারো সঙ্গে ঘর ছেড়েছে; অনাকাঙ্ক্ষিত একটি বাচ্চা পেটে এসেছে– এটা জানার চেয়ে প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছে– এটা প্রচার পাওয়া তাদের জন্য অনেক সম্মানজনক। এরকম ঘটনা তো অহরহ ঘটছে।

পড়ে সে, 'সবাই দেইখ্যা যাও, আমি নাপাক মাইয়া লোক। আমার পেটে একখ্যান ছাওয়াল বড় হইতাছে। এই ছাওয়াল আমি এবার কাউরে দিমু না।'

টিটিপাড়া বস্তিতে বাঁশের দোতলা ঘরে চৌকির উপর দুই পা তুলে বসে খিস্তি আউড়াতে থাকে জয়নব। তার ঠোঁটের কোন বেয়ে পানের লাল রস গড়িয়ে পড়ে।

'ওই হারামির বাচ্চা, করছস কী, করছস কী? তোরে না কইছিলাম, পাগলিটারে এই কয়টা দিন শিকল দিয়া রাখতে? এই জন্য তোরে আমি মাসে মাসে টাকা দেই? হতিনের পো, তুই আমার পাগলিরে আইন্না দে, নাইলে কইলাম ধইরা খাসি বানাই দিমু। কতো কষ্টে পাগলির পেট বান্ধাইলাম, আর অহন বাচ্চাটাই আমার হাতছাড়া হইয়া যাইবো। আমি তোরে ছাড়বো না, আমি তোরে খুন কইরা ফালামু।'



কলোনির মুখে মসজিদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো জিমি পাগলি, তবে এটা আগের জিমি পাগলি নয়। হয়তো অন্য কোনো নাম ছিলো। তাতে কিছু যায় আসে না। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা আগের মতো জিমি পাগলি বলে ডাকা শুরু করলে তার ক্ষেত্রেও নামটি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। জোহরের নামাজ তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। মুসল্লিরা যে যার মতো বাড়ি ফিরছে। চোখাচোখি হতেই মুয়াজ্জিন আলিম উদ্দিন পাগলির দিকে তেড়ে আসে– 'নাপাক মাইয়া লোক মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দূর হও, দূর হও।'

এবার ক্ষেপে যায় পাগলি। 'নাপাক আমি, না তুই, নাপাক আমি না তুই'– চিল্লাতে চিল্লাতে মুয়াজ্জিনের দিকে তেড়ে যায়। স্ফীত উদরে দৌড়াতে পারে না বলে এই যাত্রা রক্ষা পায় মুয়াজ্জিন। ফিরে এসে আবার বটগাছের তলায় বসে জিমি। পেটে হাত বুলাতে বুলাতে অট্টহাসিতে ফেটে

খালি গায়ে মাথা নিচু করে জয়নবের সামনে দাঁড়িয়ে ওসমান। ওর কালো পেটানো শরীর থেকে দর-দর করে ঘাম ঝরতে থাকে। দিনে রিকশা চালায় আর রাতে জয়নবের জন্য ভাড়া খাটে সে। ঢাকা শহরের রাস্তায় একা একা ঘুরে বেড়ানো যতো তরুণী পাগলি আছে তাদের সঙ্গে খাতির করে জয়নবের আস্তানায় নিয়ে আসা তার কাজ। ফুসলাতে হলে মাঝে মাঝে দিনের বেলা ওদের রিকশায় তুলেও ঘুরাতে হয়। রাতে বস্তিতে আনলে জয়নব খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়। কাউকে কাউকে ঘুমের ওষুধও খাওয়াতে হয় না, এমনিতেই পটে যায়। ওসমানের কাজ যখন যার পেটে পারা যায় বাচ্চা দিয়ে দেওয়া। ওর একার পক্ষে তো আর সবার পেটে একসঙ্গে বাচ্চা দিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়; মাঝে মাঝে একাজে যোগ দেয় তার বন্ধু সেলিমও। সেও রিকশা চালায়। একরাত জয়নবের ডিউটি করলে তারা পায় জনপ্রতি তিনশত টাকা। গত বছর তিন পাগলির পেটে বাচ্চা দিয়েছে ওসমান, আর সেলিম দিয়েছে দু'জনের। পাগলিরা মজে যায়

একটু আদর-সোহাগেই; জয়নব সেই সুযোগটাই নেয়। বাচ্চা প্রসবের সময় ঘনিয়ে এলে ফুসলিয়ে বস্তির ঘরেই রেখে দেয় ওদের। সব তো আর একসঙ্গে নয়, যখন যার সময় ঘনিয়ে আসে তাকেই ফুসলায় জয়নব। নিজস্ব ধাইও আছে তার। প্রসবের পর দ্রুতই বাচ্চাটি সরিয়ে ফেলা হয়। মেডিকেল থেকেও মাঝে মাঝে বাচ্চা চুরি করে আনা হয় এই বস্তিতে। এব্যাপারে জয়নবের বড় নেটওয়ার্ক আছে। যাদের বাচ্চা দরকার তারা অগ্রিম টাকা দিয়ে রাখে। শুধু বাচ্চা বিক্রি নয়; এই বস্তি ঢাকার অন্যতম মাদক ডিপো। কিন্তু পুলিশ ভুলেও কোনোদিন এর ভেতরে ঢোকে না। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বস্তির কমিটিই সব ম্যানেজ করে রাখে।

বেশিরভাগ পাগলির কাছ থেকে বাচ্চা নিয়ে নেওয়া সহজ হলেও মাঝে মাঝে ঝামেলা হয়। এই তো ছয় মাস আগে প্রসবের পরপরই বাচ্চা সরিয়ে ফেলে জয়নব এক পাগলিকে বলেছিলো, 'মইরা গেছে; আঞ্জুমানরে দিয়া দিছি।' সে কিছুতেই মানতে নারাজ। বাচ্চা ফেরত পাওয়ার দাবিতে ঘরে শুরু করে ভাংচুর। সর্বশেষ ওসমান এসে পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করেছে। সে ওকে আদর করতে করতে বলেছে, 'মইরা গেছে, কী আর করবি? সুস্থ হইলে তোর পেটে আমি আরেকটা বাচ্চা দিয়া দিমু।' এরকম কথা বলার পর বাচ্চাহারা সব পাগলিই আবার বশ মানে। বারবার তাদের পেটে বাচ্চা আসে আর বারবারই তারা শুনতে থাকে– 'মইরা গেছে; আঞ্জুমানরে দিয়া দিছি।'

কিন্তু সর্বশেষ পাগলিটা গেল কই, যার জন্য জয়নব আজ গালাগালি করেই যাচ্ছে? রিকশা নিয়ে খুঁজতে বের হয় ওসমান। একদিন, দুদিন, তিনদিন খোঁজে। না কোথাও নেই। তারপরও সে খুঁজতেই থাকে। কারণ এই পাগলিকে না পেলে জয়নব তার ওপর সময়-সুযোগে প্রতিশোধ নেবেই– এটা সে ভালো করে জানে। জয়নবের কথা অমান্য বা তার কোনো ক্ষতি করে কেউ কোনোদিন টিকতে পারেনি। যেখানেই যায় ওসমানের চোখ এদিক-ওদিক পাগলিকেই খুঁজতে থাকে। সপ্তম দিনে মতিঝিল আরামবাগ হয়ে ফকিরাপুলের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। একেই এজিবি কলোনিতে সবাই জিমি পাগলি বলে ডাকে। ডাকতেই সে অন্য দিকে হাঁটা শুরু করে, কিন্তু বেশিদূর যেতে পারে না। ওসমান হাত ধরে রিকশায় তোলার চেষ্টা করলে চিল্লাতে শুরু করে– 'না যামু না, যামু না। তোরা আমার ছাওয়ালটারে নিয়া যাবি, মাইরা ফেলবি।'

বেশি চিল্লাচিল্লিতে লোক জড়ো হয়ে যাবে দেখে ভিন্ন কৌশল নেয় ওসমান– 'তোর ছাওয়াল এইবার বাঁচুক– এইটাই চাইছিলাম। কিন্তু তুই বুঝলি না। তুই চাস, রাস্তায় জন্ম দিয়া গাড়ির চাক্কার নিচে ছাওয়ালাটারে মাইরা ফেলতে। ঠিক আছে, কথা যেহেতু হুনবি না, তাই কর। আমি গেলাম।'

এই ওষুধে কাজ হয়। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে জিমি বলে, 'সত্যি এইবার তোরা আমার ছাওয়ালটারে মারবি না তো? ওরে দিবি তো আমার কাছে?' রিকশার কাছে এসে ওসমানের হাত ধরে জিমি, 'আমার মাথায় হাত দিয়ে ক, ছাওয়ালটারে সত্যি আমার কাছে দিবি তো?' ওসমান পাগলির মাথায় হাত রেখে বলে, 'কয়টা ছাওয়াল লাগবো তোর? বছর বছর ছাওয়াল পাবি, ওঠ রিকশায় ওঠ।'

পাগলিকে নিয়ে রিকশা ঘুরিয়ে আবার বস্তির দিকে যায় সে। গত ক'দিন টানা বকা খেয়ে গেছে, আজ জয়নবের কাছ থেকে একটু বাড়তি আদায় করতে হবে। আজ সে হাজার টাকার একটা নোট চাইবেই চাইবে। আশা করা যায়, জয়নবও দিয়ে দেবে। লেনদেনের ক্ষেত্রে সে ভালো। ওসমান, সেলিম বা অন্যান্য দালাল, পুলিশ কারো টাকাই সে আটকে রাখে না। সবাইকে খুশি রেখেই চালিয়ে যায় নিজের ব্যবসা।

পাঁচ

ফেসবুকে চ্যাট করছে সাংবাদিক সুমনা হাসান। ওপাশে কানাডা থেকে রায়ান মরিস। সে একজন যুদ্ধশিশু। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় কোনো এক নির্যাতিতা মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলো। মাদার তেরেসার মাধ্যম হয়ে তার ঠাঁই হয় কানাডার দত্তক বাবা-মায়ের কাছে।

গত বছর এদেশে এলে সুমনা তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলো। মায়ের খোঁজ করার পাশাপাশি এদেশের অনাথ শিশু আর নির্যাতিত নারীদের জন্যও কিছু করতে চায় রায়ান। তাকে তেরেসা মাতৃসদনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ারও পরামর্শ দিয়েছিলো সুমনা।

'তুমি আসলে কী করতে চাও সেটা ডিটেইল জানাও। দিদিও আমার কাছে এটা জানতে চেয়েছেন। তোমাকে কাজে যুক্ত করতে এমনিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।' তেরেসা মাতৃসদন আর নিবেদিতা গোমেজ সম্পর্কে চ্যাটে এভাবেই বলে সে।

'আমার চাওয়া একেবারে ক্লিয়ার। আমি চাই না, দত্তক হয়ে কোনো শিশু আর বাংলাদেশ থেকে বিদেশে আসুক। বিদেশে গেলে তো আমার মতোই অবস্থা হবে। এবেদনার ভার কতো ভারী, তুমি বুঝবে না। বহু বছর আগে আমি আমার এদেশের মাকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমি তামাটে রঙের আর তুমি ও ড্যাডি সাদা কেন? তিনি আমাকে সহজ সরলভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি বাংলাদেশে জন্মেছিলে আর ড্যাডি ও মম কানাডায়। তিনি বলেছিলেন, তুমি আর একটু বড় হও, তখন আরও বিস্তারিত জানবে। এটা বুঝার মতো বয়সও হবে তখন তোমার। আমার এই মা একটি ডায়েরি তৈরি করেছিলেন আমার জন্য, যেটা আমি প্রথম দেখি আমার ১২ বছর বয়সে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধাবস্থায় আমি আমার আসল মায়ের গর্ভে বড় হই। মাদার তেরেসার অনাথ আশ্রমে আমার নাম দেওয়া হয়েছিলো রায়হান। কানাডায় এসে এটা আস্তে আস্তে রায়ান হয়ে যায়। যে নারী আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে আমার দত্তক বাবা-মা কিছুই জানেন না। তবে তাদের ধারণা, তিনি খুব কম বয়সী নির্যাতিত নারী ছিলেন। আমি চাই, বাংলাদেশের সব সিঙ্গেল মা তাদের সন্তান লালন-পালনের অধিকার পাক, স্বীকৃতি পাক। মা-ই প্রতিষ্ঠিত হোক সন্তানের অভিভাবক হিসেবে। আমি চাই এব্যাপারে একটি মুভমেন্ট গড়ে উঠুক।'

উত্তরে এবার সুমনা বলে, 'এদেশের সমাজ-বাস্তবতা তো আর তুমি বুঝবে না। তেরেসা মাতৃসদনই অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কাজ করছে। এখানে অনগ্রসর সমাজ আছে, সমাজপতিরা আছে। আবার ধর্ম আছে, ধর্মান্ধ মানুষও আছে। এতোগুলো ফ্যাক্টর যেখানে একসঙ্গে আছে সেখানে তুমি চাও সিঙ্গেল মাদারের স্বাধীনতা?'

'হয়তো আমি জানি না, কিন্তু মনের মধ্যে আমি আমার মায়ের দেশকে ঘিরে এমন একটা দেশের ছবি আঁকি, যেখানে কোনো শিশুকেই জন্মের পর কেউ মেরে ফেলবে না অথবা প্রত্যাখ্যান করবে না। সব শিশু তার মায়ের সঙ্গে বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠার অধিকার পাবে। তুমি বুঝতেই পারছো– এ চাওয়ার উৎস আমার ভেতরের পেইন।'

একথার উত্তরে কী লিখবে ভেবে পায় না সুমনা। শুধু ফেসবুক চ্যাট বা ফোনে নয়, এই পেইন সে প্রত্যক্ষ করেছে মায়ের খোঁজে সর্বশেষবার রায়ান যখন এদেশে আসে তখনও।

এদেশে আবারও আসতে চায় সে। বারবার আসতে চায়,

যতক্ষণ পর্যন্ত না মাকে খুঁজে পাচ্ছে। এদেশের মানুষের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে থেকে, মাকে খুঁজে পাওয়ার আকুতি থেকে বাংলা ভাষাও সে শিখতে শুরু করেছে। জানিয়েছে, কানাডাতেই বাংলা শেখানোর একজন শিক্ষক পেয়েছে। ওই শিক্ষক আবার একাত্তরের যুদ্ধশিশুদের নিয়ে সেখানে গবেষণাও করছেন। আগামীবার এদেশে আসার আগে অবশ্যই সে মায়ের ভাষাটি শিখে নেবে।

'প্লিজ, হেল্প মি। তুমি আমাকে হেল্প করলে অবশ্যই আমি আমার মাকে একদিন খুঁজে পাবো। আর আমার মায়ের মতো যারা সিঙ্গেল মাদার আছে তারাও অধিকার ফিরে পাবে।'

'অবশ্যই হেল্প করবো। আমিও চাই তোমার এই স্বপ্ন, তোমার এই চাওয়া বাস্তবায়িত হোক।'

নিবেদিতাকে ফোন করে সুমনা। দুইবার তিনবার রিং হওয়ার পর ধরেন তিনি। যোগাযোগ না রাখার অনুযোগ আর অন্যজনের ব্যস্ততার প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু হয়।

'তারপরও সময় করে একবার আয়। অনেক ইন্টারেস্টিং কাহিনী জমা হয়েছে এখানে।' বলেন নিবেদিতা। তার সঙ্গে রায়ানের প্রসঙ্গটি শেয়ার করে সোমা। রায়ান যে এদেশে আসতে চায় সেটাও জানায়। ওকে ই-মেইল ও ফোন নম্বর দিতে নিবেদিতার কাছ থেকে অনুমতি নেয় সে।

ছয়

অফিস থেকে কলেজের বেতনের টাকা তুলে নিবেদিতা গোমেজের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় শুভ। কেমন বিষণ্ন, বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে।

'কী ব্যাপার বাচ্চা, তোমার মুখ এতো শুকনো কেন?' চেয়ারে বসা থেকেই শুভর দিকে তাকালেন নিবেদিতা। কিন্তু সে চুপচাপ দাঁড়িয়েই আছে। নিবেদিতা উঠে এসে ওর দুই ঘাড়ে দুই হাত রাখেন– 'কী হয়েছে খুলে বলো।' এরপরও চুপচাপ আছে দেখে ঘাড় ধরে একটু ঝাঁকুনি দেন– 'শেয়ার করো বাচ্চা। সমস্যা লাঘব হবে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।'

'মা, আজ ৯ মার্চ'- এবার আস্তে আস্তে মুখ খোলে সে। 'আমি তো জানি না, আপনি বলেছিলেন, ওইদিন আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী।' নিবেদিতা শুভকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন। তারপর এক হাতে আগলে ধরে অন্য হাতে মাথায় হাত বুলাতে থাকেন। আজ শান্তির মৃত্যুবার্ষিকী– এটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। মারা যাওয়ার আগে তাকে একটা চিঠি লিখে আর দেড় বছরের একটি বাচ্চাকে মাতৃসদনের গেটে রেখে পাশের ট্রেনলাইনে আত্মাহুতি দিয়েছিলো সেই শান্তি। শুভর দায়িত্ব সে নিবেদিতাও গোমেজের হাতেই দিয়ে গিয়েছিলো। চিঠিতে সে অনেক কিছুই লিখেছিলো। এই চিঠি এখনও গচ্ছিত আছে নিবেদিতার কাছে।

শুভকে তার বাবা স্বীকার করে নেয়নি। শান্তিও পায়নি স্ত্রীর সামাজিক স্বীকৃতি। এর জন্য প্রায় দুই বছর লড়ে ক্ষান্ত দিয়েছে। তবে প্রভাবশালী লোকটির মনে শিশুটিকে নিয়ে একটা ভয় ধরে যায়– আজ না হোক কোনো একদিন হয়তো সে তার সামনে নিজের শক্তি নিয়ে দাঁড়াবে। অধিকার চাইবে। এটা মনে না করলে পরপর দুইবার ওরা মাসহ তাকে মেরে ফেলার উদ্যোগ নিতো না। একবার তো রাতের আঁধারে ঘরে আগুন দিয়েছিলো। পুরো ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। ওরা যে ওইদিন ঘরে নেই– সেটা আগে বুঝতে পারে নাই। ঘরে থাকলে মা-ছেলে কঙ্কাল হয়ে যেতো। ওইবার রক্ষা পেয়েছে বড় বোনের বাড়িতে থাকায়। আরেকবার বাচ্চাকে নিয়ে খেয়া নৌকায় নদী পার হচ্ছিল; ডুবিয়ে দেওয়া হলো নৌকা। ঘটনাচক্রে জেলেরা দ্রুত এসে উদ্ধার করায় সে যাত্রায়ও বেঁচে গিয়েছিলো মা-ছেলে।

কিছুদিন পালিয়ে থেকে মাতৃসদনের ঠিকানা পেয়েই বাচ্চাটাকে নিয়ে এখানে এসেছিলো সে। সব ঘটনার বর্ণনাই ছিলো নিবেদিতাকে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে।

'আমি জানি, আপনাদের আশ্রয়ে থাকলে আমার বাচ্চাটি নিরাপদে বড় হওয়ার সুযোগ পাবে। আমি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না বলেই সেই ভার আপনাদের হাতে দিয়ে গেলাম। আমার নিজের বেঁচে থাকার কোনো আগ্রহ আর নেই। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করিনি। চিঠিটা যখন আপনার হাতে যাবে তখন আমি এই পৃথিবীতে থাকবো না। আমি যখন এটা দিয়ে যাবো তখন শেষ রাত। আমি জানি রাত পোহানোর আগে এই চিঠি আর বাচ্চাটিকে আপনারা পাবেন না। এর মধ্যেই ট্রেন আসবে। এই অল্প কিছু সময় আমি লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবো। যদি খবর পান, তাহলে আমার লাশটাও দাফনের ব্যবস্থা করবেন। আর কারো কাছে কিছু বলার নেই আমার। আপনার কাছেই আবদারটা রেখে গেলাম।' চিঠির শেষটা ছিলো এরকমই। এখনও মনে পড়ে নিবেদিতার। এই চিঠির একটি ফটোকপি তিনি সাংবাদিক সুমনাকেও দিয়েছিলেন।

পঞ্চম শ্রেণি পাস শান্তি স্থানীয় এক চাতালের শ্রমিক ছিলো। অন্য সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে সে একটু আলাদা। দেখতেও সুন্দরী। শুরুতে ভালোই কাটছিলো। এধরনের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যা হয় তাকেও পা দিতে হলো সেই রকম এক ফাঁদে। এরা আলেয়াকে আলো ভাবে, প্রলোভনকে প্রেম ভাবে। দারিদ্র্যহীন সুন্দর জীবনের আশায় সে এক সময় ধরা দিলো মালিকের ছেলের প্রলোভনে। বেতনের বাইরে আলাদা টাকা-পয়সাও দিতো সে। আর যতোবার দেখা হতো ততোবারই বলতো, 'এই তো কিছুদিন পর আমি তোরে বিয়া করুম। বাজানরে একটু ম্যানেজ কইরা লই।' সেই ম্যানেজ করা আর হয় না, বিয়েও হয় না। ছয় মাস পর শান্তির পেটে যখন শুভ এলো তখন থেকেই অন্য সুর। সন্তান নষ্ট করতে রাজি না হওয়ায় চাকরি গেলো। আর পুরো এলাকায় রটে গেল মালেক মণ্ডলের সহায়-সম্পত্তির লোভেই তার একমাত্র ছেলে জুয়েল মণ্ডলের নামে দিনমজুর আমিন আলীর মেয়ে শান্তি অপপ্রচার চালাচ্ছে। মণ্ডল পরিবারকে ফাঁসাতে সে ইচ্ছে করেই কারো কাছ থেকে পেটে বাচ্চা নিয়েছে।

এলাকার মানুষ নানা বিদ্রূপ করে। এই অবস্থায় কোথায় যাবে শান্তি? গ্রামের মাতবর যাদের কাছেই সে যায়, তার বাবা যায়, সবাই তাদের দূর দূর করে। মণ্ডল পরিবারের পক্ষ নিয়ে ওরা তাদের দিকে একের পর এক তীর ছুড়তে থাকে। অবশেষে বাচ্চাটির জন্ম হয়েছে শান্তির মামাবাড়িতে। একটু দূরে হওয়ায় ওই এলাকার লোকজন জানতো না সে অবিবাহিত।

বাচ্চা জন্মের পরও শান্তি তার অধিকারের দাবিতে মণ্ডলবাড়িতে গিয়েছে। স্থানীয় থানায় গিয়েছে, কিন্তু কোনো সহায়তাই পায়নি।

শুভ এখন স্থানীয় কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে। বয়স ১৭ বছর। আরও এক বছর আগে থেকেই সে তার মা সম্পর্কে জানে, বাবা সম্পর্কে জানে। সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার পরই বাবার সামনে গিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। কৈফিয়ত চাইবে। এ প্রসঙ্গ এলে নিবেদিতা অবশ্য

বলেন, 'তুমি আগে লেখাপড়া শেষ করে প্রতিষ্ঠিত হও। তারপর যা করার করবে। মনে রাখবে, এই মাতৃসদনই তোমার বাবা-মা। এখানেই তুমি বড় হয়েছো। আমরা তোমাকে আরও সুযোগ দিতে চাই সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠার জন্য। নিশ্চয় ঈশ্বর তোমার প্রতি সহায় হবেন।'

'যাই হই আমি ওই লোকটার সামনে একবার দাঁড়াবো মা। আমার মায়ের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে তার প্রতিবাদ আমি শক্তভাবেই জানিয়ে আসবো। আর কিছু না পারি, লোকটার মুখে ছিটিয়ে আসবো একদলা থুথু।

সাত

গুগল ওপেন করতেই রায়ানের দীর্ঘ ই-মেইলটি চোখে পড়ে সুমনার। রায়ান লিখেছে– কানাডায় থাকা একাত্তরের ১৫ যুদ্ধশিশু এখন সংগঠিত হয়েছে। এসব শিশুর দত্তক গ্রহণকারী পরিবারের একটি নেটওয়ার্কও খুঁজে পেয়েছি। কয়েক দফা বৈঠকে তাদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা হয়েছে। সবাই আমার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য কাজ করবে। এদেশের অনাথ শিশু আর তাদের মায়েদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করবে। তুমি আমার জন্য কাজের জায়গা তৈরি করো। আমি তোমার নিবেদিতাদিকেও ই-মেইলে বিষয়টি জানিয়েছি।

রায়ান জানায়, পাঁচজন যুদ্ধশিশু ১০ বছর আগে বাংলাদেশে গিয়েছিলো। তারা তাদের আশ্রমটিও খুঁজে পেয়েছে,যেখান থেকে তাদেরকে দত্তক বাবা-মায়ের কাছে পাঠানো হয়েছিলো। ওদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছে সে। তাদের আবেগ তখন এক অন্যরকম চূড়ায় আরোহণ করেছিলো যখন তারা অনাথ আশ্রমের রেজিস্টার খাতার ওপর হাত রেখেছিল। নিজেদের শক্ত করে তারা রেজিস্টারের পাতা উল্টেছিলো। ভেবেছিলো, তারা তাদের জন্মবৃত্তান্তের একটি টেমপ্লেট পাবে, যাতে তাদের আত্মপরিচিতি ও বংশধারা লিপিবদ্ধ থাকবে। বাস্তবে সে টেমপ্লেটে তারা শুধু তাদের নাম, জন্মতারিখ আর জন্মকালের ওজন দেখতে পেয়েছিলো।

সে আরও লিখেছে, আমি তো আরও হতভাগা। দুইবার বাংলাদেশে আসলাম, অথচ এরকম রেজিস্টারও খুঁজে পেলাম না। আমি লরা রোবের্ত আর আমেনা উলসির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করিয়ে দেবো। তুমি তোমার নিউজপেপারে তাদের ইন্টারভিউ করতে পারবে। রেজিস্টারে নিজের নাম আবিষ্কারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লরা আমাকে বলেছে, 'নামটা দেখে আমার বিশ্বাস হয়নি। মনে হচ্ছিলো, আমি আমার অতীত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার উপর অন্ধকারের এক বিশাল পর্দা টানানো। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম। আমি কাঁদছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম না আমি আনন্দে কাঁদছিলাম, না দুঃখে!' আত্মঅনুসন্ধানের যে তাগিদ থেকে তারা বাংলাদেশে গিয়েছিলো সেটা হারিয়ে গেলেও ওরা বাংলাদেশ সম্পর্কে জেনে এসেছে। সেখানকার অনাথ শিশুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এসেছে বলেই তাদের জন্য কিছু করতে চায়।

আমেনা আমাকে বলেছে, 'নিজের চোখে কঠিন বাস্তবতার রূপ দেখার পর আমার মতো আমার সঙ্গের সবারই ভেতরটা উথাল-পাতাল হয়ে গিয়েছিলো। আমরা তখন আরও ভালোভাবেই বুঝেছি যে, ভাগ্যক্রমেই দত্তক বাবা-মায়েরা আমাদেরকে কানাডায় বড় হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।'

আর রবিন ক্রিসের গল্প শুনবে? সে আমাকে বলেছে, 'একাত্তরের যুদ্ধশিশু আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম একই ঐতিহাসিক সত্যের এপিঠ-ওপিঠ। অথচ যুদ্ধশিশুদের বিষয়টি একেবারেই অনালোচিত। এক্ষেত্রেই আলো ফেলতে হবে।'

রবিন আমাকে বলেছে, 'শিকড়ের সন্ধানে আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। সেই শিকড় পুরোপুরি খুঁজে পাইনি। এজন্য আমার জন্মদাত্রী মা সম্পর্কে আমার আগ্রহের স্বরূপ পাল্টেছে। আমার এখন যুদ্ধশিশু জন্মদাত্রী সকল মায়ের ব্যাপারেই জানতে ইচ্ছে করে। তাদের দুই লাখ জনের প্রত্যেকের সম্পর্কে।'

রবিনের মতো একই বক্তব্য আমারও। তোমার সঙ্গে আমি সিরাজগঞ্জ গিয়েছিলাম। সেখানে আমার ১৯ জন বীরাঙ্গনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। তাদের প্রত্যেকের চোখেই আমি আমার নিজের ছায়া দেখতে পেয়েছি। প্রত্যেককেই আমার নিজের মা মনে হয়েছে। আগামী মাসেই আমি এদেশে আসছি। তুমি কথা বলে রাখো, আমি আবার সিরাজগঞ্জ যাবো। তবে আগে যাবো মাদার তেরেসা মাতৃসদন ও অনাথ আশ্রমে।

ই-মেইলে রায়ান আরও বেশ কিছু ডকুমেন্টস পাঠিয়েছে। যেগুলো গত কয়েক মাসে সে যোগাড় করতে পেরেছে। দত্তক শিশু নেওয়া সেই পনের পরিবারের নাম-ঠিকানাও দিয়েছে। সুমনা জেনে আশ্চর্যান্বিত হয় যে, শুধু বাংলাদেশের নয়; এইসব পরিবারে নানা দেশের অনাথ শিশুরাই বড় হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ফ্রেড ও বনি ক্যাপাচিনো পরিবারেই বড় হয়ে উঠেছে ১৯টি শিশু। আর তাদের নিজেদেরও রয়েছে আরও দুটি শিশু। এই একুশ শিশুর কাউকেই তারা আলাদাভাবে দেখেনি। নিজের চার শিশুর সঙ্গে আরও পনের অনাথ শিশুকে বড় করেছে লয়েড ও স্যান্ড্রা সিমসন পরিবার। আর রবার্ট ও হেলেকে ফেরি তাদের তিন সন্তানের সঙ্গে বড় করে তুলেছেন আরও ১০ শিশুকে।

ই-মেইলের জবাবে সুমনা বড় হয়ে ওঠা এইসব যুদ্ধশিশু এবং তাদের দত্তক বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখায়। রায়ানের সূত্র ধরেই সবার সঙ্গে কথা বলে সে একটি বড় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার পরিকল্পনা করে ফেলে।

আট

একেবারে ছোট থেকে শুরু করে চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের ১০ বছর বয়সের বাচ্চাদের তিনটি সেকশনের সমন্বয়ের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সোমাকে দেওয়া হয়েছে সাড়ে তিন মাস পর। এর মধ্যে বাচ্চাদের কাছে সে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। নিবেদিতা গোমেজও তার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছেন।

আজ সকালেই তিনি তাকে কক্ষে ডেকে নিলেন– 'তোমার কী অবস্থা? দেখে তো মনে হয় ভালোই আছো। শুনেছি বাচ্চারাও তোমাকে বেশ পছন্দ করছে। ওদের প্রতি বেশি অ্যাটেনশন দিতে গিয়ে নিজের পেটেরটার কথা আবার ভুলে যেও না। আমরা চাই ইক্যুয়াল মনোযোগ।' দিদির কথায় সে কিছুটা লজ্জা পায়। নিজের পেটের দিকে তাকায়; সেখানে এখন কারো উপস্থিতি দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। দিদিও তাকান– 'ডা. সেলিনাকে আমি বলে দিয়েছি তোমার নিয়মিত চেকআপ করতে। করছে তো?' এবার হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ায় সে।

'যাক আর বেশিদিন বাকি নেই। বাচ্চাদের সঙ্গেই থাকো। তুমি হাসিখুশি থাকলে পেটের বাচ্চাটাও ভালো

ডাক্তারকে বলো। আমাকেও জানিয়ে রেখো।'

'জানি, আপনিই আমাকে আগলে রাখবেন। এখানে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।' সোমার কথায় তার দিকে প্রসন্নমুখে তাকান নিবেদিতা– 'আচ্ছা শোনো, আমার এক সাংবাদিক বন্ধু আছে; সুমনা হাসান। বয়স আমার অর্ধেকেরও কম। তবে অনাথ বাচ্চাদের ফ্রেন্ডলি। আর দূরে থেকেও আমাদের স্বেচ্ছাসেবী। এখন বড় হয়ে যাওয়া এক যুদ্ধশিশুকে সে নিয়ে আসবে আমাদের এখানে। সেই যুদ্ধশিশু এদেশের অনাথ শিশু আর নির্যাতিত মায়েদের নিয়ে কাজ করতে এখানে আসছে। থাকবে কিছুদিন। তোমার সঙ্গে ওদের দু'জনেরই পরিচয় করিয়ে দেবো। ওদের কাজেও তুমি যুক্ত হতে পারো, যদি এনজয় করো।'

'আপনি যা ভালো মনে করেন তার সবটার সঙ্গেই আমি আছি।' নিবেদিতাকে আশ্বস্ত করে সোমা। তবে মনে হচ্ছে আজ তার মন কিছুটা খারাপ। ভোর থেকেই মাকে মনে পড়ছে। শেষ রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। সকালেও তার রেশ পাওয়া যায়। বৃষ্টিস্নাত ভোরে বাগানের পাশ দিয়ে হাঁটছিলো সে। মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে লাগতেই হঠাৎ চোখে পড়ে এক কোনায় ফুটে আছে একগুচ্ছ দোলনচাঁপা। ভার্সিটি থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে মায়ের জন্য দোলনচাঁপা নিয়ে বাড়ি ফিরতো সোমা। মা ভীষণ খুশি হতেন। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। মা এখন কী করছেন, কেমন আছেন কিছুই জানে না সে। কোনো যোগাযোগই নেই। প্রতিদিন বুকের কষ্ট বুকে চেপে মা স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেন। অফিসে যান। এই বুঝি ফোন এলো। টেলিফোন বাজলেই উৎসুক হয়ে তাকান। এসবের কিছুই দেখা হয় না, বোঝা হয় না সোমার।

নয়

একদল শিশু তীর-ধনুক নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে জুয়েল মণ্ডলের দিকে। সে দৌড়াচ্ছে তো দৌড়াচ্ছেই। এক পর্যায়ে যাওয়ার সব পথ বন্ধ হয়ে আসে। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে তীরন্দাজ বাহিনী। আর সে তখন চিৎকার করছে, করেই যাচ্ছে– 'আল্লার দোহাই, তোমরা আমারে জানে মাইরো না। আমার সহায়-সম্পত্তি সব দিয়া দিমু। শুধু এইবার আমারে বাঁচার সুযোগটা দাও।'

ডাঙায় ওঠা কৈ মাছের মতো তড়পাচ্ছিলো সে। শরীরজুড়ে ঝর ঝর ঝরছে ঘাম। আর মুখে শুধুই 'আমারে মাইরো না, আমারে মাইরো না' চিৎকার। বউ ধাক্কা দিতেই ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে সে। এতোক্ষণ তাহলে স্বপ্ন দেখছিলো। এ কেমন স্বপ্ন! ষোল-সতের বছর আগের ঘটনা মাথায় ভর করে তার। হঠাৎ দেখে, শান্তি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তার ট্রেনে কাটা শরীরে ছোপ ছোপ রক্ত– 'কী, আমারে চেনা যায়? আমি মইরা গিয়া শান্তিতেই আছি। কিন্তু আমার সন্তান, সে কিন্তু একদিন সব হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বুইজা নিতে তোমার সামনে আইসা দাঁড়াবোই। তোমার রেহাই নেই জুয়েল মণ্ডল। তুমি আর তোমার বাপ আমার জীবনটারে শেষ করে দিছো– এইটা ভুললে চলবো না।'

বউ তার জিজ্ঞেস করে, 'কী এমন স্বপ্ন দেখলে? এতো ঘামতাছো কেন?'

'সে তুমি বুঝবে না। কই আছে কোথায় আছে জানি না তবে ওই হারামির বাচ্চারে শেষ না কইরা দিতে পারলে আমার শান্তি মিলবো না। আমি বুঝতে পারতাছি– হে আইবোই; আমার এই সংসার ছারখার কইরা দিতে আইবোই। আমার আরও সতর্ক হওনের দরকার ছিলো। ওই সময় কেন যে দুইটারে একসঙ্গে শেষ কইরা দিতে পারলাম না!'

'তুমি কী কইতাছো বুঝতে পারতাছি না তো?'

'তোমার বুঝা লাগবো না। তুমি অহন আমার সামনে থেকে যাও।' বউকে ধমক লাগায় জুয়েল। তারপর বিছানা থেকে নেমে হন হন করে উঠানের দিকে যায়। কামাইল্যাকে ডাকে। আবুল কামাল বাড়ির সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মী। বিগত প্রায় বিশ বছর ধরেই আছে। মণ্ডলবাড়ির সব অপকর্মের সাক্ষী। সতের বছর আগে শান্তির ঘরে আগুন দেওয়ার কাজটিও সে করেছিলো হোসেন আলীর পরামর্শে। আর চাতালের মূল কর্মী হোসেন আলী শুধু জুয়েলের নয়, তার বাপ মালেক মণ্ডলেরও সব অপকর্মের সাক্ষী। তবে খুব বিশ্বস্ত। তার এখন বয়স হয়েছে। তারপরও যে কোনো পরামর্শের প্রয়োজনে প্রথমেই তাকে ডাকে জুয়েল। চার বছর আগে মালেক মণ্ডল মারা যাওয়ার কিছুদিন আগেও ছেলেকে ডেকে বলেছিল, 'যা কিছু কর হোসেন আলীরে ছাড়বি না। হেই বার-চৌদ্দ বছর বয়স থাইকা আমার লগে আছে। বিশ্বাসী। নিজের জান দিবো তবু আমগো ক্ষতি হইতে দিবো না।' শুধু চাতালের ব্যবসা নয়; এই ক'বছরে আরও অনেক ব্যবসা বেড়েছে তার। সীমান্তে চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এলাকায় মাদকের বড় ব্যবসাটিও নিয়ন্ত্রণ করছে। সবকিছুতেই পাশে আছে হোসেন আলী।

দশ

দেশের পরিস্থিতি অনেকটাই খারাপ। সর্বত্র একটা চাপা অস্বস্তি। একই কায়দায় উগ্রপন্থিদের হামলায় নিহত হচ্ছেন মন্দিরের সেবায়েত, গির্জার ফাদার থেকে শুরু করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। এগুলোকে দেশের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে মনে হয় সুমনার। সব ঘটনারই দায় স্বীকার করছে কথিত আইএস। আর সরকার সব সময়ই বলে আসছে– এদেশে আইএস নেই। এখানকার কিছু উগ্রপন্থি দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে এগুলো করছে। সুমনা ভেবে পায় না, এদেশে আইএস না থাকলে বা তাদের মনোভাবাপন্ন লোক না থাকলে কীভাবে একই ওয়েবসাইট থেকে সব ঘটনার দায় স্বীকার করা সম্ভব! ঘটনার পরপরই যারা দায় স্বীকার করছে, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাদের যোগাযোগ আছে; সরকার বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী যা ধরতে পারছে না। শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, উগ্রপন্থিরা মুক্তবুদ্ধি চর্চার সঙ্গে যুক্ত মানুষদেরও একের পর এক খুন করে যাচ্ছে।

সুমনা টের পায়, একটা নিকষ কালো পর্দায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ। ভীষণ শ্বাসকষ্ট হতে থাকে তার। মুক্তবুদ্ধি চর্চার সঙ্গে যুক্ত সব মানুষই এখন কালো পর্দার ভেতরে আটকে শ্বাসকষ্টে গুমরে মরছে। অবশ্যই এর থেকে পরিত্রাণের একটাই পথ– প্রতিরোধ। অন্ধকারের শক্তিকে প্রতিরোধ করতেই হবে। বিভাজন আর দোষারোপের রাজনীতি যেখানে প্রবল, সেখানে এই সর্বাত্মক প্রতিরোধ কীভাবে সম্ভব, ভেবে পায় না সে। নিবেদিতা গোমেজকে ফোন করে। গতকাল তারাও একটি উড়োচিঠি পেয়েছেন। মাতৃসদনের নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে। খামের ভেতর রক্তের কয়েক ফোঁটা দাগ দেওয়া চিঠিতে কে বা কারা লিখেছে–

> 'জারজ সন্তানদের বাঁচিয়ে রেখে তোমরা খ্রিস্টান বানাচ্ছো– এটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেবো না। তোমাদের কতলের রায় হয়ে গেছে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকো।'

অন্য সময় হলে এসব উড়োচিঠি বা হুমকি হেসেই উড়িয়ে

দিতেন নিবেদিতা। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কারণে এবার তিনিও কিছুটা চিন্তিত, বিচলিত। ফোনে কথপোকথনেও সেরকম আভাস পাওয়া গেলো। তারা এখন বেশ সতর্ক। মাতৃসদনের এতোগুলো বাচ্চা থাকে, সতর্ক তো থাকতেই হবে।

নিবেদিতা বলেন, 'গতকালই আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বেশ পজিটিভ। মাতৃসদনের আশপাশের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তবে আমি চাই না, এটা নিয়ে মিডিয়ায় বেশি লেখালেখি হোক। তুই তো জানিস, অন্ধকারের শক্তিগুলো এতে আরও উৎসাহিত হয়।'

'আচ্ছা দিদি, রায়ান তো আগামী মাসের শুরুতেই আসতে চায়। এই পরিস্থিতিতে কী বলি?' ফোনেই প্রশ্ন রাখে সুমনা।

'আসতে পারে। মাতৃসদনের ভেতরে আমরা তার নিরাপত্তা দিতে পারবো। কিন্তু বাইরে মুভমেন্ট সীমিত করতে হবে। তুই পুরো বিষয়টাই জানিয়ে দিবি। কোনো ফাঁক রাখবি না। তারপর সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিক।'

নিবেদিতার ফোন রেখে ফেসবুকে রায়ানের সঙ্গে চ্যাটেও সুমনা তাকে বাংলাদেশ সফর বিলম্বিত করার অনুরোধ জানায়। তবে এতে কোনোভাবেই রাজি নয় রায়ান। 'দেখো, আমি টিকিট করে ফেলেছি। আমাদের এখানকার নেটওয়ার্ক আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে বাংলাদেশের নির্যাতিতা মা আর অনাথ শিশুদের ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করতে। আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি আসবো। না হয় আমার এই কাজে দেরি হয়ে যাবে। আমি সেটা চাই না।'

এটা বলার পর তাকে আর আসতে না করতে পারে না সুমনা। তবে তারও কেমন ভয় ভয় লাগতে থাকে।

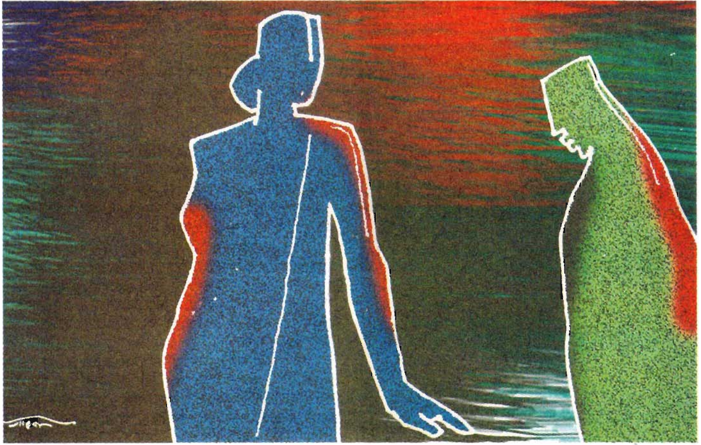
এগার

প্রতি মাসেই কলেজ হোস্টেল থেকে একবার দুইবার মাতৃসদনে আসে শুভ। ইতিমধ্যে সোমার সঙ্গেও তার পরিচয় হয়েছে।

'তোমাকে দেখলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। আমার ভীষণ কষ্ট হয়। তুমি তো তোমার পেটের সন্তানকে বাঁচানোর জন্য এই মাতৃসদনে চলে এসেছো। আমার মা-ও এসেছিলো তবে আমাকে গেটে রেখে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ট্রেনের নিচে। কী হতো, সে নিজেও যদি তোমার মতো এখানে এসে কোনো কাজ নিতো? হয়তো বড় কোনো কাজ করার যোগ্যতা ছিলো না। তারপরও নিশ্চয় নিবেদিতা মা তাকে ছোটোখাটো কোনো কাজ দিতেন। আমি মাতৃহারা হতাম না।'

সোমা ভেবে পায় না এ কথা বলার পর শুভকে কী বলবে।

'এই মাতৃসদন আমাকে সব দিয়েছে; সব। আমি ভালোভাবেই বড় হয়েছি। এখন কলেজে পড়ছি। তারপরও আমি টের পাই আমার বুকটা ফাঁকা হয়ে থাকে। মফস্বল থেকে আসা শান্তি নামে এক সাধারণ নারীকে আমি খুঁজে বেড়াই। যতো খুঁজি ততোই সে হারায় দূরে কোথাও।'



সোমার ভীষণ খারাপ লাগে। সে শুভকে হাত ধরে নিয়ে চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের দিকে এগুতে থাকে। কক্ষে পৌঁছার পরই কয়েকটি শিশু মা মা বলে তার দিকে এগিয়ে আসে। এই কয়েক মাসে সে তাদের কাছে মায়ের মতোই আপন হয়ে উঠেছে। জয়িতাকে কোলে নিতে চায় সে; মায়াকেও। পারে না। স্ফীত শরীরে তার নিজেরই কষ্ট হয়। বেঞ্চিতে বসে বাচ্চাদের আগলে ধরে সে। শুভও বসে পাশে।

'দেখো শুভ। মাত্র কয়েক মাস হয়েছে আমি এদের সঙ্গে আছি। এর মধ্যেই ওরা আমাকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছে। তুমি যখন এদের বয়সী ছিলে তখনও নিশ্চয় অনেকেই তোমাকে মায়ের আদরে বড় করেছেন। সুতরাং মনে কষ্ট নিও না। তোমার এক মা নেই তো কী হয়েছে? এখানে আছে অনেক, অনেক মা। তোমার উচিত লেখাপড়া শেষ করে বড় কিছু একটা হওয়া, যাতে তোমার মায়ের আত্মা শান্তি পায়। নিবেদিতাদি আমাকে প্রায়ই তোমার কথা বলেন।



শান্তি পায়। নিবেদিতাদি আমাকে প্রায়ই তোমার কথা বলেন। তোমাকে নিয়ে তার অনেক প্রত্যাশা, অনেক স্বপ্ন। মন খারাপ করে ভেঙে না পড়ে তোমার উচিত সামনে এগিয়ে যাওয়া। আমাদের সবার শুভ কামনা আছে তোমার প্রতি।'

বার

বিমান আজ দুই ঘণ্টা দেরিতে ল্যান্ড করবে। রায়ানকে আনতে এয়ারপোর্টে গিয়ে আটকে গেছে সুমনা। ওর এই সফরটা সে শুরু থেকেই ফলো করতে চায়। সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদককেও বিষয়টি জানিয়েছে। তারা সানন্দে রাজি হয়েছেন। ইতিমধ্যে কানাডার দত্তক গ্রহণকারী পরিবারের সদস্যদের ই-মেইল সাক্ষাৎকারও তার পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছে। রায়ান প্রথমে যাবে মাদার তেরেসা মাতৃসদন ও শিশু আশ্রমে। তারপর সময় পেলে যাবে সিরাজগঞ্জের বীরাঙ্গনাদের সঙ্গে দেখা করতে। ৬ সপ্তাহ থেকে সে আবার ফিরে যাবে কানাডা। এর মধ্যে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট তৈরি করে ওখানকার নেটওয়ার্কে উপস্থাপন করবে। তারপর সবাই মিলে বসে নির্ধারণ করবে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা।

এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি সিস্টেমের লোকজনও সুমনার পরিচিত। তাদের বিশেষ সহযোগিতায় সে বোর্ডিং ব্রিজ পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষ। কয়েক মিনিট হয় ল্যান্ড করেছে বিমান। সুমনাকে দেখেই প্রায় দৌড়ে এসে হাত বাড়িয়ে দেয় রায়ান। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জোরে একটা নিশ্বাস নেয়: 'আহ্ কতো দিন পর এমন নিশ্বাস নিলাম! মায়ের দেশ বলে কথা! চলো চলো। আমি কিন্তু কালই তেরেসা মাতৃসদনে যাবো। নিবেদিতা গোমেজকেও সেভাবে মেইল দিয়েছি।'

এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতা শেষে রায়ানকে নিয়ে গাড়িতে উঠে হোটেলের দিকে যেতে থাকে সুমনা। আর পরদিন ভোরেই রওনা দেয় গাইবান্ধার উদ্দেশে।

তেরেসো মাতৃসদনে নিবেদিতা গোমেজের সামনে বসে আছে রায়ান। পাশে বসা সুমনা ইতিমধ্যে তাকে নিবেদিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। যদিও থাকার কথা ছিলো, তারপরও সুমনা আজই চলে আসবে ঢাকায়। যেতে যেতে এভাবেই কথা হয়েছে রায়ানের সঙ্গে।

সোমাকে ডেকে আনেন নিবেদিতা। তার কাছে মনে হয়, রায়ানের সঙ্গে কাজ করার জন্য বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে এই মাতৃসদন সম্পর্কে জানানোর জন্য সোমাই যথেষ্ট। সন্তান প্রসবের সময় একেবারে ঘনিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় ডরমিটরি বিল্ডিংয়ে একা একা থাকার চেয়ে এটা করা তার জন্য অনেক ভালো কাজ।

'রায়ানের সঙ্গে তুমি কিছুদিন কথা বলতে থাকো। ও যা যা জানতে চায় সাধ্যমতো জানাও। প্রতিদিন সকাল ১০টার পর চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে চলে আসবে সে। তোমার কাজ হলো তার প্রশ্নের রেসপন্স করা। আর যেখানে যেখানে সমস্যা মনে করবে অবশ্যই আমাকে জানাবে।' নিবেদিতা বুঝিয়ে দেন সোমাকে।

অল্প কয়েক দিনেই সোমা ও রায়ানের মধ্যে বেশ সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সোমার সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানায় রায়ান– 'তোমার ডিসিশনকে আমি অনার করছি। তোমার মতো আরও অনেককেই এগিয়ে আসতে হবে। কানাডায় তো সিঙ্গেল মাকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আমি চাই এদেশেও না থাকুক। এমন পরিবেশ তৈরি হোকে যেনো তোমার সন্তান শুধু তোমার পরিচয়েই পরিচিত হয়, বড় হয়। সেই কাজটাই আমরা জোরেশোরে শুরু করছি।'

'সেজন্য সমাজটাকেই পাল্টানো জরুরি। আমাদের দেশটা কিন্তু আরও অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে। একাত্তরের যে মুক্তিযুদ্ধের ফসল তুমি, তার চেতনা থেকেও অনেকটা সরে এসেছি আমরা। সেই চেনতার মূলেই ছিলো ক্ষুধামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। আর এখন দেখো, চারদিকে কেমন ছড়িয়ে পড়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। শুধু সংখ্যালঘু নয়; মুক্তবুদ্ধি চর্চার মানুষগুলোও ক্রমশ চুপসে যাচ্ছে।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত। সমাজটা পাল্টানোর জন্যই সবাইকে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে।'

রায়ান আর সোমার কথোপকথন চলতে থাকে। এর মধ্যে এগিয়ে যেতে থাকে নানা পরিকল্পনা। আলোচনায় একে একে যুক্ত হতে থাকেন মাতৃসদনের আরও অনেকে। ভিন দেশ থেকে আসা বাঙালি চেহারার এই যুবকটি ক্রমশ সবার আপন হয়ে ওঠে।

তের

কলেজ হোস্টেলের বাইরে বাগানের পাশে উপুড় হয়ে পড়ে ছিলো লাশটি। গলা কাটা; রক্তাক্ত। ঘটনাটি প্রথমে চোখে পড়ে বাগানের মালী সুনীলের। কলেজের সীমানার মধ্যেই খুন। কে খুন করলো, কাকে করলো? তার চিৎকারে লোক জড়ো হলো। হোস্টেল থেকে কিছু ছাত্রও বেরিয়ে এলো। পুলিশকে খবর দেওয়া হলো। পুলিশ ফোনেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছে– লাশে হাত দেওয়া যাবে না। কেউ খুন হলে প্রথমে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করতে হয়– এটা কারো জানা ছিলো না। পুলিশ এসে সবাইকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেই কাজটাই শুরু করলো। যেই লাশটা উল্টানো হলো তখন তো সবাই হতবাক। আরে, এ তো আমাদের শুভ। এই নিরীহ ছেলেটা খুন হয়ে যাবে কেন!

সহপাঠীরা কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে। রুমমেটরাই জানালো, প্রতিদিন খুব ভোরে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে বাগানে হাঁটাহাঁটি করা শুভর নিয়মিত অভ্যাস। ঘাসের ওপর মোটরসাইকেলের চাকার দাগ দেখা যায়। আর পাশেই পড়ে আছে একটি রক্তাক্ত ছুরি।

পাঁচ কিলোমিটার দূরে তেরেসা মাতৃসদনেও খবরটি পৌঁছে যায়। নিবেদিতা গোমেজের মনে হয় সবচেয়ে অন্ধকার কোনো ভোরের মুখোমুখি তিনি আজ। সাথে সাথেই রওনা দেন। সঙ্গে আশ্রমের গুরুত্বপূর্ণ সবাই। সোমা যায়নি; নিবেদিতা তাকে নিষেধ করে বলেছেন, এই অবস্থায় যাওয়া ঠিক হবে না। মাতৃসদনের সীমানার বাইরে বের হতে রায়ানকেও নিষেধ করেছেন তিনি।

আসলেই সময়টা এখন খারাপ। একটা টগবগে ছেলেকে ওরা মেরে ফেললো! শুভর হতভাগী মা শান্তির আত্মার কাছে কী জবাব দেবেন? এই প্রথম সবাই দেখছে শাড়ির আঁচলে মুখ গুঁজে কাঁদছেন নিবেদিতা।

কে মেরেছে শুভকে? পুলিশ বলছে, উগ্রপন্থিরা যেভাবে খুন করে ঠিক একই কায়দায় ওর ওপর হামলা হয়েছে। অবশ্য বিকেল পর্যন্ত কোনো ওয়েবসাইট থেকেই এই হত্যার দায় স্বীকারের খবর পাওয়া যায় না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই সোমার প্রসব বেদনা উঠলো। নিবেদিতাসহ মাতৃসদনের বেশিরভাগ লোক তখনও বাইরে শুভর মরদেহ নিয়ে ব্যস্ত। পুলিশ ও গণমাধ্যমকেও সামলাতে হচ্ছে কাউকে কাউকে। খবর পেয়ে রায়ানই ছোটাছুটি শুরু করেছে এদিক ওদিক। চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের দিকে যেতে যেতে ডা. সেলিনার সঙ্গে দেখা। তিনিই সর্বশেষ একটা বুদ্ধি বাতলে দিলেন– 'সাধারণত জটিল সমস্যা হলে এসব ক্ষেত্রে আমরা বাইরের হাসপাতালে নিয়ে যাই। না হয় আমাদের এখানেই ব্যবস্থা আছে। সোমাকে আমি গত কয়েক মাস দেখেছি, অবজার্ভ করছি। তার কোনো জটিলতা নেই।'

চাইল্ড কেয়ার সেন্টারের পাশে থাকা ছোট ওটি রুমটিতে নিয়ে যাওয়া হলো সোমাকে। উদ্বিগ্ন রায়ান বসে আছে বাইরে। প্রায় এক ঘণ্টা পর ভেসে এলো নবজাতকের কান্নার শব্দ। কিছুক্ষণ পর ডা. সেলিনা নিজেই বেরিয়ে এলেন। তার কোলে টাওয়াল মোড়ানো এক ফুটফুটে শিশু। হাসিমুখেই রায়ানকে বললেন, 'সোমার ছেলে হয়েছে। নেবে একবার কোলে? পারবে তো?'

চৌদ্দ

এ কয়দিন সোমার আশেপাশেই ছিলো। অনেক কথা বলেছে তারা, অনেক কিছু শেয়ার করেছে। ভাবতে গিয়ে কিছুটা হলেও আজ খারাপ লাগছে রায়ানের। ছয় সপ্তাহ শেষ, চলে যাচ্ছে সে। যাওয়ার আগে বিদায় নিতে এসে বাচ্চাটিকে আবার কোলে নিয়েছে– 'তুমি ভালো থাকবে সোমা এবং তোমার সন্তানও। এবারের সময় ফুরিয়ে এসেছে বলেই যাচ্ছি। তবে আমি আবার আসবো। এদেশ আমাকে ছাড়বে না।' সোমার দিকে তাকায় রায়ান। তাকে এখন আর ভিন দেশের কোনো মানুষ মনে হয় না।

ওর চলে যাওয়ার প্রায় দেড় মাস হয়েছে। এর মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। একেবারেই চুপচাপ। হঠাৎ রায়ানের একটি ই-মেইল পায় সোমা। এতোদিন পর এটা পেয়ে কিছুটা হলেও হতচকিত হয়।

কী লিখেছে রায়ান–

> এতোদিন পর তোমাকে লিখছি কেন, হয়তো অবাক হচ্ছো। আসলে তোমাকে লিখবো কি লিখবো না এটা ভেবে ভেবেই সময়টা চলে গেছে। সর্বশেষ ভাবলাম লিখেই ফেলি।
>
> আমার কানাডিয়ান গার্লফ্রেন্ডের কথা আগেই তোমাকে জানিয়েছিলাম। বাংলাদেশ অন্তঃপ্রাণ বলেই সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে তিন বছর আগে। তার চাওয়া ছিলো আমি যেন আমার হারিয়ে যাওয়া মা আর বাংলাদেশ বাংলাদেশ করে কোনো অর্থ খরচ না করি। আমার পেইন সে কোনো দিনই বোঝেনি। এবার বাংলাদেশে যাওয়ার পর তোমার সঙ্গে পরিচয় হলো। একটি ফুটফুটে শিশুর জন্ম দিলে তুমি। আমি সেই সন্তানকে কোলে নিলাম। এক অন্যরকম অনুভূতি হলো আমার।
>
> বিষয়টি আমি তোমাকে বলে আসতে পারতাম। কিন্তু ভাবলাম, এটার জন্য সময় নেওয়া উচিত। কারণ আমি জানি না তুমি এটাকে কীভাবে নেবে! তোমার আপত্তি না থাকলে আমি তোমাকে এবং তোমার সন্তানকে গ্রহণ করতে চাই। তোমার সন্তানটি তোমার পরিচয়েই তোমার সঙ্গে থেকে বড় হবে। আমি আমার মায়ের সঙ্গে থেকে তার পরিচয়ে বড় হতে পারিনি বলে সারাজীবন যে গভীর দুঃখবোধ বয়ে চলেছি, এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও তার লাঘব হবে। তুমি সম্মত হলেই বিষয়টি আমি অন্যদের জানাবো। আর যদি দ্বিমত থাকে তাহলে এটা কাউকে জানানোর প্রয়োজন নেই। আমিও জানাবো না, তুমিও জানিও না।
>
> আমার কথাগুলো আমি সরাসরি বলেছি। যদি ভুল হয়ে থাকে আগেই ক্ষমাপ্রার্থী।
>
> তোমার মেইলের অপেক্ষায় রইলাম।
>
> –রায়ান মরিস

একবার পড়ে, দুইবার পড়ে, তিনবার পড়ে, তারপরও এই ই-মেইলের কী জবাব দেবে ভেবে পায় না সোমা। ❖

ইরাজ আহমেদ

ডেডবডি



গল্প

জায়গাটা ভালো না আশপাশের মানুষ বলাবলি করে। ইট বিছানো রাস্তা এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে একটা ডোবার মতো জায়গায়। ডোবার তলায় ঘোলা পানি. দু'দিকে কয়েক সারি ঘর ভাঙা তোবড়ানো টিন. নীল রঙের পলিথিন আর সিমেন্টের বস্তা দিয়ে তৈরি করা মানুষের ঘরবাড়ি। ঘরের ভেতরে নকল স্ক্রু. নুডলস আর সেমাই তৈরির কারখানা . কয়েকটা ঘরে চোলাইয়ের দোকান আর জুয়ার আসর সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কয়েকটা চা-সিগারেটের দোকান। এসব করেই মানুষগুলো ভাত জোটায় এই বস্তির ছোট ছেলেরা সকালবেলা কাঁধে চটের বস্তা নিয়ে বের হয়। সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরে. ময়লা ঘেঁটে লোহার টুকরো. ছোট কৌটা কুড়িয়ে আনে। জমা দেয় ফজলুর গাড়ি সারাইয়ের গ্যারেজে। ফজলু বস্তা মেপে কেজিতে তিরিশ টাকা করে ধরিয়ে দেয়। এই লোহা আর কৌটার গাহেক আছে তারা আবার রাত ছাড়া আসে না। বাচ্চার দল সব জানে বোমার মসলায় লোহা লাগে ফজলু লোহা বেচে।

ডোবার ধার ঘেঁষে জোড়া তালগাছ। দুটোই বাজ পড়ে পুড়ে গেছে কালো হয়ে যাওয়া গুঁড়ি. ন্যাড়া মাথা। রাতের বেলা দূর থেকে দেখলে মনে হবে. এক জোড়া ভূত গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে। কবে গাছ দুটোর মাথায় বাজ পড়েছিল. কেউ বলতে পারে না



অলঙ্করণ : : সব্যসাচী হাজরা

হয়তো এখানে মানুষের বসতি হওয়ার আগে এক দুর্যোগের রাতে আকাশ থেকে নেমে এসেছিল আগুনের রেখা। আর তাতেই জোড়া গাছের জান খালাস।

তালগাছের গোড়ায় পড়ে থাকে রাজ্যের ময়লা, মরা কুকুর, ভাঙা টিন, ব্যবহৃত কনডম। পুরো এলাকার বাতাস পচা গন্ধে ভারি হয়ে থাকে। এই ময়লার টাল থেকে একটু দূরে সকালে ছোট্ট একটা বাজার বসে। ডোবা পার হয়ে আরও ভেতরের এলাকা থেকে লোকজন শাকসবজি আর মাছ নিয়ে এসে বসে। ব্রিক সলিং রাস্তার উল্টো দিকে বেশ বড় কলোনি এলাকা। তার পর বড় রাস্তা। কলোনির মানুষ শাক আর ছোট মাছের লোভে এদিকে আসে বাজার করতে। এই এলাকা থেকে মেয়েরা কলোনিতে কাজ করতে যায়। তারাও সবজি আর মাছ কিনে নিয়ে যায় মালিকদের জন্য।

যেদিন ঘটনাটা ঘটল, তার আগের রাতে বৃষ্টি ছিল। দুপুর থেকেই আকাশের কলের লাইন কেউ যেন খুলে দিয়েছিল। বৃষ্টি পড়ার বিরাম নেই। বস্তির সামনের নিচু জায়গায় পানি জমে পুকুর। লোকজন খুব একটা বের হয়নি। যারা সকালে বের হয়েছিল, তারাও ফিরেছে তাড়াতাড়ি। শুধু ফজলুর গ্যারেজ আর নাইড়া বাবুর জুয়ার আড্ডায় নিয়মিত কাস্টমার ঢুকে পড়েছিল বৃষ্টি মাথায় করে। বাকি সব সুনসান। ঢাকা শহরে কয়েক দিন ধরে রাজনৈতিক ঝামেলা চলছে। এখানে-ওখানে বোমা ফাটছে, মানুষ মরছে, বাস পোড়ানো হচ্ছে। আর এসব ঘটনা যখন ঘটতে থাকে, ফজলুর গ্যারেজে লোহা কেনার কাস্টমারও বেড়ে যায়।

সকালে আবার বৃষ্টি উধাও। তবে আকাশে মেঘ ছিল। পোড়া তালগাছের গোড়ায় জমা ময়লা সারারাতের বৃষ্টিতে ভিজে আরও টক গন্ধ ছড়াচ্ছিল। প্রথমে বস্তির লোকজনের চোখে পড়েনি। ময়লার স্তূপের কাছে তো কেউ খুব একটা যায় না। করপোরেশনের গাড়ি এসে ময়লা ফেলে আবার তুলে নিয়ে যায়। সেই গাড়ি আসতে আসতে দুপুর হয়ে যায়। সকালে লোহা কুড়ানো দলের মোবারক বের হয়েছিল ঘর থেকে। হিসু করতে গিয়েছিল তালগাছের দিকে। তখনই তার চোখে পড়ে মটু-পাতলুর পুতুল। হাওয়া ফুরিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া। মটু-পাতলুর কার্টুন মোবারক খুব মন দিয়ে দেখে হারুন কাকার চায়ের দোকানের ছোট্ট টিভিতে। ময়লা ডিঙিয়ে ঠেঁড়া পুতুলটা আনতে গিয়েই মোবারক দেখে ফেলে মানুষটাকে। ভাঙা ইটগুলো যেখানে উঁচু করে সাজানো, তার আড়ালে পড়ে আছে একজন মানুষ। এক পায়ে স্যান্ডেল, অন্য পা খালি। মোবারক মটুর পুতুলটা হাতে নিয়ে কয়েক পা সামনে এগিয়ে গিয়েছিল ঘটনাটা বোঝার জন্য। লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটা হাত শরীরের তলায় চাপা পড়া। এ পর্যন্ত দেখে লাফিয়ে সরে আসে মোবারক। এক দৌড়ে বস্তিতে গিয়ে খবরটা জানায়। মুহূর্তে ভিড় জমে যায় তালগাছের গোড়ায়। অসংখ্য মাছির সঙ্গে অনেক মানুষের ভিড়।

দুই

টেবিলের ওপর রাখা ওয়াকিটকিটা খড়খড় শব্দ করে ওঠে। থানার সেকেন্ড অফিসার রিয়াজুল হক বিরক্তিকর দৃষ্টিতে তাকায় একবার। শালা, সকালবেলাই শুরু হয়ে গেল। কাল রাতে বৃষ্টির মধ্যেও দুই চোখের পাতা এক করতে পারেনি রিয়াজুল। গত পনেরো দিন ধরে ঢাকা শহরে যা ঘটছে, তাতে ঘুম বাড়িছাড়া। রাতে অঝোর বৃষ্টির মধ্যেও তিনটা গাড়িতে আগুন দিয়েছে শালারা। অ্যাকশনে চারজন আহত, তার মধ্যে আবার একজন পুলিশ কনস্টেবল। অন্ধকারে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে মাথায় ইট খেয়ে চিৎপাত। সবচেয়ে বড় ঝামেলার কথা হচ্ছে, লোকটার রাইফেলটাও ছোটাছুটির মধ্যে খোয়া গেছে। পুরো এলাকা আগুন হয়ে আছে। সার্চ পার্টি এখনও অপারেশন চালাচ্ছে রাইফেল উদ্ধার করার জন্য।

রিয়াজুল থানায় ফিরেছে কিছুক্ষণ আগে। সুযোগ পেলে এক কাপ চা খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল মনের মধ্যে। মাথাটা ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে। ভেতরে তীব্র ব্যথা বেলুনের মতো ফুলছে, আবার চুপসে যাচ্ছে। ওয়াকিটকি আওয়াজ করেই যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে রিয়াজুল যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বোতাম টেপে। যান্ত্রিক গলায় কথা বলে কন্ট্রোল। ডোবার পাড় এলাকায় একটা বেওয়ারিশ বডি পড়ে আছে। এখনই রেসকিউ করতে হবে। ওয়াকিটকিতে মুখস্থ কয়েকটা কথা বলে যন্ত্রটা ঠকাস করে টেবিলে রাখে রিয়াজুল। চা আর খাওয়া হবে না। বিড়বিড় করে খিস্তি করে। এত ঝামেলার মধ্যে ডেডবডি! ডোবার পাড় জায়গাটাই ক্রিমিনাল এলাকা। বস্তির ভেতরে কয়েকজন দেশি মদ, জুয়ার আড্ডা চালায়। বেশ কয়েকজন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ওই এলাকায় আসা-যাওয়া করে, সে খবরও পুলিশের কাছে আছে। কে কাকে খালাস করল, এখন সেটাই দেখার বিষয়। টেবিলের ওপর রাখা হেলমেটটা তুলে নিয়ে রিয়াজুল বের হয়ে যায় থানা থেকে।

ওসি সাহেবের ফোন আসে ডোবার পাড়ে পৌঁছানোর আগে। সিটে বসে ঝিম ধরে যাচ্ছিল। ওসির ফোনে খাড়া হয়ে

বসে রিয়াজুল।

'রিয়াজুল, কোথায় তুমি?'

'স্যার, আমি ডোবার পাড়ে যাচ্ছি। একটা ডেডবডি...।'

'আমি জানি। খবরটা তোমার আমাকে আগেই জানানো উচিত ছিল।'

ওসির গলা গম্ভীর শোনায়। রিয়াজুল থতমত খায়।

'স্যার... স্যার, আমি ভাবলাম আপনি সারারাত অপারেশনে ছিলেন, টায়ার্ড হয়ে রেস্ট করছেন, তাই...।'

'আজকাল তুমি একটু বেশি ভাবো। অ্যানি ওয়ে, ওপর থেকে ফোন এসেছিল। তুমি দ্রুত গিয়ে বডিটার ব্যবস্থা করো। এখনও মিডিয়া পৌঁছায়নি স্পটে। তার আগে লাশ তুলে থানায় চলে আসবে। বেশি ভাবতে গিয়ে আবার ঝামেলা করে ফেলো না। চারদিকের সিচুয়েশন বেশ খারাপ। মনে রাখবে, কাজটা করতে হবে সাংবাদিকরা যাবার আগে।'

'জি স্যার, আমি কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কাজ শেষ করে ফোন দিচ্ছি।'

লাইন কেটে যায়। খবরটা আগে না দেওয়ায় স্যার বেশ বিলা হয়েছে মনে হচ্ছে। ভাবে রিয়াজুল। বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে যায়। একদিকে ডিউটি করতে করতে জীবন শেষ, অন্যদিকে স্যারের জটিলতা। এসব ভাবতে ভাবতে রিয়াজুলের মাথায় দ্বিতীয় চিন্তাটা ঢুকে পড়ে। বডিটা মিডিয়ার সামনে এক্সপোজ করতে চাইছে না কেন অথরিটি? পলিটিক্যাল ঘাপলার গন্ধ পায় রিয়াজুল। বড় কোনো মাছ খালাস হলো! সে রকম কিছু হলে তো আওয়াজ পাওয়ার কথা!

চিন্তাগুলো মাথার ভেতরে জোড়া দিতে দিতে ড্রাইভারকে জোরে চালাতে বলে রিয়াজুল। মিডিয়ার লোকজন খবর পেলে বাতাসের আগে উড়ে চলে আসবে, এরা পৌঁছানোর আগে কাজ শেষ করতে হবে।

তিন

অফিসরুমে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে তারেক নজিবুল্লাহ। তাকাচ্ছে ফোনের দিকে ঘনঘন। নাহ, স্বপনের এসএমএসটা আসেনি। কপালে গভীর ভাঁজ পড়ে নজিবুল্লাহর। এই ছেলেগুলো কোনো একটা কাজ যদি তাড়াতাড়ি করতে পারে। সেই কখন বলা হয়েছে স্বপনকে, এখনও কোনো খবর নেই। চেয়ারে বসে নজিবুল্লাহ। বুকের মাঝখানে একটা চাপ-ধরা ব্যথা ফিল করছে সকাল থেকে। গ্যাসের পেইন। রাতে ভালো ঘুম হয়নি, তার পর আবার সকালে উঠে এ রকম একটা খবর। শাওনকে রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফোনটাও অফ। অথচ এই গাণ্ডুগুলো তাকে খবরটা জানিয়েছে সকালে। কাল বিকেলেও শাওনের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার। সরকারি দলের জনসভা ছিল। কাল অনেক দিন পরে মঞ্চে ডাক পড়েছিল বক্তৃতা করতে। মাঠ গরম করার কাজ। শাওন মঞ্চে উঠে সালাম দিয়ে গেছে। বিরোধী দল গত পনেরো দিন ধরে মাঠে তুলকালাম খেলা দেখাচ্ছে। হরতাল, গুলি, বোমা ফাটানো, ভাংচুর– একেবারে ক্যারাব্যারা অবস্থা। প্রথম দিকে সরকার বেশ বিপাকে পড়ে গিয়েছিল। ওরা এতটা জোরদার অ্যাকশনে চলে যাবে, আগেভাগে বোঝা যায়নি। ছাত্রদের মিছিলে গুলির ইস্যুটা বেশ ভালোই কাজে লাগিয়েছে। পরিস্থিতি গরম হলেই তখন তারেক নাজিবুল্লাহদের ডাক পড়ে। শুরু হয় রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধের খেলা। এ রকম সময়ে শাওনের নিউজটায় বেশ ঘাবড়ে গেছে নজিবুল্লাহ। সকালে খবর পেয়ে পরিচিত সব জায়গায় খোঁজ নেওয়া হয়েছে। কোথাও নেই ছেলেটা। আর শাওন ঠিক কিছু না বলে হুট করে গায়েব হওয়ার ছেলে নয়। শাওনকে না পেয়ে প্রথমেই মাথায় আসে খালাস হয়ে যাওয়ার চিন্তাটা। দেশে যা পরিস্থিতি চলছে, তাতে আশঙ্কাটা খুব বেশি অমূলক নয় বলেই মনে হয়েছে নজিবুল্লাহর। আর তখন থেকেই মাথার ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। শাওনের কিছু হয়ে গেলে একদম পথে বসে যাবে নজিবুল্লাহ। এই শহরে রাজনীতি আর ব্যবসা করে খেতে হলে শাওনকে ছাড়া তার চলে না। এই ছেলেকে বিরোধী দলের লোকজন যেমন ভয় পায়, তেমনি তার দলের ভেতরেও অনেকে সমঝে চলে। শাওনের মাসল পাওয়ার ক্যাশ করিয়ে নজিবুল্লাহর আরও কিছুদূর যাওয়ার প্ল্যান আছে। এ রকম অবস্থায় শাওন গায়েব হলে তার চলবে?

হাতের ফোনটা ভাইব্রেট করে। নজিবুল্লাহ চমকে তাকায় আলো জ্বলা স্ক্রিনের দিকে। স্বপন জানাচ্ছে, পুরান ঢাকায় কাল রাতে ঢোকেনি শাওন। এসএমএস দেখে বুকের ভেতরে ধুঁকপুকানিটা বেড়ে যায়। পোলাটা ডুব দিল কোথাও? টেনশনে মাথা কাজ করতে চায় না নজিবুল্লাহর। আগামীকাল বিরোধী দল হরতাল ডেকেছে টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা। ওপর থেকে নির্দেশ আছে, এখনই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যাতে ওরা নামতে না পারে রাস্তায়। নজিবুল্লাহর অস্থির আঙুল নিজের ক্লিনশেভ গালের ওপর ঘোরাঘুরি করে। পুলিশ কমিশনারকে জানানো যেতে পারে বিষয়টা। কিন্তু ওদের জানানো মানে আবার অন্য বিপদ টেনে আনা। অনেক দূর গড়াবে খবর। আর তাতে অন্যরা চান্স নেবে। রব্বানী আর রকিবরা তো বসেই আছে তাকে সাইজ করার জন্য। গা ঝাড়া দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নজিবুল্লাহ। না, বিষয়টা নিয়ে এভাবে বসে থাকলে চলবে না। তাকেই মাঠে নামতে হবে। প্রথম যাওয়া দরকার পার্টি অফিসে। নজিবুল্লাহ তার ভারী শরীরটা চেয়ার থেকে টেনে তুলে দ্রুত বের হয়ে যায় অফিস থেকে।

চার

বডিটাকে ঘিরে ভিড় আর কমছে না। পুরনো মুখের সঙ্গে নতুন নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে। সবার মধ্যেই ভয় আর কৌতূহল। জানা কথা, একটু পরেই পুলিশ আসবে। পেছন পেছন সাংবাদিক। তাই অনেকে উঁকি দিয়েই চলে যাচ্ছে। এখানে থাকলেই তো ঝামেলা। কীভাবে মরল, কারা মারল, রাতে গুলির আওয়াজ অথবা চিৎকার শোনা গিয়েছিল কি-না– অনেক প্রশ্নের মিছিল। জায়গাটা তো ভালো না। এলাকার লোকজন নিজস্ব নিয়মে জানে, এ রকম হলে স্পটে বেশিক্ষণ থাকতে নেই। এ রকম লাশ পড়ে থাকা অবশ্য ডোবার পাড়ে নতুন কিছু নয়। গত বছরও ডোবায় একটা লাশ পাওয়া গিয়েছিল। সেটার মাথা ছিল না। সে সময় পুলিশ বস্তি থেকে অনেক মানুষকে ধরে চালান করেছিল থানায়।

পড়ে থাকা এই ছেলেটার অবশ্য বয়স বেশি না। পরনের সাদা শার্টটা পিঠের কাছে রক্তে লাল হয়ে আছে। গুলি করা হয়েছে। মাথাও ফাটা। লাশটা একনজর দেখে গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়ায় ফজলু। তার এখানে যারা আসে, তাদের কেউ না। অবশ্য উপুড় হয়ে পড়ে থাকায় মুখ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। এখানে সবার মধ্যে তারই ভয় সবচেয়ে বেশি। পুলিশের নজর আছে তার গ্যারেজের ওপর, সেটা ফজলু জানে। অবশ্য খবর পেয়েই গ্যারেজে রাখা বস্তাভর্তি লোহা সরিয়ে ফেলেছে। ফজলুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসে নাইড়া বাবু। চাপা গলায় বলে, মালটা কে, চিনতে পারলা?

ফজলু মাথা নেড়ে বলে, না, আমাগো দিকের কেউ না।

খালাস কইরা ফালাইয়া গেছে।

শব্দ করে থুথু ফেলে বাবু। ফালাইয়া তো পেঁচগিতে ফালাইলো আমাগো। এহন কয়দিন হালা কাম বন্ধ। লৌড়ের উপরে থাকতে হইব।

ফজলু কানের পেছনে গুঁজে রাখা সিগারেট বের করে ধরায়। চোখ রাখে রাস্তার দিকে।

বাবু চাপা গলায় বলে, আইচ্ছা, ঘটনা কী হইতাছে কও তো? চাইর দিকে হালায় খালি বোম পড়তাছে, মানুষ মরতাছে, বিরোধী দল হরতাল-মরতাল দিয়া একাকার! এহন আবার এহানে লাশ পড়ল... আমার তো আর ভালো লাগতাছে না।

ফজলু তাকায় বাবুর দিকে। বস্তির ভেতরে পোলাটা দুইটা জুয়ার আড্ডা চালায়। হানিফ মিয়ার ঘর ভাড়া, পুলিশের চান্দা আর ক্যাচাল সামাল দিয়া সামান্য কিছু হাতে থাকে বাবুর। শহর জুইড়া হরতাল আর মাইরপিটে বাবুর কাস্টমার আসা কইমা গেছে। তার ওপরে যদি এলাকার সামনে লাশ পইড়া থাকে, তাইলে কাম ফাইনাল। বাবু এহন ট্যাকার চিন্তায় অস্থির। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে বাবুর দিকে তাকিয়ে হাসে ফজলু। বাবুর কাঁধে হাত রেখে বলে, খেলাটা বুঝস নাই? দুই পার্টি খেলতে নামছে। আর গোল খাইতাছি আমরা। টেনশন কি আমারও কম? পুলিশ আইসা তো পয়লা আমারে লৌড়াইব। ভাবতাছি, গ্যারেজ বন্ধ কইরা কয়দিন ফুইটা থাকুম।

বাবু ফজলুর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে টান দিয়ে বলে, আমারেও নিয়া যাও। গতবারের কথা মনে নাই? চাইর দিন হাজতে আছিলাম।

ফজলু বাবুর কথায় আবার হেসে বলে, তাইলে আর খাড়াইয়া আছস ক্যান? আয় জাইগা।

কথাটা বলে ফজলু হাঁটতে শুরু করে। বাবু যায় তার পেছন পেছন।

পাঁচ

'ওই মোবারক, আমারে একটু নিয়া যা বাপ। ময়না কইয়া গেল, ডোবার কাছে বলে মানুষের লাশ পইড়া আছে। আমি একটু দেখতাম।'

ঘরের দরজায় বসে বুড়ি বলে ভেতরে অদৃশ্য মোবারকের উদ্দেশে। সকালে লাশটা দেখার পর থেকে মোবারক ঘরে ঢুকে বসে আছে। সঙ্গীরা পুলিশের কথা বলে গেছে। মোবারক, তরে কিন্তু পুলিশে ধরব। তুই ফার্স্টে লাশটা দেখছস। ভয় পেয়েছে মোবারক। পুলিশকে তার অনেক ভয়। ধরলেই মারে। দাদি সেই সকাল থেইকা বইলা যাইতাছে, তারে লাশ দেখাইতে নিয়া যাইতে। মেজাজ খারাপ হয় মোবারকের। বুড়ির মনে হয় ঈদ লাগছে। লাশ দেখতে যাইব!

আবার দাদির গলা শোনা যায়।

'ওই মোবারক, কই যে কথা শুনছ না? আমারে একটু নিয়া গেলে কী হয়! আইচ্ছা পোলাটার মুখে কেউ পানি দিছে জানস?'

মেজাজ আরও খারাপ হয় মোবারকের।

'ব্যাডা কবে মইরা ভূত হইছে আর তুমি আছ মুখে পানি দেওয়া নিয়া।'

'কী যে কস না তুই! মরণের সময় মুখে পানি দেওন ফরজ। যুদ্ধের বছর এই রকম কত মানুষেরে পানি খাওয়াইছি।'

'লোকটা যদি হিন্দু হয়, তাইলে?'

'পানি খাওয়ানোর লগে আবার হিন্দু-মুসলমানের কী? মরণের আগে সবতের মুখে পানি দিতে হয়। পানির কোনো ধর্ম নাই।'

বুড়ি আরও কী যেন বলে। মোবারক শোনে না। তার মনের মধ্যে ভয়ের বেলুনটা বড় হতে থাকে। সে ঘরের কোনায় রাখা ছোট টিনের মুখ খুলে লাট্টু আর কয়েকটা মার্বেল বের করে পকেটে ভরে। তার মাথায় পালানোর চিন্তাটা ফাইনাল হয়ে গেছে। আর যা-ই হোক, পুলিশের হাতে ধরা পড়তে চায় না মোবারক। দরজায় বসে থাকা দাদিকে টপকে বের হয়ে যায় মোবারক। পেছন থেকে বুড়ি বলে, ওই পোলা, এহন আবার কই যাস! আমারে নিয়া যাবি না?

মোবারক দাদির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চলে যায়। বুড়ি কিছুক্ষণ উধাও হয়ে যাওয়া মোবারকের উদ্দেশে গালাগাল করে। তার পর নিজেই উঠে দাঁড়ায় কষ্ট করে। বিড়বিড় করে বলে, নিয়া গেলি না হারামজাদা। মনে করছস, আমি যাইতে পারুম না? আমি নিজেই যামু।

বুড়ি হাঁটতে শুরু করে ডোবাটার উদ্দেশে।

ডোবার পাড়ে ততক্ষণে রিয়াজুলের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের গাড়ি দেখে ভিড় করে থাকা লোকজন কেটে পড়েছে। রিয়াজুল চারজন কনস্টেবল দাঁড় করিয়ে দিয়ে বডিটা একবার পর্যবেক্ষণ করে। অপরিচিত চেহারা। রিয়াজুলের ধারণা ছিল, কোনো ভিআইপি সন্ত্রাসীর ডেডবডি দেখতে পাবে। এখন তো কত রকমে এসব লোক খতম হচ্ছে। মনে মনে বেশ হতাশ হয় রিয়াজুল। কিন্তু সেই প্রশ্নটা মনের ভেতরে খচখচ করতেই থাকে, তাহলে কেসটা কী? হঠাৎ করে এই মালের বডি ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে কেন?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ওসি সাহেবের মুখটা ভেসে উঠতেই তৎপর হয়ে ওঠে রিয়াজুল। আগে বডিটা চালান করতে হবে, তার পর রাউন্ডআপ। কিছু লোককে ধরে দেখাতে না পারলে সাংবাদিকরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোককে হাতের ইশারায় ডাকে রিয়াজুল। দ্রুত একটা মাদুর বা চাটাইয়ের ব্যবস্থা করতে বলে। লোকটা নির্দেশ পেয়ে ভয়ে ভয়ে বস্তির দিকে ছোটে।

ছয়

খবরটা পার্টি অফিসে বসেই পেল নজিবুল্লাহ। স্বপন ফোনে জানাল, রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের অফিসে রব্বানীর লোকজন হামলা করেছে। তার গ্রুপের দু'জন গুলিবিদ্ধ। মনে মনে এই ভয়টাই পাচ্ছিল নজিবুল্লাহ। শাওনের গায়েব হয়ে যাওয়ার খবরটা ছড়িয়ে পড়লে রব্বানী আর রকিবের গ্রুপ সক্রিয় হয়ে উঠবে। গত তিন বছর শাওন নামের এই তলোয়ারকে ডানে-বামে সমানতালে ব্যবহার করেছে। কাউকে কোনো একটা কাজে আঙুল ছোঁয়াতে দেয়নি নজিবুল্লাহ। টেন্ডার, কনস্ট্রাকশন, দোকান বরাদ্দ– সব জায়গায় শাওন-আতঙ্ক তৈরি করেছে। এসব নিয়ে পার্টির ওপর লেভেলে অনেক সালিশও হয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। শাওনকে পার্টির দরকার। তাহলে কি এদের কেউ শাওনকে খালাস করে দিয়েছে। তার পর পুরো ঝামেলা তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে? পার্টি অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে তারেক নজিবুল্লাহ। ভেতরে ভেতরে তাহলে গেম চলছিল, কিছুই বোঝা যায়নি! মাথার ভেতরে চিন্তার কারখানা চালু হয়ে যায় নজিবুল্লাহর। এবার কি তাহলে তাকে সাইজ করার অনুমতি পেয়েছে রব্বানী? সেও আরেক চিন্তার কথা। আবার এমনও হতে পারে, বিরোধী দলের

কাজ। শাওন ওদের দীর্ঘদিনের এক সমস্যার নাম। কিন্তু শাওন কেন কিছুই টের পেল না! এত কাঁচা ছেলে তো সে না।

অনেক কিছু একসঙ্গে ভাবতে ভাবতে নজিবুল্লাহ নিচে নেমে আসে। নিচের বড় হলরুমে পার্টির ছেলেপেলে বসে আছে। কেউ গেটের কাছে জটলা করছে। তাকে দেখে অনেকে সরে গিয়ে সালাম দেয়। গাড়িতে ওঠার আগে ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল আলমের সঙ্গে দেখা হয় নজিবুল্লাহর। আলম সাহেব তাকে একপাশে টেনে নিয়ে যায়।

'একটা খবর শুনলাম তারেক?'

'কোথায় শুনলেন?'

হাসে নূরুল আলম।

'এসব খবর বাতাসের আগে ছড়ায় ব্রাদার। ভালো করে খোঁজ নাও, শাওন আমাদের স্ট্রং ক্যাডার। ওপরে আলোচনা হচ্ছে। কিছু একটা ঘটলে কিন্তু কেউ দায়িত্ব নেবে না। সন্ত্রাসী খতমের খাতায় নাম চলে যাবে।'

মাথার ভেতরে চিন্তার কারখানায় বিপদ সংকেত শুনতে পায় নজিবুল্লাহ।

'কী আলোচনা হচ্ছে ভাই?'

'কী ঘটনা, কারা ঘটাল... বিরোধী দলের কারবার হতে পারে। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো, সিচুয়েশন তো ভালো না।'

চিন্তার ছায়া পড়ে নজিবুল্লাহর মুখে। মাথা নেড়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি চলতে শুরু করতেই স্বপনের ফোন আসে। স্বপন জানায়, ডোবার পাড় এলাকায় সকালবেলা একটা বডি পাওয়া গেছে। পেছন থেকে গুলি করা হয়েছে। পুলিশ পৌঁছে গেছে স্পটে।

এবার সত্যি সত্যি ভয় পায় নজিবুল্লাহ। আর কোনো সন্দেহ নেই, শাওন খালাস। রব্বানী খেলা শুরু করে দিয়েছে। এটা বিরোধী দলের কাজ নয়। স্বপনকে ফোনে রব্বানীদের ওপর পাল্টা হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়ে ড্রাইভারকে অফিসে যেতে বলে নজিবুল্লাহ। ওরা খেলা শুরু করে দিয়েছে। এখন তাকেও পাল্টা গোল করতে হবে।

সাত

বুড়িকে নিয়ে ঝামেলায় পড়ে রিয়াজুল। বডিটা চাটাই দিয়ে ঢেকে গাড়িতে তোলার আগে কোত্থেকে বুড়ি ভিড় ভেদ করে ঢুকে পড়ে ভেতরে। বুড়ি এই ছেলের মুখ দেখবে, মুখে পানি দেবে। রিয়াজুল বোঝাতে চেষ্টা করে, ছেলেটা অনেক আগেই মারা গেছে, তাকে পানি খাওয়ানোর কিছু নেই। কার কথা কে শোনে? বুড়ির এককথা, বাবা, আমার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছে। লাশটাও দেখি নাই। মরার সময় কেউ মুখে পানি দিছিল কি-না, কইতে পারি না। এই পোলা কার পুত, কার নাতি কে জানে! একটু পানি খাওয়াইতে দ্যাও বাবা।

বুড়ি পানি না খাইয়ে লাশ নিতে দেবে না। বলে, মরার মুখেও পানি দিতে হয়। ঝামেলায় পড়ে রিয়াজুলের মেজাজ আরও গরম হয়। এর মধ্যে ওসি স্যারের ফোন আসে। রিয়াজুল সতর্ক হয়ে ফোন ধরে।

'স্যার, লাশ গাড়িতে তোলা হয়েছে। থানায় আসছি।'

রিয়াজুলের কথা শুনে রীতিমতো হৈ হৈ করে ওঠে ওসি।

'মাথা খারাপ তোমার? থানায় বডি আনার কোনো দরকার নেই। সোজা মর্গে নিয়ে যাবে। আমি বাড়তি ফোর্স পাঠাচ্ছি। কেসটা সম্ভবত সরকারি দলের। গভর্নমেন্ট পার্টির লোকজন যাচ্ছে হাসপাতালে। মিছিল হবে লাশ নিয়ে। আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছ?'

রিয়াজুল একরাশ বিস্ময়ের মধ্যে ডুবে যায় তার বসের কথা শুনে। ফোন কেটে বুড়িকে ঠেলে সরায় রিয়াজুল। বুড়ি তাকে গালাগাল করে।

'তোরা সব হইলি শয়তান, জালিম। কার পুত, কার বাপ মইরা গেল– পানিটা খাওয়াইতে দিলি না। আরে লাশের অনেক নিয়ম আছে। তরা কী বুঝবি এইসব? আমার পোলা মরছে আমি জানি।'

অন্য পুলিশরা লাশটা ধরাধরি করে শুইয়ে দেয় ভ্যানের মেঝেতে। রিয়াজুল বুড়ির দিকে তাকিয়ে হাসে।

'দাদি, চিন্তা কইরো না। একটু পরে এই পোলারে নিয়া মিছিল হবে। পানি খাওয়ানোর অনেক লোক থাকবে।

কথাটা বলে গাড়িতে লাফিয়ে ওঠে রিয়াজুল। পেছনে অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে রওনা হয় পুলিশভ্যান।

আট

হাসপাতালের গেটে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর নজিবুল্লাহ ফোন পায়। সেক্রেটারি জেনারেল ক্ষেপে আগুন হয়ে ফোন করেছে।

'নজিব, তোমার লোকজন এসব কী শুরু করেছে, বলবে আমাকে?'

প্রশ্নটা শুনে নজিবুল্লাহর মাথায় চড়াৎ করে রাগ উঠে যায়। ক্ষিপ্ত হয়ে কথা বলে নজিবুল্লাহ।

'ভাই, বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করেন। সকাল থেকে শাওন নিখোঁজ। ছেলেপেলে আমার কন্ট্রোলে নেই।'

সেক্রেটারির গলা আরও এক পর্দা ওপরে ওঠে।

'না জেনে ফালতু কথা বলবে না। ওটা শাওনের বডি না। আনআইডেন্টিফাইড কেউ। আমরা রব্বানীকে বলেছি, লাশটা হাসপাতাল থেকে নিয়ে মিছিল বের করতে। বিরোধী দলের ওপর প্রেশার দিতে হবে। ওরা আমাদের লোক মেরে ফেলছে, আর মাঝখানে তুমি তোমার লোক দিয়ে ওদের মিছিলে হামলা চালালে! দিস ইজ টু মাচ নজিব। এ জন্য তোমাকে বহিষ্কার করে হতে পারে জানো?'

কথাটা শুনে থমকে যায় নজিবুল্লাহ।

'ভাই... আমার কাছে খবর আছে...'

'ভুল খবর আছে তোমার কাছে। রাবিশ। তুমি এখনই আমার সঙ্গে দেখা করো। তোমার ছেলেদের সরে যেতে বলো।'

কথা শেষ করে সেক্রেটারি জেনারেল ফোন কেটে দেন।

ফোনটা টেবিলের ওপর রেখে তারেক নজিবুল্লাহ ধপ করে বসে পড়ে চেয়ারে। রব্বানীর পুরো খেলাটা স্পষ্ট হয়ে যায় তার কাছে। শালা, সুন্দর একটা ফাঁদ বানিয়ে তাকে ঠেলে দিয়েছে ঠিক ফাঁদের মাঝখানে। তাহলে শাওন গেল কোথায়? ভাবনাগুলো নজিবুল্লাহর মাথার ভেতরে জট পাকিয়ে যেতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ে রিয়াজুল। ওয়াকিটকিতে তার কাছে মেসেজ আসে, হাসপাতাল থেকে উইথড্র হতে। বাইরে সরকারি দলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আপাতত ওটা থামাতে হবে। লাশ পাহারা দেওয়ার আর প্রয়োজন নেই। বিড়বিড় করে নিজের ভাগ্যকে গালাগাল করতে করতে রিয়াজুল গাড়িতে ওঠে।

নয়

বডিটা পড়ে থাকে মর্গের বারান্দায়। চাটাই দিয়ে মোড়ানো। পা বের হয়ে আছে। এক পায়ে স্যান্ডেল আছে, অন্য পা খালি। বুড়ো আঙুলের মাথায় কোত্থেকে উড়ে এসে বসে একটা নীল রঙের মোটা মাছি। ❖

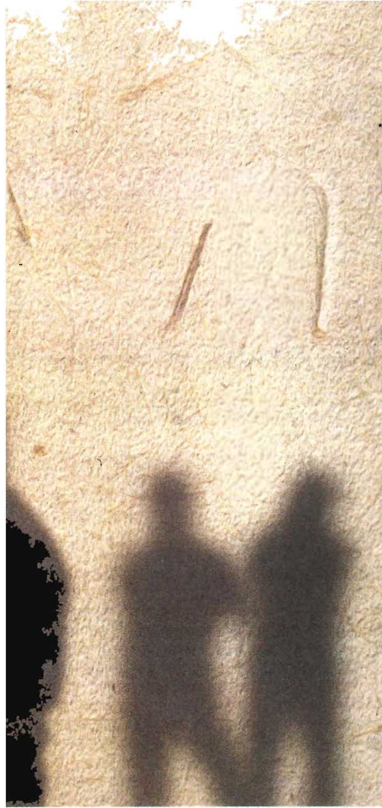
সুমন্ত আসলাম

কতিপয় যুবক এক তরুণীর ঘরে ঢোকার পর



গল্প

বিছানায় গা এলিয়ে, নেইলকাটার দিয়ে নখ কাটার পর পলিশ করতে করতে, এগার ফুট দূরে রাখা টিভিটার দিকে তাকিয়ে, মেয়েটি যখন সিরিয়ালের সবচেয়ে শিহরণ জাগানিয়া দৃশ্যটা একা একা দেখছিল, ঠিক তখনই ফ্ল্যাটের বাইরের দরজাটা খুলে গেল টুক করে। বারান্দার কার্ণিশে ঘরের বউ লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছে পাশের বাসার যুবকের সঙ্গে, গায়ে গায়ে সেঁটে থাকা দু'বারান্দার গ্রিলে হাত বাড়িয়ে পরস্পর ছুঁয়ে তারা মোদিত হয়ে আছে আবেশে, তারপর যেই না হাত জোড়া পরস্পরের গালের দিকে এগোচ্ছিল, ঠিক তখনই শাশুড়ি এসে উপস্থিত। দু'পাশের দু'জন চমকে উঠে সরে আসার আগেই নিজের অ্যানড্রয়েড মোবাইল দিয়ে ছবি তুলে ফেললেন তিনি।



অলঙ্করণ : : আনিসুজ্জামান সোহেল

তারপর ক্রুর একটা হাসি দিয়ে এগিয়ে গেলেন বউয়ের দিকে। আদর করে গলার ডান পাশে হাত রেখে বললেন, 'কিউ, তুম মেরি বেটেকো পসন্দ নেহি করতেহো? ভেরি গুড, তো ফের তুম এক কাম করো–' টিভির ভেতর বউকে বলতে যাওয়া শাশুড়ির কাজের কথাটা শোনার সুযোগ হলো না মেয়েটির চোখের কোনায় কিছু একটা ধরা পড়তেই ঝট করে তার রুমের দরজার দিকে তাকাল, বুকের ভেতরটা সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল তার। তিনটা যুবক নীরবে ঢুকে গেছে রুমে। এবং সে কিছু বলার আগেই দু'জন সামনের ডাবল সোফায় বসেছে; একজন তার পাশে, ভদ্রস্থভাবে এবং কিছুটা দূরত্ব রেখেই। মেয়েটা হঠাৎ চিৎকার করতে যাচ্ছিল, তার আগেই পাশে বসা ছেলেটি নিজ ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে কিছুটা ফিসফিসিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, তিনটা ছেলে আপনার রুমের ভেতর, আর আপনি সেটা চিৎকার করে জানান দিচ্ছেন আশপাশের সবাইকে। সবাই কী ভাববে বলুন তো! আর এই ভাবাভাবির পরবর্তী ব্রেকিং নিউজটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?'

'আপনারা কারা?'

'এটা একটা প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নটা আপনি করতেই পারেন।' নিজের ডান গালটা ডান হাত দিয়েই চুলকাতে চুলকাতে ছেলেটি বলল, 'যেহেতু আমাদের কাউকেই আপনি চেনেন না, কখনো দেখেনওনি।'

'এই ফ্ল্যাটে ঢুকলেন কীভাবে আপনারা?'

'এটাও একটা প্রশ্ন।' গাল চুলকানো বন্ধ হয়েছে ছেলেটার। কিন্তু হাতটা সেখানে স্থির রেখেই বলল, 'সারা দুনিয়া চায়নিজ জিনিসে ভরে গেছে। চকচক করে কিন্তু টেকে না। চাপ দেওয়ার আগেই ভেঙে যায়। আপনাদের দরজার লকটাও চায়নিজ ছিল।' খিক করে হেসে ওঠে ছেলেটা, 'আপনার কানে-হাতে যা দেখছি, তাও তো চায়নিজই মনে হচ্ছে।'

'আপনারা ফ্ল্যাটে কেন ঢুকেছেন?' ভয় এবং উদ্বিগ্নতায় ছেয়ে গেছে মেয়েটার গলা। চোখে আতঙ্ক।

'আপনার এ প্রশ্নটার জবাব আপাতত আমরা দিতে পারব না। তবে এটা ভাববেন না–বাথরুমের চাপ পেয়েছে আমাদের খুব, সেটা সারার জন্য আপনার এখানে এসেছি।' খাটের পাশে ঝুলানো পা'টা বিছানায় তুলে ফেলল ছেলেটা, 'আমরা কিন্তু মানুষের জিনিস কেড়ে নেই। কেড়ে নেওয়ার অভ্যাস আছে আমাদের। তবে–।' ছেলেটা একটু থামল, 'আজ কিছু নিতে আসিনি আপনার এখান থেকে।'

'তাহলে?'

'না না, ভয় পাবেন না। রেপ করার অভ্যাসও আছে আমাদের। এখানে আসার এটাও মুখ্য কোনো কারণ না। কারণ জৈবিক চাহিদা মেটানোর অনেক উপকরণ আজকাল আশপাশে ছিটিয়ে আছে। কেবল হাতটা বাড়ানো, তারপর ব্যস।' মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে ছেলেটা।

'কিন্তু–।' কিছুটা চিৎকার করতে যাচ্ছিল মেয়েটা। আগের মতোই তা বারণ করল ছেলেটা নিজ ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে। সেখান থেকে সরিয়ে বিছানার চাদরে ওই আঙ্গুল দিয়েই অদৃশ্য একটা কারুকাজ আঁকতে আঁকতে হাতটা হঠাৎ থামিয়ে ফেলল সে। দু'ঠোঁটের কোনায় মোসাহেবি একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'ম্যাডাম, স্বপ্ন দেখেন আপনি?'

প্রশ্নের জবাব দিল না মেয়েটা।

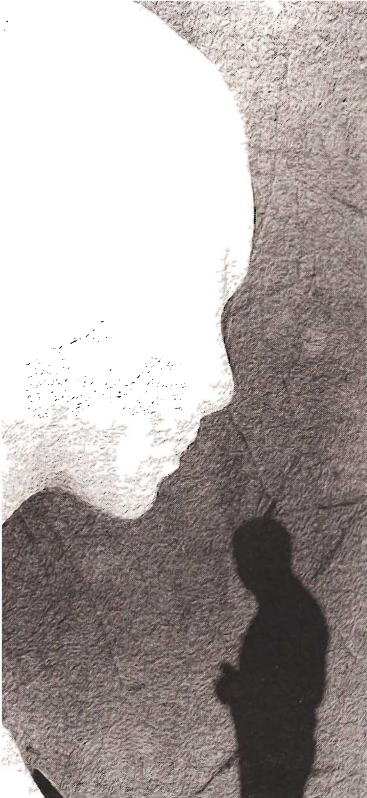
'আমি জানি–আপনি নিশ্চিত স্বপ্ন দেখেন।' মেয়েটার শরীরে এক পলক চোখ বুলাল ছেলেটা, 'কারণ এই বয়সটাই হচ্ছে স্বপ্ন দেখার। তা–।' পা দুটো গুটিয়ে বসে সে, 'আপনি সর্বশেষ কোন স্বপ্নটা দেখেছেন?'

মেয়েটা এবারও কোনো কথা বলল না। কোলের মাঝে লুকানোর ভঙ্গিতে গুটিয়ে ফেলল হাত দুটো।

'আমার একটা সমস্যা হয়েছে কি ম্যাডাম–।' বিনয়ী শোনায় ছেলেটার গলা, 'গত কয়েক বছর ধরে আমি কোনো স্বপ্ন দেখিনি। মানুষ তো ভূত-প্রেত, এটা ওটার স্বপ্ন দেখে, আমি কোনোটাই দেখিনি। স্বপ্ন দেখার মধ্যে যেমন একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রণা আছে, না দেখার মধ্যেও আছে।' চোখ দুটো নাচিয়ে ছেলেটা মেয়েটার দিকে সরাসরি তাকায়, 'তা আপনি কী বলেন?'

মাথা নিচু করে থাকা মেয়েটা আড়চোখে একবার ছেলেটার দিকে তাকায়। চোখ দুটো আগের মতোই আতঙ্কময়।

'ভালো কথা–।' কথা শেষ করতে পারল না ছেলেটা। ডান পাশের জানালার পর্দাটা বাতাসে ফাঁক হয়ে গেল একটু। সামনের সোফায় বসা ছেলে দুটোর একজনকে ইশারা করল। উঠে দাঁড়িয়ে পর্দাটা টানটান করে দিল সে। জানালা থেকে চোখ সরিয়ে এনে আবার কথা বলতে শুরু করল ছেলেটা,



'কৌতুক ভালো লাগে আপনার?' প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে ছেলেটা নিজেই বলল, 'কৌতুক কার না ভালো লাগে!' মেয়েটার দিকে একটু কুঁজো হয়ে বসে সে, 'তা আপনাকে একটা কৌতুক বলি?'

নিজেকে জড়োসড়ো করে ফেলল মেয়েটা। একটু পরপর কেঁপেও উঠছে সে। পর্দার ফাঁক গলে এক ঝটকা বাতাস এসে ঢুকল ঘরে। আছড়ে পড়ল মেয়েটার চুলে। হাওয়ায় ভাসা শিমুল তুলোর মতো তার কিছুটা এসে ছুঁয়ে গেল ছেলেটার চোখ-মুখ-গালে। অদ্ভুত আবেশে চোখ দুটো বুজে ফেলল সে। তারপর দূরাগত গলায় বলল, 'মেয়েদের চুলে অন্যরকম একটা সুবাস থাকে। প্রতিটি মেয়েরই। আলাদা আলাদা সুবাস। মন ভরে যায়। কিন্তু ছেলেদের চুলে সেটা পাওয়া যায় না।' মেয়েটার দিকে একটু ঝুঁকে বসে ছেলেটা, 'কেন বলুন তো?' প্রশ্নের উত্তর না শুনেই ভরাট গলায় বলে ওঠে, 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।' আবার সোজা হয়ে বসে সে, 'বলুন তো এটা কার কবিতা, কোন কবিতার লাইন?'

চুপ হয়ে রইল মেয়েটা।

'সম্ভবত আপনি জানেন। এটা কার কবিতা, কোন কবিতার লাইন–এটা না জানার কোনো কারণ নেই। কিন্তু একটা ট্র্যাজেডি কী জানেন?' খ্যাকখ্যাক করে হাসতে নিয়েই থেমে যায় ছেলেটা, 'মোবাইল, অ্যাপস, ইন্টারনেটের আগ্রাসনে আজ আর কেউ কবিতা পড়ে না। তবে আমি আশাবাদী মানুষ, একদিন ইবাদতের মতো কবিতা পড়বে মানুষ প্রতিদিন–আলো-অন্ধকারে যাই–মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয়,–কোন্ এক বোধ কাজ করে। স্বপ্ন নয়–শান্তি নয়–ভালোবাসা নয়, হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়। আচ্ছা–।' মুগ্ধ চোখে মেয়েটার চুলের দিকে তাকাল সে, 'মেয়েদের চুলে মাখানোর কোনো পারফিউম আছে নাকি?'

টিভিটা চলছেই। অথচ কেউ দেখছে না। বিছানার কোনায় রাখা রিমোটটা হাতে নিল সে। মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিতে নিয়েই থেমে গেল, 'টিভিটা তো কেউ দেখছে না। বন্ধ করি?'

বুড়ো গাছের মতো স্থির হয়ে আছে মেয়েটা। স্থির চোখ দুটোও। বিছানার চাদরের যে ছোট ছোট হৃদয় চিহ্ন আঁকা, সম্ভবত সেটাতে মুগ্ধ সে।

বিছানা থেকে নামল ছেলেটা। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল জানালার পাশে। বাম হাতের একটা আঙুল দিয়ে কিছুটা ফাঁক করে বাইরে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড। তারপর নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছুটা শব্দ করে বলল, 'আচ্ছা, আপনি নির্ঝরকে চেনেন?'

শরীর কাঁপিয়ে চমকে ওঠে মেয়েটা। মাথা তুলে এক পলক ছেলেটার দিকে তাকায়। কিন্তু চোখ নামিয়ে নেওয়ার আগেই তার একেবারে সামনে গিয়ে বসে সে, 'বললেন না চেনেন কি-না? আপনার অবশ্য চেনার কথা না। কান্দুপট্টির লিডার ছিল ও। চাঁদা নিয়ে একবার ঝগড়া হয়েছিল ওর সঙ্গে। এই যে–।' সম্পূর্ণ কাত করে গালের বাম পাশটা দেখায় ছেলেটা, 'এখানে লম্বা একটা দাগ দেখছেন না, ক্ষুর দিয়ে পোচ দিয়েছিল ও।' ছোট্ট একটা নিশ্বাস ছাড়ে ছেলেটা, 'পুরো তিন মাস যন্ত্রণা দিয়েছিল এই কাটা দাগটা। কিন্তু আমি ওকে যন্ত্রণা ভোগ করার কোনো সুযোগ দেই নাই। মাস ছয়েক পরে ওরকম একটা ক্ষুর দিয়েই পেটটা ফাসিয়ে দিয়েছিলাম ওর। পেটের ভেতর থেকে ভুঁড়িটা বের হয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছিল, ও চেষ্টা করছিল সেটা পেটে ঠেসে রাখতে। তারপর পিঠে একটা পোঁচ ওর। দৌড়াতে যাচ্ছিল ও। কিন্তু ভুঁড়িটা ততক্ষণে পড়ে গেছে নিচে।' বিছানায় ছোট্ট করে একটা চাপড় মারে ছেলেটা, 'আহ, কী শান্তি লেগেছিল সেদিন!'

'আমি এবার চিৎকার করে উঠব?' মেয়েটা হঠাৎ করে চিৎকার করার মতোই বলে ওঠে।

'চিৎকার করবেন?' মেয়েটার দিকে কৌতুক চোখে তাকায় ছেলেটা, 'করতেই পারেন। একজন স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে সেই অধিকার আপনার আছে। কিন্তু কী হবে সেই চিৎকার করে? ভাবছেন–চিৎকার শুনে আশপাশের সবাই বাঁচাতে আসবে আপনাকে? হা হা হা–।' কিছুটা ভিলেনীয় কায়দায় হেসে ওঠে ছেলেটা, 'সবাই যার যার জানালা বন্ধ করে দেবে যত দ্রুত সম্ভব। যারা আপনার মতো হিন্দি সিরিয়াল দেখছে, তারা টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দেবে আরো একটু। নিজেকে আপাত বধির করে কেউ কেউ বাথরুমে গিয়ে লুকাবে চুপচাপ। বাইরের ঘরের সব ছিটকিনি আটকে দিয়ে পেপারে কোনো অপঘাতের খবর পড়ে আরামে কান চুলকাতে থাকবে কোনো কোনো দেশদরদি।'

'তারপরও আমি চিৎকার করব।'

'বললাম না–করতেই পারেন।' মোলায়েম হাসিটা ক্রূর হাসিতে রূপ নেয় ছেলেটার, 'বিশ্বজিতের কথা মনে আছে

আপনার? ওই যে পুরান ঢাকায় যাকে প্রকাশ্য দিবালোকে, রাস্তায় কুপিয়ে মারা হয়েছিল?' হাসি আরো বাড়িয়ে দেয় ছেলেটা, 'না, তা আপনার মনে থাকার কথা না। যারা নিজেকে হিন্দি সিরিয়ালের নায়িকা ভেবে সারাক্ষণ সময় কাটায়, তারা এসব মনে রাখে না। বিশ্বজিতের সাদা জামা লাল হয়ে গিয়েছিল রক্তে। আর বালু নদীর বালিতে মাথা গেঁথে রাখা হয়েছিল আঠার বছরের লাবণীকে? যাকে সাত-আটটা ছেলে–।' ছেলেটা হঠাৎ থেমে যায়। মাথার পেছনে একটা হাত নিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বলে, 'আচ্ছা, আপনার বয়স কত? বিশ? না বিশের কম?'

'আপনারা আমার এখান থেকে বের হয়ে যান বলছি।' ঘড়ঘড় শব্দ বের হয় মেয়েটার গলা থেকে।

'আপনার কী মনে হয়–আমরা আপনার এখানে সারাজীবন থাকতে এসেছি? চিরদিনের জন্য? আপনার কি এটাও মনে হয়–আপনি একটু পরপর আমাদের জন্য চা বানিয়ে আনবেন আর আমরা চুকচুক করে খেতে থাকব তা। কিংবা এক খিলি পান এগিয়ে দিয়ে বলবেন–খাও, খাওনা সোনা। আমরা আপনার হাত থেকে পানটা নিয়ে, মুখে ঢুকিয়ে, চাবাতে চাবাতে, হঠাৎ ডান হাতের একটা আঙুল ঠোঁটের ফাঁকে চালান করে, আধা চাবানো কিছুটা পান আপনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলব–খাও না, তুমিও খাও না সোনা, সোনা পাখি আমার।' মেয়েটার কাঁধ আর গলার কাছাকাছি হাত দেয় ছেলেটা।

'অসভ্য।'

'সভ্যতা কোথায় দেখলেন আপনি?' মেয়েটার একেবারে মুখের কাছে নিজের মুখ আনে ছেলেটা, 'আইপিএলের খেলা দেখেন আপনি? এবারেরটা দেখেছেন? যে মেয়েগুলো খুব স্বল্প পোশাকে নাচতে থাকে সারাক্ষণ; এটা সভ্যতা, না অসভ্যতা?' মেয়েটার চোখে চোখ রাখে সে, 'এটা হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা। ভালো কথা–।' এদিক-ওদিক তাকায় সে, 'ওয়াশ রুমটা কোন দিকে?' বাম দিকে তাকায় সে, 'ওই তো।'

'ওটা একটা মেয়ের ওয়াশ রুম।'

পা বাড়াতে নিয়েই থেমে যায় ছেলেটা। আলতো করে মাথাটা ঘুরায় প্রথমে, তারপর সারা দেহ। কিছুটা নিচু হয়ে চোখ দুটো হাসি হাসি করে ফেলে, 'উৎকর্ষের চরম এই সময়ে এখনো শ্রেণীবিভাজনে বিশ্বাস করেন আপনি! অথচ এটা ভাঙা শুরু করেছে মেয়েরাই। আর আপনি তো জানেন–প্রতিটি ভাঙন মানেই নতুন কিছু, নতুন কোনো পথ।'

বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ছেলেটা। তিন-চার মিনিট পর বের হয়েই প্রস্ফুটিত একটা হাসি দিল সে, 'প্রতিটা মেয়ের বাথরুম হচ্ছে একেকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। আপনি কি জানেন–মেয়েদের বাথরুমের কোন জিনিসটা আমার খুব পছন্দের?'

'প্লিজ, ডোন্ট আট্যার অ্যানি ডার্টি ওয়ার্ড?'

খ্যাকখ্যাক করে আবার হাসতে শুরু করে ছেলেটা, 'টেলিভিশন খুললেই আমরা মেয়েদের অন্তর্বাসের প্রকাশ্য প্রচার দেখি, সচিত্র ব্যবহার দেখি লোমনাশকের, গুপ্তাঙ্গ নামক শব্দটা কানে আর লজ্জার শিহরণ জাগায় না–এসব কী বলুন তো?' হাসতেই থাকে ছেলেটা, 'অথচ নিজেকে মডার্নাইজেশনের মোড়কে ঢেকে পরিবারসহ আমরা দিব্যি চোখ আর কান দিয়ে গিলছি এসব প্রতিদিন।'

'আমি যথেষ্ট ধৈর্য দেখিয়েছি, এবার আমি সত্যি সত্যি চিৎকার শুরু করব।' জানালার দিকে দ্রুত পা বাড়ায় মেয়েটা। দু'পা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় সে। সামনের দুটো ছেলের একজন ঝট করে উঠে দাঁড়ায় সোফা থেকে। পকেটে ঢোকানো হাতটা কেবল বের হয়ে এলো না তার, ধাতব একটা যন্ত্রও বের হয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

গাছের ডালে বসে থাকা পেঁচার মতো স্থির ছেলেটার চোখ। আলতো করে হাত ঢোকায় সে পকেটে। সোনালি রঙের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট নেয় সেখান থেকে। আগুন সংযোগ করে, একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে, তৃপ্তির একটা চেহারা করে বলে, 'আপনার বাবা খুব ভালো একজন আইনজীবী, মা মানবাধিকার নেত্রী। দু'জনই খুব ব্যস্ত। সকালে বের হন বাসা থেকে, ফেরেন রাতে। ও হ্যাঁ, আপনার এক চাচা বোধহয় একজন জাঁদরেল সাংবাদিক।' সিগারেটে আরো একটা টান দেয়ে ছেলেটা, 'আমরা আর বেশি সময় নেব না আপনার। সিগারেট শেষ করার পর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাওয়ার অভ্যাস আমার। পানিটা খেয়েই–।' ছেলেটা সোফায় বসা দু'জনের দিকে তাকায়, 'বাকের, ফ্রিজটা খুঁজে বের কর। পানি নিয়ে আয় এক গ্লাস। ভালো কথা–।' ছেলেটা মেয়েটার আরো একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, 'আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে, পানি খাবেন?'

মাথা উঁচু-নিচু করল মেয়েটা। সোফা থেকে উঠে পানি নিয়ে এলো বাকের। ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে ইশারা করল। গ্লাসটা এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। এক নিশ্বাসে শেষ করে ফেলল সে গ্লাসটা।

সিগারেটের টুকরোয় শেষ টান দিয়ে ছেলেটা আচমকা গলা চেপে ধরল মেয়েটার। চোখ লাল হয়ে গেছে ছেলেটার, 'বেশ কিছু দিন ধরে ভালো করে হাসতে পারছি না আমরা। আনন্দও পাচ্ছি কোনো কিছুতে। কাল একটু হাসতে চাই। আচ্ছা–।' হাতটা আরো চেপে আসছে গলায়, 'বাজেট সমন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে? আমার নেই। এই যে প্রতি বছর হাজার কোটি লক্ষ কোটি টাকা ব্যবহারের কথা শোনা যায়, সেই টাকাগুলো কোথায় ব্যবহার হয়? কই, আমাদের পকেটে তো একটা টাকাও আসে না। যারা গাড়ি চালায়, তাদের গাড়ির মডেল বদল হয়; ফ্ল্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায়, টাকার অঙ্কটা উপচে যায় ব্যাংকের ভাগাড়ে।' হাতটা আরো চেপে বসেছে গলায়, 'আপনি কি আরো এক গ্লাস পানি খাবেন?'

কথা বলতে পারে না মেয়েটা। কেবল গোঁৎ গোঁৎ শব্দ হয় তার গলায়, চোখের কোনা দিয়ে পানি গড়াতে থাকে নীরবে।

'নয়টা খুন, তেরটা রেপ, আটাশটা ছিনতাই করার পর কেবল একটা কথাই কানে এসেছে আমাদের–অপরাধী রেহাই পাবে না কোনোভাবেই, অতি দ্রুত ধরা হবে তাদের।' ক্রূর হাসিটা আবার ভেসে ওঠে ছেলেটার মুখে, 'আগামীকাল মন্ত্রী মহোদয়ের এই কথাটা শুনতে চাই আবার–প্রতিটি টেলিভিশনের স্ক্রলে দেখতে চাই এই অমোঘ বাণীটা, ছবি আর কথার কথাটা ছাপার অক্ষরে দেখতে চাই সবগুলো দৈনিকের প্রথম পাতায়। বড় ভালো লাগে ওটা শুনতে, বড় আনন্দ লাগে। বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে চুপচাপ। কিন্তু কয়দিন ধরে কোনো আনন্দ পাচ্ছি না, ভালো লাগছে না। আজ আপনাকে তাই–।' কথা শেষ করে না ছেলেটা। গভীর চোখে মেয়েটার চোখের দিকে তাকায় একবার, 'কয়েকদিন ওই বাণীতে আনন্দ পেতে পেতে আবার বোর হয়ে যাব আমরা। একঘেয়ে হয়ে যাবে জীবন। আনন্দ দরকার পড়বে তখন আমাদের, হাসার জন্য ছটফট করতে থাকবে মন। তারপর অন্য এক বাসায়, আপনার মতো কোনো মেয়ের ঘরে। বাকের–।' চোখ দিয়ে ইশারা করে ছেলেটা। সোফায় বসা দু'জন চলে যায় পাশের ঘরে, 'কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম, প্লিজ। মন্ত্রী মহোদয়ের কথাটা কিছুদিন পর পর শুনতে না পেলে পাগল হয়ে যাব আমি, উন্মাদ হয়ে যাব আমরা। আপনি আমাদের বাঁচান।' ❖

সাগুফতা শারমীন তানিয়া

দিলতোড় বাগ


গল্প

কোথায় এক রানী ছিলেন, প্রত্যহ ব্যাজার মুখে দুইশত মাছের মুড়া রাঁধিতেন, মুড়া ছাড়া রাজা গ্রাস তুলিবেন না, পরলোকগত পিতার হুকুম। তাহার কথা দক্ষিণারঞ্জন বাবু বলিতে পারিবেন। আমাদের রাণী তেমন নহেন। রাজা ভালোবাসিয়া খাইবেন শুনিলে রাণী হেন ব্যঞ্জন নাই রাঁধিতে দ্বিধা করিবেন। রাজ্যে বড় সুখ। রাজা রাণীকে চক্ষে হারান। কুলোকে বলে, তণ্ডুলনাস্তি গৃহস্থের কন্যাকে আনিয়া রাজা বিবাহ করিয়াছিলেন, নহিলে রাজগৃহে এমন পতিসেবা কে করিবে।

দুষ্টলোকের রটনা এও শোনা যায়, নাকি একদা মৃগয়াক্লান্ত রাজা গভীর বনের প্রান্তে ঋষির আশ্রয়ে আসিয়া দেখিলেন, ভাঙা কুটিরে বসিয়া ঋষির স্ত্রী আকুলনয়নে কাঁদিতেছেন– তাহার রূপার কাজললতার মতন চোখ, বাঁধুলি ফুলের মতন ঠোঁট, তিল ফুলের মতন নাক, পুষ্পমঞ্জরীশোভিত কুচকুম্ভ, রম্ভার মতন উরু, স্থলকমলের মতন পায়ের পাতা। ঋষি তাহাকে বলিয়া গিয়াছেন, 'এই কুটির হইতে কোথাও যাইও না,' অথচ নিজে বৎসরকাল হয় গিয়াছেন আর ফিরিয়া আসেন নাই। রাজা একবেলা সেই পর্ণকুটিরে সামান্য আহার করিলেন। ঋষির মরিচজবা আর শ্বেতদ্রোণফুলের কুঞ্জের আশ্রয়ে শ্রান্ত দেহে ভূমিশয্যা লইলেন।



অলঙ্করণ : : আনিসুজ্জামান সোহেল

সন্ধ্যা নামিলে অরণ্যের বন্যজন্তু সকল ডাকিয়া উঠিল। রাজার মনে অসুর জাগিয়া উঠিল, সেই অসুর রাজাকে এবং রাজা ঋষিপত্নীকে একই কথা বুঝাইলেন, ঋষি আর আসিবেন না এবং রাজা এই রমণীরত্নকে না পাইলে তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে। রাজা সেই চকোরলোচনাকে পাতার কুটির হইতে আনিয়া রাজ্য মাঝে প্রতিষ্ঠিত করিলেন– অষ্ট অলঙ্কার পরাইলেন– অগ্নিপাটের শাড়ি পরাইলেন। রাণীর ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া প্রজাসকল বলিল, এ রাক্ষসী না হইয়া যায় না। রাজকার্য মন্ত্রীর হাতে দিয়া রাজা দিবাভাগেও রাণীর মহলে পড়িয়া থাকেন, নিবিড়কুন্তলা রাণীর কুন্তল লইয়া মেঘুয়া খেলিয়া দিন কাটান। রাণীর প্রেম সূর্যকন্যা তপতীর প্রেমকেও হার মানায়।

ঋষিপত্নীকে হরণ করিয়া আনিবার সময় রাজা রাজ্যে অমঙ্গল বহিয়া আনিয়াছেন কি না তাহা দেখিবার জন্য প্রজাচিত্ত উৎকর্ণ হইয়া রহিল। সেই বৎসর এবং তাহার পরের বৎসর সীতাশাল– ঝিঙেশাল ধান্যের বান ডাকিল। মকরসংক্রান্তিতে পিঠার ভোগ শেয়ালে খাইয়া শেষ করিতে পারিল না। রাণী রূপতরাসীর মতন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে উঠিয়া হাতিশালের হাতি খাইলেন না, ঘোড়াশালের ঘোড়া খাইলেন না– কাহারও মাংস কাটিয়া আলতা পরিলেন না– প্রজারা হতাশ হইয়া ধান ভানিতে গেল, মুড়ি ভাজিতে গেল, চিঁড়া কুটিতে গেল। রাজা রাণীকে ভালোবাসিয়া প্রাসাদপ্রান্তে একটি পাতার কুটির গড়িয়া দিলেন, কুটিরের পাশে পদ্মসরোবর কাটিয়া দিলেন, রাণী কুটিরে জল তুলিয়া উঠান নিকাইয়া শাকান্ন রাঁধিয়া রাজার মন ভুলাইতেন। রাজা হিজলগাছের ছায়ায় সরল গৃহস্থ হইয়া খেলা করিতেন, কলাপাতে নির্জলা ক্ষীর আর মর্তমান কলা খাইতে খাইতে আড়চোখে দেখিতেন রাণী ঋষির স্মরণে দীর্ঘশ্বাস গোপন করিলেন কি না। দীঘির পাড়ে কামটুঙ্গীতে সারারাত্রি রাজারাণী গল্প করিয়া কাটাইতেন, রাণীর কেশের সর্ষপতৈলের গন্ধে রাজার হৃদয়ে সুতাশঙ্খের মতন সরু পাপবোধ জাগিত কি না, তাহা শতবর্ষ পরের কথক বলিবে, রাজা কিছু লিখিয়া যান নাই, তৎকালে রাণীও কিছু বুঝিতে পারেন নাই।

তৃতীয় বর্ষে এমনি একদিন গৃহস্থ কুটিরের লীলা চলিতেছে, রাজার মনে পুত্রবাসনার উদয় হইলো, উদয় হইবামাত্র তিনি রাণীকে ডাকিয়া সেই কথা বলিলেন। রাজ্যে প্রজারা তাহাকে আটকুঁড় ডাকিতেছে। রাণীরও মনে ছিল এই, কত আর পাতাবাহার চিরুনি দিয়া তুলিয়া চুল বাঁধিবেন, ঝামা ঘষিয়া আলতা পরিবেন, হলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া পুষ্করিণীর জল কটু করিবেন। সেই বৎসর খরায় ক্ষেতময় ধান্য পুড়িয়া খাক হইতে লাগিল। আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিল না। ভেক ডাকিয়া উঠিল না। রাজ্যে হায়-হায় রব পড়িয়া গেল, রাণীকে রাজদাসী আসিয়া বিমনাভাব করিয়া আত্মত্যাগিনী রাণী কমলার পুণ্যকথা শুনাইয়া গেল, কেমন করিয়া প্রজাদের রক্ষা করিতে রাণী কমলা সরোবরে ডুবিলেন, রাণী কিছু শুনিলেন, কিছু ভুলিয়া গেলেন। রাণীর হাতে ছুঁচ বিঁধিল, রাণী সেলাই রাখিয়া উঠিয়া গেলেন। সলিলসমাধি হইয়া গেলে কি রাজাকে আর দেখিবেন? রাজার সন্তানকে গর্ভে ধরিবেন? গার্হপত্যের তৃষ্ণালুব্ধ রাণী, প্রজা তাহার তত প্রিয় নহে।

পরের দুই বৎসর খরায় আবার সকলি পুড়িল। রাণী আর কত প্রতি বৎসর বসিয়া বসিয়া শিশুর পায়ের মল আর কোমরের গোট গড়াইবেন! আহারনিদ্রা বিলুপ্তপ্রায় রাণী বিগ্রহকে সোনার তুলসীপত্র উপহার দিয়া পূজা দিতেন, চন্দন ঘষিতেন। বেতনভুক পূজারি ব্রাহ্মণ আসিয়া পূজা করিত। রাণী ভক্তিভরে চরণামৃত লইতেন, নৈবেদ্যের চিনি-কলা গ্রহণ করিতেন। একদিন সন্ধ্যাকালে খরার আকাশ জ্যোৎস্নায় জ্বলিতেছে, শুভ্রনীরা পদ্মসরোবর শুকাইয়া গিয়া পাঁক দেখা দিয়াছে বলিয়া রাজারাণী আর সরোবরে নৌকা ভাসাইয়া রাত্রির শোভা দেখিতে যান না, রাণী তাহার প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া দেখিলেন– যতদূর দৃষ্টিক্ষেপ করা যায় কোথাও একটু শ্যামলিমা নাই। প্রজার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া রাণীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, রাণী অদৃশ্য ঈশ্বরকে হাতজোড় করিয়া বলিলেন, 'হে রাজাধিরাজ, আমার বুকের একটি হাহাকারের বিনিময়ে তুমি প্রজা সকলের হাহাকার মোচন করিয়া দাও।' অমঙ্গলাশঙ্কায় কোথা হইতে একটি গৃধ্র আকাশ চিরিয়া আর্তরব করিয়া উঠিল। সরলা রাণী মনে ভাবিলেন, আমার তো রাজা থাকিবেন, সন্তানসম্ভাবনাহীনার হৃদয়ের হাহাকার স্থায়ী হউক, সন্তানবতীরা সন্তান লইয়া বাঁচুক। গভীর রাত্রে মেঘপুঞ্জের সংঘর্ষ হইবার ধ্বনিতে প্রজারা আকুল হইয়া ঘরের বাহির হইয়া আসিল। বৃষ্টি নামিল। শুষ্ক নদীবক্ষ হইতে শোঁ শোঁ শব্দ উঠিল। ভেকের দল প্রগাঢ় প্রীতিকোলাহলে সমবেত সঙ্গীত শুরু করিল। তিনদিন ক্রমাগত বৃষ্টি হইলো। রাণী মেঘডম্বর শাড়ি পরিয়া সখীসংকাশে প্রাসাদশিখরে বৃষ্টিতে ভিজিয়া আনন্দগান



করিলেন, বৃষ্টিধারার সাথে সন্তানহীনার শোকবারি মিশিয়া গেল।

কিছুকাল পরে রাণী বুঝিলেন, পরমেশ্বর তাহার জন্য একখানি নূতন হাহাকার ধার্য করিয়াছেন। রাজা ঘোড়া ছুটাইয়া আরেক রাজ্যে গিয়াছেন, ফিরিবার সময় রাজকুমারী সরযুকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন। নূতন রাণী নিতান্ত বালিকা। অল্পবয়স হইতে সরযু দেখিল, রাজার ঘরে তাহার বিবাহ হইয়াছে, স্বামী তাহার বশ, মুখ হইতে বাক্য খসিবার আগে গুপীদাসী তাহাকে বেসম মাখিয়া নাওয়াইয়া দেয়, সরোদাসী চন্দনতিলকে সাজাইয়া দেয়, ক্ষেমাদাসী হীরামোতির বেলকুঁড়ি দিয়া খোঁপা গাঁথিয়া দেয়, চাই না বলিয়া খেলনা ছুঁড়িয়া দিবার অপেক্ষামাত্র- নূতন খেলার পুতুল জুটিয়া যায়। সে রাজাকে লইয়া খেলিল, খেলিয়া ক্লান্ত হইয়া দুয়ার দিয়া দিল। রাজা দুয়ার হইতে ফিরিয়া গেলেন- তাহার কতটা পরিতাপ হইয়াছিল বলা যায় না, কারণ তিনি প্রতিবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও ফিরিয়া আসিতেন। সরযু এবং তাহার বাপের বাড়ি হইতে আনা স্যাঙাতনী তাহাতে দারুণ আমোদ পাইলো। রাণী মর্মপীড়ায় প্রাসাদ ছাড়িয়া তাহার পর্ণকুটিরে আশ্রয় লইলেন, কেহ তাহার অভাব বোধ করিল না। প্রজারা বলাবলি করিতে লাগিল, এইবার যথার্থ সুলক্ষণা রাণী আসিয়াছেন, রাজবংশ এইবার রক্ষা হইবে।

রাণীর সহিত ঈশ্বরের কথোপকথনের কোনো সাক্ষ্য তো নাই, রাণীর সহিত তাহার কী বিনিময়ের কথা হইয়াছিল- তাহাও আর কেহ শোনে নাই। রাণী ফিরিলেন বটে, ভূমে আর পা ফেলিতে পারেন না, শিশুসন্তানকামনায় যত গোট গড়াইয়াছিলেন আর যত সোনার মল- তাহাদের অদৃশ্য দানায় মাটি ভরিয়া আছে, রাণীর স্থলকমলের মতন পায়ে তাহা বারংবার বিঁধে, রক্তপাত হয়। রাণী চিরকাল দেবতাকে বড় ভালোবাসিতেন, কোথায় রহিল সুবর্ণবিগ্রহ, কে তাহার যত্ন করে, কে তাহাকে পূজা দেয়। রাণীর হৃদয়ের খরার তাপে বিগ্রহের দশা পুড়িয়া যাওয়া ধানক্ষেতের মতন হইলো।

সরযু রাজার বংশরক্ষা করিতে পারিল না, রাজার আর সহিল না, পরের বৎসর রাজা ইরাবতী নাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। বিবাহের পর প্রকাশ পাইলো রাজকন্যার মূর্ছাব্যারাম আছে, রাজভীষক মাথা নাড়িয়া রাজাকে কী কী বলিলেন কেহ জানিতে পাইলো না। খাসদাসীসহ সোনার পাল্কিতে রাজকন্যা ইরাবতী ফিরিয়া গেলেন। রাজ অন্তঃপুর শূন্য রহিল না, আবার পুরিয়া উঠিল। রাজার প্রমোদমহলও উৎকট আমোদে ভাস্বর হইতে লাগিল। একদা রাজনর্তকীদের কক্ষে তামসিকতায় ডুবিয়া থাকিয়া রাজার মনে হইলো- ঋষি এইভাবে তাহা হইলে প্রতিশোধ লইলেন। রাণী কোথায় আছেন? রাণীর গায়ে স্বর্গমাধুরীর সৌরভ স্ফূরিত হইতো- অতিশয় সাধু আত্মা ছাড়া এই সৌরভ দেহে তৈয়ার হয় না। রাজা তাহার কেশরাশির সমুদ্রে বরুণদেবতার মতন শয্যা লইতেন, সেই কেশের স্পর্শের সহিত ধূপের সুরভি মিশ্রিত থাকিত। ঋষি কিংবা রাণী কাহার প্রতি রাজা হাতজোড় করিয়া ক্ষমা চাহিলেন, তাহা রাজনর্তকিরা বুঝিতে পারিল না। রাজা মত্তাবস্থায় লোক পাঠাইয়া রাণীকে জানাইলেন, তিনি আসিবেন।

ছয় মাসের মড়া যেন খাড়া হইয়া উঠিল, জীয়ন্ত রাণী পিঠালিতে ডুবাইয়া খামা কচুর ডাগুর ভাজিলেন, তারামিরার ফুল ভাজিলেন, খয়রামাছের ডিম ভাজিলেন। রাজা বহুকাল হয় খাইয়া পরিতোষলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া রাণী কাঁদিয়া হাসিয়া গাভথোড়ের ছেঁচকী রাঁধিলেন, শালুক ফুলের নাল কুটিয়া ঘণ্ট রাঁধিলেন, কচি কুমড়া দিয়া সারঙ্গ পুঁটির লাল ঝোল রাঁধিলেন। রাজার কথা ভাবিতে ভাবিতে কটাহের ভর্জিত দ্রব্য চিমড়া হইতে লাগিল, সারঙ্গ পুঁটি অথৈ ঝোলসমুদ্রে ডুবিল ভাসিল। রাজা সেই পুণ্যদিবসে রাণীর ভাঙা মহলায় আসিতে ভুলিলেন। ভুলিলেন বলা ঠিক হইবে না, রাজা মনে ভাবিলেন- এমন কত দিন আসিবে, এমনি কত দ্বিপ্রহর সুখাদ্যের ঘ্রাণে আইঢাই করিয়া কাটিবে। রাজা অবিদ্যার ক্রোড়ে নিদ্রা গেলেন।

একদিন রাজা স্নান করিয়া সুবেশ পরিয়া রাণীর মহলায় ভোজ খাইতে আসিলেন- ডাক দিলেন, 'তিলফুল বাঁধুলিফুল'! আঙিনার গাছগুলির তলা কেহ ঝাঁট দেয় নাই। রাণীর বাগান ময়নাকাঁটা ছাইয়া ফেলিয়াছে। রাণীর কটাহে ভাসা তেলে পাটভাজা পাথর হইয়া গিয়াছে- কেহ নাই। রাণী চলিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিল রাণী সরোবরে জলে ডুবিয়া নালফুল হইয়া ফুটিয়া আছেন, জলটুঙ্গী হইতে মধ্যরাত্রে রাণীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিয়া লোকে সাশ্রুনেত্রে রাণীকে স্মরণ করিয়া থাকে। কেহ বলে রাণী সরোবরে নামিতেই সরোবরের জল মুক্তাস্বচ্ছ হইতে শুরু করিয়াছিল, তাহাতে স্ফটিকের সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে পাতালের বাগিচায়, সেই বাগিচার নাম 'দিলতোড় বাগ'। ❖



উ প ন্যা স

মঈনুল আহসান সাবের

এই কাহিনী এখনো শেষ হয়নি

সাহানার ওখান থেকে ফেরার পর কয়েকটা দিন আমার মন খারাপ হয়ে থাকল। সাহানাকে নিয়ে ওই কাহিনীটি আমি তৈরি করি, ভাবিনি, তার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হবে। এভাবে দেখা হতে পারে, সে ধারণাই আমার ছিল না। আর সাহানার কথা আমি ভুলেও গিয়েছিলাম। সেই কবে লিখেছি ওকে নিয়ে, তারপর আরো কত কী লিখেছি, ভেবেছি আরো, মনে থাকার তাই কথাও নয়। আর ওটা এমন আহামরি কোনো লেখাও না।

অলঙ্করণ : : ধ্রুব এষ

এক শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী সাহানা। এক ছেলে (যে ছেলে মধ্যপ্রাচ্যে কিছু করতে গিয়ে কিছুই করতে পারছে না), এক মেয়ে আর শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে তার সংসার। এক স্কুলে সে শিক্ষকতা করে। এইটুকুই তার জীবন। এর মধ্যে হঠাৎ করে একদিন এক লোক এসে হাজির। সাহানা আর মারুফ এক টুকরো জমি কিনেছিল। মুক্তিযুদ্ধ থেকে মারুফ ফিরে না এলে সাহানা এক সময় সে জমিতে মারুফের অফিস থেকে পাওনা টাকায় কিছু সঞ্চয় থেকে, কিছু ধারদেনা করে একটা বাড়ি তুলেছিল। বাড়ির নাম সে 'মারুফ স্মৃতি-কুটির' বা এই জাতীয় কিছু রাখেনি। কিন্তু মারুফ নিশ্চয়ই ছিল তার সঙ্গে। সেই জমি একদিন এক লোক এসে দাবি করে বসল। বলল, এই যে জমি, যে জমিতে সাহানা বাড়ি তুলেছে, সে জমি আসলে লোকটার, সাহানা দখল করে সে জমিতে বাড়ি তুলেছে। সাহানা প্রথমে সে লোককে পাত্তা দেয়নি। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সে লোকের চাপ বাড়তে লাগল। সাহানা জমির দলিল খুঁজতে গিয়ে দেখল দলিল নেই, কোনো কাগজ নেই। কখন যে কোথায় হারিয়েছে!

তারপর শুরু হলো সাহানার ছোটাছুটি।

সে পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে গেল।

সে পুলিশের কাছে গেল।

যে লোকের সঙ্গে একই সময়ে জমি কিনেছিল, তার কাছে গেল।

সে পত্রিকা অফিসে গেল।

সে জমি-রেজিস্ট্রি অফিসে গেল।

সে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিসে গেল, তারা বিবৃতি দিল।

সে এমনকি এক মন্ত্রীর কাছেও গেল, যে মন্ত্রী একাত্তরে রণাঙ্গনে মারুফের সহযোদ্ধা ছিল।

কিন্তু কোথাও সে সুবিধা করতে পারল না। তার একসময় মনে হলো, স্বাধীনতার সতেরো-আঠারো বছর পর এই যদি অবস্থা হয়, তবে এই জমি সে রাখতে পারবে না, এই জমি তার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

এই সময় মাঠে নামল বিডি। হ্যাঁ 'মাঠে নামল'– এভাবেই বলি। বিডি মারুফের দূর-সম্পর্কের কেমন যেন ভাই। ছোট দেশ, এদেশে সবাই কীভাবে কীভাবে সবার আত্মীয়, না হোক, পরিচিত অন্তত। বিডির ব্যাপারটাও খুব সরল। সে একাত্তর সালে পাকিস্তানিদের পক্ষের লোক ছিল। তাদের হয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করেছে। স্বাধীনতার পর সে পালিয়েছে। মারুফদের বাসায়ও এসেছে। সাহানার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, মারুফের বাবা-মার পা জড়িয়ে ধরেছে, যেন তারা তাকে প্রাণে বাঁচানোর ব্যাপারে সহায়তা করেন। তারপর কীভাবে কীভাবে যেন প্রাণে বেঁচেও গেছে। তারপর এসেছে মাঝেসাঝে। তাকে দেখে মনে হয়েছে সে ভালোই আছে।

সেই বিডি তখন মাঠে নামবে। এখন অবশ্য আমার 'মাঠে নামবে' শব্দ দুটো বদলাতে ইচ্ছা করছে। শব্দ দুটোর মধ্যে একটা তোড়জোড় আটঘাট বেঁধে একটা প্রস্তুতির ব্যাপার আছে। সে রকম কিছুই কিন্তু ঘটল না। বিডি এলো একদিন, যেমন সে কখনো সখনো আসে, কথা যা হয়, মারুফের বাবা-মার সঙ্গেই হয়, সাহানার সঙ্গে একটি দুটি, তার বেশি কদাচিৎ। তা এলো সে, জমি দখলের চেষ্টা করছে, এ খবরও পেল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান সে করে ফেলল। একদিন সেই লোককে সে নিয়ে এলো সঙ্গে, যে লোক জমির দাবিদার হিসেবে নিজেকে হাজির করেছে, সে লোকের নাম রহমত আলী, সে লোক সাহানার কাছে মুখ নিচু করে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিল। আর বিস্মিত সাহানা এক সময় জানতে চাইল, কীভাবে বিডি এই অসাধ্য সাধন করল। বিডির মুখ থেকে জানা গেল, বিডি ওই মন্ত্রীকেই ধরেছিল, ওই যে, একাত্তরের রণাঙ্গনে মারুফের সহযোদ্ধা যার কাছে গিয়েছিল সাহানা, যার কাছে সাহানা গুরুত্ব পায়নি। সাহানার মনে হয়েছিল সে বিদায় হলে মন্ত্রী যেন বাঁচে, এই মন্ত্রীকেই ধরেছিল বিডি। তবে 'ধরাধরি' শব্দটা ব্যবহার করা উচিত হবে না, কারণ, বিডি কোনো ধরাধরির মধ্যে যায়নি, বিডি মন্ত্রীকে বলে দিয়েছিল সমস্যা দূর করতে। বিডির কথা মন্ত্রী শুনেছে, তার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে সব সমস্যা দূর করেছে। আর পরে বিডিও রহমত আলীকে এনে সাহানার কাছে ক্ষমা চাইয়ে নিয়েছে।

এই এটুকুই কাহিনী। সহজ-সরল, শেষদিকে একটু নাটকীয় করার চেষ্টা। এই এটুকু। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

এই কাহিনীতে মনে রাখার কিছু নেই। এই কাহিনী আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমাকে মনে করিয়ে দিল স্বপন। আমার এক বন্ধু এক দৈনিক পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। তার রুমে আমার স্বপনের সঙ্গে পরিচয়। বন্ধুর মুখ থেকে আমি জানতে পারি, স্বপন রিপোর্টার হিসেবে নাম করেছে। এখন সে জমি দখলের ওপর একটা বড় রিপোর্ট তৈরির কাজ করছে। স্বপন আমাকে জানাল, সে আমার লেখা পছন্দ করে। কিছু দিন আগে সে ফুটপাত থেকে আমার একটা বই কিনেছে। ২৬-২৭ বছর আগের বই। এই বইটা তার পড়া হয়নি। কারণ তখন, যখন বইটা বেরিয়েছিল, সে নিতান্তই শিশু। পরে সে যখন পড়ুয়া হয়ে ওঠে, এ বইটা তার চোখে পড়েনি। ফলে সে কিনে ফেলে ও বাসায় এসে পড়তে গিয়ে খুবই অবাক বোধ করে এই দেখে যে– বইটায় জমি জালিয়াতি করে দখলের চেষ্টার একটা ব্যাপার আছে। স্বপন জানল, আমার কাহিনীতে যার কথা আছে প্রধানত, অর্থাৎ সাহানা, এই সাহানার একটা ইন্টারভিউ নিতে পারলে তার রিপোর্টে সেটা বাড়তি মাত্রা যোগ করবে। আমি তাকে জানালাম– সেটা সম্ভব না। কারণ এসব চরিত্র লেখকের কল্পনামাত্র। এদের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, সুতরাং এদের খুঁজে বের করাও মুশকিল।

কিন্তু স্বপন নাছোড়বান্দা। সে বলল, খোঁজার মতো খুঁজলেই নাকি খুঁজে পাওয়া যায়। আমি তার কথার গুরুত্ব দিলাম না। তার বয়স কম, সে কবিও। এই দুই মিলে তার মধ্যে এক বাড়তি আবেগ বা স্বপ্নবিলাস কাজ করতেই পারে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের একটা ব্যাপার, সে সত্যিই সাহানার বাড়ি খুঁজে বের করল। সাহানার কলেজপড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে একদিন ঠিকই চলে এলো আমার বাসায়। তারপর আমাকেও নিয়ে গেল সাহানার বাসায়। সাহানার সঙ্গে আমার বেশ কিছু কথা হলো। আমি যখন ফিরে এলাম, সেই কথাগুলোই হয়ে উঠল আমার অস্বস্তির কারণ। সাহানাকে কথা দিয়ে এসেছি, কাহিনীর পরের অংশ লিখব আমি। কিন্তু লিখব বললেই যদি এক অস্বস্তি কাজ করে ভেতরে, লেখা হয় না। এই অস্বস্তিটুকু দূর করা দরকার, একটু সুস্থির হওয়া দরকার, শুরুর আগে কাহিনীটাও সাজিয়ে নেওয়া দরকার।

এদিকে স্বপনের কোনো খবর নেই। আমার ধারণা ছিল, সাহানার ওখান থেকে যেদিন ফিরলাম, সে রাতে না হোক, পরদিন স্বপন অবশ্যই ফোন করবে, কিংবা সে হয়তো চলেই আসবে। কিন্তু সে যেন নিরুদ্দেশ হয়েছে। আমার মনে একটা ক্ষীণ ভয়ও ঢুকেছে, সে কি সাহানাদের ওখানে আটকা পড়েছে!

এই চাপ খুব বেশিদিন না হলেও বেশিক্ষণ তো বটেই, সহ্য করতে না পেরে আমি নিজেই স্বপনকে এক দুপুরে ফোন করলাম– স্বপন...।

স্বপন সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল– কেমন আছেন, স্যার?

তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো?

কোন ব্যাপার?

এই যে, একদম লাপাত্তা।

স্বপন হাসল– লাপাত্তা হওয়ার দুটো কারণ, স্যার।

বলো।

এক, আপনাকে আমি একটু একা থাকার সুযোগ দিতে চাচ্ছিলাম।

আমার একা থাকার দরকার, এটা তোমার মনে হলো কেন!

মনে হলো, স্যার। সুস্থির হওয়ার জন্য একা থাকা দরকার।

আমি অস্থির?

একটা চাপ, তাই না, স্যার? এই চাপ আপনাকে অস্থির করতেই পারে।

হুমম। তোমার কথা ঠিক।

পরের কাহিনী কেমন হবে, কিছু কি গোছাতে পেরেছেন?

একটুও না।

কিন্তু পারতে হবে, এও ঠিক।... ভুল বললাম?

না, এটাও ভুল বলোনি। পারতে হবে। এখন দ্বিতীয় কারণটা বলো।

কিসের?

ওই যে বললে না, তোমার লাপাত্তা হওয়ার কারণ দুটো।

আমার রিপোর্ট নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম ওটা ছাপা শুরু হলে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

না না, দেখা তুমি আগেই করতে পারতে।

আজ স্যার, রিপোর্টটার প্রথম কিস্তি ছাপা হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন?

আজ?... না, আজ হকার আসেইনি।

আজই সাহানার কথা আছে।

প্রথম কিস্তিতেই!

সবটা না, কিছুটা। মানে সাহানাকে দিয়ে আরম্ভ করেছি... পরে সাহানার একটা ইন্টারভিউ ছাপব।

দেবে?... আমার মনে হয় না দেবে।

দেখাই যাক।... স্যার, কাল সকালে কি একটু সময় দেবেন?

আসবে?

হ্যাঁ। আজকের আর কাল রিপোর্টের যেটুকু ছাপা হবে, সেটুকু নিয়ে আসতে চাই।

আসো। তোমার সঙ্গে এমনিতেও কথা আছে আমার। আর কারো সঙ্গে এসবের কিছুই শেয়ার করতে পারছি না।

তবে কাল, স্যার। আজ একটু সাহানার ওখানে যাব। কোনো আপডেট থাকলে কাল তাও আপনাকে জানাতে পারব।

স্বপনের সঙ্গে কথা বলে তেমন কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হলো না, তবু স্বস্তি পেলাম বেশ খানিকটা। সম্ভবত, সাহানার বিষয়ে কথা হলো, এই এটাই কারণ। তবে খচখচানি বলতে যা বোঝায়, তা আমার পুরো গেল না। সাহানার সঙ্গে দেখা না হওয়াটাই ভালো ছিল। কবে কী লিখেছি, যারা এসেছে সেই কাহিনীতে, তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা এক বিড়ম্বনা। এই প্রশ্নের জবাব দাও, ওই প্রশ্নের জবাব দাও, এসব আছেই, আরো আছে– কাহিনীর বাইরে আরো কিছু জানা। বিডি এসে সাহানার সমস্যার সমাধান করে দিল, সাহানা স্বস্তিবোধ করল, আবার গভীর এক মনোবেদনায় পড়ল, কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় বিডিরা এভাবে উঠে এলো, এই ভাবনায় উদ্ভ্রান্ত হলো– আমি কাহিনী এখানে শেষ করে দিয়েছিলাম। অথচ সেদিন সাহানার বাসায় গিয়ে শুনলাম, সমস্যা এখনো চলছে। আবার এসেছে রহমত আলী, তার পোশাক বদলিয়েছে, চেহারাও, কিন্তু তার বলার ধরন বদলায়নি। আবার সে জমির মালিকানা দাবি করেছে, জঙ্গি লালনের অভিযোগ তুলেছে সাহানার বিরুদ্ধে। আসলে আমি বুঝি, আমার মূল অস্বস্তি এই জায়গায়– কাহিনী আমি শেষ করেছি বটে, কিন্তু কাহিনী আসলে শেষ হয়নি।

বাসায় কেউ নেই। স্ত্রী বিদেশে ছেলের কাছে গেছে। একা থাকতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। কাজের লোক আছে। সে সকালে এসে দুপুরে যায়। আর রাত ১০টার দিকে আসে একজন। আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। আপাতত আমাদের বাসায় কোণের ঘরটায় থেকে এক দোকানে সেলসম্যানগিরি করছে আর চাকরি খুঁজছে। রাতে একদম একা থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো ব্যবস্থা।

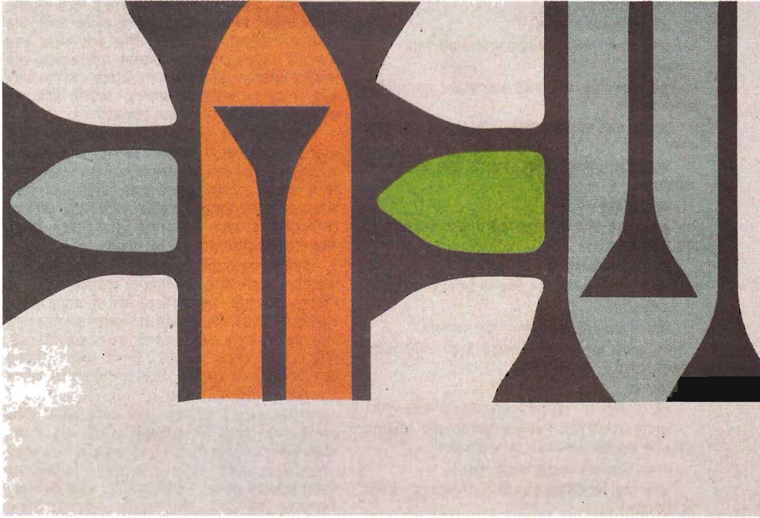
আমি কাজের মেয়েটিকে চা বানাতে বলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বারান্দাটা বড়ই। সামনের রাস্তাটাও চওড়া। এ লাইনে ৮-৯টা বাড়ি। আমি কাউকেই চিনি না, আমার ধারণা, এসব বাড়ির কেউই কাউকে চেনে না। সকালে ভুস করে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, তারপর যখনই ফিরুক, ওই গাড়িতেই, গাড়ি থেকে সোজা লিফটে, লিফট থেকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। কে কোথায় আছে আশপাশে, তা জানার সময় আর সুযোগই বা কোথায়।

কাজের মেয়েটি চা দিয়ে গেলে আমি এদিক-ওদিক তাকাই। নতুন কিছুই না, রোজকার মতোই, তবু এদিক-ওদিক তাকাতে আমার ভালো লাগে। রাস্তার বাঁ দিকে একটু কোণের মতো, সেখানে একটা চা-সিগারেট, পান-বিড়ি আর খুচরো খাবারের দোকান। ওখানটায় ভিড় থাকে সবসময়। এখানকার কেউ কেউ চেষ্টা করেছিল দোকানটা উঠিয়ে দেওয়ার। পারা যায়নি, রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ দোকানির পক্ষে আছে। ওই দোকানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ সরিয়ে আনার আগমুহূর্তে আমার একজনের দিকে নজর যায়। ও দোকানে যারা চা খায়, নাস্তা সারে, বিড়ি বা সিগারেট ফুঁকে, তাদের কাউকেই আমি চিনি না। অধিকাংশ সময়ই তারা বিভিন্নজন। কেউ কেউ হয়তো নিয়মিত ধারণা করি, কিন্তু তারা কারা সেটাও আমি বলতে পারব না। যার দিকে হঠাৎই আমার চোখ যায়, সেও আমার অচেনা। এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ, চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। তরুণ বয়স, সুন্দর চেহারা, যদিও সেখানে কিছুটা ক্লান্তির ছাপ– এসব এক নজরে ধরা পড়ে, তাকে যে চিনি না– এটাও ধরা পড়ে, সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এই ব্যাপারটা যে, তাকে আমি অচেনা বলে উড়িয়েও দিতে পারি না। আমার মনে হয় তাকে আমি দেখেছি কোথাও। কবে, কোথায়– কিছুই মনে করতে পারি না, কিন্তু ছেলেটা আমার দেখা, কখনও এই ধারণা থেকেও বের হয়ে আসতে পারি না। তা ছাড়া ছেলেটা আমার দিকে তাকিয়েই বা ছিল কেন! আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার পর সে অবশ্য সরে গেছে। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। আমার ভেতর অবশ্য একটা অস্বস্তি তৈরি হলো। মনে হলো, লোকজনের ওপাশে নিজেকে আড়াল করে ছেলেটা আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমার আর বারান্দায় থাকতে ইচ্ছা করল না।

স্বপনের প্রথম প্রশ্নটা হলো– লিখতে শুরু করেছেন?

আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিলাম না, উল্টো জিজ্ঞেস করলাম রুমানা কই?

স্বপন হেসে ফেলল– আমি থাকলেই রুমানার থাকতে হবে?



আমিও হাসলাম।

ও কলেজে গেছে। ওখান থেকে চলেও আসতে পারে। জানে, আমি এখানে আসব।

বলতে বলতে স্বপন দুটো খবরের কাগজ এগিয়ে দিল– গতকালের ও আজকের। একটু চোখ বুলিয়ে বলবেন কেমন হলো।

আমার তখন চোখ বোলানোর ইচ্ছা ছিল না। সেটা প্রকাশ্যে বলা বা ভাবে-ভঙ্গিতে বোঝানোও যায় না। আমি চোখ বোলাতে গিয়ে পুরোটা পড়েই ফেললাম। তাকালাম স্বপনের দিকে, ও নিশ্চয়ই আমার মতামতের অপেক্ষায় আছে।

হয়েছে কিছু? স্বপন জিজ্ঞেস করল।

হুঁ। আমি বললাম।

আপনার বলার ধরন দেখে বুঝতে পারছি কিছুই হয়নি।

স্বপন, সত্যি করে বলি– খুবই ভালো হয়েছে। অল্প জায়গায় অনেক কথা।

আরও বেশ কয়েকটা পর্ব যাবে।

সাহানার ব্যাপারটাও এনেছ খুব কৌশলে।

এখানে স্যার, আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হয়েছে।

বুঝতে পারছি।

আপনার ভালো লেগেছে জেনে আমি খুশি। সবাই খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করছে। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো...। এই পর্যন্ত বলে স্বপন চুপ করে গেল।

আসল ব্যাপারটা কী? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আপনার কথা বলুন।

আমার কথা কী বলব, স্বপন?

আমি এমনভাবে বললাম, যেন এটা একটা কথার কথা। আমি জানি, এটা কথার কথা না। কারণ, সত্যিই, কী বলব আমি নিজের কথা!

নিজেকে গোছাতে পারছেন না?

না। অস্থির, অশান্তি। এলোমেলো এক অবস্থা।

এমন হওয়ার কথা নয়, স্যার।

কেন! আমি অবাক চোখে স্বপনের দিকে তাকালাম।

আপনি হচ্ছেন লেখক।

তো? আমি সত্যিই জানতে চাইলাম– তো।

লেখকদের ধারণ ক্ষমতা বেশি। বেশি না, বলুন?

কম না বেশি, সেটা আপাতত বাদ দাও। তুমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছ না।

শুনি। বলুন আপনি। শুনি কী আমি বুঝতে পারছি না।

আমি লেখাটা শেষ করে দিয়েছিলাম।

কিন্তু আপনারাই বলেন, জীবনের কোনো কাহিনীই শেষ হয় না, আপাত শেষ হয় মাত্র।

ঠিক আছে, আপাত। আপাত শেষ করেছিলাম আমি।

আপাত শেষই যদি করেছিলেন, আবার আরম্ভ হতে পারে।

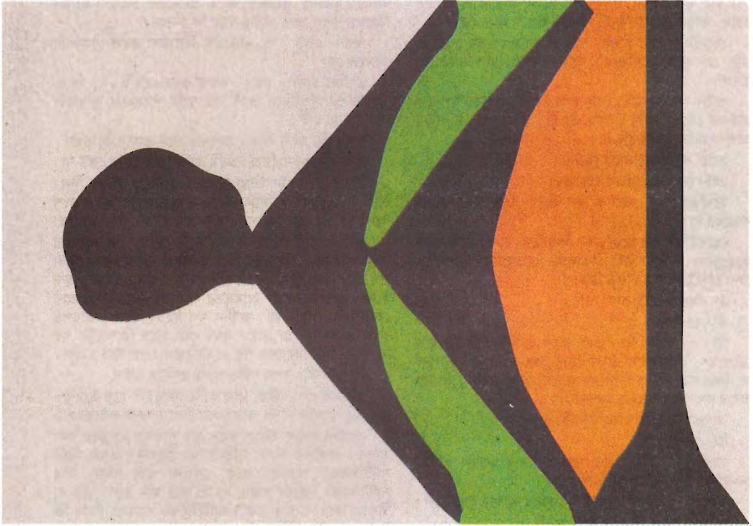
পারে।

তা হলে?

বোঝাতে পারব না, স্বপন।.... মানে, এভাবে আবার শুরু হবে...।

কাহিনী নিজে বোধহয় তার সমাপ্তি পছন্দ করেনি...।

তাই নিজেই সে শুরু করেছে?



আমরা সেভাবে ভেবে নিতে পারি।

তুমি আমাকে আরও এলোমেলো করে দিচ্ছ।

হয়তো। কিন্তু নতুন করে শুরু হওয়া এ কাহিনী আপনাকেই শেষ করতে হবে।

কেন, আমি কেন শেষ করব! আমি শুরু করিনি।

শুরুটা আসলে আপনার হাতেই। এটা পরবর্তী অংশ। এটার দায়িত্বও আপনার।

জানি না। দায়িত্ব না কী। এসব ভাবতেও আমার ভালো লাগে না। কিন্তু স্বপন, আমি অশান্তিতে আছি। এটাই বড় কথা। কেন অশান্তি, তুমি জানতে চাইতে পারো। দেখো, মারুফের যে বাড়ি, ওটাকে যদি আমরা প্রতীক হিসেবে নেই!...।

এ দেশের?

হ্যাঁ, এ দেশের। তা, কী হচ্ছে ওই জমি বা বাড়ি নিয়ে, যেখানে সাধারণ কয়েকজন নাগরিক থাকে। বারবার সেটার দাবিদার এসে হাজির হয়। বারবার সেটা কেউ না কেউ দখল করতে চায়। মানে দেশটা সাধারণ মানুষের থাকবে না...।

দ্বিতীয় অংশটা শুরু করুন, স্যার। জরুরি।

নাহ।

জরুরি না?

জরুরি নিশ্চয়। তবে লেখার কথা ভাবলে ক্লান্ত বোধ করি। কী লাভ হয় লিখে!

সেটা কি আর মেপে বলা যায়! এই যে আমি দৌড়াদৌড়ি করে রিপোর্ট তৈরি করছি, লোকজন ভালো বলছে, বলছে- ভালো কাজ করছি, দরকারি কাজ করছি। আদতে কী লাভ হচ্ছে, তা আমি বুঝতে পারছি না।

কী বলো, কাজ নিশ্চয়ই হচ্ছে... অন্তত সচেতনতা বাড়ছে, একটা অ্যাওয়ারনেস, মানুষজনের কাছে অবস্থাটা তুলে ধরাও একটা বড় কাজ।

তা হলে সাহানার কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বটা লিখে ফেলাও কি খুব জরুরি না?

আমি উত্তর দেওয়ার আগে কলিংবেল বাজল। আমি উঠতে চাইলাম। স্বপন বলল, আমি দেখছি।

স্বপন উঠে গিয়ে দরজা খুলল। দু'চারটা কথা বিনিময়ের শব্দ পেলাম। স্বপন ফিরে এসে বলল- স্যার, আপনার কাছে।

কে? আমি উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করলাম, যদিও আমার কাছে যারা আসে তাদের প্রায় সবাইকেই না চেনার কথা স্বপনের। লেখালেখির কেউ হলে অবশ্য অন্য কথা। তবে তাদের সঙ্গে আমার ওঠাবসা কম, আর, তারা কেউই হুট করে এ সময় আসবে না। তা হলে কে- আমি ভাবলাম। আমি মনে করতে পারলাম না। এ সময় কেউ আসবে বলে জানিয়ে রেখেছে, এমন কারও কথা আমার মনে পড়ল না।

অল্প বয়সী একজন মুখ সামান্য নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলল- স্লামালেকুম স্যার।

আমি সালামের উত্তর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। খুব সামান্য সময়, দুই কি তিন মুহূর্ত, তারপরই মনে হলো এই ছেলেটি আমার অচেনা নয়। কিন্তু 'অচেনা নয়' এক কথা, চেনা- আরেক; আমি কি চিনি একে? এই জিজ্ঞাসাটুকু পুরো ফুরোবার আগেই আমার মনে পড়ল গত দুপুরের কথা। আমি যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম, এই ছেলেটা ছিল রাস্তার কোণে। হাতে খবরের কাগজ ছিল, চা খাচ্ছিল আর আমাকে দেখছিল। এটা মনে পড়ে গেলে প্রথমে একটা ভয় এসে ভর করল। ভয় ভয় চোখে আমি আবার তার দিকে তাকালাম।

তার মুখ সৌম্য, গতকালের মতো কিছু ক্লান্তি আজও আছে। তার এক হাতে দুটো খবরের কাগজ আর একটা বই।

ছেলেটা সামান্য হাসল। সম্ভবত, আমি যে ভয় পেয়েছি, এটা সে বুঝতে পেরেছে। বলল– স্যার, আপনি ভালো আছেন।

ভালো। আমি মাথা দোলালাম। পেছনে ফিরে স্বপনকে একবার দেখে নিলাম। আমি ভালো। আমি বললাম। কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি না।

স্যার, আপনি আমাকে চেনেন।

তাই! কোথায় পরিচয় হয়েছিল।

হয়েছিল স্যার। অনেক দিন আগে। তাই মনে করতে পারছেন না।

ছেলেটার বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যা আমাকে সহজ করে তুলল। সামান্য মাথা ঝাঁকালাম– হতে পারে। আপনাকে চেনা চেনাই লাগছে। কিন্তু ঠিক...।

২৭ বছর আগের কথা, স্যার।

কী! ২৭ বছর!

জি। ২৭ বছর। কিন্তু আমি জানি আপনি আমাকে মনে রেখেছেন। হয়তো সেভাবে আমার কথা আপনার মনে ছিল না, কিন্তু গত কয়েক দিনে যা ঘটেছে, আমার কথা, আমার বাবার কথা মনে পড়েছে আপনার।

আপনার বাবাকেও আমি চিনি!

জি, চেনেন।

আশ্চর্য!... আচ্ছা, গত দুপুরে রাস্তার কোণে চায়ের দোকানের ওখানে আপনি ছিলেন না?

ছিলাম।... আমার আসলে গতকালই আসার ইচ্ছা ছিল।

সমস্যা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আপনার এখানে আসব বলেই বেরিয়েছিলাম। এসেও ছিলাম এ পর্যন্ত। এখানে এসে টের পেলাম, আজ স্বপন আসবে। তখন ভাবলাম, তাহলে আজই আসি।

তুমি, মানে আপনি স্বপনকেও চেনেন?

তুমি করে বলেন। মানানসই হবে। জি, আমি স্বপনকেও চিনি।... এখন চিনি।

সমস্যা বাড়ল দেখছি...।

স্যার, এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন? জরুরি কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

ওহ হো, ভেতরে আসুন।... স্বপন, স্বপন...।

স্বপন কাছেই। বাইরের দরজাটা ড্রইংরুম লাগোয়া। আমাদের কিছু কথা নিশ্চয়ই সে শুনেছে। ডাক শুনে তখনই উঠে এলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম– স্বপন, তুমি একে চেনো?... কী যেন নাম বললে তোমার?

জামিল।

হ্যাঁ, জামিল। স্বপন তুমি জামিলকে চেনো?

স্বপন দু'পাশে মাথা নাড়াল।

কিন্তু ও বলছে তোমাকে চেনে। আবার আমিও নাকি ওকে চিনি। ওর বাবাকেও।.... মজার ব্যাপার হচ্ছে, ও বলছে ওকে চিনি ২৭ বছর হলো। তা, ওর বয়স কত বলো দেখি? ২৭ বছর আগে চেনা সম্ভব? মনে রাখা? কিংবা ওই-বা কীভাবে মনে রাখল আমাকে। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে না?

জামিল ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বসতে বলার আগে বসেও পড়েছে। বলল– স্যার, আমাকে একটু সময় দিলে সবকিছু বুঝিয়ে বলতে পারি।

দরজা বন্ধ করে আমি ফিরলাম, স্বপন আমার পাশে। আমরা দু'জনই তাকিয়ে আছি জামিলের দিকে। জামিল জিজ্ঞেস করল স্যার, ওটুকু সময় কি দেবেন?

স্বপন একটু গলা চড়িয়েই জিজ্ঞেস করল– আপনি আসলে কে?

জামিল হাসল– বলব। বলার জন্য এসেছি। ... স্যার, আপনি অনুমতি দিলে আমি এই স্বপন সাহেবকে দু-চারটা কথা বলতে চাই।

মানে কী! স্বপন বলল। আপনার সঙ্গে আমার কী কথা!

রাগ করবেন না প্লিজ। আমি কাহিনীর বাইরের কেউ না।

'কাহিনী' শব্দটা আমাকে আর স্বপনকে চমকে দিল। আমি তীক্ষ্ণ চোখে জামিলের দিকে তাকালাম। কাহিনীর অংশ বলেই কি এই ছেলেকে কাল থেকে আমার চেনা চেনা লাগছে!

জামিল তার হাতের কাগজ দুটো মেলে ধরল, স্বপনের দিকে তাকাল– জমি দখল নিয়ে আপনার রিপোর্টের এ দুটো পর্ব ভালো লেগেছে। বাবাকে পড়ালাম। বাবারও খুব পছন্দ হলো। তারপর বলল– আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না। ক'দিন খুব হইচই হলো। তারপর কোথাও কোনো রা নেই। অথচ ওটা নিয়ে রিপোর্টের পর রিপোর্ট, এডিটরিয়ালের পর এডিটরিয়াল হওয়া উচিত ছিল।

বিষয়টা কী? স্বপন গম্ভীর গলায় জানতে চাইল।

স্বপনের গলা গম্ভীর, কিন্তু আমি কৌতূহলী হয়ে উঠেছি– হ্যাঁ, শুনি আপনি নির্দিষ্ট করে কোন বিষয়ের কথা বলছেন?

একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন খুব সাধারণ মানুষের কথা ভাবুন। একাত্তর সালে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তখন তিনি সার্টিফিকেট নেননি। পরে, কোনো এক সময়, তার সার্টিফিকেট দরকার পড়ল, বা তা তার মনে হলো স্মৃতি বা স্বীকৃতি হিসেবে তার একটি সার্টিফিকেট দরকার, তিনি কি ইচ্ছা করলেই সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারবেন?

যথাযথ নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে গেলে তিনি অবশ্যই পারবেন।

ভুল। আমি ২৬ বছর ধরে বিষয়টা ফলো করছি। আপনি ভুল বলছেন।

স্বপনকে আরও গম্ভীর দেখাল– তা হলে ঠিক কোনটা?

আপনি নামকরা রিপোর্টার, চোখ-কান খোলা, আপনার নিজেরই জানার কথা।

ধরে নিন, আমি জানি না, আপনি জানেন, বলুন।

জামিল হাসল– এখানে রাগারাগির কিছু নেই...।

না না, রাগছে কে! কিছু জ্ঞানার্জনের অপেক্ষায় আছি আর কি।

থাকুন।... এখনকার অবস্থাটা ধরুন– সরকারি উচ্চপর্যায়ে অনেক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার খোঁজ পাওয়া গেল, এদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

সেটা আপনাকে বলতে হবে?... এদের সম্পর্কে লিখেছি আমি।

স্যার। জামিল আমার দিকে তাকাল। যে দেশে, সামান্য বাড়তি সুবিধা পাবে বলে, বড় পদের রাজকর্মচারীরা ভুয়া সার্টিফিকেট জোগাড় করে, নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দেয়, সে দেশের ভবিষ্যৎ কেমন বলে আপনার মনে হয়?

যখন ঘটনাটা ফাঁস হতে আরম্ভ করল, এই যে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের ভুয়া সার্টিফিকেট জোগাড় করে অনৈতিক সুবিধা নিচ্ছে, আমি খুবই লজ্জা পেয়েছিলাম। সে কথাই আমি বললাম জামিলকে– লজ্জার, এটা খুবই লজ্জার।

শুধু লজ্জার, অনৈতিকতার না?

অনৈতিকতার না?

অনৈতিকতার বলেই লজ্জার।

শুধু অনৈতিকতার, অবক্ষয়ের না?

হ্যাঁ, অবক্ষয়ের।

এটা কি এই জাতির পচনের গল্প, না?

আমার লজ্জা করছিল, আমি সামান্য মাথা ঝাঁকালাম।

জামিল ফিরল স্বপনের দিকে– আপনার জমি নিয়ে রিপোর্টটি দারুণ হবে, সাহানার প্রসঙ্গ যেমন মুন্সিয়ানার সঙ্গে এনেছেন, আমি বিস্মিত হয়েছি...।

স্বপনের ভুরু কুঁচকে গেল– এমনভাবে বলছেন যেন সাহানার ব্যাপারটি আপনি জানেন!

জানি! মুখে সামান্য হাসি নিয়ে জামিল মাথা ঝাঁকাল। সাহানাকে চিনি আমি। ত... তার মেয়েকেও চিনি... ঐ যে, যাকে আপনি রুমানা বলে ডাকছেন।

স্বপন হতভম্বের মতো আমার দিকে তাকাল। আমার অবস্থাও সে রকম। আমার এ রকম মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ হলো– এই যে জামিল এসেছে, এর মধ্যে ব্যাপার আছে, এর মধ্যে ব্যাপার আছে কোনো। আমি অনেকটা যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলাম– জামিল, আপনার ব্যাপারটা পরিষ্কার করুন।

স্যার, আপনার কাছে আসব, এটা ভাবছিলাম সার্টিফিকেট জালিয়াতির পরপর। আসব অনুরোধ নিয়ে, এটা ঠিক ছিল। কিন্তু দ্বিধা, সংকোচ, আপনি আবার কী মনে করেন বা কীভাবে নেন ব্যাপারটা– এসব কারণে আসা পিছিয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যেই স্বপন সাহেব ঢুকে পড়লেন। সাহানার বাড়িও নিয়ে গেলেন আপনাকে। আমার তখন মনে হলো– আমি তা হলে বসে আছি কেন! আমিও যাই, আমিও বলে আসি আমার কথাগুলো। ... কথাগুলো অবশ্য শুধু আমার একার না, আমার বাবারও।... হয়তো.... হয়তো না, নিশ্চয় আরও অনেকের।

বেশ। বলেন। শুনি।

আগে শুধু আপনার কাছে বলার ছিল। এখন স্বপন সাহেবকেও বলার আছে।

স্বপনকে বিরক্ত দেখাল। দু'বার সে তাকালও আমার দিকে।

আমি আপনাকে অনুরোধ করি, স্বপন সাহেব। জামিলের গলা নরম ও আন্তরিক শোনাল। আপনি, '৭২ সাল থেকে কী পদ্ধতিতে কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তার ওপর একটা রিপোর্ট করবেন। এটা অনুরোধ, অনুরোধ আপনার কাছে এ কারণে যে, আমার ও বাবার ধারণা– এটা আপনিই পারবেন।

স্বপন হঠাৎই খুশি হয়ে উঠল। হাসল না, উচ্ছ্বসিত হওয়া আরও পরের কথা, তবে আমি তাকে দেখে বুঝলাম গুমোট অবস্থাটা কেটে গেছে। সে বলল– আইডিয়াটা চমৎকার।

এখন পর্যন্ত কেউ করেছে বলে জানা নেই।

আমিও জানি না। তবে খুবই পরিশ্রমের একটা কাজ।

সে জন্যই আপনাকে বলা। পরিশ্রমে নিশ্চয় আপনি পিছিয়ে আসবেন না।

না না, তা কেন, তা কেন।

দেখবেন, কী যে চমকপ্রদ এক কাহিনী। রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত যে রাজনীতি আর বাণিজ্য।

কিছু না বলে স্বপন মাথা ঝাঁকাল।

স্যার। জামিল তাকাল আমার দিকে। এ দেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য আর রাজনীতি হয়েছে, এ নিশ্চয় আপনি স্বীকার করবেন।

আমিও মাথা ঝাঁকালাম– হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি।

এবার স্যার আপনার কাছে অনুরোধ। সাহানার কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব লেখার কথা আপনি ভাবছেন, যদি লেখেন, আমার আর বাবার কাহিনীর দ্বিতীয় পর্বও আপনাকে লিখতে হবে।

আপনার আর আপনার বাবার কাহিনীটা কী?

কাহিনী বদলায়নি স্যার। কাহিনী ২৭ বছর আগে যা লিখেছিলেন তা-ই আছে। কারণ ও রকম থাকার কথা। তবে তারপর পরিস্থিতি তো অনেক বদলে গেছে, তাই না স্যার?

আপনাকে এখন আরও বেশি চেনা চেনা লাগছে।

এই এটা দেখলে স্যার, আপনি আমাকে পুরোই চিনে ফেলবেন।

জামিল তার পাশে রাখা বইটা এগিয়ে দিল। খুবই জীর্ণ অবস্থার একটা বই। ওপরের মলাটও নেই। জামিলকে কুণ্ঠিত দেখাল– স্যার, আসলে আমি আর বাবা এতবার পড়েছি... তাই ঐ অবস্থা। আবার অনেক দিন ধরে আউট অব প্রিন্টও, তাই নতুন কপি কেনাও হয়নি।

আমি বইটা নিয়ে পাতা উল্টালাম।

স্যার, মনে পড়ছে?

হুমম। পড়ছে। আমি টের পেলাম আমার ক্লান্ত লাগছে।... তুমিই সেই জামিল, না?

জি।... আমাদের কাহিনী যেখানে এসে শেষ করে দিয়েছিলেন, তার পর থেকে আবার শুরু করার অনুরোধ নিয়ে এসেছি।

আমি কিছু বললাম না।

পরের অংশটুকু লেখা জরুরি স্যার, খুব জরুরি।

জানি না।... জামিল, আমি আসলে বুঝতে পারছি না।

এই কাহিনীর পুরোটা কি আপনার মনে আছে?

না। আমি দু'পাশে মাথা নাড়লাম। শুধু মূল ঘটনার কিছুটা।

স্বাভাবিক, ২৭ বছর কি কম সময়। সাহানার কাহিনীই যখন মনে থাকেনি, আমাদেরটা থাকার কারণ নেই।... স্যার, এটা আমি এখন পড়ব।

পড়বো?

জি। বেশি সময় লাগবে না। স্বপন সাহেব, বিরক্ত হবেন না। বিশ্বাস করুন, এই কাহিনী আপনার দরকার পড়বে।... স্যার শুরু করি তা হলে?

'হবে না, না?'

বাবা বারান্দায় বসেছিলেন। জামিলকে ফিরতে দেখে উৎসুক হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরমুহূর্তে নিভে যান এবং জামিল কাছাকাছি এলে ক্লান্ত-বিমর্ষ গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'হবে না, না!'

বাবার এই প্রশ্নে জামিল অবাক হয়। সে ঠিক বুঝতে পারে না, তার চোখে-মুখে কি এতটাই নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে! এতটাই যে, দেখা মাত্র বাবা বুঝে ফেললেন! তার মনে হয় না। এমন হওয়ার কথা নয়। ঘোরাঘুরির পর তার চোখে-মুখে কিছু ক্লান্তি অবশ্য থাকতে পারে, কিছুটা পরিশ্রান্ত তাকে দেখাতে পারে। ব্যস, এটুকুই, এর বাইরে আর কিছু নয়।

তা ছাড়া, হবে না– তা সে বুঝে গেছে অনেক আগে। ইন্টারভিউ দেওয়ার পরপর। তারপর সময় অনেক পেরিয়েছে। তখন একটু খারাপ অবশ্য তার লেগেছিল। তাই বলে, হতাশার ছাপ এতক্ষণ চোখে-মুখে থাকার কথা নয়। বড় কথা, হতাশ সে আজকাল হয়ও না। হতাশ হওয়াটাও একটা বড় ব্যাপার, তার মনে হয়। খামোখা মন খারাপ করেই বা কি! হবে না, অনেকটা এ রকমই ধরে নিয়েছে সে। তবে

কেন বারবার চেষ্টা করা? তাহলে একটু আশা বোধহয় এখনও আছে কোথাও। কোথায়? তা জামিল ঠিক জানে না, ও বিষয়টি অমীমাংসিত।

অবশ্য বাবার আশা একটু নয়, বিশাল এবং প্রগাঢ়! হবেই, আজ কিংবা কলা। বাবা পরশুর কথা ভাবেন না, পরশু বহু দেরির আর দূরের পথ। বিশ্বাস করেন, হবে– আজ কিংবা কাল। অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হবে। প্রয়োজন শুধু লেগে থাকা। জামিলের অবশ্য এখন আর ওরকম মনে হয় না। তবে সে লেগে আছে, বাবার কথা মতো, আর ঐ যে অমীমাংসিত বিষয়ের মতো একটু আশা, সাকল্যে এই সম্বল নিয়ে।

বাবার ধারণায় সম্বল আরও বেশি। আশাটাই নাকি বড়, হারাতে নেই কখনো। বাবা তাই জামিলের মধ্যে কোনো রকম হতাশা বাসা বাঁধতে দেন না। সেই প্রথম থেকে তার বক্তব্য, হতাশা-টতাশা কখনো স্থান দিতে নেই মনে, ঝেড়ে ফেলতে হয়। এ বড় খতরনাক জিনিস, একবার ধরলে কুরে কুরে খায়। তা, খায় কি-না, কতটা খেয়েছে তার, নাকি তার ভেতর ঢুকতেই পারেনি এখনো, এতসব কখনো তলিয়ে দেখেনি জামিল। বাবার আশা আছে, বেশ; তার আশা কিংবা হতাশা কোনোটাই নেই– এই রকম মনে হয় তার।

এখন, অমন আশাবাদী বাবার মুখে 'হবে না, না' শুনে জামিল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন হওয়ার কথা নয়, কক্ষনো নয়। হবে না বুঝলেও বাবা কখনো এভাবে বলবেন না। আগেও কখনো বলেননি। পরে, বেশ কিছুটা সময় পেরোলে, এক ফাঁকে কথা প্রসঙ্গে টুক করে জানতে চেয়েছেন, 'তা, কেমন হলো, আজকেরটা, মানে আমি তোর ইন্টারভিউর কথা জানতে চাচ্ছিলাম, প্রশ্নগুলো কি খুব বিদঘুটে ছিল? আমাদের সময় অবশ্য তোদের মতো প্রশ্ন আসতো না'– বাবা সব সময় এভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জেনে নিতেন। জামিল 'হ্যাঁ-হুঁ' করলে উল্টো সান্ত্বনা দিতেন, 'আরে ধ্যাৎ, ইন্টারভিউ দিলেই চাকরি হয় নাকি! তুই কেন যে খামোখা এমন করিস,... তোকে বরং একটা গল্প বলি, শোন। আমাদের সময় তো আর এ রকম কঠিন অবস্থা ছিল না। তখনই জানিস, আমাদের এক বন্ধুকে মোট সতেরো বার ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল, ওর নাম ছিল আকবর, এই তো সেদিনও রাস্তায় দেখা হলো।'

সেই বাবার মুখে এখন 'না'! জামিল তাকিয়ে থাকে, একসময় সামান্য হাসি ফোটে তার মুখে, 'হ্যাঁ বাবা, হবে না। তাই-ই মনে হলো।'

'তুই নিজেই বুঝতে পেরেছিস?' বাবা পরমুহূর্তে ব্যাকুল গলায় জানতে চান। এ প্রশ্নের কী উত্তর? আর কে বুঝবে? বোঝার তো কথা তারই। সে চুপ করে থাকে। কিন্তু বাবাকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে তার মুখ খুলতেই হয়।

'তা তো পেরেছিই বাবা'– সে বলে, 'ইন্টারভিউ তো আমিই দিলাম। তাছাড়া...।' জামিল কথা শেষ না করে আড়মোড়া ভাঙে। যেন কিছুই হয়নি, এমন একটি চেহারা ফুটিয়ে তুলতে চায়, তার ঠোঁটের কোণে খুব সূক্ষ্ম এক টুকরো হাসি ঝুলে থাকে।

'তাছাড়া কী?' বাবা শিশুর গলায় জিজ্ঞেস করেন।

'তা তো তুমিও জানো বাবা।'

'কী জানি, বলবি তো।'

'সেই পুরনো কথা।' জামিলের গলায় আলস্য, 'চাকরি আজকাল ধরাধরি না করলে হয় না। আগেও সবাই মামার কথা বলতো, এখনো বলে। আমরা অবশ্য বলি জ্যাক।'

বাবা নিথর বসে থাকেন। জামিলের ভালো লাগে না। এমনটি বাবাকে মানায় না। সেও দেখে অভ্যস্ত নয়। তাই এখন, দেখে– চোখে বড় বেশি লাগে। সে তাই পরিবেশ সহজ করার চেষ্টা করে।

'আমাদের একটা মামা থাকলে হতো, না বাবা? খুব পাওয়ারফুল একটা মামা'– সে তরল গলায় বলে বাবার দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকায়।

আগে, এই নিয়ে বেশ কয়েকবার ঠাট্টা-ইয়ার্কি হয়েছে তাদের মধ্যে। বাবাই কখনো কখনো বলেছেন, 'দেখ, তোর মায়ের কাণ্ডটা দেখ। এই যে তোরা এখন এত মামা মামা করিস, তা তোর মায়ের একটা ভাই থাকতে পারলো না? কত উপকার হতো এখন, তোরা মামা বলে ডাকারও একজনকে পেতি আর তোর চাকরির ব্যাপারেও ভাবতে হতো না।'

জামিলও তখন ইয়ার্কি মেরে উত্তর দিয়েছে, 'তা, মামা না হয় না-ই থাকলো বাবা, একজন তেমন চাচা থাকলেও তো হতো, যে মামা বলে ডাকলে আপত্তি তো করতোই না, বরং খুশি মনে মামার কাজগুলোই করে দিত।'

এই নিয়ে অনেক দিন খুব হাসাহাসি হয়েছে তাদের। আজ, আশা ছিল জামিলের, মামার প্রসঙ্গ উঠলে বাবা হয়তো হেসে ফেলবেন।

কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটে না। বাবা যেন জামিলের কথা শুনতেই পাননি এমনভাবে উদাসীন চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকেন।

'কী হলো বাবা, তুমি অমন করছো কেন?' জামিল জিজ্ঞেস না করে পারে না।

বাবার ঘোর ভাঙে না, যেন ঘোরের মধ্যেই জিজ্ঞেস করেন, 'হবে না, না? তাই মনে হলো তোর?'

জামিলের রাগ হয়, 'হ্যাঁ, তাই মনে হলো। হবে না ও চাকরি। কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'তাহলে'– বাবার গলা খুব নিরাশ শোনায়, যেন নিজেকেই বলেন, 'হবে না,... তাহলে এখন কী হবে?'

জামিল আর দাঁড়ায় না। বারান্দায় চেয়ারে জবুথবু বসে থাকা বাবাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকে। ভেতর বলতে আড়াইটে ঘরের আশ্রয়। অনুজ্জ্বল, বর্ণহীন এবং কখনো কুৎসিত, জামিলের মনে হয়। এই আড়াইটে ঘরের মধ্যেই সবকিছু। এক ঘরে বাবা-মা। আরেক ঘরে ছোট ভাইবোন দুটো। আর একটা ঘর আছে। ওটাকে ওরা ড্রইংরুম বলে। তবে হিসাব এমন সহজ নয়। যেমন বাবা-মার কিংবা ছোট ভাইবোনদের ঘর আলাদা হয়েও আলাদা নয়। কারণ আলাদা বলতে যা বোঝায়, ওই ঘর দুটো তেমন নয়। কারণ কোনো ঘরে খাবার ব্যবস্থা, কোনো ঘরে পড়ার, কোনো ঘর কখনো ভাঁড়ার, এরকম। এই যেমন ড্রইংরুম, তারা ড্রইংরুম বলে বৈকি, কিন্তু জামিলের রাতে শোয়ার ব্যবস্থা ওখানেই। কখনো কোনো মেহমান চলে এলে এবং রাতে থাকলে, তার থাকার ব্যবস্থা জামিলের সঙ্গেই। আবার তার চৌকির নিচে চাল-ডালের বস্তাও পাওয়া যাবে কখনো। চৌকির নিচে বলে ওগুলো অবশ্য দেখা যায় না, তবে দেখা যায় আলনা। অন্য ঘরে জায়গা হয় না, সুতরাং জামিলের কাপড়-জামা রাখার আলনা তার চৌকির পাশেই রাখতে হয়েছে। আর রয়েছে তার টেবিল। পড়ার পাট চুকেছে, সুতরাং বইপত্র নেই টেবিলের ওপর, এখন আছে অন্যান্য টুকটাক জিনিস।

জামিল ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় বদলায়। এক চিলতে উঠোন আছে বাড়ির পেছন দিকে। সেখানে টিউবওয়েল। তার চারপাশ সব সময় কাদা কাদা, যেটুকু শান বাঁধানো অংশ, সেটুকু পিচ্ছিল। তারা অভ্যস্ত, তবু কখনো কখনো পা পিছলে যায়, বাবা তো প্রায়ই পড়েন। সেই কলপাড়ে বসে জামিল অনেকক্ষণ ধরে হাত-মুখ ধোয়। গোসল করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আলসেমি, হয় না। সে হাত-মুখ ধুয়ে ছোট বারান্দায়

উঠে গলা চড়িয়ে ছোট বোনকে ডাকে। গলা চড়ানোর দরকার ছিল না, মৃদু গলায় ডাকলেও এ বাড়ির যে কেউ শুনতে পারে। কিন্তু জামিলের এখন খুব অস্বস্তি, সে চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছে না, বরং তার ইচ্ছে করছে চেঁচিয়ে, গলা চড়িয়ে নিজের উপস্থিতি সবাইকে জানান দিতে।

ছোট বোনকে ডেকে সে ভারিক্কি গলায় চা বানাতে বলে। তারপর ড্রইংরুমে ফিরে চৌকির ওপর লম্বা হয়। একটু সুস্থির বোধ করে সে। তখনই মনে হয়, বড় বেশি চেঁচাচ্ছে সে, বড় বেশি উপস্থিতি জাহির করতে চাচ্ছে।

কেন?

বেশ অনেকটা সময় ধরে ভাবে সে। কেন? এই চেঁচানো কি ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা? সে কি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ভুলে থাকতে চাচ্ছে সবকিছু? শুধু আজকের ইন্টারভিউর ব্যর্থতা নয়, এত দিনকার সবকিছু? তবে কি তার নিজের ভয়, দ্বিধা, লজ্জা?

হতে পারে, হতেও পারে, তার মনে হয়। কিছু লজ্জা আছে বৈকি। এখনো সে সংসারে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারেনি, এই ব্যাপারটা তাকে বড় খোঁচায়। তবে এভাবে লজ্জা পাওয়ারও খুব একটা কারণ নেই। তার এমনও মনে হয়। সে জানে, বাসায় কেউ তাকে কখনো কিছু বলবে না। আর বড় কথা, সে তো বসে নেই, সে তো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। না থাকুক আশা, কিন্তু সে তো পুরো নিরাশও নয়। তবে আজ কেন অমন হলো? কেন নিজেকে জাহির করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠলো?

কী কারণ এর? এই একটু আগে বাবার ওই অদ্ভুত আচরণ? হ্যাঁ, তাই, একসময় সে নিশ্চিত হয়। বাবার মুখে 'তাহলে এখন কী হবে' শুনেই তার এই চেঁচানো। 'তাহলে এখন কী হবে'– তার সে কী জানে! যা হওয়ার তা-ই হবে। সে তো আর ইচ্ছে করলেই অবস্থা বদলে দিতে পারে না। এত সব ভেবে বাবার ওপর খুব অভিমান হয় তার। কিন্তু সে অভিমান ক্ষণস্থায়ী। সে বরং ক্রমশ বিস্মিত হয় এই ভেবে, বাবা আজ হঠাৎ অমন কেন! একবার ভাবে ছোট বোনকে জিজ্ঞেস করবে আজ সারাদিনে তেমন কিছু ঘটেছে কি-না। কিন্তু ছোট বোন চা দিয়ে যায়, সঙ্গে মুড়ি ভাজা, তার জিজ্ঞেস করা হয় না। সে ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে না, ছোট বোন একটু বোকাটে ধরনের, কিছু বলতে পারবে না, সে যাই হোক, জামিলের একসময় মনে হয়, বাবার সঙ্গে বুঝি খুব ঠাণ্ডা ব্যবহার হয়ে গেছে। অন্তত আরো কিছুটা সময় সে বাবার পাশে থাকতে পারতো। অথচ 'এখন কী হবে' বলে বাবা বিস্ময় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেও আর কিছু না বলে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। সে তো জিজ্ঞেস করতে পারতো, কেন, 'তাহলে এখন কী হবে'– এই প্রশ্ন, হঠাৎ করে? কিন্তু তারও মন খারাপ তখন। আর জোর করে কারো সঙ্গে ভালো ব্যবহার করাও কঠিন কাজ– তার মনে হয়।

আজ ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেছে তার, ইদানীং এ রকম প্রায়ই হচ্ছে। কোনো কারণ থাকে না, তবু ঘুম ভেঙে যায়। আজ যেমন ঘুম ভাঙার পর তার মনে হয়, একটা শব্দ শুনেছে সে কোথাও। অনেকক্ষণ কান পেতে থাকে, কিন্তু আর কোনো শব্দ নেই। একসময় সে বোঝে, আসলে শব্দ-টব্দ শোনেনি সে কোনো, ঘুম ভাঙার একটা অজুহাত তো দরকার, তাই ওরকম ভাবা।

ঘুম ভাঙলেও সে বিছানা ছেড়ে ওঠে না। উঠে তো করারও নেই কিছু। বড়জোর চেয়ার টেনে বারান্দায় বসে থাকা। সে হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই নেয়। বাবা একসময় কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'সিগারেট ধরেছিস দেখছি, বেশ; তবে বলে দিচ্ছি– কাজ, শারীরিক পরিশ্রম করার সময়, হাঁটার সময় এবং সকালে ঘুম ভাঙার পর শোয়া অবস্থায় কখনো সিগারেট খাবি না।' অথচ এ বাজে অভ্যেসটাই তার হয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙার পর বাসি মুখে সিগারেট না ধরালে তার ঘুমের রেশ কাটে না।

দিনের প্রথম সিগারেটটা বিছানায় শোয়া অবস্থায়ই তার শেষ হয়। আরো আধ-ঘন্টার মতো সে বিছানায়ই শুয়ে থাকে। কখনো পা নাচায়, কখনো গুন গুন করে গান গায়। কখনো তার মনে হয়, ইউনিভার্সিটি জীবনই সবচেয়ে ভালো ছিল। ক্লাস করার দরকার নেই তেমন, ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেই শুনেছিল সে, পরীক্ষার খাতায় আঁচড় টানলেই নাকি সেকেন্ড ক্লাস দিয়ে দেওয়া হয়। ফার্স্ট ক্লাস আর থার্ড ক্লাস পাওয়াটাই কঠিন, ওর জন্য বাড়তি কিছু প্রয়োজন পড়ে। সেও তাই ইউনিভার্সিটিতে যেত, নেহায়েত বাধ্য না হলে ক্লাস করতো না। তবে সব সময়েই মনে হতো– এইতো কয়েকটা বছর আর। তারপর পাস করে বেরিয়ে গেলেই চাকরি, গোছানো জীবন। কিন্তু তেমন আর হলো কই। রেজাল্ট সে খারাপ করেনি, সেকেন্ড ক্লাসের ওপরের দিকে। সে এখন বোঝে, আরেকটু চেষ্টা করলে ফার্স্ট ক্লাসটা জুটলেও জুটতে পারতো। তবে তাতে কি অবস্থার খুব একটা হেরফের হতো? তার মনে হয়– না, হতো না। দুর্দান্ত রেজাল্ট করা কত ছেলেকে সে এখনো তার মতো রাস্তায় দেখছে। বাংলা ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া তার এক বন্ধু এখন এক ব্যাংকের জুনিয়র প্রশাসনিক অফিসার। আজব ব্যাপার। তবে বাংলা আর ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্ক আছে বৈকি। দুটোরই প্রথম অক্ষর 'ব'।

বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে জামিলের আবার মনে হয় আসলেও সেই দিনগুলো ভালো ছিল। ভালো ছিল– কারণ তখন আশা ছিল। মনে হতো পাস করে বেরুলেই চাকরি। এখন চাকরি খুঁজতে খুঁজতে সে হয়রান। তার চেয়ে এমন হতো, তার মনে হয়, ইউনিভার্সিটি জীবনই ফুরাতো না কোনো দিন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো এক চিরস্থায়ী সেশন-জট শুরু হতো। তাদেরও আর পাস করে বেরোতে হতো না, আশা ভঙ্গও ঘটতো না।

উঠে সে হাত-মুখ ধুয়ে নেয়। মা উঠেছে, নাশতার ব্যবস্থা হচ্ছে। আজকের ইন্টারভিউটা আরম্ভ হবে সকাল দশটায়। কিন্তু বাসে করে অনেকটা পথ যেতে হবে তাকে। আর আগের অভিজ্ঞতায় সে জানে, নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু আগে পৌঁছাতে না পারলে নানা ভোগান্তি। হয় বসার জায়গা পাওয়া যাবে না, না হয়... না হয় আরও কিছু, কিন্তু বসার জায়গা না পাওয়াটিই সবচেয়ে ভোগান্তি।

সে বেশ অনেকটা সময় নিয়েই বাড়ি থেকে বেরোয়। সময়মতো বাস পাওয়া তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে সে স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র বাস পেয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের এ ঘণ্টারও আগে পৌঁছায় সে। পৌঁছে বোকা বনে যায়। কোথায় ফাঁকা, যেমনটি মনে হয়েছিল পথে, তার আগেই পৌঁছে গেছে অনেকেই। সে বসার জায়গা পর্যন্ত পায় না। নিজের ওপর রাগ হয় তার। এবং এই রাগ এ সময় গিয়ে পড়ে অফিস কর্তৃপক্ষের ওপর। ব্যাটারা ইন্টারভিউ দিতে ডাকবে পাঁচশ' জনকে, অথচ বসার ব্যবস্থা করবে বিশ জনের।

মেজাজ তার তেতেই থাকে। সকালে নাশতা হয়নি। নাশতা ছিল মুড়ি ভাজা। সে দু'মুঠো মুড়ি আর এক চাপ চা খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। একটু পরেই সে বোঝে, উচিত হয়নি, মুড়িই খেয়ে আসা উচিত ছিল পেট পুরে। পেট ঠিক থাকলে মাথাও ঠাণ্ডা থাকে। গরম মাথায় তো আর ইন্টারভিউ দেওয়া যায় না। এখন পেটের ভেতর ভুটভাট, ফশ, পটপাট নানা রকম শব্দ হচ্ছে। এতে দাঁড়িয়ে থাকা, পেটের ভেতর

বিদঘুটে সব শব্দ, আর এত লোকের উপস্থিতি– সব মিলে তার মেজাজ বিগড়েই থাকে। পোস্ট সাতটা, অথচ লোকের ভিড় দেখে মনে হয়, বিশাল উৎসবের পূর্বপ্রস্তুতি চলছে।

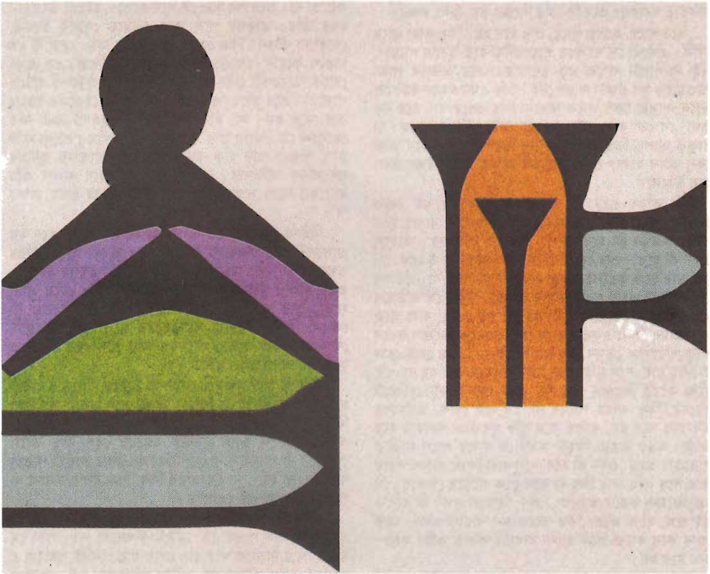
হ্যাঁ, উৎসবই বৈকি, 'আর আমিও এর মধ্যে আছি।' সে পকেটে হাত ঢোকায়। না, খুব বেশি টাকা নেই সঙ্গে। সে পাঁচটা টাকা এক কোণে ভাঁজ করে রেখে দেয়। বাকি সব টাকা খরচ করে কেনে সিগারেট, বিদেশি।

ফিরে এসে সে ঘরের ভেতর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। আয়েশী ভঙ্গিতে সিগারেট টানে আর এদিক-ওদিক তাকায়। সিগারেটে ক্ষিধেটা একটু মরে, আয়েশী ভাবটা বজায় থাকে। কিন্তু তা সামান্য সময়ের জন্য। মুখের ভেতরটা বিদেশি তামাকের ধোঁয়াও ক্রমশ বিস্বাদ-তেতো হয়ে ওঠে।

আজকে জড় করলে কেমন হতো? বেশ হতো, বেশ হতো, সে মাথা ঝাঁকায়। এবং প্রায় হঠাৎ করেই সে নিশ্চিত হয়ে যায়, না, এ চাকরিটাও তার হচ্ছে না। 'তবে আমি এসেছিলাম কেন? আমি কি ভেবে এসেছিলাম এ চাকরিটা আমার হচ্ছে?' সে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। সে শুধু মৃদু মাথা ঝাঁকায়, হয়তো ভেবেছিলাম– নইলে ইন্টারভিউ দিতে আসা কেন, কিংবা, হতো ভাবিনি– স্রেফ অভ্যেস বসে এসেছি। সে একটু একটু হাসে।

এটা তার তেরো নাম্বার ইন্টারভিউ।

আনলাকি থার্টিন! সে আবার একটু হাসে। গত প্রায় দেড় বছর তেরোটি ইন্টারভিউ হলে কত দিনে একটি হচ্ছে? সে হিসাব করে নেয়, চল্লিল-পঁয়তাল্লিশ দিনে একটা করে হচ্ছে।



আর লোকজনের ভাব-ভঙ্গি দেখে আবার তার মেজাজ বিগড়ে যায়। রিটেনে পাস করলেই বুঝি চাকরি পাওয়া যায়? তার ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে সব লোককে এ কথা বলে, 'আরে ধ্যাৎ, খামোখা এসেছেন ভাই, এসব ইন্টারভিউ-ফিউ কিছু না, লোক দেখানো, এরা লোক আগেই ঠিক করে রেখেছে। সুতরাং সবাই এক এক বাড়ি চলে যান, এখানে খামোকা সময় নষ্ট হবে।'

'হোক নষ্ট'– সে নিজেকে বলে, 'আমি ইন্টারভিউ না দিয়ে যাচ্ছি না।' সে ভিড়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরায়। ভিড়ের আর দেখেছি কী, সে নিজেকে বলে, আজ তো মাত্র প্রথম দিন। আরও দু'দিন ইন্টারভিউ হবে, সে জানে। তা, তিন দিনের সব লোককে

গ্যাপটা অনেক, তার মনে হয়। এমনও তো হতে পারতো– প্রতি তেরো দিন বিরতিতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা ইন্টারভিউ। তাহলে আমি কি যথেষ্ট সিরিয়াস নই? হিসাব মতো তাই তো দাঁড়ায়। এখন থেকে সংখ্যা বাড়াতে হবে, জামিল ঠিক করে। অবশ্য খুব একটা দোষ তাকে দেওয়া যাবে না, সিরিয়াস নয় সে– এমনও নয়। ইন্টারভিউয়ের সংখ্যা মাত্র তেরোটি হোক, এখানে ওখানে নানা রকম চেষ্টা সে তো চালিয়েই যাচ্ছে। বিভিন্ন জনকে বলে রাখা হয়েছে, সে মাঝে মাঝেই সেসব জায়গায় গিয়ে টোকা মারে। কখনো কখনো বন্ধুদের অফিসে যায়, পরোক্ষভাবে খবর নেয় ওসব অফিসে তেমন কোনো পোস্ট খালি আছে কি-না। থাকলে একটু ইঙ্গিত দেয় নিজের ব্যাপারে। অধিকাংশ বন্ধুই হ্যাঁ হ্যাঁ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

কিছুই হয় না। সে বন্ধুদের দোষ দেয় না। চাকরি অত সহজ নয় যে সদ্য কোনো অফিসে ঢোকা তার বন্ধুরাও তাকে নিয়ে নিতে পারবে। তবে চেষ্টা সে চালিয়েই যাচ্ছে। এখানে, ওখানে, এদিক-ওদিক খবর রাখছেই। এখন তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ ছাড়াই চাকরি হয়ে যায়, ত তারও যদি সে ভাবে হয়, তবে আর খামোখা ইন্টারভিউ দেওয়া কেন। ইন্টারভিউ শুধু সেখানেই দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে, যেখানে দিতেই হবে এবং চাকরিটা আকর্ষণীয়। এই আজ যেমন।

দুই

ইন্টারভিউ দিয়ে তার মন খারাপ হয়ে যায়। সবকিছুর পরও একটু তো আশা থাকেই। কখনো মনে হয়, এসব ইন্টারভিউ মানে লোক দেখানো ফার্স। কখনো মনে হয়, মাত্র ঐ ক'টা পোস্টের জন্য এত জনের ইন্টারভিউ দেওয়াটা হাস্যকর। কিন্তু আবার এমনও মনে হয়– হয়তো দারুণভাবে তাকেই পছন্দ করে বসলো কর্তৃপক্ষ, বলেই বসলো, 'হ্যাঁ, আপনার মতো লোকই খুঁজছিলাম।'

সে রকম অবশ্য কিছুই ঘটে না।

বরং ইন্টারভিউ দিয়ে একই সঙ্গে সে নিরাশ হয়, মেজাজও বিগড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। আজকের চাকরিটা সুপারভাইজারের। একটি বড় প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত তাদের শাখা অফিসের জন্য সুপারভাইজার নিয়োগ করবে। তা, সুপারভাইজার পদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটা অঙ্গরাজ্যের অন্তত তিরিশটির নাম এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট সে দেশের কততম প্রেসিডেন্ট– তা জানা কতটা সম্পর্কিত ও প্রাসঙ্গিক, তা সে বুঝতে পারে না। অথচ প্রশ্ন তাকে এ রকমই করা হয়। সে হতভম্বের মতো বসে থাকে। তিন-চারটে প্রশ্নের উত্তর দেয়। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত অমন অদ্ভুত প্রশ্নে এসে থেমে থাকে।

বেরিয়ে এসে তার মনে হয়, এরপর যে কোনো ইন্টারভিউ দিতে এলে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুলে খেয়ে আসবে। কারণ সে দেখছে, অমন প্রশ্নই বেশি আসে। তবে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কুলাবে তো? আরেকবার এক স্টোর কিপারের পদে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে সে 'ভারতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়', প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল। আরেকবার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, লেনিনের পর ক'জন নেতা সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের মধ্যে তার মতে কে সবচেয়ে যোগ্য এবং কেন। ওটাই ছিল প্রথম প্রশ্ন, সে উত্তর না দিতে পেরে বেরিয়ে এসেছিল।

এখন বেরিয়ে সে ঠিক করে, না শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হবে না। তাকে রাশিয়া এবং ভারত সম্পর্কেও জানতে হবে। পাশাপাশি ব্রিটেন সম্পর্কেও জেনে রাখা ভালো। কারণ বলা যায় না, এরপর হয়তো এমন প্রশ্ন আসবে, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লৌহমানবী মার্গারেট থ্যাচার কোনো কুকুর পোষেন কি-না, পুষলে কী তার নাম। এ বিষয়টি মনে হলে সে অবশ্য একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে। লৌহমানবীর কুকুরের খবর তো কোনো সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে? ব্রিটিশ কাউন্সিলে খবর নিতে হবে, সে ঠিক করে। হ্যাঁ, এখন থেকে শুধু বিদেশি দেশগুলো সম্পর্কে জানতে হবে, সব কিছু; নিজের দেশ সম্পর্কে কিংবা চাকরির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয় না জানলেও চলবে। ভালো তো, সে খুশি মনে হাসি মুখে মাথা নাড়ে। এই সুযোগে বিদেশি দেশগুলো সম্পর্কে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে।

এসব খুচরো ইয়ার্কি অবশ্য তার মন ভালো করতে পারে না। বরং চাকরিটা হবে না, হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই– এই দুঃখ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ফুটপাতে ঝা ঝা রোদের মধ্যে সে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ক্ষিদেটা বেশ জানান দিতে আরম্ভ করে এ সময়। কিন্তু পকেটে আছে সাকুল্যে পাঁচটি টাকা। তা দিয়ে হোটেলে খাওয়া যায় না। কিংবা কোনো মতে হয়তো যায়, দুটো পরোটা আর কিছু ভাজি। কিন্তু তারপর তো পকেটে আর কিছু থাকবে না। আজ না হয় হেঁটে বাড়ি ফিরে যাবে, কাল বেরোবে কী করে? সুতরাং খাওয়ার চিন্তা সে বাদ দিল।

এমন একটা বিচ্ছিরি, মেজাজ খারাপ করা ইন্টারভিউয়ের পরপরই তার বাড়ি ফিরে যেতেও ইচ্ছে করে না। কোনো বন্ধুর অফিসে যেতেও লজ্জা লাগে তার। হয়তো কিছুই মনে করবে না কোনো বন্ধুই, বরং এক কাপ চা আর একটা কি দুটো শিঙাড়া হয়তো খাওয়াবে। কিন্তু যদি কথায় কথায় ইন্টারভিউয়ের প্রসঙ্গ ওঠে, এই ভেবে সে শঙ্কা বোধ করে, বন্ধুদের মুখোমুখি হতে লজ্জা লাগে তার। সুতরাং সে ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং এক সময় হাঁটতে আরম্ভ করে। উদ্দেশ্যহীন হাঁটা, কোনো গন্তব্য নেই, তবে এভাবে কিছু সময় কাটবে বৈকি।

এভাবে অবশ্য বেশি সময় কাটে না। এক সময় সে রাস্তা পেরুনোর জন্য থামে। তখন খুব হঠাৎ করেই তার পাশে বিশাল এক গাড়ি এসে থামে। সে প্রথমে মনে করে অন্য কোনো কারণে থেমেছে। কিন্তু যে ভাবে, তার পথ আগলে থেমেছে তাতে সে একটু অবাক হয়েই তাকায়। দেখে গাড়ির জানালায় এক অচেনা লোকের হাসি হাসি মুখ। তার দিকেই তাকিয়ে আছে সে লোক। জামিল আরও অবাক হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে চায়। আর তখনই সে চিনতে পারে লোকটাকে। বিডি, বাবার ফুপাতো ভাই। না চেনার কারণ আছে বৈকি। বছর তিনেক পর দেখা। আর এ তিন বছরে লোকটার জেল্লা আর চেকনাই আরও অনেক বেড়েছে। গাড়িটাও নতুন, গতবার জামিল যখন দেখেছিল তখন অন্য মডেলের ছোট গাড়ি ছিল।

বিডি এবার তার দিকে দাঁত মেলে হাসে, 'চিনতে পারিস নি বুঝি? তা, এই দুপুর বেলা এমন হনহন করে কোথায় যাচ্ছিস?'

তিন বছর পর দেখা, তা ছাড়া আগেও তেমন ঘন ঘন দেখা হয়নি, তবু পেছন থেকে দেখে লোকটা তাকে চিনতে পেরেছে বলে জামিল অবাক হয়। তবে সে বিরক্তও হয়। এই অসময়ে এ লোক কেন! তার তো কথা বলার কোনো ইচ্ছাই নেই এ লোকের সঙ্গে। এমনিতেও পছন্দ নয়, বরং অপছন্দই লোকটাকে, তার ওপর জেল্লা আর গাড়ির বাহার দেখে জামিলের মেজাজ আরও বিগড়ে গেছে। সে জোর করে একটু হাসি ফোটায় মুখে, 'না, চিনেছি। চিনবো না কেন?'

: তা, হনহন করে যাচ্ছিসটা কোথায়? জিজ্ঞেস করলাম না?

'এই তো, তেমন কোথাও না'– জামিল নিতান্তই হেলাফেলায় বলে।

'তবে আয়, ওঠ।' বিডি গাড়ির দরোজা খুলে দেয়।

'কোথায়?' জামিল অবাক চোখে জিজ্ঞেস করে। লোকটা তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? আর লোকটা বললেই সেই-বা যাবে কেন!

'কোথায় আর'– বিডি এবার তাকে একটু ধমকায়, 'সে জেনে তুই কী করবি, আমি বলছি তুই ওঠ।'

জামিল পা বাড়ায় না।

আমার কথা তোর বুঝি কানে যাচ্ছে না?

জামিল ইতস্তত করে।

তাই দেখে বিডি হাসে, 'আজকালকার ছেলেরা বড় বেশি বেয়াদব হয়ে গেছে। একজন মুরুব্বি বলছে তার সঙ্গে একটু যেতে আর ছেলে কি-না ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।'

জামিল ভেতরে ভেতরে খুব অবাক হয়। গত তিন বছরে বিডির গলার আওয়াজ আরও জমকালো হয়েছে মনে হচ্ছে। আর বেশ কর্তৃত্বের ছাপ সে আওয়াজে। না করা যায় না। জামিল গাড়িতে উঠতে উঠতে বলে, 'কিন্তু কোথায় যাব সেটা বলবেন তো?'

'বলবোই তো'– বিডি সিটে হেলান দিয়ে আয়েশ করে সিগারেট ধরায়– 'জরুরি দরকার, সেই কত দিন পর যে তোর সঙ্গে দেখা হলো।... আর আমিও এমন ব্যস্ত থাকি যে...।'

জরুরি দরকার অবশ্য কিছু না। বিডি জামিলকে তার অফিসে নিয়ে যায়। দামি কেক আর ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়ায়। এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে। তার প্রায় সবই জামিলের বাবা-মা, ভাই-বোন সম্পর্কে। জামিলের ব্যাপারেও জানতে চায়। বলবে না বলবে না করেও সে হঠাৎ করেই বলে ফেলে ইন্টারভিউর কথা। শুনে বিডি অবশ্য কোনো মন্তব্য করে না, শুধু একটু হাসে। সেখানে ঘণ্টাখানেক সময় কাটে জামিলের। সে ওঠার সময় বিডি বলে, কয়েক দিনের মধ্যেই সে জামিলের বাসায় যাবে। জানায়, প্রায়ই তাদের কথা মনে হয় তার, প্রায়ই যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এত ব্যস্ততা, সময় হয় না... তবে এবার সে যাবে বৈকি।

বিডির অফিস থেকে বেরিয়ে জামিল যায় আরেক বন্ধুর অফিসে। কোনো বন্ধুর অফিসে যাওয়ার ব্যাপারে ঘণ্টা খানেক আগেও যে লজ্জাটা ছিল, ততক্ষণে সেটা ক্ষয়ে গেছে। ঐ বন্ধুর অফিসে ছিল আরও দু'জন পুরনো বন্ধু। তারা চারজন চুটিয়ে আড্ডা দেয় বেশ কিছুক্ষণ। তারপর জামিল বাড়ি ফেরার জন্য ওঠে। কিন্তু বাড়ি ফিরে তো ঐ অবস্থা।

এখন, চা খেয়ে কিছুটা সময় চুপচাপ বসে থাকার পর তার মনে হয়, বাবাকে বিডির খবরটা দিতে হয়। তা ছাড়া বাবার সঙ্গে এমনিতেও এখন বোধ হয় একটু কথাবার্তা বলা উচিত। তখন বড় বেশি গা-ছাড়া ভাব দেখিয়েছে সে। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক তার অমন নয়, উচিত হয়নি।

তবে বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে তার আবার মনে পড়ে যায় সে ফেরা মাত্র বাবার ঐ প্রশ্ন 'হবে না, না?' জামিল বোঝে না, হঠাৎ এতটা নিরাশ হয়ে পড়লেন কেন বাবা। চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই শুনে কেন বললেন 'এখন কী হবে?' কিছু হওয়া না–হওয়ার প্রশ্ন, এই তো সেদিনও ছিল না। আর বাবার চরিত্রের সঙ্গে এমনটা কখনো মানায় না। কারণ সবকিছুর পরও বাবার আশা যথেষ্ট, কখনো সাহস কিংবা ভরসা হারান না, বরং বিশ্বাস করেন অবস্থা বদলাবেই। তবে আজ কেন হঠাৎ করে অমন! জামিল ভেবে পায় না। শেষে তার মনে হয়, হয়তো এ রকমই হয়। যারা খুব আশাবাদী, তারা বোধহয় একদিন এভাবেই ভেঙে পড়ে। আর যখন ভেঙে পড়ে, ভেঙেই পড়ে, নিজেও বোঝে না।

খালি চায়ের কাপটা নিয়ে যাওয়ার জন্য জামিল ছোট বোনকে ডাকে না। সে নিজেই সেটা রেখে আসে রান্নাঘরে। বারান্দায় যাওয়ার আগে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ড্রইংরুমে।

বারান্দায় বাবা তখনো আগের মতো বসে। বিকেল প্রায় ফুরিয়েছে। চারদিকে এলায়িত ভঙ্গিতে একটু একটু করে সন্ধ্যা নামছে। জামিল বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আড়মোড়া ভাঙে। এদিক ওদিক তাকায়, দাঁতে নোখ খোঁটে। কী করে আরম্ভ করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। যেন সকালের পর এই প্রথম বাবার সঙ্গে দেখা হলো, এই রকম একটা সহজ-স্বাভাবিক ভাব চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলতে চায়। তারপর খুব হঠাৎ করেই বাবার মুখোমুখি হয় সে, 'আজ দুপুরে বিডি চাচার সঙ্গে দেখা হলো।'

বাবা অন্যমনস্ক ছিলেন, ঠিক বুঝতে পারেন না, জামিলের দিকে ফিরে বলেন, 'কিছু বললি?'

: হ্যাঁ, বিডি চাচার সঙ্গে দেখা হলো আজ।

বাবা এবারও ধরতে পারেন না, 'কার সঙ্গে দেখা হলো?'

: বিডি, বিডি চাচা, ঐ যে তোমার ফুপাতো ভাই।

বাবা বেশ অনেকটা সময় কিছুই বলেন না। যেন তিনি শুনতেই পাননি জামিলের কথা। তিনি একদৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, কিছুক্ষণ উদাসীন চোখে আকাশ দেখেন। জামিলের দিকে ফিরে বলেন, 'ও লোকটা তোর চাচা হলো কবে থেকে?'

জামিল একটু হাসে, 'সম্পর্কে লোকটা তোমার ফুপাতো ভাই-ই হয় বাবা। ... তোমাদের সম্পর্ক যতই খারাপ হোক না কেন, লোকটার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। তুমি অস্বীকার করলেও লোকটা তোমার ফুপাতো ভাই-ই থেকে যাবে।'

বাবাও একটু হাসেন, 'তুই বলছিস আমার সঙ্গে বিডির সম্পর্ক যত খারাপই হোক না কেন, লোকটা আমার ভাই-ই, বেশ। তোর সঙ্গে লোকটার সম্পর্ক কি ভালো?'

না, তাও নয়। সে প্রশ্নও ওঠে না। সম্ভাবনাই নেই কোনো। ...আমি শুধু বলছি আত্মীয়তার দিক দিয়ে লোকটা যখন তোমার ভাই, তখন আমার চাচা-ই। সে আমাদের সম্পর্ক যাই হোক না কেন, ও ব্যাপারটা তো তুমি আর অস্বীকার করতে পারবে না।

বাবা মাথা নাড়েন, 'না, আমি ঠিক সেভাবে বলিনি; ... আসলে লোকটা সম্পর্কে আমার ভাই– এটাই আমার সহ্য হয় না।'

বুঝতে পারছি।... কিন্তু কত কী আমরা এখন সহ্য করে যাচ্ছি।

তবু। ... বিডির ব্যাপার ভিন্ন।

তাও অবশ্য ঠিক।

বাবা এবার একটু হাসেন, 'তা কোথায় দেখা হলো তোর সঙ্গে?'

রাস্তায়। ইন্টারভিউয়ের পর আমি এক বন্ধুর অফিসে যাচ্ছিলাম হাঁটতে হাঁটতে। তখন দেখা।

তুই দেখলি?

না, হাঁটছি, হঠাৎ পেছনে গাড়ি এসে থামলো। তাকিয়ে দেখি উনি। প্রথমে অবশ্য চিনতে পারিনি। আমাকে দেখেই চিনেছেন। খুব ভালো মেমোরি।

হুঁ।

আমাকে জোর করে গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন।

'তুই গেলি ওর সঙ্গে! কোথায়?' বাবা এবার অবাক হয়ে জামিলের দিকে তাকান।

আমি আর গেলাম কোথায়, বললাম না জোর করে উঠিয়ে নিলেন।

বাবা এবার একটু হাসেন, 'মনে হচ্ছে, দুপুর বেলা বিডি তোকে রাস্তা থেকে হাইজ্যাক করেছিল।'

জামিলও একটু হাসে, 'না, ঠিক তা নয় বাবা। লোকটার গলায় কেমন কর্তৃত্বের সুর, একটা হুকুমদারি ভাব, কি হেলাফেলায় কথা বলে।... আর আমারও কৌতূহল হলো।'

কোথায় নিয়ে গেল তোকে?

ওনার অফিসে।

বাবা আর কিছু জিজ্ঞেস করেন না। জামিলই একটু পর

বলে, 'আমার মনে হয় উনি আমাকে তার অবস্থা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। খুব রমরমা কি-না।'

'তাই!' বাবার গলায় বিস্ময় নেই, কৌতূহলও না, স্রেফ ছোট করে জিজ্ঞেস করেন। জামিল বাবার মুখের দিকে তাকায়। গলার আওয়াজের মতো বাবার মুখও ভাবলেশহীন কি-না, তা এই প্রায় অন্ধকারে বোঝা যায় না। সে বলে, 'হ্যাঁ। তিন বছর আগে একবার দেখেছিলাম। তার চেয়ে অবস্থা এখন আরও অনেক ভালো মনে হলো। গাড়িটাও নতুন, বিশাল, লেটেস্ট মডেলের। অফিসও সে রকম। তবে অফিসটা ঠিক কী ধরনের, অর্থাৎ ওখানে কী কাজ তা বুঝতে পারলাম না। স্টাফও খুব কম।'

বাবা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলেন। পাশাপাশি নিঃশব্দ এক চিলতে হাসিও ফুটে ওঠে তার মুখে, 'বেশ।... বিডি একাত্তরে কী করতো জানিস?'

জামিল আবার বাবার দিকে ফেরে। অন্ধকার নেমে পড়েছে, বাবাকে দেখা যায় না তেমন, শুধু তার কাঠামো টের পাওয়া যায়। জামিলের মনে হয়, অদৃশ্য, অলৌকিক কোনো স্থান থেকে ছুটে এসেছে এই প্রশ্ন। কারণ একাত্তরে কে কী করতো জাতীয় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না অনেক দিন। সে অবশ্য জবাব দিতে ইতস্তত করে না। অন্ধকারে প্রায় মিশে যাওয়া বাবার কাঠামোর দিকে তাকায়, বলে, 'রাজাকার ছিল বাবা। পাকিস্তানিদের দালাল। তুমি বলেছ।'

'শুধু দালাল'- বাবার আরেকটা বড় নিঃশ্বাস বাতাসে মিশে যায়, 'শুধু কি দালাল। ওতো একটা জানোয়ার ছিল। ওর কুকীর্তি বলে শেষ করা যাবে না...।'

'জানি বাবা'- জামিল স্থির গলায় বলে, 'তুমিই বলেছ। জঘন্য সব ব্যাপার...।'

'আর দেশ যখন স্বাধীন হলো'- বাবা বলেন, 'তার মাস দুই পরই ও লুকিয়ে দেখা করতে এসেছিল। এসে আমার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিল। কাঁদছিল তখন। বার বার বলছিল যা করেছে ভুল করেছে, ভুল তো মানুষই করে, বলছিল- ওর প্রাণ বাঁচানোর ব্যবস্থা যেন করে দেই।... তখন শুধু ওর আমার পায়ে ধরা বাকি...।'

জানি বাবা, তুমি বলেছ। তখন তো ওদের ওরকম অবস্থাই। কেউ কেউ তো জানেই মারা গিয়েছিল। অধিকাংশই অবশ্য যায়নি, যারা যায়নি তারা...।

হ্যাঁ, যারা যায়নি তারা...।

হ্যাঁ, তাদের কথাই বাবা। এই যেমন ধর বিডি চাচা... তুমি কি ওনার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলে? ক্ষমা করে দিয়েছিলে ওনাকে?

বাবা চুপ করে থাকেন।

বলছো না যে বাবা, ক্ষমা করে দিয়েছিলে?... কী জন্য? মহৎ হওয়ার জন্যে, না ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে?

বাবা বোধহয় হাসেন, অন্ধকারে সে হাসি দেখা যায় না, সামান্য শব্দ পাওয়া যায়, 'আমি ক্ষমা করার কে! যারা ক্ষমা করে দেওয়ার মালিক, তারাই দিয়েছিল। তাদেরও তো ভাই-বেরাদার, মন-মানসিকতায়ও বড় মিল। ...তুই আমার কথা বলছিস! আমার মতো চুনোপুঁটি লোক ক্ষমা করে দেওয়ার কে! ...আমার এখন শুধু মনে হয়, আমারই ভুল হয়েছে, আমারই সেদিন ওকে খুন করা উচিত ছিল।'

কেন বাবা, এখন কেন মনে হয়?

জামিল জিজ্ঞেস করে। পরক্ষণেই সে বোঝে, আসলে এ কথাটা তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। এমন কোনো প্রশ্ন বাবাকে সে করতে চায়নি। সে তখনই কথা ঘোরায়, 'বিডি সাহেব আমাদের সবার খুব খোঁজ-খবর নিলেন।'

বাবা কিছু বলেন না।

জামিল একটুক্ষণ থেমে থেমে বলে, 'বললেন অনেক দিন আসেন না। তবে প্রায় নাকি আমাদের কথা তার মনে হয়। ... আসার সময় পান না। ভীষণ ব্যস্ত থাকেন। তবে সময় করে কয়েক দিনের মধ্যেই চলে আসবেন বললেন।'

'ওর আসার কী দরকার'- বাবার গলা গম্ভীর শোনায়, 'আমরা তো বলিনি।'

সে আমি কী করে বলি। আসতে যদি কেউ চায় তবে তো আর মুখের ওপর না করা যায় না। ... তা ছাড়া এর আগেও তো বেশ কয়েকবার এসেছেন।'

তা অবশ্য এসেছে।

তখন তুমিও কথা বলেছ। কেউ এলে তো আর চুপ করে থাকা যায় না, অভদ্রতা। কিছু না কিছু কথা বলতেই হয়।

জামিলের মনে হয় বাবা সজোরে মাথা নাড়েন, 'না, ওর ব্যাপারে কথা না বলাটা অভদ্রতা নয়। ওর সঙ্গে ভদ্রতা-অভদ্রতার প্রশ্নই ওঠে না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি কারণ না বললে সেটা অভিমানের মতো দেখাবে। ...অভিমান করে কাপুরুষ।'

জামিল মাথা দোলায়, সে বুঝেছে। কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। বাবার চারপাশে একবার ঘুরে ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায়, বলে, 'তুমি খুব সাহসী যোদ্ধা ছিলে, না বাবা?'

অন্ধকারে বাবার মুখ দেখা যায় না। নিস্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত পর বাবা হালকা গলায় বলেন, 'আজ খুব মশা, কামড়াচ্ছে। ধরতো আমাকে, ঘরে যাই, একা পারবো না, ব্যথাটা বেড়েছে।'

রাতে খাওয়ার টেবিলে কথাটা ওঠায় জামিল।

ছোট ভাইবোন দুটো আগে খেয়ে নিয়েছে। জামিল আর বাবার খাওয়া শেষ হলে বসবে মা। কীভাবে আরম্ভ করবে, জামিল মনস্থির করতে পারে না। সে মুখ নিচু করে খেয়ে যায়, আড় চোখে বাবাকে লক্ষ্য করে।

তারপর হঠাৎ খামোখাই কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়। 'বাবা'- বলে সে একটু ক্ষণ থেমে থাকে, 'আজ কি কোনো কারণে তোমার খুব মন খারাপ?'

বাবা প্রথমটায় বুঝতে পারেন না। জামিলের দিকে চোখ তুলে তাকান।

জামিল আবার বলে, 'কোনো কারণে তোমার মন বোধহয় আজ ভালো নেই বাবা।'

'কে বললো'- বাবা অবাক হয়ে যান, 'কই, তেমন কিছু ঘটেনি তো।'

জামিল চুপ করে থাকে।

বাবাও, তারপর হঠাৎ বোধহয় তার খেয়াল হয়, 'হঠাৎ এ কথা বলছিস যে!'

একটু হাসে জামিল, 'না, এই এমনি।'

এমনি নিশ্চয় না। কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারছি।

বলবে কী বলবে না, জামিল ভাবে। কথা যখন উঠেই গেছে, তখন বলে ফেলাই ভালো, তার মনে হয়। সে তবু একটু ইতস্তত করে, 'না বাবা, মানে আমি যখন বিকেলে ফির-লাম, তুমি জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়েছে ইন্টারভিউ, চাকরিটা হবে কি-না, এসব। ...কিন্তু চাকরিটা হবে না শুনে তুমি এমন আঁতকে উঠলে, এমন ভাবে বললে, 'তাহলে এখন কী হবে'! ... তুমি তো কখনো ওভাবে কথা বল না, তাই আমি খুব অবাক হয়েছি, হঠাৎ কোনো কারণে তোমার কি মন খারাপ হয়ে আছে?'

বাবা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। এমন ভাব করেন



যেন ব্যাপারটাকে তিনি গুরুত্বই দিচ্ছেন না। কিন্তু জামিল বোঝে, বাবা ভেতরে ভেতরে ভাবছেন। সে অপলক তাকিয়ে থাকে বাবার দিকে।

বাবা এক সময় একটু হাসেন, 'ধ্যাৎ, আমি ওভাবে বলেছি নাকি!'

'হ্যাঁ বাবা, ওভাবেই।' জামিলও একটু হাসে।

কে জানে, মনটা বোধহয় খারাপ ছিল।

কেন মন খারাপ? সেটাই তো আমি জানতে চাচ্ছি।

না না, কোনো কারণ নেই।

এমনিতেই মন খারাপ হয় না তুমি কখনো অমনভাবে কথা বল না– জামিল আবার বলে, ঠাণ্ডা গলায়।

তা হয়তো। কিন্তু আসলে সত্যিই তেমন কোনো ব্যাপার নয় রে।... হঠাৎ করে মানুষ কেমন যেন হয়ে যায় না– সে রকম কিছু ঘটেছিল বোধহয়।

জামিল বলে, 'তুমি তো ঠিক সেরকম মানুষ নও। তোমার মনের জোর অনেক বেশি।'

'তা বুঝলাম। কিন্তু বললাম না– হঠাৎ করে...। কই, তারপর তো আর তেমনভাবে তোর সঙ্গে কথা বলিনি।'

জামিল হেসে মাথা নাড়ে, 'তা অবশ্য বলনি। কিন্তু সেই যে তখন খটকা লাগলো...।'

'ক'দিন হলো শরীরটাও ভালো না। আর শরীর ভালো না থাকলে মনও ভালো থাকে না'– বাবা বলেন, 'সে জন্যেই বোধ হয়।'

ব্যথাটা বেড়েছে?

হ্যাঁ।

বাবার খাওয়া শেষ। তবু কিছুক্ষণ বসে থাকেন। তারপর উঠতে উঠতে জামিলের দিকে তাকিয়ে হাসেন, 'তা সত্যি কথা বলতে কি, চাকরি তো তোর একটা সত্যিই দরকার।'

জামিল অপ্রস্তুত হয়ে যায়। সে ভাবেনি হঠাৎ করে বাবা এভাবে বলবেন। সে বোকার মতো বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, বাবা, তা তো দরকার, সত্যিই দরকার।... আমি তো চেষ্টা করছি বাবা।'

বাবা হেসে ফেলেন, 'আরে আরে, এত সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই। আর ভাবিস না আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। তুই চেষ্টা চালিয়ে যা, হবে নিশ্চয়।'

বাবা হাত ধুতে চলে যান। জামিল একটু স্বস্তি বোধ করে, বাবার গলায় আবার সেই আগের শক্তি। আর তাকে বাবা দোষ দিচ্ছে না কোনো। জামিল ক্রমশ সহজ হয়ে ওঠে।

রাতে অবশ্য তার ঘুম হয় না। সে অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। শেষে উঠে বারান্দায় আসে। সিগারেট ধরিয়ে বসে থাকে। গরমকাল প্রায় এসে গেছে, তাও রাতের দিকে এখনো একটু শীত শীত। জামিল একবার ভাবে ঘর থেকে চাদর নিয়ে আসবে। কিন্তু ওঠার ইচ্ছেটুকু তার করে না।

সিগারেট শেষ হলে সে নিথর বসে থাকে। খাবার টেবিলে শেষ দিকে সে যেমন সহজ হয়ে উঠেছিল, এখন সে অবস্থা নেই। তার অস্বস্তি লাগছে। বাবার শেষ দিককার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বারবার। বাবা বলেছে, 'চাকরি তো একটা সত্যিই দরকার।' হ্যাঁ, সত্যিই দরকার, জামিলও জানে, কোনোই সন্দেহ নেই এতে। আর দরকারটা ইদানীংকার নয়। আমার তো উচিত ছিল ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ই কোনো চাকরিতে ঢুকে পড়া, জামিল মনে মনে বলে। কিন্তু সে রকম কিছু তো হয়ইনি, পাস করার পর দেড় বছর চলে গেল, এখনো কিছু হলো না।

বসে থাকতে থাকতে জামিলের হঠাৎ খুব কান্না পায়। এ



রকম কান্না প্রায় পায় তার। কিন্তু কেউ দেখে ফেলবে বলে খুব কষ্টে সে চেপে রাখে। কিন্তু এখন রাত, কারও দেখে ফেলার সম্ভাবনা নেই, এখন কাঁদা যায়। জামিল সত্যি সত্যি কাঁদতে আরম্ভ করে। নানা বিষয়ে এসে তার চোখের সামনে জট পাকিয়ে থাকে। সকালের ইন্টারভিউ, বিডির গাড়ি আর অফিস, বাবার অসহায় মুখ– এসব একটাও তার চোখের সামনে থেকে সরে না।

এক সময় বাবার ওপরেই রাগ হয় তার। হ্যাঁ, বাবার দোষ আছে বৈকি। আমাকে লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছে, জামিল বলে। তার চেয়ে হতো গড়পড়তা, চাকরির জন্য প্রতি দিন খোঁচা তো, কখনো কখনো লজ্জায় ফেলতো, তবে ভালো হতো।

ভালো হতো কি? জামিল আবার ভাবে। শেষে সে মাথা নাড়ে, না, ভালো হতো না, কারণ বাবা যদি অমন হতো তবে বাড়তি চাপ পড়তো তার ওপর। এমন তো নয় যে সে খুব নিশ্চিন্ত মনে আছে কিংবা সংসারের প্রতি কোনো নজর নেই তার। বরং কখনো কিছু বলে না বলে সে-ই ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে আছে; লজ্জায় আছে। আর সে সচেতন, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে, সংসারের প্রতি কর্তব্যের ব্যাপারে।

কিন্তু শুধু দায়িত্ব বা কর্তব্য বোধ দিয়ে কিছু হয় না। জামিল বোঝে, দায়িত্ব বোধ থাকলেই দায়িত্ব পালন করা যায় না। তার জন্য আরও কিছু চাই। কী চাই আরও? যেমন আপাতত একটা চাকরি। এটাই দরকার, একটা চাকরি, তাহলে বহু সমস্যার সহজ সমাধান খুব সহজেই ঘটে যাবে। কিংবা একটা ব্যবসা যদি করা যেত, জামিল এক সময় ভাবে।

ব্যবসার কথা আগেও ভাবেনি, এমন নয়। কিন্তু ভেবেই বা কী, কিছু অলস সময় কাটানো ছাড়া? টুকটাক চেষ্টাও অবশ্য সে করেছে। এই যেমন, টিপসের জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছে দৌড়াদৌড়ি। কিন্তু শুধু দৌড়ে কি কিছু হয়! বন্ধুরা বলেছে, 'পয়সা বানাতে হলে পয়সা লাগে।' এরপর বলতে পারতো, 'আছে তোর?' বলেনি, কিন্তু পয়সা তো সত্যিই নেই তার। এক বন্ধু অবশ্য আভাসে বলেছিল, হাতে কোনো পয়সা না থাকলেও চলে। কানেকশন ভালো হলেও ব্যবসা করা যায়। স্রেফ নিজের আত্মীয়-স্বজনের নাম ব্যবহার করে। কিন্তু সেটাই বা জামিলের কোথায়। তেমন আত্মীয়-স্বজন থাকলে ব্যবসা না হোক, একটা চাকরি নিশ্চয় এতদিনে হয়ে যেত।

একবার জামিলের মনে হয়েছে, খুব ছোট থেকে আরম্ভ করবে সে। একদম ছোটখাটো কিছু, যেখানে মূলধন লাগবে খুব কম। বিদেশে ওভাবেই নাকি অনেকে কোটিপতি হয়ে গেছে। শুধু বিদেশে কেন, এদেশের অনেকের কথাও জানে সে। কে নাকি ভাঙা স্যুটকেস নিয়ে আর ছেঁড়া পায়জামা পরে ঢাকা এসে কয়েক বছরের মধ্যে নিজেই ব্যাংকের মালিক হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী বন্ধুদের জামিল কথায় কথায় সে লোকের কথা জানালে, তারা হেসেছে। বলেছে, 'তোর হবে না, তোর হবে না জামিল, ব্যবসা সবাইকে দিয়ে হয় না।' ব্যবসার জন্যও নাকি মানসিকতা লাগে, টাকা বানাতে হলে মনের ছাঁচ হতে হয় অন্যরকম, আর মনের জোরও থাকতে হয় প্রচুর, জামিলের নাকি তা নেই।

বন্ধুদের কথায় হতাশ হলেও সে অবশ্য ভেঙে পড়েনি। একবার ভেবেছে বাদাম বিক্রি করতে বসে যাবে। বাদাম বিক্রি করে বড়লোক হয়ে বন্ধুদের দেখিয়ে দেবে। এ রকম অনেক ঘটনাই তার জানা। ফকিরি অবস্থা থেকে রাজা-বাদশাহর পর্যায়ে চলে গেছে। কিন্তু পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে গিয়ে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কেউ কেউ খুব ছোট অবস্থা থেকে বিশাল ধনী লোক হয়ে যায় বৈকি। কিন্তু বাকিরা? সবাই তো আর হয় না। অধিকাংশই তো সারা জীবন বাদাম

বিক্রি জাতীয় কিছু করে যায়। জামিলের অবস্থাও যদি তেমন হয়, সারা জীবন? সে ভয়ে সিটিয়ে গেছে। তা ছাড়া বাদাম বিক্রি না হোক, এ ধরনের কোনো ছোটখাটো কাজ করার ইচ্ছা শেষ মুহূর্তে মধ্যবিত্ত মন বাধা দিয়েছে।

এখন এই মাঝরাতে ওসব ভাবতে ইচ্ছে করে না জামিলের। সে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে উদাসীন চোখে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। কিন্তু ক্রমশ টের পায় ঐ ভাবনাগুলো আবার ফিরে আসছে। এড়ানো যাবে না ওসব, সে মনে মনে বলে, ওসব কিছুই এড়ানো যাবে না, যতদিন না সমাধান কোনো ঘটছে। সে পরিশ্রান্ত গলায় বলে, 'সমাধান তো চাকরি, ... একটা চাকরির যে কী নিদারুণ প্রয়োজন, অথচ সেটা জোটানো কী যে কঠিন!'

তিন

মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাবা অক্ষত শরীরে ফিরে আসেননি, কোমরের কাছে একটা গুলি লেগেছিল যুদ্ধের শেষ দিকে। ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকার মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় ফিরে এলেও বাবা ফেরেননি। জামিলরাও অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় বলতে গেলে ছিলই না। এপ্রিলে তারা চলে যায় গ্রামের বাড়ি। দাদা তখনো বেঁচে। তাদের দাদার কাছে রেখে বাবা চলে যান সীমান্ত পেরিয়ে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে।

এরপর বার দুই বাবা এসে দেখা করে গেছে তাদের সঙ্গে। দেখা অবশ্য জামিলের সঙ্গে হয়নি। জামিল পরে শুনেছে। বা মাঝ রাতে এসে মা আর দাদার সঙ্গে কথা বলে চলে যেত। তাদের দেখে যেত। জামিলের তখন বয়স আট, পরের বোনটার দেড় বছর আর ছোট ভাইটা মাত্র হয়েছে, কোলের। বাবা শেষবার এসেছিল সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে। তারপর তার কোনো খোঁজ নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'দিন পরই তারা চলে আসে ঢাকায়। জামিলের দাদা আসেন সঙ্গে। তাদের ধারণা ছিল ফিরে এসে বাবাকে দেখবে বাসায়। কিন্তু না, বাসা সেই আগের মতো তালাবদ্ধ।

মা এ সময় চিন্তিত হয়ে পড়েন, দাদাও; বয়স তখন কম হলেও জামিলের সব কিছু মনে আছে। তখন, প্রথম কয়েক দিন কী যে ছোটাছুটি গিয়েছিল মা আর দাদার! কিন্তু নির্দিষ্ট করে তো জানাও ছিল না কিছু। সুতরাং এক অর্থে খামোখাই ছোটাছুটি। এর কাছে যাওয়া ওর কাছে যাওয়া। কিন্তু কোথাও কোনো খবর পাওয়া যায় না। আর মা কিংবা দাদা কেউই তেমন চটপটে নয়, তারা দু'জনেই তিন/চার দিন পর একদম ভেঙে পড়েন— জামিলের বাবা বুঝি আর ফিরে আসবে না।

এমন সময়ে এক অচেনা লোক দেখা করতে আসেন তাদের সঙ্গে। প্রথমে মায়ের খোঁজ করেন। দাদাই প্রথমে বের হন, তার পেছনে মা। লোকটি নিজের পরিচয় দেন, জামিলের বাবা আর তিনি একসঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এ তো এক লাইনের পরিচয়, তারপরই আসল কথাটা, 'একটা খারাপ খবর আছে।'

সে কথা শুনে মা আর দাদা দু'জনে একসঙ্গে কেঁদে ওঠেন।

'অবশ্য সেরে উঠবেন তিনি'— লোকটি বলেন, 'তবে আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।'

সেই লোকের মুখেই সব খবর পাওয়া যায়। একসঙ্গে যুদ্ধ করেছেন তারা অনেক দিন। বাবা যেদিন আহত হন সেদিনও সে লোক মুস্তাফিজ সাহেব, পাশে ছিলেন। বাবার সেরে উঠতে হয়তো সপ্তাহ দুয়েক লাগবে।

সেদিন তাদের বাড়িতে হঠাৎ উৎসব আরম্ভ হয়ে যায়। মা আর দাদার প্রবল চাপে মুস্তাফিজ সাহেব বলতে বাধ্য হন, রাতে তিনি খেয়ে তারপর যাবেন। দাদা তখনই বাজার করতে ছোটেন। আশপাশের বাড়ির অনেকেই কেমন করে যেন টের পেয়ে যায়। তারা এক এক করে এসে হাজির হয়। জামিলদের ছোট ড্রইংরুমে আর জায়গা হয় না, সবারই একই ইচ্ছা, মুস্তাফিজ সাহেবের মুখে তারা মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী শুনবে।

আর মুস্তাফিজ সাহেব বলতেও পারেন বটে। লোকজন সব মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে। আর মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সময়ের বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসে জামিলের বাবার অসাধারণ বীরত্বের কাহিনী। পাড়া-প্রতিবেশীরা শোনে আর বারবার জামিলের মা আর দাদার দিকে তাকায়। কেউ কেউ বলে, জামিলের বাবা যে এমন সাহসী লোক, তা তারা জানতোই, হাঁটাচলা দেখেই বোঝা যেত। আবার কেউ কেউ একই ঘটনা আবার নতুন করে জানতে চায়। সতের বছর আগের কথা, কিন্তু জামিলের এখনো স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন বহু রাত পর্যন্ত তাদের পুরো বাড়ি চাঁদের আলোয় ভরে ছিল।

শুধু মুস্তাফিজ সাহেবের মুখের কথা নয়, দিন কয়েক পরেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাবার অসীম বীরত্বের কাহিনী প্রকাশিত হয়। দুটো পত্রিকায় বাবার ছবিও ছাপা হয়েছে। যুদ্ধের সাজে মুক্তিযুদ্ধের সময় তোলা ছবি। সে ছবি দেখে মা আর দাদা হাসে, জামিলকে বারবার ডেকে নিয়ে দেখায়। সেই থেকে দাদার কাজ হয় প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে পড়ে রাজ্যের কাগজ কিনে বাড়ি ফেরা। এক পত্রিকায় বাবার সাক্ষাৎকারও বেরোয়, ছবিসহ; বাবা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন।

এসব কিছু মনে আছে জামিলের। সবকিছু তলিয়ে বোঝার ক্ষমতা হয়নি তার, কিন্তু সে সময়ের প্রায় কিছুই সে ভোলেনি। আর সব কিছু না বুঝলেও কিছু কিছু তো বুঝতোই। যেমন, পাড়ার সবাই তখন দেখতো অন্য চোখে। ডেকে নিয়ে আদর করে কথা বলতো, জোর করে এটা-ওটা খাইয়ে দিত।

বাবা ফিরে আসেন জানুয়ারির শেষ দিকে। তখনো ক্র্যাচে ভর, তবু বাবা যেদিন ফেরেন সেদিন আরেকটি উৎসব হয় তাদের বাড়িতে। পাড়া-প্রতিবেশীরা তো আসেই, আসে কিছু আত্মীয়-স্বজন, যাদের আগে কখনো দেখা যায়নি, আর ছিল জামিলের বাবার সহযোদ্ধারা, সব মিলে তাদের বাড়ি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হৈ হৈ করে। একই ঘটনার বিবরণ জামিলের বাবাকে কতবার যে দিতে হয়! কত রকম যে প্রশ্ন মানুষের! কোনো কোনো আত্মীয় জামিলের বাবার পাশে দাঁড়িয়ে ছবিও তোলে।

ঢাকা ফিরে বাবার আরও কিছু চিকিৎসা জোটে। এমন কি একবার বিদেশে পাঠানোর কথাও হয়। তবে বাবার জায়গায় শেষ পর্যন্ত বিদেশ যায় আরেকজন।

এক রাজনৈতিক নেতার বড় ভাই, তিনি মুক্তিযুদ্ধে না গেলেও রোড অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়েছিলেন। এই নিয়ে ফিসফিস কিছু কথাও হয়েছিল এদিক-ওদিক। আরেক নেতা তখন জানিয়েছিলেন, জামিলের বাবার যে আঘাত, তার চিকিৎসার জন্যে বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঢাকায়ই এর পুরো চিকিৎসা সম্ভব এবং তিনি অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আরেক নেতা বলেছিলেন, বিদেশে গেলেও তেমন কোনো উন্নতির সম্ভাবনা নেই, যেটুকু উন্নতি হওয়া সম্ভব তা স্থানীয় চিকিৎসার মাধ্যমেই সম্ভব। দু'জনের প্রায় একই কথা। এবং দু'জনেই বলেছিলেন, এ মুহূর্তে, এই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ওসব ছোটখাটো ব্যাপারে মান-অভিমান না করে সবারই বরং উচিত দেশ গড়ায় নিজেকে নিয়োগ করা। রাজনৈতিক নেতার বড় ভাইয়ের বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য দু'নেতাই বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন।

জামিলের বাবার অবশ্য নতুন করে দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়নি। কোমরের নিচে গুলি— চিকিৎসকরা বলেই দেয়, এটা ভোগাবে। এবং ভোগায়ও বটে। বাবা অবশ্য তবু কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। জামিল এখন

বোঝে, সেটা ছিল মনের জোরে ভালো হয়ে ওঠা। যে যাক, কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পর, আঘাতটা জ্বালাবেই এটা মেনে নিয়ে চাকরিতেও যোগ দেন বাবা। মাঝে মাঝেই ব্যথাটা অবশ্য বাড়তো, কখনো বিছানায়ও থাকতে হতো। এভাবে টেনেহেঁচড়ে ক'টা বছর চলেও যায়। প্রায় বারো বছর। কখনো কিছু সুস্থ, কখনো অসুস্থ, কখনো শয্যাশায়ী, এভাবে।

তারপর হঠাৎ করেই একদিন ব্যথাটা বাবাকে শয্যাশায়ী করে দেয়, প্রায় স্থায়ীভাবে। বাবার এর পর আর শক্তভাবে উঠে দাঁড়ানো হয় না। চাকরিটাও ছেড়ে দিতে হয় এক সময়। অফিস থেকে প্রাপ্য কিছু নগদ টাকা হাতে আসে। তবে সে প্রায় বছরখানেক পর। তা ছাড়া ঐ পরিমাণ টাকা কোনো অবলম্বন নয়। আর এদিকে গত কয়েক বছরে আরো অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাদের চোখের সামনেই, তবু যেন তাদের অগোচরে। অচেনা আত্মীয়-স্বজন যারা ছুটে এসেছিল বাহাত্তরের জানুয়ারি মাসে, তারা আসা বন্ধ করে দিয়েছে বহুদিন আগে। বাহাত্তরে তারা অবশ্য অনেকবার এসেছিল, নানা রকম আবদার অনুরোধ নিয়ে। কিন্তু তার একটাও পূরণ করা জামিলের বাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই আত্মীয়-স্বজনরাও এক সময় এ-মুখ হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আর পাড়া-প্রতিবেশীদের উৎসাহ মরে গেছে বহু আগে। সেটা বছরখানেক, বড়জোর দেড় বছর ছিল। নিছক উৎসাহ নয়, কিছুটা শ্রদ্ধাও। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সে উৎসাহ আর শ্রদ্ধা তো ফুরিয়েই যায়, কি অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়, লোকজন মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বিতৃষ্ণও হয়ে ওঠে। জামিলের বাবাও হয়ে ওঠেন, গড়পড়তা অতি সাধারণ একজন। এ নিয়ে অবশ্য তার দুঃখ নেই কোনো। অসাধারণ, আলাদা তিনি কখনো কোনো দিন হতে চাননি, আর কেউ না জানুক, জামিল জানে। আর ইতিমধ্যে একাত্তরের সহযোদ্ধারাও ছড়িয়ে গেছে কে কোথায়!

চাকরি ছাড়ার মাস ছয়েক পর বাবা টিউশনি আরম্ভ করেন। ছাত্ররা বাসায় এসে পড়ে যায়। কিন্তু সেটাও বছর তিনেকের বেশি চালানো যায় না। বাবার শরীর আরও ভেঙে পড়ে। ছাত্ররা কেনইবা তার কাছে পড়তে আসবে। কারণ পরদিন তাকে সুস্থ পাওয়া যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। ছাত্ররা তাই এক এক করে সরে পড়ে। জামিলের বাবাও বোঝেন, তিনিও তাদের ধরে রাখার কোনো চেষ্টা করেন না।

পাঁচজনের সংসারে অভাব তখন থেকে হাঁ করেই আছে। আগেও ছিল অভাব, তবে এমন সব সময়ের জন্যে মুখ হাঁ করা নয়। এর পরের দুটো বছর কী করে চলেছে সংসার, কী করে এখন চলছে– ভাবা যায় না। ভাবতে গেলে আশ্চর্য হতে হয়। দুটো বড় সুবিধে, বাড়িটা নিজেদের, তাই বাড়ি ভাড়ার টাকা গুনতে হয় না, আর দাদা বেঁচে না থাকলেও গ্রামের বাড়ি থেকে এখনো বছরের চাল আসে। কিন্তু এ দুই ছাড়া আর কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোনো নির্দিষ্ট আয় নেই, এটা ওটা করে যা হাতে আসে তাই দিয়ে সংসার চালাতে হয়। দেশের বাড়িতে বেশ কিছু জমি ছিল, তা ক্রমশই কমে যাচ্ছে বিক্রি হয়ে যাওয়ার কারণে। অবশ্য জমি বিক্রি এখন বন্ধ করতে হবে, নইলে বছরের চাল আসা বন্ধ হয়ে যাবে। জমি বিক্রির টাকা ছাড়া কখনো জামিলের টিউশনি, কখনো ছোট বোন পারভীনের টিউশনি, কখনো ঘরে বসে মা'র দর্জির কাজ– এই তো সম্বল। এই করে বেঁচে থাকা যায়!

জামিল আরেকটা সিগারেট ধরায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দার এক কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। হাসি পাচ্ছে তার। এই করে কি বেঁচে থাকা যায়! বেঁচে আছে তারা, বেঁচে আছে বৈকি, কিন্তু সে কি যে বেঁচে থাকা! হাসিটুকু ক্রমশ মুছে যায় জামিলের মুখ থেকে। ক্রমশ লজ্জা লাগতে আরম্ভ করে তার। এ অবস্থায় সে কি-না দেড় বছর ধরে চাকরি খুঁজেই যাচ্ছে। এবং আরও কতদিন খুঁজতে হবে, তার জানা নেই। অথচ বাসার সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে, আর কোথায় তাকাবে, তার দিকেই। এ লজ্জা, বড় লজ্জা, বড় বেশি ছোট মনে হয় নিজেকে। সে বোঝে, আর বেশি দিন নয়, সংসার ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছে অনেক আগে, এবার শেষটুকু ধসে যাবে। শুধু তাকিয়ে দেখা ছাড়া তার বোধ হয় আর কিছুই করার থাকবে না। তাকিয়ে দেখা, শুধু তাকিয়ে দেখা, এ বয়সেও? লজ্জায় আবার মাথা নিচু হয়ে আসে জামিলের।

আর শুধু এ সংসার কেন? পুতুলের কথাও মনে হয় জামিলের। মেয়েটা তার জন্যে আর কতদিন অপেক্ষা করবে? মাস ছয়েক পর পুতুলের পরীক্ষা, মাস্টার্স। তারপর তার বিয়ে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, জামিল জানে। আর পুতুলও এমন কোনো পরিবার থেকে আসেনি যে মাস্টার্সের পরও, 'আমি আরও পড়বো বা চাকরি করবো' বললে বাড়ির সবাই মেনে নেবে। বরং তারা চাইবে, অনেক হয়েছে, মেয়ের মাস্টার্স ডিগ্রিও হয়েছে, এবার বিয়েটা হয়ে যাক। অনার্সের পরই একবার খুব তোড়জোড় আরম্ভ হয়েছিল। পুতুল সেটা অনেক কষ্টে ঠেকিয়েছে। কিন্তু ঠেকিয়ে রাখার দায়িত্ব তো শুধু পুতুলের নয়, বরং সেটা জামিলের, কিংবা এমন অবস্থা তার করা উচিত, যে অবস্থায় এসব ঝামেলায় পড়তে হবে না। কিন্তু সেজন্যেও প্রয়োজন সেই একই, চাকরি। মেয়েটাকে সে কথা দিয়ে রেখেছে। পুতুলকে সে চায়ও মনে-প্রাণে। তার ক্ষমতা অবশ্য শুধু ঐ চাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এটা আজকের উপলব্ধি নয়, বেশ অনেক দিনের। অনার্সের পর যখন পুতুলের বিয়ের তোড়জোড় উঠেছিল, তখন থেকেই এ রকম ভাবছে জামিল। বার কয়েক যে পুতুলকে ইঙ্গিত দেয়নি, এমনও নয়। নিজে সব ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েই বলেছে পুতুলকে। কিন্তু পুতুল বাবার মতোই। মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে বসে আছে, এই তো জামিলের চাকরি হয়ে যাচ্ছে বলে। না হয় মাস্টার্স ডিগ্রির পর সেই চাকরি নেবে, এখন মেয়েদের চাকরি পেতে সুবিধা, জামিল তখনও চাকরি খুঁজবে। পুতুলের পরিকল্পনা ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু তার চোখে-মুখে সব সময় এতো আশা আর বিশ্বাস, জামিল নেতিবাচক কিছু বলার আর সাহসই পায় না।

কিন্তু সে বোঝে, প্রেম সবার জন্যে নয়। তা, আসতে পারে সবার জীবনে, কিন্তু সবার জীবনে স্থায়ী হবে না। ধরে রাখা যাবে না, ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে। এখন সে রকমই মনে হচ্ছে জামিলের। ফাঁকফোকর এখন এত বেশি, কোনটা গলে যে বেরিয়ে যাবে, তার আর পুতুলের কিছুই করার থাকবে না।

বাবার কথা মনে হয় জামিলের। সম্পর্ক হওয়ার পর পুতুল প্রায় তাদের বাড়িতে এসেছে। এখন বলতে গেলে তাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে। জামিল না থাকলেও পুতুল কখনো কখনো এসে বাবা কিংবা মা'র সঙ্গে গল্প করে যায়। আর বাবা-মা তাকে ভালোওবাসে সে রকম, নিজের মেয়ের মতো।

কিন্তু সমস্যাটা বাবা জানে, মা তেমন করে বোঝে না। তার ধারণা, হ্যাঁ, চাকরি না হলে বিয়েটা হচ্ছে না, কিন্তু একদিন না একদিন তার ছেলের বউ হয়ে পুতুল এ বাড়িতে আসছেই। কিন্তু বাবা জানেন, এত সহজ নয় সবকিছু, চাকরি পেলেই ব্যাপারটার সহজ নিষ্পত্তি ঘটবে না। বাবার কথা মনে হয় জামিলের। পুতুলের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর বাবা একটা ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন।

না, নির্দিষ্ট করে জামিলকে কিছু বলেননি, তার ইঙ্গিতও জামিলকে লক্ষ্য করে ছিল না। একদিন অন্য কথায় প্রসঙ্গ উঠলে বলেছিলেন, 'কী যে ব্যাপার, এখন দেখি সব ছেলেমেয়েরই কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। ... এখন ছেলেমেয়েদের জীবন বোধ হয় খুব সহজ হয়ে গেছে।'

'এর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়া না-হওয়াটা কীভাবে নির্ভর করছে বাবা'– জামিল খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

সেদিন বিকালে তারা সবাই মিলে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। মা আর ছোট বোনটাও ছিল সেখানে। বাবা হেসে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, সম্পর্ক আছে।'

খুলে বলো, দেখি তোমার সঙ্গে আমার মত মেলে কি-না।

'ধর, একটা ছেলে ও মেয়ের সম্পর্ক'– বাবা কিছুক্ষণ থেমেছিলেন, 'কীভাবে হচ্ছে? ... হচ্ছে– তাদের হাতে দু'জন দু'জনকে দেওয়ার সময় আছে বলে। এখন ছেলেমেয়েদের হাতে পর্যাপ্ত সময়। তার কিছুটা খরচ করছে তোরা যাকে প্রেম বলিস, তার পেছনে।'

তোমাদের সময় কি এসব ছিল না? তখন কেউ প্রেম করত না?

তা করত। ... তবে যাদের হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল তারাই করত। তাদের সংখ্যা খুব কম ছিল।

'তুমি প্রেম-ট্রেম করোনি বাবা? মা জানে?' ছোট বোনটা মুচকি হাসির সঙ্গে জানতে চেয়েছিল।

বাবা আর মা সে প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলেছিলেন। বাবা বলেছিলেন, 'নারে, সে সময় আমার কোথায়! ... জীবন তখন অনেক কঠিন ছিল রে, বহু কষ্ট করে আমাদের এগোতে হতো, ওসব প্রেম-ট্রেমের কথা আমরা ভাবার সময়ই পেতাম না।'

জামিলের তখন পুতুলের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে মাত্র, সে একটু ক্ষুণ্ন গলায় বলেছিল, 'বাবা, তুমি কি বলতে চাচ্ছ, প্রেম হওয়ার পেছনে এই একটাই কারণ?'

'না, কক্ষনো না'– বাবা মাথা নেড়েছিলেন, 'আমি বলছি– এটা একটা প্রধান কারণ।'

এখন জামিল বোঝে, বাবা এতটুকুও ভুল বলেননি। হ্যাঁ, এখন ছেলেমেয়েদের হাতে পর্যাপ্ত সময়, কখনও অখণ্ড অবসর, আর জীবন এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ। এখন জীবন গড়ে নিতে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরই আগের তুলনায় অনেক কম পরিশ্রম করতে হয়। এই রকম মনে হলে জামিলের আবার লজ্জা লাগে। প্রেমটা তবে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাঁড়াচ্ছে অবসর বিনোদন। অবসর কাটাতে গিয়েই জড়িয়ে পড়া। তার আর পুতুলের ব্যাপারটা কি সে রকম? প্রথম প্রথম মনে হতো, না, কখনো না। এখন সে বোঝে, আসলে তার আর পুতুলেরও সূচনা ছিল ওভাবেই। আর এ জন্যই লজ্জাটা বেড়ে যায়। অবসর ছিল হাতে, ছিল পর্যাপ্ত সময়, অথচ তা সংসারের পেছনে ব্যয় হয়নি। কিন্তু এখন এসব ভেবেই বা কী, জামিল মনে মনে বলে, কাল পুতুল আসবে ইন্টারভিউয়ের খবর নিতে।

শীত শীত লাগে জামিলের, আগের চেয়ে বেশি। শুধু রাত বেড়েছে বলে নয়, সে ভাবে, আসলে এত সব ব্যর্থতার কথা ভাবছি বলেই শীতটা বেশি লাগছে। সে আরেকটা সিগারেট ধরায়। শেষ সিগারেট, প্যাকেটটা ছুড়ে দেয় দূরে। কাল সকালেই লাগবে আরেকটা, ঘুম ভাঙার পরপর, এটা রেখে দিলেই হতো, তার মনে হয়। কিন্তু ধরানো হয়ে গেছে, সকালে উঠে দোকানে গেলেই হবে, পাঁচটা টাকা এখনও আছে। তাছাড়া কাল কিছু টাকা পাওয়াও যেতে পারে। এক বন্ধুর অফিসের কিছু কাগজ-পত্র সে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছে। তাকে মোটামুটি ভালো টাকা দেওয়ার কথা।

সিগারেট শেষ করে সে আড়মোড়া ভাঙে। ঘরে এসে দরোজা বন্ধ করে খামোখা দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বড় একটা হাই তোলে। ঠিক করে, ওসব কথা আর ভাববে না এখন, কিন্তু তার ঘুমও আসে না। আর ভাববো না ঠিক করলেই কি না ভেবে পারা যায়?

বাবার জন্য কষ্ট হয় তার। একটা মানুষ সারা জীবনে কিছুই পাবে না– এমন কেন হবে! সে তো বয়স হওয়ার পর থেকেই দেখছে বাবা তাদের মঙ্গলের জন্য কী পরিমাণ ব্যস্ত ও চিন্তিত। অথচ শুধু করেই যাওয়া, সে লোক নিজে সুখের মুখ দেখলো না কোনো দিন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ– প্রাপ্তি তার এটুকুই। মুক্তিযুদ্ধের অত বড় যোদ্ধা, যার বীরত্বের কাহিনী ছড়িয়ে আছে পুরনো পত্র-পত্রিকা আর বইয়ে– সে লোকের জীবনে আর কোনো পাওয়া নেই। ওই একটাই সান্ত্বনা– মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। অথচ এটুকু পাওয়াও আর পাওয়া থাকল না, সান্ত্বনা আর সান্ত্বনা থাকল না। জীবনের ওটুকু পাওয়া আর ওটুকু সান্ত্বনা অল্প সময়ের মধ্যেই যেন অপরাধ হয়ে উঠল। অপরাধ– কেন তারা মুক্তিযোদ্ধা!

মুক্তিযুদ্ধ তাই ক্রমশ দূরের হয়ে গেল। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মানুষের কাছ থেকে, কী এক গভীর কৌশলে। জামিল বোঝে, কিন্তু ইতিবাচক কোনো দিক খুঁজে পায় না এর বিপরীতে। মাঝে মাঝে তার খুব অবাক লাগে– এখন তাদের যে বয়স, একাত্তরে তার চেয়ে কমবয়সী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা অনেক ছিল। তারা দেশের জন্য কী অসীম সাহসে লড়েছিল। কিন্তু তারা কী করছে, জামিলের মনে হয়, 'তাদের চেয়ে বেশি বয়সী হয়ে আমরা এখন কী করছি।' আমরা তো কিছুই করিনি। সে মনে মনে বলে, করার মধ্যে যেটুকু, সেটুকুর অধিকাংশজুড়ে আছে পথ আর শত্রু চিনতে ভুল করা। আসলে আমাদের ছক কেটে বারবার বিভ্রান্ত করা হয়েছে, জামিল বোঝে। আর এই সুযোগে বিড়িরা উঠে এসেছে। লজ্জা আবার ছেয়ে ফেলে জামিলকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সে ছোট, কিন্তু সে তো জানে কী ছিল সেই দিনগুলো। অথচ বদলে যায়, দিনগুলো দ্রুত বদলে যায়। ফাঁকফোকর গলে বিড়িরা তরতর করে উঠে আসে। আর মুক্তিযুদ্ধ ক্রমশই হয়ে যায় বড় হয়ে যাওয়া শিশুর পরিত্যক্ত খেলনা।

চার

পরদিন সকালে পুতুল আসে। প্রথমেই জামিল তার মুখোমুখি হয় না। পুতুল প্রথমে বাড়ির সবার সঙ্গে দেখা করে। তারপর পুতুল তার কাছে এলে জামিল এক গাল হাসে, 'এক কাপ করে চা হয়ে যাক, কি বল?'

'খুব খোশ-মেজাজে আছ দেখছি'– পুতুল ভ্রূ কুঁচকে তাকায়, 'তাহলে এ চাকরিটাও তোমার হচ্ছে না?'

জামিল অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে, 'বাহ, চাকরি না হওয়ার সঙ্গে খুশি হওয়ার কী সম্পর্ক? বরং চাকরি হলেই মানুষের খোশ-মেজাজে থাকার কথা। বিশেষ করে আমার মতো বোনাফায়েড বেকারের।'

'না'– পুতুল মাথা নাড়ে, 'গতকাল তোমার তের নম্বর ইন্টারভিউ গেল কি-না, যদি ভালো হতো ইন্টারভিউ, চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তবে তুমি গম্ভীর মুখে এমন ভাব দেখাতে যেন এসব চাকরি-বাকরি তোমার জন্য কোনো ব্যাপারই নয়।'

'তাই!' জামিল বোকার মতো হাসে, 'তবে বোধহয় চাকরিটা আসলেও হচ্ছে না।... কী করে হয় বল, তের নম্বর ইন্টারভিউ, আনলাকি।'

পুতুল হাসে, 'তা তোমার আগের ইন্টারভিউগুলোও কি তের নম্বর ছিল? ... ঘন ঘন ব্যর্থ হলে মানুষ অদৃষ্টবাদী হয়ে যায়। তোমার হয়েছে তাই। ... এখন শোন, গতকালের খবরের কাগজ দেখেছ?'

'কী করে দেখি'– জামিল মাথা নাড়ে, 'বেকার মানুষ, পয়সা নেই কাগজ কেনার।'

পুতুল হাতের ব্যাগ খুলে একটা পেপার কাটিং বের করে, 'ইয়ার্কি রেখে এখন দয়া করে এটা দেখ। ... আমার কাছে খুব

ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে।... তুমি এখানে চেষ্টা কর। আমি না হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না।'

জামিল কোনো আগ্রহ দেখায় না, নিতান্তই আলস্যভরে কাটিংটা নেয়, তবে অনেক সময় নিয়ে দেখে। পুতুলকে সেটা ফেরত দিয়ে বলে, হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং।'

তবে কালকেই একটা দরখাস্ত করে ফেল।

জামিল বিছানায় আধশোয়া হয়, 'আমার আপত্তি আছে। তুমি এটা না হওয়ার কোনো কারণ নেই বললে না? আমার আপত্তি সেখানে। হওয়া বা না হওয়ার কারণ তুমি আমি আর কতটুকু জানি? ... সবদিক বিচার করলে আমার চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক, না হওয়ার তেমন কঠিন কোনো কারণ নেই। কিন্তু হচ্ছে কোথায়?... এটাও হবে না।'

পুতুল ছেলেমানুষের মতো হাত নাড়ে, 'আহা, এমনভাবে কথা বোল না তো।... তেরবার চেষ্টা যখন করেছ তখন চৌদ্দবার চেষ্টা করলে কিছু এসে যাবে না। যাওয়ার মধ্যে বরং এটুকু যেতে পারে– চাকরিটা পাওয়া যেতে পারে।... শোন, আমার মন বলছে, এটা হবে।'

তুমি আমাকে একটু আগে অদৃষ্টবাদী বলেছিলে।

হ্যাঁ, বলেছিলাম। তো?

এখন তুমি অদৃষ্টবাদীর মতো কথা বলছো। মন বলার সঙ্গে চাকরি হওয়া না-হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

আহ, মেয়েরা অদৃষ্টবাদীর মতো কথা বললে কিছু এসে যায় না। পুরুষদের বলতে নেই। তুমি ওঠতো দেখি।

'উঠলাম'– বলে জামিল সত্যি সত্যিই সটান দাঁড়িয়ে যায়।

আস আমার সঙ্গে।

কোথায়? ... না বাপু, এখন আমার পার্কে বসে মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যা কথা বলতে ভালো লাগবে না।

পার্কে যেতে হবে না তোমাকে, তুমি শুধু আমার সঙ্গে আস। ভয় থাকলে পেছনে পেছনেও আসতে পার।

পুতুল জামিলকে প্রায় টানতে টানতেই বাবার কাছে নিয়ে যায়। বাবাকে পেপার কাটিংটা পড়তে দিয়ে বলে, 'চাচা, আপনি দেখুন তো, আপনিই বলুন– জামিলের এখানে অ্যাপ্লাই করা উচিত না?'

বাবা প্রথমটায় বোঝেন না। পেপার কাটিংটা হাতে নিয়ে বোকার মতো পুতুলের দিকে, তারপর জামিলের দিকে, আবার পুতুলের দিকে তাকান।

পুতুল বলে, 'চাচা, ওটা পড়ুন না আপনি একবার।'

বাবা পড়েন, পুরোটা পড়ে তিনি পুতুলের দিকে তাকান, 'তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করতে বলছো, জামিলকে?'

: হ্যাঁ, কেন নয়। আমার তো মনে হচ্ছে ওর এখানে হবেই।

বাবাও সবেগে মাথা নাড়েন তখন, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।... এই যে, বিশেষ করে এ জায়গাটা'– বাবা পেপার কাটিংয়ের এক অংশে আঙুল দিয়ে দেখান, 'এখানে ওরা একটা বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ করেছে। এই সুবিধার পুরোটাই তো ও পাবে।'

পুতুল তখনই হাসিমুখে বিজয়ীর ভঙ্গিতে জামিলের দিকে তাকায়, 'কী, বলেছিলাম না?'

'কিন্তু'– বাবা আবার কাটিংটার দিকে চোখ ফেরান, 'এটা কাদের ব্যাপার কারা করছে?'

পুতুল বলে, 'চাচা, আমার মনে হয় এটা সরকারি উদ্যোগই। প্রজেক্টটা সম্ভবত বাইরের লোকজন করছে, বাইরের পয়সায়– তবে সরকারি উদ্যোগে।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে'– জামিল বলে, সে অবশ্য কোনো আগ্রহ দেখায় না, 'সম্ভবত সরকার এবং কোনো সাহায্য সংস্থার জয়েন্ট ভেঞ্চার।'

বাবা আবার কাটিংটা পড়েন, মাথা দোলান, 'সে যাই হোক, এটা এখন না জানলেও চলবে, এটা এমন কোনো বিষয় নয়।... আমার মনে হচ্ছে আজ না পারলেও, কাল কিংবা পরশুর মধ্যে তোর এখানে অ্যাপ্লাই করে দেওয়া উচিত হবে।'

জামিল তখনই মাথা নাড়ে, 'খুব বলছো বাবা। কিন্তু ব্যাপারটা লোভনীয় বলে কতজন অ্যাপ্লাই করবে, বুঝতে পারছো?'

'পারছি'– বাবা হাসেন।

তবে যে খুব বলছো অ্যাপ্লাই করতে!

'বলছি'– বাবা আবারও হাসেন, 'কিন্তু এই যে বলেছে, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের প্রার্থীদের জন্যে দশ ভাগ আসন সংরক্ষিত, এতেই তো তুই এগিয়ে যাবি। ... এ কাজটা এরা ভালো করেছে রে। গুড, ভেরি গুড। এতদিন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য টেন পার্সেন্ট সংরক্ষণ করে বয়স বেঁধে দিত। এমন বয়স যেন সবাই আট-নয় বছরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। আসলে আই-ওয়াশ, না নেওয়ার একটা কায়দা আর কী।... কিন্তু এদের কাজটা ভালো। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে নয়, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সদস্যদের জন্যে টেন পার্সেন্ট আসন সংরক্ষিত। গুড।'

'বেশ'– জামিল মাথা ঝাঁকায়, 'ব্যবস্থাটা যে ভালো তা আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু বাবা, এদেশে মুক্তিযোদ্ধা পরিবার তো একটি-দুটো নয়। সুতরাং ক্যানডিডেট কম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

এতদিন যেসব জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছিস, সেসব জায়গায় ক্যানডিডেট কি কম ছিল?

না, তা ছিল না... কিন্তু তবু বাবা, আমার মনে হচ্ছে এখানে ভিড় আরও বেশি হবে।

বাবা পুতুলের দিকে একবার তাকান, হাসেন। জামিলের দিকে ফিরে বলেন, নারে, এখানে বয়স আর শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারও তো আছে। মুক্তিযোদ্ধা পরিবার অনেক, স্বীকার করলাম, কিন্তু সব পরিবারে কী প্রয়োজনীয় বয়স আর শিক্ষাগত যোগ্যতার ছেলে আছে? এদের চাহিদা মতো?'

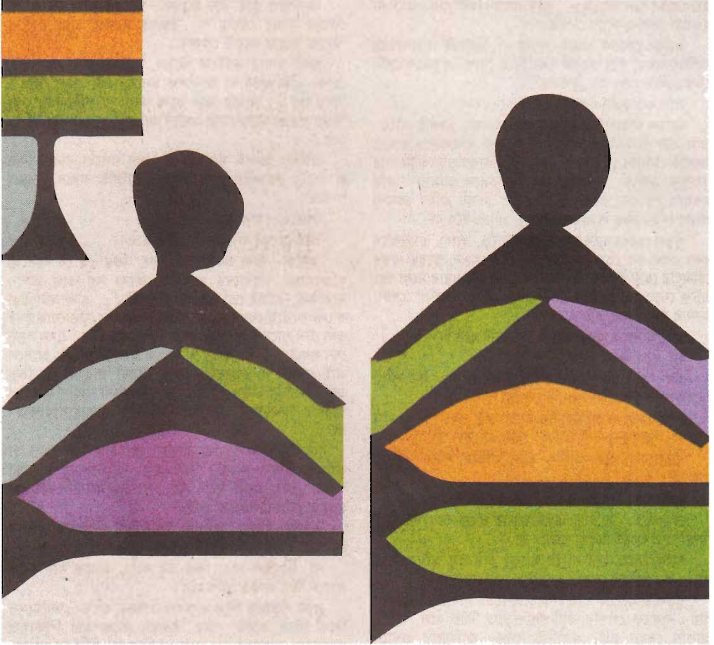
জামিল মাথা নাড়ে, 'না, তা হয়তো নেই।'

তাহলে অ্যাপ্লাই করতে অসুবিধে কোথায়। আর ইদানীং তুই বড় বেশি হতাশা দেখাচ্ছিস। এসব কখনো ভালো নয়।

জামিল অনেকক্ষণ ধরে হাসে। বাবা এখন আবার সেই পরিচিত বাবা, গত বিকেলে তার যে হতাশা, তার ছিটেফোঁটাও এখন নেই তার চোখে-মুখে। বরং আগের মতোই আশার কাছে ফিরে গেছেন। জামিলের ভালো লাগে, সে বলে, 'ঠিক আছে, তোমরা যখন এত করে বলছো। ... কাল পরশু অ্যাপ্লাই করে দেব।'

বাবার সঙ্গে আর বেশিক্ষণ কথা এগোয় না। বন্ধুর অফিসে যেতে হবে অনুবাদের টাকার তাগাদা দিতে। পুতুলের একটা ক্লাস আছে দুপুরের দিকে। কিন্তু পুতুলকে জামিল ছাড়ে না। তাকে সঙ্গে নিয়েই সে বন্ধুর অফিসের দিকে এগোয়। টাকাটা যদি পাওয়া যায় তবে বাদ বাকি সময়টুকু তারা একসঙ্গে কাটাবে, সে ঠিক করেছে।

সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় পুতুল জামিলকে আবার মনে করিয়ে দেয়। জামিল বিরক্ত হওয়ার ভান করে হাত নাড়ে, 'ধ্যাৎ, অত বারবার বলতে হবে না, মনে আছে আমার।'



সত্যিই মনে আছে তার। এতক্ষণ পুতুল সঙ্গে থাকলেও সে বিষয়টা নিয়ে ভেবেছে। বেশ লোভনীয়ই মনে হয়েছে তার কাছে। আর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও অনেক, সে ছক কেটে দেখেছে, সত্যিই যদি তারা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্যে দশ পার্সেন্ট পদ সংরক্ষিত রাখে, তবে তার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সব মিলিয়ে হয়তো সবচেয়েই বেশি। কাজের যে ধরন, তাতে হয়তো অফিসের প্রয়োজনে মাসে কয়েকটা দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হবে। কিন্তু তাতে কী। টি.এ.ডি.এ তো তারাই দেবে। তা ছাড়া এতসব ভাবার কোনো কারণ আদতেই নেই। চাকরিই যখন হচ্ছে না তার, তখন এমন একটা সুযোগ পাওয়া অনেকটা হাতে চাঁদ পাওয়ার মতোই। দরখাস্ত কালই করে দেবে, পুতুলকে বিদায় দিয়ে ফিরতে ফিরতে সে ঠিক করে।

পাঁচ

পরদিন অবশ্য হয় না। তার কাগজপত্র সব গুছানোই থাকে সব সময়। সব ক'টি সার্টিফিকেট সে বেশ কয়েক কপি করে ফটোস্ট্যাটও করে রেখেছে। কিন্তু এখানে শেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দু'জন শিক্ষকের নাম ব্যবহার করতে হবে। এমন শিক্ষক দু'জন, প্রয়োজনে,যাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য কর্তৃপক্ষ পেতে পারে, এই শিক্ষক দু'জনের নাম নিয়েই পুরো দিন গেল। প্রথমে কোনো শিক্ষকই রাজি হতে চান না। ঘুরতে ঘুরতে জামিলের এক সময় মনে হয় ছাত্ররা আসলে শিক্ষকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। নইলে এটুকু দায়িত্ব কোনো ছাত্রের জন্যে গ্রহণ করতে কোনো শিক্ষকেরই ইতস্তত করার কথা নয়। শেষে অল্প বয়সী এক শিক্ষক, যে ভার্সিটিতে জামিলদের বছর দুয়েকের সিনিয়র ছিল, জামিলরা তাকে ভাই বলে ডাকতো, রাজি হন এবং তিনিই আরেকজনকে রাজি করান।

সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে জামিল তার পরদিন ঐ অফিসে যায়। কিন্তু দরখাস্ত সে ঐদিন জমা দিতে পারে না। 'মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সদস্যদের জন্যে দশ ভাগ আসন সংরক্ষিত'– এখানে সে আটকে যায়। খুব একটা ভিড় নেই ওখানে। সাধারণ এবং মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সদস্য প্রার্থীদের দরখাস্ত আলাদাভাবে জমা নেওয়া হচ্ছে। জামিল পদ্ধতিটা দেখে খুশি হয়, তাহলে কথা মতোই কাজ করছে তারা। আর প্রার্থীদের দরখাস্ত জমা নিয়ে তখন তখনই একটা রিসিট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

জামিলের দরখাস্ত আর অন্যান্য কাগজপত্র দেখে একজন আঙুল তুলে পাশের লাইনটা দেখায়, 'এইটা না। আপনি ঐ লাইনে যান।'

জামিল একটু হাসে, 'না, আমি এ লাইনেরই।... এটা

মুক্তিযোদ্ধা পরিবার সদস্যদের লাইন তো? আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।'

সার্টিফিকেট দেননি কেন সঙ্গে?

কোন সার্টিফিকেট বাদ পড়লো? জামিল মনে মনে হিসাব কষে নেয়। না, কোনোটাই বাদ পড়ার কথা নয়। সে একটু অবাক গলায় বলে, 'দিয়েছি তো, সব সার্টিফিকেটই আছে দরখাস্তের সঙ্গে।'

'না নেই'। লোকটা মাথা নাড়ে।

'আপনি কোন সার্টিফিকেটের কথা বলছেন?' জামিল এবার অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে।

'কেন, মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট দেবেন না আপনি!' লোকটাও সেই পরিমাণ অবাক।

'ও'– জামিল বলে। সে বোঝে একটা বড় ভুল হয়ে গেছে। দরখাস্তটা আসলেও অসম্পূর্ণ অবস্থায় আনা হয়েছে। অথচ এ কথাটা তার একবারও মনে হয়নি। সে আমতা আমতা করে, 'হ্যাঁ, মানে, বুঝতে পারছি, কিন্তু...।'

লোকটা এক হাত সামান্য তোলে, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন কাইন্ডলি। আমি হাতের কাজগুলো সেরে নেই।'

হাতের কাজ সারা মানে অন্যদের দরখাস্ত গ্রহণ করা। প্রায় ঘন্টাখানেক সময় লাগে।

না, খুব বেশি ভিড় নয়। কিন্তু সব কাগজপত্র দেখে, এখানে ওখানে সিল দিয়ে, ফাইলিং করে, দরখাস্তকারীর রিসিট কেটে একেকজনকে বিদায় করতেই ছয়-সাত মিনিট লেগে যায়। জামিল ততক্ষণে একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। দুটো সিগারেট শেষ করে। লাইন শেষ হলে সে এগোয়।

লোকটা প্রথমে তাকে চিনতে পারে না।

'আমি, মানে ওই যে আমার দরখাস্তের ব্যাপারটা।' জামিল বলে।

'ও হ্যাঁ'– লোকটা এবার চেনে, 'হ্যাঁ, বলুন, কী যেন বলছিলেন আপনি?'

আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

লোকটা মাথা ঝাঁকায়।

মানে, আমার তো তাহলে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের লাইনেই দরখাস্ত জমা দেওয়ার কথা।

লোকটা এবারও মাথা ঝাঁকায়, বুঝতে পারছে সে।

'তবে আমার দরখাস্ত জমা নিন'– জামিল হাতের কাগজপত্র আবার এগিয়ে ধরে।

লোকটা সেগুলো নেয়, উল্টেপাল্টে দেখে বলে, 'বুঝলাম, আপনার সব কথাই বুঝলাম। ... কিন্তু আমাদের তো নিয়ম মানতে হবে, তাই না? আপনার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তা আমরা সার্টিফিকেট ছাড়া কী করে বুঝবো।'

তাও ঠিক জামিল ঠিক বুঝতে পারে না, এখন তার কী বলা উচিত।

অবশ্য সে কিছু বলার আগে লোকটাই আবার মুখ খোলে, 'আপনার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বলছেন, সার্টিফিকেট কোথায়?'

এতক্ষণে বলবার মতো কিছু খুঁজে পায় জামিল, সে খুব সহজ গলায় বলে, 'বাবা তো ওই সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেছেন।'

'কী!' লোকটা এবার অবাক হয়ে যায়, 'ছিঁড়ে ফেলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট!'

'হ্যাঁ– জামিলের মুখে এবার একটু হাসি ফোটে, 'ছিঁড়ে ফেলেছেন।'

ছিঁড়ে ফেলেছেন, কেন? মুক্তিযুদ্ধ এত হালকা জিনিস নাকি?

'না না'– জামিল সবেগে মাথা নাড়ে, 'মুক্তিযুদ্ধ না, বাবার কাছে মুক্তিযুদ্ধ হালকা জিনিস না। তিনি তো মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন ... তবে তার কাছে সার্টিফিকেট অপ্রয়োজনীয়, মূল্যহীন।'

'না, কে বলেছে, মূল্যহীন'– লোকটা মাথা দোলায়, 'সার্টিফিকেট কখনো মূল্যহীন হয়? এখন আমরা বুঝবো কী করে? আপনি যে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, তার প্রমাণ?'

জামিল বোকার মতো সামান্য মাথা ঝাঁকায়, 'ও হ্যাঁ, আচ্ছা...।'

বাসায় ফিরে সে বাবাকে বলে, 'না বাবা, খামোখা গিয়েছিলাম, এটাও হচ্ছে না।'

'কেন কেন!' বাবা খুব অবাক, 'তুই দরখাস্ত জমা দিতে গিয়েই কী করে বুঝলি?'

জামিল একটু হাসে, হাসি মুখেই পুরো ঘটনাটা খুলে বলে। শুনে বাবা বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। একসময় গম্ভীর গলায় বলেন, 'কিন্তু আমি তো সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা।'

'তা কি আমি জানি না বাবা।' জামিল দাঁতে নখ কাটতে কাটতে হালকা গলায় বলে, 'কিন্তু তা ওরা বুঝবে কী করে? ... ওদের তো কাগজপত্র মেইনটেইন করতে হবে।'

তাই বলে দরখাস্ত জমা নেবে না?

দরখাস্ত জমা নিলেই তো সব ঝামেলা মিটে যায়। ওটাই তো সমস্যা।'

কী বললো ওরা?

একবার পুরোটাই বলেছে সে, জামিল তবু আরেকবার বলে। ছোট বোনকে জোর গলায় ডেকে চা করতে বলে, 'বাবার জন্যেও করিস।... হ্যাঁ, বাবা যা বলছিলাম ... ওরা জানালো অসম্পূর্ণ দরখাস্ত ওদের পক্ষে জমা নেওয়া সম্ভব নয়।'

চা খেতে খেতে সে বাবার সঙ্গে কতক্ষণ আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করে। একবার বলে, 'ক-দিন আগে পত্রিকায় একটা নিউজ বেরিয়েছে দেখেছ? বাংলাদেশের আবহাওয়া নাকি একদম বদলে যাচ্ছে। বলা যায় না, দেশটা বোধহয় কোনোদিন মরুভূমি হয়ে যাবে।' আবহাওয়ার প্রসঙ্গ শেষ করে সে চলে যায় রাজনীতিতে, তারপর খেলাধুলায়। আজকের প্রসঙ্গ সে ভুলেও আর একবারও তোলে না, বাবাকেও কোনো সুযোগ দেয় না।

তবে পরদিন সকালে বেরোবার আগে সে বাবার কাছে যায়। বলে, 'ওই অফিসে যাচ্ছি বাবা, ... হ্যাঁ, ওই অফিসেই, কাল যেখানে গিয়েছিলাম।'

বাবা ভ্রূ কুঁচকে তাকান, 'আবার কেন? তুই না কাল বললি...।'

জামিল সহজ ভঙ্গিতে মাথা দোলায়, 'কিন্তু তুমি তো সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা ছিলে'।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত সে ভেবেছে। ফিরে এসে সে বাবার সঙ্গে সহজ গলায় কথা বলেছে বৈকি, এমন ভাব করেছে যেন কিছুই হয়নি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অস্থির হয়ে থেকেছে। ইচ্ছে করে সে বাবার সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গে কথা বলতে চায়নি। কারণ সে জানে, ঐ প্রসঙ্গ উঠলে বাবার কষ্ট বাড়বে।

না, অফিসের ঐ লোকটা ভুল বলেনি কিছুই, সে বোঝে। বরং যা বলেছে, তার সবটুকুই যথাযথ। সবকিছু নিয়ম মাফিকই হবে বৈকি। কিন্তু এসবের পাশাপাশি এও তো ঠিক– সেও মিথ্যা বলেনি কোনো। সার্টিফিকেট নেই– এ ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুতর বিষয় বৈকি। কিন্তু সার্টিফেকেট নেই বলেই–

তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা– এটা খারিজ হয়ে যাচ্ছে না। না, কখনো যেতে পারে না।

সার্টিফিকেট– সে একটু হাসে। মূল্যহীন, ঠুনকো বলে নয়, বাবা আসলে ওটা রাগ করে ছিঁড়েছেন। একবার কী এক প্রয়োজনে, খুব সামান্য প্রয়োজনে, বাধ্য হয়ে ঐ সার্টিফিকেট দেখিয়েও কোনো কাজ হয়নি। অথচ সেটা সার্টিফিকেট দেখানোর মতো কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু তার পরও প্রাপ্য পাওনাটুকু না পাওয়ায়, সহজ কাজটুকু না হওয়ায় বাবা ওটা ছিঁড়ে ফেলেন।

সে তো খুব বেশি আগের ঘটনা নয়। বছর কয়েক হবে। সম্ভবত চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর বাবার চাকরির বয়স, পেনশন– এসব নিয়ে এক মহা ঝামেলা বেধেছিল। অদ্ভুত এক প্রশ্নের মুখোমুখি তাকে তখন দাঁড়াতে হয়েছিল– একাত্তর সালে ৯ মাস সে অফিসে আসেনি কেন! বাবা বলেছিলেন, কেন তিনি আসেননি। কিন্তু যারা হিসাবপত্র মেলায়, যারা পেনশনের টাকা দেয় তারা সন্তুষ্ট হয়নি। সুতরাং বাবাকে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দেখাতে হয়েছিল। কিন্তু তাতেও কাজটা এগোয়নি, ঝামেলা কাটেনি।

'তবে আর এটার কী দরকার! স্বীকৃতি পত্র? সে তো আমি নিজে জানলেই চলে, আমি জানিও সেটা'– বাবা এই বলে তাদের সামনেই সার্টিফিকেটটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন।

যদি না ছিঁড়তেন বাবা, তবে কী হতো? কী আর হতো, জামিল মনে মনে বলে, তবে আর কোনো ঝামেলাই থাকতো না, আজকে দরখাস্ত জমা দিয়ে দিব্যি ড্যাং-ড্যাং করে ফিরে আসতাম। কিন্তু তাই বলে বাবার ওপর এতটুকু রাগ হয় না জামিলের। একবারও মনে হয় না– সার্টিফিকেটটা বাবা না ছিঁড়লে চাকরি বোধহয় এবার তার একটা হয়েই যেত।

বরং বাবার জন্য মায়া হয় তার। আর সে ভাবে, যদি এমন হয়– আজ সকালে লোকটা তাকে মিথ্যাবাদী ভেবেছে! যদি এমন হয়, লোকটা ভেবেছে– সে ধোঁকা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জন্যে সংরক্ষিত সুবিধা নিতে চেয়েছে। তাতে কি এমন কোনো অসুবিধা হবে, জামিল ভাবে, ভাবুক না ওই লোক, কী এসে যায়, তার সঙ্গে তো আর দেখা হচ্ছে না কোনো দিন। কিন্তু জামিল বোঝে, এভাবে এত সহজে চুকে-বুকে যাবে না ব্যাপারটা, বরং তাকে খোঁচাবে। লোকটাকেইবা খামোখা কেন সে মিথ্যা ভাবার সুযোগ দেবে। সে তো ধোঁকা দিয়ে বাড়তি কোনো সুবিধা নিতে যায়নি। সে এক বীর মুক্তিযোদ্ধার ছেলে। ওখানে চাকরি পেলে কত সুবিধা হবে, তা ভাবে না সে। সে ভাবে, সে যে মুক্তিযোদ্ধার ছেলে, সার্টিফিকেট না থাকলেও তার বাবা যে মুক্তিযোদ্ধা, এই সত্যি দুটো ওখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

রাতেই সে ঠিক করে নেয় কী করবে। কিছুদিন আগে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন পত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে। বাবার নাম আছে সেখানে। মা একটা পত্রিকা ট্রাঙ্কে তুলে রেখেছেন। বাবা কিংবা সে নয়, ওসব ব্যাপারে বাবার এখন কোনো আগ্রহ নেই, তারও নেই। যেন তারা দু'জনই জানে, তালিকায় নাম থাকা না থাকায় কিছু এসে যায় না। কিন্তু এই সতের বছরেও মায়ের দুর্বলতা এতটুকু ম্লান হয়নি। অপরিসীম যত্নে তিনি তাই তুলে রেখেছেন। ভাগ্যিস রেখেছেন, জামিলের মনে হয়, নইলে অসুবিধায় পড়তে হতো।

সে ঠিক করেছে, সে ওই পত্রিকা নিয়ে যাবে। অবশ্য বাহাত্তর সালে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোও নিয়ে যাওয়া যেত। ওসব পত্রিকায় বাবার ছবি আছে, সাক্ষাৎকার আছে, অসাধারণ বীরত্বের কাহিনী আছে। তবে ওসবের চেয়ে, জামিলের মনে হয়, এখনকার বিবরণ কিংবা তালিকাই নিশ্চয়ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত ওদের কাছে।

তাই সে যায়, পত্রিকা হাতে, সঙ্গে কাগজপত্রগুলোও নেয়। কিন্তু এবারও সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। গতকালকের সে লোকটাই অবাক গলায় বলে, 'এটা একটা প্রমাণ হলো? এটাকে আপনি সার্টিফিকেট বলছেন?'

'কেন নয়'– জামিল বলে, 'নাম দেখুন এখানে। দরখাস্তে বাবার যে নাম, তালিকায়ও তো সেই একই নাম। দেখুন আপনি।'

লোকটা তার কথা যেন শোনে না। পেন্সিল দিয়ে কাগজে হিবিজিবি কী সব লেখে। শেষে হঠাৎ জামিলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

'আপনি বিশ্বাস করছেন না? নামতো এক!' জামিল বলে।

লোকটা হাসি হাসি মুখে বলে, দু'জন লোকের একই নাম হয় না?'

হয়।

সুতরাং তালিকায় প্রকাশিত এই নামটি আপনার বাবার না হয়ে অন্য কারোরও তো হতে পারে। পারে না?

হ্যাঁ, তা পারে বৈকি! এ মুহূর্তে ঠিক কী বলা উচিত জামিল ভেবে পায় না। সে বোকার মতো সামান্য হাসে। এমন সহজ অথচ ভয়ানক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, সে আগে একবারও ভাবেনি। বোকার মতোই সে বলে, 'কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি।'

'আমি তো অবিশ্বাস করছি না'– লোকটার মুখে আবার সামান্য হাসি দেখা যায়, 'কিন্তু আপনিই বলুন, তাতে কি অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে? ... আপনার দরখাস্ত গ্রহণ করতে হলে আমাকে তো ভ্যালিড কাগজপত্র পেতে হবে।'

জামিল এবার একটু অসহিষ্ণু গলায় বলে, 'আপনি এটাকে ভ্যালিড বলছেন না? এটা মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, সরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত। এটা ভ্যালিড না হওয়ার কোনো কারণ নেই, আমরা তো বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার বাবার নাম ছাপাইনি।'

লোকটা পেন্সিল তুলে নিয়ে আবার কাগজে হিবিজিবি দাগ কাটতে আরম্ভ করে। মুখ তোলে না, জামিলের দিকে না তাকিয়ে সামান্য মাথা দোলায়, 'আমি ওই তালিকা অবৈধ বা ভুয়া কিছুই বলছি না। কিন্তু আপনি আমার ব্যাপারটাও বোঝার চেষ্টা করছেন না। আমি জানতে চেয়েছি একই নাম দু'জন লোকের হয় কি-না, আপনি বলেছেন হয়। এখন?'

কিন্তু এটা বাবারই নাম।

ধরেন, আরেকজন ক্যান্ডিডেট এলেন, তারও একই ব্যাপার। দেখা গেল তার বাবার নামও এই, তখন?

জামিল বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সে বোঝে অবস্থাটা এ লোককে সে বোঝাতে পারেনি। আর তা বোঝানো সম্ভবও নয়। তবে লোকটার ওপর খুব রাগ হলেও তার কোনো দোষও সে খুঁজে পায় না।

সে দাঁড়িয়েই আছে দেখে লোকটা মুখ তোলে, বলে, 'তাছাড়া আমার তো সার্টিফিকেট দরকার। আমি তো আর দরখাস্তের সঙ্গে ওই কাগজ রাখতে পারবো না।'

জামিল তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

লোকটা উঠে দাঁড়ায়। আড়মোড়া ভাঙে। তারপর ফাইলপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলে, 'এখন আমার অনেক কাজ। ... কালতো আপনার কাগজ-পত্র, সার্টিফিকেট সব দেখলাম। এক কাজ করুন না আপনি– সাধারণ বিভাগেই দরখাস্ত জমা দিয়ে দিন। আপনার যে কোয়ালিফিকেশন তাতে ওই বিভাগ থেকে আপনি নিশ্চয়ই সিলেক্টেড হবেন। হ্যাঁ, সাধারণ

বিভাগেই দরখাস্ত জমা দিয়ে দেন, কী বলেন? অসুবিধা কী?'

না, অসুবিধা নেই কোনো। কিন্তু এখন পুরো বিষয়টাই অন্যরকম। নিছক দরখাস্ত জমা দেওয়া না দেওয়ার বিষয়টা আর সীমাবদ্ধ নেই, জামিলের কাছে। অসুবিধা এটুকুই– এ অবস্থাটা, জামিল নিশ্চিত, তার কাছে এ বিষয়টার এখন যে ব্যাপ্তি, তা এ লোককে তার পক্ষে কখনো বুঝানো সম্ভব হবে না।

বাসায় ফিরে সে বাবার মুখোমুখি হয় না। বাসায় ফেরেও রাত করে, যেন বারান্দায় বসে থাকা বাবার মুখোমুখি না হতে হয়। ওই অফিস থেকে বেরিয়ে সে অর্থহীন এদিক-ওদিক ঘুরেছে। এক বন্ধুর অফিসে গেছে। সেখানে বন্ধুর ব্যস্ততা সত্ত্বেও ঘণ্টাখানেক সময় কাটিয়েছে। বেরিয়ে বিকালের দিকে এক পার্কে বসে থেকেছে অনেকক্ষণ। তারপর পুরো সন্ধ্যাটা এ রাস্তায় ও রাস্তায়, কখনো উইন্ডো– শপিং করেছে। সন্ধ্যের পর গেছে আরেক বন্ধুর বাসায়। সেখানে আরো দু'তিনজন বন্ধু ছিল। তারা অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছে। জামিল সে বন্ধুর বাসা থেকে রাতের খাবার সেরে তারপর ফিরেছে।

কিন্তু বাসায় বাবাকে আর কতক্ষণইবা এড়িয়ে থাকা যায়। বিশেষ করে এ রকম ছোট্ট, এক টুকরো বাসায়! রাতে শুতে যাওয়ার আগে বাবাই খবর নিতে আসেন, 'কিরে, দরখাস্ত জমা দিলি?'

জামিল একবার ভাবে মিথ্যা বলবে। বলবে, হ্যাঁ, দিয়েছে জমা। তারপর চাকরিটা না হলে বাবা তো আর খবর নিতে যাচ্ছেন না– কেন হলো না চাকরিটা। সুতরাং মিথ্যা বলে সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যায়। পরক্ষণেই সে মত পাল্টায়, এই লুকোচুরি অর্থহীন, তাছাড়া পরে 'বাবাকে মিথ্যা বলে ফাঁকি দিয়েছি' এই ভেবে কষ্ট পেতে হবে।

সে খুব সহজ গলায় বলে, 'না বাবা, নিল না।'

'নিল না কেন'– বাবা জানতে চান, 'সকালে তুই যেভাবে বেরোলি ... ।'

'সে ওদের ব্যাপার'– জামিল হাই তোলে, 'আমাদের ব্যবস্থা ওদের মনমতো না হলে আমরা আর কী করতে পারি। ... পত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল দিন কয়েক আগে, ওটা নিয়ে গিয়েছিলাম আজ। হলো না।'

কেন, কী বললো ওরা?

এত কিছু খুলেমেলে বলতে ইচ্ছে করে না জামিলের। তাতে তার না যতটা, তার চেয়ে বেশি কষ্ট বাবার। বাবার পরিচয় ধরেই ওখানে যাওয়া, আর সমস্যাটা সেখানেই।

সে একটা হাই তোলে, খুব সহজ গলায় বলে, যেন এমন কিছুই নয়, 'বললো, ওটা যে তুমি তার কী প্রমাণ? একই নামে দু'জন লোক থাকতে পারে, অনেক লোক থাকতে পারে।'

মানে?

বললাম তো বাবা। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তোমার নাম আছে ঠিক, কিন্তু ওই নাম আরো অনেকের থাকতে পারে। অর্থাৎ আমার দরখাস্তে পিতা হিসেবে আমি যে নাম উল্লেখ করেছি সেই নামের লোকটা আর তালিকার লোকটা যে একই ব্যক্তি, তার কী প্রমাণ? ... আমরা মুখে বললেই তা হবে না।

বাবা বোধহয় এবার গর্জে উঠতে চান, কিন্তু গলার স্বর তেমন ফোটে না, 'ওরা বললো একথা? ওরা বললেই হলো! আমরা নিজেরা জানি না? আমরা কি মিথ্যা বলছি?'

জামিল আরেকটা হাই তোলে, 'তা নয় বাবা, সত্য-মিথ্যার ব্যাপার নয়। তুমি নিজেই ভেবে দেখ, ওরা যা বলছে তাতো ভুল নয়। আর যদি সত্য-মিথ্যার প্রসঙ্গ তোল, তবে বল– ওরা কীভাবে বুঝবে যে আমরা সত্যি কথাই বলছি? ... আসলে ওরা সার্টিফিকেটই চাচ্ছে। ওদের দোষ নেই।'

বাবা জামিলের ক্রমাগত হাই তোলা উপেক্ষা করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। একসময় বলেন, 'এটা একটা কথা হলো?'

একটু হাসে জামিল, 'কিন্তু বাবা, ওদের তো নিয়ম-কানুনের মধ্যে দিয়েই এগোতে হবে।'

'নিয়ম'– বাবা হাসেন, 'হ্যাঁ, কত নিয়ম যে দেখবো জীবনে।'

এই বলে বাবা আর দাঁড়ান না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে জামিল পেছন থেকে বলে, 'বাদ দাও বাবা, এর চেয়েও ভালো কত চাকরি হতে হতে হয়নি।'

বাবা সে মুহূর্তেই পেছনে ফেরেন, 'আমি চাকরির কথা বলছি না।'

তবে? জামিল তাকিয়ে থাকে।

বাবা একটু থেমে থাকেন, একটু ম্লান হাসেন, 'তোর চাকরির জন্যে আমরা যখন এতদিন অপেক্ষা করতে পেরেছি তখন আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে পারবো। কিন্তু আমি অন্য কথা বলছি। তুই বুঝতে পারছিস না।'

তখন অদ্ভুত এক সুন্দর হাসিতে জামিলের মুখ ভরে যায়, 'হ্যাঁ বাবা, আমি বুঝতে পারছি। আমারও সেই একই কথা।'

এ রাতটিও প্রায় অনিদ্রায় কাটে জামিলের। ওই অফিসের লোকটার কোনো দোষ নেই, জামিল একথা বাবাকে বলেছে, এ কথা বিশ্বাসও করে সে। কিন্তু বাইরে যতটা, ভেতরে ততটা সহজ সে হতে পারে না। বরং অস্থিরতায় সে ছটফট করে। ওই অফিসে জয়েন করার কথা তার একবারও মনে হয় না; তার শুধু মনে হয়– দরখাস্তটা জমা দিতেই হবে, আর বাবারও তো এই একই কথা। না হোক চাকরি, অসুবিধা নেই কোনো, কিন্তু শুধু দরখাস্তটা তারা নিক, এতেই হবে। তার মনে হয়, এরপর যদি আর কোনো দিন সে না যায় ওই অফিসে, যদি দরখাস্ত জমা না দেয়– তবে তারা নিশ্চয়ই ভাববে সে তার বাবার মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বাড়তি সুবিধা নিতে গিয়েছিল। কিন্তু তা তো নয়। আর তাতে যে বাবাকে অপমান করা হবে। সে যে সত্যি কথা বলেছে, বাবার পরিচয় ভুল দেয়নি, অন্তত এটুকু প্রমাণ করার জন্যে দরখাস্তটা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করা যায়, এই নিয়ে সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে।

ছয়

দিন দুই পর সকালের দিকে হঠাৎ করে সে বাবাকে বলে, 'শরীর কেমন তোমার? একটু বেরোতে পারবে আমার সঙ্গে?'

'এখন'– বাবা অবাক হন, 'কোথায় যাবি আমাকে নিয়ে?'

'ওই অফিসে। ... তুমি চল। ওদের দেখিয়ে আসি, আমি মিথ্যা কথা বলিনি।... দরখাস্তটাও জমা দেওয়া হবে।'

বাবা অবাক হয়েই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর ক্রমশ তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, 'বেশ'। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে তিনি বলেন, 'কিন্তু অতসব কী নিয়েছিস সঙ্গে?'

জামিল একটু লাজুক হাসে, 'ওইসব পত্রিকাগুলো বাবা। ওই যে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন পত্রিকায় তোমার ছবি, সাক্ষাৎকার আর'– জামিল একটু থেমে থাকে, 'আর তোমার অসীম সাহসের কথা ছাপা হয়েছিল না, সেসব পত্রপত্রিকা।'

বাবা খুশি হন, 'বেশ, আমি এখনই রেডি হয়ে নিচ্ছি। ... আমিও ভাবছিলাম কী করা যায়। চল, ...মুক্তিযুদ্ধ শুধু সার্টিফিকেটে সীমাবদ্ধ নয়, ওদের বলবো, আমার শরীরেও

তার চিহ্ন আছে।'

তবে শরীরের চিহ্নটি কাজে দেয় না।

দরখাস্ত গ্রহণকারী লোকটা আজ খুব অবাক হয়। জামিলের মুখের দিকে কতক্ষণ হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে, বলে, 'হ্যাঁ, বুঝলাম উনি আপনার বাবা, কিন্তু ওনাকে কেন এনেছেন?'

: আমার বাবা যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, সেটা প্রমাণ করার জন্যে। আপনারা এমনিতে তো বিশ্বাস করছেন না।

লোকটার চোখ পিটপিট করে, 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' জামিল বাবার দিকে একবার তাকায়। লোকটার দিকে ফিরে স্থির চোখে বলে, 'আমার বাবার শরীরে একটা গুলির চিহ্ন আছে। ওটা দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।'

লোকটা এবার হতভম্ব হয়ে যায়, 'এসব কী বলছেন আপনি?'

সত্য কথাটাই বলছি। আমার বাবা ...।

জামিলের কথা শেষ হওয়ার আগে লোকটা এক হাত তোলে, 'আমি আপনার কথা অবিশ্বাস করছি– এ ধরনের কিছু তো কখনো বলিনি।'

'তবে ওর দরখাস্ত জমা নিচ্ছেন না কেন?' এবার বাবা জিজ্ঞেস করেন।

লোকটা কতক্ষণ জামিলকে দেখে, কতক্ষণ বাবাকে। বিড়বিড় করে কী বলে বোঝা যায় না। শেষে কারো দিকে না তাকিয়ে সে মুখ খোলে, 'দেখুন, আপনারা কী চান তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তা বোঝার ইচ্ছাও অবশ্য আমার নেই। আমার কথা হচ্ছে– আমাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। আপনারা প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র জমা দিন, তখন দরখাস্ত জমা নিতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না।'

জামিল লোকটার দিকে তাকিয়ে একটু একটু হাসে। তারপর একটা একটা করে হাতের কাগজ মেলে ধরে তার সামনে, 'দেখুন তো, আপনি একটু দেখে বলুন তো, এগুলো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কি-না?'

লোকটা কাগজগুলোর দিকে একবার তাকায়, জামিলকে জিজ্ঞেস করে, 'এসব কী?'

আপনি নিজেই দেখে নিন না।

'আমি বুঝতে পারছি না।'লোকটা কঠিন গলায় বলে।

কেন। এই দেখুন আমার বাবার ছবি, নিচে কী লেখা আছে দেখুন, এটা বাহাত্তর সালের পত্রিকা। আর এটা দেখুন, এই যে আমার বাবার ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ...। এটাই দেখুন ...।

লোকটা প্রায় ঠেলে সেসব পত্রিকা সরিয়ে দেয়, 'আমি এসব দেখার কোনো প্রয়োজন অনুভব করছি না। আর এগুলো আমাকে কেন দেখাচ্ছেন তাও বুঝতে পারছি না।'

'দেখাচ্ছি'– জামিল বলে, 'কারণ আপনি আমার দরখাস্ত জমা নিচ্ছেন না।'

'এক কথা কত বার বলবো আপনাকে'– লোকটা বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ে, 'আপনি সার্টিফিকেট দিন, আপনার দরখাস্ত আমি তখনই জমা নেব।'

'আপনারা সার্টিফিকেটের ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না'-

বাবা একটু রাগী গলায় বলেন, 'আপনারা তো জানেন যে কেউ ফলস্ সার্টিফিকেট জোগাড় করে জমা দিতে পারে।'

সার্টিফিকেট না তো কিসের ওপর জোর দেব? ... আর ফলস্ সার্টিফিকেটের কথা বলছেন? হ্যাঁ, পারে, যে কেউ ফলস্-সার্টিফিকেট জমা দিতে পারে। আপনারাও দিন না।'

বাবা মুহূর্তের মধ্যে রেগে যান, 'কী, কী বলছেন আপনি। ফলস্ সার্টিফিকেট জমা দেব আমি?'

'হ্যাঁ'– লোকটা বলে, 'যেভাবে বাপ-ব্যাটায় উঠেপড়ে লেগেছেন ... ফলস সার্টিফিকেট জমা দিলেই ঝামেলা মিটে যায়, আমিও যন্ত্রণা থেকে বাঁচি।'

'আবার যদি ও ধরনের কথা আমাকে বলেন তো.....'– বাবা ভীষণ চোখে লোকটার দিকে তাকান।

লোকটা নির্বিকার গলায় বলে, 'বলবো না। আপনারা হয় এখান থেকে চলে যান কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র জমা দেন।'

'কিসের কাগজ-পত্র'– বাবা এবার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আমি বলছি আমি মুক্তিযোদ্ধা। দ্যাটস্ ফাইনাল।'

'নো, দ্যাটস্ নট এনাফ।' লোকটাও গলা খোলে।

জামিল বাবাকে টেনে ধরে রাখতে পারে না। সে ভয় পায়, বাবার শরীর ভালো না, হঠাৎ একটা খারাপ কিছু ঘটেও যেতে পারে। কিন্তু বাবাকে ঠেকানো কঠিন। তিনি উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে যান। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছোটখাটো একটা গণ্ডগোল বেঁধে যায়। হৈ-চৈ শুনে আশপাশের লোক যেমন জড়ো হয়, তেমনি ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কয়েকজন। একজন এসে তাদের ঠিক পাশে দাঁড়ায়, জানতে চায়– কী ব্যাপার। জামিলরা কিছু বলার আগেই দরখাস্ত গ্রহণকারী লোকটা ঘটনাটা জানায়। শুনে সে লোক সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে তাদের দিকে তাকায়, 'আপনারা আমার রুমে আসুন প্লিজ। আমি দেখছি।'

এ লোকটি কর্তাব্যক্তি গোছের কেউ, বোঝা যায়। তার রুমটিও বড় ও সজ্জিত। জামিল ও বাবা বসার পর লোকটি হাসি মুখে বলে, 'আমার নাম গোলাম আলী। ... হ্যাঁ, এবার আপনাদের মুখ থেকে শুনি।'

বাবা গম্ভীর গলায় জানান, 'আমাদের কিছু অভিযোগ আছে।'

হ্যাঁ, নিশ্চয়, বলুন। ... দেখুন, আমরা মূলত সাহায্য সংস্থা। আমরা মানুষের মঙ্গলে বিশ্বাসী, আমরা মানুষের জন্যেই কাজ করছি, সরকারি সহযোগিতাও অবশ্য আছে...। বলুন, আমরা আপনাদের অভিযোগ অবশ্যই শুনবো।

বাবা আর জামিল একসঙ্গে মুখ খোলে।

একজন, প্লিজ। আমার বুঝতে সুবিধা হবে।

জামিল বলে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সে কী করেছে ও বলেছে, উত্তরে কাউন্টারে বসা লোকটা কী জানিয়েছে, এসব যতদূর সে মনে রেখেছে, বলে। মাঝে মাঝে বাবা তার কথা জুড়ে দেন এবং জামিল কথা শেষ করলে তিনি উত্তেজিত গলায় বলেন, 'দেখুন, কী বাজে কথা ওনার, বলেন কি-না একটা ফলস্ সার্টিফিকেট দিয়ে দিতে।'

গোলাম আলী সে কথা শুনে বাবার দিকে ফিরে মিষ্টি হাসে। তারপর জামিলের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা জামিল সাহেব, সত্যি করে বলুন তো ... খুব কি অন্যায় বা ভুল বলা হয়েছে আমাদের তরফ থেকে?'

জামিল ইতস্তত করে মাথা নাড়ে, 'না, ঠিক তা নয়...।'

আসলে আমাদের তরফ থেকে কোনো ভুলই বলা হয়নি।

জামিল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বাবা হঠাৎ দাঁড়ান, পরনের পাঞ্জাবি তুলে ধরে পেছন ফেরেন, 'ঠিক আছে গোলাম আলী সাহেব, দেখুন, আপনি নিজেই দেখুন, এই যে গুলির দাগ। ... একাত্তর সালে এক ফেস টু ফেস এনকাউন্টারে গুলিটা লাগে। ... আমি এরপরও মুক্তিযোদ্ধা না? আমার ছেলে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য না?'

লোকটার মুখে হাসি থেকেই গেছে, সে হাসি এখন আরো

বিস্তৃত হয় 'কিন্তু বুঝতে পারছেন না কেন– ঐ গুলির চিহ্নটি আমি আপনার ছেলের দরখাস্তের সঙ্গে ফাইলে রাখতে পারবো না। ... আরেকটা কথা, বলেই ফেলি। ... গুলির চিহ্নটা পুরনো ঠিকই, কিন্তু কেউ যদি বলে ওই গুলিটা বাহাত্তর সালে লেগেছে। ও সময় অনেক ঘটনা ঘটেছে ও রকম। গুণ্ডা-বদমাশ-হাইজাকার কিংবা রাজনৈতিক কর্মীরা গুলি খেয়েছে কিংবা কেউ যদি বলে আপনি ওই গুলি একাত্তর সালেই খেয়েছেন, তবে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে, তখন? ... প্লিজ, কিছু মনে করবেন না। আমি অবশ্যই আপনার বেলায় সে কথা বলছি না।'

'তবে? কী বলছেন একটু জানাবেন?' বাবা অসম্ভব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন।

আমি কথার কথা বলছি আর কী। ... আসলে সমস্যা হচ্ছে খুব ছোট– আপনার ছেলের দরখাস্ত গ্রহণ করতে হলে আমাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেতে হবে। ... শুনলাম সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেছেন ... এখন ...?

জামিল বাবার মুখ দেখে বোঝে কী পরিমাণ ক্ষেপেছেন তিনি। তার ভয় করে মুহূর্তের মধ্যে না কোনো অঘটন ঘটে যায়। সে তাড়াতাড়ি বাবার হাত চেপে ধরে, 'বাবা, বস তো তুমি।'

বাবাকে সে টেনে বসিয়েই গোলাম আলীর দিকে ফেরে। তখনই তড়িঘড়ি করে কিছু বলতে চায়। কিন্তু কী বলবে গুছিয়ে উঠতে পারে না। সে বোকার মতো বলে, 'কিন্তু আমরা তো মিথ্যা কথা বলছি না।'

গোলাম আলী আবারও হাসে, 'আমি কি কখনো সে কথা বলেছি? একবারও?'

'তবে দরখাস্ত জমা নিচ্ছেন না কেন?' বাবা বলেন।

'আপনারা আমার সমস্যা বুঝতে পারছেন না। বোঝার চেষ্টাও করছেন না।' গোলাম আলী বলতে বলতে দু'পাশে মাথা নাড়ে।

পারছি। জামিল ছোট করে বলে।

তবে?

জামিল তার উত্তর দেয় না। সে হাতের পত্রিকাগুলো গোলাম আলীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'আপনি কাইন্ডলি এই পত্রিকাগুলো একটু দেখবেন।'

লোকটা হাতঘড়ির দিকে তাকায়, একটু নীরস গলায় বলে, 'কী আছে ওতে?'

আপনি দেখুন না একটু, কাইন্ডলি।

গোলাম আলী আবার হাতঘড়ির দিকে তাকায়। একটু যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেই পত্রিকাগুলো দেখতে আরম্ভ করে।

জামিল উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে আর বলে, 'হ্যাঁ, ওটাই বাবার ছবি, বাহাত্তর সালে ছাপা হয়েছিল, ... আর ওইটায় বাবার সাক্ষাৎকার আছে ...।'

গোলাম আলী বেশ কিছুটা সময় নিয়েই পত্রিকাগুলো দেখে। একটু একটু করে হাসি ফোটে তার মুখে, প্রশংসার চোখে বারবার বাবার দিকে তাকায়, 'আরে, আপনি দেখছি দারুণ সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, ... বাবা, এতগুলো পত্রিকা আপনাকে কভার করেছে, ... এখানে দেখছি পুরো এনকাউন্টারের বিবরণ রয়েছে, ... শুধু আপনার কথা ...।'

ওই এনকাউন্টারেই আমি আহত হয়েছিলাম।

গোলাম আলী পত্রিকাগুলো ভাঁজ করে জামিলকে ফেরত দেয়। বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। ... চা খাবেন?'

বাবা সামান্য হাসেন, 'না, ধন্যবাদ। ... আপনি ওর দরখাস্তটা জমা নিন, তাতেই হবে।'

গোলাম আলী ক্রমশ আবার গম্ভীর হয়ে যায়, 'দুঃখিত, সেই পুরনো কথাই আমাকে বলতে হচ্ছে– আপনারা সমস্যাটা বুঝতে পারছেন না। ... ওনার দরখাস্ত জমা নিতে হলে আমাকে অথেনটিক কিছু পেতে হবে।'

'এগুলো অথেনটিক না?' বিস্ময়ে বাবার মুখ হাঁ হয়ে যায়।

গোলাম আলী মাথা নাড়ে, 'না, আমি ঠিক তা বলছি না। ... আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না! কেন যে ... শুনুন, সবই বুঝলাম আমি, কিন্তু আমাকে তো ডেকোরাম মেইনটেন করতে হবে, নাকি? ধরুন, আমি জমা নিলাম দরখাস্ত। কিন্তু হায়ার অথরিটির কাছে আমি কী করে প্রমাণ করবো এটা মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যের দরখাস্ত? ... বুঝতে পারছেন?'

জামিল বাবাকে কথা বলার সুযোগ দেয় না। সে মাথা দোলায়, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

তবে?

'সেটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না'– জামিল ক্লান্ত গলায় বলে এবং অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

'তবে'– শেষে সে বলে, 'কিছু তো একটা করতেই হয়। কী করা যায়, বলুন তো?'

গোলাম আলী কতক্ষণ ভাবে, 'ওয়েল, আপনারা একটা কাজ অবশ্য করতে পারেন।' আরো কিছুক্ষণ ভেবে নেয় গোলাম আলী, 'তা, আপনাদের সার্টিফিকেট বা তেমন কাগজ যখন নেই– আপনারা কাউকে দিয়ে লিখিয়ে আনুন না। এমন কাউকে দিয়ে যাকে আমরা রিলাই করতে পারি।'

'কী লিখতে হবে?' জামিল জিজ্ঞেস করে।

আপনার বাবা যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এটা লিখে দেবেন তিনি। অর্থাৎ তিনি সার্টিফাই করবেন।

'এতেই হবে আপনাদের?' বাবা জানতে চান।

গোলাম আলী একটু হাসে, 'হ্যাঁ, হবে। আমরা এটাকে তখন স্পেশাল কেস হিসেবে কনসিডার করবো। তবে মাইন্ড ইট, আবার বলছি– বিশ্বাসযোগ্য, আই মিন রিলায়েবল লোক হতে হবে। কিন্তু। অলরাইট?'

জামিল সামান্য মাথা দোলায়, হ্যাঁ, অলরাইট, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছে সে।

তবে তাড়াতাড়ি করবেন প্লিজ। দরখাস্ত গ্রহণের সময় কিন্তু প্রায় শেষ।

বাবা রাস্তায় নামার আগ পর্যন্ত কোনো কথা বলেন না। রাস্তায় নেমে একটু থামেন। রুমাল বের করে মুখ মুছে নেন। বলেন, 'খামোখাই এতদিন ঘুরালো। একথাটা আগে বললে এত ঝামেলা হতো না। যত্তসব।'

তুমি কি কারো কথা ভেবেছ? কারো কাছ থেকে ওরকম চিঠি আনা যায়?

বাবা একটু অবাক হয়েই জামিলের দিকে ফেরেন, 'কেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার যে সেক্টর কমান্ডার ছিল, তার কাছে যাব, আর তো কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ওরা তো এ ধরনের চিঠিই চাচ্ছে। ... চল।'

এখনই যাবে তোমার সেক্টর কমান্ডারের কাছে?

না, এখন পাওয়া যাবে না। আমি যতদূর জানি ওরা সংসদের অফিসে বিকেলে বসে। ... অল্প সময়ের কাজ। বিকেলেই যাবক্ষণ। তাই কালই দরখাস্ত জমা দিতে পারবি।

হ্যাঁ, তা পারবো। ... তুমি কি এখন বাসায় যাবে?

আর কোথায়। তুই ফিরবি না?

আমি একটু পরে যাব। চল, তোমাকে বাসে উঠিয়ে দিই?

বাসস্ট্যান্ডে ভিড়ের মধ্যে ঘামতে ঘামতে বাবার মেজাজ আবার ক্রমশ খারাপ হয়ে যায়। একসময় বলেন, 'ওদের



অডাসিটি দ্যাখ। বলে কি-না আমার এই গুলির আঘাতটা বাহাত্তর সালেরও হতে পারে। আমি নাকি গুণ্ডা-হাইজ্যাকার কিংবা ও ধরনের কিছু ... ।'

বাদ দাও বাবা। ওরা আর কী বলবে।

বাবা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বাদ দেব মানে? ওরা আমাকে রাজাকারও বলেছে, খেয়াল করেছিস?'

তোমাকে কখন রাজাকার বললো বাবা।

'তুই কেন এড়িয়ে যাচ্ছিস'– বাবা রাগত চোখে জামিলের দিকে তাকান, 'ওই লোকটা বললো তুই শুনিসনি? ওই লোকটা বলেনি– এই গুলি আমি একাত্তর সালেও খেতে পারি, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে? বলেনি? ব্যাপারটা তবে কী দাঁড়াচ্ছে?'

জামিল চুপ করে থাকে।

একটা চড়ে যদি ঐ লোকটার সবগুলো দাঁত ফেলে দিতে পারতাম ... ।

জামিল কথা ঘুরানোর চেষ্টা করে, 'কিন্তু বাবা, লোকটা কিন্তু আবার তোমার প্রশংসাও করলো একসময়।'

'কখন?' বাবা তীক্ষ্ণ চোখে তাকান।

ওই যে বাবা, আমি বাহাত্তর সালের পত্রিকাগুলো তাকে দেখতে দিলাম না, তখন ওগুলো দেখে বললো না, তোমার মতো সাহসী মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে তিনি খুব আনন্দিত।

বাবা তাকিয়ে থাকেন জামিলের দিকে, তারপর হাসতে আরম্ভ করেন, 'তুই ছেলে ভুলাচ্ছিস, জামিল? ওটা কী ধরনের কথা তুই বুঝতে পারিসনি? ওটা কথার কথা, বলতে হয় বলা, আমাদের একটু পিঠ চাপড়ে দেওয়া আর কি। ... তুই বুঝিসনি? ... বুঝেছিস, আমি জানি।'

জামিল চুপ করে থাকে।

বাবা একটু পর বলেন, 'তুই কিন্তু দরখাস্ত জমা না দিয়ে ছাড়বি না। তোকে দরখাস্ত জমা দিতেই হবে।' বাবা বলতে বলতে উদাস হয়ে যান, 'জামিল... , তোর বাবা মুক্তিযোদ্ধাই তো ছিল, এটা যেন কেউ ভুলে না যায়, কেউ যেন না ভাবে আমরা মিথ্যা কিছু দাবি করছি...।'

জামিল ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'ও কথা তোমার বলতে হবে না বাবা। তুমি না বললেও আমি শেষ পর্যন্ত দেখবো। ... এমন ব্যবস্থা আমি করবোই– যেন ওরা দরখাস্ত জমা নিতে বাধ্য হয়। ... তুমি দেখ বাবা, দরখাস্ত ওরা ঠিকই জমা নেবে।'

বাবাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে জামিল যায় ইউনিভার্সিটিতে। এ ক'দিন দেখা হয়নি পুতুলের সঙ্গে। তার একটু অবাক লাগছে। পুতুলের যে স্বভাব, তাতে এতদিন দেখা না হওয়ার কথা না। এমনিতে এর চেয়ে ঢের বেশি সময় গেছে দেখা না হয়ে। তবে সেদিন পুতুলই পেপার কাটিং দেখিয়ে তাকে ঠেলে পাঠালো। ওর তো উচিত, দিন দুই পরে এসেই খবর নেওয়া।

ভার্সিটিতে মিনিট বিশেক অপেক্ষা করতে হয়। সে পুতুলের ক্লাস রুমের এক পাশে বারান্দার রেলিংয়ের ওপর বসে সিগারেট টানে। নিজেকে এখনো তার আগন্তুক মনে হয় না। বরং চাকরি হয়নি বলেই হয়তো এখনো ছাত্র ছাত্র ভাবটা থেকে গেছে।

পুতুলদের ক্লাস শেষ হলে সে নামে। একটু দূরে গিয়ে লক্ষ্য করে পুতুল আরো দু'তিনটি মেয়ের সঙ্গে কমন-রুমের দিকে এগোচ্ছে। তাদের পেছনে পেছনে কিছুটা পথ যায় জামিল। শেষে পেছন থেকে ডাকে, 'এই মেয়ে, শোন।'

মেয়েরা সবাই প্রায় একসঙ্গেই ফেরে। জামিলকে দেখে সবাই হাসে। বাকিরা দাঁড়ায় না। 'তুই থাক তবে' – বলে এগিয়ে যায়।

'এ ক'দিন জ্বরে ভুগলাম'– পুতুল বলে, 'ভাইরাস।... তোমার খবর কী?'

আমিও ভুগছি।

ভাইরাস বাঁধিয়েছ?

'উঁহু'– জামিল মাথা নাড়ে, 'তুমি সেদিন বাঁধিয়ে এসেছ।'

'আমি'– পুতুল অবাক হয়, 'আমি তো সেদিন ভাইরাস নিয়ে তোমাদের বাসায় যাইনি।

: গিয়েছিলে। অন্যরকম ভাইরাস নিয়ে।

পুতুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, 'বুঝতে পারছি না। বাদ দিলাম... তোমার আসল খবর দাও। দরখাস্ত জমা দিয়েছ?'

জামিল হাসে, 'আরে, সেখানেই তো ভোগান্তি।'

পুতুলের ভ্রূ কুঁচকে যায়, 'মানে?'

চল, বলছি।

তারা লাইব্রেরির বারান্দায় এসে বসে, দুপুরবেলা বলে এখন ভিড় কিছুটা কম। জামিল বারান্দায় বসে সামনের

একটা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ওই গাছ তুমি অনেক বছর দেখেছ'– পুতুল বলে, 'দরখাস্ত জমা দাওনি কেন, তা বল।'

দিতে পারিনি।

কেন? অসুবিধা হয়েছে কোনো? ... আহা, একটু খুলেই বল না।

জামিল বলে, প্রথমদিন থেকে আজকের দিনের ঘটনা পর্যন্ত। সব শুনে পুতুল ঘনঘন মাথা নাড়ে, 'একি কথা, একি কথা! ওরা কি মগের মুল্লুক পেয়েছে?'

তাই তো মনে হচ্ছে।

'এখন কী করবে?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুতুল জানতে চায়।

বিকেলে হয়তো বাবার কমান্ডারের কাছে যাব। তার কাছ থেকে একটা চিঠি লিখে নের।

তারপরও যদি না হয়?

'না, তখন হবে'– জামিল বলে, 'ওখানকার অথরিটিও বললো।'

তা হলো তো ভালোই।

জামিল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, একটু হাসে সে, 'সমস্যাটা আসলে অদ্ভুত।'

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

ওদের মানে, ঐ অফিসকে যে পুরো দোষ দেব, তাও পারছি না...।'

বারে, ওরা তোমার দরখাস্ত জমা নিল না।

নিল না, ঠিক, একথা মনে হলেই মাথা গরম হয়ে যায়, আবার যখন একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখি তখন মনে হয়, আসলে তেমন কোনো দোষ নেই ওদের।

কেন?

আসলে একটা সার্টিফিকেট তো সত্যিই দরকার। সার্টিফিকেট মানে সে রকম কাগজ-পত্র হলেও চলে। ওরা হয়তো আমাদের সব কথাই বিশ্বাস করছে। কিন্তু আমাদের মুখের কথা তো ওরা ফাইলে রাখতে পারবে না।

'তাও ঠিক'– পুতুল মাথা ঝাঁকায়, 'তাহলে তুমি আর এত কেন চিন্তা করছো? ওদের ওপর এত রেগেইবা যাচ্ছ কেন?'

'সে তুমি বুঝবে না।' জামিল ক্লান্ত গলায় বলে।

'আমি যখন বুঝবো না'– পুতুল বলে, 'তখন বাদ।'

একটু মাথা ঝাঁকায় জামিল, পুতুলকে একবার দেখে, তারপর মনে মনে বলে, 'না পুতুল, ওটা এখন আর বাদ দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই।'

সাত

বাড়ি ফিরে জামিল দেখে বাবার শরীর ভালো নেই। শুয়ে আছেন, ছোট বোনটা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জামিল বোঝে, প্রেসার বেড়েছে। সে পাশে এসে বসে, জিজ্ঞেস করে, 'প্রেসার কি খুব বেশি মনে হচ্ছে বাবা?'

বাবা সামান্য মাথা নাড়েন, 'না, তেমন কিছু না। বিকালে যেতে পারবো।'

আহা, আমি সে জন্যে জিজ্ঞেস করছি না। ওখানে কাল-পরশু গেলেও চলবে। এমন কোনো জরুরি ব্যাপার নয় যে, তোমাকে অসুস্থ অবস্থায়ই ছুটতে হবে।

'না, আজ বিকেলেই যাব'– বাবা গম্ভীর গলায় বলেন।

এসব কথা চালিয়ে গেলে প্রেসার বাড়বে বই কমবে না। জামিল কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে, 'তোমাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে ভার্সিটিতে গিয়েছিলাম, পুতুলের কাছে।'

বলে সে বোকার মতো হাসে। দ্যাখে ছোট বোনও তার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছে। জামিলের বোকার মতো হাসিটা থেকে যায়, কথা ঘোরানো দরকার ছিল, ঠিক; তাই বলে একথাও সে কখনো বলতে চায়নি। অথচ কেমন সহজে বেরিয়ে গেল।

বাবা একটুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করেন, 'দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে?'

জামিল মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ, হয়েছে।'

তারপর আর কোনো কথা নেই। কিন্তু তখনই উঠে আসা যায় না। জামিল একসময় জিজ্ঞেস করে, 'ওষুধ খেয়েছ? ওষুধ-টষুধ সব আছে না কিনতে হবে?'

'না, আছে। খেয়েছি'– বাবা বলেন, 'তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?'

'ব্যস্ত কোথায়'– জামিল যেন একটু রেগেই যায়, 'তুমি ওষুধ খেয়েছ কি-না এটা জিজ্ঞেস করার মধ্যে ব্যস্ত হওয়ার কী দেখলে!'

বাবা কতক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তার দিকে, 'দুপুরে খেয়েছিস?'

না।

যা, খেয়ে নে। তোর মেজাজও ভালো নেই, বোঝা যাচ্ছে।

একটুক্ষণ বসে থাকে জামিল। তারপর উঠে এগোয়। পেছন থেকে বাবা বলেন, 'খেয়েই যেন বেরিয়ে যাস না।'

কেন? জামিল জিজ্ঞেস করে না, সে তাকিয়ে থাকে।

বিকেলে সংসদের অফিসে যাব।

বিকালে অবশ্য হয় না। তাদের সংসদের অফিসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যায়। জামিলের অবশ্য বেরোনোরই ইচ্ছা ছিল না। বাবার প্রেসার কমেনি, তাকানো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। আর একটু জ্বরের মতোও সম্ভবত আছে। কিন্তু ওই শরীর নিয়েও বাবা নাছোড়বান্দা, যাবেনই তিনি এবং অবশ্যই আজকে। সুতরাং জামিলকে তার সঙ্গে বাধ্য হয়েই বেরোতে হয়েছে।

বেরিয়ে সে রিকশা নিয়েছে। তাই নিয়েও বাবার কিছুক্ষণ গজগজ, 'কেন, রিকশা কেন! আমার শরীর কি এতই খারাপ? আমি নিজে তাহলে বুঝতাম না! আর তোরা এমন করে পয়সা নষ্ট করিস। বাসে গেলে কতগুলো টাকা বাঁচতো ভেবে দ্যাখতো।

জামিল কথা বাড়ায়নি। বাবার এ ধরনের আচরণ তার কাছে একদম নতুন। এ সময়ে কোনো কথা বলে বাবার মেজাজ আরো বিগড়ে দেবে, জামিল তাই চুপ করে থেকেছে।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিসটা বেশ বড়ই। কিন্তু প্রায় ভুতুড়ে বাড়ির মতো। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। অথচ ভেতরে আলো জ্বলছে, কয়েকজন আছেনও।

কিন্তু বাবার যাকে দরকার, তিনি নেই। তবে কি এসে চলে গেছেন?

বাবার এই প্রশ্নে একজন মাথা দোলান, না, এখনো এসেই পৌঁছাননি তিনি। রোজ অবশ্য আসেন না, তবে সাধারণত এ সময়েই আসেন।

সুতরাং অপেক্ষা, সেই লোক-ই তাদের এক ঘরে এসে বসান, 'আপনারা এখানে বসুন, এটাই ওনার রুম।'

বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হয় না। মিনিট দশেক। জামিল ভাবছিল উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাবে। কিন্তু তার আগেই একজন মৃদু পায়ে ঘরে ঢোকেন। টেবিলের উল্টো দিকে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে তাদের

দিকে অবাক হয়ে তাকান। বাবা কিছু বলেন না। লোকটা একটু সময় নিয়ে ড্রয়ার খোলেন, বন্ধ করেন, টেবিলের ওপর রাখা কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে তাদের দিকে ফেরেন, 'হ্যাঁ বলুন। আপনারা...।'

বাবা তার নাম বলেন।

লোকটা শুনে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ, বলুন...।'

বাবা এবার সেক্টরের নাম বলে অল্প অল্প হাসেন।

লোকটা বোকার মতো কতক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর প্রায় লাফিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেন, 'তুমি, তুমি... এতটা বদলে গেছ যে আমি প্রথমে একদম চিনতে পারিনি।'

বুঝতে পারছি। কত বছর পর দেখা?

'তো'– লোকটা এবার একটু ভাবেন, 'তা, সাত-আট বছর তো হবেই।'

আর এর মধ্যেই সব ভুলে গেছ! তোমার মেমোরি দেখছি খুব খারাপ।

আরে না, তুমি অনেক বেশি বদলে গেছ। ... সঙ্গে কে?

আমার ছেলে, জামিল।... জামিল, আরিফ সাহেব আমার কমান্ডার ছিলেন।

জামিল হেসে হাত তুলে সালাম করে, 'আপনার কথা বাবার মুখে অনেক শুনেছি। আপনার নাকি অসম্ভব সাহস ছিল...।'

উহু, তোমার বাবার চেয়ে কম।

বাবা একটু হাসেন, 'অনেকটা আন্দাজ করেই তোমার কাছে এসেছি। মানে, নিশ্চিত তো ছিলাম না তুমি এখনো এখানে বস কি বস না। তবু এলাম, তুমি না এলেও তোমার একটা খোঁজ হয়তো এখান থেকে পাওয়া যাবে– এই আশায়।'

'আরে হা'– আরিফ সাহেব বলেন, 'আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। ... কাজে এসেছ কোনো, না এমনিই এলে।'

বাবা আবার একটু হাসেন, 'না, এখন আর এমনি এমনি কোথাও যাওয়া হয় না। তোমার কাছে ছোটখাটো একটা কাজেই এসেছি, বলতে পার।'

পরে শুনবো। এখন একটু গল্প করে নিই।

এ ব্যাপারে বাবারও দেখা গেল খুব উৎসাহ, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতো বটেই তাতো বটেই।'

কিন্তু তাদের গল্প বেশিদূর অগ্রসর হয় না। তারা যেমন প্রবল উৎসাহে শুরু করেন তেমনি সহসা যেন ক্লান্ত– নিঃশেষ হয়ে পড়েন।

কোনো এক ঘটনাকে উপলক্ষ করে দু'জনই জোর করে হাসেন এবং সে হাসির রেশ ধরেই আরিফ সাহেব বলেন, 'হ্যাঁ বল। কী যেন কাজের কথা বলছিলে তুমি।'

বাবা বলেন।

সব শুনে আরিফ সাহেব ঘনঘন মাথা নাড়েন, 'আর বোল না, আর বোল না। সব জায়গায় এই এক অবস্থা, একই অবস্থা। ... আমাকে একটা 'টু হুম ইট মে কনসার্ন' জাতীয় চিঠি লিখে দিতে হবে, এই তো?'

হ্যাঁ, সে কথাইতো বললাম। দাও তোমার অফিসের প্যাডে একটা চিঠি লিখে।

'দিচ্ছি, ... তুমি'– তিনি জামিলকে বলেন, 'তুমি তোমার নাম লিখে দাও তো বাবা, এ কাগজটায়। তোমার সার্টিফিকেট নাম আর বানানের জন্য বলছি।'

জামিল লেখে। এই ফাঁকে আরিফ সাহেব লোক ডেকে চায়ের কথা বলেন।

চা খেতে খেতে বাবা এবং আরিফ সাহেবের মধ্যে টুকটাক কথা হয়।

'তুমি বুঝি রোজই আস এ অফিসে'– বাবা জিজ্ঞেস করেন।

ঠিক রোজ না। আবার বলতেও পার, আসি। আর যাবইবা কোথায়... এখানে কাজ তো নেই, নামেই অফিস। তবু আসি। অভ্যেস। সময় কেটে যায়।

সময় কেটে যায়?

আরিফ সাহেব একটু ভাবেন, 'যায়। কারণ এখানে এলে ঠিক দু'ধরনের অনুভূতি হয় আমার। ওই দুটো বিষয় নিয়েই ভাবতে ভাবতে সময় কেটে যায়।'

কী ধরনের অনুভূতি? বলা যাবে? নাকি খুব ব্যক্তিগত?

'না, না, তা নয়'– আরিফ সাহেব হাসতে হাসতে আনমনা হয়ে যান, 'আসলে এখন শুধু এখানে এলেই আমার নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা মনে হয়। দেশের আর কোথাও আমার নিজেকে তেমন মনে হয় না...।'

বাবা সামান্য হাসেন, 'আর দ্বিতীয়টা?'

আবার কখনো এখানে এসে আমার নিজেকে এসকেপিস্ট মনে হয়। ... মনে হয় পালিয়ে এসেছি, সবকিছু ছেড়ে। ... একটা কথা কি জান?

কী?

আমরা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছি। এই সীমিত পরিসরের বাইরে আসলে আমাদের কোনো অবস্থান নেই। ... যাকগে, এসব কথা বলেইবা কী। তুমি কি কিছু করছো?

বাবা মাথা নাড়েন।

একটা কিছু নিয়ে থাকলে পারতে। সময় অন্তত কাটতো।

তা ঠিক। কিন্তু শরীরে কুলোয় না। তাই বাসায় থাকতে হয়। আর সারাদিন বাসায় থাকতে হয় বলেই বুঝি সময় কাটানো কী কঠিন ব্যাপার। ... তুমি কিছু করছো?

তেমন কিছু নয়। চলে যায়। আমার তো আবার ফ্যামিলি নেই।

আমার শরীর তো গেছে। তোমার শরীরও ভালো মনে হচ্ছে না।

আসলেও ভালো না। ... ক্লান্ত, ভীষণ...।

আমারও সেই কথা। কী যে-ক্লান্তি। ভালো লাগে না।

তুমি সার্টিফিকেটটা ছিঁড়ে ফেলেছ কেন?

বাবা একটু অবাক হয়ে তাকান, হঠাৎ এই প্রশ্ন। ঠাণ্ডা গলায় বলেন, 'রেখেইবা কী করবো?'

এক ধরনের সান্ত্বনা। ওই যে, সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো। ছোটবেলায় দিত না?

ও ধরনের সান্ত্বনায় আমার দরকার নেই।

'তবু, কাজেও তো লাগে, এই যেমন এখন।' ভদ্রলোক একটু থামেন, 'তবে তোমার কথাও বোধহয় ঠিক। রেখেইবা কী লাভ, সান্ত্বনা পুরস্কার রেখেইবা কি লাভ। ... যাকগে, তোমার চিঠিটা লিখে দিই এখন। প্যাড, সিল সব আছে। প্রায় বিবৃতি-টিবৃতি দিতে হয়তো।'

পরদিন সকালে জামিল হালকা মেজাজে ঘর থেকে বেরোয়। সে ঠিক করেছে, দরখাস্ত জমা দিয়ে পুতুলের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। গতকাল শেষদিকে পুতুলের সঙ্গে একটু খারাপ ব্যবহারই করা হয়ে গেছে, তার মনে হয়। তার মনে হয়, পুতুলকে সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেও পারতো। পুতুল ঘটনার প্রথম অংশটুকু বুঝেছে, জামিল দরখাস্ত জমা দিতে না পারায় মন খারাপ করেছে, রেগেছেও কিছুটা। তবে এ

পর্যন্তই। বাকিটুকু ধরতে পারেনি, বোঝেনি জামিলের কষ্ট কোথায়। সুতরাং, পুরো ব্যাপারটা তাকে একটু খোলাসা করা যেত।

অবশ্য এখানেও জামিলের কিছু আপত্তি। অত কেন খুলেমেলে বলতে হবে পুতুলকে! তার সঙ্গে এত বছর হলো সম্পর্ক আর এই সামান্য ব্যাপার বুঝবে না! সামান্য কী, পরম-হূর্তে জামিলের মনে হয় এবং সে মাথা নাড়ে, না সামান্য নয়। আর তার মতো করে পুতুলের বোঝার কথা নয়। সুতরাং দোষ তার, সেই-ই মূল সমস্যাটা ধরিয়ে দিতে পারেনি পুতুলকে। আজ সে চেষ্টাটা সে করবে। জামিল ঠিক করেছে, দরখাস্ত জমা দিয়ে কিছু সময় সে কাটিয়ে আসবে পুতুলের সঙ্গে।

অফিসে দরখাস্ত গ্রহণকারী লোকটা তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফাইল-পত্রে এমনভাবে চোখ ফিরিয়ে রাখে, যেন জামিলের উপস্থিতি সম্পর্কেই সে জানে না। জামিল তবু তার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকলে লোকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ তোলে। এমনভাবে তাকায় যেন জামিলকে সে চেনে না। কোনো দিন দেখেনি। তারপর বিরস মুখে বলে, 'আপনার ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না। আপনি গোলাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন। এখন তো তিনিই এটা ড্রিল করছেন।'

বেশ, তাই সই। জামিলের মনে হয়, আসলে প্রথমেই গোলাম সাহেবের কাছে যাওয়া উচিত ছিল। রেফারেন্স-লেটারতো তিনিই নিয়ে আসতে বলেছেন। এ লোকে তো অতসব জানারও কথা নয়। সে ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'ধন্যবাদ, আমি তার কাছেই যাচ্ছি।'

তবে তার আগে তাকে মিনিট বিশেক অপেক্ষা করতে হয়। জরুরি মিটিং চলছে গোলাম সাহেবের রুমে। সুতরাং মিটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকা। এই অপেক্ষা অবশ্য খারাপ লাগে না জামিলের। কাজটা তো প্রায় হয়েই গেছে, এতদিন অপেক্ষার পর যখন, তখন আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে, সে গোলাম সাহেবের রুমের সঙ্গে লাগোয়া রুমে সোফায় আয়েশ করে বসে সিগারেট টানে।

মিটিং শেষ হওয়ার মিনিট পাঁচেক পর সে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায়। তাকে দেখে গোলাম সাহেব প্রথমে চিনতে পারে না। কয়েক সেকেন্ড সময় যায়, চিনতে পেরেই তার মুখ হাসিতে ভরে যায়, 'ওহ, আপনি। খুব জলদি জোগাড় করে ফেলেছেন দেখছি।'

জামিল হাসিটুকু ফিরিয়ে দেয়, 'হ্যাঁ, আপনি বললেন তাড়াতাড়ি করতে, সময় কম।'

তা অবশ্য ঠিক। দিন। ... আপনার অন্যান্য কাগজপত্রও সঙ্গে এনেছেন তো?

জামিল চিঠিটা বাড়িয়ে দেয়। জানায়, অন্যান্য কাগজপত্রও সে সঙ্গে এনেছে। তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে গোলাম সাহেব সেটা আলগোছে খোলে। তবে চিঠিটা পড়তে পড়তে ক্রমশ তার মুখ কিছুটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। এক পলক জামিলকে দেখে আবার চিঠির দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মুখ না তুলেই একটু পর বলে, 'ইফ ডোন্ট মাইন্ড মিস্টার জামিল-হু ইজ দিস জেন্টেল ম্যান? আপনি এটা কার রেফারেন্স-লেটার এনেছেন?'

জামিল গোলাম সাহেবের এই হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে যাওয়ার কারণ বোঝে না। সে অবাক হয়েই বলে, 'কেন, এই ভদ্রলোক মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবার কমান্ডার ছিলেন। আপনি বললেন না রিলায়েবল কারো কাছ থেকে লিখে আনতে।'

'হ্যাঁ, তাই আমি বলেছি, আমি তো তাই-ই বলেছি।...বাট ডু য়ু থিঙ্ক দিস জেন্টল ম্যান ইজ রিলায়েবল এনাফ?'

জামিল বোকার মতো গোলাম সাহেবের দিকে তাকায়, 'কেন নয়! বাবা তার আন্ডারে যুদ্ধ করেছেন। সুতরাং তিনিই তো সবচেয়ে ভালো জানেন। ... আমি বুঝতে পারছি না এর চেয়ে অথেনটিক আর কী হতে পারে!'

গোলাম সাহেবের মুখে এক চিলতে হাসি দেখা যায়, 'আপনি বুঝতে পারছেন না মিস্টার জামিল। অথেনটিক হওয়া না হওয়ার চেয়ে এ ক্ষেত্রে বড় বিষয় হচ্ছে রিলায়েবল হওয়া।'

কিন্তু তিনি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিলেন।

ছিলেন। ইয়েস, তিনি ছিলেন। বাট হু ইজ হি রাইট নাউ?

তিনি এখনো তাই।

গোলাম সাহেব সবেগে মাথা নাড়ে, 'উঁহু, আপনি বুঝতে পারছেন না। ... আমি তার এখনকার আইডেন্টিটি জানতে চাচ্ছি। এখন তিনি কী?'

জামিল চুপ করে থাকে।

গোলাম সাহেবই আবার বলেন, 'আর আপনি বলছেন এটা অথেনটিক। কিন্তু আমি বা আর সবাই কী করে সেটা বুঝি? তিনি তো ইচ্ছা করলেই যে কাউকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সার্টিফাই করতে পারেন, প্যাড আর সিল থাকলেই হলো ...।'

তার চেয়ে বেশি রিলায়েবল আর কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না।

গোলাম সাহেব শব্দ করে হাসে, 'জামিল সাহেব, আসলে আপনি এমন একজনের রেফারেন্স-লেটার এনেছেন যাকে চিনিয়ে দিতে অন্য আরেকজনের রেফারেন্স-লেটার লাগবে।'

জামিলের কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। কিন্তু তার গলায় স্বর ফুটতে চায় না। সে ভাঙা গলায় বলে, 'আমি বুঝতে পারছি না এর চেয়ে রিলায়েবল আর অথেনটিক আপনারা কোনটাকে বলবেন।' গোলাম সাহেব মাথা ঝাঁকায়, 'হতে পারে, আপনি নাও বুঝতে পারেন। ...দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার। বিশ্বাসযোগ্য লোকের রেফারেন্স লেটার পেলেই আমরা সেটাকে অথেনটিক বলবো।'

জামিল একবার ভাবে খুব জোরে চিৎকার করে উঠবে। গোলামের জামার কলার ধরে ঝাঁকাবে। বলবে, ইয়ার্কি পেয়েছ শুয়োরের বাচ্চা কিংবা সোজা চলে যাবে কোনো খবরের কাগজের অফিসে। গিয়ে সব খুলে-মেলে জানাবে। তেমন কোনো পত্রিকা অফিসে গেলে খবরটা নিশ্চয়ই বড় করে বেরোবে, সে ভাবে। কিন্তু ওসব কিছুই সে করে না। সে ক্লান্ত গলায় বলে, 'দরখাস্ত তাহলে জমা নেওয়া যাচ্ছে না?'

গোলাম সাহেব মাথা দোলায়, 'দুঃখিত...কী করে নেই বলুন? আমার পক্ষে সম্ভব না।'

জামিলও একটু মাথা দোলায়। তারপর ঘর থেকে বেরোবার জন্যে পা বাড়ায়। তবে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে সে হঠাৎ থামে। দ্রুত ফিরে আসে গোলাম সাহেবের টেবিলের সামনে। 'শুনুন, আমার এ চাকরিটার কোনো দরকার নেই।'

গোলাম সাহেব হঠাৎ একথার অর্থ বোঝে না। সে একটু অবাক হয়ে তাকায় জামিলের দিকে, তারপর দু'কাঁধ ঝাঁকায়, 'ওয়েল, সেটা আপনার ব্যাপার।'

কিন্তু আপনি আমার দরখাস্তটা জমা রাখুন।

'দরখাস্ত জমা রাখবো'– গোলাম সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়েই থাকে, 'কেন?'

সে আপনি বুঝবেন না। আপনি শুধু এই দরখাস্তটা জমা নিন। এটা আমার জন্যে খুব জরুরি।

এবার একটু বিরক্ত হয়েই মাথা নাড়ে গোলাম সাহেব, 'না না, তা কি করে হয়। পরে এ নিয়ে ঝামেলা বাধতে পারে।'

না, সত্যি বলছি কোনো ঝামেলা হবে না। দরখাস্ত জমা নিলে আমি আর কোনো দিন আসবো না এখানে। সত্যি

নিলে আমি আর কোনো দিন আসবো না এখানে। সত্যি বলছি।

না না, তা হয় না ...।

'নেবেন না'– জামিল কাতর গলায় বলে।

আহা, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, আমি তো আসলে ইনকমপ্লিট দরখাস্ত জমা নিতেই পারি না।

'ও'– জামিল ছোট করে বলে, বেরোবার জন্যে ফিরে দাঁড়ায়।

'শুনন'– পেছন থেকে গোলাম সাহেব বলে।

জামিল তখনই ফেরে।

'এখনও তো দু'দিন সময় আছে। আপনি অন্য কারো রেফারেন্স-লেটার জোগাড় করার চেষ্টা করুন না। ... তবে প্লিজ, যার-তার নয়, অ্যাকসেপ্টেবল কারো, আই মিন- আইডেন্টিটি আছে এমন কারো, অর্থাৎ যার কথা রিলাই করা যায় এমন কারো কাছ থেকে লিখিয়ে আনবেন। ওকে?'

জামিল বেরিয়ে আসে।

আট

বাড়ি ফিরে সে খুব সহজ গলায় বাবাকে বলে, 'বাবা, হলো না।'

সে ওই অফিস থেকে বেরিয়ে আর কোথায় যায়নি। বাড়ি প্রায় মাইল চারেক পথ। সে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসেছে। এই সময়টুকু সে ভেবেছে, বলবে কি বলবে না। প্রায় পুরো পথটাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে গেছে। শেষে একদম বাড়ির কাছে এসে মনস্থির করেছে। হ্যাঁ, বলবে সে, লুকোবার কিছু নেই। অবশ্য ভয় আছে, বাবার যে স্বাস্থ্য, শুনে হঠাৎ অজ্ঞানও হয়ে পড়তে পারেন।

সে রকম অবশ্য কিছুই ঘটে না। জামিলের ধারণা ছিল বাবা হয়তো চ্যাঁচাতে আরম্ভ করবেন কিংবা তখনই গোলাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে ছুটবেন। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে বাবা খুব সহজ শান্ত থেকে যান। উত্তেজনায় জ্ঞান হারানো তো অনেক দূরের কথা।

বাবা শুধু অবাক হয়ে কতক্ষণ জামিলের দিকে তাকিয়ে থাকেন, 'হলো না মানে?'

ওরা দরখাস্ত জমা নিল না।

নিল না কেন? কী অসুবিধা এদের?

'কে জানে' –জামিল ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমাকে অবশ্য বললো তোমার কমান্ডারকে ওদের যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। অর্থাৎ তিনি রিলায়েবল নন।'

তাই?

হ্যাঁ। ... আমাকে বললো আমি নাকি এমন একজনের রেফারেন্স লেটর নিয়ে গেছি যাকে আবার অন্য একজনের সার্টিফাই করে দিতে হবে।

আচ্ছা।

জামিল খুব সতর্কভাবে বাবাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু না, বাবার মুখের একটা রেখাও বদলায় না। যেন জামিল কাঁচাবাজার থেকে ফিরে কী কী জিনিসের দাম কেমন বেড়েছে তার ফিরিস্তি দিচ্ছে আর বাবা মন্তব্য করতে করতে শুনছে। জামিল অবাক হয়। বাবা এতটা নিরুত্তাপ থাকবে, সে বুঝতেই পারেনি।

সে বলে, 'চলে আসার সময় ঐ লোকটা অবশ্য আরেকবার বললো'

কী বললো?

না, মানে এখনও তো দিন দুয়েক সময় আছে। সম্ভব হলে অন্য কারও রেফারেন্স-লেটর নিয়ে যেতে বলল। তবে এমন কারও কাছ থেকে নিতে হবে, এই সমাজে যার একটা আইডেন্টিটি আছে, ওদের কাছ যার বিশ্বাসযোগ্যতা আছে ...।

ছোট এক টুকরো হাসিতেই বাবার পুরো মুখ ভরে যায়, 'ঠিক আছে। তুই ভেবে দেখ, আমিও ভাবি– কী করা যায়।'

দুপুর বেলাটা বাবা ঘুমিয়ে পার করেন। এমন সচরাচর ঘটে না। বাবা দুপুরবেলা সাধারণত ঘুমান না। কিন্তু আজ পুরো দুপুর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। জামিল বার দুই গিয়ে দেখে আসে। আসলে সে অবাক হয়েছে, ভয়ও পেয়েছে। এই অবেলায় বাবার এমন গভীর ঘুম কেন! বাসার আর কেউ অবশ্য বাবার এই ঘুমকে অস্বাভাবিকভাবে নেয়নি। একমাত্র নিতে পারতেন মা, কিন্তু মা এতসব ঘটনার কিছুই জানেন না। মাকে বলা হয়নি, তাছাড়া মা-ও সারা দিন ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, এদিকে কী হচ্ছে না-হচ্ছে খোঁজ-খবর রাখতে পারেন না।

বাবা অবশ্য বিকেলের দিকে নিজে নিজেই ওঠেন। জামিলকে ডেকে নিয়ে বারান্দায় চা খেতে বসেন। জামিল অবাক হয়ে দেখে, বাবাকে খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে। 'ভেবেছিস কিছু'– বাবা এক সময় জিজ্ঞেস করেন।

জামিল বোকার মতো মাথা নাড়ে। সে অবশ্য ভেবেছে, কিন্তু কিছুই মাথায় আসেনি।

'ঠিক আছে'– বাবা একটু হাসেন, 'তুই আমাকে এক টুকরো কাগজ আর কলম দে দেখি।'

জামিল কাগজ, কলম দিলে বাবা কী যেন লেখেন, কাগজের টুকরোটা জামিলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'নে, এর সঙ্গে দেখা কর, হয়ে যাবে।'

জামিল কাগজের টুকরোটা একটুক্ষণ দেখে, বাবার দিকে অবাক চোখে তাকায়, 'হয়ে যাব মানে, বাবা? তুমি এ মন্ত্রীকে চেন কী করে?'

বাবা আবারও হাসেন, 'আরে আমরা যুদ্ধ করেছি না একসঙ্গে। অনেকদিন ছিলাম একই সেক্টরে, পাশাপাশি, ... বলতে পারিস একবার আমি ওর প্রাণও বাঁচিয়েছি।'

'এতদিন এ কথা বলনি কেন বাবা?'

'ধ্যাৎ' –বাবা সবেগে মাথা নাড়েন, 'মন্ত্রী-ফন্ত্রীর কাছে কোনো কাজে যেতে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া এত ছোট কাজে মন্ত্রীর কাছেইবা যেতে হবে কেন! ... তবে, এখন বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে। দেখা কর তুই, আমরা খুব ক্লোজ ছিলাম, আর কথায় বলে না–যুদ্ধ ক্ষেত্রের বন্ধুত্ব কখনও মরে না।'

'কাজটা হবে তো'– জামিল একটু ইতস্তত করে, 'মানে বাবা, আমি বলতে চাচ্ছি মন্ত্রীর কাছে পৌঁছাতে পারব তো? ওনারা এত বেশি ব্যস্ত থাকেন ...।'

বাবা মৃদু ধমকে ওঠেন, 'হবে না কেন, কেন হবে না? না হওয়ার কী কারণ। আর এত লোক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করছে, তুই পারবি না? ... শোন, ওকে বলিস ব্যাপারটা একটু ইনভেস্টিগেট করে দেখতে। ব্যাটাদের একটু ঠ্যালা খাওয়া দরকার।... বলিস, আমিই যেতাম, কিন্তু আমার শরীরটা ভালো নেই।'

বাবাকে সত্যিই অসুস্থ দেখায়।

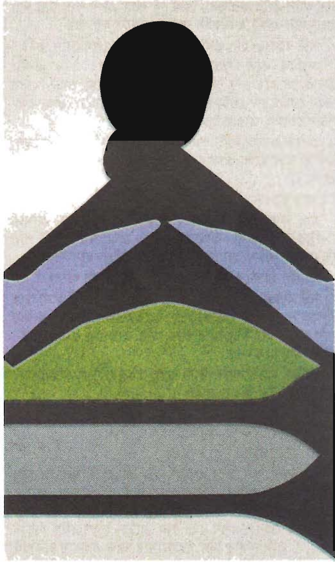
জামিলের আরেকটি রাত কাটে নিদ্রাহীন। তার ভালো লাগে না। পুতুলের ওপর রাগ হয় তার। ওরই দোষ, ওই জোর করে ওই অফিসে পাঠিয়েছে। ওর জন্যই এতসব ভোগান্তি। কাল যদি বাবার বন্ধু ওই মন্ত্রীকে ধরা যায়, তবে হয়তো ভোগান্তির শেষ হবে। তবে এ ক'দিন যা গেল, তা মনে

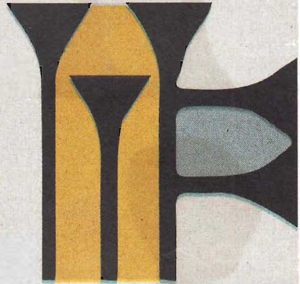
থাকবে তার। অবিশ্বাস্য মনে হয়, তার নিজের কাছেই। সে তো নিজেই জড়িত প্রত্যক্ষভাবে, নিজেই দেখেছে আর শুনেছে। অথচ এত সবের পরও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। আশ্চর্য, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের চিঠিও ওদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে আর থাকে কে? আর কী প্রশ্ন– 'হু ইজ হি রাইট নাউ!' বিরক্তি আর অপমান প্রায় সারা রাত তাকে অস্থির করে রাখে। শেষে কি-না এই ছোট কাজে মন্ত্রীর কাছে যেতে হচ্ছে। জামিলের হাসিও পায়। বাবার মতো তারও কোনো সুপারিশ নিয়ে কোনো মন্ত্রী-ফন্ত্রীর কাছে যতে একটুও ইচ্ছা করে না। কিন্তু উপায় কী, এখন অস্তিত্বের প্রশ্ন। এত ছোট কাজ নিয়ে মন্ত্রীর কাছে গেলে মন্ত্রী যদি অবাক হয় তো হোক, জামিলের কিছু করার নেই।

জামিল তাই করে। একদম সকালে উঠে সে চলে যায়। কিন্তু ওই সকাল বেলাই বেশ ভিড় এবং জামিল ওই ব্যক্তিগত সহকারীকে কোথাও খুঁজে পায় না। তাদের চোখের সামনে দিয়েই মন্ত্রী আধঘণ্টা পর বেরিয়ে যায়। মন্ত্রীর পেছনে পেছনে ভিড় ছোটে। জামিলও তাদের সঙ্গে দৌড়ায়।

অফিসের মূল গেট পেরোনো অবশ্য সহজ ব্যাপার নয়। তবে সেটা কীভাবে ম্যানেজ করতে হয়, তা জামিলের এই তিন দিনে জানা হয়ে গেছে। সে অফিসে পৌঁছে প্রথমেই দেখা করে ওই ব্যক্তিগত সহকারীর সঙ্গে। সে লোক বলে, 'কী হলো, দেরি করে এলেন যে?

'আমি বাসায় গিয়েছিলাম। আপনি বাসায় যেতে বলেছিলেন।'





কাজ ছোট হোক বড় হোক, মন্ত্রীকে ধরা অবশ্য সহজ কাজ নয়। জামিল প্রথম তিন দিন প্রচুর চেষ্টা করেও তার নাগাল পায় না। মন্ত্রী সব সময়েই ব্যস্ত। তিন দিনের দিন কেমন রোখ চেপে যায় জামিলের। এই তিন দিনে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারীদের একজনের সঙ্গে তার মোটামুটি কথাবার্তা হয়েছে। সেই লোকই বলে, 'আপনি কাল সকালে বাসায় আসুন দেখি, একটা ব্যবস্থা হয়তো করা যাবে।'

এর আগেও মন্ত্রীর বাসায় গেছে সে, লাভ হয়নি। তাই সে ইতস্তত করে, 'বাসায় তো গিয়েছিলাম আগে, দেখা হয়নি। কাল কি হবে?'

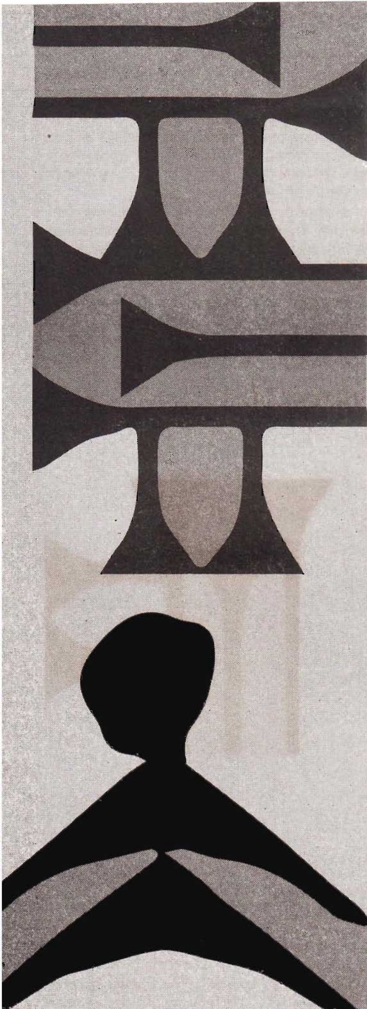
সহকারী জানায়, 'একদম সকাল সকাল চলে আসবেন। লিস্টে এক নাম্বারে আপনার নাম থাকলে দেখা হয়তো হবেই।

'আরে না, আমি কেন বাসায় যেতে বলব'– সে লোক বলে, 'ঠিক আছে, দেখি এখন কী করা যায়।'

ঘণ্টা খানেক পর সত্যি সত্যিই একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। জামিল ভেতরে ঢুকে দেখে মন্ত্রী ব্যস্ত। কী সব কাগজপত্র দেখছেন আর তার ফাঁকে ফাঁকে বোধ হয় দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন। জামিলের দিকে চোখ তুলে এক পলক দেখে বললেন, 'বলেন।'

এভাবে কি বলা যায়? কিন্তু আর কী উপায়! জামিল প্রথমে বাবার পরিচয়, একই সেক্টরে বাবা আর মন্ত্রী যুদ্ধ করেছে, জানায়। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি ওনাকে চিনতে পারছেন?'

মন্ত্রী 'ভ্রূ কুঁচকে যায়, তবে তা সামান্য সময়ের জন্য।



তিনি বাবাকে চিনতে পারেন এবং কিছুটা উদ্ভাসিতও হয়ে ওঠেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তোমার বাবাকে না চেনার কোনো কারণ নেই। ওর মতো রিয়েল ফাইটারকে কেউ কোনো দিন ভুলতে পারে না। হি ওয়াজ এ হিরো।'

জামিল একটু হাসে। বলে, 'আমি খুব ছোট একটা কাজ নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।'

'খুব দেখি ভদ্রতা শিখেছ'–মন্ত্রী হেসে ফেলেন, 'শুনবো শুনবো। তার আগে বল তোমার বাবা কেমন আছেন, কী করছেন? অনেক দিন দেখা নেই। ... আরে, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস বস।'

জামিল বসে। বাবার বর্তমান অবস্থা জানায়। জানায়, বাবার শরীরে কুলোয় না কিছু। এখন সারাদিন বাসায় বসেই সময় কাটে তার।

শুনে মন্ত্রী ঘন ঘন মাথা ঝাঁকান, 'তোমার বাবা খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, খুব বড় যোদ্ধা। ... ঠিক সময় বিদেশে ট্রিটমেন্ট হলে ...থাক, তখন গভমেন্ট তো ...।'

জামিলের মনে হয় এই মন্ত্রী প্রায় সব সরকারের আমলেই মন্ত্রী ছিলেন, একদম প্রথম থেকে। হ্যাঁ, সে সময়ের গভমেন্টেও ছিলেন, জামিলের মনে পড়ে।

এই তো ক'দিন আগেই তারা বন্ধুরা মন্ত্রীদের দলত্যাগ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল। কিন্তু সে কথা এখন বলা যায় না। বরং মুখটা একটু হাসিহাসি করেই রাখতে হয় তার।

মন্ত্রী বলেন, 'হ্যাঁ, এবার তোমার ব্যাপার বল দেখি, শুনি।'

জামিল বলে, যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে। তবে একটা ঘটনাও সে বাদ দেয় না। জানায়, এখন অবস্থা এমন, মন্ত্রীর একটা রেফারেন্স-লেটার লাগবেই। মন্ত্রীর একটা রেফারেন্স-লেটার পেলেই তার কাজ হয়ে যাবে।

শুনতে শুনতে মন্ত্রী শেষদিকে এসে ঘন ঘন মাথা নাড়েন, 'আমার মনে হচ্ছে আমার চিঠি নিয়ে তোমার কোনো কাজ হবে না।'

কাজ হবে না!

হ্যাঁ, কাজ হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। ওরা আমার মিনিস্ট্রির আন্ডারে না। তাছাড়া দরখাস্ত জমা দেয়ার ডেট পার হয়ে গেছে। এখন আমার চিঠি দেয়াটা উচিত হবে না।

জামিল হাঁ করে মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মন্ত্রী বলেন, 'ওখানে বাদ দাও। তুমি তোমার ঠিকানা আর টেলিফোন থাকলে নাম্বার কিংবা কাছের কোনো বন্ধুর নাম্বার রেখে যাও। আমি তোমার জন্য অন্য জায়গায় চেষ্টা করব। বেটার কিছু। কেমন?'

জামিল ফ্যাসফেসে গলায় বলে, 'কিন্তু ওরা যে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাবাকে স্বীকার করল না।'

মন্ত্রী এ কথার অর্থ বোঝেন না। সম্ভবত শুনতেও পান না। বলেন, 'আচ্ছা, কোন এলাকায় থাক তুমি?'

জামিল বলে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মন্ত্রী কী যেন হিসাবে কষে নেন। বলেন, 'আচ্ছা, তোমার মতো ইয়ং ছেলেরা দেশের কাজ কেন করে না? যেমন তুমি। তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করছো না কেন? এখন তো সব বিভেদ ভুলে দেশ গড়ার সময়। ... তুমি দু'চার দিন পর আমার সঙ্গে একবার অবশ্যই দেখা করবে, কেমন?'

সব বিভেদ ভুলে? তাহলে হয়তো ওই পুরনো প্রসঙ্গ টেনে কোনো লাভ হবে না। জামিল তবু বলে, 'কিন্তু ওরা যে বাবাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকার করল না?'

এবারও এ কথা মন্ত্রীর কান পর্যন্ত পৌঁছায় না, 'তুমি কিন্তু দেখা করছো আমার সঙ্গে, ভুলো না। ... আর হ্যাঁ, তোমার ঠিকানাটা রেখে যাও আমার পিএসের কাছে। ভাববে না, চাকরি তোমার একটা হবেই। ... তোমার বাবাকে সালাম দিও।'

বিকেল বেলা বারান্দায় বাবার পাশে বসে জামিল পা দোলাতে দোলাতে চা খায়। তবে তার এই পা দোলানো মাঝে মধ্যেই থেমে যায়। জামিল সেটা জোর করে চালিয়ে যায়। কিছুই হয়নি, সব কিছুই ঠিক আছে এই রকম একটা ভাব,

জামিল ঠিক করেছে, বজায় রাখবেই। বাড়ি ফিরে সে বাবাকে যতদূর সম্ভব সহজ করে বলেছে। আসলে বাবার ওই মন্ত্রী বন্ধুর কোনো কিছুই করার নেই, এ ক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই নিরুপায়, বাবাকে জামিল এভাবে বলেছে। বলেছে, 'মন্ত্রীকে তো ডেকোরাম মেইনটেন করতে হবে বাবা। ডেট পার হয়ে গেছে এমন কোনো জায়গায় তিনি চিঠি লিখে কী করে দেন! ইস, আমি যদি দু'দিন আগেও ওনার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। ... তবে বাবা, তোমার বন্ধুকে খুব সিনসিয়ার মনে হলো। বার বার বললেন, আমার চাকরির জন্য তিনি অবশ্যই দেখবেন। বারবার তোমার খোঁজখবরও নিলেন ...।' তবু এত কিছুর পরও জামিল বাবার মুখের দিকে তাকাতে ভয় পায়। বাবা তো শিশু নন। যা বোঝার তিনি ঠিকই বুঝে নেন। জামিলের ভয় এখানেই। এ শরীরে এমন একটার পর একটা আঘাত আর মানসিক যন্ত্রণা সহ্য হলে হয়।

কোনো একটা গল্প আরম্ভ করে বাবাকে একটু সরিয়ে আনা যায় কি-না, জামিল ভাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে ঠিক কী ধরনের গল্প উপযোগী হবে, সে বুঝতে পারে না। যে কোনো বিষয়ে একটা আরম্ভ করে দিলেই হয়তো হয়। এরকম ভেবে সে মুখ খুলতে যায়। কিন্তু তার আগেই তাদের বাড়ির সামনে বিশাল এক গাড়ি এসে থামে। বাবা এবং সে দু'জনেই অবাক চোখে তাকায় সেদিকে। কয়েক মুহূর্তে পর দেখা যায় বিডিকে। তার পেছনে ড্রাইভার, হাতে মিষ্টির প্যাকেট আর নানা ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে।

তাদের বারান্দায় দেখে বিডির মুখ হাসিতে ভরে যায়, 'দু'জনেই বাসায়। বেশ হলো। ... ভাইজান, আপনি আছেন কেমন? সেদিন রাস্তায় হঠাৎ করেই জামিলের সঙ্গে দেখা। ওরা তো আর এমনিতে কোনো খোঁজ-খবর দেয় না। তা রাস্তায় দেখা, ও বললো, আপনার শরীর ভালো নেই। ... তাই তো দেখছি।'

বাবা গম্ভীর গলায় বলেন, 'বস। ....জামিল, একটা চেয়ার এনে দে।'

বিডি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে জামিলের দিকে হাত ওঠায়, 'ওসব একে দাও। ... জামিল, তুই এগুলো ভেতরে নিয়ে যা।'

বাবার দিকে এক পলক তাকায় জামিল, দেখে বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে। সে ড্রাইভারের হাত থেকে জিনিসগুলো নিয়ে ভেতরে যায়। চেয়ার নিয়ে ফিরে এসে দেখে বিডি মোড়ায় বসে হাত-পায়ের আড়মোড়া ভাঙছে, বাবাকে বলছে, 'সময় পাই না ভাইজান, একদম সময় পাই না। সেই কবে শেষ এসেছি, মনে হলে নিজেরই খারাপ লাগে। ... আপনার না হয় শরীর খারাপ বাইজান, কিন্তু এই জামিল তো একটু খোঁজ-খবর, যোগাযোগ রাখতে পারে।'

জামিল একটু হাসে, চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এখানে বসুন।' বিডি চেয়ারে বসলে সে বসে মোড়ায়। একটু পর খেয়াল করে বাবা বিডির কথার টুকটাক উত্তর দিচ্ছেন। সে একটু স্বস্তিবোধ করে। ভয় ছিল, বাবা কখন কী কথায় হঠাৎ রেগে যান, মন তো এমনিতেই খারাপ। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি। এখন কিছু কথা-টথা বললে বাবা একটু সহজ হতে পারবেন।

কথা অবশ্য বিডিই বলছে একনাগাড়ে। বাবার শুধু 'হু, হ্যাঁ'। কথা বলতে বলতে বিডি হঠাৎ জামিলের দিকে ফেরে, 'সেদিন তোর সঙ্গে দেখা হলে তুই বললি একটা ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়েছিস। তা, কী খবর ওটার, চাকরিটা হয়েছে?'

জামিল বিডির দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়ে।

তা কী করছিস এখন? বাড়িতে বসে আছিস না চেষ্টা করছিস? জামিল চুপ করে থাকে।

রোজ তো পত্রিকায় অসংখ্য বিজ্ঞাপন বের হচ্ছে। তুই দেখে-শুনে ওসব জায়গায় অ্যাপ্লাই করছিস না?

জামিল একটু হাসে, 'অ্যাপ্লাই করব কি? চেষ্টা তো করছি, দরখাস্তই জমা দিতে পারি না।'

'মানে;– বিডি ভ্রূ কুঁচকে তাকায়, 'সেটা আবার কী ব্যাপার?'

জামিল চুপ করে থাকে। কথাটা সে বলতে চায়নি। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কাউকে বলতে না পেরে হয়তো চাপা ক্ষোভ ছিল মনের ভেতর। বলে ফেলে এখন হালকা লাগছে বৈকি। তবে বলা যে উচিত হয়নি সেটাও সে বুঝতে পারছে। সে আড়চোখে বাবার দিকে তাকায়। বাবার মুখে বাড়তি কোনো রেখা নেই দেখে সে একটু আশ্বস্ত হয়। বিডিকে ঠিক কী বলবে ভাবে। কিন্তু পরমুহূর্তে তাকে অবাক করে দিয়ে বাবাই বলে, 'ওতো চাকরির চেষ্টা করছে বেশ কিছুদিন হলো। কয়েকদিন আগে ও এক জায়গায় দরখাস্ত জমা দিতে গিয়েছিল। কিন্তু কী এক অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে ওরা দরখাস্ত জমা নিল না।'

বিডির ভ্রূ আবার কুঁচকে যায়, 'ইন্টারেস্টিং! জামিল, কী হয়েছে বল দেখি।'

জামিল আরেকবার বাবার দিকে তাকায়? বোঝে, বাবাও বেখেয়ালে হঠাৎ বলে ফেলেছেন। নইলে এসব, বাবার কখনও বিডিকে বলার কথা নয়। কিন্তু সে এখন কী করে? এখন আর চেপে রাখা উপায় নেই, মানেও হয় না। কথা অবশ্য ঘোরানো যায়। কিন্তু বিডি চালাক, বিডি বুঝবে। সামান্যক্ষণ ভাবে জামিল, তারপর খুব সহজ গলায় পুরোটা খুলে বলে। বলে ভাবে, বললাম তো কী হলো, এসব লুকিয়েই বা কী লাভ!

বিডি অবশ্য বিষয়টাকে মোটেও গুরুত্ব দেয় না, সে শুধু একটু ঠোঁট উল্টো, 'অ।' পর মুহূর্তে সে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়।

জামিলের মাকে এক সময় ডেকে বলে, 'ভাবি, এই আমার ফোন নাম্বার থাকল, ইচ্ছা হলেই ফোন করবেন, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আপনি ইচ্ছামতো ঘুরবেন, বেড়াবেন। সারাদিন বাসায় বসে থাকা ভালো না। জামিলের বোনকে কাছে ডেকে বলে, 'তোর চেহারা দেখেই আমার মনে হচ্ছে তুই গান জানিস। শোনা দেখি একটা।'

এক সময় সে বলেছিল, একদম সময় পায় না বলে সে আসতে পারে না, আজ সে সময় করে এসেছে এবং যখন তখন রাতে এ বাড়িতেই খেয়ে যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করে সে মত পাল্টায়, 'এহে, জরুরি কাজ আছে আমার, ভুলেই গিয়েছিলাম। ... আজ আর হচ্ছে না, পরে একদিন এসে সারা দিন থাকব, সেদিন খাওয়া যাবেক্ষণ।' এই নিয়ে বাড়ির কেউ কোনো আপত্তি তোলে না। বরং সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বেরোতে বেরোতে বিডি জামিলকে কাছে ডাকে, 'তুই শোন, কাল সকাল দশটার দিকে আমার অফিসে আয়তো একবার, জরুরি দরকার। ভুলবি না যেন। মনে থাকবে?'

জামিল মাথা নেড়ে জানায়, থাকবে; বিডি বেরিয়ে গেলে সে বলে, 'রাজাকার।'

শুনে বাবা হাসেন, 'কী বললি তুই, রাজাকার?'

আর কি বলবো? লোকটার ভাব-সাব দেখেছ?

বাবা আবারও হাসেন, 'হুঁ। আমাদের টাকা দেখিয়ে গেল। একগাদা জিনিস নিয়ে এসেছে সঙ্গে।'

সেদিনই তোমাকে বলেছিলাম না– আসলে নিজের রমরমা অবস্থা দেখাতে আমাকে প্রায় জোর করে নিজের অফিসে নিয়ে গিয়েছিল।'

বাবা সামান্য মাথা ঝাঁকান, একটু উদাস গলায় বলেন,

'ওর আর দোষ কী, মানুষ তো নিজেরটা দেখাতেই চায়।'

'বাবা, সমস্যা হচ্ছে'– জামিল বলে, 'যাদের দেখানোর কথা তাদের দেখানোর ক্ষমতা নেই, আর যাদের অস্তিত্বহীন থাকার কথা... তুমিই তো বলেছ, একাত্তরে ওর মতো দালালি খুব কম লোকই করেছে।'

বলেছি– বাবা বলেন, 'শুধু দালালি কেন, অনেক অন্যায়ও করেছে, তার প্রায় সবগুলোই ক্ষমার অযোগ্য।... থাক, বাদ দে এসব কথা।'

নয়

রাতে ঘুম হচ্ছে না, এ এক ভোগান্তি। জামিল দুপুরেই ঘুমের ওষুধ জোগাড় করেছে বাবার ওষুধের বাক্স থেকে। রাতে ভাত খেতে বসার ঘণ্টাখানেক আগে সে একটা মুখে পোরে। ভাবে, ভাত হওয়ার পর তাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না, বিছানায় গেলেই ঘুম।

কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটে না। সে বিছানায় এ পাশ-ওপাশ করে শুধু। 'ভালো লাগে না, ভালো লাগে না আমার'– সে বিড় বিড় করে বলে। কিন্তু ঘুমও আসে না তার। বেশ কিছু মুখ চোখের সামনে এসে ভিড় জমিয়েই থাকে। বাবা, গোলাম আলী, মন্ত্রী, বিডি। শেষে বাবার জন্যে দুঃখ হয় তার। না, নিজের কথা ভাবে না সে, তার শুধু বাবার জন্যে দুঃখ হয়। এ বয়সে এ শরীরে এত অপমান বাবার কি সহ্য হবে? তাদের জন্যে এই অপমান এই যন্ত্রণা অপেক্ষা করে থাকবে বলেই কি তারা একাত্তর সালে জান বাজি রেখেছিল? হাসি পায় জামিলের। সে ভয় পায়– সত্যিই না হাসতে আরম্ভ করে সে। হাসি ছাড়া এ মুহূর্তে কিইবা করার আছে আর!

এক ফাঁকে বাবার বন্ধু মন্ত্রীর কথাও মনে হয় তার। কী যেন বললো? ও, হ্যাঁ– সব বিভেদ ভুলে দেশের কাজ করতে হবে।

তাই? সব বিভেদ ভুলে?

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? বিভেদ আছে– কিন্তু তা ভুলে যেতে হবে, এই তো? বেশ বেশ। ঘুম পায় জামিলের। সে মৃদু গলায় বলে, 'ভুলে যাওয়ার যে পালা আরম্ভ হয়েছে, দেরি নেই– একাত্তরকেও বাধ্যতামূলকভাবে ভুলে যেতে হবে সবার।'

পরদিন খুব সকালে তার ঘুম ভেঙে যায়। শরীরে ক্লান্তি, উঠতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু শুয়ে থাকতেও না। সে উঠে এক কাপ চা বানায়। বারান্দায় এসে বসে চা হাতে। সে বোঝে, গত রাতের শেষ দিকে নিজের সঙ্গেই ঐ যে একটু ঠাট্টা-ইয়ার্কি, তাতে লাভ হয়নি কোনো। বরং শরীরে এখন পরাজয়ের গ্লানি বিশাল অস্তিত্ব নিয়ে অনায়াসে বসে আছে। ভালো লাগে না তার।

বিডি তাকে আজ সকালে দেখা করতে বলেছে, তার মনে হয়। বিডি যখন কাল বলেছিল, তখনই সে ঠিক করেছে, যাবে না। এখন, সে সেরকমই ভাবে। কী দরকার কে জানে, ঘাড়ের ওপর কী চাপিয়ে দেয় ঠিক নেই। হয়তো তাকে কাজহীন বসে থাকতে দেখে কিছু একটা মনে হয়েছে বিডির। আর সবচেয়ে বড় কথা, ঐ লোক বললেই তাকে যেতে হবে কেন! যাবে না সে, অন্তত এটুকু তো সে পারে।

কিন্তু বারান্দায় বসে এসব ভাবতে ভাবতে সে ক্রমশ উৎসাহীও হয়ে ওঠে। তার কাছে বিডির হঠাৎ কী এত দরকার! দরকার বলেই কি বিডি হঠাৎ করে এসেছিল? তার মনে হয়, হতেও পারে। প্রয়োজনে তো ঐ লোকগুলো সব পারে। হয়তো গেলে বলবে, 'এখন আসো, সব বিভেদ ভুলে এই কাজটা করি।' হাসে জামিল, তার মনে হয়, 'তবে যাই, দেখেই আসি কেন বিডির এই জরুরি তলব।' সে একবার ভাবে বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবে। তবে সে মত পাল্টায় পরপরই। এটা এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, বাবার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। নাস্তার পরপর সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

সে দুপুরের আগে আগে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে ঢোকার আগেই গেটের কাছে বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। বাবা সহজ চোখ তুলে তাকান। জামিল বোকার মতো হাসে।

কোথায় যাচ্ছ বাবা?

এই তো সামনেই। রহমান সাহেবের সঙ্গে একটু গল্প করে আসি।

বাবা তাকে পাশ কাটিয়ে এগোতে গিয়ে থমকেও দাঁড়ান, 'তুই অমন বোকার মতন হাসছিস কেন?'

দরখাস্তটা ঐ অফিসে জমা দিয়ে এলাম বাবা।

বাবা অবাক হয়ে তাকান, 'জমা দিয়ে এলি মানে?'

কাল তো বিডি চাচা তার সঙ্গে দেখা করতে বলে গিয়েছিলেন। আজ সকালে তার অফিসে গেলাম। তিনি আবার ঐ দরখাস্ত জমা না নেয়ার ব্যাপারটা পুরো শুনলেন। শুনে ঐ অফিসে ফোন করে কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। তারপর চিঠি লিখে পাঠালেন ঐ অফিসে।

তারপর?

জামিল একটু থামে। বাবার দিকে তাকিয়ে হাসে।

তারপর বাবা, বুঝেছ– আমি বাড়ি এসে অন্যান্য কাগজপত্র নিলাম, তুমি ছিলে না তখন। তারপর ঐ অফিসে গেলাম। আর, আর ওরাও খুব খুশি হয়ে আমার দরখাস্ত জমা নিয়ে নিল।... ডেট অবশ্য পার হয়ে গিয়েছিল।'

বাবা বিমূঢ় তাকিয়ে থাকেন।

জামিল আবার হাসে।

বাবা, তুমি যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলে, আমি যে মুক্তিযোদ্ধার ছেলে, তা ওরা বিডির কথায় বিশ্বাস করেছে বাবা।

জামিল বোকার মতো হাসতে হাসতে বোকার মতো কাঁদতে আরম্ভ করে।

***

জামিল পড়া শেষ করে বইটা সরিয়ে রাখলে, স্বপন জিজ্ঞেস করল– শেষ?

শেষ। তখন আর কিছু বলার ছিল না।

আমি বললাম– এটাও খুব সাদামাটা কাহিনী, সাহানার মতো।

দু'জায়গায়ই বিডি আছে, আমি এ ছাড়া কোনো মিল দেখছি না।

দু'জায়গায়ই বিডি আছে, এটা আরেকটা দুর্বলতা। তবে আমি ওই মিলের কথা বলিনি। বলেছি সাদামাটা সরল কাহিনী।

কাহিনী সাদামাটা না কি। জামিল বলল। এটা স্যার, আমার আর বাবার মাথা ব্যথা না। ওসব নিয়ে ভাবিওনি আমরা। ওসবের জন্য সমালোচকরা আছেন। আবার তারা কী বলবেন, সেটাও আমরা ভাবিনি কখনো।... স্যার, আপনি এই কাহিনীতে আমাদের অনেক ছোট করে দিয়েছেন।

আমি! আমি কীভাবে ছোট করলাম তোমাদের!

বিডির কথায়, বিডির অনুমোদনে আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা হলো, স্বীকৃতি পেল, এটাই কি ছোট হওয়া না?

সে তুমি বলতে পার। কিন্তু এটাও তোমাকে বুঝতে হবে, আমি একটা চিত্র, তখনকার একটা চিত্র তুলে ধরেছি মাত্র।

আমার কথায় সমর্থন দিল স্বপন, জামিলকে সে বলল– আপনি যেহেতু সাহানাকে চেনেন, তাই বলছি। সাহানার ঘটনার এটাও তখনকার এক বাস্তব চিত্র।

আপনার কি ধারণা, সেটা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই?

আছে নিশ্চয়ই। তবে আছেই যখন, তখন আর জিজ্ঞেস করছেন কেন!

কারণ আছে, সে জন্য। ... আমরা ছোট হয়ে আছি এখনো।

তোমাদের ছোট হয়ে থাকার কারণ নেই জামিল। সময়টা ওই রকম ছিল। তোমরা তোমাদের কারণে ছোট হওনি।

স্যার, এসব অনেকটা তত্ত্ব কথার মতো। কিন্তু যার ওপর দিয়ে যায়, সে জানে কী গেল!

আমি কথা ঘোরাবার জন্য বললাম– তোমার বাবার খবর বলো।

বলার কিছু নেই স্যার। আছেন, ওই রকমই আছেন?

তুমি চাকরিটা করছ?

কোন চাকরি স্যার?

ওই যে বিডির অনুমোদনে তোমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন...।

স্যার, ওই স্বীকৃতি আমরা নেইনি।

দেখো, কাহিনী আমি এমন এক জায়গায় এনে শেষ করেছি, তার পরের কথা আমার জানা নেই।

বললেন না– বাস্তব চিত্র। চিত্রটা আপনার দেওয়া হয়ে গেছে, আপনি শেষ করে দিয়েছেন। এরপর আর তো কিছু বলার থাকে না।

তা তোমরা বিডির অনুমোদনটা নিলে না।

নাহ, আমি আর বাবা মিলে ভেবে এটা ঠিক করলাম। বাবা বললেন, দেখো লেখক কিন্তু এখানে এনে ছেড়ে দিয়েছেন, আমরা তারপর কী করলাম, সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। সুতরাং এখানে আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি।

গুড। ভেরি গুড। তা এখন কী করছ তুমি?

ওই ওই রকমই স্যার। জামিল বলল। ওই রকমই চলছে।

চাকরি যখন নাওনি ওই অনুমোদনে ছোট লাগার কারণ নেই।

আছে। একটা ব্যাপার আপনি মাথায় আনছেন না স্যার। সেই অনুমোদন আমরা নেইনি বটে কিন্তু তাই বলে এটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না– আমাদের অন্যসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। আমরা কোথাও সুবিধা করতে পারিনি। কেউ আমাদের বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বিডির কথায় সব পাল্টে গেল। এই যে বিডির কথায় সব পাল্টে গেল– এটাই অপমান, এটাই ছোট হয়ে যাওয়া।

আমাকে জামিলের কথা স্বীকার করে নিতে হলো। আমি তার দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকালাম। স্বপনের দিকে তাকালাম– সাহানার ব্যাপারটাও এরকম, তাই না? ও ছোট ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, অসহায় বোধ করছিল, অপমানও ছিল সেখানে...।

কাহিনী তো স্যার, একই। স্বপনকে সুযোগ দিয়ে জামিল বলল। সাহানা অনেক বেশি অসহায়। তার বিডির ফেভার নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আমরা অতটা অসহায় না। ফলে আমরা অস্বীকার করতে পেরেছি। তার মানে অবশ্য এই না যে, অপমানটা কারো কম বেশি, দু'জনের সমান। ... আপনি আমাদের নিয়ে খেলেছেন।

আমি তীব্র গলায় প্রতিবাদ করলাম– ভুল।

জামিল মুখে ম্লান হাসি নিয়ে চুপ করে থাকল।

আমি বারবার বলছি, আমি একটা সময়ের কাহিনী বলেছি মাত্র।

আপনার একথাটাই শুনতে চাচ্ছিলাম।

কেন! আমি বুঝতে না পেরে অবাক চোখে তাকালাম।

এখন তাহলে আপনি এখনকার কাহিনী বলবেন। জামিল বলল। বলে স্বচ্ছ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

স্বপন মৃদু গলায় বলল– এখনকার কথা লিখতে আমিও বলি স্যার। সেদিন সাহানাও বলেছেন। লেখা তো উচিত।

লিখব। আমি ছোট করে বললাম।

শুরু করে দিন। লিখব বলে বসে থাকবেন না।

কিন্তু কিছুই গোছাতে পারছি না। বুঝতে পারছি না কী লিখব...।

আমাদের নতুন করে ছোট হওয়ার কাহিনী লিখবেন স্যার।

নতুন করে ছোট হওয়া।

শুধু আমাদের না। পুরো জাতির নতুন করে ছোট হওয়া। বিডিরা আমাদের ছোট করেছিল ক্ষমতাধর হয়ে। এখন ক্ষমতাধররা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সেজে কি আমাদের ছোট করছে না? একবার ভাবুন স্যার, মানুষ কত ছোট হলে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সামান্য অবদান না রেখে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে সব সুযোগ-সুবিধা লুটে নেয়!

লজ্জার, লজ্জার। স্বপন বলল।

সাহানার জমি দখলের ও রক্ষার পদ্ধতি ২৭ বছর আগে যেমন লজ্জা ছিল, স্বপন সাহেব, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সাজার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনই লজ্জার। দুটোই রাষ্ট্র লালন করেছে। সায় দিয়েছে। মেনে নিয়েছে।

মেনে আমরাও নিয়েছি।

আমরা রাষ্ট্রের বাইরের কেউ নই। ... স্যার , আপনি কিন্তু কথা দিলেন।

আপনার ভেতরটা কী বলছে?

না, না, আমি লিখব নিশ্চয়ই।

লিখবেন। না লিখে আপনার উপায় নেই। ... আপনার কাহিনী, তার জের আপনি টানবেন না?

সমস্যা হয়েছি কী, জানো? আমি এলোমেলো ছিলাম সাহানার ব্যাপারটা নিয়েই। এখন তুমি আসার পর আরো এলোমেলো।

তাছাড়া। স্বপন বলল। কয়েকজন, ধরলাম বেশ কয়েকজন, উচ্চপদস্থ তারা, দেশের নানা কিছু তাদের হাতে সম্পন্ন হয়, ভুয়া সার্টিফিকেটে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে, এই এটুকু নিয়ে কাহিনী সাজানোও মুশকিল ।

আশ্চর্য! জামিল অবাক হয়ে স্বপনের দিকে তাকালেন। মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে ব্যবসা আর রাজনীতি এই নিয়ে লিখবেন। এই নিয়ে লিখবেন। এই নিয়ে লিখলে প্রসঙ্গক্রমে সবকিছু চলে আসবে। ... আপনি নিজেও সাহিত্য করেন, এটা বোঝেন না?

আমি সাহিত্য করি এটা আপনাকে কে বলল! স্বপন অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল।

যার কোনো নাম নেই। জামিল মুচকি হাসল। আপনি অবশ্য রুমানা বলেন।

আপনি ওকে চেনেন!

আমি সাহানাকে চিনলেও ওকে চিনব না!... ভয় নেই। জামিল মুখ টিপে হাসল।

ভয় পাওয়ার কী আছে! স্বপন একটু বোধহয় তোতলাল। স্যার, স্বপন সাহেব গুছিয়ে বলেছেন, আপনার ওভাবেই লেখা উচিত।

কীভাবে লেখা উচিত, আমি সেটা ভাবতে শুরু করলাম। ❖

আলফ্রেড খোকন

সফরের সীমানা

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে– রবীন্দ্রনাথ



ভ্রমণ

এক

ছোটবেলায় বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা নাটকের একটা দীর্ঘ সংলাপ শুনতে শুনতে আমাদের অনেকেরই প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল– 'বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা...।' মজার ব্যাপার, তখন এই আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি, উড়িষ্যাই হবে আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ এবং তা অবশ্যই নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে! ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম তরুণ কবিদের সার্ক কবিতা উৎসব ২০০৮-এ বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিই ২১ ফেব্রুয়ারি। এই প্রথমবারের মতো মাতৃভূমি থেকে বাইরে একটি একুশ সত্যিই আমাকে বাস্তবের নিরিখে টের পাইয়ে দিল। নানান ভাষার কবিরা এসেছিলেন এই সম্মেলনে। তাদের অনেকেই মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষায় পারদর্শী নন। ফলে আকারে-ইঙ্গিতের ভাষাই আমাদের মনোভাব প্রকাশে ভূমিকা রাখছিল বেশি। 'আমার ভাষার সীমানা হচ্ছে আমার পৃথিবীর সীমানা।' এখানে এসে ভাষার দার্শনিক অস্ট্রিয়ার লুডবিগ হ্বিগেনস্টাইনের এই কথাটি চোখের সামনে প্রমাণিত হলো। ঢাকা থেকে কলকাতা, তারপর কলকাতা থেকে ট্রেনে চড়ে ভুবনেশ্বর যখন পৌছলাম তখন ২১ ফেব্রুয়ারির রাত ৯টা। আমার থাকার জায়গা উড়িষ্যায় নিখিল ভারতের আকাশবাণী ও দূরদর্শন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নেপালের কবি মানু মঞ্জিল, অনুবাদক ও গদ্যকার কুমুদ অধিকারীর আন্দাজ আমাকে অভ্যর্থনা কক্ষে পৌছতে সহায়তা করল। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অভ্যর্থনাকারী কৈলাসকে খুঁজে পেতে কৈলাস পর্যন্ত যেতে হবে ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার ভাবনার অবসান ঘটিয়ে আধ ঘণ্টা পর সে এলো এবং কক্ষের চাবিটা তর্জনীতে ঝুলিয়ে আমাকে তার অনুসরণ করতে বলল। ১৭ নম্বর কক্ষে ঢুকেই উড়িষ্যার অন্ধকার ও বেশ কিছু বুভুক্ষু মশার সম্ভাষণ আমাকে উৎসাহী করে তুলল। বাতাসে ভেসে আসা এক ধরনের স্যাতসেঁতে ম্লান গন্ধে আট জাতির সৌহার্দ্যের কথা বিস্মৃত হতে পারলাম না– এসবই উপঢৌকন হয়তো। অভ্যর্থনাকারী তরুণ কৈলাসের আনমনা ভাবখানি আমার বেশ লাগল।



কোনারকের মন্দির

তবুও সে আমাকে দক্ষিণের খোলা একটা বারান্দা উপহার দিতে কার্পণ্য করেনি। ঘুমিয়ে পড়ার আগে নিজেকে বিদেশি বিদেশি মনে হলেও, ঘুম আমাকে স্বদেশি করে তুলল।

ভুবনেশ্বরে কবিতা উৎসবের উদ্বোধন করলেন উড়িষ্যার গভর্নর চন্দ্রকান্ত বন্দ্রে। আনুষ্ঠানিকতার এক পর্যায়ে ঘাড় বাঁকা করে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানাল কবি ও ঔপন্যাসিক মন্দাক্রান্তা সেন। রাষ্ট্রীয় মর্যাদাপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের ক্ষেত্রে কোলের-পিঠের আচরণ, বিশেষ করে পাকিস্তানিদের ক্ষেত্রে এক রকম, অন্য আট দেশের কবি-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে আরেক রকম আতিথেয়তার জন্য মন্দাক্রান্তা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আমরা যেহেতু বিদেশি তাই দেখেশুনে চুপ করে থাকতে হয়েছে। কারণ এখানে দেশের সম্মান জড়িত। তবু বাইরে এসে আয়োজকদের সঙ্গে সাধারণ আলাপের ফাঁকে আমি জানিয়ে দিলাম, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের স্পর্শকাতর সম্পর্কটা এখানে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অনুষ্ঠান শেষে একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগল– এ ধরনের অনুষ্ঠানে কারা দাওয়াত পান, দাওয়াত পাওয়ার যোগ্যতাই বা কী! দু'একজন সত্যিকারের লেখক, বাকি সব অলেখক। কোনোমতে দাওয়াত এনে নিজের পয়সায় অংশ নেন। একটি দেশের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে সমস্ত রকম দুর্বলতা ভুলে দেশ ও জাতির মান-সম্মানের বিষয়টি যদি প্রধান না হয়, তবে তা কেমন হয়!

এই উৎসবের সমন্বয়কারী মি. পটনায়েকের কাছে প্রতিনিধিদের মান নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম। তার সাফ জবাব– 'আমি তোমার দেশকে আহ্বান করেছি। কে আসবে আর কে আসবে না; এটা তোমাদের ব্যাপার। আমি কী করে জানব যে কার মান কী?' মি. পটনায়েককে আমি আর কিছুই বলতে পারিনি।

সাইট সিইংয়ে ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো উদয়গিরি। মণিপুরি এক তরুণ কবির কাঁধে বানর নাচ আমার মনে গেঁথে রইল অনেকক্ষণ।

২৩ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা। কোনার্ক মন্দির যাওয়ার জন্য হেঁটে বাস ধরতে এলাম। আমার আসতে দেরি হওয়ায় বাসের পাশেই অনেকে দাঁড়িয়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেবন্তি ঘোষ ও অংশুমান কর, মন্দাক্রান্তা সেনসহ পাকিস্তানি তিন কবি ও আফগানিস্তানের দুই তরুণতম কবি– যাদের কণ্ঠে কবিতার চেয়ে 'মহব্বত' আর 'বহুত আচ্ছা' শব্দদ্বয় বেশ লাগে। বাসের কাছে আসতেই প্রায় দুই দিন পর এই প্রথম মন্দাক্রান্তা সেন হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে করতে বলল, 'হেই কবি আলফ্রেড খোকন, আমি মন্দাক্রান্তা সেন। আপনার গায়ে চের টি-শার্টটি বেশ সুন্দর।' আমার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললাম, 'খুলে দেব?' মন্দাক্রান্তা বলল, 'না, না'। আমি ওকে বললাম, 'মন্দাক্রান্তা, আপনার কবিতা আমি পড়েছি'। পাঠকের কাছ থেকে কবির এই প্রাপ্তি বা উপঢৌকনে মন্দা তার সারল্যভর্তি হাসি দিয়ে আমাকে সম্ভাষণ জানাল। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা সেবন্তি ঘোষ জানাল, 'নমস্কার।' অংশুমান কর বলল, 'আমি অংশুমান।'

বাসে উঠে আমরা কোনার্কের উদ্দেশে রওনা হলাম। শুভ্রাংশু পণ্ডে তরুণ কবি ও সাংবাদিক। ওকে নিয়ে আমি উড়িষ্যার জনপ্রিয় গায়ক ভিখারি বলের ভজন কিনলাম। বাসে তখন হিন্দি গান বাজছিল। আমি আর পণ্ডে মিলে বললাম, উড়িষ্যায় উড়িয়া গান হবে; হিন্দি নয়। তাই হলো।

দুপুরের আগেই কোনার্ক মন্দিরের সামনে নেমে পড়লাম। বহু যুগের পুরনো ভাস্করদের হাতে নির্মিত কোনার্ক মন্দির বহু আগেই পৃথিবীখ্যাত। এই মন্দিরের দেয়ালে তাকালে, সে সময়ের মানুষের যৌন-জীবনের অলিগলির অনেক পৃষ্ঠা পাঠ করা যায়। যৌনসম্ভোগের শতাধিক ভঙ্গির এই অভূতপূর্ব চিত্রমালায় যে কেউ আন্দোলিত হবে মুহূর্তে। মন্দিরের গায়ে সেই নাম না-জানা শিল্পীরা চিরকালীন বসন্ত বর্ণনা করে গেছেন, যা আজও এই তথাকথিত সভ্যতার মানুষের কাছে বিস্ময়ের ঘোর আনে অনায়াসে। এখানে এসে কেউ খুঁজে ফেরেন পড়ন্ত ইতিহাস, কেউ খুঁজছেন বিস্ময়, কেউ নন্দনতত্ত্ব, কেউ ধর্মতত্ত্ব। আবার কেউ খুঁজছেন পাওয়া না-পাওয়া।

কোনার্ক শেষে আমরা সন্ধ্যা নাগাদ পুরীতে পৌঁছলাম। এখানে এলেই মনে পড়বে কবি উৎপল বসুর পুরী সিরিজ। পুরীর মঞ্চে তরুণ কবিরা কবিতা পড়ল– কেউ অহমিয়া, কেউ হিন্দি, কেউ মারাঠি, কেউ বা উর্দুতে। বাংলায় কবিতা পড়ল পশ্চিমবঙ্গের সেবন্তি ঘোষ আর বাংলাদেশের শামীম রেজা। সেবন্তির কবিতায় 'সমকাম' শব্দ ব্যবহারের ফলে সেখানে হৈচৈ পড়ে গেল। এক বুড়ো প্রফেসর এই তরুণ কবিকে পারে তো কবিতা লেখা শেখায়। ওই পৃষ্ঠা পড়া প্রফেসরের বাড়ি কোনার্ক থেকে সামান্য দূরে। কোনার্কের কাম-আকাম-সকাম, সঙ্গম-সমকাম, আরোহণ-অবরোহণের সমস্ত ভাস্কর্য দেখেও এই প্রফেসর সেবন্তির কবিতায় 'সমকাম' শব্দটিকে মেনে নিতে পারছে না!

মন্দাক্রান্তা কলকাতার মেয়ে। বর্ধমানে থাকে অংশুমান। সেবন্তি শিলিগুড়িতে। শামীম রেজা গোয়াগামী, কারণ সে নাকি তার উৎস খুঁজে ফিরছে। গোয়াতেই উপমহাদেশের উপদংশ বা ফেরেঙ্গব্যাধি বিস্তারী ভাস্কো দা গামা প্রথম পা রেখেছিলেন। গোয়ানিজদের সঙ্গে শামীমের চেহারার কোনো সাদৃশ্য-রহস্য উন্মোচিত হয় কি-না সেই আবিষ্কারের নেশায় সে, এমনকি বন্ধুসঙ্গ ত্যাগে ব্রতী হলো। আমি যেহেতু কলকাতায় যাব, তাই মন্দা আর আমি দু'জন একই ট্রেনে কলকাতা যেতে পারি। তাতে দু'জনেরই বিষণ্ণতা কমবে। অতএব ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোরে ভুবনেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে

পৌছে গেলাম। আমি উদ্বিগ্ন, ট্রেনের টিকিট আছে কিন্তু আসন পাইনি বলে। কিন্তু মন্দাক্রান্তা বলল, 'চিন্তা করো না, আসন পেয়ে যাবে।' মন্দার পাশে বসেই রওনা হলাম কলকাতা। অনেক প্রশ্নের ভিড়ে ওকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, তোর দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখক প্রায়ই আমার দেশের কোনো কোনো ব্যবসায়ী-লেখকের নাম বলে জিজ্ঞেস করে, আমি চিনি কি-না। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু নির্দ্বিধায় একজন শক্তি, শঙ্খ, সুনীল, বিনয় কিংবা উৎপলের নাম বলে দিতে পারি এক নিশ্বাসে। এমনকি তোদের মতো অনেক উজ্জ্বল তরুণের নামও বলতে পারি। কিন্তু তোর দেশের লেখকেরা আমাদের আরজ আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, মাহমুদুল হক, আহমদ ছফা, হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ শামসুল হক কিংবা রফিক আজাদের নাম বলতে হোঁচট খায়; আমাদের সময়ের উজ্জ্বল বন্ধুদের নাম তো দূরের কথা। কেন?' মন্দাক্রান্তা সেন বলল, 'আমরা সেই জায়গাটা ভাঙব। তোরা সহায়তা করবি।' ট্রেনের কামরায় দুই দেশের এই আন্তঃআড্ডার সময় ফুরিয়ে এলো। ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌছল। আমি ওকে বললাম, 'বন্ধু, হিন্দিতে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিস, আমি হিন্দি জানি না।' ইংরেজিতে ডাকলে ফরেনার ভেবে বেশি চায়।' ও বলল, 'এত ভাবছিস কেন, আমি তোর বন্ধু না!' প্ল্যাটফর্ম থেকে সড়কের পাশে এসে দাঁড়ালাম। দেখি মুখোমুখি 'কেপি' লেখা একটা জিপ ও একটা অ্যাম্বাসেডর দাঁড়িয়ে। জিপ থেকে নেমে এলো কলকাতার দু'জন পুলিশ। সাধারণ পোশাকে নেমে এলো এক তরুণ। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাধারণ পোশাকের ওই লোকটি বৃহদাকৃতির একটি ফুলের তোড়া আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'কলকাতায় আপনাকে স্বাগতম! আমি কলকাতা পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে কাজ করি। আমি ও মন্দ্রাক্রান্তা মিলে একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করি, নাম 'বৃষ্টিদিন'। আমি বিস্মিত। মন্দার চোখমুখে হাসি। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলল, 'চল, তোকে তোর হোটেলে পৌছে দিই।' আমাকে কিছুই না বলতে দিয়ে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দিয়ে গাড়ি বয়ে নিয়ে চলল পার্ক স্ট্রিটের দিকে।

ঢাকায় এসে বন্ধু-কমরেড আজফার হোসেন, রাজীব নূর, আহসান কবির ও রেজা ঘটক যখন কৌতূহলবশত শুনছিল আমার ভারত ভ্রমণের কাহিনী, হঠাৎ আহসান কবির রফিক আজাদকে মনে করে বললেন, 'কবিকে স্যালুট করবে পুলিশ।'

আমার মনে হলো, কবিই সকলকে সাম্যের স্যালুট করতে শেখায়।

দুই

কলকাতা ও উড়িষ্যার পর দার্জিলিং যাই নিজ খরচ ও গরজে। ভারতবর্ষের এই একটি মাত্র অঞ্চল সম্পর্কে এত কথা শুনেছি আর শুনেছি, ফলে দার্জিলিং স্বপ্নের বসতবাড়িতে পরিণত হয়ে আছে বহু আগেই।

স্বপ্নপূরণের মতো এই ভ্রমণের শুরুতেই বুড়িমারী হয়ে সড়কপথে দার্জিলিং যাওয়ার সময় আমার মনটা সত্যিই আহত হলো। যদিও আগেই জেনেছি, পৃথিবীর সব সীমান্ত অঞ্চলে মহব্বত একটু কম। দু'দেশের সীমান্তরক্ষীরা মানুষকে এখানে প্রাণী ভাবে এবং কাউকে অবৈধ ভাবতে তাদের মুহূর্ত লাগে মাত্র। বুড়িমারী বর্ডারে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষে ভারতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে যখন বাংলাদেশ প্রান্তে দাঁড়ালাম, তখন বিডিআর (অধুনা বিজিবি) আমাদের লাইনে দাঁড়াতে বলল। যথারীতি তাই করলাম। কিন্তু জিরো পয়েন্ট পার হওয়ার কয়েক গজ আগে সড়কের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত কপিকলের মতো একটা বাঁশ রাখা হয়েছে। প্রত্যেককেই ওই বাঁশটির নিচ দিয়ে মাথা নিচু করে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ দেশ থেকে মাথা নিচু করে অন্য দেশে ঢুকতে হবে। আমি বাদ সাধলাম– মাথা নিচু করে যাব না। আমি মাথা উঁচু করে বাঁশ ডিঙিয়ে যাব অথবা আমার জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি কোনোমতেই মাথা নিচু করে দেশত্যাগ করব না– এটা বিডিআরকে জানিয়ে দিলাম। আমার পেছনে এক ভদ্রলোক আমাকে সাহস জোগালেন। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি তো আমার চেয়ে বয়সে বড়; আপনিও বলুন। তিনি সম্ভবত অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। তার ছেলে দার্জিলিংয়ের একটি স্কুলে পড়ে। ঈদের ছুটিতে ছোট্ট ছেলেকে আনতে যাচ্ছেন। তাই তার সাহস শেষ পর্যন্ত টিকল না। আমাকে লাইন থেকে বের করে নিয়ে এলেন একজন সীমান্তরক্ষী। তার অফিসারের কাছে নিয়ে বললেন, 'স্যারকে বলেন।' আমি বললাম– 'আমার দেশ থেকে আরেক দেশে আমি কেন মাথা নিচু করে যাব?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী করি। বললাম– 'আমি কবি'। পাসপোর্টে আমার পেশা লেখক। অফিসার আর কোনো কথা না বাড়িয়ে আমাকে পাশ দিয়ে ওপারে চলে যেতে বললেন। আমি একা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। অন্যরা এই দৃশ্য দেখেও মাথা নিচু করে ওপারে যেতে লাগল।

এবার বুড়িমারী-ভারত সীমান্তে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হবে। একজন দারোগা ও কয়েকজন পুলিশ টেবিল নিয়ে বসে আছেন। দারোগা পাসপোর্ট দেখে সিল-সই করলেই ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবে, অন্যথায় পেছনে ফিরে যেতে হবে। কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর কিউতে এবার আমার পালা। আমি পাসপোর্ট দিলাম। দারোগার নাম কী সিং যেন। তিনি পাসপোর্ট খুলে প্রফেশন দেখে দাঁড়িয়ে সালাম জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যারাইভাল সিল মেরে পাসপোর্ট আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'স্যার, ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি কালেকশন উইথ ইউ?' আমি বললাম, 'আই ক্যান গিভ ইউ অ্যান ইংলিশ ট্রান্সলেশন অব মাই পোয়েট্রি অর বেঙ্গলি প্রোস। তিনি বললেন, 'প্লিজ'। আমি তাকে আমার কবিতার ইংরেজি অনুবাদ 'দ্য ফাল্গুন ফেনোমেনা' দিলাম।

ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষ করে বুড়িমারী থেকে শিলিগুড়ি পৌছতে বিকেল ৩টা বাজল। শিলিগুড়ি থেকে দশজনে মিলে একটি টাটা সুমো ভাড়া করে দার্জিলিংয়ে রওনা হলাম। ভ্রমণেচ্ছুদের এই একটা সুবিধা, চেনা-জানা লাগে না। একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই হলো। মুহূর্তেই সহযাত্রী জুটে যায়, ভাগাভাগি করে যাওয়া যায়। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং প্রথমে চা বাগানের বুক চিরে রাস্তা চলে গেছে, তারপর ধীরে বেঁকে বেঁকে, ঘুরে ঘুরে ক্রমশ উঁচুতে। আর তখন থেকেই গায়ের ভেতর শীত শীত অনুভূতি ছুঁতে লাগল। গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে নিচের দৃশ্য দেখে কখনও বুকে শিহরণ লাগবে, কখনও রোমাঞ্চ জাগবে– কখন পৌছব স্বপ্নের দরজায়! ঘণ্টাতিনেক পর আমরা পৌছলাম দার্জিলিং। হোটেল অপ্সরার ভেতর যখন ঢুকলাম তখন কনকনে ঠান্ডা। রুমের ভেতর ঢুকতেই বিস্ময় ঢুকে পড়ল চোখে। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে মুখ করা রুমের একপাশ কাচের দেয়ালে ঘেরা। বাইরে বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুতের ঝলকে কাঞ্চনজঙ্ঘার আরেক রূপ। হোটেল ম্যানেজার বললেন, সবার ভাগ্যে এই দৃশ্য জোটে না। কারণ তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রয়েছে সন্ধ্যায় ঝড়ো আবহাওয়া থাকলে পরদিন আবার রোদ্দুরে ভেসে যায়। তবে এই মেঘ এই বৃষ্টি দার্জিলিংয়ের সাধারণ দৃশ্য। পরদিন ভোরে কাঞ্চনজঙ্ঘার অতুলনীয় রূপ কাচের জানালা ভেদ করে তার কিছু আভা আমার দেহে লাগল। দোলা লাগল, এই দৃশ্য দেখতে দেখতে উঠে

পড়লাম। পৃথিবীতে কিছু দৃশ্য আছে তার পাশে দাঁড়ালে কোনো বর্ণনা চলে না, কেবল চেয়ে থাকা চলে।

কুয়াশা মেঘ শিশির ভেদ করে গাড়ি এসে গেছে অপ্সরার গেটে। এখনও ভোরের নরম আঁধারে ভরে আছে দার্জিলিংয়ের সমস্ত শরীর। অন্ধকার কেটে যাবার আগেই আমরা যাব টাইগার হিলে। সেখান থেকেই নাকি কাঞ্চনজঙ্ঘার আসল রূপ।

টাইগার হিলে যখন পৌছলাম তখন আমরা সমতল থেকে প্রায় ১২০০ ফুট উঁচুতে। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে পর্যটকরা এসে ভিড়েছে এখানে। অধিকাংশের হাতেই ভর করে। ২০০৮ সালের কথা। তখন দার্জিলিং ঘুরে আমি মাত্র দু'জন শিল্পী আবিষ্কার করেছিলাম; সরল চোখে যাদের পেশা ভিক্ষাবৃত্তি। তারা দুই ভাই। অনেকটা শারীরিক প্রতিবন্ধী। রাস্তার পাশে বেহালা বাজিয়ে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে অর্থ উপার্জন করে। যদিও এটাকে ভিক্ষাবৃত্তি বলা যায় না। কারণ তারা গানের বিনিময়ে অর্থ চায়। আর ভিক্ষুকেরা বিনিময়হীনভাবেই হাত বাড়ায়। ভিক্ষুক চোখে না পড়লেও কোনো কোনো এলাকায় ক্ষুধা-দারিদ্র্যে ক্লিন্ন পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে কিছু অমল ধবল মুখ দেখে আমার মনে হয়েছে, সত্যি হয়তো পাহাড়ি মেঘের মতো আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।



দার্জিলিংয়ে সস্ত্রীক লেখক

ক্যামেরা। ক্লিক করে উঠল চারপাশ। দূরে সূর্য দেবতা তার দিনের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন বলে চারিদিকে আসহবেণীকলার আভায় জানান দিচ্ছেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে নিচ থেকে তিনি আসবেন, তাই আমরা উপরে দাঁড়িয়ে আছি। ক্রমশ তিনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। আর আমরা নিচে নামতে থাকছি। কাঞ্চনজঙ্ঘার এই রূপ দেখে বহু কিছু মনে আসে তখন। আবার থমকে যায় সব মনে পড়া। কিছুক্ষণ পর সূর্য উপরে চলে এলো। কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ পরিবর্তিত হলো। পাহাড়ের চূড়ায় জমাট বরফের গায়ে সূর্যরশ্মি পড়ে দার্জিলিংয়ের পৃথিবীতে মোহময় মুগ্ধতা ছড়াল চারিদিক।

অনেকক্ষণ পর ফিরলাম লোকালয়ে। ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। দুপুরে হ্যাপি টাইমস রেস্টুরেন্টে কেক আর ব্ল্যাক কফি নিয়ে একটা ছাতার নিচে বসলাম। সেখান থেকে ১২০০ ফুট নিচে নেমে গেছে সমতলভূমি। মুহূর্তেই একখ মেঘ এসে আমার পায়ের পরে চুমু দিয়ে চলে গেল। আমি তাকে ধরতে চেয়েছিলাম হামাগুড়ি দেওয়া শিশু যেমন দু'হাত দিয়ে উড়ন্ত রঙিন বেলুন ধরতে যায়। কিন্তু মেঘ ধরা যায় না। সমতল ভূমি থেকে আমরা যে মেঘ দেখি, তা আসলে জলীয় বাষ্পের কণা। নিচ থেকে যেমন দেখা যায়, মেঘের মধ্যে থাকলে তার রূপ তেমন নয়। ফলে স্থানভেদে দৃশ্যের রূপ বদলায়।

দার্জিলিং আসলেই বেঁচে আছে চা আর পর্যটকদের ওপর

প্রত্যাবর্তনের আগের দিন বিকেলে কুয়াশা-শিশির-মেঘ-হাল্কা বৃষ্টি মিলে শীত জেঁকে বসল। ছোট্ট শহর দার্জিলিংয়ের প্রধান সড়কের দু'পাশে পর্যটকদের সম্ভাব্য প্রয়োজনের পসরা সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা। কেউ স্টল করে, কেউ ফুটপাতে। একটি স্টলে ঢুকে দোকানিকে দেখে দারুণ এক ভালো লাগা তৈরি হলো। অবশ্যই বলে রাখি, তার স্নিগ্ধতা, পরিমিতি বোধ ও বেশভূষা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তার কাছে এক প্যাকেট বেনসন অ্যান্ড হ্যাজেজ সিগারেট চাইতেই ভাঙা বাংলা-ইংরেজিতে তিনি বললেন, লন্ডনেরটা আছে। এরই মধ্যে একজন বিদেশিনী যখন এক পাউন্ড দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলেন, তখনই বুঝতে পারলাম তার দেশ ইংল্যান্ড। তার লাগল এক টাকা, আমার দেড়শ' টাকা। এ রকম মুহূর্তে নিজেকে খুব ছোট মনে হলো। বিদেশে এ ধরনের মন ছোট হওয়ার অনেক ঘটনাই ঘটে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের পর্যটকদের ক্ষেত্রে এই মন খারাপ করা বিকেল পিছু লেগেই থাকে। এই মন খারাপ করা বিকেলের রেশ অবশ্য কেটে গেল ওই দোকানির সৌজন্যে। পরদিন ফিরলাম স্বদেশে। প্রতিবার যে কোনো বিদেশ থেকে ফিরে স্বদেশের মাটিতে পা রাখতেই যে প্রশান্তি আসে, তার কোনো মূল্যই অন্য দেশ দিতে পারে না। ❖

অলঙ্করণ : : সমর মজুমদার

জেসমিন মুননী

বিদ্যুৎ সুন্দরী



গল্প

অনেককাল আগের কথা; পার্বতীপুরের রাজা কিচক তার অপূর্ব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী কন্যা পারবতী নামানুসারে অত্র এলাকার নাম রেখেছিল পার্বতীপুর। পার্বতীপুরের ঠিক মধ্যখানে মধ্যপাড়া গ্রামটিতে তার জন্ম। প্রকৃতির মতো পারবতীর মুখখানা ছিল মায়াবী। মধ্যপাড়ায় দাদার রাজদরবার ছিল পারবতীর প্রিয় জায়গা। সেখানে দাদার কাছে শুনত মধ্যপাড়ার গল্প। কী করে এই কঠিন শিলার উৎপত্তি।...

দাদার কাছে শুনেছিল– শক্ত, ঘন, কেলাসিত আগ্নেয় অথবা রূপান্তরিত শিলাই হচ্ছে কঠিন শিলা। মধ্যপাড়ার এসব কঠিন শিলা মূলত নাইস, গ্রানোডায়োরাইট এবং কোয়ার্টজ ডায়োরাইট সহযোগে সৃষ্ট। দাদার কাছেই শুনেছিল তুষার যুগে হিমালয় পর্বতমালা ছিল সুউচ্চ এবং পুরোপুরি বরফাবৃত। তখন হিমবাহসমূহ ছিল পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সে সময়ে শুষ্ক জলবায়ুগত অবস্থার প্রভাবে বরফগলা পানি, বঙ্গীয় সমভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কিছু সংকীর্ণ ও গভীর নদী প্রণালীর মাধ্যমে প্রবাহিত হতো। সর্বশেষ বরফ যুগের অন্তিমকালে বর্ষা মৌসুমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃষ্টিপাত ঘটত এবং সে সময় হিমবাহও গলতে শুরু করেছিল। এই গলিত পানি বর্ষার বর্ধিত পানি সহযোগে বঙ্গীয় সমভূমির ওপর দিয়ে, সংকীর্ণ নদী ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতো। এসব নদীপ্রবাহের মাধ্যমে প্রবাহিত বিপুল জলরাশি বিপুল পরিমাণ নুড়িপাথর বহন করে আনত এবং তা পর্বত পাদদেশীয় ভূস্তর হিসেবে সঞ্চয় করত।... এসব শুনতে শুনতে পারবতী পাথরের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। কঠিনকে ভালোবাসলো কোমল হৃদয় দিয়ে। পারবতীর ভালোবাসার প্রশয় পেয়ে কঠিন শিলার গুরুগম্ভীর হাসিতে লতাগুল্মেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। এভাবে দিনগুলি তার সুখেই কাটছিল। আচমকা একদিন আকাশ ফাটানো শব্দে পুরো মধ্যপাড়া কেঁপে উঠলে সবাই দেখল একদল প্রলুব্ধ মানুষের সমাবেশ। গ্রানাইড দিয়ে তারা পাথরের বুক ফাটাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। মধ্যপাড়ার আজকের শব্দ প্রকৃতির সকল নীরবতায় চিড় ধরাল আর বাড়াল পারবতীর হৃৎকম্প। কৌতূহল নিয়ে দেখল বিস্তৃত মাঠের প্রান্তে যেখানটাতে তারা খেলত, সেখানে তখনও কিছু মানুষ মাটির বুকে সুড়ঙ্গ করে চলছিল।

দৌড়ে পারবতী দাদাকে সামনে পেয়ে বলল, ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এইখানে কূপ খনন করে ভূপৃষ্ঠের অতি অল্প গভীরতায় পুরাজীবীয় যুগের কেলাসিত ভিত্তিস্তরে কঠিন শিলার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। ভিনদেশি এক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। তারা বেশ কয়েক বছর এইখানে থাকবে। হাঁফাতে হাঁফাতে পারবতীর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

'চিন্তা করিস না। তারা কিছুই করতে পারবে না।' নাতনিকে সান্ত্বনার কথা বললেও দাদা খান্ডোবার মুখে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাহলে কি তারা আদি বসতভিটা হারাতে বসেছে? কিন্তু নাতনিকে কিছু বুঝতে দিল না।

পারবতী কিছু একটা বলতে চাইছিল; কিন্তু মুখে কিছু না বলে চোখ দিয়ে বোঝাল– কিছুই ঠিক নাই।

পারবতীর মনে হলো গভীর একটা আলোড়ন এসেছে তার মধ্যে, তার হৃদয়ে এমন ভারাক্রান্ত আগে কখনো অনুভব করেনি। নিশ্চিত বুঝল গভীর প্রেমে নিমগ্ন বলে এত কষ্ট পাচ্ছে। জড়ো পদার্থের প্রতি তার এহেন প্রেমানুভূতি নিয়ে বিছানায় যেতে না যেতে ঘুমিয়ে পড়ল। মুখে কান্নার ছাপ আর হৃদয়ে প্রেম নিয়ে পারবতী একেবারে সকাল পর্যন্ত একটানা নিটোল ঘুমাল। ভোর হতেই হৃদয়ে চিন চিন বেদনা শুরু হলো ষোড়শী পারবতীর।

প্রতিদিনই ভিনদেশিরা এসে জরিপ করছে। মাঝে মধ্যে দিগন্ত কাঁপিয়ে গ্রানাইড ফাটাচ্ছে। টুকটাক উড়ো খবর শুনছিল। কানাডীয় পরামর্শক ভূপৃষ্ঠের গভীরে ছয়টি কূপ খনন করে সমীক্ষা করে মতপ্রকাশ করেছে, ১২৮ থেকে ১৫৪ মিটার গভীরতায় তারা পুরাজীবীয় কঠিন শিলার সন্ধান পেয়েছে।

খননকারীরা আসলে পারবতী বিভিন্ন কৌশল উদ্ভব করত তাদের তাড়াতে। ভয় দেখাবার চেষ্টা করত। ভাবত ছোটখাটো ভয় দেখালে মানুষ প্রজাতি দূরে সরে যাবে। সেখানকার সাপেরা বিষ ঢেলে দিত শ্রমিকদের শরীরে। শ্রমিক মৃত্যু ও অলৌকিক সব কাণ্ডকারখানাতে স্থানীয়রা আন্দোলন ও ধর্মঘট করলে কাজের তোড়জোড় কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকত। কাজ বন্ধ হলে পারবতী আবারও কঠিন শিলার কাছে ফিরে যেত। ক্ষত-বিক্ষত পাথর স্পর্শ করে নিজেকে যতটুকু সম্ভব পাথরের গায়ে যেন নিজেকে ঠেসে ধরতে চাইত। এই কঠিন শিলা তাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আকর্ষণ করত।

সেদিন শীতের এক দুপুরে ভিনদেশিদের দেখে পারবতী ঝোপের আড়ালে নিজেকে আড়াল করল। ভরদুপুরে একান্ত নিবৃত্তে পাথর স্পর্শ করার জন্য ছুটে আসত। নরম রোদের তাপে জায়গাটা যতটুকু উষ্ণ হয়ে উঠত সেটুকুতে পারবতী নিবিষ্ট হয়ে লতাগুল্ম আর বন্য ফুলেদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিত। সে যেন এক ভাষাচিত্রী। ভাষা দিয়ে গল্পের পর গল্প রচনা করত।

সেদিন দেখল বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলা ও উত্তর কোরিয়া সরকারের পক্ষে ন্যাম ন্যাম কোম্পানি প্রতিষ্ঠানটি লিজ নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। পার্বতীপুর ধরে মধ্যপাড়া রাস্তার ধারে ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলা প্রকল্পটি প্রায় ১.৪৪ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত হলো। দিনরাত মধ্যপাড়ায় বন ও ঝোপঝাড় কেটে সমতল ভূমিতে বিশাল বিশাল মেশিন বসানো হলো, ভিনদেশিদের থাকার জন্য তৈরি করা হলো অত্যাধুনিক আবাসিক ভবন। এভাবে সময় গড়ালে শোকে-দুঃখে পারবতীর দাদা খান্ডোবার দেহান্তর হলে রাজা কিচক মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মেয়ের জন্য তার চিন্তার অন্ত ছিল না। বিবাহিত না হয়েও পারবতী বিধবার বেশ ধারণ করে থাকত। কন্যার বৈধব্যদশা রাজা সহ্য করতে পারছিল না। কোনো বাবার পক্ষে তা সম্ভবও না। এভাবে কয়েক বছর কেটে গেল।

সেদিন টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। মধ্যরাতে কোরিয়ান জেনারেল ম্যানেজার চো মিঙ্গের ঘুম ভেঙে গেল অদ্ভুত এক শব্দে। ঘুম ভেঙে দেখল টিভি, ডেক্সটপ কম্পিউটার সবই খোলা। কাজ করতে করতে চোখ লেগে এসেছিল বোধ হয়। বছর পাঁচেক ধরে সে এখানে কাজ করছিল। পরিবার বলতে কেউ ছিল না বলে পিছুটানও ছিল না। তার সঙ্গে অদ্ভুত কিছু একটা হচ্ছে ব্যাপারটা কমবেশি সবাই বুঝতে পারছিল। মাসখানেক আগে একদিন খনিতে নামার সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ ফল করলে লিফটে আটকে গেল। ভেতরে বসে চো মিঙ্গ ইমার্জেন্সি বেল বাজাচ্ছিল। তারপর ঘুটঘুটে অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে উদ্ধারের অপেক্ষায় ছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত সে জানে ধৈর্যই হচ্ছে একমাত্র গতি। চোখ বন্ধ করলে সে কারো উপস্থিতি টের পেল। দ্রুত চোখ মেললে দেখল অন্ধকার। তার সঙ্গে কি কেউ ছিল? না তো যদ্দুর মনে পড়ে সে একাই ছিল। মনের ভুল ভেবে পুনরায় চোখ বন্ধ করতেই আবারও কারো উপস্থিতি বেশ ভালোভাবে অনুভব করলো। মনে হলো একদম গা ঘেঁষে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। এতই কাছে যে তার ঘ্রাণ ও নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছিল। লিফটের বাইরে বরফিকরণ স্তরের মধ্যেও সে ঘেমে অস্থির হয়ে যাচ্ছিল। ঘ্রাণটা কি তার পরিচিত! হঠাৎ 'সারাং ইয়ে' শব্দটা তার কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কণ্ঠস্বরটা অতি পরিচিত মনে হলো। নিঃশ্বাস আরো ঘন হলে চারদিকে নীলাভালোয় একটি মেয়ের অবয়ব স্পষ্ট হয়। সয়ে যাওয়া সেই আলোতে যাকে দেখল সেখানে কোনো ভুল ছিল না। তার সামনে দাঁড়ানো কিম সে রোঙ্গ! ধবধবে সাদা মুখটা রক্তশূন্যতা রোগীর মতো।

চো মিঙ্গের হিমশীতল দৃষ্টি সেদিকে প্রসারিত। সে কি স্বপ্ন দেখছে! নিজেকে নিজে চিমটি কাটে। নাহ! সে স্বপ্ন দেখছে না। কিম সে রোঙ্গ তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ইয়োগিওয়া। সেই শিশুসুলভ পবিত্র হাসি দেখে তার শরীর ততক্ষণে জমে বরফ।

- কিম!

উত্তর না দিয়ে খনির সুড়ঙ্গ ধরে ক্রমশ নিচে হাঁটতে শুরু করল কিম। অন্ধকারের দিকে...

চো মিঙ্গ চিৎকার করে, কিম কোথায় যাচ্ছ! ওইখানে গ্রানাইড আছে।

কিম সো মিঙ্গ তড়িৎ গতিতে অদৃশ্য হলে বিকট এক শব্দ। পরক্ষণে চারদিক আলোকিত হলে নিজেকে লিফটের মধ্যে আবিষ্কার করে বুঝতে পারে উপরের দিকে যাচ্ছে।

বাইরে উৎসুক শ্রমিকরা দ্রুত লিফটের দরজা খুলে চো মিঙ্গকে উদ্ধার করে। ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স এসে গেছে, উদ্ধার কর্মীরাও ব্যস্ত লিফট হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার কারণ উদঘাটনে। সেদিনর ঘটনার আর কিছু মনে নেই তার। দিনাজপুর সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মধ্যপাড়ার ফিরে আসার পর অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করল সবাই। বলা নেই কওয়া নেই চো মিঙ্গ উধাও। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হয়তো দেখত খনির কাছে, নয়তো পাথরের স্তূপের পেছনে বসে নিজের মনে কথা বলছে। সেদিন রাতে দরজা খুলে দেখল কিম সে রোঙ্গ দাঁড়িয়ে বলছে, ইয়োগিওয়া। আজ সে তাকে অনুসরণ করল। সকালে সবাই দেখল রুমের পাশে বিশাল আমগাছটাতে তার ঝুলন্ত লাশ।

কয়েক বছর অতিক্রম হয়ে গেলে কোরিয়ান কোম্পানি সাফল্যের চাইতে লোকসান দিচ্ছিল বেশি। এদিকে কোরিয়ানরাও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিবাদে জড়িয়ে নানা রকম ফ্যাসাদের সৃষ্টি করছিল। অন্যদিকে মাসখানেক পরপর রহস্যজনক মৃত্যুতে পুরো মধ্যপাড়া অস্থির হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি নিজেদের আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হয়ে ফেরত গেলে পারবতী সুখনিঃশ্বাস ছেড়েছিল। এসবের পেছনে পারবতীর হাত ছিল এমনটা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। যত্রতত্র স্তূপ করে রাখা পাথরের মধ্যে ততদিনে ঘাস গজিয়ে গেলেও জায়গাটা নিজের দখলে এসেছে দেখে পারবতী আপন মনে ঘুরে বেড়াত। বিষাদ ভুলে আনন্দের গান গাইত। কুসুম রঙের বৃত্ত আর দুধসাদা রঙ পাপড়ি নাগেশ্বর ফুল খোঁপায় গুঁজে মিশে যেত প্রকৃতিতে। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিত, তার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যেত। প্রকৃতি যেন তার পরম আত্মীয়, সখা। মধ্যপাড়ায় দিবারাত্রি মেশিনের শব্দ বন্ধ হয়ে গেলে সে মনোরম প্রকৃতির আহ্বান শুনতে পেত। নিসর্গপ্রেমে প্রগাঢ় হয়ে বুঁদ হয়ে থাকত। তাতে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হতো।

সময় সব সময় কারো প্রতিকূলে স্থায়ী হয় না। হঠাৎ একদিন নতুন এক ধরনের মানুষ মধ্যপাড়ায় এসে উপস্থিত। নতুন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বেলারুশের জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম সংক্ষেপে জিটিসি পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ শেষে বাংলাদেশের পেট্রোবাংলার সঙ্গে ৬ বছরের চুক্তিতে পুরোদমে কাজ শুরু করে দিল। জার্মানিরা একটা মুহূর্তকে অবহেলা না করলে পারবতীর জীবনে শুরু হলো কষ্টের অধ্যায়। তারা মধ্যপাড়ায় দামি দামি সব অত্যাধুনিক মেশিন প্রতিস্থাপন করল। জায়গাটা বসবাসের উপযোগী করার জন্য চারদিকে বাউন্ডারি ওয়াল তুলে দিল, যাতে স্থানীয়রা যত্রতত্র প্রবেশ করতে না পারে।

পারবতী রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে উন্নয়নের ধারা পর্যবেক্ষণ করত। মনে হতো জার্মান থেকে একটা অংশ তুলে এনে মধ্যপাড়ায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। পারবতী এদের কাছে ঘেঁষতে নানা রকম কৌশল অবলম্বন করে ব্যর্থ হচ্ছিল। বিনা অনুমতিতে বাইরের মানুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল বলে দুপুর কিংবা রাতে নিজের রূপ পাল্টেও সেখানটাতে যেতে পারত না।

তাই অদৃশ্য হয়ে খনিতে তিন সিফটে মাটির নিচ থেকে পাথর বের করা দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হতো। এতো অত্যাধুনিক পদ্ধতি এক সময় পারবতীকে ভালোলাগার অনুভূতি দিল। সে ধাপে ধাপে পাথর উত্তোলনের দৃশ্য দেখত। খনি থেকে পাথরের চাকা তুলে সেগুলো বিভিন্ন ধাপে ধাপে ভাঙার জন্য তিন ধরনের স্টোন ক্রাসারে চলে যেত। এভাবে মনুষ্য প্রজাতির প্রতি তার আসক্তি জন্ম নিল।

লাল হেলমেট, বুট জুতা ও কমলা পোশাক পরে এসব কাজে যে নির্দেশনা দিত তার চেহারা পারবতী কখনো দেখেনি। সেদিন ভরদুপুরে ঝুপ করে বৃষ্টি নামলে জাভেদ মাথার হেলমেট খুলে ক্লান্তিগুলোকে বৃষ্টিতে ধুয়ে ফেলতে চাইলে কাছে কোথাও বিকট শব্দে বাজ পড়ল। জাভেদকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে চলে আসবার জন্য শ্রমিকরা চিৎকার করল, স্যার চলে আসুন, জায়গাটা নিরাপদ না।

জেনারেল ম্যানেজার জাভেদ চাকরিতে জয়েন করার পর এখানকার অনেকে তাকে এক ধরনের ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু জাভেদ দমে যাবার পাত্র না। কথাগুলো হেসে উড়িয়ে দিত। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে আজকে এতো বড় একটা পদে দায়িত্ব পেয়েছে।

বাজটা ধারে-কাছে কোথাও পড়েছে অনুধাবন করতে পারল। দ্রুত নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে একটা বিদ্যুৎ যেন তার চোখ-মুখ ঝলসে দিল। চোখ ঝলসে যাবার পূর্বে দেখল অসাধারণ সুন্দর এক নারী মূর্তি। যেন উড়ে এলো দিক দিগন্ত থেকে, তারপর মিলিয়ে গেল তড়িৎ আলোকে। তারপর সব অন্ধকার।...

যখন জ্ঞান ফিরল জাভেদ দেখল সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। বাইরের স্ট্রিট লাইটে ঘরের সবকিছু কেমন যেন অলৌকিক মনে হচ্ছিল। জানালার বাইরে আমগাছটায় এক রহস্যজনক জমাট বাঁধা অন্ধকার। জাভেদ সেদিকে তাকিয়ে বিকেলের ঘটনাটা পুনরায় ভাবার চেষ্টা করল। ঘটনাটা আসলে কী ছিল? বিদ্যুতের আলোয় সে কিইবা দেখেছিল?

জার্মানি কোম্পানিতে দায়িত্ব পাবার পর জাভেদ পুরো মধ্যপাড়া রেনোভেট করেছিল। কোম্পানিটি জার্মানি হলে সেখানে বেশিরভাগ মানুষ ছিল রাশিয়ান ও বাংলাদেশি। বড় মাপের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য রুমের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেও পুরোনো জিএমের রুমটি সে বেশি পছন্দ করেছিল। রুমটির বারান্দা ও জানালা দিয়ে খনি থেকে শুরু করে ডাইনিং, খেলার মাঠ, জিম সবই নজরে আসত। বিশেষ করে আমগাছটার মধ্যে কী যেন এক রহস্য ছিল।

জাভেদ বারান্দায় এলো। ক'টা বাজে ভেবে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখে ঘড়ি নেই। এমন সময় পিএস ফারুক এসে পাশে দাঁড়ালে সে চমকে ওঠে।

নতুন জিএম মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরত এসেছে দেখে ফারুক বলে, আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া।

আমার ঘড়িটা পাচ্ছি না। চলতো ব্যাপারটা দেখে আসি।

স্যার, আপনার শরীর ভালো না। সবাই বলাবলি করছিল আপনাকেই সে আঘাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু একটুর জন্য আপনি রক্ষা পেয়েছেন।

রাজ্যের বিরক্ত মিশিয়ে জাভেদ বলে, 'সেটা' আবার কে?

– তাকে স্পষ্টভাবে কেউ দেখেনি। কিন্তু তার চলাচল

অনেকে টের পেয়েছে। যারাই তাকে দেখেছে তার অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। মনে হয় সে আপনাকে পছন্দ করেছে।

জাভেদের মুখ আরো বেশি ফ্যাকাশে হলে দুই ভ্রুর মাঝখানে ভাঁজ ফেলে প্রশ্ন করে, এসবের মানে কী! দু'চোখ বিস্ফোরিত করে বলে, স্পষ্ট করে সব খুলে বল।

কাঁচুমাচু হয়ে ফারুক কিছু বলতে উদ্যত হলে জাভেদ সেদিকে তোয়াক্কা না করে শার্টটা গায়ে চেপে বেরিয়ে পড়ে।

ম্যানেজারকে আসতে বল। শিলাখনির ইয়ার্ডের দিকে একবার ঘুরে আসি, সঙ্গে আমার ঘড়িটাও খোঁজা যাবে।

–রাত ম্যালা হয়েছে। যাচ্ছিল। বিচলিত হয়ে বলল, কই কোথাও তো কিছু দেখছি না!

কী দেখছেন না! ফারুক ফিসফিস করে জবাব দেয়। ভয়ে মনে হচ্ছিল ফারুকের কণ্ঠ জমে যাচ্ছে।

–আমার ঘড়িটা।

– সকালে খুঁজে দেব।

জাভেদ ইতস্তত করতে লাগল। ভাবল, সত্যি কি সে ঘড়ি খুঁজতে এসেছে! কোথায় সেই বিদ্যুৎ সুন্দরী। তাহলে কি মধ্যপাড়া সম্পর্কে এতোদিন যা শুনে আসছিল সবই সত্যি! অশরীরী বলে এখানে কেউ আছে। যাকে সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু নিরাকার ব্যক্তিটি তাকে দেখছে।

পরদিন বেলা গড়িয়ে গেলে সবাই এক প্রকার ধরে নেয়



ফারুকের কোনো কথাই কর্ণপাত না করে জাভেদ গটগট করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। সঙ্গে নাইটগার্ড রহমান।

শিলাখনির ইয়ার্ডের দিকে যেতে জাভেদের বেশি সময় লাগে না। সে সব সময় খুব দ্রুত হাঁটে। ইয়ার্ডে পৌঁছে দেখল ধূসর পাথরগুলো বৃষ্টিতে ভিজে আরো গাঢ় রঙ ধারণ করেছে। চারদিকে পাথরের ডাস্টের মাঝে গজিয়ে ওঠা ভেজা ঘাসেরা চকচক করছিল। প্রকৃতি এখানে নীরব সুনসান। জাভেদ ২নং ক্রাসার মেশিনের দিকে যেখানটাতে বিদ্যুৎ সুন্দরীকে দেখেছিল সেদিকটাতে পথ ধরল। বিদ্যুৎ সুন্দরী শব্দটা তাৎক্ষণিক আবিষ্কার করে এক ধরনের সুখানুভূতি হলেও পরক্ষণে চেহারায় আতঙ্কের ছাপ দেখা দিল। আসলে সেটা কী ছিল! চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কোনো দৃশ্য! স্মার্ট সুদর্শন জাভেদের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। মুখে হাসির চিহ্নটুকু নেই। উদভ্রান্তের মতো ইতিউতি তাকাচ্ছিল। কথাও জড়িয়ে

এবারের জিএমও গলায় দড়ি দিয়েছে। আমগাছে কিছু না দেখতে পেয়ে তিনতলা ঘরের দরজা ভাঙতে উদ্যত হলে জিএম নিজেই দরজা খুলে হাসছিল। ম্যাডাম ততক্ষণে ফ্রেস হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

– আপনাদের স্যারকে সারপ্রাইজ দেবার জন্য রাতেই রৌনা দিলাম।

ম্যাডামের মুখের কোণের রহস্যের হাসি অনেকে বুঝতে পেরেও চুপসে গেল। সবাই চলে গেলে পারবতী আজন্ম প্রেমের তৃষ্ণা নিয়ে জাভেদের গলা জড়িয়ে ধরল। জাভেদও স্ত্রীকে বাহুর আলিঙ্গনে নিলে মনে হলো এই প্রথম কোনো নারীকে স্পর্শ করছে। আজকের মতো সুখানুভূতি দীর্ঘ দশ বছরের বিবাহিত জীবনে হয়নি।

সেদিন সকালে প্রচারিত হচ্ছিল বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে অজ্ঞাত এক নারীর মৃত্যুদেহ পাওয়া গেছে মধ্যপাড়া রাস্তার ধারে। ❖

অলঙ্করণ : : আনিসুজ্জামান সোহেল

প্রশান্ত মৃধা

দিকচক্র



গল্প

তারিককে ফোন করার আগে কাফি ভাবল, কী বলবে। এটা সত্যি অস্বাভাবিক কাফির জন্য. তারিককে ফোন করতে আগে কখনও ভাবেনি সে ! মোবাইলে তো প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কত কারণে ফোন করে। স্রেফ খোশগল্প কি গুলতানি মারতে ; কখনও কোনো বন্ধুকে নিয়ে ইয়ার্কি-ফাজলামি করে ফর নাথিং দুটো কথা বলে। কখনও জানায় নতুন কোনো জোকস। তারিক তখন কাজে ব্যস্ত থাকলে বলে, বিজি আছি, পরে করিস। কখনও কাফির মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে বিজি। সাধারণত কাফিই ফোন করে এই রকম খোশগল্প কিংবা ফাজলামি করার জন্য। তারিক একেবারেই মাঝেমধ্যে।

এখন ল্যান্ডফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে তারিকের নাম্বার প্রেস করার আগে কাফি ভাবল, জামিল ভাইয়ের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করবে, না অন্য কথা বলবে। সাধারণত কাফি ফোনে খুব দ্রুত কথা বলে, সামনাসামনি অতটা নয়। তারিক কথা বলে সে তুলনায় গুছিয়ে।

তারিক ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই কাফি শুরু করে, 'ওই ব্যাটা, শোন, কাইল আমি এই জায়গার এডিশনাল এসপির সাথে কথা কইলাম। আমাগো জাহাঙ্গীরনগরের। বেশ জুনিয়র। মনে হয়, আটাশ কি উনত্রিশ ব্যাচ।'

তারিক বুঝতে পারল, কাফি কী নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। কোন প্রসঙ্গে, কেন এইভাবে একেবারে সরাসরি। কাল এ নিয়ে অন্তত বারপাঁচেক কথা হয়েছে। কিন্তু কাফির বলার গতিটা একটু কমানোর জন্য সে বলল, 'ওর নাম কী?'

'আরে ব্যাটা শিমুল, কেমেস্ট্রিতে পড়ত।'

'চিনি আমি?'

'আমরা চিনব কইৎথা, আমাগো মাস্টার্সের সময় ওরা আইচে নাকি?'

'হুঁ।'

'আমার তো এই জায়গায় পোস্টিং নিয়ে আসার পরে পরিচয়। তাও তেমন ভালোভাবে না। কাল জামিল ভাইর ঘটনাটা নিয়ে এসপি অফিসে যাওয়ার পরে মোটামুটি আলাপ হলো।'

২.

তারিক আর কাফির ফোনের কথোপকথনে যে জামিল ভাইয়ের নাম এসেছে, সে কাফির ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র, কামাল উদ্দিন হলের। তারিক-কাফি শহীদ সালাম-বরকতের। কিন্তু তারিক আর জামিলের বাড়ি খুলনায়, একই পাড়ায়। এ ঘটনাটা নিয়ে তারিক খানিকটা উদ্বিগ্নও। তা ছাড়া গত পরশু সন্ধ্যায় তারিকের সঙ্গে জামিলের ঢাকা নিউমার্কেটে দেখা হয়েছে: মেয়ের জন্য একটা স্কুলব্যাগ কিনবে। তারিককে ফোন করে ওখানে আসতে বলেছিল জামিল। ব্যাগটা কেনার পর নীলক্ষেত মার্কেটে কিছুক্ষণ পুরনো বই খুঁজেছে দু'জনে। তার পর মার্কেটের মুখের রেস্টুরেন্টে মুরগির হালিম খেয়েছে। এ নিয়ে কিছু রসিকতাও আছে তাদের, সঙ্গে স্মৃতিও। এলাকার এক বড় ভাই তাদের একবার এই দোকানে কীভাবে ফাও হালিম খাইয়েছিল। তখন তারা সব এক এক করে ঢাকা আসছে। সে ভাই থাকত মুহসীন হলে। জামিল জাহাঙ্গীরনগরে চান্স পেয়েছে, তারিক সবে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় এসেছে।

হালিম খাওয়া শেষ হতেই জামিল বলল, 'তারিক শোন, আমি উঠি। কল্যাণপুরে রুবি আপার বাসা থেকে ব্যাগটা নিয়ে ৮টার বাস ধরব।'

'এত তাড়াতাড়ি যাবা? দশটা-সাড়ে দশটার বাসে যাও।'

'নারে। তা'লি সকালে আর ঘুমানোর টাইম পাব না। কাল কলেজে ভাইভা আছে। আমাকে থাকতি হবে।'

'আটটার বাসে গেলে তো সেই ভোর চারটায় পৌছবা।'

'সেই জন্যিই তো। তবু ঘণ্টাচারেক ঘুমানো যাবে।'

'তা'লি দাঁড়াও, একটা সিগারেট খাই, এইটুক সময় থাকো। তোমার সাথে কত দিন পরে দেখা। আবার কবে দেখা হবে। একসময় আমাগো দিনরাত্তির প্রায় সব এক ছেলো, আড্ডা আর আড্ডা।'

'বাদ দে।' জামিলের গলা সব সময়ই নিচু খাদে থাকে। কোনো কারণে উত্তেজিত হলেও তা ধরা পড়ে না। এখন তারিককে উপদেশ না দিয়ে ওই নিচু খাদের গলায় সে ধমকই দিল, 'তুই এই সিগারেট খাওয়াটা ছাড়। বয়স তো কম হলো না, এখন শরীরের দিকে খেয়াল নেওয়ার সময়।'

'হুঁ। চেষ্টা করি বোঝলা, হয় না।'

'আচ্ছা চেষ্টা কর। আমি ফোটলাম। খুলনা গেলিই আমারে ফোন দিস। কথা আছে। পারসোনাল। এক জায়গায় না-বসে, সময় না-নিয়ে বলা যাবে না।'

তারিক হাত নাড়ে। রাস্তার উল্টো দিকে চলে যায় জামিল। তারিক এখন টিএসসির দিকে যাবে।

রাতে একটা টেক্সটও দিয়েছিল জামিল তারিককে। ইংরেজিতে লেখা সেই খুদেবার্তার অর্থ, যে কথাটা সে তারিককে বলতে চায়, সেটা আজই বলতে পারত, কিন্তু তার আগে তারিককে বলতে হবে, এ কথা সে কখনও কাউকে বলবে না।

এটা জামিলের ধরন। তারিক একেবারে খাস বাংলায় লিখেছে : আগে দেখা হোক, তার পর শোনব তোমার কথা। তোমারে কতবার যে এইরাম কথা আমি দেলাম।

তার পর কাল সকালে জামিলের স্ত্রীর ফোন। কয়েকবার ফোন রিং হওয়ার পরও তারিক ভেবেছিল, ফোনটা ধরবে না। আননোন নাম্বার। ধরতই না, আবার ভেবেছে, এত সকালে ফোন, নিশ্চয়ই জরুরি কোনো বিষয়।

কল রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে উৎকণ্ঠিত গলা, 'তারিক, আমি স্বপ্না আপা, তোর জামিল ভাইরে কোপাইচে!'

কথাটা শুনে উত্তরে কী বলতে হয়, এ সময়ে প্রায় কারোই জানা থাকে না। তারিকেরও জানা নেই। হতবিহ্বল দশায় সে শুধু বলতে পারে, 'মানে?'

স্বপ্না, জামিলের স্ত্রী। তারা সহপাঠী। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে তারিকের সঙ্গে তার ভালোই আলাপ ছিল। অনেক দিন দেখা হয় না। ছুটিতে তারিক যখন খুলনা যায়, স্বপ্নাও তখন ছুটিতে বাচ্চাদের নিয়ে রাজশাহী, বাপের বাড়ি। এ মুহূর্তে এই দেখা হওয়া না-হওয়া কোনোটাই কোনো বিষয় নয়।

স্বপ্না বলে চলে, 'মানে না, মানে না। সত্যি। ঘাড়ের কাছে, ঘাড় থেকে মুখের কাছেও।'

'কখন?'

'আজ ভোরে। ও শিববাড়ী মোড়ে নামার পরে একটা রিকশা নিয়ে যখন ময়লাপোতা মোড়ের কাছ থেকে বাসার দিকে আসছিল!'

তারিক আর বলল না, এত সকালে একা একা শিববাড়ীর মোড়ে নামল কেন? জানতে চাইল, 'কারা, কিছু জানা গেছে?'

'না। আমি এখন আড়াইশ' বেডে। ওরে ওটিতে নিছে।'

'পুলিশকে জানাইছো?'

'ওর ছাত্ররা জানাইছে। পুলিশ আইছিল।'

'পুলিশ কিছু বলেছে, কারা?'

'পুলিশ বলে ছিনতাইকারী।'

'আচ্ছা। ওই ভোররাতে ময়লাপোতার মোড়ে ছিনতাইকারী, একটু সন্দেহ করার মতো বিষয়!'

'তা তো বটেই। শোন, তুই ওর বন্ধুদের সবাইকে জানাস। সাংবাদিক যারা আছে, তাদের জানাস, তবে এখন নিউজ করার কিছু নেই। নিউজ যদি করে তো স্থানীয় সাংবাদিকরা করবে।'

'আচ্ছা। জানাব।'

'আমি রাখলাম, আর কথা বলতে পারব না। এটা আমার নাম্বার, কেউ চাইলে এই নাম্বারটা দিস, ওর ফোনও নিয়ে গেছে।'

'ফোন নিয়ে গেছে?'

'তাইলে কইলাম কী? ফোন আর ল্যাপটপ দুটোই নিয়ে গেছে। ল্যাপটপটা ঘাড়ে ছিল, ওটা নেওয়ার সময় টানাটানি করছে, তখন ঘাড়ের কাছে কোপাইছে।'

'আচ্ছা। তুমি টেনশন করো না। দেখো ডাক্তাররা কী

বলে। আমি যারে যারে বলার দরকার বলতিছি।'

'বলিস।'

রাতে তারিক দেরি করে ঘুমিয়েছিল। আজ বেরোতে হবে দেরি করে। জাঈদ ফোনে জানাবে কখন গেলে চলবে। বাসার সবাই বেরিয়ে গেছে। তারিকের মনে হয়, আগে জাঈদকেই জানানো যায়। কিন্তু ঢাকায় বসে জাঈদ কী করবে। তখনই কাফির কথা মনে পড়েছে। কাফি মাস তিনেক হয় খুলনায় পোস্টিং নিয়ে গেছে। ওকে জানানো দরকার। ও হয়তো একবার হাসপাতাল যেতে পারবে।

তারিক কাফিকে ফোন করে। একবার রিং হওয়ামাত্রই কাফি ফোন ধরে।

তারিক বলে, 'কাফি শোন, আজ ভোররাতে জামিল ভাইরে ময়লাপোতা মোড়ে কোপাইচে।'

'কস কী তুই ব্যাটা। পরশু দিনের আগের দিনও কলেজ থেকে ফেরার পথে আমার ব্যাংকে আইচিল জামিল ভাই।'

'আরে ব্যাটা, কাইল সন্ধ্যায় আমার সাথে নীলক্ষেতে হালিম খাইচে। আমি কইলাম আটটার বাসে যাইয়ো না, পরে দশটার বাসে যাও। ফেরি ঠিক থাকলে আটটার বাস ভোররাতে পৌঁছাবে। আজকাল রাস্তাঘাটের যা অবস্থা! অত ভোর!'

'তোমাগো শহর না? আমরা আইচি চাকরি করতে, জান তো হাতে থাহে...'

'কোন শহরের অবস্থা ভালো? তুমি ঢাকার পোলা মামু, তোমাগো এই রাজধানী শহরে সকাল হওয়ার আগে বের হওয়া যায়?'

'বাদ দে। এহোন কই আছে জামিল ভাই?'

'আড়াইশ' বেড মানে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।'

'তোরে জানাইল কেডায়?'

'স্বপ্না আপা।'

'ও। শোন আমি যাইতেছি। অফিসে যাওয়ার জন্য একবারে রেডি হয়ে হসপিটালে যাব। তুই আমারে স্বপ্না আপার নাম্বারটা মেসেজে পাঠা।'

তারিক কাফির ফোনে স্বপ্নার নাম্বার টেক্সট করে। তার পর ভাবে, আর কাকে কাকে জানানো যায়। বিপুলকে জানাবে ভাবে। বিপুল জামিলের ব্যাচমেট। কিন্তু তাদের হলের হওয়ায় তারিকের সঙ্গে তুই-তোকারি সম্পর্ক। ফারুককে জানাবে। খুলনায় আলী হোসেন ভাইকে একবার ফোন করবে। তা ছাড়া তারিক জানে, কিছুক্ষণের ভেতরে শহরে যাদের যাদের জানা দরকার, জেনে যাবে। জামিল ভাইর কলিগরা আছে। কলেজের ছাত্ররা আছে, ছাত্রনেতারা নিশ্চয়ই বিষয়টা দেখবে। ওর ডিপার্টমেন্টের ছাত্রই তো একজন সরকারি দলের বেশ পাওয়ারফুল স্টুডেন্ট লিডার। গগনবাবু রোডে বাড়ি। কী যেন নাম ছেলেটার। কথায় কথায় একদিন জামিল ছেলেটার নাম বলেছিল। কী কাজে ওর কাছে এসে ধমক খেয়েছে, তারপরও জামিলের নেওটা। কারণ একটাই, পরীক্ষার আগে জামিলের কাছে আসবে সাজেশনের জন্য। ছেলেটার কী অজ্ঞাত কারণে ধারণা, জামিলের সব সাজেশন কমন পড়ে।

স্বপ্না আপাকে ফোন করে ওই ছেলেটার কথা বলা যেতে পারে। নিশ্চয়ই কোনো না কোনোভাবে সাহায্য করবে। কিন্তু কী ভেবে এ কথা জানিয়ে স্বপ্নাকে তারিকের আর ফোন করা হয় না। অবশ্য তার আগে বিপুল, ফারুক আর আলী হোসেনকে ফোন করে জানায়। এর ভেতরে আলী হোসেন ইতিমধ্যে জেনে গেছে। সে তারিককে বলেছে, পুলিশ কমিশনারের কাছে যাবে। যেভাবে হোক জামিলের ল্যাপটপটা উদ্ধার করবে। আর যারা জড়িত, তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেফতারের ব্যবস্থা যেন করে।

আলী হোসেনের সঙ্গে কথা বলে তারিকের মনে হলো, এই কাজ শহরের একটা নির্দিষ্ট চক্র করে, এই বিষয়টা তার জানা আছে। তারিক নিজেও তা জানে। প্রতিটি শহরের এ কাজ একটা বা দুটো গ্রুপই করে। যদি ছিনতাই তাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এমন গ্রুপ এক শহরে বেশি থাকার সুযোগও নেই। তাহলে নিজেদের ভেতরেই কামড়াকামড়ি লাগবে। আর যদি অন্য কারণ হয়। তারিক সে বিষয়টাও আলী হোসেনের কাছে জানতে চেয়েছে। কোপের যে ধরন, আলী হোসেনকে স্বপ্না যেভাবে বলেছে, ঘাড়ের কাছে কোপের বর্ণনা দিয়েছে, তাতে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে। ছিনতাইকারীরা এত বড় রিস্ক নেবে? ছিনতাইকারীদের কাছে ঘাড় নামিয়ে দেওয়ার মতন অস্ত্র থাকে? এসব কথা কথার পিঠে একটার পর একটা বলেছিল তারিক। আলী হোসেন বলেছেন, সে হাসপাতালে যাবে। তবে তার আগে তার ধারণা, বিষয়টা ছিনতাইকারীদের। ওই সময়ে ওখানে অন্য কোনো কাজের জন্য কোনো সন্ত্রাসীর থাকার কথা নয়। আর সে দীর্ঘদিন ধরে জামিলকে চেনে, তাকে মারার উদ্দেশ্য কারও থাকতে পারে বলে মনে হয় না!

কী জানি! তারিকের ধন্দ কাটে না। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের বিভিন্ন হিসাব থাকে। তা ছাড়া পাওয়ার পার্টির সঙ্গে যুক্তরা ব্যালান্সও করে ভালো। আলী হোসেন যদিও সরাসরি রাজনীতির লোক না, আবার বাইরেরও নয়। তার বন্ধুরা সবাই একসময়ের সার্বক্ষণিক রাজনীতিক। এখন অনেকেই সরকারি দলের পদ-পজিশনে আছে। ফলে আলী হোসেনের প্রায় নিশ্চিত হয়ে বলা কথাটা তারিক প্রথম হিসাবে নিল। যদিও সে জানে, সে ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে। শহরেও অনেক দিন যায় না। এখনকার সব বিষয়ে তার জানাশোনা ততটা স্পষ্ট নয়।

এরপর জাঈদের ফোন পেয়ে সে বেরিয়ে গেল। আর কিছু জানা গেলে নিশ্চয়ই কাফি তাকে ফোন করবে। যদি কাফি ফোন না করে, তাহলে দুপুরের পরে সে কাফিকে ফোন করবে। জাঈদকে বিষয়টা বলবে দেখা হওয়ার পরে।

দুপুরের পরে কাফি আর ফোন করেনি। তবে মাঝখানে স্বপ্না ফোন করেছিল, জামিলকে কেবিনে দিয়েছে। জ্ঞান ফিরেছে। ভালো আছে। কাউকে আইডেন্টিফাই করতে পারেনি। পুলিশ এসেছিল, কথা বলে গেছে।

তারিকের তখন জামিলের মুখখানা মনে পড়ল। এখন কেমন দেখতে লাগছে। কোন দিকের কেবিনে আছে জামিল ভাই। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভালোই চেনে তারিক। এখন ওখানে থাকলে সে নিশ্চয়ই কেবিন ব্লকের বারান্দায় বসে থাকত।

৩.

সন্ধ্যার আগে অফিস থেকে বেরিয়ে ফোন করে কাফি। তারিক জানত, কাফি ফোন করবে। তারিক হ্যালো বলার পরপরই হড়হড় করে জানিয়ে যায় তার কথা।

জামিলকে দেখে এসেছে। ভালো আছে। আজ আলী হোসেনের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে। আলী হোসেন ভাই বেশ মজার মানুষ। এদিকে সবাই খোঁজ নিয়েছে, এটা ছিনতাইকারীরাই করেছে। তবে এইবার কাফি একটু দম নিয়ে জানায়, এই ছিনতাইকারীদের ভেতরেও নাকি ছাত্ররা আছে। ফলে ল্যাপটপটা ফেরত পাওয়া যেতে পারে। আর

কালকে জামিলের ছাত্ররা কলেজের সামনে খানজাহান আলী রোডে একটা মানববন্ধন করবে। পুলিশ প্রশাসনকে দু'দিন সময় দেবে, এর ভেতরে অপরাধীদের ধরতে। ইত্যাদি।

এর পর ফোন রাখতে রাখতে কাফি বলল, একটু পরে আমি আর তোগো ওই আলী হোসেন ভাই আর জামিল ভাইর এক কলিগ এসপি অফিসে যাব। পারলে জানাব, কী কথা হইল। কোনো আপটুডেট খবর হলে জানাব।

তার পর এই এখন, কাফির ফোন, তারিককে আপটুডেট খবর জানানোর জন্য।

তারিক জানতে চাইল, 'কী বলল শিমুল?'

কাফি বলল, 'আরে ব্যাটা, পুলিশে কয় পুলিশের কথা। পলিটিশিয়ানরা কয় তাগো কথা। যে যার মতো ব্যালান্স করে। ওদিকে স্বপ্না আপা কয় স্বপ্না আপার কথা, জামিল ভাইর কলিগরা কয় তাগো কথা। আর ছাত্ররা কয় তাগো মতন, খানজাহান আলী রোড বন্ধ করে দেবে। বুঝলি না, যে যার হিসাব অনুযায়ী কথা কয়।'

'মানে?'

'মানে খুব সোজা। এই জন্য তোরে টিঅ্যান্ডটি দিয়ে ফোন দিচি।'

'এমনিতেও তুই টিঅ্যান্ডটি ফোন দিয়ে ফোন দিস্।'

'হ। এহোন শোন, শিমুলের কথা কওয়ার আগে তোর ওই আলী হোসেন ভাইর কথা কই। সে কইল ছিনতাইকারীদের কাজ। ধরা যাবে। ল্যাপটপ যখন পাওয়া গেছে। পাবলিকরেও পাওয়া যাবে। মাত্র চারজন। চারজন মানুষরে পুলিশ আইডেন্টিফাই করতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। বলে এবার নিজের কথা বলল, 'এরা আসলে ব্যালান্স করে। আমারে পাইছে, অন্য জেলার মানুষ। বিষয়টা নিয়ে মুভ করতেছি, এই জন্য। তখন আমি করলাম কী? পরে শিমুলরে বললাম, তোমার সাথে কথা আছে।'

তারিক আসলে বুঝতে পারছিল না, কাফি কথা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তাই চুপ হয়ে গিয়েছিল।

কাফি বলল, 'শুনতেছিস্?'

'হু।'

কাফি আবার বলে চলে, 'শিমুল আমারে বলল, কী বলল জানিস, বলল, কিছুই করা যাবে না। এই ছিনতাইকারীদের নেটওয়ার্ক খুব স্ট্রং। এদের পলিটিক্যাল শেল্টার আছে। সব কোনো না কোনোভাবে পাওয়ার পার্টির ওয়ার্কার। আইজকে যদি শিমুল তার প্রভাব খাটাইয়ে কিছু করে, পরে দেখা যাবে জামিল ভাইর মেয়েটাকে ইশকুল থেকে ফেরার পরে তুলে নিয়ে গেল।'

'আচ্ছা।'

'এই ল্যাপটপ ফেরত দেওয়ার কারণ হলো, ছাত্ররা মানববন্ধন-টন্ধন করবে, সে সবে এক প্রকার প্রেশার হবে, এই জন্য আগে থাকতে একটু এদিক ওদিক।'

'তাই নাকি?'

'শিমুল আমারে সব কইচে। বোজছোস্।'

'হু।'

কিছুই হবে না। এসব পুলিশের হাতের বাইরে। পুলিশ চাইলে পারে, কিন্তু করা যাবে না।'

তারিক জানে কাফির কথা আপাতত শেষ। সে এখন ফোন রাখবে।

এদিকে কাফিও যা বলার জন্য ফোন করেছিল, তা প্রায় বলে ফেলেছে। তাকে একটু পরে বেরোতে হবে। স্বপ্না আপাকে কলেজের প্রিন্সিপাল ডেকেছেন, সেখানে এসপি আসবেন। স্বপ্না কাফিকে বলেছে, তার সঙ্গে যেতে। কাফি বলেছে, সে বারোটা নাগাদ কলেজের গেটের উল্টো দিকে থাকবে।

এ কথা তারিককে জানিয়ে কাফি ফোন রাখল। রাখার পরে তার মনে পড়ল, একটা কথা বলা হয়নি তারিককে, ও যেন এগুলো কারও সাথে শেয়ার না করে। এ জন্য এখন আর ফোন করবে না। কাফি জানে, তারিক কাউকে এ কথা বলবে না। বললে কাফির রেফারেন্সে বলবে না। তা ছাড়া তারিক এখন এখানে নেই। বিষয়টা ঠিক বুঝতে পারছে না। মাঝেমধ্যে শহরে আসা আর ভেতরে থেকে একটা শহরের সিচুয়েশন বিড করা এক কথা না। আসলেই তফাৎ আছে। এখানে আসার আগে তারিকের কাছে যা যা শুনেছিল, তার অনেক কিছুতেই কোনো মিল পায়নি কাফি। তা নিয়ে সে তারিককে দোষও দেয়নি, বোকা ভাবেনি। তারিকের ভেতর থেকে দেখা বিষয়টা তখনকার সময়ের। এত দিনে এসবে বদল ঘটেছে। আবার তারিক এই শহরের ছেলে, তার কাছে একটা বিষয় এক রকম। সে বিষয়ে যুক্ত মানুষগুলোর আচরণ এক রকম। আর কাফির কাছে তাদের প্রয়োজন আর যোগাযোগের ধরনটা একেবারেই আলাদা।

ফোন করার আগে কাফি ভেবেছিল তারিককে বলবে, এ বিষয়ে কোনো নারীঘটিত কিছু আছে কি-না, তা খোঁজ নেওয়ারও কথা উঠেছিল, শিমুল বলেছে। সবাই চায় যেন মূল ঘটনাটাকে একপাশে সরিয়ে গোটা বিষয়টাকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে। এ ঘটনা ঘটার পর এর ভেতরে না ঢুকলে বোঝা যায় না, কোন দিকের ডালপালা কোন দিকে যায়। না না, ঘটনার ডালপালা কত দিকে ছড়ায়। কত পদের শিকড়-বাকড় গজায়। তখন সুবিধা হয় পুরো ঘটনাকে যে কোনো একদিকে নিয়ে যাওয়ার। তাতে মূল ঘটনা পাতলা হয়। সুবিধা হয় অপরাধীর।

কাফি ভাবল। কাফি জানে, শিমুল তাকে বলেছিল, মাত্র দুই ঘণ্টায় সে অপরাধীদের হাজির করতে পারে। কিন্তু সম্ভব না। কিছু করা সম্ভব না। শিমুল নিজের ইচ্ছেয় যদি তা করে, তাহলে কালকেই তার ট্রান্সফার অর্ডার আসবে।

শিমুলের ওই সময়ের মুখখানার অসহায়ত্ব কাফি পড়ে নিতে পেরেছে। যতই ক্ষমতাধর মনে হোক, পুলিশের একজন অ্যাডিশনাল এসপিও যে অসহায়, কাফির বুঝতে বাকি থাকেনি।

তাহলে কাফি একটা ফাইল নাড়তে নাড়তে ভাবল, থাকুক জামিল ভাই যেমন আছে শুয়ে। ক'দিন বাদে সুস্থ হবে। তার পর আবার কলেজে যাবে। ক্লাস নেবে। মাষ্টার মানুষ অত বাড়াবাড়ি কিসের। ল্যাপটপ চালায়, সেটা ফেরত পাইচে এই বেশি।

কাফি মোবাইলের দিকে তাকায়। সেটা তুলে এক তা কাগজের ওপর রাখে। স্বপ্না আপার ফোন এলে উঠবে। নাকি স্বপ্না আপাকে বলবে তার এখানে আসতে। অথবা দাঁড়াতে বলবে কেডিএর মোড়ে। সেখান থেকে তুলে। স্বপ্নার কাফির এখানে আসাই ভালো, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে কাছে।

একটু পরে কাফিই স্বপ্নাকে ফোন করে। তাকে এখানে আসতে বলে। কারণ হিসেবে জানায়, কলেজের সামনে ছাত্রছাত্রীরা যে মানববন্ধন করবে বলে ঠিক করেছে, যদি সেটা শুরু হয়ে যায়, তাহলে স্বপ্নাকেও সেখানে দাঁড়াতে বলতে পারে। তার চেয়ে সে এখানে এলে কাফি গাড়ি নিয়ে সরাসরি কলেজের ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে।

স্বপ্না কাফির কথায় রাজি হলো। কিছুক্ষণের ভিতরে আসছে সে। এ ছাড়া কাফির আর একটা উদ্দেশ্য হলো, স্বপ্না

এখানে এলে এ পর্যন্ত বিষয়টা নিয়ে কী শুনেছে, তা জানতে পারবে। স্বপ্নাকে পুলিশ কমিশনার কিংবা রাজনৈতিক নেতারা কেউ কিছু বলেছে কি না, জানা দরকার। এ সময় ভিকটিমের ক্লোজ আত্মীয়দের কিংবা বউকে কানকথা লাগানোর মানুষের অভাব হয় না। প্রিন্সিপাল সাহেব তো পারতেন গোটা বিষয়টা নিয়ে অন্যত্র বসে কথা বলতে। তিনি কি কোনো প্রকার চাপে পড়ে স্বপ্নাকে ডেকেছেন।

কাফি এ বিষয়ে একটার পর একটা প্রসঙ্গ সাজায়। নিজেই আশু ঘটনার যুক্তি দাঁড় করায়। যুক্তিহীন হলে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু গোটা বিষয়টা তো এতক্ষণে তার মোটামুটি বোঝা হয়ে গেছে। শিমুল সবই বলেছে। তবু সে স্বপ্নার সঙ্গে যাচ্ছে। নাকি যেতে যেতে সে স্বপ্নাকে সবই খুলে বলবে। আসলে, কাফির মনে হয়, কোনো লুকোচাপা না করে পুরো ঘটনা স্বপ্নাকে খুলে বলা উচিত।

না, তা এখন বলা যাবে না। জামিল ভাই এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। আইসিইউতে থাকা লাগেনি, এটাই ঢের। ওটি থেকে যে কেবিনে আনা গেছে, এটা ক'জনের ঘটে।

এ সময়ে স্বপ্না আসে। একদিনেই চোখ বসে গেছে বলে মনে হয়, চেহারায় ক্লান্তি। যদিও কাফির সঙ্গে এই অনেক বছর বাদে দেখা। এখানে আসার পর জামিলের সঙ্গে কাফির অনেকবার দেখা হয়েছে। জামিল কাফিকে বাসায়ও যেতে বলেছে, কিন্তু যাওয়া হয়নি তার। স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হয়নি।

স্বপ্না কাফির চেম্বারের দরজা ঠেলে ঢুকেই বলল, 'দেখ তো সেই কতকাল পরে দেখা হইল, কিন্তু কেমন একটা দিনে?'

'জি আপা, আমিও একটু আগে এই কথা ভাবলাম।'

'চল।'

'যাব। এক কাপ চা অন্তত খাও।'

'আমার এখন চা খাওয়ার উপায় আছে?'

'আরে খাও।' কাফি বেল টেপে।

'জামিল ভাই এখন আছে কেমন?'

'তিনি আছেন। কয়জন প্রিয় ছাত্রছাত্রী আইচে, তাদের সাথে কথা কয়। আর আমার ননদ আসছে, তারে কইলাম দেখিস বেশি যেন আড্ডা না মারে।'

'তাইলে তো ভালো।'

'ভালো তো। আল্লা বাঁচাইচে। ডাক্তার বলছে, আর হাফ ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলে বাঁচানো যাইত না।'

কাফি তা জানে। হাসপাতালে জমিলকে দেখেছে। আবারও এও জানে স্বপ্না এই কথা এতজনকে একইভাবে বলেছে যে কাকে বলেছে আর কাকে বলেনি, তা তার মনে থাকার কথা নয়। কাফি প্রসঙ্গ ঘুরাল, 'আচ্ছা, ও আপা, কলেজের প্রিন্সিপাল তোমারে ডাকল কেন?'

'জানি না তো। তোর ভাইও তো বলল, যাও যখন ডেকেছেন।'

'আমার তো মনে হয়, এসব ওই আলী হোসেন ভাইর কাজ।'

'হতে পারে। তুই আলী হোসেন ভাইরে চিনিস নাকি? ও হ্যাঁ, চিনিস তো। জামিলের সঙ্গে এই নিয়ে তোর একবার কী সব কথা হলো।'

'ওই তো, জামিল ভাই বলেছে, আলী হোসেন ভাই-ই ল্যাপটপটা উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছে।'

'তুই ওনারে চিনিস কীভাবে?'

'কবে যেন, পিকচার প্যালেসের সামনে জামিল ভাই ওনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।'

'তুই কিছু বুঝিস, প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে এই মিটিং, এইসব– এর কারণ কী?'

'না।'

তা হলে, স্বপ্না আপারও কিছু জানা নেই। হতে পারে। কাফি ভাবল। আবার এও হতে পারে, ওই পক্ষ বিষয়টার একটা ফয়সালার জন্য প্রিন্সিপালের ওখানে মিটিং ডেকেছে। প্রিন্সিপাল আসলে মিডলম্যান। ওখানে গেলে বোঝা যাবে। আবার হতে পারে, স্বপ্না আপা সবই বুঝে গেছে, প্রকাশ করছে না কিছুই। অথবা, এও হতে পারে, স্বপ্না অনড় তার জায়গা থেকে, তাই আগেভাগে কিছুই বলবে না এখন। অথবা, স্বপ্নাকে বোঝানোর জন্য আলী হোসেন বলেছে, তাকে সঙ্গে নিতে।

কাফি এ মুহূর্তে ব্যক্তিগত দোটানায় আছে। স্বপ্নার চা খাওয়া শেষ হলেই উঠত। কিন্তু ড্রাইভার বলেছে, ও পাঁচ মিনিটের ভিতরে আসছে। পাশেই স্থানীয় দৈনিক আনতে পঠিয়েছে। এই মোড়ে পায়নি, পিকচার প্যালেস অথবা ডাকবাংলোর মোড়ে গেছে। এখনই এসে যাবে।

কাফি উঠল। চেম্বার থেকে বেরিয়ে পাশের টেবিলে একজনকে কিছু একটা বলে এসে স্বপ্নাকে জানাল, আপা চলো। ড্রাইভাইর আসতে আসতে আমরা নিচে নামি।'

স্বপ্না উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে কাফিকে হয়তো কিছু একটা বলবে, এমনভাবে তাকিয়েছে। কিন্তু কিছু বলল না। একবার দাঁড়াল। তারপর বেরিয়ে এলো। কাফি সামনে। ব্যাংকের গেটের কাছে। এ সময়ে কাফির ফোন বাজে। শিমুলের নাম। কাফি রিসিভ করতেই শিমুল বলে, 'আপনারা কলেজে পৌঁছে গেছেন?'

কাফি বলল, 'না। এই যাচ্ছি। বেরোচ্ছি, আমি আর স্বপ্না আপা।'

'আমি জানি। স্বপ্না আপা কি আপনার পাশেই?'

'হুঁ। কাছেই।

'শোনেন, আপাকে কিছু বলার দরকার নেই, কাফি ভাই।' শিমুল বলে চলছে, কিন্তু কাফি একটু থতমত, কেন? কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে পারল না। দ্রুত এগিয়ে এলো। ফুটপাতে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে স্বপ্নার অবস্থান দেখল। কাফি বলে চলেছে, 'এখন আপনি কিছু বললে ঠিকঠাক নাও বুঝতে পারে।'

'কেন কী হয়েছে?'

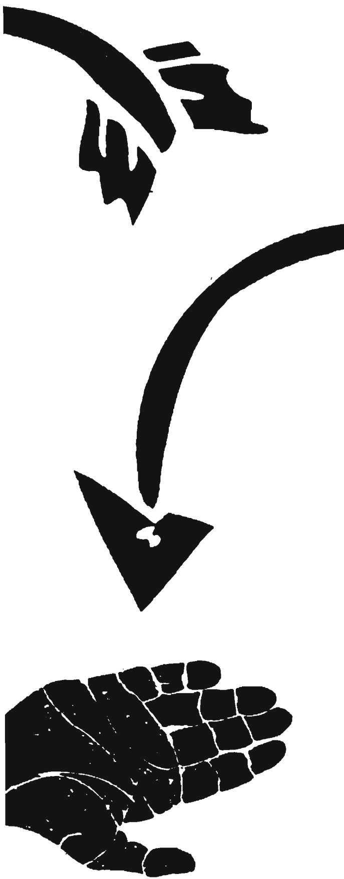
'কলেজে গেলে, প্রিন্সিপালের ওখানে পলিটিক্যাল নেতারা ওনাকে প্রেশার দেবেন কেস তুলে নিতে।'

'তাই নাকি?' কাফি গলা নামাল। স্বপ্না তার কাছে চলে আসছে।

'হ্যাঁ, বলবে, এটা কোনো কেসের বিষয় না। ওই সব ছিনতাইকারীকে এমনিই ধরা হবে। জাস্ট পুলিশকে কয়েক দিন সময় দিলেই...'

'কারও তো নাম দেওয়া হয়নি। সব তো অজ্ঞাতপরিচয়।'

'সমস্যাটা তো ওখানেই। তাতে যদি আমি অনেকজনকে অ্যারেস্ট করি। বুঝবেন না, বুঝবেন না ভাই। কেন যে এই চাকরিতে আইছিলাম। হলের বড়ভাইর গলা নামিয়ে দেবে, কিন্তু ধরতে পারব না।' শিমুলের গলায় হাহাকার। অসহায়ত্ব তীব্র। কাফি বুঝতে পারছে। স্বপ্না তার কাছেই, শিমুলকে বলতে পারছে না কিছুই। কাফি নিজেও এ মুহূর্তে অসহায় বোধ করছে। কোথাও যাওয়ার আগেই, কোনো ঘটনায় অংশগ্রহণের আগেই যদি ঘটনার ফল জানা হয়ে যায়, যদি সেখানে গিয়ে স্রেফ হাজিরা দেওয়াই উপলক্ষ হয়, তাহলে না



সেখানে গিয়ে স্রেফ হাজিরা দেওয়াই উপলক্ষ হয়, তাহলে না যাওয়াই ভালো।

কাফি স্বপ্নার জন্য গাড়ির দরজা খুলল। গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে স্বপ্না জানতে চাইল, 'কোনো সমস্যা, কাফি?'

ড্রাইভার কাফির জন্য অন্য দরজাটা খুলেছে। গাড়ির ভিতর কাফি নিজেকে গলিয়ে দিয়ে বলল, 'না। এমনি।' ড্রাইভারকে বলল, 'সিটি কলেজ।'

স্বপ্না বলল, 'তোর কথায় মনে হলো, জামিলের বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলি।'

'হুঁ।' কাফি লুকোল না। 'শিমুলের ফোন। ও এখন আসছে না। কমিশনার অফিসে কী একটা মিটিংয়ে যাবে।'

'আচ্ছা। আমি ভাবিওনি যে আসবে। ওর থাকার কথাও না। তবে এসপি সাহেব আসবেন মনে হয়।'

'প্রিন্সিপাল সাহেব আপনাকে কিছু বলেছেন?'

'না। শুধু ফরমাল যা বলার, এক ফাঁকে যদি আমি। এককাপ চা খাব, আর টোটাল বিষয়টা নিয়ে কথা। ও হ্যাঁ, একটা কথা বলেছিলেন, ওনার কাছে অথবা আলী ভাইর সাথে কথা না বলে যেন প্রেসকে কিছু না বলি।'

'আচ্ছা।' কাফির মনে হলো, শিমুল যা বলেছে তাই।

'কী আচ্ছা। তুই কী মনে করিস। তারা চায় না, ব্যাপারটা জানাজানি হোক?'

ড্রাইভারের কাছে কাফি জানতে চাইল, পেপার দুটো এনেছে কি না?

ড্রাইভার পিছন রেখেছে বলতে, কাফি ঘাড়ের কাছে রাখা সংবাদপত্র দুটো নিল। একটা কোনো নিউজ নেই। অন্যটায় সেকেন্ড পেজে সিঙ্গেল কলাম। অবশ্য ওপরের দিকে। কীর্তিটা ছিনতাইকারীদের। এর বেশি আর কিছু নেই।

'শোন, কাল সকালেই আমি তারিকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তারিককে পরে আমিই বলেছি পত্রিকায় না জানাতে।'

'ও চাইলে সাংবাদিকদের বলতে পারত।'

'তা তো বটেই, জানি আমি। জামিলকে প্রিন্সিপালও বলেছে। নিউজ-টিউজ তেমন একটা করার দরকার নেই।'

'প্রিন্সিপালের ওপর উপরের প্রেশার আছে নাকি কে জানে?'

'আছে তো বটেই।'

'বোঝালা কীভাবে?'

'নইলে আমারে এইভাবে ডাকে। আমার স্বামী হাসপাতালে আর আমি যাই চা খাইতে ভার্সিটির ছোট ভাইরে নিয়া। এইসব ফাইজলামি আমি বুঝি না?'

কাফি চকিতে স্বপ্নার দিকে তাকাল।

'কুল স্বপ্না আপা। মাথা ঠাণ্ডা! এ সময়ে উত্তেজনা মানেই ভুল করা।'

স্বপ্ন ঝাঁজের সঙ্গে বলল, 'আরে তুই বাদ দে। এমপি নিশ্চয়ই প্রিন্সিপালকে ফোন করে কইচে, ওই প্রফেসরের মিসেসরে বলবেন, এই নিয়ে বেশি মুভ না-করতে। আমিও গো-বেচারা, স্বামী মরে নাই, তাতেই খুশি আর কী। মরলে চেক পাইতাম।' এই বলে গাড়ি কাঁপিয়ে হাসল স্বপ্না। ওড়না তুলে কপালের ঘাম মুছল, যদিও সেখানে ঘাম ছিল না। এটা করে সে হয়তো নিজেকে একটু হালকা করল।

গাড়ি এতক্ষণে প্রায় সিটি কলেজের কাছাকাছি। খানজাহান আলী রোডের মুখে পড়তেই সামনে মানববন্ধনে গাড়ি গতি কমে। ছাত্রছাত্রীরা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়েছে। কলেজের গেটের কাছে ব্যানার। স্বপ্না ওই কথাটা বলার পরে কাফি আর কিছুই বলেনি। গাড়িতে স্বপ্নাকে দেখে ছাত্রনেতাদের কেউ কেউ চিনতে পেরেছে। গেটের কাছে একটু ফাঁকা, সেখানে মানববন্ধন মিছিল হলো। গাড়ি কলেজে ঢুকছে।

কাফি এখন স্বপ্নাকে কী বলে? স্বপ্নার এ কথায় কাফি বুঝেছে, শিমুলের সঙ্গে তার কথোপকথনের পুরোটা আগে থেকেই সে বুঝে গেছে! ❖


কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬]


কায়কোবাদ [১৮৫৭-১৯৫১]

সলিমুল্লাহ খান

কাজির বিচার কায়কোবাদের চাপরাশ


নিবন্ধ

'কবি কায়কোবাদ কাব্যবনের পুরানো গাছ, তাঁহার আদর্শে মুসলমান সমাজে লেখক ও কবি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবে।'
–নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৩২৭ : ৭৪৮ ক)

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনে আর যে পদার্থেরই অভাব হোক, বিচারকের অভাব হয় নাই। সব বিচারকই সবসময় ন্যায়বিচার করিয়াছেন তাহা আমরা বলিব না, অন্যায় বিচারকদের মধ্যে পূর্বতন কবি কায়কোবাদও (১৮৫৭-১৯৫২) আছেন। এই অন্যায়ের প্রকাশ ঘটিয়াছে কায়কোবাদের একাধিক লেখায়, অথচ সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ–যেমন আনিসুজ্জামান–বিষয়টির অবতারণা সম্যক করেন নাই। বর্তমান নিবন্ধে আমরা ঐ প্রসঙ্গেরই বিচার করিতে চাহিতেছি।

১

ইংরেজি ১৯২৭-২৮ (বাংলা ১৩৩৪) সালের দিকে–অধ্যক্ষখ্যাত ইবরাহিম খাঁর উদ্দেশে বিজ্ঞাপিত–এক লোকপত্রযোগে কাজী নজরুল ইসলাম লিখিয়াছিলেন, 'প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল এটা অস্বীকার করিনে; কিন্তু তাই বলে মুসলমানেরা যে আমায় কদর করেননি এটাও ঠিক নয়। যাঁরা দেশের সত্যিকার প্রাণ, সেই তরুণ মুসলিম বন্ধুরা আমায় যে ভালোবাসা যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন তাতে নিন্দার কাঁটা বহু নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রবীণের আশীর্বাদ–মাথার মণি–হয়তো পাইনি কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা বুকের মালা আমি পেয়েছি। আমার ক্ষতির ক্ষেত্রে ফুলের ফসল ফলেছে।' (নজরুল ১৯৮৪ : ২৭৯)

মোহাম্মদ কাজেম আল-কোরেশী ওরফে কায়কোবাদ তখন একাধারে সহি বড় জনপ্রিয় মুসলমান কবি, অন্যদিকে মহাকবি যশ-প্রার্থীও। নজরুল ইসলামের মাপে অন্তত তিনি যে সহি বড় ও প্রবীণ কবি-এ সত্যে সন্দিগ্ধ হইবার কারণ নাই। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভাষায়, 'কায়কোবাদ তখন মুসলিম বাংলার প্রিয় কবি।' (শামসুদ্দীন ১৯৯৪ : ২৩১)ঃ

সমস্যার মধ্যে, প্রথম গালাগালির ঝড়টা যে দিক হইতে আসিতেছিল দেখিলাম কায়কোবাদও সেদিকেই দাঁড়াইয়া। প্রথম দেখিয়া আমিও একবার অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' বাহির হইয়াছিল ইংরেজি ১৮৯৫ সালে, এই কাব্যপাঠ-অনন্তর কবিবর নবীনচন্দ্র সেন কবিকে লিখিয়াছিলেন:

> মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না; অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। যেদিন মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গভাষায় অশ্রু বিসর্জন করিবে, সেদিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া কখনও উপস্থিত হয়, আপনার 'অশ্রুমালা' তাহার প্রভাত-শিশির-মালা-স্বরূপ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে। (মোবারক ১৯৯৫ : ৩১-৩২)

এই কবিতা পুস্তকের উত্তরবর্তী কোন এক সংস্করণে পরিশিষ্ট প্রকরণস্বরূপ 'কাব্য-কবি ও সমালোচক' নামে একটি প্রবন্ধ-জুতিয়া দেওয়া হয়। আমার হাতে আছে ১৯৭৩ সালের একটি সংস্করণ, তাহা হইতে আমি প্রবন্ধের সন-তারিখ সঠিক নির্ণয় করিতে পারি নাই, তবে মনে হয় সময়টা ১৯২০ সালের দশক হইবে। নহিলে সেখানে নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার গোপন দোহাই পাওয়া যাইত না। এই প্রবন্ধে নামধাম উল্লেখ না করিয়াও কাজী নজরুল ইসলামের উপর এমন একহাত লওয়া হইয়াছে যে, যাহার তীব্রতা-কম করিয়া বলিলেও-ভয়ানক। প্রথম প্রথম আমার পক্ষে প্রত্যয় যাওয়া সহজ হয় নাই।

কেন সহজ হয় নাই তাহা একটু খুলিয়া বলি। কায়কোবাদ নিজে শুদ্ধ কয়দিন আগে সৈয়দ এমদাদ আলী প্রভৃতি মুসলমান লেখকের বিচারে হিঁদুয়ানি আর অশ্লীলতার অপরাধে ভয়ানক অপরাধী সাব্যস্ত হইতেছিলেন। তিনি খানিক উদ্ধার পাইয়াছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ নবীন প্রতিভাবান মুসলমান কিংবা নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতন স্বাধীনচিত্ত উচ্চবর্ণ হিন্দুর হস্তক্ষেপে। (শামসুদ্দীন ১৯৯৪ [ক]: শামসুদ্দীন ১৯৯৪ [খ] ও ভট্টশালী ১৩২৭)

মুসলমানদের মধ্যে একদল তরুণ তখন সবে নজরুল ইসলামের ধ্বজা বহন করিতে শুরু করিয়াছেন। আর ঠিক এই সময়ে কি-না কায়কোবাদ উদ্দিষ্টের নামটা মাত্র আড়াল করিয়া অসূয়া প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, কোন এক মুসলমান কবি 'আপনার ধর্ম ও সমাজের মাথায় পদাঘাত করিয়া-বিধাতার বুকে হাতুড়ি পিটিয়া-আরসকোরশ ছেদিয়া' হিন্দুদের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতেছেন আর তাঁহাদের দেবদেবীর ও রক্তাম্বরধারিণী মাতার বন্দনাগীতি গাহিতেছেন। আর মাত্র সেই কারণেই হিন্দু সাহিত্যিকেরা তাঁহাকে 'নেড়ে হরিদাস চাচা'র দলভুক্ত করিয়া লইতেছে। মজার জিনিস, মাত্র কয়দিন আগে-ইংরেজি ১৯১৯ কি ২০ সাল নাগাদ-'সুসাহিত্যিক' সৈয়দ এমদাদ আলী খোদ কায়কোবাদকেই 'যবন হরিদাস' বলিয়া নিবর্তন করিতে লাগিয়াছিলেন। এমদাদ আলী লিখিয়াছিলেন

> 'মুসলমান কবির কাব্যে "গঙ্গার স্তব", কি দুর্দৈব ঘটনা! প্রথম সংস্করণের "মহাশ্মশানে" ইহা ছিল না। কবির পরিণত বয়সের এই রচনা আমাদের মনে নানা অশুভ আশঙ্কার উদ্রেক করে। এই গানটি পড়িলে কি সেই যবন হরিদাসের কথা মনে হয় না যিনি বৈষ্ণব হইয়া গঙ্গার এক স্তব লিখিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন? কায়কোবাদ সাহেব কি দ্বিতীয় যবন হরিদাস হওয়ার বাসনা মনে পোষণ করেন নাকি?' (এমদাদ আলী ১৯৯৪ [ক]: ৩৯৫)

কায়কোবাদ ইংরেজি উনিশ শতকের কবি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বিশ শতকের মাঝখানটা পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন; কিন্তু ততদিনে তাঁহার দিন রাত্রি হইয়াছে। ১৯২১ সালে প্রকাশিত 'শিব-মন্দির' কাব্যের ভূমিকা উপলক্ষে সে সত্য স্বীকারও করিয়াছিলেন তিনি, লিখিয়াছিলেন :

> আমি জানি বঙ্গবাণীর সাহিত্য-মন্দিরে আজকাল অনেক নূতন দল জুটিয়াছেন, আমি সে দলের নহি। আমি পুরাতন দলের লোক। আমাদের দলের নবীন, হেম, মধুসূদন, দীনেশ, অক্ষয় বড়াল, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণ চলিয়া গিয়াছেন। আমিও এখন যাওয়ার পথে। নূতন দলের সহিত অনেক বিষয়ে আমাদের মতের মিল নাই। (আনিসুজ্জামান ১৯৬৪: ২৬১)

কায়কোবাদ রওয়ানা হইয়াছিলেন গীতিকবিতা সোয়ার হইয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত গীতিকবিতার পিঠে নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই তিনি, কিছুদূর যাইয়া মহাকাব্যের ঘোড়ায় চড়াও হইলেন। কায়কোবাদ যখন মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত-আনিসুজ্জামানের মতে তখন-'বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগের অবসান হয়েছে।' শুদ্ধ তাহাই নহে, আনিসুজ্জামান প্রয়োজনের অধিক গিয়াছেন : 'রবীন্দ্রনাথের হাতে গীতিকাব্যের নবরূপায়ণের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে দিকনির্দেশ ছিল, কায়কোবাদ তা বুঝতে পারেননি।' (আনিসুজ্জামান ১৯৬৪: ২৬১)

মহাকাব্য রচনা কেন বিধেয় হইল তাহার কারণও কায়কোবাদ বেশ ভালোভাবে নির্দেশ করিয়াছিলেন। কারণ আর কিছুই নহে, মুসলমান সমাজের দুরবস্থা জাতীয় দায়িত্ব পালন করিবার বাসনায় তিনি মহাকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। 'মহাশ্মশান' দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে-১৯১৭ সালের এক হস্তক্ষেপে-কায়কোবাদ লিখিয়াছিলেন, ভারতীয় মুসলমানদের আপনকার অতীত গৌরব মনে করাইয়া দেওয়াই এ কাব্য প্রণয়নের গূঢ় উদ্দেশ্য। তাঁহার বাক্য উদ্ধার করিতেছি :

> আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্যসংবলিত এমন একটি যুদ্ধ-কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে, একসময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, শৌর্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাঁহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না, তাই তাঁহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ যেখানে যে কীর্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি, তাহাই কবি-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে।

(আনিসুজ্জামান ১৯৬৪: ২৫৮)

কায়কোবাদ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করিতেন–একথাও অসত্য নহে। তবে ভারতীয় মুসলমানের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য বিষয়ে আপন মতামতের অন্যথা মানিয়া লইতে তিনি কদাচ প্রস্তুত ছিলেন না। কায়কোবাদের 'মহরম শরীফ' কাব্যের প্রকাশ ১৯৩২ সালে। এই কাব্যের 'কৈফিয়ত' উপলক্ষে তিনি সেদিন অভিযোগ করিয়াছিলেন, বাংলাদেশের মুসলমান লেখকেরা–পুঁথিলেখক কি গদ্যপদ্য-লেখক নির্বিশেষে–এমনকি মীর মশাররফ হোসেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত–ঐতিহাসিক সত্য লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী। আনিসুজ্জামান লিখিয়াছেন, 'এঁদের সংগৃহীত তথ্যের অনৈতিহাসিকতার নিন্দা তিনি করেছেন একে মুসলমান হিসেবে, তার উপর কবি হিসেবে। কেননা তিনি মনে করেন যে, অলীক ঘটনার আরোপে পবিত্র ধর্মের মর্যাদাহানি হয়েছে এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্য ঘটনার পরিবর্তন সাধনের অধিকার কবিদের নেই।' (আনিসুজ্জামান ১৯৬৪: ২৬৫)

কায়কোবাদ–আনিসুজ্জামানের চোখে ধরা পড়িয়াছে–রবীন্দ্রনাথকেও ঈর্ষা করিতেন। তাই কারণে অকারণে তাঁহার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে তিনি কদাচ কুণ্ঠায় পড়েন নাই। ১৯২০ সালের দশকে লেখা 'কাব্য-কবি ও সমালোচক'-যোগে কায়কোবাদ, নিঃসঙ্কোচ জানাইয়াছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতা মিষ্টি ও উচ্চভাবপূর্ণ; কিন্তু সবগুলিই যে ভালো একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথের অন্ধ স্তাবক ব্যতীত কোন সুধী পাঠকই ইহা স্বীকার করিবেন না। তিনি মহাকাব্য একখানাও লিখেন নাই।' (কায়কোবাদ ১৯৭৩: ২১৬)

কায়কোবাদের চোখে রবীন্দ্রনাথের দোষ আরো আছে। এক্ষণে আমাদিগের তাহা পড়িতে বেশ আমোদ হয়। তবে তাঁহার সকল কথা নিছক কথা নাও তো হইতে পারে। সারমর্ম না করিয়া তাই বিচারটা খোদ কায়কোবাদের জবানেই হুবহু তুলিয়া দিতেছি। কায়কোবাদ বলিতেছেন:

> 'বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। যে 'গীতাঞ্জলি' লিখিয়া তিনি নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তেমন কিছু আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু ইহার ইংরেজি অনুবাদখানি বাঙ্গালা 'গীতাঞ্জলি' হইতে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তাহার জন্যই তিনি দেশবিদেশে এত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ব্যাকরণগত দোষ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিছু কিছু আছে; সেগুলি কেহ দেখিয়াও দেখেন না। ... রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখিতে যাইয়া অশ্লীলতার নগ্ন চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার 'ঘরে বেরে' ['ঘরে-বাইরে'] ও 'নৌকাডুবি' পাঠ করিলে সুধী পাঠকবর্গ আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এগুলি ইংরেজীশিক্ষিত নব্য যুবকের বড়ই মুখরোচক। কেননা ইহারই নাম মনস্তত্ত্ব। পরের স্ত্রীকে লইয়া নিজের স্ত্রীর মতো ছয় মাস ঘরকন্না করিয়া প্রেম আদায় করিয়া লইতে পারিলে নব্য যুবকের মধ্যে অনেকেই আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু চরিত্রবান ও ইশ্লাম ধর্মভীরু পাঠকের কাছে এ কার্যগুলি হারাম ও অবৈধ। জানি না এক্ষেত্রে হিন্দু নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ কি ব্যবস্থা দেন।' (কায়কোবাদ ১৯৭৩ : ২১৫-১৬)

এখানে আমাদের যোগ করিতে হইতেছে যে নজরুল ইসলামের বিষয়েও কায়কোবাদের এই গোত্রের বিশ্বাস কার্যকর ছিল। যতদূর দেখিতেছি, বিষয়টি অনেক ন্যায়বিচারকের নজরে পড়ে নাই, আনিসুজ্জামান অবশ্য সত্যের অর্ধেকটা হইলেও উল্লেখ করিয়াছেন। মহাকবি কায়কোবাদের প্রতিভা কেন এই পরশ্রীকাতরতার চাপরাশ (বা ব্যাজ) পরিয়াছিল এখানে আমরা মাত্র তাহার আংশিক সুলুকসন্ধান করিব। অনুসন্ধান করিব নজরুল ইসলাম যে একটা যুগান্তর ততদিনে সম্ভব করিয়াছেন তাহাও কেন তিনি ধরিতে পারিলেন না। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, বিশ্বাস করিতে পারি কায়কোবাদ নজরুল ইসলামের কবিতা বেশ মনোযোগ করিয়াই পড়িয়াছিলেন।

২

'কাব্য-কবি ও সমালোচক' নিবন্ধে কায়কোবাদ লিখিয়াছিলেন, 'মুসলমান কবিদের নাম আমি এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম না। কেননা তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাঁহারা অল্পদিন যাবৎ সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময় তাহাদের উৎসাহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। তবে এতটুকু বলা অবশ্যই কর্তব্য যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিয়াছেন; উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশ্রয় দিবার জন্য তাঁহাদের কতকগুলি বন্ধুবান্ধবও জুটিয়াছেন।' (কায়কোবাদ ১৯৭৩ : ২১৬)

'অশ্রুমালা'য় মুদ্রিত 'কাব্য-কবি ও সমালোচক' প্রবন্ধের পরিচয়স্বরূপ জানান হইয়াছিল লেখাটি "গদ্য-প্রবন্ধ' বিশেষ। ইহার ছাতা দিয়া নজরুল ইসলামকে আঘাত করা হইয়াছিল গোটা তিনেক। এক জায়গায় হিন্দুয়ানির আর এক জায়গায় মুসলমানির প্রশ্নে, আরো এক জায়গায় ছন্দজ্ঞানের প্রশ্নে। এই হামলার তলে তলে দেশের সংস্কৃতি-জগতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক যে ততদিনে একটা মহান প্রশ্নচিহ্ন হইয়া উঠিতেছে তাহার ইশারাও হাতছানি দেয়। কায়কোবাদ লিখিতেছেন, 'মুসলমান লেখকদের গ্রন্থ হিন্দু সাহিত্যিকগণ খুব কমই পাঠ করিয়া থাকেন। যদিও কেহ পাঠ করেন, সে ভাল উদ্দেশ্য লইয়া নহে। মুসলমান সাহিত্যিকদের সামান্য খুটিনাটি দোষ ধরিয়া তাহাদিগকে চাপিয়া রাখার জন্য, বাড়াইয়া তোলার জন্য নহে।' কায়কোবাদের অভিযোগ, হিন্দু সাহিত্যিকগণের বিচার একান্ত পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি দুঃখ করিতেছেন, 'তাঁহারা [মানে হিন্দু সাহিত্য-লেখকেরা] মুসলমান সাহিত্যিকের দোষ সামান্য হইলেও ধরিয়া ফেলেন; কিন্তু তাহাদের সমাজের রুই-কাতলার ত কথাই নাই, সামান্য চুনাপুঁটিটি পর্যন্ত বাদ দেন না। সেই চুনাপুঁটিটির প্রশংসা গীতেও বঙ্গভাষা মুখরিত হইয়া উঠে।'

এতটুকু লিখিবার পর তিনি ফিরিয়া মুসলমান সাহিত্যিকদের–বিশেষ করে নজরুল ইসলামের–দিকে মন দিলেন। বলা যায় তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা শেষ করিলেন না। অনুযোগ করিলেন, মুসলমান লেখকেরা হিন্দুদের মনস্তুষ্টির জন্য নিজেদের আত্মীয়-সমাজকে ছোট করিতেছেন। এখানে পৌঁছিয়া কায়কোবাদ যে ধৈর্য পুরাপুরি হারাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি প্রমাণ এখানে :

> তবে এখানে অবশ্য একথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যদি কোন মুসলমান সাহিত্যিক আপনার ধর্ম ও সমাজের মাথায় পদাঘাত করিয়া–বিধাতার বুকে হাতুড়ি পিটিয়া–আরসকোরশ ছেদিয়া–তাহাদের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিয়া তাহাদের দেবদেবীর ও রক্তাম্বরধারিণী মাতার বন্দনাগীতি গাইতে পারেন, তবে তাঁহারা তাঁহাকে নেড়ে হরিদাস চাচার দলভুক্ত করিয়া লইতে পারেন।

একটু পা চালাইয়া–নেড়েমাথা চুলকাইয়া–কায়কোবাদ

আবার যাহা লিখিলেন তাহার পর আর তো কথা চলে না : 'আর হিন্দুদেরই বা দোষ কি? মুসলমানগণই যখন সনাতন ইস্লামের নীতি ভুলিয়া–মুসলমান হইয়া মুসলমানের গলা টিপিয়া মারিতে উদ্যত; তাঁহাদের প্রশংসা শুনিলে তাঁহারাই যখন মর্মে মর্মে জ্বলিয়া অধীর হইয়া উঠেন; পরশ্রীকাতরতার ব্যাজ (চাপরাশ) গলায় পরিয়া স্বজাতিবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা যখন গালাগালিতে পর্যবসিত করিতে গৌরব মনে করিয়া থাকেন তখন আর ভিন্ন জাতির উপরে দোষারোপ করিয়া লাভ কি?' (কায়কোবাদ ১৯৭৩: ২৩১)

কায়কোবাদের দ্বিতীয় আপত্তি মুসলমান কবিদের ভাষা লইয়া। মুসলমান কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলাম তখন বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি ও উর্দু কথা কিছু বেশি বেশি পরিমাণে এস্তেমাল কিংবা আমদানি করিতেছিলেন, কায়কোবাদ ইহাতে খানিক ব্যথিত। তিনি লিখিলেন, 'আমাদের মুসলমান সমাজে আর একদল বাহির হইয়াছেন, তাহারা বিশুদ্ধ ভাষায় কাব্য রচনা না করিয়া পাঁচমিশালী দাইল-খিচড়ি তৈয়ার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। সেরূপ দোভাষী ভাষার পুঁথি অশিক্ষিত লোকও লিখিতে পারে। এরূপ লিখায় কবির শক্তির পরিচয় কি? সাহিত্য সমাজে এরূপ দোভাষী কবির আসন অতি নিম্নে।' (কায়কোবাদ ১৯৭৩: ২২৪)

তিন নম্বরে কায়কোবাদ আরও বেপরোয়া। তাঁহার হামলার নিশানা যে আর কেহ নহেন, খোদ নজরুল ইসলামই তাহার প্রমাণ নিচের উদ্ধৃতিতে আরেকবার পাইতেছি। তাঁহার মনে হইতেছিল, কবিতা লিখিবার কলাকৌশল সত্য সত্য শিক্ষা না করিয়াই নজরুল ইসলাম বুঝি বা সস্তায় বাজিমাত করিতেছেন। কায়কোবাদ লিখিয়াছেন :

> বর্ত্তমান যুগের কোন মুসলমান কবি দশ, একাদশ, দ্বাদশ অক্ষরের কবিতা লিখিয়া 'তোটক ছন্দ' নাম দিয়াছেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি কি জানেন না যে তোটক ছন্দের প্রত্যেক চরণে দ্বাদশটি বর্ণ থাকা চাই, এবং ইহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ এই চারিটি বর্ণের চারিটি স্বর গুরু ও বক্রী আষ্টটি বর্ণের আষ্টটি স্বর লঘু; অর্থাৎ বারটি বর্ণের প্রত্যেক দুটি বর্ণের পর তৃতীয় বর্ণের স্বরটি গুরু না হইলে তোটক ছন্দ হয় না। কেবল দ্বাদশ অক্ষরের কবিতা লিখিলে তোটক হয় না। পুরাকালের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। যথা তাঁহার : 'নলিনী যেন মত্ত করি ধরিল।' (কায়কোবাদ ১৯৭৩: ২২২)

বলিয়া রাখিতে চাহি, কায়কোবাদের ভাষা বড়ই সুমিষ্ট। বাকি অর্থে 'বক্রী' শব্দের ব্যবহারে তাহার প্রমাণ মেলে। আট অর্থে 'আষ্ট' খাইতে সত্যই বঙ্গীয় মিষ্টান্ন সদৃশ। এখানে বলাবাহুল্য নয়, নজরলি ইসলাম তাঁহার 'জাগৃহি' কবিতার পরিচয়স্বরূপ 'তোটক ছন্দ' কথাটি বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার 'বিষের বাঁশী' বহির মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে পরখ করিবার নিমিত্ত ঐ কবিতার কয়েক চরণ দেখা যাইতে পারে।

'হর — হর হর শঙ্কর হর হর ব্যোম্'–
একি — ঘন রণ-রোল ছায় চরাচর ব্যোম্!
হানে ক্ষিপ্ত মহেশ্বর রুদ্র পিনাক,
ঘন — প্রণব-নিনাদ হাঁকে ভৈরব হাঁক
ধূ ধূ — দাউ দাউ জ্বলে কোটি নর-মেধ-যাগ,
হানে কাল-বিষ বিশ্বে রে মহাকাল-নাগ!
আজ — ধূর্জটি ব্যোমকেশ নৃত্য-পাগল,
ঐ — ভাঙলো আগল ওরে ভাঙলো আগল।
বোলে — অম্বুদ-ডম্বরু কম্বু বিষাণ,
নাচে — থৈ-তাতা থৈ-তাতা পাগলা ঈশান!
... — ...

(নজরুল ১৯৬৬: ৬৯)

কায়কোবাদের বিশ্বাস, এইভাবে ব্যাকরণের যে সব ছন্দের কথা বর্ণিত হইয়াছে বর্তমানে সেই সব ছন্দকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আধুনিক কবিগণ নিজেদের ইচ্ছামতো কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। এইভাবে নিয়মভঙ্গ করিয়া কবিতা লেখার কোন অর্থ হয় না। তাঁহার কথায়, 'ব্যাকরণে নির্দেশিত ছন্দগুলি ছাড়া তাঁহাদের [আধুনিক কবিদের] নিজস্ব নূতন কিছুই নহে। বিশেষত তাঁহাদের এই ছন্দ ব্যাকরণে বিমিশ্র ছন্দ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।' (কায়কোবাদ ১৯৭৩: ২২২)

৩

ইতিহাস–লোকে বলে–বড় রসিকপুরুষ। এই রসিকতা মাঝে মাঝে আকর্ণবিস্তৃত ব্যাজের আকার ধারণ করে। কাজী নজরুল ইসলামের সহিত কোরেশী কায়কোবাদের দেখাসাক্ষাত অধ্যায়টি এই দিক হইতে দেখিলে প্রাণে বিশেষ আনন্দ দেয়। বেশিদিন আগের কথা নহে, বাংলা ১৩২৬ (ইংরেজি ১৯১৯) সালের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় স্বনামধন্য সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেবও কবি কায়কোবাদের বিরুদ্ধে একই ধাঁচের হামলা পরিচালনা করিতেছিলেন। সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬) মানে ততদিনে অবলুপ্ত 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁহার কবিতার বই মাত্র একটি–নাম 'ডালি'। কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' মহাকবিতাকে আক্রমণ করিয়া ইঁনি এক বছরেই গোটা দুইটা বড় কড়া লেখা লিখিয়াছিলেন। একটির নাম 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈশ্লামিকতা ও অশ্লীলতা', অন্যটি 'মহাশ্মশান কাব্যে জোহরা চরিত্র'। (এমদাদ আলী ১৯৯৪ [ক], ১৯৯৪ [খ])

'মহাশ্মশান' মহাকাব্য হাতে লইয়া সৈয়দ এমদাদ আলী অভিযোগ করিলেন, কায়কোবাদ মুসলমান হইয়াও তাঁহার কাব্যে 'অনৈশ্লামিকতা' ও 'অশ্লীলতা' আমদানি করিয়াছেন। ঘটনাক্রমে নবীন লেখক আবুল কালাম শামসুদ্দীনও (১৮৯৭-১৯৭৮) সেদিন এই বিতর্কে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত একখণ্ড স্মৃতিকথায় শামসুদ্দীন স্মরণ করিয়াছেন, 'মহাশ্মশানে অনৈশ্লামিকতার নিদর্শন দেখাতে গিয়ে তিনি [সৈয়দ এমদাদ আলী] কাব্যের এক নায়িকার মুখে প্রদত্ত "গঙ্গাস্তোত্রে"র কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি 'গঙ্গাস্তোত্র'টি তাঁর প্রবন্ধে উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন : 'মুসলমানের কাব্যে গঙ্গাস্তোত্র–কি দুর্দৈব!' (শামসুদ্দীন ১৯৯৪: ২৩১)

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের স্মৃতিকথায় এই ঘটনার তাজা বয়ান অল্পবিস্তর পাওয়া যায় : 'মহাশ্মশানের বিরুদ্ধে অনৈশ্লামিকতার অপবাদ সম্পর্কে লিখলাম : কাব্যে ইসলামিকতা বা অনৈশ্লামিকতা বলে কোন কথা নাই। কাব্য সার্বজনীন। কাজেই সৈয়দ সাহেবের [সৈয়দ এমদাদ আলীর] অনৈশ্লামিকতার অপবাদ সত্যকার কাব্যবিচারের ধোপে টিকে নাই। তাছাড়া কাব্যের একজন হিন্দু নায়িকার মুখেই গঙ্গাস্তোত্র দেওয়া হয়েছে–সেখানে আল্লাস্তোত্র দেওয়া অস্বাভাবিক হতো। আর কায়কোবাদ সাহেব যে গঙ্গাস্তোত্রটি ঠিক হিন্দুর মতো করেই সুন্দরভাবে লিখতে পেরেছেন এটা কবি হিসাবে তাঁর কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। এ জন্য তাঁকে নিন্দা করা শুধু অশোভন নয়, অন্যায়ও।' (শামসুদ্দীন ১৯৯৪: ২০১-৩২)

ইতিহাস বিশারদ প্রবীণ নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭) আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সমর্থন করিয়া 'সওগাত' পত্রিকায় সৈয়দ এমদাদ আলীর কড়া সমালোচনা লিখিলেন।

তিনিও এই কাব্যে কোন অনৈশ্লামিকতার গন্ধ বা অশ্লীলতার নিদর্শন খুঁজিয়া পাইলেন না। তবে তিনি কায়কোবাদের ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও কম সাংঘাতিক নহে। এ অভিযোগ সত্য হইলে মহাকবির ইজ্জত আর থাকে না : 'কবির ভাষা সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ কাহাকে বলে তাহাকে তিনি ঠিক ধরিতে পারেন নাই।' ভট্টশালীর কথা আরেকটু উদ্ধার করা যাইতে পারে : 'ছন্দ সর্বত্রই অমিত্র পয়ার মাত্র। তবে এই বিষয়ে তাঁহাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি যে কবির উপাসক সেই কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের এবং হেমচন্দ্রের হাতেও অমিত্রাক্ষর ভাল খেলে নাই, প্রায়ই অমিত্র পয়ার হইয়া পড়িয়াছে।' (ভট্টশালী ১৩২৭: ৭৪৮)

১৯২৩ সালের শেষদিককার কথা। ততদিনে নজরুল ইসলামের নাম বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কায়কোবাদ একবার কি উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের স্মৃতি অনুসারে বলিতে, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন খোদ 'মোসলেম জগৎ' [মোসলেম ভারত] আপিসে। স্মৃতিচারণে মনে আছে খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনও তখন সেখানে ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর কায়কোবাদ হঠাৎ মঈনুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'নজরুল ইসলাম কি এখন কোলকাতায় আছেন?' প্রকাশ থাকে যে, নজরুল ইসলাম তখন অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' সম্পাদনা করিতেছেন। সকলে মিলিয়া 'ধূমকেতু' আপিসে হাজির হইলেন। প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে অবস্থিত 'ধূমকেতু' আপিসে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকারের বিবরণ আবুল কালাম শামসুদ্দীন লম্বাচওড়াই দিয়াছেন। তিনি স্মরণ করিতেছেন : 'দেখলাম, নজরুল কবি কায়কোবাদকে অভ্যর্থনার জন্য একেবারে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর সাথে নজরুলের পরিচয় করিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল নত হয়ে তাঁর কদমবুসি করলেন এবং তাঁকে সাদরে হাত ধরে তাঁর অফিস-রুমে নিয়ে গেলেন।' আবুল কালাম শামসুদ্দীনের বয়ান অনুসারে নজরুল ইসলাম যখন কায়কোবাদকে বলিলেন : 'আপনি আমাদের কবিগুরু; আপনার অনুসরণেই আমরা যা কিছু করছি–আপনি আমাদের আশীর্বাদ করেন', তখন কায়কোবাদও কম গেলেন না, বলিলেন : 'যদিও আপনার ও আমাদের কবিতার ধরণ আলাদা, তবুও আমি আপনার কবিত্ব-শক্তিতে মুগ্ধ হয়েছি।' (শামসুদ্দীন ১৯৯৪: ২৭৭)

ইহার পর কায়কোবাদের একান্ত ইচ্ছায় শুরু হইল নজরুল ইসলামের গান ও কবিতার আবৃত্তিপর্ব:

> 'প্রথমেই নজরুল আবৃত্তি করলেন তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা। তারপর ক্রমে "কামাল পাশা", "আনোয়ার", "কোরবানী", "মহরম" প্রভৃতি কবিতার আবৃত্তিও হলো। কায়কোবাদ মন্ত্রমুগ্ধের মতো এ-সব আবৃত্তি শুনলেন এবং উচ্চারণ করলেন : সাবাশ।' 'এরপর শুরু হলো গান। একটা গান শেষ হতেই কায়কোবাদ সাহেব আর একটা গাইতে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। নজরুল ইসলামেরও তাতে ক্লান্তি নাই। তিনিও গানের পর গান গেয়েই চললেন। এভাবে যখন রাত প্রায় দশটা, তখন মনে হলো নজরুলও বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এবং আমাদেরও ঘরে ফিরবার কথা মনে পড়লো। কাজেই বিদায়ের পালা শুরু হলো। কবি সাহেব নজরুল ইসলামকে মোবারকবাদ জানালেন এবং নজরুলও বিনয়ে সঙ্কুচিত হয়ে কবিকে ধন্যবাদ জানালেন। নজরুল রাস্তা পর্যন্ত কবিকে এগিয়ে দিলেন।' (শামসুদ্দীন ১৯৯৪ : ২৭৭-৭৮)

সারাজীবন কাজী নজরুলের ছিদ্রান্বেষণ করিবার পর একদিন–ইংরেজি ১৯৫৮ (বাংলা ১৩৬৫) সালে–কাজী আবদুল ওদুদ একটি কথা নতুন করিয়া জাহির করিয়াছিলেন। ওদুদ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন নজরুল ইসলাম যদিও মহাকবি নহেন, তিনি নিঃসন্দেহে একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি, মহান মানুষ। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন, 'নজরুল সেদিন পর্যন্ত পান খেয়ে গান গেয়ে বহাল তবিয়তে আমাদের মধ্যে ফিরেছেন; তাঁর সংখ্যাহীন স্খলন-পতন-ত্রুটির কথা আমরা কে না জানি, অথবা জানি বলে বিশ্বাস করি! কিন্তু তবুও এ [কথা] সত্য যে বহু দোষে দোষী নজরুল প্রকৃতই মহাপ্রাণ–সেই মহাপ্রাণতাই তাঁর নিগূঢ় পরিচয়।' আবদুল ওদুদের পেশ করা একটা নজিরও এই মত সমর্থন করিতেছে : 'একদিন' তাঁর গৃহে আমার দেখা হয়েছিল তাঁর এক কড়া নিন্দুকের সঙ্গে, সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর নিজের এক রচনা সম্পর্কে কবির সাহায্য নিতে। কবি তাঁকে গ্রহণযোগ্য সাহায্য করেছিলেন আর তাঁর চলে যাবার পরে হেসে বলেছিলেন–"এক চমৎকার ইয়ার্কি"।' (ওদুদ ১৯৯০: ২০২)

কোন এক চরিতকার অনুমান করিয়াছেন–কড়া নিন্দুকটি আর কেহই নহেন সেই ১৯২০ সালের দশকের–শ্রেষ্ঠ নজরুল নিপীড়ক–ফ্যাসিপন্থী 'শনিবারের চিঠি'-খ্যাত–সজনীকান্ত দাস। দুর্ভাগ্যের মধ্যে, আমি এখন মনে করিতে পারিতেছি না এই চরিতকারটি কে। তবে কাজী আবদুল ওদুদের শেষ মন্তব্যটা মনে আছে : 'কোন আঘাত ছিল না তাঁর সেই হাসিতে।' প্রকাশ থাকে যে, ১৯৪২ সালে নজরুল যখন পুরাদস্তুর ধরাশায়ী হইলেন, তখন কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোক সোহবতে 'নজরুল সহায়ক সমিতি' গঠিত হইয়াছিল। ঐ কমিটির সভাপতি দাঁড়াইয়াছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর সাধারণ সম্পাদক (কিংবা মতান্তরে যুগ্ম-সম্পাদক) পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন–আর কেহ নহেন–স্বয়ং সেই সজনীকান্ত দাস! (আহমদ ১৯৭৩: ৩৬৯)

কবুল করিতে দোষ কি–'এক চমৎকার ইয়ার্কি।' ❖

দোহাই

১. কায়কোবাদ, 'কাব্য-কবি ও সমালোচক,' *অশ্রুমালা*, ষষ্ঠ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ১৯৭৩), পৃ. ২০১-২৩১।

২. কাজী নজরুল ইসলাম, 'পত্র নং ৩১,' *নজরুল রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, ২য় অর্ধ, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ২৭৫-২৮৭।

৩. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪)।

৪. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'কবি কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্য,' *সওগাত*, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ [১৯২০]: পুনর্মুদ্রণ : *সওগাত*, আশ্বিন ১৩৭৬, পৃ. ৭৪৮-৭৪৮গ।

৫. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, 'অতীত দিনের স্মৃতি,' *আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ [ক]), পৃ. ২০৯-৫১৫।

৬. আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, 'মহাশ্মশান কাব্য,' *সওগাত*, আষাঢ় ১৩২৬: পুনর্মুদ্রণ : *কায়কোবাদ রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ [খ]), পৃ. ৪০২-৪১৫।

৭. কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিষের বাঁশী,' *নজরুল রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৬), ৫১-১১২।

৮. মুজফফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, ৩য় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৩)।

৯. মোবারক হোসেন, *নবীনচন্দ্র সেন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫)।

১০. সৈয়দ এমদাদ আলী, 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈশ্লামিক ও অশ্লীল ভাব,' *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, বৈশাখ ১৩২৬: পুনর্মুদ্রণ: *কায়কোবাদ রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ [ক]), পৃ. ৩৯৩-৪০২।

১১. সৈয়দ এমদাদ আলী, 'মহাশ্মশান কাব্যে জোহরা চরিত্র,' *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, শ্রাবণ ১৩২৬: পুনর্মুদ্রণ : *কায়কোবাদ রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪ [খ]), পৃ. ৪১৫-৪৪৪।

১২. কাজী আবদুল ওদুদ, 'কবির মহাপ্রাণতা,' *কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, আবদুল হক সম্পাদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯০), পৃ.

মাহবুব আজীজ

নদীর পাড়ে বসে থাকি শুধু



গল্প

নদীর পাড়ে. সন্ধ্যা হয় ততক্ষণে–সন্ধ্যার লালাভ আলো বুনো বেড়ালের মতো অস্পষ্ট অন্ধকারে লাফিয়ে মিশে যেতে শুরু করে: গুটিকয় নৌকামাত্র. এদিক ওদিক ছড়ানো কয়েকজন মানুষ. আকস্মিক চিৎকার ভেসে আসে–'লাফ দিছেরে রে লাফ দিছে! মরবো. মরবো! আছুইন কেউ! তাত্তাড়ি...আইউন... আইউন যে!'–বোঝা যায় নৌকার মাঝি-মাল্লার স্বর: মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে আরেকজনের আর্তচিৎকার: এবারের ধ্বনিস্বর শহুরে: কণ্ঠে-বুকে যত শক্তি আছে তা নিয়ে লোকটির সুতীব্র আর্তধ্বনি বয়ে যায় নদী বরাবর–'বাঁচান! বাঁচান!'

আমরা বসে আছি বানাড় নদীর পাশে. প্রাচীন বটগাছের নিচে: আজকাল সন্ধ্যার ঠিক আগে আমরা বাদিহাটির মোড় ছেড়ে নদীর পাড়ে বসে যাই শতবর্ষী বটগাছের নিচে ইট বিছিয়ে: আমরা কয়েকজন: এদের অনেকে এখানে নিয়মিত. কেউ কেউ অনিয়মিত– নানা বয়সের তরুণ– দু'চারজন আইএ/বিএ পাস দিয়ে চাকরির খোঁজ করি. কেউবা পাস-টাসের আশা ছেড়ে ব্যবসার চেষ্টায় রত: দু'একজন কী করবো ঠিক করে উঠতে পারিনি তখনও: আমরা কয়েকজন বসে নানা প্রসঙ্গে কথা বলতে থাকি: এর মধ্যে 'বাঁচান' 'বাঁচান' চিৎকারে আমরা আমূল চমকে উঠি ও নদী বরাবর দৌড় দিই।

ততক্ষণে লোকটিও ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর জলে. নৌকা নিয়ে এগোয় কয়েকজন মাঝি: আমরা বুঝতে পারি– তরুণী আত্মহত্যার চেষ্টায় ঝাঁপ দিয়েছে জলে. তাকে বাঁচাতে নদীতে লাফ দেয় লোকটি।



অলঙ্করণ : : ইমরান হোসাইন পিপলু

নৌকার মাঝিরা তাদের উদ্ধারের চেষ্টায় রত; আমরা কালবিলম্ব না করে ৪ থেকে ৫ জন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি ও দু'জনকে উদ্ধারের চেষ্টায় নিয়োজিত হই; আষাঢ় মাস শুরু হলেও নদীতে জল খুব বেশি নয়; ১০/১২ ফুট গভীর হবে, নদীর পাড়ের মানুষ আমরা— সাঁতারে পটু; পরস্পর একযোগে হাত লাগাই ও তরুণ-তরুণীকে উদ্ধার করে নৌকায় তুলি; আমরা সাঁতরে, নৌকা ঠেলে পাড়ের দিকে নিয়ে যাই— আমাদের মধ্যে ততক্ষণে নেতৃত্বে চলে আসে রতন—আবদুল কাদির রতন দুই/তিনবারের বিএ ফেল, স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ও রাইস মিলের মালিক। নদীর পাড়ের আড্ডাধারীদের মধ্যে রতন সবচেয়ে চতুর, মাঝারি উচ্চতার ছোট করে ছাঁটা চুলে মুখে ব্রণের দাগসহ ছোট চোখ দুটো অস্থির, সবসময় তিরতির করে যেন কাঁপে; আজকাল কমই আসে সে এই আড্ডায়, নানান ধান্ধাফিকিরে তার দিন যায়; তরুণীকে নদীর পাড়ে মাটিতে শুইয়ে রীতিমতো সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো রতন তরুণীর বুকে চাপ দিয়ে ও উপুড় করে ভেতরে ঢোকা পানি বের করার চেষ্টা করে এবং আমাদের বলতে থাকে, 'ডাক্তার লাগবো। ডাক্তার। দুইজনরে তুইলা গেস্ট হাউসের রিসিপশনে লয়া চল, আমার লগে'। আমরা তাই করি, লোকটি আমাদের দুইজনের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটলেও তরুণী হাঁটার মতো অবস্থায় নেই; আমাদের বডিবিল্ডার বন্ধু মিঠু তরুণীকে পাঁজাকোলে নিয়ে রওনা দিতে চায়। রতন বাধা দিয়ে বলে— 'একলা নিস না। পইড়া যাইবো; আমি ধরি লগে'— বলে মিঠু ও রতন নদীর পাড় থেকে গেস্ট হাউস ১০/১২ মিনিটের হাঁটাপথ দু'জনে মিলে তরুণীকে পাঁজাকোলে নিয়ে রিসিপশনের সোফায় শুইয়ে রাখে।

নীল ও হলুদের মিশ্রণে ফুল-ফুল ছবিওলা জামা পরা তরুণীটির নাম মনিকা— সঙ্গের লোকটি এ তথ্য জানিয়ে বলে, তার নিজের নাম এমদাদ— গার্মেন্টসের মার্চেন্ডাইজারের চাকরি করে; মনিকা তার বন্ধু, তারা ঢাকা থেকে আজই বেড়াতে এসেছিল নদীর পাড়ে; ফিরে যাবে; সন্ধ্যার পরপর, সামান্য রাগারাগী হয়— মনিকা ঝাঁপ দেয় নদীর জলে! আমি সোফায় চোখ বন্ধ করে রাখা তরুণীটির মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হই; লোকটির তুলনায় অল্প বয়সী তরুণী, মুখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, মেয়েটির বয়স কোনোভাবেই ১৮/১৯ পার হয়নি; মুখের গড়ন অসম্ভব সুন্দর, সরল; মনে হয়, তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে কেউ ওই মুখ; শুশ্রূষা করার পর অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তার নিঃশ্বাস; মায়াময় দুই চোখে অন্তহীন গভীরতা, যথেষ্ট লম্বা— ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি তো হবেই; বেঁটে বলে চিরকালই আমার মনে দুঃখের শেষ নেই; মনে মনে লজ্জা পাই। এই মেয়ে দেখি আমার চাইতে কমপক্ষে ১ ফুট বেশি লম্বা! এমদাদ মেয়েটির চেয়ে অনেক বড় হবে; ৩৫-৩৬ বছর বয়স, শক্ত-পেটা শরীর, ডান চোখের ওপর তেরছা কাটা দাগ, ফর্সা মুখ, লম্বায় এমদাদ মেয়েটির সমান হবে।

রতন জনসংযোগে যথেষ্ট কৃতি, ম্যানেজারকে বলে অতিথি ভবনের নিচতলার ১০৩ নম্বর কক্ষ খুলে পাশাপাশি দুই খাটে অসুস্থ মনিকা ও এমদাদকে শুইয়ে দেয়; পুরো ফুলবাড়িয়াতেই বেসরকারি সাহায্য সংস্থার এই অতিথি ভবনের আলাদা খ্যাতি আছে; সুরম্য ও ছিমছাম বলে, সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই বললেই চলে— আমাদের গ্রামে বানাড় নদীর কোল ঘেঁষে বাগানবিলাসে ছাওয়া দারুণ নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে এই অতিথিশালায় নানা প্রতিষ্ঠানের দেশি-বিদেশি উর্ধ্বতনরা অতিথি হিসেবে থাকেন; এখানে আগে থেকে বুকিং দেওয়া না থাকলে শূন্য কক্ষ পাওয়া মুশকিল বলে আমরা সবসময় জেনে এসেছি।

রতন আমাদের বলে, 'তোরা ২/১ জন যা। দৌড়ায়া

ডাক্তার নিয়া আয়। মোড়ের ফার্মেসিতে পাইবি। যা...!... শেষ 'যা!...'টি রতন আমাকে বলে, মৃদু ধাক্কা দেয় ও বলে, 'ডাক্তারকে স্যালাইন নিয়া আসতে বলিস। স্যালাইন না দিলে নেতাইয়া যাইবো।' রতনের মতো আমি ডাকাবুকো নই; ফুলবাড়িয়া কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় বারদুয়েক ফেল আমিও করেছি; আমি নিরীহ গোছের, অচঞ্চল কর্মহীন; অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকের ঘাড়ে বসে বেশ আছি, আড্ডাই মুখ্য কাজ আপাতত; রতনের দেখা অবশ্য নিয়মিত পাই না আমরা– আজ পাকেচক্রে তারই কথার তোড়ে ভেজা কাপড়ে আমি আর বডিবিল্ডার মিঠু পলাশীহাটা মোড়ের দিকে রওনা দিই ডাক্তার লুৎফরকে নিয়ে আসতে।

রতন আমার স্কুল বন্ধু হলেও স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠেই তার হাবভাব অন্যরকম হয়ে যায়, মিশতে শুরু করে তার চেয়ে বয়সে বড়দের সঙ্গে; কলেজে উঠে সে রাজনীতিতে জড়ায়, নানারকম টেন্ডারবাজির সঙ্গে জড়ালেও খুব যে সুবিধা করতে পারে তা নয়; তবে বিএ ফেল করেই সে রাইস মিলের ব্যবসা শুরু করে। মনে আছে, একবার আমাকে ডেকেছিল রতন–'বইসাই তো থাকস সারাদিন, আমার লগে ঘুরতে ফিরতে তো পারস্'–আহ্বানে দু'চারদিন ঘুরে দেখেছি, রতন যে কোনো কাজে নিজের লাভ খোঁজে সবার আগে; এতোটা খাই-খাই ভালো লাগে না আমার; আমি ফিরে এসে নদীর পাড়ে আবার নিয়মিত বসতে শুরু করি।

ডাক্তার লুৎফর ফুলবাড়িয়ার সবচেয়ে তুখোড় ডাক্তার বলে আমরা জানি। আমি ও বডিবিল্ডার মিঠু দৌড়ে যাই তার কাছে; মিঠুও আমাদের– মানে রতন আর আমার সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে, উচ্চ মাধ্যমিকে বারকয়েক অনুত্তীর্ণ হয়ে পড়াশোনা বাদ দিয়ে শরীরচর্চাকেই ধ্যানজ্ঞান করে ৫ ফুট ৫ ইঞ্চির মজবুত শরীরটা নিয়ে কয়েক বছরে মিঠু রীতিমতো কুস্তিগিরের অবয়বে আবির্ভূত হয়, সকালে-বিকালে বাজারের ওষুধের দোকানে মিঠু অ্যাটেনডেন্টের কাজ করে; তবে তার অধিকাংশ সময় কাটে শরীরচর্চায়। বডিবিল্ডার মিঠুকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার লুৎফরকে বৃত্তান্ত বলতে থাকি। ডাক্তার সহাস্যে বলেন– 'ডেটিং করতে আইসা কাইজা? সেখান থেকে আত্মহত্যার চেষ্টা? আবার কইতাছো মেয়েটার বয়স কম। চলো... চলো...।' আমি ও মিঠু ডাক্তার লুৎফরের মোটরসাইকেলে তিনজনে আধ ঘণ্টার মধ্যে অতিথি ভবনে পৌঁছি।

ফিসফাস, গুঞ্জন ওঠে নদীর পাড়ে; 'এক মাইয়া নিকি ধরা পড়ছে আকাম করতে গিয়া'– শোনা কথা বাতাসের আগে ধায়, বেশ কয়েকজন ভিড় করে অতিথিশালার গেটে; ব্যস্ততা বাড়ে আবদুল কাদির রতনের; সে রীতিমতো ধমকে জড়ো হওয়া মানুষদের সরিয়ে দেয়; মিঠুর নেতৃত্বে কয়েকজনকে মূল গেটে দাঁড় করায়, অনাহূত কাউকেই ঢুকতে দেওয়া হবে না।

এদিকে ডাক্তার এনে বসে আছি টিভি রুমে, রতনের দেখা নাই; ওর সাঙ্গপাঙ্গরা এরইমধ্যে নিচতলার বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে আছে; জিজ্ঞেস করি– '১০৩ নম্বর কক্ষে তালা কেন? ডাক্তার নিয়া আসছি? রোগী কই!' গোঁফওলা এক সাঙ্গ আমাকে হাত ইশারায় চুপ করে টিভি দেখতে বলে ও জানায়, 'উস্তাদ আসতাছে।' কিছুই বুঝে উঠতে পারি না– কেমন গা ছমছমে ও অচেনা মনে হয় চারপাশ; একতলার মূল দরজায় পাহারা বসিয়ে রতন যেন অদৃশ্য হয়ে যায়; আধঘণ্টা পর ফিরে হন্তদন্ত রতন টেলিফোন করে তার রাজনৈতিক বড় ভাই– বাবুভাইকে– এলাকার যুব সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। ফোন পেয়ে বাবুভাই ৩/৪টি মোটরসাইকেল ও সংগঠনের সঙ্গীসাথী ৮ থেকে ১০ জনকে নিয়ে অতিথিশালায় পৌঁছে।

নিচতলায় ১০৩ নম্বর কক্ষে তালা কেন?– রতনকে জিজ্ঞেস করতেই সে ধমকে ওঠে– 'এমদাদ এহন কয়, সে এই মাইয়ারে চিনে না! আতকা পানিত লাফ দিছে দেইখা আমাগোর মতোই সে তারে বাঁচাইতে নদীতে ঝাঁপ দিছিল। সে একলা পলাইতে চাইছিল। তার গাড়ি আটকাইছি গ্যারেজে, আর তারে ১০৩-এ রাইখা তালা মাইরা থুইছি।'

'আর মনিকা?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'মনিকা?' চুপ করে থাকে রতন– 'আছে। শ্বাসকষ্ট হইছিল দিখা দোতলার এসি রুমে নিয়া রাখছি।...ডাক্তার সাব ট্রিটমেন্ট দিলেই পুরা সুস্থ হইবো। ঘরটর সব ঠিক করতে সময় লাগলো।' রতন আমার চোখের দিকে তাকায় না, অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলে।

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলের নেতৃত্ব রতনের হাত থেকে বাবুভাই ও তার ক্যাডারদের হাতে চলে যায়; রতন ও তার ক্যাডাররা দৃশ্যপটে পিছু হটে যায়; বাবুভাই বলে, 'রতন ঘাবড়ায়ো না। আমি দেখতাছি! আর, ডাক্তাররে চা দিতে বল। আমি আগে দেখি কি ব্যাপার? এত লোকতো রোগীর কাছে নেওয়া যাবে না।' রতনকে উদ্দেশ করে বলতে থাকে বাবুভাই– 'আমারে খবর দিছো। এইটুক ঠিক ছিল। আবার পুলিশরে ফোন দিলা কেন? এত বেশি বুঝো তুমরা? আমি তো আছি এইখানে? নাকি!'

বাবুভাই পুলিশের ওসিকে ফোন করে –'না, না; ফোর্স পাঠানোর কিছু নাই। সামান্য ঘটনা; ট্যাকল দিয়া দিছি অলরেডি। প্রবলেম হলে আপনি তো জানবেনই। আমরা আছি কেন?' ফোন শেষে বাবুভাই রতনকে মূল গেটের দায়িত্ব দিয়ে বলে, 'এক পাও নড়বা না। কাউরে কুনো ফোনের দরকার নাই। ১ ঘণ্টা পরে জলিল সাব মেম্বর ভাই আসতাছে। দরকার পড়লে প্রশাসন সে ট্যাকল দিব।'

আমার সামান্য বুদ্ধিতে কুলোয় না; পানিতে ডুবতে বসা মেয়েটা ইতিমধ্যে উদ্ধারকৃত; যদি আজ ঢাকায় যাওয়ার মতো অবস্থা না থাকে, তো রাতটি গেস্ট হাউসে ঘুমিয়ে সকালে রওনা দিলেই ল্যাঠা চুকে গেল!...তা না, বাবুভাই, জলিল সাব মেম্বার...সব গুচ্ছের বস্ কেন এখানে এনে ভিড় করাতে শুরু করলো রতন; বুঝে উঠতে পারি না। 'তুই জন্মের গাধা! দুই তলার ঘরে কিছু একটা হইতাছে..। আতকা মনিকার কন্ডিশন খারাপ হয়া গেছে! লোক-লস্কর লয়া আইতাছে তাই। এইডাতো একটা আন্ধাও বোঝে আর তুই বোঝস না!'- বডিবিল্ডার মিঠুর কথা শুনে থমকে যাই; কী বলে মিঠু এইসব!

কক্ষের তালার চাবি রতনের হাতে তখনও, রতন দ্রুত হাতে ১০৩ নম্বর কক্ষের তালা খোলে ও আমাকে ডাক দেয়; কক্ষের অভ্যন্তরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি আটকে দেয়; আমাদের দেখে ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে বসে এমদাদ। ও বলতে থাকে, 'রতন ভাই। আপনি আমার বড় ভাই। জানাজানি হয়া গেলে বিপদ; ঢাকায় আমার সংসার আছে; সমাজ আছে–সবাই আমারে চেনে। মানসম্মান আর কিছু থাকবে না! আপনের যা লাগে আমি দিবো, আমারে ছেড়ে দেন।'

রতন কর্কশ স্বরে এমদাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মনিকার মোবাইল আপনের কাছে না?'

'পানিতে লাফ দেওয়ার সময় মনিকার হাতে মোবাইল ছিল; ওইটা কি আর আছে নাকি!'

'আপনার ফোন থেকে মনিকার বাপরে একটা ফোন দেন।'

'আমার কাছে নম্বর নাই।'

'আরেকবার চালাকি করলে মুগুর দিয়া মাথা ভাঙুম। মনিকারে রেপ করছে কে?'- রতনের চোখ খুনির মতো টকটকে লাল; সে চোখ-মুখ শক্ত করে এমদাদকে বলতে

থাকে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকায় এমদাদ, যেন সে নিজের কানকে বিশ্বাস করে না; নির্বাক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সে বলতে থাকে– ' এইসব আপনি কী বলেন?'

'শালা বজ্জাত। রেপ কইরা নদীতে ফালায়া, কও আত্মহত্যা করছে। ফোন নম্বর দে শালা... ।' বলতে থাকে রতন।

আমি কিছুই বুঝতে পারি না, নিজের চোখ আর কান কি অকেজো হয়ে গেল! আমি রতনের দিকে তাকাই, 'রতন, রেপের ব্যাপারটা কী? এইসব কী কস্?'

'তুই চুপ থাক' রতন বলে আর এই সময় ঘরের দরজায় বাবুভাইর মুহুর্মুহু করাঘাত; 'বাইর হয়া আয় রতন! জলিল সাব মেম্বর আসতেছেন। তাড়াতাড়ি বাইর হ।'

রতন দরজা খোলে, বাইরে গাড়ির আওয়াজ শুনে বুঝি– রতন আর বাবুভাইর লিডার জলিল সাব মেম্বর ৫/৭ জন সহযোগীসহ ভেতরে আসে, জলিল মেম্বর আর বাবুভাই রতনকে হাত ধরে টানতে টানতে বারান্দার অন্ধকারে কোণে নিয়ে যেতে থাকেন; আর আমি আবার এমদাদের ঘরে ঢুকে পড়ি–

'আচ্ছা ভাই, সত্যি করে বলেন তো ব্যাপারটা কী?'

লোকটি আমাকে অবাক করে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে–

'ভাই আপনারা কি মানুষ! পানিতে পড়া একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে কী শুরু করলেন?' কাঁদতে থাকে লোকটি – 'আমার বউ আছে, বাচ্চা আছে। আমারে ছেড়ে দেন আপনারা। আপনারা ওই মেয়েকে নিয়ে যা খুশি করেন।'

এমদাদের কান্নাকাটির মধ্যেই জলিল সাব মেম্বর, রতন আর বাবুভাই ঘরে ঢোকে। বুঝতে পারি, নেতৃত্ব এখন বাবুভাইর হাত থেকে জলিল সাব মেম্বরের হাতে চলে গেছে; বুঝতে পারি– রিলে রেসের মতো এক নেতা থেকে আরেক নেতার হাতে এখন মনিকার নিয়তি যেতে শুরু করেছে; আর আমরা কতিপয় বিদূষক–যেমন আমি কখনও রতনের, রতন কখনও বাবুভাইর; আবার বাবুভাই কখনও জলিল সাব মেম্বরের পিছু পিছু চক্রাকারে ঘুরছি আর এর মধ্যে একের পর এক– বাটন যার হাতে, যাচ্ছে মনিকার ঘরে, ফিরে আসছে আহত মেয়েটিকে আরও রক্তাক্ত করে; পুরো বিষয়টি আমার কাছে অবিশ্বাস্য ও ভীতিকর মনে হতে থাকে; আমি ম্লান মুখে শুনতে থাকি জলিল সাব মেম্বর গর্জন করতে থাকে এমদাদের সাথে, 'আপনেরা দুইজনে ঢাকা থিকা প্রাইভেট কারে দুপুর ১২টায় মোমেনসিং প্রেস ক্লাবে থামছেন। ক্যান্টিনে খাইয়া হোটেল ইউসুফে মেয়েটারে নিয়া উঠছেন। সাড়ে বারোটা থেকে চারটা পর্যন্ত হোটেলে ছিলেন....রুম নম্বর...!' জলিল সাব মেম্বরের কথা শেষ হবার আগে বলতে শুরু করে এমদাদ, এবার সে মরিয়া; এতক্ষণ নানাভাবে তার সমাজ- পরিবার- 'পরিচিতির কথা বলে এমদাদ সমঝোতা ও পরিত্রাণ পেতে চাইলেও এবার এমদাদ সত্যিই মরিয়া; বলতে থাকে– 'ভাই, আপনারা আসলে কী চান, বলেন তো! আমার সাথে মনিকা আসছে, আমাদের ঝগড়া হয়েছে, ও রাগ করে পানিতে লাফিয়ে পড়েছে। আপনারা কয়েকজন আমাদের উদ্ধার করে একি তামাশা শুরু করলেন? মনিকাকে আলাদা রুমে রেখে আপনারা কী করছেন, ভাবছেন– আমি কিছু বুঝি না!'

জলিল সাব মেম্বরও রেগে ওঠে, 'এই ব্যাটা বলে কী! এইখানে কে আবার কী করলো? চোরের মায়ের বড় গলা দেখি...! এই, এরে ধইরা রামপিটা দে তো তোরা কয়েকজন...।'

জলিল সাব মেম্বরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রতন হামলে পড়ে এমদাদের দিকে, ' মনিকার বাপের ফোন নম্বর এক্ষণ দিবি। আরেকটা কথা কইলে দাঁত খুইলা দিয়াম।' বলে আর সজোর এক থাপ্পড় বসায় এমদাদের ডান কান বরাবর, নাক বরাবর কয়েকটা তীব্র ঘুষি!

এমদাদ উল্টে পড়ে; রক্ত ঝরতে থাকে। হৈচৈ, চিৎকারে বাবুভাই আর জলিল সাব মেম্বরের কয়েকজন সাঙ্গ ছুটে আসে– আরও গোটা কয়, বিক্ষিপ্ত কয়েক কিল-ঘুষির পর জলিল সাব মেম্বর থামায় সাঙ্গদের; বলে, 'পুলিশ আইলে আমি কথা কমু। তোরা চুপ থাকবি।'

১০৩ নম্বর কক্ষ যখন রণক্ষেত্র, ব্যতিব্যস্ত ভঙ্গিতে ডাক্তার লুৎফর এসে কান্নামেশা কণ্ঠে বলতে থাকে– 'তোমাদের এইখানে নরক নাইমা আসছে! এইখানে একজনও মানুষ নাই!' সাঙ্গপাঙ্গসহ আমরা কয়েকজন মাথা নিচু করে থাকি, ডা. লুৎফর বলে, 'পানিতে পড়া রোগীর কথা বলে নিয়ে আসলা তোমরা। আমারে টিভি রুমেই আটকায়া রাখলা ২ ঘণ্টা! আমি রোগীর মুখটা পর্যন্ত দেখতে পারলাম না! যখন আমারে নিয়া গেল ততক্ষণে সব শেষ!'

বুঝতে পারি, আমাদের অলক্ষ্যে অঘটন ঘটে চলে দোতলায়; মিঠুকে বলি- 'কী? পুতুলের মতো খাড়য় রইছস? চল তো মেয়েটাকে দেখে আসি?'

মিঠুর হাসিকে আমার অশালীন মনে হয়, সে অশ্লীল হাসি দিয়ে বলে, 'এইবার বুঝি তোর টার্ন'! আমি কথা না বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাই; দেখি সিঁড়ির নিচে জলিল সাব মেম্বর, বাবুভাই ও রতন পরস্পর তীব্র বচসায় লিপ্ত; প্রত্যেকেই একে অপরকে দোষ দিচ্ছে; এদের মধ্যে রতনের কণ্ঠ সবচেয়ে উঁচু, 'আমার বয়স কম। আমি ভুল করতেই পারি! আপনারা মুরুব্বি। সবদিক সামলানোর জন্য আপনাদের ডাকলাম। আপনেরা এইটা কী করলেন? মেয়েটারে মাইরা ফেলাইলেন একেবারে।'

জলিল সাব মেম্বর বজ্রকঠিন স্বরে বলে, 'বাবু, তোমার এই ট্যান্ডলরে মুখ সামলায়া কথা কইতে কও! জিভ টান দিয়া ছিঁড়ুম কইলাম!'

রতন বলে, 'আয়নায় নিজের মুখটা দেইখা পরে অন্যের জিভ টান দিবার যায়েন জলিল সাব!'

বাবুভাই গম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'কাদা ছোড়াছুড়ি বাদ দে। আমরা সবাই তো মেয়েটারে বাঁচাইতেই চাইছি। তোরা কয়েকজন মিলা ওরে পানি থিকা উদ্ধার কইরা আনলি...! এখন সবার নাম জড়ায় যাইবো। তুই কইবি জলিল সাবের নাম; জলিল সাব কইবো তোর নাম; আরেকজন কইবো আমার নাম!....এহন মাথা গরম করার সময় না। ডাক্তারকে জিগা– এহন এরে বাঁচামু কেমনে! হাসপাতালে নিয়া যামু? অ্যাম্বুলেন্স ডাকুম?'

'ডাক্তারকে তো দুই ঘণ্টা ওই রুমেই ঢুকতে দেন নাই আপনারা। এখন মইরা যাওনের পর ডাক্তার কী করবো?'- রতন ফুঁসতে থাকে। তিনজনের এই বাহাসের মধ্যেই ডাক্তার লুৎফর এগিয়ে যায় সিঁড়ির নিচে, তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মেয়েটা আর নাই। মৃত! ওর ফ্যামিলিরে খবর দেন, পুলিশ ডাকেন।'

ততক্ষণে প্রশাসনে খবর চলে যায়, তৎপর হয় থানা-পুলিশ; আর তার পরের ঘটনাটি খুবই সংক্ষিপ্ত– মনিকার লাশ কীভাবে যেন পাওয়া যায় বানাড় নদীর ধারে, যেখান থেকে মনিকাকে নদীতে লাফ দিতে দেখি আমরা কয়েকজন সন্ধ্যার ঠিক পরপর; ঠিক সেখানেই! তবে মনিকা লাশ হয়ে ওখানে রাত ১২টার আগে কী করে পৌঁছুলো এটা অবশ্য আমরা কেউই জানি না।

আমরা বুঝতে পারি না বা বোঝার চেষ্টা করতেই ভুলে যাই, আসল ঘটনা কী? ঘটনা আদৌ কি কিছু ঘটেছিল? নাকি– আমরা, বিদূষকেরা– নদীর পাড়ে বসে থাকি শুধু। ❖



ধ্রুব এষ

নেমে যাই, বৃষ্টিতে হাঁটি

'এই শীতে তোরা আর আমাকে দেখবি না।'
'কেন, তুই কি বিয়ে করে ফেলবি?'
'না।'
'তাহলে কী? আত্মহত্যা করবি?'
'না। এই শীতে আমি পাহাড়ে থাকব।'
'অ।'

অলঙ্করণ : সব্যসাচী হাজরা

হতাশ হলো মামুন। পাহাড়ে থাকবে! এ আর এমন একটা কী কথা হলো? দুই লাইন নাটক করে বলতে হবে কেন? কথা কম বলে। মৌনীবাবা প্রায়। বন্ধুদের সঙ্গেও। এজন্যেই হয়তো হঠাৎ কিছু বললে, কারণ ছাড়াই সেসব নাটুকে মনে হয়। 'অ' বলে মামুন মনে মনে বলল, 'মিস্টার জারিফ, ইউ আর আ মেলোড্রামাটিক অ্যানিমেল। তুই একটা অতি নাটকীয় জন্তু।'.

জারিফ একটা তামাক ধরাল। কুষ্টিয়ার জিনিস। ঢাকায় এখন সহজলভ্য, কারণ সাপ্লায়ার 'সাধু' কাহালুর এখন ঢাকায়। কাহালু না, মানুষটার নাম হলো কাহালুর। তারা ডাকে সাধু কাহালুর। সকালে এই সাধু কাহালুর আড়াইশ' গ্রাম দ্রব্য দিয়ে গেছে জারিফকে। সংবিদা মঞ্জরী পাতার নকশা এনগ্রেভ করা কাঠের একটা কৌটা আছে জারিফের। পোস্টার কালারের ছোট শিশি সাইজের। সংবিদা মঞ্জরীর কৌটা। সংবিদা মঞ্জরী হলো তামাক। গাঁজা না, তারা বলে, তামাক। কেউ গাঁজা বললে খেপে যায়, 'গাঁজা কী? গাঁজা কী? তামাক! তামাক!'

আহা! যাহা গাঁজা তাহাই তামাক নয় কি?

না।

তামাকের অধ্যাত্ম আলাদা।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক ছাড়া কেউ এই মাহাত্ম্য বুঝবে না।

তারা আধ্যাত্মিক। প্রকৃত আধ্যাত্মিক।

মামুন, জারিফ এবং রনো। আরও কয়েকজন আছে বন্ধুদের মধ্যে। কিন্তু তারা স্পটে নেই এখন।

সিগারেটের ক্ষতিকর নিকোটিনযুক্ত উইড না, সাদা পাতা মিশিয়ে তামাক বানায় তারা। তামাকের মৌতাত থাকে যতক্ষণ ততক্ষণ আর সিগারেট টানে না। নিয়ম-সিয়ম কিছু মেনটেন করে আর কি!

বর্তমান তামাকের প্রস্তুতকারক মামুন। যত্নশীল ব্যক্তি। বিষপাতা খুবই যত্ন করে বাছে। তার বানানো তামাক এজন্যে উইন্ডি হয়। হাওয়ায় ওড়া যায়।

আর দুটো আছে জারিফ মৌনীর পকেটে।

অল্প আগে আরেকটা তারা টেনেছে।

ঝিম ধরে গেছে সেই একটা টেনেই।

রনোর চোখ ডাকাতিয়া লাল হয়ে গেছে। ঝিম মেরে সে কি জারুল গাছ দেখছে?

পার্পল জারুল। ফুটেছে ঝাঁপিয়ে। পার্পল করে রেখেছে আকাশের খানিকটা।

দাবদাহের দিন। চৈত্রমাস চলে গেছে, মনে হচ্ছে আছে। বৈশাখের তেরো তারিখ আজ। গতকাল ঢাকার তাপমাত্রা ছিল চৌত্রিশ দশমিক শূন্য ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ মনে হয় পঁয়ত্রিশ-ছয়ত্রিশ পার হয়ে গেছে। বিশ্রী গরম ছিল আধঘণ্টা আগেও। এখন অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। জারিফ দুই টান দিয়ে তামাক ঘুরাল, 'ধর, নে।'

মামুন বাধা দিল, 'উঁহু, অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ! রনো না, আমি।'

এও নিয়ম।

অতএব জারিফ দিল মামুনকে।

মামুন একটা টান দিয়ে বলল, 'আমি শালা একটা জিনিয়াস! না হলে এত ভালো তামাক কী করে বানাই? তাজ্জব!'

'তাজ্জব পরে হবি। আগে টান দে।'

রনো খ্যাঁক করে উঠল, এটা রনো করলে মামুনও খেঁকাত। ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে। তামাক পুড়ে যাচ্ছে। কথা বললেই বিরাট অপচয়। মামুন আর অপচয় করল না। আরেক টান দিয়ে ঘুরাল রনোকে। রনো দুই টান দিয়ে আবার জারিফকে। এভাবে ঘুরবে।

পার্কে মনে হচ্ছে জনসভা হবে। এত মানুষ। কেউ বসে আছে, কেউ হাঁটছে। বিকেল ফুরিয়ে গোধূলির দিকে যাচ্ছে। এ সময় এত মানুষ থাকে না পার্কে। তিতকুটে গরমে ত্যক্ত হয়ে জুটেছে। সিসার লেয়ার, বিল্ডিং, ধোঁয়া, কোলাহল, ঢাকা এমনিতেই তেতেমেতে থাকে। তার সঙ্গে যদি লা নিনার প্রভাব যুক্ত হয়, তিষ্টোবে কী করে মানুষজন? যাবে কোন চুলায়? এই বিবেচনা মাথায় থাকলেও এত মানুষ দেখে তারা খুবই বিরক্ত। অনাহূত মনে করছে আগত ব্যক্তিদের। তোরা এখানে কেন? হোয়াইরে হোয়াই?

কত কিসিমের মানুষ শালা! নারী, পুরুষ এবং কিম্পুরুষ জাতীয়। লম্বা, চওড়া, চৌকো, গোলাকার। ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করছে কিছু মাকাল। কিছু ফুলস্পিডে হাঁটছে। মনে হচ্ছে আখাউড়া জংশন পার্কের গেটেই। বিরাট এক ব্যক্তি, লাল টি-শার্ট, ডার্ক সানগ্লাস, আইফোনে কথা বলছে, বাংলা সিনেমার বিস্মৃত কমেডিয়ান পরাণ বাবুর মতো দেখতে, মাকালটা হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটছে এবং আইফোনে কথা বলছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন বুরবকের বুরবক! এই সময় এত লাল টি-শার্ট পরে কেউ! তারা যদি ইনফরম করে ঠা_কে, যাবে মাকালটার এত সাধের আইফোন। নিয়ে নেবে ঠা_র পোলাপান। কিন্তু তারা ওসব করবে না। কখনোই করবে না। ঠা_ হলো 'ভাই'। এলাকার 'ভাই।' নিরাপত্তাজনিত কারণে ঠা_র সঙ্গে তারা সামান্য আলাপ পরিচয় রেখেছে, এর বেশি কিছু না। ভাই ঠা_ যথেষ্ট সম্মান করে তাদের। তারা কিছু বললে শুনবে। সেই হিসাবে বিরাট লাল ব্যক্তি বুঝতে পারল না, তারা কত দয়া তাকে দেখাল।

তার আইফোনে কী দেখছে মামুন? দেখতে দেখতে বলল, 'আরে রনো! তোর ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়!'

রনো বলল, 'কী?'

'এই যে দেখ! অনলাইনে। দেখ।'

রনো দেখল। তার ছবি কোথায়? গরমে অতিষ্ঠ এক শালিকের ছবি দিয়েছে। অল্প পানিতে স্নান করছে পাখিটা। একদম মানুষের মতো এক্সপ্রেশন। একই সঙ্গে আর্ত এবং বিরক্ত। ছবিটা অদ্ভুত।

মামুন বলল, 'কোনখানে গোসল করছিলি তুই?'

রনো বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা!'

মামুন আইফোন দেখাল জারিফকে।

'দেখ জারিফ, ওর ছবি না?'

জারিফ দেখল। বলল, 'হুঁ।'

মামুন বলল, 'ঘুম থেকে উঠেই ছবিটা দেখেছি। পত্রিকার তিন নম্বর পৃষ্ঠায় ছেপেছে। দেখেই ওর কথা মনে হয়েছিল। আরে, এ তো আমাদের কমরেড। ভেবেছিলাম ফোন করব পত্রিকায়। কথা বলব ফটোগ্রাফার সাহেবের সঙ্গে। কমরেডকে পেলেন কোত্থেকে ভাই?'

রনো বলল, 'শেষ?'

বলল, 'হ্যাঁ, শেষ। তুই কি কিছু বলবি?'

রনো বলল, 'হ্যাঁ, বলব।'

'বল।'

'তার আগে আমি একটা কথা বলি।'

জারিফ বলল।

রনো এবং মামুন তাকাল।

জারিফ বলল, 'শর্মিকে সেন্ড করে দে ছবিটা।'

রনো বলল, 'মৌনীবাবা তুই! শুয়োরের বাচ্চা দুই!'

মামুন বলল, 'সাধু! সাধু!'

জারিফ শিশুর মতো হাসল।

মামুন খিক খিক করতে চাইলেও পারল না, তামাকে

শেষ টান দিচ্ছে সে।

তারা বসেছে একটা জারুল গাছের নিচে।

এই পার্কে জারুল গাছ কয়টা?

একান্নটা। বৃক্ষদা বলেছেন। লেখক নিসর্গবিদ বিপ্রদাশ বড়ুয়া। বিপ্রদা হলেন তাদের বৃক্ষদা।

রনো এবং জারিফের মধ্যে আরও কিছু বাকবিতণ্ডা হতো। হলো না মায়াবিবির হঠাৎ উপস্থিতির কারণে। বারো-তেরো বছর হবে বয়স, পার্কে রং চা বিক্রি করে মেয়েটা। গ্রিন আইড। চোখের মণি সবুজ। আর কালো তা সে যতই কালো হোক। তারা মনে করে প্যারিসে জন্মালে বড় হয়ে মায়াবিবি আঁদ্রে তাতুর মতো মডেল হতে পারত।

মায়াবিবি বলল, 'চা দিমু, মামা?'

মামুন বলল, 'দে।'

তিন গ্লাস চা দিয়ে মায়াবিবি বসল।

'গানঅলা মামায় আজ আইব না, মামা?'

দিশুর কথা বলছে।

মামুন বলল, 'নারে, মামা।'

পুরান ঢাকার ইসলামপুরে কাপড়ের গদি আছে দিশুদের। পৈত্রিক ব্যবসায়। গদিতে বাপের সঙ্গে বসতে হয় দিশুকে।

দিদারুল আলম দিশু। শান্তিনিকেতন থেকে মাস্টার্স করেছে। বিয়ে করেছে পারিবারিক ব্যবস্থাপনায়। এর মধ্যে দুই বাচ্চার বাপও হয়ে গেছে। দোষের কিছু না। ছোট পরিবার সুখী পরিবার। দোষের হলো সংবিদা মঞ্জরীর অধ্যাত্ম সে বিস্মৃত হয়েছে। জলের অধ্যাত্ম বোঝার চেষ্টায় লিপ্ত আছে এখন। তা আবার বাংলা জল না, কনিয়াক, ওয়াইন, শ্যাম্পেন এইসব। শালা কাপড়ের গদিঅলা। গৃহপালিত প্রাণী হতে জন্মেছে। সফিসটিকেটেড প্রাণী। নেগেটিভ অর্থে না। দিশু একটা পজেটিভ ক্যারেকটার। নাক লম্বা, চোখ বড় বড়, চশমা পরে, আড্ডা কখনও কখনও হয়তো তাকে তার শান্তিনিকেতনের দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে গান গায় সে। স্কুল লাইফে তারা রেডিওতে শুনেছে, এমন কোনো একটা গান হয়তো। কিংবা আরও পুরনো দিনের। মায়াবিবি সেই গান শুনেছে। দিশু আসবে না শুনে আফসোস করল, 'আহ্হারে মামা! এইটা তো একটা দুঃখের কথা কইলেন! মন খারাপ নানান কারণে। চিন্তা করছিলাম মামার গান শুনব।'

রনো বলল, 'মন খারাপ তোর?'

'হ্যাঁ, মামা।'

'কেন?'

'সেই দুঃখের কথা শুনে কী করবেন, মামা? সব আমার কপাল! বলে না, অভাগী যেদিকে যায় সাগর শুকায়!'

'এই! অভাগী না, অভাগা যেদিকে।' মামুন বলল।

'ওই একই কথা হইল তো, মামা! দুঃখের কাহিনি শুনেন। ইসকুলে তারা আমারে বিউটি কুইন নাম দিছে।'

জারিফ বলল, 'বাহ্! কারা?'

দুঃখে একেবারে জরো জরো হয়ে গেল মায়াবিবি, 'বাহ্ বললেন, মামা! তারা আমারে নাম দিছে ভেঙায়ে, বুঝছেন? আমি তো কয়লার মতো কালো। কাঁকলাসের মতো দেখতে। আমি বিউটি কুইন হইতে যাব কোন দুঃখে?'

জারিফ বলল, 'তুই হবি।'

'জি, মামা?'

'তুই বিউটি কুইন হবি।'

মামুন তাকাল, রনো তাকাল। কী বলল জারিফ?

কী হবে মায়াবিবি? বিউটি কুইন? মাঝেমধ্যে কথা খুব লেগে যায় মৌনীবাবার। সে কোনো প্রকার ভাব নেয় না যদিও। হঠাৎ হঠাৎ একটা কথা বলে, হঠাৎ হঠাৎ একটা কথা লেগে যায়। বিচিত্র ব্যাপার। নিরূপণের ঘটনা মনে আছে সকলের। সে অনেকদিন আগের ঘটনা। আরবের লোকেরা তখন...। নিরূপণকে একদিন আড্ডায় টার্গেট করে পচানো হচ্ছিল।

নিরূপণ নিরূপণ
পলিমাটি ছেনেছুনে
রাতে করে কী রোপণ?

এসব শুনে নিরূপণ খুবই খেপছিল। তার বউ পলি। তারা বলে পলিমাটি। মাস দুই হলো তারা বিবাহিত হয়েছে। শাঁখারীবাজারে একটা ঘর নিয়ে থাকে।

: তোর কি সমস্যা হয় না?

: কী সমস্যা।

: একটাই ঘর?

: তাতে তোদের কী সমস্যা?

: আমাদের আর সমস্যা কী? আমরা তো বন্ধু। পলিমাটি ছানতে সমস্যা হলে লজ্জা না করে আমাদের বলিস।

: তোরা বন্ধু? শুয়োরের বাচ্চারা! তোদেরকে বলব? তোদের মতো কুলাঙ্গার ইতর প্রাণীদের?

কোনো কোনো মানুষ টার্গেট হয়েই জন্মে। নিরূপণ তেমন একজন। কী নিয়ে তাকে খেপানো হয়নি! সেদিনের কথা তাহলে কেন উঠল? হঠাৎ সেদিন একটা কথা বলেছিল জারিফ।

'এত খেপছিস কেন তুই! আর দশদিন পরে তোকে আমরা দেখতে পাব কি-না, ঠিক আছে?'

নিরূপণ খেপেছিল আরও, 'মানে কী? দশদিনের মধ্যে আমি মরে যাব নাকি? মরে গেলে যাব! তোরা কেউ আমাকে পোড়াতে যাবি না। আমার শ্রাদ্ধে গান্ডেপিন্ডে গিলতে যাবি না। মরার আগে আমি লিখে দিয়ে যাব! আরে, আমার তো একটা বউ আছে। আমি মরে গেলে কান্নাকাটি করবে। তোদের কে আছে? কেউ আছে?'

জারিফ বলেছিল, 'আশ্চর্য! মরে যাবি কেন তুই? আমি বলছিলাম দশদিন পর আমরা তোকে দেখতে পাব কি-না!'

কথা লেগে গিয়েছিল। পরদিন দুপুরেই নিরূপণ সকলকে বিউটি বোর্ডিংয়ে আপ্যায়ন করেছিল। জাপানের স্কলারশিপটা হয়ে গেছে তার। ফ্লাইট ধরতে হবে সাতদিনের মধ্যে।

জাপানে গিয়ে থেকে গেছে নিরূপণ। পলিমাটিকে নিয়ে গেছে। পলিমাটি মা হয়েছে রিসেন্টলি। ফেসবুকে তারা দেখেছে। জাপানি পুতুলের মতো হয়েছে বাচ্চাটা। নিরূপণ এবং পলি মেয়ের নাম রেখেছে পনি। অ-কবিদের বুদ্ধি। পনির প এবং নিরূপণের নি। আরেকটা বাচ্চা হলে তার কী নাম রাখবে, সেটাও তারা ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু নামটা এক্সপোজ করেনি। সুখে-শান্তিতে আছে, ভালো আছে তারা।

কথা হলো জারিফের কথা লেগে গেছে। দশ দিন কি, আটদিন পর থেকেই তারা কেউ আর বাস্তবে দেখেনি নিরূপণকে। এখনও দেখেনি। তারা তাদের অধ্যাত্ম অনুসারে ভার্চুয়াল দেখাকে দেখা মনে করে না। ইমেজের সঙ্গে ইমেজের দেখা কি দেখা?

আরও কিছু ঘটনা আছে। জারিফের কথা লেগে গেছে। সব কথা তো না, কিছু কিছু কথা। তার মধ্যে এই কথাটাও থাক। বিউটি কুইন হবে মায়াবিবি! মামুন রনো শেয়ার করল না কিন্তু একসঙ্গে দুজনই এরকম ভাবল। মায়াবিবি বিউটি কুইন হোক। মিস ওয়ার্ল্ড, মিস ইউনিভার্স হোক।

তাদের চা শেষ হয়ে গেছে। পাকনা পাকনা আরও কিছু কথা বলে চলে গেল মায়াবিবি। কথা শুনে কে বলবে বারো-তেরো বছর বয়স। কর্মজীবী শিশুদের স্কুল আছে। সেই স্কুলে পড়ে মায়াবিবি। সেভেনে উঠবে।

মায়াবিবির প্রস্থানের পর তারা আর তাকে নিয়ে কথা

বলল না। জারিফ বলল, 'আরেকটা ধরাব?'

রনো বলল, 'পরে ধরা।'

মামুন বলল, 'হ্যাঁ, পরে ধরা। আসমান জমিন এক করা জিনিস। সাধু আকালুর! জয় হোক। জয় হোক! তুই শীতে পাহাড়ে যাবি কেন?'

জারিফ বলল, 'শীত দেখতে।'

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকারে ডুবে গেছে একটা খরতাপের দিন। খরতাপ অবশ্য কমেনি। হাওয়া দিচ্ছে বলে তেমন গায়ে লাগছে না। মামুন বলল, 'আমিও যাব।'

রনো বলল,' আমিও যাব।'

জারিফ বলল, 'না। তোদেরকে নেব না। কখনও কখনও পাহাড়ে একা যেতে হয়।'

'ঝেড়ে দিল একপিস।' রনো বলল।

মামুন বলল, 'সেই লেভেলের! তবে শীতকাল আসতে দেরি আছে অনেক। এর মধ্যে কত কী ঘটবে। এখন তোর শীত দেখার কথা মনে পড়ল কেন? এমন একটা বিশ্রী গরমকালের দিনে?'

'গরমকালেই শীতকালের কথা বেশি মনে পড়ে।'

'আরেক পিস! সাধু! সাধু!' রনো বলল।

উচ্ছ্বসিত মামুন বলল, 'যা। পাহাড়ে গিয়ে মরে যা তুই!'

এই সময় ফোন বাজল।

রনো বলল, 'তোর ফোনের এই কুৎসিত হ্যালো টিউনটা তুই কখনও বদলাবি না? ছি!'

'নিনকা সেট করে দিয়েছে।' মামুন বলল।

রনো বলল, 'তাহলে আর কী!'

লুসি আপার মেয়ে নিনকা।

এনজিও কর্মী লুসি আপা। নানাবিধ কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে জড়িত। বয়সের গড় হিসাব ধরলে তাদের সাত-আট বছরের বড়। থার্টি ফাইভ-সিক্স হবে বয়স। লিভ ইন করত আর্টিস্ট রাউবার মাসুদের সঙ্গে। তাদের বাচ্চা নিনকা। এই এপ্রিলে আটে পড়েছে। রাউবার মাসুদ এখন জার্মানিতে। জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছে। শীতকালে মাঝেমধ্যে আসে দেশে, এক্সিবিশন করে, ব্যাপক মিডিয়া কভারেজ পায়। লুসি আপা এখন প্রেম করে মামুনের সঙ্গে। ফিক্স করে কিছু কিছু দুপুর তারা একসঙ্গে কাটায়।

'ফোন ধর।' জারিফ বলল।

'অ্যাঁ, হ্যাঁ। সরো।'

বলে মামুন ধরল, 'বল।'

সরো, সরোয়ার। বলল, 'তুই কোথায়?'

'উদ্যানে। জারুল গাছের নিচে। জারিফ, রনো এবং আমি।'

'তোরা কি মগবাজার আসতে পারবি এখন?'

'মগবাজার! কোথায়?'

'কাজী অফিসে।'

'তুই কি কাজী অফিসে?'

'হ্যাঁ।'

'কাজী অফিসে কী করিস? কাজীর অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেছিস নাকি?'

'আরে না! বিয়ে করব। সাক্ষী লাগবে, উকিল বাপ লাগবে।'

'কী বলিস!'

'সিরিয়াস! তোরা আয়!'

বলে ফোনের লাইন কেটে দিল সরো।

মামুন বলল, 'ব্রেকিং নিউজ। সরো এখন মগবাজার কাজী অফিসে। বিয়ে করবে। তার সাক্ষী এবং উকিল বাপ লাগবে।'

জারিফ বলল, 'সাধু! সাধু!'

রনো বলল, 'আমি উকিল বাপ হবো।'

মামুন বলল, 'হিয়া তানজিমের উকিল বাপ ছিলি না তুই। বিয়েটা টিকেনি!'

'সেটা কি আমার দোষ নাকি? তারা অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি।'

জারিফ বলল, 'হক কথা। কিন্তু পাগলা বিয়ে করছে কাকে?'

মামুন বলল, 'দীপিকা পাড়ুকোনকে।'

তারা তিনজনই একসঙ্গে হাসল।

সরো কবি। দ্য পোয়েট। ঐতিহাসিক চরিত্র। তার ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ হতে পারে। দশ-এগারো বছর আগের ঘটনা। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক রূপবতী ড্রাগ পাচারকারী ধরা পড়েছিল। সাড়ে তিন কেজি হেরোইন এবং নব্বইটা সোনার বারসহ। ব্যাপক তোলপাড় হয়েছিল মিডিয়ায়। আমেরিকান মেয়ে। এলিয়েদা সন্ডারস। আমেরিকান মা, শ্রীলংকান বাবা। ইনোসেন্ট, মায়াবতী দেখতে। ফেসবুকে হৃদয় বিদীর্ণ করা স্ট্যাটাস দিয়েছিল অনেকে। গ্রুপ হয়েছিল। গ্রুপ ফর এলিয়েদা সন্ডারস। কাজ হয়নি কিছু। এলিয়েদা সন্ডারসের বিচার হয়েছিল এবং কারাদ হয়েছিল। আট বছর কারাবাস এবং দুই লক্ষ টাকা জরিমানা। অনাদায়ে আরও এক বছর কারাবাস। কোর্টকাচারি চত্বরে এলিয়েদা সন্ডারস, পুলিশের নীল ভ্যানে এলিয়েদা সন্ডারস, ফেসবুকে লাইকের হাইপ উঠে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে এক সন্ধ্যায় তারা ছিল আজিজ মার্কেটের সিঁড়িতে। জারিফ, মামুন, বিল্লা এবং পার্থ। তিনতলার সিঁড়িতে বসে তামাকের অধ্যাত্ম বুঝে নিচ্ছিল। পার্থ প্রথম সরোকে দেখল। উদভ্রান্ত দাঁড়কাকের মতো উঠে এলো সরো। মামুন বলল, 'ঘটনা কী তোর? দুই ঘণ্টা ধরে ফোন দিয়ে পাচ্ছি না। ফোন বন্ধ করে রেখেছিস কেন?'

সরো বলল, 'জেলে গিয়েছিলাম।'

'জেলে! কেন? তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?'

'না। এলির সঙ্গে দেখা করে এলাম।'

'এলি মানে?'

'এলিয়েদা সন্ডারস। রূপবতী একটা ভিনদেশি মেয়ে, একা একা জেলে পচে মরবে নাকি? এই দেশে কে আছে তার? আর কারোর দায়িত্ব না থাকুক, আমার একটা দায়িত্ব আছে। কবি হিসাবে একটা দায়িত্ব আছে না?'

'তা তো ঠিকই।'

'বাংলার কবিসমাজের পক্ষ থেকে আমি তার সঙ্গে দেখা করে এলাম।'

পার্থ বলল, 'কোন দশকের?'

সরো বলল, 'মানে?'

'কোন দশকের কবিসমাজের পক্ষ থেকে আর কি। তোদের কবিদের তো আবার দশকওয়ারি বিভাজন ঘটে। অমুক অমুক দশকের কবি। তমুক তমুক দশকের কবি!'

'তুই কি কবি? যেটা বুঝিস না সেটা নিয়ে কথা বলিস কেন? দশক মানে? দশকের কিরে? কবিরা হলো মিনিটের, সেকেন্ডের। এই যে আমি, আমি তো এই মিলিসেকেন্ডের কবি! দশক মানে? মূর্খপ্রাণী!'

মামুন বলল, 'বাদ দে তো। জেল কর্তৃপক্ষ তোকে দেখা করতে দিল?'

শান্ত হলো সরো, 'হারুন ভাই ম্যানেজ করে দিয়েছেন। পুলিশ আর মিডিয়ার টানা-হেঁচড়াহেঁচড়ি। এই ক'দিনেই কী হাল হয়েছে মেয়েটার! চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। আমি

তাকে বলেছি ভয় নেই। যতদিন সে জেলে থাকবে, ততদিন আমি তার জন্য রোজ একটা করে কবিতা লিখব।'

বিল্লা বলল, 'রোজ একটা করে কবিতা! আট বছর জেল হয়েছে না? আট ইনটু তিনশ' পঁয়ষট্টি, দুই হাজার নয়শ' বিশটা কবিতা লিখবি তুই?'

জারিফ বলল, 'দুই হাজার নয়শ' একুশটা। একটা লিপইয়ার পড়বে এর মধ্যে।'

সরো বলল, 'পড়ুক। আমি লিখব।'

'বাংলায় লিখবি?'

'হ্যাঁ, বাংলায়। জ্যোতিদার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে রাখব।'

ক্ষণজন্মা পুরুষ জ্যোতিদা। চট্টগ্রামের মানুষ। চট্টগ্রামেই থাকেন। ঘাট ফরহাদ বেগ পাড়ায়। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, রফিক আজাদ এবং নির্মলেন্দু গুণের কিছু কবিতা ইংলিশে অনুবাদ করেছেন। সবিশেষ স্নেহ করেন সরোকে।

'জ্যোতিদা তোর কবিতা অনুবাদ করে দেবেন!'

'বিশেষ বিবেচনায়। আমি লিখে তার মেইলে পাঠাব। পড়ে জ্যোতিদা অনুবাদ করে আমাকে ফরোয়ার্ড করে দেবেন।'

মামুন বলল, 'আইডিয়া ভালো। কিন্তু জ্যোতিদা কি অতদিন টিকবেন? পাউডার পোড়াতে পোড়াতে যে হাল করেছেন শরীরের! এই বয়সে আধ্যাত্মিক ব্যাপারস্যাপার বাদ দিয়ে পাউডারে আসক্ত হয় নাকি কেউ? বুঝি না। তোকে অলটারনেট ভেবে রাখতে হবে।'

'ভেবে রাখব। এছাড়া উপায় কী? ... টাকা-পয়সা নাই, কী করব? এলির জন্য এক প্যাকেট গোল্ডলিফ সিগারেট আর একটা চুলের ক্লিপ নিয়ে গিয়েছিলাম। চুলের ক্লিপটা তারা রাখতে দেয়নি।'

বিল্লা বলল, 'অন্যায় করেছে। পরের বার একটা না, দুইটা চুলের ক্লিপ আর দুই পাতা ফ্লাজিল নিয়ে যাবি তুই।'

'ফ্লাজিল! কেন?'

'আরে, জেলের খাবারের যে অবস্থা শুনেছি। পেট খারাপ করতে পারে না তোর এলির? রূপবতী একটা আমেরিকান মেয়ে বদনা নিয়ে বাংলাদেশের জেলে দৌড়াদৌড়ি করছে, দৃশ্যটা খুব ভালো দেখাবে? ফ্লাজিল এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ওষুধ।'

সরো একই সঙ্গে বিস্মিত এবং বিষণ্ন হয়ে বলল, 'তোরা মানুষ না!'

মামুন বলল, 'আসলেও। মানবিকতা বলতে কিছু নাই। সিরিয়াস একটা ব্যাপার, সেটা নিয়েও রং-তামাশা। জেলগেটে তুই কতক্ষণ ছিলি? এলির সঙ্গে কথা বললি কতক্ষণ?'

সরো বলল, 'পাক্কা আটাশ মিনিট।'

পার্থ বলল, 'সাধু! সাধু! কোন ভাষায় কথা বলেছিস তোরা? ইংলিশ, না বাংলায়?'

সরো বলল, 'তুইও মানুষ না! অমানবিক। এলি সম্পর্কে আর একটা কথাও আমি কখনও তোদের বলব না। কসম।'

তাদের না বললে আর কাকে বলবে সরো?

জ্যামাইকান দৌড়বিদ উসাইন বোল্টকে?

এলিয়েদা সন্ডারসের জন্য কবিতা লিখবে!

কাকে শোনাবে?

জারিফ, মামুন, বিল্লা, পার্থরা ছাড়া কেউ শুনবে?

আর কেউ আছে সরোর?

এলিয়েদা-জ্বর বছর চারেক স্থায়ী ছিল সরোর। পাগলের মতো কবিতা লিখেছে 'মাদক পাচারকারীর জন্য। রোজ। জেলগেটে গেছে, দেখা করেছে। জেলে থাকতে থাকতে বছর দেড়েকেই অনেক বাংলা শিখে গিয়েছিল এলিয়েদা সন্ডারস। সরোকে একদিন বলেছিল 'কুট-আর বাছা।' দুই রাত ঘুম ধরেনি সরোর। এত সুন্দর করে 'কুত্তার বাচ্চা' বলতে পারে কেউ? অন্তত তাকে কেউ কখনও বলেনি। কুট-আর বাছা!

গুনে দেখতে দেখতে দিন চলে যায়। আট বছর এমন কতদিন আর? চলে যাবে। জেল থেকে ছাড়া পাবে এলিয়েদা সন্ডারস। প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে সরো। দুই রুমের একটা বাসা ভাড়া নেবে, বিয়ে করবে এলিয়েদা সন্ডারসকে এবং কপোত-কপোতী তারা, সুখ-শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিবে।

দুঃখের বিষয়, এলিয়েদা সন্ডারস যে দেশে জন্মেছে সেই দেশটার নাম আমেরিকা। এই দেশের কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ, সাধ করে কি আর লিখেছিলেন, ডট ডট ইউ আমেরিকা! সেই দেশ বাংলাদেশের এক কবির কী মূল্যায়ন করবে? তাদের দেশের একটা মেয়েকে নিয়ে অতঃপর সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে দেবে? ওয়াশিংটন ডিসি কী কলকাঠি নাড়ল, চার বছর দুই মাসের মাথায় ছাড়া পেয়ে গেল এলিয়েদা সন্ডারস। নিরাপত্তাজনিত কারণে সরোর সঙ্গে দেখাও করে যেতে পারল না। বিশালদেহী কয়েকজন দেশি ভাইয়ের সঙ্গে আমেরিকায় চলে গেল একদিন। পত্রপত্রিকায় ছবি দিল। নিউজ দেখাল টেলিভিশনে। ফেসবুকে কিছু মাতম, আহাজারি হলো।

ভয়ংকর মুষড়ে পড়েছিল সরো। এলিয়েদা সন্ডারস, সন্ডারস এলিয়েদা লিখে ফেসবুকে সার্চ দিয়ে গেছে ম্যালাদিন। না এলিয়েদা, না সন্ডারস পেয়েছে।

পরের প্রজেক্ট পূর্বা কাশ্যপ।

ইন্ডিয়ার অহম প্রদেশের বাংলা কবিনি। ধরি ধরি সন্ধান করি টাইপ। ফেসবুকে টুইটারে তাকে ফলো করে লোকজন। ফলো করতে করতে তার বেডরুমে ঢুকে যায়। পূর্বা কাশ্যপের বেডরুমের দেয়ালে মনিরুল ইসলামের একটা ছোট পেইন্টিং আছে। বাংলাদেশের শিল্পী স্পেনপ্রবাসী মনিরুল ইসলাম। ফেসবুক অ্যালবামে পূর্বা সেই দেয়ালের একটা ছবি রেখেছে। মনিরুল ইসলামের সঙ্গে তার একটা হাস্যোজ্জ্বল ছবিও দিয়েছে। লাইকের ছড়াছড়ি দুটো ছবিতেই। জারিফ ছাড়া তারা প্রায় সকলে দেখেছে। জারিফ একটা এই যুগের আজিব। মৌনীবাবা তো মৌনীবাবা, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট দূরে থাক, কম্পিউটারও ব্যবহার করে না। টেলিভিশন চ্যানেলের প্রোগ্রাম দেখে না। যদিও একটা ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি আছে ঘরে। ডিভিডি প্লেয়ারে ছবি দেখে প্রচুর। এমনও হয়, এক ছবি অনেকবার দেখে। এখন যেমন চলছে 'ত্রিস্তানা' সিজন। পরাবাস্তব লুই বুনুয়েলের ছবি। দেখে সে মুগ্ধ। বাসায় থাকলে যখন মনে হয় দেখে। এ নিয়ে মিমোর সঙ্গে ঝগড়াও হয়। মিমো পছন্দ করে কার্টুন ছবি দেখতে। বিশেষ করে থ্রি ডি অ্যানিমেশন। এত কার্টুন ছবি দেখে, যে কোনোদিন চশমা নিতে হবে। বেড়ালদের চশমা কোথায় পাওয়া যায়? মৌনীবাবার পোষা মার্জার মিমো। এহেন আজব জারিফও শেষে পূর্বা কাশ্যপের ছবি দেখল। সরো তাকে প্রিন্ট করে এনে দেখাল। মনিরুল ইসলাম এবং পূর্বা কাশ্যপের ছবিটা শুধু।

'দেখে কিছু মনে হলো তোর?'

'মনিরুল ইসলাম স্যার দেখতে দিন দিন স্প্যানিশ সন্তদের মতো হয়ে যাচ্ছেন। স্মার্ট সন্ত।' জারিফ বলল।

সরো বলল, 'তোকে আমি মনিরুল ইসলাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে বলিনি। স্ট্রেইট বল, ছবি দেখে কী মনে হয়? মনিরুল ইসলামের প্রেমে পড়ে আছে ও?'

'পড়তেই পারে।'

'পড়তেই পারে মানে? টু বি আর নট টুবি মার্কা কথা বলবি না। সত্যিকারভাবে তোর কী মনে হয় বল? মেয়েটা কি

মনিরুল ইসলামের প্রেমে পড়ে গেছে?'

'ছবির মেয়েটা? আমি তো মেয়েটাকে দেখতেই পাচ্ছি না। শুধু চোখের সাদা অংশ আর সাদা দাঁত দেখছি। এই কয়লা সুন্দরী কে?'

সরো খর হলো, 'কয়লা সুন্দরী!'

মামুন সেভ করল জারিফকে, 'কথায় কথায় এতো খেপিস কেন তুই। আরে, এটা তো একটা কমপ্লিমেন্ট। সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবির সিমি গাড়োয়ালের মতো দেখতে তো মেয়েটা। তোর কেন মনে হচ্ছে এই মেয়ে মনিরুল ইসলাম স্যারের প্রেমে পড়ে গেছে? এই মেয়ে পড়তেই পারে। মনিরুল ইসলাম স্যার কেন তার প্রেমে পড়বেন? দুইজন ইনভলবড না হলে প্রেম হয়?'

জারিফ কারেকশন বলল, 'এই সুন্দরী কে?'

সরো বলল, 'পূর্বা কাশ্যপ?'

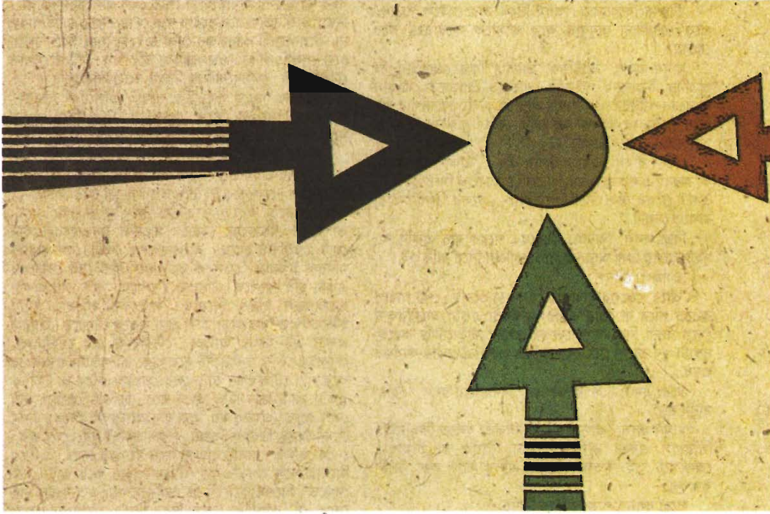
'হ্যাঁ।'

পূর্বা কাশ্যপ প্রজেক্ট চলল মোটামুটি দুই বছর। এরমধ্যে ইন্ডিয়ান কিছু দাদাকবির সঙ্গে পূর্বা কাশ্যপ ঢাকা থেকে ঘুরে গেল একবার। আগুনের ফুল ফুটল সরোর কবি-হৃদয়ে। সে ঘোষণা দিল, আগামী একুশের বইমেলায় তার যে একটা মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, সেটা সে উৎসর্গ করবে পূর্বা কাশ্যপকে।

সেই বইমেলা চলে গেছে কবে। সরোর কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই কাব্যগ্রন্থ সে পূর্বা কাশ্যপকে উৎসর্গ করেনি।

পূর্বা কাশ্যপ ফেসবুকে তার বিয়ের ছবি প্রকাশ করেছিল। আমেরিকা প্রবাসী এনআরআই এক অধ্যাপককে বিয়ে করেছে।

এলিয়েদা সন্ডারসের মতো এই ব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে,



'কী করে? রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়?'

'না, ও একজন কবি!'

'আবার তুই রেগে যাচ্ছিস। কেন?'

'রাগব না? ফেসবুকে টুইটারে এই পূর্বা কাশ্যপের ফলোয়ার কত তুই জানিস?'

'আমি কি টুইটার-ফেসবুকিং করি?'

'তাও তো কথা। তোকে আমি ওর আরও ছবি দেখাব।'

'ওর? কার?'

'পূর্বা কাশ্যপের।'

'তুই কি পূর্বা কাশ্যপের প্রেমে পড়েছিস।'

'মনে তো হচ্ছে।'

'মনে তো হচ্ছে কী মিন করে?'

আমেরিকার একটা ভূমিকা আছেই।

পূর্বা কাশ্যপের পর আরজে সানজানা।

আরজে সানজানার পর টিসা।

সানজানা এখন থাকে উইসকনসিনে। আমেরিকা!

টিসা কিছুদিন সাইপ্রাসে ছিল, এখন আমেরিকার সিয়াটলে থাকে। সেই আমেরিকা! কোইন্সিডেন্স?

বর্তমানে সরো মত্ত রংপুরের তিতলীকে নিয়ে। রিজওয়ানা হাসান তিতলী। হনুমানতলা পাড়ায় থাকে। কারমাইকেল কলেজে পড়ে। এইচএসসি দেবে। ফেসবুক থেকে ঘটনার সূত্রপাত। ফোনে নিয়মিত তাদের কথাবার্তা হয়। দুইদিন আগেও আজিজ মার্কেটের 'অন্তরে রেস্টুরেন্টে' গুরুগম্ভীর সেমিনার হয়েছে- সরোর বর্তমান ফাইল তিতলীও ইনফিউচার আমেরিকায় স্যাটেল করবে কি-না? অবশ্যই।

একমত হয়েছে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা। জারিফ, মামুন, বিল্লা, দিশু, রনো। সরো সেমিনারে উপস্থিত ছিল না। পাগলা কি তবে যাবতীয় আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত করতে যাচ্ছে? বিয়ে করছে তিতলীকে? তিতলী কি ঢাকায় এসেছে? এইচএসসি দেবে মানে বাচ্চা একটা মেয়ে। কবি সরোর টানে পলাতক হয়েছে? সাধু! সাধু!

দুই

সন্ধ্যার পর কাজী অফিসে বিয়ে কম হয়। মগবাজার কাজী অফিস মোটামুটি নিরালা। তারা ঢুকেই দুই তরুণকে দেখল। একটা ক্লিন শেভেন, একটার মুখে গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল। বয়স কত হবে? তেইশ-চব্বিশ। ক্লিন শেভেন বলল, 'এসে গেছেন!'

এরা কারা?

মামুন বলল, 'সরো কোথায়?'

ক্লিন শেভেন বলল, 'সারওয়ার? আছে ভেতরে। আপনারা বসেন। আমি ওকে বলছি।'

জারিফ বলল, 'আপনারা কারা?'

ক্লিন শেভেন বলল, 'আমরা? সারওয়ারের বন্ধু।'

এরা সরোর বন্ধু? তবে তারা কারা? জারিফ, রনো, মামুন? কোনকালের বন্ধু এরা সরোর? জুনিয়র বন্ধু?

মামুন, জারিফ কিংবা রনো, কেউ আগে এদেরকে দেখেনি।

তাদের হাবভাব দেখেই মনে হয় একটু খটকায় পড়ল ক্লিন শেভেন ছেলেটা। সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'জিয়া ভাই পাঠাননি আপনাদের?'

'জিয়া ভাই? জিয়া ভাই কে?' মামুন বলল।

'মাসুদুজ্জামান জিয়া। সারওয়ারের দেশি বড় ভাই। কোনাপাড়ায় থাকেন। স্পঞ্জের স্যান্ডেলের কারখানা আছে। সারওয়ার তো তাকেই ফোন করেছিল। জিয়া ভাই বললেন মানুষ পাঠাচ্ছেন।'

মামুন আবার বলল, 'জিয়া ভাই? না ভাই, আমরা উনাকে চিনি না। সরো তো ফোন করেছিল আমাকে। আপনাদের চিনলাম না।'

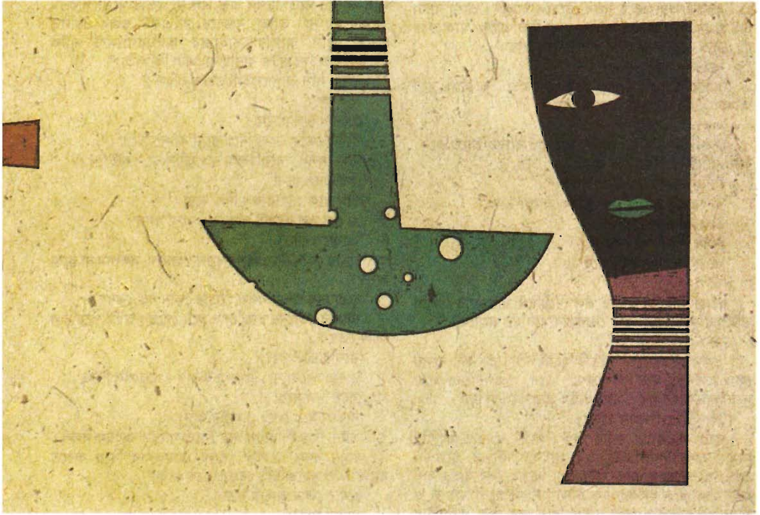
ক্লিন শেভেন বলল, 'আমি তপংকর।'

দাড়িঅলা বলল, 'আমি কৃষ্ণেন্দু।'

'আপনারা বলছেন আপনারা সরোর বন্ধু?' মামুন বলল।

তপংকর বলল, 'হ্যাঁ।'

তারা আরও দুটো ছেলেকে দেখল। এরাও ভেতরের ঘর



থেকে বেরুলো। তপংকর বলল, 'সারওয়ার!'

আজিজ মার্কেটের নিত্য উপহারের 'রবীন্দ্রনাথ' টি-শার্ট পরে আছে, ছেলেটা তাকাল। এ সারওয়ার। সরো না, সারওয়ার। তপংকর, কৃষ্ণেন্দুর বন্ধু। ঘটনা যা বলল ছেলেরা, এই সারওয়ার বিয়ে করবে। উকিল বাপ এবং সাক্ষী হিসাবে তিন বন্ধুকে নিয়ে এসেছে। মারুফ, তপংকর এবং কৃষ্ণেন্দু। ধর্মীয় এবং আইনগত কারণে তপংকর, কৃষ্ণেন্দু সাক্ষী বা উকিল বাপ হতে পারবে না বিয়ের। বিপদে পড়ে সারওয়ার তার এলাকার বড় ভাই মাসুদুজ্জামান জিয়াকে ফোন করেছিল। জিয়া ভাই বলেছিলেন, তার কারখানা থেকে কয়েকজনকে পাঠাচ্ছেন। জারিফদের দেখে তপংকররা মনে করেছে, জারিফরা সেই কয়েকজন। অনেকবার স্যরি বলল

বিব্রত তপকংর, কৃষ্ণেন্দু। কিন্তু স্যরি হওয়ার কী আছে তাদের?

মামুন কল দিল সরোকে।

'তুই কোথায়?'

'পুরানা পল্টনে।'

'পুরানা পল্টনে মানে?'

'অভ্রদার বাসায়।'

'অভ্রদার বাসায় কী করিস?'

'বিয়ে করব, তোদের আসতে বললাম না?'

'কোথায় আসতে বললি, পুরানা পল্টনে? তুই আমাদের মগবাজার কাজী অফিসে আসতে বলেছিস।'

'মগবাজার! আরে না! পুরানা পল্টন লাইন কাজী অফিস বলেছি।'

'দেখ সরো, তোর সব কথা আমার ফোনে রেকর্ড করা আছে। তুই মগবাজার কাজী অফিস বলেছিস!'

'রেকর্ড করা আছে যখন, তাহলে বলেছি। আরে ব্যাটা এই প্রথম বিয়ে করতে যাচ্ছি। মাথা ঠিক আছে? মাফ করে দে, দোস্ত। তোরা অভ্রদার বাসায় চলে আয়।'

'অভ্রদার বাসায় কেন?'

'আরে অভ্রদার বাসায় বিয়ে হবে তো। কাজীকে ধরে আনতে গেছে এনামুল। তোরা আয়।'

'শালা ফাউল!'

ফোন রেখে মামুন বলল, 'অভ্রদার বাসায় যেতে হবে। অভ্রদার বাসায় বিয়ে হবে তার।'

জারিফ বলল, 'তবে না বলল-।'

'আরে এই শালার মাথার ঠিক আছে? চল।'

তপংকর বলল, 'ভাই!'

মামুন বলল, 'কী? বলেন?'

'একটা সমস্যা হয়ে গেছে।'

'কী?'

'জিয়া ভাইকে আবার কল দিয়েছিল সারওয়ার। জিয়া ভাইয়ের ফোন বন্ধ। তার লোকজন মনে হয় আসবে না।'

'অ।'

'এখন আমরা তো পড়েছি মহাবিপদে। কী করি বলেন তো? যদি কিছু মনে না করেন... মানে... আপনাদের মধ্যে দুজন যদি সাক্ষী হন... মানে আমি আর কৃষ্ণেন্দু তো ...।'

'হিন্দু।' বলে মামুন হাসল।

পাত্র, সারওয়ার কবীর পিন্টু। পাত্রী, নুসরাত ফারিয়া মিম। তারা ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসের স্টুডেন্ট। তপংকর, কৃষ্ণেন্দু এবং মারুফও। বিয়ের দেনমোহর ধার্য করা হলো এক হাজার এক টাকা। সাক্ষী হলো মারুফ ও মামুন। উকিল বাপ হলো রনো। বিয়ে হয়ে গেল আধঘণ্টার মধ্যে। মিষ্টিমুখ হলো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পালা চলল কিছুক্ষণ। সবশেষে ফোন নাম্বার বিনিময়। এই করতে করতে রাত নয়টা বেজে গেল। সরো এর মধ্যে কল দিল না একবারও। শালা কি বিয়ে করে ফেলেছে?

রিকশায় উঠে সরোকে কল দিল মামুন, 'তোর বিয়ে কি হয়ে গেছে নাকি?'

'আরে না! তোদের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।'

'আমরা তো আসতে পারছি না।'

'কী?'

'শান্তভাবে শোন। রনো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যে গরম, হিট স্ট্রোক করেছে মনে হয়। এখন তখন অবস্থা। আমরা রনোকে নিয়ে মেডিকেলে যাচ্ছি।'

বলেই ফোনের লাইন কেটে দিল মামুন। ফোন অফ করে রাখল। রনো বলল, 'এটা কী হলো?'

'তোর ফোনও অফ করে রাখ।' মামুন বলল।

'আরে না, নয়টা বেজে গেছে! শর্মি যে কোনো সময় ফোন দিতে পারে।'

'তাহলে বাসায় চলে যা তুই।'

'বাসায় যাব কেন?'

'বাসায় গিয়ে শর্মির কোলে উঠে বসে থাক! সারাক্ষণ বউয়ের ভয়ে জুজু হয়ে থাকিস। কেন? শর্মি তোকে মারধোর করে?'

'সে আর বলতে। শংকর মাছের লেজ দিয়ে চাবকায়।' রনো হাসল।

'হাসবি না। ঘটনা তো আসলে সত্যি। তোকে দিয়ে বাসনকোসন মাজায় না শর্মি? ব্রা প্যান্টি ধোয়ায় না? অস্বীকার কর!'

'না, অস্বীকার কেন করব? কিন্তু শর্মির সাইজ ছোট তো, লুসি আপার মতো ট্রিপল এক্স এল না, তোর মতো পরিশ্রম আমার হয় না। আচ্ছা, বাজারে যে একটা গুজব প্রচলিত আছে, লুসি আপার সাইজের আন্ডারগার্মেন্ট নাকি ভিক্টোরিয়াজ সিক্রেটও বানায় না, এটা কি সত্যি?'

'সেটা লুসি আপাকেই জিজ্ঞেস করিস।'

'তুই বল।'

ফোন বাজল রনোর।

পকেট থেকে ফোন নিয়ে রনো বলল, 'সরো।'

মামুন বলল, 'বলেছিলাম না? ধরিস না, কেটে দে।'

কেটে দিল রনো।

সঙ্গে সঙ্গে আবার কল দিল সরো।

'ও তো কল দিতেই থাকবে।' রনো বলল।

'আমাকে দে।'

রনোর ফোন নিয়ে মামুন বলল, 'হ্যালো, বললাম না রনো অসুস্থ!'

সরো ম্লান গলায় বলল, 'তোর ফোন বন্ধ কেন?'

'আমার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে। আমি পরে কল দিচ্ছি তোকে।'

'রনোর কী অবস্থা?'

'অবস্থা ভালো না। এখন তুই রাখ। পরে কল দিচ্ছি।'

রেখে দিল সরো।

'নার্ভাস হয়ে গেছে।' মামুন বলল।

'ঘটনা কিন্তু সিরিয়াস হয়ে যেতে পারে।' জারিফ বলল।

মামুন বলল, 'হোক। শালা প্রেমকুমার বিয়ে করতে যাচ্ছে! এত সহজে ছাড় দেওয়া হবে ওকে!'

রনোর ফোন আবার বাজল।

আবার সরো?

না, শর্মি।

রনো ধরল, 'হ্যাঁ।'

শর্মি বলল, 'কোথায় চড়ে বেড়াচ্ছ, জামাই?'

'এই তো, ফিরছি। এত রাতে যা জ্যাম রাস্তায়, আর আধঘণ্টা মতো লাগবে।'

'আচ্ছা ফিরো। শোনো, আমি কিন্তু বড় আপুর বাসায়। বড় আপুর ননদ শাহরিয়া, কম্বোডিয়ায় থাকে যে, দেশে ফিরেছে। আজ রাতে আমরা একসঙ্গে থাকব।'

'ইয়া-হু!' মনে মনে একটা চিৎকার দিল রনো। শর্মিকে বলল, 'থাকো। আমি একা একা থাকব আর কি।'

শর্মি বলল, 'ওরে বাবারে! একা থাকতে মনে হচ্ছে কষ্ট হবে খুব?'

'হবে না? কী বলো তুমি? একা একা আমি থাকতে পারি

নাকি?'

'একা থাকবে কেন? তোমার কোনো বান্ধবীকে ফোন দাও। একটা রাতই তো। তোমার সঙ্গে থাকুক।'

'সত্যি বলছো! কাকে ফোন করি বলো তো?'

'কেন প্রিমা, প্রিমাকে ফোন দাও।'

'দুঃখজনক একটা কথা বললে তুমি। প্রিমা! ওহ্। আমাদের খাটে ও ধরবে? এরচেয়ে নওশীন কি মুনাকে ফোন দেই।'

শর্মি হি হি করে হাসল, 'রাখ বেটা বদমায়েশ! একটা কাউকে ফোন করে দেখ না, হাড্ডি গুঁড়ো করে ট্যালকম পাউডার না বানাই তো, হি! হি! হি!... শোনো বাবু, খাবারদাবার ফ্রিজে রেখে এসেছি। একটু গরম করে খেয়ে নিও, কেমন?'

'আচ্ছা।'

'গুড বয়। রাখি তাহলে?'

'রাখো।'

'এই! এই! এই! শোনো। শোনো! আমার ফোনে কিন্তু চার্জ কম। চার্জারও সঙ্গে নিয়ে আসিনি। কল দিয়ে যদি ফোন বন্ধ পাও, টেনশন করো না।'

'ওকে, বস।'

'ওকে, রাখি।'

'হ্যাঁ।'

ফোন রেখে জারিফ এবং মামুনকে গুড নিউজটা দিল রনো। শর্মি রাতে বাসায় থাকবে না।

সাধু! সাধু!

তিন

রিকশা পুরানা পল্টন লাইনের গলিতে ঢুকেছে। মাস্টার ফার্মেসি পার হচ্ছে। মামুন বলল, 'এই! এই! রাখো তো একটু।'

জারিফ বলল,' কী করবি?'

'ওষুধ কিনব।'

'ওষুধ? কেন?'

'মাথা ধরেছে।'

রিকশাঅলা রিকশা রাখল।

মাস্টার ফার্মেসি থেকে এক প্যাকেট ওষুধ নিল মামুন। ফার্মেসির ছেলেটা প্যাকেট করে দিল। মাথাধরার ওষুধ এরকম প্যাকেট করে দেয় নাকি?

পুরানা পল্টন লাইনের সবচেয়ে পুরনো বিল্ডিংটাতে থাকেন অভ্রদা। চারতলা বিল্ডিং, চারতলায়। বিশ-একুশ বছর ধরে আছেন। ডেভেলপাররা যদি অ্যাটাক না করে, তবে এই বিল্ডিংয়ে থেকেই মরতে চান।

অভ্র সমাদ্দার। উনপঞ্চাশ। বিয়ে করেননি এবং করবেন না। স্টেডি রিলেশন আছে এক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে। বিবাহিত মহিলা, ছেলেমেয়ে আছে। তবে অভ্রদা তাদের বাপ না। শিপিং-এর ব্যবসায় করেন। হিল্লিদিল্লি করে বেড়ান। বাসায় অভ্রদার সঙ্গে থাকে একমাত্র এনামুল। রাস্তার ছেলে, পকেটমার ছিল। মতিঝিল এলাকায় হাতেনাতে ধরা পড়ে গণধোলাই খেয়ে মরতে বসেছিল। অভ্রদা বাঁচান, চিকিৎসা করান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। এনামুল এখন তার একের মধ্যে তিন। সেক্রেটারি, শেফ, কেয়ারটেকার। পকেট মারত সেই ইতিহাস ভুলে গেছে।

আজিজ মার্কেটের আড্ডা থেকে লিংকআপ। বারো-চৌদ্দ বছর হয়ে গেছে তাও। অভ্রদা ব্যাপক প্রশ্রয় দেন তাদের। জারিফ, মামুন, সরো, বিল্লা অ্যান্ড কোং-কে।

চারতলায় উঠে দরজায় টোকা দিল জারিফ।

এনামুল দরজা খুলে দিল, 'সেলামালিকুম।'

মামুন বলল, 'ওয়ালিকুমসালাম, কেমন আছ এনামুল?'

'জি, ভালো।'

'অভ্রদা কোথায়?'

'ভিতরে আছেন, স্যার।'

ড্রয়িংরুমে একজন মাওলানা বসে আছেন। অল্পবয়স্ক। মনোযোগ দিয়ে কলকাতার জি-বাংলা চ্যানেলে জনপ্রিয় 'ভুতু' সিরিয়াল দেখছেন। এনামুল বলল, 'কাজী সাহেব, স্যার।'

তারা তিনজনই যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে কাজী সাহেবের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করল।

মামুন বলল, 'সরো ভাই কোথায়?'

এনামুল বলল, 'ভিতরে আছেন স্যার।'

রনো বলল, 'পাত্রী?'

'ভিতরে আছেন স্যার।'

তাদের গলা শুনতে পেয়েছে, ছিটকে অভ্রদার ঘর থেকে বের হয়ে এলো সরো, 'তোরা! তোরা!'

মামুন বলল, 'কী?'

'তুই না বললি রনো অসুস্থ! তাকে নিয়ে তোরা মেডিকেলে যাচ্ছিস!'

'গিয়েছিলাম। ওপেন হার্ট সার্জারি করে ছেড়ে দিয়েছে।'

'শুয়োরের বাচ্চা!'

'বিশ্বাস কর!'

'বিশ্বাস! তোদের কোনো কথা বিশ্বাস করব আর! তোরা কেউ মরে গেছিস বললেও করব না। শালা! মনটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। অভ্রদা অবশ্য সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তোরা দুজন অবশ্যই আসবি! রনোর একটা ব্যবস্থা করেই আসবি। এই নাটকের কী মানে বল? বিয়ে করাটা কত একটা বিরাট, কত একটা টেনশনের ব্যাপার বুঝিস?'

রনো বলল, 'বুঝি। অভ্রদা কোথায়?'

অভ্রদা তাদের দেখে বললেন, 'কমরেডস।'

তারা একসঙ্গে বলল, 'অভ্রদা!'

অভ্রদার সঙ্গে সারি বসে আছে। ঘরের এসি ফুল, ঘর ঠাণ্ডা, এর মধ্যে বসে বিড়ি টানছে সারি।

রনো বলল, 'তুই!'

সারি হাসল।

ইলিনা সারি। পেইন্টার শামসুদ্দীন নবাবের মেয়ে। পড়াশোনা করেছে বাংলায়। পার্টটাইম জব করে গ্রে-তে। পার্টটাইম কবি। মর্জি হলে লেখে দুই-চার পদ। অতি কমন মুখ শাহবাগ এলাকার। সে কি খবর পেয়ে এসেছে? পাত্রী কি অভ্রদার স্টাডিরুমে? সাজুগুজু করছে?

তারা বসল।

'দুজনেরই হাত দেখে দিয়েছি।' অভ্রদা বললেন।

মানুষের হাতের রেখা স্টাডি করেন অভ্রদা। শখ। যা বলেন কিছু না কিছু মিলে যায়।

রনো বলল, 'কী দেখলেন?'

'যমজ বাচ্চা হবে দম্পতির।' অভ্রদা বললেন।

'বিয়ের এক বছরের মাথায় নাকি, অভ্রদা?' মামুন বলল।

'হতে পারে।'

'দুশ্চিন্তার কথা।'

'তোর এত দুশ্চিন্তা কেন?' সারি বলল।

মামুন বলল, 'দুশ্চিন্তা করব না? এক বছরেই দুটো বাচ্চা হয়ে যাবে। ট্যাঁ ট্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ করবে। সরো কি আর কোলে কাঁখে করবে, যত যন্ত্রণা তো হবে বউটার। আমি অবশ্য

ব্যবস্থা করেছি। এই সরো, ধর।'

পকেট থেকে মাথাধরার ওষুধের প্যাকেটটা বের করল মামুন।

সরো বলল, 'কী?'

খুলে দেখ।

বোকামিটা করল সরো। প্যাকেটটা খুলতেই তিনটা কনডমের প্যাকেট টুপটাপ করে পড়ল। হাসির হররা উড়ল ঘরময়। 'ধরা' সরো বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা!'

দরজা ঠেনে মাথা ঢুকালো এনামুল, 'স্যার, খাবার রেডি।'

অভ্রদা বললেন, 'ঠিক আছে, এনামুল। ফ্রিজে কি বরফ জমেছে?'

'জি।'

এনামুলের মু অপসৃত হলো।

'বিয়েটা তাহলে হয়ে যাক, নাকি?' অভ্রদা বললেন।

'হয়ে যাক।' রনো বলল।

মামুন বলল,' কিন্তু অভ্রদা-।'

'কী?'

'কী করবি মানে? ফকিন্নি মার্কা এই টি-শার্ট আর ট্রাউজার্স পরে বিয়ে করবি তুই?'

'হ্যাঁ।'

'নেভার। ফকিন্নির ফকিন্নি। নিত্য উপহারের বাহার ভাইকে বললে সে কি তোকে একটা শাড়ি স্পন্সর করত না? কাইয়ুম চৌধুরীর ডিজাইন করা শাড়ি।'

'আরে আমরা ডিসিশন নিয়েছি সন্ধ্যায়।' সরো বলল।

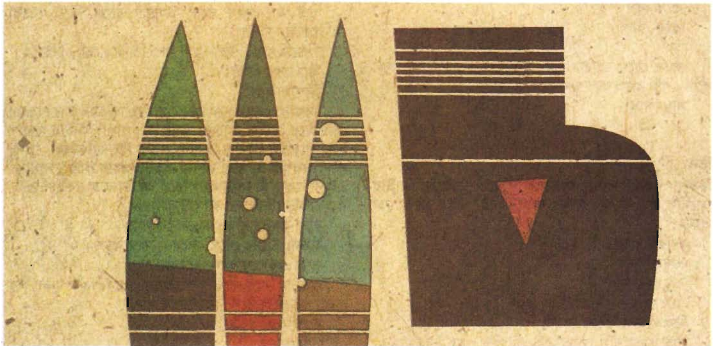
রনো বলল, 'তুই চুপ কর। তুই ডিসিশন নেওয়ার কে রে ব্যাটা? শাড়ি ছাড়া বিয়ে হবে না। অন্তত আমি তোদের উকিল বাপ হবো না। অভ্রদা, ব্যবস্থা করেন।'

অভ্রদা ব্যবস্থা করলেন। তার পাশের ফ্ল্যাটে ফ্যামিলি থাকে। তাদের কাছ থেকে একটা শাড়ি নিয়ে এলেন। নীল সুতির শাড়ি। সারি পরল। টি-শার্ট-ট্রাউজার্সের সঙ্গেই। আজব, অচেনা দেখাল সারিকে।

রনো শাউট করল, 'ঘোমটা! ঘোমটা!'

নিরীহ বালিকার মতো কথা শুনল সারি।

রনো বলল, 'দেখ, এখন কেমন বউ বউ লাগছে। আরে, বাঙালি মেয়ে শাড়ি না পরলে বউ! মাথায় ঘোমটা না দিলে



বউ! হিন্দু হলে শাখা-সিঁদুর না পরলে বউ! খ্রিস্টান হলে ওয়েডিং গাউন না পরলে বউ!'

মামুন বলল, 'বউ বিশেষজ্ঞ!'

রনো বলল, 'তা তো অবশ্যই। তুই তো আর বিয়ে করবি না। আগলা পাতে খেয়ে কাটাবি। বউয়ের মর্ম তুই কী করে বুঝবি?'

'আমিও কিন্তু মামুনের দলে রনো।' অভ্রদা বললেন।

'আপনার কথা আলাদা, অভ্রদা। কোথায় ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ আর কোথায় ফজল মামুর ডাঁটিভাঙা চায়ের কাপ।'

আনন্দমুখর একটা পরিবেশ।

হয়ে গেল বিয়েটা।

দেনমোহর এক হাজার এক টাকা। উকিল বাপ হলো রনো।

সাক্ষী মামুন এবং জারিফ।

কবুল। কবুল। কবুল।

কবুল। কবুল। কবুল।

কাজী সাহেব তার রেজিস্টার খাতায় ঘটনা লিপিবদ্ধ করে

'ওকে বিয়ে করার মতো মারাত্মক একটা ডিসিশন যে মেয়েটা নিয়েছে তাকে তো এখনও দেখলাম না।'

অভ্রদা বললেন, 'দেখলে না মানে? এটা কে?'

সারি!

রনো বলল, 'কী? কী-কী-কী?'

মামুন বলল, 'বিশ্বাসঘাতক! আমি না বিয়ে করতে চেয়েছিলাম তোকে!'

সারি মিটমিট করে হাসছে। বলল, 'সে তো আমিও জারিফকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম।'

জারিফ বলল, 'কার একটা বই পড়েছিলাম মনে নেই। বইয়ের নাম, অঘটন আজো ঘটে। ঘটে তাহলে।'

অভ্রদা বললেন, 'ঘটে। ওঠো তাহলে। সইসাবুদ যা করার হয়ে যাক। কাজী সাহেব আর কতক্ষণ বসবেন?'

তারা উঠল।

রনো বলল, 'এক মিনিট। তুই এইভাবে বিয়ে করবি নাকি?'

সারি বলল, 'কী করব তবে?'

রাখলেন। সরো আর সারি জামাই-বউ এখন। কাজী সাহেবের নির্দেশমতো সরো বিরাট একটা সালাম দিল সকলকে, 'আসসালাম ওয়ালাইকুম।'

'ওয়ালিকুম আসসালাম।' চেঁচাল সকলে।

বর-কনেকে আশীর্বাদ করলেন অভ্রদা, 'সুখে থাকো। দীর্ঘায়ু হও।'

রনো কল দিল শর্মিকে। ফোন বন্ধ না, শর্মি ধরল, 'কি গো?'

রনো বলল, 'আর কি গো! শোনো, বিরাট ঘটনা ঘটেছে। সরো পাগলা বিয়ে করে ফেলেছে!'

'তাই নাকি? এমা? কবে? কখন?'

'এই তো মাত্র। অভ্রদার বাসায় বিয়ে হয়েছে। আমরা এখন অভ্রদার বাসায়। বউ কে বলো তো?'

'রংপুরের মেয়েটা? কী যেন নাম...?'

'তার নাম মনে করার আর দরকার নেই, বাবা। সরোর বউ হয়েছে সারি। আমাদের ইলিনা সারি। চিন্তা করতে পারো?'

'কী-ই-ই-ই!'

মামুন কল দিল বিল্লাকে, 'সরো আত্মহত্যা করেছে শুনেছিস?'

'কী? কখন?'

'কিছুক্ষণ আগে। অভ্রদার বাসায়।'

'অভ্রদার বাসায় আত্মহত্যা করেছে? কী হয়েছিল? তুই কি সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ সিরিয়াস। সরো বিয়ে করেছে সারিকে।'

'সারি?'

'ইলিনা সারি!'

'কী বলিস? কে বলল? তুই কোথায়?'

'আমরাও এখন অভ্রদার বাসায়। আমি, জারিফ আর রনো।'

'শুয়োরের বাচ্চারা! আমাকে একটা কল দিতে পারলি না?'

'এখন চলে আয়।'

'এখন কী করে আসব? আমি তো এখন গাড়িতে। গাইবান্ধা যাচ্ছি অফিসের কাজে। পরশু ফিরব।'

'মুড়ি খা তাহলে।'

'জামাইকে দে, কথা বলি।'

জামাই-বউ দুজনের সঙ্গেই কথা বলল বিল্লা।

প্রফেশনাল ক্যামেরা আছে অভ্রদার। নাইকন ডিএসএলআর। বিয়ের অনেক ছবি তুলে রেখেছেন। মামুন তার মোবাইল ফোনের ক্যামেরায়ও তুলেছে। কাল সকালে আপলোড দেবে ফেসবুকে।

রনো বলল, 'হোয়াই নট এখন?'

সারি বলল, 'সমস্যা আছে, বাবা। আব্বু দেখলে!'

'কী করবে? থানাপুলিশ করবে?'

'করতেও পারে।'

'তা অবশ্য ঠিকই। যে একখান জিনিসকে বিয়ে করেছিস। তোর আব্বু! আমারই তো মামলা দিতে ইচ্ছে করছে থানায়।'

খাবারদাবারের আয়োজন করেছে এনামুল। অভ্রদার নির্দেশমতো শুধু ইলিশ মাছের আইটেম করেছে। শর্ষে ইলিশ, ইলিশ মাছ ভাজা এবং ইলিশ মাছের ডিম ঝোরা। অসাধারণ। ফক্স চ্যানেলের 'মাস্টারশেফ' প্রোগ্রামে এনামুলকে পাঠানোর চিন্তাভাবনা হলো।

খেয়েদেয়ে সবার সঙ্গে করমর্দন করে কাজী সাহেব বিদায় হলেন।

সাধু! সাধু!

অভ্রদা একটা ডাবল ব্ল্যাক খুললেন।

সংবিদা মঞ্জরীর কৌটো বের করল জারিফ।

মামুন 'ম্যানুফ্যাকচারের' আয়োজন করল।

রনো বলল, 'একটা কথা!'

মামুন তাকাল।

রনো বলল, 'তোকে না, সরোকে বলব।'

সরো বলল, 'বল।'

রনো বলল, 'আগেই, এখনই বলে রাখি, তোদের কোনো ম্যারেজ ডেতে কিন্তু আমি যাব না।'

সারি বলল, 'এমা! কেন?'

রনো বলল, 'আজকের তাপমাত্রা কত জানিস? উনচল্লিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাগলে না কামড়ালে এই সময় বিয়ে করে কেউ!'

জারিফ বলল, 'কেন? সারওয়ার করেনি।'

অভ্রদা বললেন, 'সারওয়ার? কে?'

মগবাজার কাজী অফিসের ঘটনা তারা বর্ণনা করল। সরো, সারি, অভ্রদা এনজয় করলেন।

'কিন্তু তাদের ম্যারেজ ডেতে নিশ্চয়ই তারা আমাদের দাওয়াত করবে না। তোরা করবি। আমি যাব না। সরোর বাসাটা তো একটা ফার্নেস। এই গরমে ঘাম শাওয়ার নেব নাকি?' রনো বলল।

সরো বলল, 'তা কেন? আমাদের সব ম্যারেজ ডে আমরা অভ্রদার বাসায় করব। কী অভ্রদা?'

অভ্রদা বললেন, 'শিওর!'

'তাহলে ঠিক আছে।' রনো বলল।

গ্লাসে গ্লাসে সোনালি ডাবল ব্ল্যাক। চুমুক দিতে দিতে কথা বলছে তারা। মামুন ম্যানুফ্যাকচার করে ফেলেছে। তিনটা ফুল আর একটা এনপি হয়েছে। এনপি তারা বলে ছোট সাইজকে। বর্তমানে কারাগারে অবস্থানরত ছোট সাইজের নয়নিকা পূর্ণা স্মরণে। আট বছর আগে এই স্মরণমূলক নামকরণ করেছিল জারিফ, 'এটা দেখি নয়নিকা পূর্ণা সাইজ হয়েছে।'

নয়নিকা পূর্ণার কাজিন ছিল লোপিতা। গান করত। তার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল জারিফের। গাঢ় রঙিন একটা সম্পর্ক। তারা হয়তো বিয়েও করত। কিন্তু এক কুয়াশামুদ্রিত সকালে লোপিতার ডেডবডি পড়েছিল রাস্তায়। অপহরণ এবং ধর্ষণের পর তাকে খুন করা হয়েছিল। খুব হৈচৈ হয়েছিল কিছুদিন। ডিবি অফিসে যেতে হয়েছিল জারিফকে। ছয় বছর আগের ঘটনা। লোপিতার খুনি, ধর্ষণকারী একটা জানোয়ারও ধরা পড়েনি। সেই থেকে এসব ব্যাপারে একেবারেই চুপ হয়ে গেছে জারিফ। আর কোনো সম্পর্কে যায়নি। নারিন্দার খ্রিষ্টান সিমেট্রিতে একটা মার্বেল পাথরের কবর আছে, হেয়ার লাইজ লোপিতা উইলিস...।

মামুন বলল, 'এনপিটা ধরাই।'

বলে ধরাল।

জারিফ বলল, 'অভ্রদা টানবেন?'

অভ্রদা বললেন, 'দেই দুইটান।'

সারি বলল, 'আমিও টানব।'

রনো বলল, 'মাথা খারাপ নাকি?'

সারি বলল, 'মাথা খারাপ হতে যাবে কেন? আমি মনে হয় কখনও টানিনি!'

'দেখেছি তো!'

'তো?'

'আজ তোর জন্য এসব নিষিদ্ধ। অভ্রদা দয়া করে একপেগ দিয়েছে, এই-ই যথেষ্ট বলে ধরে নে। আর তোকে পেগও দেওয়া হবে না।'

'কেন? আমি কী দোষটা করলাম?'

'দোষ না? বিয়ে করেছিস। বাসররাতটা কি সরো মাতাল হয়ে কাটাবে? তুই হাসতে হাসতে মরে গিয়ে কাটাবি? ওসব চলবে না। অভ্রদা, সরোকেও দেবেন না আর।'

সরো বলল, 'অবজেকশন! সাত আট পেগেও আমার কিছু হয় না।'

'অন্যদিন না হোক, আজ হবে। আজ রাতটা অন্তত একটু সুস্থভাবে কাটা।'

মামুন বলল, 'রনো ঠিকই বলেছে। আজকের রাতটা খুবই স্পেশাল রাত একটা। স্পেশাল শো নাইট। নেশা করে ঘুমিয়ে থাকার রাত না।'

সরো বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা!'

এই সময় মেঘ ডাকল।

'বৃষ্টি হবে।' জারিফ বলল।

রনো বলল, 'যদি না হয়? কাল রাতেও তো আকাশ মেঘলা ছিল। মেঘও ডেকেছে? একফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে?'

'আজ হবে।'

'তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আচ্ছা অভ্রদা, এই মুখে ফুল চন্দন পড়ার ব্যাপারটা কী? ফুল পড়তে পারে, চন্দন কি পড়ে? আরেকটা কথা যে বলে, দুধে আলতা রং। দুধের সঙ্গে আলতা মেশালে তো দারুণ কোনো রং হওয়ার কথা না, নাকি?'

অভ্রদা বললেন, 'বলে আর কি।'

আবার মেঘ ডাকল।

'বৃষ্টি নামবেই।' জারিফ বলল।

রনো বলল, 'নামুক। আকাশ উজাড় করে নামুক। এগারো বারো দিন ধরে গরম। তাপমাত্রা শুধু বাড়ছেই, বাড়ছেই। কোনো মানে হয়? এর চেয়ে বৃষ্টি হয়ে চরাচর ডুবে যাক। এই শহর জলাবদ্ধ থাকুক কিছুদিন।'

'তখন তো আবার সেটা নিয়ে পড়বি! জলাবদ্ধ থাকবে কেন নগরী? জনজীবনের এত দুর্ভোগ, নগর কর্তৃপক্ষ কি কিছুই দেখে না?' সরো বলল।

রনো বললে, 'তা তো পড়বই। যখন যেটা সমস্যা মনে হবে সেটা নিয়ে কথা বলব না? আমি কি তোদের মতো এসকেপিস্ট নাকি? আমার একটা রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। স্টাডি সার্কেল করেছি, বুঝেছিস?'

মামুন বলল, 'আই প্রটেস্ট। এখানে রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ।'

মেঘ এবার দীর্ঘমেয়াদি লয়ে ডাকল।

'মেঘও প্রটেস্ট করছে।' মামুন বলল।

অভ্রদা বললেন, 'প্রটেস্ট করুক। বৃষ্টি তো হোক।'

'মজার একটা ব্যাপার দেখেছেন, অভ্রদা? আজকের পত্রিকায় কিন্তু লিখেছে তিন-চারদিনের মধ্যে বৃষ্টি হবে না। তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে।' সারি বলল।

রনো বলল, 'আর পত্রিকা! মেঘ বৃষ্টি তাদের অর্ডারে চলে আর কি।'

সরো বলল, 'গুগল তো তিনদিন আগে রিপোর্ট করেছিল আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে রাতেই।'

'যাহা পত্রিকা তাহাই গুগল।' রনো বলল।

অভ্রদা আরেক পেগ করে ঢাললেন।

মামুন বলল, 'সারি!'

সারি বলল, 'কী?'

'তুই একটা গান কর না।'

অভ্রদা বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব!'

'আরে না, অভ্রদা।' সারি বলল।

রনো বলল, 'কেন? গান করলে কি তোর গলা ভেঙে যাবে নাকি? জামাই আছে এখন বাবা। গলা ভাঙলে, যত্ন করে দেখবি কুইক ফিক্স দিয়ে আবার জোড়া দিয়ে দেবে।'

সারি নিচু গলায় বলল, 'মাতাল হয়ে গেছে!'

'কী বললি? কী বললি?'

'না, বললাম কোন গানটা করব?'

'ভেরি গুড! এটা ভেরি গুড! স্টার্ট কর! কুইক!'

মামুন বলল, 'ডিভিডি প্লেয়ার আর কি?'

তেড়ে উঠল রনো, 'কী বললি? কী বললি?'

'তোকে কিছু বলিনি। চুপ কর এখন। সারি, গান গা।'

সারি বলল, 'বৃষ্টি হবে তো। তোর বৃষ্টির গানটা করি, জারিফ?'

জারিফ বলল, 'কর।'

মাঝেমধ্যে লিরিসিস্ট হয় মৌনীবাবা। গান বানায়। লিখে না, বানায়। সুর করে বিল্লা। বৃষ্টির গানটার সুরও করেছে। এসব গান গায় এবং শোনে শুধু তারা নিজেরাই।

নির্মিত শেষ তামাকটা রনো ধরাল।

সারি গান ধরল।

বৃষ্টি পড়ুক ঘরেদোরে
বৃষ্টি পড়ুক মনে
বৃষ্টি পড়ুক দূরের একটা
নিকোনো উঠোনে
বৃষ্টি পড়ুক পাখির ঠোঁটে
বৃষ্টি পড়ুক ঘাসে
বৃষ্টি পড়ুক বুক পকেটের
নিজস্ব আকাশে
বৃষ্টি পড়ুক পাতায় পাতায়
বৃষ্টি পড়ুক বনে
বৃষ্টি পড়ুক নিকটবর্তী
শূন্য ইস্টিশনে
বৃষ্টি পড়ুক কাটাকুটি
বৃষ্টি পড়ুক ঝিঁ ঝিঁ
বৃষ্টি পড়ুক সব ডুবে যাক
বৃষ্টি পড়ুক ভিজি
বৃষ্টি পড়ুক ভিজি
বৃষ্টি পড়ুক ভিজি।

শেষ।

অভ্রদা বললেন, 'সাধু! সাধু! তুমি কেন গান করো না, সারি? সিরিয়াসলি! জারিফের সাত-আটটা গান দিয়েই তো একটা সিডি করে ফেলা যায়।'

রনো বলল, 'ইউ আর রাইট, অভ্রদা! ইউ আর রাইট! ইউ আর রাইট!'

বৃষ্টি নামল আরও আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট পর। আকাশ উজাড় করে নামল। কিন্তু তারা বসে আছে একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে। দরজা-জানালা এয়ারটাইট করে আটকানো। এই ঘরে বসে বৃষ্টি বোঝা যায়?

অভ্রদা বললেন, 'কে কে বৃষ্টিতে ভিজবে?'

ভিজবে না কে?

একটা কেউ না।

এনামুলকে ডাক দিলেন অভ্রদা। ছাদের গেটের চাবি আছে তার কাছে।

ছাদের গেট খুলে দিল এনামুল।

বৃষ্টি আর হাওয়ার দাপাদাপি ছাদে। হাওয়া কি হাওয়া। বৃষ্টি কি বৃষ্টি! কত দিন পর? তারা তুমুল ভিজল বৃষ্টিতে। সাধু! সাধু!

চার

টানা বৃষ্টি হলো অনেকক্ষণ ধরে। রাত বারোটা, একটা বাজল। দুটোর দিকে, বৃষ্টি ধরেছে, জারিফ, মামুন এবং রনো অভ্রদার বাসা থেকে নামল। নবদম্পতি থাকবে অভ্রদার বাসায়। অভ্রদার স্টাডিরুমে বাসররাত কাটাবে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রাত।

পানি জমে গেছে অভ্রদার গলিতে। দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি এখনও পড়ছে। মামুন বলল, 'সরো দেখাল!'

জারিফ বলল, 'হ্যাঁ, ঘটনার রাত গেল একটা।'

যাচ্ছে। যায়নি।

আধমাতাল রনো পড়ে যাচ্ছিল, মামুন তাকে ধরে আটকাল।

রনো খ্যাঁক করে উঠল, 'এই শালা, আমি কি মাতাল?'

মামুন বলল, 'না, আধমাতাল।'

'কী? কী? কী?'

'ডান দিকে, ডান দিকে যা।'

'ডান দিকে? ডান দিকে কী?'

'মেইন রোড।'

'অ।'

মেইন রোডেও পানি জমেছে। পত্রিকা কি ছাপা হয়ে গেছে? নাকি কাল সকালে নিউজ করবে তারা, বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ নগরী!

ভোঁতা শব্দ করে একটা ট্রাক চলে গেল।

রিকশা অটোরিকশা কিছু নেই রাস্তায়।

তারা হাঁটা দিল কাকরাইলের দিকে। রাজমনি সিনেমা হলের গলিতে রিকশা কি অটোরিকশা পাওয়া যেতে পারে। মার্কামারা হোটেল আছে গলিতে। রাতবিরাতে আনাগোনা করে মানুষজন। শীত-বৃষ্টির ধার তারা ধারে না।

পুলিশের একটা নীল কাভার্ডভ্যান শান্তিনগরের দিকে যাচ্ছে। এলাকাটা ছিনতাইপ্রবণ। গত শীতে বিল্লা এবং তরিকের মোবাইল ফোন এবং টাকা-পয়সা গেছে। অভ্রদার বাসা থেকে যাচ্ছিল তারা। সন্ধ্যা ছয়টায়। বৃষ্টির পর এই রাতেও কি ওত পেতে থাকবে বেজন্মার দল?

তারা মেইন রোড ধরে হাঁটছে। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের অফিস পার হয়ে যাচ্ছে, ফুটপাতে দুটো মেয়েকে দেখল। সাদা সালোয়ার কামিজ পরে আছে একটা, পিংক সালোয়ার-কামিজ পরে আছে একটা। পিংক একটা বিড়ি ধরাল। পলকের জন্য মুখটা দেখা গেল তার, লাইটারের আগুনে। কুৎসিত। জম্বিদের মতো। কাস্টমার ধরতে পারেনি এখনও!

রনো বলল,' বাসায় ফিরব না আর।'

মামুন বলল, 'হোটেলে থেকে যা।'

'হোটেলে? হোটেলে কেন থাকব রে, শালা?'

'বডি ম্যাসাজ নিবি।'

'তোর দরকার হলে তুই ম্যাসাজ নে। আমি তোর বাসায় থাকব।'

'শর্মি কি পারমিশন দিয়েছে?'

'আমি কি বউয়ের কথায় চলি রে, শালা? আমার বউ কি তোর লুসি আপা নাকি? উঠতে বললে উঠি, বসতে বললে বসি!'

'শর্মি কি তোকে উঠতে বলে নাকি? তুই তো নিচেই পড়ে থাকিস।'

'তোকে বলেছে! আচ্ছা একটা ফাইনাল কথা বল তো। অনেস্ট আস্কিং।'

'কী?'

'লুসি আপাকে তুইও লুসি আপা ডাকিস?'

'কী ডাকব তবে?'

'সব সময় ডাকিস?'

'হ্যাঁ।'

'সব সময়!' বলে রনো খিক খিক করে হাসল।

'শালা মাতাল!'

জারিফ বলল, 'সিএনজি তো আছে দেখছি। কিন্তু তারা কি মিরপুর যাবে?'

মামুন বলল, 'যাবে না মনে হয়। তুইও আমাদের সঙ্গে থেকে যা।'

'আরে না।'

'না মানে? এত রাতে মিরপুর যাবি কী করে তুই? হেঁটে হেঁটে?'

মামুনের ফোন বাজল। ফোন দেখে মামুন বলল, 'ভাই কলিং! এত রাতে ভাই!'

রনো বলল, 'ভাই হয়তো বাদুড় হয়ে গেছেন। খিক! খিক! খিক!'

মামুন ভাইয়ের কল রিসিভ করল, 'জি, ভাই!'

ভাই বললেন, 'ভাই, আপনি কি বাসায়?'

'না ভাই, রাস্তায়। কেন?'

'একটা সমস্যা হয়ে গেছে, ভাই।'

'কী সমস্যা ভাই।'

'আমাকে তো পুলিশ আটকেছে।'

'সেকি? কেন?'

'এত কিছু বলতে পারব না, ভাই। এরা তো কথাই বলতে দিচ্ছে না। আপনি কি আসতে পারবেন? পান্থপথে আসেন। পান্থপথ মোড়।' বলে ফোনের লাইন কেটে দিলেন ভাই।

জারিফ বলল, 'কী?'

মামুন বলল, 'ঝামেলা হয়ে গেছে। পান্থপথ মোড়ে ভাইকে পুলিশ আটকেছে।'

'ভাইকে আটকেছে?'

'হ্যাঁ। ভাই পান্থপথ মোড়ে যেতে বললেন।'

রনো বলল, 'ঘটনাটা কী?'

মামুন বলল, 'বুঝতে পারছি না।'

'পান্থপথ যাবি?'

'যাই। দেখি।'

তিনটা অটোরিকশা রাজমনির গলিতে।

১.

'এই যে ভাই পান্থপথ যাবেন?'

'না।'

২.

'এই যে ভাই পান্থপথ যাবেন?'

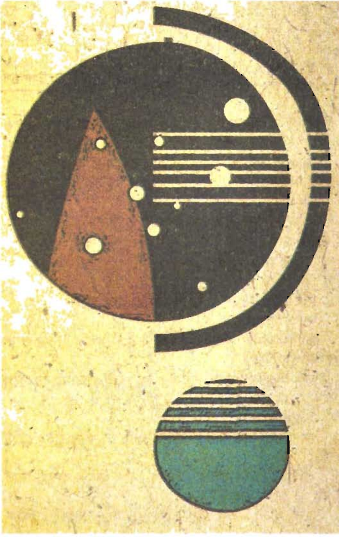
'না।'

৩.

'এই যে ভাই, পান্থপথ যাবেন?'

'না।'

আরেকটা অটোরিকশা ঢুকল গলিতে। প্যাসেঞ্জার আছে। প্যাসেঞ্জার নির্দিষ্ট হোটেলের গেটে নামল। অতিকায়া এক ফর্সা তরুণী। কালো ব্লাউজ কালো শাড়ি পরে আছে।



কালো হাইহিল। কিছু বলল হোটেলের সিকিউরিটি গার্ডকে। গার্ড কলাপসিবল গেট খুলে দিল। অতিকায়া ইন করল হোটেলে।

'এই যে ভাই, পান্থপথ যাবেন? পান্থপথ মোড়ে?'

'যাব। আড়াইশ' টাকা দিবেন।'

'আড়াইশ' টাকা ভাড়া হয়, ভাই? দুইশ' টাকা নেন।'

'না।'

নিরুপায়। উঠে পড়ল তারা।

বৃষ্টিভেজা নগরী সুনসান। এ-রাস্তা ও-রাস্তায় পানি জমে আছে। রনো একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এত রাতে ভাই পান্থপথে কেন?'

'কোথাও থেকে বাসায় ফিরছিলেন হয়তো।' মামুন বলল।

'এত রাতে?'

'বৃষ্টিতে কোথাও আটকে পড়েছিলেন হয়তো।'

'মহিলা-টহিলাসহ যদি ধরা পড়ে থাকেন?'

'কী করা যাবে?'

ইউসুফ বিন মাহতাব। বয়স বাষট্টি। অধ্যাপক ছিলেন, রিটায়ার করেছেন। বর্তমানে ফুলটাইম কথাসাহিত্যিক। মামুনের দেশি। মামুন ডাকে ভাই। জারিফ, রনোরাও ডাকে ভাই। ঢাকা শহরের আরও অনেকেই ডাকে। জীবনরসিক মার্কামারা ব্যক্তি। মিথ হয়ে গেছেন জীবদ্দশাতেই। শিং ভেঙে বাছুর হননি, মানুষটাই এমন। বয়স নির্বিশেষে সকলের বন্ধু। আনা-যানা আছে আজিজ মার্কেটে। অমুক মহিলা, তমুক মহিলার সঙ্গে দেখা যায়। যখন যায় না তখন হয়তো অমুক কিংবা তমুক মহিলার বাসায় থাকেন। চলছে, চলবে। অসংখ্য ঘটনা-উপঘটনার মধ্যে দুই বছর আগের একটা ঘটনা আছে। মামুনের বাসায় আড্ডা দিচ্ছিল তারা। মামুন, জারিফ, রনো, বিল্লা, পার্থ। তামাক ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছিল এবং নানা কিছু নিয়ে তারা কথা বলছিল। যেমন যেমন হয় আড্ডায়।

মামুন তখন থাকে এলিফ্যান্ট রোডে। এরোপ্লেন মসজিদের গলিতে। সন্ধ্যার আগে আগে ভাই উপস্থিত হলেন বয়স্কা এক মহিলাকে নিয়ে। পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ভাই, ইনি হলেন জান্নাত আরা আপা।'

জান্নাত আরা আপা। কী করেন?

সাংবাদিকতা করতেন। ছেড়ে দিয়েছেন। বই পড়েন প্রচুর। প্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। ভাইয়ের লেখাও পছন্দ করেন।

জান্নাত আরা আপার বয়স?

বায়ান্নর কম না। ছোটখাটো মানুষ। সাদামাটা দেখতে। সরলসিধা টাইপ আবার উচ্ছল। নিমেষে আপন হয়ে গেলেন তাদের। মামুনের রান্নাঘরে ঢুকে ডাল, পিঁয়াজ এবং তেলের শিশি বের করে চমৎকার ডালের বড়া করে খাওয়ালেন। পার্সে ছিল, মেয়ে, মেয়ের জামাই এবং নাতনির ছবি দেখালেন। নাতনির নাম রেখেছেন আরশি। আরশি তাবাসসুম। জান বলতে জান, কলিজার টুকরা বলতে কলিজার টুকরা। ফোনে নাতনির সঙ্গে একবার কথাও বললেন।

জান্নাত আরা আপার স্বামী?

পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। মারা গেছেন। সৎ ছিলেন, তেমন কিছু করতে পারেননি। ছয়তলা একটা বাড়ি করে শুধু জান্নাত আরা আপার নামে লিখে দিয়ে গেছেন। উত্তরায়।

জান্নাত আরা আপার ছেলে আছে একটা। এনএসইউতে পড়ত, এখন আর পড়ে না। কুসঙ্গে পড়ে ফুলটাইম ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে গেছে। জান্নাত আরা আপার জীবনে দুঃখ যদি বলতে হয় তাহলে এই ছেলেটাই। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে দিয়েছেন কয়েকবার। কিছুদিন থাকে, পালিয়ে আসে। বিদেশে পাঠিয়ে দেবেন ভাবছেন। জার্মানির হামবুর্গে এক দেবর থাকে তার। কথা বলেছেন সেই দেবরের সঙ্গে। সে বলেছে পাঠিয়ে দিতে।

'আমার যখন বিয়ে হলো বুঝেছ, সে তখন তোমাদের বয়সী। আমার দেবর। খুব ন্যাওটা হয়ে গিয়েছিল আমার।' জান্নাত আরা আপা বললেন।

ভাই বললেন, 'ন্যাওটা! আপনার প্রেমে পড়েনি তো আবার। তরুণী বয়সে আপনি তো দেখতে সোফিয়া লরেনের মতো ছিলেন। তা অবশ্য এখনও আছেন।'

'কী বলেন না বলেন আপনি।' জান্নাত আরা আপা বললেন।

ভাই সাক্ষী মানলেন মামুনদের, 'আমি কি বাজে কথা বললাম নাকি ভাই? আপার নাক সোফিয়া লরেনের মতো না? ঠোঁট সোফিয়া লরেনের মতো না?'

রনো বলল, 'সোফিয়া লরেন না, ভাই, ব্রিজিত বার্দোর সঙ্গে মিল আছে আপার।'

ভাই বললেন, 'রাইট, ব্রিজিত বার্দো। আমিও ব্রিজিত বার্দোর কথাই ভাবছিলাম। মুখে সোফিয়া লরেন এসে গেছে আর কি। বয়স হয়ে গেছে না, ভাই?'

বিল্লা বলল, 'বয়স! আপনার! আপনার কখনও বয়স হবে না ভাই, বিরাশি বছর বয়সেও আপনি এই রকম লেডিকিলারই থাকবেন।'

ভাই বললেন, 'দুঃখ দিলেন, বিল্লা। লেডি কিলার মানে? আমি কি লেডিদের হত্যা করি, বলেন?'

'যা করেন সেটা কি আর আপার সামনে বলা যাবে, ভাই?' বিল্লা বলল।

জান্নাত আরা আপা বললেন, 'দুষ্টু ছেলে! আমার দেবরটাও একদম তোমার মতো ছিল। তোমার মতো দুষ্টু। দুষ্টু কেন শুধু, এখন বলি, দেখতেও তোমার মতো ছিল সে। তোমাদের একদিন ছবি দেখাব। ইউসুফ ভাই তো ছবি দেখেছেন। ওর মতো কাটিং না বলেন?'

ভাই বললেন, 'কাটিং মানে? ফটোকপি!'

জান্নাত আরা আপা বললেন, 'তোমাকে দেখে এজন্যে আমি প্রথম খুব চমকে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, আরে রাব্বি। আমার দেবরের নাম রাব্বি।'

বিল্লা লজ্জা পেয়ে গেল।

জান্নাত আরা আপা বললেন, 'লজ্জা পাচ্ছ কেন, স্মার্ট ছেলে? প্রেম করো? প্রেম করো না?'

বিল্লা বলল, 'না, আপা।'

'সে কী কথা। প্রেম করো না কেন? প্রেম করার বয়স তো এটাই। প্রেম করবে। নাকি লজ্জা পেয়ে আমাকে লুকাচ্ছ?'

'না, আপা?'

মাগরিবের আজান হলো এরোপ্লেন মসজিদে। ভাই এবং জান্নাত আরা আপা উঠলেন।

মামুন বলল, 'আবার আসবেন আপা।'

'অবশ্যই আসব। উত্তরার দিকে গেলে আমার বাসায় যেও তোমরাও। বিল্লা, তুমি যেও।'

বিল্লা বলল, 'যাব, আপা।'

'ভাই, আপনি আবার কবে আসবেন?' মামুন বলল।

ভাই বললেন, 'এই তো ভাই। এখন তো যাই।'

জান্নাত আরা আপা বললেন, 'যাই বলতে হয় না ইউসুফ ভাই। বলেন আসি।'

বাধ্যগত ভাই বললেন, 'আসি।'

তারা আসলেন।

রনো বলল, 'মাইডিয়ার মহিলা। তবে বিল্লা তুই শ্যাষ।'

বিল্লা তেড়ে উঠল, 'শ্যাষ মানে?'

'আরে ভাই। তোকে পছন্দ হয়েছে মহিলার। সাবধানে থাকিস। না হলে ইলোপ হয়ে যাবি কোনদিন।'

'বলেছে!'

মামুন বলল, 'সেরকম কিছু ঘটলে ভাই কিন্তু বিল্লাকে খুন করে ফেলবেন। আমার ভাইয়ের চরিত্র বাবা, নাগলিঙ্গম ফুলের মতো পবিত্র।'

দ্বিতীয় দফায় বিল্লা এবং পার্থ ছিল না। মামুন, জারিফ এবং রনো তামাকের অধ্যাত্ম সাধনা করছিল। ভাই এলেন এবং জান্নাত আরা আপা। সেটা মাসখানেক পরের ঘটনা। ভাইও অধ্যাত্ম সাধনা করলেন এবং বিনীত গলায় বললেন, 'আপনাদের একটা নিউজ দেওয়ার আছে, ভাই।'

মামুন বলল, 'জি ভাই, বলেন।'

'আমি কিন্তু উনাকে আর আপা ডাকি না।'

'অ। কী ডাকেন তবে?'

'নাম ধরে ডাকি। আপনিও বলি না।'

রনো বলল, 'নাম ধরে ডাকেন? কী ডাকেন ভাই? জান্নাত না আরা?'

ভাই ব্যথিত হয়ে বললেন, 'আপনার কমন সেন্সের কিছু অভাব আছে, রনো। জান্নাতের মতো একটা সুইট নাম থাকতে আরা ডাকব কেন বলেন? জান্নাত শব্দের অর্থ জানেন তো?'

'জানি ভাই। স্বর্গ।'

'তবে?'

জান্নাত আরা আপা বললেন, 'আমিও কিন্তু ওকে নাম ধরে ডাকি। তুমি বলি।'

রনো কমেন্ট করল, 'একসেলেন্ট। বিল্লা শুনলে খুবই খুশি হবে, আপা।'

ভাই আবার ব্যথিত হলেন, 'বিল্লা শুনলে খুশি হবে কেন ভাই? এটা কী ধরনের কথা বুঝলাম না!'

'আরে ভাই, আমরা কি খুশি হইনি? বিল্লাও খুশি হতো, এটাই বললাম।'

'তাই বলেন।'

মনে হলো রিলিফ বোধ করলেন ভাই।

জান্নাত আরা আপা সরলভাবে বললেন, 'ইউসুফ যখন ফোন করে বুঝেছ, কোথায় থাকে আমার ছেলেমেয়ে, কোথায় থাকে আমার নাতনি, আমার মনে হয় আমি উড়ছি! মনে হয় উড়ছি!'

মামুন বলল, 'অসাধারণ!'

জান্নাত আরা আপা বললেন, 'কিন্তু একটা কথা বলো তো, এই ছেলে আরিফ।'

রনো বলল, 'আরিফ না, আপা, জারিফ। আপনার জান্নাতের জা। ওর একটা পিচ্চি ভাগ্নি আছে তুপা। তুপা ওকে ডাকে জিরাফ মামা।'

জান্নাত আরা আপা হাসলেন, 'জিরাফ মামা! ভালো তো! কিন্তু এই জিরাফ মামা কি খুবই কম কথা বলে নাকি? সেদিনও তো কথা বলতে শুনলাম না। এই ছেলে!'

জারিফ হাসল।

রনো বলল, 'ওকে আপনি, কী বলব, ফিফটি পারসেন্ট বোবা বলতে পারেন, আপা। ফিফটি না, সেভেনটি এইট পার্সেন্ট।'

জান্নাত আরা আপা বললেন, 'রক্ষা যে ইউসুফ ওর মতো না।'

রনো বলল, 'ভাই! ভাইকে তো একটা মোবাইল ফোন কোম্পানি বিজ্ঞাপনের জন্য সিলেক্ট করেছিল, আপা। কত বলেরে একটা বিজ্ঞাপন দেখায় না?'

জান্নাত আরা আপা বললেন, 'যাই বলো আর তাই বলো ভাই, কথা না বললে ভালো লাগে নাকি? ইউসুফকে যে আমি এত পছন্দ করি, সেটা কেন? চমৎকার করে কথা বলতে পারে ও। না হলে আর ওর ফোন পেলে উড়ে যাই!'

ওড়াউড়ি শুরু হয়ে গেছে!

চিন্তাযুক্ত হয়ে সেদিন রাতেই ভাইকে কল দিয়েছিল মামুন।

'সব ঠিক আছে তো, ভাই?'

'ঠিক আছে, ভাই।'

'উত্তরায় এর মধ্যে গেছেন কতবার?'

'এই তো ভাই দুইদিন, না, তিনদিন।'

'তিনদিন না, ভাই, চারদিন গেছেন। বলেন?'

'আপনি ভাই সব ধরে ফেলেন!'

'কেন, ভাবি ধরতে পারেন না?'

'ধুর ভাই, বোকা মহিলা! আটত্রিশ বছর ধরে সংসার করছে, একটা কেসও ধরতে পেরেছে শুনেছেন? সন্দেহ করে। সন্দেহ মোচনের ওষুধ তো ভাই আপনাদের দোয়ায় আমি জানি। যত মোটা হচ্ছে তত বোকা হচ্ছে মহিলা। হা! হা! হা!'

পরের দফায় মামুন ছিল অফিসে। উটমার্কা ঢেউটিনের বিজ্ঞাপন ভাবছিল। রিসেপশনের প্রীতি ইন্টারকমে বলল, 'মামুন ভাই, আপনার আপা এসেছেন।'

আপা? কে? বৃষ্টি?

মামুনের আপন বোন নেই। খালাতো বোন শিলা, বৃষ্টি। শিলা আপু থাকে বাড্ডায়। বৃষ্টি রোকেয়া হলে। স্ট্যাটিসটিকসে পড়ে। শিলা আপু অফিসে আসার কথা না। বৃষ্টি এর আগেও এসেছে কয়েকবার। রিসেপশনে পরিচয় দিয়েছে, সে মামুনের আপা। ফাজিলের হাড্ডি। কিন্তু প্রীতি তো চেনে বৃষ্টিকে।

রিসেপশনে ঢুকে ধাক্কা খেল মামুন। জান্নাত আরা আপা

বসে আছেন। মামুন বলল, 'আরে আপা!'

জান্নাত আরা আপা উচ্ছ্বসিত হলেন না, গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, মামুন।'

'বলেন, আপা।'

'এখানে বলব? আচ্ছা, বসো।'

মামুন বসল।

জান্নাত আরা আপার বয়স বেড়ে গেছে? বিগত ছয়-সাত-আট মাসেই?

মামুন বলল, 'বলেন, আপা।'

জান্নাত আরা আপা বললেন, 'আচ্ছা একটা কথা বলো তো, ইউসুফ কি সবসময় মিথ্যা কথা বলে নাকি?'

নয় নম্বর বিপদ সংকেত! মনে মনে রনোর বুদ্ধি ধার নিল মামুন। হেসে ফেলে বলল, 'ভাই? কেন আপা আপনি জানেন না?'

'তুমি বলো।'

'এটা তো মোটামুটি একটা এটারনাল ট্রুথ হয়ে গেছে, আপা। মিথ্যা কথা না বলে ভাই থাকতে পারে না।'

'মিথ্যা কথা না বলে থাকতে পারে না?'

'জি।'

জান্নাত আরা আপা হিস করে উঠলেন, 'তুমি এই কথা হাসতে হাসতে বলছ!'

'স্যরি, আপা।'

'তোমার স্যরি হওয়ার কিছু নেই, মামুন। শোনো একটা কথা সেই ছোটবেলা থেকে শুনেছি, মুখে মধু মুখে বিষ, অঙ্গ জ্বলে অহর্নিশ। অঙ্গ কখন জ্বলে বলো তো? যখন ইউসুফের মতো কথা বলে কেউ।'

'কী হয়েছে, আপা?'

জান্নাত আরা আপা মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে? কী হয়নি, তাই বলো। শোনো, সে এত মিথ্যা কথা বলে। এত মিথ্যা কথা বলে, আমাকে তো আগে বলেনি। জানলে তার সঙ্গে আমি রিলেশন করতাম না। দুইদিন আগেও কত রঙ্গরসের কথা! এত ভোল পাল্টায় কী করে মানুষ! বুঝতে পারিনি তো সব মিথ্যা, সকালে তার জন্য মন কেমন কেমন করছে, ফোন করেছি। বলল কি ছয়টায় তুমি শিল্পকলা একাডেমিতে আসো, নাটক দেখব। আমি বাসা থেকে রওয়ানা দিয়েছি তিনটায়। রাস্তায় কী জ্যাম। মহাখালী পর্যন্ত এসে সিএনজি ছেড়ে দিয়ে মগবাজার পর্যন্ত হেঁটে এসেছি। রিকশা নিয়ে শিল্পকলায় পৌঁছেছি ঠিক পাঁচটা বেয়াল্লিশ মিনিটে। তারপর থেকে কল করছি তো করছি। ও বাবা, কল আর ধরে না! শেষে ফোন অফই করে দিয়েছে। এটা কী ধরনের ইতরামি বলো তো?'

'কী করবেন, আপা?'

'কী করব? কী করব তোমরা দেখবে। আমার নাম জান্নাত আরা! সে আমাকে চিনতে পারেনি, বুঝেছ? চিনিয়ে ছাড়ব। হাড়ে-মজ্জায় তাকে চিনিয়ে ছাড়ব, আমি কে! বদমায়েশের বদমায়েশ! তুমি আমাকে তার বাসার ঠিকানা দাও তো।'

'ঠিকানা তো আমি জানি না, আপা। জিগাতলার দিকে কোথায় থাকেন শুনেছি। ঠিকানা জানি না।'

'কেন? সে না বলল, তুমি যাও তার বাসায়।'

'মিথ্যা কথা আপা। কখনও যাইনি।'

'দেখেছ অবস্থা! পাই একবার। জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব মিথ্যুকটার। সে কী মনে করেছে? আমি তাকে ধরতে পারব না? কোথায় পালাবে? সে এই ঢাকা শহরে থাকবে না? আমার সঙ্গে চিট করে হ্যাঁ? মিথ্যা কথা বলে! আমি জান্নাত আরা তার মতো কত মিথ্যুককে টিট করেছি, জানো? কথাসাহিত্যিক! কত কথাসাহিত্যিক দেখলাম! মিথ্যা কথাসাহিত্যিক একটা!'

রণরঙ্গিনী জান্নাত আরা আপা ঠিক কতক্ষণ লেকচার ঝাড়লেন? সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ মিনিট। লেকচার ঝেড়ে নিষ্ক্রান্ত হতেই ভাইকে কল দিয়েছিল মামুন। ফোন বন্ধ। আনরিচেবল। আরেকটা নাম্বার আছে ভাইয়ের। অত্যন্ত প্রাইভেট। এটাতে কল দিতেই ভাই ধরলেন। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'কী খবর, ভাই? এই সময় আপনি?'

'আপা আপনার এই নাম্বারটা জানেন না, ভাই?' মামুন বলল।

'কোন আপা, ভাই?'

'জান্নাত আরা আপা?'

ভাই হাসলেন, 'মাথা খারাপ, ভাই। এই নাম্বার আমি কোনো মহিলাকে দেই না। কেন, কিছু ঘটেছে নাকি? সে কি আমাকে গুগল সার্চ দিচ্ছে?'

মামুন সংক্ষেপে ঘটনা বলল। নির্বিকার ভাই বললেন, 'সে এখন একটা ক্লোজড চ্যাপ্টার, ভাই। চিল্লাক তড়পাক, আমি কী করব? হে! হে! হে!'

পুলিশ এহেন ভাইকে আটকেছে!

দোষঘাট কী করেছেন ভাই?

জলমগ্ন বাংলামটর এলাকা পার হচ্ছে তারা। ভাই আবার কল দিলেন মামুনকে, 'কোথায় ভাই আপনি?'

'আসছি, ভাই।'

'জলদি আসেন! এরা তো মনে হচ্ছে আমাকে থানায় নিয়ে যাবে!'

বসুন্ধরা মার্কেট ক্রস করে তারা ভাইয়ের সাদা এলিয়েন এবং পুলিশের নীল ভ্যান দেখল। পুলিশ বাহিনী এলিয়েন ঘেরাও করে রেখেছে। পরিস্থিতি কি এতটাই সিরিয়াস?

'এই যে ভাই, রাখেন।'

তারা অটো থেকে নামল।

পুলিশ দেখলে মাতলামি ছুটে যায় রনোর। মস্তিষ্ক ঠান্ডা হয়ে যায়। পুলিশের এসআইয়ের সঙ্গে কথা বলল সে, 'ভাই, একটু কথা বলতে পারি?'

'আপনারা কারা?'

'আমি রনো। ও মামুন। ও জারিফ।'

ভাই এলিয়েন থেকে নামতে নিচ্ছিলেন, এক পুলিশ অতি চিকন গলায় ধমকাল, 'আপনে নামতে পারবেন না।'

এসআই সাহেব তাদের বয়সীই হবেন। বললেন, 'কী বলবেন, বলেন।'

রনো এলিয়েন দেখিয়ে বলল, 'উনাকে আটকেছেন কেন আপনারা?'

'আপনাদের কথাই বলেছিলেন উনি! হাবেভাবে তো আমি মনে করেছিলাম মন্ত্রী-মিনিস্টার কেউ আসছেন।'

'বুঝতেই পারছেন আমরা তেমন কেউ না। কোনো মন্ত্রী, সাংসদ এমনকি কমিশনারও আমাদের আত্মীয় না।'

'ফালতু সময় নষ্ট হলো তাহলে। মফিদুল, ভ্যানে উঠ। বিল্লাল তুই এলিয়েনে উঠ।'

অতি চিকন গলা পুলিশ ভাই বিল্লাল, বললেন, 'থানায় যাব স্যার?'

'হ্যাঁ।'

রনো বলল,' একটু কথা শোনেন ভাই।'

'কী? বলেন।'

'ভাই, উনি একজন কথাসাহিত্যিক।'

'কী?'

'বলছি ভাই, উনি একজন কথাসাহিত্যিক। গল্প-উপন্যাস লিখেন।'

'কথাসাহিত্যিক কী, আমি জানি। আমার ওয়াইফ হুমায়ূন আহমেদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়ে।'

'ভাবি তাহলে হয়তো উনার লেখাও পড়েছেন।'

'পড়ে নাই। হুমায়ূন আহমেদ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়া সে আর কারোর উপন্যাস পড়ে না। উনার নাম কী?'

'ইউসুফ বিন মাহতাব। কথাসাহিত্যে এ বছর উনি পদ্মাবতী পুরস্কার পেয়েছেন।'

'নামই শুনি নাই।'

'পদ্মাবতী সাহিত্য পুরস্কার। খুবই প্রেস্টিজিয়াস পুরস্কার, ভাই। দুই লক্ষ টাকা দেয় নগদ।'

'কী ফালতু কথা বলছেন, বলেন তো! আমি বলেছি উনার নাম শুনি নাই। কী বললেন, ইউসুফ-।'

'বিন মাহতাব।'

'হ্যাঁ। আপনি বলছেন কথাসাহিত্যিক, কিন্তু উনি তো একজন সন্ত্রাসী।'

'সন্ত্রাসী!'

'হ্যাঁ। অস্ত্রসহ ধরা পড়েছেন।'

'কী?'

'জি। আর কিছু বলতে পারব না। আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে থানায় চলেন, থানায় গিয়ে বলবেন।'

'শোনেন ভাই, কিছু একটা ভুল হয়েছে কোথাও। উনার কাছে অস্ত্র থাকার কথা না।'

'বললাম তো যা বলবার থানায় গিয়ে বলেন। এই মফিদুল!'

'জি স্যার! জি স্যার!'

'ভ্যানে উঠতে বললাম না তোদের।'

'জি স্যার! জি স্যার!'

রনো বলল, 'শোনেন ভাই, প্লিজ।'

'আরে মিয়া ঝামেলা করবেন না তো। আপনারাও কিন্তু শেষে ফাঁসবেন?'

'সে না হয় ফাঁসব। সমস্যা নেই। কিন্তু উনার সঙ্গে কি আমরা কথা বলতে পারি?'

দয়ার্দ্র হলেন, বিরক্ত এসআই, 'ঠিক আছে, বলেন।'

'থ্যাংক ইউ, ভাই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।'

এই এক ঘণ্টা কি আধঘণ্টায়, শুকিয়ে মমি হয়ে গেছেন ভাই। এলিয়েন থেকে যে মানুষটা বের হলেন, তিনি একজন ভাঙাচোরা মানুষ। ভাঙা গলায় বললেন, 'ভাই!'

রনো বলল, 'কী হয়েছে, ভাই!'

'তারা আমার গাড়িতে অস্ত্র পেয়েছে, ভাই!'

'কী বলেন?'

'হ্যাঁ, ভাই। বলল, এয়ালথার পিপিকে।'

'এটা তো 'মাসুদ রানা' সিরিজের মাসুদ রানার পিস্তল। আপনার গাড়িতে এলো কী করে, ভাই?'

'কী করে বলব, ভাই? গাড়ি আটকে সার্চ করল তারা। কাপড়চোপড়ের ব্যাগে ছিল পিস্তলটা।'

রনো গলা নিচু করে বলল, 'তারা রেখে দেয়নি তো ভাই?'

'না। ব্যাগ আমিই খুলে দেখিয়েছি।'

'তাহলে?'

'আপনি কি বাসায় যাচ্ছিলেন, ভাই?' মামুন বলল।

ভাই বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে?'

'এফডিসি। নাটকের শুটিং করছিলাম।'

'নাটকের শুটিং! আপনি নাটকের শুটিং করছিলেন? নাটক বানাচ্ছেন! আমাদের বলেননি!'

'বানাচ্ছি না ভাই। অভিনয় করছি।'

'অভিনয়! আপনি অভিনয় করছেন নাটকে! কী বলেন ভাই! কবে থেকে? নিউজও তো দেখলাম না পত্রিকায়।'

'পত্রিকায় পরে নিউজ হবে, ভাই।'

'কিন্তু আপনি ভাই, অভিনয় করছেন! এত বড় ঘটনা আমাদের বলেননি!'

'পরে বলব মনে করেছিলাম, ভাই। কী করব বলেন? সাইফ এমন করে ধরল! তারা একটা খ নাটক বানাচ্ছে। সেই নাটকে আমার বয়সী একজন থ্রিলার লেখকের ক্যারেকটার আছে। বলল, আমাকে খুবই মানাবে। অভিনয় করতে হবে না, আমি যেমন ঠিক তেমন ক্যারেকটার। না করতে পারলাম না, ভাই।'

'আপনার আর কত রূপ দেখব ভাই! ওহ্! অভিনেতা ইউসুফ বিন মাহতাব!'

'যা হওয়ার তো হয়ে গেছে, ভাই। এখন আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন আগে। পিস্তল দেখে তারা ক্যাওস করতেই, সাইফকে ফোন দিয়েছিলাম। সাইফের ফোন বন্ধ। তার ইউনিটের আর কারোর নাম্বারও আমি জানি না।'

'সাইফটা কে? সাইফ জুবেরী?'

'হ্যাঁ, ভাই। বিশ মিনিট হয়নি গেছে, এর মধ্যে ফোন বন্ধ করে দিয়েছে! এটা কোনো কথা হলো, বলেন?'

কী করুণ গলারে, ভাইয়ের!

'এক মিনিট, ভাই।'

মামুন কল দিল বৃষ্টিকে।

কল যাচ্ছে।

বৃষ্টি ধরল, 'কিরে, মামুন? ঘুমাসনি তুই?'

অন্য সময় হলে মামুন বলত, 'বেয়াদব! ভাইয়া বল।' এখন বলল, 'নাটক বানায় সাইফ জুবেরী। বন্ধু না তোর?'

'সাইফ ভাই? আমার বন্ধু না। তার বউ নূপুর আমার বন্ধু। কেন?'

'নূপুরকে একটা ফোন দে তো কুইক। সাইফকে বলতে বল, ফোন ওপেন করতে। ইউসুফ ভাই কথা বলবেন।'

'তোদের ভাই? কী হয়েছে আগে বল তো।'

'সমস্যা! পরে বলব, কুইক কর, প্লিজ!'

'আচ্ছারে বাবা, কল দিচ্ছি। কিন্তু তারা যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে।'

'ঘুম থেকে ওঠা! প্লিজ! কথা বলে আবার আমাকে কল দে।'

দেড় মিনিটের মাথায় কল দিল বৃষ্টি, 'বলেছি। সাইফ ভাই কল দিচ্ছে তোদের ভাইকে।'

'থ্যাংক ইউ! থ্যাংক ইউ!'

'কী হয়েছে এখন বলবি?'

'বললাম না পরে বলব। ফাউল! এত রাতেও ঘুমাসনি কেন? ফেসবুকিং করছিস?' বলে ফোনের লাইন কেটে দিল মামুন।

ভাইয়ের ফোন বাজল। 'সাইফ!' বলে ভাই ধরলেন, 'হ্যাঁ সাইফ... হ্যাঁ হ্যাঁ, বিরাট সমস্যা। আপনি একটু আসেন তো ভাই... পান্থপথ মোড়ে... হ্যাঁ। ... রাখি। ... হ্যাঁ। হ্যাঁ। ... বাই।'

সাইফ-নূপুর গ্রীন রোডে থাকে। পান্থপথ থেকে হাঁটা দূরত্ব। দফতরবিহীন মন্ত্রী হাসনাত আল আবদুল্লাহ নূপুরের আব্বা। সাইফ এলো একটা প্রাডো গাড়ি নিয়ে! শ্বশুরের গাড়ি?

ভাইয়ের মুখের রং কিছুটা ফিরল।

গাড়ি থেকে নেমে সাইফ অনেকবার 'স্যরি' বলল

ভাইকে। প্রয়োজনীয় পরিচয় দিল পুলিশের এসআই সাহেবকে এবং অত্যন্ত নম্রভদ্রভাবে বলল, 'এটা তো একটা খেলনা পিস্তল, ভাই। নাটকের প্রপস। ভুলে কেউ উনার ব্যাগে রেখে দিয়েছে।'

এসআই সাহেব বললেন, 'খেলনা পিস্তল!'

'জি ভাই, প্লাস্টিকের। আপনি ভালো করে দেখেননি মনে হয়।'

এসআই সাহেব এবার ভালো করে দেখলেন এবং আর কী?

'স্যরি! স্যরি! স্যরি!'

তারা 'থ্যাংকস' দিল সাইফকে : ভাই, মামুন, রনো, জারিফ। মধুরেণসমাপয়েৎ ঘটনা।

আট মিনিট পর।

এলিয়েন ছুটছে।

ভাই আগে জিগাতলা থাকতেন, এখন থাকেন

ধড়ে প্রাণ ফিরেছে ভাইয়ের। সরস গলায় বললেন, 'এলেম তো আমারও কিছু আছে, নাকি রনো? এমনভাবে আপনাদের কথা বললাম, ব্যাটা এসআই তো মনে করেছিল আপনারা মন্ত্রী-মিনিস্টার হবেন; না হলে কখন থানায় নিয়ে যায়!'

'হা! হা! হা!'

'হা! হা! হা!'

আবার বৃষ্টি নামল। ঝুম বৃষ্টি।

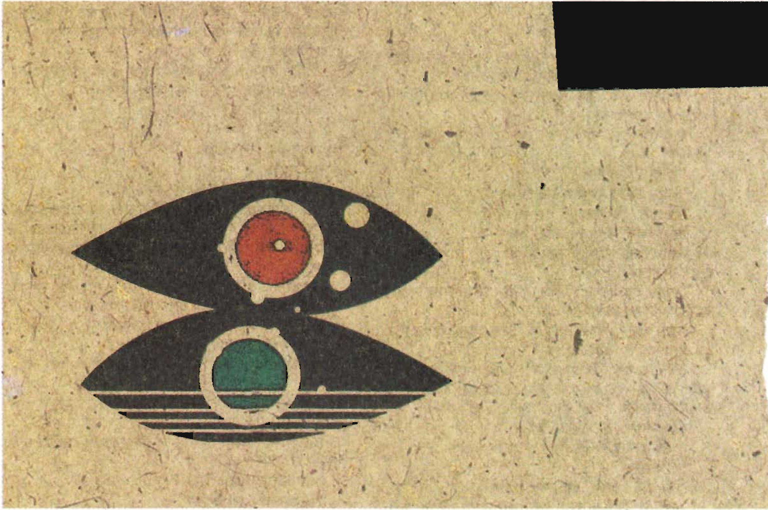
এলিয়েন ছুটছে।

চরাচর প্লাবিত বৃষ্টি। শুধু ভাইয়ের এলিয়েন ছুটছে। জানালার কাচ তারা অর্ধেকটা উঠিয়ে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ পর একটা কথা বলল জারিফ, 'নেমে যাই চল।'

রনো বলল, 'কী?'

জারিফ আবার মৃদু গলায় বলল, 'নেমে যাই, বৃষ্টিতে



মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদী হাউজিং কমপ্লেক্সে। সাতাশ নম্বরে নামিয়ে দিয়ে যাবেন মামুন, রনো এবং জারিফকে। রনো, জারিফ মামুনের বাসায় থাকবে।

এলিয়েনের জানালা খোলা। গাড়ির সঙ্গে তামাকের ঘ্রাণ ছুটছে। উচ্ছ্বসিত ভাই। এবং তার তরুণ বন্ধুরাও।

'ভাই তাহলে অভিনেতাও।' মামুন বলল।

'জীবনে আর না, ভাই। শিক্ষা হয়ে গেছে।' ভাই বললেন।

রনো বলল, 'জীবনে আপনার শিক্ষা হবে না, ভাই। আপনি হলেন সবার আমি ছাত্র। কাল কী নিউজ হতো পত্রিকায়? অস্ত্রসহ কথাসাহিত্যিক গ্রেফতার : হা! হা! হা! কিন্তু পুলিশ আপনাকে ধরেই কেন থানায় নিয়ে গেল না, ভাই?'

হাঁটি।'

মামুন বলল, 'উত্তম প্রস্তাব।'

ভাই বললেন, 'আপনারা কি পাগল হলেন নাকি, ভাই? এই বৃষ্টিতে কোথায় নামবেন? অবস্থা কী দেখতে পাচ্ছেন? গাড়ি পর্যন্ত চালানো যাচ্ছে না।'

'খ্যাতাপুড়ি ভাই আপনার গাড়ির।' মামুন বলল।

'পাগলামি করবেন না, ভাই। আপনারা বাসায়ও যাওয়ার দরকার নেই আর, আমার বাসায় চলেন। প্রভার আম্মুকে ফোন করে দিচ্ছি, দুটো ডালভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। সূর্য তো আগেই চলে গেছে কানাডায়, প্রভারও বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, দুটো ঘর তো খালিই পড়ে থাকে ভাই। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন হাত-পা ছড়িয়ে।'

'আমি হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমাই না ভাই।' রনো বলল।

মামুন বলল, 'হ্যাঁ! গুটিসুটি হয়ে শর্মির কোমর ধরে ঘুমায়।'

রনো বলল, 'অবশ্যই। লুসি আপা আমার সঙ্গে থাকলে তো তার কোমর ধরে ঘুমাতাম।'

'আচ্ছা ভাই, মোহাম্মদপুরে যাই তো আগে।' ভাই বললেন।

রনো বলল, 'মোহাম্মদপুরে গেলে তো আর লুসি আপাকে পাব না, ভাই।'

'আরে ভাই, যাই তো আগে।'

'গেলে লুসি আপাকে পাব, আপনি ভাই গ্যারান্টি দিচ্ছেন?'

মামুন বলল, 'এই! চুপ কর তো। মোহাম্মদপুরে যাব না, ভাই।'

শূন্যপুর। বৃষ্টিতে কোন শূন্যপুর আছে?

তারা হাঁটছে সেই শূন্যপুরের দিকে।

ভাই গাড়ি থেকে দেখলেন।

পাগলের দল। হেঁটে ঢুকে গেল তুমুল বৃষ্টিতে। তাদের আর দেখা গেল না।

ভাই আবার স্টার্ট দিলেন গাড়িতে। গাড়ি চলল না। ইঞ্জিন খকখক করে কাশল। কী হয়েছে? আর কিছুক্ষণ চেষ্টা-চরিত্র করে ভাই রেইনকোট পরে গাড়ি থেকে নামলেন। বনেট উঠিয়ে মোবাইলের টর্চ দিয়ে দেখলেন, মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে। তারতুর খুলে গেছে ইঞ্জিনের! কার্বোরেটরে পানি ঢুকে গেছে।

আবার গাড়িতে উঠে ভাই ত্বরিত কল দিলেন গাড়ির মেকানিক তফাজ্জলকে। তফাজ্জলের বউ সম্ভবত, কল রিসিভ করে বলল, 'এই বান্দীর ঘরের বান্দী-।'

ভাই বললেন, 'তবে কোথায় যাবেন? সাতাশ নম্বরেই নামিয়ে দিয়ে যাব?'

'না। আমরা সাতাশ নম্বরেও যাব না।'

'তাহলে আর কোথায় যাবেন ভাই? এই বৃষ্টিতে?'

'শূন্যপুরে।'

'শূন্যপুর? শূন্যপুর কোথায়?'

'বৃষ্টিতে, ভাই। গাড়ি রাখেন। আমরা নেমে যাই।'

'আপনারা পাগল, ভাই!'

'পাগল না ভাই, আমরা পাগলের মেলা। গাড়ি থামান।'

ভাই আর কী করবেন, গাড়ি থামালেন।

তারা তিনজন নেমে গেল বৃষ্টিতে।

থতমত ভাই লাইন কেটে দিলেন।

কী মুশকিল!

মেঘ ডাকল। বিদ্যুৎ চমকাল।

বৃষ্টির জোর আরও বাড়ল।

গাড়িতে উঠে বসে থাকলেন ভাই। কী আর করবেন? পাগল তিনটার সঙ্গে নেমে গেলে পারতেন। গাড়ি? থাকত! আফসোস হচ্ছে এখন।

তারা এখন কোথায়? মামুন, রনো, জারিফ? শূন্যপুরে? বৃষ্টি হয়ে গেছে? শূন্যপুরে। বৃষ্টি হয়ে গেছে।

সাধু! সাধু!

সাধু! সাধু! ❖

অলঙ্করণ : : সব্যসাচী হাজরা

মূল : ও হেনরি

টিউন অ্যান্ড ডিসটিউন

ভাষান্তর : জয়া ফারহানা



অনুবাদ গল্প

রাতের নীরব প্রহরে মেয়েরা যখন তাদের স্বামীর শরীরে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে; না, না তখন তাদের গায়ে শীল মাছের চামড়ার কোনো পোশাক নেই, যখন পাতিহাঁসের ডেকে ওঠাটা করুণ শোনায় আর ম্যাডিসন স্কোয়ারের পার্কের বেঞ্চে সোফিও একটু উসখুস করে, তখন আপনি ধরে নিতে পারেন শীত আসছে।

পাতিহাঁস, সোফি আর বিবাহিত মেয়েরা আসন্ন শীত অথবা এরই মধ্যে অনুভব করতে পারা এই নিম-শীতকে মোকাবেলার জন্য একটু উষ্ণতা কামনা করছে; ফুরিয়ে আসা হেমন্তের এই শীত-শীত শেষ রাতে। শীতের আগমনী বার্তা অবশ্য আরও আছে। ম্যাডিসন স্কোয়ারের এই পার্কের প্রত্যেকটা পাতা তখন ঝরে যাবে। ঝরতেই থাকবে। টুপটাপ শব্দে, কখনও নীরবে। তবু জানা যায় শীত আসছে, এমনকি নীরবে পাতা ঝরলেও। যার প্রাণ আছে এবং যে প্রকৃতির প্রাণস্পন্দন টের পায়, এমন যে কেউ অনুভব করতে পারবে, শীত এসে যাচ্ছে। সোফির জন্য আসন্ন শীত একটু দুশ্চিন্তারই। না, এই দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ নতুন কিছু নয়। প্রতিবার শীতের আগে, এই শীত পড়বে পড়বে সময়টাতে ঘোর শীত মোকাবেলার উপায় ভাবতে হয় সোফিকে। ভাবনাটা একটু অস্বস্তিরই বটে...।

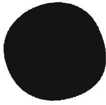
তবু উপায় তো কিছু বের করতে হবে। পার্কের বেঞ্চটাকে এই মুহূর্তে খুব আরামদায়ী মনে হলো না... হয়তো শীত থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করবে সেই দুর্ভাবনায়। তবু যেভাবেই হোক... একটা দ্বীপে, কোনো একটা দ্বীপে পুলিশ যদি নির্বাসনে পাঠাত তাকে...। তিন মাস। মাত্র তিন মাস। কঠিন শীতের তিনটে মাস যদি... একটুখানি খাওয়া আর থাকার জায়গা পাওয়া যেত... আহা। গত বছর শীতে যেমন মিলে গেছিল ব্ল্যাক-ওয়েলে খাওয়া আর থাকার জায়গাটুকুন। নিউইয়র্কের সবাই অবশ্য সেই জমাট শীতে নিউইয়র্ক থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। কেউ টিকিট কেটেছিল পামবিচের, কেউ রিভিয়েরার। সোফির রিভিয়েরার আর পামবিচ হলো দ্বীপান্তরে কাটিয়ে আসা। না, সেখানে জমে যাওয়া বরফের ওপর 'স্কি' করার জন্য নয়... খালি একটু থাকা আর খাওয়ার আশ্রয় জোটানোর জন্য। আর পুরোদস্তুর শীত না পড়তেই ম্যাডিসন স্কোয়ারের এই ফোয়ারার কাছের বেঞ্চে... যেই রকম শীত অনুভব হচ্ছে...। উফ! পিঠে, হাঁটুর নিচে এমনকি কোটের পকেটেও খবরের কাগজ গুঁজে রেখে শীত তাড়ানো যাচ্ছে না...।

অতএব একটা কোনো দ্বীপে আশ্রয় নেওয়ার চিন্তা করতেই হয়...। যেখানে মনের সুখে আড্ডা মারা যাবে... খাওয়া-পরার চিন্তা থাকবে না...। কিন্তু কীভাবে সম্ভব? না, সোফি কোনো পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে চায় না। ওসব দাতব্য বা স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে পুলিশের কিংবা আইনের মেহমান হওয়া শ্রেয়তর। সিজারের সঙ্গে যেমন ব্রুটাস, যিশুর সঙ্গে যেমন ক্যাসিও– এসব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তেমন জড়িয়ে থাকে একটা আপত্তিকর টিউমার। ওখানে যাওয়া মানে একান্ত ব্যক্তিগত কিছু নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া। একদম যা-তা। ওসব করুণা-টরুণা অসহ্য লাগে সোফির। ওর চেয়ে ঢের ভালো আইন অমান্য করে জেলে ঢোকা। এরা অন্তত ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে হামলে পড়ে না। আর দানের সঙ্গে লেপ্টে থাকে করুণা। না, না, করুণার দান গ্রহণ করতে সোফির তীব্র অনীহা। ওসব পারবে না সে। এমন কিছু করতে হবে, যেটাতে আইন 'অমান্য' হয় এবং শাস্তি হিসেবে যেন সামনের কঠিন শীতের তিনটি মাস তাকে কোনো দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়। দ্বীপান্তরিত হওয়ার জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে যে সহজ উপায়টি সোফির মাথায় উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে তা হলো, অভিজাত কোনো রেস্তোর-াঁয় গিয়ে জম্পেশ একটা ভোজ দেওয়া, তারপর বিল দিতে অস্বীকার করা। বিল না দিলে হোটেল কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই পুলিশ ডাকবে এবং ততোধিক নিশ্চিতভাবে বলা যায়, পুলিশ এসেই তাকে দ্বীপে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। দ্বীপে যাওয়ার এইটেই সবচেয়ে সোজা পথ, হ্যাঁ। ব্যস্। মামলা খতম। মাঝখান থেকে হোটেলের জমজমাট খানাগুলো খাওয়াও হয়ে গেল আরাম সে। বাহ্, চমৎকার আইডিয়া! এই তো এখনই সোফির চোখের সামনে ভেসে উঠছে খানদানি হাঁসের রোস্ট, ক্যামেম বার্ট আর এক বোতল দামি মদ। ওগুলো খাওয়ার পর বিল না দিলে হোটেল ম্যানেজমেন্ট না রেগে যাবে কই? আর রেগে গেলেই তো কেল্লা ফতে! পুলিশ ডাকবে এবং পুলিশ এসে সোজা চালান করে দেবে দ্বীপে। খালি ক্যাফের ম্যানেজারকে ঠিকঠাক খেপিয়ে দিতে পারলেই হলো। একটা আরামদায়ক ভবিষ্যতের ভাবনা চোখে কোলাজ করে সোফি পার্ক ছেড়ে এসে দাঁড়াল ঝাঁ-তকতকে একটি রেস্তোরাঁর সামনে, যেখানে ব্রডওয়ে আর ফিকথ এভিনিউ এসে মিলেছে। কিন্তু রেস্তোরাঁর রিসিপশনে পা রাখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্যরত ম্যানেজমেন্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল তার মলিন প্যান্ট আর ছেঁড়া জুতোর ওপর। বেশ নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই তারা তাকে ঠেলে দিল হোটেলের চৌকাঠের বাইরে। নাহ্, জেলে যাওয়ার বিষয়টি যত সহজ মনে হয়েছিল শুরুতে, ততটা সহজ নয়তো। ব্রডওয়ে থেকে বের হলো সোফি। প্রথম পরিকল্পনাটাই ভেস্তে গেল! ভাবল সোফি। তা যাকগে, ভিন্ন উপায় তো বের করতে হবে। ভাজো সোফি, ভাজো; চিন্তাকে ভেজে ভেজে পোক্ত কর। দ্বীপে যাওয়ার উপায় একটা তোমাকে বের করতেই হবে। সামনে সিক্সথ এভিনিউ, যেখানে ঝকমকে সব দোকান... অফুরন্ত আলোর ঝলকানি, আর আদ্যোপান্ত আলোর ফোয়ারায় সাজানো সব শোকেস। রাস্তা থেকে ছোট্ট একখণ্ড পাথর তুলে মারবে নাকি ওইসব বিলাসী পণ্যের শোকেসে? ভাবামাত্রই এক খণ্ড পাথর তুলে মারল শোকেসে। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল বহু মূল্যবান গ্লাস। চারপাশ থেকে দৌড়ে এলো পুলিশ। যাক, বাঁচা গেল তবে! এবার বাছাধনরা আমাকে গ্রেফতার না করে যাবে কোথায়! চারদিক থেকে দৌড়ে ঘটনাস্থলের কাছে আসছে পুলিশ, আর বিপদ টের পেয়ে সরে যাচ্ছে লোকজন। কিন্তু সোফি সরে না গিয়ে, ঠায় দাঁড়িয়ে পুলিশের কাজকর্ম দেখছে আর ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে কখন তার হাতে হাতকড়া পরানো হবে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণের! কিন্তু তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে উত্তেজিত সোফি অপেক্ষা করছে পুলিশের জন্য। পুলিশ কাছে আসতেই সে মিষ্টি করে মুচকি একটা হাসি দিল। পুলিশের জিজ্ঞাসা, কোথায় পালাল লোকটা? কোন লোকটা? এই মাত্র যে দোকানের শোকেস ভেঙে দৌড়ে পালাল? আবারও হৃদয়কাড়া হাসি হেসে সোফি বললো, ধরে নাও, আমি-ই শোকেসের গ্লাস ভেঙেছি। আমাকে গ্রেফতার কর...। পুলিশ রাগত স্বরে উচ্চকিত কণ্ঠে বলল, পুলিশের সঙ্গে ইয়ার্কি? তামাশা হচ্ছে, না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছ, ভাগো এখান থেকে। হতাশ কণ্ঠে সোফি বলল বিশ্বাস কর, ওই দোকানের কাচ আমি ভেঙেছি। পুলিশ অফিসারটির কণ্ঠ এবার আগের চেয়েও কঠিন। পুলিশকে বোকা পেয়েছ না? কাচ ভেঙে না পালিয়ে পুলিশের হাতে ধরা দিচ্ছ; না? সরে যাও এখান থেকে। পুলিশের উঁচিয়ে ধরা লাঠির তাড়ায় দ্বিতীয়বারের মতো হতাশ হতে হলো সোফিকে। নাহ্, এবার ব্যর্থ হলে চলবে না– বলেই একটি সস্তা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল সোফি। দেখা যাক, এখানে খাওয়ার পর বিল না মেটালে এরা পুলিশে খবর দেয় কি-না। এদের তৈরি স্যুপ যদিও একটু ঢ্যালঢেলে আর ন্যাপকিনগুলোও বেশ সাদামাটা, তবু ভেতরটা বেশ জমকালো। ঢুকে পড়া যাক। দেখা যাক, কপালে পুলিশের গ্রেফতার লেখা আছে কি-না। ভেতরে বসে সোফি মনের আশ মিটিয়ে মাংস, মটর, এটা-সেটা খেল। তারপর ফুরফুরে মন নিয়ে ওয়েটারকে ডেকে বলল, আমার পকেটে বিল দেওয়ার মতো একটা ফুটো তামার পয়সা পর্যন্ত নেই, বুঝলে হে। নাও, এবার জলদি জলদি ডাক তো পুলিশকে।

কেন, পুলিশ ডাকব কেন?

এই যে আমি তোমাদের রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করলাম, অথচ এখনও বিল দিচ্ছি না; তো এ জন্য পুলিশ ডাকবে না? ডাকো ডাকো, আর দেরি করো না। ওয়েটার সোফির দিকে অবজ্ঞাভরে তাকাল– তোমার মতো ফুটো পয়সার মানুষের জন্য পুলিশ ডেকে নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। যাও তো বাপু। যথেষ্ট হয়েছে।

হা কপাল! পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া এত কঠিন! তৃতীয়বারের মতো হতাশ হয়ে ভাবল সোফি। অথচ একটু দূরেই একটা ওষুধের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশ। সোফির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল মাত্র। এরপর গোটা পাঁচেক বাড়ি পেরিয়ে যেতে যতটুকু সময় লাগে, ততটা সময় এলোমেলো হাঁটল সোফি। গ্রেফতার হওয়ার জন্য এখন সে





রীতিমতো মরিয়া। ইউরেকা! ইউরেকা! ওই যে ওই শৌখিন দোকানটিতে বাহারি জিনিস দেখছে যে সুন্দরী মেয়েটি, ওকে গিয়ে অশ্লীল একটি ধাক্কা লাগাই। এরপরও পুলিশ গ্রেফতার না করে যাবে কোথায়? সোফি তার টাইটা ঠিকঠাক করে মাথার টুপিটাকে কায়দামতো আঁটসাঁট করে লাগাল। মেয়েটি তখন শেভিং মগ দেখছে। কাছে এসে সোফি ভাবল, একে একটি অনৈতিক প্রস্তাব দেওয়া যাক। হ্যাঁ, এতে গ্রেফতারের পথটা আরও সোজা হবে। 'আরে বেভেলিয়া যে, হ্যাঁ বেভেলিয়া-ই তো, আমার বাসায় খেলতে যাবে নাকি? হয়ে যাক মজার এক রাউন্ড। পুলিশ এখন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তখন মেয়েটি সামান্য ইশারায় পুলিশ ডেকে ওকে ধরিয়ে দিলেই সোফির স্বপ্নটা পূরণ হয়ে যায়। হা-হতোস্মি! পুলিশ ডাকার বদলে খুশি খুশি গলায় মেয়েটি বলল, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাব...। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমার সঙ্গে তোমার বাসায় যেতে...।

অগত্যা কী আর করা! মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে কিছু দূর হেঁটে সোফি শেষমেশ পালিয়ে বাঁচল। গ্রেফতার হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা কেন এভাবে ভেস্তে যাচ্ছে? চূড়ান্ত হতাশায় ভেঙে পড়ে বলল সোফি– হা ঈশ্বর, তুমি কি নেই? একটা থিয়েটার হলের সামনে পুলিশ দেখে শেষবার চেষ্টা করার একটা চিন্তা এলো তার মাথায়। ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে মাতাল সেজে কিছুক্ষণ চেষ্টায় একটা ছোটখাটো মনোযোগ পেতে চাইল। কিছুক্ষণের চেষ্টায় একটা ছোটখাটো গোলমাল বেধেও গেল। ব্যস, এবার তবে নিশ্চিন্ত। সোফি নিশ্চিত, পুলিশ এবার আর তাকে ছাড়ছে না। কিন্তু না, সোফির বিস্ফারিত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে অবিশ্বাস্যভাবে এবারও পুলিশ তাকে ছেড়ে দিল। ছেড়ে দেওয়ার আগে সামান্য ব্যাখ্যা দিল মাত্র। এই শীতে, রাস্তার মাতালদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ আছে ওপর মহল থেকে। শুনে বিপর্যস্ত সোফি শেষমেশ বন্ধ করল মাতালের অভিনয়। তবে কি গ্রেফতার হওয়ার কোনো আশাই আর নেই? বাইরে তখন হুল ফোটাচ্ছে শীতের বাতাস। বাতাসের তীক্ষ্ণ হুল সোফিকে ফের গ্রেফতার হওয়ার জন্য উদ্যমী করে তুলল। পাতলা কোটের বোতাম লাগিয়ে সোফি গ্রেফতার হওয়ার তীব্র বাসনায় এবার সত্যি সত্যি চুরি করে বসল। সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করছিল একজন। দরজার পাশে ছিল সিল্কের জমিনের একখানা ছাতা। সোফি ছাতাটি তুলে নিয়ে ধীর পায়ে এগোচ্ছে। দৌড়ানোর দরকার নেই। ধরা পড়ার জন্য ধীরে হাঁটাই ভালো। লোকটা চুরুট ধরিয়ে সোফির পেছন পেছন আসছে। এই যে শুনছেন, আমার ছাতা নিয়ে যাচ্ছেন কেন? মারমুখো সোফি বলল, 'তোমার-ই ছাতা বটে! তা মশাই, নিয়েই যখন যাচ্ছি তো পুলিশ ডাকছ না কেন? পুলিশ ডেকে বল যে, আমি তোমার দামি সিল্কের ছাতাখানা চুরি করে নিচ্ছি...। বল, বল না! ওই তো, মোড়েই দাঁড়িয়ে পুলিশ...।

সোফির হুমকি-ধমকিতে ভড়কে গেল ছাতাওয়ালা। কাঁচুমাচু স্বরে কোনো রকম বলল, ইয়ে, মানে কিছু মনে করবেন না। আজ সকালে এক রেস্তোরাঁয় পেয়েছিলাম ছাতাখানা। যদি আপনার হয় তো ক্ষমা করবেন, প্লিজ। ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দিন জনাব, তবু দয়া করে পুলিশ ডাকবেন না। বিধ্বস্ত সোফি কিছু দূর হেঁটে ছাতাটি ছুড়ে ফেলল পার্কে। ঘুরতে ঘুরতে আবার এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাডিসন স্কোয়ারে। এ ছাড়া আর কোথায় যাবে? এই শীতে মাথা গোঁজার মতো একটা ছাউনির আশ্রয় পর্যন্ত নেই তার। সামনে গির্জা। কাচের শার্সি ভেদ করে গির্জার বাইরে পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক অপার্থিব আলো। ভেসে আসছে রোববারের প্রার্থনা সঙ্গীতের অলৌকিক সুর। এই সুর বড় নষ্টালজিক। অলৌকিক ওই সুরের দ্যোতনা সোফিকে নিয়ে গেল ওর শৈশবে। অলৌকিক শৈশব। সোনারঙ শৈশব। মধুমাখা শৈশব। সেই মায়াবী শৈশবে সোফি ফিরে যাচ্ছে যেখানে মা ছিলেন, বন্ধুরা ছিল। বাগানে তখন গোলাপ ফুটত। আহা! জীবন তখন ছিল দুর্দান্ত আশার। প্রতিটি দিন ছিল খাম না খোলা, না পড়া চিঠির মতো রহস্যময়, জাদুময়। গির্জার করুণ শোক সঙ্গীত সোফির আত্মাকে শুদ্ধ করছে...। শুদ্ধ করেছে...। শুদ্ধ করছে...। ধুয়ে-মুছে দিচ্ছে জীবনের সমস্ত গ্লানি, ক্লেদ, মলিনতা। ধুয়ে যাচ্ছে সমস্ত পাপ, হিংসা-দ্বেষ, লোভ আর যাবতীয় অসুন্দর। হৃদয় মন্থন করে এক অলৌকিক সোফি জেগে উঠছে...। যদি আর একমাত্র জীবনটাকে ফিরে পাওয়া যেত... তবে ঠিক সমস্ত ভুল থেকে নিজেকে মুক্ত করত সোফি...। এ পর্যন্ত যত যত ভুল জীবনে সে করেছে... সব মুছে ফেলত জীবন থেকে।

কিংবা শৈশব যদি নাও ফিরিয়ে আনা যায়, তবু এই জীবনটাকে কি ফের শুদ্ধ করা যায় না? ত্রুটিমুক্ত করা যায় না? নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই পারা যায়। সোফি পারবে। পারতে চায় তো ও। আবার একটা নিষ্পাপ জীবনযাপন করবে সোফি। যে জীবনে কোনো স্খলন নেই, অন্যায় নেই, অসত্য নেই...। আবার সে ফিরে যাবে শৈশবের মতো বিশুদ্ধ জীবনে। সত্যিকারের মানুষ হবে। মানুষের মতো স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে। বর্তমানের সব কলুষতা ধুয়ে-মুছে ফেলবে...। আবার সে মানুষ হবে...। আবার–। অকস্মাৎ কেউ একজন তার হাত মুচড়ে ধরল। একটা ঘোরের মধ্যে ছিল সোফি। সম্বিৎ ফিরে তাকিয়ে দেখে পুলিশ। খেকুরে গলায় পুলিশ খ্যাঁক খ্যাঁক করল বটে! কী করা হচ্ছে, এখানে অ্যাঁ? বাছাধন? সোফির আহত স্বর– কই, কিছু না তো। বললেই হলো কিছু না? নিশ্চয়ই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোনো বদ মতলব আঁটছিলে। চলো, এক্ষুণি হাজতে চলো।

পরের দিন পুলিশ কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট সোফির জন্য তিন মাসের কারাদণ্ড নির্ধারণ করলেন। দ্বীপে। ❖

অলঙ্করণ : : নাজিব তারেক

সাদিয়া মাহ্‌জাবীন ইমাম

গল্পটা দু’জনের



গল্প

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় পানশালায়। সত্যি কথা বললে, গল্পটা লিখতে সুবিধে হয়। মাঝে মাঝে সাকুরায় যেতাম প্রায় বছর দুই একটানা। এখন অবশ্য বনানীর পিকিংয়ে আসি। লেখকদের জন্য কখনও একা থাকা বাধ্যতামূলক আর সেজন্য পানশালা উৎকৃষ্ট। কোনো নারী সঙ্গ আমার নেই মানে স্ত্রী বা প্রেমিকা, বহুবছর হয়েছে দেশের বাড়ি যাই না। সেখানে পুরনো স্মৃতি লেপ্টে থাকা ছাড়া অবশিষ্ট নেই বিশেষ কিছু। বলা যায় লেখা ও পানীয়ের নেশাটা হচ্ছে জীবনের আকর্ষণ। আমার পূর্বসূরিরাও চমৎকার সব গল্প বলে গেছেন পানশালা নিয়ে। সৈয়দ শামসুল হকের ‘আনন্দের মৃত্যু’ বইতে পড়েছিলাম কবি আর তার বন্ধু প্রতিদিন শাহবাগের পানশালায় বসে অদ্ভুত এক মানুষের মুখোমুখি হতেন। লেখক হিসেবে এইসব উদাহরণ উৎসাহিত করে। আর দশজন পানাহারিও হয়তো নিজের জন্য এইরকম একটা কিছু ব্যাখ্যা দাঁড় করাবেন। আজ পিকিংয়ে ঢুকতেই ওয়েটার কাছে এলো। অর্ডার নেওয়ার মতো মুখ নিচু করে ফিসফিস করে জানাল, আমাকে একজন খুঁজছেন। এমন জায়গায় কেউ খুঁজছে শুনেই প্রথমে মনে হলো ডিবির লোক। মাত্র মাস তিনেক হলো স্থান বদলেছি, তাছাড়া কেউ জানেও না এখানে আসি। এটা খোঁজার জায়গাও না, ফোনে চেষ্টা করবে না পেলে অফিসে, সেখানেও ফেল মারলে চিরকুট রেখে আসবে বিনয়ের সঙ্গে। আতঙ্ক ও আগ্রহ দুটোই কাজ করছে একসঙ্গে। ওয়েটারকে বললাম, নাম জানো?

সরি স্যার নাম জিজ্ঞেস করিনি। বললেন, দেখলেই চিনবেন।

এখনও আছেন?

জি, তবে কাস্টমার সিকিউরিটির কারণে আপনি এসেছেন কি-না বলা হয়নি। ইচ্ছা করলে দূর থেকে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কন্টাক্ট করবেন কি-না। যাহ বাবা এ তো দেখছি সোয়া সের,

ভালো বখশিশ চায় মনে হয়। তবে যেহেতু কোনো অপকর্মের তালিকায় নাম নেই ঝামেলা বাড়াতে ইচ্ছা হলো না। বললাম, আসতে বলো তাকে। আমার জন্য অপেক্ষারত মানুষটি এলেন এবং তাকে দেখে বিস্ময় গোপন করে হাত বাড়িয়ে বললাম, জানতাম খুঁজে বের করবেন।

–তাই কোনো ঠিকানা না রেখেই ঠিকানা পাল্টালেন?

–তা নয়, তবে জানেন তো কোথাও শেকড় গজিয়ে গেলে লেখকরা সেখান থেকে সরে যেতে চায়।

–এটা কি লেখক ধর্ম?

–জানি না, তবে আমার হয়। কোথাও আটকে গেলেই কিছু দিন পর গায়ে শ্যাওলা জন্মানো অনুভূতি আসে। ভালো আছে আপনার মেয়ে? বলুন কেন খুঁজছিলেন?

তিনি প্রশ্ন এড়িয়ে বরং আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, গল্পটা লিখেছেন?

–কেন পড়তে চান?

–না শেষটা বলা হয়নি তাই।

তিনি অনুমতি না নিয়েই গল্পের শেষটা শুরু করলেন। শুনে আমার কেমন লাগছিল সেটা পড়ে বলছি। একজন সাধারণ মানুষ এমন ভালো বক্তা হতে পারে, অবিশ্বাস্য। এতদিন তাকে বেশ নিরীহই মনে হতো। আমাদের দেখা হলো প্রায় মাস তিনেক পর। এটা চতুর্থ বা পঞ্চমবারের মতো দেখা হতে পারে। অফিস সেরে সপ্তাহে দু'দিন সাকুরায় বসতাম তখন। আমরা দু'জন মুখোমুখি দুটি টেবিলে বসেছিলাম। একদিন, দু'দিন এবং তৃতীয় দিন। এরপর আবিষ্কার করলাম দু'জনই একে অপরকে দেখছি এবং আমরা দু'জনই একা। ভদ্রলোকের বয়স আমার চেয়ে বছর পাঁচেক বেশি হবে বলেই ধারণা। এসব জায়গায় যারা একা আসে, তারা অন্যের সঙ্গে সেধে কথা বলে না কারণ তারা নিজের সঙ্গে থাকতেই আসে। চতুর্থ দিন ইচ্ছা করে টেবিল বদলে বসে একটা স্বস্তি পাচ্ছিলাম। সারাক্ষণ মুখের সামনে কেউ তাকিয়ে থাকলে ভালো লাগে নাকি কারও? মাত্র এক পেগ নিয়েছি, ভাবছি আজ বেশি নেব না, কাল সকালেই মিটিং আছে। প্রায় মিনিট ত্রিশ পড় খুক খুক কাশির শব্দে তাকিয়ে দেখি পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। আপনার সঙ্গে বসতে পারি?

অনুমতি না দেওয়ার মতো অভদ্র নিশ্চয়ই আমি নই। তিনি বসে নিজের জন্য অর্ডার দিলেন। হাতে ঘড়ি পরেন। চুলটা বেশ যত্নে আঁচড়ানো। ভদ্রতা করে আমার জন্য অর্ডার করতে চাইলেন। আশ্বস্ত করলাম, ওরা আমার পছন্দ জানে। বেশ কিছুক্ষণ অল্প আলোর মধ্যে আমরা মুখোমুখি বসে আছি। পিলারের সঙ্গে এক কোনায় টেলিভিশনে শব্দহীন আইপিএল খেলা চলছে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ব্যাঙ্গালুরুকে টার্গেট দিয়েছে। দু-একজন গ্লাসে সিপ নিতে নিতে বোবা খেলা দেখছে। একজন অযথাই মুম্বাইয়ের হয়ে বাজি ধরতে সঙ্গীকে জোর করছে। সে রাজি হচ্ছে না। বেচারা বাজি ধরার মানুষ না পেয়ে হতাশ হয়ে ওয়েটারকে আবার অর্ডার দিল। আমি খুব একটা খেলা দেখি না। তবে এখানে মানুষ দেখতে ভালো লাগে। পেটে খানিকটা যাওয়ার পরই কারও শব্দ একেবারে উদারায় নামে আবার কারও মেজাজ গামা লেভেলে উঠে যায়। আমার সামনে যে বসে আছে, সেও কিছুক্ষণ বোবা টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে রইল। কাট গ্লাসের তরল শেষ হচ্ছে; কিন্তু সাদা পিরিচগুলোতে দৃশ্যমান অনুষঙ্গের দিকে কারও আগ্রহ নেই। তিনি শুরু করলেন– একাই আসেন?

–অধিকাংশই তাই আসে, আপনিও যেমন এসেছেন

–লেখেন?

–পড়েছেন কোন বই?

–না তবে বইয়ের দোকানে পাতা উল্টানোর সময় মনে হয় ফ্ল্যাপে দেখেছি।

–শার্প আপনি, ব্যাক পেজের ছবি দেখে মিলিয়ে ফেললেন! এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনিও একা আসেন?

–বলতে পারেন, একা হতেই আসলে আসি। খাওয়াটা ম্যান্ডেটরি না।

–কেন, বন্ধু সঙ্গ বা বাসায় ফিরতে ভালোলাগে না?

–তেমন নয় বিষয়টা, এখানে বসে ভাবি।

–আপনিও লেখেন নাকি?

–লিখি তবে অপ্রকাশের জন্য।

–কী রকম?

–যা যা ভেতরে লেখা হয় সেসব যেন ভুলেও প্রকাশ না হয় সেই কৌশল রপ্ত করি এখানে বসে বসে।

–আপনি তো মজার মানুষ। তা বলুন তো আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন কেন?

–মনে হচ্ছিল যা ভাবি তা আসলে কারও না কারও সঙ্গে শেয়ার করা দরকার নয়তো এ থেকে আমি বের হতে পারব না। আসলে পরিচিত মানুষ বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সব কথা বলা যায় না। আপনাকে দেখে মনে হলো আপনার বই দেখেছি। অপরিচিত একজন লেখককে বলা যায়, লেখকরা অন্যরকম হন।

–হয়তো আপনার কথা ঠিক। চাইলে শেয়ার করতে পারেন আপনার ভাবনাটা মানে যেটা অপ্রকাশিত রাখার কৌশল রপ্ত করতে আসেন।

–পরে বলি আজ তো মাত্র প্রথম বসলাম আমরা তবে আপনাকেই বলব।

এই প্রথম আমি পানশালা থেকে ফেরার পর অস্বস্তিতে রাত কাটল। সাদামাটা হলেও লোকটার চোখ বেশ ধারালো। বেশ কয়েকবার মনে হলো, এমনকি গল্প হতে পারে যা অপরিচিত মানুষকে বলতে হয়। পরপর দু'দিন কখনও সাকুরায় যাই না। গ্যাপ দেই, শরীরের জন্যই। আজ গেলাম। কেন যেন ভদ্রলোকের গল্পটা টানছে। মনে হচ্ছে দারুণ খোরাক অপেক্ষা করছে। লেখকদের হরেক রকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। মানে তারা যেচেই পরিচিত হতে যায় আর কি। বিশেষ করে যারা মানুষকে উপজীব্য করে লেখেন, তাদের মিশতে হয়। মানুষের কাছ থেকে গল্প নিয়ে সেই গল্পটাই লিখতে আবার নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়। অফিস সেরে সন্ধ্যার দিকে বসলাম, নাহ লোকটা আসেনি। পরপর কয়েকদিন তার দেখা নেই। ভালো যন্ত্রণা হলো দেখি। একটা গল্প নিজে থেকে বলবে বলে ঝুলিয়ে রাখল শ্রোতাকে। সপ্তাহ খানেক পর ঢুকে দেখি মূর্তিমান বসে আছেন। নিজেই তার টেবিলে গেলাম। ম্লান হাসলেন। এ ক'দিনে চেহারা খারাপ হয়েছে।

–কয়েকদিন আসেননি। ঝামেলায় ছিলেন?

–মেয়েটা অসুস্থ।

–একটা গল্প বলতে চেয়েছিলেন।

–জি এখন আর ঠিক বলতে ইচ্ছা করছে না।

– বলে দেখুন স্বস্তি পেতে পারেন।

–বিষয়টা হাস্যকর কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভাবাচ্ছে বলে অস্থির হয়ে আছি। শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো ভাবনাটা আসছে বারবার। আসলে হয়েছে কী, আমার একটাই মেয়ে। বয়স পাঁচ।

–মেয়ে নিয়ে সমস্যা?

–কিছুটা ওই রকম।

মনে মনে ভাবলাম, যাহ বাবা এবার না ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের সিদ্ধান্ত চেয়ে বসে। অবশেষে পাঁচ বছরের মেয়ের গল্প শুনতে হবে।

–তো কী হয়েছে আপনার বাচ্চার?

–না ওর কিছু হয়নি। আপাতত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছে। সমস্যাটা অন্য।

– যেমন?

–আমার বারবার মনে হয় মেয়েটা আমার না।

এবার নড়েচড়ে বসলাম। বেশ একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কেন মনে হয় আপনার না?

– আমার সঙ্গে কিছুতেই কোনো মিল নেই।

–তা না থাকতেই পারে তাই বলে এমন ভাবনা? যদি কিছু মনে না করেন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

–সেটাই সমস্যা আসলে ও হচ্ছে আমার দেখা সবচেয়ে শান্ত মানুষ। স্কুলে পড়ায়। স্কুল, বাসা আর মেয়ের বাইরে ওর জগৎ নেই। নানাভাবে খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি। এমনকি আপনি শুনলে হয়তো খুব ছোট ভাববেন আমাকে, প্রায়ই ওর মোবাইল চেক করি। এখনও করি কিন্তু সামান্য সন্দেহ করার মতো কিছুই কখনও চোখে পড়েনি।

–সরাসরি জিজ্ঞেস করার সুযোগও তো নেই মনে হচ্ছে।

–অসম্ভব। আমার স্ত্রী খুব আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ। এ ধরনের কথা বললে ভয়াবহ পরিস্থিতি হবে।



–যেহেতু সে যথেষ্ট ম্যাচিউরড মানে আপনার কথা ধরেই বলছি, আপনার সমস্যা বুঝিয়ে বললে সহজেই সমাধান হতে পারে। আর এ ধরনের ভাবনাও আসলে আপনার কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

–নিজেও জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, পাঁচ বছরের একটা মেয়ে তার সামান্য কিছুতেও মিল থাকবে না বাবার সঙ্গে?

–বাচ্চা হাসপাতালে হয়েছিল?

–জি।

–ইদানীং তো হাসপাতালের অনেক রকম ঘটনা শোনা যায়। সেখানে কোনো ঝামেলা হতে পারে মনে হয়?

–কী রকম?

–আসলে দেখুন, অনেক মানুষই এখনও সেকেলে আছেন। যেহেতু মেয়ে সন্তান। হতে পারে হাসপাতালে ওই একই সময় কোনো গোঁড়া পরিবারের মহিলারও ডেলিভারি ছিল এবং তার পরিবারের আশা ছিল ছেলেসন্তান হবে। টাকার বিনিময়ে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের সময় কিডনি রেখে নিচ্ছে হাসপাতালগুলো, সেখানে একটা বাচ্চা বদলে দেওয়া খুব অসম্ভব না। ভদ্রলোক সামান্য হাসলেন। এই সুযোগটা একেবারেই নেই কারণ আমার চাচাতো বোন ডাক্তার, ওর হাতে ডেলিভারি হয়েছে। তার কেয়ারেই ছিলেন আমার স্ত্রী পুরো সময়।

–কিছু মনে করবেন না, আপনার স্ত্রীর কোনো গোপন সম্পর্ক থেকেও তো থাকতে পারে, সেখানে যদি কিছু। না আমি আসলে একটা বাজে সম্ভাবনার কথা শুধু মনে করলাম। আপনি এভাবে ভাববেন না। হতেও পারে, আসলে সে আপনারই সন্তান কিন্তু আকস্মিক কোনো কারণ ছাড়াই ভাবনাটা মাথায় এসেছে আর আপনি তা থেকে বের হতে পারছেন না। প্রকৃতি অনেকভাবে নিষ্ঠুর আচরণ করে মানুষের সঙ্গে।

–বিশ্বাস করুন, আমি কোলে নিয়ে অনেকবার তার গায়ের গন্ধ নিয়েছি। চোখ দেখেছি, হাত-পা, ঘুমাবার ধরন, খাওয়া কিছুতেই আমার সঙ্গে মিল নেই।

এবার আমার হো হো করে হাসার পালা। একটু ব্যঙ্গ করেই বললাম, একটা শিশু আপনি তার গায়ের গন্ধ শুঁকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। আশ্চর্য, নিজে একটা সন্দেহ ভুলতে সাকুরায় এসে বসে থাকেন বলে ভাবেন বাচ্চার গায়েও সাকুরার গন্ধ পাবেন? ভদ্রলোক বেশ মর্মাহত হয়েছেন আমার কথায়। তার দৃষ্টি বলে দিচ্ছে, মনে মনে ভাবছেন একজন ভুল মানুষের কাছে তিনি তার গোপন অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে মানুষটা স্বাভাবিক না। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সাকুরায় এসে বসে থাকার আগে আপনি কি রোজ বাড়ি ফিরে টিভিতে সিরিয়াল দেখতেন? এসব বেশ ইফেক্ট করে মানুষের মনে।

–না কখনোই তা নয়। আমি যে দায়িত্বে কাজ করি, সেখানে সিরিয়াল দেখার মতো বালখিল্য মনোভাব নিয়ে কাজ করা যায় না। আসলে আমার স্ত্রীর একটা আচরণ সন্দেহটা প্রবল করেছে। সে মেয়েটাকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। ধরুন রাতে ও হঠাৎ বলল বাবার কাছে ঘুমাবে। ওর মা কোনোভাবেই সেটা হতে দেবেন না। এমনকি আপনি বিশ্বাস করবেন না কখনও আমার সঙ্গে মেয়েটাকে একা বের হতে দিতে চায় না।

–অদ্ভুত সমস্যা তো, তবে এটা মায়েদের অতিরিক্ত কনশাসনেস থেকে হতে পারে। আপনি হয়তো ঠিক তাকে যত্ন করতে পারবেন না এমন আশঙ্কা থেকে করতে পারেন। শুনুন আপনাকে দুটো গল্প বলি। একটা স্টোরি টেলারের কাছ থেকে শোনা, অন্যটা সত্যি। এক লোক পশুপাখি পালতে পছন্দ করে। একদিন বিশাল একটা সাপ কিনে নিয়ে এলেন বাড়িতে। তার একটি মেয়ে আর স্ত্রী নিয়ে থাকেন বাড়িতে। ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিলেন, আপনি আমাকে নিয়ে গল্প বানাচ্ছেন?

–না প্রথমেই বলেছি গল্পটা আমার শোনা। আপনি শুনতে না চাইলে বলব না।

–বলুন

–তো সেই লোক সাপ নিয়ে আসার পর তার স্ত্রী খুব নাখোশ। কিন্তু তিনি সাপ পুষবেনই। একদিন তারা বাড়িতে ছিল না। সাপটার খিদে পেলে ভদ্রলোকের কুকুরটা খেয়ে ফেলল। সাপটার একটা অভ্যাস ছিল, সে কোনো কিছু খাওয়ার আগে সেই জিনিসের পাশে যেয়ে তার মাপ নিত। তা কুকুরটা খেয়ে ফেলা দেখে ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব ভয় পেলেন। সে কান্নাকাটি করে

অনুরোধ করল সাপ মেরে ফেলতে। লোকটা কথা শুনল না। একটা আস্ত কুকুর খেয়ে দিন কতক সাপ পড়ে রইল ঝিম ধরে। সবাই ভাবল যাক বাবা হয়তো বুঝেছে সে অন্যায় করেছে। এরপর আরেকদিন ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। প্রায় মাস খানেক হয়েছে কুকুরটা সে হজম করেছে। একদিন ভদ্রলোকের স্ত্রী পাশের রুমে ছিলেন হঠাৎ গোঙানোর মতো একটা শব্দ পেলেন এবং ছুটে এসে যা দেখলেন তা ভয়াবহ। সাপের মুখের ভেতর থেকে মেয়ের পায়ের জুতো জোড়া দেখা যাচ্ছে। মহিলা অজ্ঞান হলেন এবং জ্ঞান ফিরলে মানসিক ভারসাম্য হারালেন। সাপ নিয়ে কিছু বলার শক্তিও হারিয়ে ফেললেন। এরপর অনেক দিন চলে গেল। মহিলা একটু একটু সুস্থ হয়েছেন। একদিন রান্না করছিলেন, ছুটির দিন। স্বামী প্রবর বাড়িতেই। মহিলার কী মনে হতে হঠাৎ বেডরুমে এলেন। দেখলেন বিছানায় লোকটি ঘুমাচ্ছে আর তার পাশে সাপটি শুয়ে লোকটিকে মাপছে। মহিলা সামান্য মুচকি হেসে সেখান থেকে সরে গেলেন।

গল্প শুনে আমার শ্রোতার দৃষ্টি বদলে গেছে। সম্ভবত তিনিও কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিলেন তারপর বললেন, এটা সত্যি?

–আগেই বলেছি স্টোরি টেলারের কাছ থেকে শোনা।

–দ্বিতীয় গল্পটা?

–এটা আমার এক কাজিনের ঘটনা। শীতের মধ্যে একদিন ভোররাতে ও উঠেছে স্বামী অফিস যাওয়ার আগে নাশতা বানাতে। ওর ছেলেটা বাবার পাশে ঘুমানো ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পর কাজ শেষ করে বেডরুমে এসে দেখে বাচ্চাটা খাটে নেই, কিন্তু স্বামী প্রবর নাক ডাকছেন। বাচ্চা খুঁজে পাওয়া গেল খাটের নিচে। সে মাত্র গড়াতে শিখেছে। মা খাটের একপাশ থেকে উঠে গিয়েছে সেই জায়গা দিয়ে গড়িয়ে সে খাট থেকে মেঝেতে পড়েছে, কার্পেট ছিল বলে তেমন শব্দও হয়নি, বাচ্চাটাও ব্যথা পায়নি। কিন্তু সে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচে চলে গেছে এবং আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক শীত ছিল, প্রায় ঘণ্টা খানেক ওভাবে থেকে বাচ্চা নীল হয়ে গেছে জমে। তারপর যা হয় নিউমোনিয়া, বাচ্চাটাকে বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনার পর আমার সেই কাজিন আর স্বামীর সঙ্গে থাকে না।

–আপনার মিথ্যে ও সত্যি দুটো ঘটনাই অদ্ভুত।

–কিছুটা অদ্ভুত হয়তো, কিন্তু এই যে আপনার মনে হচ্ছে আপনার সন্তান আপনার না অথচ এর কোনো কারণ নেই এই ভাবনাটাও তো কম অদ্ভুত না। আসলে আপনাকে বলতে চেয়েছি, সন্তানের বিষয়ে মায়েদের সব সময় এক ধরনের ইনসিকিউরিটি কাজ করে হয়তো তা থেকে আপনার স্ত্রী এমন কিছু আচরণ করেন যা স্বাভাবিক না। সে কারণেই আপনার মনে সন্দেহ জন্মেছে।

–আচ্ছা আপনার কথা সব মানলাম। কিন্তু বলুন তো মেয়ের সঙ্গে আমার কোথাও কোনো মিল নেই কেন?

–লোকটার মধ্যে রিপিটেশন সিনড্রোম প্রবল। হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, আপনার যদি নাও হয় এখন আর কী করা যাবে বলুন?

–কিছু করার নেই। আমি এই বাচ্চাটাকে খুব ভালোবাসি।

–আপনার মধ্যে আসলে প্রবল স্ববিরোধিতা কাজ করছে এ বিষয়ে।

–হয়তো আপনি ঠিক। কিন্তু আজ মনটা ভালো নেই। মেয়েটার জ্বর বেড়েছে। ও ঈদ করতে দাদাবাড়ি যেতে চায়। ওর মা রাজি না। আরেকটা কথা জানেন? যেদিন থেকে মনে হচ্ছে মেয়েটা আমার না তখন থেকেই ওর একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে।

যদিও এসব অর্থহীন কথা তবুও আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। কারণ এসব কষ্টের কোনো সমাধান লেখকরা দিতে পারেন না। তবে না দেখা মেয়েটার জন্য মায়াও হলো, বড়জোর গল্পটা লিখতে পারি। তাতে কিছু ডালপালা বানাতে হবে, মেয়েটার বয়স বাড়াতে হবে। ভদ্রলোকের স্ত্রীর চরিত্রটা স্পষ্ট করতে হবে। গল্পের নাম দেওয়া যেতে পারে 'সংশয়'। ভদ্রলোককে হালকা করতে বললাম, আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, আপনার স্ত্রী আসলে এবার ছুটিতে তার বাবার বাড়ি যেতে চাইছে। এনিওয়ে আপনাদের একই শহরে বাড়ি?

– না আমার যশোর, ওর রাজশাহী।

–কিছু মনে করবেন না, আমাকে কেন আপনার সংশয়ের কথাটা বললেন?

–আসলে আপনি লেখেন কিনা! লেখকরা সংবেদনশীল হয়, আমার মনে হলো কেউ লিখলে আমি একটু স্বস্তি পাবো। আরও একটা কথা, এমন ব্যক্তিগত অনুভূতি বলতে একটা বিষয় হয়তো আমাকে আরও এগিয়ে দিয়েছে।

–কি সেটা? আমি ভালো শ্রোতা?

–তা হয়তো আপনি আছেন তবে আপনার সঙ্গে আমার মেয়ের চেহারার অদ্ভুত মিল রয়েছে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে এই পর্বের আমার এখানেই শেষ। এরপর আর সাকুরায় যাওয়া হয়নি গত তিন মাসে। ইচ্ছা করেই যাইনি। তিনি আমাকে খুঁজতে বনানী পর্যন্ত চলে এসেছেন দেখে বিস্মিত হইনি তা নয়। তবে তা চেপে গিয়েই কথা শুরু করলাম।

–আপনি কি শুধু গল্পের শেষটা বলবেন বলেই আমাকে খুঁজছিলেন?

–ধরুন তাই

–এখন বলবেন?

–সে জন্যই এসেছি

–ধরুন মেয়েটার বাবা এমন সন্দেহ থেকে গোপনে খোঁজ-খবর নিয়ে সত্যিটা আবিষ্কার করলেন। এবং জানলেন যে তার স্ত্রীর একজন প্রেমিক ছিল বটে বিয়ের আগে।

আমি ভদ্রলোকের কথা শুনছি।

ছেলেটার বিয়ে করার পরিস্থিতি নেই এবং এই বাস্তবতা দু'জনই ভালো জানেন। কিন্তু ইমোশনটা অনেস্ট ছিল। ফলে বিয়ের খবরটা যখন মেয়েটা জানাল, দু'জনই প্রচণ্ড ইমোশনাল হলো এবং মুহূর্তে তাদের সেই আবেগ বাঁধ ভাঙল, ফলাফল মেয়েটা। কিন্তু ভদ্র মহিলা নিজেও বুঝতে পারেননি আসলে মেয়েটা কার সন্তান। যত বড় হতে থাকল, ততো তার চেহারা স্পষ্ট হচ্ছে আর সে জন্যই তার ভয়। সেই ভদ্রলোক বিষয়টা ধরে ফেললেন এবং পানশালায় এসে আপনার মতো এক লেখককে পেয়ে গল্পটা করলেন।

আমার নিঃশ্বাস আটকে আসছিল ভদ্রলোকের কথায়। তবু খুব শক্ত থাকার চেষ্টা করছি। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর এনে বললাম, তাহলে আপনি জেনেছেন যে, আপনার স্ত্রীর একটা ভুলের কারণে এমন হয়েছে? এটুকুই লিখতে হবে গল্পের শেষে তাই তো?

না, আমার কথা শেষ হয়নি। আপনাকে বলেছিলাম কেন আপনাকে এত ব্যক্তিগত অনুভূতি শেয়ার করলাম।

–মনে পড়ছে না, লেখক বলে?

–না বলেছিলাম আপনার সঙ্গে আমার মেয়ের চেহারার মিল আছে।

–আমি নিঃশ্বাস চেপে বসে আছি।

– আমার মেয়ের জ্বর বলেছিলাম।

–হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

–আমার মেয়েটা নেই।

–বুঝতে পারছি না কী বলছেন?

–যদিও বায়োলজিক্যাল বাবা নই, তবুও যেহেতু সে বাবা ডাকত, বিশ্বাস করি আমিই আসল বাবা। আচ্ছা গল্পের শেষটুকু লিখতে পারবেন তো নাকি আমার মৃত মেয়ের জন্য আপনারও কষ্ট হবে?

–উঠে যাবো কিনা ভাবছি। কিন্তু পা মনে হচ্ছে মাটিতে গেঁথে আছে। কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে, যাওয়ারও জায়গা নেই। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু প্রায় ছয় বছর হলো রাজশাহী যাই না আমি। ভদ্রলোকের গল্পটা লেখা হলো না আমার। ❖

অলঙ্করণ : : সৈয়দ ইকবাল

মোহিত কামাল

জেনেটিক বাঁধন বনাম সামাজিক বাঁধন



গল্প

'আপনি আমার আসল বাবা নন?'

'না, স্টেপ ফাদার।'

'কী বলছেন এসব?'

'সত্যি বলছি। তোমার বাবা ছিলেন মদ্যপ। রাতে মদ খেয়ে এসে প্রায় পেটাত তোমার মাকে। বছরখানেক মুখ বুজে সে সহ্য করেছে ওই নৃশংসতা। তারপর তোমাকে নিয়ে ওঠে তোমার নানার বাড়িতে। ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেয়। তখন তোমার বয়স দেড় বছর। আর তোমার দুই বছর বয়সে আমি বিয়ে করি তোমার মাকে। তোমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করি।'

আকাশ থেকে সূর্যটা যেন দুম করে আছড়ে পড়ল নিচে। লোকটা তার আসল বাবা নয়, উনিশ বছর বয়সেও টের পায়নি সে। মা কথাটা তাকে বলে যাননি। মায়ের মৃত্যুর ছয় মাস পর লোকটি বিপজ্জনক কথাটি বলে স্তব্ধ করে দিল মেঘাকে।

এ সময় দুই যমজ পিচ্চি, রোদ ও বৃষ্টি; মেঘার এক ভাই, এক বোন দু'দিক থেকে দু'হাতের আঙুল ধরে টানতে লাগল মেঘাকে। হতবিহ্বল বড় বোনের সাড়া না পেয়ে তারা আবার ছুটে গেল তাদের ঘরে। ওদের তিনজনকে রেখে আচমকা হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন মা। দুই পিচ্চিকে মায়ের আদর দিয়েই আগলে রেখেছিল মেঘা। এ সময় আকাশ ফাটানো কথায় বোম ফাটালেন বাবা! বিশ্বাস করতে পারছে না সে। আবার বিশ্বাস তো করতেই হবে। আসল বাবা ফান করেও কখনও এমন কথা বলার কথা নয়। লোকটাও মাকে কষ্ট দিয়েছে, নিজের চোখে দেখেছে মায়ের ওপর তার নির্দয় আচরণ। স্বামী-স্ত্রীর বোঝাপড়ার ঘাটতি আছে ভেবে দু'জনকেই সামলাতো মেঘা। তখনও মনে হয়নি, মনে হতো না লোকটার মধ্যে বড় ধরনের খারাপ বৈশিষ্ট্য আছে। মেয়ের চোখে বাবাকে দেখত বলে কখনও তার অশুভ আচরণকে ভয়াবহ মনে হয়নি। এ মুহূর্তে লোকটির কথা শোনার পর আকাশ ঝেপে যেন মেঘ নেমে এলো বাড়ির ওপর। জানালা গলে ঢুকছে মেঘ, কেবলই ঘরে নয়, অন্তরলোকেও।

ছোট ভাই রোদ হঠাৎ পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে মেঘার হাত টান দিয়ে বলল, 'আপু আসো। আমার পুতুলটা দেখো। বৃষ্টি ভেঙে ফেলেছে পুতুলের নাক।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোট বোন বৃষ্টিও এসে জবাব দিল, 'না আমি ভাঙিনি, ভেঙে গেছে। এমনি এমনি।'

ভাই-বোনের দিকে ফিরে তাকাল মেঘা। ওদের মুখের দিকে দেখার মতো করে দেখল। ওদের অর্ধেক বোন আমি। বাকি অর্ধেকটা অন্যজনের; মা একই, বাবা আলাদা– ভাবতে গিয়ে জমে যেতে লাগল সে।

রোদ জড়িয়ে ধরল মেঘাকে। তার শরীর বেয়ে উপরে উঠতে চাইল। আর দাবি করল, 'বৃষ্টিকে বকে দাও।'

রোদের আবদারে মায়ার ঢেউ এলো মনে। আর তখনই আকাশের মেঘের আড়াল থেকে জোছনাঢাকা চাঁদ জেগে উঠল। মায়াময় এ চাঁদের আলোয় ধুয়ে যেতে লাগল হঠাৎ ঝলসে ওঠা বিস্ময়ের মেঘ। তবুও তাকাল লোকটির দিকে। কঠিন কণ্ঠে হঠাৎ মেঘা প্রশ্ন করল, 'এতদিন পর হঠাৎ এরকম ভয়াবহ ঝড়ো খবরটা কেন দিলেন আমাকে?'

লোকটি জবাব দিল না। মাথা নুইয়ে মেঘার সামনে থেকে সরে যেতে চাইল।

চিৎকার করে মেঘা আচমকা লোকটির শার্টের কলার খামছে ধরে আবার প্রশ্ন করল, 'কেন লুকিয়ে রেখেছিলেন ভয়ঙ্কর কথা? এখনইবা আমাকে জানানোর প্রয়োজন হলো কেন?'

লোকটি দাঁড়িয়ে গেল। কলার ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য জোর করল না। অপরাধীর মতোই দাঁড়িয়ে রইল।

মেঘা কলার ছাড়ল না। আরও কয়েকবার জোরে টান দিয়ে ধাক্কা মেরে একই প্রশ্ন করল, 'কেন এমন সত্য তুলে ধরলেন? লুকিয়ে রাখলে কী হতো?'

এবার লোকটি মুখ খুলল, 'কিছু সত্য লুকিয়ে রাখা যায় না। কোনো না কোনো সময় তা বেরিয়ে আসত। যদিও তোমার মায়ের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কখনও তোমার কাছে এ সত্য ফাঁস করব না। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না। আমি দুঃখিত। কারণ আমি না জানালেও তোমার নানাবাড়ি থেকে জানিয়ে দেওয়া হতো। যদিও তোমার দাদাবাড়ির কেউ তোমার খোঁজ রাখেনি।'

আরেকবার যেন মাথার ওপরে আকাশটা ভেঙে পড়ল। গরম আর বুনো বাতাসের ঝড় ছুটে এসে আটকে দিতে চাইল শ্বাস। আপন নাড়িতে টান খেল সে। অন্তঃস্থল থেকে দাপিয়ে বেরোল সমুদ্রের গর্জন, 'আমার আসল বাবাকে আমি দেখতে চাই। তার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।'

বড় বোনের গর্জন শুনে হাত ছেড়ে দিল রোদ, বৃষ্টিও। দু'জনই একছুটে পালিয়ে ঢুকে গেল পাশের ঘরে; খাটের ওপরে উঠে ভয়ার্ত শিশুদ্বয় মুখ লুকালো বালিশে। তারপর একসঙ্গে কেঁদে উঠল দুই শিশু।

ওদের কান্না থামিয়ে দিল মেঘার মেঘ-গর্জন। লোকটার সামনে থেকে ছুটে গেল পাশের রুমে। খাটে উঠে ওদের জড়িয়ে ধরল। তারপর হুহু করে কাঁদতে লাগল সেও।

মেঘার কান্নার শব্দে থেমে গেছে রোদ আর বৃষ্টির কান্না। যমজ ভাই-বোন এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল মেঘার বুকে। বুকের আকাশে জমে ওঠা ভারি মেঘের ভেতর থেকে মায়ার বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। নিজেকে আর ওই দুটোর বোন বলে মনে হলো না মেঘার, মনে হলো ওদের মা-ই সে। স্নেহ-মমতায় ওদের বড় করে তুলতে হবে। এই প্রতিজ্ঞায় ঋদ্ধ হয়ে কান্না থামিয়ে দুটোকে দুই কোলে নিয়ে ঢুকলো বাথরুমে। ওদের গোসলের সময় হয়ে গেছে। গোসল করিয়ে খাওয়াতে হবে। এ দায়িত্ব এখন তার। আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাবাসত্তার টান মোটেই ভুলতে পারল না। তবু ভাই-বোনের মমতার ছলে, শুদ্ধতার জলে নিজেকে ধুয়ে নিয়ে দু'জনকে একসঙ্গে গোসল করিয়ে, শুকনো টাওয়াল জড়িয়ে দু'জনকেই বসিয়ে দিল খাটে। নতুন কাপড় পরিয়ে বলল, 'এবার খেতে হবে, এসো।'

রোদ বলল, 'নিজে খাব না। তুমি খাওয়াও।'

বৃষ্টি বলল, 'আমি নিজে খাব।'

সঙ্গে সঙ্গে রোদ একটা ঘুষি চালিয়ে দিল বৃষ্টির দিকে।

ক্ষিপ্র হাতে মেঘ ধরে ফেলল রোদের হাত। তারপর কঠিন স্বরে বলল, 'এখন থেকে নিজে নিজে খাওয়ার অভ্যেস করতে হবে দু'জনকেই।'

॥ দুই ॥

ঘরের কাজের উছিলায় নিজেকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতে লাগল মেঘা। ঘরের লোকটাকে বাবা ডাকত সে। এখন ওই শব্দটা আচমকা বুকের কন্দরে আটকে গেছে। কেউ যেন সিন্দুকের ভারি ঢাকনা লাগিয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। 'লোকটা গেল কোথায়' এমনি চিন্তা এখন মাথায় উদয় হলেও, বাবা গেল কোথায় এটা মনে হলো না। বাবা-আসন থেকে আকস্মিক ছিটকে পড়েছেন লোকটা। তবুও বুঝল মনের টান কমেনি, ঘৃণাও জাগেনি; শ্রদ্ধার আসনটাও টলেনি। শুদ্ধতম সত্যের শেকড়ে বাবা-সন্ধানী অনুসন্ধিৎসা জেগে বসলেও, গেল কয়েকদিন ধরে লোকটার রহস্যময় ভূমিকার জন্য বিভ্রান্ত হতে লাগল মেঘা। একবারের জন্যও তিনি মুখোমুখি হননি মেঘার। অথচ ঘরের কোনো কিছুর অভাব রাখছেন না। বাজারের প্রতিও রয়েছে ওনার সতর্কতা। মরা কোনো মাছ বাজার থেকে আসুক পছন্দ নয় মেঘার। তাজা মাছ, লাফানো বা মুখ হাঁ-বন্ধ করে এমন মাছই আসছে বাজার থেকে। দুই ভাই-বোনের প্রয়োজনীয় খাবার-দাবারেরও ঘাটতি হচ্ছে না। লোকটা কি তবে বদলে গেছেন? মা বেঁচে থাকতে তো এমন ঘরমুখী ছিলেন না তিনি, এখন বেশ ঘরমুখো হয়েছেন, বোঝার বাকি রইল না। সত্য ফাঁস করে দেওয়ার পরও তাই লোকটাকে আর দোষ দিতে পারছে না মেঘা, মায়ের সঙ্গে ওনার সম্পর্ক যতই জটিল থাকুক না কেন বাবা হিসেবে বন্ধুর মতোই ভাবত সে। বন্ধু ভেবে নিজের নানা কথা শেয়ারও করত। মনোযোগ দিয়ে কথা শুনতেন, ভালো পরামর্শ দিতেন তিনি। ওনার এ গুণটি বেশ মনে পড়ছে এখন। তবুও সচল মনের নীরব কোনা থেকে ওনার সাথে দেখা করার ডাক আসছে না কী এক অবোধ্য তৃষ্ণায় ক্রমাগতভাবে কাতর হয়ে যাচ্ছে মন, বুঝতেও পারছে না মেঘা। ঘরের নানা আয়োজনের আড়ালে কী সত্য আর কী

মিথ্যে থাকতে পারে– এমন জিজ্ঞাসা ভেতর থেকে একবার তেড়ে এসেছিল। এখন আর তাড়া নেই।

বয়স্কা বুয়া মেঘার ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল, 'সাহেব বাইরে যাওন লাগছে, আপনার কি কিছু লাগব? জিগাইছেন।'

প্রশ্ন শুনে ধূপের ধোঁয়ার মতো আকস্মিক ধোঁয়াশা হয়ে গেল চারপাশ। মশা-মাছি না থাকলেও অসংখ্য উড়াল কীটপতঙ্গ উড়তে শুরু করল যেন মাথায়। উৎকট জ্বালাতন থেকে বাঁচার জন্য ঘরের জানালা খুলে দিয়ে বড় করে শ্বাস নিল সে। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিল, 'কিছু লাগবে না। বলে দিন।'

বুয়া চলে যাওয়ার পরে মেঘা ভাবতে বসল, লোকটার সঙ্গে এমন আচরণ করা কি ঠিক হচ্ছে?
উত্তর খুঁজে পেল না। রোদ আর বৃষ্টির কাছে ফিরে এসে ভুলে যেতে চাইল ভেতর থেকে ফুঁসে ওঠা প্রশ্নের তেজ। ভুলতে পারল না। বরং নিউরনের অরণ্যে ঝড় বইতে শুরু করল। আরও আরও সব প্রশ্ন, লোকটার উদ্দেশ্য কী? গোপনীয়, কথার এটম বোমার বিস্ফোরণের পর এমন বদলে গেলেন কেন? বদলানোর আড়ালে কি লুকিয়ে আছে নতুন কোনো মতলব? দুই ভাই-বোন নিয়ে কী করবে সে? তাকে কি ঘর ছেড়ে যেতে বলছেন আকার-ইঙ্গিতে? আবার বিয়ে করে নতুন বউ আনবেন না তো ঘরে?

॥ তিন ॥

মধ্যরাতের পর ঘুম ভেঙে গেল মেঘার। ভাই-বোন দুটি তাকে দু'পাশ থেকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। তাই উঠতে চাইলেও উঠতে পারল না। ঘুমের ঘোরে কেবল দুঃস্বপ্ন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল– একটা কালো ভাল্লুক ছুটে আসছিল তার দিকে। ছুটে পালাতে চাচ্ছিল মেঘা। পা নড়ছিল না। পায়ের শক্তি যেন চুম্বক দিয়ে টেনে কেউ বের করে নিঃশেষ করে দিয়ে গেছে। ভাল্লুক লাফিয়ে পড়েছিল তার দেহের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম উধাও হয়ে গেছে। আশ্চর্যজনকভাবে দপদপ শব্দ তুলে বুক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এখনও। গলা শুকিয়ে গেছে। শুষ্ক ঠোঁট ভেজাতে চাইল জিব বের করে। পারল না। উপরের তালুর সঙ্গে সেঁটে আছে শুকনো জিহ্বা। ওঠা দরকার। ওয়াশরুমে যাওয়া দরকার। তার দেহের সঙ্গে জড়ানো রোদ আর বৃষ্টির ঘুম না ভাঙিয়ে কীভাবে ওঠা যায় তার পরিকল্পনা করছিল সে।

আচমকা তার দেহ থেকে সরে গেল বৃষ্টির তুলে দেওয়া পা, হাতও সরে গেল। শরীরটা মোচড় দিয়ে বৃষ্টি শুলো বাঁ-কাত হয়ে। বৃষ্টির সরে যাওয়ায় সুবিধা হলো মেঘার। আলতো করে সে নামিয়ে দিল রোদের পা। হাতটাও সরিয়ে নিজের দেহটা আলগা করে ধীরে ধীরে উঠে বসল এবার। বাইরের বারান্দার আলো ঘরে ঢুকছে। ভাই-বোন দু'জনকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নরম হাত, নরম পা দিয়ে ওরা কি কেবল অক্টোপাসের মতো জড়িয়েছিল, ঘুমিয়েছিল নিজ দেহের সঙ্গে?

না, নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই না-বোধক মাথা ঝাঁকালো। গায়ে জড়ানো অদৃশ্য মায়াজালটাও দেখতে পেল মেঘা। মমতার সুতোয় জড়িয়ে গেছে বড় বোনের মন। মমতাময়ী মায়ের মতো মায়ার চোখে সে এখন দেখছে ছোট্ট ভাই-বোন দু'জনকে। ওয়াশরুমের কাজ সেরে এক গ্লাস পানি পান করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক অপরূপ দৃশ্য দেখে বিমূঢ় হয়ে রইল মেঘা : নিঃসীম আকাশে রাতের পর্দা ক্রমেই নীলাভ হয়ে যাচ্ছে। আকাশের গাঢ় চাঁদও নীলাভ চাদরে জড়িয়ে নিয়েছে গা। চাঁদের শরীর ছুঁয়ে ক্রমাগতভাবে নেমে আসছে নীলাভ চাঁদনি; অন্ধকার ফুঁড়ে ধেয়ে আসছে নিজের দিকে।

আকস্মিক কাঁধে হাতের হালকা স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠে মেঘা ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল লোকটাকে। চমকে উঠলেও শীতল হয়ে গেল তার দেহ। ঘুরে আবারও তাকাল সে আকাশের আঁধারপানে। নীল ফুঁড়েও আকাশে দেখল ভাসমান মেঘের উড়াল স্রোত। ওই মেঘ কি কেবলই বৃষ্টি ঝরাবে? নাকি মেঘের ওপরে ভর করেও উড়ে বেড়াচ্ছে লক্ষকোটি দূষিত জীবাণু? চারপাশ কি ভরে যাবে ছিটানো জীবাণুতে?

ছোটবেলা থেকে যাকে বাবা হিসেবে জেনেছে, আচমকা বাবাসত্তা খোয়ানো লোকটার হাতেও কি রয়েছে জীবাণু? দূষিত কি হয়ে যাবে সামনের দিনগুলো? দুটো প্রশ্ন একসঙ্গে উড়ে এলো মাথায়। প্রশ্ন দুটো ভেতরে ঠেসে দিয়ে মুখ ফুটে প্রশ্ন করল, 'আর কী বলবেন? আরও কোনো রাসায়নিক বোমা কি লুকিয়ে রেখেছেন? ছুড়তে চান এখনি?'

ঠাণ্ডা স্বরের নিয়ন্ত্রিত প্রশ্নের ওজনে দমে গেলেন তিনি। কী উত্তর দেবেন, না বুঝে গুটিয়ে গেলেন কেঁচোর মতো। ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মেঘা আবার প্রশ্ন করল, 'যা বলতে এসেছেন বলে যান। আপনার জীবাণু বোমার আক্রমণও মোকাবিলা করার শক্তি আছে আমার।'

কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ালেন তিনি। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। বারান্দা থেকে সরে যাচ্ছিলেন।

মেঘাই আবার প্রশ্ন করল, 'বিয়ে করতে চান আরেকবার? পথের কাঁটা হিসেবে সরিয়ে দিতে চান আমাকে? এ জন্যই কি ১৮ বছরের গোপন সিন্দুকের তালা খুলে দিয়েছেন?'

প্রতিটি শব্দ তীরের মতো এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। তিনি যেন সহজেই মাথা সরিয়ে শব্দতীর থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। মেঘার মনে হলো, আক্রান্ত হয়নি বেহায়া লোকটা। স্পষ্ট সে দেখল, শব্দবাণের নির্মল আলোয় লোকটা ধুয়ে নিয়েছে নিজের শরীর। চকচকে চোখ মেলে এবার বলল, 'হ্যাঁ বিয়ে করা উচিত আমার। বিয়াল্লিশ বছরে বউ ছেড়ে গেছে। বিয়ে না করলে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যেতে পারে এ বয়সের যে কোনো পুরুষ। এটাই বাস্তবতা। এটাই জৈবিক চাহিদার সত্য দিক।'

উত্তর শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল মেঘা। মনে হলো জীবাণুবোমা নয়, অন্য কোনো মহাশক্তিশালী শব্দতরঙ্গ কেড়ে নিয়েছে তার মুখের ভাষা। ইথারে ভাসমান শব্দরা চৌচির হয়ে ভেঙে গিয়ে সশব্দে আক্রমণ করছে কানের পর্দা। কানের ভেতর থেকে যেন ভেসে আসছে জৈববোমার হাজারো মনবারুদের বিস্ফোরণের আওয়াজ। লক্ষকোটি চিকন গর্জন একত্রে মিলেমিশে ভিন্ন ধরনের আওয়াজ ঠেসে ঢুকিয়ে দিচ্ছে কর্ণকুহরে। তবে মস্তিষ্ক তাল হারায়নি। একবার মাত্র ভাবনার উদয় ঘটল– কেবলমাত্র বিয়ে করার জন্য, জৈবিক চাহিদা মেটানোর নৈতিকপথ তৈরি করে নেওয়ার জন্য মিথ্যা বলে সন্তানকে কি কেউ তাড়িয়ে দিতে পারেন?

না!, নিশ্চয় আরও কোনো বড় সত্য আছে লুকিয়ে এ বিস্ফোরণের আড়ালে। কী সে সত্য? আসলেই কি নিজের বাবাই তিনি? সৎকন্যার ধোঁয়াশা তুলে কি আপন কন্যাকে বিতাড়িত করে জৈবিক পথের দিকেই হাঁটছেন তিনি? না! প্রশ্নটি যুতসই হচ্ছে না। সৎকন্যা/আসল কন্যার মীমাংসা করে দিতে পারেন নানি। তিনি তো এখনও বেঁচে আছেন। এমন একটা অকাট্য প্রমাণ সামনে রেখে লোকটা মিথ্যা বলার সাহস পেত না। মেঘা নিজের শেকড়ে টান খেল নতুন ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে। শরীরের মধ্যে প্রবহমান শিরার গলি-উপগলিতে ছুটন্ত রক্তকণিকাগুলো শোরগোল তুলে পিতৃত্বের টানকে মহিমান্বিত করতে চাইছে। সম্ভবত কণিকারা অবরুদ্ধ যাতনা থেকে মুক্তি চায়; সম্ভবত মুক্তির স্লোগান তুলে ছুটছে আপন তালে।

মুক্তির ঢেউ শব্দ-তরঙ্গরূপে বেরিয়ে এলো ঠোঁট বেয়ে. 'কখনও তো মনে হয়নি আপনি বাবা নন. স্নেহ-মমতার তো কোনো ঘাটতি দেখিনি. মৌলিক বাবার অভাব তো মোটেই বুঝতে দেননি। জৈবিক টানের কাছে কি পরাজিত হয়ে গেল সেই পিতৃত্বের টান? হোক আপনি আসল বাবা নন. তবুও তো বাবারূপেই বড় করে তুলেছেন আমাকে। খাদ তো দেখিনি।'

"হ্যাঁ. ঠিকই বলেছ। মমতার কোনো কমতি দেখোনি তুমি। তবে তুমি আমার 'ক্রোমোজমের এক্সটেনশন' নও. তোমার মধ্যে আমার সত্তা নেই. আমার রক্ত তোমার রক্তে বহমান নয়। জেনেটিক বাঁধন আর সামাজিক বাঁধন এক নয়। সামাজিক বাঁধনেও মায়া তৈরি হয়। সে মায়ায় কমতি রাখিনি আমি। এখন বাস্তবতার কাছে পরাজিত আমি। বিয়ে করা দরকার আমার। তোমার অনুমতির প্রয়োজন।"

বিশুদ্ধ বিষাদে শ্বাস আটকে গেল মেঘার। লোকটার আর দোষ দিতে পারছে না। সে। যা বলার স্পষ্টই বলে ফেলেছেন তিনি। এমন পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিতে হবে জানা নেই। নির্বাক তাকিয়ে রইল সে শূন্য চোখ মেলে।

লোকটি চলে যেতে উদ্যত হলে স্তব্ধতার অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। ঠাণ্ডা স্বরে মেঘা বলল. 'আমি তো আপনার রক্ত নই। আমার অনুমতির প্রয়োজন কী? বিয়ে করবেন কি করবেন না সেটা আপনারই ইচ্ছে। তবে আপনার বিয়ের পর রোদ আর বৃষ্টিকে নিয়ে আমি আমার নানির বাড়িতে গিয়ে উঠব. বলে রাখলাম।'

'তা কেন হতে দেব আমি? রোদ. বৃষ্টির বাবা আমি– বৈধ অভিভাবক। তোমার বৈধ অভিভাবক নই আমি। ওরা আমার কাছে থাকবে। তুমিও ইচ্ছে করলে থাকতে পার। আমি খুশি হবো।'

'কী বলে লোকটা! বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। আমি কি ওদের কেউ নই? আমার মায়ের রক্ত রয়েছে ওদের দেহে. মমতায় টান তো নয় শুধু! ওদের সঙ্গে ক্রোমোজমের আধেক বন্ধনও রয়েছে আমার। ওদেরকে কি আমি নিয়ে যেতে পারব না?'

'নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ওদের নিয়েই থাকো তুমি। চাই আমি।'

'আরেক মহিলাকে ঘরে তুলে আনলে আমার মতো পরগাছাকে কি সইতে পারবেন তিনি? সৎকন্যাদেরই সইতে পারেন না সৎমারা। আমার স্থান কোথায়? আমার মায়ের আসনেও অন্য কাউকে সইতে পারব না আমি।'

'অন্য কাউকে সইবার প্রয়োজন নেই। তোমাকে তুমি সইতে পারলেই সব কূল রক্ষা হবে। রোদ. বৃষ্টির বড় হওয়ার পথ ঝামেলামুক্ত থাকবে. মায়াময় থাকবে।'

কথাটার অর্থ-ইশারা কিছুই বুঝতে পারল না মেঘা। মাথার ভেতরে কেবলই ঘুরপাক খেতে লাগল লোকটার বলা-কথা– তুমি আমার 'ক্রোমোজমের এক্সটেনশন' নও. তোমার মধ্যে আমার সত্তা নেই. আমার রক্ত তোমার রক্তে বহমান নয়. জেনেটিক বাঁধন আর সামাজিক বাঁধন এক নয়... ভাবতে ভাবতে আচমকা ঘূর্ণি উঠল মেঘার মস্তিষ্কে. বৈশাখের ঝড়ো বাতাসে উড়ে যাওয়া ধূলিকণা. ছেঁড়া কাগজ আর ঝরাপাতার মতো উড়তে লাগল স্মৃতিকণা। লোকটির প্রতি পিতৃত্বের মায়াজাল থেকে সব উড়ে গিয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে তাকে। নিঃশেষিত শূন্যপাক থেকে আকস্মিক সে তাকিয়ে প্রশ্ন করল. 'কথাটার অর্থ কি?'

'অর্থ খুব সোজা।' লোকটি খুব সাহসী হয়ে মেঘার হাত ধরে আরও বলল. 'সমস্যার সমাধানও সোজা। তুমি রাজি হলে তোমাকেই রোদ আর বৃষ্টির মা বানানোর প্রস্তাব দিতে পারি। নতুন কোনো নারী এ ঘরে আসার প্রয়োজন নেই।'

পিতারূপী লোকটা তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে. দু'কানকে বিশ্বাস করাতে পারছে না মেঘা। আপন মস্তিষ্কের চিত্রে সে দেখল. মধ্যসাগরে জলের উল্লাসের মধ্যে খাবি খাচ্ছে একটা ডিঙি নৌকা। সেই নৌকায় মেঘা আবিষ্কার করল নিজেকে. আবিষ্কার করল রোদ আর বৃষ্টিকেও। চেনা লোকটাকে আর মানুষ মনে হচ্ছে না। সত্যিকারের ক্ষুধার্ত হাঙ্গর যেন নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে তার দিকে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে... নৌকাটা ডুবে যাচ্ছে সাগরে. মেঘার মনে হলো তার চেনাজানা পৃথিবীটাও ঢুকে যাচ্ছে দাঁতাল হাঙ্গরের হাঁ-করা বিশাল পেটের ভেতরে... ❖



অলঙ্করণ : : সৈয়দ ইকবাল

আফসার আহমদ

জাদুবাস্তবতার প্রাচ্য রূপ



নিবন্ধ

জাদুবাস্তবতা আজ সারাবিশ্বে নতুন একটি শিল্পমতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে এই মতবাদটির উদ্ভব ঘটেছে প্রথমে চিত্রকলায়; চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে উপন্যাসে এবং ক্ষেত্রবিশেষে চলচ্চিত্র ও নাটকে। কিন্তু এই যে মতবাদটি আধুনিক বিশ্বশিল্পের একটি বিচারিক মতবাদ হিসেবে গণ্য হলো তাতে জীবনকে সমগ্রতায় না দেখে মতাবাদের আড়ালে সংকীর্ণ করা হলো। ল্যাটিন আমেরিকায় এই মতবাদের চূড়ান্ত সাহিত্য রূপায়ণ ঘটলেও এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস তাঁর নিজের সাহিত্যকে এই মতবাদের তকমায় অলঙ্কৃত করতে চাননি। অর্থাৎ তিনি তাঁর সাহিত্যকে কোনো মতবাদের আলোকে নয়, জীবনের সামগ্রিকতায় বিচার করতে চেয়েছেন। জাদুবাস্তববাদ এখন একটি সাহিত্য মতবাদ রূপে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত হলেও এর ইতিহাসগত পর্যালোচনায় আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, শব্দটির স্রষ্টা জার্মান শিল্প-সমালোচক ফ্রানজ রোহ নিজেই শব্দটি নিয়ে সন্দিহাম ছিলেন। চিত্র-সমালোচনা করতে গিয়ে সেই সময়ের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জাদুবাস্তবতার বিষয়টি চিত্রকলায় শনাক্ত করলেন। তার পরও তিনি 'জাদুবাস্তবতা'/'উত্তর-অভিব্যক্তিবাদী' এমত শব্দবন্ধ দিয়ে চিত্র-সমালোচনা করেছিলেন। অর্থাৎ কোন শব্দটি যথাযথ হবে তা নিয়ে তিনি ঘোরতর সংশয়ে ছিলেন। তাই তিনি তাঁর পরবর্তী সময়ের লেখায় আর জাদুবাস্তবতা না বলে 'New Objectivity' উল্লেখ করেছেন। ১৯২৫ সালে ফ্রানজ রোহ উদ্ভাবিত এই জাদুবাস্তবতা ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্যে ব্যাপকভাবে গৃহীত হলে বিশ্বসাহিত্যে তা গুরুত্ববহ হয়ে ওঠে। জাদুবাস্তবতা এই সময়ে পশ্চিমা বিশ্বের উদ্ভাবিত একটি স্বতন্ত্র মতবাদরূপেই বিশ্বসাহিত্যে পরিচিহ্নিত ও নন্দিত। আমি এই নিবন্ধে জাদুবাস্তবতার পশ্চিমা তত্ত্বকে প্রাচ্যের শিল্প-নন্দন ভাবনার আলোকে প্রতিতুলিত করার প্রয়াস পেয়েছি। প্রাচ্যের সুবিপুল সমৃদ্ধ আখ্যানদৃষ্টে আমাদের প্রতীতি জন্মেছে যে, জাদুবাস্তবতার এই বিষয়টি প্রাচ্যীয় সাহিত্যে বহু আগে থেকেই বিদ্যমান। আমরা

দেখেছি যে, প্রাচ্যের বর্ণনামূলক লিখিত কিংবা গেয়-আখ্যানে কিংবা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহে জাদুবাস্তবতার উপাদানসমূহ জীবনের পরিপূর্ণতা ও সমগ্রতায় রূপায়িত হয়েছে, খণ্ডাংশ রূপে নয়। প্রাচ্যের শিল্প সবসময়েই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে এবং সমগ্রতার অংশ বলেই বিবেচনা করে। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে নাটক বা ট্র্যাজেডিকে একটি ঘটনার অনুকরণ মাত্র বলেছেন; কিন্তু ভারতীয় নাট্যদর্শনে তা আরও ব্যাপকভাবে বিধৃত। ভরতমুণির মতে নাটক হচ্ছে লোকবৃত্তের অনুকরণ অর্থাৎ মানবজীবনের অনুকরণ; একই সঙ্গে তা জীবনের ব্যাখ্যাও। এভাবে বিবেচনা করলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্পদর্শনের ভাবনাগত পার্থক্যের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য ব্যতীত, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের এই সমগ্রতার ভেতরে মানবজীবনের সংস্কার, সংস্কৃতি, ধর্ম-অধর্ম, ইতিহাস-অনৈতিহাসিকতা, লৌকিকতা-অলৌকিকতা, স্বপ্ন-কল্পনা, বাস্তবতা-অবাস্তবতা, ফ্যান্টাসি, রাজনীতি অর্থাৎ মানবজীবনের সকল প্রকার আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের একটি সমষ্টিগত রূপ অঙ্গীকৃত। জাদুবাস্তবতায় উক্ত বিষয়গুলো ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই জাদুবাস্তবতার মৌল বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন পশ্চিমাবিশ্ব ও প্রাচ্যের সাহিত্যে ভিন্নভাবে ঘটেছে; আর এ জন্যই প্রাচ্য ও ল্যাটিন আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের জাদুবাস্তবতাবাদী তত্ত্বের দর্শনগত ভেদরেখা থাকাটা স্বাভাবিক। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ইতিহাস চেতনার আড়ালে স্বভূমি ও স্বসমাজের সংস্কৃতির মর্মমূলকে স্পর্শ করার প্রবণতা বিদ্যমান।

জাদুবাস্তবতা এমন একটি শিল্পমতবাদ, যা একেবারেই বাস্তবতার অনুষঙ্গে গড়ে উঠেছে। মানুষের স্বপ্ন-কল্পনা, আধিভৌতিক বিশ্বাস ও বৃহত্তর জনজীবনের সংস্কৃতি মিলেমিশে জীবনের এমন একটি রূপকে জাদুবাস্তবতায় উপস্থাপন করা হয় যা এক কথায় আরেকটি নতুন জগৎ। যে জগৎ বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত; কিন্তু ভিন্ন আরেক বাস্তবতাকে তুলে ধরে। প্রাচ্যের আখ্যানকাব্যে কিংবা গল্পকথনরীতির ভেতর দিয়ে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে বাস্তবের আদলে বাস্তবতার বিভ্রম বা মায়া তৈরি করা হয়েছে; কিন্তু তা বাস্তবতার প্রতিপক্ষ না হয়ে অন্য আরেকটি বাস্তবতার জীবনচিত্র তুলে ধরেছে; এ প্রসঙ্গে আমরা সোমদেব ভট্টের 'কথাসরিৎসাগর' আলোচনায় আনতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সোমদেব ভট্টের 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে যে আখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে আকাশ-পৃথিবী, দেবতা, অপ্সরা-অপ্সরী, মানুষ, গন্ধর্ব-কিন্নর-কিন্নরী, পশুপাখি, লৌকিকতা-অলৌকিকতা, মায়া-বিভ্রম, জাদু-টোনা, তুকতাক, মন্ত্র একাকার হয়ে যে জগৎ তৈরি হয়েছে তাতে তা বাস্তবতার প্রতিপক্ষ নয়, মানুষের ইচ্ছানুরূপ আরেকটি জগৎ হয়ে উঠেছে; আধুনিককালের তাত্ত্বিকগণ জাদুবাস্তবতার যে অন্যতম প্রধান গুণটির কথা বলেছেন তা হলো বর্ণনাধর্মিতা। আমাদের দেশের আখ্যানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বর্ণনাধর্মিতা। বর্ণনার সমৃদ্ধ উদাহরণ প্রাচ্যদেশীয়, বিশেষ করে সংস্কৃত ও বাঙলা আখ্যান কিংবা আসরকেন্দ্রিক গেয়কাব্য। বাঙলা ও সংস্কৃত নাটক, আখ্যান ও গেয়কাব্যে আমরা দেখি জাদুবাস্তবতার এক সর্বোত্তম জগৎ তৈরি হয়েছে। আর এর দর্শনটি তৈরি হয়েছিল জীবনকে ব্যাখ্যা করার অভিপ্রায়ে। তাহলে পশ্চিমাবিশ্বে এ মতবাদটির উদ্ভবের বহু আগেই আমাদের সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার উপাদানগুলো অঙ্গীকৃত হয়েছে জীবনের সমগ্রতার অনিবার্যতায়। এ কথা সত্য যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পরুচির কারণেই নানান শিল্পমতবাদের উত্থান ঘটে। আমরা এ কথা কখনও বলব না যে, পাশ্চাত্যের জাদুবাস্তবতায় শিল্পের সারাৎসার তুলে ধরার প্রয়াস নেই। বরং এ কথা সত্য যে, মতবাদপুষ্ট সাহিত্য হয়েও অনেক ক্ষেত্রেই জীবনকে ভিন্নমাত্রায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে জাদুবাস্তবতায়। তবে জাদুবাস্তবতার প্রত্নবৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করলে আমরা দেখব যে, বর্ণনার মধ্য দিয়ে লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাসের বিস্ফোরণে যে আরেকটি বাস্তব জগৎ জাদুবাস্তবতায় নির্মিত হয়েছে তার সূতিকাগার প্রাচ্য; ফ্রানজ রোহ তার শিল্প-মতবাদ প্রতিষ্ঠাকালে জার্মান ভাষায় অনূদিত কালিদাসের কোনো নাটক পাঠ করেছিলেন কি-না আমরা জানি না। তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক নাট্যকার মহাকবি গ্যেটে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল পরিব্যাপ্ত পৌরাণিক-লৌকিক-অলৌকিক কাহিনীনির্ভর 'শকুন্তলা' নাটককে পরিণত বয়সের ফুল ও ফলের সম্মিলিত সৌন্দর্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন ফ্রানজ রোহের অনেক আগেই। এমনকি সোমদেব ভট্ট রচিত 'কথাসরিৎসাগরের' C.H. Tawney-কৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮০-৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। Tawney যে অনুবাদ করেছিলেন তার মূল অবলম্বন ছিল জার্মান পণ্ডিত H. Brockhans সম্পাদিত 'কথাসরিৎসাগর'। গ্রন্থটি আঠারোটি লম্বক বা খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডে এক বা একাধিক তরঙ্গ বা অধ্যায় রয়েছে। 'কথাসরিৎসাগরে' কাহিনীর সংখ্যা অগণিত। কাহিনীসমূহে ভারতবর্ষীয় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। আর এজন্যই গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। 'কথাসরিৎসাগর' সম্পর্কে বলা হয়, 'One of the greatest collections of tales the world has ever seen'– একেবারেই সঠিক মন্তব্য। অনুমান করা খুব অসঙ্গত হবে না যে, হয়তো জার্মান পণ্ডিতের সম্পাদিত 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থের বর্ণনাধর্মিতা সেই সময়ের জার্মান কবি-সাহিত্যিক-সমালোচকদের প্রভাবিত করেছিল।

ভারতবর্ষে আখ্যানের এই যে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছিল তার সঙ্গে ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক ছিল। এসব কাহিনি ছিল স্বর্গ-মর্ত-পাতাল পরিব্যাপ্ত। বাস্তবতাকে ভিত্তি করে যে রূপকথা কিংবা উপকথা তৈরি হয়েছে তাতে কল্পনার অবাধ বিস্তার রয়েছে; কিন্তু তা কখনই বাস্তবতাচ্যুত হয়নি। ভারতীয় জনজীবন ও সংস্কৃতির ভেতরেই গল্পের যে জগৎ তৈরি হয়েছে তা বাস্তবতার মিশেলেই আরেকটি সৃজিত জগৎ। আমরা ইতোপূর্বেই বলেছি যে, আমাদের আখ্যান কিংবা কাব্যে এমন এক জগতের পরিচয় পাই যেখানে বাস্তবতার সঙ্গে মিলেমিশে কল্পনার এক জগৎ তৈরি হয়েছে, যা ইতিহাস, পুরাণ, লৌকিকতা ও অলৌকিকতার সমাহার। আর এ সবকিছুই বাস্তবতা থেকে উৎসারিত গল্পকাহিনী, যে গল্পে নির্মিত হয়েছে মিথের বিশ্ব; আর এই যে মিথ উঠে এলো আখ্যানে তা বিশ্লেষণ করলে আমরা বাঙলা আখ্যানে ধ্রুপদী, ধর্মীয় (হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম) এবং লোকজীবন– এই তিনটি বিষয়-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। ল্যাটিন আমেরিকার উপন্যাসের বর্ণনাধর্মিতার মধ্যে সে দেশের লোকজীবনপ্রসূত জাদু-পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণ ঘটেছে। এই যে বর্ণনাত্মক গল্পকথনরীতির যাত্রারম্ভ হয়েছিল সংস্কৃত ও বাঙলা আখ্যানে, তার প্রমাণ 'কথাসরিৎসাগর'সহ বহু সংস্কৃত আখ্যান ও নাট্যে, বিশেষ করে বাংলাদেশের গেয়োআখ্যান ও পরিবেশনামূলক সাহিত্যে। বাঙলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, পদাবলী, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, গেয়আখ্যান-উপাখ্যান, গীতিকা, রূপকথা, উপকথার মধ্যে জাদুবাস্তবতার নানা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বাঙালির শিল্প-সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার উপাদান জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই উপস্থাপিত হয়েছে। জাদুবাস্তবতা একটি সুনির্দিষ্ট শিল্প মতবাদ হিসেবে পাশ্চাত্যে

প্রতিষ্ঠিত এবং চর্চিত হলেও প্রাচ্যে তা ঘটেনি। প্রাচ্যের শিল্প-সাহিত্যের জাদুবাস্তবতা জীবনযাপন প্রণালিরই এক অবিচ্ছিন্ন অংশ যার মধ্যে সম্পূর্ণ জীবনের প্রতিভাস লভ্য। বাঙলা আখ্যানে জীবনের সামগ্রিকতার অংশরূপে জাদুবাস্তবতাকে খুঁজে পাওয়া যায়, বিচ্ছিন্ন কোনো মতবাদ রূপে নয়। জাদুবাস্তবতা মতবাদের আলোকে প্রাচ্যের সাহিত্যকে বিচার করলে দেখা যায় যে, জাদুবাস্তবতার নানা উপাদানের উপস্থিতি প্রাচ্যের আখ্যানে সেই প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান। এসব আখ্যানে জনজীবন অঙ্গীকৃত হয়েছে। সমাজের ভেতরে বিদ্যমান টানাপড়েন কিংবা সামাজিক অভিঘাত থেকে এই আখ্যানসমূহ বিযুক্ত নয়। এতে সংস্কৃতির মিশ্রণ, নানাপ্রকার লোকবিশ্বাসের উপস্থিতি এবং জীবনযাপনের অভ্যাসগত অবস্থান লক্ষণীয়। বর্ণনার ভেতর দিয়ে যে জগৎ উদ্ভাসিত হয়, সেখানে মানবিক সংকট কিংবা জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো অনুপস্থিত থাকে না। মধ্যযুগের বহু গল্প-উপাখ্যান-আখ্যানে আমরা চলমান রাজনৈতিক সংকটের চিত্রও পাই। গল্পের আড়ালে সাধারণ মানুষের অধিকারহীনতা, অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কিংবা বঞ্চনার বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'চমঙ্গল কাব্য' গল্পের বাতাবরণে শোষিতের আখ্যান হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে জাদুবাস্তবতার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে যেভাবে রাজনীতিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে সে অর্থে ভারতীয় কিংবা আমাদের বাঙলা আখ্যানের ভেতরে লভ্য জাদুবাস্তবতায় তা নেই। তবে ভাষা এবং অভিজাত অনভিজাতদের দ্বন্দ্বের বিষয়টি সেই সময়ের আখ্যানেও বিধৃত, যে আখ্যানগুলো ব্যাপকতার্থে লোকসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল। লোকসৃষ্টির সীমানার ভেতরে রয়েছে লোকসাহিত্য, লোকগীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য, লোকচিত্র ও লোকভাস্কর্য। এসব লোকসৃষ্টির সঙ্গে অভিজাতদের কিংবা শাসকদের দ্বন্দ্ব সে কালেও ছিল এ কালের বিশ্বেও রয়েছে। ব্যাপক অর্থে যে জনসংস্কৃতিকে রাজনীতিক আধারে রেখে এখনকার জাদুবাস্তবতার উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে তারও বহু উদাহরণ রয়েছে সংস্কৃত কিংবা বাঙলা আখ্যানে। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি লোকছড়ার উদাহরণ দিতে পারি। সমাজে প্রচলিত শোষণ কিংবা বৈষম্যের কথাও লোকছড়ায় বিধৃত। নবান্নে কাকভোজন নিয়ে একটি ছড়ায় আমরা দেখি যে নবান্নে কাকদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে। তাদের বসার ও খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; কিন্তু শেষে দেখা যায়, ছড়াতে আছে– 'দাঁড় কাওয়ারে কলা দিমু/পাতি কাউয়ারে লাথি দিমু।' এতে সমাজে বড়দের অর্থাৎ ধনী কিংবা শক্তিশালীদের তোষণের কথাটি উঠে এসেছে। আধুনিক জাদুবাস্তবতায় রাজনীতি যেভাবে মিথের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তারই ভিন্নরূপ ভিন্নার্থে এ সকল লোকসৃষ্টিতে আমরা দেখি। জাদুবাস্তবতা এবং পুরাণের অন্তর্গত সম্পর্কের ভেতর দিয়ে যে রাজনীতি বিধৃত হয়েছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদারণ আলেহো কার্পেন্তিয়ারের Loss Pasos perdidos (The Lost Steps, 1953) গ্রন্থে। এতে ধ্রুপদী মিথের প্রয়োগ ঘটেছে। এখানে আমরা বর্ণনাকারীর ভেতরে গ্রিক বীর জেসনকে চিনতে পারি এবং জেসনের আর্গো নামের জাহাজটি নতুন কালের অভিযাত্রার প্রতীক হয়ে ওঠে। এসকল মিথের ভেতর যে অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা রয়েছে তার সঙ্গে সমকালীন ল্যাটিন আমেরিকার সংগ্রামী অভিযাত্রার গভীরতর সম্পর্ক বিদ্যমান। এমনতর লোকাচার, মিথ কিংবা যে কোনো ধরনের উপনিবেশবিরোধী অবস্থান থেকে সাহিত্য রচনার নিদর্শন বাঙলা সাহিত্যেও লভ্য। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদে আমরা এর পরিচয় পাই। একথা এখন সর্বজনবিদিত সত্য যে, জাদুবাস্তবতা ধারার সাহিত্য উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্য। চর্যাপদে আমরা দেখি, টিকে থাকার জন্য সে সময়ের সধর্মী বৌদ্ধরা অনবরত সংগ্রাম করছে ব্রাহ্মণ্য শাসনের বিরুদ্ধে। ব্রাহ্মণ্য শাসনের অত্যাচারে স্বধর্মী বৌদ্ধরা পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়ে থাকতো। নগরের উপান্তে তাদের স্থান। নগরে তাদের আসতে বারণ। এরা নিজেদের ভাষায় কাব্যচর্চা কিংবা সঙ্গীত রচনাও করতে পারতো না। এরা বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে অবর্ণনীয় অত্যাচারের ভেতরেও নিজেদের ভাষায় নিজেদের ঐতিহ্য, সমাজ-পারিপার্শ্বিকতা, সংস্কৃতি, জীবন-যাপনের নৈমিত্তিকতা, আচরিত ধর্ম এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা রূপক-সাংকেতিকতায় তুলে ধরলেন চর্যাপদে। সেই সপ্তম-অষ্টম শতকের বাঙালি জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাগুলো বিধৃত চর্যাপদে। নিম্নশ্রেণির সাধারণ বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য শাসনের মানসিক পীড়নের নানারূপ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। এই শাসনকে আমরা বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণদের মানসিক উপনিবেশ বলতে পারি। ব্রাহ্মণরা শশাঙ্কের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এমনভাবে নিপীড়ন করেছে যে, ইতিহাসে তা মাৎস্যান্যায় বলে খ্যাতি পেয়েছে। বিতাড়িত সধর্মী বৌদ্ধরা পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করল। এভাবেই শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণ্য শাসনজাত মানসিক উপনিবেশবিরোধী সংগ্রাম। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের *One Hundred Years of Solitude* উপন্যাসে লোককাহিনী ও মিথের ভেতর দিয়ে যেভাবে উপনিবেশবিরোধী চেতনার বাস্তবায়ন ঘটেছে, তেমন করে এখানেও ঘটেছে এমন কোনো কথা বলছি না। আমরা এই লেখার শুরুতেই বলেছিলাম যে, কালে কালে দেশে দেশে মানুষের প্রকাশভঙ্গি পাল্টায়। ভিন্ন দেশে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন মতবাদের উত্থান ঘটে। তবে কখনও কখনও শিল্পের চিন্তার সমুন্নতির ক্ষেত্রে দেশভেদ হলেও চিন্তাসূত্রের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন উপমা রূপকের আড়ালে। বাস্তবতাকে অবলম্বন করে কল্পনার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এমন বহু পদ রয়েছে চর্যাপদে। আমরা প্রসঙ্গত কাহ্নপা রচিত ১১ নম্বর পদটি বিশ্লেষণ করতে পারি। এই পদে–

আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণে।
রবি শশী কুকিউ আভরণে॥ ধ্রু॥
রাগ দেশ মোহ লইঅ্যা ছার।
পরম মোঘ লভই মুত্তিহার॥ ধ্রু॥
মারি সাসু ননন্দ ঘরে সালী।
মাঅ মারি কাহ্ন ভইঅ কবালী ॥ ধ্রু॥

পদটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, কবি আলিকালি অর্থাৎ লোকজ্ঞান ও লোকভাসকে তাঁর পায়ের ঘণ্টা নূপুর করেছেন। রবিশশী রূপ গ্রাহ্য-গ্রাহকাদি ভাবকে তিনি করেছেন কানের কুণ্ডল, রাগ-দ্বেষ মোহকে পুড়িয়ে তার ছাই শরীরে লেপন করে নিয়েছেন। শ্বাসবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংস করে এবং অবিদ্যারূপিণী মায়াকে মেরে ফেলে কাপালিক হয়েছেন। কাহ্নপার কাপালিক হওয়ার প্রক্রিয়ার বর্ণনায় কবির কল্পনার বিস্তার ঘটেছে। এই বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি মিশ্রধর্মের সংস্কৃতির প্রত্ন- বৈশিষ্ট্য।

১৭নং চর্যায় বৌদ্ধদেবতা যে হেরুক বীণা বাজান সেই বীণা তৈরির পদ্ধতিতে পাওয়া যায় বাস্তবতা ও কল্পনার সংশ্লেষ। সূর্যকে লাউ, চন্দ্রকে তন্ত্রী এবং অনাহতকে দণ্ড ও অবধূতীকে চাকি রূপে নিয়ে এই অপূর্ব বীণাটি তৈরি করা হয়। কাহ্নপার কাপালিক হওয়ার পদ্ধতি ও হেরুক বীণা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কবির কল্পনা ও বাস্তবতার সংশ্লেষ লক্ষণীয়। অতিপ্রাকৃত উপায়ে লোকভাসকে পায়ের ঘণ্টা নূপুর, রবি-শশীকে কানের কুণ্ডল করেছেন কাহ্নপা। সেখানে রয়েছে

বাস্তবতা ও কল্পনার মেলবন্ধন। এক জাদুকরী ক্ষমতায় যেনবা তিনি কাপালিক হয়ে উঠলেন এবং তা পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। একই সঙ্গে কাহ্নপার জীবনে রূপান্তর ঘটে। এ যেন ধ্রুপদী রূপান্তরবাদের একটি লোকধর্মী প্রতিভাস। পাশ্চাত্যের জাদুবাস্তবতা ধারার সাহিত্যের সাথে প্রাচ্যের, বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যের একটি অন্যতম পার্থক্য হলো পাশ্চাত্যে কোনোরূপ আধ্যাত্মিকতা আরোপ করা হয়নি। প্রাচ্যে লোকায়ত ধর্মচর্চা একটা আধ্যাত্মিক বিষয় হিসেবে বিদ্যমান। ফলে সাধারণ বিষয়গুলো অতিবাস্তব হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা যায় প্রাচ্য সাহিত্যে। তবে তা বাস্তবতাকে মূলভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত করে না।

বাঙলা সাহিত্যের আদিমধ্যযুগের প্রথম লিখিত নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে আমরা স্বর্গ-মর্ত ব্যাপ্ত কাহিনীর রূপায়ণ দেখি। কাব্যটি রাধা-কৃষ্ণের মিথ নিয়ে রচিত। তবে লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ঘটনার মিশ্রণও ঘটেছে এই আখ্যানে। লৌকিক কোনো প্রেমের ঘটনার অলৌকিকতায় উত্তরণ যেনবা এই কাব্য। এই কাব্যে বহু পৌরাণিক ঘটনা ও ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষণীয়। আমরা এই আখ্যানে এমন অনেক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হই, যা বাস্তবতার আধারে জাদুর মিশেল। আমরা একথা পূর্বেই বলেছি যে, বাঙালির সংস্কৃতির মধ্যে বহুজাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির অবলেশ রয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে আমরা বাঙালির মিশ্র সংস্কৃতির একটি রূপরেখার পরিচয় পাই। এমন অনেক ঘটনার পরিচয় পাই যা জাদু বলেই প্রতিভাত হয়। বাণখণ্ডে কৃষ্ণের শরের আঘাতে মৃত রাধা জীবিত হয়ে ওঠে কৃষ্ণের স্পর্শে। এ যেন এক জাদুকরী শক্তিবলে মৃত মানুষকে জীবিত করে তোলা। বৃন্দাবন খ নিজেকে বহু বিভক্ত করে ষোলো হাজার গোপীর সঙ্গে একই সময়ে রমণ করার ঘটনা বাস্তবসম্মত নয়। জাদুবলে যেমন একটি মানুষকে একই সময়ে অনেকগুলো মানুষ রূপে দেখানো যায়, এ যেনবা তেমনই বর্ণনার এক জাদুকরী কৌশল। এখানে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার সেতুবন্ধন ঘটে অলৌকিকতার সংশ্লেষে এক ভিন্ন বাস্তবতার সৃষ্টি হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বাস্তবতার নিয়ন্ত্রণে কল্পনার অগ্রসরমানতার চিত্র লভ্য। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণ যে মোহন বাঁশি তৈরি করেন তা বাস্তব। এই বাঁশির সাতটি ছিদ্র। সোনার কারুকাজ করা বাঁশিটি বহুমূল্যবান। বাঁশি তৈরির বিষয়টি নানাভাবে বিস্তারিত করা হয় বাস্তবতা ও অলৌকিকতার মিশেলে। বাস্তব বাঁশিতে যে সুর সংযোজন করা হয় তাতে কল্পনার বিস্তার ঘটে। লৌকিক-অলৌকিক একাকার হয়ে যায় বাঁশির বর্ণনায়। বাঁশির সুরে জগৎ মোহিত করার ঘটনাটি অবাস্তব কল্পনা। কিন্তু তা বাস্তবতার বিস্তারণে সীমাবদ্ধ থাকে না কারণ বাঁশির স্রষ্টা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ জগতের স্রষ্টা। রাধা জীবাত্মার প্রতীক। সে তার বাঁশির সুরে রাধাকে বিমোহিত করে। রাধা বিমোহিত হওয়া মানে জগৎ বিমোহিত হওয়া। এখানে বাঁশিটি বাস্তব কিন্তু বাঁশি সৃষ্টির পদ্ধতিটি হলো জাদু। বাঁশির সুরে জগৎ মোহিত হওয়াটাও জাদু। জগতের স্রষ্টা কৃষ্ণের মানুষরূপে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটল যখন, তখন ধর্ম, লোকবিশ্বাস ও পুরাণ এক হয়ে গেল এই কাব্যে। নৌকাখণ্ডে রাধাকে ভারমুক্ত হতে বলে কৃষ্ণ অর্থাৎ সে ধীরে ধীরে রাধাকে নিরাভরণ করে। নৌকায় রাধার সঙ্গে রতিক্রিয়া করা বাস্তব। নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে রতিবিহারের সময় কৃষ্ণ যখন রাধাকে বিশ্বরূপ দেখায়, তখন তা অলৌকিকতা ও কবিকল্পনা হয়ে ওঠে; কিন্তু তা ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। চরিত্র ও ঘটনার বর্ণনায় প্রাচ্যের এই আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ পাশ্চাত্য থেকে একটি আলাদা প্রকাশরীতি তৈরি হয়েছে। রাধা তার সখীদের সঙ্গে দধি বিক্রি করতে যায়, যমুনা পার হয়– এটা বাস্তব। যমুনা পার হওয়ার সময় মাঝ নদীতে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন এবং মিলনের দীর্ঘ সময় তার সখীদের কাছে নিমেষমাত্র মনে হওয়া যেনবা জাদু। এখানে বাস্তবতা হলো কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার মিলন এবং মিলনের সময় রাধাকে কৃষ্ণের বিশ্ব দেখানো হলো কল্পনা তথা জাদু। রাধা-কৃষ্ণ ধর্ম ও মিথের চরিত্র। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে শতসহস্র বছর ধরে চর্চিত বৈষ্ণবীয় ধর্মের সঙ্গে এ দেশে প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। এখানে জাদুবাস্তবতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য আন্তঃসংস্কৃতির সংশ্লেষ ব্যাপকভাবে লভ্য। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে লোকায়ত বিশ্বাসের সম্মিলন ঘটেছে। ধ্রুপদী বিশ্বাসের সঙ্গে লোকবিশ্বাসের সম্মিলন ঘটেছে। জন্মখ নারদের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে স্বর্গীয় দেবতার মর্তের সাধারণ মানুষের মতো, বলা যেতে পারে ভাঁড়ের মতো উপস্থাপন করে জনসংস্কৃতির সঙ্গে মূল ঘটনাকে সম্পর্কায়িত করা হয়েছে। এখানে লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ধ্রুপদী সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটেছে।

বর্ণনাধর্মিতা ও বর্ণনার সম্প্রসারণ (Amplification) জাদুবাস্তবতা ধারার সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্ণনাধর্মিতা ও বর্ণনার বিশালায়তনের এক ভিন্নমাত্রিক রূপ দেখতে পাওয়া যায় বাঙলা আখ্যানে নারীর রূপ বর্ণনায়। উপমার নান্দনিক প্রয়োগে দর্শক-পাঠকচিত্তে এই বিশালায়তনের আবহ, অনুভব নতুনতর দৃশ্যকল্প সৃজন অত্যন্ত চমৎকারভাবে ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, মৈমনসিংহ গীতিকা কিংবা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে নারীর রূপ বর্ণনা অংশে কল্পনা ও বাস্তবতার সংশ্লেষ লক্ষণীয়। এসব আখ্যানে রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে আলাদা করে নিখুঁতভাবে উপমিত করা হয়েছে। রূপ বর্ণনায় উপমার প্রয়োগে কল্পনার বিস্তার লক্ষণীয় এবং সেখানে রয়েছে বাস্তব ও কল্পনার সংশ্লেষ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণ বলেছে যে কেশ তার তমাল কুসুম, শৈবাল দাম, চোখ যেন নীলকরবক। রাধার হাসিতে নবমল্লিকা শেফালী মালতী বিকশিত হয়। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপমিত বর্ণনা রাধার রূপের বর্ণনায় বাস্তব ও কল্পনার সমাবেশ ঘটেছে। রাধার হাসি ও হাসির সৌন্দর্য বাস্ব, তার হাসিতে নবমল্লিকা শেফালী মালতী বিকশিত হওয়ার ঘটনা কবির কল্পনায় বেড়ে ওঠা কোন এক জাদুকরী বিষয়। আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে রূপবর্ণনা খ পদ্মাবতীর দেহের খ ি অংশের উপমিত বর্ণনার মাধ্যমে সামগ্রিক রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। পাঠকচিত্তে বর্ণনার এক ভিন্নমাত্রিক বিশালায়তন ঘটতে দেখা যায় উপমা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। এই রূপবর্ণনায় কল্পনার বিস্তার ঘটেছে বাস্তবতার আধারে। বাস্তবতাকে রেখেই একটি সমান্তরাল জগৎ তৈরি হয় জাদুবাস্তবতায়। আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে ককনুস পাখির বর্ণনা রয়েছে। পাখিটি নিজের জ্বালানো আগুনে নিজে পুড়ে মরে আবার জীবিত হয়ে ওঠে। এ যেন গঠিত হয় আবার শূন্যে মিলায় এমত একটি আধ্যাত্মিক জগৎকে আমাদের সামনে উন্মোচন করে। ককনুসের জীবন বাস্তবতা হলো : সে জন্মগ্রহণ করবে, কাঠ সংগ্রহ করবে, চিতা জ্বালাবে, ডিম পাড়বে এবং অগ্নিদগ্ধ হবে– পাখির চক্রাকার জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে বাস্তব জগতের একজন মানুষের মিল রয়েছে। বাস্তবতার প্রতিভাসরূপে মানব কল্পনায় আরেকটি জগৎ তৈরি হলো। জাদুবাস্তবতার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলে পশ্চিমাবিশ্ব যে পুরাণ, ধর্ম, কৃত্য, লোকবিশ্বাস, মানুষের আচার- আচরণ, অলৌকিকতা এবং ফ্যান্টাসিকে গণ্য করে থাকে প্রাচ্যমতে তারই একটি আধ্যাত্মিক রূপায়ণ এই ককনুস পাখির আখ্যানে, যা জীবনের সমগ্রতার আধারে আরেক জাদুবাস্তবতা। ❖

অলঙ্করণ : : সুমন

ইকবাল হাসান

যে গল্পে পরী নাই



গল্প

কবির আগমন ও আপাত প্রস্থান

আমাদের পরিচয় পর্বের কথা আপনাকে বলা হয়নি কোনোদিন। আই মিন, কীভাবে কবির সঙ্গে পরিচয়।

টিম হরটন'স থেকে কফি নিয়ে বসার মুহূর্তে মকবুল ফরাজি, মার্ক হ্যাডনের 'দ্য কিউরিয়াস ইনসিডেন্ট অব দ্য ডগ ইন দ্য নাইট টাইম'-এর বালকটি যেভাবে তার পিতার দিকে বিহ্বল চোখে তাকাত সেভাবে আমার দিকে তাকাল। বোঝার চেষ্টা, আমি শুনতে আগ্রহী কি-না।

বাইরে আকাশ নীল। দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি সময়। এ ক'দিন আকাশের ওপর দিয়ে ধকল গেছে খুব।

অনেকদিন পর ঝকঝকে রোদ আজ– নিষ্পত্র বৃক্ষের শাখায়, পার্কিং লটে গাড়ির কাচে ঝিলিক দিচ্ছে সেই রোদ। রোদ হলে কী হবে, তাপমাত্রা মাইনাস ১৮, ফিল লাইক মাইনাস ২৭। এ রকম ঝলমল একটা দিন অথচ মনেই হবে না যে, বাইরে শীত দামেস্কের তরবারি দিয়ে চামড়া ছিলে নিচ্ছে। চায়নিজ চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে যেন আলাদা করছে মানুষের হাড়-মাংস।

আমরা বসেছি জানালার পাশে, মুখোমুখি। ডানে ও বাঁয়ে আমাদের শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে রোদ।

মনে মনে বলি, কবির সঙ্গে পরিচয়ের গল্পটি আজ না শুনলেই নয়!

আমি বাইরে তাকিয়ে আছি। মকবুল বলে, কী ভাইজান, শুনতে মন চাইতেছে না? না চাইলে নাই, আরেকদিন শুনাবো। এমন তো জরুরি কিছু না যে আজই শুনাতে হবে।

বাহ! মকবুলের মাথার অ্যান্টেনা তো ভালোই কাজ করছে আজ। আমার মনের কথা পড়ে ফেলেছে।

শোনো মকবুল, কফিতে চুমুক দিয়ে আমি বলি, তোমার মুখে নানা মানুষের গল্প শুনতে শুনতে টায়ার্ড হয়ে গেছি। এখন থেকে তুমি আমাকে গাছপালা, নদী-সমুদ্র-আকাশ, বৃষ্টি, পাহাড়-পর্বত আর জঙ্গলের গল্প বলবে। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনব।

খুব বিরক্ত হয় মকবুল, কী কথার মধ্যে আপনি কী কথা ঢুকাইয়া দিলেন! গাছপালা, নদীনালার গল্প মানে কী! শোনেন ভাইজান, মানুষের তুলনায় পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল-ফঙ্গল তো কিরতিম। মানুষই তো আসল। প্রতিটি মানুষ হইতেছে গল্পের খনি। ২৫ বছর ট্যাক্সি চালাইয়া বুঝছি, মানুষের পরতে পরতে লুকাইয়া আছে হাজার হাজার গল্প।

বুঝতে পেরেছি আজ রেহাই নেই। বললাম, ঠিক আছে কবির সঙ্গে তোমার পরিচয়ের গল্প শুনব। তবে গল্পটি নির্মেদ হতে হবে। বানিয়ে বানিয়ে লম্বা করা চলবে না।

নির্মেদ মানে কী?

মেদহীন। অর্থাৎ গল্প ফ্যাটলেস হতে হবে।

এইটা আবার কী কইলেন? আপনার কথার মধ্যে নানা ঝামেলা থাকে ভাইজান। গল্প কি গরু-খাসির মাংস যে ফ্যাট থাকবে?

একটু খুলে বলি, তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। মোপাশা-ফ্লবেয়ার এ দু'জনের নাম শুনেছ?

প্রথমজনের নাম শুনেছি, দ্বিতীয়জন কে?

প্রথমজনের গুরু। তো একদিন সারারাত জেগে মোপাশা একটি গল্প লিখলেন। পরদিন সকালে গল্প নিয়ে গুরুর বাড়ি হাজির। ফ্লবেয়ার গল্পের পুরোটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর যা বললেন তা শুনে মোপাশা হতাশ। গল্পের প্রথম কয়েক পাতা, শেষের পাতাটি এবং মাঝখানের কিছু অংশ ফেলে দিতে হবে। তাহলেই এটা গল্প হয়ে উঠবে।

তাইলে আর থাকল কী!

বললাম, যেটুকু থাকল ওইটুকুই গল্প।

আমি আপনাকে যা বলব তা কিন্তু কোনো বানোয়াট গল্প নয়, পুরোটাই সত্যি। অতএব কিছুই ফালানো যাবে না। আপনি শুনতে চাইলে বলব। না চাইলে না।

আচ্ছা শুরু কর, নো ভূমিকা।

কফিতে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে মকবুল ফরাজি শুরু করে তার গল্প।

সেই বিকেলে মকবুল ফরাজির গল্প।

প্রথমেই বইলা রাখি ভাইজান, আমি কিন্তু শুদ্ধ ভাষায় বেশিক্ষণ কথা কইতে পারি না। মাঝেমধ্যে দেখবেন শুদ্ধ-অশুদ্ধ মিল্লামিশ্যা একাকার।

হা-হা, ঠিক আছে। গল্পে আসো। নো ভূমিকা।

এই কবি আমার লগে বিট্রে করছে। হেই গল্প পরে। আগে বলি, দ্যাখা ওইলো কেমনে।

এরকম শীতের মাস, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। সন্ধ্যার সময় গাড়ি নিয়ে বের হইছি। এমন সময় রেডিও ডেসপাচার বলল, নাইন আইসক্রিম লেনে যেতে, প্যাসেঞ্জার এয়ারপোর্ট যাবে। এয়ারপোর্টের কথা শুনেই বললাম, রজার্স।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আইসক্রিম লেনের সামনে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন তাকে দেখে আমি হতবাক! গ্রামে ধানের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে থাকা কাকতাড়ুয়া, আরে ওই যে– ক্ষ্যাংড়াকাঠির মাথায় কুমড়া, সে রকম একজন বেরিয়ে এলেন। পরনে ধবধবে সাদা স্যুট, গলায় সাদা মাফলার। দেখে মনে হইল যেন একখানা কাফনের কাপড় গাড়ির দিকে আসতেছে। সঙ্গে ট্রলি, হ্যান্ডব্যাগ আর দশাসই স্যুটকেস।

সবকিছু সামলাতে ক্ষ্যাংড়া কাঠির ত্রাহী অবস্থা দেখে আমি হাত দিলাম। হঠাৎ দেখি, দরজায় একজন দাঁড়িয়ে, তার মুখে আঁচল। ভেজা ভেজা গলায় বললেন, ঢাকা পৌঁছামাত্র ফোন দেবা কিন্তু। বাংলাদেশ গেলে তোমার তো আর দিশা থাকে না।

ভালো থেকো।

তুমিও।

গাড়িতে উঠেই ক্ষ্যাংড়া কাঠি বললেন, টার্মিনাল ওয়ান।

আইচ্ছা।

তারে দেখামাত্র আমার মনে হইল, এই ক্ষ্যাংড়া কাঠি লোকটার নিশ্চই ডায়াবেটিস আছে। তো খুবই মোলায়েম স্বরে জানতে চাইলাম, ভাইজানের কি ডায়াবেটিস?

আমার এ প্রশ্নে বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

বললেন, এই ডায়াবেটিস মানে? আপনি ডাক্তার নাকি?

কী যে কন ভাইজান! ডাক্তার অইলে কি আর টেক্সি চালাইতাম ! এমনি মনে অইল, আপনার বোধহয় ডায়াবেটিস। বড় খারাপ রোগ। মনে দোষ নিয়েন না। এই রোগে আমার বাপ গেছে, চাচা গেছে, একমাত্র মামা– হেও গেছে। আমার মায়েরও ডায়াবেটিস ছিল, হালকা পাতলা।

কী নাম আপনার?

মকবুল ফরাজি।

আপনার?

ইকবাল হাসান।

ইকবাল হাসান! আপনারে একটু চেনা চেনা লাগতেছে। আপনারে কি টিভিতে দেখছি? দেশ টিভি না দেশি টিভি.... না মনে করতে পারতেছি না। তা ভাইজান, কী করেন আপনি?

এই এক-আধটু লেখালেখি করি।

আপনি লেখক! কিন্তু আপনার নাম তো শুনি নাই। কী লেখেন?

না শোনারই কথা। আমি কোনো নামি লেখক নই। সামান্য গল্প কবিতা লিখি এই আর কি!

খুব ভালো, খুব ভালো। তা ভাইজান, আমারে নিয়া একটা গল্প লেখেন।

তার মানে?

মানে কিছু না। আপনারা তো মানুষ, মানুষের জীবন নিয়া

গল্প লেখেন। আমার কাছে অনেক গল্প আপনি পাইবেন; আমি গল্পের খনি।

তাই নাকি!

শোনেন কবি ইকবাল হাসান ভাই, আমার জীবনটাই একটা গল্প। শোনলে আপনি না লিখে পারবেন না।

ঠিক আছে, বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসে আপনার গল্প শুনব। আমার ফোন নম্বরটা দিচ্ছি আপনাকে।

তবে একটা শর্ত আছে। আপনি আমার গল্পে নিজের গল্প, বানোয়াট কিছু ঢুকাবেন না। খালি আমার গল্পটা লিখবেন। আমার জীবনের গল্প।

ঠিক আছে, আগে গল্পটা তো শুনি।

আর একটা অনুরোধ, গল্পে পরী-জিন আনবেন না। আজকাল পোলাপাইন কী যে লেখে! সব গল্পে পরী উইড়া আসে। পড়তে গেলে মাতা আউলাইয়া যায়।

ওরা জাদুবাস্তবতা নিয়ে খেলে। দুরূহ কাজ। ওসব গল্প আপনার জন্য নয় মকবুল।

শোনেন কবি ভাই, অত বেকুব ভাইবেন না। আমার গোর্কি, রবীন্দ্রনাথ, মোপাশা পড়া আছে। আমি...

ঠিক আছে, ঠিক আছে.এবার আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে আমি মকবুলকে থামিয়ে দেই, বলি– তুমি তো গল্প বলতে গিয়ে উপন্যাস শুনাচ্ছো। শর্ট করো।

আচ্ছা। কবিকে সেদিন আর কিছু বলা হয় নাই। এর মাস দুই পর এক সন্ধ্যায় কবি ভাইকে আমি আমার জীবনের গল্প বলি। তবে পুরা জীবনের না, অর্ধেক জীবনের।

উনি কি লিখেছিলেন গল্পটা?

হ্যাঁ, লিখেছিলেন। তবে কাহিনীতে ঝামেলা আছে। গল্পে যদিও পরী নাই। তারপরও আমার তেমন পছন্দ অয় নাই। পড়লেই বোঝবেন, উনি খুব একটা ভালো লেখক না।

তোমার কাছে আছে গল্পটা?

জি, মকবুল কাঁচা কাম করে না। গল্পটা একটা ঈদসংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ফটোকপি করে আনছি। এই নেন, পড়ে দেখেন।

গল্পের নাম : পূর্বে পশ্চিমের ছায়া

অবশেষে পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে মকবুল ফরাজির হাতে চিঠিখানা এসে পৌছায়।

সাধারণত ধর্মকর্মের দিকে তেমন আগ্রহ না থাকলেও চিঠিখানা পাওয়ামাত্র সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় তার। সে জানালার বাইরে আকাশের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকে, পাতলা একখণ্ড মেঘ ছাড়া তার চোখে ধরা পড়ে না কিছুই, তবু এই প্রথমবারের মতো কেন যেন মনে হয়, আছেন তিনি। সপ্তম আসমানের কোথাও না কোথাও তাঁর আরশ এবং সেখানে বসেই তিনি সব কিছু কন্ট্রোল করেন– মক্তবে ছেপারা পড়ার সময় এমন শুনেছে মকবুল ফরাজি। সেসব যদিও বাল্যকালের কথা, আজ তবু চিঠিখানা পেয়ে এবং মাথার উপর থেকে বিশাল ভারী একখানা পাথর সরে যাওয়ায় করুণাময়ের অস্তিত্ব ও রহমত দুটো সম্পর্কেই যেন কিছুটা নিশ্চিত হতে পারে সে।

স্ত্রী সেলিনা আখতার রিমঝিম তাকে তালাকনামা পাঠিয়েছে, বাইপোস্ট।

যদিও এই তালাকনামা এসেছে ওয়েস্টকোস্ট থেকে কিন্তু ভিতরে বাংলাদেশের উকিলের চিঠি। পাকাপোক্ত কাজ। উকিলের নাম ব্যরিস্টার সগির উদ্দিন আলতামাস। নাম থেকেই দাম বোঝা যায়। রিমঝিম যখন তাঁকে উকিল হিসেবে নিয়েছে জাঁদরেল হবেন নিশ্চয়ই। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে ধরনের ফরোয়ার্ডিং লেটার মূল চিঠির সঙ্গে আদান-প্রদান করা হয়, সে ধরনের একখানা লেটার তালাকপত্রের সঙ্গে, উকিল সাহেবের সিল-স্বাক্ষর সংবলিত। তালাকপত্রখানা দেখে বেশ কৌতূহল হয় মকবুল ফরাজির, এতসব করার কোনো দরকার ছিল না, আমাদের দেশে সিস্টেম তো একেবারে জলবৎ তরলং, তিন তালাক বললেই কাজ হয়ে যায়। এখানে অবশ্য ব্যাপারটা একটু আলাদা, স্ত্রী তালাক দিচ্ছে তার স্বামীকে। তা একখানা সাদা কাগজে 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম' বললেই তো আমি মেনে নিতাম। আমি তো আর ফাইটে যেতাম না। আর আমাদের আছেই বা কি, যা নিয়ে আমাদের ফাইট হবে। মকবুল ফরাজি ভাবে, আহা রে, না জানি রিমঝিমকে কত ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।

বেশ ক'বছর আগে টেলিভিশনে মাইকেল ডগলাস ও ক্যাথলিন টার্নারের একটি ছবি দেখেছিল সে, ওয়ার অব রোজেজ। ওয়ারেন অ্যাডলারের উপন্যাসের চিত্ররূপ। 'ডিভোর্স ব্যাটেল' যে কত ভয়াবহ হতে পারে তারই কাহিনীচিত্র। স্বামী-স্ত্রীর অই সম্পর্কের কথা ভাবলে ঘুমের মধ্যেও শিউরে ওঠে সে। বলতেই হবে, ভাগ্য তার খুবই সুপ্রসন্ন, সবকিছু হয়ে গেল চট্‌জলদি, বেশ শর্টকাট।

মকবুল ফরাজির জীবনে তালাকের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। নিজেরই জানা ছিল না যে, সে এত খারাপ লোক এবং তার বিরুদ্ধে রিমঝিম এত এত অভিযোগ বুকের ভেতর লালন করে আসছে এতদিন। তালাকপত্রে লিপিবদ্ধ নানা অভিযোগের মধ্যে 'অসুস্থ অবস্থায় সেবাযত্ন না করা', 'ভারবাল এবিউজ', 'দায়িত্বহীনতা', 'বিয়ের পর দীর্ঘদিন বাংলাদেশে ফেলে রাখা', 'সংসারের প্রতি উদাসীনতা', 'গ্রাম্য আচরণ' সহ 'শারীরিক নির্যাতনে'র মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগও রয়েছে। এর মধ্যে 'ভারবাল এবিউজ', ও 'শারীরিক নির্যাতন' শব্দ ক'টির ওপর চোখ আটকে যায় তার। সে ভাবার চেষ্টা করে, কবে কখন এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সে কিছুতেই মনে করতে পারে না, আর ঠিক তখন ফোন আসে রিমঝিমের।

চিঠি পেয়েছো? মিথ্যা বলবে না।

বলতে দিলা কই।

শুদ্ধ করে কথা বলো। আমার সঙ্গে ফাজলামো করবে না। চিঠিটা পেয়েছো? ভেরি ইম্পর্টেন্ট।

হ, পাইয়া গেছি।

এ কথায় টেলিফোনের অপরপ্রান্তে যেন স্বস্তি, তোমাকে ডিভোর্স করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ।

স্টুপিড। তোমাকে বহুবার বলেছি, আমার সঙ্গে ফাজলামো করবে না। আই এ্যম নো মোর ইওর ওয়াইফ।

পত্রখানা পাওয়ার পর বুঝলাম।

কী বুঝলে?

বুঝলাম, ইউ আর নো মোর মাই ওয়াইফ।

আবার ফাজলামো...!

ফাজলামি কোথায় করলাম? তুমি কইলা তালাক দিছো, আমি কইলাম আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ খোদার শুকরিয়া আদায়ের মধ্যে ফাজলামোর কী দেখলা?

স্টুপিড।

ফোন রেখে দ্যায় রিমঝিম।

আনন্দ, আনন্দ! মকবুল ফরাজির মনে হয়, এই হচ্ছে সময়। এই হচ্ছে আনন্দের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে সুউচ্চ পাহাড় থেকে অনন্তে ঝাঁপ দেয়ার। তারপর চারদিকে শুধু নীল আর নীল। এলোমেলো মেঘের সাম্পানে মুক্তবিহঙ্গের মতো ভেসে বেড়ানো।

রিমঝিম দূর থেকে বলছে যেন, এই নাও, স্বাধীনতা তোমাকে দিলাম। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় তার। আর সে জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোখ রেখে বলে ওঠে, আলহামদুলিল্লাহ।

দুই

পাঁচ দিন কোনো ফোন নেই রিমঝিমের, মকবুল ফরাজি টের পায় তার ভিতরটায় দোলা দিয়ে উঠছে একধরনের অস্থিরতা। কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে গেল নাতো। ঝামেলায় জড়ানোর মতো মেয়ে সে নয়, তবু বলা যায় না– একা থাকতে গেলে বিদেশ-বিভুঁইয়ে কত ধরনের ঝামেলা হতে পারে। নিজেকে অবশ্য টেক-কেয়ার করার ক্ষমতা আছে রিমঝিমের। তার উপর সে তো আর পুরোপুরি একা নয়, মাথার উপর মামা-মামি আছেন। তবু কেন মাথার ভিতর ঝিঁঝিঁ পোকার অস্থির শব্দ।

রিমঝিমকে প্রথম যেদিন দেখেছিল সেদিনও এমন অস্থির লাগছিল। অসম্ভব চঞ্চল, ছটফটে, স্ট্রেট টকার মেয়েটিকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায় তার।

আপনি সানগ্লাস পরে আছেন কেন? এখানে তো রোদ নেই। সানগ্লাস খুলে ফেলুন, আপনার চোখ দুটি একটু দেখি।

বলে কী মেয়ে! প্রথম দর্শনেই এভাবে কথা বলা! অবাক হয় মকবুল ফরাজি, আর ভিতরে ভিতরে ঘেমে একাকার যখন, রিমঝিমের কণ্ঠে ধমক, কী বললাম, সানগ্লাস খুলুন।

মকবুল ফরাজি অতএব এই প্রথমবার কালো কাচের আবরণমুক্ত চোখ দুটি তুলে পরিপূর্ণভাবে তাকায় রিমঝিমের দিকে।

ওয়াও! আপনার চোখ দুটি তো খুব সুন্দর।

তুমি নিবা? তোমারে দিয়া দিমু– বলতে গিয়েও কিছু না বলে বরং নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কী ব্যাপার, লজ্জা পেলেন নাকি? ওখানে সাদা গার্লফ্রেন্ড নেই আপনার?

এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে শেষে বলে, সাদা-কালো কাউরে পাওয়া এত সোজা না।

বিশ্বাস করলাম না, যার চোখ অত সুন্দর তার একজন গার্লফ্রেন্ডও নেই তা কী করে হয়!

বিশ্বাস না করতে চাইলে কইরেন না। তবে অইখানে আমার কেউ নাই। আমি একলা।

শোনেন মিস্টার, আপনাকে দু-একটি কথা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, এক, আপনার নামটি চেঞ্জ করতে হবে।

মকবুল ফরাজি অসম্ভব গ্রাম্য একটি নাম। আর দুই, আমাকে বিয়ে করার আগে আপনাকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা শিখতে হবে।

রিমঝিমের এ কথায় কিঞ্চিত বিস্মিত হলেও মকবুল ফরাজির অবয়বে সে বিস্ময় থাকে অপ্রকাশিত, বরং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে এই মেয়েটিকেই সে বিয়ে করবে নাম চেঞ্জ না করেই এবং যথাসম্ভব দ্রুত।

সে শুধু মুখে বলে, আইচ্ছা।

তার হাতে আর সময় নেই, তাকে ফিরে যেতে হবে এমন যুক্তি নিয়ে রিমঝিমদের বাড়িতে যাওয়ার তিন দিনের মাথায় তাদের বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বিদেশে নিজ কর্মস্থলে ফিরে আসার পর মকবুল ফরাজি টের পায় চোখ দুটিই শুধু নয়, হৃদয় মন সবকিছুই যেন মেয়েটি রেখে দিয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে রিমঝিম তাকে এতটা দখল করে ফেলেছে ভাবতেই ভালোলাগার অজানা এক আশ্চর্য শিহরণ অনুভব করে সে। এই বোধ, অপেক্ষার এই বিরল অনুভূতি কোথায় ছিল এতকাল? অপেক্ষাও যে এতটা আনন্দের হতে পারে জানা ছিল না মকবুল ফরাজির।

তবে খুব বেশি দিন অপেক্ষায় থাকতে হয়নি তাকে। স্ত্রী হিসেবে ফার্স্ট ট্রাক প্রসেসিং-এ ইমিগ্রেশন নিয়ে রিমঝিম যেদিন বিদেশের মাটিতে পা রাখে, সেদিনই যেন স্বপ্নের দেয়াল ধসে পড়ে। ট্যাক্সিতে মালপত্র উঠিয়ে মকবুল ফরাজি ড্রাইভিং সিটে বসতেই খুব বিরক্তির সঙ্গে জানতে চায় রিমঝিম, তুমি ট্যাক্সি চালাও? ছিঃ!

ছিঃ ছিঃ করতাছ কেন? আমি কইছি কোনো দিন যে, কানাডার প্রধানমন্ত্রীর অফিসে চাকরি করি?

তাই বলে তুমি ট্যাক্সি চালাবে? আর কি কোনো কাজ নেই এদেশে?

তুমিতো নতুন আইছো এই দেশে। কিছুদিন থাকার পর দেখবা, এই দেশে যে কোনো কাজই সম্মানের। কেউ কোনো কাজ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চোখে দ্যাখে না।

এ কথার কোনো জবাব দ্যায় না রিমঝিম। চুপ করে থাকে সে।

সেই যে ছিঃ ছিঃ দিয়ে শুরু তারপর শতচেষ্টা করেও মকবুল ফরাজি সংসারের ধসে যাওয়া দেয়ালটি পুনর্নির্মাণ করতে পারেননি। এবং এই ব্যর্থতা তাকে ধীরে ধীরে অই ধসে যাওয়া দেয়ালের প্রান্তসীমায় দাঁড় করিয়ে দ্যায়। একই বাড়িতে, একই ছাদের নিচে ভালোবাসাহীন জীবন যাপনের চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াই উত্তম, এমন প্রস্তাব রিমঝিম দিয়েছে বার কয়েক। আর অন্যদিকে, এই যে একই বাড়িতে থাকা, এই যে প্রায় প্রতিদিন দেখা হওয়া এর মূল্যই বা কম কি– এমন ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকার কারণেই মকবুল ফরাজি চাইছিল সম্পর্কের সুতোটুকু ধরে রাখতে। কিন্তু এদেশে আসার নয় মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ বদলে গেল রিমঝিম এবং এতটাই বদলাল যে, এক সময় মকবুল ফরাজির মনে হলো, ফাঁপা অন্তসারশূন্য এই জীবন ও সংসারে অবশিষ্ট বলে আর কিছু নেই।

রিমঝিম এমন একটি সময়ের অপেক্ষায় ছিল হয়তো।

সারারাত ট্যাক্সি চালিয়ে ভোররাতে বাসায় ফিরে দ্যাখে রিমঝিম নেই, ফাঁকা চারদিক। চার লাইনের একটি চিরকুট রেখে চলে গেছে।

কোনো একদিন এমনটি হবে ভেবে রেখেছিল বলেই তার চলে যাওয়ায় খুব একটা বিস্মিত হয়নি মকবুল ফরাজি।

যদিও অহেতুক ভোর অব্দি ঠাঁয় বসেছিল সে, সকালের দিকে ফোন করে রিমঝিম অবশ্য জানিয়েছিল, সে ভ্যানকুভার চলে এসেছে মামা-মামির কাছে। এ সংসারে ফিরে আসার কোনো বাসনা তার নেই।

তিন

অবশেষে ফোন এলো রিমঝিমের, পাঁচ দিনের মাথায়।

কী করছ?

তা দিয়া তোমার কী কাম? ইউ আর নো মোর মাই ওয়াইফ।

জানি।

তো জানলে জিগাইতে আছো ক্যান্?

এমনি জানতে ইচ্ছে হলো।

শুনবা কী করতাছি? তোমার ডিভোর্স পাওয়ার আনন্দে মুখের মধ্যে বুইড়া আঙুল ঢুকাইয়া চুষতাছি।

স্টুপিড। রিমঝিম হিস্‌হিস্ করে বলে ওঠে।

আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে দ্যায় মকবুল ফরাজি।

একটু পরই আবার ফোন বেজে ওঠে, রিমঝিম।

ফোন রেখে দিলে কেন? এ কেমন ভদ্রতা?

স্টুপিড মানুষেরা এমুনি করে।

তোমাকে আর কতবার বলবো, আমার সঙ্গে শুদ্ধ ও সুন্দর করে কথা বলবে। আজ পর্যন্ত শিখলে না।

আর শিখতে অইবো না। কামের কতায় আহো, বারবার ফোন লাগাইতেছ কেন?

কেন, তোমাকে ফোন করা নিষেধ নাকি?

নিষেধ অইবো কেন! তবে ডিভোর্স স্বামীর লগে বাতচিৎ গুনার কাজ। দোজগে যাবা।

এই হাদিস কে শেখালো তোমাকে?

কামের কতায় আও। বারবার ফোন কেন?

হ্যাঁ, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আসার সময় তাড়াহুড়ার মধ্যে আমি আমার পাসপোর্ট, সার্টিফিকেট ও কিছু কাগজপত্র ফেলে এসেছি। কুরিয়ারে পাঠিয়ে দাও প্লিজ। ঠিকানা দিচ্ছি...।

আচ্ছা। তোমারে একটা কথা জিগাই। তুমি তালাকনামায় লিখছো, আমি তোমারে মারধর, গালিগালাজ করছি...

আমি লিখিনি। উকিল লিখেছে।

তুমি না কইলে উকিল লিখলো কেমনে?

দ্যাখো মকবুল, আমাকে শুধু শুধু রাগাবে না। ওসব কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলেছি, আমাদের বনিবনা হচ্ছে না। তালাক দিতে হলে নাকি অমন দু'একটি অভিযোগের কথা বলতে হয়, তাই উকিল সাহেব আমাকে না জিজ্ঞেস করেই ওসব লিখেছেন।

আর তুমি এই ডাহা মিথ্যা কথাগুলি মাইনা নিলা?

আমার মানা না মানায় কী বা এসে যায়! আর তুমিইবা এতটা সিরিয়াস হচ্ছো কেন? এতে তোমার তো কোনো ক্ষতি হয়নি।

আমার ক্ষতি অয় নাই তো তোমার অইছে?

হ্যা, ক্ষতি যা হবার আমারই হয়েছে। আমি আমার স্বামী হারিয়েছি, তুমি কিছুই হারাওনি।

ফোন রেখে দ্যায় রিমঝিম।

চার

হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে, তারপর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। টরন্টোর আবহাওয়া এ রকমই। এই ভালো, এই খারাপ। কাল রাতে কাজে যায়নি সে, ক'দিন থেকেই ভাবছে, এ শহর ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে। এই ঘর, এই বারান্দা, আসবাবপত্র সব কিছু জুড়ে যেন রিমঝিমের ছায়া।

রিমঝিম চলে গেলেও যেন রেখে গেছে তার শরীরের অশরীরী ছায়া। মেয়ে মানুষরা পারেও বাবা! তবে আনন্দের ব্যাপার, মকবুল ফরাজি হিসেব করে দ্যাখে, গত চার মাসে একটিবারও ফোন করেনি সে।

অন্তত ফোনের উপদ্রব থেকে সে মুক্ত। এ রকম ভাবতে না ভাবতেই আজ ফোন বেজে ওঠে সহসা, অপর প্রান্তে রিমঝিম।

কেমন আছো?

তা দিয়া তোমার কাম কী?

তুমি কি আমার উপর রেগে আছো মকবুল?

ফালতু কথা ছাইড়া কামের কথা কও। আবার ফোন কেন?

আমি ফিরে আসছি।

মানে কি ? কই আইবা?

কেন, আমার সংসারে।

সংসার পাইলা কই? নতুন সংসার অইছে?

নতুন হবে কেন? পুরনো সংসারেই ফিরে আসছি।

বাট ইউ আর নো মোর মাই ওয়াইফ, তুমি আমারে তালাক দিছো...

তাতে কি? বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হিসেবে থাকবো। আই অ্যাম নট জোকিং মকবুল, আমি এখন এয়ারপোর্টে। অ্যান্ড আই অ্যাম কামিং।

ফোন রেখে দ্যায় রিমঝিম।

পাঁচ

স্তব্ধ হয়ে সোফার উপর বসে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে ওঠে মকবুল ফরাজি। আর সময় নেই তার হাতে, কিছু কাপড়-চোপড় আর নিত্যব্যবহারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটা ব্যাগে ভরে নেয় সে। একটা ট্যাক্সি ডাকে। ওয়ালেট থেকে রিমঝিমের রেখে যাওয়া চিরকুটটি রাখে টেবলের উপর, বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি।

মকবুল ফরাজি তখনও জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, তার গন্তব্য কোথায়!

অবশেষে রিমঝিম

গল্পের শেষ এইখানে।

আমি বললাম কি, আর উনি লিখলেন কী! আমি কি জানি না, আমি কই যাইতেছি? যত সব ফালতু কথা। উনি গল্প শেষ করলেন, মকবুল ফরাজি তখনো জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, তার গন্তব্য কোথায়!

এইটা কথা অইলো কোনো! আমি না জানলে থান্ডার বে'র টিকেট কাটলাম কেমনে? আমি তো জানি আমি কোথায় যাচ্ছি।

সমস্যা আরো আছে এই গল্পে। পূর্বে পশ্চিমের ছায়া— নামটা উনি কেন দিলেন তা আমার মাথায় একেবারেই ঢুকছে না। পশ্চিমে পূর্বের ছায়া হলেও মানতে পারতাম। জানেন, রিমঝিম যে ফিরে এসেছে অবশেষে সেই কথাটা কিন্তু উনি লেখেননি গল্পে। এই থান্ডার বে'তেই ঘটনাটা ঘটেছিল। একদিন, খুব বৃষ্টি ছিল সেদিন, আমি গাড়ি নিয়ে বেরোবো, এমন সময় দরজা খুলতেই দেখি, রিমঝিম। সাক্ষাৎ পরী।

বললাম, মকবুল গল্পে অমন হয়। কিছু অনিশ্চয়তা, কিছু রহস্য তো গল্পে থাকতেই হবে। ❖

অলঙ্করণ : : বিপ্লব সরকার

আদিলা বকুল

‘রইলে আধেক চেনা’



কবির মুখ

কবির বাঁশি শুনেছি, চোখে দেখি নাই। অষ্টাদশীর ছোঁয়ায় কিনা। গল্প, কবিতা, গান, উপন্যাস আচ্ছন্ন করে রেখেছে মনকে। যেখানে জন্মেছি এবং বড় হয়েছি সেখানে মুসলিমের সংখ্যা কম। পাড়া-প্রতিবেশী রমাদি, মঞ্জুদি, কৃষ্ণাদি, পুতুল, নাজমা ওদের সাথে ভাব। দিদিরা বড় বড়, তাদের কথা শুনতাম, গান শুনতাম। সুবল দাদা, অত্যন্ত স্নেহময়, কলেজে প্রথম বছর, যাচ্ছি, সুবল দাদা ডেকে বললেন, ‘নীলু (আমার মেঝো ভাই) কোথায় রে? একজন কবির সাথে আলাপ করিয়ে দিতাম।’

চমকে গেলাম, কবি? পাশের বাসায়?

কবি প্রায়ই আমাদের পাড়ায় যেতেন। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে।

আমার তো মন পড়ে আছে কবি কেমন। যার নাম শুনেছি। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদের কবিতা অনেক পড়েছি। রফিক আজাদের কম। তার বইও বের হয়নি। কবিকে দেখে কিন্তু মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।

ছেচল্লিশ বছর আগের কথা। স্মৃতিতে ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। স্মৃতি সতত মধুর। দেখলাম, খুব ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, আঁটসাঁট পোশাক। ঘুম ঘুম চোখ। নাহ, বেশিক্ষণ মন খারাপ থাকলো না। বাসায় ফিরে কোন ম্যাগাজিনে তার কবিতা পড়েছি খুঁজে বের করলাম। যা হোক ধলেশ্বরী যমুনায় বেশ পানি গড়ালো। একটু ঝামেলার পর পরিণয়। নতুন জীবন, নতুন বয়স, সব ভুলে লেখাপড়া এবং কবির সহচার্য জীবন চমৎকার চললো।

তার বই 'অসম্ভবের পায়ে' প্রকাশিত হয়নি তখনো। কবির খুব আকাঙ্ক্ষা বইটি বের হোক। আমি তো সুগ্রিব দোসর। যুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মহান যুদ্ধ শেষ হলো। আমরা ঢাকায় চলে এলাম। আমাদের প্রথম সন্তান তখন ছোট্টটি। প্রকাশক, প্রচ্ছদ শিল্পী, প্রেস, প্রুফ ইত্যাদি নিয়ে কবির ব্যস্ততম সময়, তারুণ্যের উত্তাপ, সে একদিন গেছে। স্মরণীয়। বইয়ের প্রুফ দেখায় তিনি ছিলেন দক্ষ। নিজে দেখবেন রাত জেগে জেগে। বইটি বেরুলো। কী অপার আনন্দ, যা অবর্ণনীয়। 'সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে' দ্বিতীয় বইটিও বেরুলো। তার জগতে তিনি ডুবে রইলেন। বাংলা একাডেমিতে কর্মরত। দিন মাস যায়, তার সাহিত্য চর্চা সমৃদ্ধ হয়। বহু তরুণ কবি, তার বন্ধুরা তার বাসায় আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন। আমি নীরব শ্রোতা থাকতাম, কারণ অজ্ঞের চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

টাইপরাইটার ছিল, তাতে লিখতেন, বাইক চালাতেন, কতবার যে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন ছোট-বড়। আড্ডা জমাতেন, হোহা করে অট্টহাসিতে নিজে এবং অন্যদের হাসাতেন, ফাটাতেন। অনুজদের ভালোবাসতে দেখেছি। শিহাব সরকার, আবিদ আজাদ, সুমন রহমান আমার ছোট ভাইয়ের মতো ছিল। মাহমুদুল হক বটু ভাই, আসাদ চৌধুরী ভাই, আবদুল মান্নান সৈয়দ, হায়াৎ সাইফ, উনাদের সামনে আমি ছোট বোনের মতো ছিলাম। বিশেষ করে আসাদ ভাই। আমিও যথেষ্ট বয়সে বয়সী এখন। সবার নাম মনে করতে পারছি না। সেদিনের সোনার দিনগুলোতে তাদের ভালোবাসা, স্নেহ, সম্মান হৃদয়ে গেঁথে আছে। অনেকে চলে গেছেন বহু দূর দেশে।

হয়তো চারটি শিশু নিয়ে তার সাথে দীর্ঘ সংসার হয়নি। নিয়তি আমি মেনে চলি। হয়তো তারই লীলা রহস্য।

মা বলতেন, কেউ যখন জান্নাতবাসী হয়, তখন তার প্রতি কোনো রাগ রেখো না– ময়ূরের পালক দিয়ে চোখ ঢেকে রেখো– পালকের রূপটি যেন ফুটে থাকে।

মজার মজার কথা বলতেন, ঈদ এলে আমি কিছু টাকা চাইতাম, বলতেন, চলো ধর্ম বদলে ফেলি।'

মা-বাবার সাথে কোনোদিন জোরে কথা বলতে শুনিনি। বাচ্চাদের সাথে মাঝে মাঝে খেলতেন। মেজাজ ভালো থাকলে। একদিন ছোট মেয়েটি পেছন থেকে বাবার চোখ চেপে ধরে বলছে, বলতো আব্বু, আমি কে? চিনে ফেলাতে মেয়ে তো ভীষণ রাগ। বাবা তাকে কোলে নিয়ে, হাতে-পায়ে ধরে আদর করে মান ভাঙালেন। স্নেহের প্রকাশটি ছিল কম। মাঝে মাঝে বাচ্চাদের স্কুলে নামিয়ে দিতেন, ছোট বয়স ওদের তখন। তবুও ওরা পরিষ্কার মনে রেখেছে।

শিল্প-সাহিত্য ছিল জীবন। ততটা সংসারী বুদ্ধি ছিল না। নান্টু নির্ভরশীল ছিলেন।

একবার চুনিয়া বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলা একাডেমির সহকর্মী বন্ধুদের সাথে। লিখলেন– 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া।' বহু বই, বহু বড় বড় পুরস্কার পেয়েছেন। 'আলাওল' সাহিত্য পুরস্কার যখন পেলেন, তখন আমার চার সন্তানসহ নিয়ে গিয়েছিলেন। বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। ছোট ছোট বাচ্চারা আমার, কেউ একজন একটু কটাক্ষ করে ছিলেন তাতে কিছু হয় না। লঘুচাপ অল্প বৃষ্টিতেই চলে যায়। জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন কত কিছুই তো জীবনে আসে। যা সত্যি, তা সাত আসমান ভেদ করে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। আমি কখনো তাকে বা তার কাজে কোনো বিঘ্ন ঘটাইনি। আপ্রাণ চেষ্টা করেছি সহযোগিতার, এটি আমার আত্মবিশ্বাস।

মাঝে মাঝে বলতেন, 'তোমাকে স্ত্রী নয়, প্রেমিকার মতো দেখি।' বলতেন, 'তুমি অযোধ্যার রানী।' কতদূর সত্যি বা মেকি জানি না, আমার কাছে মধুর সম্পদ। জীবন বড় বিচিত্র। কী করে যেন কী হয়ে গেলো। হয়তো আমি বুঝতেই পারিনি জীবনের কোনো জটিলতায় আমি যেতে পারি না। আগেই আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি থাকি। আমি শান্তিকামিতা মনে করি, কবি কি মনে করেছেন ভালো করে জেনে নিইনি। তাই তো বললাম, 'তুমি আধেক চেনাই রয়ে গেলে।' একমাত্র বড় ভাই, বড় বোনকে ভীষণ ভালোবাসতেন। দিলারাকে; সন্তানদের খুব ভালোবাসতেন। আমাকে বাসতেন কি না ভালো করে কোনো দিন জিজ্ঞেস করিনি? বড় কষ্ট হয়, জানা হলো না, জানা হলো না। 'কবিদের' প্রতি আচ্ছন্নতায় বুঝতে শিখেছি জীবন, তার সঠিক উত্তর অজানাই রয়ে গেল। খুব নিয়ম করে লিখতেন না। যখন মাথায় আসতো তখনই কিছু লিখতেন।

বেরসিক মানুষ পছন্দ করতেন না। মুগ্ধ হতেন কম, তবে যা পছন্দ করতেন তা খুব ভালোভাবে করতেন। বুঝেসুঝে প্রশংসা করতেন।

আমার বড় ভাইয়ের বিয়ের কনে দেখতে যাওয়ার সময় আব্বা তাকে নিয়ে যেতেন। আর কবি আমাকে বলতেন, কেন শ্বশুর আব্বা আমাকে নিয়ে যান, আমি যাকে দেখি তাকেই পছন্দ হয়; আমি বলতাম, মেয়েদের দেখলেই?

ছেচল্লিশ বছর আগের দিনগুলো। মাঝখানে কালাহারি, সাহারা মরুভূমি স্মৃতি তো ধূসরবর্ণ হবেই।

ক্ষমা চাচ্ছি। অনেক লেখা যায় তো কিন্তু মন ব্যথা করে। আমিও তো অপেক্ষায় আছি প্রভুর ডাকের। আকাশ নদী পাহাড় সাগর যে সত্যি, জীবনের ঘটনাপ্রবাহগুলোও তাই। রকমটা ভিন্ন রক্তপাত বুকের ভেতরে। বুঝতে এবং বোঝাতে সমস্যা। ভাষা ঠিকমতো জানি না। সঠিক প্রকাশটা করতে পারি না।

রোজ হাশরের ময়দানে যদি উষ্ণ হাসি হেসে কবি হাত বাড়িয়ে দেন খুশি হবো, না দিলে মেনে নেব, কিন্তু আমার অকালপ্রয়াত চাঁদনী-দীপিতা, সে বেহেশতের দরজায় আমার অপেক্ষায় বসে আছে– সেই সোনামণি নীল পায়রা যেন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। একটি বার শুধু একটি বার, প্রভু।

প্রভু, তুমি মহান, কন্যা পিতাকে বেহেশতের অতি চমৎকার বাগিচায় মধুর প্রশান্তিতে ভরে রেখো। আমাকে ক্ষমা করো। আবারও ক্ষমা করো।

আমার সঙ্গে যেন একবার সন্তানটির সঙ্গে দেখা হয়, তার বাবার সঙ্গে যেন দেখা হয়। তখন যেন পূর্ণিমা থাকে তোমার বিচারের মাঠে।

আমিন। ❖

সৈয়দ ইকবাল

দ্বিতীয়জন



আখ্যান

নেকস্ট. মে আই হেল্প ইউ স্যার? মৃণ্ময় রয় চমকে সামনে তাকালো। টরন্টো শহরে তার দীর্ঘ বছরের বাস সে মনে করতে পারে না কখনো সে ম্যাকডোনাল্ড বা স্টারবাক. সেকেন্ড কাপের কফি খেয়েছে কি-না! তার এক ও একমাত্র পছন্দ টিমহর্টনের কফি। কী জাদু মেশানো থাকে কে জানে!

'টিমহর্টন' ম্যাকডোনাল্ডের মতোই চেইন ফাস্টফুড আর কফিশপ। তবে বিশ্বজুড়ে নয়. শুধু কানাডার অন্টারিও প্রদেশে সব শহরে তুমুল জনপ্রিয়। মৃণ্ময় রয় ভুলেই গিয়েছিলো সে কফি নিতে টিমহর্টনের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে চিন্তার অন্য জগতে হারিয়ে যাওয়া মৃণ্ময়ের পুরোনো অভ্যাস কখন যে সামনের সাতজন সরে গেছে সে টেরই পায়নি. ভাবতে ভাবতে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো। কাউন্টারের মেয়েটির কথায় চমকে উঠলো:



অলঙ্করণ : : নাজিব তারেক

–ইয়েস প্লিজ, গিভ মি স্মল কফি উইথ ওয়ান ক্রিম থ্রি সুগার। মেয়েটি ক্যাশ মেশিনে আঙুল চাপিয়ে চকিতে ওর দিকে তাকালো। কানাডার মানুষ কফির সঙ্গে সুগার নেয় না প্রায়, নিলেও এক আধ স্পুন। একেবারে ত্রি স্পুন! তাও লোকটির জুলফিতে চুলে বেশ ক'টা চুলে পাক ধরেছে।

মৃণ্ময় বুঝলো তার দিকে চকিত চাহনির কারণ। থ্রি স্পুন তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। যতদিন ডায়াবেটিস না হয় চালিয়ে যাবে সে।

কফি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। ভেতরে চেয়ার-টেবিলে বসে না খেয়ে তার অফিসে যেতে যেতে গরম কফিতে চুমুক দেবে। পার্কিংয়ে তার কালো ছোট্ট মার্সিডিজের দরজা লক করে না সে, শুধু আবার খোলার আলসেমিতে। টরন্টো শহরে গাড়ির দরজা খোলা থাকলে কেউ কিছু নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও তেমন ঘটে না। মৃণ্ময়ের অফিস মাত্র এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। কিংস্টন রোড দিয়ে গিয়ে মিডল্যান্ডে রাইট টার্ন, তারপর সাগরের মতো জলরাশি ওন্টারিও লেক, ব্লাফার্স আর্চ আর সিগালের তুমুল হৈচৈতে ভরা জাগায় দোতলা এক পুরোনো বাড়ির ওপরতলায় তার অফিস। সে ইচ্ছা করে টরন্টো ডাউন টাউনের বিশালদেহী সব অট্টালিকার কংক্রিটের জঙ্গলে নিজের অফিস করেনি। মাত্র পনেরো মিনিটের দূরত্ব ডাউন টাউন থেকে অথচ কত নিরিবিলি জায়গাটা! জানালা খুললেই লেকের জল ছুঁইয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসও মৃণ্ময় গায়ে মাখতে খুব ভালোবাসে। জানালার ব্লাইন্ড খুলে রেখেছে সে। সবসময় জানালাটি খোলা দেখতে মজা পায় সে। তীব্র শীতে গ্লাসের পাল্লা যদিও বন্ধ থাকে, তবে বাইরের চরাচর সব দেখা যায়। সামারের তেজি রোদ, নীল আকাশে সিগালের ঘুরপাক। শীতে সাদা তুষারের কাফনে মোড়া সবকিছু। অঝোর ঝরছে স্নো আকাশ থেকে। জানালাটি যেন তার মনের জানালা। প্রকৃতির এই দৃশ্যাবলি দেখে মৃণ্ময় শেখে নিজকে শক্ত করতে, জীবনযুদ্ধে বুদ্ধিমান শক্তিশালী যোদ্ধা না হলে শুধু বারবার মার খেতে হয়।

আজ অফিস খুলে এক হাতে কফি আর অন্য হাতে লেটার বক্স থেকে নেওয়া এক গাদা চিঠিপত্র আর ক্রেডিট কার্ডের বিল নিয়ে তার টেবিলের পেছনে চেয়ারে বসে জানালার দিকে তাকাতে তার ফারাহ বিনতে হাশেম বিন্দুর কথা মনে পড়লো। এতো লম্বা নামের কী দরকার! নামের মধ্যে সুন্দর দুটি শব্দ রয়েছে। ফারাহ এবং বিন্দু। বিন্দু মানে ইংরেজিতে 'ডট'। মানুষের ফেলে আসা জীবন তো ডট আর ডট-এ ভরা। বিন্দু বিন্দু জীবন জমে হয়ে ওঠে জমজমাট জীবন।

মেয়েটি আজ তার অফিসে আসবে। মৃণ্ময় রয় জানালার কার্নিশে এসে বসা এক মেধাবী সিগালের দিকে তাকিয়ে ভাবতে চাইলো বিন্দু মেয়েটি কী রকম! বয়স কত? সাধারণত ফ্যাশন ডিজাইনের ছাত্রী স্লিম সুন্দর হয়। সে বাংলাদেশি ফ্যাশন জগৎ সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না, শুধু বিবি রাসেলের নাম শুনেছে। তবে ফারাহ বিনতে হাশেম বিন্দু বাঙালি হলেও কানাডিয়ান। টরন্টো ফ্যাশন ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম না-কি দ্বিতীয় হয়ে গ্র্যাজুয়েশন করে ঢাকা ফিরে গিয়েছিলো। তার স্বামীর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া পাঁচ-পাঁচটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি রয়েছে। তার নিজেরও গুলশান ও ধানমণ্ডিতে দুটি 'ফ্যাশনডট' নামের বুটিক আউটলেট রয়েছে। সে আসলে কেন পড়ে থাকবে টরন্টোতে! টরন্টো তাকে এক জীবনে কতটুকুই-বা দেবে? তার চেয়ে অনেক বেশি দেবে ঢাকা। বিন্দু নাকি ইতিমধ্যে তরুণ ফ্যাশন পারসোনা হয়ে উঠেছে সেখানে। ফ্যাশন নিয়ে টকশোতে কথা বলা আর নিজের নতুন ডিজাইন কালেকশন মডেলদের পরিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করালে ঢাকার টিভি চ্যানেলগুলো খুশিতে ধন্য হয়ে যায়।

মৃণ্ময় রয় যতই চেষ্টা করছে মেয়েটির কথা ভেবে মগজকে ব্যস্ত রাখতে, তারপরও প্রতিদিনের মতো জানালায় ভেসে উঠলো করুণাময়ী দেব বর্মণের মুখ; তার এক্স ওয়াইফ। টরন্টোতে এসে সে নিজেই নামটি একটু কাটছাঁট করে করুণা রয় হিসেবে পরিচিত করিয়েছিলো টরন্টোয় সবার সঙ্গে। তার অফিসে এসে প্রায় বলতো, ঘাড় পর্যন্ত কাটা সিল্কি চুলে ঝাটকা মেরে– কী একটা অফিস, তার আবার প্রিয় জানালা! খুললেই যদি ডাউন টাউনের উঁচু মেঘ ছুঁই-ছুঁই করা টাওয়ার বিল্ডিংয়ের ফাঁকে কংক্রিটের অতিকায় টুথপিকের মতো সিএন টাওয়ার দেখা না যায়, তাহলে আর কিসের অফিস আর কিসের জানালা! টরন্টো শহরে থাকাই বৃথা।

করুণার পছন্দ বিশাল শহর, বিশাল বিল্ডিং, বিশাল গাড়ি। কুইন সাইজ জীবন। বৈভব ছাড়া যেন তার কাছে অন্য কিছুর

মূল্য নেই। মাথা থেকে করুণাকে আবার সরাতে চাইলো। বিন্দুর কথা ভাবতে চাইলো, তার বাবা-মা এমনকি স্বামী– সবাই কানাডার সিটিজেন। তাদের ইমিগ্র্যান্টদের মতো হাজিরা দিতে সময়মতো থাকা-টাকার ঝামেলা নেই।

– আমি অফিস থেকে বেরুচ্ছি।

মৃণ্ময় চমকে তাকালো। তার অফিস সেক্রেটারি জেনিফার কার্লোভা রুমানিয়ান মেয়েটি এতোই লম্বা যে, তার দিকে তাকাতে মুখ উঁচু করতে হয়।

– আমার ছেলেকে ডে-কেয়ার থেকে নিতে হবে। জেনিফার সিঙ্গেল মাদার। পেটে করে ছেলেটি নিয়ে স্বামীর জ্বালাতনে পালিয়ে কানাডা এসেছিলো। সিঙ্গেল মাদার খুব সহজে অ্যাসাইলাম কেস পেয়ে যায়। মানে কানাডায় থাকার বৈধতা পেয়ে যায়। নারীর অধিকার কানাডায় সবার ওপরে। অথচ নারী তার অধিকারে যদি কোনো পুরুষকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়, তার কোনো বিচার নেই।

– যাও জেনি, দেরি করো না। স্কুল বাস ডে-কেয়ারে নামিয়ে দিলে ছেলে মায়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকে।

– ওকে, বস।

– ছেলে-মেয়ে মানে নিজের সন্তান কী জিনিস, আমার থেকে ভালো কে জানে! গুড বাই জেনি।

জেনিফার কার্লোভা হাত নেড়ে বাই-বাই করে চলে গেলো। মৃণ্ময় আবার তার রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে জানালার বাইরে অনেক দূরে দৃষ্টি নিয়ে গেলো। বাইরের বিশাল আকাশে মেঘের চলাচল দেখলে তার ভেতরে জমে ওঠা শূন্যতা হালকা হয়। মেঘের সঙ্গে মিলেমিশে ভেসে ওঠে তার দুই সন্তানের মুখ। তেরো বছরের ছেলে রিনো, বারো বছরের মেয়ে রিঙ্কি। এদের এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাতে হবে, যেখান থেকে তারা জীবনে নিজের পথ নিজেরাই চলতে পারে। তবে সেই সময় আসতে দেরি আছে এখনো। তার স্ত্রী যে ছিল করুণাময়ী দেববর্মণ থেকে করুণা রয়, সেখ নেই থামেনি; এখন সে পরিচিত ক্যারেন গোল্ডবার্গ বর্মণ নামে। করুণাকে সে পছন্দ করেছিলো তার সরল নিষ্পাপ মুখ দেখে। কোনো প্রেম-মহব্বতের ব্যাপার ছিলো না। অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ।

টরন্টো থেকে ঢাকা গিয়েছে বিয়ে করতে। দিদি আর তার বর পাঁচ-পাঁচটি সুন্দরী দেখে নিয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন। সে যেন এসে ফাইনাল করে। পাঁচ মেয়ের পিতা ট্রেকে দৌড়বিদের মতো কে কার আগে দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন হবে সেই চেষ্টায় মহাব্যস্ত। মেয়েরাও পার্লারে পার্লারে ঘুরে কে কত সাজগোজ করে সুন্দরী থেকে স্মার্ট হবে সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। হাজার হোক কানাডার টরন্টো শহরের স্থায়ী বাসিন্দা জামাই। দেশি মেয়েদের মা-বাবারা কেন যে এত পাগলের মতো পরবাসী পুরুষদের ধরতে চান, তার বোধগম্য হয় না।

দিদি আর জামাই বাবুর লিস্টে পাঁচের পর অনেক অনুরোধে একটি ৬ নম্বরও ছিলো। অনুরোধে ঢেঁকি গিলেছিলেন তারা। মেয়েটির রঙ ময়লা, বাবার অবস্থায়ও সাধারণ চাকরিজীবী, বংশ-ঐতিহ্য, বিষয়-সম্পত্তি সবই মাজুল। দিদিরা ধরেই রেখেছিলেন পাঁচজন চোখ ধাঁধানো সুন্দরী আর্থিক অবস্থায় হৃষ্টপুষ্ট বাপ ছেড়ে ঐ আধকাল্লি মেয়ের দিকে তার প্রবাসী ভাই হয়তো চোখ তুলেই দেখবে না।

হলো ঠিক উল্টো। পাঁচজন সুন্দরী স্মার্ট চটপটে কানাডা যেতে প্লেনের সিঁড়িতে এক পা দেয়া সবাইকে একের পর এক দেখা, বাড়িতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া। কে কত কী দিতে পারার ক্ষমতা রাখে তার কম্পিটিশন। মৃণ্ময়ের দম বন্ধ হবার উপক্রম। হয়তো ফোনে অনেক জোরাজুরি করায় দিদি জামাই বাবু নিমরাজি হলেন একবার মৃণ্ময়কে নিয়ে করুণাকে দেখতে যেতে। দিদি জামাই বাবু আগেই খাওয়ার লিস্টে কী কী থাকবে জানিয়ে দিলেন। সবই তার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে– এই আমাদের মৃণ্ময়; সামান্য এই সব খেতে পছন্দ করে আর কি!

– উফ্। কেন তোমরা আমার নামে উল্টাপাল্টা এসব কথা চালিয়ে যাচ্ছো? মেয়ে দেখতে যাবো খাওয়া কী দেবে না দেবে এসব বড় কথা কেন তোমরা মনে করছো?

–শোনো, পাগল ছেলের কথা শোনো। কী চাইছি আমরা, একটা মেয়ে ফুড়ুৎ করে কানাডার নাগরিক বনে যাবে! আমি নিজেই তো ছোট ভাইয়ের জন্য কত চেষ্টা করলাম, পঁচিশ লাখের নিচে কেউ কথাই বলতে চায় না। বলেন জামাই বাবু। মনে মনে মৃণ্ময় ভাবছিলো বিয়ে না করেই পালাবে। পরের বার এলে নিজেই বিয়ে ঠিকঠাক করে দিদিদের জানাবে। এখনো দিদিরা কপাল চাপড়ান অনুরোধের ঢেঁকি গিলে কেন ছয় নম্বর মেয়ে করুণাকে দেখতে গিয়েছিলেন! তাদের হাতেই নিজের ছোট ভাইয়ের সর্বনাশ হয়ে গেলো। অবশ্য তারা পুরোটা দায়ী করেন মৃণ্ময়কে। সে ছয় নম্বর হাবাগোবা আধময়লা সাধারণ বাপের তুচ্ছ মেয়েটিকে এমনভাবে পছন্দ করে বসবে, তারা স্বপ্নেও ভাবেনি।

করুণাদের সাধারণ ভাড়াটে বাসা তা আবার খিলগাঁও হট্টগোলে। খাওয়া-দাওয়ায়ও তেমন বাড়াবাড়ি নেই। দিদিরা ভেবেছিলেন, এত্তো করে যখন চাইছে মেয়ে দেখাতে, দেখে জব্বর খাওয়া খেয়ে নি, ও মেয়ের সঙ্গে তার ভাইয়ের বিয়ের প্রশ্নই তো ওঠে না। মেয়ের বাবা যতই চাক প্রবাসী জামাই পাওয়ার ক্ষমতাই তো নাই তার। বিয়ে হয় কীভাবে?

তাদের মাথা বজ্রপাতের মতো মনে হলো বিদেশে থাকা শিক্ষিত স্মার্ট ছেলে মৃণ্ময় কোন আক্কেলে পছন্দ করে বসলো মেয়েটিকে। এমনিতে মৃণ্ময়ের ফর্সা মেয়ে তেমন ভালো লাগে না। করুণার শুধু শ্যামলা রঙই নয়, সারা মুখে লেপ্টে আছে এক নিষ্পাপ সারল্য। বড় বড় চোখে কালো কাজল। লাল টিপ। শ্যামলা মুখে এক অপূর্ব আভা আলোর মতো খেলে বেড়াচ্ছে। প্রথম দর্শনে করুণাময়ীকে পছন্দ করে কথা দিয়ে দেয়ার ঘোর আপত্তি করলেন দিদি-জামাইবাবুরা।

তারা ধরে নিয়েছিলেন শ্যালক ছোট ভাই প্রবাস থেকে এসেছে বিয়ে করতে। আরো পাঁচ বাড়ি যাবেন, সুন্দরীদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন। গোয়েন্দাদের মতো কত কী প্রশ্ন করবেন। বিত্তশালী কন্যাদের পিতৃদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবেন। কিছুই হলো না। জামাইবাবুর কলিগের ছোট ভাই এই সুইডেন থেকে বিয়ে করতে এসে ত্রিশটা মেয়ে দেখেছে, খেয়েছে মৌজ মেরেছে। তাদের শ্যালক তো কানাডার মতো এক বিশাল দেশের নাগরিক, দেখতে সুদর্শন। সেখানে নিজের ব্যবসা আছে। তাই তার বিয়ে নিয়ে তিনি কত প্ল্যান দাঁড় করিয়েছিলেন। সব ভেস্তে গেলো।

দুই

মৃণ্ময়ের ছবি দেখেই মেয়েটিকে ভালো লেগেছিল। এমনিতে সে মনে মনে বড়লোকের সুন্দরী, স্মার্ট কন্যাদের মেকিপনা থেকে দূরে থাকতে চাইতো, দিদি আর জামাইবাবুর পাল্লায় না পড়ে উপায়ও তার ছিলো না, ঢাকায় বড়দিই তার গার্ডিয়ান। তবু সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিপত্তি আর বৈভবের কাছে বলি হতে পারলো না। সাধারণ ঘরের অসাধারণ লাবণ্য যেন করুণাময়ী। একেই যেন মন খুঁজছিলো এত্তোদিন। দিদি আর কি পারবেন হাজার হোক ছোট ভাই! মেনে নিলেন সব।

প্রথমবার দেখার সময় মাত্র কয়েকবার চোখে চোখ রাখার সুযোগ পেয়েছিল মৃণ্ময়। তাতেই সে অনুভব করে করুণাময়ীর চোখের আকুতি ঝিলিক দিয়ে বলছে যেন আমি তোমার! নিয়ে চলো আমাকে। আমি বেরুতে চাই ছিন্নভিন্ন করে এই খাঁচা।

মৃণ্ময়ের কী হয়েছিলো কে জানে। দিদির হাত চেপে কাঁপা গলায় বলেছিলো– ফাইনাল কথা বলো দিদি, ওর বাবাকে বলে পাকাপাকি করে ফেলো। স্ত্রী হিসেবে একেই খুঁজছি আমি।

চট দেখা আর পট বিয়ে চটপট হয়ে গেলো। বিয়ের পর নয় মাস ছিলো সে দেশে। খুবই কম গেছে দিদির বাড়িতে। দিদি অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারেননি কী এমন জাদু আছে এই আধময়লা রঙের ড্যাব ড্যাব চোখের মেয়ের মধ্যে। কী দিয়ে সে জয় করে নিলো মুহূর্তে সব। বোধহয় এক রকম ঈর্ষা বোধ তৈরি হয়েছিল দিদির মধ্যে। ইদানীং তিনি হাতে পেয়ে গেছেন জয়ের

পতাকা। তার অপছন্দ মেয়ে বিয়ে করলে কী হয় আঙ্গুল চোখে দিয়ে দেখাচ্ছেন বারবার। করুণাময়ী দেব বর্মণ বদলে করুণা রয় দুই সন্তান রেখে তাকে ছেড়ে গেছে। বিয়ে করেছি পোলিশ বংশোদ্ভূত বিরাট শিল্পপতি স্মিথ গোল্ড বাগচে।

মৃণ্ময় দিদির থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে টরন্টোতে বলেই সার্বক্ষণিক বকাবকি থেকে বেঁচে গেছে। জামাইবাবু বলে– শ্যালক তোমার বউ তো তোমাকেই শুধু ভাসিয়ে যায়নি সঙ্গে আমারও ভাসান দিয়ে গেছে। আমার সূত্রে যোগাযোগ যেহেতু। কেন যে আমি তোমার এই অলক্ষুণে বিয়েতে চরম বাধা দিই নাই এর জন্য আমার ওপর তোমার দিদি বুলডোজার চালাচ্ছে হরদম।

দিদি আসলে মেয়ে বলে হয়তো বুঝতে পারেনি করুণার ওপর আমার এই তীব্র টান জন্মেছিল কেন! ফর্সা টানা চোখের মেয়েরা সুন্দরী সিল মারা পুতুলের মতো। তার মতো পুরুষকে টানে না! তীব্র টান তো দূরে থাক। এই তীব্রতা আজ কোনো মেয়ে বুঝতে পারে না। করুনা সাধারণ বাঙালি মেয়েদের চেয়ে বেশ লম্বা, স্লিম। শরীরে বাড়ন্ত কিছু থাকলে তা হচ্ছে তার অপূর্ব বক্ষ। সুন্দর বড় কালো চোখের নিচে গালটা চাপা, র‍্যাম্প মডেলদের মতো। করুণাময়ীর দিকে যে কোনো পুরুষ একবার তাকালে মন ভরে না। দ্বিতীয়বার তাকাতে হয়।

তার সরল মুখের আড়ালে বাস করতো অন্য এক নারী, যে নারী বলে নিজকে দুর্বল মনে করে না, নিজের ইচ্ছাপূরণ ছিনিয়ে নেয়। তাকে একবার দেখে যেমন মন ভরে না তেমনি বছরকে বছর সঙ্গে থেকে চেনা যায় না।

টরন্টোর নামি ল'ফার্ম সিকদার অ্যাসোসিয়েট-এর প্রধান ব্যারিষ্টার পল্টু সিকদারকে ডবল ফি দিয়ে মাত্র নয় মাসে স্পাউস ইমিগ্রেশনের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিলো মৃন্ময়। করুণাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে ঢাকা যেতে হবে, নতুন বউকে সঙ্গে আনা দীর্ঘ এই বিমানযাত্রা জীবনের এক শ্রেষ্ঠ সময়। ঠিক সেই সময় তার গার্মেন্টস বাইং ফার্মের বেশ কটা বড় অর্ডার বড় মাছের মতো ধরা দেবে-দেবে করছিলো। তাই একবার সে ভাবলো ঢাকা টু টরন্টো আমিরাত এয়ারও থেকে টিকেট পাঠিয়ে দেয়। টরন্টোর পিয়ারসন্স এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ওয়ান থেকে সে নিজে গাড়িতে করে নিয়ে আসবে। এসব কী ভাবছে! পরমুহূর্তে সে ঘাবড়ে গেলো কী ভাবছে! জীবনে করুণা বিমানে ইন্টারনাশনাল ট্রাভেল করেনি কখনো। দেশের ভেতরে করেছে কিনা সে জানে না। এই সহজ সরল মেয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিধঘুটে জংলা নিয়মের ঢাকা এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন, রাষ্ট্রময় পার করে কী প্লেনে চড়ে বসতে পারবে। পারলেও দুবাইয়ের মতো এত্তোবড় এয়ারপোর্টে প্লেন বদলাতে সময় মতো পারবে কী না! কোত্থেকে কোথায় হারিয়ে যায় তার নতুন বউ।

সে চাকরি ছেড়ে নিজে ব্যবসা শুরু করেছে মাত্র বছর খানেক। কষ্টেমিষ্টি টেনে নিয়ে বাড়ছে সে। চাকরি থেকে ভবিষ্যৎ ভালো, তবে ক'টা বছর হাড়ভাঙা খাটুনি দিতে হবে। এখুনি বিয়েটা না করলেও হতো। পুরোপুরি বিয়ের কথা ভেবেও দেশে যায়নি সে। দিদি হরহামেশার মতো বললেন পাঁচটি মেয়ে বেছে রেখেছেন। তারপরই করুণাময়ী দেবীকে দেখে সে কুপোকাত। বিয়ে ছাড়া আর গতি ছিল না। বড় মাছের মতো বড় কয়েকটা ওয়ার্ডার তার আরো কাছে এসে ঘুরঘুর করছে। সে ঢাকা গেলে হয়তো ধরা যাবে না।

মৃণ্ময় নিজেকে শক্ত করে সিদ্ধান্ত নিলো জীবনে অনেক সুযোগ আসবে ব্যবসায়। তবে কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসার সুযোগ হয়তো আর আসবে না। সে ঠিক করলো যাবে ঢাকা।

তিন

টরন্টোর ডেনফোর্থ রাস্তা আর ভিক্টোরিয়া পার্ক এভিনিউর কাছেই বাংলা টাউন। ভিক্টোরিয়া পার্ক সাবওয়ে স্টেশনের লাগোয়া ২৪-২৮ তলা বিল্ডিং টাওয়ার সব দাঁড়ানো। এই গুচ্ছ বিল্ডিংগুলোর নাম ক্রিসেন্ট, মেসি, টিসডেল তাও আবার একটি বিল্ডিং না! এক থেকে সাত, আট, দশ পর্যন্ত আছে যেমন ক্রিসেন্ট-১, ২ থেকে ৭-৮ পর্যন্ত তেমনি মেসি, টিসডেল একাধিক অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। সব বিল্ডিং মিলিয়ে হাজার হাজার পরিবারের বাস এখানে। প্রত্যেক বিল্ডিংয়ের প্রত্যেক ফ্লোরে তিন থেকে দশটা বীর বাঙালি পরিবার থাকে। কানাডায় আসার মাত্র দুটি উপায় চালু– প্রথমত, ভদ্রোচিতভাবে কানাডা সরকারের কাছে নিজের যোগ্যতার শত কাগজপত্র দিয়ে প্রমাণ করে ইমিগ্রেশন নিয়ে। দ্বিতীয়ত, জোর করে এসে দুই হাত উর্ধ্বমুখী করে প্রাণভিক্ষা বা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করা। কোর্টে কেস চলে দীর্ঘদিন এতদিনে কাজকর্ম করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে জমে বসে আশ্রয় প্রার্থীরা। কেস হেরে দেশে ফেরত গেছে শ'য়ের মধ্যে দু'একজন। বেশিরভাগ মানুষকে কানাডা গ্রহণ করে নেয়। বেশিরভাগ বাঙালির টরন্টো জীবন শুরু হয় এই ক্রিসেন্ট, মেসি, টিসডেল থেকে। পরে যে যতটুকু সাফল্য পায়, ঠিক তত বড় বাড়ি কিনে চলে যায়। গিয়েই জানান দিতে থাকে আমি আর ক্রিসেন্ট, মেসি, টিসডেল বাঙালি ঘেটোতে নেই। নিজের বিশাল বাড়ি কিনেছি, ডাকবো একদিন, খেতে আসতে হবে। আবার ক্রিসেন্ট, মেসি, টিসডেলের মধ্যেও অ্যাপার্টমেন্ট বদলাবদলি চলতেই থাকে হরহামেশা। প্রায় এলিভেটরে (লিফট) উঠতে নামতে শোনা যায়– আমি ম্যাসাতে এখন খালেদ ভাই! জামাল ভাবী কেমন আছেন আমরা আপনাদের টিসডেল-২০ শে মুব (মুভ) করছি আগামী মাসে। উত্তমদা আপনেরা নাকি চলে গেছেন ক্রিসেন্ট ছেড়ে। প্রায় এসব সংলাপ ভিক্টোরিয়া সাবওয়ে স্টেশনের বাতাসে ভাসে। এই বাঙালি ঘেটো নিয়ে জনপ্রিয় দৈনিক 'টরন্টো স্টারে' বেশ বড় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। টরন্টো হচ্ছে নিউইয়র্কের ছোট ভাই। নিউইয়র্কের মতো হুলস্থুল হট্টগোল নেই। সেই তুলনায় নিরিবিলি বলা যায়। নিউইয়র্কের মতো বাঙালিদের আয়-ইনকামও নেই এখানে। ভালো মানুষজনের চলার মতো চলে যায়, রাত-দিন স্বামী-স্ত্রী হাড়ভাঙা খাটুনি করে সন্তানদের ভালো শিক্ষায় মানুষ করছে ভেবেই দিন-রাত পার করেন। অবশ্য বীর বাঙালির মধ্যে যারা অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে পারদর্শী, তারা তো সব জায়গায় ভালো থাকেন। মৃণ্ময় ভাবে, কোনো দিন না এরা কানাডা সরকারের আর্থিক গ্র্যান্ট নিয়ে এনজিও খুলে নতুন প্রবাসীদের জন্য শিক্ষাদান কার্যক্রম শুরু করবেন। প্রবাসে এসে অতি অল্প সময়ে কীভাবে অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙন এবং নিজের মাথা সেভ করার কোর্সে ভর্তি হোন। মৃণ্ময়ও এসে উঠেছিল এই ক্রিসেন্ট বিল্ডিংয়ের বাইশ তলা ছোট্ট ওয়ান রুমের অ্যাপার্টমেন্টে। তার কিন্তু ভালো লাগে দেশে না থেকেও দেশের আমেজ পাওয়া। যত্রতত্র কাগজ ফেলা, অনবরত বাচ্চার কান্না, হাউকাউ! ভাবিদের উচ্চস্বরে ঝগড়া। তবে ভালো ব্যাপারও অনেক আছে। ভাবিরা যারা দেশে স্কুল-কলেজে পড়াতেন, ব্যাংকে ভালো চাকরি করতেন, সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। প্রবাসে এসেই তারা প্রথমে বোঝেন দেশের ওসব কাজ লাইনে-লাইনে জানাশোনা থাকলে করা যায়। এখানে নিজের ফাঁকিজুকিতে ভরা শিক্ষা ব্যবস্থার বড় ডিগ্রি বসে বসে পেঁয়াজ কাটা ছাড়া কোনো কাজে আসে না। বাঙালি নারী বুদ্ধিমতী উপলব্ধির পর সময় বেশি নষ্ট করেন না, নতুন লাইনে নিজেকে নিবেদিত করেন। যারা টিচার ছিলেন, লেকচারার ছিলেন, সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, এখন বাসায় বসে দারুণ ডালপুরি, পরোটা বানিয়ে দোকানে দোকানে সাপ্লাই দিতে শুরু করেন। বাসায় অন্যদের অনুষ্ঠানের বিরিয়ানি, তান্দুরী চিকেনের ক্যাটারিং সাপ্লাই করে জমিয়ে ফেলেছেন। অনেকে তো টয়োটা গায়েনা ভ্যান কিনে মিসিসাগার ইন্ডিয়ান দোকানেও সাপ্লাই করে জমজমাট অবস্থায় নিজেদের দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। একটু ভীতু প্রকৃতির ভাবীজানরাও সাহসের সঙ্গে শুরু করেন 'টিম হর্টন'-এ কাজ। শুধু একটাই অসুবিধা– ভাবিরা তাদের আসল নাম হারিয়ে ডালপুরি ভাবি, বিরিয়ানি ভাবি, ক্যাটারিং ভাবীতে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। স্বামী ভাইদের স্ত্রীদের এই বাড়তি কামাইয়ের জন্য গর্ববোধ করার জায়গায়

সারাক্ষণ খুটখাট বকাবকিতেই অল্প সময়, যা একসঙ্গে পান তা পার করেছেন।

চার

মৃন্ময়ের একরুম অ্যাপার্টমেন্ট মানে শোবার এক বড় রুম ডাইনিং স্পেস এতোটাই বড় যে খাবার টেবিল চেয়ার ছাড়া টু-সেট সোফা রাখা যায়। সামনের দেয়ালে ঝোলে টিভি। বেডরুমে তার সিঙ্গেল খাট ফেলে কিনে আনতে হলো কেইন বেড। ভাগ্যিস মিজান ফার্নিচারের মিজান ভাই তাকে ফুল ক্রেডিটে বেড আর সোফা দিয়েছেন। বাক্স টিভি ফেলে দেয়ালে ঝুলন্ত টিভিটি উপহারস্বরূপ দিয়েছেন বাংলা মেইল পত্রিকা আর এনআরবি টিভি চ্যানেলের প্রধান শহীদুল ইসলাম মিন্টু। বাইশ তলার উত্তরের জানালা দিয়ে দেখা যায় অন্টারিও লেকের জলে সূর্যের আলোর ঝিলিক। ভূগর্ভ থেকে ঠিক ভিক্টোরিয়া সাবওয়েতে বেশ কিছুটা পথ ট্রেনটি চলে মাটির ওপরে উঠে আসে। এঁকেবেঁকে ওয়ার্ডেন স্টেশনের দিকে যাওয়া ট্রেনকে উঁচু থেকে এক বড় শুঁয়োপোকার মতো লাগে।

এপ্রিল-মে'তেও হালকা ঠাণ্ডা বাতাসে ভর করে ঘুরে বেড়ায়। হয়তো এই জানালা করুণাময়ীর মাথা হেলান দিয়ে দেশের স্মৃতিতে ডুব দেওয়ার জায়গা হবে। ভাগ্যবান জানালার দিকে তাকিয়ে সেদিন মৃণ্ময় হেসেছিল।

জানালায় হেলান দিয়ে স্মৃতি সাগরে ডুব দেয়ার ব্যাপার যা শোনা সবটাই বন্ধুবান্ধবদের কাছে। তারাই বলেছে আঁচমকা দেশ ছেড়ে এসে জানালায় দাঁড়িয়ে বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন একলা পার করে নতুন বউয়েরা। অনেকের আবার দেশে বিয়ের আগের প্রেমিকদের কথা খুব মনে পড়ে বাবা-মায়ের চেয়ে বেশি। প্রবাসী পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিদেশে আসা স্বপ্নের মতো লাগে, যত সম্পর্ক দেশের সব বাদ। চলে আসার পর এই নির্মম জীবনের বয়সে বেশ বড় স্বামী নামের পুরুষটির সঙ্গে রাতের যৌনসঙ্গী হওয়া ছাড়া সবই শূন্যতা। তখন ছেড়ে আসা প্রেমিকের নানা কথা মাথায় শুধু ঘুরপাক খায়।

করুণাময়ীরও কোনো প্রেমিক কি ছিলো? যার জন্যে সে বাইশতলার এই ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদবে। তাই তো স্বাভাবিক। তাই যদি হয়, তাহলে প্রথম দেখায় তার চোখে সেই আকুতি কেন। চোখ যেন বলছিলো তুমি আমার রাজপুত্তুর আমাকে এই দেশ থেকে উড়িয়ে নিয়ে চলো। দুর, উল্টাপাল্টা সে কী ভাবছিলো নিজকেই ধমক লাগালো মৃণ্ময়। তার চেয়ে অন্যভাবে ভাবা উচিত। করুণাময়ীকে নিয়ে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন টেকঅফ করার সময় প্রেসারে কান দুটি বন্ধ হয়ে আসে। কেমন যেন লাগে মাটি থেকে ছিন্ন হতে। প্রথমবার যখন ওর হয়তো বেশি লাগবে, ভয় পেয়ে যাবে। সে আগে থেকে করুণাকে এসব কিছু বলার সুযোগ পায়নি। ভেবেছে থাক না, সেটাই তো মজা– ভয় পেয়ে নিজের কান দু'হাতে চেপে ধরবে। চোখ বন্ধ করে হয়তো বা তাকে জড়িয়ে ধরতেও পারে। ওর ভয় কাটাতে প্লেনের জানালা দিয়ে নিচে তাকাতে বললে বার বার মাথা নাড়বে। সিটবেল্টের হুক অনেক চেষ্টা করেও লাগাতে পারবে না। তার দিকে অসহায়ভাবে তাকাবে। মৃণ্ময় হেসে লাগিয়ে দেবে। এসব জীবনের এক বড় পাওয়া। সে নিজকে শাবাশী দিলো বড় কাজ পাওয়ার লোভ ছেড়ে নিজেকে ঢাকা আসার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে। মৃণ্ময় যেমনটি ভেবে এতদূর করুণাময়ীকে নিতে এসেছিলো, তেমনটি মোটেই হলো না।

করুণাময়ী প্লেনের সিটে বসে কখন যে সিটবেল্ট লাগিয়ে ফেলেছে, মৃণ্ময় টেরই পেলো না। সে ভাবতে পারেনি এমন হবে। তাই জিজ্ঞেস করলো

–আরে কখন লাগাবে? ঠিকমতো লাগিয়েছো তো?

– হ্যাঁ। করুণাময়ীর ছোট্ট উত্তর।

– হুকটা ঠিকমতো লেগেছে তো? নয়তো প্লেন বাম্পিং করলে জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আকাশে ভেসে পড়বে। কথাগুলো ঠাট্টা করে শেষ করে মৃণ্ময় হাসতে লাগলো। ভেবেছিলো কপট ভয় পাওয়ার ভাব দেখিয়ে করুণাময়ী তার হাত আঁকড়ে ধরবে। বলবে তুমি নিজেই দেখে নাও না ঠিকমতো লেগেছে কি-না! সেই সুযোগে মৃণ্ময় স্ত্রীর শরীরে হাত রাখবে। তার স্পর্শ করুণাকে হালকা কাঁপন ছড়িয়ে দেবে। আসলেই এই সময়গুলো জীবনে খুবই রোমান্টিক।

মৃণ্ময়ের কল্পিত সংলাপ বলা তো দূরে থাক, তার এই মজার করুণাময়ী সামান্য হাসলো পর্যন্ত না। খুবই স্বাভাবিক গলায় বললো।

–বেল্টের হুক লাগানো এ আবার এমন কী? গাড়ির সিট বেল্টের মতোই তো।

মৃণ্ময়ের মুখে হালকা মেঘের ছায়া খেলে গেলো। সে চুপ করে বসে রইলো। প্লেন টেকঅফ করার সময় করুণার কোনো পরিবর্তন হয় কি-না লক্ষ্য রাখলো।

চাকা প্লেনে ঢুকে পড়লো দ্রুত দৌড়ের পর আকাশে ভাসা শুরু। করুণাময়ীর কোনো পরিবর্তন নেই। বরং মজা করে প্লেনের জানালা দিয়ে নিচে দেখতে চেষ্টা করলো। একসময় করুণাময়ী বিজ্ঞের মতো বললো– ওপর থেকেই ঢাকা শহর সুন্দর লাগে। আশপাশে কিছু সবুজ এখনো আছে বোঝা যায়।

মৃণ্ময় কোনো উত্তর দিলো না। কী বলবে সে। ঢাকা শহরের আশপাশের সবুজ আছে কি-না তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

কিছুক্ষণ পর প্লেন বেশ উঁচুতে উঠে স্থির হলো। জানালা দিয়ে শুধু মেঘ আর মেঘ দেখা যাচ্ছে। আর একটু পরে মেঘ নিচে তারা উপরে উঠে গেলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে মৃণ্ময় করুণাময়ীকে তাচ্ছিল্য দেখাতে বলেছিলো–

– জানো আমি ভেবেছিলাম টিকিট পাঠিয়েছি, তুমি একা চলে আসো। আমি টরন্টো এয়ারপোর্টে তোমাকে তুলে নেবো। মৃণ্ময় আশা করছিলো করুণা আহত হয়ে বলবে–

– যা! তা কী করে হয়। তুমি আমাকে নিতে আসবে না আর আমি যাবো?

সিটবেল্ট পরে থাকায় বাতি নিভে গেছে। করুণা হুক খুলে ফেলে টগবগিয়ে খুশিতে বললো।

– তাই নাকি? চমৎকার হতো। টরন্টো এয়ারপোর্টে তুমি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। আমি ঠিকই চলে আসতাম একা একা।

মৃণ্ময় করুণার উত্তরে কিছুটা আহত হলো। তা লুকিয়ে বললো–

– ধ্যাৎ, তুমি ঠিকমতো প্লেন চেঞ্জ করে আসতে পারছো কি-না সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়ে যেত আমার। তুমি বলছো ফুল হাতে নিয়ে পিয়ারসন্স এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। উফ! কী যে বলো না।

– আরে ফুল না আনতে চাইলে আনতে না! শীতের জন্যে শুধু লেডিস কোট নিয়ে দাঁড়ালেই হতো।

এবার রেগে গিয়ে চুপ হয়ে গেলো মৃণ্ময় রয়। কিছুক্ষণ কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের ভান করলো। মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তবু তো কিছু বলতে হবে।

– ঘুমিয়ে নাও করুণা। অনেক দৌড়ঝাঁপ গেছে আসার আগে। আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বাসায় ধুম পড়ে গিয়েছিলো দাওয়াত খাওয়াতে। না খাওয়ালে যেন সম্মান থাকে না। দিদি বলে ছিলে পিউরা খাওয়ালে তোর ক্ষণাদি খাওয়াবেই। ক্ষণাদি খাওয়ালে তোর বরুণ কাকারা কীভাবে বাদ দেয়। বরুণরা ডাকলো আর তোর নিজের দাদা পরিতোষ না ডাকলে দাদার সঙ্গে জীবনে আমি কথাই বলতাম না। উফ্, এক অত্যাচারের সম্মুখীন প্রতিদিন। টরন্টোর প্লেন ধরার আগের রাত পর্যন্ত। হঠাৎ খেয়াল করলো তার কথা শোনায় মনোযোগ নেই করুণাময়ীর। তাকাতেই বললো– এই তোমার হাতব্যাগ, টিকিটগুলো আমাকে দাও।

– কেনো?

– দুবাই এয়ারপোর্টে আমিরাতের কাউন্টারে গিয়ে আমি টরন্টোর বোর্ডিং কার্ড নিতে চাই।

– পাগল হলে নাকি! এটা কি ঢাকা এয়ারপোর্ট নাকি। সেখানেই আগলে নিয়ে এলাম। আর দুবাইয়ের মতো এত বড় এয়ারপোর্টে কই হারাবে কে জানে! তারপর তোমাকে খুঁজতে প্লেন মিস্।

– কী যে বলো। সব ডিরেকশন তো দেয়ালে লেখা, কোন দিকে কত নম্বর কোন এয়ারওয়েজের কাউন্টার। ডিজিটাল সাইন চারদিকে কিলবিল করছে। চাইলেও কেউ হারাতে পারবে না।

– কী বলছো?

– টিকিট নিয়ে আমিরাতের কাউন্টারে যাবো, বোর্ডিং পাস নেবো। নো বিগাউল। ভয় থাকলে তুমি থেকো পেছনে আমার। দেখ পারি কি না!

– দেয়ালে, ডিজিটাল সাইনে সবই অ্যারাবিক আর ইংরেজি ভাষা, দ্রুত আসে-যায় পড়ে উঠতে পারবে না তুমি। প্রশ্নটা করে মৃণ্ময় অবাক হয়ে তাকালো করুণার দিকে। বলে কী মেয়ে! যে জীবনে প্লেনে চড়েছে কি-না সন্দেহ, সে দুবাইয়ের মতো ব্যস্ত এয়ারপোর্টে প্রথমবার এসেই সব ডিরেকশন খুঁজে পেতে বোর্ডিং পাস নেবে কাউন্টারে গিয়ে! ইংরেজিতে কথা কতটা বলতে পারে তাও মৃণ্ময়ের জানা নেই।

– দুবাই এয়ারপোর্ট বড় হতে পারে তবে হিথরো লন্ডন কিংবা জেএফকে নিউইয়র্ক থেকে বড় নয়। হিথরো আর জেএফকে হলে আরো সহজ। আমার সব মুখস্থ, যেন কতবার গিয়েছি।

– তোমার মাথা খারাপ হয় মাঝেমধ্যে তা তো কেউ আমাকে বলেনি।

– যা হয় না তা কেন বলবে। আমি তো বেশিরভাগ ইংরেজি নভেল পড়ি। হিথরো আর জেএফকের বর্ণনা এতবার পড়েছি যে, মনে হয় সব চেনা। দুবাই সম্পর্কে ধারণা কম, তবে সব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট একই রকম।

– তুমি আবার ইংরেজি নভেল পড়ো নাকি? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো মৃণ্ময়।

– হ্যাঁ। আমি তো ও-লেভেল পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়ামে কনভেন্ট স্কুলে পড়েছি। ইংরেজিতেই স্বচ্ছন্দ বেশি, তবে বাংলা পড়তেও পারি, লিখতেও পারি। বাংলায় একসময় সুনীল, সুচিত্রা, হুমায়ুন, মিলনদের লেখা বই খুব পড়তাম। এখন সেলিনা হোসেনের নভেল ভালো লাগে। মৃণ্ময়ের সাহিত্য পাঠে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কেউ জোর করে পড়তে দিলে সুনীল বা হুমায়ূন আহমেদ কিছুটা পড়েই হাঁপিয়ে ওঠে। সে বুঝলো করুণাময়ী নাম আর তার মুখ দেখে মৃণ্ময় নিজের মতো অনেক কিছু ভেবে বসেছিলো। বেশি কিছু জানার সুযোগও ছিলো না। উড়ে এসে হুটহাট করে বিয়ে করা। এর মধ্যে আবার দিদি-জামাইবাবুর নিজেদের পছন্দ চাপিয়ে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা!

দুবাই এয়ারপোর্টে করুণা মুখে কিছু না বলে হাত বাড়ালো। মৃণ্ময়ও আর না করতে পারলো না। ব্যাগ থেকে টিকিট দুটো করুণার হাতে দিলো।

– আমিও তোমার পেছনে আসছি।

– আসো, পেছনে-পেছনে, সামনে নয়। দেখো পারি কি-না।

দুবাই এয়ারপোর্টে নেমে সরলমুখী করুণাময়ী নিজের দীর্ঘ খোলা চুল টাইট করে বেঁধে দূর আক্ষেপে নম্বর আর সাইন দেখে আমিরাতের কাউন্টারে এসে থামলো। ভয়-ভীতি নার্ভাসনেস কিছুই নেই তার অভিব্যক্তিতে। একেবারে স্বাভাবিক সুন্দর ইংরেজিতে কথা বললো। আমিরাতের কাউন্টারের মহিলা প্রতিউত্তরে হেসে টরন্টো পর্যন্ত উড়ে যাওয়ার বোর্ডিং পাস দুটো ওর হাতে দিলেন। পেছনে মৃণ্ময়ের ভূমিকা শুধু নিজের আর করুণার ব্যাগ টানার। মুখে হেসে বলতেও হয়েছিলো–

– নাইস, ব্রেভো করুণা। এই প্রথম তুমি ক্রস আটলান্টিক করছো অথচ মনেও হচ্ছে না প্রথমবার। ভালো, ভালো।

মুখে ভালো বললেও ভেতরে মৃণ্ময় কেঁপে উঠেছিলো। ভালো লাগেনি তার। সে এত সুন্দরী বাদ দিয়ে খুঁজে পেতে বের করেছিলো যাকে– আশা করেছিলো লাজুক, ভীতু, সদা তার ওপর নির্ভরশীল একটি বউ।

টরন্টো পিয়ারসন্স এয়ারপোর্টেও কোনো বন্ধুকে গাড়ি নিয়ে তাদের নিতে আসতে বলেনি। নতুন লাজুক বউসহ বন্ধু হোক, তবু তৃতীয়জন সে চায়নি। ট্যাক্সি নেবে, বউকে পাশে নিয়ে বিশাল চার লেনের হাইওয়ে, দূরে আকাশছোঁয়া সিএন টাওয়ার; ঢাকা হাইকোর্ট দেখানো বলে না, ও রকমই করুণাকে দেখিয়ে অবাক করে দেবে। আসলে সে তেমন কাউকে বলেওনি, বিয়ে করে বউ নিতে যাচ্ছে। ভেবেছিলো, টরন্টো ফিরেও প্রায় বিশ দিন তার ছুটি থাকবে। টুকটাক নিজের অফিসের কাজ ছাড়া কিছু করবে না। সঙ্গ দিতে হবে বউকে। নতুন দেশ, নতুন সবকিছুতে যাতে বেসামাল না হয়ে যায়। বাসা থেকে বেরুবে না বেশি। কেউ জানে না বলে খাওয়ানোর দাওয়াত থেকে রক্ষা। নিজে মজার সব রান্না করে করুণাকে খাওয়াবে।

তাদের ট্যাক্সি ফোর টোয়েন্টি সেভেন পার হয়ে গার্ডিনার হাইওয়েতে এসে পড়লো। দূরে টরন্টো ডাউন টাউনের আকাশচুম্বী বিল্ডিংগুলোর আলো জ্বালিয়ে যেন তাদের অভ্যর্থনা করছে। এতো উঁচু সব বিল্ডিং ছাড়িয়ে তালগাছের মতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে টরন্টোর আইকন সিএন টাওয়ার। দু'বছর আগেও পৃথিবীর সর্বোচ্চ উঁচু ছিলো। প্রথমে মালয়েশিয়ার টুইন টাওয়ার একে ছাড়িয়ে গেলো। তারপর এখন দুবাইয়ের ব্রুজদুবাই টাওয়ার।

মৃণ্ময় বড়ই আগ্রহের সঙ্গে হাত উঁচিয়ে করুণাকে দেখাতে চাইলো।

–ঐ যে দেখো লম্বা আকাশছোঁয়া গম্বুজ দেখছো, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার ছিলো দু'বছর আগে। টরন্টোর ল্যান্ডমার্ক করুণার ভালো লাগছে। হাইওয়েতে একশয়ের ওপরে গতিতে গাড়ি চলা। স্পিড তার ভালো লাগে। বন্ধ জানালার কাচের ভেতর থেকে সে অপলক তাকিয়ে দেখছে তার নতুন শহর টরন্টোকে।

– আমি জানি, গম্বুজ নয়, ওটা সিএন টাওয়ার। পড়েছি, একেবারে টপে রেস্টুরেন্ট আছে। সেখানে বসে লাঞ্চ করবো। অনেক উঁচু থেকে দেখবো আমার আপন হতে যাওয়া নতুন শহর টরন্টোকে। সেই প্রথম আলতো করে মৃণ্ময়ের হাত ধরে ছিলো করুণাময়ী। সে চমকে একটু জোরেই বলে উঠেছিলো–

– হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্যই।

ভেতরে ভেতরে মৃণ্ময়ের কেমন যেন লাগছিলো। এ মেয়ে এতো সব জানে কেন? এতো সব না জানলে কী ক্ষতিটা ছিলো? ক্রিসেন্ট টাউন বিল্ডিংয়ের বাইশ তলায় এসে পরের দিন থেকে লেগে গিয়েছিলো নিজের মতো গোছগাছ করতে। মাত্র পাঁচ দিনে তার মতো সে সেটআপ সব করে ফেললো। একটি বারও জানালার কাছে গিয়ে মাথা হেলান দিয়ে দূরে তাকিয়ে স্মৃতিতে হারিয়ে গেলো না। দেশের ব্যাপারে, মা-বাবাদের ব্যাপারে একটি কথাও বললো না। বরং জানতে চাইলো নতুন ইমিগ্র্যান্টদের জন্য অনেক কোর্স, গ্রান্ট থাকে। বুকলেট কিছু পাও কি-না দেখো তো, ক'টা মাস পর দেখা যাক কোনো কলেজ বা ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যায় কি-না।

মৃণ্ময় উত্তরে কিছু বলতে পারেনি। চুপ করে করুণাময়ীর পেছনে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে দেখেছে এঁকেবেঁকে সাবওয়ে যাচ্ছে। অথচ এত উঁচু আর দূর থেকে ছোট্ট একটা শুয়োপোকার মতো লাগছে। মানুষও কি একই রকম দূর থেকে একেবারে অন্য রকম লাগে! ❖

[আখ্যান প্রথম পর্ব সমাপ্ত]



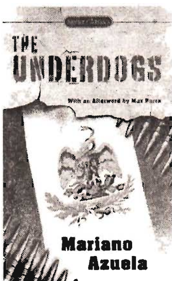
মারিয়ানো আসুয়েলা [১৮৭৩-১৯৫২]

রাজু আলাউদ্দিন

লাতিন আমেরিকার প্রথম বিপ্লবী উপন্যাস



নিবন্ধ



নিকারাগুয়ার কবি রুবেন দারিও কিংবা পেরুর কবি সেসার বাইয়েহোর নামটি স্মরণে রেখেই আমরা প্রায়শ বলতে শুনি, লাতিন আমেরিকায় চিলেই হচ্ছে কবিতার সেই দেশ যা সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও গভীরতা দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীকে অভিভূত করেছে। এমনটা বলার কারণও আমাদের কাছে অজানা নয়। কারণ চিলেতে প্রায় কাছাকাছি সময়ে বিসেন্তে উইদোব্রো, গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল, পাবলো নেরুদা, পাবলো দে রোকা ও নিকানোর পাররার মতো বিশ্বমানের কবির আর্বিভাব। অন্যদিকে, কথাসাহিত্যের জন্য আর্হেন্তিনাকেই পরানো হয় প্রশংসার অতুল্য মুকুট; কেননা এস্তেবান এচেবেররিয়া থেকে শুরু করে মাসেদোনিও ফের্নান্দেস, হোর্হে লুইস বোর্হেস, আদোল্ফো বিয়ই কাসারেস, দানিয়েল মোইয়ানো, হুলিও কোর্তাসার ও মানুয়েল পুইগ-এর মতো লেখক কেবল লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটেই নয়; বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই বিস্ময়কর উত্থান হিসেবে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে আছেন। কিন্তু লাতিন আমেরিকার একেবারে উত্তরে অবস্থিত মেহিকো সম্পর্কে এমন কিছু কখনোই বলতে শোনা যায় না। অথচ মেহিকো, কী কবিতা, কী প্রবন্ধ, কী কথাসাহিত্য– বলতে গেলে সাহিত্যের এই তিনটি শাখায়ই রয়েছে তার অনন্য অর্জন। কবিতায়, সেই ঔপনিবেশিক যুগের বিস্ময়কর প্রতিভা ছর হুয়ানা ইনেস্ দে লা ক্রুস থেকে শুরু করে আমাদো নের্বো, রামোন লোপেস বেলার্দে, হাবিয়ের বিইয়াউররুতিয়া, হোসে গরোস্তিসা কিংবা লাতিন আমেরিকার প্রথম

ঔপন্যাসিক হোসে হোয়াকিন ফের্নান্দেস দে লিসার্দি, তিনিও মেকিহানো। প্রবন্ধে দার্শনিক ও ভাবুক হোসে বাসকন্সেলোস, এদমুন্দো ওগোরমান, আলফোনসো রেইয়েস, অক্তাবিও পাস। অর্থাৎ তিনটি ক্ষেত্রেই মেহিকোর রয়েছে অসামান্য অর্জন। আর কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যদি সময়ক্রমের ধারাবাহিকতায় দেখতে চাই তাহলে লক্ষ্য করব লিসার্দি দিয়ে গোটা লাতিন আমেরিকার উপন্যাসের যে শুরু, তার পরে ধীরে ধীরে এসে যুক্ত হচ্ছেন বিস্ময়কর সব ঔপন্যাসিক, যেমন হুয়ান রুলফো, আগুস্তিন ইয়ানঞেস, হুয়ান গার্সিয়া পনছে, হোসে এমিলিও পাচেকো, ফের্নান্দো দেল পাসো কিংবা কার্লোস ফুয়েন্তেস। এদের সবার আগে উচ্চারণ করতে হবে মারিয়ানো আসুয়েলার নাম, যিনি কেবল মেহিকোরই নয়, গোটা লাতিন আমেরিকার প্রেক্ষাপটেই প্রথম সত্যিকারের এক উল্লম্ফন ঘটিয়েছিলেন কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে। ঔপন্যাসিক মারিয়ানো আসুয়েলা লিসার্দির সূচনাকে সবচেয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে কথাসাহিত্যকে বিস্ময়কর উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ মেহিকো সাহিত্যের কেবল একটিমাত্র শাখায় নয়; প্রায় তিনটি শাখাতেই তার সৃষ্টিশীলতা ও মননের বিশ্বজনীন বিস্তারকে নিশ্চিত করে তুলেছে নিভৃতে। নিভৃতেই তো। কারণ এক অক্তাবিও পাস ও কার্লোস ফুয়েন্তেস ছাড়া উল্লিখিত আর কার কথা আমরা তেমনভাবে জেনেছি? আর আসুয়েলা তো আরও পরের কথা, যিনি আমাদের অজ্ঞতার তলানিতে পড়ে আছেন বহুকাল থেকে। আমাদেরই বা আর দোষ কতটুকু? ১৯১৫ সালে 'লোস দে আবাহো' বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে 'নিচের মহল'– এই যুগান্তকারী উপন্যাসটি লেখা সত্ত্বেও স্বভাষী পরিমণ্ডলেই তিনি বহুদিন ছিলেন উপেক্ষিত এবং যাকে প্রায় এক দশক অপেক্ষা করতে হলো এই উপন্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে নিজ দেশে নড়াচড়া লক্ষ্য করার জন্য। এবং আরও প্রায় ৩৫ বছর অন্তত প্রকাশের পর অপেক্ষা করতে হলো এটুকু জানার জন্য যে, 'লোস দে আবাহো' চূড়ান্ত বিচারে এমনই এক উপন্যাস, যাকে এড়িয়ে লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যের ইতিহাসের লক্ষ্যযোগ্য বাঁকগুলোকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই স্বীকৃতির মুকুট পাওয়ার পরও বিতর্কের বিরোধী বুলেটে আসুয়েলা ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন বহুবার। বিপ্লবী নাকি প্রতিবিপ্লবী– এই তর্কে বিভক্ত হয়েছে দুই শিবির। ভর্ৎসনা ও গঞ্জনার কাঁটায় তাকে রক্তাক্ত করা হয়েছে দুই শিবিরের অসার আক্রমণে। কেউ তাকে চিহ্নিত করেছেন বিপ্লবীর ছদ্মবেশে 'প্রতিবিপ্লবী' হিসেবে; আর প্রতিবিপ্লবীরাও তাকে চিহ্নিত করেছেন 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে। তাই তার্কিকদের কাছে তিনি বহুদিন যাবৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বিষয় হয়ে থাকলে কী বলে তাকে অভিহিত করা হবে : 'বিপ্লবী ঔপন্যাসিক' নাকি 'বিপ্লবের ঔপন্যাসিক'?

মেহিকোতে বলিষ্ঠ (Virile) সাহিত্য আছে কি-না–১৯২৪ সালের ২০ ডিসেম্বর হিমেনেছ রুয়েদার এই উত্তেজক প্রশ্ন দিয়ে তর্কের শুরু হলেও, রুয়েদার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়তে গিয়েই তখনকার তরুণ সাহিত্য সমালোচক ফ্রান্সিস্কো মনতের্দে ওই তর্কের সদ্যোজাত আগুনে লোস দে আবাহো নামক আসুয়েলার বিস্ফোরক জ্বালানিটি ছুড়ে মারেন। আর তাতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল বিতর্কের শিখা। এই সূত্রে তর্কের কাফেলায় যুক্ত হয়েছেন তখন অনেকেই। তাদেরই একজন এদুয়ার্দো কলিন উপন্যাসটির পক্ষে প্রশস্তি জানালেও, এটি আদৌ মেহিকোনো বিপ্লবের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করে কি-না সে ব্যাপারে তার উত্তর ছিল আক্রমণকারীদের মতোই নেতিবাচক। তার মতে, 'আমাদের জাতীয় সারবত্তা, এমনকি বিপ্লবও কেবল যুদ্ধ আর রক্তপাত নয়, বরং অন্যকিছু।'

সেই সময় প্রভাবশালী আরেক সাহিত্য সমালোচক বিক্তোরিয়ানো সালাদো আলবারেস ১৯২৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন : '(লোস দে আবাহো) বৈপ্লবিক নয়। কারণ বিপ্লবকে এটি ঘৃণা করে, আবার এটি প্রতিক্রিয়াশীলও নয়। কারণ বিগত যুগের জন্য এর নেই ব্যাকুল আগ্রহ। কারণ এটি যখন লেখা হয়েছে তখন ফ্রান্সিস্কোর (বিইয়া) নামে প্রতিক্রিয়া কেটে গেছে। এটা বিশুদ্ধভাবে এবং অকপটভাবেই নাস্তিবাদী। যদি এটা থেকে শিক্ষণীয় কিছু থেকে থাকে, সেটা হচ্ছে বৃথাই ছিল এই আন্দোলন। এতে এমন কোনো বিখ্যাত বিপ্লবীরা ছিলেন না যারা তাদের কাজ সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা নিয়ে শুভ বিশ্বাস থেকে কাজ করেছেন। কিংবা যদি তা হয়েও থাকে তাহলে এ জন্য তারা অনুতপ্ত ছিলেন, এমনকি এ কারণে তারা নিজেদেরকে শত্রুদের চেয়েও বেশি ঘৃণা করতেন।'

এ ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যখন বের হচ্ছিল আসুয়েলা তখনও জীবিত। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, তিনি এসবে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েছিলেন। যদিও তিনি এসব প্রতিক্রিয়া ও আক্রমণের প্রতি কোনো সাড়া দেননি। তবে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি যখন স্মৃতিকথা লিখলেন, সেখানে তিনি তার পুঞ্জীভূত ক্রোধ আর সামলে রাখতে পারেননি :

'ইদাল্গো নাট্যশালার এক সম্ভ্রান্ত মহিলা যখন আমার উপন্যাসের মঞ্চায়ন করেছিল তখন বিপ্লবের কিছু ক্ষুদ্র কুকুর(Lapdogs) আর মুনাফাখোর আমাকে অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে আর আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলতার চিহ্ন।'

একই স্মৃতিকথায় তিনি আরও জানাচ্ছেন : 'আমার বইগুলোতে (বিপ্লবীদের) এই খুঁতগুলো উল্লেখ করার কারণে আমাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যায়িত করায় কতটা বিস্মিত হয়েছিলাম তা আপনি অনুমান করতে পারছেন। ওই শূন্যগর্ভ শব্দ ছাড়া চোর আর গুপ্তঘাতকগুলো আত্মরক্ষার জন্য এর চেয়ে ভালো আর কোনো উপায় খুঁজে পায়নি।'

"বিপ্লবের বিজয়ের পরপরই সর্বোচ্চ শক্তি ও স্বচ্ছতার সঙ্গে যখন আমি নতুন ধনিক শ্রেণির উত্থানের বিষয়টি দেখিয়ে দিলাম, তখন উচ্ছিষ্টজীবী ক্ষুদ্র কুকুরগুলো আমাকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।"

লোস দে আবাহো সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের ভুল ধারণা তার মনকে কতটা বিষিয়ে তুলেছিল, এই ছোট উদ্ধৃতি থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে স্বদেশে ডান ও বাম শিবিরে এই উপন্যাস নিয়ে যত বাক-বিতণ্ডাই থাকুক না কেন; বিদেশে এর গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো (রাজনৈতিক) মতাদর্শিক দ্বিধা ছিল না। ১৯৪৫ সালে এক বক্তৃতায় লেখক নিজেই সে কথা জানিয়েছিলেন এভাবে :

'জীবনে লেখক হিসেবে চূড়ান্ত তৃপ্তি ভোগের অন্যতম *The Underdogs* উপন্যাসটির কাছে আমি ঋণী। খ্যাতিমান কমিউনিস্ট, বিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক আঁরি বারবুস অনুবাদ করে প্যারিসে পরিচালিত তার Monde পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন, ফ্রান্সে রাজতন্ত্রপন্থি ও চরম ডানপন্থি সংগঠন L'action francaise আমার উপন্যাসটিকে প্রশংসার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। একজন স্বাধীন লেখকের জন্য এ ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর বাকিটা বলা নিষ্প্রয়োজন।'

কিন্তু একটা বিষয় জানানো প্রয়োজন, এসব বিতর্কের মূলে আছে উপন্যাসটির ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিশেষ করে বিপ্লবের আগুনে মোড়ানো একটি দশক, যার কালপরিধি ১৯১০ থেকে ১৯২০। ১৮৫৭ সালে মেহিকানো সংবিধানের আদর্শ ও নীতিমালা লঙ্ঘন করে পোর্ফিরিও দিয়াস নামে সিন্দাবাদের যে-বুড়োটি মেহিকোর ঘাড়ের ওপর

বসেছিল তাকে হটাতেই উদারপন্থি ও বুদ্ধিজীবীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। এই তৎপরতার প্রথম রাজনৈতিক অভিব্যক্তি ঘটে ফ্রান্সিস্কো মাদেরোর 'সান লুইস পতোসি পরিকল্পনা'র (Plan de San Luis Potosi) মাধ্যমে। ওটাই ছিল বিপ্লবের প্রথম প্রজ্বালন।

যাকে হটাতে গিয়ে এই পরিকল্পনা তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পালিয়ে নির্বাসনে গেলেও মেহিকো শান্ত ও স্থিতির পরিবর্তে প্রবেশ করে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের বহুমুখী মত ও পথের এক জটিল ঘূর্ণিপাকে। 'মত' ও 'পথ' যদিও বলছি, আসলে 'মত'-এর চেয়ে 'পথ'-এর প্রভাবই ছিল প্রবল। মত বললেই রাজনৈতিক বা আদর্শিক মতাদর্শের এক বিশ্বাস আমাদের মনে জেগে উঠতে চায়। কিন্তু রুশ বিপ্লবেরও সাত বছর আগে ঘটে যাওয়া মেহিকোর বিপ্লবে তেমন কোনো 'মত'-এর অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞ ও পণ্ডিতকুলের সবাই। রুশ বিপ্লব যে-আদর্শ থেকে বিস্ফোরিত হয়েছিল, এরই সাত বছর আগে ঘটে যাওয়া মেহিকোর বিপ্লব তেমনটা ছিল না। 'মতাদর্শিক পূর্বসূরির অভাব আর সর্বজনীন আদর্শের সঙ্গে সংযোগের অপ্রতুলতাই এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক, পরবর্তী বহু সংঘাত ও সংশয়েরও বীজ এই বিপ্লব।'

আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করব, আজ বিপ্লবকে ঐতিহাসিকরা কিংবা অক্তাবিও পাস-এর মতো লেখকও যে দৃষ্টিতে দেখছেন, মারিয়ানো আসুয়েলা প্রায় নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনায় তার সেই ইঙ্গিতগুলো রেখে গিয়েছিলেন উপন্যাসের মুখোশে। এই একই কারণে কার্লোস ফুয়েন্তেস এ উপন্যাসে বিপ্লবের চিত্রায়ন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে আরও গভীরে নিয়ে জানালেন :

'বহু শতাব্দীর পাথরের নিচ থেকে আসুয়েলার নারী-পুরুষেরা বেরিয়ে আসে : এরা সবাই নতুন বিশ্বের (Nuevo mundo) যাবতীয় দুঃস্বপ্ন ও স্বপ্নের শিকার। আমরা কি বিস্মিত হবো পাথরের নিচ থেকে বেরিয়ে আসার সময় এদেরকে যদি কখনও কখনও মনে হয় সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া কীটপতঙ্গ, অন্ধ বৃশ্চিক যারা আসতেক, ইবেরীয় এবং প্রজাতন্ত্রের শক্তির শিলাখণ্ডের নিচে দমিত এবং শত শত বছরের অন্ধকারে দিকভ্রান্ত হয়ে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা এই পৃথিবীকে ঠিক ঠাহর করতে পারে না, তারা ঘুরে বেড়ায়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়, মারামারি করে, তারা বিপ্লবে যায়।'

মারিয়ানো আসুয়েলা প্রায় নির্ভুল অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার সময়ে ঘটে যাওয়া বিপ্লবের ছবিটি এঁকেছেন মহাকাব্যিক ইশারায় ঠাসামাত্রই সোয়াশ' পৃষ্ঠার পরিসরে। মহাকাব্যিক বললাম বটে, কিন্তু ফুয়েন্তেসের ভাষায়, আসুয়েলার হাতে অধঃপতন ঘটেছে মহাকাব্যের। কারণ 'যে মহাকাব্য শুধু প্রতিফলন কিংবা ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে, আসুয়েলা তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি হচ্ছেন সেই ঔপন্যাসিক, যিনি সাধারণ ঐক্যকে ভেঙে মহাকাব্যকে দুমড়ে-মুচড়ে বদলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহাকাব্যিক বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। এক অর্থে, আসুয়েলা এভাবে বের্নাল দিয়াস সূচিত চক্রটিকে পরিণতি দেন : তিনি বিজয়ের (Conquista) শিলাখণ্ড উত্তোলন করে আমাদেরকে দেখতে বলেন জাতীয় স্বৈরাচার, স্থানীয় কাসিকাজগো, বাধ্যতামূলক শ্রম, চার্চ ও পিরামিডের চাপে পিষ্ট প্রাণীদের।'

আসুয়েলা মাত্র তিনটি অধ্যায়ে গোটা উপন্যাসটিকে সাজিয়েছেন। কিন্তু এই সজ্জার মধ্য দিয়ে তিনি পশ্চিমের মহাকাব্যিক ঐতিহ্যের এমন এক দ্বার উন্মোচন করেছেন, যার ধারাবাহিক কাঠামোগত নিরীক্ষা আমরা লক্ষ্য করব তারই পরবর্তী লেখক হুয়ান রুলফোর 'পেদ্রো পারামোয় ডিভাইন কমেডি'র সৃষ্টিশীল পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কিংবা আরও দূরে আর্হেন্তিনায় হোর্হে লুইস বোর্হেস তার একাধিক গল্পে এই সৃষ্টিশীল দুঃসাহসকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তা আরও ছোট্ট পরিসরে, যেমন 'এল আলেফ' নামক গল্পে আমরা দেখব 'ডিভাইন কমেডি'কে তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে সংকুচিত করে নিয়ে আসবেন মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার পরিসরে, যেখানে বোর্হেস নিজেই দান্তে আর বোর্হেসের বেয়াত্রিস বিতার্বো হয়ে ওঠে দান্তের বেয়াত্রিস পার্তিনারি। কিন্তু রুলফো বা বোর্হেস যে জটিল প্রক্রিয়ায় এই বিন্যাসকে মূর্ত করে তোলেন, আসুয়েলা আপাতদৃষ্টে প্রায় এলোমেলো ভঙ্গিতে সাজিয়ে তোলেন মহাকাব্যের 'অধঃপতন'কে। ফুয়েন্তেসের বুদ্ধিদীপ্ত বর্ণনায় এ উপন্যাসের বৈপ্লবিক ভূমিকাটি যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় :

উপন্যাস তাচ্ছিল্য করছে মহাকাব্যকে, অন্যদিকে ঘটনাপঞ্জি তাচ্ছিল্য করছে উপন্যাসকে। অর্থাৎ বিভিন্ন জনরায় (Genres) সাঁতার কাটছে দ্ব্যর্থক ও অশান্ত টেক্সট এবং তা এসব জনরার (Genres) সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার এক ইস্পানো-আমেরিকান সংস্করণ হাজির করছে।

আসুয়েলার এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, অর্থাৎ দেমেত্রিয় মাসিয়াস 'ইলিয়াড'-এর হেক্টর বা একিলিস, কিংবা চানসন দে রোলাঁ, রাজা আর্থার-এর বীর কিংবা স্পানঞল মিও সিদ-এর বীরের দূরবর্তী ছায়া নিয়ে সে হয়ে ওঠে এমন এক চরিত্র, যে বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ। দেমেত্রিয় বিপ্লবে এসেছে রাজনৈতিক আদর্শ থেকে নয়, বরং স্থানীয় জমিদারের (Casique) সঙ্গে বিরোধের সূত্র ধরে। গুরুত্বের বিচারে এর পরেই আসবে লুইস সের্বান্তেসের নাম, যে দেমেত্রিয়কে রাজনৈতিক দীক্ষা ও পরামর্শদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দেমেত্রিয়র অন্য সব অনুসারীর মধ্যে লুইসই একমাত্র শিক্ষা-দীক্ষায় আলাদা চরিত্রের মানুষ। পেশায় সাংবাদিক, চিকিৎসাশাস্ত্রেও আছে যার এলেম। বিপ্লবের পর নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া সে-ই একমাত্র ব্যক্তি এই উপন্যাসে।

সত্যিকারের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নিয়ে এ উপন্যাসে যে চরিত্রটি স্বল্প পরিসরেও উজ্জ্বল হয়ে আছে সে আলবের্তো সলিস। সলিস বিপ্লবের প্রতি মোহমুক্ত বিপ্লবের কারণে নয়, বরং এর ব্যর্থতার কারণে সলিস ছাড়াও এই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি চরিত্র হচ্ছে বেনাসিও, আনাস্তাসিও মন্তানেস, মেকো মান্তেকা, দন মনিকো আর পাশবিক চরিত্রের গুয়েরো মার্গারিতো।

আরও কিছু গৌণ চরিত্রসহ এরাই এ উপন্যাসের গতি ও বিস্তারের মূল চালিকাশক্তি। কাহিনীও তেমন শাখা-প্রশাখাময় বহুবিস্তারী জটিল কোনো আদল নিয়ে গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব থেকে প্রতিশোধের বাসনায় জড়ো হয়ে দেমেত্রিয়র দলটি বিপ্লবের স্বপ্নে একের পর এক অভিযান শেষে তারা গন্তব্যে পৌঁছায়। ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সোর্হিও লেওনের হাতে এই কাহিনী দুর্দান্ত ওয়েস্টার্ন মুভি হয়ে উঠতে পারত। কারণ সে রকম উপাদান এতে যথেষ্ট আছে।

কিন্তু এ উপন্যাসের মূল শক্তি ও অভিনবত্ব অন্যত্র : স্প্যানিশভাষী কোনো উপন্যাসে এই প্রথম প্রায় সিনে-চিত্রনাট্যের মতো কিছুটা ছাড়া ছাড়া ভঙ্গিতে কাহিনী বা ঘটনার বুনন দেখা যাবে। কাহিনীর দ্রুততার জন্য শাখা-প্রশাখাময় ঘটনাংশের অনুপস্থিতিও এর গদ্যকে দিয়েছে গতিশীলতা। কিন্তু কী এমন বিষয় এ উপন্যাসে রয়েছে, যা বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী উভয় পক্ষকেই অসন্তুষ্ট করেছিল? এর উত্তর দিতে গেলেও এই উপন্যাসের শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের দিকেই আমাদের ফিরে তাকাতে হবে। এর কাহিনীবিন্যাস ও সংলাপ এমন ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে, যা কোনো পরম বা চরম বিশ্বাসের আভাস দেয় না কোনোভাবে। ❖

অলঙ্করণ : : বোরহান আজাদ

ফরিদ কবির

দুই টুকরো জীবন



স্মৃতি

সহিদ মিয়ার সংসার যে খুব সুখের ছিল, তা নয়। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চাকরি। সামান্য মাইনে। দু'জনের সংসার চালানোই তার জন্য কষ্টকর। সেখানে পরপর চার চারটি সন্তানের জন্ম তাকে কিছুটা বিধ্বস্তই করে দেয়।

আমি ছিলাম মা-বাবার প্রথম সন্তান। পরে, আরও দুটি ছেলে সন্তানের জন্ম হলেও তারা অল্প বয়সেই মারা যায়। চার নম্বরে শরিফ।

আমাদের বেশ টানাটানির সংসার। সাদুল্লাহ, ওরফে সহিদ মিয়া, যাকে আমি আব্বুজি ডাকতাম, তিনি প্রতি মাসে বেতনের টাকা আম্মার হাতেই তুলে দিতেন। তুলে দিতেন মানে, দিতে বাধ্য হতেন। আম্মা সম্ভবত এ রকমই নিয়ম করে দিয়েছিলেন। আব্বুজি পরে খুবই বেকায়দায় পড়তেন। তার নেশা বলতে ছিল পান আর সিগারেট। সিজর্স সিগারেট খেতেন। দাম তেমন বেশি নয়। কিন্তু এই টাকা আসবে কোত্থেকে! তিনি আম্মার কাছেই হাত পাততেন। আম্মা একবার-দু'বার দিলেও তিনবারের সময়ই বেঁকে বসতেন।

বলতেন, সংসারই চলে না; তুমি বারবার সিগারেটের পসা চাইলে তো আমি দিবার পারমু না। তুমি অন্যভাবে এই পসা জোগাড়ের ধান্দা করো!

আব্বুজি জানতেন না, অন্য কীভাবে তিনি ওই টাকা জোগাড় করবেন!

ছুটির দিন আব্বুজি বাসায়ই কাটাতেন। কোথাও তেমন যেতেন না। আমি যখন কিছুটা বুঝতে শিখেছি, তখন আমিও চাইতাম না আব্বুজি বাসার বাইরে যান। গেলেই একটা না একটা কা করতেন। বাসার বাইরে যাওয়া মানে গলির মোড়ের চা-দোকানে তিনি আড্ডা দিতেন। তারপর দুপুরে বা রাতে বলা নেই কওয়া নেই কাউকে না কাউকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতেন। আর আম্মাকে বলতেন, মিনু, খানা দেও।

আম্মা ফিসফিস করে বলতেন, গরে কি পোলাও-গোস্ত রাইন্দা রাখছো যে তুমি লোকজন লয়া আইছ?

আব্বুজি নির্বিকারভাবে বলতেন, যা আছে তাই দেও।

আম্মা রাগে গরগর করতেন। তারপর যা আছে তাই বেড়ে দিতেন।

কখনও কখনও আব্বুজি দু-তিনজন লোক নিয়েও বাসায় আসতেন। আর আম্মাকে বলতেন, খানা লাগাও। আব্বুজির সাথে যারা আসতেন, তাদের বেশিরভাগই শ্রমিক শ্রেণির লোক। চায়ের দোকানে হয়তো আলাপ হয়েছে। খাওয়ার পয়সা নেই। তিনি হয়তো বলতেন, চলো ভাই, আমার বাড়িতে যা আছে ভাগযোগ কইরা খায়া লমুনে।

আব্বুজি বিনা নোটিশে বাসায় কাউকে নিয়ে ঢুকলেই আম্মা ভয়ানক ক্ষেপে যেতেন। ঘর থেকে আব্বুজিকে বাইরে ডেকে নিয়ে বলতেন, তুমি কি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান! দুইজনের সংসারে তুমি তিনজন মানু লয়া ঢুকছ কোন আক্কেলে!

আব্বুজি ততোধিক ফিসফিস করে বলতেন, মিনু, আস্তে কও। অরা হুনলে রেজার হইবো।

ছুটির দিনে আব্বুজি বাড়ির বাইরে যেতে চাইলেই আম্মা রেগে যেতেন। বলতেন, বাড়িতেই বয়া থাকো। তোমার তো আক্কেল কম। ফিরার সময় তো আবার ফকিন্নি-ঝকিন্নি সব দইরা লয়া আইবা।

একটা সময় এমন ছিল যে আব্বুজি বাড়ির বাইরে যেতেই পারতেন না। তখন অজুহাত খুঁজতেন। কখনও কখনও বলতেন, মিনু, আমার তো বাইরে ইট্টু যাইতে অইবো। গরে তো পান নাই।

সত্যিকার অর্থে ঘরে সময় কাটানোর মতো কিছু আমাদের বাড়িতে ছিলই না। না কোনো রেডিও, না অন্য কিছু। বাড়িতে বিদ্যুৎ না থাকায় সন্ধ্যার পরেই বাড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যেত। ঘরে একটা হারিকেন জ্বালানো হতো। রাতে রান্নার সময় সেই হারিকেনটাই বারান্দায় ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আব্বুজি তখন একটা পিঁড়া পেতে বারান্দায় বসে থাকতেন।

শরিফ একটু বড় হলে আম্মা একদিন বললেন, শরিফরেও হাম্মাদিয়াতে ভর্তি করায়া দেও। আব্বুজি বললেন, ঠিকাছে।

কিন্তু শরিফকে তিনি ভর্তি করালেন ফকির মোহাম্মদ ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে! ফিরে এসে বললেন, মিনু, ফকির মোহাম্মদ স্কুলটা কিন্তু বালোই। শরিফরে ওইখানেই ভর্তি করায়া দিলাম। তিনি আম্মার দেওয়া ভর্তি ফি'র টাকা তাকে ফেরত দিয়ে দিলেন। আব্বুজি ভেবেছিলেন, টাকাটা বাঁচিয়ে দেওয়ায় আম্মা খুবই খুশি হয়ে যাবেন। কিন্তু ঘটল উল্টোটা!

আম্মা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, তোমার কি দেমাগ খরাব অইছে? তুমি আমার পোলাটারে ফকিন্নি গো স্কুলে বর্তি করাইছ কেলা? তোমার মান-ইজ্জত না থাকবার পারে, আমার তো আছে।

তখন পুরান ঢাকাজুড়েই আমার নানার পাঁচ ভাই ও তাদের ছেলেমেয়েরা থাকত। কেউ জিন্দাবাহার, কেউ কলতাবাজার, কেউ বেগমবাজার। তারা সবাই নানা ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য করত। হাতে তাদের কাঁচা পয়সা। আমার মায়ের প্রায় সব কাজিনেরই, মানে আমার প্রায় সব খালারই আম্মার তুলনায় ভালো বিয়ে হয়েছে! তাদের স্বামীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে। খালারা প্রতি মাসে নতুন নতুন সোনার গয়না কেনে, শাড়ি কেনে। ছেলেমেয়েদের ভালো ভালো স্কুলে পড়াতে পাঠায়। আমার বাবা সে তুলনায় হতদরিদ্র। তিনি খুবই ছোটখাটো একটা চাকরি করেন। এ নিয়ে আম্মা মনে মনে কিছুটা হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। আম্মার ধারণা, তার অনেক ভালো বিয়ে হতে পারত। চাল-চুলাহীন একটা এতিম ছেলের কাছে তাকে গছিয়ে দেওয়াটা আম্মা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু অবস্থা যাই থাক, আম্মাকে কেউ ছোট ভাবুক– সেটা তিনি চান না। আর এ কারণে, আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে বা কোনো অনুষ্ঠানে মামা-খালারা যে ধরনের উপঢৌকন দেন আম্মা প্রায় সে রকমই দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি বুঝতে চাইতেন না যে আব্বুজির সেটা দেওয়ার সামর্থ্য আদৌ আছে কি-না! এ নিয়ে সব সময়ই ঝামেলা-ঝগড়া লেগে থাকত।

আম্মার হয়তো ধারণা, শরিফকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করানোর কারণে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা আম্মাকে 'ছোট নজরে' দেখবেন! এ রকম একটা ধারণা থেকে আম্মা আব্বুজির ওপর ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন।

আব্বুজি বললেন, আমার তো আর মায়না বাড়ে নাইক্কা। আমি ভাবলাম, আপাতত শরিফ এহেনে পড়ুক। ওয়ানে উঠলে অরে বি হাম্মাদিয়ায় দিয়া দিমুনি।

আম্মা রাগে গজগজ করতে থাকেন, আমি হইলাম পোড়া কপাইলা! আমি তুমারে উপরে উঠাইতে চাইলে কী অইবো। তুমার তো নজরটাই ফকিরা!

আব্বুজি জানেন, কথা বললেই কথা বাড়বে! তিনি চুপ করে রইলেন।

আম্মার মুখের এই সংলাপ আমাদেরকে প্রায় সারাজীবনই শুনতে হয়েছে। আব্বুজি এ ধরনের কথা শুনে মন খারাপ করে বসে থাকতেন। আমাদের তখন মনে হতো, আর যাই হোক এর পর তিনি এমন কাজ করবেন না, যাতে আম্মা তাকে আবার এ ধরনের কথা বলেন। কিন্তু আব্বুজি পরের দিনই এটা ভুলে যেতেন।

আব্বুজি আসলে কিছুটা উদাসীন ধরনেরই ছিলেন। আম্মার কিসে রাগ বা অভিমান হবে তা নিয়ে তাকে খুব একটা ভাবিত মনে হতো না। কিংবা তিনি ভুলে যেতেন। যদিও আম্মা কোনো কিছু নিয়ে রাগ করে ফেললে তিনি খুবই দুঃখী হয়ে যেতেন। একবার আম্মা রাগ করে না খেয়েই সারারাত কাটিয়ে দিলেন। আব্বুজি তাকে অনেক মানানোর চেষ্টা করেও যখন ফেল মারলেন তখন নিজেও না খেয়ে শুয়ে

পড়লেন।

আম্মার রাগ সহজে পড়ত না। কিন্তু আব্বুজি পরের দিনই আবার সাফ-সুতরো। আগের দিন যে অনেক হাঙ্গামা হয়েছে, তাকে দেখে কেউ বুঝবেই না।

আমাদের পড়াশোনা নিয়েও আব্বুজির যে খুব আগ্রহ কিছু ছিল তা কখনও বোঝা যেত না। আব্বুজির সঙ্গে হয়তো বাজারে যাচ্ছি। রাস্তায় কেউ হয়তো তাকে জিজ্ঞেস করল, সহিদ বাই, আপনের পোলা নিহি?

আব্বুজি বলতেন, হ।

কুন কেলাসে পড়ে?

আব্বুজি বলতেন, কেলাস থিরিতে।

আমি তখন সেটা সংশোধন করে বলতাম, আব্বুজি, আমি তো কেলাস ফোরে পড়ি! এই বছরই তো ফোরে উঠলাম!

আব্বুজি সঙ্গে সঙ্গে সেটা সংশোধন করে নিয়ে বলতেন, ওহ হো! বুইলা গেছি। হ হ কেলাস ফোরে। কেলাস ফোরেই তো!

এমন ঘটনা একবার না, প্রায়ই ঘটত! এমনকি এক মাসের মধ্যেই তিনি সেটা ভুলে যেতেন। পরের মাসেই হয়তো আমরা কোনো একটা বিয়েতে গেছি। কোনো আত্মীয় তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনের পোলা দুইটা মাশাল্লা ঠাণ্ডা টাইপের। আমারগুলি তো একেকটা শয়তানের আড্ডি। অরা কুন কেলাস পড়ে? আব্বুজি যথারীতি বলতেন, বড়টা কেলাস থিরিতে আর ছোটটারে এবারই বর্তি করাইছি।

আমি পাশ থেকে বলতাম, আব্বুজি, আমি তো কেলাস থিরিতে...!

আব্বুজি মনেই রাখতেন না আমরা কখন কোন ক্লাসে পড়ি! তিনি কোন দুনিয়ায় থাকতেন কে জানে!

স্কুলে যাবার সময় আম্মা বা আব্বুজি আমাকে কোনো পয়সা-কড়ি দিতেন না। আম্মা কিছুটা রাগী টাইপের বলে আমি কখনোই তার কাছে কিছু চাইতাম না। আর, আব্বুজির কাছে চাইলে তিনি দিতেন না। বলতেন, তর আম্মার কাছ থেইকা লয়া যা।

আম্মা সামনে থাকলে বলতেন, মিনু, ফরিদরে একটা-দুইটা পসা দিয়া দেও না কেলা! পোলাটা খালি হাতে স্কুলে যায়।

শুনেই আম্মা মুখ-ঝামটা দিতেন! বলতেন, তুমি কি আমারে কোচড় ভইরা টেকা-পসা দিয়া রাখছ নিহি যে দিমু!

আমি আম্মার দিকে তাকালে তিনি বলতেন, তুই আবার খাড়ায়া রইছস কেল্লেগা? স্কুলে ঠিফিন দেয় না?

আমি মিনমিন করে বলি, দেয়।

আম্মা বলেন, তাইলে আবার পসা চাস কেল্লে গা?

আমি চুপচাপ স্কুলে চলে যেতাম!

স্কুলেই আমাদের টিফিন দেওয়া হতো। ফোর্থ পিরিওডের পর কখনও সুজির হালুয়া আর লুচি, কখনও লুচি-ভাজি, কখনও বা কলা আর কেক। তা সত্ত্বেও প্রায় সবাই স্কুলের বাইরের খাবার কিনে খেত। স্কুলের গেটের সামনেই নানান স্বাদের খাবারের ছোটখাটো দোকান বসে যেত। চটপটি, ফুচকা, আইসক্রিম, ঝাল-মুড়িসহ কত কী! আমার এসব কেনার সঙ্গতি ছিল না। আমি তাই অধিকাংশ সময়েই ক্লাসরুমের বাইরে যেতাম না। স্কুলের দেওয়া টিফিন খেয়ে পরের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করতাম। টিফিনের জন্য অবশ্য বেতনের সঙ্গে অতিরিক্ত আড়াই টাকা নেওয়া হতো। ফোর্থ পিরিওডের পর ক্লাসের ক্যাপ্টেন টিফিন বিতরণ করত। আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় ও ক্যাপ্টেন ছিল আলী মোহাম্মদ। ক্লাস নাইন পর্যন্ত সে-ই ছিল ক্যাপ্টেন!

আলী মোহাম্মদ সাইনু পাহলোয়ানের ছেলে। সাইনু পাহলোয়ানের মোরগ-পোলাও সে সময় ছিল বিখ্যাত। অনেকে বলত, চকবাজারে সাইনু মিয়া মোরগ-পোলাও রান্না করলে তার ঘ্রাণ জিন্দাবাহারেও পাওয়া যায়! আমি ছোটবেলাতে এটা বুঝে ফেলেছিলাম, এটা যতই লোভনীয় হোক, সাইনু পাহলোয়ানের মোরগ-পোলাও খাওয়ার সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি!

'টেলিবিছন' আইছে

জিন্দাবাহারে আমাদের জীবন ছিল খুবই নিস্তরঙ্গ।

পড়াশোনা ছাড়া, অবসর সময়ে আমাদের কিছুই করার ছিল না। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া গলিতে মেয়েদের সঙ্গে কুতকুত আর ছেলেদের সঙ্গে লাটটু বা বিরিং খেলেই আমাদের জীবন চলছিল! এ ছাড়া আমার অন্তত করার কিছু ছিলও না।

আমাদের ঘরে বিদ্যুৎ ছিল না। সন্ধ্যের পর আমাদের জীবন ছিল পুরোপুরিই অন্ধকারময়। সন্ধ্যের পর আমি হারিকেনের আলোতে পড়তে বসতাম। স্কুলের পড়া তৈরি করতাম। তারপর মাদুর বিছিয়ে রাতের খাবার খেতাম। এরপর আর কিছু করার নেই। বেশিরভাগ সময় ছোটভাই শরিফের সঙ্গেই খেলতাম। একদিন ওর সঙ্গে খেলছিলাম। আমার হাতে একটা হলুদ রঙের টেনিস বল ছিল। শরিফ সেটা নেওয়ার জন্য জোরাজুরি করছিল। আমি তাকে ধাক্কা দিতেই সে গিয়ে পড়ল শেল্‌ফের ওপর। শেল্‌ফের কাচ ভেঙে শরিফের হাত কেটে গেল। পাতলা চামড়া! কাটতে না কাটতেই দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এলো! আমি ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরলাম। বাঁ হাতের বেশ কিছুটা চামড়া উঠে গেছে! শরিফ সেদিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক যে মুহূর্তে চামড়ার নিচ থেকে রক্ত বেরিয়ে এলো শরিফ তখনই গগনবিদারী একটা চিৎকার দিল! ওর চিৎকার শুনে বারান্দা থেকে আম্মা ছুটে এলেন। এসেই দেখলেন, শরিফের হাত কেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে! আম্মা শরিফের হাতের রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা না করেই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন, আয় হায়, কী অইছে! ক্যামনে অইলো?

শরিফ ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ভাইয়া দাক্কা দিসে!

শুনেই আম্মা আমার গালে কষে কয়েকটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন। থাপ্পড়গুলি এত জোরে লাগল যে অনেকক্ষণ আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল! আমার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো।

আমি ঘর থেকে বারান্দায় চলে এলাম। আমার খুব অভিমান হলো! আমি তো ইচ্ছে করে ধাক্কা দেইনি! ধাক্কা লেগে গেছে। আমার মনে আছে, প্রচ অভিমানে সে রাতে আমি অনেকটা সময় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেছি। একবার আমার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেও মনে জেগেছিল!

তবে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো বয়স ও সাহস আমার তখনও হয়নি! পরদিন ঘুম থেকে উঠে আমি যথারীতি স্কুলে গেলাম! স্কুল থেকে ফিরে বাসায় ভাত খেলাম। বিকেলে বাড়ির বাইরে, গলিতে নুরুননাহার ও শেফালিদের সঙ্গে কুতকুতও খেললাম।

সেদিনও কুতকুত খেলছি। এমন সময় সেখানে আমার মামাতো ভাই কবিরকে দেখলাম। সে খুবই উত্তেজিত! আমি

তখন এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে আমার হাত ধরে কোর্টের বাইরে এনে বলল, ফরিদ ভাই, জলদি চলো।

আমি বললাম, কী হইসে?

সে তখনও হাঁফাচ্ছিল!

হাঁফাতে হাঁফাতেই বলল, জোসনা ফুবুর বাড়িত একটা বাকসো আনসে। অর মদে নাচ-গান দেহন যায়!

আমি বললাম, আব্বে! কী কস?

হ। হুনছি অর মদে ফিলিম বি দেহন যায়। গেলে জলদি চলো!

আমি কুতকুত খেলা ছেড়ে কবিরের সঙ্গে ছুটলাম।

আমাদের বাড়ি থেকে জ্যোৎস্না খালাম্মার বাড়ি এক মিনিটের পথ। আমরা সেটা দৌড়ে সেটা ৩০ সেকেন্ডে পার হলাম। এসে দেখি, বাড়ির নিচতলায় এলাহী কা ! ২০-৩০ জন মানুষ বারান্দায় জড়ো হয়েছে। বারান্দার মাঝখানে ছোট একটা উঠান। তার অপর পাশে টানা বারান্দা। সেখানে ছোট একটা টেবিলে বাকসের মতো একটা জিনিস রাখা। তার সামনে চৌকো একটা গ্লাস লাগানো। উঠানে একটা সোফায় বসে খালু গড়গড়া টানছেন। পাশে আরও কয়েকটা চেয়ার লাগানো। সেখানে বসে আছেন জ্যোৎস্না খালাম্মা, নূরজাহান আপা, নার্গিস আপা, লাটঠু মামাসহ অনেকেই।

আমি পাশেই ফকির ভাইকে দেখে বললাম, এইটা কী জিনিছ?

ফকির ভাই বিজ্ঞের মতো বললেন, এইটা অইলো টেলিবিছন।

টেলিবিছন! এইটা দিয়া কী অয়? আমি ফিসফিস করে জানতে চাইলাম।

ফকির ভাই বললেন, রেডুতে ত খালি গান হুনন যায়, এইটাতে আর্টিস রে বি দেহন যাইবো। একটু থেমে বললেন, শিলঙে (সিলোন) বয়া মোহাম্মদ রফিক (মোহাম্মদ রফি) গান গাইবো, আর এইহানে বয়া তারে দেখবি।

ফকির ভাই গুনগুন করে গাইতে শুরু করলেন, ইয়ে দুনিয়া, ইয়ে মেহফিল, মেরে কাম কি নেহি...!!

একটা বাকসের মধ্যে মানুষ কীভাবে দেখা যাবে– এটা ভেবে আমার মধ্যেও দারুণ কৌতূহল আর উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। আমি একে-ওকে ধাক্কা দিয়ে এক ফাঁকে দেখলাম আমি 'টেলিবিছন' নামের সেই যন্ত্রটার সামনেই দাঁড়ানো। যন্ত্রটা তখনও চালু হয়নি। তার সঙ্গে যে প্ল্যাগটি ছিল, সেটার তার ছিল বেশ ছোট। সেটা দেয়ালে লাগানো সকেট পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না! আবার টেলিভিশম সেটটা সেই দেয়ালের কাছে নিয়ে গেলে আরেকটা তার টেলিভিশনে লাগানো যাচ্ছে না। পরে জেনেছিলাম, ওইটা অ্যান্টেনার তার। বাবুল মামা, আমাদের দূরসম্পর্কের মামা, যিনি ওই বাড়িতেই থাকেন, তিনি বুঝতে পারছেন না আসলে কী করা উচিত। আমি টেলিভিশনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পেছন থেকে খালু আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, এইটা ফরিদ না? আব্বে, তুই টেলিবিছনের সামনে খাড়ায়া হা কইরা কী দেখবার লাগছস?

আমি এতই বিস্ময় নিয়ে যন্ত্রটিকে দেখছিলাম যে, পেছন থেকে খালু যে আমাকে কিছু বলছেন সেটা আমি টেরই পাইনি। সত্যিকার অর্থে আমি তখন কিছুটা হাবা গোছেরই ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, অপর পাশ থেকে কবির আমাকে ইশারায় পেছনে তাকাতে বলছে।

আমি পেছনে ফিরতেই খালু বললেন, আব্বে, হা কইরা রইছস কেলা? মুখে ত মাকখি (মাছি) ঢুইকা যাইব! আমার মনে হলো, আমি সত্যি সত্যি হাঁ করে ছিলাম! খালুর কথা শুনেই আমি মুখ বন্ধ করলাম।

খালু বললেন, টেলিবিছন কি তুই একলাই দেখবি? না আমারেও দেখতে দিবি?

খালুর কথা শোনার পরই খেয়াল করে দেখলাম, আমি ঠিক তার সামনেই দাঁড়ানো। আমি একটু ডান দিকে সরে যাওয়ার পর তিনি বাবুল মামার দিকে ফিরে একটা ধমক লাগালেন, আবে হালায়, কী করবার লাগাইছস? মাথায় কি গোবর নিহি! এতো টাইম লাগে ক্যান।

বাবুল মামা তখন ঘেমে একসা। বললেন, মর জ্বালা, আমি কী করমু, একটা তার লাগাইলে আরেকটা লাগে না।

খালু বিরক্ত মুখে বললেন, তরে ত আগেই কইছিলাম, মিস্তিরি রে বুলা। তুই ত নওয়াব সাব অইছস। আমার কথা হুনবি কেলা। অহন লাগা...!

বাবুল মামা বললেন, মনে লয়, মিস্তিরিরেই ডাকন লাগবো।

খালু এবার ক্ষেপে গেলেন, নাটকির জানা, তাইলে অহন তরি খাড়ায়া রইছস কেলা! লৌড় দে না।

বাবুল মামা সত্যি সত্যিই 'লৌড়' দিলেন।

কিন্তু তিনি গেলেন যে গেলেন! তার আর পাত্তা নাই! কিছুক্ষণ হুক্কা টানার পর খালু একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তিনি হাঁক দিলেন, ফকিরা, ফকিরা গেল কই? অরে ত এহেনেই দেখছিলাম!

ফকির ভাই তার সামনে ছুটে গেলেন, জ্বি ফুবা?

দ্যাখ ত খানকির পোলায় কই গেল! এতক্ষণে ত লাহোর থনে মিস্তিরি আনন যাইত!

মোল্লা ফার্মেসির সাথেই ইলেকট্রিকের দোকান। এ বাড়ি থেকে ৫-৬ মিনিটের রাস্তা। আসতে-যেতে বড় জোড় ১০-১২ মিনিট লাগার কথা। আমার ধারণা, তখন ৫-৭ মিনিট সময়ও পার হয়নি। কিন্তু লোকজন অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাদের কাছে তখন এক মিনিট সময়ও এক ঘণ্টার মতো দীর্ঘ! টেলিভিশনে ছবি দেখার জন্য তাদের তর সইছিল না।

বাবুল মামা মিনিট পনেরোর মাথায়ই ফিরলেন। এতক্ষণ বারান্দায় আর উঠানে যারা ছিল তারা এ জায়গাটাকে বাজার বানিয়ে ফেলেছিল! সবাই কথা বলছিল। বাবুল মামা ইলেকট্রিশিয়ান নিয়ে ফিরতেই সবাই চুপ হয়ে মেরে গেল।

ভয়ংকর নীরবতার মধ্যে শুধু খালুর গলা শোনা গেল। বাবুল মামাকে বললেন, নওয়াব ছলিমুল্লা অইছস! আইতে-যাইতে এত টাইম লাগে নিহি! এতক্ষণে ত লাহোর থনে আহন যাইত। অহন জলদি ছাড়।

ইলেকট্রিশিয়ানের চেষ্টায় আরও আধ ঘণ্টা পর 'টেলিবিছন' চালু হলো। তখন ফিলিপস বাতির বিজ্ঞাপন হচ্ছে- 'ফিলিপস, ফর লাস্টিং বাল্ব...'।

বিজ্ঞাপন শেষ হলে ইংরেজি ছবি শুরু হলো। 'টারজান'। টারজানের নানা কেরামতি, বাঘ, ভালুক, হাতি আর বানরের নানা কসরৎ দেখে আমি একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম! বাসায় যে সন্ধ্যে ছটার মধ্যে ফেরার নিয়ম, সেটা বেমালুম ভুলে গেলাম। টারজান শেষ হওয়ার পর খবর শুরু হলো। সে সময় আমার ভেতর থেকে কেউ যেন বলে উঠল, ফরিদ, জলদি বাড়ি যাও, আজ তোমার খবর আছে!

আমি উঠে পড়লাম।

আমি উঠতেই পেছনে খালুর গলা শুনলাম, কিরে তুই আবার কই যাইবার লাগছস?

বললাম, বাড়িত যামু।

খালু বললেন, টেলিবিছন দেখলি পসা তো দিলি না!

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম! সবাই কি তবে পয়সা দিয়ে টেলিভিশন দেখছে নাকি! বিষয়টা আমার

মাথায় এলো না। আশ্চর্য! কবির তো আমারে কিছুই কয় নাই! আমাকে চুপ থাকতে দেখে খালু বললেন, ইদিকে আয়।

আমি তার কাছে যেতেই তিনি আমার হাতে চার আনার একটা কয়েন দিয়ে বললেন, যা এক লৌড় দিয়া বাদাম কিনা লয়া আয়।

আমার এমনিতেই অনেক রাত হয়ে গেছে। আগে কখনও এতো রাত পর্যন্ত বাইরে থাকিনি। বাড়িত গেলে আম্মা কী করবে কে জানে! ভয়ে আমার বুক ঢিবঢিব করছিল। এর মধ্যে খালু আমাকে বাদাম কিনতে পাঠাচ্ছে। তার কথা না রাখারও কোনো উপায় আমার নাই।

আমি পয়সা হাতে নিয়ে ছুটলাম। রাত তখন ৯টা কী ১০টা। ঘড়ি সম্পর্কে আমার পুরোপুরি ধারণা না থাকায় বুঝতেও পারছিলাম না, ঠিক ক'টা বাজে! পুরো জিন্দাবাহার এলাকায় কোনো বাদামঅলার চিহ্ন নাই। অথচ এমনিতে প্রতিদিনই রাস্তাঘাটে বাদামঅলার দেখা পাওয়া যায়। নয়াবাজার, আশক লেন, প্রসন্ন পোদ্দার লেন চক্কর কেটে আমি হয়রান হয়ে গেলাম। কোনো বাদামঅলার দেখা মিলল না।

আমার কপাল সব সময়ই খারাপ। কোনো কিছু আমার সহজে মেলে না। খালু এমনিতে আমাকে কখনও কিছু কিনতে পাঠায়নি। আজই প্রথম ঘটল। বাদামটা কিনে দিতে পারলে আমারও ভালো লাগত। খালু আমার প্রতি নিশ্চয়ই কিছুটা প্রীত হতেন!

কিন্তু প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ছুটাছুটি করেও আমি বাদামের দেখা পেলাম না! মন খারাপ করে আমি জ্যোৎস্না খালাম্মাদের বাড়িতেই ফেরত গেলাম! আমার খুবই অস্বস্তি লাগছিল। খালু আমাকে বাদাম কিনতে দিলেন অথচ আমি সেটা খুঁজে পেলাম না!

চরম হতাশ হয়ে আমি খালুর সামনে গিয়ে তার দেয়ো কয়েনটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, খালুজান, বাদাম তো পাইলাম না!

খালু আমার হাত থেকে পয়সাটা ফেরত নিয়ে সেখানে একটা কিছু গুঁজে দিলেন।

আমি অনুভব করলাম, সেটা একটা বাদামের খোসা।

খালু বললেন, গাদার বাচ্চা, তুই বাদাম আনতে কই গেছিলি? আমি গরে বয়া থাইকা বাদাম পাইলাম। আর তুই বাজারে গিয়া বাদাম বিচরায়া পাইলি না? আব্বে কছ কী?

আমি চুপ করে রইলাম। এর কী উত্তর হতে পারে আমার জানা নাই।

তিনি বললেন, ঠিকাছে। যা, এইবার কিনার যা।

অনেক রাত হয়ে গেছে। ক'টা বাজে আমি অনুমান করতে পারলাম না! ১০টাও হতে পারে, ১১টাও!

বাসায় ঢুকে দেখি, আম্মা আর আব্বুজি- দু'জনের মুখই থমথমে। শরিফ বিছানায় ঘুমুচ্ছে।

আমাকে দেখেই আম্মা বললেন, ওই যে গোলামের বাচ্চায় আইছে!

আম্মা খুবই দ্রুত রেগে যান! রেগে গেলেই তিনি সাধারণত এ গালিটাই দেন।

বিছানার ওপর আব্বুজি চুপ হয়ে বসেছিলেন। আম্মা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, অহন তুমার পোলারে জিগাও, এতো রাইত পর্যন্ত কুনহানে আছিলো। বালা মানু কুনুদিন এতো রাইত পর্যন্ত ঘরের বাইরে থাকে!

আম্মা আবউজির দিকে তাকালেন। আব্বুজি কোনো কথা বললেন না।

আম্মা এতে আরও রেগে গেলেন। বললেন, তুমি চুপ কইরা বয়া রইছো কেল্লাইগা? পোলারে জিগাইতে পারো না, কই আছিলো?

আব্বুজির গলায় অবশ্য কোনো উত্তেজনা নেই! তিনি শান্ত গলায় জানতে চাইলেন, কই গেছিলি? এতো রাইত পর্যন্ত তো বাইরে থাকন বালো না।

আমি মুখ নিচু করেই জবাব দিলাম, জোসনা খালাম্মা গো বাড়িত। অরা টেলিবিছন আনছে, দেখতে গেছিলাম।

টেলিবিছন! কবে আনছে? আমি জানলাম না! আব্বুজির গলায় বিস্ময়!

আম্মা তখন আরও ক্ষেপে গেলেন।

বললেন, আমি কই কী, আর আমার সারিন্দায় কয় কী! জোসনা আপায় তো আমারেও কইছিলো, আজকা টেলিবিছন ফিট করবো। আমি গেছি? আমি গেছি নিহি কও? আমি তো যাই নাইক্কা! আমি তো তুমাগো মথন ফকিন্নি না। কইলেই কি যাইতে অইবো নিহি? তুমরা বাপ-বেটা অইলা ফকিন্নির জাত! কেউ কিছু কইলেই তুমরা কুত্তার মতন গিয়া খাড়ায়া থাকো।

রেগে গেলে আম্মা সহজে চুপ হতে পারেন না! তিনি অনেকক্ষণ ধরে বকবক করতে থাকেন।

আমার দিকে ফিরে বললেন, তরে না কইছি, ছয়টার পর বাইরে থাকবি না! তারপরেও তুই থাকলি কুন সাহসে? ক?

আমি বললাম, কুনুদিন টেলিবিছন দেহি নাই, এল্লেইগাই ইট্টু গেছি...।

সন্ধার মদে বাড়িত ফিরলি না ক্যান?

ক্যামনে আমু, টেলিবিছন ফিটিং করতে দেরি অয়া গেছিলো!

আর তুই ফকিন্নির মথন খাড়ায়া আছিলি?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনো কথা বললাম না। আম্মা হঠাৎ আমার গালে কষে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। মুখে বললেন, এই থাপ্পড়ের কথা যদি মনে থাকে তাইলে আর যাবি না। মাইনসের বাড়িত বেসি বেসি যাওন আমার একদম নাপসন্দ। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, ওই বাড়িত খায়া আইছস, নাকি না খায়া আইছস?

আমি চুপ করে থাকলাম। আম্মার রাগ কমতে কমতেও আর কমলো না।

তার মুখ চলতে থাকল, এবার সব রাগ গিয়ে পড়ল জ্যোৎস্না খালার ওপর। আম্মা গজগজ করতে লাগলেন, সবগুলিরে আমার চিনা আছে। এত রাইতে আমার পোলারে না খাওয়ায়া অরা কেমনে ছাড়ল!

আমার দিকে ফিরে বললেন, সন্ধ্যা ৬টার পর আর যদি ওই বাড়িত গেছস, তর ঠ্যাং আমি ভাইঙ্গা দিমু। আমি ত তরে খেলতে না করি না। স্কুল থন সুজা বাড়িত আয়া গল্লির মদে খেলবি, ছটার সুময় পড়তে ববি। কী কইলাম হুনছোস?

আম্মাকে এখন এটা কে বোঝাবে যে সেখানে কেউ খাবার দেয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। আমি সেসব আর ব্যাখ্যা করতে গেলাম না। চুপচাপ আমি মাথা নাড়লাম।

আম্মা উঠে গিয়ে আমার জন্য খাবার বাড়তে লাগলেন। কিন্তু আমার ভেতরে ভেতরে প্রচ অভিমান হলো। সামান্য বিষয়। এর জন্য এতো রাগ করার কী আছে! সব সময়ই দেখি, আম্মা সামান্য জিনিস নিয়াই খ্যাচম্যাচ করেন।

কেন?

এর উত্তর আমার জানা নাই।

তবে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, জোসনা খালাম্মা গো বাড়িত আর যদি যাই! আম্মার সাথেও না।

কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা আমার মাত্র তিন দিন স্থায়ী হলো। ❖

লুবনা মারিয়াম

সহজের সন্ধানে



নিবন্ধ

ইতিহাস সংরক্ষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, বিশেষত চিন্তা ও দর্শনের ইতিহাস, কারণ সেই ধারাবাহিকতার মধ্যে একটি জনসমষ্টি তার বর্তমান জাতিসত্তাকে বুঝতে এবং সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়। আজ যখন বাংলাদেশ জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের বৃদ্ধির আশঙ্কার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধান খুঁজছে, ইতিহাসের অনুশীলন করা আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। পৃথিবীজুড়ে বলা হচ্ছে এই অযৌক্তিক অন্ধকারের আগ্রাসন ঠেকানোর সবচাইতে বড় উপকরণ সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ।

ভাগ্যক্রমে, এই সমাধান, যুগের পর যুগ, আমাদের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক চর্চার ভেতর অন্তর্নিহিত আছে। মধ্যযুগের বৌদ্ধ বজ্রযান ধর্ম অনুসারী থেকে বর্তমানের বাউল ও বয়াতি সাধক পর্যন্ত, আজ অবধি, 'সহজ' চিন্তনের ওপর দাঁড়িয়ে, মহাকরুণার দর্শন, বাংলাদেশের ভূগর্ভে সমাদৃত ও চর্চিত। এই করুণা মানুষকে, একটি জাতিকে, সহিষ্ণু ও উদার করে। আজকে তাই সহজের এই সন্ধান।

কী তবে 'সহজ'?

স্বনামধন্য নাথ যোগী মহেন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুযায়ী,

'মানুষ স্বাভাবিকতার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সেই আদিম পরিপূর্ণতার দিনগুলো সে এখনও ভোলে নাই, তবে সেই স্মৃতি সভ্যতার কৃত্রিম কাঠামোর ও কৃত্রিম চিন্তনের তলায় প্রোথিত। এই স্বাভাবিকতাই 'সহজ'। বৃক্ষ 'সহজ' অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়– স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক-জগতের প্রাকৃতিক বিধির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে। কেউ তাকে বলে না কী করণীয় এবং কেমন করে করণীয়। তার কোনো জন্মগত স্বধর্ম বা আরোপিত বিধিনিষেধ নেই। আছে শুধু স্বভাব-অন্তর্গত নিষ্কর্ষ, যা তার একমাত্র পথপ্রদর্শক। 'সহজ' সেই সহজাত প্রকৃতি যা অন্তরে সংস্থাপিত হয়ে পরম স্বাধীনতা ও প্রশান্তি প্রদান করে।'

জন্মমাত্রই আমরা একটা কাঠামোর ভেতর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। নাম, গোত্র, ধর্ম, জাতীয়তা, পূর্বনির্ধারিত ভালো ও মন্দের ধারণা, সবটাই নবজাত শিশুর ওপর আরোপিত হয়। এই কাঠামোর তাড়নায় মানুষ তার আদিম পরমার্থিক স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, লোভ, ক্রোধ, মোহ দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। 'সহজ' সেই কাঠামোবিরোধী দর্শন যা মানুষকে তার নিজস্ব অদ্বৈত- আধ্যাত্মিক, সকরুণ স্বভাবের সাথে পুনরায় যোগ করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতি অঙ্গনে এই 'সহজ' চিন্তনের এক অনন্য যাত্রা পরিলক্ষণীয়। আশ্চর্যজনকভাবে এই চিন্তা কেবল শুষ্ক নীরস পণ্ডিত মহলে আলোচিত হয়নি। প্রথমাবধি এ সকল মতবাদ গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়ে এসেছে। সম্প্রচারিত হয়েছে দ্ব্যর্থক, সান্ধ্যভাষা দ্বারা সাধারণ শ্রোতার জন্য এক অর্থে, আর সাধু সাধকদের উদ্দেশে তারই ভেতর প্রচ্ছন্ন গূহ্য অর্থ।

মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে 'সহজ'

বৌদ্ধ বজ্রযান সাহিত্যে প্রথম উপস্থাপিত হয় 'সহজ'-এর দর্শন; বৌদ্ধ চর্যাপদ আর দোহা গানে প্রায়শ 'সহজ' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও, তার বিশ্লেষণ আমরা প্রথম পাই মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ বজ্রযান তান্ত্রিক রচনা 'হেবজ্রতন্ত্র'-এর দশম পাটলে :

সহজাত্যাং য়দুৎৎপন্নং সহজং তত্ প্রকীর্তিতং।

স্বভাবং সহজং প্রোক্তং সর্বাকারৈকসংবরং ॥ ১০.৪১

(প্রজ্ঞা আর উপায়, বা করুণা) সহজাত হবার কারণে তাকে সহজ বলা হয়।

সকল প্রপঞ্চের প্রচ্ছন্ন ঐক্যের স্বভাবমাত্রই সহজ।

পুরুষতত্ত্ব আর প্রকৃতি তত্ত্বের যৌগিক মিলনে যুগপৎ উৎপাদিত হয় সহজ। স্পষ্টত এই চিন্তা হিন্দুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে ধারকৃত, যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি যথাক্রমে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আর প্রজ্ঞার প্রতীক। তবে বৌদ্ধ মতে তার এক অভিনব বিবর্তন ঘটে। জগৎপ্রেমিক গৌতম বুদ্ধ নিষ্ক্রিয় বৌদ্ধিক স্বাধীন ইচ্ছার পরিবর্তে, মানবসভ্যতার মঙ্গলের লক্ষ্যে, উপস্থাপিত করলেন স্বেচ্ছায় সাধিত সক্রিয় নৈতিক দায়িত্ব বা করুণার তত্ত্ব। প্রায়োগিক দৃষ্টিতে স্বাধীন ইচ্ছা তখনই শ্রেয় যখন আমরা স্বাধীনভাবে নিজের এবং অপরের মঙ্গল সাধন করতে পারি। তাই, বৌদ্ধতান্ত্রিক চর্চার প্রধান অভিপ্রায় মানবচিত্তে এই স্বেচ্ছাজনিত দায়িত্বের বিকাশ। সেই দায়িত্বপূর্ণ সহজ স্বভাব করুণা আর জ্ঞানের মিলনে উৎপন্ন হয়।

বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনার শেষ পরিস্থিতি 'নির্বাণ' যা 'বোধিচিত্ত' যা করুণা আর প্রজ্ঞা, বা পুরুষ তত্ত্বের আর প্রকৃতি তত্ত্বের, মিলনে অর্জিত হয়। ক্রমে সেই শেষ ফল 'মহাসুখ' বা সহজ উপলব্ধির পরিস্থিতি হিসেবে বিকশিত হয়।

কীভাবে সাধিত হয় এই উপলব্ধি?

বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে শরীরকে দেবালয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেই দেবালয়ের অধিষ্ঠাতা মানবাত্মা এবং দেহ তার রাজ্য। নানান বিরাজমান সাধন বিধি দ্বারা মানুষ, দেহে অধিষ্ঠিত সেই রাজ্যকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছে। তন্মধ্যে আদি সংখ্যাতত্ত্বের সাধনা 'যোগ' নামে পরিচিত। শরীরের প্রতিটি ভঙ্গি, অনুভূতি, হস্ত মুদ্রা, মন্ত্রোচ্চারণা, দেহে শনাক্ত করা কিছু শক্তির স্থুল বা চক্র, নিশ্বাসের বিশেষ প্রক্রিয়া ইত্যাদির ওপর সুগভীর মনোযোগ রেখে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সাধন যোগতন্ত্রকে, সারা বিশ্বে, আধ্যাত্মিক সাধনার অন্যতম উপায় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এই সাধন মার্গ সংক্রান্ত অজস্র আলোচনা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত হয়েছে। সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দ্বারা দেহ ও মনের প্রায় বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। পতঞ্জলির 'যোগসূত্র'; 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, 'যোগ কুণ্ডলিনী উপনিষদ' ছাড়া ও বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে।

দেহভিত্তিক আধ্যাত্মিক সাধনা ক্রমে একটি পরিমার্জিত দর্শনের রূপ ধারণ করে যাকে 'তন্ত্র' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তন্ত্রের মূল বক্তব্য– আমরা ও আমাদের লৌকিক জগৎ এক অদৃশ্য মহাজাগতিক শক্তির বাস্তব রূপ। তার ফলস্বরূপ এই পরমাত্মিক শক্তির সাথে প্রতিটি মানব আত্মার অন্তর্নিহিত যোগ আছে। অবিদ্যার ফলে আমরা সেই যোগ উপলব্ধি করতে পারি না। দেহভিত্তিক সাধনার মাধ্যমে এই যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তন্ত্রের মূল লক্ষ্য। দেহের পঞ্চেন্দ্রীয়– রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বাস্তব অনুভূতি দ্বারা এই উপলব্ধি সাধিত হয়। তন্ত্রে, আরও যুক্ত হয় পুরুষ ও নারীর যৌন-যোগিক মিলনে লব্ধ পরমার্থিক আনন্দ, যা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহায়ক।

তন্ত্রের সাধনা বিধিতে প্রায়শ সঙ্গীত ব্যবহারের নির্দেশ আছে। হস্তমুদ্রার ব্যবহার সাধনার ওতপ্রোত অঙ্গ। দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি স্থলে, বিশেষত পূর্বাঞ্চলে, তন্ত্রে নৃত্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত, যথা– নেপালের বজ্রযান তন্ত্রে চর্যানৃত্য, আসামের বৈষ্ণব মঠ বা সত্রে সত্রিয়নৃত্য। বাংলাদেশের বাউল সাধনায়ও নৃত্য ব্যবহৃত হয়।

চর্যানৃত্য মূলত বজ্রযান বৌদ্ধতান্ত্রিক কৃত্যে ব্যবহৃত নৃত্য-গীতির ধারা। তবে চর্যা শুদ্ধ নৃত্য বা নাটক নয়। এটা একটা সাধন প্রণালি বা 'চর্চা'। 'হেবজ্রতন্ত্রং' বজ্রযানতন্ত্রের রচনা। হেবজ্রতন্ত্রের চর্যাপাটলে বলা হয়েছে :

"যদি গীতং গীয়ত আনন্দাৎ তর্হি বজ্রান্বীত পরং।
যদি আনন্দে সমুৎপান্নে নৃত্যতে মোক্ষহেতুনা।
তর্হি বজ্রপদৈ নাট্যং কুর্যাৎ যোগিসমাহিতং ॥"
৬.১০

অর্থাৎ যোগী সহিত 'বজ্রপদ'ভিত্তিক নৃত্য ব্যবহার করে মুক্তির সাধনা করাই শ্রেয়। এখানে যদিও 'বজ্রপদ' বলা হয়েছে, উদাহরণে যে পদ ব্যবহৃত হয়েছে সেটি অপভ্রংশে লিখিত 'চর্যাপদ'।

এই কৃত্য যারা পরিচালনা করেন তারা বজ্রাচার্য। তান্ত্রিকেরা এই নৃত্যের মাধ্যমে ধ্যানস্থ হন। অদৃশ্য আরাধ্য শক্তিকে বাস্তব বিস্তার দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। যে সকল দেবতার নৃত্য চর্যানৃত্যে পরিবেশিত হয় তারা হলেন– বজ্রযোগিনী (বজ্রবারাহী), মহামঞ্জুশ্রী, পঞ্চবুদ্ধ (বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চ স্কন্ধের প্রতীক)। এক একটি চর্যাগীত নির্দিষ্ট রাগাশ্রিত এবং শেষে পঞ্চতাল নামে নির্দিষ্ট বোল-বাণীর ব্যবহার আবশ্যক। পোশাকে মুখোশের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। পায়ে নূপুর ও মাথায় মুকুটসহ তাম্রের অলঙ্করণ দেখা যায়। মাঝে মধ্যে মুখাঙ্কনও পরিলক্ষিত।



বাংলাদেশে আমরা যে সকল চর্যাপদের সাথে পরিচিত তন্মধ্যে চতুর্থ পদ, ত্রিহন্ডা, বজ্রযানী অহরাত্র কৃত্যে ব্যবহৃত।

সত্তরের দশক পর্যন্ত এ সকল নাচ নেপালে কেবল গোপন কৃত্যে ব্যবহৃত হতো। তবে সেই সময় কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে পরিলক্ষিত হয় যে, এই নৃত্যশৈলীর দ্রুত অবলুপ্তি ঘটছে। এর ফলে বজ্রাচার্যগণ সিদ্ধান্ত নেন যে চর্যা নৃত্য বাছাই করা কিছু নৃত্যশিল্পকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সেই থেকে ধীরে ধীরে এই নৃত্য পরিবেশনা শিল্পের রূপ নিতে আরম্ভ করেছে।

লক্ষণীয়, যে নেপাল একটি হিন্দুরাজ্য হওয়া সত্ত্বেও দুরূহ এই বৌদ্ধ বজ্রযানী নৃত্যশৈলী কয়েক শতাব্দী ধরে এখানে সংরক্ষিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ, নেপালের হিন্দুদের পারিবারিক কৃত্য পরিচালনা করেন বজ্রযানী বজ্রাচার্যগণ। এমনকি নেপালি হিন্দু রাজপরিবারেরও। বজ্রাচার্যরা পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার ফলে তারা তাদের গোপন বজ্রযান কৃত্যের চর্চা বজায় রাখতে পেরেছেন।

মধ্যযুগে বাংলাদেশ ও নেপালের সংযোগ

মধ্যযুগের বাংলাদেশে তন্ত্রের চর্চা সংক্রান্ত তথ্য, অন্যদের মধ্যে, ড. আহমদ শরীফ ও অসীম রায়ের আলোচনা থেকে জানা যায়। বৌদ্ধ মহাযানী তন্ত্রের চর্চাও সেই সময় এ দেশে হতো। তা ছাড়া ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'চর্যাচর্চাবিনিশ্চয়'-এর ভাষার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, বহু চর্যাপদের পদকর্তা পূর্ব বাংলার বসবাসকারী ছিলেন। ১০৪১ সালে পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট বৌদ্ধ মহাসিদ্ধাচার্য অতীশ দীপঙ্কর নেপালে যাত্রা করেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, তার সাথে স্থানান্তরিত হয় বাংলার বৌদ্ধ বজ্রযান চর্চা।

বজ্রযান কৃত্যের প্রধান আরাধ্য শক্তি 'বজ্রযোগিনী'। সেই কৃত্যের নৃত্যে আজও যে চর্যাপদ ব্যবহৃত হয় সেটি শান্তিকরাচার্যের লিখিত, যিনি ছিলেন মধ্যযুগীয় গৌড়ের রাজা প্রচণ্ডদেব। আমরা আরও জানি যে, বৌদ্ধ সাধক অতীশ দীপঙ্করের গ্রামের নাম বজ্রযোগিনী, যেখানে কিছু বৌদ্ধ নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে উঠে এসেছে বৌদ্ধ সভ্যতার পুণ্য স্থান। এ সকল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে, বর্তমানের নেপালের চর্যার চর্চার সাথে বাংলাদেশের একটা নিশ্চিত যোগ রয়েছে।

প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প থেকেও মধ্যযুগীয় বাংলাদেশ ও নেপালের যোগাযোগ অনুমান করা যায়। হেবজ্রতন্ত্রের প্রধান দেবতা 'হেবজ্র' বা 'হেরুকা'। কুমিল্লার ময়নামতি ও শুভপুরে হেরুকার মূর্তি পাওয়া গেছে। তদুপরি বাংলাদেশের মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপিতে হেরুকার চিত্র বরেন্দ্র জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এই চিত্রের সাথে 'থাংকা' চিত্রের মিল আছে। সেখানকার ভিন্ন এক পাণ্ডুলিপিতে বজ্রবারাহীর ভিন্নরূপ 'মারীচি'র চিত্রও সংরক্ষিত। আরও পাওয়া গেছে বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি বৌদ্ধ 'পর্ণাশাবরী' মূর্তি। এ দুটো নারী দেবমূর্তিতে দেবী 'প্রত্যালিঢ়া' ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। আজও নেপালের চর্যানৃত্যে এই ভঙ্গি বজ্রযোগিনীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত এবং মহামঞ্জুশ্রীর ভঙ্গি হেরুকার চিত্রের অনুরূপ। এ সকল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে, চর্যাপদের এবং চর্যানৃত্যের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক রয়েছে।

বৌদ্ধ যুগ-পরবর্তী চর্চায় 'সহজ'

বৌদ্ধ সংস্কৃতির চর্চা বাংলাদেশে হ্রাস হওয়ার পর, 'সহজ'-এর চিন্তন এবং নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে তার সম্প্রচারের সংস্কৃতি অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে হিন্দুচর্চায় প্রবেশ করে নাথ যোগীদের বিভিন্ন কৃত্যের মাধ্যমে। গোরক্ষনাথ, মৎসেন্দ্রনাথ ও দারিপদের বিভিন্ন লেখায় স্থান পেয়েছে সহজের স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিকতার দর্শন। 'গোরক্ষবোধ'-এর এক সংলাপে বলা হচ্ছে :

গোরক্ষনাথ : যদি নাই থাকত রাত্রি, তবে দিবসের উৎপত্তি হতো কোথায়? দিবস ছাড়ায় বা রাত্রি মিশে যেত কোথায়?

মৎসেন্দ্রনাথ : বিনা রাত্রি, সহজে মিশে যেত দিবস; আর যদি নাই থাকতো দিবস, রাত্রি অবলুপ্ত হতো সহজে। (পঙ্ক্তি ২৯-৩০)

নাথ যোগীর চর্চায় হঠযোগের গুরুত্ব এবং নিয়মিত ব্যবহার এই কায়িক সাধনের পদ্ধতিকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়। আর তার সাথে ছড়িয়ে পড়ে সাধনা দ্বারাপ্রাপ্ত সহজ এবং সহজানন্দের চিন্তন।

পাল রাজ্যের পতনের পর, বৈষ্ণব ধারায় বিশ্বাসী, সেনবংশের রাজত্বে বহু বৌদ্ধমতাবলম্বী বৈষ্ণব মতবাদে ধর্মান্তরিত হন। রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেমলীলার সংস্কৃতিতে

সংমিশ্রিত হলো বৌদ্ধ সহজিয়া চিন্তন ও সাধনা। আবির্ভূত হলো বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়। বৌদ্ধ সাধনার করুণা আর প্রজ্ঞার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত হলেন শ্রীকৃষ্ণ ও তার পরম ভক্ত রাধা আর তাদের মিলনের মধ্যেই মহাসুখ উপলব্ধি পেল। এই চর্চাও নৃত্য ও গীতের আশ্রয় নিল। অসাধারণ সঙ্গীত ও সাহিত্য রচনা করলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকেরা। ষোলো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত তিনশ' বছর ধরে বৈষ্ণবপদ রচিত হলো। গীতোপযোগী ও ভণিতাযুক্ত ছন্দোবদ্ধ রচনা 'পদ' নামে অভিহিত। অমর সাহিত্য রচনা করলেন বলরাম দাস, নরোত্তম দাস, রাধামোহন দাস ঠাকুর প্রমুখ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই অভূতপূর্ব এক সাংস্কৃতিক একীকরণ লক্ষণীয়। এগার-বারো খ্রিষ্টাব্দ থেকেই আরম্ভ হয় জ্ঞানসম্পন্ন সুফি আওলিয়া দরবেশদের আগমন। অনায়সে সংমিশ্রণ ঘটে বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও মুসলমান চিন্তনের। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা পাই অভিনব সমন্বয়কারী কিছু ইসলামী তান্ত্রিক রচনা যথা 'যোগকলন্দর', 'অমৃতকুণ্ড' ইত্যাদি।

এ ধরনের সমন্বয়কৃত ধর্মচর্চার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আঠারো শতকে বৈষ্ণববাদ ও সুফিবাদ থেকে উদ্ভূত কর্তাভজা নামে একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়। এ মতবাদের মূল গুরু ছিলেন আউলচাঁদ (আনু. ১৬৯৪-১৭৭০)। বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতো, কর্তাভজাগন পরমার্থিক সত্যকে 'সহজ' নামে শনাক্ত করেন। সেই মতাবলম্বে 'সকল মানুষের অন্তরে 'সহজ' বসবাস করে 'মনের মানুষ'-এর রূপে। তাদের মৌলিক গ্রন্থ 'ভাবের গীতা'তে বলা হচ্ছে :

'সহজ জাতি মানুষের
বস্তি সহজ দেশে
কি মতি প্রকৃতি বুঝো আভাসে' (৪৮)

বর্তমানের বাউল সম্প্রদায়ের মতো কর্তাভজা সম্প্রদায় ও তাদের চিন্তা ও দর্শন সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করেন।

ধর্মমত প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে আমরা এবার বিশ্বনন্দিত কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখব 'সহজ' এখানে বৈদিক দর্শনের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে 'আনন্দ'রূপে স্বীকৃত। কবির অতি প্রিয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ এ বলা হয়েছে :

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তিতী ॥ ৩.৬'
সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে,
সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে,
সেই আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।'

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি বলেন, 'ঈশ্বর সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষা সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ।' আনন্দের এই সহজ উপলব্ধি থেকে কবির বাণীতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে করুণার বার্তা–

'একি করুণা করুণাময়!
হৃদয়শতদল উঠিল ফুটি অমল কিরণে তব পদতলে॥'

এই পটভূমি থেকে উদ্ভূত হয় বর্তমানবাদী বাউল ও ফকির সম্প্রদায়, যারা সকল প্রকার ধর্মীয় পাঠের অনুমেয় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, অন্তরের মনের মানুষকে ধ্রুব সত্য হিসেবে স্বীকার করেন। লালন সাঁইয়ের কথায় :

'সহজ মানুষ ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে,
পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে।'

বিশ্বনন্দিত কোনো বিদ্যাপীঠে নয়, গুরুগম্ভীর আলোচনা সভায়ও নয়, পদ্মা নদীর পাড়ে অজ্ঞাতপ্রায় এক গ্রামে বসে সুদৃঢ়কণ্ঠে মানবসভ্যতার সবচাইতে ব্যাপক দর্শন উচ্চারিত হলো।

'সে রূপ দেখবি যদি নিরবধি সরল (সহজ) হয়ে থাক।
আয় না চলে ঘোমটা ফেলে নয়ন ভরে দেখ॥'

এই সহজ-সরল উপলব্ধির ভিতে দাঁড়িয়ে সমতার দর্শন সমগ্র বিশ্বকে অভিভূত করে :

'জগত বেড়ে জাতির কথা লোকে গল্প করে যথা তথা
লালন ফকির জাতির ফাতনা ডুবিয়েছে সাধ বাজারে
সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কি রূপ আমি দেখলাম না দুই নজরে॥'



তবে এই দর্শন হঠাৎ আবিভূত হয় নাই। বহু যুগ আগে উদ্ভাবিত, কায়-সাধনার মাধ্যমে লব্ধ অভিনব সহজ স্বভাবের চিন্তা আজও বাংলার মাটিকে, মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। আজও লোকমুখে গীত হচ্ছে করুণার অনুপ্রেরণীয় এই দর্শন। সময় এসেছে এই উদার, আকাশছোঁয়া দর্শনকে আরও সুদৃঢ় স্থান দেওয়ার। হয়তো সেখানেই আমাদের শেষ রক্ষা হবে। ❖



ভ্রমণ

মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদ

মাসাই মারা, কেনিয়া

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, শুধুই মাঠ, ঘাসে ভরা । মাঝে মধ্যে দু'একটা গাছ সমতল ভূমিতে অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে । ভূ-প্রকৃতিকে একদম সমতল বলা চলে না, কিছুটা উঁচু-নিচু । মাঝে মাঝে কিছু টিলা দেখা যায়। যেদিকে টিলা চোখে পড়ে, সেদিকে টিলাগুলোই যেন দিগন্তের সীমানা নির্ধারণ করছে। যেদিকে সমতল গিয়ে মিশেছে দিগন্তে, দিগন্তের দূরত্বটা সেদিকে যেন অনেক বেশি। টিলার দিকটায় দিগন্তটা কাছে চলে এসেছে টিলা পর্যন্ত। চারদিকে আর কোথাও চোখে পড়ছে না কিছু। ওলকিওমবো এয়ারস্ট্রিপ, যেখানে আমাদের উড়োজাহাজটা অবতরণ করেছে, সেটা ছেড়ে এসেছি দশ মিনিটও হয়নি। এরই মাঝে তা চলে গেছে দৃষ্টিসীমানার বাইরে। এয়ারস্ট্রিপে কোনো টার্মিনাল ভবন ছিল না। ভবন বলতে যা বোঝায়, সেটা ছিল একটা শৌচাগার। গোপালভাঁড়ের মতো কোনো ভাঁড়ের গল্প হয়তো এখানেও প্রচলিত আছে। গোপালভাঁড়ের গল্প যারা পড়েছেন, তাদের নিশ্চয় মনে আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গোপাল প্রমাণ করেছিল– পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দদায়ক কাজ হলো প্রাকৃতিক কাজ। আনন্দদায়ক কথাটা সকলেই হয়তো মেনে নেবেন না। কিন্তু সবচেয়ে যে প্রয়োজনীয়– তা মানতে কারোরই আপত্তি করার কথা নয়। ধু-ধু এই মাঠের মাঝে তাই টার্মিনালের প্রয়োজন না থাকলেও শৌচাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাটা অবহেলিত হয়নি মোটেও। এয়ারস্ট্রিপ বা রানওয়েটা নেহায়েত সাদামাটা। ঘেসো মাঠের মাঝে ঘাসহীন এক টুকরো রাস্তা। চল্লিশ-পঞ্চাশজন যাত্রী বহনকারী উড়োজাহাজ ওঠানামা করতে পারে। ছবিতে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়কে সেই ১৯০৩ সালে যে মাঠে তাদের প্রথম হাওয়াই জাহাজখানা ওড়াতে দেখেছি, এটার অবস্থা তার থেকে যে খুব বেশি উন্নত, তা মনে হলো না।

আমাকে নিতে এসেছিল জনাথন নামে এক মাসাই যুবক। বয়স আনুমানিক পঁচিশ-তিরিশ বছর। পরে জেনেছিলাম, সে বত্রিশ বছরের সক্ষম যুবক। চার সন্তানের জনক। পরিচয় দিয়ে

জানাল, সে হবে আমার গাইড বা প্রদর্শক, পরবর্তী দু'দিনের জন্য। পরে উপলব্ধি করেছিলাম, সে আসলে একের ভিতরে অনেক। চালক, প্রদর্শক এবং দেহরক্ষী; এমনকি ক্যাম্পের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে খাবার পরিবেশক। পরনে তার ছিল মাসাইদের ঐতিহ্যগত রঙিন পরিধেয়, সঙ্গে কোমরে গোঁজা ওলালেমচ হাতখানেক লম্বা দুদিকেই শানিত মাসাই ছুরি। দেহরক্ষী বললাম বটে, তবে–মাসাই মারার উন্মুক্ত প্রান্তরে বুনো জন্তুর আক্রমণে আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসত, নাকি নিজেকে রক্ষা করতে চম্পট দিত তা হলফ করে বলার মতো পরিস্থিতি সফরকালে তৈরি হয়নি। সঙ্গে ছিল জর্জ নামে আরও এক যুবক। পরিচয়ে জানলাম, সে ক্যাম্পের খাদ্য পরিবেশক। এয়ারস্ট্রিপ ছেড়ে মিনিটদশেক চলার পরই মাসাই মারার দিগন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রথম যে জন্তুটি দেখলাম, তা হলো একটি জিরাফ। লম্বা গলাটাকে সটান আরও লম্বা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটুর ওপরের পুরো শরীরটাই পেয়েছে নীল আকাশের পটভূমি। সমতল তৃণভূমির লম্বা ঘাসগুলো কোনোমতে জিরাফের হাঁটু অব্দি পৌঁছেছে। অভিভূত হয়ে দেখলাম। চিড়িয়াখানার জিরাফ তো অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়াতে দেখিনি কখনও; বন্দিদশায় অহঙ্কার মানায় না বলেই হয়তো। অনেক সময় নিয়ে অনেক ছবি তোলার লোভটা সংযত করে দু'তিনটা ছবি তুললাম মাত্র। নাইরোবিতে পরিচিত হওয়া সাফারির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক বিদেশি পরামর্শ দিয়েছিল, ইচ্ছে হলেও প্রথম জন্তু দর্শনেই অনেক ছবি তোলা সময়ের অপচয়মাত্র। কেননা, সাফারির পুরো সময়টাই কাটবে ছবি তুলে।

জিরাফের পরে পেলাম বুনো মহিষ, তারপর টপি ও জেব্রা। মহিষগুলোর স্বাস্থ্য একেবারে জুতসই। গায়ে-গতরে বাংলাদেশের সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান মহিষের দ্বিগুণেরও বেশি হবে। শিংগুলো বাঁকানো, বেশ বড় সড়। বিশেষত, শিংয়ের ভিতটা মাথার উপরের অনেকটা অংশজুড়ে। হরিণ প্রজাতির পাঁচটি ধরন দেখেছি মাসাই মারায়: টপি, ইম্পালা, অ্যান্টেলপ, গ্যাজেল এবং গ্র্যান্ট গ্যাজেল। টপি একটু বড়, শিংগুলো বেশ বড় সড়, সোজা উপরে উঠে পিছনে বেঁকে গেছে। মর্দা মাদী দুয়েরই মাথায় শিং। বাদামি রঙের স্বাস্থ্যবান শরীরে নীল নীল ছোপ, যেন নীল জিন্সের পোশাক পরেছে। জেব্রাগুলোর স্বাস্থ্যও চমৎকার। জেব্রাগুলোর রঙ কি কালোর ওপর সাদা স্ট্রাইপ, নাকি সাদার ওপর কালো, সেই তর্ক থামার নয়। তবে, কোথাও পড়েছিলাম, রঙটা কালোর ওপর সাদা স্ট্রাইপ। প্রশ্ন করায় জনাথন বুঝিয়ে বলল, পায়ের নিচের দিকে যেখানে কোনো স্ট্রাইপ নেই তা কালো; এ থেকেই বোঝা যায় জেব্রার গায়ে কালো রঙের ওপর সাদা স্ট্রাইপ। বরাদ্দকৃত ১০ সিটের টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার ট্রাকটা চলছে মেঠোপথ ধরে। পথ বলতে মাঠের মাঝে গাড়ি চলতে চলতে তৈরি হওয়া আঁকাবাঁকা সমান্তরাল দুটো দাগ। একটু দূরে গেলেই তা আর দেখা যায় না। হঠাৎ পথ ছেড়ে গাড়ি বাঁয়ে মোড় নিল। দেখলাম সামনে কিছু ঝোপঝাড়। পথ ছেড়ে হঠাৎ ঝোপে ঢোকার কারণ প্রথমে না বুঝলেও, বুঝলাম একটু পরেই; যখন জনাথন ঝোপের নিচে বিশ্রামরত চিতার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গাড়ির শব্দে ততক্ষণে তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে দেখে নিলাম সবচেয়ে দ্রুতগামী শিকারিকে। চওড়া বুক, সুগঠিত পা আর সরু কোমরই জানিয়ে দেয়– শিকারের সময় কতটা ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন হতে পারে এই শিকারি। চিড়িয়াখানার প্রাণী আর এখানকার প্রাণীর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য লক্ষ্য করলাম, প্রাণশক্তির পার্থক্য। বড় বেশিমাত্রায় যেন সজীব এখানকার প্রাণীগুলো।

ক্যাম্পের পথে বাকি সময়টুকু কাটল ঘটনাবিহীন। মাঝে ওতালেক নামে একটা শহর পড়ল, যেটাকে শহর না বলে গঞ্জ বলাই শ্রেয়। কিছু আধা-পাকা ঘরবাড়ি, একটা স্কুল, ফিলিং (পেট্রোল) স্টেশন এবং কিছু মানুষের নড়াচড়া দেখলাম। শহরটা পেরিয়ে এলাকার সঙ্গে বেমানান একটা বেশ বড় অত্যাধুনিক বাড়ি চোখে পড়ল। জানলাম একজন পাইলটের বাড়ি সেটা। বৈদ্যুতিক তারের বেষ্টনী দেওয়া কয়েক একর জায়গা নিয়ে আরও একটা বাড়ি দেখা গেল। বুঝলাম ধনাঢ্য কোনো ভাগ্যবানের বাড়ি হবে। রাতে হাতি ও সিংহের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক বেষ্টনীর ব্যবস্থা। পরে জেনেছিলাম, প্রায় দশ হাজার ডলার বা আট লাখ টাকায় এখানে এক একর জায়গা মেলে। চলতি পথে আরও কিছু দূরত্ব পেরিয়ে পৌঁছুলাম কাঙ্ক্ষিত ক্যাম্পে– টিপিলিকওয়ানি মারা ক্যাম্প। স্থানীয় ভাষায় জাম্বো বলে সম্ভাষণ জানানোর পর চেক-ইনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আট নম্বর তাঁবুতে পাঠানো হলো আমাকে। তাঁবুটা এককথায় চমৎকার! মাটিতে খুঁটি পুঁতে উপরে কাঠের পাটাতন দিয়ে মেঝে। চারদিকে গোলাকার কাঠের খিলানের ওপর কাঠ দিয়ে তৈরি চালের কাঠামো। তাতে ছনের দোচালা ছাদ। ছাদের নিচে আলাদা করা তাঁবুর মূল ঘরটি। ক্যানভাসের ঘরে নেটের দরজা-জানালা, তাতে জিপার লাগানো। দরজা-জানালাগুলো দুটি স্তরে তৈরি। একটা নেটের, অন্যটা ক্যানভাসের। রাতে দুটোর জিপারই লাগানো থাকে বন্যপ্রাণী সাপ আর পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তবে তাঁবুর ক্যানভাসের ছাদে শুধু নেট লাগানো দুটো জায়গা। মূলত বায়ু চলাচলের জন্য, তবে নেটের সেই পথে রাতে ঠাণ্ডা নেমে এসে অপ্রস্তুত অতিথিদের যে ভোগায়, আমি নিজেই তার জলজ্যান্ত সাক্ষী। তাঁবুর ভিতরটা চমৎকার। একপাশে কিং সাইজ বিছানা, অন্যপাশে বড় একটা সোফা। পড়ার টেবিলও আছে এক কোনায়। বেডরুমের সঙ্গে লাগানো ড্রেসিংরুমসহ হাত-মুখ ধোয়ার জায়গা। পাশেই শৌচাগার আর গোসলের ব্যবস্থা, আলাদা। ক্যাম্পে তাঁবু আছে এ রকম মোট কুড়িটা। তারই আট নম্বরে স্থান হয়েছে আমার। তাঁবুটার নামকরণ করা হয়েছে ক্যাথেরিন এনডেবেরার (Catherine Ndebera) নামে। সাধারণভাবে ক্যাথেরিন, দ্য গ্রেট নামে পরিচিত, ইনি কেনিয়ার একজন অলিম্পিক বিজয়ী ম্যারাথন দৌড়বিদ। ২০০১ সালে শিকাগো ম্যারাথনে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী স্বনামধন্য এই দৌড়বিদ প্রথম এবং একমাত্র মহিলা, যিনি চারবার বোস্টন ম্যারাথন বিজয়ী এবং যাকে Runner's World পরপর পাঁচবার বর্ষসেরা দৌড়বিদ নির্বাচিত করেছিল। পাশের তাঁবুটার নামকরণ হয়েছে মোহাম্মদ আমিন-এর নামে। তার সম্পর্কে জানার তেমন সুযোগ হয়নি। গোসল সেরে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে বিকেল চারটার দিকে জনাথনের সঙ্গে আবার আমার শুরু হলো অপরাহ্ণের সাফারি ভ্রমণ। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে দক্ষিণদিকে কিছুটা এগোতেই আবার বন্য পশু। প্রথমেই চোখে পড়ল ধূসর আর সাদায় মেশানো অ্যান্টেলপ এবং লালচে রঙের ইম্পালা। তারপর আবার মহিষ। একটু পরে রাস্তা ছেড়ে একটা সরু নালার ধার ঘেঁষে জনাথন গাড়ি চালাল কিছু ঝোপের দিকে। পাশে নালা থাকায় তৃণভূমির মাঝে ঝোপের সৃষ্টি হয়েছে। আমাকে জানাল, লেপার্ড খুঁজছে সে। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও লেপার্ডের কোনো সন্ধান মিলল না। হতাশ হয়ে দূরের পথে যাত্রা করলাম আমরা। ততক্ষণে সূর্য ঢলে পড়েছে বেশ খানিকটা পশ্চিমে। সূর্যটাকে ডানে রেখে আমরা চললাম আরও দক্ষিণে। বামপাশে গাড়ির ছায়াটা ততক্ষণে দীর্ঘ থেকে

দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে। ডানে-বামে, সামনে-পেছনে চারদিকেই দেখা যাচ্ছে ইম্পালা, অ্যান্টেলপ, টপি, জেব্রা চরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্তে। কে জানে, ক্ষিপ্র গতির চিতা বা বিশাল দেহী সিংহ হয়তোবা তৈরি হচ্ছে কোথাও শিকার ধরার আশায়; তাদেরও তো উদরপূর্তি করতে হবে, কিন্তু ঘাসে তো পোষাবে না ! তবে সেদিকে তৃণভোজীদের ভ্রুক্ষেপ আছে বলে মনে হলো না।

আরও কিছুদূর চলার পর পথের পাশেই একটা জিরাফকে বসে থাকতে দেখা গেল। জিরাফকে সচরাচর বসে থাকতে দেখা যায় না- জানালো আমার গাইড। দ্রুত ছবি নিলাম। একটু পরেই সে উঠে রওনা দিল নিজের গন্তব্যে; তাড়া আছে বোধহয়। আমরাও রওনা দিলাম। হাতের ডানে পেলাম কয়েকটা উটপাখি। কিছু একটা খুঁটে খাচ্ছে। কারও খাদ্যেরই অভাব নেই এই মানবহীন প্রান্তরে। খাদ্যের যা অভাব তা কেবল মনুষ্য অধ্যুষিত অঞ্চলেই। আরও দেখলাম ধূসর রঙের তিনটা ওয়াটার বাকু; সবই মাদী, শিং নেই। হরিণ প্রজাতির হলেও ভেড়ার মতো দেখতে, তবে ঘাড়টা অনেক লম্বা। এদেরই জাতভাই হলো বুশ বাকু; কিন্তু তাদের দেখা মেলা ভার। ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকাই তাদের বেশি পছন্দ। ততক্ষণে ফিকে হয়ে এসেছে তির্যক হয়ে পড়া পড়ন্ত সূর্যের আলো; জনাথন তবুও গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে ডানে ঘুরে পশ্চিম দিকে। চলতে চলতেই পথের উপর পড়ে থাকতে দেখলাম হাতির মল; চিড়িয়াখানায় দেখে চেনা। একদম কাঁচা। জনাথনকে জিজ্ঞেস করায় সম্মতিসূচক মাথা নাড়তেই সামনে পড়ল ছ'সাতটা হাতির এক পরিবার। সামনের জায়গাটা একটু উঁচু ছিল বলে সামান্য দূরে থেকেও তাদের দেখতে পাইনি। বাচ্চা হাতি দেখতে সত্যিই সুন্দর, আদর করতে ইচ্ছে হয়। আমাদের গাড়ির আট-দশ হাত দূরত্বে ঘাস খেয়ে চলল। পানি পান করল ছোট্ট একটা গর্ত থেকে। বেশ খানিকটা সময় কাটালাম ওদের কর্মকাণ্ড দেখে। তবে সূর্য অস্তাচলে যাওয়ার আগেই ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করলাম আমরা। ক্যাম্পটা ঘণ্টাখানেকের পথ। ফিরতি পথে তিনটা হর্নবিল পাখি দেখলাম। কালো শরীর হলেও ঘাড় আর ঠোঁটের অংশটা লাল। ক্ষয়িষ্ণু সন্ধ্যার আলোয় অসংখ্য প্রাণীর সান্ধ্যকালীন চারণ, আর চারণভূমির অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে ফিরে চললাম ক্যাম্পে; শেষ হলো আমার প্রথম দিনের সাফারি।



দ্বিতীয় দিনের গল্প

ট্রু টুক টুক, নাকি ক্রু-উ কুক কুক- কোনটা সঠিক, অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারলাম না; কিন্তু নিয়মিত বিরতিসহ একটানা ডেকে চলল নাম না জানা একটা পাখি। একবার মনে হচ্ছিল ট্রু টুক টুক, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল ক্রু-উ কুক কুক। সেই সঙ্গে ছন্দ মিলালো কুক ক্রু-উ কুক, কুক ক্রু-উ কুক ডাকের আরও একটি পাখি। আরও শোনা গেল টুটুক টুটুক টুটুক টুটুক, কিচ কিচ কিচ, চিঁউ চিঁউ চিঁউ এমন অনেক ডাক। কিচির মিচির তো আছেই। কোনো পাখিরই নাম জানি না। মধ্যাহ্নভোজনের পর আয়েশে শরীর এলিয়ে দিয়েছিলাম তাঁবুর বারান্দার আরাম কেদারায়। মৃদুমন্দ বাতাস শরীরে আরামের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। চারদিকে ঘন গাছগাছালিতে ঘেরা, লতাগুল্মে জড়াজড়ি। বাতাসে দোল খাচ্ছিল সেগুলো।

পাশের তাঁবুগুলো খুব বেশি দূরে না হলেও ঘন গাছের আড়ালে থাকায় দেখা যাচ্ছিল না। কোনো মানুষের পদচারণা ছিল না আশেপাশে। শুধু বাতাসের নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাকি সব সুনসান। ভাবছিলাম, সকালের সাফারির চমৎকার অভিজ্ঞতাটা লিখে ফেলব। কিন্তু স্বল্প ঘুমে কাটানো রাত্রি আর খুব ভোরে শুরু করা রোমাঞ্চকর সাফারির পর বাতাসের শীতল পরশে দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। শেষ কবে এমন অনাবিল শান্তির আস্বাদ পেয়েছিলাম তা মনে করতে পারলাম না। কাছাকাছি যতটুকু মনে পড়ল তা স্কুলজীবনে গ্রামের বাড়িতে গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর কথা। জেগে আর থাকতে না পেরে তাঁবুর বিছানায় শরীর এলিয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম। অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম ঘণ্টাখানেক পর অপরাহ্নের সাফারির প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য।

নতুন জায়গায় এমনিতেই আমার ঘুম ভালো হয় না; অনেকেরই হয় না। তার উপরে ছাদের নেটের অংশ দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস যেন ঠিক আমার নাকে এসে পড়ছিল। গায়ে কম্বল থাকলেও খোলা মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডার প্রকোপে বেশ ক'বার ঘুম ভাংল। তবু অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়লাম। ফজর নামাজ পড়ে ছ'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। এ রকমই পরিকল্পনা হয়েছিল আগের রাতে। ক্যাম্পের রেস্তোরাঁয় কফি পান করে ছ'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়া গেল। সঙ্গে নেওয়া হলো পিকনিক ব্রেকফাস্ট ব্যাগ। ক্যাম্প গেট থেকে বেরিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ সোজা দক্ষিণে চলা হলো। সূর্যমামা তখনও দিগন্তরেখা ছেড়ে উঠে আসেননি। তবে পুবের আকাশটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। যে কোনো সময় তিনি চেহারা দেখাবেন। মাঠে এরই মধ্যে তৃণভোজীদের দেখা মিলেছে। আবারও টপি, ইম্পালা, অ্যান্টেলপ, গ্যাজেল এবং জেব্রাদের প্রাধান্য। দুপুরের খর রোদ থেকে বাঁচার জন্যই তৃণভোজী প্রাণিকুলকে সকাল ও পড়ন্ত বিকেলে চারণে নিমগ্ন দেখা যায়। ভরদুপুরে তারা যায় গাছের ছায়াতলে বা ঝোপেঝাড়ে, বিশ্রাম নিতে। তখন খুব একটা দেখা মেলে না তাদের। একটু পরেই আমরা ডানে বাঁক নিয়ে পশ্চিমে চললাম। সকালের সোনারোদে সামনের দিকটা দিগন্ত পর্যন্ত ঝকঝকে হয়ে উঠল। কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এরই মাঝে এক হায়েনাকে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে দেখা গেল। কাজ সমাধা করে এদিক-ওদিক তাকাল। ভাবখানা- কেউ দেখে ফেলল না তো! তারপর, দেখলেই বা কী– এমন ভাব নিয়ে হেঁটে চলল নিজের গন্তব্যে। শিকারের কোনো তাড়া দেখা গেল না তার মধ্যে।

নিঃসঙ্গ একটা হাতিকে দেখলাম প্রাতরাশে ব্যস্ত। নিঃসঙ্গতা কাটাতে তাকে কিছুটা সঙ্গ দিয়ে পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করতেই দেখা গেল দূরে দু'দুটি গরম বাতাসভর্তি বেলুন পর্যটক নিয়ে শূন্যে উঠে গেছে। বেলুন দুটো বাতাসের ঝাপটায় বেশ কিছুটা সামনে এগোনোর পর গ্রাউন্ড-ক্রুদের নিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রাক আর কার্গো ট্রাক দুই-ই ছুটল সেগুলোর পেছনে। মাটিতে নামলে পর্যটক আর বেলুন, দুই-ই ফেরত আনতে হবে তো। পরিষ্কার নীল আকাশের পটভূমিতে রঙিন দুটো বেলুনের গায়ে সকালের কাঁচা রোদ পড়ে মনোমুগ্ধকর একটি দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। দৃশ্যটা হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে আমরা ডানে ঘুরে উত্তরমুখী হলাম। খোলা ময়দানে কিছু তিতির পাখির দেখলাম খুঁটে খুঁটে খাবার খাচ্ছে। এর একটু পরেই চোখে পড়ল বাদুড় কানের কয়েকটা শিয়াল (Bat eared fox)। ছোটখাটো শরীর, কিন্তু ত্বরিৎ গতিসম্পন্ন। আমাদের দেখে সেই যে গর্তে লুকাল, অনেক অপেক্ষা করেও তাদের আর সাক্ষাৎ পেলাম না। বোধ হয়, দু'একটা তিতির দিয়ে নাশতার পরিকল্পনা ছিল; অনাহূত আমাদের আবির্ভাবে সেটা আর হয়ে উঠল না। বেচারা শিয়াল!

সামনে পড়লা তালেকু নদী। এই নদীটাই এঁকেবেঁকে বয়ে চলে গেছে আমাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে। ক্যাম্প আর মাসাই মারা রিজার্ভের সীমানা নির্ধারণ করেছে এই নদী। আবার নিকটস্থ শহরের নামকরণও এই নদীর নামেই। পানি নেই বললেই চলে। পাড় থেকে নিচ পর্যন্ত পঁচিশ-ত্রিশ ফুট হবে। ট্রাক থামিয়ে একটু সরেজমিন তদন্ত করে এসে, ট্রাক চালিয়ে ওপারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জনাথন। আমি শুধু একবার ইঞ্জিনের ক্ষমতা জানতে চাইলাম। চার লিটারের ইঞ্জিন শুনে নিশ্চিন্তে বসে রইলাম শক্ত হয়ে; রোলার-কোস্টার রাইডটা উপভোগ করার জন্য। গোঁ গোঁ শব্দ তুলে ইঞ্জিন জনাথনের সিদ্ধান্তের অত্যন্ত তীব্র প্রতিবাদ জানালেও, শেষ পর্যন্ত জনাথনের শাসনে বাধ্য বালকের মতো অপর পাড়ে পৌঁছে দিল আমাদের। বামে ঘুরে নদীর পাড় ঘেঁষে আবারও পশ্চিমদিকে যাত্রা। হঠাৎ জনাথনের চিৎকারে নদীর অপর পাড়ে তাকিয়ে দেখি বেশ কয়েকটা সিংহ। এত দূর থেকে ভালো করে দেখাই যায় না, ছবি তোলার তো প্রশ্নই আসে না। প্রতিবাদী ইঞ্জিনকে শাসনে রেখে, আবার নদীর বুক চিরে অন্য পাশে যাত্রা। জনাথন আমাদের গাড়িটা নিয়ে দাঁড় করাল একেবারে সিংহগুলোর গা ঘেঁষে। আমার মতো রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষও ভড়কে গেল প্রথমে।

গুনে গুনে মোট ছয়টা। দুটো সিংহ, বাকিরা সিংহী। সকালের নাশতাটা মনে হলো সেরেছে জুতসইভাবে। ঘুমে তাদের চোখ ঢুলু-ঢুলু। জগতের কোনোকিছুতেই তাদের তেমন আগ্রহ নেই। ইঞ্জিনের শব্দে কোনোমতে মাথা উঠিয়ে চোখ খুলে একবার দেখে নিয়ে যখন বুঝল, তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমতা বা সাহসটুকু আমাদের নেই, তখন নিজেদের দেখার সুযোগ করে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শুনেছি, সিংহ-নাকি দিনের আঠার ঘণ্টাই ঘুমিয়ে কাটায়। ইঞ্জিন থামিয়ে অনেক সময় নিয়ে দেখলাম, ছবি তুললাম। ওদের জাগানোর জন্য স্টার্ট দিয়ে ট্রাকটাকে নড়াচড়া করালে ওরা উঠে আমাদের দিকে একটু রূঢ়ভাবে তাকিয়ে পাঁচ-সাত ফুট দূরে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবখানা এমন– দেখতে এসেছ, দেখ; প্রাণভরে দেখ, তবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাও কেন বাপু? আবার করলে ঘাড়টা মটকে দেব কিন্তু। আমরাও বুঝলাম, আর বেশি ঘাঁটানো ঠিক হবে না। সময় থাকতে সরে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ওদের আরাম করতে দিয়ে আমরা আবার চললাম নদীর কিনার ঘেঁষেই। উদ্দেশ্য জলহস্তী দর্শন। দু'তিন কিলোমিটার দূরত্বে পাওয়া গেল তাদের। প্রায় শুষ্ক পাথুরে নদীর যে জায়গাটাতে একটু গভীরতা নিয়ে পানি জমেছে, সেখানে অনেক জলহস্তী পানিতে শরীর ডুবিয়ে আয়েশ করছে। জলহস্তীরা এমনিতেই বিশাল দেহী, তবে এদের মধ্যে দু'তিনটা এতটাই বিশাল যে মনে হলো, ডাঙায় উঠলে তাদের ছোট ছোট পা ওই দেহের ভার বইতে পারবে না। পানিতে থাকাটাই তাদের জন্য উত্তম। নদীর পাড় থেকে এবার আমরা চললাম খোলা ময়দানে। বিশাল এই প্রান্তরেভূ-প্রকৃতি মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হচ্ছে। কোথাও ঘাসগুলো সবুজ এবং ছোট। হরিণ বা জেব্রা জাতীয় প্রাণীদের চারণের জন্য উপযুক্ত। কোথাও ঘাসগুলো দু'তিন ফুট উঁচু। হাতি ছাড়া অন্যদের চারণের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। আমরা এমন একটা জায়গায় এলাম যেখানে ঘাস দেড় থেকে দু'ফুট হবে। এখানে একটা সিংহ দেখলাম, যার মধ্যে বেশ তেজ লক্ষ্য করা গেল। রাজেন্দ্র চালে চলছে, সত্যিই যেন অঞ্চলের রাজা। আর একটু দূরেই পেলাম সিংহের এক যুগলকে।

কেনিয়ার মাসাই মারায় দুই দিনের অভিজ্ঞতা আমার বহু দিনের সঞ্চয়ে যোগ হতে থাকে। ❖

সতেরো শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত নদীবহুল পূর্ববঙ্গ ছিল মোগল সাম্রাজ্য-বহির্ভূত

হাবিব আনিসুর রহমান

আদি ঢাকা প্রসঙ্গে



নিবন্ধ

পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে ইংরেজরা নতুন একটি প্রদেশ গঠন করে ১৯০৫ সালে। এই প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়ায় প্রাচীন নগরী ঢাকাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, সে কারণে ইংরেজ লেখক ব্রাডলে বার্টের ওপর দায়িত্ব বর্তায় মোগল রাজধানী ঢাকার প্রাচীন গৌরব নিয়ে একখানি গ্রন্থ রচনার। ঢাকাকে নিয়ে তিনি লিখলেন ১৯০৬ সালে, 'দি রোমান্স অব অ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল', যার বাংলা অনুবাদ 'প্রাচ্যের রহস্য নগরী'। সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তানের জন্ম হলে ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হলো, তখন পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমদ হাসান দানী ঢাকাকে নিয়ে 'ঢাকা' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।

অধ্যাপক আবদুল করিমের 'ঢাকা দি মুঘল ক্যাপিটাল', অধ্যাপক কে এম মহসীনের 'কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসপেক্টস অব ঢাকা ইন দ্য এইট্টিন সেঞ্চুরি', অধ্যাপক শরীফ উদ্দিনের 'ঢাকা এ স্টাডি ইন আরবান হিস্ট্রি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট', অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের 'ঢাকা : স্মৃতি-বিস্মৃতির নগরী', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুশীল চৌধুরীর লেখা, 'ট্রেড অ্যান্ড কমার্শিয়াল অর্গানাইজেশন ইন বেঙ্গল'– এসব গ্রন্থ ছাড়াও আরও অনেক গ্রন্থ থেকে ঢাকা নগর সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়।

অখ্যাত একটি ক্ষুদ্র স্থান থেকে রাতারাতি ঢাকা রাজধানী শহরে রূপান্তরিত হওয়ার নেপথ্যে ছিল এ অঞ্চলকে ঘিরে মোগলদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। নগরায়নের অন্যতম উপাদান রাজনৈতিক গুরুত্বই ছিল মূলত শহর হিসেবে ঢাকার উত্থানের প্রধান কারণ। এই রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভের আগে ঢাকা সীমিত সামরিক ক্ষমতা ও ব্যবসা ও প্রশাসনের ক্ষুদ্র কেন্দ্র বৈ আর কিছু ছিল না।

সতেরো শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত নদীবহুল পূর্ববঙ্গ ছিল মোগল সাম্রাজ্য-বহির্ভূত। মোগল সাম্রাজ্যকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক সীমান্তের শেষ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এবং এই অঞ্চলের স্বাধীন পাঠান গোষ্ঠীপতিদের দমন করতে এবং কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী জমিদার বা খুদে শাসকদের বশে আনতে ঢাকাকে কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচন করা হয়। ঢাকার অবস্থানগত কারণে কৌশলগত সুবিধা ছিল ব্যাপক।

ঢাকা নগরী প্রথম মোগল রাজধানী হিসেবে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো সে কথা বলতে গেলেই যে কীর্তিমানের নাম সবার আগে উঠে আসে, তিনি সুবাদার ইসলাম খান চিশতি, যিনি ফতেহপুর সিক্রির শায়খ সেলিম চিশতির পৌত্র এবং দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমবয়সী ছিলেন এবং ছেলেবেলা থেকে তারা একসঙ্গে বড় হন। ইসলাম খানের বয়স বেশি ছিল না, শাসনের ব্যাপারে অভিজ্ঞতাও বেশি ছিল না, তাই বাংলার মতো এমন সমস্যাসংকুল প্রদেশে সুবাদার নিযুক্ত করার সময় উচ্চপদস্থ আমিররা তাঁর উপযুক্ততার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু ইসলাম খানের চরিত্র, সাহস ও আনুগত্যে সম্রাটের আস্থা থাকায় কারও কথায় কান না দিয়ে সম্রাট তাকেই নিযুক্তি দেন। ইসলাম খান চিশতি সম্রাটের আস্থার মূল্য দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের পিতা সম্রাট আকবরের বাঘা বাঘা সেনাপতি যে কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হন, ইসলাম খান তা সম্রাটের ইচ্ছামতো সমাধা করেন। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি সব বিদ্রোহীকে দমন করে সারা বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তার করেন এবং এর ফলে বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হয়।

আগে ইসলাম খান চিশতি বিহারের সুবাদার ছিলেন, ১৬০৮ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে বাংলার তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে আসেন এবং রাজমহলে বসেই উচ্চপদস্থ সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা নির্মাণ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, বাংলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম বাধা বারোভূঁইয়া এবং দ্বিতীয় বাধা খাজা উসমান আফগান। বারোভূঁইয়া এবং উসমান আফগানের ক্ষমতার কেন্দ্র পূর্ব বাংলা। অতএব তাদের পরাজিত করতে হলে ইসলাম খানকে পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে জয় করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তিনি বুঝতে পারেন যে, পূর্ব বাংলা জয় করতে হলে তাঁকে পূর্ব বাংলায় ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে। এই লক্ষ্যে রাজধানী পূর্ব বাংলায় স্থানান্তর করতে হবে। পূর্ব বাংলা জয়ের জন্য তাঁর দরকার একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী। নদীমাতৃক পূর্ব বাংলায় বছরের অর্ধেক সময় ঘোড়া অচল। বারোভূঁইয়ার শক্তির উৎস ছিল নৌবাহিনী, তাঁরা নৌযুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিত।

রাজমহলে বসেই সুবাদার তার লক্ষ স্থির করে ফেলেন। ইসলাম খানের অনুরোধে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইহতিমাম খান নামে একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল নিযুক্ত করেন। ইসলাম খান সমগ্র নৌবহর এবং উচ্চপদস্থ সব কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেনাপতি, দীওয়ান-বখশীদের সঙ্গে নিয়ে নৌপথে পূর্ব বাংলার দিকে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি তার সমগ্র বাহিনী নিয়ে রংপুরের ঘোড়াঘাটে পৌঁছান, সেখানে বর্ষাকাল কাটিয়ে শীত মৌসুমে ঢাকার দিকে অগ্রসর হন। বুড়িগঙ্গা নদী দিয়ে ঢাকা পৌঁছে তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী নৌবাহিনী গঠন এবং পূর্ব বাংলার ঢাকাকে রাজধানীর উপযুক্ত মনে করে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। ইসলাম খান ঢাকায় পৌঁছান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ওই সাল থেকেই রাজমহলের স্থলে ঢাকা হয়ে গেল সুবা বাংলার রাজধানী। ঢাকা থেকেই ইসলাম খান বারোভূঁইয়া এবং অন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সফলভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং সারা বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করলে সাধারণ পাঠকদের কাছে ঢাকা ও কলকাতা দুই বাংলার দুই শহর সম্পর্কে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়, ঢাকা যখন মোগল সুবা বা প্রদেশের রাজধানী কলকাতা তখন কয়েকটি ছোট ছোট গ্রামে সীমাবদ্ধ ছিল। কলকাতা, সুতানুটি এবং গোবিন্দপুর তিনটি গ্রাম ইংরেজ জব চার্নক ১৬৯০ সালে মোগল সম্রাটের কাছ থেকে ক্রয় করে একটি শহরের পত্তন করেন এই শহরের নাম হয় ক্যালকাটা, যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়েছিল।

ঢাকার নামকরণের সঠিক ইতিহাস নিয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে ভ্রমণের সময় সন্নিহিত জঙ্গলে হিন্দু দেবী দুর্গার একটি বিগ্রহ দেখতে পান। দেবী দুর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ বল্লাল সেন ওই স্থানটিতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর বিগ্রহটি ঢাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাই তিনি মন্দিরটির নাম দেন 'ঢাকা ঈশ্বরী' বা ঢাকেশ্বরী মন্দির। ওই মন্দিরের নাম থেকেই কালক্রমে স্থানটির নাম হয়ে যায় ঢাকা।

আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী ঘোষণা করেন, তখন সুবাদার ইসলাম খান আনন্দের সঙ্গে তার বাদ্যযন্ত্রীদের খুব জোরে জোরে ঢাক বাজানোর নির্দেশ দেন। ওই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোকমুখে কিংবদন্তির রূপ নেয় এবং তা থেকেই শহরের নাম হয় ঢাকা।

ঢাকার নামকরণ নিয়ে আরও কিছু প্রবাদ প্রচলিত আছে, যেমন এই অঞ্চলে প্রচুর ঢাক গাছ ছিল এবং ওই গাছের নামের কারণে এই স্থানের নাম হয়েছে ঢাকা। আবার বলা হয়, বুড়িগঙ্গার পাড়ে ঢাক্কা বা ডেক্কা নামের চৌকি বা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ছিল, সে জন্য ওই স্থানের নাম হয় ঢাকা। রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে ওই ঢাক্কা বা ডেক্কা উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া কেউ কেউ বলেন, এলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লিখিত সমুদ্রগুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ডবাকই হলো ঢাকা।

কাল পরিক্রমায় ঢাকা প্রথমে সমতট, পরে বঙ্গ ও গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রিষ্টীয় ১৩শ' শতকের শেষ দিকে পাঠান মুসলমানরা ঢাকা অধিকার করে। ১৬১০ সালের ১৬ জুলাই জাহাঙ্গীর রাজকীয় ফরমানের মাধ্যমে ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী ঘোষণা করেন। এবং জাহাঙ্গীরের জীবিতকাল পর্যন্ত ঢাকার নাম ছিল জাহাঙ্গীরনগর।

১৬১০ সালে ঢাকা সুবা বাংলার রাজধানী হলেও বাংলার রাজধানী বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৬৫০ সালে সুবাদার শাহ সুজা রাজধানী আবার রাজমহলে স্থানান্তর করেছিলেন। শাহ সুজার পতনের পর ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদার মীর জুমলা আবার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করেন। এরপর বেশ কিছুকাল ঢাকা নির্বিঘ্নে রাজধানীর মর্যাদা ভোগ করে। কিন্তু ১৭১৭ সালে সুবাদার মুর্শিদ কুলী খান রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন।

এরপর ঢাকা মোগল শাসনামলে ছিল নায়েবে নাজিমের অধীনে। এসবের দীর্ঘকাল পর ১৯০৫ সালে ঢাকা আবার তার সম্মান ফিরে পায়। বঙ্গভঙ্গের পর ১৯০৫ সালে ঢাকা পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামের নতুন প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়। ১৯১১ সালে দুই বাংলা পুনরায় এক হয়ে গেলে রাজধানী চলে যায় কলকাতায়, ঢাকা তার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা হারায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হলে ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয় এবং ১৯৭১ সালে পরাধীনতার শেকল ছিঁড়ে দেশ স্বাধীন হলে ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজধানী ঘোষিত হয়।

ঢাকা নগরীর ক্রমবিকাশ ও বিস্তারে মধ্যযুগে নগরায়ন ও নাগরিক শ্রেণী-বিন্যাসের এক আকর্ষণীয় চিত্র পাওয়া যায়। এখানকার পুরনো সামরিক দুর্গটি, যেখানে এসে ইসলাম খান প্রথম তার ছাউনি ফেলেন, তা নতুন রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে রূপান্তরিত হয় এবং তাকে ঘিরে অন্যান্য বসতি এলাকা গড়ে উঠতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই দুর্গটি সুবাদারের দপ্তর ও বাসস্থানের জন্য খুবই ছোট ছিল। এ কারণে নতুন অট্টালিকা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অট্টালিকা নির্মাণ ছিল দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম খানের তৈরি সুবাদারের প্রাসাদ, মসজিদ, বাদশাহী বাজার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার জন্য নির্মিত বাড়িঘর নিয়ে যে এলাকা গড়ে ওঠে, তা মোগল ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রকৃতপক্ষে সুবাদারের বাসস্থানই ছিল মোগল ঢাকা বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু। যদিও ঢাকার সম্প্রসারণে কোনো সুচিন্তিত নকশা অনুসরণ করা হয়নি, তবুও এর নতুন সামাজিক বিন্যাস ও বসতি সে যুগের ভাবনা এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে। দুর্গের পশ্চিম দিকে সুবাদারের বাসস্থানকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে নানা সরকারি প্রশাসনিক ভবন এবং তাদের কর্মকর্তা

ও কর্মচারীদের আবাসস্থান– দেওয়ানবাজার, বখশীবাজার, মোগলটুলি, কায়েতটুলি এবং এমন ধরনের অনেক বসতি। দুর্গের পূর্বদিকে যা ছিল পুরনো বসতি, সেখানে নতুন নতুন বাজার গড়ে উঠল আর গড়ে উঠল বিভিন্ন কুটির শিল্পী ও কারিগরদের বিশেষ এলাকা– বাংলাবাজার, পাটুয়াটুলী, শাঁখারীবাজার এবং তাঁতীবাজার।

উত্তরদিকের অপেক্ষাকৃত উঁচু সমতল ভূমিগুলো স্বল্পকালের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, অভিজাত পরিবার ও বড় ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। সেখানে তারা তাদের নিজস্ব এলাকা গড়ে তোলেন, প্রাসাদোপম বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেন এবং সুন্দর সুন্দর বাগান তৈরি করেন। এটাই ছিল মোগল ঢাকার শহরতলি। আরও উত্তরে তেজগাঁও এলাকায় এবং পরে অন্যত্র ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো তাদের কুঠিসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। এখানেই তৈরি হতো ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে রপ্তানির জন্য বিশেষ নকশার রকমারি বস্ত্রসামগ্রীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ।

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকা একটি বৃহৎ এবং সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হয়। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বের বিরাট এলাকাজুড়ে এর বিস্তৃতি ঘটে আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা। অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন তার গবেষণা গ্রন্থে জানাচ্ছেন– মোগল আমলে ঢাকা যখন তার সমৃদ্ধির তুঙ্গে ওঠে, বলা হয়ে থাকে তখন এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় নয় লাখ। এ নগরীটি বুড়িগঙ্গার তীর ধরে প্রায় দশ মাইল আর ভেতর দিকে প্রায় আড়াই মাইল পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। তিনি আরও বলছেন যে, এই পরিসংখ্যান যদি সম্পূর্ণ সত্য নাও হয়, তবুও সমসাময়িককালের পর্যটকদের বিবরণ এবং অন্যান্য উপাদান-উপকরণের সূত্র ধরে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সতেরো শতকের শেষ দিকে ঢাকা বাংলার অন্যতম বৃহৎ এবং জনবহুল নগরী হিসেবে গড়ে ওঠে। কবির ভাষায়, এটি ছিল 'প্রাচ্যের শহরগুলোর রানী'।

যেহেতু রাজনৈতিক তাগিদে ঢাকার গোড়াপত্তন হয় এবং ঢাকা প্রথম দিকে উৎপাদনের সঙ্গে ছিল সম্পর্কহীন, সেহেতু গোড়ার দিকে এর অস্তিত্ব ছিল নেহাৎই পরনির্ভরশীল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহরটি এর প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করত, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছুই দিতে পারত না। প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে সারাদেশের রাজস্ব দিয়ে ঢাকার প্রয়োজন মেটানো হতো। একই সঙ্গে দেশের সার্বিক সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার শ্রীবৃদ্ধিও ঘটতে থাকে। কিন্তু অচিরেই ঢাকার চেহারায় মৌলিক পরিবর্তন আসে, যখন ঢাকা তার নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই শহরটির সত্যিকারের নগরায়ন ঘটে। ঢাকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়। মূলত এই উত্তরণ সম্ভব হয় ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। এর অবস্থান ছিল এক উর্বর প্রশস্ত নিম্নভূমি এলাকার শেষ উচ্চস্থলে, যা একই সঙ্গে শহরটির সঙ্গে এক সম্পদশালী পশ্চাৎভূমির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুযোগ ঘটায় এবং সমগ্র দেশের সঙ্গে নদীপথে যোগাযোগের চমৎকার সুবিধা করে দেয়।

ঢাকার অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন মোগল শাসকগোষ্ঠী, তাদের সহযোগীবৃন্দ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, কারিগর ও শিল্পীরা। শাসকগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, বণিক, ব্যাংকার এবং কারিগরদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকার নিজস্ব একটি দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। এভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠী ও নগরবাসীর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে শহরকে গড়ে তুলতে এবং একে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে। কোনো নগর পরিকল্পনা অনুসরণ করা না হলেও ঢাকা মধ্যযুগের একটি সুন্দর শহর হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রাসাদ-অট্টালিকা, মসজিদ, মন্দির, ঘাট, রাস্তা আর বাজারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মধ্যযুগের এই শহরটি। শহরটির যোগাযোগ ব্যবস্থা, হাট-বাজারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার এবং সেই সঙ্গে শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করার গুরুদায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের ওপর, যিনি একই সঙ্গে ছিলেন শহরের প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, ঢাকার মতো বড় একটা শহরের স্বাভাবিক পৌর সমস্যা এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত নানা ধরনের জটিলতাকে কীভাবে পৌর কর্তারা নিয়ন্ত্রণ করতেন বা এ ক্ষেত্রে কী রকম সফলতা তারা লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়।

মোগল যুগে ঢাকার সমাজ ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে বলা যায়, সমাজ মূলত মোগল শাসকগোষ্ঠী, বণিক ও ব্যবসায়ী, জমিদার ও কারিগরদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। সেবামূলক কাজে বেতন ও মজুরিভোগী শ্রেণীর উপস্থিতিও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সমাজের উচ্চাসনে ছিলেন দিল্লি সম্রাটের প্রতিনিধি সুবাদার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রধান দেওয়ান, বখশী (সৈন্য এবং শ্রমিকদের বেতন প্রদানের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) এবং অন্যান্য উচ্চপদ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, যাদের হাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দুই-ই ছিল। এদের পরেই ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারগণ, যাদের অনেকেরই ঢাকা শহর বা এর আশপাশে বা দূরবর্তী এলাকায় বিপুল বিষয়-সম্পত্তি ছিল। এই সব উঁচুস্তরের মানুষরাই ঢাকার সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং এর সাংস্কৃতিক জীবনকেও পরিচালিত করতেন। শহরের সাধারণ মানুষেরা এদের জীবনধারার অনেক কিছুই অনুসরণ করতেন। কিন্তু তখন ঢাকার নাগরিক জীবনে পেশা কিংবা ব্যবসা ও শিল্পকে কেন্দ্র করে কোনো মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেনি।

ঢাকায় বিপুল সংখ্যক কারিগর, শিল্পী ও শ্রমিক শ্রেণীর উপস্থিতি ঢাকার শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নতির ইঙ্গিত বহন করে। এই জনসংখ্যার বেশিরভাগই আবার জড়িত ছিল বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে।

মোগল যুগে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে, এমনকি এ পর্যায়ে সারা বাংলার জনজীবনে ঢাকার অবদান ছিল প্রশ্নাতীত। অধ্যাপক আবদুল করিম তার 'ঢাকাই মসলিন' গ্রন্থে লিখেছেন, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম এবং শহরের মানুষ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করত, যাদের আর্থ-সামাজিক জীবন ঢাকার সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল। ঢাকা থেকেই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হতো, কেননা ঢাকার অনতিদূরেই অবস্থিত ছিল এই অঞ্চলের প্রধান শুল্ক দপ্তর শাহবন্দর। ঢাকা শহরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক কিছুই এর পশ্চাদভূমি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে অনুসৃত হতো। ইউরোপীয় কোম্পানির রপ্তানি তালিকায় সংখ্যার দিক থেকে সুতিবস্ত্রই অন্যান্য বস্ত্রের (রেশম বা মিশ্র) চেয়ে অনেক বেশি স্থান পেয়েছে। সুতিবস্ত্র প্রধানত মসলিন ও ক্যালিকো– এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বিশ্ববিখ্যাত ঢাকাই মসলিন খুব মিহি সুতো থেকে তৈরি হতো। যে মসলিন ঢাকা থেকে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হতো। সোনারগাঁ, ধামরাই, তিতবাধি, জঙ্গলবাড়ি এবং বাজিতপুর ছিল মসলিন তৈরির ঐতিহ্যবাহী প্রধান কেন্দ্র। রোমান যুগ থেকে প্রসিদ্ধ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও মহার্ঘ জাতের মসলিন অবশ্য ইউরোপীয়রা বেশি করে রপ্তানি করতে পারত না তার কারণ সম্ভবত এই যে, স্বল্প পরিমাণে তৈরি হতো বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তার সবটাই একচেটিয়াভাবে সংগ্রহ করত ধনী অভিজাতদের কাছে বিক্রির জন্য, ইউরোপীয়রা তার নাগাল পেত না। তা ছাড়া ইউরোপের শীতল আবহাওয়াতে অতি সূক্ষ্ম মসলিন খুব উপযোগীও ছিল না। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো নানা ধরনের যেসব মসলিন রপ্তানি করত, তার মধ্যে প্রধান হলো তাঞ্জেব, টেরিন্দাম, খাসা, মলমল, দুরিয়া, রেহাঙ্গ, আদাতি, আতছাবানি, চন্দরবানি, দোতানি, একতানি, গঙ্গালহরি, কামখানি, কোমররন্ধ, মিলমিল, মোহনবানি, রুদ্রবানি, নয়নসুখ, শিরবন্দ ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে খাসা ও মলমলের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। ❖



অলঙ্করণ : : বোরহান আজাদ

ফরিদুর রেজা সাগর

ডাক্তারদের ডাক্তারি



দু'জনেই নতুন ডাক্তার। আর ডাক্তারি পড়ার সময় নিয়মমাফিক ওরা পড়ত সাদা অ্যাপ্রোন। গলায় ঝুলত স্টেথিস্‌কোপ। এ কাজটি করত ওরা কলেজ ক্যাম্পাসে। কলেজ থেকে বেরোনোমাত্র স্টেথিস্‌কোপ আর অ্যাপ্রোন সাথে সাথে খুলে রাখত।

কেমন একটা সংকোচ কাজ করত! ডাক্তার হতে চলেছে– এটুকু জাহিরে ছিল আপত্তি।

এভাবেই দু'জন মনোযোগী ছাত্রের মতো ডাক্তারি পড়ল। পাসও করল ভালোমতো। ডিগ্রির পরে কিছু কিছু রোগী দেখা শুরু করল যত্ন নিয়ে।

অথচ আত্মীয়স্বজন, কাছের মানুষ যখনই বলে, 'কী খবর ডাক্তার?' একটু লজ্জিত হয়। ডাক্তার হয়েছে ঠিক, কিন্তু ফুটানি করতে নারাজ একটু।

শুধু ডাক্তার হওয়ার তকমাটা নামের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিলেই তো শেষ হয় না। চিকিৎসাশাস্ত্রে আপডেট থাকার জন্য নিয়মিত পড়াশোনায় থাকতে হয়। লেটেস্ট জার্নাল ঘেঁটে মস্তিষ্কে গেঁথে নেওয়া লাগে। এসবই ওরা দু'জন আন্তরিকতার সাথে করে। গভীর পাঠচক্রে ওদের ঘাটতি নেই। চেষ্টার ত্রুটিও নেই। শুধু কিঞ্চিৎ অস্বস্তি, নামের আগে 'ডাক্তার অমুক' জুড়ে দিতে।

অন্‌ডিউটিতে হাসপাতালে এ দুই তরুণ-তরুণীর সুনাম ছড়াতে লাগল। রোগীরা খুশি। হসপিটাল অথরিটি খুশি। সবাই ওদের লক্ষ্য করল বিনয়ের পরাকাষ্ঠা হিসেবে। এমন একটা সময়ে ঘটনাচক্রে যা দাঁড়াল, একটু একটু করে স্বভাবের মিলের জন্য সখ্য গড়ে উঠল দু'জনের। স্বভাবে এক রকম। আত্মপ্রচারবিমুখ। কিছুটা লাজুক। অন্তর্মুখী। দু'জন দু'জনার কাছাকাছি হওয়ার উপলক্ষগুলো প্রকট।

দু'জনই যেহেতু আমার কাছের মানুষ, ডিগ্রি নেওয়ার পরে ওদের ডেকে বলি, অসুবিধাটা কী– নামের আগে 'ডাক্তার' লেখা শুরু করতে পার। ফুল ডাক্তার হলে ডাক্তার লিখতে হয়। পাস করে গেছো প্রায় এক বছর। পাসপোর্ট বদলে নামের আগে 'ডাক্তার' থাকুক।

বিব্রত ভঙ্গি ওদের, 'না, খুব দরকার নেই।'

বললাম, ডাক্তার লিখলে তো একটা ভালো দিকও আছে। ধরো, প্লেনে যাচ্ছো কোথাও। প্লেনটা আকাশে উড়াল দিল, মাঝপথে কোনো প্যাসেঞ্জার সিরিয়াস হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল, প্যাসেঞ্জার লিস্টে 'ডাক্তার' কথাটা দেখলে তোমাদের সাহায্য করতে ডাকা হবে। তোমরা যাবে। রোগীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত হবে। প্রফেশনে এর চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কী হতে পারে বলো?

'না, না, এ জন্যই তো লিখতে চাই না। বাচ্চাদের ডাক্তার হয়েছি। বড়দের ট্রিটমেন্ট করার পণ্ডিতি তো নিতেই পারি না। পণ্ডিতি করা যায় তখনই, সেই বিষয়ে যখন বড় মাপের কেউ হয়। তার আগে না।'

যে দু'জনের কথা এত বিস্তারিত বলছি, তাদের একজন আমার বড় কন্যা। অন্যজন পরবর্তীতে আমার কন্যার জীবনসঙ্গী। পড়াশোনা ছিল একই ক্লাসে। বেরিয়েছেও একই সাথে। ডাক্তার তকমাটা লাগার পরেও ডাক্তারির ব্যাপারটা এলেই আমার সামনে অন্তত খানিক সংকুচিত হয়ে যায়।

আমার মেয়ে স্টুডেন্ট পড়ায় চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি। পড়ানোর সময় নানা বয়সী মেধাবী, কৌতূহলী, তুখোড় ছাত্র-ছাত্রীরা বেঞ্চে বসে ওর লেসন নেয়। শেখে। পরীক্ষা দেয়। উত্তীর্ণ হয়। এত এত স্টুডেন্টের ভিড়ে ওর জড়তা নেই। বাড়িতে, সামাজিক অনুষ্ঠান সব ফেলে-টেলে মাঝে মাঝে চেঁচায়, 'উপায় নাই। প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করা আমার কপালে নাই। কারণ, আমার ক্লাসরুমে আমার ছাত্রছাত্রীরা বসে থাকবে। ওরা লেকচার শোনার জন্য রীতিমতো ওয়েট করবে। সামনে ওদের জরুরি পরীক্ষা।'

কখনো দেখি, রাত জেগে জেগে আমার মেয়েটা স্টাডি করছে। পুরো প্রস্তুতির জন্য পড়াশোনা একপাশে, আর পৃথিবীর যাবতীয় কাজ অন্যপাশে।

মেঘনার বর রাফাত। লক্ষ্য করি, সেও সাংঘাতিক সিরিয়াস। স্কিন নিয়ে বড় কিছু করবার তার বড় পরিকল্পনা। পরিকল্পনা আর স্বপ্নের শেষ নেই। খামতি নেই তার প্রিপারেশনেও। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে স্বভাবমাফিক কর্মকাণ্ডে দায়িত্ব পালন শেষেও তাকে দেখি বিশাল বিশাল স্পেশালিস্টের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে, দিন পার করতে। হাসপাতালেই থাকেন, তারা রাফাতের আগ্রহ দেখে সহায়তার হাত বাড়ান। কাউকে সিরিয়াস দেখা গেলে বিশেষজ্ঞরা কখনও বিরক্ত হন না। সাহায্য করেন। তাই হচ্ছিল।

দু'জনের এভাবেই ব্যস্ততার কমতি নেই।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন এক ঘটনা ঘটল।

সেদিন রাত ১০টার পরে সবার খাওয়াদাওয়া শেষ। হঠাৎ দেখা গেল মেঘনার মা কণার সুগার ফল করে গেছে ভীষণভাবে। আমি ছুটে গেলাম আমার স্ত্রীর কাছে। ওর একটু ডায়াবেটিস আছে অনেক দিন থেকে।

হুট করে ওই সুগার নেমে যাওয়ায় একটু চিন্তিত সবাই। কণা যথেষ্ট শক্ত প্রকৃতির। কিন্তু সবাইকে চিন্তিত হতে দেখে যেন তার কপালেও একটু চিন্তার ভাঁজ পড়ল। থম ধরে বসে থাকল কণা। দুর্বল লাগছিল বেশ। কথাবার্তা বন্ধ একেবারে। নিশ্চুপ।

ফোন করা হলো আমাদের পারিবারিক বন্ধু ডক্টর এহসান মাহমুদকে।

ফোনেই সতেজ কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন, 'একটু চিনি গুলিয়ে খাইয়ে দাও।'

বাড়িতে তৎপর জুনিয়র দুই ডাক্তার নির্দেশমাত্র যথারীতি তাই করল।

কখনো কখনো সুগার ফল করার এরকম সময়টাতে বাড়িতে কাজের মানুষরাই চিনি গুলিয়ে কণাকে খাওয়ায়।

সেই রাতে ডাক্তারদ্বয় কাজটি করল নিজেদের হাতে। ওদের চটজলদি ভূমিকায় আমি মিটিমিটি হাসছি। কাজের মানুষদের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিল না।

যতই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠছিল ডাক্তাররা, ততই যেন জটিলতা বাড়ছিল। সেভাবে কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছিল না।

সুগার ফল ঠেকানো যাচ্ছে না বলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে। কপালে চিন্তার ভাঁজ ডাক্তারদ্বয়ের কপালেও দেখলাম।

লক্ষ্যযোগ্য অবস্থা। চুপচাপ, নীরবে দেখছি সবাই।

আর দেরি করতে চায় না ওরা। মোটামুটি দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে আমার কাছে ওদের মুহুর্মুহু অনুরোধ, 'তোমার বন্ধু ডাক্তার এহসান মাহমুদ পিন্টুকে এবার তোমার ধরে আনতেই হবে। আর তো দেরি করা যায় না বাবা।'

ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ। আওয়াজ প্রায় বেরই হচ্ছে না।

যথারীতি পিন্টু আমার ফোনে গভীর রাতে বাড়িতে হাজির।

ঘটনা শুরু ওখান থেকেই।

খ্যাতিমান ডাক্তার পিন্টু অবস্থানে অধ্যাপক। দেশজোড়া তার সুনাম। এত রাতে কারো বাড়িতে উপস্থিতি তার অস্বাভাবিক। কিন্তু দীর্ঘকালের সম্পর্ক বলে কথা। বন্ধুত্বের সুবাদে ঠোঁটে স্মিত হাসি নিয়ে পিন্টু এলেন। দেখলেন এবং কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে রইলেন।

নবীন ডাক্তারদ্বয়ের উৎকণ্ঠা তাতে চরমে। রহস্য ছবির নায়ক-নায়িকা যেন। এক সময় খ্যাত ডাক্তার পিন্টুর ভরাট কণ্ঠের ঘোষণা, 'যদি আগামী আধঘণ্টার মধ্যে সুগার না বাড়ানো যায় তবে স্যালাইন পুশ করতে হবে।'

ছবির গল্পের মতোই ডাক্তার জুটি একে অন্যের দিকে নিঃশব্দে তাকাল। ওদের ত্রাহি অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারছিলাম।

সেদিন কী একটা কারণে সারাদেশে জাতীয় ছুটি চলছে। তার ওপর রাত্রি গভীর। চারপাশে সুনসান নীরবতা। খোলা ডাক্তারের দোকান থেকে স্যালাইন সংগ্রহের বিশাল হ্যাপা। স্যালাইন না হয় জোগাড় হলো, সেটা পুশ করার কম্পাউন্ডার পাওয়া যাবে কোত্থেকে? নবীন ডাক্তারকুলের প্রায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা। আমার নার্ভ বরাবর শক্ত। তাই চেয়ে চেয়ে শুধু ওদের কাণ্ড লক্ষ্য করছি। জীবনে বিপদ আসে তো মোকাবেলা করতে হবে বলেই। সেই মুহূর্তে সেই উপদেশ

দেওয়া বাতুলতা।

ডাক্তারদ্বয়ের উৎকণ্ঠা খানিক লাঘবের উদ্যোগ নিলেন অধ্যাপক পিন্টু। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আগে ছোট্ট করে বললেন, 'পরিস্থিতি সহজ নয়। তবু আমি দেখছি, কী করা যায়।' কথাটা শেষে করে এটাও বললেন, 'তোমরাও দ্যাখো নিজেরা কিছু করতে পারো কি-না।'

পিন্টু চলে গেলেন। ওরা দারুণ তৎপর হয়ে গেল ওদের মায়ের সুগার বাড়ানোর। তখনও নাই স্যালাইন। নাই নার্স-কম্পাউন্ডার। ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার। ভরসার জায়গা অধ্যাপক স্যার।

কিছুক্ষণ পরে দুঃসংবাদ এলো।

দুঃসংবাদ লাইন ধরেই আসে। অধ্যাপক বন্ধু পিন্টু ফোনে



অকপটে জানালেন, 'সরি'। 'একটা সমস্যা হয়ে গেছে। যে লোকটিকে দিয়ে স্যালাইন পুশ করবার জন্য ভেবেছি, সে তো বাড়ি চলে গেছে।'

ফোনের এপাশ থেকে কথাটা শুনে ডাক্তারদ্বয়ের উল্টো অসুস্থ হয়ে পড়ার অবস্থা। সংকট দেখি এবার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে।

বাড়ির মানুষরাও বুঝে উঠতে পারছে না, এবার কী করা যেতে পারে! রাত ফুরিয়ে আসছে। ভোরের আজান পড়বে পড়বে করছে। পিন্টু ফোনে জানালেন এটাও, 'তুমি কি টেনশান করছো বন্ধু? তুমি তো টেনশানের মানুষ না। তাছাড়া তোমার ঘরে দুই দুইটা ব্রাইট ডাক্তার। দায়িত্ব ওদেরও কম নয়। বিশেষ করে 'মা' বলে কথা। ওদেরকেই বলি কীভাবে কী করতে পারে।'

ফোন কেটে যেতেই নবীন ডাক্তারদের থরহরি কম্প।

পিন্টুর সাথে কথা শেষ হওয়ার পরে আমিও ঘোষণা দিয়ে দিলাম, 'আমি শুয়ে পড়ছি। তোমরা দুই ডাক্তার থাকতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। খুব বেশি দরকার না হলে আমাকে ডেকো না। প্রয়োজনেই ডাকবে।'

মেঘনা-রাফাতের বাড়ির গেট মধ্যরাতে বন্ধ হয়। তাই ওদের বাড়িফেরা শিকেয় উঠেছে। বললাম, 'বাড়ি ফেরার চিন্তা বাদ। লিফটের লোককে বলে রেখেছিলে। এখন জানিয়ে দাও, মায়ের পাশেই থাকছো। মাকে এ পজিশনে রেখে চলে যাওয়া হচ্ছে না।'

কথা শেষ করে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়েও পড়লাম কিছুক্ষণের মধ্যে। হঠাৎ হাতের ওপর, কনুইয়ের নিচে পিঁপড়ার কামড়ে তন্দ্রা কাটল। আবছায়া অন্ধকারে চোখ খুলে দেখি, ওরা নার্ভাস হয়ে আমার হাতের মধ্যে স্যালাইনের সুই দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ঘরের ডিমলাইটে হাত ভুল করেছে নবীন ডাক্তারেরা! বেচারা।

বললাম, 'কী করছ বাবারা? স্যালাইন তো তোমাদের মাকে দেওয়ার কথা। আমি কেন?

তাড়াতাড়ি নার্ভাস হাতগুলো আমার কব্জির পাশ থেকে স্যালাইন, ইনজেকশন সরিয়ে নিল।

ফিসফিস করে রাফাত বলল, 'আমরা হাত ভুল করিনি বাবা।'

খুব অবাক হলাম আমি, 'মানে! ব্যাপারটা কী?'

মেঘনা বলল, 'আমরা পরীক্ষা করে দেখছি। সুগার মাপার মেশিন মনে হয় কাজ দিচ্ছে না। নষ্ট হয়ে গেছে। আদতেই কতটা কাজ দেবে, সেজন্য তোমার ফ্রেশ হাতে পুশ করে চেক করে নিচ্ছি। মা রোগী। রোগীর ওপর তো আর রিসার্চ চালানো যায় না।'

একি সর্বনাশা কথা! ভোররাত। আমি শুয়ে পড়েছি। এখন এক্সপেরিমেন্ট করছে আমার ওপরে?

সান্ত্বনা দিল মেঘনা, 'প্রথমে আমাদেরটাও দেখেছি। আমাদের পরে এবার তোমার হাতে ট্রাই করতে চাচ্ছিলাম।'

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। ঘুম চোখে তাকিয়ে রইলাম। আমার ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি দেখে মায়া হলো ডাক্তারদ্বয়ের। পরিত্রাণ দেওয়া হলো অধমকে।

এমনিতে ইনজেকশনে আমার চরম ভয়। এর মধ্যে শেষরাতে নবীন ডাক্তারদের অত্যাচার। পরিত্রাণ দেওয়ার সময় রাফাত বলল, 'আপনার তো ডায়াবেটিস কখনোই নেই। তার মানে মেশিন ঠিক আছে। পারফেক্টলি অলরাইট। এবার মাকে পুশ করতে আর কোনো অসুবিধা নাই।'

এর পরে আবার আমি ঘুমিয়ে গেছি। তখন ওরা ধীরগতিতে ওদের ডাক্তারি নিয়ে ব্যস্ত।

কয়েক মিনিট পার হয়েছিল মনে হয়। হঠাৎ এক তীব্র চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসলাম, 'কী হলো? কী হলো?'

আমার লাফিয়ে উঠে বসা দেখে আমার ডাক্তার কন্যার আবারও মায়া হলো। চিৎকার কমিয়ে খানিক নিচু গলায় কলল, 'চিন্তা নাই বাবা। তুমি শুয়ে পড়।'

কেন, হয়েছেটা কী? চিৎকার কেন?

ঘরে বাতি জ্বালানো হয়ে গেছে। কাজের মেয়েরা ছুটে এসেছে। রাফাত-মেঘনার গালভর্তি হাসি। ঘটনা হচ্ছে, কণার ব্লাড সুগার ফিরে এসেছে। ওদের মিশন সফল।

কণা সুস্থ।

জীবনে প্রথম ডাক্তারি করার আনন্দ আর সাফল্যে দুই নতুন ডাক্তারের মুখ উজ্জ্বল। সেই ঔজ্জ্বল্য চারপাশ ঝলমল করে দিচ্ছিল।

আসলে যে-কোনো সাফল্যে মানুষের মুখের যে বদল ঘটে তা তুলনাহীন। সেই ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে কোনো উজ্জ্বলতার তুলনা হয় না।

সেদিন ভোররাতে সেটা আমি বিছানায় বসে বসে প্রত্যক্ষ করছিলাম। ❖





উপন্যাস

রকিব হাসান

ভোরের জ্যোৎস্না

রাস্তাটা একেবারেই নির্জন। হেডলাইটের আলোয় মুষলধারা বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগছে জাফরের। আবহাওয়ার পূর্বাভাস শোনার জন্য রেডিও অন করে রেখেছে ও। ঢাকা থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। ফেনী ছাড়ার পর থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি। চিটাগাং ছাড়ার পর মুষলধারে

অলঙ্করণ : : সব্যসাচী হাজরা

ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত বেশি নয়, ৯টা বেজে পাঁচ। কিন্তু আশপাশের অবস্থা দেখলে মনে হয় অনেক রাত। মদের নেশা কেটে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল ও। পাশে ফেলে রাখা বোতলটা তুলে নিয়ে ছিপি খুলে লম্বা চুমুক দিল।

বোতল রেখে সিগারেট ধরাল। রেডিওতে গান হচ্ছে। ভালো না লাগায় বন্ধ করে দিল রেডিও। হেডলাইট নিভিয়ে পুরো অন্ধকার করে দিল। নির্জন এই পাহাড়ি পথে বৃষ্টির মধ্যে একলা বসে থাকতে কেমন লাগে দেখতে চাইছে।

নেশা ধরতে আরম্ভ করেছে আবার। গাড়ির ছাদে বৃষ্টির একটানা শব্দ। নিরালা এই নির্জনতা ভালোই লাগছে ওর। ফুরফুরে হয়ে আসছে মেজাজ। বাড়ি যাবার তাড়া নেই।

কটকছড়িতে যাচ্ছে ও। ওখানে একটা বাংলো আছে ওর। চিটাগাং-রাঙামাটি সড়ক থেকে মোড় নিয়ে অনেকখানি ভেতরে চলে গেছে একটা রাস্তা, সেটার মাথায় কটকছড়ি। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করছে ওখানে একটা বিদেশি কোম্পানি। নিজেদের সুবিধের জন্য অনেক কিছুই করেছে ওরা। বাজার গড়ে উঠেছে, ভালো কিছু দোকানপাট হয়েছে, শাখা অফিস খুলেছে একটা ব্যাংক, রাস্তা তৈরি হয়েছে ট্রাক চলাচলের জন্য।

বছর তিনেক আগে কটকছড়িতে বাংলোটা কিনেছে জাফর। দোতলা কাঠের বাড়িটা ছিল এক নিঃসন্তান ধনীর। তার বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে কিনেছে জাফর। গাছপালায় ঘেরা বাড়ি। আশপাশে রয়েছে প্রচুর বুনো লতা আর ফুলের গাছ। বসন্ত এলে ফুলে ফুলে ভরে যায়।

বাড়িটা কিনে ওটাকে আধুনিক করার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেছে জাফর। বাথরুম, রান্নাঘরে দামি দামি ফিটিংস লাগিয়েছে। ছুটি কাটানোর চমৎকার জায়গা।

ঢাকায় কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে, বিরক্তি আর একঘেয়েমি কাটাতে ওখানে যায় ও– মানে যেত, তবে এক বছর ধরে একবারের জন্যও যেতে পারেনি ও। সালমার কারণে।

সালমা জাফরের স্ত্রী। স্বভাবে বিপরীত। নির্জন পাহাড়ে যাওয়ার কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে সালমা।

গভীর রাতে সালমা যখন ঘুমে অচেতন, ঢাকার বাড়িতে লোডশেডিংয়ের অন্ধকার, প্রায়ই জানালায় বসে জায়গাটার কথা ভেবেছে ও। বুনোফুল, পাহাড়, নদী, বন। কাঁধে ছিপ, হাতে মাছ নিয়ে গোধূলির সবুজ আলোয় পাহাড়ি পথে বাংলোয় ফেরার আনন্দ! আহা!

'ফ্যাটাল ম্যারেজ!' বিড়বিড় করল ও।

সালমা সুন্দরী। বিয়েও করেছে দু'জনে প্রেম করে। তবে বেশিদিন এই প্রেম টেকেনি। জাফরের ধারণা, ভালোবাসা নয়, শুধুমাত্র ক্ষণিকের মোহে ওকে বিয়ে করেছে সালমা।

চূড়ান্ত ঝগড়া হয়ে গেছে গতকাল। চিৎকার-চেঁচামেচি, জিনিসপত্র ভাঙা– ইদানীং নিত্যদিনের ঘটনা। তবে গতকালকের ঝগড়াটা মাত্রা ছাড়িয়েছিল। এ রকম ঘটতে থাকলে অনেক খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে। তাই গত রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। ঢাকায় আর একটা মুহূর্ত নয়। চলে যাবে, দূরে, অনেক দূরে। সালমার কাছে থাকলে বাঁচবে না ও।

একটা ফিল্ম কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও। প্রতি বছর একটা করে ছবি বানায়। সব ছবি হিট। কিন্তু সালমাকে বিয়ে করে সব নষ্ট হতে বসেছে। কাজে মনোযোগ দিতে পারে না। যখন-তখন অফিসে গিয়ে হাজির সালমা। প্রতিদিনই ওর কোনো না কোনো আবদার– শিল্প মেলায় যেতে হবে, চাইনিজ খাওয়াতে হবে, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। একা গেলে যাক, আপত্তি নেই– কতবার বুঝিয়েছে জাফর, কিন্তু সালমা শুনবে না। এমনিতে একা সে বেরোয় না তা নয়, প্রচুর বেরোয়, কিন্তু জাফর অফিসে গেলেই যেন মাথায় রক্ত চড়ে যায় সালমার, ওকে বিরক্ত করাটা ওর একমাত্র লক্ষ্য।

আগে মদ খেত না জাফর, সালমার যন্ত্রণায় মানসিক অশান্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এই বিষ ধরেছে। মাতাল হয়ে সব ভুলে থাকাটা অনেক শান্তির।

গত রাতে ঝগড়ার পর আজ সকালে উঠেই ব্যাগ-সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে, অফিসের ভার ম্যানেজারের ওপর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে জাফর। বাগড়া দিচ্ছিল সালমা, শোনেনি ও। সোজা গাড়িতে উঠে বসেছে।

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়তেই চমকে চোখ মেলল জাফর। ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? হাই তুলল ও। কানে আসছে বৃষ্টির শব্দ। গাড়ির ছাদে আঘাত হেনে চলেছে একটানা।

হাত লম্বা করে আড়মোড়া ভাঙল। ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত ১০টা বেজে পাঁচ। নির্জন রাস্তায় বৃষ্টি দেখা অনেক হয়েছে। এবার যেতে হয়। হেডলাইট জ্বালল। বৃষ্টির ফোঁটা নাচ জুড়েছে রাস্তার ওপর।

এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। দশ মাইল। ভালো রাস্তা হলে দশ মাইল কোনো ব্যাপারই না, কিন্তু রাস্তা খারাপ। বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই আরও খারাপ হয়ে আছে।

কটকছড়িতে পৌঁছে রাতের বেলা এই দুর্যোগের মধ্যে কোনো দোকান খোলা পাবে না, জানে, তাই চিটাগাং থেকেই বাজার করে নিয়ে এসেছে। তরকারি, ডিম, আলু, মাখন, হিমায়িত মুরগি, গরুর মাংস, বিস্কুট, চানাচুর, চা-কফি; মোটকথা– প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই প্রায় বাকি রাখেনি।

মদ গিলে গিলে মাথার ভিতরটা কেমন ঘোলা হয়ে গেছে। পিচ্ছিল রাস্তায় ঠিকমতো ড্রাইভ করে যেতে পারলেই হয় এখন।

যতটা সম্ভব সাবধানে গাড়ি চালাল ও। সমানে চলছে উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার, কিন্তু বৃষ্টির সঙ্গে কোনোমতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না। ভেজা কাচের ভেতর দিয়ে সবকিছুই ঘোলাটে দেখাচ্ছে। বৃষ্টির চাদর ভেদ করে সামনের দিকে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারছে না হেডলাইটের আলো।

মোড় পেরিয়ে এসে একজন লোককে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। টর্চ জ্বেলে সংকেত দিচ্ছে। মাথায় ক্যাপ, গায়ে বর্ষাতি। পাশে সাইডস্ট্যান্ডে কাত করে দাঁড় করানো একটা মোটরসাইকেল।

পুলিশ! এত রাতে এখানে? নিশ্চয় মোটরসাইকেল খারাপ হয়েছে? নাকি পাহারা দিচ্ছে? চিন্তিত হলো জাফর। মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোর অপরাধে না শেষে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ক্যানসেল হয়!

আবার ইশারা করল লোকটা।

পাশে এসে থামল জাফর। জানালার কাচ নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'টহল দিতে বেরিয়েছিলাম,' মুখ ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না লোকটার। ক্যাপ টেনে দিয়েছে কপালের ওপর, বর্ষাতির কলারটা উঁচু করে দিয়েছে, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য বোধহয়। 'ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। স্টার্ট নিচ্ছে না কিছুতে।'

'কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'রাঙামাটি।'

'আমি তো ওখানে যাব না। কটকছড়ি যাচ্ছি।'

'মোবাইল আছে আপনার কাছে?'

'না, ফেলে এসেছি। শান্তিতে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি আমি আমার বাংলোতে। মোবাইলের ঝামেলা সঙ্গে আনিনি।'

'টেলিফোন আছে আপনার বাংলোতে?'

'আছে।'

'তাহলে অসুবিধে নেই। থানায় ফোন করে পিকআপ

আনতে বলব। আপনার অসুবিধে হবে না তো?'

'না না, অসুবিধে আর কি। উঠুন।' প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা খুলে দিল জাফর।

উঠে বসল লোকটা।

জাফর বলল, 'বিচ্ছিরি রাত!' আবার গিয়ার দিল ও। চলতে শুরু করল গাড়ি। সরু কাঁচা রাস্তাটার মুখের কাছে এসে মোড় নিয়ে রাস্তায় নামল। 'এটা দিয়েই আমার বাংলোতে যেতে হয়। রাস্তার যা অবস্থা, ভালোয় ভালোয় পৌঁছতে পারলে বাঁচি।'

জবাব দিল না পাশে বসা লোকটা। তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। ক্যাপ খোলেনি। ভেজা বর্ষাতি থেকে পানি ঝরে সিট ভিজছে, খেয়ালই করছে না যেন।

'পুলিশ অফিসারদের কাছে তো ওয়্যারলেস থাকে,' আবার বলল জাফর। 'বিশেষ করে রাতের বেলা যারা টহলে বেরোয়... আপনারটা কোথায়?'

'পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। মোটরসাইকেলের সাইডবক্সে ফেলে এসেছি।'

'আরেকটু সহজ করে দিতে পারি আপনার কাজ। আরেকটা রাস্তা আছে, শর্টকাটে চলে যেতে পারি কটকছড়ি ফাঁড়িতে। আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'আমি আপনার বাড়িতেই যাব!' ঝনঝন করে উঠল যেন কঠিন কণ্ঠ।

অবাক হলো জাফর। 'ঠিক আছে, যা ভালো বোঝেন।'

চুপ করে রইল পাশে বসা লোকটা।

এ ধরনের গোমড়ামুখো মানুষগুলোকে ভালো লাগে না জাফরের। আলাপ জমানোর শেষ চেষ্টা করল, 'আপনার নামটা জানতে পারি?'

'তরিকুল হক।'

'আমি জাফর উল্লাহ। এখানে এসেছি...'

'বড় বেশি বকবক করেন আপনি!' ধমকে উঠল তরিকুল। 'গাড়ি চালান। রাস্তার দিকে মনোযোগ না দিলে অ্যাক্সিডেন্ট করবেন তো।'

আর কিছু বলল না জাফর। রাস্তার একখানে পানিতে ঢেকে থাকা গর্তে পড়ল গাড়ির চাকা। একাই গিয়ে বাম্পার ধরে গাড়িটাকে উঁচু করে ফেলল তরিকুল। এক্সেলারেটর চেপে ধরল জাফর। গর্ত থেকে উঠে এলো গাড়ি। লোকটার শক্তি বিস্মিত করল জাফরকে।

এই অঘটনটা ঘটার পর জাফরকে সরিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে নিজে বসল তরিকুল। এতক্ষণে ওর দিকে ভালোমতো তাকানোর সুযোগ পেল জাফর। ড্যাশবোর্ডের সামান্য আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না মুখ। ভালুকের থাবার মতো বড় বড় হাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখেছে, মাথার ক্যাপটা আগের মতোই কপালের ওপর টেনে দেওয়া, ইচ্ছে করে যেন মুখ দেখতে দিচ্ছে না।

জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কতদিন আছেন?'

দ্বিধা করে জবাব দিল তরিকুল, 'অনেক দিন।'

'আমি একটা ফিল্ম কোম্পানির মালিক। শান্তিতে বসে সিনেমার চিত্রনাট্য লিখতে বাংলোতে চলেছি।'

'হুঁ।'

'বিয়ে করেছেন?'

'না।'

'বেঁচে গেছেন,' জাফর বলল। 'মারা পড়তেন নাহলে। আপনার গায়ে কিন্তু সাংঘাতিক জোর। যেভাবে গাড়িটাকে উঁচু করলেন... ওয়েট লিফটার ছিলেন নাকি?'

তরিকুল জবাব দিল না। পরের বিশটা মিনিট নীরবে গাড়ি চালাল।

জাফর বলল, 'ডানে যান। এসে গেছি।'

ঘরের আলোয় লোকটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এখন জাফর। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ওর চেয়ে দুই ইঞ্চি লম্বা। পেটানো শরীর। দৃষ্টি শীতল। ছোট করে ছাঁটা চুল শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে আছে। বড় কপাল। কোমরে গুলির বেল্ট, হোলস্টারে পিস্তল ঝুলছে।

'চলুন, ঘরে গিয়ে আরাম করে বসি,' জাফর বলল।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলো দু'জনে। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজার তালা খুলে সোজা বসার ঘরের দিকে এগোল জাফর। আরেকটা তালা খুলল। আলো জ্বালল। ঘরে ঢুকে ডাক দিল, 'আসুন, ভিতরে আসুন।'

পিছনে ঢুকল তরিকুল।

দোতলায় উঠে বলল জাফর, 'বাঁয়ের দ্বিতীয় ঘরটা আপনার।'

নিজের শোবার ঘরে ঢুকল জাফর। আলো জ্বালল। বিশাল বিছানাটার দিকে তাকাল। যেটাতে সালমাকে নিয়ে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল ও। দীর্ঘ একটা নীরব মুহূর্ত বিছানাটার দিকে তাকিয়ে থেকে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর এগোল বড় আলমারিটার দিকে। শার্ট, গেঞ্জি, লুঙ্গি, প্যান্ট, জাঙ্গিয়া আর নতুন তোয়ালে বের করে নিয়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। গিয়ে ঢুকল দ্বিতীয় শোবার ঘরটায়।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তরিকুল। ঘরটা দেখছে।

'এই যে নিন,' কাপড়গুলো বিছানায় ছুড়ে ফেলল জাফর। 'দেখুন শার্ট-প্যান্টগুলো লাগে কি-না। টাইট হবে, জানা কথা। অসুবিধে লাগলে লুঙ্গি পরেই থাকুন। আচ্ছা, আমি চললাম গোসল করতে। কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'বেশ আরামেই থাকেন আপনি,' এখনও ঘরটায় চোখ বোলাচ্ছে তরিকুল।

'ঘর তাহলে পছন্দ হয়েছে আপনার। বাথরুম ওই দিকে,' জাফর বলল। ভেজা পোশাক গায়ে সেঁটে আছে, অস্বস্তি লাগছে তার। এগুলো খুলে ফেলে গরম পানিতে গোসল করার ইচ্ছেটা প্রবল হলো। নিজের শোবার ঘরে ফিরে এলো আবার।

বাথরুমে ঢুকে পানি গরম করার হিটারটা চালু করে দিয়ে এলো। আবহাওয়ার অবস্থা কেমন জানা দরকার। এই বৃষ্টি কি আদৌ বন্ধ হবে কাল সকালে? মাছ ধরতে যেতে পারবে? ভাবতে ভাবতে প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পরল ও। ছোট রেডিওটা নিয়ে এসে বাথরুমে ফিরে এলো। চালু করে দিয়ে তুলে রাখল তাকের ওপর। গান-বাজনা আর নানারকম অনুষ্ঠান চলছে। মাঝখানে থেমে একটু পর পর আবহাওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে।

আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টি এবং বাতাসের আর্দ্রতা আরও বাড়তে পারে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রবল ঝড়ের সম্ভাবনা।

মুখ বাঁকাল জাফর। তার মানে ঘরেই বসে থাকতে হবে। বেরোতে আর পারবে না।

পানি গরম হয়ে গেছে। পেটে ছুঁচো নাচছে। তাড়াতাড়ি খাওয়া দরকার।

গোসল শেষ করে তোয়ালে নিতে হাত বাড়িয়েছে, এই সময় রেডিওতে ঘোষক বলল : একটা জরুরি ঘোষণা। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার রোডের সমস্ত যানবাহন চালককে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে পুলিশ...

রেডিও বন্ধ করে দিল জাফর। এ মুহূর্তে সে যানবাহন চালক নয়। হুঁশিয়ারিটাও শোনার প্রয়োজন নেই। ওর এখন জরুরি প্রয়োজন খিদে মেটানো।

দ্রুত গা মুছে কাপড় পরে নিল ও। নেমে এলো নিচতলায়। বসার ঘরের দরজায় এসে দেখল পায়চারী করছে তরিকুল। গোসল সেরে এসেছে। ভেজা খাটো চুল লেপ্টে রয়েছে মাথায়। শার্ট-প্যান্টগুলো বেশ আঁটো হয়ে লেগেছে। কাঁধ আর

বাহুর ফুলে থাকা পেশির চাপে শার্ট ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা। হাতা গোটানো, বাঁ বাহুতে উল্কি আঁকা।

জিজ্ঞেস করল জাফর, 'খিদে পেয়েছে আপনার? আমি মারা গেলাম। ডাল আর আলুভর্তা দিয়েই এখন একগাদা ভাত খেয়ে ফেলতে পারি।'

'আমার পায়নি।' অযথাই খেঁকিয়ে উঠল তরিকুল, 'আপনার ইচ্ছে হলে খান গিয়ে।'

লোকটাকে রাতে থাকতে বলে ভুল করল কি-না বুঝতে পারছে না জাফর। অবশ্য এ ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারত? এই বৃষ্টির মধ্যে বের করে দেওয়াটা নেহায়েত অভদ্রতা হতো। কটকছড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছে দিতে তো বলেছিল, গেল না তো।

'দেখুন,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল জাফর, 'আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবেন না। আমি পছন্দ করি না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল তরিকুল। সাপের মতো ঠাণ্ডা চোখে কোনো ভাবান্তর নেই। তারপর হাত নাড়ল, 'আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।'

'আপনি টেলিফোন করতে চেয়েছিলেন,' বলল জাফর।

গুটি গুটি পায়ে জাফরের দিকে এগোল তরিকুল। হাসল। 'হ্যাঁ, চেয়েছি।'

হাসিটা মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ জাগাল জাফরের। 'তাহলে করছেন না কেন?

'টেলিফোন নষ্ট,' এগিয়ে আসছে তরিকুল।

'মানে?'

'মানে, নষ্ট। আপনার খিদে পেয়েছে, খেতে যান। আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।'

তরিকুলকে বেরিয়ে যেতে দেখল জাফর। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। উঠে যেতে লাগল ওপরে। দুই লাফে ফোনের কাছে চলে এলো ও। তারটা ঝুলছে। সকেট থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

উপরতলায় দড়াম করে দরজা বন্ধ হলো।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে জাফর। এই লোক পুলিশের লোক হতে পারে না। ওর চুলের ছাঁট, পোশাক কোনো কিছুই পুলিশ অফিসারের মতো নয়। তাহলে কে সে?

মনে পড়ল জাফরের, রেডিওতে পুলিশের হুঁশিয়ারি ঘোষণা করা হচ্ছিল, কোনো কারণে যানবাহন চালকদের সতর্ক করছিল, যেটা শোনার প্রয়োজন বোধ করেনি ও। তাহলে কি এই লোকটার ব্যাপারেই সতর্ক করছিল পুলিশ?

খিদে নষ্ট হয়ে গেল। অস্বস্তিটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে ওর। বলা যায় না, আবার সতর্ক বাণী প্রচারিত হতে পারে। টেলিভিশনের দিকে এগোল। চোখ পড়ল তারের দিকে। টেলিভিশনের পাওয়ার লাইনও টেনেছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ধড়াস ধড়াস করে বুকের ভিতর লাফাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ডটা। মনে পড়ল রেডিওটার কথা, বাথরুমে ফেলে এসেছে।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও। বারান্দা পেরোল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ঢুকল শোবার ঘরে। বাথরুমে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তাকের দিকে তাকাল। যা আশঙ্কা করেছিল তাই। নেই রেডিওটা।

বুকের কাঁপুনি আরও বাড়ল ওর। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। আচ্ছা, গাড়িতে তো রেডিও আছে। আবার নিঃশব্দে পা টিপে টিপে নেমে এলো নিচে। বাইরে বেরোনোর জন্য দরজার নবে মোচড় দিয়েই থমকে গেল। ঘুরছে না। তালা দেওয়া। চাবিটা খুঁজে পেল না কোথাও।

তার মানে আটকে ফেলা হয়েছে ওকে। নিজের ঘরেই বন্দি এখন ও। বাইরের কোনো সাহায্য পাবে না।

ভয় লাগছে। কী ঘটবে বুঝতে পারছে না। ফিরে এলো বসার ঘরে। হুইস্কির বোতল বের করে গ্লাসে ঢালল। এক চুমুকে গিলে ফেলল। আবার গ্লাস ভর্তি করে নিয়ে এসে বসল একটা লাউঞ্জিং চেয়ারে।

ভালো বিপদেই পড়েছে। সে এখন নিশ্চিত, উপরতলার ওই মানুষটা বিপজ্জনক। খুনিও হতে পারে। গায়ে দানবীয় শক্তি। সঙ্গে পিস্তল।

গ্লাস খালি করল জাফর। আস্তে করে রাখল টেবিলের ওপর। শব্দ করতেও ভয় পাচ্ছে যেন।

মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার। গত দশ ঘণ্টায় মদ ছাড়া কিছু খায়নি।

পা ছড়িয়ে টান টান করে দিল। আরাম করে হেলান দিল চেয়ারে।

ভালো বেকায়দায় পড়েছে। হঠাৎ মনে হলো, গল্প তৈরি হচ্ছে না তো! সিনেমার গল্প? সাসপেন্স, ভায়োলেন্স, অ্যাকশন– সব রয়েছে এতে।

দূর, কী সব ভাবছে! লোকটার কাছে পিস্তল না হয় থাকলই। তাতে খুনখারাপি যে হবে তার কী নিশ্চয়তা?

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি। গাছের ডালে বাড়ি খেয়ে গুঙিয়ে ফিরছে বাতাস। সেই সাথে মদের নেশা। ঘুমে জড়িয়ে এলো চোখ। কখন যে বিছানায় এসে শুলো, নিজেও জানে না।

*

অফিসের টেবিলে ছড়ানো ম্যাপের ওপর ঝুঁকে রয়েছেন কটকছড়ি ফাঁড়ির ইনচার্জ ইয়াকুব আলী এবং রাঙামাটি থানা থেকে আসা সাব ইন্সপেক্টর মুশফিক। ওকে পাঠিয়েছেন থানার ওসি আনোয়ার উদ্দিন সাহেব।

ইয়াকুব আলী ও মুশফিক দু'জনেরই চোখ লাল। সারারাত ঘুমায়নি। অফিসে বসে কাটিয়েছে। দু'জনেরই সন্দেহ, জেলপালানো দাগী আসামি ভয়ঙ্কর খুনি 'কিলার মুন্না' এই এলাকাতেই আছে।

মুশফিক বলল, 'আমার ধারণা, বেশিদূর যেতে পারেনি মুন্না। কাছাকাছিই আছে কোথাও।'

মাথা নাড়লেন ইয়াকুব আলী, 'বুঝতে পারছি না, পালিয়ে না গিয়ে এখানে বসে থাকবে কেন? এতগুলো খুন করার পর পুলিশ যে ওকে ধরার জন্য খেপা হয়ে যাবে, চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে, এটা না বোঝার মতো বোকা সে নয়। জেনেশুনে কেন থাকবে এই ঘেরের মধ্যে?'

'থাকত না, একটা গাড়ি পেলে। মোটরসাইকেল নিয়ে আরেকটু এগোলে ধরা পড়ে যেত, তাই ফেলে রেখে বনে ঢুকে গেছে। হয় কোথাও লুকিয়ে থাকবে এখন, পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার অপেক্ষা করবে, নয়তো অন্য কোনো পথে পালানোর চেষ্টা করবে।'

টেলিফোন নষ্ট। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। ঘরের দরজায় তালা দেওয়া। গাড়ি নিয়ে যে বেরোবে তারও উপায় নেই। নিজের ঘরে নিজেই বন্দি এখন জাফর।

নিচতলায় নেমে এলো ও। বারান্দায় দাঁড়াল। ডিম ভাজার গন্ধ এখনও ভাসছে বাতাসে। মোচড় দিয়ে উঠল শূন্য পেট।

রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে উঁকি দিল।

গরম গরম ডিমভাজা প্লেটে ঢালছে তরিকুল। সাড়া পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল। আগের রাতে যে কাপড়গুলো ওকে দিয়েছিল জাফর ওগুলোই পরে আছে এখনও। কোমরে খাপে ঝোলানো পিস্তল। ঠোঁটে হাসি।

'কেমন আছেন?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল তরিকুল।

'ভালো,' জবাব দিল জাফর।

আবার চুলার দিকে ঘুরল তরিকুল। 'যান, টেবিলে গিয়ে

বসুন। চা বসিয়ে দিয়ে আসি। ভাগ্যিস, খাবারগুলো নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে করে। নাস্তা দেব?'

পরিস্থিতিটা মেনে নিয়ে বসার ঘরে চলে এলো জাফর। খাওয়ার জন্য তর সইছে না। উঠে গিয়ে গ্লাসে হুইস্কি ঢালার ইচ্ছেটা জোর করে দমন করল। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। টেনে সরিয়ে দিল পর্দা। বাইরে তাকাল। ঝমঝম ঝমঝম ঝরেই চলেছে বৃষ্টি। ফুটো হয়ে গেছে যেন আকাশটা। গাছের পাতা থেকে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা পানি। মাটি আর মাটি নেই, থকথকে কাদা।

ভাবছে, আপাতত কিছু করার নেই ওর। ওই লোকটার হাতে জিম্মি হয়ে থাকতে হবে। কিছুই করার নেই ওর। কিচ্ছু না। লোকটা যা বলবে তাই শুনতে হবে। অস্থির হয়ে পায়চারী করতে লাগল ও।

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল তরিকুল। নামিয়ে রাখল টেবিলে। প্লেট বোঝাই খাবার। পরোটা, ডিমভাজা আর আলুভাজা।

'আসুন, বসে যান,' ডাকল তরিকুল। 'মহাসুখে দিন কাটান সাহেব আপনি।'

মুখোমুখি চেয়ারে বসল ওরা। খেতে আরম্ভ করল।

কিছুক্ষণ নীরবে খাওয়ার পর মুখ তুলে তাকাল তরিকুল। 'দুঃখিত, বুঝলেন, এসবের জন্য সত্যি দুঃখিত আমি।'

রাগটা চেপে রাখল জাফর। এক টুকরো পরোটা ছিঁড়ে আলুভাজিসহ মুখে পুরল। 'কেন, দুঃখিত কেন?'

'ঘুম দরকার ছিল আমার। গত দু'দিন চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কী ব্যাপার, খাচ্ছেন না? ভাজিটা ভালো হয়নি?'

'হয়েছে। রান্নার হাত আপনার চমৎকার।'

কাপে চা ঢেলে জাফরের দিকে ঠেলে দিল তরিকুল। 'টেলিফোন আর টিভিটাকে অচল করে দিয়েছি বাধ্য হয়ে। পুলিশকে যদি ফোন করেন– এই টেনশনে ঘুমাতে পারতাম না।'

কাপটা টেনে নিয়ে জাফর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কোনো ঝামেলায় জড়িয়েছেন?'

পরোটার শেষ টুকরোটা মুখে পরল তরিকুল। আস্তে আস্তে চিবিয়ে গিলে ফেলল। বিচিত্র হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'হ্যাঁ,' কাপে চা ঢালতে লাগল ও। চোখ কাপের দিকে। 'ঝামেলায়ই জড়িয়েছি। পুলিশি ঝামেলা।'

আরেক কাপ চা ঢালল তরিকুল। বিশাল থাবা টেবিলে ছড়িয়ে দিয়ে কনুইয়ে ভর রেখে সামনে ঝুঁকল। আচমকা পিস্তল বের করে তাক করল জাফরের দিকে।

ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল জাফরের। জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল, 'ওটার প্রয়োজন নেই। আপনাকে সাহায্য করতে রাজি আছি আমি?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল তরিকুল। হাসল। পিস্তলটা আবার ফিরে গেল যথাস্থানে। 'সত্যিই করবেন?'

'করব। আমার সাধ্যে কুলালে।'

'কুলাবে।'

'বেশ, বলুন,' চেয়ারে হেলান দিল জাফর।

'চা পছন্দ হয়েছে আপনার?'

'খুব ভালো।'

'তা হলে আরেক কাপ নিন। আমি ভালো রান্না করতে পারি, এ প্রশংসা অনেকেই করে। কেবল টাকা রোজগারের বেলায় আমি একটা অপদার্থ,' তিক্ত কণ্ঠে বলল তরিকুল। 'আপনার কথাই ধরুন না, গল্প লিখে, সিনেমা বানিয়ে, কত টাকা কামিয়ে ফেলেছেন। কত আরামে থাকছেন,' চোখের ইঙ্গিতে ঘরটা দেখাল ও। 'একটা কথা অবশ্য বুঝি, টাকা কামানোর জন্য বুদ্ধি দরকার। আপনার আছে, আপনি পেরেছেন। আমার নেই, আমি পারিনি।' ভ্রূকুটি করল ও। 'নিশ্চয় ভাবছেন, আমি পাগল। তা ভাবতেই পারেন। আমার টাকা না থাকার দুঃখ আপনি বুঝবেন না। আপনার অনেক আছে– কিছু না থাকাটা যে কত কষ্টের, আপনাকে বোঝানো যাবে না।'

চুপ করে আছে জাফর। একেবারে স্থির। ধুকধুক করছে বুকের মধ্যে। অস্থিরতা বাড়ছে। সামনে বসা এ লোকটাকে বিশ্বাস নেই। এই ভালো তো এই খারাপ। বড় বেশি আবেগতাড়িত। যে কোনো মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। ওর সঙ্গে সাবধানে কথা বলা দরকার।

'বুঝবেন না,' আবার বলল তরিকুল, 'কিচ্ছু বুঝবেন না আপনি। না থাকার যে কত কষ্ট, বুঝবেনই না।'

'এখানেই ভুলটা করছেন আপনি, তরিকুল,' জাফর বলল। 'এক সময় আমিও আপনার মতো ভাবতাম– আমি নির্বোধ, আমার টাকা কামানোর ক্ষমতা নেই। বসে বসে শুধু বই পড়তাম। বিরক্ত হয়ে মা-বাবা বকাবকি করত– আমি কোনো কাজের না, আমি অপদার্থ, আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। চাকরি নেওয়ানোর জন্য বহু চাপাচাপি করেছিল, পারেনি। শেষে একদিন নাইট কোচ অ্যাক্সিডেন্টে দু'জনেই গেল মরে। স্বাধীন হলাম বটে, কিন্তু বাবার পয়সায় বসে বসে ভাত গেলার উপায়ও গেল বন্ধ হয়ে। সামান্য চাকরি করত বাবা। সেই টাকায় চলত আমাদের সংসার।

'চাকরি করা আমাকে দিয়ে হবে না, ততদিনে বুঝে গেছি। এক বন্ধু বুদ্ধি দিল, লিখতে আরম্ভ করো। সে একটা পত্রিকায় চাকরি করে। আমার প্রথম লেখাটা ছাপার ব্যবস্থা করল। সম্পাদক সাহেব বললেন, ভালো হয়েছে। চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিলেন। সাহস করে বলে ফেললাম, দুদিন শুধু চা আর বিস্কুট খেয়ে কাটিয়েছি। কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিলেন তিনি। পরের লেখাটা ছাপা হলো না। তার পরেরটাও না। আবার টাকার কষ্ট। লেখা নিয়ে প্রকাশকদের কাছে ধরনা দিতে লাগলাম। কেউ মিষ্টি কথা বলে বিদায় করল, কেউ দরজা থেকেই বের করে দিল। তারপর একজন চিত্র পরিচালকের সঙ্গে পরিচয়। আমার লেখা স্ক্রিপ্ট নিয়ে বানানো প্রথম ছবিটা হিট করার আগের কয়েকটা বছর যে কী কষ্টে কেটেছে, বলে বোঝাতে পারব না।'

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে থামল জাফর। অ্যাশট্রেতে পিষে মারল সিগারেটের আগুন। মুখ তুলে তাকাল আবার তরিকুলের দিকে। 'আজকে আমার এই যে আরাম-আয়েশ আর উন্নতি দেখছেন, এসব একদিনে হয়নি, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। আর আপনি বলছেন, আপনার দুঃখ বুঝব না?'

শ্লেষের হাসি হাসল তরিকুল। মুখ বাঁকাল, 'এসবকে কষ্ট করা বলেন আপনি? বসে বসে লিখেছেন, বিস্কুট খেয়ে থেকেছেন; তা-ও তো খেয়েছেন। আমার মতো দিনের পর দিন শুধু পানি খেয়ে থাকতে হয়নি। ডাস্টবিনের আবর্জনা ঘেঁটেছেন কখনও? শুধু একমুঠো ভাতের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ময়লার গাড়িতে ময়লা তুলেছেন? ড্রেন পরিষ্কার করেছেন? নর্দমায় নেমেছেন? রাস্তায় ঘুমাতে গিয়ে পুলিশের বুটের লাথি খেয়েছেন? আরও বলব?'

চুপ করে রইল জাফর।

'জানি, জবাব দিতে পারবেন না,' সামনে ঝুঁকল তরিকুল। 'কম দুঃখে কি আর এমন হয়েছি! পুলিশ ধরতে পারলে হয় এখন আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, নয়তো যাবজ্জীবনের জন্য গারদে ভরে দেবে, টানো আবার ঘানি!' টেবিলে কিল মারল

ও। ঝনঝন করে উঠল কাপ-প্লেটগুলো। 'সারাটা জীবন বলদের মতো শুধুই ঘানি টানা! উফ্, কেন যে জন্মেছিলাম!'

উঠে দাঁড়াল তরিকুল। এঁটো প্লেটগুলো জড়ো করতে লাগল। 'ছাপাখানায় চাকরি করত আমার বাবা। একটা খুপরির মতো ঘরে বসে দিন নেই, রাত নেই কম্পোজ করত। মাথার কাছে জ্বলন্ত একশো পাওয়ারের বাল্ব। টুলে বসে কাজ করতে করতে বাঁকা হয়ে গিয়েছিল পিঠ। চোখে যখন কম দেখা শুরু করল, বের করে দিল মালিক। রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেল। বাড়ি ফিরল পঙ্গু হয়ে। মা আরেকজনকে বিয়ে করে চলে গেল। আমি ফেলতে পারলাম না বাবাকে। একমাত্র ছেলে হিসেবে বাবার ভার নিতে হলো আমাকেই।'

প্লেটগুলো ট্রেতে তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল ও।

সেদিকে তাকিয়ে রইল জাফর। চা খাওয়া শেষ করে প্লেট আর কাপটা নিয়ে সে-ও এসে ঢুকল রান্নাঘরে।

সিঙ্কে থালাবাসন ভিজিয়ে ধুচ্ছে আর আপন মনে বেসুরো শিস দিচ্ছে তরিকুল। তাকাল না।

সিঙ্কে কাপ আর প্লেটটা রেখে দিয়ে আবার বসার ঘরে ফিরে এলো জাফর। চেয়ারে বসে কান পেতে শুনতে লাগল বৃষ্টির শব্দ।

জটিল পরিস্থিতি। সাবধানে থাকতে হবে। কোনো রকম খারাপ আচরণ করা চলবে না লোকটার সঙ্গে। চটানো চলবে না।

নিজের অস্থিরতা দূর করার চেষ্টা করল জাফর। টানটান করে দিল পা, মাথা রাখল সোফার নরম হেলানে। পুরো দশটা মিনিট চোখ বন্ধ করে শুনল বৃষ্টির রিমঝিম, গাছের ডালে গুঙিয়ে ফেরা বাতাসের ফিসফিস কানাকানি।

ঘরে ঢুকল তরিকুল।

চোখ মেলল জাফর। তরিকুলকে জানালার কাছে যেতে দেখল।

পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল তরিকুল। কয়েকটা মিনিট একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার পর্দা টেনে দিয়ে ফিরে এসে বসল সোফায়। জাফরের মুখোমুখি।

'আপনার রান্নাঘরটার তুলনা হয় না,' তরিকুল বলল। 'বাবা বেঁচে থাকতে কিসের মধ্যে আমি রাঁধতাম, কল্পনাই করতে পারবেন না। নরক, নরক!' একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'যতক্ষণ বৃষ্টি থাকবে, আমাকে এখানে খুঁজতে আসবে না পুলিশ। ততক্ষণ একসঙ্গেই থাকতে হবে আমাদের। বিরক্ত হচ্ছেন?'

'না, হচ্ছি না।'

'হলেও কিছু করার নেই আমার।'

'আপনি থাকাতে আমার ভালোই লাগছে। একা একা এই বৃষ্টির মধ্যে নাহলে কী করতাম?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে জাফর। 'রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। সঙ্গ দিচ্ছেন। বেশ আছি। রান্না করার ভয়ে হয়তো শুকনো বিস্কুট খেয়ে কাটিয়ে দিতাম। অনবরত মদ গিলতাম। তাতে ভালো কিছু হতো না।' হাসল ও, 'হয়তো বলবেন, একা থাকতেই তো এসেছিলাম। তা এসেছি। কিন্তু একজন সঙ্গী পেয়ে গিয়ে খুশিও হয়েছি।'

'কেন এসেছেন এখানে?'

'ছুটি কাটাতে। মাছ ধরতে আপনার কেমন লাগে, তরিকুল?

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল তরিকুল। জবাব না দিয়ে উঠে চলে গেল রান্নাঘরে। ফিরে এলো জাফরের রেডিওটা নিয়ে। 'খবরের সময় হয়েছে,' বলে সুইচ অন করে দিল।

খবরের প্রধান প্রধান অংশগুলো বলা শেষ করেছে কেবল সংবাদ পাঠক। বিস্তারিত আরম্ভ করল। বিরক্ত হয়ে মুখ তুলল তরিকুল, 'আচ্ছা, বলুন, এসব খবরের কোনো মানে আছে? অকারণ ঘ্যানর ঘ্যানর! যত্তসব প্যাঁচাল!'

চুপ করে রইল জাফর। আগ্রহ নিয়ে শুনছে। অবশেষে সংবাদ পাঠক পড়ল : একটা বিশেষ ঘোষণা। পুলিশ জানিয়েছে, গত রাতে তরিকুল হক ওরফে কিলার মুন্না নামে যে লোকটা কটকছড়িতে একজন পুলিশ অফিসারসহ চারজনকে খুন করে পালিয়েছে, সে এখনও ধরা পড়েনি। এর আগে এক পেট্রোল স্টেশনে আরও দু'জন পুলিশ ও স্টেশনের ম্যানেজারকে খুন করেছে ও। ভয়ঙ্কর লোক। পুলিশের ছদ্মবেশে রয়েছে। সঙ্গে পিস্তল আছে। পুলিশের সন্দেহ, কাল রাতের বেলা কোনো গাড়ি থামিয়ে সেটাতে করে চলে গেছে। চালককে খুন করে কোথাও ফেলে দিয়ে থাকতে পারে। ওর বাহুতে উল্কি দিয়ে একটা বাঘের মুখ আঁকা। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। ও রকম কাউকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী থানা অথবা ফাঁড়িতে খবর দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। লোকটাকে ধরার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

রেডিও বন্ধ করে একপাশে রেখে দিল তরিকুল। চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নিজের বাহুতে আঁকা বাঘের মুখের দিকে, তারপর মুখ তুলল।

শীত শীত লাগছে জাফরের। কানে বাজছে সংবাদ পাঠকের কথাগুলো। মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। হাতের তালু ভিজে গেছে ঘামে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'আপনার নামও তো তরিকুল হক, তাই না?' নিজের খসখসে কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল জাফর।

কঠিন হাসিতে বেঁকে গেল তরিকুলের ঠোঁট। আবার তাকাল বাঘের মুখের দিকে। মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ।'

উঠে জানালার কাছে চলে গেল ও। পর্দা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে বসল আগের জায়গায়। 'আপনি লেখক, ভালো করেই জানেন, ছোটবেলায় কত অদ্ভুত কাণ্ড করে মানুষ। ছেলেমানুষী করে আমিও করেছিলাম। এই যে এটা!' বাহুতে আঁকা বাঘের মুখটা ডলল ও, যেন ডলে ডলে তুলে ফেলতে চাইছে ওই বিপজ্জনক চিহ্ন। 'পনেরো বছর বয়সে একটা দল গড়েছিলাম পাঁচজনে মিলে। নাম দিয়েছিলাম ইয়ং টাইগারস। দল গড়তে প্রেরণা জুগিয়েছিল আমাকে দস্যু বাহরাম। সিরিজটা পড়েছেন নিশ্চয়। আমাদের পাড়াতেই এক লোক থাকত, উল্কি দিয়ে ছবি আঁকতে পারত ও। তাকে দিয়ে আঁকিয়ে নিলাম বাঘের মুখ। বোকামি করেছিলাম। এই ছবিটাই এখন আমার পরিচয় ফাঁস করে দেবে।

ধকধক করে জ্বলছে তরিকুলের চোখ। জাফরের মনে হলো, বাঘের চোখ। কথা বলতে বলতে গলা যেন সামান্য কাঁপল। চোখের আগুন আরও বাড়ল।

ওকে সামলে নেওয়ার সময় দিল জাফর। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'আবার সেই পুরনো কাজ– ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি। কয়েকবার জেলে গেছি। কখনই বেশিদিন আটকে রাখতে পারেনি আমাকে, বারবার পালিয়েছি। পালানোর ব্যাপারে ওস্তাদ হয়ে গেলাম। এর জন্য অবশ্য বহু খুন করতে হয়েছে আমাকে। মানুষ খুন করতে আর একটুও খারাপ লাগে না এখন আমার...'

'ড্রেন পরিষ্কার করেছেন কোন সময়টায়?'

'ইয়ং টাইগারস গড়ার আগে। অনেক চেষ্টা করেছি দুটো মুখের ভাত জোগাড়ের। দিন-রাত ঘাম ঝরিয়েছি। ভাতের চেয়ে বেশি পেয়েছি লাঞ্ছনা। কখনও আধপেটা খেয়েছি, কখনও না খেয়ে থেকেছি।'

'শেষবার পালালেন কাল রাতে, তাই না? কী করেছিলেন?'

'একটা পেট্রোল পাম্পে ঢুকে টাকা চেয়েছিলাম। চেঁচাতে শুরু করল ম্যানেজার। ছুরি মেরে দিলাম। ধরে নিয়ে যাচ্ছিল দু'জন পুলিশ। ওদেরকেও শেষ করে দিয়ে পালালাম,' বাঘের মুখটায় টোকা দিল তরিকুল।

জানার কৌতূহল হচ্ছে জাফরের। 'শেষের চারজনকে মারলেন কেন?'

'আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল মেয়েটার বাবা। ওকে তো শেষ করলামই, ওর বউ আর মেয়েটাকেও খতম করলাম। ভালো লোক ছিল না কেউ। একজন অল্পবয়সী পুলিশ ছিল তখন ওদের বাড়িতে, মেয়েটার প্রেমিক হবে হয়তো, ওকেও মারলাম। পুলিশটার পিস্তল আর মোটরসাইকেলটা আমার দরকার ছিল।' এমন ভঙ্গিতে বলল তরিকুল, যেন মানুষ নয়, মশা মেরেছে।

একের পর এক মানসিক আঘাত পেয়ে, আর অমানবিক দৈহিক নির্যাতনের শিকার হতে হতে মাথা গোলমাল হয়ে গেছে লোকটার, বুঝতে পারল জাফর। ঘৃণার বদলে কষ্টই লাগছে তরিকুলের জন্য।

*

'রাস্তাটা সামনে,' ইয়াকুব আলী বললেন, 'এখানেই রাখুন।'

পাশের ঝোপের ধারে গাড়ি সরিয়ে আনল মুশফিক। বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।

'এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে।' ওয়্যারলেসে রাঙামাটির ওসি আনোয়ার উদ্দিনকে ধরার চেষ্টা করছেন ইয়াকুব আলী। কোথায়, কখন, কী করছেন দু'জনে, সব তথ্য জানিয়ে রাখতে চান তাঁকে। 'ওসি সাহেব? আমি ইয়াকুব আলী। নদীর ধারে বাংলোগুলোতে খুঁজতে যাচ্ছি আমি।'

'একটু অপেক্ষা করুন,' তীক্ষ্ণ হলো ওসির কণ্ঠ। 'চারজনের স্পেশাল টিম পাঠাচ্ছি। পৌঁছতে দেরি হবে না। ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যান। একা যাওয়া উচিত হবে না।'

'একা যাচ্ছি না। সঙ্গে সাব ইন্সপেক্টর মুশফিক আছে।'

মুশফিকের ওপর আস্থা আছে ওসি সাহেবের। এক মুহূর্ত চুপ করে বোধহয় ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, যা ভালো বোঝেন।'

গরুর মাংসের স্যান্ডউইচ বানিয়ে প্যাকেট করে দিয়েছেন সুফিয়া বেগম। প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বর্ষাতির পকেটে ঢোকালেন ইয়াকুব আলী। রাইফেল তুলে নিলেন হাতে। মুশফিক নিল আরেকটা রাইফেল। দু'জনেই বেরিয়ে এলো বৃষ্টিতে।

গাড়ির দরজার তালা লাগিয়ে দিলেন ইয়াকুব আলী।

আগে আগে হেঁটে চললেন তিনি। পিছনে রইল মুশফিক। ইয়াকুব আলীর চওড়া কাঁধের দিকে তাকাল। সামান্য ঝুলে পড়েছে কাঁধ। পেটের কাছটাও মোটা। পরিশ্রমের কাজ করতে হয় না। বসে থেকে থেকে চর্বি জমে গেছে। আনফিট হয়ে গেছে শরীর।

সরু বুনোপথ ধরে এগিয়ে চলল দু'জনে। ঘন গাছপালার নিচ দিয়ে গেছে পায়ে-হাঁটা পথ। কাদায় ভরা। পানি জমে আছে জায়গায় জায়গায়। ডাল-পাতা থেকে টপ টপ পানি ঝরছে।

বৃষ্টিকে পরোয়া করে না মুশফিক। ওর ভয় খুনিটাকে। আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে ওর কাছে। পুলিশকে দেখামাত্র গুলি করে বসতে পারে। রাইফেলটা তাই এমনভাবে ধরে রাখল, যাতে প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালানো যায়।

কিছুদুর এগিয়ে থামলেন ইয়াকুব আলী। ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'আর বেশি নেই। এ রাস্তার মাথায় পড়বে প্রথম বাংলোটা। আমি আগে যাব, আপনি আমাকে কভার দেবেন।'

'না, আমি আগে যাব।'

'দেখুন, এটা আমার এলাকা। বাংলোগুলো আমার চেনা। সুতরাং আমারই যাওয়া উচিত।'

'ইয়াকুব সাহেব,' শান্তকণ্ঠে মুশফিক বলল, 'আপনিও পুলিশ, আমিও পুলিশ, এসব কাজের ট্রেনিং আর অভিজ্ঞতা আমাদের দুজনেরই আছে। তবে বাস্তব কথাটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনার বয়স হয়েছে, অফিসে বসে থাকেন। আমার বয়স কম, প্রায়ই অ্যাকশনে যেতে হয়। ইমোশন বাদ দিয়ে এখন আপনিই বলুন, কার আগে যাওয়া উচিত?' ইয়াকুব আলীকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল মুশফিক, 'আপনি কি আমার কথায় মাইন্ড করলেন?'

মাথা নাড়লেন ইয়াকুব আলী, 'না।' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার বয়স হয়েছে, আগের মতো আর পরিশ্রম করতে পারি না। ঠিক আছে, যান, আপনিই যান।'

রাইফেলে হাত বোলাতে বোলাতে ইয়াকুব আলী ভাবলেন, মুশফিককে এভাবে আগে ঠেলে দেওয়াটা কি ঠিক হলো? বিরক্ত হলেন নিজের ওপর। বয়সকে দোষারোপ করতে থাকলেন। তার অ্যাসিস্ট্যান্ট জসিমের কথা ভাবলেন। ওকে মতিন সওদাগরের বাংলোতে একা যেতে দিয়ে মস্ত ভুল করেছিলেন কাল রাতে। ওর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করছেন। এখন আবার মুশফিককে একা যেতে দিয়ে আরেকটা ভুল করলেন না তো? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাটা উচিত হচ্ছে না। ওকে কভার দেওয়া দরকার। পা বাড়ালেন তিনিও। নিঃশব্দে চলে এলেন মুশফিকের বিশ গজের মধ্যে। কেবিনের দিকে রাইফেল তাক করে রাখলেন। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই গুলি চালাবেন। ভয়ানক এক খুনির পিছনে লেগেছেন, যাকে কোনো রকম সুযোগ দেওয়া যাবে না।

আড়ালে চলে গেল মুশফিক। আর দেখা যাচ্ছে না ওকে। গেল কোথায়?

থমকে দাঁড়ালেন ইয়াকুব আলী। দশ মিনিট গেল। জীবনের দীর্ঘতম সময় বলে মনে হলো এই কয়েকটা মিনিটকে।

দেখলেন বাড়ির পাশ ঘুরে বেরিয়ে এসেছে মুশফিক। হাত নাড়ল তার দিকে তাকিয়ে।

হাঁফ ছাড়লেন ইয়াকুব আলী। অবাকও হলেন। তার চোখের সামনে কোন দিক দিয়ে অদৃশ্য হয়েছিল মুশফিক, বুঝতেই পারেননি। দ্রুত এগিয়ে গেলেন।

'দরজা-জানালা সব ঠিক আছে,' মুশফিক জানাল। 'ভেঙে ঢোকার কোনো চিহ্ন দেখলাম না। তবে ভিতরটা দেখা দরকার। জেল পালানো আসামি, তালা খোলার নানা রকম কায়দা ওর জানা।'

'দিন, চাবিটা,' হাত বাড়ালেন ইয়াকুব আলী।

একবার দ্বিধা করে পকেট থেকে চাবি বের করে দিল মুশফিক।

'আপনি আমাকে কভার দিন,' চাবি হাতে বারান্দায় ওঠার জন্য এগোলেন ইয়াকুব আলী।

রাইফেল তাক করে ধরে রাখল মুশফিক।

খুব সাবধানে তালা খুললেন ইয়াকুব আলী। পিস্তল খুলে নিলেন হোলস্টার থেকে। মুশফিকও উঠে এলো বারান্দায়। আচমকা এক ধাক্কায় পাল্লা খুলে পিস্তল উদ্যত রেখে ঢুকে পড়লেন ইয়াকুব আলী। পিছনে ঢুকল মুশফিক। খুনিটা ভিতরে থাকলে যে কোনো মুহূর্তে আড়াল থেকে ছুটে আসতে পারে পিস্তলের গুলি।

তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। নেই এখানে।

একটা বাংলো দেখা হয়েছে, আরও চারটে বাকি। ইয়াকুব আলী বললেন, 'পাশেরটা হাফিজ সাহেবের। বছরে আসেন দু'বার। এ মাসের শেষে একবার আসতে পারেন।'

'খালিই তো থাকে দেখি ঘরগুলো সারা বছর,' মুশফিক বলল। 'ঘরে জিনিসপত্র আছে না? পাহারা দেয় কে?'

'দারোয়ান আছে।'

পরের বাংলোটা দুশো গজ দূরে। দারোয়ান জানাল, সে একাই আছে। অপরিচিত কেউ আসেনি।

তারপরের বাংলোটায়ও নেই খুনি।

চতুর্থ বাংলোর দারোয়ানকে পাওয়া গেল না। তালা দিয়ে চলে গেছে কোথাও। বাজারে যেতে পারে। কিংবা বৃষ্টির মধ্যে একলা থাকতে ভালো লাগেনি, কোনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিতে গেছে। মাস্টার কি-র সাহায্যে দরজা খুলে ভিতরে খুঁজে দেখলেন ইয়াকুব আলী। খুনিকে পাওয়া গেল না।

টেলিভিশনের তারটা আবার লাগিয়ে ফেলেছে তরিকুল। ভিসিডি চালিয়ে ছবি দেখছে। মারামারির ছবি। একটু পর পরই শিস দিয়ে উঠছে। 'যত্তোসব গাঁজাখুরি গপ্পো!'

সঙ্গে করে অনেক সিডি নিয়ে এসেছে জাফর। এগুলোর মধ্যে ঢাকার বাংলা ছবিও আছে।

টেলিভিশন থেকে অনেকটা দূরে বসেছে জাফর। গ্লাসে হুইস্কি। ছবির চিৎকার-চেঁচামেচি ভাবনায় বাধা সৃষ্টি করতে পারছে না ওর। তরিকুলকে নিয়েই ভাবছে। এই লোকটাকে শান্ত রাখার সব রকম চেষ্টা এখন করতে হবে ওকে। কোনোরকম চাপ দেওয়া চলবে না, সমালোচনা করা যাবে না, কেবল ভালো ভালো কথা আর ভালো ব্যবহার।

শেষ হলো ছবি। টিভি বন্ধ করে দিল তরিকুল। 'জঘন্য!' জাফরের দিকে তাকাল ও, 'এসব ফালতু জিনিসই বানান নাকি?'

'না। আমারগুলো বোধহয় এতটা খারাপ হয় না।'

চেয়ার ঘুরিয়ে জাফরের দিকে মুখ করে বসল তরিকুল। 'আমারও তাই মনে হয়। আপনি অন্য রকম মানুষ। রুচি আলাদা। টাকা-পয়সা ভালোই পান, তাই না?'

'তা পাই।'

'মাসে কত পান?'

'মাসের হিসাব তো রাখি না ওভাবে। তবে ভালো।'

মাথা দোলাল তরিকুল, 'তা হবে। জিনিসপত্র দেখেই আন্দাজ করা যায়। ঘরে টাকা রাখেন? আছে এখন?'

'এখানে তো থাকিই না, রাখব কেন?' তরিকুলের চোখ জ্বলে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল জাফর, 'তবে কটকছড়ি ব্যাংকে কিছু জমা আছে।'

'যাক, ভালো খবর। কিছু টাকা লাগবে আমার। আপনার অসুবিধে হবে না তো দিতে?'

হাসল জাফর। 'না, হবে না।'

আবার মাথা ঝাঁকাল তরিকুল। 'আমি জানতাম। আপনার নিয়ে আমার সমস্যা হবে না। মনের মিল হয়ে গেছে।'

'তাই মনে হচ্ছে আপনার?'

'কেন, আপনার হচ্ছে না?'

মাথা কাত করল জাফর, 'হচ্ছে।'

'হুঁ, এই প্রথম একজন টাকাওয়ালা ভালোমানুষকে দেখলাম।'

'আমি অত ধনী লোক না। তবে সচ্ছল বলতে পারেন।'

'ওতেই চলবে আমার। এখানকার ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবেন?'

মাথা ঝাঁকাল জাফর, 'পারব।'

উঠে জানালার কাছে চলে গেল তরিকুল। পর্দা সামান্য ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল। 'বৃষ্টি থেমেছে। পুলিশ আসতে আর দেরি হবে না।' ঘুরে তাকাল জাফরের দিকে। কঠিন হয়ে উঠেছে চেহারা। বদলে গেছে দৃষ্টিভঙ্গি। 'ওরা এলে কী বলতে হবে জানেন তো?'

'জানি। শিখিয়েই তো দিলেন,' শান্তকণ্ঠে বলল জাফর।

'চালাকির চেষ্টা করবেন না। যদি বাঁচতে চান। বুঝলেন?'

'করব না।'

হাসল তরিকুল। 'আপনি বুদ্ধিমান এবং ভালো লোক। হতেই হবে। যে লোক সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের ভাগ্য বদলাতে পারে, তার তো বুদ্ধিমানই হওয়ার কথা।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'তবে আবারও বলছি, আমার সঙ্গে চালাকির চেষ্টা করবেন না, যদি বাঁচতে চান।'

'বাঁচতে চাইলে আপনিও আমার একটা কথা শুনুন।'

জ্বলে উঠল তরিকুলের চোখে, 'কী কথা?'

'আমার গ্যারেজে পুলিশের যে ক্যাপ আর বর্ষাতি ফেলে এসেছেন, ওগুলো সরিয়ে ফেলুন। পুলিশ এসে দেখে ফেললে...' তরিকুলের হাসি দেখে থেমে গেল জাফর।

'ওগুলো নেই ওখানে,' হাসল তরিকুল। 'আমার কথা ভাবার জন্য ধন্যবাদ।'

চুপ হয়ে গেল জাফর। মিনিটখানেক একভাবে বসে থাকার পর বলল, 'গাড়িতে কিছু জিনিস রয়ে গেছে আমার। কাপড়-চোপড়, একটা ল্যাপটপ, কিছু জরুরি কাগজপত্র। ওগুলো লাগবে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জাফরের দিকে তাকিয়ে রইল তরিকুল। তারপর মাথা ঝাঁকাল। পকেট থেকে গ্যারেজের চাবি বের করল। 'যান, নিয়ে আসুন। মনে রাখবেন এটার কথা,' চোখের পলকে পিস্তল বেরিয়ে এলো হাতে। 'সহজে মিস করি না। আপনার ওপর নজর রাখা হবে। যান।'

অসহায় রাগে জ্বলেপুড়ে মরছে সালমা। জাফরের সঙ্গে দেখা করতে হবে। একটা বোঝাপড়া দরকার। এভাবে আর চলে না। হেস্তনেস্ত যা করার একটা করে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি। প্রয়োজনে জাফরকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করবে।

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সালমা। এ বাড়িতে আর একটা মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। দৌড়ে গেল শোবার ঘরে। একটা স্যুটকেস বের করে দ্রুতহাতে জিনিসপত্র ভরতে শুরু করল।

স্যুটকেস গোছানো শেষ করে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল রাস্তা থেকে কেউ এ বাড়ির ওপর নজর রাখছে কিনা। কাউকে দেখল না। কোনো গাড়িও দাঁড়ানো নেই।

ফিরে এসে স্যুটকেসটা তুলে নিল। বেরোতে যাবে, এই সময় মনে পড়ল পিস্তলটার কথা। জাফরের আলমারি থেকে বের করে নিল ওটা। একা মেয়েমানুষ অচেনা বুনো জায়গায় যাচ্ছে, পথঘাটের অবস্থা কী রকম জানে না, সঙ্গে একটা অস্ত্র থাকা ভালো। পিস্তলটা ব্যাগে ভরল ও।

*

জুতো আর বর্ষাতি খুলে বারান্দায় রেখে জাফরের পিছন পিছন বসার ঘরে ঢুকল দু'জনে।

রান্নাঘরে চুলায় চায়ের পানি চাপাল জাফর। তরিকুল কোথায় লুকিয়ে আছে বুঝতে পারল না। গল্পের প্লট পেয়ে

গেছে। ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর এক কাহিনীতে রূপ নিচ্ছে পরিস্থিতি। চমৎকার একটা সিনেমার গল্প তৈরি হচ্ছে। বুঝতে পারছে জাফর, আগুন নিয়ে খেলছে ও। শেষ যে কীভাবে হবে, জানে না।

তরিকুলকে খুঁজতেই যে এসেছেন ইয়াকুব আলী আর মুশফিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই জাফরের। তরিকুলের কথা তোলা এখন কোনোমতেই উচিত হবে না। পুলিশকে অ্যাকশন নিতে দেখলেই বুঝে ফেলবে তরিকুল, বেইমানি করেছে জাফর, প্রথম গুলিটা ওকেই খেতে হবে। দুটো কাপে পানি ঢালল ও। চিনি মেশাতে মেশাতে ভাবল, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এখন। খুব সাবধানে সামাল দিতে হবে সব দিক।

কাপ দুটো ট্রেতে নিয়ে বসার ঘরে চলে এলো ও। হেসে বলল, 'কী জন্য এসেছেন, বলেননি কিন্তু। হরিণ শিকারের গল্প গেলাতে পারবেন না আমাকে।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ইয়াকুব আলী বললেন, 'একটা খুনিকে খুঁজতে বেরিয়েছি। সন্দেহ করছি, এ দিকেরই কোনো বাংলোতে লুকিয়ে আছে ও।'

'তরিকুল হক? রেডিওতে পুলিশের হুঁশিয়ারি শুনেছি।'

'হ্যাঁ,' কাপে চুমুক দিলেন ইয়াকুব আলী। 'মতিন সওদাগরকে তো চেনো?'

'ওই যে, এখানকার ধনী কাঠ ব্যবসায়ী?'

'হ্যাঁ। নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে ওকে। কুড়াল দিয়ে বাড়ি মেরে ভর্তা করে ফেলেছে মাথা। ওর মেয়ে আর স্ত্রীরও একই অবস্থা করেছে।'

কথাটা জানা না থাকলে চমকে যেত জাফর। 'রেডিওতে তাহলে ওদের কথাই বলা হয়েছে!'

মাথা ঝাঁকালেন ইয়াকুব আলী। কঠিন স্বরে বললেন, 'আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট জসিমকেও একইভাবে খুন করেছে!'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল জাফর। জিজ্ঞেস করল, 'সবগুলো বাংলোতে খুঁজে দেখেছেন?'

'দেখেছি। তোমারটাই বাকি ছিল।' চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ইয়াকুব আলী। 'যাই এখন। থাকবে তো কিছুদিন?'

'থাকব। মাস দুয়েকের আগে আর যাচ্ছি না এখান থেকে।' জাফরও উঠে দাঁড়াল।

'বাপরে! তোমার আপা শুনলে খুশি হবে। ছুটে চলে আসবে।'

'থাক, এই বৃষ্টির মধ্যে আপার আর কষ্ট করে আসার দরকার নেই। আমিই যাব।'

'তাড়াতাড়ি যেও। ও কিন্তু অস্থির হয়ে থাকবে তুমি না যাওয়া পর্যন্ত।'

'যাব, বৃষ্টিটা একটু কমলেই।'

দু'জনের সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এলো জাফর।

জুতো আর বর্ষাতি পরে নিয়ে, জাফরকে সাবধানে থাকতে বলে মুশফিককে নিয়ে নেমে গেলেন ইয়াকুব আলী। বনের দিকে এগোলেন। বৃষ্টি পড়ছে। বললেন, 'খুনেটা এদিকে আসেনি। বৃষ্টির মধ্যে লুকানোর আর কোনো জায়গা নেই। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে হয় কক্সবাজারের দিকে চলে গেছে, নয়তো চিটাগাং।'

জবাব দিল না মুশফিক। ইয়াকুব আলীর পিছন পিছন কাদা মাড়িয়ে হাঁটছে। বনের ভিতরে ঢুকে থেমে গেল। 'দাঁড়ান'।

থেমে গেলেন ইয়াকুব আলী। ঘুরে তাকালেন। 'কী?'

'আমার ধারণা, জাফরের বাংলোতেই আছে ও। আড়াল থেকে পিস্তল ধরে রেখেছিল উনার ওপর।'

মুশফিকের দিকে তাকালেন ইয়াকুব আলী। 'কী করে বুঝলেন?'

'মন বলছে,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল মুশফিক।

'শুধু কি মন? না কোনো প্রমাণ পেয়েছেন?'

'পেয়েছি,' শীতলকণ্ঠে বলল মুশফিক। 'টেলিফোনের তার ছেঁড়া। তার মানে আপনি খেয়াল করেননি। আপনার কি ধারণা তারটা জাফর সাহেব ছিঁড়েছেন?'

শক্ত হয়ে গেছেন ইয়াকুব আলী। বিব্রত বোধ করছেন। মুশফিকের চোখে যা পড়েছে সেটা তার চোখেও সেটা পড়া উচিত ছিল। 'চলুন, ফিরে যাই। জাফরকে জিজ্ঞেস করব...'

'না না, একদম উচিত হবে না। এখন ফিরে গেলেই মুন্না সাবধান হয়ে যাবে। জাফর খুন হয়ে যাক এটা নিশ্চয় চান না আপনি?'

বৃষ্টি আর কাদার মধ্যে কষ্ট করে এতটা পথ এসে কাহিল হয়ে পড়েছেন ইয়াকুব আলী। তারটা তার চোখে পড়ল না কেন, ভেবে নিজেকে দোষারোপ করতে লাগলেন মনে মনে। লজ্জা লাগছে মুশফিকের দিকে তাকাতে। 'আপনি সত্যি মনে করেন মুন্না আছে ওখানে?'

'নইলে তার ছেঁড়া কেন?'

'হুঁ,' মাথা দোলালেন ইয়াকুব আলী, 'যদি থাকে, আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত হবে না, ঠিকই বলেছেন।' বিড়বিড় করে বললেন, 'কিন্তু জাফর তো বলল সে একা আছে।'

'আড়াল থেকে পিস্তল ধরে রাখলে তো বলবেই।'

'তা ঠিক!' পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিল ইয়াকুব আলীকে, তার বয়স হয়েছে। শরীরের ক্ষিপ্রতা গেছে কমে। অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। নজরও ভোঁতা হয়ে গেছে। এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়া এখন তার সাধ্যের বাইরে। 'ওসি সাহেবকে জানাব?'

'তাতে লাভটা কী? ওসি সাহেব লোক পাঠাবেন। ওরা বাংলো ঘিরে ফেলবে। আপনার শালাকে জিম্মি করবে মুন্না। গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে হয়তো মারা যাবেন আপনার শালা। এ রকম ঝুঁকি নেবেন?'

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ইয়াকুব আলীর, 'তাহলে কী করতে চান?'

'মুন্না বুঝুক, আমরা কিছু সন্দেহ করিনি। তাতে নিশ্চিন্ত থাকবে ও। সতর্কতায় ঢিল পড়বে। সুযোগ বুঝে আঘাত হানব আমরা।'

'সেটা কীভাবে?'

'কাল আবার আসব আমি এখানে। সঙ্গে থাকবে টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল। দূর থেকে পাহারা দেব।' পায়ের নিচে প্যাচপ্যাচে কাদা, পাতা থেকে টপটপ পানি পড়ছে গায়ে, কিন্তু কোনোরকম বিরক্তি নেই মুশফিকের, পুরোপুরি শান্ত। 'চলুন, আপনার অফিসে গিয়ে কথা বলি।'

'জাফরকে এই ভয়ানক বিপদের মধ্যে রেখে চলে যাব?' দ্বিধা করছেন ইয়াকুব আলী।

'আর কী করতে পারি? এখন বাংলোয় ফিরে যাওয়ার মানে জাফর সাহেবকে আরও বিপদে ফেলে দেওয়া। আমার বিশ্বাস, কাল রাতেই তার গাড়িতে করে এসেছে মুন্না, তাকে জিম্মি করে রেখেছে। এতক্ষণ যখন মারেনি, পুলিশ গিয়ে হামলা না চালালে মারবে না।'

কথাটা ভেবে দেখলেন ইয়াকুব আলী। অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'ইস, বৃষ্টিও যা শুরু করল!' ছপছপ করে কাদা মাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আবার। ফিরে তাকালেন, 'আমরা খবর না দিলেও ওসি সাহেব খবর নেবেন। জিজ্ঞেস করলে কী বলব?'

'আপনার কিছু বলতে হবে না, যা বলার আমি বলব। তাকে বোঝানোর দায়িত্ব আমার।'

*

সোফায় এলিয়ে পড়েছে জাফর। চার চারজন মানুষকে কুড়াল দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে লোকটা। উন্মাদ খুনি। এর সঙ্গে থাকাটা ভীষণ ঝুঁকির ব্যাপার। পালানো উচিত। পারলে এখনই। কিন্তু কীভাবে?

'দারুণ অভিনয় করেছেন।'

তরিকুলের খসখসে কণ্ঠে চমকে গেল জাফর। ধড়াস করে উঠল বুক। ফিরে তাকাল ও।

পিস্তল হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তরিকুল। 'যেভাবে তাড়িয়েছেন ওদের, একটা পুরস্কার পাওনা হয়ে গেল আপনার। ভালো কিছু রান্না করে খাওয়াব। মুরগি পছন্দ করেন?'

'আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না,' কোনোমতে বলল জাফর। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

'খানিকটা হুইস্কি খান, ঠিক হয়ে যাবে।' পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল তরিকুল। বোতল বের করে গ্লাসে ঢেলে এনে দিল জাফরকে। 'ভালো হয়ে যাবেন এখুনি। আমার বাবাও হতো, বিড়ি পেলে। গরিবের বিলাসিতা। কী আর করব। মাঝে মাঝে এনে দিতাম।'

লোভীর মতো চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করে ফেলল জাফর। রাগ দেখিয়ে খালি গ্লাসটা ফেলে দিল কার্পেটের ওপর।

একটা চেয়ারের হাতলে বসল তরিকুল।

মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না জাফর। চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি, আপনি মানুষ না! এতগুলো লোককে শুধু শুধু খুন করলেন!'

সিগারেট ধরাল জাফর। ঘড়ি দেখল। সবে সন্ধ্যা। উঠে গিয়ে পর্দা ফাঁক করে বাইরেটা দেখল। বৃষ্টি পুরোপুরি থামেনি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ফিরে এসে আগের জায়গায় বসল আবার। দীর্ঘ একটা অন্ধকার রাত অপেক্ষা করছে সামনে। অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করে এলো মনে। কী ঘটবে? তরিকুল আর কতক্ষণ থাকবে? ওর হাত থেকে ভালোয় ভালোয় মুক্তি পাবে তো? ইয়াকুব আলী আর মুশফিক কি ফেরত আসবে? টেলিফোনের তারটা ওদের চোখে পড়েছে? তরিকুল যে আছে এখানে সন্দেহ করেছে ওরা?

আধঘণ্টা পর ছায়ার মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল তরিকুল। তন্দ্রা এসে গিয়েছিল জাফরের। খুট করে শব্দ হতেই চমকে জেগে গেল। দেখল দরজা লাগাচ্ছে তরিকুল।

জাফরকে তাকাতে দেখে বলল, 'অনেক দূর গিয়েছিলাম। কেউ নেই। দুজনেই চলে গেছে। আপনার খুব খিদে পেয়েছে, না?'

মাথা নেড়ে জাফর বলল, 'হ্যাঁ।'

'এই জন্যই আপনাকে ভালো লাগে আমার। সোজা কথা সোজা করেই বলেন, কোনো ভণিতা নেই। একটু ধৈর্য ধরুন। বেশিক্ষণ লাগবে না রান্নাটা সেরে ফেলতে। চাইলে আরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারেন।'

'আপনি কি থাকছেন আজ রাতে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল তরিকুল। 'এই বৃষ্টির মধ্যে আর কোথায় যাব।' জাফরকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করব না। বাইরে থেকে আপনার ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দেব, ভিতরে আরাম করে ঘুমাতে পারবেন। কোনো উৎপাত এলে আমি একাই সামলাতে পারব।'

রান্নাঘরে চলে গেল তরিকুল।

আগের দিন জাফরের বাংলো থেকে ফিরে এসে ইয়াকুব আলীর কোয়ার্টারে বাড়তি যে ঘরটা আছে, তাতে ঘুমাল মুশফিক। একটানা ঘুমিয়ে অনেক বেলা করে উঠল। ভালো করে ঘুমিয়ে নিয়েছে, কারণ, জানে সারারাত জাগতে হতে পারে। শেভ আর গোসল সেরে, ইউনিফর্ম পরে এসে অফিস ঘরে ঢুকল। ওর অপেক্ষায়ই বসে আছেন ইয়াকুব আলী। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘুম ভালো হয়েছে?'

'দারুণ!' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল মুশফিক।

'কই গো,' ডাক দিলেন ইয়াকুব আলী, 'তোমার নাশতা হলো? মুশফিক উঠেছে।'

রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলেন সুফিয়া বেগম, 'হয়েছে। এসো।'

মুশফিককে নিয়ে ভিতরের ঘরে এলেন ইয়াকুব আলী। গোটা দশেক পরোটা, দুই প্লেট ডিম ভাজা, আর বড় এক প্লেট সবজি ভাজা এনে টেবিলে রাখলেন সুফিয়া বেগম।

'এত্তো!' চোখ কপালে তুলল মুশফিক।

'এত আর কই?' হেসে বললেন সুফিয়া বেগম, 'কিছুই দিতে পারলাম না। ঘরে বাজার নেই, সব শেষ।'

'এত কিছু দেওয়ার পরও যদি বলেন কিছুই দিতে পারলাম না, আর কিছু বলার নেই আমার,' মুশফিক হাসল। 'গোলগাল ভুঁড়িটা আপনার সাহেব কী করে বাগিয়েছেন, এখন বুঝতে পারছি।'

'খেতে থাকুন, আমি চা নিয়ে আসি,' আবার রান্নাঘরে রওনা হয়ে গেলেন সুফিয়া বেগম।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুশফিক। 'যাক, বাবা, বাঁচা গেল। বৃষ্টি তাহলে থামল। রোদও উঠবে মনে হয়।'

'হ্যাঁ,' পরোটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন ইয়াকুব আলী। 'ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি। মুন্নার আর কোনো খোঁজ পাননি। কটকছড়ির কয়েকজনকেও ফোন করেছি। কেউ কিছু বলতে পারল না। অপরিচিত কাউকে দেখেনি।'

'বাংলোয় লুকিয়ে বসে থাকলে দেখবে কী করে? জাফরকে করেননি তো?'

'করেছি। লাইন কাটা।' ডিম ভাজাসহ পরোটা মুখে পুরলেন ইয়াকুব আলী। 'আপনার কি এখনও বিশ্বাস, জাফরের ওখানেই লুকিয়ে আছে ও?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার এই একা যাওয়াটা ভালো লাগছে না আমার।'

'বাংলোর কাছাকাছি যাব না আমি। জাফর সাহেবের বাড়ির কাছে গাছে উঠে বসে থাকব। ওয়্যারলেসে যোগাযোগ রাখব আপনার সঙ্গে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ইয়াকুব আলী। বোধহয় বয়সকেই দোষারোপ করলেন মনে মনে। 'রাইফেল তো নেবেনই। একটা ফিল্ডগ্লাসও আছে, নিয়ে যাবেন, কাজে লাগবে। সুফিয়া বলেছে, খাবার বানিয়ে দেবে। আর কিছু লাগবে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ইয়াকুব আলীর দিকে তাকিয়ে রইল মুশফিক। 'লাগবে। আপনার সাক্ষী। বলতে হবে, মুন্নাই আগে গুলি করেছিল আমাকে।'

'মিথ্যে কথা বলতে বলছেন?'

'বলা যায় না, ঘটনাটা মিথ্যে না-ও হতে পারে।'

অস্বস্তি দেখা দিল ইয়াকুব আলীর চোখে। মুশফিকের কথার মানে বুঝতে পেরেছেন। দেখামাত্র লোকটাকে গুলি করে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও, কোনো সুযোগ দেবে না। 'কাজটা কি ঠিক হবে?'

'তাহলে কি আপনি চান, আমি মারা যাই? এবং আমার পর আপনার শালা?'

ঘরে ঢুকলেন সুফিয়া। হাতে খাবারের প্যাকেট। টেবিলে

রেখে মুশফিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাচ্ছেনই তাহলে?'

'উপায় নেই, ভাবী, ইয়াকুব ভাইর কাছে নিশ্চয় সব শুনেছেন,' ব্যাগটা তুলে নিল মুশফিক। 'আপনারা যেভাবে চিন্তা করছেন আমাকে নিয়ে, সত্যি, কৃতজ্ঞ হয়ে যাচ্ছি। ভাববেন না। আমার কিছু হবে না। ফিরে এসে আবার আপনার হাতের রান্না খাব। ভাইকে বাজার করে রাখতে বলবেন। চলি।'

রাইফেল হাতে আগে আগে বেরোল মুশফিক। পিছনে ইয়াকুব আলী।

রোদ উঠেছে। বাষ্প উঠতে শুরু করেছে ভেজা মাটি থেকে। দেখছে মুশফিক।

গাড়ি বের করতে গেলেন ইয়াকুব আলী।

*

ধীরে ধীরে চোখ মেলল জাফর। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে রোদ। হাতঘড়ি দেখল। সাড়ে ৮টা বাজে। বিশ্রী গরম। বিছানা থেকে নেমে দরজার কাছে গিয়ে দেখল তালা দেওয়া।

চুপ করে কান পেতে রইল। নিচে কোনো নড়াচড়ার শব্দ নেই। খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল রোদে চিকচিক করছে ঢেউ। বাংলোর কাছে রাস্তাটায় পানি জমে আছে। থকথকে কাদা। বৃষ্টিটা থেমেছে অবশেষে। রোদও উঠেছে।

সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে দাড়ি কামাল, গোসল করল, কাপড় পরল। কফির জন্য আনচান করছে মন। তরিকুল না থাকলে এখন নাশতা খেয়ে ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। চলে যেত নদীতে, মাছ ধরতে। কাটিয়ে আসত দিনটা।

বিছানায় বসে সিগারেট ধরাল ও। তরিকুলের আসার অপেক্ষা করছে।

সময় যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে। ১০টা নাগাদ নিচে শব্দ শুনতে পেল। দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল।

মৃদু শিস দিচ্ছে তরিকুল। দশ মিনিট পর তালা খোলার শব্দ হলো। ঘরে ঢুকল ও। জাফরের একটা হাতাওয়ালা শার্ট পরেছে। বাঘের মুখটা ঢাকা পড়েছে। শান্ত মনে হচ্ছে ওকে। কোনো দুশ্চিন্তা নেই যেন আর। হাসল। 'উঠতে দেরি হয়ে গেল,' কৈফিয়তের সুরে বলল ও। 'খিদে পেয়েছে আপনার?'

'পেয়েছে।'

'নিচে আসুন। আমি নাশতা বানাতে যাচ্ছি।'

বসার ঘরে নামল জাফর। বেশিক্ষণ বসতে হলো না, নাশতা নিয়ে এলো তরিকুল। টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন। খাবারগুলো কিনে এনেছিলেন বুদ্ধি করে, নইলে উপোস থাকতে হতো।'

জাফরের উল্টোদিকের চেয়ারে বসল তরিকুল। 'টাকা থাকার এই আরেক সুবিধে, যত খুশি খাবার কিনে জমিয়ে রাখা যায়।'

খেতে আরম্ভ করল জাফর। মনে মনে আরেকবার স্বীকার করতে বাধ্য হলো, এই লোকটা রান্না জানে।

নীরবে খেয়ে চলল দুজনে।

এক সময় জাফর জিজ্ঞেস করল, 'কতদিন থাকবেন এখানে, ঠিক করেছেন কিছু?'

'চিরকাল যদি থাকি অসুবিধে আছে আপনার?'

'আমার নেই। আপনার আছে।'

'তা বটে,' বিষণ্ন হয়ে গেল তরিকুল। মিনিটখানেক নীরবে চিবিয়ে মুখ তুলল, 'পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না হলে বেরোনো উচিত হবে না আমার। রেডিও শুনেছি। পুলিশের এখনও মাথা গরম হয়ে আছে, খেপে গেছে আমাকে ধরার জন্য। কিন্তু পারবে না। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, তাই না? আরেকটা কথা, হাজার বিশেক টাকা দিতে হবে আমাকে। আছে তো আপনার ব্যাংকে?'

'আছে।'

'দেখলেন, মানুষ চিনতে আমি ভুল করি না। নেই বললেও পারতেন, বললেন না। সত্যি কথা যারা বলে তারা ভালো লোক।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ খাওয়া চলল। খাবার শেষ করে প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে রাখল তরিকুল। হেলান দিল চেয়ারে।

পড়ার ঘরে চলে এলো জাফর। ডেস্কে বসে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বৃষ্টিধোয়া ঘন সবুজ পাতায় চিকচিকে রোদ। ছিপ নিয়ে বেরোতে পারলে এখন খুশি হতো। কিন্তু উপায় নেই। বেরোতে দেবে না তরিকুল। চেয়ারে হেলান দিয়ে কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ও। পুরো আধঘণ্টা গভীর ভাবনায় ডুবে রইল। ল্যাপটপ অন করার ঝামেলায় যেতে ইচ্ছে করল না। একটা কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে কাহিনীর খসড়া শুরু করল। কাজে এতই ডুবে গেল, সময় যে কোনদিক দিয়ে বয়ে গেল খেয়াল রইল না।

দরজায় টোকা দিল তরিকুল। 'আসুন, খাবার রেডি।'

ঘড়ি দেখল জাফর। একটা বাজে। বাপরে! এত বেলা হয়ে গেছে, খেয়ালই ছিল না! লেখা ফেলে টেবিল থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না। তবু উঠল। চলল তরিকুলের পিছু পিছু। চলে এলো বসার ঘরে।

বড় বড় আলু দিয়ে ঝোল মাংস রান্না করেছে তরিকুল। সেই সঙ্গে চাইনিজ রাইস। খাবারের সুগন্ধে ভুরভুর করছে বাতাস। খিদেয় মোচড় দিয়ে উঠল জাফরের পেট। জিভে পানি এসে গেল।

'আহ, দারুণ গন্ধ তো!'

'বেশি করে পেঁয়াজ দিতে পারলে আরও ভালো হতো,' রান্নার তারিফ খুশি করল তরিকুলকে। 'পেঁয়াজ শেষ হয়ে গেছে,' হাসল ও। বিষণ্ন দেখাল হাসিটা। 'বেশি করে পেঁয়াজ কেটে দেওয়া ভাজা মাংস আমার বাবা খুব পছন্দ করত। আর ডালের সঙ্গে আলুভাজি। মাংস দিতে পারতাম না। টাকার অভাবে।'

তরিকুলের প্রতিটি কথা এখন মনোযোগ দিয়ে শোনে জাফর, মনে রাখার চেষ্টা করে। লেখার জন্য। যতটা সম্ভব বাস্তবের কাছাকাছি থাকতে চায়।

'বাবাকে আপনি খুব ভালোবাসতেন, তাই না, তরিকুল? শুধু তরিকুলই ডাকলাম, কিছু মনে করলেন না তো?'

'না না, তাই তো ডাকবেন। সাহেব যোগ করলে বরং অস্বস্তিতে পড়ে যাই। আমি তো আর সাহেব না...হ্যাঁ, বাসতাম। জেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে যখন দেখলাম বাবা নেই, সব কিছু শূন্য লাগল,' চুপ হয়ে গেল তরিকুল। এক টুকরো মাংস মুখে ফেলে বলল, 'মাংসটা ভালো এনেছেন।'

'আপনার মায়ের কথা কিছু বলবেন?'

চিবানো বন্ধ করে দিল তরিকুল। 'না! আপনার কথা বলুন। বিয়ে করেছেন?' আবার চিবাতে শুরু করল ও।

'করেছি।'

'সুন্দরী?'

'হ্যাঁ।'

'টাকা থাকার এই আরেক সুবিধে। নিজের পছন্দমতো মেয়েকে বিয়ে করা যায়। আমি হলে অবশ্য করতাম না। মেয়েমানুষের ঝামেলায় জড়াতে রাজি না, যত সুন্দরীই হোক। বিয়ে করলে মানুষের স্বাধীনতা বলতে আর কিছু থাকে না। বউকে ভালোবাসেন?'

'বাসি।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল তরিকুল। 'হুঁ! তিনি আপনাকে



বাসেন?'

থমকে গেল জাফর। কী জবাব দেবে? 'তা তো জানি না! বোধহয় বাসে!'

'মেয়েমানুষ, ভাই, বোঝা বড় মুশকিল,' হাসল তরিকুল। চেয়ারে হেলান দিল। 'সে-জন্যই তো ওদেরকে এড়িয়ে চলি। বাদ দিন। আপনার লেখার কথা বলুন।'

'কী বলব?'

'কী করে লেখেন?'

'সহজ। প্রথমে গল্পের একটা ছক বানিয়ে নিই মনে মনে। তারপর কম্পিউটার নিয়ে লিখতে বসে যাই। শুরু করলে আপনাআপনিই বেরিয়ে আসতে থাকে।'

'টাকা অনেক পাওয়া যায়, তাই না?'

'সবাই পায় না।'

মিনিটখানেক চুপচাপ খাওয়ার পর আবার মুখ তুলল তরিকুল। জাফরের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আপনার কাহিনীর একটা চরিত্র আমি, তাই না?'

এড়িয়ে গেল জাফর, 'রান্না খুব ভালো হয়েছে। চেষ্টা করলে রান্নার পেশা নিয়েও ভালো আয় করতে পারতেন।'

'আসলে কি জানেন, কোনো কাজে লেগে থাকার ধৈর্যই নেই আর এখন আমার।'

এরপর নীরবে খাওয়া শেষ করল দুজনে। বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে এসে জাফর বলল, 'আমি কাজ করতে যাচ্ছি।'

মৃদু শিস দিতে দিতে এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো জড়ো করতে লাগল তরিকুল। কিছু বলল না। এমনকি মুখ তুলেও তাকাল না।

*

নদীর দিকে মোড় নিয়েছে যেখানে পথটা সেখানে এনে গাড়ি থামালেন ইয়াকুব আলী।

নেমে পড়ল মুশফিক। রাইফেল কাঁধে ঝোলাল। সঙ্গে আনা চামড়ার ব্যাগে খাবারের প্যাকেট আর ওয়্যারলেসটা ভরল। তাকাল ইয়াকুব আলীর দিকে।

'কোনো রকম রিস্ক নেবেন না বলে দিলাম,' ইয়াকুব আলীর কণ্ঠে অস্বস্তি। 'আমি সঙ্গে আসতে পারলে ভালো হতো।'

হাসল মুশফিক। 'অহেতুক ভাবছেন। অন্য কোনোখানেও তো ঘটতে পারত ঘটনাটা। তখন কি আমার সঙ্গে থাকতে পারতেন? নাকি এতদিন পেরেছেন, চাকরি তো অনেক বছর ধরে করছি। জীবনটা যার, সেটা সামলানোর দায়িত্বও তার, তাই না?'

জবাব দিতে পারলেন না ইয়াকুব আলী, চুপ হয়ে গেলেন।

নদীটা চোখে পড়ল। ডানে, দুশো গজ দূরে রয়েছে এখন জাফর উল্লাহর বাংলো। আরও সতর্ক হলো মুশফিক। ঝোপঝাড়ে গা ঢেকে চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দে এগোল। এতই সাবধানে, গাছে বসা পাখিরা পর্যন্ত টের পেল না ওর উপস্থিতি। ওদেরকেও সচকিত করতে চায় না ও। চমকে গিয়ে যদি উড়ে যায়, চোখে পড়ে যেতে পারে মুন্নার। ভীষণ ধূর্ত ও। সাবধান হয়ে যাবে। একটা একটা করে ডাল, লতাপাতা হাত দিয়ে সরিয়ে সামনে পা বাড়াচ্ছে। জুতো কামড়ে ধরছে আঠাল কাদা। বিশ্রী গরম। ঘামে ভিজে গেছে মুখ। পাতায় লেগে থাকা পানিতে কাপড় আগেই ভিজেছে, এখন ঘাম বেরোনোতে লেপ্টে গেছে শরীরের সঙ্গে। অস্বস্তিকর।

ব্যাগটা ডালে ঝুলিয়ে রাখল ও। রাইফেল ঝোলাল হাতের কাছে আরেকটা ডালে। ওয়্যারলেস রাখল কোলের ওপর। তাকাল বাংলোটার দিকে। কাউকে চোখে পড়ল না। অহেতুক সময় নষ্ট করছে না তো? মনে হয় না, নিজেকে বোঝাল ও।

ভাবছে, ইয়াকুব আলী নিশ্চয় অফিসে ফিরে গেছেন এতক্ষণে। ওয়্যারলেসের সুইচ অন করল মুশফিক। ঠোঁটের কাছে এনে, কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব নামিয়ে বলল, 'ইয়াকুব ভাই, মুশফিক বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?'

'পরিষ্কার,' জবাব দিলেন ইয়াকুব আলী।

'গাছে উঠে বসেছি। বাংলোটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি পাতার আড়ালে থাকায় বাংলো থেকে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। জানালার পর্দা টানা। ঘরের ভিতর দেখতে পাচ্ছি না। অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।'

'করুন। আমি ওয়্যারলেসের কাছে আছি।'

'ঠিক আছে,' সুইচ অফ করে দিল মুশফিক। ঘড়ি দেখল। দুপুর হয়েছে। একটিবারের জন্যও দেখা যায়নি জাফরকে, বাইরে তো আসছেই না, জানালার কাছেও নয়। ঘরে আছে তো? না বেরিয়ে গেছে? ঘরেই আছে, নিজেকে জবাব দিল ও। মুন্না তাকে আটকে রেখেছে, বেরোতে দিচ্ছে না।

সকালে পেট ভরে খেয়েছে, তবু খিদে লেগে গেল মুশফিকের। একটা স্যান্ডউইচ খেলে মন্দ হয় না।

একবারে দুটো স্যান্ডউইচ খেয়ে ফেলল ও। পানি খেলো। একটা সিগারেট খেতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু ধরানো উচিত হবে না। বাংলো থেকে কেউ ওর ওপর নজর রেখে থাকলে আগুন চোখে পড়ে যেতে পারে।

ব্যাগটা আবার আগের জায়গায় ঝুলিয়ে গাছে হেলান দিল ও। শরীরটা ঢিল করে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

*

নদীর ধারের পথ ধরে এগোল জিপ। রাস্তা সাংঘাতিক খারাপ। খুব সাবধানে চালাচ্ছে ড্রাইভার। ভয় পাচ্ছে সালমা, পিছলে না নদীতে পড়ে যায়।

আঠাল কাদা। পথের এখানে ওখানে পানি জমা। গর্তে পড়ার ভয়ে ওসব এড়িয়ে চলল ড্রাইভার।

তবে নিরাপদেই পথটা পেরিয়ে এলো জিপ। বাংলোটা চোখে পড়ল। কখনও দেখেনি, কিন্তু দেখামাত্র চিনতে পারল সালমা। এতবেশি বলেছে জাফর, বাড়িটার ছবি সালমার মনে গেঁথে দিয়েছে।

'ওটার সামনে রাখুন,' ড্রাইভারকে বলল সালমা।

বাংলোর সামনে এনে জিপ রাখল ড্রাইভার। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। 'আমি থাকব না চলে যাব?'

'এক মিনিট দাঁড়ান, দেখে আসি এই বাড়িই কিনা।'

জিপ থেকে নেমে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল সালমা। থাবা দিল দরজায়। পরিবেশ দেখে দমে গেছে। অবশ্য, এর চেয়ে বেশি কিছু আশাও করেনি ও।

কয়েক সেকেন্ড পর নব ঘুরল। খুলে গেল দরজা।

'তুমি!' চিৎকার করে উঠল জাফর। কল্পনাই করেনি সালমা এসে হাজির হবে।

'হ্যাঁ, আমি,' বাঁকা হেসে বলল সালমা। 'ভেবেছিলে খুঁজে বের করতে পারব না। দাঁড়াও, ড্রাইভারকে বিদেয় করে আসি।'

স্যুটকেসগুলো বারান্দায় তুলতে সালমাকে সাহায্য করল ড্রাইভার। ভাড়ার টাকা আর বকশিশ নিয়ে জিপে গিয়ে উঠল। গাড়ি ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেল আঙিনা থেকে।

ভিতরে ঢুকেই মারমুখো ভঙ্গিতে জাফরের দিকে তাকাল সালমা। 'কি, আমাকে দেখে খুশি হওনি?' আচমকা চুপ হয়ে গেল ও। জাফরের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে। হাঁ হয়ে গেছে পিস্তল উদ্যত করে রাখা তরিকুলের দিকে তাকিয়ে।

ধীরে-সুস্থে গিয়ে দরজার পাল্লা লাগিয়ে ছিটকানি তুলে দিয়ে এলো তরিকুল। পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে।

চাবুকের মতো শপাং করে উঠল সালমার কণ্ঠ। 'লোকটা কে?'

ঘাবড়ে গেল জাফর। এমনিতেই মেয়েমানুষ সইতে পারে না তরিকুল, সালমার আচরণে রেগে গিয়ে কখন কী করে বসে কে জানে! সালমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য তাড়াতাড়ি বলল, 'সালমা, ওর নাম তরিকুল।'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল তরিকুল। 'আমার নাম তরিকুল। বড় অসময়ে এসে পড়েছেন। বেশি চেঁচামেচি করবেন না, গোলমাল করবেন না, তা হলে আমিও চুপ থাকব। নইলে...' পিস্তল নাচাল ও। জ্বলে উঠল চোখের ওরা। 'কী বলছি, আশা করি বুঝতে পারছেন।'

জাফর বলল, 'ওকে সব বুঝিয়ে বলব আমি, তরিকুল। আপনি ভাববেন না। সালমা গোলমাল করবে না।'

'না করলেই ভালো,' মাথা ঝাঁকাল তরিকুল। 'আপনারা কথা বলুন, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। মেহমান যখন এসেই গেছে, কী আর করা, কাজ বাড়ল আরকি আমার।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সালমা। এ রকম কোনো পরিস্থিতিতে পড়বে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি।

কঠিন দৃষ্টিতে তরিকুলের দিকে তাকিয়ে রইল সালমা।

পাত্তা দিল না তরিকুল। 'জাফর সাহেব, একটা কাজ করতে হবে আপনাকে। ব্যাংকে গিয়ে টাকা আনবেন, আর লোকের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের গতিবিধিও জানার চেষ্টা করবেন।'

আড়চোখে সালমার দিকে তাকাল একবার জাফর। জবাব দিতে দ্বিধা করতে লাগল।

হাসল তরিকুল। 'স্ত্রীর জন্য ভয় পাচ্ছেন? ভাবছেন আমার সঙ্গে একা ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা?'

সাহস করে বলেই ফেলল জাফর, 'হ্যাঁ, তাই।'

'সত্যি কথাটা বললেন, খুশি হলাম। যারা সত্যি কথা বলে তাদের বিশ্বাস করা যায়। মিথ্যে আমিও সহজে বলি না, জাফর সাহেব। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার স্ত্রীর কোনো ক্ষতি আমি করব না।'

ভয়ঙ্কর ওই লোকটার সঙ্গে একা বাড়িতে থাকার কথা ভেবে ভয়ে সিঁটিয়ে যাবার কথা সালমার। কিন্তু সেরকম কিছু করল না ও।

সামনের টেবিলে রাখা পিতলের ভারী অ্যাশট্রেটা তুলে নিল তরিকুল। বিশাল থাবায় চিপে দুমড়েমুচড়ে দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল সালমার পায়ের কাছে। 'তাই বলে উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করবেন না, ম্যাডাম। অবাধ্য হবেন না। অবাধ্যতা আমি একদম পছন্দ করি না,' হিসহিস শব্দ বেরোচ্ছে ওর দাঁতের ফাঁক দিয়ে। 'অ্যাশট্রেটাকে যেভাবে চিপলাম, দুই হাতে আপনার মাথা ধরে যদি ওভাবে চাপ দিই, কী ঘটবে বুঝতে পারছেন? একদিন একটা মেয়ে আমার কথা শোনেনি। রাগ করে ওর মাথা চিপে দিয়েছিলাম। কান দিয়ে মগজ গলে বেরিয়ে গিয়েছিল। বুঝতেই পারিনি এত জোরে চাপ দিয়েছি। আসলে অনেক কিছুই বুঝি না আমি। নিজেকে মাথামোটা কি আর সাধে বলি?'

রেগে গেল জাফর। ওর মনে হলো, সালমাকে হুমকি দিয়ে ওর সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছে তরিকুল। রক্ত চড়ে গেল মাথায়। একটানে কাচের একটা ফুলদানি তুলে নিয়ে বাড়ি মারতে গেল তরিকুলকে।

হেসে ফেলল তরিকুল। জাফরের ফুলদানি ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরল। চাপ দিতে আপনাআপনি আঙুলগুলো খুলে গিয়ে মেঝেতে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেল ওটা। এক ধাক্কায় জাফরকে উল্টে ফেলে দিল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে তরিকুল বলল, 'মেয়েমানুষ কেন দেখতে পারি না আমি বুঝলেন তো? দু'দিন ধরে আমার সঙ্গে আছেন, একটা খারাপ কথা বলেননি, দুর্ব্যবহার তো দূরের কথা। আসলে দোষ আপনার নয়, দোষ আপনার স্ত্রীর। মুহূর্তে মাথাটা গরম করে দিয়েছে আপনার। তবে আর কিন্তু এ রকম করবেন না, পরের বার আর মাপ করব না। যান, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসুন। দেরি করলে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে।'

উঠে দাঁড়াল জাফর। চেয়ারের কোনায় লেগে কনুই ছড়ে গেছে। ডলতে লাগল জায়গাটা। সালমার স্যুটকেস দুটো তুলে নিয়ে বলল, 'এসো।'

আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ও। পিছনে সালমা।

*

একজন মেয়েমানুষকে বাংলোতে ঢুকতে দেখে ভড়কে গেল মুশফিক। সর্বনাশ! নিশ্চয় জাফর সাহেবের স্ত্রী। পরিস্থিতি

আরও জটিল করে দিল!

ওয়্যারলেস অন করল মুশফিক। 'ইয়াকুব ভাই?'

'শুনছি।'

'একজন মহিলা এসেছে জিপে করে। থাকবে মনে হয়। সঙ্গে স্যুটকেস আছে।'

চমকে উঠলেন ইয়াকুব আলী, 'বলো কি! নিশ্চয় জাফরের বউ। আর কে আসবে? ইস্, বিপদ আরও বাড়াল দেখছি! ওসি সাহেবকে খবর দিচ্ছি আমি...'

'না না, ও কাজও করবেন না!'

'কী করব তাহলে?'

'যা করছেন, তাই। ওয়্যারলেসের কাছে থাকুন। নতুন কিছু ঘটলে জানাব,' সুইচ অফ করে দিল মুশফিক।

কিছুক্ষণ পর জাফরকে বাইরে বেরোতে দেখল ও। গ্যারেজের দিকে যাচ্ছে। গাড়ি বের করল। চলে গেল নদীর ধারের পথটা ধরে।

ওয়্যারলেসের সুইচ অন করল আবার মুশফিক, 'ইয়াকুব ভাই?'

'শুনছি।'

'জিপ নিয়ে বেরিয়েছেন জাফর সাহেব। আমার বিশ্বাস, কটকছড়িতে যাচ্ছেন। নিশ্চয় স্ত্রীর জন্য কিছু কিনতে। উনার স্ত্রী বাংলোতে একা রয়েছেন।'

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ।'

হাঁফ ছাড়লেন ইয়াকুব আলী, 'তার মানে মুন্না বাংলোতে নেই। নইলে বউকে ওরকম একটা জানোয়ারের সঙ্গে বাড়িতে একা ফেলে কিছুতেই বেরোত না জাফর।'

'আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি। যদি বলি স্ত্রীর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে জাফর সাহেবকে বেরোতে বাধ্য করেছে মুন্না?'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ইয়াকুব আলী, 'কেন বাধ্য করবে?'

'কারণ তো একটা নিশ্চয়ই আছে। আপনি একটু কটকছড়িতে যান, প্লিজ। জাফর সাহেবের সঙ্গে দেখা হলে বুঝতে পারবেন, কেন গেলেন উনি।'

'ঠিক আছে। যাচ্ছি আমি।'

*

ব্যাংকের সামনে থামল জাফর। তিনটে বাজে। এই সময় রাস্তায় লোক নেই, বাজারেও লোকজন কম। দশটা-এগারোটার মধ্যেই এখানে বাজার করা হয়ে যায় লোকের, তারপর আর নেহায়েত দরকার না পড়লে বাজারে আসে না কেউ। দুপুর বেলা দু'চারজন কুলি-কামিন কিংবা বেকার-ভবঘুরেকে দেখা যায় গাছের নিচে বসে ঢুলতে, কিংবা আড্ডা দিতে। আজ ওরাও নেই। কাদার মধ্যে গাছের নিচে বসার জায়গা নেই। তা ছাড়া ভাপসা গরম। ভেজা মাটি থেকে ওঠা বাষ্প গরমটাকে আরও অসহ্য, অস্বস্তিকর করে তুলেছে।

গাড়ি থেকে নামল ও। ব্যাংকের দিকে এগোল। কাচের পাল্লা খুলে ভিতরে ঢুকল। কাউন্টারে কেউ নেই, লেনদেন বন্ধ। ওপাশে বসে লেজার মেলাচ্ছে একজন বয়স্ক মহিলা। সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল, 'আরে, জাফর সাহেব না? কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনারা কেমন?'

'ভালো। অনেক দিন পর এলেন।'

'হ্যাঁ। আতাহার সাহেব আছেন?'

মাথা ঝাঁকাল মহিলা। 'আছেন। যান না।' হাত তুলে 'ম্যানেজার' লেখা দরজাটা দেখাল ও।

কাউন্টার ঘুরে এগোল জাফর। এই সময় খুলে গেল ম্যানেজারের অফিসের দরজা। বেরিয়ে এলেন হালকা-পাতলা একজন মানুষ, বয়েস চল্লিশের কোঠায়। জাফরের দিকে তাকিয়ে রইলেন দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন, 'আরে, জাফর সাহেব যে! মনে পড়ল তাহলে আমাদের কথা! তা এই অবেলায় কী মনে করে?'

'টাকা দরকার। দেওয়া যাবে এখন?'

হাসলেন ম্যানেজার, 'বেশি জরুরি হলে ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে। আসুন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জাফর। অসময়ে টাকা পাবে কিনা, একটা ভয় ছিল। টাকা নিয়ে যেতে না পারলে তরিকুলকে বোঝানো কঠিন হতো। সালমা এসে পরিস্থিতি গোলমেলে করে দিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন ভজিয়ে-ভাজিয়ে, যা চায় তাই দিয়ে তরিকুলকে বিদেয় করা দরকার।

জাফরকে তার অফিসে এনে বসালেন ম্যানেজার। জিজ্ঞেস করলেন, 'কত টাকা লাগবে আপনার?'

'এই হাজার বিশেক। আছে তো অ্যাকাউন্টে?'

'আছে।'

চেক লিখে দিল জাফর।

একজন পিয়ন ডেকে চেকটা ওর হাতে দিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'ক্যাশিয়ার সাহেবকে দাও। বলো, আমি দিতে বলেছি।' জাফরের দিকে তাকালেন। 'চা দিতে বলি?'

'না, আরেকদিন। আজ তাড়া আছে।'

টাকা নিয়ে ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এলো জাফর। খানিক দূরে একটা বড় দোকান। তাতে স্টেশনারি জিনিস থেকে শুরু করে রুটি-বিস্কুট সব পাওয়া যায়।

আড়াল থেকে নজর রাখছিলেন সাব ইন্সপেক্টর ইয়াকুব আলী। জাফর বেরিয়ে গেলে রাস্তা পেরিয়ে এসে ব্যাংকে ঢুকলেন।

'আরে, দারোগা, তুমি?' ভুরু কোঁচকালেন ম্যানেজার। 'আজ অসময়ে রুই-কাতলাদের ভিড় লাগল কেন? তুমি আবার কী চাও?'

'জাফর এসেছিল কেন?'

'জাফর?' দ্বিধা করছেন আতাহার সাহেব। 'মক্কেলের খবর কাউকে বলি না আমরা, জানো, তবু তুমি পুলিশের লোক...'

'অত বাহানা করছ কেন? ব্যাপারটা জরুরি। জলদি বলো।'

'টাকা নিতে এসেছিল। বিশ হাজার।'

'দিয়েছ?'

'কেমন কথা বলছ? অ্যাকাউন্টে টাকা আছে, দেব না কেন?'

'অনেক ধন্যবাদ।' ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে একবার হাত নেড়ে দরজার দিকে রওনা হলেন ইয়াকুব আলী।

পিছনে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন বিস্মিত ম্যানেজার।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে দোকানটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন ইয়াকুব আলী।

এক ডজন ডিম আর দুই কেজি পেঁয়াজ কিনে বেরিয়ে এলো জাফর। দোকানের বাইরে পা দিতেই চোখে পড়ল ইয়াকুব আলীকে। ধক করে উঠল বুক।

হাত তুলে এগিয়ে এলেন ইয়াকুব আলী। 'অ্যাই যে, শালা, বাজার করতে বেরিয়েছ বুঝি?'

ডিম আর পেঁয়াজের ব্যাগটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল জাফর। 'আপনিও তো বেরিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, একটা কাজ ছিল। বাজার করতে এসেছ?'

'না, ব্যাংকেও দরকার ছিল। ভাবলাম, এলামই যখন, কিছু

ডিমটিম নিয়ে যাই। সালমা এসেছে।'

'তাই নাকি?' অবাক হওয়ার ভান করলেন ইয়াকুব আলী, যেন কিছুই জানেন না। 'কখন এলো?'

'এই তো খানিক আগে। ঢাকায় নাকি একলা ভালো লাগছিল না, এসে হাজির হয়েছে।'

'ভালোই তো।'

'ভালো আর কোথায়, নিরিবিলি লেখাটা মাটি করল আমার। মাছ ধরারও বারোটা বাজল।' হাসল জাফর।

হাসিটা নিষ্প্রাণ। সালমা আসাতে কি খুশি হয়নি জাফর? ভাবছেন ইয়াকুব আলী। না অন্য কোনো ব্যাপার? মুশফিকের ধারণাই কি ঠিক? খানিক দূরের রেস্টুরেন্টটা দেখালেন, 'চা খেতে ইচ্ছে করছে। চলো না, একটু বসি? দেরি করলে তোমার বউ খেপবে না তো?'

'তা তো খেপতেই পারে। সবাই কি আর আমার বোনের মতো?'

'তা তোমার বোনের সত্যিই জুড়ি নেই, ভাই,' স্ত্রীর প্রশংসায় খুশি হলেন ইয়াকুব আলী। 'এতগুলো বছর একসঙ্গে কাটালাম, টুঁ শব্দ করল না কোনোদিন।'

চা না আসা পর্যন্ত চুপচাপ রইল দুজনে। চায়ের কাপে চুমুক দিলেন ইয়াকুব আলী। 'তা আর সব খবরাখবর ভালো তো?'

'ভালো,' কাপের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল জাফর।

'তোমার বোন তো অস্থির হয়ে গেছে তোমাকে দেখার জন্য। রাস্তা খারাপ বলে যেতে পারছে না। এখন যদি শোনে তোমার বউ এসেছে, আর ঠেকানো যাবে না...'

'না না,' তাড়াতাড়ি বলল জাফর, 'আপার কষ্ট করে গিয়ে দরকার নেই। রাস্তাঘাট ভালো হোক, আমরাই দেখা করতে যাব।'

'ঠিক আছে, তাই যেও,' মাথা কাত করলেন ইয়াকুব আলী। 'তো, কী জন্য এলে এবার? সেদিন সঙ্গে লোক ছিল, তাড়াও ছিল, কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। গল্প লিখবে নাকি?'

হ্যাঁ,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে হিমশিম খাচ্ছে জাফর। 'ভাগ্য ভালো, একেবারে সময়মতো চলে এসেছি। ওই খুনিটার কথা শুনে একটা প্লট তৈরি হয়েছে মাথায়। ভাবছি, তাকে নিয়ে লিখলে মন্দ হয় না। আর কোনো খবর-টবর আছে ওর? ধরা পড়ল?'

'না। খোঁজাখুঁজি চলছে,' চেয়ারে হেলান দিলেন ইয়াকুব আলী। 'মনে হয় কক্সবাজারের দিকে পালিয়েছে।'

'বাঁচতে পারবে?'

'তা কি আর পারে? কিছুদিন ঝামেলা করবে আরকি, কষ্ট দেবে। তবে ধরা তাকে পড়তেই হবে।'

'হুঁ!' মাথা দোলাল জাফর। কাপে চুমুক দিল। ইয়াকুব আলীকে সব কথা বলার জন্য অস্থির হয়ে আছে ও। কিন্তু বললেই অ্যাকশন নেবে পুলিশ, আর তাতে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে সে আর সালমা। 'আপনি সেদিন দেখা করে আসার পর থেকেই কথাটা ভাবছি, দুলাভাই। গল্পটা নিয়ে। সত্যি যদি আমার বাংলোতে লুকিয়ে থাকত খুনিটা, তাহলে কী ঘটত?'

চেহারা স্বাভাবিক রাখলেন ইয়াকুব আলী। চোখ দুটো কেবল সতর্ক হয়ে উঠল। 'কী আর ঘটত? তুমি লেখক মানুষ, কল্পনার দৌড় বেশি, আমার চেয়ে তুমিই ভালো বলতে পারবে।'

'আপনারা চলে আসার পর মনে হলো, লোকটা তো সত্যি সত্যি আমার এখানে লুকিয়ে থাকতে পারত। ব্যাপারটা অবাস্তব নয়। ভাবলাম, ওর মতো একটা উন্মাদ খুনি যদি পিস্তল দেখিয়ে আমাকে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য করে, না শুনে কি উপায় আছে আমার?' জোর করে হাসল জাফর। 'প্রাণের ভয় কার না আছে, বলুন?'

'হিরোদের থাকে না।'

'আমি নিজে হিরো নই, তবে গল্পের হিরো তৈরি করি। প্রথমে কাগজে-কলমে। তারপর পর্দায়।' লাইটার বের করে সিগারেট ধরাল জাফর। 'চমৎকার একটা গল্পের প্লট এখন মাথায় ঘুরছে আমার। গল্পটা আপনাকে শোনাতে অসুবিধে নেই। ধরা যাক, বনের কিনারে নিরালা বাংলোতে এক লেখককে তারই বাড়িতে আটকে রেখেছে এক ভয়ানক খুনি। গায়ের জোরে খুনির সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না লেখক। তার ওপর লোকটার কাছে রয়েছে পিস্তল, নিশানাও বড় সাংঘাতিক। ভীষণ বিপদে আছে লেখক। খুনির কথামতো চলতে বাধ্য হচ্ছে। পটিয়েপাটিয়ে লোকটাকে শান্ত রেখে কোনোমতে বিদেয় করতে চাইছে। হঠাৎ করেই হাজির হলো লেখকের স্ত্রী। পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলল। খুনির হলো সুবিধে। জিম্মি হিসেবে একজনের পরিবর্তে দুজনকে পেয়ে গেল। আরও বেশি ফেঁসে গেল লেখক। আগে শুধু ওর নিজের জন্য ভাবনা ছিল, এখন স্ত্রীর জন্যও ভাবতে হচ্ছে। প্রচণ্ড উত্তেজনা আর নানা রকম ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে কাহিনী। তবে ক্লাইম্যাক্সে কী ঘটবে, ভেবে বের করতে পারি-নি এখনও।'

গম্ভীর হয়ে গেছেন ইয়াকুব আলী। মাথা দুলিয়ে বললেন, 'বলে যাও।'

কাপের বাকি চা-টুকু দুই ঢোকে শেষ করে ফেলল জাফর। 'ভীষণ বেকায়দায় পড়ে গেছে স্বামী-স্ত্রী। পুলিশকে বলতে পারছে না। পুলিশ শুনলেই ওদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাবে। তাতে বিপদ আরও বাড়বে ওদের। উন্মাদ খুনিটা তখন রেগে গিয়ে আগে ওদের খুন করবে, তারপর নিজে বেরোনোর চেষ্টা করবে। না পারলে গুলি খেয়ে মরবে, তবু পুলিশের কাছে ধরা দেবে না।'

নিশ্চিত হয়ে গেছেন ইয়াকুব আলী, মুন্না জাফরের বাংলোতেই রয়েছে। কিন্তু একটা কথাও জিজ্ঞেস করলেন না সে-সম্পর্কে। নীরবে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। শেষে চোখ তুলে বললেন, 'আমি হলাম পুলিশ। কাজের মধ্যে শিখেছি চোর-ডাকাত ধরা, লেখালেখি আমার কর্ম নয়। তবু একটা পরামর্শ দিতে পারি। দেখো, তোমার গল্পে মেলাতে পারো নাকি।'

'বলুন!' অতি আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এলো জাফর। চেহারা স্বাভাবিক রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। ইয়াকুব আলীর নজর এড়াল না সেটা। বললেন, 'খুন করে যখন পালিয়েছে তোমার খুনি, পুলিশ তো তাকে খুঁজবেই, তাই না? ধরো খুঁজতে খুঁজতে দুজন পুলিশ অফিসার গিয়ে হাজির হলো বাংলোতে। আড়ালে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুনি, ওর পিস্তলের লক্ষ্য লেখক। তাই খুনিটার কথা পুলিশকে জানাতে পারল না ও। এই তো পরিস্থিতি?'

মাথা ঝাঁকাল জাফর।

'সন্দেহ হলো দুই পুলিশ অফিসারের। বুঝতে পারল, লেখক বিপদে আছে। কাজেই বাইরে বেরিয়ে একজন অফিসার লুকিয়ে রইল, আরেকজন চলে গেল। ধরা যাক, দুজনের মাঝে অল্পবয়সী অফিসারটি সাংঘাতিক চালাক। এসব পরিস্থিতিতে কী করতে হয় জানে, অভিজ্ঞতা আছে। বাংলোর ওপর চোখ রাখল ও। সন্দেহ আরও জোরদার হলো তার। পরদিন আবার রাইফেল নিয়ে ফিরে এলো ও। গাছে চড়ে বাংলোর ওপর নজর রাখতে লাগল। কেমন লাগছে শুনতে?'

আস্তে আস্তে দম ছেড়ে বাতাস বোঝাই ফুসফুসটা খালি

করল জাফর। বুঝে গেছে, তরিকুলের বাংলোতে থাকার কথাটা অজানা নয় ইয়াকুব আলীর। আর মুশফিক গাছে চড়ে বাংলোর দিকে চোখ রেখে বসে আছে।

'ভালো,' খসখসে হয়ে উঠল জাফরের কণ্ঠস্বর। 'তারপর?'

এইবার দ্বিধা করার পালা ইয়াকুব আলীর। বলবেন কিনা ভাবছেন। শেষে জাফরের দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য বললেন, 'অনেকগুলো মানুষকে খুন করেছে ওই লোকটা। ধরা পড়লে ফাঁসি হবে, নিশ্চিত। ওকে ধরতে গেলে আরও কিছু নিরীহ মানুষের খুন হওয়ার সম্ভাবনা। গাছে বসে থাকা পুলিশ অফিসারের মতে, ওদের বাঁচাতে হলে, খুনির অজান্তেই তাকে শেষ করে দেওয়া উচিত। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তুমি হয়তো বলবে, ব্যাপারটা অমানবিক, কিন্তু কিছু সৎ নাগরিকের জীবন বাঁচানোর জন্য এ কাজ করা যেতে পারে।'

ঘেমে যাওয়া হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে রইল জাফর, 'যতভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, দুলাভাই, এ জাতীয় নিষ্ঠুরতা দর্শকরা ভালোভাবে নেবে না।'

'কী করে দেখালে ভালোভাবে নেবে, সেটা লেখার দায়িত্ব তোমার। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে সিনেমায় প্রায়ই দেখানো হয়, আগে পুলিশ অফিসারকে গুলি করল খুনি, বাধ্য হয়ে তখন তাকে গুলি করে মারল অফিসার। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম, খুনি মিসই করবে না হয়তো, পাল্টা গুলি চালানোর জন্য বেঁচে থাকবে না অফিসার। সুতরাং খুনিকে আগে খুন করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই তার।'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে জাফরের। তাকিয়ে রয়েছে ইয়াকুব আলীর দিকে। 'কিন্তু খুনি যদি কিছুতেই ঘর ছেড়ে না বেরোয়?'

'কতদিন বসে থাকবে? একসময় বেরোতে তাকে হবেই।'

'অত সময় কি গাছে বসে থাকতে পারবে পুলিশ অফিসার?'

'থাকতে হবে। লেখক অবশ্য এ ব্যাপারে অফিসারকে সাহায্য করতে পারে। কায়দা করে ঘর থেকে বের করে আনতে পারে খুনিটাকে। তবে সাংঘাতিক ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে তাতে। কোনোভাবে যদি অফিসারের প্রথম গুলিটা মিস হয়, সরে যাবে খুনি। বুঝে ফেলবে লেখক তাকে খুন করানোর জন্য বের করে এনেছে। তাকে তো ছাড়বেই না, তার স্ত্রীকেও ছাড়বে না। দুজনকেই খুন করবে। অফিসারের প্রাণও বিপন্ন হতে পারে। লেখক সে-ঝুঁকি নিতে পারে না।'

'না, পারে না,' জাফর বলল। 'আরও একটা কারণে নেবে না, এটা হবে তার জন্য জল্লাদের ভূমিকা। জেনেশুনে একজন মানুষকে খুন করানোর জন্য ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘর থেকে বের করে আনার কাজ তাকে দিয়ে হবে না।'

চুপ করে রইলেন ইয়াকুব আলী।

উঠে দাঁড়াল জাফর। 'যাওয়া দরকার।'

জাফরকে গাড়ির কাছে এগিয়ে দিলেন ইয়াকুব আলী। বললেন, 'সাবধানে থেকো।'

※

কঠিন হয়ে আছে তরিকুলের চেহারা। চোখে সন্দেহ। হাতে পিস্তল। বলল, 'ছিটকানি লাগান। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ঘুরবেন।'

'আমাকে বিশ্বাস করছেন না?'

'যা বলছি, করুন।'

তর্ক করল না জাফর।

ওর দেহতল্লাশি করল তরিকুল। দেখল কোনো অস্ত্রটস্ত্র আছে কিনা। নেই দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'দাঁড়ান এখানে, ব্যাগটাও দেখি।'

'এমন করছেন কেন?'

জবাব দিল না তরিকুল। ব্যাগ দেখা শেষ করে মুখ তুলে তাকাল। এতক্ষণে হাসি ফুটেছে। 'দেখলাম, পুলিশ কোনো কিছু ভরে দিল কিনা। পেঁয়াজ এনে ভালো করেছেন। পেঁয়াজ ছাড়া রান্না হয় না।'

'আমার স্ত্রী কোথায়?'

'ওপরতলায়। ভালোই আছেন তিনি,' পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল তরিকুল। 'টাকা এনেছেন?'

'এনেছি,' একটা সোফায় বসে পড়ল জাফর। 'পাঁচশো টাকার নোট।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল তরিকুল। 'আর কী খবর?'

'সাব ইন্সপেক্টর ইয়াকুব আলীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। পুলিশ এখন কক্সবাজারে খুঁজছে আপনাকে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তরিকুল। 'সত্যি বলছেন?'

অনেক কষ্টে চেহারা স্বাভাবিক রাখল জাফর। 'আমাকে তো তা-ই বলল।'

'কে বলেছে?'

'ইয়াকুব আলী সাহেব।'

'আপনার দুলাভাই?'

মাথা ঝাঁকাল জাফর। সিগারেট ধরাল। হাত কাঁপছে অল্প অল্প, সেটা ঢাকার চেষ্টা করল না। করতে গেলেই সন্দেহ হবে তরিকুলের।

'ওকে ভয়ের কিছু নেই,' চিবুক ডলল তরিকুল। 'সঙ্গের লোকটা কোথায়?'

জবাব দিতে সময় নিল জাফর। সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে আরেক দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখা হয়নি আমার সঙ্গে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জাফরের দিকে তাকিয়ে রইল তরিকুল। 'পুলিশ তাহলে ভাবছে, আমি এদিকে নেই?'

'মনে হয়।'

'টাকাগুলো কই?'

নীরবে পকেট থেকে টাকাভর্তি খামটা বের করে দিল জাফর।

※

কোলের ওপর রাখা রাইফেলটা শক্ত করে ধরেছে মুশফিক। পিঠের টনটনে ব্যথা বাড়ছে। আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল। অনবরত প্যানপ্যান করে চলেছে মশার দল। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আবহাওয়া। ইস্, একটা সিগারেট ধরাতে পারলে অস্বস্তি অনেকখানি দূর হতো।

হঠাৎ ঝোপের ভিতর খসখস শব্দ হলো। ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর।

নিচের দিকে তাকাল ও। ঘন ঝোপের জন্য কিছু চোখে পড়ল না।

গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে কুকুরটা।

ডেকে জিজ্ঞেস করল একটা লোক, 'এই, কী হয়েছে রে? কী দেখেছিস?'

ঘামতে শুরু করেছে মুশফিক। লম্বা একজন মানুষকে নদীর দিকে যেতে দেখল। হাতে ছিপ।

কানেই তুলল না কুকুরটা। চেঁচিয়ে চলেছে।

মহাজ্বালা! চুপ করে আছে মুশফিক। সর্বনাশ করে দেবে কুকুরটা! এই ডাক সন্দেহ জাগাবে মুন্নার। ওর অস্তিত্ব ফাঁস

করে দেবে। কী দেখে চিৎকার করছে কুকুরটা, ওর মালিক যদি দেখতে আসে, আরও সর্বনাশ।

কিন্তু এলো না লোকটা। আবার ধমক দিল, 'এই, আয়, আয় বলছি! পিঁপড়ে বাসা দেখলেও চেঁচানো শুরু করে। পাজি কোথাকার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রভুর কাছে ফিরে গেল কুকুরটা। নেচে নেচে নদীর দিকে এগিয়ে চলল।

*

খামটা দিয়ে জাফর বলল, 'আপনি গুনে দেখুন ঠিক আছে কিনা। আমি ওপরে যাচ্ছি।'

'গোনা লাগবে না। আপনি যখন দিয়েছেন, কম দেবেন না। বসুন। কথা আছে আপনার সঙ্গে,' খামটা পকেটে রেখে দিল তরিকুল।

সিগারেট বের করে ধরাল জাফর। তরিকুলের দিকে তাকাল, 'বলুন?'

ওর মুখোমুখি বসল তরিকুল, 'ইয়াকুব আলীর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার, তাই না?'

'হয়েছে।'

'অন্য লোকটা সঙ্গে ছিল না?'

'না।'

'ওদের ধারণা আমি কক্সবাজার চলে গেছি?'

'হ্যাঁ।'

জাফরের চোখে চোখে তাকাল তরিকুল। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে দৃষ্টি। 'দেখুন, জাফর সাহেব, আপনি মিথ্যে বলতে জানেন না, তাই বলে লাভ নেই। আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না। ইয়াকুব আলীর ধারণা, আমি আপনার বাংলোতে লুকিয়ে আছি, তাই না?'

একবার দ্বিধা করে মাথা ঝাঁকাল জাফর, 'হ্যাঁ।' ঘন ঘন টান দিল সিগারেটে। হাত কাঁপছে।

হাসল তরিকুল। 'বললাম না, মিথ্যে বলতে পারবেন না। ইয়াকুব আলী কী ভাবছে, কী করছে, আমি আগেই আন্দাজ করেছি।'

'কী করছে?'

'ওসিকে খবর দেয়নি, ফোর্স পাঠাতে অনুরোধ করেনি, আপনার ক্ষতি হতে পারে এই ভয়ে। নইলে এতক্ষণে বাংলো ঘিরে ফেলত পুলিশ। দুজনে মিলে অন্য ফন্দি করেছে। আমি জানি, এ মুহূর্তে কোথাও লুকিয়ে বসে এই বাড়ির ওপর নজর রাখছে ইয়াকুব আলীর সঙ্গের পুলিশটা। রাখছে না?'

'আ-আমাকে বলেনি!'

মুচকি হাসল তরিকুল।

দরদর করে ঘামছে জাফর। চোখে চোখে তাকাতে পারছে না।

'আপনি ভালো মানুষ, জাফর সাহেব– পুলিশটাকেও বাঁচাতে চাইছেন, আমাকেও বাঁচাতে চাইছেন। কিন্তু দুজনকে তো একসঙ্গে বাঁচাতে পারবেন না।'

'এই ভালো মানুষ, ভালো মানুষ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আপনার কথা শেষ হয়েছে? আমি ওপরে যাব।'

'আরেকটু বসুন। আমার সময় কম। শুনুন, আজ রাতে আমি চলে যাচ্ছি। অন্ধকার হলে বেরোব। গাড়িতে পেট্রোল ভরে এনেছেন তো?'

'এনেছি।'

গাছে বসা মুশফিকের কথা ভাবল জাফর। ঘামে ভিজে যাচ্ছে হাতের তালু। ঘর থেকে বেরোলে গাড়ির কাছে পৌঁছার আগেই গুলি খাবে তরিকুল। মায়া হলো ওর জন্য। বলল, 'তরিকুল, আপনার ভালোর জন্য বলছি, পুলিশের কাছে ধরা দিন। প্লিজ!'

বিষণ্ণ হাসি হাসল তরিকুল। হেলান দিল চেয়ারে। 'ভাবছি, আরও আগে কেন আপনার সঙ্গে দেখা হলো না আমার, খুনগুলো করার আগে? এখন আর কিছুই করার নেই আপনার। আমার ভালো হওয়ার পথ আমি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছি।'

এই সময় কানে এলো কুকুরের চিৎকার।

*

রেডিও অন করল মুশফিক। 'ইয়াকুব ভাই?'

'শুনছি।'

'একটা ঘাপলা হয়েছে। আমি যে গাছে বসে আছি, ফাঁস হয়ে গেছে মনে হয়।' কুকুরটার কথা জানাল মুশফিক। 'মুন্না বোকা নয়। নিশ্চয় সন্দেহ করেছে।'

'কী করবেন? নেমে চলে আসুন। ভেবেচিন্তে অন্য কোনো বুদ্ধি বের করি।'

'আর কোনো বুদ্ধিতে কাজ হবে না। পরিস্থিতি আগের চেয়ে খারাপ, আগে ছিল একজন জিম্মি, এখন দুজন। অন্ধকার হোক। আরেকটা গাছে সরে যাব।'

'কিন্তু অন্ধকার তো হবে না আজ। পঞ্জিকা দেখেছি। পূর্ণিমা।'

'তা হলে তো আরও ভালো। পাতার আড়ালে অন্ধকার, বাইরে চাঁদের আলো, নিশানা করতে সুবিধে হবে।'

নাহ্, কোনোমতেই নিরস্ত করা যাবে না এই লোককে। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে গেলেন ইয়াকুব আলী।

*

কুকুরের ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল তরিকুল। পিস্তল হাতে ছুটে গেল জানালার কাছে। ওর ক্ষিপ্রতা দেখে হাঁ হয়ে গেল জাফর।

পর্দার একপাশ সামান্য একটু ফাঁক করে উঁকি দিল তরিকুল। ঘেউ ঘেউ করে চলেছে কুকুরটা। নিশ্চয় দেখে ফেলেছে গাছে বসা মুশফিককে, জাফর ভাবল। কী ঘটবে এখন?

একটা লোকের গলা শোনা গেল। কুকুরটাকে ডাকছে। সময় কাটতে লাগল। ডেকেই চলল কুকুরটা। আবার শোনা গেল ধমক।

তরিকুলের চওড়া কাঁধের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জাফর। কী করা যায়? গাছে বসা পুলিশ অফিসারকে সাবধান করতে পারলে ভালো হতো। কীভাবে করবে?

'খামাকো ভয় পাচ্ছেন,' শান্তকণ্ঠে তরিকুলকে বলল জাফর। 'কুত্তা এখানে নতুন না।'

পর্দাটা ছেড়ে দিয়ে ঝট করে ঘুরে তাকাল তরিকুল। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। দুরুদুরু করে উঠল জাফরের বুক।

'নতুন না মানে?'

'মানে অনেকেরই কুকুর আছে। ডাকাডাকিও করে। ওতে চমকানোর কিছু নেই।'

রুক্ষকণ্ঠে তরিকুল বলল, 'গাছের মাথায় চড়ে বসে আছে পুলিশ। সেটা দেখেই চিৎকার করেছে কুকুরটা। আমাকে কী ভাবেন? গাধা?'

'কাঠবিড়ালি দেখেছে।'

'কী দেখেছে?'

'কাঠবিড়ালি চেনেন না? অনেক আছে এখানে। দেখলেই চেঁচানো শুরু করে কুত্তাগুলো,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে কষ্ট হচ্ছে জাফরের। সিগারেট বের করে ধরাল।

*

দরজা লাগিয়ে রেখেছে সালমা। জাফর টোকা দিতে ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'আমি। খোলো।'

ছিটকানি খোলার শব্দ হলো। জাফরকে দেখে একপাশে সরে দাঁড়াল সালমা। ওর হাতে উদ্যত পিস্তল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল জাফর।

ও ঢুকতেই চট করে আবার ছিটকানি লাগিয়ে দিল সালমা। পিস্তলটা দেখিয়ে বলল, 'এটা তোমারটা। একা এসেছি তো, বিপদের ভয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'ভালো করনি। লাইসেন্সটা আমার নামে। পুলিশ ধরলে বিপদে পড়তে,' বিছানায় গিয়ে বসল জাফর।

'পুলিশ জানবে কীভাবে?' পিস্তলটা হাতব্যাগে রেখে দিল সালমা। 'যাকগে, বাজার থেকে এলে তো অনেক আগে। নিচে কী করছিলে এতক্ষণ?'

'আটকে রেখেছিল তরিকুল। আমি যখন ছিলাম না, তোমার কোনো অসুবিধে হয়নি তো?'

দপ করে ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠল সালমার চোখ। 'না, দরজা লাগিয়ে দিয়ে সারাক্ষণ পিস্তল হাতে বসে থেকেছি। লোকটা দরজা ভেঙে ঢুকলে গুলি করতাম।'

'কেন, ভাঙার চেষ্টা করেছিল নাকি?'

'না। আমিই খুলে দিয়ে রেখেছিলাম। কিছু করে কিনা দেখতে।'

'তাহলে আবার লাগালে কেন?'

রেগে গেল সালমা। 'অত জেরা করছ কেন?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত সালমার দিকে তাকিয়ে রইল জাফর। অদ্ভুত আচরণ করছে সালমা। অচেনা মনে হতে থাকল ওকে। 'ও এসেছিল?'

'এসেছিল। আমাকে পরামর্শ দিল, তোমার জীবন থেকে সরে যেতে।'

খানিকক্ষণ জবাব খুঁজে পেল না জাফর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী বললে?'

'বললাম নিজের চরকায় তেল দিতে।'

'তারপর?'

'বলল, আমার কোনো ক্ষতি করবে না– তোমাকে এ কথা না দিলে নাকি আমার ঘাড়টা ধরে মটকে দিত।'

'আমি তোমাকে বলেছি, ও বিপজ্জনক লোক...'

'যত বিপজ্জনকই হোক, ওকে আমি দেখে নেব!' ফুঁসে উঠল সালমা।

তার এই রাগ অবাক করল জাফরকে। 'থাক, বাড়াবাড়ি কোরো না আর। আজ রাতে চলে যাচ্ছে ও।'

'দেখো, যায় কিনা, না আবার কোনো ফন্দি আঁটে।'

'যাবে।'

'বড় বেশি বিশ্বাস করছ মনে হয় লোকটাকে?'

'ও আর যাই হোক, মিথ্যেবাদী নয়।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জাফরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সালমা। গম্ভীর। 'আমি মানি না এ কথা।'

গম্ভীর হয়ে গেল জাফর। 'দেখো, সালমা, আমি কোনো তর্ক করতে চাই না। ঝগড়া ভালো লাগছিল না বলেই এখানে চলে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে রেহাই দিলে না।'

'কেন দেব? তুমি এখানে বসে বসে আরাম করবে, আর আমি ঢাকায় একা পড়ে থাকব, এ হয় না। এতই যদি একা থাকার ইচ্ছে, বিয়ে করেছিলে কেন?'

'এটা কোনো নতুন কথা নয়, বহুবার বলা হয়েছে...'

টোকা পড়ল দরজায়। 'জাফর সাহেব, আসুন, টেবিলে খাবার দিয়েছি।'

'এত তাড়াতাড়ি খাব?'

'হ্যাঁ, আসুন। আমার সময় নেই। বেরোতে হবে।'

'ঠিক আছে, যান, আসছি।' সালমার দিকে তাকাল জাফর, 'চলো, খেয়ে আসি। ঝামেলা কাটুক আগে। কথা বলার জন্য সারাটা রাতই পড়ে আছে।'

সালমা বলল, 'তুমি যাও। আমি ওর সামনে বসে খেতে পারব না।'

'যদি জিজ্ঞেস করে, কেন খাবে না?'

'বলবে, খুব মাথা ধরেছে। শুয়ে আছি।'

নিচে নেমে এলো জাফর।

পোলাও রান্না করেছে তরিকুল। আর মুরগির রোস্ট।

'এত তাড়াতাড়ি করলেন কী করে এতসব?' অবাক হয়েছে জাফর।

'আপনি যখন কটকছড়িতে গিয়েছিলেন, তখনই সব রেডি করে রেখেছিলাম। আপনার স্ত্রী এলো না?'

'ওর মাথা ধরেছে।'

'নাকি আমার সামনে খেতে চায় না?' হাসল তরিকুল। 'আপনি বসে যান। স্ত্রীকে ফেলে খাবেন তো?'

'তা খাব। কিন্তু খিদে লাগেনি এখনও ভালোমতো। তবু, আপনি যখন বলছেন, বসেই যাই।'

চামচে করে বাসনে পোলাও তুলে নিতে নিতে তরিকুল বলল, 'তাইলে গাছের ডালের কাঠবিড়ালিটার কথা ভেবেই বোধহয় খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে আপনার।'

তরল বরফ বয়ে গেল যেন জাফরের মেরুদণ্ডে। উদ্বেগ চাপা দেওয়ার জন্য মুরগির রানে কামড় বসাল। 'কাঠবিড়ালি? নাহ্, তখনই ভুলে গেছি ওটার কথা।'

চুপ হয়ে গেল তরিকুল। নীরবে খেয়ে চলল আবার। বাসনের খাবার শেষ করে জাফরকে জিজ্ঞেস করল, 'আর নেবেন না?'

মাথা নাড়ল জাফর। 'আরও! অনেক খেয়েছি।'

'বাবা বলত– বাটি আর প্লেট থেকে চেঁছেপুছে নিতে নিতে বলল তরিকুল– খাবার নষ্ট করবি না। বাবার কথা আমি মেনে চলি। কেন মানি জানেন? ভয়ে। খাবার না পাওয়ার ভয়ে। বাবা বলত, খাবার নষ্ট করলে ওগুলো নাকি বদদোয়া দেয়। খাবার পাব না ভাবলে আতঙ্ক লাগে আমার। পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে গিয়ে ডাস্টবিনের পচা নোংরা খেয়েছি। কাছেই দেখা যেত রেস্টুরেন্টে কাবাব বানাচ্ছে। কষ্টে পানি এসে যেত চোখে।' সত্যি সত্যি পানি দেখা গেল তরিকুলের চোখের কোনে। 'কম দুঃখে খারাপ হইনি, জাফর সাহেব! কে চায় পুলিশের রোলের বাড়ি খেতে, বলুন!'

বাসনটা ঠেলে সরাল জাফর। ঢকঢক করে পানি খেল এক গ্লাস।

তরিকুলের খাওয়া শেষ হয়নি। 'রেখে দিলেন যে? শেষ?'

'হ্যাঁ,' গ্লাসটা নামিয়ে রাখল জাফর। 'অনেক খেয়েছি।'

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল তরিকুল। সে নিশ্চিত, ইয়াকুব আলীর সঙ্গের সেই পুলিশটা রাইফেল নিয়ে গাছে উঠে বসে আছে। ওর ব্যবস্থা না করলে পালাতে পারবে না। গাড়িতে উঠতে গেলেই গুলি খেতে হবে।

হোলস্টার থেকে পিস্তলটা খুলে ভালোমতো পরীক্ষা করল ও। সন্তুষ্ট হয়ে আবার ঢুকিয়ে রাখল জায়গামতো। রান্নাঘরের আলো নিভিয়ে ছোট জানালার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল। চোখ বোলাল অন্ধকার ঝোপঝাড় আর গাছপালার ওপর। চাঁদ উঠছে। আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাংলোর সামনের চিলতে জায়গাটুকুতে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওপাশের বনভূমিও আলোকিত হয়ে উঠবে।

এটাই উপযুক্ত সময়।

জানালা খুলল ও। সিংকের ওপর উঠে জানালা গলে বেরিয়ে এলো নিঃশব্দে। গাছ থেকে এ জায়গাটা দেখা যায় না। লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। নেমেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। কান পেতে রইল। কোনো শব্দ নেই। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল কয়েক গজ। আবার নিথর হয়ে পড়ে রইল মাটিতে। ভেজা মাটি থেকে পানি শুষে নিয়ে ভিজে গেল শার্ট। কেয়ারই করল না ও। অন্ধকার ভালোমতো চোখে না সওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর আবার আগে বাড়ল। দ্রুত নিঃশব্দে সাপের মতো এগিয়ে চলল ও। গাছটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ, বাঁ দিকে। বেশ কিছুটা ঘুরে গিয়ে লোকটার পিছন থেকে ওর দিকে এগোবে।

গাছের পঞ্চাশ গজ দূরে এসে থামল ও। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ঝোপের নিচু ডালের পাতা লাগছে মাথায়। এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে গাছটা। ঘন পাতার ভিতরে চাঁদের আলো ঢুকতে পারছে না। ভিতরে কী আছে দেখা যায় না।

আনমনে মাথা ঝাঁকাল ও। ভালো জায়গা বেছে নিয়েছে লোকটা। এমন জায়গায় বসেছে, সে নিজে ঠিকই দেখতে পাবে বাংলোটা, কিন্তু তাকে দেখা যাবে না।

এগোতে হবে আরও।

পায়ের ঝিঁঝিঁধরা অসহ্য হয়ে উঠল। জ্বলতে শুরু করেছে যেন চামড়ার ভিতর। সঙ্গে করে কম্বল আনা উচিত ছিল। ভুল হয়ে গেছে, ভাবল মুশফিক। ভাঁজ করে ডালে বিছিয়ে নিলে এতটা কষ্ট হতো না। যাকগে, সেটা নিয়ে ভেবে আর এখন লাভ নেই। আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে লোকটা।

আস্তে করে কোলের ওপর থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে নলটা রাখল সামনের একটা দো-ডালার ফাঁকে, যাতে একটুও না কাঁপে নিশানা। সামান্য নড়েচড়ে বসল, স্বস্তি দিল অবশ হয়ে আসা পা দুটোকে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল।

কী মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে, জানল না!

দেখে ফেলেছে ওকে তরিকুল। মুচকি হেসে পিস্তল খুলে আনল হোলস্টার থেকে।

*

জাফরের মতোই চমকে গেছে সালমাও, 'পিস্তলের গুলি না!' লাফ দিয়ে উঠে জানালার কাছে ছুটে এলো ও।

'হ্যাঁ!' পাল্লা খুলে বড় বড় কয়েকটা গাছের দিকে তাকাল জাফর। ঝকঝকে জ্যোৎস্না। আলোকিত হয়ে উঠেছে বনভূমি। ভীষণ দুলে উঠতে দেখল একটা ডাল। আতঙ্কিত হয়ে দেখল ডালে ডালে বাড়ি খেয়ে নিচের ঝোপে আছড়ে পড়ল একটা ভারী কিছু। তারপর পড়ল আরেকটা জিনিস। প্রথমটা মানুষ, দ্বিতীয়টা রাইফেল।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল জাফর, 'মুশফিককে মেরে ফেলেছে!'

ঝোপের ভিতর থেকে তরিকুলকে বেরোতে দেখল জাফর। গাছের গোড়ায় গিয়ে লাথি মারল মুশফিকের লাশটাকে।

শিউরে উঠল জাফর। পাগলটা খেপে গেছে। ও আর এখন মানুষ নেই। তাকে দিয়ে এ মুহূর্তে সব সম্ভব!

'আলো জ্বালো!' গলা কাঁপছে জাফরের। 'চুপ করে থাকবে। ও যা বলে, করবে। কোনো তর্ক করবে না, বুঝেছ?'

আলো জ্বেলে দিল সালমা। ঝাঁজিয়ে উঠল, 'তুমি ওকে ভয় পাও, কিন্তু আমি পাই না। আমাকে কিছু করার আগেই গুলি করে মারব ওকে।'

চুপ হয়ে গেল জাফর। এ আরেক উন্মাদ। এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

সদর দরজা খোলার শব্দ হলো। বন্ধ হলো দড়াম করে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। উঠে আসছে তরিকুল। ওদের দরজার সামনে দিয়ে গিয়ে ঢুকল পাশের ঘরটায়, যেটাতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল ওকে।

পাশের বাথরুমে পানি পড়ার শব্দ হলো।

কেঁপে উঠল জাফর। মনে হলো, হাত থেকে রক্ত ধুচ্ছে খুনিটা! মুশফিকের রক্ত!,

পানি পড়ার শব্দ থেমে গেল। বেসুরো শিসের শব্দ হলো। আরও মিনিট পাঁচেক পর পায়ের শব্দ এসে থামল ওদের দরজার সামনে।

'এসে গেছে!' ফিসফিসিয়ে সালমাকে সাবধান করল জাফর। 'একটা ফালতু কথা বলবে না বলে দিলাম!'

ঝাঁঝিয়ে উঠতে গিয়েও কী ভেবে চুপ থাকল সালমা।

তালা খোলার শব্দ। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। গোসল করে গায়ের কাদা ধুয়ে এসেছে তরিকুল। জাফরের একটা বাদামি শার্ট আর নেভি-ব্লু জিন্স পরেছে। অন্ধকারে মিশে যাওয়ার জন্য এই রঙ বেছে নিয়েছে ও। এক এক করে তাকাল সালমা আর জাফরের মুখের দিকে। ঘরে ঢুকল।

'আপনার কাঠবিড়ালিটাকে মেরে রেখে এলাম, জাফর সাহেব। রাইফেল আর ওয়্যারলেস ছিল সঙ্গে,' জাফরের চোখের দিকে তাকাল তরিকুল। 'আজব কাঠবিড়ালি, কী বলেন?'

কথা বলার চেষ্টা করল জাফর। শব্দ বেরোল না।

'জাফর সাহেব, আমি চলে যাচ্ছি। এবার আর ধরা দেব না আমি ওদের হাতে। একটাই দুঃখ, আর কোনোদিন দেখা হবে না আপনার সঙ্গে।' হাসল তরিকুল। 'বিদায় জানাতে এলাম। অনেক সাহায্য করেছেন আমাকে। যতক্ষণ দম থাকবে, আপনার কথা ভুলব না।' হাত বাড়িয়ে দিল ও।

জাফর বাড়াল না।

নিজেই জাফরের হাতটা ধরে তুলে নিল তরিকুল। বিষণ্ন হাসি হেসে বলল, 'আপনি ভালো লোক, জাফর সাহেব। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না,' বলতে বলতেই প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল জাফরের চোয়ালে।

জাফরের মনে হলো হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। হাজারটা তারা জ্বলে উঠল মাথার মধ্যে। পড়ে গেল বেহুঁশ হয়ে।

চিৎকার করে উঠল সালমা।

তার দিকে তাকাল তরিকুল, 'আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, ম্যাডাম।'

আঁতকে উঠল সালমা, 'আমি!'

'হ্যাঁ। আপনি যতক্ষণ সঙ্গে থাকবেন, পুলিশ গুলি করার সাহস পাবে না।'

'আমি যাব না!'

জ্বলে উঠল জাফরের চোখ, 'দেখুন, এক কথা আমি দুবার বলা পছন্দ করি না!'

পিছিয়ে গেল সালমা।

ধমকে উঠল তরিকুল, 'মরতে চান?'

হাতব্যাগটার ওপর চোখ পড়ল সালমার। কী ভেবে তুলে নিল ওটা। তরিকুলের সামনে এসে দাঁড়াল, 'চলুন, কোথায় যেতে হবে।'

নিজের অকম্পিত নির্বিকার কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল সালমা।

সালমাকে আগে সিঁড়ি বেয়ে নামতে বলল তরিকুল। বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি চালাতে জানেন নিশ্চয়?'

'জানি।'

'যান, উঠুন। গাড়িটা আপনাকেই চালাতে হবে।'

বনের ভিতরের পথটাতে এসে গাড়ি থামিয়ে দিলেন ইয়াকুব আলী। মুশফিকের কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো ওয়্যারলেস খারাপ হয়েছে, এ কারণেই জবাব দিতে পারছে না। গাড়ি নিয়ে গেলে ইঞ্জিনের শব্দ কানে যাবে মুন্নার। এতসব আয়োজন বিফলে যাবে। আর তা হলে মুশফিক রাগ করবে তার ওপর।

কী করা যায় ভাবতে লাগলেন। হেঁটে যেতে পারেন, কিন্তু দুই মাইল হাঁটতে অনেক সময় লাগবে। অত সময় নষ্ট করা চলবে না। যেতে হবে তাড়াতাড়ি, আবার শব্দও করা চলবে না। বুদ্ধিটা মাথায় এলো। আবুল মিয়ার সাইকেলের গ্যারেজ! বেশি দূরে না। জিপ ঘুরিয়ে রওনা হলেন তিনি।

গ্যারেজের কাছে এসে গাড়ি থামালেন। ডাক দিলেন, 'আবুল মিয়া, ও আবুল মিয়া।'

ন্যাকড়ায় হাতের কালি মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো এক প্রৌঢ়। 'সেলাম, দারোগা সাহেব। তেল লাগবে?'

পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল সবই রাখে আবুল মিয়া। রাস্তায় কারও গাড়ির তেল ফুরালে, ওর কাছে পাওয়া যায়।

'না, আবুল মিয়া, তেল লাগবে না,' ইয়াকুব আলী বললেন। 'একটা সাইকেল দরকার। আছে?'

তাকিয়ে রইল আবুল মিয়া। বুঝতে পারছে না। 'সাইকেল?'

'হ্যাঁ, সাইকেল। মেরামতের জন্য দিয়ে যায় না। ওরকম একটা হলেই হবে। নেই?'

মাথা ঝাঁকাল আবুল মিয়া, 'আছে, কিন্তু...'

'আমার একটা সাইকেল দরকার কিছুক্ষণের জন্য।' বুঝিয়ে বললেন ইয়াকুব আলী। 'জরুরি।'

'আছে। নিয়ে আসছি।'

জিপ থেকে নামলেন ইয়াকুব আলী।

বাংলোর সদর দরজা খুলে গেছে। প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে জাফর। পড়ে গেল আছাড় খেয়ে। হাতে ভর দিয়ে উঠল আবার। মাতালের মতো এগিয়ে এসে মাথা উঁচু করে তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক।

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে দৌড় দিলেন ইয়াকুব আলী। চিৎকার করে ডাকলেন, 'জাফর!'

ঘুরে তাকাল জাফর। আবারও পড়ে যাচ্ছিল, ইয়াকুব আলীর কাঁধ খামচে ধরে ঠেকাল। 'দুলাভাই, ও চলে গেছে! সালমাকে নিয়ে গেছে! আমি বাধা দিতাম, তাই পিটিয়ে বেহুঁশ করে ফেলে গেছে আমাকে।'

চাঁদের আলোতে জাফরের চোয়ালের কালো দাগটা দেখতে পেলেন ইয়াকুব আলী। তরিকুল যেখানে ঘুষি মেরেছে, গোল হয়ে ফুলে উঠেছে।

'কতক্ষণ আগে গেছে?'

'পনেরো মিনিট,' ইয়াকুব আলীর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল জাফর। 'গাড়ি কোথায় আপনার? জলদি চলুন! সালমাকে নিয়ে গেছে ও...'

'গাড়ি আনিনি। সাইকেল নিয়ে এসেছি...'

'সর্বনাশ! আমার গাড়িটাও তো নিয়ে গেছে...'

'বসে থাকো তুমি এখানে। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি আসছি,' ঝোপের দিকে দৌড় দিলেন ইয়াকুব আলী।

জিপ নিয়ে তার ফিরে আসতে আধঘণ্টার বেশি লেগে গেল। লাফ দিয়ে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে বসল জাফর। চিৎকার করে বলল, 'চলুন! জলদি! অনেক দেরি হয়ে গেছে!'

রাস্তা এমনিতেই ভালো না, তার ওপর বৃষ্টি হয়েছে। শুরু হলো যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে গাড়ি চালানো। জায়গায় জায়গায় কাদা রয়ে গেছে এখনও। যেসব জায়গা শুকিয়েছে, উঁচুনিচু হয়ে আছে নদীর ঢেউয়ের মতো। ভয়াবহ ঝাঁকুনি খাচ্ছে গাড়ি। ড্রাইভিং তো নয়, যেন যুদ্ধ করা।

'যদ্দূর মনে হয় চিটাগাঙের দিকে যাবে ও,' জাফর জানাল। 'আমাকে খুন করতে চায়নি, তাই বেহুঁশ করে রেখে গেছে,' চোয়াল ব্যথা করছে তার। দাঁত লেগে গালের ভিতর দিকটা কেটেছে। কথা বলতেই রক্ত বেরোতে শুরু করল। থুহ্ করে ফেলল রক্তমাখা থুতু। কিন্তু ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, ওর একমাত্র চিন্তা এখন সালমা। সালমাকে বাঁচাতে হবে!

কাদায় চাকা পড়তে পিছলে গেল গাড়ি। কিছুতেই সামলাতে পারলেন না ইয়াকুব আলী। পাশে সরে গিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ছিঁড়ে গেল একপাশের উইং। অনেক কষ্টে গাড়িটাকে আবার সরিয়ে আনলেন।

বড় রাস্তায় উঠেই গাড়ি থামিয়ে আগে ওয়্যারলেস অন করলেন। কথা বলতে শুরু করলেন রাঙামাটির ওসির সঙ্গে।

'আমি শুনেছি,' ওসি সাহেব বললেন। 'আপনি বেরিয়ে যেতেই ফোন করেছেন আপনার স্ত্রী। ফোর্স পাঠিয়েছি। সব রাস্তা বন্ধ করে দেবে।'

'তার আগেই যদি বেরিয়ে যায়? জাফরের স্ত্রী সালমাকে জিম্মি করে নিয়ে গেছে,' ইয়াকুব আলী জানালেন। 'চিটাগাং যাবে মনে হয়।'

'ঠিক আছে, তারও ব্যবস্থা করছি। আপনি কি যাচ্ছেন ওদিকে?'

'হ্যাঁ।'

※

কাঁচা রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে সালমা।

'তাড়াতাড়ি করুন!' ধমকে উঠল তরিকুল। হেডলাইটের আলো পড়েছে ভিজে নরম হয়ে থাকা মাটিতে। সালমার পাশে প্যাসেঞ্জার সিটে বসে সামনে তাকিয়ে আছে ও।

আরেকটু গতি বাড়াল সালমা। এর বেশি বাড়ানোর উপায় নেই। মাথার ভিতরে এক ধরনের ভোঁতা অনুভূতি, বেপরোয়া ভঙ্গি।

সামনে থকথকে কাদা। গাড়ির চাকা কাদায় ভরা গর্তে পড়লে তোলা কঠিন হবে। দেবে নাকি নামিয়ে? গাড়ি আটকে যাবে, ওই সুযোগে হাতব্যাগ থেকে পিস্তলটা...

'করেন কী!' ধমক দিল তরিকুল। 'কাদায় ফেলার ইচ্ছে

নাকি? ডানে কাটুন।'

গতি না কমিয়ে ডানে কেটে কাদা পার করে আনল সালমা।'

'গাড়ি আপনি ভালোই চালান,' সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল তরিকুল।

সালমা কিছু বলল না। আরও কিছুটা গতি বাড়াল। মিনিট দশেকেই পৌঁছে গেল হাইওয়ের কাছে।

'থামুন!' কর্কশ কণ্ঠে বলল তরিকুল। 'আলো নেভান!'

গাড়ি থামাল সালমা। হেডলাইট অফ করে দিল। গাঢ় অন্ধকারে পাশাপাশি বসে আছে দুজনে। তরিকুলের ভারি নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছে ও। নাকে আসছে ঘামের গন্ধ।

এটাই সুযোগ। আস্তে করে ডান হাতটা স্টিয়ারিং থেকে সরিয়ে এনে রাখল পাশে ফেলে রাখা হাতব্যাগের ওপর। চেন খুলতে হবে। এক হাত দিয়ে খোলা অসম্ভব না হলেও কাজটা হবে খুব কঠিন। সাবধানে সারতে হবে। চেন খোলার শব্দ হলে টের পেয়ে যাবে তরিকুল।

চেন খোলার জন্য সবে ওপেনারটা দু'আঙুলে টিপে ধরেছে, কথা বলে উঠল তরিকুল, 'চালান। বড় রাস্তা পার হলে ওপাশে একটা কাঁচা রাস্তা দেখবেন, ওটাতে নামাবেন গাড়ি। যান, এগোন।'

'ওটা তো চিটাগাঙের রাস্তা নয়,' ব্যাগের ওপর থেকে হাত সরিয়ে আনল সালমা।

ধমকে উঠল তরিকুল, 'যা বলছি, করুন!' ও জানে, জাফরের হুঁশ ফিরলেই পুলিশকে ফোন করবে। রোডব্লক দেবে পুলিশ। সুতরাং সোজা পথে যাওয়া চলবে না। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘুরপথে রোডব্লক পার হবে। ওপাশে গিয়ে আবার উঠবে রাস্তায়।

ডানে-বাঁয়ে তাকাল তরিকুল। কোনো গাড়ি আসতে দেখল না। রাস্তা পেরোতে বলল সালমাকে।

হেডলাইটের আলোয় রাস্তার ওপাশে নেমে যাওয়া কাঁচা রাস্তাটা দেখতে পেল সালমা। চোখের পলকে হাইওয়ে পেরিয়ে বুনোপথে নেমে পড়ল গাড়ি। এবড়ো-খেবড়ো অসমতল পথে ঝাঁকুনি শুরু হতেই গতি কমিয়ে দিল ও।

'আস্তে চালান,' তরিকুল বলল। 'অত তাড়াহুড়া নেই আর।'

আড়চোখে তরিকুলের দিকে তাকাল সালমা। শরীর ঢিল করে দিয়ে বসেছে লোকটা। বেসুরো শিস দিতে আরম্ভ করেছে।

সামনে তাকিয়ে আছে সালমা। পথের দুপাশে ঘন ঝোপ, বুনো ফুল ফুটে আছে। চাঁদের আলোয় রঙ বোঝা যাচ্ছে না। রাতের বাতাসে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে হালকা এক-আধ ঝলক মিষ্টি সুবাস। গাছটা চোখে পড়তেই হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল ওর। শ'খানেক গজ দূরে বিরাট এক শিমুল গাছ।

ওটাতেই হবে। যদিও ঝুঁকিটা সাংঘাতিক। একটু এদিক ওদিক কিংবা হিসাবের ভুল হলে দুজনেই মারা যাবে। কিন্তু আর কোনো উপায়ও নেই। ওখানেই শেষ করতে হবে এই খেলা।

মাইল মিটারের দিকে তাকাল ও। ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার। মন শক্ত করল। গাছটার কাছাকাছি এসে আচমকা চাপ বাড়াল গ্যাস পেডালে। খেপা ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠল গাড়ি। সিটে পিঠ চেপে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরল ও।

'কী করেন!' চিৎকার করে উঠল তরিকুল।

ততক্ষণে গাছের দিকে গাড়ির নাক ঘুরে গেছে। তরিকুল বাধা দেবার আগেই তীব্র গতিতে গাছের গায়ে গুঁতো মারল। শুধু তরিকুলের পাশটাতেই গুঁতো লাগাতে চেয়েছিল সালমা। লাগিয়েছেও। কিন্তু এ রকম ভয়ঙ্কর গতিবেগে ধাক্কা লাগিয়ে সে নিজেও নিস্তার পায়নি। কাচ ভাঙার ও গাড়ির বডি দুমড়ে যাওয়ার বিদঘুটে শব্দ হলো।

ধাক্কাটা বেশি লাগল তরিকুলের দিকেই। সামনের দিকে ছুড়ে দিল যেন তাকে তীব্র গতিবেগ। প্যানেলে ঠুকে গেল মাথা। পরক্ষণে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ফিরে এসে পড়ল সিটের ওপর। জ্ঞান হারাল।

স্টিয়ারিংয়ে কপাল ঠুকে গিয়ে সালমাও জ্ঞান হারাল। বেঁচে যাওয়াটা দুজনের জন্যই অলৌকিক ব্যাপার। তরিকুলের চেয়ে কম ব্যথা পেয়েছে সালমা। তাই আগে হুঁশ ফিরল তার। পাশে কোনো নড়াচড়া নেই। ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে তরিকুলের দিকে তাকাল। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না গাড়ির ভিতরে এসে পড়েছে। সেই আলোয় দেখল, নেতিয়ে পড়ে আছে লোকটা। মরে গিয়ে না থাকলে মৃত্যুটা নিশ্চিত করতে হবে। দুপুরবেলা ওকে যখন ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সালমা, লোকটার ব্যঙ্গভরা চাহনিটা কল্পনা করে তখনকার মতোই মাথায় আগুন ধরে গেল ওর।

একপাশে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা খুঁজল।

ব্যাগটা পেল না আগের জায়গায়। দুমড়ে, বেঁকে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে ড্যাশবোর্ড। বাঁকা হয়ে যাওয়া ব্রেক পেডালের কাছে পাওয়া গেল ব্যাগটা।

তরিকুলের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে ওটা তুলে আনল সালমা। জিপার টানল। কিছুটা খুলে আটকে গেল চেন। টানাটানি করে খুলে পিস্তলের জন্য ভিতরে হাত ঢুকিয়েছে সালাম, আর তরিকুলও নড়ে উঠল। মুখ তুলে তাকাল সালমার দিকে। তরিকুলের কপাল কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।

সালমা পিস্তল তুলতেই ঝট করে সোজা হয়ে গেল তরিকুল। সাপের মতো ছোবল মারল যেন ওর হাত। থাবা লেগে পিস্তলটা উড়ে চলে গেল জানালা দিয়ে। চিৎকার করে উঠল সালমা।

ঘুষি মারল তরিকুল।

কানের পাশে লাগল ঘুষিটা। যন্ত্রণা টের পেল না সালমা। দুলে উঠল মাথাটা। চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু। গলায় চাপ অনুভব করল।

গুলির শব্দ শুনে চোখ মেলল ও। দেখে জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে একটা পিস্তলধরা হাত।

সালমার গলায় ভয়াবহ চাপ। শ্বাস নিতে পারছে না। ওর গলা টিপে ধরেছে তরিকুল।

বহু চেষ্টা করেও ছুটাতে পারল না সালমা। এরই মাঝে কানে এলো ইয়াকুব আলীর চিৎকার, 'আজ তোকে ছাড়ব না আমি, শয়তান!'

ছটফট করছে সালমা। কিন্তু সাঁড়াশির মতো কঠিন আঙুলের চাপ থেকে মুক্ত করতে পারল না নিজেকে। চোখের সামনে পুরোপুরি আঁধার নামার আগে শেষবারের মতো একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল ও।

*

বহু কষ্টে মৃত তরিকুলের সাঁড়াশি-আঙুল খুলে সালমাকে যখন বের করল জাফর, দেরি হয়ে গেছে অনেক। তরিকুলের মতোই নিথর হয়ে গেছে সালমা। নিষ্প্রাণ। স্তব্ধ।

দিগন্তে ঢলে পড়েছে চাঁদ। শেষ রাতের জ্যোৎস্নার আলো ফিকে হয়ে এসেছে। যাই যাই করেও যেতে চাইছে না। কোনোমতেই মায়া কাটাতে পারছে না যেন মাটির পৃথিবীর। ❖

কড়াদের গ্রাম

ছবি : : সালেক খোকন

নৃগোষ্ঠী

রাজীব নূর

কড়াদের শেষ ৮৫ জন

বাংলা ছাড়াও বাংলাদেশে আরও অনেক ভাষা আছে। সেসব ভাষায় শিক্ষা এবং ভাষার চর্চা ও ইতিহাস নিয়ে ধারাবাহিক একটি প্রতিবেদন করেছিলাম ২০১৫ সালে। ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছিল সমকালে। সম্ভবত তারও মাসখানেক আগের কথা। প্রতিবেদন তৈরির প্রস্তুতিপর্বে একদিন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে কথা হচ্ছিল বন্ধুবর আহমেদ শামীমের সঙ্গে। জানা ছিল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র, তখন উচ্চতর গবেষণার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী শামীম আদিবাসীদের কোনো একটি গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে পিএইচডি করছেন। নিতান্ত কৌতূহলের বশে কোন ভাষা নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন তা জানতে চাওয়া। শামীম জানালেন, তিনি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ লিখছেন কডাদের ভাষা নিয়ে। আরেক বন্ধু সালেক খোকনের লেখালেখির সূত্রে দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় বসবাসকারী কড়াদের কথা জানা ছিল। তাই সংশয় হলো, শামীম হয়তো কড়া লিখতে গিয়ে কডা লিখে ফেলেছেন। শামীম আবারও নিশ্চিত করলেন তাঁর গবেষণার বিষয় কড়াদের নয়, কডাদের ভাষা। কডারা দিনাজপুরে নয়, বাস করে রাজশাহীর পুঠিয়া ও তানোরে।



আহমেদ শামীম জানালেন, মুন্ডা ভাষা পরিবারের একটি ভাষা এটি, ভাষাভাষীদের জাতিপরিচয় কডা এবং ভাষার নামও কডা। শামীমের পিএইচডি গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অধ্যাপক জুলিয়েট বেভিন্স তাঁকে ভাষাটি নিয়ে সরেজমিন খোঁজখবর করার পরামর্শ দেন। মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধানের পর শামীম নিশ্চিত হন এটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা। এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল নামে আন্তর্জাতিকভাবে ভাষা নিয়ে গবেষণার জন্য স্বীকৃত একটি প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশবিষয়ক গবেষণায়ও কডাকে একটি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরে পুঠিয়ার কডা ভাষাভাষী অরুণ কডা ও সোহাগ কডার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, রাজশাহী ছাড়া আর কোথাও কডারা নেই। রাজশাহীর পুঠিয়া, তানোর ও মোহনপুরে বসবাসকারী কডাদের সংখ্যা হবে ১ হাজার ৩০০ জনের মতো।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ সিকদার, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, সেভ দ্য চিলড্রেনের আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত শিশুর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের পরিচালক মেহেরুন্নাহার স্বপ্না, আন্তর্জাতিক

মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক পুলক বরণ চাকমা, গবেষক পাভেল পার্থ ছাড়াও আদিবাসীদের ভাষা নিয়ে কাজ করেন এমন অনেকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, কড়াদের কথা জানা নেই তাদের। রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, 'আমার ধারণা দিনাজপুরের কড়াদেরই কোথাও কোথাও কডা বলা হয়ে থাকে।' তবে আদিবাসীবিষয়ক গবেষক সালেক খোকন নিশ্চিত করলেন, 'কড়া এবং কডা দুটি আলাদা ভাষাভাষী জাতি।'

অবশেষে লেখক-গবেষক সালেক খোকন ও উন্নয়নকর্মী মুস্তাফিজুর রহমান রূপমের সঙ্গে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরের একদিন দুপুরের আগে আগে পৌঁছাই সীমান্তবর্তী ঝিনাইকুড়ি গ্রামে। পাড়ায় ঢুকতে পথে দেখা হলো কৃষ্ণ কড়ার সঙ্গে। কড়াদের সবচেয়ে উচ্চশিক্ষিত এই মানুষটিও স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। তিনি যাচ্ছিলেন জমিতে পানি দেওয়ার কাজ তদারকির জন্য। সালেক খোকনের পূর্বপরিচিত হওয়ায় থামলেন কৃষ্ণ। চাকরি সূত্রে খোকনের দিনাজপুরে আসা। বেশ কয়েক বছর ধরে আছেন বিরলে।

সালেক খোকনের কাছ থেকেই জানা হয়েছিল মাত্র ১৬টি কড়া পরিবার বাস করে গ্রামটিতে। কিন্তু সরেজমিন বিরল উপজেলার হালজায় মৌজার ঝিনাইকুড়ি গ্রামে গিয়ে জানা গেল, দুই তরুণের বিয়ের পর এখন এখানে পরিবারের সংখ্যা হয়েছে ১৮। কড়াদের আরও তিনটি পরিবারের একটি আছে বিরলের বৈরাগীপাড়ায় এবং দুটি দিনাজপুর সদর উপজেলার ঘুঘুডাঙার খাড়িপাড়ায়। সব মিলিয়ে এই ২১ পরিবার না থাকলে বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে যাবে একটি জাতি। সেই সঙ্গে একটি ভাষাও।

শেষ পর্যন্ত দেশে টিকে থাকতে পারবে কি-না তা নিয়ে সংশয়ে আছে ঝিনাইকুড়ির কড়ারা। এমনকি মূলত আদিবাসীদের গ্রাম ঝিনাইকুড়িতেও অন্য আদিবাসীদের তুলনায় বেশি নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে হয় কড়াদের। গ্রামটিতে সাঁওতালরা সংখ্যায় বেশি। ওঁরাও, ভুনজার, মুণ্ডাসহ অন্য আদিবাসীরাও আছে। একসময় এ গ্রামেই কড়াদের ২০০ পরিবারের বসবাস ছিল। মূলত ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধের কারণেই স্বতন্ত্র ধর্ম ও ভাষাভাষী এ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক চলে গেছে ভারতে।

কৃষ্ণ কড়ার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতেই জানা হলো এসব। খোকনের সঙ্গে কৃষ্ণের পূর্বপরিচয়ের কারণে আলাপের শুরুতেই একটা সহজ পরিবেশ তৈরি হয় এবং জমির মালিকানা ধরে রাখতে পারা নিয়ে সংশয়ের কথা জানান তিনি। কৃষ্ণ কড়ার বিঘা তিনেক জমি এখনও অবশিষ্ট আছে। সেই জমিতে চাষাবাদ করে চলে তাদের সংসার। বংশপরম্পরায় যে জমির মালিক কৃষ্ণ ও তার পরিবার, সেই জমির দাবিদার হয়ে কৃষ্ণদের মামলায় ঝুলিয়ে রেখেছেন স্থানীয় প্রভাবশালী হান্নান মাস্টার ও রিয়াজ মাস্টার। শুধু চাষের জমি নয়, প্রভাবশালী ওই মহলটির লোলুপদৃষ্টি পড়েছে কড়াদের বসতবাড়িতেও। জমিতে যাওয়া স্থগিত রেখে কৃষ্ণ আমাদের নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে। বাড়ির পাশে ছোট্ট একটা মজাপুকুর। তার পারে কৃষ্ণ নতুন একটা ঘর তুলতে চেয়েছিলেন। ঘর তুলতে দেওয়া হয়নি, উল্টো মারধর করা হয়েছে তাকে। প্রভাবশালী মুসলমানদের হাতে মারধর খাওয়ার ঘটনা কড়াদের কাছে নতুন কিছু নয়। কৃষ্ণের বাবা সীতা কড়াও বহুবার এমন নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। মারা যাওয়ার কয়েক মাস আগে সীতা কড়াকে চরম নির্যাতন করেছিল ওই মাস্টারদের লাঠিয়ালরা। ঘর তুলতে দেওয়া হয়নি কিনা কড়াকেও। কৃষ্ণ কড়ার বাড়িতেই দেখা হলো কিনা কড়ার সঙ্গে। কিনা ঝিনাইকুড়িতে আশ্রিত মানুষ। তার নিজের বাড়ি ছিল আরও ভেতরে চকফসল নামে একটি গ্রামে। সেখানে এখনও তার চার বিঘা জমি রয়েছে। চকফসলের যে বাড়িটায় তারা থাকতেন, সেই ভিটে কেটে সমান করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে এখন চাষাবাদ করে দখলদাররা। কিনা কড়ার প্রতিবেশীরা সবাই পাশের দেশ ভারতে চলে গেলেও কিনা কড়া এসে আশ্রয় নিয়েছেন পাশের গ্রাম ঝিনাইকুড়িতে। ছোট্ট ঘরে তার সংসার। ছেলে অর্জুন কড়া বিয়ে করার পর এক আত্মীয়ের জায়গায় ঘর তৈরি করতে গিয়ে মাস্টার পরিবারের বাধার কারণে পারলেন না। কড়াদের ১৮ পরিবারের ঘরে ঘরে ঘুরে জানা গেল তাদের নিদারুণ দারিদ্র্য ও সংগ্রামের গল্প।

ঘর বলতে কড়াদের পাড়ায় কোনো রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁইকে বোঝায়। সব কয়টি ঘরই মাটির তৈরি। ওপরে ছনের চাল। তবে মাটির ঘরে রঙের প্রলেপ তাদের সৌন্দর্যবোধকেই যেন প্রকাশ করে। অর্জুনের জন্য বিবাহযোগ্য পাত্রী পাওয়া গেল না কড়াদের মধ্যে। তাই বাধ্য হয়ে ভুনজারদের ঘর থেকে মেয়ে এনেছেন। অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে দিয়ে ওঁরাওদের একটি মেয়েকে আনা হয়েছে ঝিনাইকুড়ির কড়াদের পাড়ায়। আদিবাসী গবেষক সালেক খোকন বললেন, তিনি খোঁজখবর করে নিশ্চিত হয়েছেন, দিনাজপুর ছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও কড়াদের অস্তিত্ব নেই। কড়াদের স্বজাতিতে বিয়ে করাই নিয়ম। দিনাজপুরের কড়ারা এখন বাধ্য হয়ে অন্য জাতিতে বিয়ে দিচ্ছেন। যদি অন্য কোথাও কড়ারা থাকত, তারা নিজেদের গরজেই কড়াদের খুঁজে বের করে আনত। ঝিনাইকুড়ি গ্রামটি একেবারেই সীমান্তলগ্ন একটি এলাকা। একটু কোনাকুনি এক-দেড় কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই ভারতীয় সীমান্ত।

জানা গেল, একসময় শুধু দিনাজপুর নয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জেও কড়াদের কয়েকটি গ্রাম ছিল। নানা কারণে এরা পাড়ি জমায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। ভারতের ঝাড়খণ্ডের দুমকা, গোড্ডা, পাকুর, শাহীবগঞ্জ, হাজারীবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও কড়াদের একাধিক গ্রাম রয়েছে।

কড়ারা তাদের ভাষাটিকে কড়া ভাষা বলে দাবি করে। সালেক খোকন বলেন, তার নিজেরও মনে হয়েছে, কড়াদের ভাষার সঙ্গে ওঁরাওদের কুড়ুখ ভাষার শব্দগত মিল থাকলেও, তা স্বতন্ত্র একটি ভাষা। স্বতন্ত্র ধর্ম ও ভাষাভাষী কড়াদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোনো স্বীকৃতি নেই। তিনি জানান, কড়াদের নাম নেই বিভিন্ন আদিবাসী তথা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও শ্রেণির জনগণের সরকারি তালিকায়। কড়াদের একটি স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ে উদ্যোগ নিয়েছেন ওই এলাকার সাংসদ খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

ঝিনাইকুড়ি থেকে ফিরে কথা বলি খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি বলেন, কড়া নামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষজনকে বহুকাল ধরে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যে কয়েকটি পরিবার রয়ে গেছে, তাদের টিকিয়ে রাখতে হলে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। তিনি কড়াদের জন্য সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছেন। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাগুলো যেন কড়াদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। তবে তার মতে, এ সবকিছুর আগে কড়ারা যে আলাদা একটি জাতির মানুষ, তাদের যে নিজস্ব ভাষা ও ধর্মবিশ্বাস রয়েছে, সেগুলোর স্বীকৃতি প্রয়োজন। দিনাজপুর-২ (বিরল-বোচাগঞ্জ) আসনের এই সাংসদ এরই মধ্যে কড়াদের স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি লিখিতভাবে আদিবাসীবিষয়ক সংসদীয় ককাস ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছেন বলে জানালেন। তার মতে, সরকারি স্বীকৃতি পেলে তাদের রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে। ❖

তুলসীতলায় ওরাঁও বৃদ্ধা মুংলী তির্কী

ছবি : : লেখক



নৃগোষ্ঠী



সালেক খোকন

ওরাঁওদের বিপন্নতার গদ্য

দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। মধ্য বিকেল। দিনাজপুরের সীমান্তবর্তী টিনপাড়া গ্রামটি প্রায় পুরুষশূন্য। হাঁকডাক দিয়েও ওই ওরাঁও গ্রামটিতে কোনো পুরুষের দেখা মিলল না। হাট বসেছে পাশের বহবলদীঘি বাজারে। তাই সেখানে নানা জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছেন এ গ্রামের পুরুষেরা। কৃষি পেশা তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। নানা কারণে জমি হারিয়ে জীবিকার তাগিদে তারা অনেকেই এখন যুক্ত হয়েছেন নানা ব্যবসায়।

এ গ্রামের ওরাঁওদের আজ সাহরাই উৎসব। গ্রামটিতে পা রেখে কোথাও উৎসবের ছিটেফোঁটা চোখে পড়ল না। তবে একটি বাড়ির এক কোণে মাটি লেপা তুলসীতলা। সেখানে জল ছিটিয়ে

গৃহঠাকুরকে ভক্তি করছেন এক বৃদ্ধা। নামটি তিনি নিজেই জানালেন।

মুংলী তির্কী। বয়স আশির মতো। চোখেমুখের চামড়া ভাঁজখাওয়া। ভাঁজের পল্লতে পরতে যেন ইতিহাস লুকানো। আমাদের চোখ আটকে যাচ্ছিল সেদিকে। তিনি বললেন, সকাল-সন্ধ্যায় তুলসীতলার এমন আচার চলে টিনপাড়ার ওরাঁও বাড়িগুলোতে। তবে সব পরিবারে নয়। কেন? উত্তরে প্রথমে দীর্ঘনিশ্বাস, অতঃপর মুংলী হড়হড় করে বলতে থাকলেন।

এক সময় শতাধিক পরিবারের বসবাস থাকলেও এ গ্রামে এখন রয়েছে মাত্র বিশটি ওরাঁও পরিবার। স্থানীয় বাঙালিদের থেকে নিজের জমিজমা টেকাতে না পেরে বাকিরা চলে গেছেন কাঁটাতারের ওপারে, ভারতে। এই বিশ ওরাঁও পরিবারের মধ্যে পাঁচ পরিবার খ্রিষ্ট আর তিন পরিবার বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। সীমাহীন দারিদ্র্য আজ বাসা বেঁধেছে ওরাঁও সমাজে। ফলে তারা অভাবের তাড়নায় টিকিয়ে রাখতে পারছেন না পূর্বপুরুষদের আদি সনাতন ধর্মবিশ্বাসটিকে। ধর্মান্তরিত ওরাঁওরা উৎসবে শুধু নাচগান পর্বে অংশ নিলেও বাকি আচারগুলো তাদের কাছে এখন শুধুই কুসংস্কার। ফলে বুকের ভেতর এক ধরনের জমানো কষ্ট নিয়ে জীবন পার করছে টিনপাড়াসহ সারাদেশের ওরাঁওরা।

আমরা সাহরাই উৎসবের অপেক্ষায় থাকি। মনের ভেতর তখন ঘুরপাক খায় ইতিহাসে– ওরাঁওদের আগমনের নানা তথ্য। ওরাঁওরা এ উপমহাদেশের ভূমিজসন্তান। তারা বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে কংকা নদীর উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করে কনাটকা হয়ে অমরকন্টক ফরেস্ট রেঞ্জে এসে পৌঁছায়। অনেকেই মনে করেন, খ্রিষ্ট জন্মের ১৭৫০ বছর আগে হরপ্পা থেকে ওরাঁওরা শাহাবাদের রোহটাস অঞ্চলে চলে আসে। যা বর্তমানে হরিয়ানা এবং যমুনার সমতলভূমি হিসেবে পরিচিত। শারীরিক গঠন ও ভাষাগত বিচারে ওরাঁওরা দ্রাবিড়িয়ান গোষ্ঠীভুক্ত। তাদের বসবাস ছিল ভারতের উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও রাজমহল অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায়। দেশ ভাগের আগেও দিনাজপুরে বহু সংখ্যক ওরাঁওয়ের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন দলিলে। ১৭৮০-১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দের কথা। ওই সময় দিনাজপুরের রাজজমিদারির দেওয়ান ছিলেন দেবী সিংহ। তিনি তার খেয়াল খুশিমতো ধার্যকৃত খাজনা আদায় করতে কৃষকদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালান। ফলে ওই সময় গোটা উত্তরবঙ্গই কৃষকশূন্য হয়ে পড়ে। এতে অনাবাদি অবস্থায় পড়ে থাকে ফসলি জমিগুলো। দেবী সিংহের পতনের পর দেওয়ান নিযুক্ত হন রাজমাতুল জানকিরাম। তিনি অনাবাদি জমি চাষাবাদের জন্য সাঁওতাল পরগনা, ছোট নাগপুর, দুমকা, রাজমহল প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আদিব াসী কৃষক ও শ্রমিক নিয়ে আসেন এবং তাদের খাজনামুক্ত জমির বন্দোবস্ত দেন। এভাবেই দিনাজপুরে আগমন ঘটে ওরাঁওদের।

সন্ধ্যা হয় হয়। ওরাঁও গ্রামের পুরুষেরাও ফিরতে শুরু করেন। গোত্রের মহত নিপেন টিগ্গা হাসিমুখে সঙ্গ দেন আমাদের। তিনি জানালেন লুপ্ত হওয়া তাদের গ্রাম পরিষদের কথা। এক সময় ওরাঁও গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল তাদের নিজস্ব গ্রাম পরিষদের হাতে।

হঠাৎ ঢোল-মাদলের বাদ্যি। উঠোনের এককোণে একদল ওরাঁও আদিবাসী গাইছে। যে গানের ভাবার্থ হয় : 'বাড়িওয়ালা তুমি বাতি জ্বালিয়ে কী করো, কিসের জন্য বাতি জ্বালাও, বাতি জ্বালিয়ে গোয়ালে গরুগুলোকে জাগিয়ে তুলছি এবং পরে কৃষককে জাগিয়ে তুলব পূজার জন্য।'

সময়টা ছিল আশ্বিনের চাঁদের অমাবস্যার পরের দিন : এ দিনেই ওরাঁওরা গবাদিপশুর কল্যাণে 'সাহরাই' উৎসব পালন করে থাকে। উৎসবটি তিন দিনের। গানের সুরে সুরে তারা একে একে ঘরে, উঠানে, গোবর ফেলার জায়গাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রদীপ জ্বালায়। এটিই উৎসবের প্রথম দিনের আনুষ্ঠানিকতা। মহত জানালেন, দ্বিতীয় দিন গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতিকে স্নান করিয়ে তেল ও সিঁদুর মাখানো হয়। লাঙল, জোয়ালসহ চাষাবাদের সব যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে মাখানো হয় সিঁদুরের রঙ। তৃতীয় দিন মূল পূজার আগেই তারা গোয়াল মাটি দিয়ে লেপে পরিষ্কার করে। শালবন থেকে উলুর ঢিবির মাটি এনে তিন ভাগে উঁচু করে দেয় মেঝেতে। পূজা শেষে প্রথমেই গরু-ছাগলকে খাওয়ানো হয়। এরপর বাড়ির সবাইকে গোয়াল ঘরে বসেই সেরে নিতে হয় খাওয়া-দাওয়া।

এ গ্রামের ওরাঁওরা দুটি ভাষায় কথা বলে। একটি 'কুঁড়ুখ' অপরটি 'সাদরী' ভাষা। মুংলী আমাদের বুঝিয়ে দেন তাদের ভাষাটিকে। কারও নাম জানতে ওরাঁওরা কুঁড়ুখ ভাষায় বলে–'নিহাই নাম এন্দা', আর সাদরী ভাষায় বলে, 'তোর নাম কা'। মায়ের ঘুম পাড়ানি গান আর বাবার আদর ও বকুনি থেকেই ওরাঁও শিশুরা শিখে নেয় তাদের মাতৃভাষাটিকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ওরাঁও ভাষা রক্ষার কোনো উদ্যোগও নেওয়া হয়নি অদ্যাবধি।

টিনপাড়ার ওরাঁও গ্রামে আদিবাসী শিশুর সংখ্যা ত্রিশ। তাদের কেউই অষ্টম শ্রেণী অতিক্রম করতে পারেনি। আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা না থাকা, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়েও কোনো আদিবাসী শিক্ষক না থাকাই এর প্রধান কারণ। ফলে পঞ্চম শ্রেণীর আগেই ঝরে পড়ছে অধিকাংশ আদিবাসী শিশু। আবার আশপাশে বাংলা ভাষাভাষীর প্রভাবে ওরাঁওদের মাতৃভাষাটিও আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। গ্রামের প্রবীণ আদিবাসীরা নিজ ভাষায় কথা বললেও নতুন প্রজন্মের ওরাঁওরা তাদের ভাষাটির ব্যবহার জানে খুবই সামান্য। ফলে ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়ছে ওরাঁওদের ভাষাটি।

কথায় কথায় আমাদের চোখ পড়ে মুংলী, মায়া ও পারলোর কপাল ও গলায়। সবার কপাল ও ঘাড়ের চামড়ায় হালকা কালো রঙের দাগ। কিসের দাগ এটি? প্রশ্ন করতেই মুংলী বললেন, এটি 'উল্কি'। ওরাঁওরা গায়ে উল্কি আঁকেন। এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। পাশে বসা পারলো টিগ্গা বলেন উল্কি নিয়ে ওরাঁওদের নানা বিশ্বাস ও আচারের কথা। বারো-চৌদ্দ বছর বয়স হলেই ওরাঁওদের বিশেষ নিয়ম মেনে নারী-পুরুষ উভয়ের শরীরে উল্কি আঁকতে হয়। আদিকালে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে শনাক্তকরণের একমাত্র চিহ্ন ছিল এই উল্কি। ওরাঁওরা বিশ্বাস করে কোনো নারী বা পুরুষ যদি উল্কিবিহীন মারা যায় তবে যমরাজা তাকে মানবরূপে গ্রহণ করে না। ফলে অনন্তকাল তাকে নরকে পড়ে থাকতে হয়।

ওরাঁও আদিবাসী সমাজে গোত্র রয়েছে বিশটির মতো। একই গোত্রের সবাই সমতুল্য বলেই এরা বিশ্বাস করে। তাই এদের একই গোত্রে বিয়ে সম্পন্ন নিষিদ্ধ ও পাপ হিসেবে গণ্য। সংখ্যায় কমে যাওয়ায় এ অঞ্চলে এখন শুধু একই গোত্রেই নয়, ওরাঁওদের বিয়ে হচ্ছে কড়া, মুন্ডা, তুরি প্রভৃতি আদিবাসীর সঙ্গে। ফলে ওরাঁও বিয়ের আদি রীতিগুলোও পাল্টে যাচ্ছে অন্য জাতির সংমিশ্রণে। রাত বাড়তে থাকে। আমাদের মুখে মুখে তখন ওরাঁও বিশ্বাসের নানা কাহিনী। থেমে থেমে বাজছে ঢোল-মাদল। ❖

জনিক নকরেক– শতবর্ষী এই মানুষটি নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাংসারেকদের ছবি : : লেখক

ফারহা তানজীম তিতিল

হারানো সাংসারেক



নৃগোষ্ঠী

মিসি আপিলপা সালজং গালাপার ছিল নানা রকম খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার। একদিন তিনি বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে দেখা হয় আনি আপিলপা চিনি গালাপার সঙ্গে। নামের মিল থাকায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আলাপ-আলোচনার ফাঁকে তারা খেতে বসলেন দংক্রেং নামের এক গাছের নিচে। আনি আপিলপা চিনি গালাপার ঝোলা থেকে বের হলো শুধু বনআলু। মিসি আপিলপা সালজং গালাপার খুব করুণা হলো। তিনি নিজের আনা সুস্বাদু মাছ-মাংসের তরকারি খেতে দিলেন বন্ধুকে। জানতে চাইলেন আনি আপিলপা জুম চাষ করেন কি-না। ধান, কাউন এসবের চাষ করেন কি-না। আনি আপিলপা এসব ফসলের নাম জানতেন না। মিসি আপিলপা সালজং বললেন, আমি তোমার জন্য বীজ পাঠাব, তবে যখন ধান হবে তুমি আমাকে স্মরণ করবে। পরে মিসি আপিলপা সালজং ভৃত্যকে দিয়ে আনি আপিলপার জন্য ধানের বীজ পাঠালেন। ভৃত্যটি ঈর্ষাবশত বীজগুলোকে ভিজিয়ে তারপর পৌঁছে দিল আনি আপিলপার কাছে। পরের বছর ফসল ফলল না, তাই আনি আপিলপা ফসল উৎসর্গও করলেন না। ভুল বোঝাবুঝি হলো দু'জনের। তারপরে অবশ্য ঝগড়া এবং ভুল বোঝাবুঝির অবসান হলো। চমৎকার ধান জন্মাল। আনি আপিলপা সেই ধান প্রথমেই আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে মিসি সালজংকে উৎসর্গ করলেন। শুরু হলো ধান, কাউনের চাষাবাদ। আর ফসল প্রাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ওয়ানগালা।



এমন যাদের লোকগল্প, এমন যাদের স্বহৃদয় উৎসবমুখর জীবন তাদের কথা তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানোর আগে জানতে পারিনি। কেন? কারণটা খুব সহজ-সরল নয়। বাঙালির ভাষার লড়াই, বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার পাশাপাশি সচেতনভাবে অস্বীকার করা হয়েছে বাংলাদেশে বসবাসকারী আরও অনেক জাতির অস্তিত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ছয় জাতির লোকগাথা সংগ্রহ শুরু করেছিলাম। মাঝের বিরতির পরে ২০১৪ সালে আবারও সমতলের আদিবাসী এলাকায় গিয়ে মনে হলো প্রকৃতির কাছে থাকা, সুখ-সংকটকে সমান করে ভাগ করে নেওয়া এই জীবন শুধু গবেষণার জন্য না, যাপনের জন্যই অনেক বেশি কাম্য। তাই অক্টোবরে

যখন ওয়ানগালায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেলাম, ছুটে চললাম সেখানে।

গেলাম জনিক নকরেকের বাড়িতে। বাড়ির প্রবেশ মুখটাতে একটা সরু পায়ে হাঁটা পথ। দু'পাশের ফসলি জমি ঘিরে রাখায় মাঝখানে এই পথ তৈরি হয়েছে। জমিগুলো অবশ্য তার নয়। অন্য মান্দির জমি, বাঙালি মহাজনেরা চাষ করে। এই জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে প্রতিবেশী মান্দিরা। কখনোবা যার জমি সে নিজেও ক্ষেতমজুরের কাজ করে। পরে জানা হলো এই অঞ্চলে জমি ব্যবহারে একটা মজার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একদা আদিবাসীরা তো জমিতে চাষ করত কেবল, জমির মালিকানা ছিল যৌথ। অথবা মালিকানাই ছিল না। জুম চাষে জমিগুলোকে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হতো। পাহাড়ি জমি চাষের উপযোগী করে কয়েক বছর চাষ করার পর পাহাড়ি মানুষেরা চলে যেত একটু দূরে অন্য জমিতে। আগের জমিটা ফেলে রাখত উর্বরতা ফিরিয়ে আনার জন্য। তখন বাঙালিরা যেত সেখানে দখল নিতে। একথা তো মানতেই হবে বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রকৃতিসংলগ্নতা এখন আর তত বেশি নেই। বরং আছে জন্মহার এবং ধানের উৎপাদন বাড়ানোর প্রবণতা। যাই হোক, জমির রেজিস্ট্রেশন করার চেয়ে জমিকে ব্যবহারের উপায় আবিষ্কারে আদিবাসীরা মনোযোগী ছিলেন বেশি। পরে বাঙালি সমাজের আইন কাঠামোতে রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া বুঝে ওঠা কঠিন ছিল তাদের জন্য। রাষ্ট্রের বিরূপতা ছিল। ছিল বনাঞ্চল সংরক্ষণ আইন। সব মিলে মালিকানার ব্যাপারটা চাপা পড়ে থেকেছে। তারপরও যাদের মালিকানা আছে তাদেরও আধুনিক চাষাবাদ ব্যবস্থায় আবাদ করার সামর্থ্য নেই। জমিতে কাজ মান্দিরাই করেন। তবে শ্রমিক হিসেবে। শুধু চুনিয়াতে নয়, আশপাশের অনেকগুলো গ্রামেই জমি মিদ্দি দেয়া-নেয়ার প্রথা চালু আছে। বর্গা প্রথা তো সারাদেশেই আছে। মিদ্দি প্রথার অভিনবত্ব হলো, যিনি মালিক তিনিই পরে শ্রমিক হয়ে যাচ্ছেন। প্রায় সব জমিই নিচ্ছে এক ধরনের লোক, দিচ্ছে যারা তাদেরও আছে জাতিগত মিল। মিদ্দি দেয়ার মানে হলো অর্থের বিনিময়ে কয়েক বছরের জন্য জমির অধিকার ছেড়ে দেয়া। সরকার অনুমোদিত পঞ্চাশ টাকার স্ট্যাম্পে চুক্তি লিখে রাখা হয়। সাক্ষী থাকে দু'জন। গ্রামপ্রধান বা নকমার উপস্থিতিতে এই চুক্তি করা হয়। মান্দিদের জমির মালিক মেয়েরা। তাই মেয়েরাই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

জনিক নকরেককে আমরা বলি আচ্চু। আচ্চু মানে দাদু এবং দাদুর বাবা। তার গ্রাম চুনিয়া বিখ্যাত দোখলা ফরেস্ট রেঞ্জ থেকে বিশ মিনিটের হাঁটাপথ। বাড়িতে ঢুকতে ডানপাশে একটা পানিবিহীন ছোট গর্ত। বাম পাশের জমিতে কয়েকটা কাঠের গাছ বছর তিনেকের হয়েছে। জনিক আচ্চুর ঘরটা সাংসারেক রীতিতে বানানো হয়েছে। মান্দিরা আদিতে সাংসারেক ধর্ম পালন করত। ব্রিটিশ আমল থেকে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। এখন সাংসারেক মান্দির সংখ্যা বিরল। অধিকাংশ মান্দিই খ্রিস্টান। আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রংয়ের ভাষায়, সাংসারেক মান্দির সংখ্যা কয়েক হাজার। গবেষক পাভেল পার্থের মতে কয়েকশ'। সাংসারেকদের ঠিক সংখ্যা জানা কঠিন। সরকারি তথ্য সংগ্রহের ওপর নির্ভর করা যাচ্ছে না। ২০০১ এবং ২০১১ সালের জনসংখ্যা জরিপে দেখা যাচ্ছে, ৪৭ জেলায় আদিবাসীদের সংখ্যা কমে গেছে। উত্তরাঞ্চলের নওগাঁ জেলায় ২৪ হাজার ৪০৯ জন চাকমা বাস করে এমন উদ্ভট তথ্যও সেখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে। দশ বছরে বাংলাদেশে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এক লাখ ৭৫ হাজার ৯৭২ জন মাত্র। যদি এ কথা সত্যি হয় তাহলে এর কারণ কি? আবার, ২০০১ সালের জরিপে বরিশাল এবং ভোলায় আদিবাসীদের সংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ হাজার ৩২১ জন এবং ১২ হাজার ৯৪৯ জন। ১০ বছর পর এই দুই জেলার সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬ জন এবং ৫৭ জন। দশ বছরে জেলা দুটোয় কি মহামারী হয়েছে যাতে শুধু আদিবাসীরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নাকি এই তথ্য কোনো রাজনৈতিক প্রচারণার অংশ, যেখানে আদিবাসীদের হিন্দু, খ্রিস্টান হিসেবে দেখানোর মূঢ়তা রয়েছে।

অন্য আদিবাসীদের মতো সাংসারেকদেরও ধর্ম বদলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শুরুতেই। ধর্ম বদলে হয়তো তারা খ্রিস্টান মিশনারীদের সমর্থন পেতে চেয়েছিলেন। যাই হোক সাংসারেক ধর্ম এবং মান্দি জীবন এক সুতোয় গাথা। যে মান্দিরা ধর্মান্তরিত হননি, তাদের বেশির ভাগই আজ বেঁচে নেই। বাঙালি মুসলমানরা যেমন মুসলমান হয়েও শাড়ি, লুঙ্গি, বৈশাখবরণ ছেড়ে দেয়নি, তেমনই মান্দিরাও পোশাক, পূজা, উৎসব, সামাজিক রীতিনীতি ছেড়ে দেয়নি। মিশনারীরা মান্দিদের ধর্মান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের আচরণ ছিল সহযোগিতামূলক, পাদ্রিরা প্রভাবিত করলেও জায়গা-জমি দখল করেননি। আর তারা সংখ্যায় ছিলেন কম। অন্যদিকে, দ্বিতীয় দফায় বাঙালি আগ্রাসনটা ছিল অর্থনৈতিক। মান্দি আবাসভূমিগুলো বাংলাদেশের বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা দখল করলে জীবিকার সংকট শুরু হয়। সাংস্কৃতিক হুমকি ধর্মান্তরের সময়েও হয়েছিল। জমি বেদখলজনিত স্থানান্তরের ফলে এটা গাঢ় হয়।

বনের জমিতে বাঙালি বসতি বেড়ে যাওয়ায় কমে যায় জুম চাষের সুযোগ। স্বাধীন বনজীবীর পরাধীন চাকরিজীবী হয়ে ওঠা। অনেকেই এই বাস্তবতাটা মেনে নিতে পারেননি। মানিয়ে নেয়াটা এ ক্ষেত্রে বিরাট এক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা একেবারে ব্যক্তিগত কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী একটা অনুসিদ্ধান্ত। বাস্তুচ্যুতি অনেক বেশি বিপন্নতার বোধ তৈরি করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু এবং আচ্চুর গুণমুগ্ধ জুয়েল আমাকে আচ্চুর ঘরে নিয়ে গেল। আচ্চুর তরুণ বন্ধুরা তাকে সম্মান জানাতে এই ঘরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন। এরাই প্রতিবছর অক্টোবর মাসে ওয়ানগালা উৎসবের আয়োজন করে থাকে আচ্চুর বাড়িতে। মাটির দোচালা ঘর। বারান্দা আছে। দুটি দরজা। একটি বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য অন্যটি অন্দরবাড়িতে যাবার জন্য। নারীরা আমাকে ডেকে নিলেন অন্দরবাড়িতে। প্রথমেই সমাদর করে নতুন ঢালা চু দেওয়া হলো। এটাই সম্মান দেখানোর রীতি। আমি তাদের শলাকা উপহার দিলাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমার সঙ্গে বোন পাতিয়ে ফেললেন। সম্পর্ক করাটা দ্বিতীয় সম্মান। জ্ঞাতি সম্পর্ক এবং সমাজ মান্দি চেতনায় দুটো স্তম্ভের মতো। চিরান, সাংমা, মানখিন, চিসিম, মৃ, নকরেক, রুগা, রাংসা, স্কু, দ্রং, ম্রং, রাকসাম, দালবত, দাওয়া, চিসিক, চিসাম, রিছিল ইত্যাদি টাইটেল রয়েছে। টাইটেল ছাড়া নাম রাখা হয় না। একই গোত্রের মানুষ পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় দেখা হোক গোত্রীয় উষ্ণতা পাবে। আমাকেও দেখা হওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে মৃ চাচ্চির অন্তর্ভুক্ত করা করা হলো। গোত্র সম্পর্কে কে আমার কি হন তাও জেনে গেলাম নিমেষেই। বাইরের লোকের মতো থাকতে চেয়েছিলাম। সহসাই সেই সুযোগ হারিয়ে ফেললাম। আমি হয়ে গেলাম আচ্চুর পরিবারের একজন।

জনিক আচ্চু জাত্যাভিমানী কি-না জানি না। তবে তিনি এখনও সাংসারেক। তার জীবনের একশ' বারোটি বসন্তে সুখ-দুঃখ সবই এসেছে। তবে ধর্ম ত্যাগ করেননি তিনি। বরং নানা সংকটের দিনেও সাংসারেক মান্দিদের বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির পুরনো কথাগুলো তিনি সারা জীবন ধরে শিখেছেন। চর্চা করেছেন। আজও তিনি স্বপ্ন দেখেন সারা পৃথিবীকে জানাতে হবে সাংসারেক বিশ্বাস এবং রীতির কথা। ❖

শাকুর মজিদ

হাছনজানের রাজা



কা ব্য না ট্য

অন্ধকার মঞ্চের পর্দা সরতেই উপরের দিকে মঞ্চের পেছন থেকে ঝলমলে চাঁদ দেখা যাবে। ধীরে ধীরে আলো ফুটলে দেখা যাবে অমল ধবল জ্যোৎস্নাকবলিত ভরা বর্ষার হাওর। একটা নৌকার গলুই প্রবেশ করবে মঞ্চের বাঁ থেকে ডানে। কতকগুলো তরুণ-তরুণীর মুখাবয়বের ছায়া পড়বে পেছনের পর্দায়। কারো হাতে গিটার, কারো কাঁধে ক্যামেরা। চার-পাঁচজন তরুণ-তরুণীর দলটি একটি ছাদখোলা নৌকার পাটাতনে বসে আছে। নৌকা বাইছেন এক মাঝি। নৌকার গলুইতে চিত হয়ে শুয়ে আছে গিটার হাতের যুবক। সে প্রথমে গান ধরে। পরে তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সবাই কোরাসে গায়।

গান *ছাড়িলাম হাছনের নাওরে*
আরে বৈঠা ফালাইতে নারে শূন্যে করে উড়ারে
(হৈ হেইয়া হো, হৈ হেইয়া হো হেইয়া)
সুখের মায়ায় করছিল পিরীত নদীর কূলে বইয়া
এখন কেনো ছাড়িয়া গেল সায়রে ভাসাইয়া রে
(হৈ হেইয়া হো, হৈ হেইয়া হো হেইয়া)

তরুণ(১) দেখার হাওরে আইজ চান্নির পশর
আচানক কোনো চান যেনো আসমানে ভাসায় বহর
মেঘালয়ে ছায়া পড়ে উত্তর আকাশে, আর
পুবের আকাশ জুড়ে জৈন্তিয়া পাহাড়
দক্ষিণ-পশ্চিম মিলে হাওর ভাটার
আজ রাত এই নায়ে মহা-পূর্ণিমার

তরুণ(২) কথা ছিলো, আজ এই মহা পূর্ণিমাতে
আকাশ কাঁপায়ে যখন বর্ষার শরীর হতে
ধীরে ধীরে খসাবে তার মায়াবী চাদর,
তখন খোলস খোলা শামুকের উদর
থেকে বের হওয়া মুক্তোর
মতো ভিড়বে আজ রাজার বহর।

তরুণ(৩) উনিশশো বাইশের তিরোধান পরে
নানা লোকে নানাভাবে দেখেছে রাজারে
কেউ নাকি দেখেছে তারে সুরমার পাড়ে
কেউ দেখেছে বলে কুড়া শিকারে

কেউ নাকি পেয়েছে তারে লাউড়ের বনে
ডুগডুগি বাজায়া নাচে অষ্টসখী সনে

তরুণ(১) কেউ নাকি শুনেছে এমন
ভরা কোনো বর্ষায় মহাপূর্ণিমা যখন
ঝিকিমিকি রোশনাই দেয় দেখার হাওরে
আচানক কোনো রাতে ভরা সে বহরে
হাছন রাজার নাও ঘুরিয়া বেড়ায়
কাছে গেলে এই নাও আকাশে মিলায়।

মাঝি এমনি কথা কত হুনছি বহু
নিজ চক্ষে দেখি নাই, তয় দেখেছে কেউ

তরুণী এটা কি কেমোফ্লেজ? নাকি ইল্যুশন হয়।

তরুণ(২) এসব কি আসলে সত্য? নাকি ভ্রম নিশ্চয়!

মাঝি তারপর বেশি কিছু নাই চাওয়া,
দূর থেকে শুধু দেখে যাওয়া
চান্দের লাখান।
যত তার কাছে গেছে আরো
ততো দূরে সরে গেছে চাঁদ,
সরেছে রাজাও।

ময়-মুরুব্বির কথা যায়নি বিফলে
সেই যদি সত্য হয়, তবে লক্ষণ বলে
সত্যি যদি হয়ে যায় হিসাব আমার,
তবে আইজ রাতে আইবেন রাজা আবার।

(মঞ্চের সকল তরুণ-তরুণীর মধ্যে অনেক উল্লাস।)

তরুণ(৩) আজ সেই নীল চাঁদ ভরা বর্ষার
এখন প্রতীক্ষা তবে হাছন রাজার!

তরুণী(১) ফেসবুকে এমন স্ট্যাটাস আমি দেখেছি তোমার
তাই যদি সত্যি হয়, আজ তবে রাজা আমার
আমি তার দিলারাম, আমি লবজান
আমি আছি এই রাতে হাছন পরান।

তরুণী(২) মোর সাথে দেখা তার হয়েছিল কোনো এক
কাপনার পাড়
সেই থেকে চেয়ে আছি যদি কোনোদিন আর
দেখা হয়, তবে হবে সে শুধু আমার
আজ রাতে আমি আছি হাছন রাজার

(মাঝিকে নিয়ে নৌকায় বসা তরুণ-তরুণীরা এসব হুল্লোড়ময় কথার মাঝে লক্ষ্য করেন, কোথাও থেকে যেনো দূরের বাজনার শব্দ শোনা যায়। তারা সবাই চুপ হয়ে যান। খুব ধীরে ধীরে একটা গান শোনা যায়। ঢোলক, করতাল আর হারমোনিয়াম দিয়ে বাজতে থাকে গান।)

নিশা লাগিল রে, নিশা লাগিল রে,
বাঁকা দুই নয়নে নিশা লাগিল রে।
হাছন রাজার পিয়ারীর প্রেমে মজিল রে॥
ছটফট করে হাছন রাজা দেখিয়া চান মুখ
হাছনজানের মুখ দেখিয়া জন্মের গেল দুখ॥

(নৌকার তরুণ-তরুণীরা বিহ্বল হয়ে পড়েন। হঠাৎ মাঝি কথা বলে ওঠেন)

মাঝি চুপ চুপ।
সক্কলে চুপ।

নিশ্চিত আসছে সে বহর আবার!
আর কোনো কথা নাই, শুধু কান খাড়া করে শুনেন এবার।
যদি কেউ কথা কয়, যদি কেউ দেখে ফেলে তারে,
তবে তিনি চলে যান, আর কেউ দেখে না রাজারে।

(মঞ্চে স্থির ও বিহ্বল হয়ে আছেন এই কুশীলবেরা। মঞ্চের পেছনের পর্দায় ছায়া পড়ে এক মাস্তুলের। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিভাষিত হয় এক বজরা। এই বজরার মাঝখানে ৬০ বছর বয়সি ৬ ফুট উঁচু, ফর্সা, পিঙ্গল চোখি, কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি আর গোঁফ নিয়ে, মখমলের পাজামা আর বেগুনি রঙের আলখেল্লা পরা হাছন রাজা। তার দু'পাশে কয়েকজন রমণীমাত্র। একজন মাঝি বজরার পেছনে। হাছন রাজা প্রায় পাগলের মতো নেচে নেচে এই গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং আগে থেকে মঞ্চে থাকা অপর কুশীলবরা নৌকার পাশে এসে দাঁড়ান।
এখানে দুইটা নৌকার সকল পাত্র-পাত্রী একত্রিত হয়ে একটা মঞ্চে একত্রিত হবে। এবং এই কাজটি হবে 'ছাড়িলাম হাছনের নাও' গানের শেষ স্তবক গাইতে গাইতে।

গান *পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত হইলো জ্বালা*
পিরীত করা প্রাণে মরা মন না জানিয়া রে
ছাড়িলাম হাছনের নাও রে
(হৈ হেইয়া হো, হৈ হেইয়া হো হেইয়া)

নায়ে থাইকা হাছন রাজা বলে যে ডাকিয়া
পিরীত না করিও রে ভাই মন না দেখিয়া রে
(হৈ হেইয়া হো, হৈ হেইয়া হো হেইয়া)

তরুণী (১) হাছন রাজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথমে নিজের গায়ে চিমটি কাটে। ব্যথা পায়। পরে হাছন রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। হাছন সরে দাঁড়ান।

প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা তার হ্যান্ডিক্যাম তাক করে রাখেন হাছনের দিকে।

সাংবাদিক পকেট থেকে নোটবুক বের করে, বারবার হাতঘড়ি দেখে, নোটবুকে নোট করেন। পকেট থেকে ভয়েস রেকর্ডার বের করে অন করে রাখেন।

তরুণী (২) বারবার তার মোবাইল ফোনে ছবি তুলছেন। কখনো সেলফি, কখনো সবার ছবি।

শহর থেকে আগত দল এক ধরনের মহা উত্তেজনাকর অবস্থায় আছেন। হাছন রাজার দল নির্জীব। মাঝখানে হাছনকে রেখে তার পিছনে প্রায় জিন্দা লাশের মতো সঙ্গিনীরা।

সাংবাদিক পকেট থেকে সেলফোন বের করেন। কথা বলার জন্য ডায়াল কি চাপতে যান। এমন সময় তাকে থামিয়ে কথা বলেন হাছন।

হাছন   নামাও যন্ত্র তোমার
আমার চক্ষের দিকে চাও একবার

(সবাই সব ডিভাইস বন্ধ করে দেয়। নীরবতা নেমে আসে মঞ্চে।)

কী আছে ইহার মাঝে জানি আর
কী নাই তাহার মাঝে জানা যে আমার

(লাঠি হাতে হাছন খানিক পায়চারি করে আবার কথা বলেন।)

তামাম দুনিয়া আইজ থির (স্থির) হইয়া আছে
উনিশশো বাইশের পর মাঝে মাঝে
এখানে-সেখানে যাই,
কখনো এদের পাই,
কখনো একা
কখনো যদিবা কারো পাই দেখা
সে মোরে চিনিয়াও চিনে না
নাকি আমারে তার লাগে অচেনা?

আজকের এই মহাপূর্ণিমায়, যদিবা হইলো মোলাকাত
যতক্ষণ চান আছে আসমানে আর তোমরা সাক্ষাৎ
আছ, সকলেরি নিয়া আমি ভাসিমু হাওর।
সঙ্গে মোর সঙ্গী যতো,
তার সঙ্গে তুমরা ততো
মিলেমিশে চলো আজ ভাসাই বহর
বলো, কী খবর!

(সোল্লাসে ফেটে পড়ে মঞ্চের সকল পাত্র-পাত্রী। তারা একত্রিত হয়ে হাত ধরাধরি করে হাছন রাজাকে মাঝখানে রেখে নাচতে নাচতে ঘুরতে থাকবে)

কোরাস   হয় হয় হয়
হাছন রাজায় কয়

হয় হয় হয়
রাজার হয় জয়

হয় হয় হয়
বাজে কথা নয়

হয় হয় হয়
সত্যের হয় জয়

হয় হয় হয়
রাজায় কথা কয়

হয় হয় হয়
মিছা কথা নয়

হয় হয় হয়
হাছন রাজায় কয়

হয় হয় হয়
সত্যই নিশ্চয়

তরুণী(১) আচ্ছা হাছন
কও তো শুনি, রাজা তুমি কেমন?
গান শুনেছি তোমার লেখা, নাম শুনেছি রাজা
এ আবার কেমন রাজা, নাই যে কোনো প্রজা?

হাছন   হা হা হা হা, এর কুনো ভিত নাই, কুনো এক হেলায়
পাগলে পাইছিল মোরে জীবন বেলায়
দেওয়ান-চৌধুরী মিলে খিদা মিটে নাই
দুনিয়ার রাজা হতে চাই
বলে নিজেরে নিজেই আমি রাজা বানাই।

সাংবাদিক রাজার বংশ তবে ছিলো না তোমার?
রাজারা কি সে আমলে ছিলো জমিদার?

হাছন   তিন পুরুষ আগে মোরা হিন্দু ছিলাম
বীরেন্দ্র সিংহ দেব ছিলো যার নাম
ব্রিটিশের আগে থেকে মুঘল-আকবরী
আমলে তাঁদের ছিলো বড়ো জমিদারি

সে লোক কী কারণে হয়ে মুসলমান
জাত বদলাইয়া নাম নিলো বাবু খান
তার পুত ছিলো যে আনোয়ার খান
সেই জমিদারই ছিলো মোর দাদাজান

আলী রেজা ছিলো মোর পিতাজীর নাম
ব্রিটিশ রাজার ঘরে খাজনা তোলার কাম
পেয়ে তিনি হয়ে যান মহান দেওয়ান
আর নামের সঙ্গে এই পদবি লেখান
রামপাশা ছিলো তাঁর মূল জমিদারি
তারপরও যেতে হয় লক্ষ্মণছিরি (শ্রী)

হুরমত জাহান বানু মাতাজী আমার
ঈশা খাঁর বংশে ছিলো জমিদারি তাঁর



নেত্রকোনার খালিয়াজুরি তাঁর বাস ছিলো
সতেরো বছরে তাঁর বিবাহ হইলো।
সুনামগঞ্জের লক্ষ্মণছিরির তেঘরিয়া গ্রাম
আমির বক্স চৌধুরী ছিলো যার নাম
জমিদারের কন্যা আসে জমিদারের বাড়ি
সেইখানে মাতা নেন তারও জমিদারি

তিন পুত্র এক কন্যার সুখের সংসার
এর মাঝে ঘটে এক এলাহী কারবার
বলা এসে নিয়ে যায় শত শত জন
একে একে যায় চলে তাঁর সব ধন

স্বামী যায়, পুত্র যায়, আর যায় জায়া
শূন্য ভিটায় শুধু থাকে তাঁর কায়া
এখন কী হবে তার? কী আছে সংসারে?
কী হবে এই ধনে? এই মিরাশদারে?

স্বামী-সন্তান হারা এই দুখী নারী
অবশেষে বাবা তারে করেন সংসারী
এর আগে ছিলো তাঁর বউ চারখান
পঞ্চম বউ হন হুরমত জাহান

সম্পদ যাহার থাকে ক্ষমতাও হয়
জানো তো এমন কথা? জানো নিশ্চয়
মা'র সম্পদ ছিলো জমিদারি তাঁর
দেখবার ভার নেন পিতাজী আমার
মার কথা বাবাকে রাখতে গিয়া
রামপাশ ছেড়ে তিনি যান তেঘরিয়া

রামপাশা, জমিদারি, পুত্র ও থিরি (স্ত্রী)
রাখিয়া পিতাজী এলেন এই লক্ষ্মণছিরি (শ্রী)
নতুন জীবন পায় জননী আমার
যার ঘরে জন্ম হয় হাছন রাজার।

ওবেদুর রেজা ছিলো মোর সৎ ভাই
তার লগে মিল রেখে নাম রাখা চাই।
জন্মের পরে নাম রাখা হলো তাই
ওহিদুর রেজা, যেনো ওবেদের ভাই।

অহিদুর রেজা থেকে হাছন রেজায়
নাম বদলাইয়া দেন নাজির আবদুল্লায়
ওহিদুর থেকে আমি হাছনে মিলাই
আর রেজা নাম ছেড়ে আমি রাজাতে বিলাই।

চৌধুরী-দেওয়ান সাথে যোগ যে রাজার
এ যেনো সব্বাই মোরা বংশ বাদশার!
খাজনা তোলার কাম শেষে হলে পরও
দেওয়ানীর তকমা রাখে নামের অপরও

তার সাথে যোগ থাকা উপাধি রাজার
এই নিয়া আছে দেখি বিশাল বাজার।

গায়ক — বাহ, বাহ, স্যালুট জনাব
দিল খোলা কথা সব, শুনে লা-জবাব
এতোদিন ছিলে তুমি মীসটির আধার
একে একে খুলো দেখি, বাকি সব দ্বার

চিত্রনির্মাতা — আমার ক্যামেরা পেলো নতুন জীবন
সার্থক সৃষ্টি তার দেখে এ ভুবন
তোমার এই বাণী আর তোমার এই কথা
বাণী-চিত্রে দেখে নেবে কোটি জনতা

তরুণী(১) — বলো তো হাছন, তবে কোন ঘটনায়
লম্পটিয়া বলে তুমি নিজেরে ফলাও

হাছন — কৈশোর থেকে ছিলো বেয়াড়া হাছন
জগৎ সংসার ছিলো আমার পিছন
গাংপাড়ে যত সখা যত ছিলো হুর
কে পারে ঠেকাতে মোর জং বাহাদুর

গান — *এগো মইলা, তোমার লাগিয়া হাছন রাজা বাউলা।*
ভাবতে ভাবতে হাছন রাজা হইল এমন আউলা॥
দিনে রাইতে উঠে মনে, প্রেমানলের শওলা।
লোকে বলে হাছন রাজা হইল রে আজুলা।

তরুণী — ওয়াও, হেভভী হাছন, তাইতো সবে কয়
রাসপুতিন তোমার কাছে তুচ্ছ দেখি হয়

হাছন — ওসব চিনি না আমি যখন কিশোর
শ্রীমান কৃষ্ণ এসে মোরে করে ভর
যমুনা না থাক, আমি সুরমার পাড়ে
ওঁৎ পেতে বসে থাকি রাই শিকারে

গান — *সুন্দরী রাধে গো তোর কানাইয়্যা যাইব ছাড়ি*
তাই ভাবিয়া হাছন রাজা, ফিরে বাড়ি বাড়ি
কানাইয়া ছাড়িয়া গেলে লোকে বলবে এড়ি
কানাইয়ারে বান্ধিয়া রাখ পায়ে দিয়া দড়ি

হাছন — প্রতিদিন খোঁজে চোখ কাঁদে যে পরান
হিন্দু কি মুসলিম কি জালুয়া কিরান
ওসব ভজিনি আমি বৌ-জায়া কার

আমি তো চেয়েছি তারে শুধুই আমার

তরুণী হাও সিলী! হাছন, এসব কী বলো তুমি?
এটা কি ফাজলামি!
তোমাদের কালে এতোই কি সহজ ছিলো এই কারবার?
কেউ কি ছিলো না তবে এসব দেখার?

হাছন বয়স! সে বড় কঠিন কাল
তার সাথে থাকে যদি কাঁড়ি কাঁড়ি মাল
জানো তো কী করে গোলমাল?
অর্থকে অনর্থের মূল বলে ঠাওরাইছিলো যে লোক আগে বহুকাল,
একবার যদি পতিত যদি হয় অনটনে
বুঝিতে পারিত সে অর্থের মানে।

বুঝি নাই কেবলই আমি। অর্থ মোর কত ছিলো
জানি না কেবল। শুধু মোর জানা হলো
বাপ-ভাই মারা গেলে পেয়ে যাই দেওয়ানী তাঁদের
তার সাথে যোগ হয় তাবৎ মায়ের
রামপাশা লক্ষ্মণছিরি দুই মিলে আর
পাঁচ লাখ বিঘা নিয়া হাছন জমিদার।

গান *করবায় নিরে হাছন রাজা রামপাশায় জমিদারি।*
করবায় নিরে কাপনা নদীর তীরে ঘুরাঘুরি রে॥
(আর) যাইবায় নিরে হাছন রাজা রাজাগঞ্জ দিয়া।
করবায় নিরে হাছন রাজা দেশে দেশে বিয়া রে॥

মাঝি টেখার নাম জয় রাম
টেখা অইলে অয় খাম

হাছন তখন যৌবন মোর
ফুলে ফেঁপে উঠে যেনো সতেজ ভোমর
যেনো কোনো দলছুট ঘোড়ার লাখান আমি ছুটে যাই,
যখন যেখানে যাই, যা চাই, হাত ভরে পাই
নদীতে-কিনারে-ঘাটে-হাটে-মাঠে যতো কুঞ্জবন
কে পারে ঠেকাতে সেই রাজা হাছন?

ক্ষমতা যাহার ছিলো শক্তি ছিলো দখল করবার
সে কি করে নাই? হয় এইভাবে, নয় ঐভাবে, বার-ংবার
সুলেমান নবীর ছিলো পত্নী হাজার
ষোলশো গোপিনী ছিলো কৃষ্ণের বাহার

ইস্তাম্বুল-আগ্রা কিংবা মানসিংহের মহল হাওয়ার
অযোদ্ধার নবাব কিবা চৈনিক রাজার?
যুগে যুগে কড়িবাজ ছিটিয়েছে ধান আর বাকুম বাকুম করে
সোনালি কৈতর দলে বাসা এসে বেঁধে গেছে এই সব হাছনের ঘরে।

এই জগৎ সংসার বড় বেয়াড়া বাজার
কত দামে কখন কে বিকি খায়, আর
কেনা যায় কারে কতো দামে
এ বড় বিস্ময় দেখি এই ধরাধামে।

বিত্তের রোশনাই বলে কথা
ছিটিয়েছি ধান যথা তথা
নয়খানা বৌ ছিলো হিসাবের মোর
আরো কতো ছিলো তার রাখিনি খবর

মাঝি টেখা অইলে বিয়া খরে
খে খারে জিয়া (জিগা) খরে

সাংবাদিক এই সব ছাড়া আর কি ছিলো তোমার
সাধের জমিদারি ছাড়া দিন কাটাবার?

হাছন কিশোরী তরুণী ছাড়া শখ ছিলো আর
হাতি-ঘোড়া চড়া আর কোড়া শিকার
যৌবন কাটিছে মোর কুড়ারে চিনিতে
কত জনা আইতো কাছে কুড়া জানিতে

সাংবাদিক শুনি তবে কিছু কথা বয়ান কুড়ার
যা নিয়ে লিখেছিলে শৌখিন বাহার

হাছন *ডাইনে আড়া চিটের কুড়া অতি উত্তম হয়*
বাউযে আড়া চিটের কুড়া মন্দ যে নিশ্চয়
বড় চিটের কুড়া মন্দ জানিও নিশ্চয়
মধ্যমান চিটের কুড়া অতি উত্তম হয়।
পিঙ্গলা চৌখি কুড়া অতি নেক্কার
জোওয়ান মদ্দির সীমা নাই হিম্মত অপার
শাওলা চক্ষুর কুড়া ভাল তার খেছাল
শিকারেতে গেলে সে না করে গোলমাল

এসব কুড়া ছিলো পেয়ারা আমার
শেষকালে খোদারেও পেয়ে যাই ভেতরে তাহার
মনে হতো তিনি যেনো কুড়া রূপ ধরে
মানবের খেলা দেখে জগৎ সংসারে।

সাংবাদিক কুড়ার পরে ছিলো তার ঘোড়ার খায়েশ
চার কুড়ি ঘুড়া তাঁর মিটাইতো আয়েশ

দিলারাম *চান্দ মুশকি ঘোড়া জানো সবার সরদার*
তাহার সওয়ার জানো উদাই জমাদার

আরব জান *যথায় সায়েবের কোড়া-ঘোড়া অথায় তার মন*
খেদমতের লাগিয়া সায়েবে রাখছইন ষোলজন
সায়েবের সুরতের কথা শুনো দিয়া মন
যেইখানে শুনিয়া গীত সেইখানে গমন।

হাছন চান্দ মুসকি, ফুলমুন, খুসদিল, জং বাহাদুর,
মাখন লাল, লাল চান্দ, দুলদুল, কানা বেনজির
কিংবা লাল মোহন
কত নামে কতোটিরে ডেকেছে এ-মন
কত সব কথা আমি লিখেছি তাহার
এই নিয়া বই করি শৌখিন বাহার

তরুণ তোমার তো পড়া নাই, লিখো কি করে?
হাছন উদাস আর শৌখিন বাহারে

হাছন লেখা পড়া ছিলো মোরা বংশ আচার
কেবল পড়িনাই আমি এই গুনাহগার
পিতাজান আলী রেজা কিংবা মোর ভ্রাতা অবেদুর
ফার্সিতে জ্ঞান ছিলো সবার বহুদূর।

কাব্য কথার প্রতি টান ছিলো আমার
সেই শুনে শখ হয় কিছু লিখিবার
বড়ো বোন সহিফার কতো যে সুনাম
প্রথম বাঙ্গাল কবি হাজি বিবি নাম

আমি শুধু পড়ি নাই দেখেছি কেবল
সেই কথা লিখে রাখে মুহুরী সকল
পিতা-ভ্রাতা-ভগ্নির পথ ধরে তাই
যা কিছু মনে আসে মুখে বলে যাই

কখনো বাংলা কিংবা উর্দুতে প্রকাশ
সেই পদে বই হয় হাছন উদাস

কিয়া রাং দেখায়া মুঝে পিয়া পিয়া
দেখ কার ফিরিপ্তা হুয়া জিয়া
দেখ কার চান্দসা মুখ, কিয়া কারকে গিয়া
চেহরে কি বাহার নে দিল ছিন লে লিয়া
হামেশা তাড়াপ্তা দিল, কিয়া কিয়া কিয়া কারকে গিয়া
উসকো দিয়ে মাত ওয়ারা হুয়া হাছন রাজা মিয়া

সাংবাদিক রমণে রমণে দিন করে গুলজার
সখা-সখী পত্নী নিয়া কাল করে পার
রমণী মোহন বলে ডাকে লোকজনে
রমণী নানা রূপ দেখে দর্শনে

তরুণ বিজ্ঞানের শাখা আছে জানি, আহারে
'সায়েন্স অব ফ্রেনোলজি' বলে তাহারে
এটা কি তেমন কিছু? জানা আছে রাজা?
বুজাইয়া কও শুনি, কঠিন না সোজা

হাছন শরীরের গঠন দেখে বুঝে নিতে পারি
উত্তম না অধম হবে সেই সে নারী
এই নিয়ে পদ লিখি হাছন বাহার
তারি কয় ছত্র বলি, শোন এইবার।

মধ্য ক্ষীনা, ভাষা আঁখি, পদ্মিনী কামিনী
পতিহীনা হইলেও সে শ্রেষ্ঠ রমণী

তরুণী বাহ, বাহ, কী চমৎকার
আর তবে কি আছে ভাণ্ডারে তোমার?

হাছন *মাথা ছোট আওরত, বে আক্কল হয়*
বাড়ি আওরত দোষণীয়, সর্বলোকে কয়।
বাড়ি, হালকা যেসব আওরত হয়
তাহাদের খারাবির কথা, শরীরে না সয়।
নাকের আগা মোটা যে আওরতের হইল
সে আওরত বিবাহ কৈলে প্রাণখানি গেল।
মুখ ছোট, চক্ষু, কর্ণ যদি ছোট হয়
ছোট যত হইবেক, সবে মন্দ কয়।

তরুণী ওসব সেকেলে কথা চিন্তা সনাতনী
তা-ও বলো তো রাজা আরো কিছু শুনি

হাছন *দন্ত উঁচা হইলে কচিৎ মুর্খ হয়*
সুন্দর হইলে নারী, সতী নাহি রয়।

ঝুট কথা কহে ভাই, যেই হারামজাদি
তারে না করিও বিয়া, যদিও সাজাদি।
কথায় কথায় যেজন, কছম খায় ভাই
তার সমান ঝুটা কেহ, সংসারেতে নাই।

আওরত উপরে যেই, পুরুষে দেয় ভার
সংসারে নাহি কেহ, এমত গোওয়ার
স্ত্রী নায়ক, শিশু নায়ক, ভৃত্য নায়ক হইল
নিশ্চয় জানিও তার সংসার গেল।

তরুণী পড়েছি তোমার কথা সেকি ছিলো হাছা
রেপ কেইস খাইছো নাকি, ঘটনা কি মিছা?

হাছন হে হে হে! কোথায় পড়েছো সখী
নাতি আজরফে? আসলে জানো তো কি
এমন ঘটনা হলে– থাকে কি মান?
সেই বেটি ফাসাই ছিলো, নাম সুরজান।

সেই সব জমিদারি জামানার দিনে
বিবাহের সময়ে মহিলার সনে
দাসী-বাঁদি দেয়া হতো খেদমতে তাহার
খেদমত করিত তারা রানী ও রাজার

উপহার-যৌতুক, যা বলো তার নাম
তাদের রক্ষণ ও ভক্ষণ ছিলো পতিদের কাম।
যে দুই দাসী ছিলো আমার মায়ের
তাহারা জন্ম দিলো দুই সন্তানের

এক দাসী জন্ম দিলো আয়াত তার নাম
আরেক দাসীর ঘরে জন্মায় সুরজান
একদা তাদের মাঝে বিয়া হয়ে যায়
সুরজান মেয়েটি মোর মনে ধরে, হায়।
আমার আসরে তার আহার বিহার
আমারে সে মানে, যেনো দেবতা তাহার
সুরজান নামখানি আমি দেই তারে
বনের কোকিলা তার সুর শুনে হারে
সোনার বদন ছিলো চাঁদমুখ তার
এই দেখে প্রাণ পড়ে হাছন রাজার।

গান *আহারে সোনালি বন্ধু, শুনিয়া যা মোর কথা*
হাছন রাজার হৃদকমলে তোমার চান্দমুখ গাঁথা
হেরি যবে তব মুখ, এ জনমের যায় দুখ
উপজিয়ে মনের সুখ জনমের যায় ব্যথা

হাছন গোবিন্দ শর্মা ছিলো আর জমিদার
মামলা-মোকদ্দমা ছিলো তার কারবার
জমিদারি নিয়া আছে লড়াই বিবাদ
শোধ নিতে আমারে সে বাধায় প্রমাদ

একদিন অগোচরে সুরজান, হায়
থেকে যায় মোর ঘরে রাত্রী বেলায়
গোবিন্দ শর্মা মোরে ফাঁসাইতে গিয়া
রেপ কেইস ঠুকে দেয় আমারে নিয়া

তরুণী এ কেমন কথা বলো, এতো কাঁচা কাম!
সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়া আছে কি দাম?

সাংবাদিক সাক্ষী প্রমাণ সব আদালতে খাড়া
ডাক্তারি রিপোর্ট দেখে চোখ ছানাবড়া
হাকিমে হুকুম ছিলো কোর্ট ভবনের
আঠারো মাসের জেল হবে হাছনের।

তরুণী হায় হায়! এ কী করে হয়? আর
তুমি না রাজা তখন, জমিদার?
আসল ঘটনা কি, সত্য করে বলো
এতো কাঁচা কাম কী করে হলো?

হাছন কিছু করেছি কি করি নাই
কিছু মনে নাই
শুধু জানি এই সত্য, হায়–
আদালত পাড়াতে রায় কেনাবেচা যায়।

উকিল কিনিলে আমি, হাকিম কেনে সে
আমি কি থাকিতে পারি ঘরেতে বসে?
একবার সে কিনে নিলে রায়, আর
বাকি থাকে মোর পালা, খরিদ করিবার

এই যদি হয়, এই যদি সত্য তবে হয়,
তবে মোর কিসেতে কি ভয়?
আমার উকিল তারে প্রমাণ দেখায়
ঘটনার রাতে আমি ছিলাম কোথায়।

সুরজান যে বয়ান আদালতে দিলো
সে কর্মে আমি নই, অন্য কেউ ছিলো।
সাক্ষী-সাবুত পেয়ে আদালত আবার
জামিনে খালাস দিলো হাছন রাজার

তরুণ হাত্তিরও হেলে পাও
সুবর্ণরও ডুবে নাও

হাছন ইজ্জত! সে বড় দুর্জেয় ধন
অর্জনে লেগে যায় পুরোটা জীবন।

একবার পাইবার পর যখন তখন লাফায় ফালায়
কখন কী ফাঁক দিয়ে ফসকে সে যায়
আর যদি একবার ফসকে সে ধন
তারে ফিরে পেতে লাগে আরেক জীবন

তরুণ আচ্ছা হাছন, ঠাকুরের অমন পাবলিসিটির পর
কেউ কেনো রাখে নাই তোমার খবর?
তোমার কাব্য গাঁথা ছিলো দুইখানা
তাঁর কোনো কপি আজ কোথাও দেখি না

জমিদারি-দেওয়ানীর দলিল তোমার
লেনদেন যত ছিলো ভাগ-বাটোয়ারার
সব দেখি আছে ঠিকই নেই শুধু ঐ
হাতে লেখা কিংবা ছাপা তোমার দুই বই

সাংবাদিক তোমার গঞ্জে-পাড়ায় কিংবা গানের মেলায়
ছেলেপুলে নাতিদেরই জীবিত বেলায়
কে তোমার নাম নিছে উৎসব আসরে?
পাগল ঠাওরায় নাকি হাছন রাজারে?

গায়ক মরিবার তিন যুগ পরে
তোমার খবর গেলো গানের আসরে
নির্মল চৌধুরী গা'ন দেড় যুগ পর–
তোমার স্বজনেরা কে রেখেছে খবর?

তরুণ তার আরও দেড়যুগ পরে
উনিশশো তেষট্টিতে তোমারে প্রথম স্মরে
তাও যারা করেছিলো এই আয়োজন
সে দলে দেখে না কেউ তোমার স্বজন

তরুণ এতোগুলো বিবিজান, এতো সন্তান
কমতো করো নাই কাওরে কিছু দান
তবে কেনো তোমারে ঠাওরাই পাগল
নিজেদের তল্পি ভরে রাখে আগল?

হাছন সেকি আমি জানি নাই? বুঝি নাই? বাপ–
জমি-জমা সম্পদ কাল হয়ে যায় যেন পোষা
কোনো বিষধর সাপ
নিজের কপালে মারে বিষের ছোবল
যখন ভাগের থালা হাতে বসিবে সকল

চেনে না কে ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা
কিংবা পরিজন
বড় ভাগ সকলের পাইতে চায় মন
সম্পদের ভাগে বসে মানুষ যখন,
নিমেষেই বনে যায় শৃগাল তখন॥

অথচ ভুলিয়া যায় জনমে তাহার
খালি হাতে দেখা পায় জগৎ সংসার
এর ওর কাছ থেকে যাহা কিছু পায়
এই নিয়ে কিছুদিন ফুটানি মারায়

গান *কিসের আশা কিসের বাসা কিসের সংসার*
মইলে পরে ভাবিয়া দেখো কিছু নয় তোমার
কিসের আসয় কিসের বিষয় কিসের জমিদারি
কিসের হয় রামপাশা কিসের লক্ষ্মণছিরি

হাছন যেসব সকলই ছিলো অন্য কারো ধন
পাইবার পরে ভাবো ইহাই জীবন
তারপর কিছুদিন পর
পালা শেষে পর্দা পড়ে খালি হয় ঘর
আবার পরের রাতে শুরু হলে নতুন আসর
তোমার লেবাসে নাচে অন্য নটবর

গান *লোকে বলে বলেরে ঘর-বাড়ি বালা নাই আমার*
কি ঘর বানাইমু আমি শূণ্যেরও মাঝার॥
ভালা কইরা ঘর বানাইয়া কয়দিন থাকমু আর
আয়না দিয়া চাইয়া দেখি পাকনা চুল আমার॥

তরুণ তবে কি ধনের মায়া ছিল না তোমারি?
পোলাদের হাতে তুলে দিয়ে জমিদারি,
ভাওয়ালী নৌকায় বাঁধো তোমার সংসার
রাজা, তুমি ভাঙ্গো তো– কি ভেদ তাহার

হাছন আঠারোশ' সাতানব্বইর বড়ো ভুইচাল পর
পরথম জানান দিলো এই মনুষ্য বহর
বেহুদা ফুটানি করে, দেখায় বড়াই
এ যেনো হস্তির সনে কোন পিঁপড়ার লড়াই।

এর সাত বছরের পর
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মাথার অপর
জননী যে জন মোরে দিয়া ছিলো ছায়া
পঁচাশি বছরে তিনি ছেড়ে যান কায়া

কী তাহার ছিলো শান
কী তাহার মান
ধন-দৌলত সব ফেলে রেখে হায়
খালি হাতে ফিরে যায়, একা অসহায়

তখন আমার এই মন খালি কান্দে
জগৎ ছাড়িয়া গেলে কই নেবে ঠাকুর চান্দে
যখন ছাড়িয়া মন করিবে গমন
ভব লোকের শক্তি নাই তারে করিবে দমন

গান
উড়িয়া যাইবো শুয়াপঙ্খী পড়িয়া রইবো কায়া
কিসের দেশ কিসের খেশ কিসেরময়া দয়া
ময়নারে পালিতে আছি দুধ কলা দিয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর ময়নায় না চাইব ফিরিয়া
হাছন রাজায় ডাকবো যখন ময়না আয়রে আয়
এমন নিষ্ঠুর ময়নায় আর কি ফিরিয়া চায়

সাংবাদিক
লোভ কি ছিলো না বলো তোমার সম্পদের?
পাশের জমিদার কিংবা ভগিনী নিজের
দখল করেছো শুনি দেখাই বাহাদুরি
জমি নিয়ে বাড়াইছো নিজ জমিদারি

তরুণ
এই নিয়ে সহিফা বানু, তোমার সৎ-ভগিনী
কাব্যে কথায় সে কথা তো তা লিখতে ছাড়েনি

ছহিফা
শাহে ছলেসা কাহা, শাহে সিকান্দার কাহা
খালি হাত সব কই গায়া দুনিয়ামে কই না রাহা
ইয়ে দুনিয়া ফানি হয়ে, এক রোজ যানে হোগা
রোজে হাশরে সে সব ইন্সাফ হোয়ে না
কাদির করিমকো কিয়া মোহ দেখানাওয়েলা
ছহিফা বেকুফনে এয়সে বেওকুফী কিয়া
হাছন কো খাতির কারকো বেসকো ডুবা দিয়া।

হাছন রজানে এয়সে জুলুম কিয়া
এতিম বেকুস কো লে কে আতিস মে ঢাল দিয়া
মালো মিলিকা আয়ছে লালচ হুয়া
বেকস এতিম পর জরা রহম না কিয়া।

হাছন
জুলুম করেছি কি করি নাই, ঠিক মনে নাই
তবে আজ তোমাদের জানাই
ছইফার ধন দেখে আমি নিজ পুত্রকে তার জামাই বানাই
যতটুকু দেয়ার কথা তার সব দেই নাই।

তয়, জীবনের শেষকালে এই বোধ হয়
আমি যদি ঠকাই তারে, সে-ই শেষ নয়
সমান ঠকার মালা নিজ গলে পরে যেতে হয়
এই সত্য, এটাই সত্য হয়, জেনো নিশ্চয়

এইটুকু জানি বলে শেষ কালে- ভাই
মিরাশদারি আমি ছেড়ে দিয়ে যাই
এক পুত্র বড়ো ভাগ পেয়ে যায় সার
বাকি সব ভাই বোন বিলাপে অসার

উইল করে দিয়ে যাই সম্পদ আমার
মানুষের কাজে যেনো হয় ব্যবহার
তার কিছু ছিলো কারো আহার-বিহার
আর কিছু ছিলো তার লেখা পড়াবার
এই নিয়ে না-খোশ ছিলো বাকীরা সবাই
তাহাদের কাছে আমি কদর না পাই
(আর তাই) দেখার হাওরে মোর ভাওয়ালী ভাসাই
আর সখীদের নিয়ে খোজি পিয়ারী সদাই

তরুণ
তখন ষাট ছিলো বয়স তোমার
তখনই কি সাধ হয় সংসার ছাড়ার?
(হাছন রাজা একটা জরির কাজ করা রুমাল দিয়ে তাঁর মুখের ঘাম মোছেন। এক সময় রুমালটি আলখেল্লার পকেটে ঢুকিয়ে দেন)

হাছন
ধীরে ধীরে সাধ জাগে জানিতে তাহার
পিয়ারীর রূপে যদি আসে একবার

গান
হাছন রাজার হইলো জ্বালা, দেখিয়ে সুন্দরী বালা
দৌড়িয়া দাফিয়া হাছন রাজা নাঙের ঘাটে গেলা
আঞ্জা করি ধরি তাইরে কোলে তুলিয়া লইয়া
মানুষ বলিয়ে ধরে দেখে নূরের পুতুলা
হাছন রাজার হইলো জ্বালা দেখিয়ে সুন্দরী ভালা

হাছন
চিশতিয়া তরিকার কথা ছিলো জানা
সেই পথ ধরে আমি শুরু করি গানা
শৌখিন বাহার খানা রেখে দিয়ে পাশ
আমি তো রচনা করি হাছন উদাস

গান
রূপের ঝলক দেখিয়া তার আমি হইলাম কানা
সেই অবধি লাগল আমার শ্যাম পিরিতির টানা॥
হাছন রাজা হইল পাগল লোকের হইল জানা
নাচে নাচে পালায় পালায় আর গায় গানা॥
মুখ চাহিয়া হাসে আমার যত আরি পরী
দেখিয়াছি বন্ধের মুখ ভুলিতে না পারি॥

তরুণ
কী করে তোমার মাঝে আসে, আর
নিজের সম্মুখে দেখো বন্ধুরে তোমার?

হাছন
হঠাৎ খোদারে পাই নিজের ভেতর
যখন নিজেই এসে বাধে তার ঘর
আমার কুটার ভেতর তাহার বিছানা
আমার বুকের ভেতর তার যে ঠিকানা
যখন নিজেই আসি নাড়াচাড়া করে
আমার দরোজায়, আর বারে বারে
আমারে চিনিয়ে বলে, দেখো মোর রূপ
তোমার ভেতরে আমি, বাস করি চুপ

গান
রূপ দেখিলামরে নয়নে আপনার রূপ দেখিলা মরে
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে
দেখা দিয়া প্রাণ লইয়া সামাইলো ভিতরে
আদম সুরত দেখা দিলো ধরিয়া আমারে'

হাছন
যখন যেমন মন যা কিছু চেয়েছিল
সবকিছু কাছে পেয়ে সব নিয়ে রেখেছিল
আর, কিছু কি ছিলো মোর বাকী?

সব ফাঁকি! সব কিছু ফাঁকি?
যে আমারে চেয়েছিল কাছে,
কিংবা আমি যারে পেয়ে নিয়ে গেছি পাছে
সে আমারে নাচায় লাফায়
যে আমার চিত্ত ভরে কাঁপায়
কখনো সে সুরমা বা কাপনার পাড়
কখনো হেরেম মোর, কখনো বাগাড়
কোন জাত কোন পাত কার ঝি, কার পরিবার
কিছুই বিচারি নাই যখন ক্ষমতা আমার
যখন সকলে তারা হয় মুখোমুখি
সকলের মাঝে আমি অন্য কিছু দেখি
কখনো পিয়ারী মোর কখনো যে মাতা
কখনো রমণী কোনো, কখনো বিধাতা

তরুণী — তাহলে পিয়ারী কে গো, প্রেমিকা তোমার?
লোকে বলে কতো আছে হাছন রাজার।
প্রেমের বাজারে নাকি করো বেচা কেনা
তবে তা কিসের কথা লোকমুখে শোনা?

হাছন — *প্রেমের বাজারে বিকে মানিক সোনা রে*
যে জন চিনিতে পারে লভ্য হয় তিনগুণা রে

প্রেমের বাজারে আমি বিকি হতে যাই
সোনা বন্ধে যদি কেনে ভরসা সদাই।
তার লাগি মন মোর ধৈর্য না মানে
না জানি কী ছিলো মোর মন মোহনে।

আশিক না হইলে তুমি মাশুক পাইবা না
একথা আমার নয়, সর্বলোকের জানা
তাঁর রূপ দেখে আমি হয়েছিনু ফানা
নাচিয়া লাফিয়া আমি গাই তাঁর গানা

গান — *কানাই তুমি খেইল খেলাও ক্যানে,*
রঙ্গে রঙ্গিলা কানাই, কানাই তুমি খেইল খেলাও ক্যানে
এই কথাটা হাসন রাজা, উঠে মনে মনে
হাসন রাজা জিজ্ঞাস করুইন কানাই বা কোন জন
ভাবনা-চিন্তা কইরা দেখি, কানাই যে হাছন

তরুণ — তোমার ভেতরে তুমি খোদারে যে পাও
কানাই রে খুঁজিয়া শেষে নিজেতে মিলাও
আইনুল (আন-আল) হক বলে প্রকাশ তোমার
এর মাঝে ভেদ কি গো শোনাও এবার

হাছন — এমন কথা আমি বলিনি পহেলা
নিজেরে জানিবার কথা বহুকাল আগে থেকে বলা

হজরত আলী কথা শুনেছিতো বহু
'মান আরাফা নফসাহু, ফাকাদ আরাফা রব্বাহু'
হোসেন মনসুর কিবা বোস্তামী বায়েজিদ
'আনা হিয়া' বলা সেই ইবনুল ফরীদ
সকলে এমন কথা বলে বহুবার
রুমীর বয়ানেও তার আছে বিস্তার

হাছন — *আমি হইতে আল্লা রছুল, আমি হইতে কুল।*
পাগলা হাছন রাজা বলে, তাতে নাই ভুল॥
আমা হইতে আসমান জমিন আমি হইতেই সব।
আমি হইতে ত্রিজগত্, আমি হইতে রব॥
মম আঁখি হইতে পয়দা, আসমান জমিন।
কর্ণ হইতে পয়দা হইছে, মুসলমানী দিন॥
শরীরে করিল পয়দা, শক্ত আর নরম।
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম॥
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় আর বদবয়।
আমি হইতে সব উত্পত্তি হাছন রাজা কয়॥

তরুণ — কী করে পাওয়া হয় বন্ধুরে তোমার?
মোল্লা মৌলভি তুমি ক্ষেপিয়ে বারংবার
কি করে বিশ্বাস কর তুমি পেয়ে যাবে পার
তোমার ঐ কথার মানে কে আছে শোনার?

হাছন — মোল্লা পুরুত কিছু ভণ্ডের দল
কাতারে কাতার যেনো বর্ষার ঢল
জানে না কিসের বাণী কার কাছে কয়
কী তাহার ভেদ আছে, মানে কী হয়।
রাকাত রুকু আর সেজদার পর
পরনিন্দা পরচর্চায় থাকে দিনভর
লোক দেখানোই যার বড় কারবার
সে-ই ভাবে এই দিয়ে হয়ে যাবে পার
তাদেরে বলি আমি
জানে সত্য অন্তর্যামী

আমি নামাজ পড়মু কেমনে দিয়া
যেদিকে ফিরাই আঁখি সেদিকে যে প্রিয়া

নামাজ-রোজা ছাড়ছি আমি বেহেস্ত যাওয়ার ভয়
নামাজ-রোজা পড়লে বেস্তে যাইবেরে নিশ্চয়
পরের মন্দ ছাড়িয়া দিছি দোজখেরই ডরে
বেহেস্ত-দোজখ এরাফে বন্ধু নিওনাগো মোরে

বন্ধু ছাড়িয়া থাকবো না গো এই মনে চাই
যখন যেখানে থাকি, তারে যেনো পাই।

হাছন রাজায় বলে আমি না রাখিব জুদা
মুল্লা মুনসীর কথা যত সকলই বেহুদা
হাছন রাজার বন্ধুকে মুল্লা নাহি দেখে
আজলের আন্ধি লাগছে কট মুল্লার আঁখে।

গান — *না চাই ধন, না চাই জন, না চাই জমিদারি।*
হাছন রাজার মনোবাঞ্ছা থাকত চরণ ধরি॥
পূর্ণ কর আকাঙ্ক্ষা প্রভু, ভক্তি করি তোরে।
পদতলে রাখ আশিক হাছন রাজারে॥

হাছন — এ কেবল আমার নয়
কথাটা কৃষ্ণেরও হয়–
অর্জুনকে বলেছিলো, শোনো– কথাটা সহজও
'সর্ব ধর্মান পরিত্যাজ্য, মামেকাং শরণং ব্রজো'
সকল ধর্ম ছেড়ে তুমি আসো আমার দিকে
আমি তব করি মুক্ত সকল পাপের থেকে

কৃষ্ণ যেমন ভর করিলো শৈশবের বেলায়
কৃষ্ণ আবার হাজির হলো বৈকালী বেলায়

গান — *আমি তোমার কাঙ্গালী গো সুন্দরী রাধা,*
আমি তোমার কাঙ্গালী গো।
তোমার লাগিয়া কন্দিয়া ফিরে,
হাছন রাজা কাঙ্গালী গো॥

তোমার প্রেমে হাছন রাজার, মনে হুতাশন।
একবার আসি হৃৎকমলে, করযজ্ঞে আসন॥
কান্দে কান্দে হাছন রাজা পড়ে আছাড় খাইয়া।
শীঘ্র করি প্রাণ প্রিয়সী, কোলে লও উঠাইয়া।

হাছন *হিন্দুযজ্ঞে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদা।*
রাধা বলিয়া ডাকিলে, মুল্লা মুন্সি যে দেয় বাধা॥

হাছন রাজা বলে আমি, না রাখিব যুদা।
মুল্লা মুন্সির কথা যত সকলই বেহুদা॥
এখন কী করি?
আমার অন্তরেতে যদি থাকে শ্রী হরি
আমি কি তোর যমকে ভয় করি?

তরুণ, তোমার অন্তরে আছে আল্লা, হরি
তবে কোথা থাকেন তোমার সই-পিয়ারী?
কোথায় রাখিবে তব দিলারাম, যামন
আরবজান,.সোনাজান অথবা মিশ্রিজানের মন?

তরুণী(১) *তোমরা হুনছোনি গো সই*
হাছন রাজা দিলারামের মাথার কাঁকই

তরুণী(২) *ধর দিলারাম ধর দিলারাম ধর দিলারাম ধর*
হাছন রাজারে বাইন্ধ্যা রাখ দিলারাম তোর ঘর

গান *ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে গো দিলারাম*
ঠাকুরকে রাখ হিয়ার মাঝে
হাছন রাজা ঠাকুর তোমার সকলের প্রধান
তাঁর হাতে সঁপিয়া দেও কুল আর মান গো

হাছন ওসব সকলে মোর কলিজা পরাণ
তাদের ভেতরে আছে হাছনের জান
তাহারা শেখায় পড়ায় আর দে জ্ঞান
তাহাদের মাঝে আমি খুঁজি মোর জান

যেজন দিলারাম আছে, যে আমার সই
দিলের আরাম আনে জানো নিশ্চয়ই
হাছনের পিয়ারী যে জন, আর কেউ নয়
হাছনজানের রাজা সে ই তো হয়।

তোমাদের কাছে ছিলো রাজা যেই জন
এই আমি ছিলাম না কভু সেই জন
যে আমার রুহু ছিলো, যে আমার প্রাণ
সে ই তো পিয়ারী মোর সে হাছনজান

গান *ছটফট করে হাছন রাজা দেখিয়া চাঁন মুখ*
হাছন জানের মুখ দেখিয়া জন্মের গেল দুখ॥
হাছন জানের রূপটা দেখি ফালদি ফালদি উঠে
চিড়া বাড়া হাছন রাজার বুকের মাঝে টুঁটে॥

এ গানটি গাইবে আগের সেই দল, নাটকের শুরুতে যে দলকে দেখা গিয়েছিলো গান গাইতে গাইতে মঞ্চে ঢুকেছে, তারাই গাইবে এবং শহর থেকে আসা চরিত্রগুলো নিজেদের চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে যাবে। একেবারে সূচনাদৃশ্যের মতো। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের পর্দায় ভোরের আলো ফোটার লক্ষণ দেখা যাবে। একটা মোরগের ডাক শোনা যাবে। এবং ধীরে ধীরে হাছন রাজার সঙ্গে আসা চরিত্রগুলো পর্দার আড়ালে মিলিয়ে যাবে।

মঞ্চের বাকি পাত্র-পাত্রীরা হতবিহ্বল। তারা ঠিক বুঝতে পারছেন না, এখন কী করা উচিত। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন।

মাঝি এমন কোথা আমি আগে কইছি না?
ফজরের পরে তারে কেউ পায় না

যিনি ক্যামেরায় ধারণ করেছিলেন, তিনি তার ফুটেজ রিওয়াইন্ড করে এলসিডির দিকে, তাকালেন। কিছু নাই এখানে;
ব্যস্ত হয়ে সাংবাদিক তার ক্যাসেট রিওয়াইন্ড করেন।
তরুণীরা তাদের সেলফোনের ফোটো গ্যালারিতে খোঁজেন।

চিত্রনির্মাতা একি ! এসব কী দেখি এই পর্দায় আমার!
শুধু যে আকাশে দেখি, চাঁদ পূর্ণিমার

সাংবাদিক (ভয়েস রেকর্ডার কানের কাছে লাগিয়ে)
আমি তো শব্দ শুনি শন শন আর
শুনি না কোনো কোথা হাছন রাজার

তরুণী (১)(সেলফোন দেখিয়ে)
এসব কী দেখি, আমার ডিসপ্লে?
ভরে আছে শুধু এই হাওরের জলে!

তরুণী (২)আমার ফোনেও তো কিছু দেখি নাই
শুধু একখানি দেখি নায়ের গলুই

(এমন সময় গায়ক হঠাৎ দেখে মঞ্চের এক কোনায় পড়ে আছে একটা জরির কাজ করা রুমাল। তারা সবাই চমকিত হয়। এই রুমাল দিয়ে এক সময় হাছন রাজা মুখ মুছেছিলেন। সব পাত্র-পাত্রী বিহ্বল।)

গায়ক তবে কি ছিলেন রাজা এই বহরে?
মহা পূর্ণিমার আজ দেখার হাওড়ে
যদিবা ছিলেন তিনি, এখন কোথায়
চিহ্নসব সাথে নিয়ে কোথায় উদাও?

আমাদের আরো কথা ছিলো জানিবার
অপারে কি আছে এই হাছন রাজার
জগতের রাজাগিরি ছাড়িবার পর
অপারে কেমন থাকে তার বাড়িঘর?

আবার কখন যদি দেখা হয় আর
কোনো এক বর্ষার রাত পূর্ণিমার
তখন নিশ্চিত তারে জিজ্ঞাসিব সোজা
জানিব কেমন আছে- হাছনজানের রাজা

খুব ধীরলয়ে গানটি গাইতে গাইতে সকল কুশিলব একত্রিত হয়ে দর্শকদের সম্ভাষণ জানাবে

গান ছটফট করে হাছন রাজা দেখিয়া চাঁনমুখ
হাছনজানের মুখ দেখিয়া জন্মের গেল দুখ॥
হাছনজানের রূপটা দেখি ফালদি ফালদি উঠে
চিড়া বাড়া হাছন রাজার বুকের মাঝে টুঁটে। ❖

(নাট্যকারের অনুমতি ছাড়া এ নাটক মঞ্চায়ন করা যাবে না)

শিল্পী শাহাবুদ্দীন আহমেদ

ছবি : : সাজ্জাদ হোসেন

শাহাবুদ্দীন আহমেদ

শিল্পজীবন : প্যারিস পর্ব



শিল্পকলা

এক.

আজকের জগতে কোনো আর্কিটেক্ট, কোনো সিনেমা পরিচালক কিংবা ফটোগ্রাফার; যাই বলি– তারা যদি চিত্রকর্ম না বোঝেন, তারা যত বড় প্রতিভাই হোক ওপরে যেতে পারবে না। সোজা কথা অসম্ভব।

ঢাকায় যেমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে, হইছে ভাই, দিয়া দেন, চলবে– এমন একটা মনোভাব; কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় কোয়ালিটি অন্যরকম একটা জিনিস।

আজকের বাংলাদেশে যেমন প্রকৌশলেই ধরা যাক– মাজহার ভাই মানে স্থপতি মাজহারুল ইসলামের পর সেই জায়গা পর্যন্ত কেউ যেতে পারছে না কেন! এই যে আধুনিক আর্কিটেক্চার ব্যাপারটাই তো আসছে বাইরে থেকে। তেমনি অয়েল পেইন্টিং আমরা জানতাম না; এগুলো ইউরোপ থেকে। আমাদের পটচিত্র ছিল, মুঘল আমলে হয়তো কিছু নানান ধরনের চিত্রকর্ম দেখা যায়– কিন্তু অয়েল পেইন্টিং তো আসছে বাইরে থেকেই। আর্কিটেক্চারেও তেমনি। আমাদের তো বেশিরভাগই কুঁড়েঘর। ধীরে ধীরে মুঘলরা এলো, ব্রিটিশরা এলো; তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন কৌশল আমাদের এখানে প্রবেশ করতে থাকল। আসলে নির্মাণকলার উৎকর্ষটা ওদেরই আগে হয়েছে। কিন্তু কৌশল আর এসব মেটেরিয়ালের কথা বাদ দিলে চিত্রকর্মে আমাদের মৌলিক দিক হলো আমাদের 'লাইট'। বর্ষা, শরৎ, হেমন্তের একেক সময় একেক রকম আলো। প্রকৃতিরই কতগুলো নিয়ম-কানুন আছে আমাদের প্রকৃতির ভেতরের দিকটা খেয়াল করতে হবে। তবে আমাদের সাহিত্য এসব ব্যাপারে এগিয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই। কিন্তু ছবি আঁকায় তেমনটা নয়। এসব আমি হয়তো বুঝতাম না ওইখানে, মানে প্যারিসে না গেলে।

যখন গেলাম– ল্যুভর, প্যারিস, বিখ্যাত সব চিত্রকর্ম দেখতে দেখতে আমি তো বিমোহিত; ল্যুভরে অনেক সময় ক্লাসও করেছি। মিউজিয়ামে রাখা বিখ্যাত ছবিগুলোকে দেখে দেখে কপি করার ক্লাস। রোম, আমস্টারডাম, এথেন্স, স্পেন– এ কোন জগতে এলাম! এতসব কিছু দেখতে দেখতে আমার ভেতর থেকে কী যেন একটা ধসে যেতে লাগল। বাংলাদেশ থেকে যে ভিত্তিটা আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে, সেটা যেন মুহূর্তেই ক্ষুদ্র হয়ে গেল। মনে হচ্ছে, যে স্বপ্ন নিয়ে এখানে এসেছি তা আর সফল হবে না। আশাহত মন নিয়ে ঘুরে বেড়াই এখানে-সেখানে। কোনো ছবি আঁকতেই আর ভালো লাগে না; দেশে থাকতে, এমনকি মুক্তিযুদ্ধে থাকতেও যেই আমি প্রতিনিয়ত এত ছবি আঁকতাম– সেই আমার

কোনো ছবিই আর ভালো লাগছিল না। ছবি আঁকার মনটাই নষ্ট হয়ে গেল। অসুস্থ-পাগলপ্রায় অবস্থা– যাকে বলে 'লস্ট'। সমুদ্রে পড়ে গেলে যেমন হয়, হাবুডুবু খেতে খেতে মরে যাওয়ার মতো অবস্থা। প্রায়ই আমাকে ওষুধ খেতে হতো।

স্কলারশিপের প্রথম এক বছর তো ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স। বাংলাদেশ থেকে প্যারিসের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় আমার সে কি উৎসাহ-উত্তেজনা! প্লেনে ওঠার পর সবকিছুই কেমন কেমন হয়ে যায়। মনে আছে, যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। সকালে নামলাম প্লেন থেকে; এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আমাদের চোখে-মুখে একটাই প্রশ্ন– কোথায় ঘুমাব?

কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলল, আপাতত এখানে লাঞ্চ কর। একটু পর বাসে করে শহরটা ঘুরিয়ে দেখাল। সন্ধ্যায় ডিনার শেষে বলে, আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। আমরা তো অবাক! মনে মনে ভাবছি, ট্রেনে কোথায় নিয়ে যাবে? প্যারিসেই তো! ভাষাও বুঝি না। কী সব বলছে। শেষমেশ যা বুঝলাম, ট্রেনে আমাদের অন্য শহরে পাঠিয়ে দেবে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করার জন্য। কিন্তু আমরা সবাই ভেবেছিলাম, হয়তো শহরটা বড়– এক মাথা থেকে অন্য মাথায় যেতে ট্রেন ধরতে হয়। কিন্তু সেই ট্রেন যদি হয় সারারাত!

সে রাতে ট্রেনে আর কেউ নেই– খালি আমরা চৌদ্দজন বাঙালি। কী আজব ব্যাপার! আমাদের চৌদ্দজন স্কলারশিপে গিয়েছিলাম বাংলাদেশ থেকে। সেখানে চিত্রকলা ছাড়াও স্থাপত্য, প্রকৌশল বিভাগের মত নানারকম শিক্ষার্থী। তার মধ্যে আমরা দু'জন মাত্র তরুণ। ২৪ বছর হবে বয়স। আরেকজন বুয়েটের তপন। সাংঘাতিক মেধাবী। বাকি সবাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক। সবাই ছিল একটু মান্ধাতা আমলের ধ্যান-ধারণার মানুষ। তাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না। সারারাত ভয়ানক ঠাণ্ডায় আমাদের প্রায় জীবন বের হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। হঠাৎ রাত ২টার সময় ট্রেনের কন্ট্রোলার এসে হিটার চালু করে দিল। আমরা যেমন প্রাণ ফিরে পেলাম। এর পর দেখি উল্টো অবস্থা, কিছুক্ষণের মধ্যে কান-টান সব গরম হয়ে গেল। সে কী এক বিব্রতকর অবস্থা!

৯ অক্টোবর গিয়ে পৌছালাম এক গ্রামের মতো একটা জায়গায়। স্টেশনে তেমন কেউ নেই, বিরান স্টেশন। কিছুক্ষণ পর দেখি, একলা একটা মহিলা আমাদের নিতে এসেছে। তার সঙ্গে যেতে যেতে আমাদের তো কান্নাকাটির মতো অবস্থা। আর কিছুদূর যাওয়ার পর শুনি সমুদ্রের গর্জন। সমুদ্রের ধারে পৌছে আবার যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। সমুদ্রের সে জায়গাটা অনেকগুলো সিনেমায় দেখা যায়। লঙ্গেস্ট ডে, সেভিং প্রাইভেট রায়ান এমন আরও বেশকিছু ছবির শুটিং হয়েছে, পরে দেখেছি।

সমুদ্র, বাতাস– এমন একটা জায়গায় ঠাণ্ডা মাথায় ভাষা শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে এটা আমাদের জন্য প্রথম শাস্তি। এক মাস ক্লাস। ফ্রেঞ্চ শেখা শুরু হলো। কিন্তু আমার ভেতরে ঢুকল– শালার, আসলাম ছবি আঁকতে, এইসব ফালতু জিনিস দিয়ে আমার কী হবে? আমার না, ভেতরে কেমন ভয় ঢুকে গেল। এক মাস গেল, দেড় মাস গেল টুকটাক ছবি আঁকি। মনে মনে ভাবি, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে মেলাঘরে বসেও ছবি আঁকলাম, আর এইখানে আমারে পাঠাইছে ভাষা শিখতে। দূরে থাকলে দেশের কথা বেশিই মনে পড়ে। দেশ থেকে চিঠি আসতেও সময় লাগে। আস্তে আস্তে আমি কেমন নিরুৎসাহিত হতে লাগলাম। দুর্বল হয়ে যেতে লাগলাম। তবে অন্যদের দেখছি, তারা দিব্যি আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার ছবি আঁকতে না পারার অস্বস্তি দিন দিন বাড়তেই থাকল। আর ছোট শহর, ছবি আঁকার রঙ-টঙও পাওয়া যায় না তেমন। প্যারিস এখান থেকে ৭০০ কি.মি. দূরে। মাথাই নষ্ট হওয়ার জোগাড়।

আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে দু-তিনশ স্টুডেন্ট– সেখানে ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল নানান দেশের ছেলেমেয়ে। আর শহরটায় জোয়ান-বুড়ো মিলে সর্বসাকল্যে ২০০ জনের মতো মানুষ। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই শহরটাই ভরে ওঠে আশি-নব্বই হাজার মানুষে। সি-বিচ শহর, সব বাড়িগুলি বন্ধ। গ্রীষ্মে এর সবগুলো খুলে যায়।

একদিন সমুদ্রের পাড় দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ অনেক দূরে দেখি, একটা জটলা মতন। সেই জটলার ফাঁক দিয়ে একটা ইজেল দেখা যাচ্ছে, একটা মহিলা ছবি আঁকছে। আমার চোখেমুখে যেন খুশি খুশি। এতদিন পরে ছবি আঁকার কিছু পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি মহিলাটি ঢেউ, পাথর-টাথর কী কী যেন আঁকছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগলাম। অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশে মহিলাটা বিব্রত হচ্ছে। আর কী কী বলছে, আমি তো বুঝি না। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো। মহিলা তো ঠিকঠাক আঁকতেও পারছে না– আমার ইচ্ছা করছে বলি, কিন্তু ভয়ে আর ফ্রেঞ্চ না পারায় বলতেও পারছি না। হঠাৎ ইন্ডিয়ান একটা ছেলে গি। গি এখানে এসেছে চার মাস হলো। সেই ছেলেটাকে দেখি পাশ দিয়ে দৌড়াচ্ছে। গিকে ডাক দিয়ে বললাম, গি দেখত মহিলা কী বলে? মহিলা ইজেল প্রায় গুটিয়ে নেবে– সেই সময় হঠাৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল– কী? আমি বললাম, আমি আর্টিস্ট। মহিলা তো দেখি খুশি– কী! আর্টিস্ট! ব্রাশ, প্যালেট আমার দিকে এগিয়ে দিলো। আমি দশ মিনিটের মধ্যে একটা ছবি এঁকে ফেললাম। মহিলা তো এটা দেখে মাটিতে বসে পড়ল। মুগ্ধ হয়ে গিকে বলছে, ইউ আর ফ্রেন্ড, প্লিজ কাম ফর এম্পারিটিভ। আমি তো বুঝি না এম্পারিটিভ কী? গি বলল, চল চল। দুই মিনিটের রাস্তা হেঁটে আমরা গেলাম মহিলার বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকতেই মহিলার কুকুরটা ডাকাডাকি শুরু করল। পিচ্চি একটা কুত্তা। মহিলার সব জিনিসপত্র আমার হাতে। মহিলা কী বলে গি বোঝে না ঠিকঠাক। আমরা বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকে তো দেখি– হায় হায়, এ কোন জগতে এলাম! দরজা থেকে শুরু করে উপরে-নিচে, চারদিকে কুকুরের, ফুলের, গাছের, আরও বিচিত্র সব জিনিসের ছোট ছোট ছবি। এর সবগুলো এই মহিলার আঁকা। অ্যামেচার ছবি। কিন্তু এগুলো সবই সে নিজে এঁকেছে। আমি তো ভাবছি, যাক বাবা এতদিনে আসল জায়গায় এলাম।

ঘরে বসলাম। মহিলা আমাদের সেই এম্পারেটিভ দিলো– খেলাম। আমি প্রথম জীবনে এমন জিনিস খেলাম। সর্বনাশ– খেয়ে তো শরীর গরম হয়ে গেল। কেমন কেমন জানি লাগে! ওদিকে মহিলা গি কে বোঝাল– আমি যদি সপ্তাহে একবার তাকে ছবি আঁকা শেখাই, তাহলে কত টাকা দিতে হবে। আমি তো শুনে বলি– নো, নো, নো মানি। লাগবে না, প্রত্যেক দিনই আসব। মহিলা তো অবাক। ফ্রান্সের মতো দেশে টাকা ছাড়া কাজ করা তো অসম্ভব ব্যাপার। মহিলা তো খুশি। আমিও প্রতিদিন যাই তার বাসায়। যেতে যেত পারিবারিক একটা সম্পর্ক হয়ে গেল তার সাথে। তার নাম 'ইবন'। আমি তাকে তন্‌ত ইবন বলে ডাকি। তন্‌ত মানে চাচি। সেই তন্‌ত ইবনের হাত ধরেই যেন ফ্রান্সের মাটিতে ঘুরে গেল আমার ইতিহাস।

দুই.

ওই যে প্রতিদিন তন্‌ত ইবনের বাসায় যাই– ধীরে ধীরে আমি তার পরিবারের একজনে পরিণত হলাম। আমি আর কোথাও যাই না। ওই বাসায় গিয়ে প্রতিদিন ছবি আঁকি। তন্‌ত ইবনকে শিখাই। সেও কোত্থেকে কোত্থেকে টেলিফোন করে আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে রঙ আনায়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনিয়ে রাখে আমার জন্য। অনেকটা মায়ের মতো হয়ে গেল সে আমার। বৃদ্ধ ইবনের জীবনে যেন একটা ফুল ফুটল।

ওনার বয়স তখন পঞ্চান্ন হবে। তার স্বামি একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। এখান থেকে প্রায় ৩০ কি.মি. দূরে তাদের একটা জুতার দোকান ছিল। ইবন তখন অন্তঃসত্ত্বা। একদিন গাড়িতে করে দোকানে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তার স্বামী মারা যায়। আর পেটের সন্তানটাও নষ্ট হয়ে যায়। তার পর থেকেই সে সম্পূর্ণ একা। হাসপাতাল থেকে তাকে বলা হয়েছিল সে যাতে নাচ, গান বা ছবি আঁকার মতো কিছু একটাতে ব্যস্ত থাকে। সে ছবি আঁকাটাকেই বেছে নিয়েছিল।

এখন তার জীবনে নতুন আরেকজনের আবির্ভাব হলো। সন্তানের মতো। আবার ছবি আঁকা থেকে শুরু করে সবকিছুই আমি করতে পারি। আমার তরুণ বয়স- দারুণ উদ্দাম। অনেক সময় রান্নাবান্নাও করি সে বাড়িতে। আর আমি ছবি আঁকতে পারছি- এটাই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ। আর উনি পেয়েছেন তার নিঃসঙ্গ জীবনের একজন সঙ্গী।

কিন্তু ঝামেলাটা শুরু হলো ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের ক্লাসে। আমি ক্লাসে যাই না ঠিকমতো। আমার নামে রিপোর্ট এসেছে। একদিন কোর্সের ডাইরেক্টর আমাকে ভেরিফাই করতে এলেন। সে তো দেখে অবাক! দেখে আমি ছবি আঁকি। আবার ভাষাটাও পারি। কিন্তু তারা যে কোর্স করায় বেশিরভাগই তার বাইরের কথাবার্তা! কারণ আমি তো ইবনের বাড়িতে থাকতে থাকতে গৃহস্থালী জিনিসপত্র থেকে শুরু করে এইরকম কতকিছুর নাম শিখে বসে আছি। ডাইরেক্টর তো থতমত। এই ছেলে স্কুলে যায় না- কিন্তু শিখলো কোত্থেকে! আমি তাকে ইবনের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। গিয়ে বললাম- দিস ইজ মাই মাদার। ভদ্রলোক কী বলবে বুঝে উঠতে পারছেন না। আমার আঁকা ছবিগুলো দেখে তিনি তো আরও অবাক। তিনি উল্টো আমাকে আরও উৎসাহ দিলেন। আমি তো ফ্রেঞ্চ একজন মহিলার ঘরের লোক হয়ে গেলাম। ফ্রান্সের মতো একটা দেশে ছবি আঁকার স্কলারশিপ করতে গিয়ে আর কী চাই। কোর্স ডাইরেক্টর আমাকে বললেন, তোমার কী লাগবে আমাকে বল। আমি তোমার এক্সিবিশন আয়োজন করে দিচ্ছি। করলাম এক্সিবিশন। সব ছবি বিক্রি হয়ে গেল। বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

এক্সিবিশনের ছবি বিক্রির সব টাকা উনি রেখে দিলেন। বললেন, 'আমার কাছে থাক, তোর কাছে থাকলে তুই সব নষ্ট করে ফেলবি। এমনকি তিনি আমাকে দিয়ে দেশে আমার মায়ের কাছে চিঠিও লিখিয়ে দিলেন। আজব এক লোক। মাকে লিখলাম। এমনকি সেই লোককে আমি ক-খও শিখিয়েছিলাম।

কিন্তু এরপর এলো আগস্ট মাস। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট। সে দিন সমুদ্রের ধারে বসে আছি। হঠাৎ দেখি তনত ইবন হন্তদন্ত হয়ে আমার দিকে দৌড়ে আসছে। কাছে এসে বলল, শাহাবুদ্দীন, শাহাবুদ্দীন বাসায় চল। টিভিতে দেখলাম তোমাদের দেশে কী যেন হয়েছে। খুব ভয়াবহ কিছু। অমি তো বুঝতে পারছি না। বাংলাদেশে আবার কী হবে! বাসায় এসে চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ চোখে পড়ল- ঢাকার রাস্তায় ট্যাঙ্ক। খবরে বলছে, দ্য টাইগার অব বাংলাদেশ ওয়াজ কিলড। আমি মুহূর্তেই বোবা হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম সেদিন। ফ্রান্সে প্যারিস থেকে ৭০০ কি.মি. দূরের এক সমুদ্রসৈকতে বসে দেখলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস উল্টো দিকে ঘুরে গেল। আমার এত কাছের, এত পছন্দের একটা মানুষ- যে আমাকে এখানে পাঠাল, সেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে মেরে ফেলা হয়েছে।

এ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সময় লেগেছে অনেক। আমি কোর্স শেষ করে প্যারিসে চলে এলাম।

এখানে আরেকটা মর্মান্তিক ঘটনা বলি- তনত ইবন জীবনে কোনোদিন প্যারিসে যাননি। আমি প্যারিসে চলে যাচ্ছি- সে কী কান্না। আমি চলে গেলে সে আবার একলা হয়ে যাবে। তাকে বুঝিয়ে বললাম, কত মানুষ আসা-যাওয়া করবে, আমিও কয়েক মাস পরপর আসব। তবু তার কান্না থামে না। ভীষণ মন খারাপ অবস্থায় রেখে তার বাড়ি থেকে আমি প্যারিসের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম। আর আমার মনের অবস্থা আর নাইবা বললাম। কিন্তু যে মহিলা ফ্রান্সে থেকেও তার সারাজীবনে প্যারিসে যাননি, তিনি আমাকে দেখতে একদিন প্যারিসে চলে এসেছিলেন। এবং সবচেয়ে অদ্ভুত যে বিষয়টি, আমার সেই তনত ইবন মারা যাওয়ার সময় তার সব সম্পত্তি আমার নামে উইল করে গেছেন। কিন্তু আমি তো সম্পত্তির জন্য তাকে সময় দিইনি! তনত ইবন ছিল আমার জীবনের এক বিরাট আশির্বাদ।



ফ্রান্সিস বেকনের আত্মপ্রতিকৃতি

তিন.

প্যারিসে এসে ফাইন আর্টসে ভর্তি হলাম। যে কোনো শিল্পীরই প্রিয় শিল্পী থাকে। কারও দ্বারা শিল্পী বেশি অনুপ্রাণিত হন। প্রত্যেকটা নতুন সৃষ্টির পেছনেই পরম্পরা থাকে। আমি প্যারিসে ঘুরে ঘুরে অনেক বিখ্যাত ছবি দেখতে লাগলাম। মনের মতো কোনো শিল্পীকে খুঁজে পাচ্ছি না। কেমন ছবি আঁকব? আমার ভালো লাগাটা কেমন? এসব ভাবতে ভাবতে দিন কাটে। অনেকের ছবি ভালো লাগে- কিন্তু আমার অন্তরে ধরে না।

কত কী করেছি! এক সময় অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিংও করেছি।

সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি নিয়ে প্রদর্শনী করেছি। বিক্রিও হয়েছে, কিন্তু পরে এইসব ফালতু জিনিস আমার নিজের কাছে ভালো লাগেনি।

প্যারিসে এসে প্রথম দিন থেকেই আমি আমার সেই প্রেরণাকে খুঁজতে থাকলাম। যেমন ধরা যাক গয়া- স্পেনে গেলাম গয়ার কাজ দেখতে। তেমনি রেমব্রান্ত, ডেভিড হকনে, ড্যালাকুয়া এমন অনেক শিল্পীর কাজ দেখছি- ভালো লাগছে। বিস্মিত হচ্ছি কিন্তু মনের মতন হচ্ছে না। ১৯৭৭-এর অক্টোবরের দিকে আমার ছবি আঁকায় মূল পরিবর্তনটা ঘটে যায়।

প্যারিসে ফাইন আর্টস স্কুল যেটা- ইকল দ্য বুজ আর্ট; ফ্রেঞ্চ ইকল অর্থ স্কুল আর বুজ আর্ট মানে ফাইন আর্ট যেটাকে বলে। বিশ্বসেরা ফাইন আর্টের স্কুল। ইকল দ্য বুজ আর্ট এলাকাটিই শিল্পীদের এলাকা। আমাদের যেরকম শাহবাগ। বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর সব মিলিয়ে শিল্প-সাহিত্যের একটা পরিবেশ। যেখানে জন পল সার্ত্রের সিক্সটি এইট মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল, ওই এলাকাটায়। এলাকাটায় প্রায় দুইশ' আর্ট গ্যালারি আছে। শিল্পকলা নিয়েই ওখানকার যতসব কাজ-কারবার। ওখানকার যে মূল গ্যালারি- সেটাতে মাতিস, পিকাসো, জ্যাক মেতির মতো পৃথিবী বিখ্যাত সব পেইন্টারের কাজ ঝোলানো আছে। শুরু থেকেই আমার মনে একটা স্বপ্ন ছিল- আমি এই গ্যালারিতে একদিন এক্সিবিশন করব। সহপাঠী অনেককেই দেখতাম তারা কীসব ফাইলপত্র নিয়ে, ড্রইং নিয়ে বিভিন্ন গ্যালারিতে ছোটাছুটি করে। আমি কখনই তেমন করিনি। যেতামও না সেইসব গ্যালারিগুলোতে। আমার একটাই কাজ- ক্লাস শেষ করে এই গ্যালারিতে এসে ঘুরি। কাছাকাছি গ্যালারিগুলোতে এক্সিবিশন হলে মাঝে মধ্যে গেছি- কিন্তু কোনোদিন ভাবিওনি যে, সেগুলোতে কোনোদিন আমার ছবির প্রদর্শনী করব। প্রতিদিন যাই বলে গ্যালারির সবাই চেনে অমাকে। বারবার যাই, বারবার ছবিগুলো দেখি। একদিন আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়ে দেখি, গ্যালারিতে প্রচুর ভিড়ভাট্টা। সামনে যেতে পারছি না। কিন্তু পেইন্টিং দেখে তো আমি আকাশ থেকে পড়ে গেলাম। মনে হলো, একেই তো খুঁজছিলাম। ছবির পাশে একজন লোক বসা। সবাই হাত মেলাচ্ছে। আমিও হাত মেলালাম। পরে শুনি এর নামই ফ্রান্সিস বেকন।

বাসায় ফেরার পরও দেখি চোখের মধ্যে ভাসছে। মনে হচ্ছে কি আঁকি এসব! আজ থেকে সব বাদ। আমার ছবি আঁকার জগতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। সে সময়টায় সবকিছু মিলিয়ে আমার মানসিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। দেশের অবস্থাও ভালো নয়। বঙ্গবন্ধুকে মেরে চক্রান্তকারীরা দেশ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি- তিনিও বললেন আসিস না এই দেশে, ওখানেই থাক। মানে সবকিছুই কেমন নেগেটিভ।

যাই হোক, পরের দিন আবার গেলাম গ্যালারিতে। খোঁজ নিলাম, আমি যেভাবে আঁকি সেইভাবে এরকম ছবি আঁকা যাবে না। এই প্রক্রিয়াটা আরও বিশাল। রঙের গুদামে চলে গেলাম, যেখান থেকে রঙ সস্তায় কেনা যায়। কারণ আমার অনেক রঙ লাগবে। বড় বড় ব্রাশ কিনলাম, রঙ কিনলাম। প্যালেট-টেলেটসহ ছবি আঁকার ব্যবস্থাটাই পাল্টে ফেললাম। এখন যেভাবে আঁকি। আগে তো সেই ক্ল্যাসিক পদ্ধতিতেই আঁকতাম। সেগুলো ফেলে দিলাম।

স্কুলে ক্লাস সকালে। মডেল দেখে দেখে ছবি আঁকি। কিন্তু দেখা গেছে, পনেরো দিনের কাজ আমি তিন দিনেই শেষ করে ফেললাম। তারপর আবার করলাম। যে জন্য আমার ফিগার ড্রইংটা তখন থেকেই মজবুত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে গেছি, সে জন্য অনেক জায়গায় আমার ব্যাপারটা ওরা মেনে নিতে পারত না। কিন্তু আমার কাজের গতি আর পরিশ্রম আমার জন্য প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছে। যুদ্ধটা সহজ হয়ে গেছে।

স্কুলের মূল ক্লাস সকালবেলা। বিকেলে লিথো, হিস্ট্রি অব আর্ট, মোজাইক- থিওরির এমন আরও অনেক ক্লাস- যার যার যেটা দরকার করতে চলে যায়। দু-একজন আছে ছবি আঁকে। বিকেলটায় তাই আর্ট স্কুল ফাঁকাই পড়ে থাকে। ওই সময়টাতেই আরম্ভ হলো আমার ছবি আঁকার নতুন জীবন। ওই যে ফ্রান্সিস বেকনের ছবি দেখে এলাম, সেই ছবিগুলোই একেবারে সরাসরি নকল করা শুরু করে দিলাম। ছবি এঁকে সেগুলো আবার লুকিয়েও রাখি- নকল ছবি তো, মানুষজন দেখলে কী বলবে! প্রত্যেক দিন ছবি আঁকি। ছবি আঁকতে আঁকতে দরকার পড়লে, কাছেই গ্যালারি, দৌড় দিয়ে গিয়ে দেখে আসি।

একদিন দুইদিন তিনদিন- বন্ধুরা জেনে ফেলেছে যে, আমি বেকনের ছবি নকল করা শুরু করেছি। কিন্তু প্রফেসর এখনও দেখেননি। বন্ধুরা অনেকেই দেখা হলে দূর থেকে আমাকে 'পিতিত' বলে ডাক দিত- এই, পিতিত। পিতিত মানে হলো ছোট্ট। ডাকতো এই পিতিত বেকেন, গুড গুড। আমি এইসবে কিছু বলতাম না। ধীরে ধীরে আমি প্র্যাকটিস বাড়াতে থাকলাম। একদিন বিকেল ৪টার সময় সিগারেট ধরিয়ে আমি ছবি আঁকছি। যদিও এখানে সিগারেট ধরানো নিষেধ। রুমের মধ্যে কেউ নেই। আর বিকেলে আরেকটা সুবিধা হলো, সহপাঠীদের রেখে যাওয়া রঙও আমি সুযোগমতো ব্যবহার করতে পারি। অনেক ধনী ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়ত সাথে। তাদের তো রঙের অভাব নেই। আর আমারও ওগুলো কেনার মতো অত ক্ষমতা নেই। তাই বলে কি ছবি না এঁকে বসে থাকব? অনেক সময় দেখা গেছে, কেউ ক্যানভাসে অর্ধেক ছবি এঁকে রেখে গেছে- আমি ঠাসঠাস করে কয়েকটা ব্রাশ মেরে সেটাকে আমার ছবি বানিয়ে ফেললাম, আর পেছনে লিখে দিলাম শাহাবুদ্দীন। ওরা অতকিছু খেয়ালও রাখে না।

তো, সেই দিন বিকাল ৪টায় আমার হাতে সিগারেট। হঠাৎ দেখি যে আমাদের প্রফেসর বসে আছেন ঘরের মধ্যে। আমি তো লজ্জায় শেষ। সিগারেট নিচে ফেলে দিতে দিতে মুখ কাচুমাচু করে বললাম, সরি স্যার। আমি তো খেয়াল করিনি। কিন্তু, স্যার দেখি বলে, নো নো, শাহাবুদ্দীন, কন্টিনিউ কন্টিনিউ। কিন্তু আমার তো আর কন্টিনিউ হয় না। পেছনে স্যার বসে আছেন, কেমনে ছবি আঁকি! স্যার তখন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন- আমি প্রথম দিন থেকেই খেয়াল করছিলাম তোর কোথায় যেন কী একটা মিসিং হচ্ছিল। স্যাররা তো দেখলেই বুঝে ফেলেন। স্যার বলেন কাম, কন্টিনিউ। ব্রাভো ব্রাভো। আর বললেন, এই ছবিগুলো তোর কেন ভালো লাগল সেটা খুঁজে বের কর। স্যারের এসব কথায় আমি তো একটু সাহস পেয়ে গেলাম। এখন আর ছবি লুকিয়ে রাখি না। আরও স্বাধীনভাবে, আরও গতিতে ক্যানভাসে ব্রাশ চালাতে থাকি।

ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে গেলাম। আস্তে আস্তে ছবির মধ্যে ডায়নামিজম শুরু হলো। স্বাধীনভাবে ক্যানভাসে স্ট্রোক দেওয়ার কাজে আরও বৈচিত্র্য এলো আমার হাতে। আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেল আগের চেয়ে। তখন আমি সেই প্রিয় গ্যালারিতে আবার গেলাম। সেই যে আমার স্বপ্ন। যেখান থেকে এতসব। গ্যালারিতে গিয়ে দেখি, সেখানে তখন একটা ইতালিয়ান শিল্পীর কাজ ঝোলানো হচ্ছে। প্রদর্শনী হবে। আমিও গিয়ে কাজে কিছুটা সাহায্য করলাম। গ্যালারিতে ছোট ছোট মই থাকে। সেই মইয়ের ওপর উঠে বলল, একটা পিন দাও তো। আমি ইংরেজিতে বললাম, ক্যান আই হ্যাভ ইউ ওয়ান কোশ্চেন প্লিজ?

ইউ ডোন্ট টেক ইয়ং পেইন্টার? সে বলল, ও নো। নো।

বিখ্যাত গ্যালারি। সেই গ্যালারিতে পিকাসো, মাতিস, জিয়াকোমেত্তির মতো শিল্পীদের পরে অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পীদের বয়স কম করে হলেও ৬০ থেকে ৭০ বছর। আমি তাই নিরাশ হয়ে গেলাম। নো চান্স। কিন্তু ফিরে আসব, সেই সময়ে গ্যালারির লোকটা মই থেকে নামতে নামতে বলল, হোয়াই? ইউ আর অ্যা পেইন্টার?

এ কথা শুনে আমি তো রেগে আগুন– এতদিন লাগল এটা বুঝতে! এতবার এলাম! এ কথা ক্যান বলল? ইচ্ছা কইরাই কইল কি-না!

বললাম, ইয়া।

-ফ্রম হুইচ কান্ট্রি?

আমি বললাম বাংলাদেশ।

সে অনেকটা বিস্মিত হয়ে বলল, বাংলাদেশ! সো হোয়াই ডোন্ট ইউ ব্রিং অ্যা স্লাইট?

নিরাশার মধ্যেও আবার আশা ফুটে উঠল। আমি বললাম, স্লাইট? ওকে, টুমরো।

বাসায় এসে স্লাইট বানালাম। সব ছবি মিলিয়ে একটা মিক্স করে ফেললাম। দেশে থাকতেই ওয়াটার কালারে আমি ভালো ছিলাম। জলরঙ করে আমি দু'বার গোল্ড মেডেলও পেয়েছিলাম। সেই জলরঙ আর সাম্প্রতিক কিছু কাজ মিলিয়ে পরদিন স্লাইট নিয়ে গেলাম। ওরা সেগুলো দেখে বলল, ও ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা রেখে যাও। পরশু দিন এসে নিয়ে যাবা।

আমি তো ভাবি অদ্ভুত! ওরা রাখল!

আমি আবার ঠিক পরশু দিন গেলাম। দু'জন লোক আছে। একজন হলো বার্নার্ড। যার নামে গ্যালারির নাম 'গ্যালারি ক্লদ বার্নার্ড'। সেই বার্নার্ডের সেক্রেটারি ইয়ং পাজে। পাজে বলল, আমি বার্নার্ডের সাথে কথা বলে দেখি। কথা শুনে আমার মনে হলো তারা ইন্টারেস্টেড। তিন দিন পর আবার গেলাম। তখন ওরা নানা রকম কথা বলছে, দেখ আমাদের গ্যালারিটার মানটা অন্যরকম। এই সেমিস্টাইল ছবি দিয়ে হবে না। তবু দেখি, তুমি পরে আসো।

আমি তো পড়ে গেলাম মহাধান্দায়। কিছু বলেও না আবার কাজগুলো ফেরতও দেয় না। ঘুরাচ্ছে। আমার সহপাঠী কেউ তো এই গ্যালারিতে ছবি দেওয়ার কথা চিন্তাও করে না। আর করার কথাও না। এখানে নতুন কোনো শিল্পীর কাজ তো দূরে থাক, বিখ্যাত পেইন্টার ছাড়া নেয়-ই না।

যাই হোক, আমি তবু যেতে লাগলাম। কিছুদিন পর একদিন তারা কাগজে লিখে আমাকে দিলো যে, শাহাবুদ্দীন, উই আর সরি। বাট ইট ইজ ইন্টারেস্টিং। এই ঠিকানাটায় যাও, ওখানে একটা গ্যালারি আছে, ওরা তোমার এক্সিবিশন করবে।

এ কথা শুনে আমার একদমই পছন্দ হলো না। গ্যালারি থেকে বের হয়ে আমি সেই কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম। কিন্তু মনে থাকল কোন গ্যালারিটার নাম দিয়েছে ওরা। একদিন মনে হলো, আচ্ছা যাই, গিয়ে দেখি ওখানে কী অবস্থা। তবে ক্লদ বার্নার্ডের আসা আমি ছাড়িনি। তারা আমাকে বলেছে, তোর সবই ভালো, কিন্তু তোর ছবিটা আরেকটু টাইট করতে হবে। সেই টাইট শব্দটাই আমাকে পাল্টে দিলো। আমি আমার ছবিকে পাল্টাতে থাকলাম। টাইট করতে গিয়েই ছবির বিষয় আরও সেন্ট্রালাইজড হতে থাকল। ফিগারগুলোকে টেনে এনে টাইট করতে লাগলাম। স্পেসের ব্যবহার, ক্যানভাসে জায়গা ছেড়ে দেওয়া। এই বিষয়টাই আমাকে দার্শনিকভাবে একটা গভীরতায় নিয়ে গেল। ততদিনে ছয় মাস পার হয়ে গেছে।

আমি আবার গেলাম গ্যালারিতে। ওরা আমাকে বলল, তুমি কোথায় আঁকো। বললাম, স্কুলে। ওরা তো অবাক! আর ওই সময়ে স্কুল থেকে ঝামেলা করা শুরু হয়ে গেছে। আমি এত ছবি আঁকছি, যে ছবিতে রুম ভরে গেছে। অন্যদের ছবি রাখার জায়গা নেই। ফেলেও দিতে পারে না। আবার রাখতেও পারে না। অন্যসব ছাত্ররা আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে। ডিরেক্টর আমাকে নোটিশ দিয়ে দিলো, ছবি না সরালে এগুলো সব জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন। কী আর করব, এত ছবি আঁকছি যে, সব জায়গা দখল হয়ে গেছে। ডিরেক্টর ডাকালেন আমাকে। কালকে সব ছবি সরাতে হবে, না হলে পুলিশ দিয়ে সরাবেন। আমি পরের দিন ডিরেক্টরের কাছে গেলাম। তার সাথে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছি, আর মনের ভেতরে ভয়। তাকে গ্যালারি ক্লদ বার্নার্ডের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ডিরেক্টর প্রফেসর বললেন, 'হ্যাঁ ওদের ওখানে আমি পরশু দিন গিয়েছিলাম তিনটা ছবি জমা দিতে। কিন্তু ওরা আমাকে রিফিউজ করে দিয়েছে।' আমি বললাম, আপনি কয়টায় গিয়েছিলেন? স্যার বললেন, সকাল ৯টায়। কারণ ওই দিন আমিও ওখানে ছবি জমা দিয়েছি। আমি গিয়েছিলাম সকাল ১০টায়। আমি স্যারকে বললাম, স্যার, কিন্তু ওরা তো আমার ছবি রেখে দিয়েছে। স্যার তো চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বল শাহাবুদ্দীন! তাই! তারপর আমি অতীতের সব কাহিনী বলা শুরু করলাম। সব শুনে স্যার তো বলেন– 'ইউ আর সো লাকি। হ্যাঁ তোর কাজ অনেক ডেভেলপ করেছে।' আমি তখন সেই সুযোগে তাকে ধরে বসলাম– স্যার, প্লিজ আমাকে আর দুইটা মাস সময় দেন। আপনার পায়ে পড়ি। স্যার বলেন, কী বল! দুই মাস না, এক বছর রাখো। নো প্রবলেম।

প্যারিসে গ্যালারি ক্লদ বার্নার্ডের এমনই সম্মান। গতকালকে যে আমাকে নোটিশ দিলো– তোমার সব ছবি নিয়ে যাও, নতুবা পুলিশ দিয়ে সব সরিয়ে ফেলব। আর আজকে সেই প্রফেসরই বলছেন, কোনো সমস্যা নেই, তোমার যতদিন ইচ্ছা রাখো। স্যার বললেন, তোর নার্ভাস হওয়ার কারণ নেই। আঁকতে থাক। আমি তো মহা খুশি– বাহ্ প্রবলেম সলভড।

১৯৮০ সালেই আমার স্কলারশিপের মেয়াদ শেষ। কিন্তু স্যার নিজে উদ্যোগ নিয়ে আমার পুলিশ পারমিশন করে দিলেন। আর কী লাগে? আমি আবার গ্যালারি ক্লদ বার্নার্ডে গেলাম। এখন তো পরিচয় আরও বেশি ঘন হয়েছে। গ্যালারির সেক্রেটারি নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে গেলেন। নতুন গ্যালারি তত্ত্বাবধায়ক একজন তরুণ শিল্পী। সেক্রেটারি আমার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন থেকে ইনি তোমার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। আমরা তোমার ড্রইং দেখতে চাই। ও তোমার ড্রইং দেখবে। তোমার নিশ্চয়ই ড্রইং আছে?'। আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই। কিন্তু মনে মনে বলি, কিসের ড্রইং, নেই বললে তো আবার ঝামেলা। এত কষ্ট করে চান্স পাইছি।

যেহেতু স্কলারশিপ শেষ। তবু আমাকে ডাইরেক্টর বিনা খরচে এক হোস্টেলে থাকতে দিয়েছেন। সেই প্রথম আমার জীবনে আমি হোস্টেলে থাকি। পকেটে কোনো পয়সা নেই। খুব খারাপ অবস্থা। কিন্তু গ্যালারির সেক্রেটারি তো বলেছেন, কবে তোমার ড্রইং দেখতে যাব? আমি তো বলছি মিথ্যা কথা। কোনো ড্রইং-ই তো করা নেই আমার। আমি বলেছিলাম, এই তো আমার এক আন্টি আছেন, তার বাড়িতে যাব। এসে দেখাব। আমার আন্টির বাড়ি কথাটা শুনে ভেবেছিল, কোনো বাঙালি বোধ হয়, কিন্তু যখন তনত ইবনের কথা শুনল, অবাক হলো। ইবন আন্টির বিষয়টাও একটা প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেছে। একটু অবাক হলেও পরে বলল, ওকে, নো প্রবলেম। তাহলে শিগগিরই তোমার ড্রইং দেখছি আমরা।

ইচ্ছা করেই আমি তিন সপ্তাহ পেছালাম। ২১ তারিখে ড্রইং দেখানোর তারিখ। এখন তো আমার মাথা খারাপ। ড্রইং করতে হবে। আর্ট স্কুলের আশপাশের রঙের দোকানে গেলাম। ছয় বছর ধরে এ এলাকায় আছি। মোটামুটি সবাই চেনে। সরাসরি দোকানের মালিকের কাছে গিয়ে বললাম, কিছু



চিত্রকর্ম : শাহাবুদ্দিন আহমেদ

রোল আর চারকোল দরকার। আমার কাছে পয়সাপাতি কিছু নেই। এক সপ্তাহ পরে দেব। মথি ব্যাপারটা বুঝল। একটা রোল দিলো আর বলল চারকোলের পয়সা দিতে হবে না। এখন সরঞ্জাম তো হলো– আঁকবো কোথায়? হোস্টেলের রুমে একটা দরজা আর একটা জানালা আছে। চারটা দেয়াল। দরজা-জানালার ওপর দিয়ে রোলের কাগজ সব কেটে কেটে লাগালাম। ঘরের সবগুলো দেয়ালে কাগজ লাগানো। দরজাও বন্ধ। ওই দিন সন্ধ্যায় এক বন্ধুর বাসায় ডিনারের দাওয়াত ছিল। শীতকাল, সেখানে আগুন জ্বালানোর পর অনেক কয়লা ছিল। এক কিলোর মতো কয়লা নিয়ে আসছিলাম সেখান থেকে। এখন কয়লা তো আনলাম, চারকোলও আছে, কিন্তু কী আঁকবো! তিন সপ্তাহের একদিন এরই মধ্যে চলে গেছে। ঘরটা প্রায় অন্ধকার। কৃত্রিম কিছু আলোর ব্যবস্থা করলাম। ঘরে একটা ছোট্ট আয়না ছিল। সেই আয়নায় নিজেই নিজের মডেল হবো। জামা-কাপড় সব খুলে উলঙ্গ হয়ে গেলাম। আয়নাতে নিজেকে দেখে দেখে ড্রইং করব। এখন আমি তো হলো ল্যাদা, মানে দুর্বল সিং। কী আঁকবো মাসল! তাই অনুমান করে করে আঁকা শুরু করলাম। শুরু হলো ইমাজিনেশনের খেলা। এই যে মাইকেল এঞ্জেলো, এই যে গয়া– নানা রকমভাবে আঁকতে লাগলাম। শুরু করলাম হাতি দিয়ে। আঁকব যখন মজবুত জিনিসই আঁকি। হাতি-টাতি আঁকলাম। সন্ধ্যা হলে নিচে ক্যান্টিনে গিয়ে কিছু খেয়ে আসব– পয়সা লাগবে তো! অনেক ছাত্র-ছাত্রীর ভিড়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে, এখনও খেয়াল আছে, আপেল সালাদ চুরি করে খেয়েছি। ধরা পড়লে বলে দেব বাকি। কিন্তু কেউ তেমন খেয়াল করেনি বলে রক্ষা।

এর মধ্যে একদিন রাস্তায় একটা বড় আয়না পেলাম। ইউরোপে ব্যবহারের পর যেসব জিনিসপত্র মানুষ ফেলে দেয় গরিব দেশগুলো সেগুলো দিয়ে দিব্যি চলতে পারে। তো রাস্তায় ফেলে রাখা আসবাবপত্রের স্তূপ থেকে আমি সেই আয়নাটা নিয়ে এলাম। সেই আয়নাই আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করল। সেই আয়নাতে ইমাজিন করে আমার শরীর দেখে দেখে তার ডাবল শরীর, মাংসপেশি আর তাদের অ্যাকশন আঁকা শুরু করলাম। বাংলাদেশ জাদুঘরে সেই চারকোলে আঁকা ফিগারগুলো আছে এখনও। প্রায় ৩৫টার মতো আঁকলাম। আবার কাগজ কেটে কেটে লাগালাম দেয়ালে।

রুমে একটা ইলেকট্রিক স্টোভ ছিল। ওইটার মধ্যে চা-কফি কিংবা ডাল বাগার দিতাম– খাবার-দাবার বলতে ওইটাই। এসব করতে করতে দিন চলে এলো। আমি গ্যালারিতে ফোন করলাম। ওরা বলল, ওকে আসছি। ১০টার সময় এলো। আমি তো নার্ভাস। যদি পছন্দ না হয়, আমার সব স্বপ্ন তো মাটি হয়ে যাবে। পিকাসো-মাতিসদের সাথে একই গ্যালারিতে আমার ছবি ঝুলবে না।

কিন্তু আমার পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ঘরে ঢুকেই ওয়াও, ওয়াও করতে করতে চুমা-টুমা দিয়ে পাগল হয়ে গেল ওরা। বলল, অবশেষে পেলাম। ঘর থেকে বের হয়েই নিচে গিয়ে ওরা বসকে টেলিফোন করে বলতে লাগল– প্লিজ কাম, ইনক্রেডিবল, ইনক্রেডিবল ওয়ার্ক। বস বোধ হয় বলছে, ওরে শুদ্ধ নিয়ে আসো, দেখি।

ঘরে স্টোভে ডাল বাগার দিতে দিতে ডাল আর হলুদের ছিটা পড়ছিল দেয়ালের একটা ছবিতে। আমি খেয়াল করিনি। তাছাড়া ছবিগুলোতে স্প্রেও করা হয়নি। বললাম, স্প্রে করে নেই। তখন ওরা বলল, স্প্রে করে কালকে নিয়ে আসো। তখন আমি ছবিগুলোতে স্প্রে করতে গিয়ে দেখি একটা ছবিতে হলুদ আর ডাল লেগে এমন অবস্থা! আবার চারকোল দিয়ে ঘসে ঘসে কোনোরকম ছবিটারে ঠিক করতে গিয়ে দেখি ছবিটা অন্যগুলোর চেয়ে একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার হলো, সেই ছবিটাই বাজিমাত। আমি মনে মনে বলি, শালা, হলুদের দাম কত হয়ে গেল! ওই দিক দিয়ে পুলিশের ভ্যারিফিকেশন আরও এক সপ্তাহ মেয়াদ বেড়ে গেল। আমার টিকিট,ক্যান্সেল হয়ে গেছে; দেশে যাচ্ছি না এখনও।

গ্যালারি ক্লদ বার্নার্ড যতই ছবি দেখুক, ওয়াও ওয়াও করুক, আমি জানি ওরা সিনিয়র আর বিখ্যাত আর্টিস্ট ছাড়া ছবি হ্যাং করে না। তাই ছবিগুলো দেখাতে গিয়ে আমি সেই নতুন গ্যালারি তত্ত্বধায়ককে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তোমরা তো নতুন শিল্পীদের ছবি নাও না, কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি ট্যালেন্ট হলেও নাও না? এরপর ওরা একটা বুদ্ধি করল, প্যারিসে ছয়জন তরুণ শিল্পী খুঁজে বের কর, যে কোনো দেশেরই হোক। সেই ছয়জন শিল্পীকে নিয়ে এই প্রথম 'সিক্স কন্টেম্পরারি ইয়াং আর্টিস্ট' শিরোনামে একটা এক্সিবিশন হবে। সেই ছয়জনের মধ্যে আমি নাম্বার ওয়ান। আরেকজন ছিল আলজেরিয়ান। বাকি চারজনই ফ্রেঞ্চ। আমার তিনটা ছবি ঝোলানো হয়েছিল। বাকিদের একটা একটা করে ছবি।

সেই দিনটাই আমার শিল্পী জীবনের ইতিহাসকে ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা দিন। একটা দিনেই আমার স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেল। তার পরের কাহিনী যদিও নানা চড়াই-উতরাই পেরোনোর ঘটনা, বাংলাদেশ থেকে একটা ছেলে শিল্পের শহরে গিয়ে হাজির হওয়া, আর ঘুরতে ঘুরতে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের সারিতে গিয়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন সত্যি হওয়ার আনন্দে ভরপুর। ❖

অলঙ্করণ : : বোরহান আজাদ

শাহ্‌নাজ মুন্নী

পার্টি গোয়িং অন



গল্প

গুলশানের অভিজাত পাঁচতারকা হোটেল ওয়েস্টিনের বলরুম একটি মৃদু নম্র মিষ্টি আলো ছাদ চুঁইয়ে নেমে এসে কক্ষটাকে আলো-আঁধারি মায়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে নিচু স্বরে বেজে যাচ্ছে হাল্কা মিউজিক বিদেশি কোনো দূতাবাসের আয়োজনে একটা পার্টি চলছে সেখানে আমন্ত্রিতদের বেশিরভাগই বিদেশি স্বল্পসংখ্যক বাংলাদেশিও আছেন বটে, তবে তারা এলিট শ্রেণির ক্ষমতা, প্রতিভা ও সুযোগ-সুবিধার কারণে এরা সমাজে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত।

এই ধরনের পার্টিতে বসার জন্য কোনো চেয়ার থাকে না। সবাই দাঁড়িয়ে থাকে, হাঁটে, পরিচিতজন একসঙ্গে জটলা পাকায়, লাইন ধরে বুফে খাবার তুলে নেয় যারা পছন্দ করে তারা মদ খায়, অন্যরা অরেঞ্জ বা আপেল, টমেটো বা পেঁপে, পেয়ারা বা পাইন অ্যাপেল জুস খায়। গলায় বো বাঁধা স্মার্ট ছেলেরা হাতে ট্রে নিয়ে মদ ও মাংস সার্ভ করে।

রায়হানের সামনে দিয়ে এমন একটি ট্রে যাচ্ছিল যাতে অলিভ আর ব্ল্যাক বেরি দিয়ে পাতলা লাল মাংসের স্মোকি স্লাইস খুব আকর্ষণীয়ভাবে ভাঁজ করে রাখা ছিল। টুথপিকের মতো চিকন কাঠিতে বিদ্ধ করে অনেকেই সেই সুদৃশ্য মাংসখণ্ড তুলে মুখে পুরছিল

রায়হান ভাবল একটা নেবে কি-না, সে হাত বাড়াল তারপর কী মনে করে প্রায় ফিসফিস করে খাবার বহনকারী ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কি বিফ ... না চিকেন?'

ছেলেটি হাসিমুখে নিচু গলায় বলে, 'পর্ক, স্যার।'

শোনামাত্র রায়হান দ্রুত তার বাড়িয়ে দেয়া হাত সরিয়ে নিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি-না আর তখনই সৌম্য শাহাদতকে দেখতে পায় সে সৌম্যর সঙ্গে একটা মেয়ে, লম্বা, সুন্দর। কে? রায়হান চিনতে পারে না, সৌম্যর স্ত্রী ফারিয়া তো নয় এ।

'যাই হোক, তোমাকে পেলাম, অনেকক্ষণ পর একজন চেনা-জানা মানুষ....'

রায়হানকে দেখতে পেয়ে সৌম্য হাসিমুখে এগিয়ে আসে রায়হানও হাসে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে

'তোমাদের পরিচয় আছে? নেই? ও আচ্ছা, ও মিতালি হক...'

সৌম্য তার পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে বলে রায়হান আশা করেছিল, মিতালি হক সম্বন্ধে সৌম্য আরও কিছু বলবে। বলবে, ও ভালো অভিনয় করে, গান করে, ছবি আঁকে, মডেলিং করে বা কবিতা লেখে কিন্তু সৌম্য আর কিছু বলে না মিতালি রায়হানের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বেয়ারাদের ট্রে থেকে ফুলের মতো সাজিয়ে

রাখা একটা মাংসের টুকরো টুথপিকে গেঁথে মুখে পুরে দিয়ে সৌম্যর কানে কানে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে। সুসজ্জিত বেয়ারা ট্রে নিয়ে সরে যেতে চাইলে রায়হান তাকে ডাকে।

'এটা কী?... পর্ক ...?'

'এটা বিফ অ্যান্ড টার্কি স্যার..'

'ও, তাহলে তো খাওয়াই যায়।' রায়হান টুথপিকে গেঁথে ক্রিস্টালের ট্রে থেকে লেটুসের সবুজ বিছানায় শুয়ে থাকা মাংসের সুদৃশ্য ফুলটি তুলে নেয়।

হাতে একটা প্লেটে আধা-খাওয়া খাবার নিয়ে অনির্বাণ নন্দী তখন এসে পাশে দাঁড়ান। তিনি দূতাবাসের একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, রায়হানের সঙ্গে সামান্য চেনা-জানা আছে তার। আচরণ দেখে মনে হলো, সৌম্যর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়তো আরেকটু বেশি।

'১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বিলেতে গরুর মাংস খেয়েছিলেন; জানেন? নিয়মিতই খেতেন। পরে অবশ্য খাওয়া ছেড়ে দেন। নিরামিষভোজী হয়ে যান। বাট আই লাইক বিফ .. ভেরি সফট অ্যান্ড ডেলিশিয়াস...'

অনির্বাণ নন্দী সম্ভবত বিফ কাবাব চিবুতে চিবুতে বলেন।

'গরুর মাংস খাদ্য তালিকায় রাখা তো দোষের না। শুয়োরও রাখতে পারে; যার ভালো লাগে। খাদ্য কীভাবে কোনো বিশেষ ধর্ম মানা বা না মানার প্রতীক হতে পারে, বলেন তো?'

মিতালি একটু উষ্মার সঙ্গে বলে।

'আরে ভাই, গো-মাংস খাওয়ার সঙ্গে মুসলমান হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক আছে নাকি? আর শুয়োরের মাংস খাওয়ার সঙ্গেও তো হিন্দু হওয়া না হওয়ার সম্পর্ক নেই।'

সৌম্য বোধহয় বিষয়টা হাল্কা করতে চায়।

রায়হানের তখন পাশাপাশি দুটি ঘটনা মনে পড়ে; একটা খুবই সাম্প্রতিক।

কিছুদিন আগে বিবিসি নিউজ করেছিল, ভারতের উত্তরপ্রদেশে দাদরি গ্রামে বাড়িতে গরুর মাংস রেখে খাওয়ার গুজবে মোহাম্মদ আখলাক নামে ৫০ বছর বয়সী এক মুসলিম ব্যক্তিকে পিটিয়ে মেরেছে এলাকার মানুষ। আখলাকের পরিবার যদিও বলেছে, তাদের ফ্রিজে খাসির মাংস ছিল; গরুর মাংস নয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি, ওর বন্ধু তপনের। রায়হানদের গ্রামের মেথরপাড়ায় তখন শুয়োর পালা হতো। নোংরা, কাদায় গড়াগড়ি খাওয়া গোল-গাল কালো লোমশ প্রাণীগুলোকে দেখে গা ঘিন ঘিন করত রায়হানের। কাদামাখা শুয়োরগুলো দেখিয়ে রায়হান একদিন বলেছিল,

'আচ্ছা, তপন, তোরা এইসব শুয়োর কেমনে খাস? ঘিন্না লাগে না?'

'তোরা যেমনে গরু খাস, তেমনে ...'

তপন দাঁত বের করে হেসে বলত। 'শোন, গরু যখন ঘাস খায়, তখন ঘাসের মধ্যে মানুষের ইয়েটিয়ে থাকলে সেটাও তো খায়, হে হে হে ... তাই বলে কি গরুকে তোরা ঘিন্না করিস? আসলে এসব কিছু না। তোদের খাওয়ার অভ্যেস নেই, তাই এসব বলছিস...'

এই তপন কিন্তু কোরবানির ঈদ এলেই রায়হানদের বাড়ি এসে বাটি ভরা গরুর মাংস খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলত। অবশ্য বড় হয়ে রায়হান যখন টিভিতে বা পত্রিকায় সাদা সাদা মোটাসোটা গোল-গাল শূকরের ছবি দেখেছে; দেখেছে তাদের গোলাপি ঠোঁট আর আয়েশি চেহারা তখন আর ছোটবেলার ঘেন্না বোধটা তার মনে টিকে থাকেনি। তারপরও শূকরের মাংস শুনলে এখনও তার খাওয়ার রুচি হয় না।

রায়হানের ইচ্ছা করে এখানে, এই খাবার হাতে দাঁড়িয়ে থাকা আড্ডা দেওয়া মানুষদের কাছে এই বিষয়টা বলে। বলে যে, 'শূকর বা গরু কোনো ব্যাপার নয়, যার রুচিতে যেটা হয় সে সেটা খাবে, এটা নিয়ে রাজনীতি করার তো কিছু নেই।'

কিন্তু বাস্তবে রায়হান কিছুই বলে না। চুপচাপ কাঁটাচামচের ঘায়ে প্লেটে রাখা ল্যাম্ব রোস্টের একটা টুকরো ঘায়েল করার চেষ্টা করতে থাকে

'ওফ, এরা এত চিজ খায়! সব খাবারে চিজ...'

মিতালি কাঁটাচামচ দিয়ে তার প্লেটে নেওয়া খাবার নাড়তে নাড়তে বলে।

'চিজ কিন্তু ক্লাসিক খাবার। চিজের হিস্ট্রি জানো? পৃথিবীতে ৬০০০ বছর আগেও চিজ ছিল- এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। রোমান যুগে চিজ চলত, মিসরেও ছিল, তবে ইন্টারেস্টিং তথ্য হচ্ছে, এক অ্যারাবিয়ান মানে মরুবাসী বেদুইন নাকি প্রথম অ্যাক্সিডেন্টলি চিজ বানিয়ে ফেলেছিল, ভেড়ার চামড়ার থলেতে রাখা দুধ মরুভূমির তাপে চাপে পনির হয়ে গিয়েছিল ...'

সৌম্য সব বিষয়ে এত জানে, রায়হান অবাক হয়। সেও মোটামুটি পড়ালেখা করে, কিন্তু মনে রাখতে পারে না, ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে মোক্ষম গল্পটিও জুড়ে দিতে পারে না। পরে মনে হয়, আহা! ওখানে তো ওটা বলা যেত। কী যে অক্ষমতা এটা ...

মিতালি হক তার বড় বড় চোখ মেলে সৌম্যর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর আহ্লাদি গলায় বলে, 'আপনি এত কিছু জানেন, সৌম্যদা ...'

রায়হানের তখন মিতালিকে খুব চেনা চেনা লাগে। মনে হয় ওকে আগেও কোথায় যেন দেখেছে, কিন্তু সেটা কোথায়, তা আর মনে পড়ে না তার।

মিতালি আর সৌম্য অন্যদিকে চলে গেলে রায়হান কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থেকে হলের অন্য কোনায় ডেজার্ট নেওয়ার জন্য পা বাড়ালে একটা বিখ্যাত কাগজের প্রবীণ সম্পাদক মহসীন হোসেনের মুখোমুখি হয়ে যায়। রায়হান সালাম দেয়। ভদ্রলোকের হাতে মদের গ্লাস। তিনি ঢুলু ঢুলু চোখ তুলে তাকান,

'এই যে, তুমি? তুমি ফটোগ্রাফি করো না ... ওই যে সেবার সাইক্লোনের ছবিগুলো তুলেছিলে, খুব ভালো হয়েছিল ..কী যেন নাম তোমার...'

মহসীন ভাইয়ের স্মৃতিশক্তি প্রখর বলে বাজারে সুনাম আছে। সেই সুনামের সত্যতা প্রমাণ করেই হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে রায়হানের নামটাও বলে ফেললেন তিনি। রায়হান এবার সত্যিই অভিভূত। তার মতো একজন অকিঞ্চিৎকর ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার ব্র্যাকেটে চাকরিহীন, বেকার, ভবঘুরে একটা লোককে শনাক্ত করা ... রায়হান কৃতজ্ঞতায় কুঁকড়ে যায়।

'নাও, নাও, এদের হুইস্কিটা ভালো...'

মহসীন ভাই আদর করে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিলে রায়হান সেটা হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মহসীন ভাই ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে বলে যান, 'ওয়ান পিকচার ইজ ওর্থ এ থাউজেন্ড ওয়ার্ডস, ইউ নো। একটা ভালো ফটোগ্রাফি সঙ্গীতের মতো, সাউন্ডলেস মিউজিক। কিন্তু এখন জানো, দুনিয়াজোড়া একটা মেজর ইস্যু হয়ে গেছে ফটো ম্যানিপুলেশন। এখনকার ফাকিং ডিজিটাল ক্যামেরায় ...'

'এফ ওয়ার্ড বলে আবার পরিবেশ দূষিত করছেন কেন মহসীন ভাই?'

আরেক জাঁদরেল সাংবাদিক এসে মহসীন হোসেনের সামনে দাঁড়ালে রায়হান আস্তে করে সেখান থেকে কেটে পড়ে। দুই চুমুকে হুইস্কির গ্লাস খালি করে, ডেজার্টের সমাহার থেকে পুডিং আর চকলেট কেক তুলে নিতে নিতে রায়হানের হঠাৎ মনে হয় এই এলিটদের মধ্যে সে কেন? কোন বিবেচনায়? সচরাচর এসব নিমন্ত্রণ তো তার কপালে জোটে না। এবার কেন জুটল? মনে মনে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আনমনে এক চামচ পুডিং মুখে দেয় সে। আর তখনই চট করে কারণটা খুঁজে পায় রায়হান। কিছুদিন আগে দূতাবাসের একটা প্রোগ্রামের ছবি তুলে দিয়েছিল সে, কাজটা ছিল আসলে ফারুকের, কিন্তু ওর হঠাৎ প্যারিসে একটা স্কলারশিপ হয়ে যাওয়ায় সে কাজটা রায়হানের কাঁধে গছিয়ে দিয়ে যায়। বিদেশিদের কাজ করলে অবশ্য মাল-পানি ভালোই পাওয়া যায়, রায়হানের এক মাস চলার মতো খরচা উঠে গিয়েছিল। সম্ভবত সেই সূত্র ধরেই দূতাবাসের কর্মকর্তারা তাকে দাওয়াতপত্র পাঠিয়েছে। যাক। কারণটা আবিষ্কার করে স্বস্তি বোধ করে রায়হান।

তবে সত্যি বলতে কি, পার্টির এই ফাঁপা ভাবগম্ভীর পরিবেশে মোটেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না সে। বরাবরের মতোই তার মনে হয়, লুকিয়ে পড়ি কোথাও, কোনো ঘন লম্বা গাছে ছাওয়া বনে-জঙ্গলে, হরিণ-বানর-সাপ-বাঘের সঙ্গে কিংবা কোনো অখ্যাত গ্রামে-গঞ্জে-

বাজারে, রাস্তার পারের চায়ের দোকানে, কোনো ধু-ধু প্রান্তরে, স্বাধীন শূন্যতায়, এইসব পার্টি-ফার্টিকে বড় মেকী আর কৃত্রিম মনে হয় তার। মনে হয় প্রাণহীন কিছু মানুষ মাপা মাপা কথা, মাপা মাপা আচরণ করে যাচ্ছে।

হাতের পুডিংটা শেষ করেই বলরুম ছেড়ে বেরুনোর পাঁয়তারা করে রায়হান। পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন সাদা চামড়ার বিদেশি নারী ভদ্রতাসূচক 'হাই' বলে। পাল্টা একটা ভ্যাবাচ্যাকা মার্কা হাসি দিয়ে কাউকে কিছু না বলে সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ে রায়হান। পেছনে পার্টি চলুক। চলতে থাকুক। সে একাই চলে যাবে তার নিজস্ব ভুবনে।

লবিতে আবার সৌম্য আর মিতালির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। দু'জন কী যেন বলাবলি করছিল, রায়হানকে দেখে এগিয়ে আসে সৌম্য।

'এই যে রায়হান, কোনদিকে যাবে তুমি?'

সৌম্যর এ প্রশ্নে বিপদে পড়ে যায় রায়হান। আপাতত কোথায় যাবে, তা নিয়ে কিছু ভাবেনি সে। কখনোই ভাবে না। মোটরসাইকেলটা চালু করার পর হয়তো ভাববে, কোথায় যাওয়া যায়। তার শূন্য ফ্ল্যাটে, কোন পত্রিকা অফিসে, বন্ধুদের আড্ডায় নাকি প্রিয়তাদের বাসায়।

'প্রেস ক্লাবের দিকে..' কোনো কিছু না ভেবেই বলে দেয় রায়হান।

'গুড। তুমি তাহলে মিতালিকে একটু নামিয়ে দিয়ে যাও।'

'আমার তো মোটরসাইকেল, সৌম্যদা।'

'অসুবিধা নেই, আমি দিব্যি আপনার পেছনে বসে যেতে পারব।'

এবার চটপটে ভঙ্গিতে বলে মিতালি।

মেয়েদের পেছনে বসিয়ে গাড়ি চালাতে খানিকটা অস্বস্তিই লাগে রায়হানের। প্রিয়তা কখনোই তার মোটরসাইকেলের পেছনে চড়ত না।

'ওই রকম বাঁকা হয়ে বসতে ভালো লাগে না আমার। খুব আনকমফোর্টেবল লাগে।'

বলত প্রিয়তা। মিতালি কিন্তু দিব্যি গ্যাট হয়ে বসে গেল রায়হানের সিটের পেছনে, এমনকি এক হাত দিয়ে ওর কাঁধও চেপে ধরে রইল। রাস্তার ঝাঁকুনিতে তাল সামলাতে না পেরে কয়েকবার রায়হানের পিঠে এসে মৃদু ধাক্কাও খেলো মিতালি। রায়হান শুধু ভাবছিল, এই দৃশ্য যদি প্রিয়তা দেখতে পায় তবে কী প্রতিক্রিয়া হবে তার। কিংবা যদি আত্মীয়স্বজন, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী কেউ দেখে ফেলে আর প্রিয়তার কাছে গিয়ে রসিয়ে রসিয়ে সেই কথা বলে, তাহলে? অবশ্য এখন বেশ রাত, রাস্তার হাল্কা আলোয় অনেকেই হয়তো চিনতে পারবে না তাদের।

'মগবাজার মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিয়েন।'

রাস্তার গাড়ি আর বাতাসের শব্দ এড়াতে রায়হানের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে মিতালি। মোটরসাইকেলের ঝাঁকুনিতে মিতালির ঠোঁট আলতোভাবে রায়হানের কানের লতি স্পর্শ করলে হঠাৎ গা কেমন শিরশির করে ওঠে তার। প্রথম প্রথম প্রিয়তার স্পর্শ পেলে যেমন শিহরণ লাগত ঠিক তেমন, দেড়-দু'মাস হতে চলল প্রিয়তা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কবে আসবে? আদৌ আসবে কি-না জানে না রায়হান। প্রিয়তা জানায়নি, আসলে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি।

'এখানেই রাখেন, নামব।'

মিতালির কথায় একটা অন্ধকার গলির সামনে দ্রুত ব্রেক চাপে রায়হান, আর তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটে। গলির ভেতর থেকে একটা রিকশা এসে হুড়মুড় করে মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা খায়। রায়হান শক্ত হাতেই মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে রেখেছিল, কিন্তু নামতে গিয়ে ভারসাম্য রাখতে না পেরে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায় মিতালি। যদিও পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ায় সে, কিন্তু হাঁটতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। কিছুতেই পা ফেলতে পারে না। ব্যথায় সুন্দর মুখটা কুঁচকে যায় ওর। রায়হান মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি মিতালির হাত ধরে,

'ব্যথা লাগছে বেশি? আমার উপর ভর দেন... আমি খুব স্যরি যে এ রকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো...'

'না, না, ঠিক আছে। আপনার কী দোষ বলেন? এটা তো আর আপনি ইচ্ছা করে করেননি।... আমি পারব, ওই তো এই গলির মুখেই আমার বাসা। একটু চেষ্টা করলেই ঠিক চলে যেতে পারব।'

রায়হান হাত ছেড়ে দিলে একাই সামনের দিকে পা বাড়ায় মিতালি, কিন্তু এগোতে না পেরে 'উফ' শব্দ করে থেমে যায়। এবার রায়হান আবার এগিয়ে আসে। একটু জোর দিয়েই বলে,

'ধরেন তো আমার হাত। কিচ্ছু হবে না, চলেন তো। আমি আপনাকে দিয়ে আসছি।'

মিতালির বাসাটা তিন তলায়। পুরনো ধাঁচের বাসা। লিফট নেই। দরজায় বেল টিপলে কঠিন চেহারার এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে দেয়। তার পেছনে উঁকি দেয় চার-পাঁচ বছর বয়সী মিষ্টি চেহারার একটা ছেলে।

'কী হইছে তোমার মাম্ মাম্?'

কচি গলায় উদ্বেগের ছোঁয়া লাগিয়ে জিজ্ঞেস করে বাচ্চাটা।

'কিছু না বাবা, পায়ে একটু ব্যথা পাইছি, ঠিক হয়ে যাবে।' মিতালি আদুরে গলায় বলে।

রায়হান মিতালিকে ধরে এনে সাবধানে সোফায় বসায়। বিশেষ কাউকে উদ্দেশ না করেই বলে,

'বাসায় একটু বরফ থাকলে ভালো হতো। পায়ে বরফ ঘষলে আরাম হবে।'

কঠিন চেহারার ভদ্রমহিলাটি ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বাটি বরফ আর একটা গামছা নিয়ে ফিরে আসে। মিতালি গামছায় বরফ পেঁচিয়ে নিজেই তার ফুলে ওঠা পায়ের উপর চেপে ধরে। ছোট ছেলেটা খুব মনোযোগ দিয়ে সেই দৃশ্য দেখতে থাকে। মিতালি বলে,

'এ আমার ছেলে ফাইয়াদ। আংকেলকে সালাম দাও বাবা।'

মায়ের পায়ের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই ফাইয়াদ যান্ত্রিকভাবে বলে, 'স্লামালেকুম আংকেল।'

মিতালি মাঝবয়সী মহিলাকে দেখিয়ে বলে, 'উনি আমার মা।'

রায়হান ভদ্রতা করে হাত তুলে সালাম দেয়। মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চোখ সরু করে রায়হানের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার তাকানো দেখে রায়হানের নিজের শাশুড়ি, প্রিয়তার মা হাবিবার কথা মনে পড়ে। তিনিও এভাবেই সন্দেহ-ঘৃণা আর অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাতেন ওর দিকে। প্রিয়তার সঙ্গে রায়হানের সম্পর্কটা পছন্দ করেননি তিনি। মিতালির মা-ও হয়তো অপছন্দ করছে তাকে।

রায়হানের মনে হয় এবার তার ওঠা উচিত

'আচ্ছা আসি আমি। আশা করি পায়ের ব্যথাটা সেরে যাবে।'

মিতালি বা ঘরের অন্য কেউ কোনো কথা বলে না। ফাইয়াদ আবারও শেখানো বুলির মতো বলে,

'আবার আসবেন আংকেল।'

রায়হান মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসে। মিতালিকে এবার চিনতে পেরেছে সে। টেলিভিশনে খুব কড়া কণ্ঠে টকশো করে। আজকালকার মেয়েদের দেখলে বোঝাই যায় না বাচ্চা আছে বা বিয়ে হয়েছে। কচি কচি মিষ্টি চেহারা। বাচ্চা যখন আছে তখন স্বামীও নিশ্চয়ই আছে। মিতালির স্বামী কী করে, কে জানে! যাক্‌গে এসব ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলাই ভালো।

রায়হান তার মোটরসাইকেল স্টার্ট দেয়। আর তখনই ফোন বেজে ওঠে। প্রিয়তার ফোন।

'ডিস্টার্ব করলাম? তোমার নতুন গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ভালোই আছো তাহলে? এত অল্প দিনেই অনুরাগী জুটে গেল....'

প্রিয়তার কণ্ঠে শ্লেষ। রায়হান কিছু একটা বলতে যায়, কিন্তু কিছু না শুনেই ফোনটা কেটে দেয় প্রিয়তা। মোটরসাইকেলের সিটে বসে মাটিতে পা রেখে ঘাড় উঁচু করে আকাশের দিকে তাকায় রায়হান। তার নির্মলেন্দু গুণের কবিতার কথা মনে পড়ে, প্রিয়জন চলে গেলে মানুষই ব্যথিত হয়, অথচ আকাশ থেকে কত তারা খসে যায়, মহান আকাশ তবুও থাকে নির্বিকার, মানুষ কত সহজে দুঃখ পায়, আকাশ কি দুঃখ পায়? হে ঈশ্বর, আমাকে আকাশ করে দাও। ❖

অলঙ্করণ : : বোরহান আজাদ

অনুবাদ : আন্দালিব রাশদী

নিক্সনও ইয়াহিয়াকে রক্ষা করতে পারলেন না



মুক্তিযুদ্ধ

১৯৭১-এ পাকিস্তানে গণযুদ্ধ শুরু হলো। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের দূরত্ব ১০০০ মাইল; মাঝখানে ভারত দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। দুই অংশেই মুসলমানের সংখ্যাধিক্য, কিন্তু ভাষা, জাতিসত্তা ও সংস্কৃতি মোটেও অভিন্ন নয়। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ওপর আধিপত্য করত, অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের শোষণ করত। ১৯৭০-এর নভেম্বরে যে ধ্বংসাত্মক সাইক্লোন পূর্ব পাকিস্তানকে আঘাত করে, তার প্রতি উদাসীন নিস্পৃহতা বিচ্ছিন্নতাবাদী অনুভূতিতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার যখন ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের সুযোগ দিল; মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদী দল আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের (মুজিব) নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ আসনের ১৬৭টি জিতে নিল। এতে সংসদে পেল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু ইয়াহিয়া সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতার শোর ওঠে এবং বাঙালি-অবাঙালি সহিংসতা শুরু হয়। ২৫-২৬ মার্চ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনী মুজিবকে গ্রেফতার করে আওয়ামী লীগ ও সাধারণভাবে বাঙালিদের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালায়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শহর ঢাকার কেন্দ্রে ২৫টি এলাকায় অগ্নিসংযোগ করে। যারা পালাতে চায় তাদের কচুকাটা করে। প্রথম কয়েক দিনে ঢাকা শহরে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয় এবং সারাদেশে হত্যাযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালিদের গেরিলা প্রতিরোধে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণে আরও রক্তক্ষয় হয়। ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কনসুলার অফিস গোপনে বার্তা পাঠায় : এখানে সিলেকটিভ জেনোসাইড– বাছাই করা গণহত্যা চলছে। বিশ্বব্যাংকের একটি মিশন পূর্ব পাকিস্তান ঘুরে জুলাই মাসে রিপোর্ট করে। তারা যেসব শহর দেখতে গেছে প্রত্যেকটিতে আগুনের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে এবং কিছু কিছু গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গ্রীষ্ম পর্যন্ত সাধারণ হিসাবে দুই থেকে তিন লাখ মানুষ নিহত হয়েছে (ইয়াহিয়া সাংবাদিকদের বলেছেন, 'যখন লড়াই চলে তখন তো আর শত্রুর ওপর ফুল নিক্ষেপ করে না')। আক্ষরিক অর্থেই লাখ লাখ বাঙালি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গেছে। স্মরণকালের ইতিহাসে এটাই সম্ভবত স্বল্পতম সময়ে সবচেয়ে বড়

একমুখী শরণার্থী গমন।

এই হত্যাযজ্ঞে বিশ্বজনমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নিক্সন প্রশাসন এ ব্যাপারে পাকিস্তানকে একটি কথাও বলেনি। পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন কনসুলেট কার্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান নীতির সাথে দ্বিমত পোষণ করে ওয়াশিংটনে তারবার্তা পাঠাতে থাকে : 'আমাদের সরকার গণতন্ত্রের ওপর নিপীড়নকে নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে, আমাদের সরকার নৃশংসতাকে নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে, এমনকি তা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য না হলেও আমরা হস্তক্ষেপ না করার পথ বেছে নিয়েছি।' যে কারণে নিক্সন কনসাল জেনারেলকে বদলির আদেশ দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক ব্যর্থতার শুরু আরও আগে থেকেই। মার্চের শুরুর দিকে উর্ধ্বতন নীতি প্রণেতাদের ফোরাম সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের (এসআরজি) বৈঠকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তা প্রস্তাব দিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে শক্তি প্রয়োগ করা থেকে ইয়াহিয়াকে নিরস্ত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত। স্টেট ডিপার্টমেন্টের অন্দরমহলের একজন কর্মকর্তার মতে, ওই কর্মকর্তা তার প্রস্তাবটি গ্রহণের জন্য চাপ দিতে পারলেন না, কারণ কিসিঞ্জার সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের সদস্যদের সতর্ক করে দিয়েছেন– "তাদের মনে রাখা উচিত ইয়াহিয়ার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের 'বিশেষ সম্পর্ক' রয়েছে।" এসআরজি সদস্যরা এভাবে উপসংহার টানলেন– এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তাই হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সর্বোত্তম নীতি।

পাকিস্তানি একনায়কের সঙ্গে নিক্সনের 'বিশেষ সম্পর্ক' কথার দুটি উৎস : (১) ডানপন্থি জেনারেলের প্রতি একটি সাধারণ মার্কিন পছন্দ (১৯৭০-এর অক্টোবরে ইয়াহিয়া যখন ওয়াশিংটন সফরে আসেন নিক্সন তাকে আশ্বস্ত করেছেন, তার মতো পাকিস্তানের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু কখনও হোয়াইট হাউসে বসবাস করেননি)।

(২) ১৯৭১-এর জুলাইয়ে কিসিঞ্জারের গোপন চীন সফরে পাকিস্তানকে জাম্পিং পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে দেবেন বলে ইয়াহিয়া অঙ্গীকার করেছিলেন। কিসিঞ্জার লিখেছেন, 'পাকিস্তানই ছিল চীনের সঙ্গে আমাদের একমাত্র চ্যানেল। এটা একবার বন্ধ হয়ে গেলে বিকল্প ব্যবস্থা করতে আমাদের মাসের পর মাস লেগে যাবে।' এটা অত্যন্ত বাজে যুক্তি। কারণ ততদিনে রোমানিয়াকে বিকল্প চ্যানেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং গোপন চ্যানেল রাখার কোনো যৌক্তিকতাও ছিল না। কিসিঞ্জার নিজেই স্বীকার করেছেন, চীন তার এই গোপন সফরের বিরোধিতা করেছে। এই গোপনীয়তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন নিক্সন এবং কিসিঞ্জার।

মার্চে পাকিস্তানের সহিংস রক্তাক্ত আক্রমণের দশ দিন আগে সিআইএ, পেন্টাগন ইলেক্ট্রনিক ইন্টেলিজেন্স পাকিস্তানের সামরিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করেছে, তবুও ওয়াশিংটন বাঙালিদের সতর্ক করার প্রয়োজন বোধ করেনি। এই সহিংসতা শুরু হওয়ার পরদিনই কিসিঞ্জার উঁচু পর্যায়ের বৈঠকে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন এসব বিষয় নিয়ে 'কিছু করতে চান না... তিনি সক্রিয় কোনো নীতি অনুসরণ সমর্থন করছেন না।'

যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। নিক্সন উষ্ণভাবে ইয়াহিয়ার রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশংসা করেন এবং বিরাজমান জটিল পরিস্থিতির জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের ধ্বংসাত্মক কাজে অন্যান্য অস্ত্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অস্ত্র ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নিয়ে জনসমালোচনা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন পাকিস্তানে আরও অস্ত্র সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। দু'মাস পর জানা যায়, ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর আগে যেসব অস্ত্র চুক্তি হয়েছে, তার ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হয়। বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে, এটাকে 'স্যাংশন বা অববোধ' হিসেবে দেখা হতে পারে। 'অভ্যন্তরীণ সমস্যায় অযাচিত হস্তক্ষেপ' মনে করা হতে পারে এবং 'অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ' করে দেওয়া হলে 'পাকিস্তান অস্ত্রের জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্য উৎসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে'– এটি বরং একটি খোঁড়া যুক্তি। কারণ অন্য উৎস মানে চীন, যার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এখন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে।

২৫ মার্চের আগের চুক্তি অনুযায়ী যেসব সামরিক সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ সরবরাহ হওয়ার কথা তা প্রাণঘাতী হওয়ার কথা নয়। গোলাবারুদকে কখন প্রাণঘাতী বলা হয়– এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র তা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, এটি একটি 'ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন'

২৫ মার্চের পর পাঁচ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক কার্গো নিয়ে দশটি জাহাজ যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর ছেড়ে যায়। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা সাক্ষ্য দিয়েছেন, ২৫ মার্চের আগের চুক্তি অনুযায়ী ১০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সরঞ্জাম নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসে না। তবে তারা নতুন কোনো চুক্তিতে যাবে না– এতে পাকিস্তানকে কোনো কঠোর বার্তা প্রদান করা হলো না– ইয়াহিয়াকে বলা হলো না যে, তার কার্যক্রম যুক্তরাষ্ট্র অনুমোদন করছে না ১৯৭১-এর জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র পাশ্চাত্য দেশ, যে পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। নভেম্বরের গোড়ার দিকে ওয়াশিংটন জানায়, পাকিস্তানের জন্য মার্কিন সামরিক সহায়তার পাইপলাইন শুকিয়ে এসেছে।

দুর্ভিক্ষের হুমকির মুখোমুখি পূর্ব পাকিস্তানে এবং শরণার্থীবেষ্টিত ভারতে যথেষ্ট পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য-সহায়তা পাঠানো হয়েছে।

একাত্তরের জুনে বিশ্বব্যাংক সুপারিশ করে, পূর্বাংশে রাজনৈতিক সমঝোতা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে যেন কোনো উন্নয়ন সহায়তা প্রদান বন্ধ থাকে। অন্যান্যের মধ্যে ব্রিটেন, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস এবং পশ্চিম জার্মানি উন্নয়ন সহায়তা স্থগিত রাখে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তা করেনি। দাতা সংস্থার বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ঘোষণা করেন, 'রাজনৈতিক সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়ন সহায়তাকে ব্যবহার করতে চায় না।'

প্রশাসনের বাধার মুখে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ সাহায্য স্থগিত রাখার জন্য ভোট নেয়। এতে প্ররোচিত হয়ে নিক্সন পাকিস্তান সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নিয়ে প্রথমবার প্রকাশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন, 'গণচাপে আমরা পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে চাপ দিতে যাচ্ছি না। এর ফল সম্পূর্ণ উল্টো হবে। পাকিস্তানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা অব্যাহত থাকবে।'

সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানে নিক্সনের সমর্থন এবং তার বক্তব্য যে, সংকটটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার অবশ্যই পাকিস্তানি একনায়ক ইয়াহিয়ার মানসিক অবস্থান আরও জোরদার করেছে।

২ মে ১৯৭১ নিক্সন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'এই সময়ে ইয়াহিয়াকে চেপে ধরো না ' পূর্ব পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক রিলিফ অপারেশনে যুক্তরাষ্ট্র ছিল গুরুত্বপূর্ণ দাতা। স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মকর্তা বিশ্বাস করেন, ইয়াহিয়া যাতে অর্থবহ রাজনৈতিক সমাধানের দিকে এগোন সে জন্য হোয়াইট হাউসের প্রভাবকে কমিয়ে আনাই এ সহায়তার উদ্দেশ্য। ৩১ জুলাইয়ের বৈঠকে ডেপুটি এআইডি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রস্তাব দিলেন, ওয়াশিংটনের উচিত ইয়াহিয়াকে বলা যে, ত্রাণ কাজ চালানোর প্রয়োজনে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন থেকে সেনাবাহিনী উঠিয়ে নেওয়া দরকার।

কিসিঞ্জার তখন খেঁকিয়ে উঠলেন, তারা কীভাবে নিজেদের শাসন করবে সেটা আমাদের দেখার কী দরকার?

ততদিনে পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারত প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও ঘাঁটি দিয়ে বাঙালি গেরিলাদের সাহায্য করে যাচ্ছে। পাকিস্তানি ও ভারতীয় বাহিনী সীমান্তে কামানের গোলাগুলি বিনিময়, সীমান্তে রক্তক্ষয়ী আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের ঘটনাও ঘটছে। নভেম্বরের শেষদিকে ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান নিল। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমান ঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমণ চালায়। পুরোদমে শুরু হয় যুদ্ধ। দু'সপ্তাহ পর পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধরত পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

একাত্তরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে লাখ লাখ শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করে তা নয়াদিল্লি সরকারের ওপর অবিশ্বাস্য রকম চাপ সৃষ্টি করে। শরণার্থীদের ভিড় জমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। সেখানে মোট জনসংখ্যার ২০ ভাগ হতদরিদ্র মানুষই হচ্ছে শরণার্থী। বারবার রোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষ করে কলেরা মহামারী শিবির ছাড়িয়ে সাধারণ বসতিতেও ছড়িয়ে পড়ে। শত-সহস্র বাড়তি শরণার্থী সাধারণ ভারতীয় জনগণের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে এবং তারাও দুর্লভ চাকরির বাজারে প্রতিযোগী হয়ে ওঠে। ভারতীয় কর্মকর্তারা অবশ্যই চাচ্ছেন শরণার্থীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাক, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন: পাকিস্তান বাহিনী সেখানে উন্মত্ত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেলে তাদের কখনোই ফেরা সম্ভব নয়।

ভারতীয় হস্তক্ষেপের আরও একটি উদ্দেশ্য বেশ জটিল। ভারতীয় কর্মকর্তারা বিশ্বাস করতেন, স্বাধীনতাকামী বাঙালি শক্তি ক্রমান্বয়ে বৈপ্লবিক হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত গেরিলারা পাকিস্তান বাহিনীকে পরাস্ত করবে। পাকিস্তান বাহিনী হাজার মাইল দূর থেকে এসে আসলে একটি উপনিবেশ রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। বিজয় অর্জনে যত দেরি হবে, আন্দোলনের নেতৃত্ব বিশেষ করে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে বামদের হাতে চলে যাবে। নিজ দেশের অস্থির বাঙালি জনগণ নিয়ে ভারত সরকারের যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে। অতিমাত্রায় বিপ্লবী এ ধারণা থেকে ভারত সরকার রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালের শাসন জারি করেছে। সীমান্তের ঠিক ওপারে স্বাধীন বামপন্থি বাঙালি জাতিকে মেনে নিতে ভারতীয় নেতৃত্বের আপত্তি ছিল। ইয়াহিয়ার সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মোলাকাত ছাড়া কার্যত বাইরের অন্যান্য প্রভাব থেকে প্রেসিডেন্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। প্রেসিডেন্টের কাছে ইচ্ছেমতো যাওয়ার এই অস্বাভাবিক সুযোগ থাকার পরও যুক্তরাষ্ট্র কখনও স্বাধীন বাংলাদেশকে মেনে নিতে কিংবা শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিতে ইয়াহিয়াকে চাপ দেয়নি।

ডিসেম্বরের শুরুতে যখন পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হলো, কিসিঞ্জার নীতি নির্ধারকদের বললেন, 'আধঘণ্টা পরপর প্রেসিডেন্ট আমাকে পাগল করে ফেললেন যে, ভারতের ব্যাপারে আমরা কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছি না। তিনি চান আমরা পাকিস্তানের পক্ষে হেলে পড়ি।'

৩০ জুলাই ১৯৭১, যুদ্ধের চার মাস আগে কিসিঞ্জার সিনিয়র রিভিউ গ্রুপকে জানিয়েছেন, 'প্রেসিডেন্ট বারবার আমাদের পাকিস্তানের দিকে হেলে পড়তে বলেছেন।'

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১, জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ সিনিয়র যে কথা বলে তার বক্তৃতা শুরু করলেন তা হচ্ছে : জাতিসংঘের মতো মহান প্রতিষ্ঠানের যে নৈতিক কর্তৃত্ব তা কার্যকর করে যত দ্রুত সম্ভব দুটো বড় সদস্য দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপনের এখনই সময়।

এ কথা শুনে একজন মন্তব্য করেছেন, 'অচেতন পরিহাস।' জাতিসংঘের সক্রিয় ভূমিকা পালনের সময় মার্চেই পেরিয়ে গেছে। নয় মাস পরে নয়; হাজার হাজার দেহ লুটিয়ে পড়ার পর নয়। এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট জুলাই মাসেই নিরাপত্তা পরিষদকে সক্রিয় করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অন্য কেউ এ বিষয়ে শুনতে আগ্রহ দেখায়নি।

ডিসেম্বরে জর্জ বুশ নিরাপত্তা পরিষদে ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানের 'ট্র্যাজিক ভুল'-এর কারণে ভারত ক্ষমতা প্রয়োগের প্রাধিকার লাভ করতে পারে না।

অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দিল। কিসিঞ্জার যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বললেন, তিনি চান প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে একটি সাধারণ সূত্র অন্তর্ভুক্ত হোক, তবে 'আমরা অবশ্যই এটা মনে করি না কিংবা সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব যেমন মুজিবের মুক্তি এতে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই না।' সাধারণ পরিষদে বেশ বড় ব্যবধানে প্রস্তাবটি গৃহীত হলো।

একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে: ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে। গত কয়েক মাস ধরে পাকিস্তানি কর্মকর্তারা হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন– যুদ্ধ বেধে গেলে চীন বসে থাকবে না। আর যে ভারতীয় নেতারা অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন তারাও শুনিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে আমরাও একা নই। জুলাই মাসে কিসিঞ্জার ইসলামাবাদের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন, খুব ভালো হয় যদি ভারত চীনের কাছ থেকে একটি কড়া বার্তা পায় : পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে চীন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর যুদ্ধ বেধে গেলে চীন 'নীরব দর্শক'-এর ভূমিকা পালন করবে না। ডিসেম্বরে কিসিঞ্জার ভাবলেন, বেইজিংয়ের (তখন পিকিং) যুদ্ধে নেমে পড়ার সত্যিকার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিসিঞ্জার তার সহকারীকে আদেশ দিলেন, যদি চীন যুক্তরাষ্ট্রকে জানায়, তারা যুদ্ধে যাচ্ছে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রও জবাব দেবে তাদের সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিষয়টি উপেক্ষা করলে চলবে না। আপাতদৃষ্টিতে যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করার কোনো কথা বলা হয়নি– যদিও গোটা অঞ্চলই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে, আর যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারান্টিতে যদি কিছু হয় চীন যুদ্ধে নেমে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চীন কিসিঞ্জারের চেয়ে বেশি সংযত ছিল এবং কোনোভাবে নিজেকে জড়ায়নি। কিসিঞ্জার তার উপদেষ্টাদের জিজ্ঞেস করলেন, পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম পাঠাতে কোনো মৈত্রী দেশ যেমন জর্ডানকে যুক্তরাষ্ট্র বলতে পারে কি-না? তারা বললেন, কাজটা বেআইনি হবে। কিন্তু কিসিঞ্জার জর্ডান, সৌদি আরব ও ইরানকে তাদের দেশ থেকে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের প্রয়োজন হতে পারে বলে চিঠি লিখলেন এবং তিনি চাইলেন এই সরবরাহের সম্ভাবনার কথা ভারতের কানে পৌঁছাক। যখন জর্ডানের বাদশাহ যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি আটটি জেট পাকিস্তানে পাঠানোর অনুমতি চাইলেন, নিক্সন তাকে দশটি পাঠানোর অনুমতি দিলেন এবং বাদশাহ হোসেনকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এর বদলে সমসংখ্যক জেট জর্ডানকে দেওয়া হবে।

নিক্সন ও কিসিঞ্জার উদ্বিগ্ন ছিলেন পাকিস্তান বাহিনীকে পূর্বাংশে হারিয়ে দিয়ে ভারত শান্ত হবে না। যদিও পশ্চিম সীমান্তে ভারত প্রতিরক্ষামূলক সেনা সমাবেশ ঘটিয়ে থাকে তারা আসলে পশ্চিম পাকিস্তানকেও ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লাগবে। পারমাণবিক অস্ত্রবাহী উড়োজাহাজ বহন করতে জাহাজ এন্টারপ্রাইজের নেতৃত্বে একটি নেভাল টাস্কফোর্সকে ওয়াশিংটন বঙ্গোপসাগরের দিকে পাঠিয়েছে। ১০ ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানি সেনা কমান্ডার যুদ্ধবিরতি দিয়ে বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন হস্তক্ষেপ করবে– এতে উৎসাহিত হয়ে তিনি সৈন্যদের লড়াই চালিয়ে যেতে বললেন। (কিন্তু সাধারণ নাগরিকের ভোগান্তি অব্যাহত থাকল। পিছু হটার সময় পাকিস্তান বাহিনী অযোদ্ধা সাধারণ বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। বাঙালিদের হাতে হত্যার শিকার হয় অবাঙালি পাকিস্তানিরা।)

১৬ ডিসেম্বর পূর্বাংশের পাকিস্তানি বাহিনী নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও বাংলাদেশের সংকটকাল কাটেনি। ওয়াশিংটন খাদ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু কিউবায় পাট রফতানি বন্ধ না করলে যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য সহায়তা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিল।

১৯৭৫-এ একটি সামরিক অভ্যুত্থানে মুজিব সরকারের পতন ঘটানো হলো। সম্ভবত এর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল। নতুন সরকার যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং সৌদি আরবের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। মস্কো ও নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ পড়ল। ❖

[নিউ জার্সির উইলিয়াম প্যাটারসন ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিফেন আর. শ্যালমের প্রবন্ধ ও দুটি দলিল থেকে অনুবাদ]

মোহাম্মদ আলী [১৯৪২-২০১৬]

এম এ মোমেন

মোহাম্মদ আলী
দ্য বেস্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেটেস্ট



খেলা

[সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী ৩ জুন ২০১৬ ৭৪ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। প্রায় ৩৬ বছর ধরে তিনি পার্কিনসন'স ডিজিজে ভুগছিলেন। বক্সিং রিংয়ের আলী যত বড়, বক্সিং রিংয়ের বাইরে তার চেয়ে আরও বেশি বড়। অসুস্থ অবস্থায় তিনি ছুটেছেন লেবানন, বাগদাদ: মার্কিন জিম্মিদের উদ্ধার করবেন। তার এই উদ্যোগ ভালোভাবে নেয়নি মার্কিন প্রশাসন, এমনকি শুরুতে ইরাকের একনায়ক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। আলী দিনের পর দিন সাদ্দামের দেখা পাওয়ার প্রতীক্ষায় আছেন, ওদিকে নিত্যদিনের ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, বিছানা থেকে উঠতে কষ্ট হচ্ছে, কণ্ঠস্বরও বসে গেছে। সাদ্দাম যখন দেখা দিলেন, আলীর ব্যক্তিত্ব তাকে পরাস্ত করল। তিনি বললেন, মোহাম্মদ আলীকে খালি হাতে তার দেশে ফিরতে দেব না, কিছু জিম্মি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আলী জিম্মিদের সকলকে নিয়েই ফিরেছেন। প্রয়াত এই মানুষটি শুধু শ্রেষ্ঠই নন, মহত্তমও। মোহাম্মদ আলীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা।]

ভিয়েতকঙরা আমাকে নিগার বলেনি

১৯৬০ দশক যতই শেষের দিকে আসছে, আমেরিকানরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে চলে গেছে, তারা বাড়িয়ে দিয়েছে আলীর জনপ্রিয়তা। সে এমন এক সময় যখন জনগণ বুঝে গেছে ভিয়েতনামের ব্যাপারে সরকার যা বলছে সব বানোয়াট, কিন্তু মোহাম্মদ আলীর মুখ থেকে যা বেরোচ্ছে তাই সত্য, কারণ তিনি দেখেশুনে বলছেন; তার সঙ্গে কারও দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু তারা তাকে শ্রদ্ধা করে তার কথা শুনেছে।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বলেছেন, আমি মনে করি মোহাম্মদ আলী যে কাজ করেছেন (সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আদেশ অমান্য করা), যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনামে থাকা উচিত কি না তা

এই বিতর্কে বিশেষভাবে অবদান রেখেছে এবং তার ভক্তরা এই প্রথমবারের মতো যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এই কারণে যে, তিনি তার বিশ্বাস থেকে পিছু হটেননি। সেনাবাহিনীতে যোগদানের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে তার কঠোর ফল ভোগ করেছেন, রায় খারিজ না হওয়া পর্যন্ত তার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন খেতাব হারানোর ক্ষতি তাকে সইতে হয়েছে।

২০০১ সালের একটি স্যাক্ষাৎকারে মোহাম্মদ আলী বলেছেন, ভিয়েতনামে যেতে আমার অস্বীকৃতি কেবল কালো মানুষদের সাহায্য করেনি, আরও বেশি সাহায্য করেছে সাদাদের। বেশি সংখ্যক সাদা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আর এটা আমাকে সাদা মানুষদের কাছে যেমন কালোদের কাছেও নায়ক করে তুলেছে, কারণ এই পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস আমার ছিল, আর যেসব মানুষ অবিচারকে ঘৃণা করেন সবাই আমাকে সমর্থন জুগিয়েছেন।

আলী ২৮ এপ্রিল ১৯৬৭ ড্রাফটিং বোর্ডকে নক আউট করে দিয়ে বললেন, 'আমি ভিয়েতকঙদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছি না।'

মোহাম্মদ আলী ভিয়েতনাম নিয়ে তার অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

তারা আমাকে কেন বলবে ইউনিফর্ম পরে বাড়ি থেকে দশ হাজার মাইল দূরে গিয়ে ভিয়েতনামের বাদামি রঙের মানুষের ওপর বোমাবর্ষণ কর আর বুলেট চালাও যেখানে লুইভিলে তথাকথিত নিগ্রো মানুষদের সঙ্গে কুকুরের মতো আচরণ করা হচ্ছে, অস্বীকার করা হচ্ছে তাদের মানবাধিকার?

না আমি বাড়ি থেকে দশ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পৃথিবীজুড়ে কালো মানুষদের ওপর তাদের সাদা ক্রীতদাস প্রভুদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতে আরেকটি দরিদ্র দেশের জনগণকে হত্যার কাজে সাহায্য করতে যাব না।

এই সেই দিন, যখন এ ধরনের অশুভের সমাপ্তি ঘটা উচিত। আমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই ভূমিকা অব্যাহত রাখলে আমার সম্মান ধুলায় লুটাবে এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন যে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আমার তহবিলে যোগ হতো তা থেকে বঞ্চিত হব।

আমি একবার বলেছি, আমি আবারও বলব। এখানেই আমার জনগণ আসল শত্রু। যারা ন্যায়বিচার পেতে, স্বাধীনতা পেতে, সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে লড়ে যাচ্ছে তাদের দাসত্ব করাবার হাতিয়ার হয়ে আমি আমার ধর্মকে অসম্মানিত করতে পারি না।

আমি যদি ভাবতে পারতাম যুদ্ধ আমার দুই কোটি কুড়ি লাখ মানুষকে স্বাধীনতা ও সাম্য এনে দেব, তাহলে ড্রাফট করে আমাকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ানোর প্রয়োজন হতো না। আমি নিজেই কাল যোগদান করতাম। কিন্তু আমাকে হয় দেশের আইন মানতে হবে কিংবা আল্লাহ্‌র আইন। আমার বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়ালে আমার হারাবার কিছু নেই। কাজেই আমি জেলে যাব। আমরা তো চারশ' বছর ধরে জেলেই আছি।

পেশাগত জীবনের চরম উৎকর্ষের সময় যখন আলী হাতের গ্লাভস খুলে বন্দুক নিতে রাজি হননি। আলী প্রবল ঘোষণা দিয়ে তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। 'আমার বয়সী লাখ লাখ যুবক তখন বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার উপযুক্ত– যে যুদ্ধে তাদের কোনো বিশ্বাস নেই।' মোহাম্মদ আলীকে সমাহিত করার অনুষ্ঠানে বিলি ক্রিস্টাল বলেছেন, সেই সময় আলী নিজের জন্য দাঁড়িয়ে আসলে আমাদের সবার জন্য লড়েছিলেন।

আলীকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে।

প্রজাপতির আত্মা : জীবনপথের প্রতিবিম্ব
মোহাম্মদ আলী

(মোহাম্মদ আলীর আত্মজীবনী লিখতে সাহায্য করেছেন তার কন্যা হান্না ইয়াসমিন আলী। শুরুর দিকের খানিকটা অনূদিত হলো। এই অংশটুকুর নাম হতে পারে 'আমার শৈশব'।)

আমার মনে আছে কেন্টাকির লুইভিলে আমি কেবল একটি ছোট্ট শিশু, আমার মা রোববার খুব সকালে আমাকে আর আমার ভাইকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিত। আমাদের রুমে এসে কপালে চুমো খেয়ে কোমল কণ্ঠে ফিসফিস করে বলত 'জেগে ওঠো লক্ষ্মী সোনা, জেগে ওঠো। রুডি, আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি।'

আমার মা কখনও কখনও আমাকে 'জিজি' বলেও ডাকত, কারণ আমার কথা বলা শেখার পূর্বে আমার মুখ থেকে এই ধ্বনিগুলোই বের হয়েছে। আমি গোল্ড গ্লাভস জেতার পর মাকে বললাম, মা আমি জিজি বলতে গোল্ডেন গ্লাভস বোঝাতে চেয়েছি। আমি ভাবতাম আমার মায়ের নামটা পাখির নামের মতো, কিন্তু কেন এটা ভাবতাম জানি না। পাখিদের তো নামই নেই। কিন্তু যখনই আমি পাখির নামের কথাটা বললাম আমরা সবাই মাকে মামা বার্ড ডাকতে শুরু করলাম। আমাকে ও রুডিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে পাখি আমাদের জন্য চমৎকার নাশতা তৈরি করত। আমরা যখন নাশতা খেতাম, মা তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ পোশাকগুলো ইস্ত্রি করে বিছানার ওপর শুইয়ে রাখছে। তারপর মা আমাদের গোসলের জন্য ডাকছে। পোশাক পরার পর আমি এবং রুডি সানডে স্কুলে যাওয়ার আগে বাড়ির সামনের আঙিনায় একপ্রস্থ মার্বেল খেলে নিই।

আমার বেশ মনে আছে, কাপড় নোংরা না করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি জানি বো টাই আর সদ্য ইস্ত্রি করা পোশাকে আমাকে অনেক হ্যান্ডসাম দেখায়। পাখি যখন বেরিয়ে এসে আমার বাবা ক্যাসিয়াস ক্লে কিংবা ক্যাশ-এর পাশে দাঁড়ায়, আমি গর্বভরে তাদের দিকে তাকাই কী সুন্দর দেখায় তাদের আর পুরু কালো গোঁফে ক্যাসকে কত হ্যান্ডসাম মনে হয়। ক্যাস প্রায়ই আমাকে বলত, 'অধিকাংশ পুরুষ মানুষই আমাকে ঈর্ষা করে কারণ তাদের কারোই আমারটার মতো কালো এবং পুরু গোঁফ গজায় না।'

বাবা যখন যা বলেছে সবই আমার মনে লেগে আছে। তার কাছে তার গোঁফ অহঙ্কারের একটি উৎস। এখন প্রায়ই আমি নিজের গোঁফ বাড়তে দিই।

আমার বেড়ে ওঠার ভিত্তিটা ছিল বেশ শক্ত। আমার বাবা-মা ছিল খুব যত্নবান এবং খুব ভালোবাসতেন আমাদের। যতটুকু আমি স্মরণ করতে পারি সেই ছোটবেলা থেকে বাবা আমাদের আলিঙ্গন করত এবং চুমো দিত। বাবা বলত, 'দেখি ঐ চোয়ালগুলো এগিয়ে দে তো' (এই ছিল তার গালে চুমো দেওয়ার ভাষা। চুমোতে চুমোতে আমাদের গাল লাল করে ফেলত। আমি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ এমন একটা অনুভূতি ক্যাস আমাকে দিত। যদিও মাঝে মাঝে হঠাৎ আমার বাবার মেজাজ চড়ে যেত, মার সঙ্গে তার মতানৈক্য হতো, আমার শৈশবটা বেশ সুখেরই ছিল, আমি জানতাম আমি সবার ভালোবাসার পাত্র। আমি একজন বিশেষ কেউ এমন একটা অনুভূতি তারা আমাকে দিয়েছে। যখন বাবার আদর পাচ্ছি না, মা তখন গল্প শোনাতে বসে। যখন আমার জন্ম মামা বার্ড সে সময়কার গল্প বলে। মা বলেছে জন্মের পর আমি দেখতে এত সুন্দর একটা শিশু, সবাই ভেবেছে আমি বোধ হয় মেয়ে; তারপর তারা আমাকে বাড়ি নিয়ে আসে। ক্যাস তখন আমার গালে চুমো খেতে থাকে। আমার বাবা-মা যে সবদিক দিয়ে পরিশুদ্ধ ছিল এমন নয়। দু'জনের প্রকৃতিতে ছিল ভালোবাসা। আমার বাবা ছিল পেইন্টার। ম্যুরাল তৈরি করে সাইনবোর্ড লিখে তাকে

জীবিকার বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। লুইভিলের প্রায় সব ব্যাপটিস্ট চার্চে তার কিছু না কিছু কাজ রয়েছে। আমার বাবা মেধাবী ছিল। আমার ডেস্কের ওপর, অফিসের দেয়ালে তার একটি পেইন্টিং ঝোলানো আছে। ক্যাস লোকজনকে বলত, সে কেবল পেইন্টার নয়, আর্টিস্টও। কখনও কখনও আমাকে এবং রুডিকে তার সঙ্গে কাজ করতে নিয়ে যেত। ক্যাশ আমাদের শিখিয়েছে কেমন করে রঙ মিশিয়ে সাইনবোর্ডে কাজ করতে হয়। আমি কিছুটা আনতে পারতাম কিন্তু এটাকে বিশেষ কিছু বলা যাবে না। কিন্তু রুডি বাবার কাজটা পুরোটাই বুঝে নিয়েছে। সে একজন শিল্পীও। বাবা আমাদের ভালোভাবেই লালন করেছে, আমাদের শিখিয়েছে যেন আমরা ভালো মানুষের সান্নিধ্যে থাকি, আমরা যা ভয় পাই যেন তার মোকাবেলা করি এবং আমাদের সাধ্যমতো ভালো কাজটা যেন করি। এতসব উপদেশ দেওয়ার পর ক্যাস বলল, 'এসব আমার বাবা আমাকে বলেছে, এসব তো আর হঠাৎ করে কেউ শেখে না, শেখাতে হয়।

ক্যাসের ধরনটা অন্য রকম। একেবারে প্রাণবন্ত জীবনে ভরপুর, আলিঙ্গন চুমো, কথা, বিতর্ক সবই মিলেমিশে আছে। ক্যাশ আমার বাবা এবং বন্ধু। যখন সম্ভব বাবা আমার পক্ষে চলে এসেছে, আমাদের দু'জনের একসঙ্গে মন্দর চেয়ে ভালো সময়ই বেশি কেটেছে।

স্কুল থেকে ফেরার পর আমাদের হোমওয়ার্ক যখন শেষে কড়তাম, প্রতিবেশীদের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে আমরাও চলে আসতাম। আমি রুডিকে বলতাম, আমার গায়ে ঢিল মারো। রুডি ভাবত আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু যত নিষেধই করত, আমি এত দ্রুত সরে যেতাম যে একটাও লাগাতে পারত না। ডানে-বাঁয়ে ছুটে, ডজ দিয়ে, মাথা নামিয়ে, ঢিলের পথ থেকে সরে গিয়ে আমি অমত জানাতাম। মা যখন রুডিকে শাসন করতে চেষ্টা করত, মায়ের কাছে শুনেছি, চার বছর বয়সেই আমি বাধা দিতাম, বলতাম, আমার বাচ্চাটাকে মেরো না। রুডি এবং আমার সম্পর্ক এমনই ঘনিষ্ঠ।

শিশু হিসেবে আমি বাড়িতে তেমন ঝামেলা করিনি, কখনও ব্যতিক্রম ঘটলে মামা বার্ড আমাকে মেঝের এক কোণে বসিয়ে একটি পুরনো ভালুকের শুকনো মাথা এনে মেঝের মাঝখানে রেখে দিত। আমি এক ইঞ্চিও নড়তাম না। আমার মনে হতো মাথাটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে কামড়াতে শুরু করবে।

মা নরম স্বরে কথা বলত, অন্যের গালমন্দ কখনো করত না, তাদের বিষয়ে নাক গলাত না। মা আমাদের শিখিয়েছে কারও সম্পর্কে আগে থেকেই খারাপ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। মানুষকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। মা রান্না করত, খেত, আমাদের পোশাক বানাত এবং সারা দিনই পরিবারের সঙ্গে থাকত। মাকে আমি খুব ভালোবাসতাম, আমার সারা জীবনে তার চেয়ে ভালো কাউকে আমি পাইনি।

আমার বড় হয়ে ওঠার সময় আমার বাবা-মায়ের কাজ থেকে অনেক শিখেছি। যখন অবিচার হচ্ছে, তখনও তারা তাদের মর্যাদা সমুন্নত রেখেছে; আমি দেখেছি মা কীভাবে ক্ষমা করেছে, ঘৃণা করেনি। ক্যাস মাথা উঁচু রেখেছে। আমাদের খাওয়া-পরার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করেছে। আর্থিক দিক দিয়ে আমরা দরিদ্র ছিলাম, কিন্তু ভালোবাসা ও গর্বে আমরা ছিলাম যথেষ্ট ধনবান।

আমার মা ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান আর বাবা মেথোডিস্ট। কিন্তু আমরা সবাই মায়ের চার্চেই গিয়েছি। মা আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। ক্যাশও চেয়েছে মামা বার্ড তার মতো করে আমাদের লালন করুন, মা ভালো ব্যাপটিস্ট আর নারী-পুরুষের চেয়ে ভালো কাজেই আমরা যেন মাকেই অনুসরণ করি।

আমি যখন জুনিয়র স্কুলে পড়ি লুইভিলের স্প্যাল্ডিং কলেজের ব্ল্যাকবোর্ড ডেস্ক ও মেঝে মোছার কাজের জন্য আবেদন করি। সিস্টার জেমস এলা আমাকে চাকরিটা দিয়েছিলেন। সিস্টার অ্যানের তত্ত্বাবধানে আমি সপ্তাহে কিছু ডলার কামাই করতাম। সিস্টার এলা খুব মিষ্টি স্বভাবের মহিলা ছিলেন। কেমন করে শেলফ মুছতে হবে, কেমন করে মেঝে ঝাঁট দিতে হবে, তিনি আমাকে শিখিয়েছেন। কিছুদিন আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তার কথা আমার সবসময় মনে থাকবে।

আমার সুন্দর একটা শৈশব ছিল। অনেক বাধা ছিল, টাকা-পয়সার টানাটানি ছিল। কিন্তু আমি সোজা পথ থেকে নামিনি। মূল্যবোধগুলো আমার মনে জাগ্রত ছিল, কঠিন ছিল আমার বিশ্বাস। যদিও আমি পরে ধর্মান্তরিত হই, গড বরাবরই আমার অন্তরে ছিলেন। মা একবার বলেছে, আমার আত্মবিশ্বাস দেখেই মা আমার ওপর বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। আমি ভাবি উল্টোটা, আমার ওপর তার আস্থা আছে দেখেই আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। তখনও বুঝিনি, আসলে সেই ছোটবেলা থেকেই বাবা-মা আমার জীবনের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে।

ফ্যান্টম পাঞ্চ

১৯৫৯ সালে শিকাগোর গোল্ডেন গ্লাভস টুর্নামেন্টে মোহাম্মদ আলীর 'ন্যাশন অব ইসলাম' নামক সংগঠনের প্রধান এলিজাহ মোহাম্মদের নাম শোনেন। তখন তাঁর মনে অনেক বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। ১৪ বছর বয়সী কালো তরুণ এম্মেট হিল ক্যারোলিন নামে ২১ বছর বয়সী এক বিবাহিত নারীকে ডেটিংয়ের প্রস্তাব দেওয়ায় বর্বরোচিত নির্যাতন করে ১৯৫৫ সালে তাকে হত্যা করা হয়। এম্মেট হিলের 'মা ওপেন কাসকেট ফিউনারেল' আয়োজন করে মৃত ছেলের অত্যাচার জর্জরিত শরীর বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। বিষয়টি আলীর মনে গভীর দাগ কাটে। কালো মানুষ হওয়ার যন্ত্রণা তাকেও পেয়ে বসে। আমার নিজের জীবনেও বহু জায়গায় আমার প্রবেশাধিকার, আমার যাবার অধিকার নেই। অলিম্পিক গেমসে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করে আমি সোনার মেডেল জিতে এনেছি, কিন্তু আমি যখন আমার নিজের জায়গা লুইভিলে ফিরে আসি তখন আমাকে ডাকা হয় নিগার। অনেক রেস্তোরাঁ আমাকে পাবার সার্ভ করতে অস্বীকার করে। কেউ কেউ আমাকে ডাকতে থাকে 'ছোকড়া' বলে।

১৯৬১ সালে এলিজাহ মোহাম্মদের শিষ্য স্যাম স্যাক্সটনের সাথে তখনকার ক্যাসিয়াস ক্লের দেখা। স্যাম মায়ামির রাস্তায় 'মোহাম্মদ স্পিকস' নামের খবরের কাগজ। স্যাক্সটন তাকে মায়ামি মসজিদে আমার আমন্ত্রণ জানান। 'মায়ামিতে মুসলিম মন্দিরে প্রবেশ করে জীবনে এই নিজেকে সত্যিকারভাবে বিশেষ কেউ মনে হলো।'

'ব্রাদার জন নামে একজন মসজিদের ভেতর বক্তৃতা করছিলেন। তার বক্তৃতার যে বাক্যগুলো আমার কানে গেল : আমাদের নিগ্রো ডাকা হয় কেন? আমাদের পরিচিতি মুছে ফেলার জন্য এটা সাদা মানুষের একটি কৌশল। যদি কোনো চায়নাম্যানকে আসতে দেখেন তাহলে বুঝবেন তিনি চীন থেকে এসেছেন। যদি কিউবান কাউকে দেখেন তাহলে বুঝবেন তিনি কিউবার মানুষ। যদি কানাডিয়ান কাউকে দেখেন তাহলে জানবেন তিনি কানাডা থেকে এসেছেন। কিন্তু কোন দেশের নাম নিগ্রো?'

ন্যাশন অব ইসলামের বিচ্ছিন্নতাবাদী দর্শন ক্লে-কে স্পর্শ করল। 'আমি শুনেছি আমার ভালো লেগেছে, আমি আরো জানতে চেয়েছি।' 'আমি মার্টিন লুথার কিং এবং অন্য সিভিল রাইট নেতাদের পছন্দ করি, কিন্তু আমি একটি ভিন্ন পথে

যাচ্ছি।'

ন্যাশন অব ইসলাম যা ব্ল্যাক মুসলিম নামেও পরিচিত তার কাছে তাদের কাছে সাদারা শয়তান। ১৯৬০ দশকের সিভিল রাইটস আন্দোলনের সময় আফ্রিকান-আমেরিকানরা যখন সমতা ও ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করছিল সে সময় কালোদের ওপর যে নির্যাতনযজ্ঞ চালানো হয়েছে তার অনেক প্রমাণ এলিজাহ মোহাম্মদের অনুসারীদের কাছে আছে। আলীর নতুন বৈপ্লবিক ধর্মীয় আনুগত্য ১৯৬৪ সালে জনগণের নজরে আসে, তখন মোহাম্মদের প্রভাবশালী একজন শিষ্য ম্যালকম এক্স আলীর সাথে মায়ামি থেকে নিউইয়র্ক সফর করেছেন, মুসলমানদের একটি সমাবেশে আলী ভাষণ দিয়েছেন। লুইভিল কুরিয়ার জার্নালের সাথে সাক্ষাৎকারে ক্লে মুসলমানদের সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন। 'সাদারা কালোদের সম্পৃক্ততা চায় না। জোর করে এটা করা যায় বলে আমিও বিশ্বাস করি না।'

লিস্টনের সাথে লড়াইয়ের আঠার দিন আগে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ সালে ক্লের বাবা মায়ামি হেরাল্ড পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন তার ছেলে মুসলমান হয়ে গেছে। ক্যাসিয়াস ক্লে সিনিয়র অভিযোগ করেছেন ন্যাশন অব ইসলাম তার ব্রেইন ওয়াশ করে দিয়েছে এবং তার টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে।

হেভিওয়েট বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের আগে ক্লে মনস্তাত্ত্বিক মিসাইল ছোড়াও শুরু করলেন। লিস্টন যখন রিংয়ে প্রবেশ করে আলীর ক্রুদ্ধ চোখজোড়া যেন খুলি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চিৎকার করে বললেন, 'আমি তোকে খেয়ে ফেলব!'

পরদিনের সংবাদপত্র লিখেছে– 'একজন মানুষকে যতটা পেটানো সম্ভব লিস্টনকে আলী তাই করেছে। আলী বিজয় চিৎকার হয়ে উঠেছে অনেক কাগজের শিরোনাম। আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট! আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট! আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট!

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবার পর আলী নিজেই নিশ্চিত করলেন যে, তিনি ন্যাশন অব ইসলামের সদস্য। 'ব্ল্যাক মুসলিম তো সাংবাদিকতার শব্দ, এটা কোনো বৈধ নাম নয়, আসল নাম ইসলাম। তার মানে শান্তি। ইসলাম একটি ধর্ম, পৃথিবীর ৭৫ কোটি লোক এ ধর্মে বিশ্বাস করে, আমি তাদের একজন। আমি আর খ্রিষ্টান নই।'

৬ মার্চ, ১৯৬৪ আলী সাদা আমেরিকানদের তো বটেই, কালোদেরও অনেককে চটিয়ে দিলেন। এলিজাহ মোহাম্মদ রেডিওতে বললেন, 'এই যে ক্লে- এ নামের কোনো মানে নেই। আমি আশা করি, মোহাম্মদ আলীর মতো সুন্দর নাম সে পছন্দ করবে।'

ক্যাসিয়াস ক্লে মোহাম্মদ আলী হয়ে গেলেন। রিং ভেতর যে মুষ্টিযোদ্ধা তাকে ক্লে নাম ধরে ডেকেছেন, ক্রমাগত ঘুষিতে আলী তাকে বাধ্য করেছেন মোহাম্মদ আলী উচ্চারণ করতে।

শিকাগোর ককটেল ওয়েট্রেস সনজি বয়কে আলী বিয়ে করেছেন এক বছরও হয়নি, ইসলামী আদর্শ বিশেষ করে পোশাক পরিধানে সম্মত না হওয়ায় আলী তাকে তালাক দেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪ সালের যন্ত্রণা ভুলতে পারেননি সনি লিস্টন। এক বছর তিন মাসের ব্যবধানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন টাইটেল পুনরুদ্ধার করতে সনি লিস্টন আবার রিংয়ে প্রবেশ করলেন ২৫ মে, ১৯৬৪ সালে। মাত্র ১০৪ সেকেন্ডের মাথায় মোহাম্মদ আলীর প্রবল এক ঘুষিতে সনি লিস্টন যেভাবে ভূপাতিত হলেন, নির্ধারিত সময়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারলেন না।

আলীর সেই বিখ্যাত ঘুষি যা চোখের পলকে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে তা খ্যাত হলো 'ফ্যান্টম পাঞ্চ' নামে। আলী নামের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল রিংয়ের ভেতরে এবং বাইরে। আলী এ ফ্যান্টম পাঞ্চটি নিক্ষেপ করেছিলেন মেইন অথরাজ্যের লিউইসস্টন, বক্সিং রিংয়ে।

আলী যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দিতে ড্রাফটিং (বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগদান) বোর্ডের সামনে অস্বীকৃতি জানাল মেইনের গভর্নর বললেন, সকল দেশপ্রেমিক আমেরিকানের উচিত আলীকে ঘৃণা করা। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে বলা হলো খেলাধুলার ইতিহাসে সবচেয়ে বিরক্তিকর বাজে চরিত্র হচ্ছে মোহাম্মদ আলী।

আলীর পরের লড়াই ছিল আর্নি টেরেলের সাথে ১৯৬৬-এর মার্চে শিকাগোতে। শিকাগো ট্রিবিউন ইলিয়ন স্টেট অ্যাথলেটিক কমিশনকে লড়াই বাতিল করতে চাপ দিল। রাজ্য সরকার চাপে নত হয়ে গেল। আলীর আর ফ্যান্টম পাঞ্চ দেখানোর সুযোগ হলো না।

সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি তার জীবনের প্রাইম টাইম অপহরণ করে নিল। আলী ভার্সাস ইউএসএ মামলায় আলীর পক্ষের অ্যাটর্নি জোর দিয়ে বলেছেন, আলী মুসলমান বলেই মামলার শিকার হতে যাচ্ছেন।

শান্তির জন্য জীবনের ঝুঁকি

১৯৮৫-তে লেবাননে জিম্মি ৪০ আমেরিকানকে মুক্ত করতে আলী লেবানন ছোটেন। বাহ্যত মনে হয় তার মিশন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু মুক্তির পর জিম্মিদের একজন জেরেমি লেভিন জানালেন, একজন আমেরিকান ইসলামিক ব্যক্তিত্বের হস্তক্ষেপ ও পীড়াপীড়ির কারণেই জিম্মিরা মুক্তি পেয়েছেন।

আলী বলেছেন সেই ব্যক্তিত্ব 'আমিই হতে পারি'।

ইরাকের কুয়েত আক্রমণের পরপরই ১৯৯০-র আগস্টে সাদ্দাম হাজার হাজার বিদেশিকে জিম্মি হিসেবে আটক করলে, বোমা বর্ষণ হতে পারে এমন সব জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাদের রাখলেন। সাদ্দাম তাদের 'হিউম্যান শিল্ড' হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত ১৫ জন আমেরিকান পুরুষের মুক্তি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। ২৩ নভেম্বর, ১৯৯০ জিম্মিদশার ১১৩তম দিনে মোহাম্মদ আলী ইরাকে অবতরণ করলেন।

পৃথিবী জেনে গেল আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত মুসলমান মোহাম্মদ আলী, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন' এবং 'বিশ্বখ্যাত নায়ক' এখন বাগদাদে। আলী যেখানেই যাচ্ছেন, তাকে দেখার জন্য মানুষের ভিড় লেগে যাচ্ছে, তার অটোগ্রাফ চাচ্ছে, হাত মেলাতে চাচ্ছে, দু'দণ্ড কথা বলতে চাচ্ছে। ১৯৮৪ থেকে আলী পার্কিনসন'স রোগের জন্য সম্পূর্ণ ওষুধনির্ভর। বাগদাদে তার সাত দিন পেরিয়ে গেছে, সাদ্দামের দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। এদিকে সঙ্গে আনা ওষুধও ফুরিয়ে গেছে। পরিস্থিতি এমন যে, তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না, গলার স্বর ফিসফিস করে কথা বলার মতোও নয়। ওষুধের জন্য ছুটতে হলো বাগদাদ আইরিশ হাসপাতালে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমলারা আলীর এই উদ্যোগ পছন্দ করলেন, প্রেসিডেন্ট বুশ বিরক্তি প্রকাশ করলেন। অন্যরা বলে বেড়ালেন নোবেল শান্তি পুরস্কারের ধান্ধায় আলী বাগদাদে ছুটেছেন।

শেষ পর্যন্ত ২৯ নভেম্বর ১৯৯০ সালে সাদ্দাম আলীকে দেখা দিতে সম্মত হলেন। দু'জনের মধ্যে আন্তরিক আলাপ হলো।

সাদ্দাম জানালেন, 'আমি মোহাম্মদ আলীকে খালি হাতে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যেতে দিচ্ছি না। অন্তত কিছু সংখ্যক আমেরিকান নাগরিক তাকে সঙ্গ দিতে তার সঙ্গে যাবে।'

আলী ১৫ জন জিম্মির সকলকেই পেলেন।

ষোলো বছর ধরে পার্কিনসন'স রোগে ভুগছেন, ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, জীবনে ঝুঁকি নিয়ে সাদ্দামের মতো একনায়ক শাসকের সঙ্গে দরকষাকষি করে জিম্মি উদ্ধারে আর কে এগিয়ে আসতেন?

নোবেল শান্তি পুরস্কার অবশ্যই তার প্রাপ্য ছিল। ❖

তুলি হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফয়জুল লতিফ চৌধুরী

ছবির জগতে রবীন্দ্রনাথ

একটি কালপঞ্জি নির্মাণের প্রয়াস



র বী ন্দ্র না থ

এ এক ঐতিহাসিক সত্য: নানা পরিচয়ের সমন্বয়ে যে বিশাল, বিপুল রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি আমাদের মনে ভেসে ওঠে তার মধ্য থেকে 'চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ' যেন অনুপস্থিত। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ৭৫ বছর কেটে গেছে, তবু আজও চিত্রশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ অভিষেকের দাবি রাখেন অনেকের কাছেই।

চিত্রকলা রবীন্দ্রনাথকে আশৈশব খুব টানত। তাকে আকৃষ্ট করেছিল রেখা ও রঙের সমবায়ে যে ছবি নির্মিত হয়, তার মধ্যে প্রাণ ও বাণী সঞ্চারণের ব্যাপারটি। খাতায় কলম দিয়ে আঁকাআঁকির এক রকম প্রচেষ্টা মাঝেসাঝে চলত, যদিও জীবনের প্রথমভাগে তিনি মেনে নিয়েছিলেন, ছবি আঁকার ব্যাপারটি তার নয়। শৈশবেই পেন্সিল বা তুলির আঁচড়ে বাস্তবের প্রতিমূর্তি ফুটিয়ে তোলার যে সহজাত ক্ষমতার স্ফুরণ অনেককে চিত্রাঙ্কনে উৎসাহী করে তোলে, তা-ও তার ছিল না। পরিণত বয়সে অনেকটা খেলার ছলেই তিনি আঁকতে শুরু করেছিলেন। তারপর এক সময় তা নেশা হয়ে দাঁড়ায়। কার্যত তা রেখা ও রঙ থেকে ছবি ফুটিয়ে তোলার স্বীয় শক্তির দৈনিক পরীক্ষায় পরিণত হয়। চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রথাগত বা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আদৌ ছিল না। সুতরাং পরীক্ষাটি সহজ ছিল না

১৯৫৫ সালে মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছিলেন : 'সম্প্রতি রবীন্দ্র চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা খুব শুরু হয়েছে; যদিবা এ বিষয়ে এখনও অনেক মননার প্রয়োজন আছে।' এ লেখার পর প্রায় সাড়ে ছয় দশক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে আলোচনার পরিমাণ ঢের বেড়েছে; এরই মধ্যে বেরিয়েছে বেশ কয়েকটি

পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ; এমনকি দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে গবেষণা-সন্দর্ভ রচনা করে মিলে গেছে পিএইচডি ডিগ্রি। সব মিলিয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রচিত্র-ভাবনা আজ একটা সুপরিসর অবয়ব লাভ করেছে। তবু এখনও বোধ করি অনেক কথা বলা বাকি। লক্ষ্য করা যেতে পারে, রবীন্দ্রচিত্র-ভাবনা অনেকখানিই পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট, আলোচনায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট অভাব। এর বড় কারণ রবীন্দ্র চিত্রাবলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সমস্যা।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা কম-বেশি আড়াই হাজার ছবির হদিস এ পর্যন্ত করা গেছে। তবে পূর্ণাঙ্গ কোনো মুদ্রিত তালিকা এখনও লভ্য হয়নি। বিষয়, কালিক-পর্যায়, আকার ইত্যাদি ভেদে শ্রেণীবিন্যাসও কেউ কেউ করেছেন। তবে বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ছবিগুলোর সময়ানুক্রমিক একটি বিনিঃশেষ তালিকা খুব প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কম-বেশি আড়াই হাজার ছবির মধ্যে খুব বেশি হলে ছয়-সাত শত ছবিতে তারিখ দিয়েছেন। সুতরাং ছবিগুলোর কালানুক্রমিক তালিকা তৈরির কাজটি একদম সহজ নয়। যতটুকুন তথ্য লভ্য তা দিয়ে পরিষ্কারই উপলব্ধ হয় একটি বিবর্তনের ধারার অস্তিত্ব যদিও তার গতিপ্রকৃতি পরিপূর্ণভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

১৮৮০'র দশকে অঙ্কিত পেন্সিলে আঁকা কয়েকটি পোর্ট্রেটকে অশোক মুখোপাধ্যায় 'রবির সর্বপ্রথমোদ্যম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাণ্ডুলিপি সংশোধনের সময় কাটাকাটিগুলোকে একটি শিল্পিত রূপ দিতে গিয়ে রেখায় রেখায় রূপ ফুটিয়ে তোলার নিয়মিত অনুশীলন পরিলক্ষিত হয় ১৯২০-এর দশকের প্রথমার্ধে। তবে ১৯২৬ বা ১৯২৭ থেকে নিয়মিত ছবি আঁকতে শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪১-এ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ছবি এঁকেছেন তিনি।

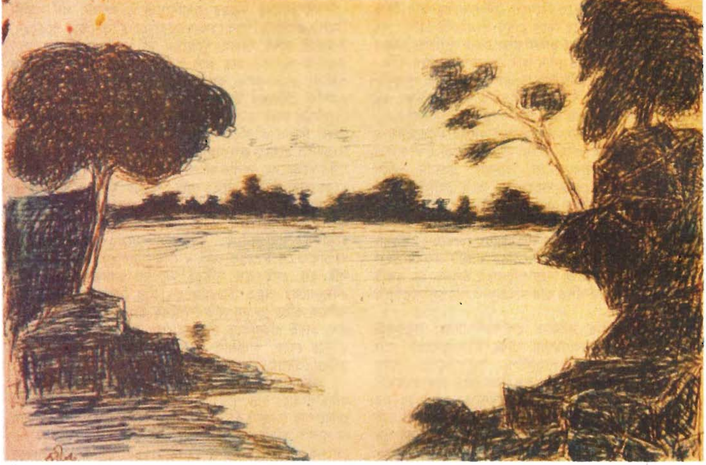
আরও পরিলক্ষিত হয় : রঙ নয়, তুলি নয়; প্রধানত রেখাকেই অবলম্বন করে তার যাত্রা শুরু ছবির জগতে। এই বৈশিষ্ট্য অনেকাংশেই শেষাবধি বজায় থেকেছে। যদিও পরিণত পর্যায়ে প্রচলিত ঢঙে রঙ-তুলিতে কিছু ছবি এঁকেছেন, তবু কালির-কলম আর রেখাই ছিল তার প্রধান অবলম্বন।

কী আঁকবেন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা না-নিয়েই তিনি ছবি আঁকা শুরু করতেন। রেখায়-রেখায় শেষ পর্যন্ত বোধগম্য পছন্দসই ছবি ফুটিয়ে তুলে তবে ক্ষান্ত হ'তেন। এ বিষয়ে মৈত্রেয়ী দেবীর স্মৃতিচারণ একরকম : 'কাগজের ওপর যখন একটি লাইন পড়তো কবি শিল্পী তখনও জানতেন না সেটি মুখ হবে কি ফুল হবে– সে কোনো অতি-প্রাকৃত জন্তু হ'য়ে উঠবে কি প্রান্তরের ওপর বনের আভাস দেবে। লাইনের পর লাইন দিয়েছেন। যখন একটি বিশেষ আকার ফুটে উঠলো তখন সেটার অনুসরণ করতে লাগল সচেতন দৃষ্টি। লাইনের ভারসাম্য ও সৌন্দর্য লক্ষ্য ক'রে রেখার সঙ্গে রেখার সংযোগ করতে লাগলেন শিল্পী। হয়তো আঁকছেন রঙ-পেন্সিল দিয়ে, সজোরে ঘষছেন তো ঘষছেনই, গেল তার শিস ভেঙে, তুলে নিলেন অজস্র পেন্সিল থেকে আর একটি, সেটার রঙের দিকে দৃকপাত মাত্র না ক'রে। হয়তো তুলে নিয়েছেন খুব মোটা ক'রে গোলা জলের রঙ, কিন্তু বিভিন্ন রঙের পাত্র থেকে তুলে নেবার পূর্বে ফিরে দেখবার প্রয়োজন বোধ করেন না কবি। পাশে যদি কেউ থাকে তবে তাড়া দিলেন পাত্রটি এগিয়ে দিতে, কিন্তু কোন রঙের পাত্র চাই সেদিকে দৃষ্টি নেই। সুন্দর একটি মুখ হয়ে উঠেছিল, দিলেন তার উপর খানিকটা কালি জেবড়ে। একটা পাশ গেল কালো হ'য়ে। মনে হলো এর মৃত্যু হলো। সে-সময় দর্শক যদি কেউ থাকত অবশ্যই তার মনে হতো এর হাত থেকে ছবিটি ধ্বংস হবার পূর্বে উদ্ধার ক'রে নেওয়া ভালো। কিন্তু তারপর সেই আকস্মিক উৎপাতের মতো রঙকে টানতে লাগলেন তুলি দিয়ে। ঘষতে লাগলেন, কখনো তুলি ফেলে দিয়ে আঙুল, নখ কাজে লাগালেন, আবার নতুন রঙ ঢাললেন, ঘষাঘষি চলতেই লাগল। তারপর ধীরে-ধীরে সেই কালিমা লাঞ্ছিত মুখমণ্ডলে বিচিত্র ব্যঞ্জনা ফুটে উঠলো। অজ্ঞাতপরিচয় রেখা ও রঙ ধরা পড়ল পরিচয়ের বন্ধনে÷ছন্দিত হল রূপের আকারে, রঙ-এর স্পন্দনে; অনিদের্শ্য সৌন্দর্য, রেখার বাণী অসংশয়ে বলল আমি এসেছি÷অয়ম্ অহং ভোঃ।'

রবীন্দ্রনাথের নিজের জবানিতেও এ বর্ণনার পূর্ণ সমর্থন মেলে। এভাবেই শিশুর স্বেচ্ছাচারের মতোই তিনি ছবি এঁকেছেন, এভাবেই ছবির ভাষায় খুঁজেছেন মগ্ন-চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এভাবেই পানমাত্র হয়ে ওঠে পাখির শরীরের মতো, সারসের শরীরের মতো ভৃঙ্গার, কচ্ছপাকৃতির টুল কি সর্পাকৃতি পেয়ালা। এমনকি টেবিলের উপর নিষ্পাপ জগের ছবিটিকেও সেখানে খোঁয়াড়ের জন্তুর মতো দেখায়। পরবর্তীকালে মানুষের যেসব মুখ কিংবা বিভিন্ন আকৃতির অবয়ব তিন এঁকেছিলেন তারও মধ্যে আভাসিত হয়েছে রূপকল্পনার দোলাচল : জ্যামিতিক মুখাবয়ব, যষ্টির মতো দেহ, শিলার মতো শরীর, কৌণিক দেহাবয়ব, পাখির মতো মাছ, পাখির মতো নারী, পাথুরে মুখ, প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো প্রাণী। কিন্তু এই যে, রেখায় রেখায় অদ্ভুত ছবি ফুটিয়ে তোলার খেলা, এর প্রেরণা শৈশবেই যেন অন্তর্জাত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথে। অস্তমান সূর্যের আলোকচ্ছটায় পশ্চিমাকাশে ইতঃস্তত চলমান মেঘপুঞ্জের যে অনির্বচনীয় রূপ সৃষ্টি হয়, সেই রূপ সৃষ্টিরই অন্বেষণ আমরা প্রত্যক্ষ করি রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত চিত্ররাজিতে। আর নিরাকারের এই রূপ সম্পর্কে কবির চেতনা অতি শৈশবেই জাগ্রত হয়েছিল মনে হয়। এবং তারই পরিণতিতে জীবনের শেষ অধ্যায়ে, বয়স যখন ৬৩ ছাড়িয়ে গেছে, পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির মধ্য দিয়ে অরূপের রূপ ফুটিয়ে তোলার খেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের মেধা বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে ধরা পড়ে তার শেষ বয়সের প্রেরণা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর চোখে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ভিক্টোরিয়া যদি না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক আর মন্দই হোক কারও চোখেই পড়ত না। 'পূরবী' রচনার সময়ই পাণ্ডুলিপি সংশোধনে সৌসামঞ্জস্যপূর্ণ কাটাকুটির খেলায় রবীন্দ্রনাথ খুব মেতে উঠেছিলেন। তার কথায়, 'কবিতা লিখতে কাটাকুটি করতুম, সেই





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকর্ম

কাটাকুটি যেন রূপ নিতে চাইতো, তারা হ'তে চাইতো জন্ম নিতে চাইতো। তাদের সে দাবী আমি অগ্রাহ্য করতে পারতুম না। পড়ে থাকলো লেখা, সেই কাটাকুটিগুলিতে রূপ ফলাতুম ......।' কাটাকুটি রেখায় রেখায় রূপ উন্মোচনের এই অভ্যাস ভিক্টোরিয়ার অনুপ্রেরণার রীতিমতো অনুশীলনে পরিণত হয়।

জাপান থেকে পেরু যাওয়ার পথে দৈব-দুর্বিপাকে আর্জেন্টিনায় সান-ইসিদ্রোতে রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্য বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ছোটো একটা খাতায় কবিতা লিখতেন সে সময়। বাংলা জানতেন না ভিক্টোরিয়া, তবু এ খাতার ভিন্ন একটা আকর্ষণ ছিল। পাতায় পাতায় কবিতার সংশোধনের নামে কাটাকুটির মধ্যে আভাসিত নানা কিম্ভূত অবয়ব ভিক্টোরিয়ার চোখে গূঢ়ার্থ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। ভিক্টোরিয়ার ভাষায়, 'সমস্ত ভুল, সমস্ত বাতিল করা লাইন কবিতা থেকে বহিষ্কৃত সব শব্দ এমনি ক'রে পুনরুজ্জীবিত হতো এক রূপের জগতে, আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন স্নিগ্ধ কৌতুকেই হাসতো তারা, নয়তো তাকিয়ে থাকতো একটু বাঁকা মুখে, মেলে ধরতো যেন অজানা প্রাণীর ভয়ংকর দৃষ্টি। ...... (এভাবে) কবিতার মধ্যে শব্দ খোঁজার ব্যাপারটাকে রেখায় রূপান্তর দেওয়া থেকে শিল্পের জন্ম হলো।'÷ ভিক্টোরিয়া উস্‌কে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে, প্রেরণা দিতে থাকলেন, আশা দিলেন। সাড়া দিলেন কবি : ১৯২৬-২৭ নাগাদ এই রেখার আঁকিবুঁকি ক্রমাগত অনুশীলনে পরিণত হলো চিত্রকলায়।

কেবল অনুশীলনে প্রবিষ্ট করে দেওয়া নয়; রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রথম প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভিক্টোরিয়ারই উদ্যোগে, ১৯৩০-এ, সারাজগতের চিত্রশিল্পীদের ভূ-স্বর্গ প্যারিসে। বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ছবি, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই। রাতারাতি রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর পরিচয় প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সব পরিচয় ছাপিয়ে তিনি যে 'পটো'– সে পরিচয়টাই ছড়িয়ে পড়ছিল।

ছবি রবীন্দ্রনাথের 'শেষ বয়সের প্রিয়া'। জীবন-সায়াহ্নে তিনি নিজেকে ছবির হাতে প্রায় নিঃশেষে সঁপে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? এ প্রশ্ন সবাইকে ভাবিয়ে তোলে। 'রবিকার চিত্রকর্ম' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রশ্নের জবাব দিলেন এই বলে, 'অতি গভীর অন্তরের উষ্মা ও তাপে এই রঙ রূপ সমস্তই যেন প্রকৃতির খেলাঘরে লুকানো হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ দিয়ে নির্মিত, ফেটে বেরিয়েছে, রূপ পেয়েছে। .... এত রঙ, এত রেখা, এত ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের গুহায় যা সাহিত্যে কুলালো না, গানে হলে না÷শেষে ছবিতেও ফুটে বের হ'তে হলো .....।'

এ কথাই খানিকটা অন্যভাবে বুদ্ধদেব বসু বললেন, '...রবীন্দ্রনাথকে বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকতে হলো তা' এ-জন্যেই। তাঁর সত্তার যে অংশটিকে তাঁর অতিপ্রজ লেখনী সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করতে পারেনি, তার জন্যে একটা নির্গমপথ সায়াহ্নকালে তিনি নির্মাণ ক'রে নিলেন।'

তা হলে কি মেনে নিতেই হবে যে, কলমে যা লেখা যায়নি, 'অকথিত সেই বাণী' প্রকাশেরই জন্য ছবির আশ্রয় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? কিন্তু সমস্যা হলো রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনে÷দৈবক্রমে একটা অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে।' তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার যে ইতিহাস তা থেকেও কি এ-কথারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে তিনি ছবি এঁকেছেন প্রথমতঃ ছবি আঁকার জন্যই? 'অশিক্ষিত' হাতে রেখার সমষ্টি ছবি হ'য়ে ফোটে কি-না এ-পরীক্ষার অধ্যবসায়ে সফল হয়েই তিনি ছবি-আঁকিয়েতে পরিণত হয়েছেন। এ-ছবি অবশ্য অন্তর্লীন অনুপ্রেরণারই ফল। অনন্ত সুন্দরের অর্থাৎ সৌষাম্য ও মসৃণতার কবি রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কেন ভিড় করে আসে কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা, কেন খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, কাঁটার মতো, অদ্ভুত ও বিকৃত মুখের মেলা বসে গেছে সেখানে– এ প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদের ও রকম মনোনিবেশ বিশ্লেষণে যেতে হয় বৈ-কি। অবশ্য, 'যে বিষণ্ন একটি মুখ তিনি এঁকেছিলেন তা তার নুতন বৌঠানের, বা ভুতুড়ে মুখগুলো রান্নাঘরের পাচকদের বা মলিন ভাবলেশহীন মুখগুলো সেই পরিচারিকাদের যারা তার বাড়ির পিছন দিককার উঠোনে কাজ করতো'– এ ধরনের বিশ্লেষণ আবেদনপূর্ণ হলেও সহসা মেনে নেওয়া যায় না। আরও দেখার ও বোঝার আছে; আরও মিলিয়ে দেখার আছে; আছে আরও ধ্রুব

ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়ার।

শিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষ থাকাকালে (১৯৮১-৮৩) রবীন্দ্রনাথের প্রায় ১৬০০ ছবির ক্যাটালগিং সম্পূর্ণ করেছিলেন। রবীন্দ্র চিত্রকলার সঙ্গে তার পরিচয় প্রত্যক্ষ ও নিবিড়। শিবনারায়ণ রায়ের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ এই , '১৯২৮ সাল থেকে চিত্রকর্মে নিমগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্যারিসের গ্যালারি পিগালে (২ মে, ১৯৩০) প্রথম প্রদর্শনী না হওয়া পযন্ত তিনি সে সম্পর্কে নিতান্ত অনিশ্চিত ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তারপর একাদিক্রমে বার্মিংহ্যামে, লন্ডনে, বার্লিনে, ড্রেসডেনে, কোপেনহেগেনে, জেনিভায়, মস্কোতে এবং বস্টন ও নিউইয়র্কে একই বছরে পর পর অনেকগুলি প্রদর্শনী হওয়ার ফলে এবং পশ্চিমী সমালোচকরা তাঁর এই নতুন কৃতির তারিফ করায় তিনি তাঁর ছবি আঁকাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। তখন ব্যবহৃত উপাদানের উৎকর্ষের দিকে নজর যায়, কিছুটা প্রায়োগিক নিপুণতা অর্জনের দিকে আগ্রহ বাড়ে, ভিতরকে প্রকটিত করবার প্রয়োজনে বাইরের রূপভেদ ও সাদৃশ্যজ্ঞানের উপযোগিতা একেবারে আর অবান্তর ঠেকে না। গোড়ার দিকে প্রাকপুরাণিক কিম্ভূতের, মগ্নচৈতনিক বিক্ষোভের প্রাবল্য যতটা ব্যাপক, পরের দিকে সে তুলনায় কলম, তুলি, খড়ি বা পেন্সিলের নিপুণতর প্রয়োগে নিসর্গচিত্র এবং মুখাকৃতি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সাদৃশ্য আনবার চেষ্টা করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন; কিন্তু এই সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত এই প্রয়াসের শেষ থেকে তিরিশের মধ্য এবং শেষভাগের বেশ কিছু ছবি জন্ম নিয়েছে, যেগুলিতে দৃঢ় মুখাকৃতি ও স্থির ল্যান্ডস্কেপের র' ও রেখাঙ্কন অবচেতনিক প্রাণশক্তির প্রক্ষোভে রহস্যময় ও বেগবান।' [সূত্র : শিবনারায়ণ রায় : 'প্রবন্ধ সংগ্রহ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ . ১১০-১২৪]

'অকল্পিত' ছবির ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় কোনো ছবির শিরোনাম তিনি দেননি। তার ছবি অনাহূতের আশ্রয়; তাই নাম দেওয়ার প্রশ্ন তিনি তুচ্ছ করেছেন। তার ভাষায়, 'রূপ সৃষ্টি পর্যন্ত আমার কাজ, নামবৃদ্ধি অপরের।' ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে কবির যে চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল সেটির উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বললেন, 'এই ছবিগুলিই আপনি তৈরি হ'তে-হ'তে আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। বিচিত্র কল্পনার পথে আমার আংগুলকে তারা চালনা করবে।' এখানে সঙ্গত কারণেই মনে আসতে পারে সুইস চিত্রকর পল ক্লের কথা। ক্লে তার ছবিকে 'রেখার স্বাধীন সঞ্চরণ' বলে অভিহিত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের উক্তির দুটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। তিনি 'বিচিত্র কল্পনা'র কথা বলেছেন, 'রূপসৃষ্টি'র কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনকে প্রধানত রূপসৃষ্টির বিষয় বলে উল্লেখ করলেন। যে কল্পনার কথা আমরা শুনলাম তা সেই জায়মান কল্পনা, যা তাৎক্ষণিক আর ধাবমান কলমের আঁচড়েরই সহজাত। রবীন্দ্র-চিত্রকলার কৌশল অনুধাবনের ক্ষেত্রে এ কথাটি মনে রাখার প্রয়োজন আছে।

অসীমের মাঝে রেখা সীমা সৃষ্টি করে। তার বাঁকে বাঁকে অদ্ভুত রহস্য, বিচিত্র দ্যোতনা। সেই রহস্যকে, সম্ভাব্য দ্যোতনাকে মূর্তিমান করার প্রচেষ্টাই ছিল কবির ছবি আঁকার অনতিক্রমণীয় আকাঙ্ক্ষা। তার জবানিতেই আমরা শুনেছি, 'আজকাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। ... কেবলই তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই।' এই রহস্যেরই পসরা সাজিয়ে তুলেছেন কবি তার কলম ও কালিতে। তার শেষ কথা : আমার ছবি রেখার ছবি, রঙয়ের ছবি, ভাবের ছবি নয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি বাণীহীন সঙ্গীতের মতো। আর তাতেই সে অনন্য ও অসাধারণ। চিত্রকলায় শিল্পী হিসেবে মগ্ন হওয়ার আগেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সারা বিশ্বে ছবির জগতে ঋতু বদলের জোর হাওয়া লেগেছে। 'ফটোগ্রাফিক রিয়্যালিটি' থেকে মুক্ত হয়ে ছবি তখন আপনার রূপ পেতে চাইছে। প্রথাসিদ্ধ কৃৎকৌশলের ভার আর অনুপুঙ্খ কারুকাজের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে প্রাকৃত, শিল্পিত, সরল রূপে ফিরে যেতে চাইছে। আমার বিশ্বাস, সম্পূর্ণ আপতিকভাবে হলেও একটি অনুভূতির জোয়ার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও বইছিল। অতঃপর বিশ্ব চিত্রশালার মুক্ত বাতাসের ঝাপটা তাকে আপন বিশ্বাসে আস্থাবান করে তুলল। ফলে, আমার বিশ্বাস, সম্পূর্ণ ঐতিহ্য-বিবর্জিত পথে ছবির জগতে প্রবেশ করতে রবীন্দ্রনাথ একটুও ইতস্তত করেননি। তার অন্ধবিশ্বাসের প্রমাণ পাই যখন তিনি ভিক্টোরিয়াকে বলেন, 'তোমার উৎসাহে এ-কাজে আমি প্রবৃত্ত হবো বটে তবে তুলি দিয়ে আমি ছবি আঁকবো না। যে কলম দিয়ে কথার কাব্য লিখি সে-কলম দিয়েই রঙ ও রেখার কাব্য লিখতে পারি কি-না তারই একটা পরীক্ষা চালাতে চাই।'

আজ অন্তত বলা যায়, এ পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ কেবল সফলই হননি; তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক রীতির প্রবর্তনা করে গেছেন। যামিনী রায় একবার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাঁটি ইয়োরোপীয় আঙ্গিকে।' যামিনী রায় সেই মুষ্টিমেয় প্রথমদের একজন যিনি কবির ছবিগুলোর অনন্যতা ও উচ্চ শিল্পমূল্য সম্পর্কে শুরুতেই সচেতন ছিলেন। অন্যদিকে বার্লিনের 'টেম্পো' পত্রিকার অভিমত ছিল এই যে, 'অনুভূতি ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্প নব্য-ইয়োরোপীয় ধারার খুব কাছাকাছি।'

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রথম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। বলার অপেক্ষা রাখে না, নোবেল-বিজয়ী কবির পক্ষে তার শৌখিন চিত্রচর্চার নিদর্শনগুলোর প্রতি প্যারিসের নাক-উঁচু চিত্র-সমালোচকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজতর ছিল। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, ঐ শৌখিন ভারতীয় কবির আঁকা ছবিগুলোর অনন্যতা তাদের নাড়া দিয়েছিল। প্রায় কারও সঙ্গেই যেন তার মিল নেই; নেই কোনো ঐতিহ্যেরই অনুরণন। অবশ্য কেউ বলেছেন, তার আঁকা কয়েকটি মানবদেহের ছায়ামূর্তি শিল্পী মুখকে স্মরণ করিয়ে দেয়; আর হাস্যরসের সহজস্ফূর্তিতে তিনি পল ক্লের সমধর্মী। কেউ স্মরণ করেছেন রোলফস্-এর খেয়ালি অঙ্কনরীতির কথা। কেউ বা খুঁজে পেয়েছেন জেমস এনসর বা বেলের ছায়াপাত। জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকর এমিল নোল্দের সঙ্গেও যেন বাস্তবিক কিছু সমিলতা লক্ষ্য করা যায়। নোলদে প্রাচীন পুরাতাত্ত্বিক শিল্পকলার দানবীয়-সত্তায় অনুপ্রাণিত আঁকিয়ে। হিংস্র অভিব্যক্তি, অবয়বের বিকৃতি, ভয়াবহ বর্ণচ্ছটা আর আর্ত-আঁচড়ে নারকীয় আবহ তৈরিই ছিল তার ছবির বৈশিষ্ট্য। আপাত দৃষ্টিতে এই সাযুজ্য যথেষ্টই বটে। তবে এখানে পারস্পরিক প্রভাবান্বয়ের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। জার্মান সমালোচকের ভাষায়, 'এতে প্রভাবের কোনো কথাই ওঠে না-বরং তাদের শিল্প প্রবণতার সাধর্ম্যই পরিস্ফুট।'

ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ যখন রীতিমতো ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করলেন ততদিন বিশ্ব-চিত্রকলা সম্পর্কে তার মনে সুস্পষ্ট একটা ধারণা কেলাসিত হয়ে গেছে। তার মনে হয়েছিল : নানা অলঙ্কার আর ওস্তাদিয়ানার মারপ্যাঁচে ছবির জগৎ ভারাক্রান্ত, প্রাণহীন ও নির্জীব। ১৯২৫ সালে আধুনিক চিত্রসজ্জদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আদিকালের মানুষ তার অশিক্ষিত পটুত্বে বিরল রেখায় যে-রকম সাধাসিধে ছবি আঁকত, ছবির সে গোড়াকার ছাঁদের মধ্যে ফিরে না গেলে এই অবান্তরভারপীড়িত শিল্পের উদ্ধার নেই।'

সাধারণত শিরোনাম তো দেন-ই নি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারিখও দেননি। ফলে রবীন্দ্রনাথের ছবির টেকনিকের ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে বিবর্তনের ধারা নিরূপণ করা কঠিন। তবু আমরা চিত্রশিল্পের জগতে কবি রবীন্দ্রনাথের অপ্রত্যাশিত ভ্রমণের একটি কালপঞ্জি নিরূপণের চেষ্টা করেছি। এটি সম্পূর্ণ নয় কোনোভাবেই। কখনও সঠিক তারিখ আছে, কখনও সাল ও মাসের নাম পাওয়া যায়, কখনও কেবলই সাল কত তা জানা যায়। কখনও খ্রিস্টাব্দ কখনও বঙ্গাব্দ। তথ্যের এই অভাব ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও কবি কীভাবে জীবনসায়াহ্নে এসে আত্মপ্রত্যয়ী একজন নিয়মিত চিত্রকরে পরিণত হলেন তার কিছু ধারাক্রমিক চিহ্ন এই কালপঞ্জিতে ধরা পড়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রীসত্তাকে সম্যক বুঝতে এই কালপঞ্জি সহায়ক হবে।

কালপঞ্জি

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৮৬১: ৭ মে (২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)
চিত্রকর ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার. পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর. মাতা সারদা দেবী. পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান।

১৮৭৪ অগ্রহায়ণ/ ১৮৭৪ বঙ্গাব্দ : প্রথম কবিতা 'ভারতভূমি' বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৮৭৫ : রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ 'দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণ আলোকে দেখিতাম দেয়ালের উপর হইতে মাঝে-মাঝে চুনকাম খসিয়া গিয়া কালোয়-সাদায় নানা প্রকারের রেখাপাত হইয়াছে. সেই রেখাগুলি হইতে আমি মনে মনে বহুবিধ অদ্ভুত ছবি উদ্ভাবন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম।' (উৎস : 'জীবন স্মৃতি')

১৮৭৮ : 'মালতী' পুঁথিতে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কিছু স্কেচ প্রকাশ।

১৮৭৮ সেপ্টেম্বর : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ইংল্যান্ড যান।

১৮৭৯-১৮৮০ : ইউনিভার্সিটি কলেজ. লন্ডনে অধ্যয়ন।

১৮৮১ : গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই অভিনয় করেন।

১৮৮৩, ৯ ডিসেম্বর : খুলনার বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবী রায়চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ।

১৮৮৫ : যৌবনের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে আত্মজীবনীতে লিখেছেন. 'মনে পড়ে. দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে-যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে÷সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন-মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল. কিছুমাত্র আঁকা গেল না. সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।'
[জীবন স্মৃতি. বিশ্বভারতী ১৩৫৭. ১৪৭]

১৮৯৩, ১৭ জুলাই : চিত্রকলার দুর্দমনীয় আগ্রহ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত ক'রে থাকি-কিন্তু আর পাবার আশা নেই. সাধনা করবার বয়স চ'লে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাকেও সহজে পাবার জো নেই-তার একেবারে ধনুকভাঙা পণ-তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হোলে তার প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে-বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সবচেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন....।'
['ছিন্নপত্র'. পত্রধারা. বিশ্বভারতী ১৩৪৫. ২২৬]

১৯০০, ৩০ সেপ্টেম্বর : রবীন্দ্রনাথ স্কেচবুক বানিয়ে তাতে মাঝে-মধ্যে ছবি ও নকশা আঁকতেন। জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠিতে লিখেছেন: 'শুনে আশ্চর্য হবেন. একখানা ঋশবঃপয নড়ড়শ নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁকচি। বলা বাহুল্য. সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্য তৈরি করচিনে. এবং কোন দেশের ন্যাশনাল গ্যালারি যে এগুলি স্বদেশের ট্যাক্স বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এ-রকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাত্র নেই। কিন্তু কুৎসিৎ ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা করলুম. এবারে ষোল-আনা কুড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে ওই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করবার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে. যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশি রবার চালাতে হচ্ছে. সুতরাং ওই রবার চালনাটাই অধিক অভ্যাস হ'য়ে যাচ্ছে। অতএব মৃত র‍্যাফেল্ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রে থাকতে পারে-আমার দ্বারা তাঁর যশের কোন লাঘব হবে না।'
[চিঠিপত্র ৬. বিশ্বভারতী ১৯৫৭. ৮-৯. ।]

১৯০১ : শান্তিনিকেতনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন. যা ১৯১৮-তে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত।
রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের আবাস তুলে দিয়ে চলে যান শান্তিনিকেতনে।

১৯০২ : কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। এর কয়েক মাসের মধ্যে কন্যা রেণুকা মারা যান।

১৯০৪ : 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি পল্লী সংগঠন সম্পর্কে গঠনাত্মক কার্যপদ্ধতি. লোকশিক্ষা. সামাজিক কর্তৃত্ব. সমবায় প্রভৃতি জনসেবার দিক তুলে ধরেন।

১৯০৫ : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করেন।

১৯০৫ (২১ আশ্বিন ১৩১২) : বঙ্গাব্দ 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' গানের সঙ্গে অলঙ্করণ : সঞ্চারমান লতা।

১৯০৭ : মৃত্যু ঘটে কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের।

১৯০৯ : চিত্রকর নন্দলাল বসুর সঙ্গে পরিচয়। 'চয়নিকা'র জন্য কিছু ছবি এঁকেছিলেন নন্দলাল।

১৯০৯ এপ্রিল : এক দুপুরবেলা শিল্পী মুকুল দে'কে ডেকে রবীন্দ্রনাথ দেরাজ খুলে মোটা চামড়া-বাঁধাই কালো খাতা বের করে দিলেন। তাতে ছিল বেশ কিছু 'হেড ও ফিগার স্টাডি' এবং আলঙ্কারিক নকশা।

১৯০৯ : চামড়া বাঁধানো ড্রয়িং বুকে আঁকা রবীন্দ্রনাথের অনেক স্কেচ ও ড্রয়িং উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে।

১৯১২ জানুয়ারি : ভগিনী নিবেদিতা সংখ্যার মডার্ন রিভিউতে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের ইংরেজি অনুবাদ করেন। এই গল্প পড়ে অভিভূত হন ইংরেজ মনীষী চিত্রশিল্পী উইলিয়ম রোটেনস্টাইন।

১৯১৩ : গীতাঞ্জলির (Song Offerings) জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি।

১৯১৬ : কবির জাপান ভ্রমণ। এ ভ্রমণে তার সঙ্গে ছিলেন দু'জন ভারত অনুরাগী উইলিয়ম পিয়ারসন ও সিএফ এন্ড্রুজ এবং তরুণ শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে। জাপান থেকে কন্যা মীরা দেবী লিখলেন. 'চিত্রবিদ্যা আমার বিদ্যা নয়। যদি তা হতো দেখাতে পারতুম. আমি কী করতে পারতুম।'

১৯১৬ : জাপানি চিত্রকলার অভিজ্ঞতার আলোকে অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন. 'এখানে এসে বুঝতে পারলুম যে তোমাদের আর্ট ষোল-আনা সত্য হয়নি।'

১৯১৬ : জোড়াসাঁকোয় 'বিচিত্রা' স্টুডিও স্থাপন।

১৯১৭ : শান্তিনিকেতনে 'কলাভবন' প্রতিষ্ঠা।

১৯২০ : প্যারিসে প্লাস দ্য মাজলেনইন-এর ছবির দোকানে ইমপ্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে অভিভূত হয়েছিলেন।

১৯২০ : প্যারিসে প্লাস দ্য মাজলেনইন-এর ছবির দোকানে ইমপ্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্টদের ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে অভিভূত হয়েছিলেন।

১৯২০ : ২০ জুন. অক্সফোর্ডে স্টেলা ক্রামরিশ-এর (১৮৯৫-১৯৯৩) সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তীকালে (২১ ডিসেম্বর ১৯২১) তিনি শান্তিনিকেতনে এলে কলাভবনে যোগ দেন। তিনি শিল্পকলার ইতিহাস নিয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সব বক্তৃতায় যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২১ : জার্মানির ভাইমার ভ্রমণ। বাউহস স্কুলের চিত্রীদের সঙ্গে পরিচয়। ওয়াল্টার গ্রোপিয়াস এবং বিশেষ করে পল কী সঙ্গে সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ। কখনও কখনও পল কী'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অংকণরীতির সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়।

১৯২১, জুন : অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় চিত্রশিল্পী ফ্রানৎ সিজেক-এর শিশুদের চিত্রকলা প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন।

১৯২২ : শান্তিনিকেতনে 'কলাভবন'-এর অধ্যক্ষ হিসেবে নন্দলার বসুর (১৮৮২-১৯৬৬) যোগদান।

১৯২২ : ২২ ডিসেম্বর জার্মানির Bauhaus দলের প্রদর্শনী কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ ছিল। আয়োজক ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। যাদের চিত্রকর্ম ছিল তারা হলেন : লিওনেল ফেইনিযার (৩৫টি শিল্পকর্ম). জোহানেস ইটেন (২৩টি). ওয়াসিলি কান্ডেনিস্কি (৪টি). পল ক্লি (৯টি). জেরহার্ড মার্কস (২০টি). গর্গ মুশে (৭টি). লথার শ্রেইরার (৭টি). সেটি কর্নার (২টি) প্রমুখ। উল্লেখ্য. এসব ছবি কখনোই ফেরত দেওয়া হয়নি।

১৯২৩ : 'রক্তকরবী' রচনাকালে বিশু পাগলের গান 'ধামার শেষ রাগিনীর ধুয়ো ধরলি রে কে তুই' কাটাকুটি করতে করতে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত এক প্রাণীর আদল ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তার বহু ছবিতে অদ্ভুতুড়ে পাখী. প্রাণীর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। এমনকী মানুষের মুখায়বেও দেখা যায় অদ্ভুতুড়ে চেহারা।

১৯২৪ : 'পূরবী' কাব্য রচনাকালে পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি. আর্জেন্টিনায় ভিক্টোরিও ওকাম্পোর সঙ্গে পরিচয়।

১৯২৪ : কবি প্রাচ্যদেশ ভ্রমণে বের হয়ে চীন-জাপান ঘুরে আসেন। এ সময় রচিত হয় তার বিখ্যাত নাটক 'রক্তকরবী'। এ বছরই তিনি দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দিতে যাত্রা করেও যেতে পারেননি।

১৯২৪ : রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক The Art of old Peru (সম্পাদক ওয়াল্টার লেহম্যান) গ্রন্থটি পাঠ।

১৯২৪ : ১৮ অক্টোবর ১৯২৪ তারিখে ফ্রান্সের শেরবুর্গ বন্দর থেকে 'আন্দেস' নামীয় জাহাজে দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ শুরু। এই জাহাজযাত্রায় যেসব কবিতা লিখেছিলেন যেমন 'অপরিচিতা' ও 'আনমনা' সেগুলো কাটাকুটির মাধ্যমে অলঙ্কৃত করেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯২৪ নভেম্বর থেকে জানুয়ারি : ভিক্টোরিও ওকাম্পোর আতিথেয়তায় আর্জেন্টিনায় সান-ইসাদ্রেরাতে মিরালরিও লামীন গৃহে রবীন্দ্রনাথের প্রায় দুই মাস অবস্থান। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা রচনা। পাণ্ডুলিপিতে সংশোধনের কাটাকুটিতে আঁকাজোকার আভাস।

১৯২৪ : ১৯ নভেম্বর : বুয়েনোস আইরেসে উরুগুয়ে চিত্রশিল্পী পেদ্রো ফিগরি'র (১৮৬১-১৯৩৮) চিত্রপ্রদর্শনী পরিদর্শন।

১৯২৪ : প্রতিমা দেবীকে লেখা চিঠি : 'পুপের চিঠি পেলুম.... ওর নাচ যেমন নিরর্থক. ওর লেখাও তেমনি. হিজিবিজির নৃত্য। এই হিজিবিজিবিদ্যায় আমারও সখ আছে.... এই জন্যে ওর চিঠির ঠিকমত উত্তর আজ সকালে বসে বসে লিখেছি। আমরা যাঁর অতিথি তিনি আমার টেবিলে হঠাৎ এটা দেখে অবাক.... এর একটু ব্যাখ্যাও করা দরকার। গোড়ায় আমি কাগজটার উপর ওর যত আদরের নাম সব লিখলুম.... তার পরে যেমন করে আমার লেখার ভুলগুলোকে চাপা দিই তেমনি করে নানা আঁকাজোকা দিয়ে ওগুলো সম্পূর্ণ চাপা দিয়েছি।'
[সূত্র : চিঠিপত্র ৩. বিশ্বভারতী ১৩৪৯. পৃ. ৪০-৪১।

১৯২৪-১৯২৫ : জোরেশোরে ছবি আঁকা শুরু. রক্তকরবীর পাণ্ডুলিপিতে

নকশার খেলা।

১৯২৫ : ভিক্টোরিয়াকে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ এই লিখে– 'বিজয়ার করকমলে'। ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে অতিথি কবিতায় লিখেন : 'প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করে দিলে, নারী মাধুর্য সুধায়; কত সহজে করিলে আপনারি দূরদেশী পথিকেরে...'

১৯২৬, ১৬ জুন : ইতালির ফ্লোরেন্সে লেনার্দো দ্য ভিনসি সমিতি কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সংবর্ধনা প্রদান।

[সূত্র : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জি, ১৯৬২]

১৯২৬, ৩ জুলাই : রম্যাঁ রলাঁ তার দিনলিপিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর্মে লালের পরিবর্তে বেগুনি ও ফিরোজা রঙ ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন।

১৯২৬, ২৬ আগষ্ট : নরওয়ের রাজধানী অসলোতে গুস্তভ ভিগেলান্ডের স্থাপত্যকর্ম দর্শন।

১৯২৬-১৯৩২ : বিভিন্ন অবকাশে প্রচুর ছবি অঙ্কন।

১৯২৮ : ঝর্ণা কলমে কালো কালিতে অনেক স্কেচ অংকন। পরবর্তীকালে 'পেলিক্যান' ব্র্যান্ডের নানা রঙের কালিতে ছবি আঁকতেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯২৮ : ৮-৩১ আগষ্ট গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে'র ২৮ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতার বাসভবনে অবস্থান। এ সময় ১২৬টি ছবি এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

[সূত্র : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জি, ১৯৬২]

১৯২৮ : ১০ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে সারা দিন ছবি অঙ্কন।

[সূত্র : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জি, ১৯৬২]

১৯২৮ : ১০ অক্টোবর শান্তিনিকেতন কলাভবনে আয়োজিত চিত্রপ্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের কিছু ছবি প্রদর্শন।

১৯২৮ : ৭ নভেম্বর নির্মলকুমারী মহলানবিশকে চিঠিতে লিখেছেন : 'আমার এখনকার সর্ব্বপ্রধান দৈনিক খবর হচ্ছে ছবি আঁকা। রেখার মায়াজালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। কোনোকালে যে কবিতা লিখতুম সে কথা ভুলে গিছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত করে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা।

...আমি যেসব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টো প্রণালী রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তার পরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌছতে থাকে মাথায়। এই রূপ সৃষ্টির বিষয়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিষ্ট হতুম তাহলে গোড়াতেই সংকল্প করে ছবি আঁকতাম মনের জিনিস কালের মত কর্ম্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতুম-তাহলে পদ্মার তীরে বসে কালের সোনার তরীর জন্যে কেবলি ছবির ফসল ফলাতুম-এখন নানা দায়ের ভিড় ঠেলে ওর জন্যে অল্পই একটু জায়গা কর্ত্তে পরি—তাতে মন সন্তুষ্ট হয় না—ও চাচ্ছে আকাশের প্রায় সমস্তটাই, আমারো দিতে আগ্রহ-কিন্তু গ্রহদের চক্রান্তে নানা বাধা এসে জোটে-জগতের হিতসাধন তার মধ্যে সর্বপ্রধান।'

[সূত্র : দেশ, ৪ চৈত্র ১৩৬৭, ৫১৫.]

১৯২৮-১৯৩০ : কলম দিয়ে কালির রেখায় আঁকা সরলরেখা ও কৌণিক প্রখরতা সম্পন্ন চিত্রকর্ম অঙ্কন। অধিকাংশ সাদা-কালোয় আঁকা। তিন বৎসরে আঁকা এরকম ছবির সংখ্যা চার শতাধিক। ১৯২৮-২৯-৩০-এর ছবিগুলি মুখ্যত কলম দিয়ে কালির রেখায় আঁকা। কিছু ছবিতে সরলরেখা ও কৌণিক প্রখরতা প্রবল, কিছু ছবিতে আঁকাবাঁকা রেখায় অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব নানা রূপাবয়ব আকার পেয়েছে। শিবনারায়ন রায় পর্যবেক্ষণ করেছেন, "অনেক ছবিতে তিনি হালকা রঙের উপরে কলম দিয়ে কাটাকুটি করে সেই রঙেরই ঘন বুনোট দিয়েছেন। প্রায় ছবিতেই পশ্চাদপট অন্ধকার, তা থেকে উত্থিত জনকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন শাদা ফাঁকের ঘের দিয়ে (দ্রষ্টব্য ঝরণা কলম এবং ওয়াটারপ্রুফ কালিতে আঁকা হিংস্র জলচরের মুখ, তারিখ এবং স্বাক্ষরহীন)।" [সূত্র: শিবনারায়ন রায়: "প্রবন্ধ সংগ্রহ", আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ— : ১১০-১২৪]

১৯২৯ : কাঠের ওপর রঙিন কালি দিয়ে প্যাঁচার ছবি অঙ্কন।

১৯২৯ : ২৪ জুন, সাইগনে শিল্প জাদুঘর দর্শন।

১৯২৯ : ২২, ফেব্রুয়ারি, উইলিয়াম রোটেনস্টাইনকে চিঠিতে লিখেছেন : If I ever have an opportunity I should like to show you some pictures that I have done myself with the hope of once again being startled with your appreciation as in the case of Gitanjali.

[সূত্র : Imperfect Encounter, Harvard University, ১৯৭২, ৩২৫]

১৯২৯ : প্যারিসের পিগ্যাল আর্ট গ্যালারিতে আয়োজনের উদ্যোগ। মূল উদ্যোক্তা আঁদ্রে জিদ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও আঁদ্রে কার্পেলেস।

১৯৩০ : ২ মে, প্যারিসের পিগ্যাল আর্ট গ্যালারিতে প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন। ১২৫টি চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থাপন।

১৯৩০ : 'রূপম' পত্রিকায় প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলির প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ কলকাতার ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি ছবি ক্রয়।

১৯৩০ : ৩ মার্চ নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে রোটেনস্টাইনকে চিঠিতে লিখেছেন, I am sure they do not represent what they call Indian art.

১৯৩০ : ২৬ মার্চ, ফ্রান্সে মি. কানের আতিথ্যে অবস্থান। এদিন সারাদিন আপন মনে ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩০ : ২৮ মে,

An Apology is due from me for my intrusion into the world of pictures and thus offering a perfect instance to the saying that those who do not know that they know not are, apt to be rash where angels are timidly careful. I, as an artists, cannot claim any merit for my courage; for it is the unconscious courage of the unsophisticated, like that of one who walks in dream on a perilous path, who is saved only because he is blind to the risk.

The only training which I had from my young days was the training in rhythm in thought, the rhythm is sound. I had come to know that rhythm gives reality to that which is desultory, which is insignificant in itself. And therefore, when the scratches in my manuscript cried, like sinners, for salvation, and assailed my eyes with the ugliness of their irrelivence, I often took more time in rescuing them into a merciful finality of rhythm than carrying on what was my obvious task. In the process of this salvage work I came to discover one fact, that in the universe of forms there is a perpetual activity of natural selection in lines, and only the fittest survives which has in itself the fitness of cadence, and I felt that to solve the unemployment problem of the homeless heterogeneous into interrelated balance of fulfillment is creation itself.

My pictures are my versification, in line. If by chance they are entitled to claim recognition, it must be primarily for some rhythmic significance of form which is ultimate and not for any interpretation of idea or representation of a fact.

[বার্মিংহাম সিটি আর্ট গ্যালারিতে প্রদর্শনী পুস্তিকার ভূমিকা]

১৯৩০ : ২৮ মে, বার্মিংহামের 'সিটি মিউজিয়াম অ্যান্ড আর্ট গ্যালারি'তে রবীন্দ্র চিত্রপ্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে My Pictures শীর্ষক নিবন্ধ প্রকাশ।

১৯৩০ : জুলাই, জার্মানির বার্লিন শহরে অবস্থিত 'ফার্দিনান্দ মুল্যার গ্যালারি'তে রবীন্দ্র চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত। পরবর্তীকালে ড্রেসডেন ও মিউনিখ শহরেও স্বল্প সময়ের জন্য এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

১৯৩০ : ২ জুলাই, লন্ডনে My Pictures শিরোনামীয় বক্তৃতা প্রদান। মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় মুদ্রিত।

১৯৩০ : ২৩ জুলাই, জার্মানির মিউনিখে 'গ্যালারি কাসপেরি'তে রবীন্দ্র চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৯৩০ : ৯ আগষ্ট, ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন শহরে রবীন্দ্র চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৯৩০ : ১৭ সেপ্টেম্বর, মস্কোর 'স্টেট মিউজিয়াম অব নিউ ওয়েস্টার্ন আর্ট'-এ রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন। এতে প্রায় ২০০ জলরঙে আঁকা ছবি প্রদর্শিত হয়। এক সপ্তাহে পাঁচ হাজার দর্শক এ প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন। মস্কো প্রদর্শনীর উদ্বোধন ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

My most intimate gifts to you are my pictures, and I hope taht in them we shall truly meet each other..... I myself value them ohiefly because they enable me to get into direct touch with the western people. Words have failed me, the help of the interpreter has created further distractions in the path of our mutual understanding. Let me hope that my pictures will be messengers of thought between us and bring us close to each other on the plane of harmonious understanding.

[Modern Review, January ১৯৩১, পৃ. ১০]

১৯৩০ : ১৭ সেপ্টেম্বর, মস্কোতে শিল্প সমালোচকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

Critic : What is the idea of this picture?

Tagore : No idea. It is a picture. Ideas are in words not in life....

Critic : We asked whether your paintings have any title.

Tagore : None at all. I cannot think of any names. I do not know how to describe my pictures.

Tagore : None at all. I cannot think of any names. I do not know how to describe my pictures.
Critic : Is this a portrait of Dante?
Tagore : No, it is not a portrait of Dante. I did it on the steamer on my way from Japan last year, my pen followed its own impulse, which led to this figure......
Critic : Is this any particular colour?
Tagore : No. Just ordinary blue fountain-pen ink....
[Modern Review, January ১৯৩১. পৃ. ৮]

১৯৩০ : অক্টোবর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বষ্টন শহরের মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস-এ রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাটালগের শুরুতে ছিল আনন্দ কুমার স্বামীর মুখবন্ধ।

১৯৩০ : নভেম্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ৬'ষ্ঠ গ্যালারিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে রবীন্দ্রনাথের লেখা The Language of Pictures শীর্ষক নিবন্ধ মুদ্রিত হয়েছিল।

১৯৩০ : ৩০ নভেম্বর, নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনে রবীন্দ্র চিত্রপ্রদর্শনীর সমালোচনা প্রকাশ।

১৯৩০ : ডিসেম্বর, বষ্টনের 'মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস'-এ অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র চিত্রপ্রদর্শনীর ক্যাটালগে My Pictures নামে তৃতীয় একটি নিবন্ধ প্রকাশ।

নিউইয়র্ক ও বষ্টনে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের প্রদর্শনী।

১৯৩০ : ৭ ডিসেম্বর, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে নিউইয়র্কে সাক্ষাৎ।

১৯৩১ : ৭ মার্চ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :"আমার ছবি আঁকার কলম আমার হুকুম মেনে চলে না। আমার আঙ্গুলকে তার হাতে নিবেদন করে বলি 'যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি'। তারপর আপন খেয়ালে যা হয় কিছু একটা করে বসে।"

১৯৩১ : মে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩১ : ৬ জুন, দার্জিলিং থেকে অনুজ শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে'কে লেখা পত্রে ভারতের মাটিতে তার চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠান বিষয়ে অনীহা প্রকাশ।

১৯৩১ : ১৮ জুন, শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে'কে লেখা চিঠিতে কলকাতায় চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন।

১৯৩১ : ২৫ ডিসেম্বর, কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের একক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন। মূল উদ্যোক্তা মুকুল চন্দ্র দে। ১৯৩১ ডিসেম্বর দ্য নিউম্যান গ্যালারিজ, ফিলাডেলফিয়া, ইউএসএ। টাউন হল বোম্বে, ভারত।

১৯৩১-১৯৩২ : পাখি, সরীসৃপদের অবলম্বন করে আঁকা ছবির সংখ্যা বেশি।

১৯৩২ : 'কমলা বক্তৃতা'য় কবি বলেন 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করে কয়েকটি বক্তৃতা দেন এবং ১৯৩৮ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

১৯৩২ : অঙ্কিত চিত্রে কখনও অস্বচ্ছ রঙ, কখনও অত্যুজ্জ্বল রঙের ব্যবহার শুরু।

১৯৩২ : 'নিসর্গের প্রেক্ষাপটে কলসী মাথায় অবগুণ্ঠিত রমণী' ছবিটি অঙ্কন।

১৯৩২ : গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট-এ ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন। আয়োজক শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে। এ উপলক্ষে একটি সচিত্র ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৯৩২ : প্রথম আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কন।

১৯৩২-৩৩ : 'পসরা হাতে নারী' ছবিটি অঙ্কন। মাধ্যম কলমের এচিং ও ওয়াটারপ্রুফ কালি। আকার ২৭ × ২০.৫ সেন্টিমিটার।

১৯৩৩ : জ্যামিতিক ফর্মে ফিনিক্স পাখির ছবি অঙ্কন। মাধ্যম কালি, কলম ও রুলার। আকার ১৮.৭×২৫.৪ সেন্টিমিটার।

১৯৩৩ : রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী টাউন হল, বোম্বে।

১৯৩৪ : স্বীয় ফটোগ্রাফের ওপর রঙিন কালি, ক্রেয়ন ও রিড পেন দিয়ে চারটি 'আত্মপ্রতিকৃতি' অঙ্কন।

১৯৩৪ : 'নীলিম নিসর্গে দ্বীপ' ছবিটি অঙ্কন। মাধ্যম সিল্কের ওপর প্যাস্টেল ও কালি। আকার ৩৪.৬ × ৫০.১ সেন্টিমিটার।

১৯৩৪ : ৩ সেপ্টেম্বর, কার্ডবোর্ডের ওপর কালি ও জলরঙ দিয়ে উদ্বাহু বালিকা ও অবগুণ্ঠিত মানুষের ছবি অঙ্কন। আকার ১৮.৮ × ২৫.৭ সেন্টিমিটার।

১৯৩৪ : ২৫ অক্টোবর, মুখাবয়বের রেখাচিত্র অঙ্কন। চক্ষুদ্বয় বর্গাকৃতি। আকার ২৫.৫×৩৫ সেন্টিমিটার।

১৯৩৪ : অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে লেখেন 'এখন মাদ্রাজে এসে এই লোকহিতকর পালা চলচে-টাগোরকে সাজতে হচ্চে কখনো শিক্ষা সংস্কারক, কখনো পল্লী সংস্কারক, কখনো বিশ্ব সংস্কারক। এখন সব সাজ ফেলে দিয়ে চিত্রকূটের শিখরে চড়ে নির্জনবাসের জন্যে মন উৎসুক।'

১৯৩৫ : অঙ্কিত চিত্রে 'শ্রীরবীন্দ্র'র পরিবর্তে 'শ্রী' বর্জিত কেবল 'রবীন্দ্র' লেখা থাকে।

১৯৩৫ : ২৮ জানুয়ারী, 'নিসর্গের প্রেক্ষাপটে গরুর পাশে মানুষ' ছবিটি অঙ্কন। মাধ্যম কালি ও পোস্টার কালার। আকার ৪০.৭×৫৬.৭ সেন্টিমিটার।

১৯৩৫ : (১ আষাঢ়, ১৩৪২), চন্দননগরে অবস্থানকালে আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কন।

১৯৩৫ : ২১, জুলাই রেখার টানে নিসর্গচিত্র অঙ্কন। আকার ২৫.১×৩৫.৫ সেন্টিমিটার।

১৯৩৫ : ৪ নভেম্বর, কালি ও পোস্টার কালার দিয়ে কয়েকটি বৃন্তসংলগ্ন এক গুচ্ছ ফুলের ছবি অঙ্কন। আকার ২৫ ক্ষ ৩৫ সেন্টিমিটার।

১৯৩৫ : ২৭ ডিসেম্বর মুকুল চন্দ্র দে'র সঙ্গে ভারতের 'জাতীয় শিল্পমন্দির' স্থাপন প্রসঙ্গে পত্রালোচনা।

১৯৩৫-১৯৩৬ : ছবিতে মানুষের রূপ প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

১৯৩৬ : এপ্রিল, বেশ কয়েকটি আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কন।

১৯৩৬ : ১৪ মে, 'নীলিম আকাশের প্রেক্ষাপটে তিনটি গাছ' ছবিটি অঙ্কন। আকার ৩৯.৭ × ৫০.৩ সেন্টিমিটার।

১৯৩৬ : ১৬ জুন, জলরঙ ও কালি দিয়ে অদ্ভুত মুখাবয়ব অঙ্কন। আকার ২১×১৮.১ সেন্টিমিটার।

১৯৩৬ : ২৬ জুন, 'তীক্ষ্ণ চঞ্চু বর্ণিল পাখির ঝাঁক' ছবিটি অঙ্কন। মাধ্যম ওয়াটারপ্রুফ কালি ও পোস্টার কালার। আকার ৬৭.২ × ৫০ সেন্টিমিটার।

১৯৩৬ : ২১ জুলাই, কবিতা রচনা : 'অয়ি চিত্রলেখা দেবী, ক্ষম মোরে, তোমার মহিমা যদি খর্ব করে থাকি ....'

১৯৩৬ : জুলাই, 'চিত্রশিল্পী'র ভূমিকায় লিখেছেন....

১৯৩৭ : ২৮ সেপ্টেম্বর, 'ফুল হাতে রমণী' ছবিটি অঙ্কন (রবীন্দ্র স্বাক্ষরিত)। কাগজে জলরঙ, ২২ × ৩৫ সেন্টিমিটার

১৯৩৭ : ২০ অক্টোবর, 'নিসর্গের প্রেক্ষাপটে পাঁচজন মানুষ' ছবিটি অঙ্কন। মাধ্যম ওয়াটারপ্রুফ কালি ও জলরঙ। আকার ৪৯.৫ × ৩৩.৫ সেন্টিমিটার।

১৯৩৮ : ২৯ এপ্রিল- ২৭ জুন, আলমোড়ায় অবস্থান ও বহু ছবি অঙ্কন।

১৯৩৮ : ৯, ডিসেম্বর 'ক্যালম্যান গ্যালারি', লন্ডনে আয়োজিত রবীন্দ্র চিত্রপ্রদর্শনী, লর্ড জেটল্যা কর্তৃক উদ্বোধন।

১৯৩৯ : চিত্রপ্রদর্শনী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ভারত।

১৯৪০ : ১৬ এপ্রিল, মুখোশ জাতীয় ছবি অঙ্কন (১৩০টির সর্বশেষটি)।

১৯৪০ : ১৫ জুলাই, 'বন-বনানীর আবহে ঘোড়ার পিঠে আরোহী সন্তবেশী মানুষ' ছবিটি অংকন। মাধ্যম কালি-কলম এবং প্যাস্টেল। কালো ও রঙীন সরু রেখার জালিকায় এক অভিনব রূপ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর একটি এই ছবি।

১৯৪০ : ৩ আগস্ট, রেখার জালিকার অপরূপর বিন্যাসে রবীন্দ্র এঁকেছেন একটি নিসর্গচিত্রঃ 'উঁচু-নিচু জমিতে গাছের সারি'।

১৯৪০ : সেপ্টেম্বর, কালিম্পঙ গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে।

১৯৪০ : সেপ্টেম্বর, ১৮টি ছবি সংবলিত 'চিত্রলিপি' প্রকাশিত।

১৯৪০-৪১ : ছবি এঁকেছেন তবে সংখ্যা খুব কম।

১৯৪১ : কবি বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় একটি নিবন্ধে শিল্পী যামিনী রায়ের মন্তব্য প্রকাশ : 'রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন খাঁটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে; সুতরাং তার ছবি বোঝার যারা চেষ্টা করবেন, তাদের পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে হবে।' [সূত্র : কবিতা, আষাঢ়, ১৩৪৮]

১৯৪১ : ২৫ এপ্রিল, শিল্পী যামিনী রায়কে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি।' [সূত্র : শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ]

১৯৪১ : ৩ ফেব্রুয়ারি, 'আরোগ্য'-এর একটি কবিতায় কাটাকুটির খেলা। ("বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে; আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে...")। ১৯২৪ থেকে পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটির ছলে যে রূপ ফুটিয়ে তোলার অনুশীলন দিয়েই চিত্রকলার জগতে কবি রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশ। কিন্তু এটি ছিল তাঁর নেশা। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই কাটাকুটির খেলা অব্যাহত ছিল।

১৯৪১ : ১৫ জুন, (১ আষাঢ়; ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ); জীবনের শেষ ছবি আঁকেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্যাস্টেলে আঁকা একটি গাছ, গাছের সম্মুখে একজন মানুষ।

১৯৪১ : শেষ কবিতা রচনা; "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/ বিচিত্র ছলনাজালে,/ হে ছলনাময়ী... / মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপূণ হাতে / সরল জীবনে। / এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত; / তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি। / তোমার জ্যোতিস্ক তারে / যে-পথ দেখায় / সে যে তার অন্তরের পথ, / সে যে চিরস্বচ্ছ, / সহজ বিশবাসে সে যে / করে তারে চিরসমুজ্জল। / বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু, / এই নিয়ে তাহার গৌরব। / লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত। / সত্যেরে সে পায় / আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে। / কিছুতে পারে না তা'রে প্রবঞ্চিতে, / শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে / আপন ভাণ্ডারে। / অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে / সে পায় তোমার হাতে / শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

১৯৪১ : ৭ আগস্ট, (২২শে শ্রাবণ) ; কলকাতায় পারলোকগমন। ❖



প্রতিকৃতি : বিপ্লব সরকার



সঙ্গীত

মুস্তাফা জামান আব্বাসী

সঙ্গীতের কুমার শচীন দেববর্মন

রাজপ্রাসাদ আকর্ষণ করেনি সঙ্গীতের কুমার বাংলার সঙ্গীত ভূখণ্ডের অকৃত্রিম রাজকুমার শচীন দেববর্মনকে। দু'বার দেখেছি তাকে। গাঁথা হয়ে আছে তার স্মৃতি মনের দুয়ারে চিরকালের মতো। কুমিল্লা 'রানীকুটির' ও ত্রিপুরার আগরতলায় খুঁজে ফিরেছি তার পদচিহ্ন, কুড়াতে এসেছি তার জীবনের ফেলে আসা হারানো দিনগুলো।

নতুন দিনের মানুষ তাকে খুঁজে ফিরবে তার গানের মালায়, অক্ষয় হয়ে আছে যা। এই অশ্রুমালা নিবেদিত তার চরণে। বাংলার হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে তার সুরের কাঙাল একজন গুণমুগ্ধ বৈ তো নই। সেই বাঁশি বাজান দিনগুলোর স্নিগ্ধ আবেগে মাখানো তার জীবনের উত্থান-পতনের আবেগের সঙ্গে আমার আবেগও আজ মিশ্রিত করলাম হাজারও নাম-না-জানা বিহঙ্গের মতো। তার গানের মূলে বিহার করেছে যারা, তারা এর মূল্য জানে। বিশুদ্ধ এর গায়ন রীতি। তুলে নিয়েছিলাম তার গান। সুপরিচিত গানের সঙ্গে অপরিচিত গানগুলোর চরণ কণ্ঠে তুলে নিয়েছিলাম সেদিন, যখন তার গান শোনার রেওয়াজ ছিল না, সংগ্রহ করেছি ৪৫ আরপিএম রেকর্ডগুলোতে। আজ ঘরে ঘরে সিডিতে, ইউটিউবে; এক সেকেন্ডেই সব গান হাজির।

পুরনো কথা আমার মতো করে আজ বলব। দেশের সঙ্গীতপাগল মানুষ তাকে কতখানি ভালোবাসে, তা আমি জানি না। হয়তো আমার এ কাহিনী পড়ে আরও দু'ফোঁটা অশ্রু তার জন্য সযত্নে তুলে রাখবে–এ আমার অভিলাষ।

প্রথম দেখা

যেদিন তাকে প্রথম দেখি, সেদিনের কথা। ভারত সরকার আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছে, যার যোগ্য আমি নই। ভারতীয় হাইকমিশনার মুচকন্দ দুবে আমার বাসায় এলেন। ভদ্রলোক আমাকে খুব ভালোবাসেন। বললেন, আপনাদের তিন ভাইবোন আমাদের মাথার মণি। কারণ আর কিছু নয়। আপনারা আমাদের সন্তান। আব্বাসউদ্দীনের পুত্র-কন্যা, তাই আপনাদের আমরা এত ভালোবাসি। আপনাকে ভারত

সফরের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যেখানে খুশি যাবেন, সেখানেই থাকবে সুবন্দোবস্ত।

সফরের সব বাদ দিয়ে আসল কথায়। বম্বের ফরেন অফিসের স্মার্ট মহিলা কর্মকর্তা বললেন, বলুন, এবার বম্বেতে কার কার সঙ্গে দেখা করবেন? হেমামালিনী থেকে শুরু করে সবার নাম গড়গড় করে বলে গেলেন। বললাম, অভীষ্ট একজন, শচীন দেববর্মন। বললেন, তার সঙ্গে দেখা হবে না, উনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। বেজায় ব্যস্ত, সারাদিন ফিল্মের কাজ নিয়ে। বললাম, বাড়িতে পৌঁছে দিন, বাদবাকি দেখব। কার্ড পাঠালাম, লেখা আব্বাসউদ্দীনের ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে তলব। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম, জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আব্বাস ভাইয়ের ছেলে? তুমি আমার অতিথি। এখানেই থাকবে। কী আদর ও যত্ন করলেন, তা বলার জন্যই অনেকগুলো পাতার প্রয়োজন।

তার গানের কথা মনে হতেই কোথায় যেন বেজে উঠেছে মুরলি বাঁশি, যা শুনে অধীর হয়ে পাগলিনী প্রায় রাধা; তিনি ছুটেছেন কৃষ্ণ অভিমুখে। আমাদের প্রতি গ্রামে রাধা ও কৃষ্ণ। পটের রাধা-কৃষ্ণ নয়, হৃদয় রাধা হৃদয় কৃষ্ণ। তাই এ রাখালি বাঁশির নেই বিরাম বাংলার প্রতি লোকালয়ে। নিজে শুনেছি সেই বাঁশি। রাধারূপী রমণী বাঁশি শুনে কাতর হয়ে যায়। যারা শুনেছে তারাও। যারা এ গান গেয়ে বেড়িয়েছে, তারাও এ বাঁশির সুরে সিক্ত। যত গান কুড়িয়েছি সারাজীবনে হিসাব রাখিনি, রাখলে হাজার পেরিয়ে যেত।

'বাঁশির সুরে উড়িল পরাণ, কেমনে ঘরে থাকি রে' গানটির মূল সংগ্রহ করেছি ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে। প্রথম যেদিন রেডিওতে গাইলাম শ্রোতা বিমোহিত, কোথায় লুকিয়েছিল এত সুন্দর সুর? কারা সেই মানুষ যারা এত সুন্দর গান লিখতে পারে, গাইতে পারে? নিশ্চয়ই তারা সর্বোত্তম। গানটিকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি, যা গেয়ে ফিরেছি টেলিভিশনে শতাধিকবার। গানটির নায়ক ধোলাই, তাকে উদ্দেশ করে নায়িকা গাইছে :

শিশুকালে চিনিলা না
ধোলাই পুরুষ কেমন জনা
এখন ক্যানে কান্দেন ধোলাই
পুরুষ কাঞ্চা সোনারে

ধোলাই কেমন জানি না। সে পুরুষ, যাকে ভালোবাসা দেয়নি মেয়েটি। পরে বুঝতে পেরেছে পুরুষের মূল্য। পুরুষ যে কাঁচা সোনা, সে উপলব্ধি আসে মেয়েদের একমাত্র বিরহে। বিরহেই মেয়েরা তা বোঝার সুযোগ পায়। আগে ডাল-ভাত। পুরুষ বিদেশে, তখন সে দুর্লভ, সোনার চেয়েও মূল্যবান। বিরহী নারীদের এর চেয়ে সুন্দর উপলব্ধি একমাত্র মৈমনসিংহ গীতিকা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই পুরুষ চিনতে হলে যেতে হবে নারীর কাছে। পুরুষ ছাড়া নারীর রূপ-যৌবন অর্থহীন। অনেক গানে এ কথা পেয়েছি। সঞ্চারিতে গানটি কথা বলে ওঠে :

নদীর বসন্তের কালে রে
উজান আর ঐ ভাটি
নারীর বসন্তের কালে
পুরুষ গলার কাঠিরে॥ আমার ধোলাইরে...

গাইতে গাইতে উপলব্ধি করি, নারীর জীবনে উজান আর ভাটি। সেই সঙ্গে নারীর জীবনে পুরুষের অচ্ছেদ্য অংশ। পুরুষ গলার কাঠিরে– এই কথাটি মেয়েদের জীবনে পরম সত্য।

ধোলাই যখন কাঁদে, তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ে। দরিয়ার পানি তখন উজানের দিকে যেতে চায়, যা লেখা এই গানে :

ধোলাইর কান্দনেরে
গাছের পাতা ঝরে
ভাটিয়া দরিয়ার পানি
সেও তো উজান ধরেরে॥ আমার ধোলাইরে...

এমনি নিজের গাওয়া গানের সংখ্যা শত। সঙ্গীতের কুমার বেছে নিয়েছিলেন মাত্র ১৮টি গান, যা প্রতিনিধিত্ব করে শ্রেষ্ঠ বাঁশির গানগুলোর, যা বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রাণ। কুমিল্লার প্রতিটি গ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ, তিতাস, পদ্মা, মেঘনা, গোমতীর ডাঙ্গায় প্রাণসঞ্চার করে এই বাঁশি, যেন সঙ্গীতের রাজকুমারের মতো গেয়ে ওঠে :

১. 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি'।

২. 'ও-ও বাঁশি! আল্লাহ্‌র দোহাই ঘাটে লাগাইয়া ডিঙা পান খাইয়া যাও, বাঁশি আল্লাহ্‌র দোহাই'।

৩. 'সেই যে দিনগুলি বাঁশি বাজানোর দিনগুলি'।

৪. 'তুই কি শ্যামের বাঁশিরে ঘরের বার করলি বাঁশি আমারে'।

৫. 'অসময়ে বাজাও বাঁশি প্রাণ তো মানে না রে কালা, সময় বোঝ না'।

৬. 'কোন সুদূরের বাঁশির টানে কোথায় যাবে কে বা জানে'।

কোনো গান নেই, যেখানে বাঁশিওয়ালা অনুপস্থিত। যেখানেই গেছি ওদের খুঁজে পেয়েছি। এরা গ্রামের সাধারণ মানুষ, ফকির, কখনও মুর্শিদ, কখনও বাউল, কখনও বৈষ্ণব। ওরাই মাঝিমাল্লা, ওরাই কাজের মানুষ, ওরা বাঁশি শেখেনি অথচ ফুঁ দিলেই ফুটে ওঠে ভোর-কীর্তনের সুর। সকালে যারা ঘুম থেকে ওঠেনি, তারা শোনেনি এই কীর্তন। 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ', সঙ্গে নগর কীর্তন, কবিগান, ঢপযাত্রা। পূর্ব বাংলা মানেই শচীনের গান। যারা এই গান শোনেনি, বাংলাদেশ চেনে না তারা, এ দেশের নারীর সঙ্গে তাদের পরিচয় নিবিড় হয়নি। এই গানগুলো সারাজীবন খুঁজে ফিরেছি :

৭. 'বাঁশি আজ কেঁদে কয় কভু সে তো দূরে নয়, বালুচরে মোর'।

৮. 'বন্ধু বাঁশি দাও মোর হাতে তে'।

৯. 'বাঁশরিয়া রে কোথায় শিখেছ বাঁশি বাজান'।

১০. 'না না না ফুটনারে ফুল, না না না উঠনারে চাঁদ, এখনও বাঁশিতে ইশারা শুনিনি'।

১১. 'একমনে শোন মরমে তার মুরলি বাজে'।

১২. 'মায়াবী কানুর বাজে বাঁশি'।

কানাইলাল শীল যখন গান শেখাতে আসতেন, লক্ষ্য করতাম বাঁশির সুর তাকেও পাগল করত। দোতরার আগে তিনি বাঁশি শিখেছিলেন। তাই প্রথম দিকে যত গান রেকর্ড করেছেন, তার সবই বাঁশি-সংশ্লিষ্ট। নজরুলের জীবন যারা তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন, তারা জানেন তিনি ছিলেন বাঁশিয়াল। 'লেটোর' দলে যেমন গান নেচেছেন, অভিনয় করেছেন, তেমনি বাঁশিও বাজিয়েছেন। জুয়েল আইচ, ফকির আলমগীর, এরাও স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নাম করেছেন। ওদের সঙ্গেও খেলা করেছে বাঁশি।

একদিন বিশিষ্ট বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিমকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি বাঁশি বাজাতে পারব? সে বলল, খুবই সহজ। বাঁশির চেয়ে সহজ আর কিছু হয় না, কিন্তু ভাব প্রকাশের জন্য সবচেয়ে কঠিন। জাপানে যখন তাকে নিয়ে যাই আটটি শহরে, গাজী তার বাঁশি দিয়ে সবাইকে পাগল করে তুলেছিল। তার মধ্যে বাংলার সত্যিকার ভালোবাসার রূপটি। বাদ্যযন্ত্রের দোকানে গিয়ে সে অনেক বাঁশি তুলে বাজাতে থাকে। এর মধ্যে একটি স্টেইনলেস স্টিলের বাঁশিও ছিল। ফুঁ দিতেই তা বেজে উঠল। আমি অবাক হয়ে হাকিমের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হাকিম বলল, কেমন লাগছে আব্বাসী ভাই? বললাম, এটি হলো জাপানি আবদুল হাকিমের সুর, তোমার হাতে পড়ে

যন্ত্রটি বাঙালি হলো। ইউরোপে বিভিন্ন দেশে গিয়ে নানা বাঁশির দেখা পেলাম, কিন্তু হায় রে! মন কেন ফিরে আসে শচীনের কাছে।

১৩. 'বাজে না বাঁশি গো, ফুলের বাসরে জাগে না হাসি গো'।
১৪. 'আমারি জীবনে শুনি যে বাঁশি তব, মরমে এলে কি প্রভু'?
১৫. 'তুমি শ্যামের বাঁশি'।
১৬. 'বাঁশি তোমার হাতে দিলাম'।
১৭. 'ফুলের বনে থাক ভ্রমর ... শুনবে যেথায় বেভুল বাঁশি'।
১৮. 'বাঁশরি বাজালে কুসুম জাগালে'।

পৃথিবী ঘুরে জেনেছি শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীত তাই, যা মিলিয়ে দেয় স্রষ্টার সঙ্গে। তিনি ও আমি একাকার। দু'জনে আলাদা হতে পারি না। যখন শচীনের উদাসী সুর আমার সামনে গীত হয়, তখন মনে হয় তার সঙ্গে আর যারা সুর দিয়েছিলেন, যেমন– নজরুল ইসলাম, হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, অজয় ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরী, সমেন্দ্র পাল। এরা শচীনকর্তাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। উনি ছিলেন সুরের বরপুত্র। সুর সব সময় তার কাছে এসে খেলা করত। রাজসিংহাসন তিনি হেলায় দূরে ফেলে দিয়েছিলেন। অথচ নজরুল যখন এলেন তার জীবনে, তখন মাত্র চারটি গান তিনি রেকর্ডে গাইতে পেরেছিলেন। তা হলো :

১. 'কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া'।
২. 'মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে'।
৩. 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে'।
৪. 'পদ্মার ঢেউরে মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যা রে'।

এই চারটি গান গবেষণা করলেই বোঝা যাবে ঠুমরি ও খেয়ালের অববাহিকায় মেদুরতা কীভাবে একসঙ্গে খেললে ওই চারটি গান সৃষ্টি হয়? এতে যেমন ছিল নজরুলের ঢঙ, তেমনি শচীনকর্তার আজীবনের অনুশীলিত পরিণত গায়নশৈলী, যা আনুনাসিক কণ্ঠের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। কুমিল্লার লোকজীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান কুমার শচীন দেববর্মন। এখানকার সাংস্কৃতিক জীবন, নাট্যচর্চা, বিশেষ করে ঠাকুরপাড়ার সুরলোক, কান্দির পাড়ের সবুজ সংঘ নাট্যদল, দি গ্রেট ভার্নল থিয়েটার পার্টি, ইয়ংমেন্স ক্লাব, তার প্রতিভাকে করেছিল সত্যিকার অর্থে জীবননির্ভর। মহারাজা বীরবিক্রম কুমিল্লায় টাউন হল, বীরেন্দ্র মিলনায়তন কেন্দ্রের নাট্যশালা এগুলো কুমিল্লাতেই ছিল। আর কোনো জেলা শহরে ছিল বলে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার বড় অবদান একটিই– 'লোকসঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীতের মেলবন্ধন'। এখনও শচীনকর্তার গান গাইতে চাইবেন যারা, তাদের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের পাঠ হতেই হবে পরিপূর্ণ। সেই সঙ্গে ভাটিয়ালি, রাখালি, বিচ্ছেদি, মুর্শিদি ও ফকিরি গানের মূল বিন্দুর সঙ্গে থাকতে হবে পরিচয়।

শচীন দেববর্মনের সঙ্গে দেখা ছোটবেলা থেকেই। সেই গানগুলো আমার আব্বা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বাসায় নিয়ে আসতেন কুচবিহারে। আমাদের গ্রামোফোনে বেজে উঠত তার একেকটি গান। আজ এত দিন পর সেই গানগুলো বারবার ফিরে আসছে আমার কাছে, যেমন ফিরে আসছে প্রতিটি বাঙালির গৃহে। টিভিতে সেই গানগুলো যখন আবার নতুন করে শুনি, তখন বুঝতে পারি নতুন বাঙালি প্রজন্মকে কিছুতেই ভুলতে পারেনি; বরং আরও নতুন আবেগ নিয়ে সেই গানগুলোর দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। একেকটি গান নিয়ে আসছে নতুন দ্যোতনা, নতুন পরিবেশ, নতুনভাবে গাওয়ার সম্ভাবনা। একজন শিল্পীকে যেন নতুন করে পাওয়া। যখনই শচীন দেববর্মনের গান হয়, আমি সব ফেলে দিয়ে সেই গান শুনতে বসি।

ত্রিপুরা ও কুমিল্লার মাটির মানুষ

খগেশ দেববর্মনের গ্রন্থখানি প্রকাশের পর তিনি অনেকখানিই উদ্ভাসিত। এই বইখানিতে পাওয়া যেতে পারে সোঁদা মাটির সঙ্গে সঙ্গীতের কুমারের সম্পৃক্ততার কথা, যা তার প্রতিটি গানের মেলবন্ধনে বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত এটুকু জানাতে যে বাংলার মানুষ কোনোদিন তাকে ভুলবে না। তার গান কোনোদিন মরে যাবে না। আমাদের তনু-মন সেই গানের পুলকে চিরদিন সঞ্জীবিত হবে। খগেশ দেববর্মনের বই সংযোজিত করেছে এক নতুন মাত্রা। সে মাত্রায় আমি দুর্বাদলসম। কিছু নেই অশ্রুজল ছাড়া। ১৯৭০-এ 'দেশ' পত্রিকায় শচীন দেববর্মনের লেখা 'সরগামে নিখাদ' অনেকের পড়া হয়নি। এত সুন্দর একটি লেখা সচরাচর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেখানে আছে তার জীবনের অনেক অকথিত কথা, যা তা নিজের লেখা। লেখাটি এখানে সংযোজিত না হলে অনেক কথাই রয়ে যাবে অজানা। সেই কথাগুলো অন্য লেখক ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখতে পারবেন, তবুও তা কখনও তার মতো হবে না। আমার লেখা 'আব্বাসউদ্দীন মানুষ ও শিল্পী' গ্রন্থেও আমি এর ব্যত্যয় ঘটতে দিইনি। যখনই সুযোগ পেয়েছি, পিতার গ্রন্থ থেকে তুলে দিয়েছি, যাতে আগামী প্রজন্মের মানুষ তার কণ্ঠেই শুনতে পারে তার কথা। শচীন দেববর্মনের নিখাদের প্রথম কথাটি বড়ই মজার।

তিনি লিখছেন : 'প্রবাদ আছে ত্রিপুরার রাজবাড়িতে রাজারানী কুমারকুমারী থেকে দাসদাসী পর্যন্ত গান গায়।' তিনি লোকসঙ্গীতের পাঠ নিয়েছিলেন তাদের গৃহভৃত্য একজন মুসলমান ছেলের কাছ থেকে, তা-ও অকপটে লেখা আছে। ওখানকার মানুষ গানের রাজ্যের মালাকার। সবার গলায় সুর আছে। একজন গাইছে, আরেকজন অবাক হয়ে তার গান শুনছে। প্রথম যেবার আগরতলায় যাই, আমন্ত্রক বললেন, একা কোথাও যাবেন না, বিশেষ করে রাতে। এখানে রাতের বেলা সব ম্যাওপন্থি। সেন্ট্রিদের সঙ্গে ভাব জমালাম। বললাম, আমি গায়ক। গান গাই। আমাকে কেউ মারবে না। সেন্ট্রি নিজেই গান করে। সে আব্বাসউদ্দীন ও শচীন দেবের ভক্ত। বলল, আপনি যেখানেই যাবেন, আপনার পেছনে পেছনে আমি যাব। সে বলল, আমি এখানকার মানুষ নই। তবু অবাক হই যে এখানকার চাষিরা চাষ করতে করতে গান গায়। মাঝিরা নৌকা চালাতে পারে না গান বিহনে। জেলেরা মাছ মারে গানের সুরে সুরে। আর মেয়েরা রান্না করে সেই সুরের রেশে।

অবাক হয়ে অনেকটা পথ ঘুরে এলাম। রাতের অন্ধকারে দেখলাম সেই রাজবাড়ি আধিভৌতিক পরিবেশে, যেন মনে হলো স্বপ্ন থেকে ভেসে এসেছে সেই রাজবাড়ি। মেলাতে চেষ্টা করলাম কুচবিহারের রাজবাড়ির সঙ্গে। একই সূত্রে গাঁথা। তোরষা নদী ঘুরে গেছে সেই রাজবাড়ির পাড় দিয়ে, যেখানে দিনের বেলাতেও বাঘ 'হালুম' করে ওঠে। আর আমি যেন শুনলাম ভাওয়াইয়ার কলিগুলো 'ক' বধূ মোর বধূয়া কেমন আছে রে। সেখান থেকে আবির্ভূত হলো ত্রিপুরা রাজবাড়ি, যেখান থেকে শুনতে পেলাম শচীন দেবের কণ্ঠস্বর। 'সাঁইয়া দিল মে আনারে, আকে ফির না জানারে', লতার গাওয়া 'ঠাণ্ডি হাওয়ায়েঁ লেহরাকে আয়ে'।

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা

পিতা আব্বাসউদ্দীন ও শচীন দেবের মধ্যে ছিল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক। এক অনুষ্ঠানের শেষে শচীন দেব বললেন আব্বাকে, বড় আশা ছিল ভাওয়াইয়া ভালো করে রপ্ত করব। তা আর হলো না। আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন? আব্বা বললেন, সেটা খুবই সম্ভব, তবে সেটা হবে শচীন দেববর্মনের মতন, অর্থাৎ আব্বাসউদ্দীনের চেয়েও ভালো। এই বলে রিহার্সেল রুমেই তিনি একটি ভাঙার কাজ দেখিয়ে দিলেন। শচীনবাবু বার কয়েক চেষ্টা করলেন। বললেন, নাহ! হবে না।

আরেকদিন আব্বাসউদ্দীন মনমরা হয়ে বসে আছেন। শচীনকর্তা বললেন, সব সময়ই আপনার পরে আমার গান থাকে। তাই আমার গানগুলো তেমন জমে না, আপনার ভাটিয়ালি জসীমউদ্দীনের, আর আমার ত্রিপুরার। ত্রিপুরার অডিয়েন্স আমারটা যেমন করে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে,

এখানকার অডিয়েন্স তা পারে না। তাই মার খাই। আব্বা বললেন, সেটি আংশিক সত্য। আসল সত্য হলো, আপনার গানে আছে ক্লাসিক্যালের ঢঙ, লোকগীতির সঙ্গে ক্লাসিক্যালের বিবাহ। অসবর্ণ বিবাহের স্বীকৃতি দেয় না যারা, তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য। আবার অনেকে জলসার রসে মশগুল হয়ে সেই পানদোক্তার মসলার গন্ধ খুঁজে পান আপনার বিরহী কণ্ঠে। লোকগীতির মধ্যেও তারা পান আদি সঙ্গীত রসের উপাদান। এর পরেই আব্বাসউদ্দীনের গান। তিনি গাইলেন : 'রঙিলা রঙিলা রঙিলা রে' গানটির লোকসঙ্গীতের অপর পিঠ। নাম হল : 'রঙিলা নায়ের মাঝি'। আমার নানা অনুষ্ঠানে সেটা লন্ডনেই হোক, মস্কোতেই হোক বা টোকিওতে। আমি দুটি খুব মজা করে পরিবেশন করি এবং দু'জনকেই যথোচিত সম্মান জানিয়ে বলি। একটি আব্বাসউদ্দীনের 'রঙিলা', আরেকটি শচীন দেবের 'রঙিলা'। দু'জনেরই যোগসূত্র আব্বাসউদ্দীন।

একদিন কানাইলাল শীল শচীনকর্তার কাছে গিয়ে উপস্থিত। বললেন, কর্তা আপনি তো ত্রিপুরার গান গাইলেন, ফরিদপুরের কয়েকটা গাইয়া দেখুন। ভালো লাগবে। কয়েকটি গান তুলে দিলেন, কিন্তু সেগুলোর সুর চলে গেল ক্লাসিক্যালের ঢঙে। ফরিদপুর অনুপস্থিত। শচীনকর্তা বহুদিন বম্বে থাকায় তার মন থাকত তৃষিত। তার মন পড়ে থাকত কুমিল্লা রানীর দীঘির পাড়ে, যেখানে তিনি বাঁশি বাজাতেন। গেয়েছেন তার সেই বিখ্যাত গানটি : 'মনে পড়ে সেই বাঁশি বাজানোর দিনগুলি'।

আমাকে বললেন, তোমার গলাটি খাসা। যদি বম্বে থাকতে চাও, নাম করতে পারবে সর্বভারতীয়। তোমার গানগুলো হিন্দিতে পরিবেশন করব এমন করে, যাতে ঘরে ঘরে সবাই তোমাকে চিনে নেবে। যেমনটি আমি করেছি। আমার সব গানেই কুমিল্লা। যারা জানে তারাই শুধু জানে। মাঝখানে যে ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক তাতে আছে কীর্তনের খোল, মন্দিরা আর বাঁশি। এ কাজ করেছিলেন সলিল চৌধুরীও নিজে। মাঝখানের বাদ্য ছিল অরিজিনাল বাংলার সুর। তাই তার প্রতিটি গান নতুন মাত্রা পেয়েছিল। 'মধুমতী' ছবিতে বৈজয়ন্তীমালার নৃত্যের সঙ্গে গীত তার গানটি ছিল লতা মঙ্গেশকরের গলায়, মনে করুন। কেউ জানতেও পারেনি গানটি মাদলের ছন্দে 'হলুদ গাঁদার ফুল এনে দে এনে দে, নইলে বাঁধব না বাঁধব না চুল'।

শচীন দেব আমাকে বললেন, তোমার পিতার মৃত্যু আমাকে নাড়া দিয়ে গেছে। আমারও মৃত্যু হলে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কেউ আমাকে দেখতে আসবে না। যদিও আমার স্মরণ হবে, কিন্তু যারা আমার স্মরণে এলে আমার মন পরিতৃপ্ত হবে তাদের কাউকে আমি দেখব না। আমি মনেপ্রাণে ত্রিপুরার, মনেপ্রাণে কুমিল্লার। মা-পুতের এই বন্ধন কেউ ছিন্ন করতে পারবে না। আমার গানে তা লেখা আছে। আমি জানি আমার মৃত্যুর পর পশ্চিম বাংলায় ও বাংলাদেশে আমার মূর্তি বানিয়ে সেখানে পূজা হবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'রথযাত্রা' কবিতা যারা পড়েছেন তারা জানবেন, আমি সেখানে নেই। আমি আছি আমার বিরহী গানে। যে গান আমি গেয়েছি চোখের পানিতে। আমার স্ত্রী আমাকে যা দিয়েছে, তা আমার সম্পদ। মীরাই আমার জীবন, আমার জীবনই মীরা। আমি সারাজীবন ছবির সঙ্গে ছিলাম। আমি জানি আমার মৃত্যুর পর আমাকে নিয়ে ছবি হবে। সে ছবিতে আমার গান থাকবে। কিন্তু আমি আমার জীবন কল্পনা থেকে অনেক দূরে, সেখানে আমি একাকী। ত্রিপুরা ও কুমিল্লা আমার প্রাণ। তিতাস আমার জীবন বাহিকা।

শচীন দেবের ছেলে আর ডি বর্মন, অর্থাৎ রাহুল আমাকে একই অফার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমি বাংলার ছেলে, চিরদিনই বাংলার থাকব। আমার গানে খেলা করেছে সর্বত্রই বাংলা। বাংলাকে আমি ছড়িয়ে দিয়েছি পুরো ভারতে।

আর ডি বললেন, আমাকে কি বাংলাদেশের লোক চেনে?

বললাম, গানে চেনে।

বললেন, আমার ভালো লাগে চিন্তা করতে যদি কখনও কুমিল্লায় গিয়ে ক'দিন থাকতে পারতাম।

বললাম, ঢাকায় আমার বাড়িতে ক'দিন থাকবেন। দেখবেন ঢাকার লোক কেমন পাগল হয়ে যায়।

বললেন, তা মনে হয় এ জীবনে হবে না।

বললাম, কেন?

বললেন, জীবন বড় ছোট। আর ব্যস্ততা আমাকে ছাড়ে না। আমি মানেই নতুন গান। আমি মানেই হিন্দি ছবির ব্যস্ততা।

শুভময় ছিলেন মস্কোতে। তিনি পরিচয় করিয়ে দেন শচীনের সঙ্গে ১৯৬১ সালে। স্ত্রী মীরাসহ গেছেন সেখানে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিরূপে। সেখানে শুভময় ও তার স্ত্রী সুপ্রিয়ার সঙ্গে তাদের হয় পরিচয় এবং হৃদ্যতায় তা পরিণত হয়। শুভময়ের ব্যবহার দু'জনকেই মুগ্ধ করে। শুভময় তখন 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন 'মস্কোর চিঠি'। শচীনবাবু শুভময়ের সব লেখা নিয়মিত পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই হলো সূত্রপাত।

১৯৬৫ সালে বম্বেতে বাংলাদেশের বাউলসঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান, তাতে যোগ দেন বাউল বৃন্দাবন দাস ও সনাতন দাসসহ অনেকে। শচীন দেবের শরীর ভালো নয়। চোখ, হার্ট ইত্যাদির নানা গণ্ডগোলে ভুগছেন। ঘোরাফেরা, রাতে দেরি করা, সহ্য হয় না। ঠিক সময়মতো শচীনদা ও মীরা বৌদি হাজির। বৃন্দাবন দাসের পায়ের তালে তালে রসঘন সেই গান, শচীনদাকে শেষ পর্যন্ত ঠায় বসিয়ে রাখল। পরে আমাকে বলেছিলেন, 'কান পালটাইয়া গেল-কান পালটাইয়া গেল'। শচীনদার সেই অপূর্ব বলার ধরন, প্রকাশ করার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা। বম্বের চলচ্চিত্র জগতের এক ধরনের গান শুনে শুনে কান যখন পচে গিয়েছিল, তখন বাংলাদেশের মাটির আস্বাদ আনা এসব লোকসঙ্গীত শচীনদার 'কান পালটে দিয়ে' তাকে বিহ্বল করেছিল। অভিভূত হয়ে সেদিন আরও বলেছিলেন আমাকে ছলছল চোখে, "গান শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, পূর্ব বাংলায় আমার প্রথম জীবনের নানান দৃশ্য ও স্মৃতি। কী আনন্দই না পেলাম এই গান শুনে।" আজ চলচ্চিত্র জগতে খ্যাতির শীর্ষে উঠে ১০০ শিল্পীসংবলিত বৃহৎ অর্কেস্ট্রার সঙ্গীত-পরিচালনা করেও বাংলাদেশের সহজ সরল লোকসঙ্গীতের আকর্ষণ তার কাছে এতটুকুও কমেনি। আরেকবার ভারতীয় বিদ্যাভবনে একইভাবে তাকে অভিভূত হতে দেখেছিলাম, শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী ও বাউল শ্রীপূর্ণ দাসের গান শুনে।

শচীন দেব অনেক গানের গল্প নিজে নিজে বানাতেন এবং লিখে রাখতেন। ভালো প্রযোজক পেলে তাদের দিতেন। এমন একটি গল্পের নাম 'বিরাগী ভ্রমরা'।

তার প্রথম গান 'ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে' শুনে মুগ্ধ হয়েছিল হাজার শ্রোতা। তিনি বাংলাতেই সমর্পিত ছিলেন। বম্বেতে তিরিশ বছরের বেশি, কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি। এমনটি আর কেউ ছিলেন না।

শচীন দেবের বক্তব্য রবীন্দ্রসরোবরে :

'আপনাদের সম্মুখে গান করার এই আমন্ত্রণ আমার কাছে মনে হলো বাংলা মাটির আমন্ত্রণ, আমার বাংলা মায়ের আমন্ত্রণ।' রবীন্দ্রসরোবরের অনুষ্ঠানে শচীন দেব দু-এক মিনিট তার বক্তব্য বলে শ্রোতাদের গানে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

বললেন : 'শীতকালে কলকাতায় গিয়ে মাছ তরিতরকারি খেয়ে আসি। সকালবেলা লেকের ধারে খানিকক্ষণ বেড়ানো পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা। বম্বের চিত্রজগতের ব্যস্ততার বাইরে একটু নিরিবিলি দিন কাটাব। এটাই আমার আনন্দ।' ❖



ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ





ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর রেকর্ড



সঙ্গীত

সুস্মিতা ইসলাম

গানের সম্রাট : ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের জগতে ওস্তাদ ফৈয়াজ খা একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। খেয়াল গানের তিনি সম্রাট। তার সঙ্গীত জগৎ থেকে অন্তর্ধানের পর একষট্টি বছর (ফৈয়াজ খাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৫০ সালের ৫ নভেম্বর) গত হয়েছে তবুও আজ অবধি তার মতো বলিষ্ঠ জলদগম্ভীর সুরেলা ভরাট দরাজ গলা নিয়ে অন্য কোনো শিল্পীর আবির্ভাব হয়নি তার গান একবার শোনার সৌভাগ্য যার হয়েছে তার পক্ষে তাকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। রাগসঙ্গীতের বিশেষ সমঝদার না হয়েও আমার জীবনে সেই সৌভাগ্য হয়েছিল, শুধু তার গানই নয়; সেই সঙ্গে তার চরণধূলিতে একদা আমার গৃহ ধন্য হয়েছিল

সে এক দুর্লভ আনন্দের ঘটনা। তার আগে আজকের প্রজন্মের কাছে, যাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সেই মহান শিল্পীর নামের সঙ্গেও পরিচিত নন, তাদের সঙ্গে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কিছুটা পরিচয় করিয়ে দিই।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে (১৮৮৬ সালে) রঙ্গিলা ঘরানার এক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পরিবারে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর জন্ম হয়। তার পিতার নাম সাফদার হোসেন এবং ফৈয়াজ খার জন্মের তিন মাস পূর্বেই তিনি মারা যান। তখন ফৈয়াজ খাঁকে তার নানা নিজের কাছে আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানেই সঙ্গীতের তালিম দেন। এইভাবে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গীত সাধনার প্রারম্ভিক কাল থেকে রঙ্গিলা ও আগ্রা উভয় ঘরানাই বিশেষ প্রাধান্য পায়। এই উভয় ঘরানাতেই তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন মাত্র পনেরো বছর বয়স থেকেই তিনি আসরে গাইতে শুরু করেন এবং প্রথম থেকেই উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের একজন বিশিষ্ট গায়ক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। আগ্রা ঘরানা গায়কদের মধ্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে খেয়াল গায়ক হিসেবে সঙ্গীত জগতে তার পরিচিতি থাকলেও, ধ্রুপদ, ধামার, ঠুমরী– এমন কি দাদরা গানেও তার সমান অধিকার ছিল। ফৈয়াজ খাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে ১৯১৫ সালে বরোদার সরাজীরাও গায়কোয়াড় তাকে তার দরবারের অন্যতম সঙ্গীত গুরু হিসেবে নিযুক্ত করেন ফৈয়াজ খাঁ তার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত (নভেম্বর, ১৯৫০) বরোদার রাজদরবারের ওই পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন মহীশূরের মহারাজাও তার সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে 'আফতাব-এ-মৌসিকী' উপাধিতে ভূষিত করেন। আমার স্বামী পাইলট ক্যাপ্টেন মুস্তাফা আনোয়ারের গানের প্রতি খুবই অনুরাগ ছিল। তাই কলকাতায় স্থিরভাবে বসবাস করতে শুরু করার পর থেকেই তিনি একজন গানের ওস্তাদের খোঁজ করছিলেন তখন সৈয়দ মুজতবা আলী একদিন সন্তোষ কুমার রায় নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আনোয়ার নিয়মিতভাবে তার কাছে গানের তালিম নিতে শুরু করলেন সন্তোষ কুমার রায় ওরফে 'সন্তোষ বাবু' দীর্ঘদিন বরোদায় থেকে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে

নাড়া বেঁধে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তার বাড়িতেই থেকে তার কাছ থেকে খেয়াল শেখেন। ওই একই সময় সৈয়দ মুজতবা আলীও বরোদায় শিক্ষকতা করতেন বলে সন্তোষ বাবুর সঙ্গে তার ভালো পরিচয় ছিল। সন্তোষ বাবুর মতন জাত শিল্পী আজও আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু আজ তার কথা নয়, আমি ফিরে যাই আবার ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের প্রসঙ্গে।

সন্তোষ বাবু এসেছিলেন আমার স্বামীর সঙ্গীতগুরু হিসেবে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আমাদের পারিবারিক গুরু হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। ননদ হাস্না, আমি ও দেবর মুস্তাফা মনোয়ার (তখন সে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র), আমরা সবাই তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। সেই সুবাদেই একদিন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর পদধূলি পড়েছিল আমাদের বাড়িতে।

সময়টা ছিল ১৯৪৯ সালের জুন-জুলাই মাস। সন্তোষ বাবু একদিন সকালে এসে বললেন, কী কারণে যেন ওস্তাদজী কলকাতায় আসছেন। শুনেই আমি আর আনোয়ার ওকে ধরে বললাম যে, যে করেই হোক, ওস্তাদজীকে একবার আমাদের বাড়িতে আনতেই হবে। সে এক ভীষণ উত্তেজনা। তখন তার কী নামডাক। মুজতবা আলীতো বরোদায় থাকতে তার সঙ্গে পরিচিতই ছিলেন। তবুও তিনি, আবু সইদ আইয়ুব, তার বড় ভাই ডা. এ এম গনি (পরে এমপি হয়েছিলেন), তার স্ত্রী আমাদের শ্রদ্ধেয় খালা ও তার ছোট ভাই মাহমুদুর রহমান (কচি), সকলেই খুবই উত্তেজিত এতবড় একজন গুণী ব্যক্তির সমাগমের জন্য। কথা হলো, ওনারা যেদিন বরোদা থেকে এসে পৌঁছবেন, সেইদিনই আমাদের বাড়িতে তাকে আনা হবে। বরোদার ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে সকালে। স্থির হলো আনোয়ার ও সন্তোষ বাবু সোজা স্টেশন থেকেই তাকে নিয়ে আসবেন আমাদের বাড়িতে।

এইরকম একজন ব্যক্তির গৃহে আগমন উপলক্ষে আমি তার যথাযথ অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সমস্তই শাহী আয়োজন। আস্ত মুরগির রোস্ট, খাসির চাপের কাবাব, শামী কাবাব, শিক কাবাব, খামতা পরোটা, সালাদ, ছোলার হালুয়া, আর জলযোগের (মিষ্টির দোকান) নানান রকমের মিষ্টি, আমসহ অন্যান্য সব রকমের ফল আর শেষে কাশ্মীরী চা। আগের দিন থেকেই সব আয়োজন, তবুও শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ার শেষ নেই। আনোয়ারের আবার মিলিটারি তাজেম। সব কিছুই তার সময়ের আগে প্রস্তুত থাকা চাই– না হলে তার মনের ব্যারোমিটার একেবারে নেমে যাবে। সুতরাং উৎসাহ, উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে খাটাখাটুনী করে সব আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ, তখনই আনোয়ারের গাড়ি গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মুজতবা সাহেব, আবু সইদ আইয়ুব ও আমার মেজ দেবর মুস্তাফা আজিজ এগিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে আনলেন। আমরা সবাই পেছনে, সঙ্গীত সম্রাটের মতনই চেহারা তার, মাঝারি দোহারা গড়ন, উন্নত ললাট তার ... মুখমণ্ডল ছড়িয়ে বিরাট এক জোড়া গোঁফ। সবাই মিলে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে এলে আনোয়ার ও সন্তোষ বাবু আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমি তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম। এরপর যথারীতি মুজতবা আলীই আলাপ শুরু করলেন ওস্তাদজীর সঙ্গে। আমি সন্তোষ বাবুর জন্য ইশারার জন্য অপেক্ষমাণ, তার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেলেই দস্তরখানার ওপরে খাদ্যসামগ্রী সাজাবার জন্য কাজের লোকদের ইঙ্গিত করব। সন্তোষ বাবু আগে থেকেই দস্তরখানা বিছিয়ে রাখার জন্য বলে রেখেছিলেন। যথাসময়ে তার নির্দেশ পেয়ে প্রাতরাশ পরিবেশন করা হলো, ওস্তাদজীর সঙ্গে আসা সকল অভ্যাগতই সেই খাবারে শরিক হলেন। ওস্তাদজী পছন্দ করবেন কি-না জানা না থাকায় কেউই ছবি তুলল না কিন্তু মেজো দেবর আজিজ যার চারকোলে Portrait আঁকা একটা Passion ছিল, সে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ওস্তাদজীর সুন্দর একটি Portrait এঁকে ফেলল। খাবার সময় ওস্তাদজী মুখে কিছুই বললেন না, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল যে আয়োজনে তিনি তৃপ্ত হয়েছেন, তার সঙ্গে যে দু'জন সঙ্গী বরোদা থেকে এসেছিলেন তারা বেশ তারিফ করেই আহার্য গ্রহণ করলেন। এরপরে সন্তোষ বাবু আনোয়ারকে গাইতে বললে তানপুরা নিয়ে ফৈয়াজ খাঁর বিখ্যাত গান ললিত রাগে '... হু য্যায়সে, জল বীণা মিনা...' গানটি গাইতে শুরু করল। আনোয়ার গানটি শুরু করলে ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে যে দু'জন ব্যক্তি এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজন নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে সন্তোষ বাবুর কাছ থেকে তবলা নিয়ে বাজাতে শুরু করে দিলেন। গান শেষ হলে ফৈয়াজ খাঁ আনোয়ারের দিকে চেয়ে বললেন, 'সাবাস'– আর বললেন, 'আচ্ছা চলগা হ্যায়'। ট্রেন থেকে নেমেই সোজা এসেছিলেন তাই আর বসার জন্য অনুরোধ না করে আনোয়ার ও সন্তোষ বাবু গেলেন ওনাদের পৌঁছাতে। তারপরই আসর জমিয়ে বসলেন মুজতবা আলী বরোদায় থাকতে তিনি ফৈয়াজ খাঁর বাড়িতে ও অন্যান্য মজলিশে ফৈয়াজ খাঁর কোন্ কোন্ গান শুনেছেন এবং তার আনুষঙ্গিক সব গল্প বলতে লাগলেন। তার মধ্যে একটি গল্প ছিল সন্তোষ বাবুর সম্বন্ধে। সন্তোষ বাবু একদিন দরবারি রাগের ওপর গান ধরেছেন তখন বাবুর্চিখানা থেকে খুন্তি হাতেই ফৈয়াজ খাঁর বাবুর্চি এসে সন্তোষ বাবুকে বলেছিল, 'ঐ সা নেই, ফিরমে গাহ' এমনই সুরজ্ঞান ছিল তার। সেই গোলাপ গাছের তলার মাটিটাকে গোলাপের গন্ধের মতোই ব্যাপার আর কী। দীর্ঘদিন ধরে সুরের সাধনা শুনতে শুনতে খাঁ সাহেবের বাবুর্চির রাগরাগিনী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান কার্যত তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

আমার মনটা কিন্তু তখন একেবারে বাতাস বের হয়ে যাওয়া চুপসানো বেলুনের মতন। এতো কল্পনা-জল্পনা, এতো আয়োজন, শুধুই এক-দেড় ঘণ্টা খাওয়া, আর .... কথাবার্তার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। এত বড় একজন গুণী শিল্পী এলেন, সামান্য দুই-চারটি কথা ছাড়া তার গলার সুরের আওয়াজটুকু পর্যন্ত পেলাম না। আমার যতই ঐসব ভেবে মন খারাপ হতে লাগল, মুজতবা সাহেব ততই তার গানের সম্বন্ধে নানা রকম গল্প বলতে লাগলেন। সন্তোষ বাবু আমার মনোভাব টের পেয়েছিলেন। তাই পরের দিন সকাল এসেই বললেন যে, সেই দিন বিকেলেই ভবানীপুরের কোনো একটি হলে ওস্তাদজীর গান হবে। যথাসময়ে আমরা গেলাম। অল্প সময়ের মধ্যে হল নির্বাচন করা হয়েছিল বলে তখন ভালো হল পাওয়া যায়নি; কিন্তু আগ্রহী শ্রোতার ভিড়ে হল একেবারে উপচিয়ে পড়েছে। সেই সন্ধ্যায় তার শ্যালক-পুত্র মুনাওয়ার হোসেন খান গান গেয়েছিলেন; খুব সম্ভব কলকাতা শহরে সেই ছিল তাঁর প্রথম গান।

সেই সন্ধ্যার আসরেও তিনিই ছিলেন একক গায়ক। তিনি গেয়েছিলেন সেই বিখ্যাত খাম্বাজ গানটি- ম্যায় না মানুষ, না মানুষি, উনকে মানায়ে বিনা, না মানুষী – তখন তার বয়স ছিল খুব সম্ভব বিশ কি একুশ, এতো সুন্দর গলা আর এতো সুন্দর মিষ্টি করে গেয়েছিলেন যে ওই গান তারপরে বহুবার বহুজনের কণ্ঠে শুনেও তাঁর গাওয়ার সুর আজও ভুলিনি। তারপরে শুরু করলেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, খুব সম্ভব সেটি ছিল একটি ধ্রুপদ আঙ্গিক খেয়াল- কী অদ্ভুত উদাত্ত কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছিল হাজার হাজার মেঘের গুরু গর্জনে সমস্ত হল যেন ভরে গেছে। তারপর দ্বিতীয় গানটি তিনি গেয়েছিলেন- বনাও বঁতিয়া, চলো, কাহেশে ঝুঁটি

এই গানের যেখানটায় 'লকড়ী জ্বলি কোরেনা ....,
কোয়েন যে খাক হুই,
ম্যায় প্রেমী এয়সি জ্বলি,
না ওই কোয়েলা, না ওই খাক রে...

এত সুন্দর করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়েছিলেন যে, সেদিনের সন্ধ্যার সেই গান আজও বাজছে আমার কানে।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব সঙ্গীত জগৎ থেকে চিরকালের মতন অন্তর্হিত হয়েছেন। এখন একষট্টি বছর হলো, কিন্তু সঙ্গীতের ভুবনে তার যে স্থান, তা আজও অবিচলিত রয়েছে। ঐরকম সুরেলা, গুরু-গম্ভীর, উদাত্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে রঙ্গিলা ও আগ্রা ঘরানার সংমিশ্রণে যে অপূর্ব গায়কী তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তা আজও তুলনারহিত, এবং সেই জন্যেই তার মৃত্যুর পরেও তিনি গানের জগতে অনন্য সাধারণ হয়ে অত্যন্ত জীবন্ত। ❖



জীবন

এই তো আমি

কণ্ঠশিল্পী সামিনা চৌধুরী। বাংলা সঙ্গীতের ভুবনে সুরের সারথি হয়ে আছেন তিনি। শ্রোতানন্দিত এ শিল্পী বাঙালির অন্যতম প্রিয় কণ্ঠস্বর হয়েছেন তার মাধুর্যময় গানে গানে। শিল্পীর জীবনও বর্ণাঢ্য। সামিনা চৌধুরী বলেছেন স্মৃতিময় জীবনের কিছু কথা। গ্রন্থনা **রাসেল আজাদ বিদ্যুৎ**

সামিনা চৌধুরীর ছবি তুলেছেন **রাজিব পাল**

ধরণীতে প্রথম চিৎকার

২৮ আগস্ট ১৯৬৬ সাল। দিনাজপুরের গণেশতলায় শোনা গেল এক শিশুর চিৎকার। জঠর যন্ত্রণার অবসান হলো রাশেদা চৌধুরীর। যিনি আমার মা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা। সেদিন মাহমুদুন্নবীর ঔরসের দ্বিতীয় সন্তানকে পৃথিবীর আলোয় এনেছিলেন তিনি। আমিই সেই শিশু, সেদিন জন্মোল্লাস কিংবা অজ্ঞাত কারণে যে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। জানান দিয়েছিল, আমি এসেছি, তোমরা বরণ করে নাও। রাজা-বাদশাদের মতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে না হলেও ভালোবাসা দিয়ে আমাকে বরণ করেছিল সবাই। সেই সঙ্গে নানা গোলাম কাদের চৌধুরীর বিশাল বংশলতিকায় যোগ করেছিল আরেকটি নাম, সামিনা নবী।

প্রিয় শৈশব

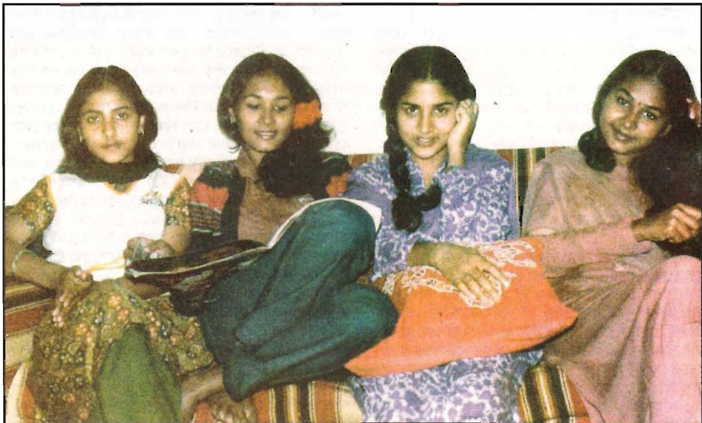
সামিনা নবী থেকে সামিনা চৌধুরী হতে অনেকটা সময় পাড়ি দিতে হয়েছে। তারও আগে আমাকে সবাই ডাকত সুমা নামে। পুরো শৈশব কেটেছে এই নামটির ডাক শুনে। ক্ষণে ক্ষণে শুনতে হতো, সুমা কী করছো; এই দুষ্টুমি করবে না; বড়দের সঙ্গে নয়, ছোটদের সঙ্গে খেলতে যাও– এমন অসংখ্য বাক্য। কারণ সুমা দিনভর কী করছে না করছে সেদিকে নজর রাখত অনেকে। একটু দুষ্টু ছিলাম বলেই হয়তো এত নজরদারি। কৈশোরে তো পুরোপুরি টমবয় বনে গিয়েছিলাম। সে কথা পরে, আগে বলি শৈশবে কেমন বাউণ্ডুলে ছিলাম। টো টো কোম্পানির মতো ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগত। বিশেষ করে নানাবাড়ি দিনাজপুর গেলে তো কথাই নেই। সাত খালার এক দল ছেলেমেয়ে একজোট হয়ে কত কী করতাম, তার হিসাব মেলা ভার। কুয়োর পানি তুলে একে ওকে ভিজিয়ে দেওয়া, পেকে যাওয়ার আগেই সবাই মিলে কাঁচা কুল খেয়ে গাছ উজাড় করে দেওয়া, তরুণ বয়সের পেয়ারা, ডালিমকে দাঁতের তলায় পিষে ফেলা ছিল নিত্যদিনের বিষয়। শীতের সময় ক্ষণে ক্ষণে চলত পোয়া পিঠা খাওয়া। পিঠা বানানোর সময় প্রায়ই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেত। খালামনি কিংবা যেই পিঠা বানান না কেন, দল বেঁধে চুলোর পাশে বসে থাকতাম। কার আগে কে ছিনিয়ে নেবে পিঠা, তারও অঘোষিত একটা প্রতিযোগিতা চলত। আবার যখন একা থাকতাম, তখন ছাগল ধরে এনে পাতা খায়ানো, মোমবাতি পুড়িয়ে ভাঙা চুড়ি জোড়া লাগানো কিংবা প্রিয় দোলনচাঁপা ফুল খুঁজে খুঁজে সময় কাটাতাম। আহ্, সেই শৈশব আর কি ফিরে পাওয়া যাবে? যাবে না বলেই আজও স্মৃতি রোমন্থনে ডুবে যেতে ভালো লাগে।

মিষ্টি নই, দুষ্টু কিশোরী

একটু কল্পনা করুন– জিন্স প্যান্ট, শার্ট পরে ডাকাবুকো স্বভাবের একটি কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে, আপনাকে পাত্তাই দিচ্ছে না, তাহলে তাকে কী বলবেন? দুরন্ত কিশোরী? টমবয় বললেও ভুল হবে না। আমার সাজপোশাক ছিল এমন, যাকে বাঙালি নয়, মনে হতো ঠিক যেন ওয়েস্টার্ন ছবির কোনো চরিত্র। আমি আর নুমা [ফাহমিদা নবী], যখন রিকশা করে আজিমপুর অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে যেতাম, তখন অনেকে তাকিয়ে থাকলেও কাছে এসে কথার বলার সাহস পেত না। অথচ বাসায় যত অতিথি আসতেন, তাদের কেউ কেউ ভাবতেন মেয়ে হিসেবে আমি হয়তো মিষ্টি স্বভাবের। এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার বাবা প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মাহমুদুন্নবী ছিলেন সাদামাটা জীবনের বাহক। তার আত্মজাও একই রকম সরল মিষ্টি স্বভাবের হবেন, সেটা ভেবে নেওয়া দোষের কিছু হবে না। কিন্তু আমি যে মিষ্টি নই দুষ্টু কিশোরী, তা অতিথি আগন্তুকদের অনেকে জানতেন না। আমরা সব ভাইবোনই ছিলাম খানিকটা হুল্লোড়ে স্বভাবের। যে কারণে শোরগোলের মধ্য দিয়ে শৈশব-কৈশোর কেটেছে আমাদের। শুধু আমি নই, নুমা, অন্তরা, পঞ্চমও যে যার মতো দিনভর ছুটে বেড়াত। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠতেই জড়ো হতো একদল বন্ধুবান্ধব। এরপর পাশের বাড়ির পেয়ারা, কুলসহ যত ফল-ফল আছে তা চুরি করে চলত হল্লাবাজি। একদিন তো ধরাই পড়ে গেলাম। লাইনে দাঁড় করিয়ে বাড়ির কর্তা এক এক করে সবার নাম-পরিচয় জানতে চাইলেন। এরপর আমাদের পরিচয় পেয়ে খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, তোমরা মাহমুদুন্নবীর মেয়ে! তার মতো সরল সাদাসিধে মানুষের মেয়ে হয়ে তোমরা... এ কথায় লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কখনও এমন কাজ করব না। শুধু প্রতিজ্ঞা নয়, খানিকটা বদলেও ফেলেছিলাম নিজেকে। এখন মনে হয়, যদি আবার কৈশোরে ফিরে যেতে পারতাম, তবে নিশ্চিতভাবে প্রতিজ্ঞা ভাঙতাম। তোয়াক্কা করতাম না অপরাধের। কারণ হারানো দিনের সেই বর্ণিল মুহূর্তগুলো কেনোকিছুর বিনিময়েই যে আর পাওয়া যাবে না।

উদাসীন বাবা আর সংগ্রামী মা

বাসার সামনে বেবিট্যাক্সি এলেই শুরু হতো হুল্লোড়। সব ভাইবোন মিলে হুড়োহুড়ি করে দিতাম ছুট। জানতাম, ট্যাক্সিতে বাবা ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারেন না। ব্যস্ত দিনের ক্লান্তিকে পায়ে ঠেলে রোজ হাসিমুখে বাসায় ফিরতেন বাবা। তাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, বিশ্বজুড়ে কত ওলট-পালট কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। কারণ তার মুখে থাকত অনাবিল প্রশান্তির ছায়া। খালি হাতে বাসায় আসতেন না বলেই আমরা দিনভর তার প্রতীক্ষায় থাকতাম। ছোট ছোট প্রাপ্তিতে ছিল আমাদের অফুরন্ত আনন্দ। বাবাও হয়তো আবদার পূরণের মধ্য দিয়ে খুঁজে নিতেন এক টুকরো প্রশান্তি। সারাদেশের মানুষের কাছে তিনি এক খ্যাতিমান ব্যক্তি। লোকমুখে শোনা যেত, তিনি সঙ্গীতাঙ্গনের উজ্জ্বল তারকা। তুমুল জনপ্রিয় এক কণ্ঠশিল্পী। 'আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে', 'আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন', 'ও মেয়ের নাম দেব কী', 'গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে', 'তুমি যে আমার কবিতা'সহ অজস্র গানের মধ্য দিয়ে তিনি জয় করেছেন লাখো মানুষের হৃদয়। অথচ আমরা জানতামই না মাহমুদুন্নবীর নামে শ্রোতামহলে এত জয়জয়কার! কৈশোরে তিনি ছিলেন কেবলই আমাদের বাবা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা। আমার বাবার মতো আর কেউ না, কখনও হবে না– এই ছিল ধ্যান-ধারণা। এরপর কৈশোরের খোলস ছেড়ে যখন বেড়ে উঠতে থাকলাম, তখন একটু একটু করে জানলাম, তিনি কত বড় সঙ্গীত পূজারি! এখন ভাবলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয় যে, তার মতো একজন শিল্পীর কাছে সঙ্গীতের অক্ষরজ্ঞান পেয়েছি। সন্ধ্যা হলেই শুরু হতো আমাদের সঙ্গীত পাঠ। নুমা [ফাহমিদা নবী] মনোযোগী ছাত্রী হলেও আমার ছিল ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস। সহজে গান করতে চাইতাম না। বাবা তখন স্নেহের হাত বুলিয়ে রেওয়াজে বসাতেন। 'শাসন' নামক শব্দটা হয়তো তার অভিধানে ছিল না। থাকলেও তা হাসিমুখের আড়ালে ম্লান হয়ে যেত। অবাক করার মতো বিষয় হলো, সে মানুষটার প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকার পরও খানিকটা দূরে দূরে থাকতাম। কিছুটা ভয় আর সম্মানের কারণেই হয়তো এটা করতাম। আজ যখন নিজের সন্তানদের দেখি, তখন অবাক হই। বীরবল ও তেজি তো ছোটবেলা থেকেই বাবা-মার বন্ধু হয়ে গেছে। তাই ভয়-ডরের বালাই নেই কোনো। অবশ্য সময় অনেক কিছুই বদলে দেয়। কেবল বাবার ক্ষেত্রেই বিষয়টা ছিল ভিন্ন। আজীবন নিজেকে তিনি রেখেছিলেন সাধারণ মানুষের কাতারে। ছিল না আত্মঅহঙ্কার। সবকিছুকে সাদা চোখে দেখতেন। যখন চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক শুরু করি তখনও আমাকে নিয়ে বড় কোনো প্রত্যাশা ছিল না। জানতেন গান ভালোবাসি, সুযোগ পেয়েছি তাই প্লেব্যাক করেছি। তাই উচ্চাশা নিয়ে লোকসমাজে গালগল্পে মাতেননি। হতে পারে এ বিষয়টিই আমাদের মনে


বন্যা খালা, নুমা ও সীমা খালার সঙ্গে আমি

ছায়া ফেলেছে। সে কারণে আমরা ভাইবোনরা সঙ্গীত নিয়ে অনেকটা পথ পাড়ি দিলেও অহমিকামুক্ত থাকতে চেয়েছি। অংশ নিইনি তারকা হওয়ার দৌড়ে।

বাবা ছিলেন উদাসীন মানুষ। তাই ঘর সংসারের সমস্ত দায়ভার মার কাঁধে চেপে বসেছিল। মা ভালোভাবেই জানতেন, যে মানুষ গানের জন্য এতটা নিবেদিত, তার কাঁধে সংসারের বোঝা চাপিয়ে দিলে হয়তো তার শিল্পীসত্তার মৃত্যু হবে। গানপাগল এই সরল মানুষটার জন্য তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। যে মানুষ গান গাইবার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে পরীক্ষার ফি নিয়ে করাচি চলে যান, তাকে আর যাই হোক গান থেকে বিরত রাখা যায় না। তাই মা সংসার-ধর্ম পালন আর ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি নিজেও চমৎকার গাইতে পারতেন, কণ্ঠও অসাধারণ। তার পরও সংসারের দিকে তাকিয়ে শিল্পী হওয়ার বাসনাকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। দু'যুগ আগে বাবা যখন আমাদের ছেড়ে চলে যান, তখন এক শূন্যতা আমাদের আঁকড়ে ধরেছিল। মা সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝাকে মাথায় তুলে নিয়ে আমাদের মনে সাহস জুগিয়েছেন।


মায়ের সঙ্গে আমরা ভাই-বোনেরা

আলো অন্ধকারের গল্প

আশপাশের প্রতিটি বাড়ি থেকে প্রতিদিনই লোকজন উঁকি দিত আমাদের বাসায়। তাদের চোখেমুখে থাকত আকাঙ্ক্ষা আর বিস্ময়। কেউ কেউ দেখা হলে বলতেন, তোদের বাড়িতে তো আলোর অভাব নেই, দিন কি রাত, তারার আলোয় আলোময় হয়ে থাকে। তখন তাদের এই হেঁয়ালি বুঝতাম না। আমাদের বাসার দিকে এত আগ্রহভরে তাকিয়ে থাকা নিয়েও মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু তাদের সঙ্গে একটা বিষয়ে মিল ছিল, আমাদের বাসার অতিথি দেখে তারা যেমন খুশি হতো, আমরাও তেমনি আনন্দ পেতাম। কাল এসেছিলেন সৈয়দ আবদুল হাদী, আজকে আরেক খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন– বিস্ময় নিয়ে অনেকে যখন কেউ আমাদের আগন্তুকদের নিয়ে এভাবে বলতেন, শুনে মজাই পেতাম। কেবল এই শিল্পীরাই নন, বাবার স্নেহধন্য শিল্পী নিয়াজ মোহম্মদ চৌধুরী, রফিকুল আলম, শাম্মী আখতার থেকে শুরু সে সময়ের আলোচিত ও জনপ্রিয় প্রায় সব শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালকরা আমাদের বাসায় আসতেন। বাবার কাছে তারা যেমন আপন মানুষ ছিলেন, তেমনি তারা ছিলেন বাবার কাছের মানুষ। ভালোবাসার মানুষের যেমন অভাব ছিল না, তেমনি ছিল না ঈর্ষাপরায়ণ মানুষের অভাব।

বাবা যখন কণ্ঠশিল্পী হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেলেন, তখন থেকে তাকে নিয়ে শুরু হয় নোংরা রাজনীতি। 'দি রেইন' ছবির 'আমি তো আজ ভুলে গেছি সবই' গানের জন্য তিনি এই পুরস্কার পেয়েছিলেন। যা অনেকের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরবর্তীকালে তিনি যেন আর কোনো জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার না পান, তার জন্যও অনেকে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। নোংরা রাজনীতির শিকার হয়ে বাবা অসম্ভব দুঃখ পেয়েছিলেন। সিনেমায় গান গাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষমেশ জীবিকার তাগিদে তিনি বিসিকে চাকরি নেন। তবু বাবা কখনও কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেননি, মনের মধ্যে পুষে রাখেননি কোনো ক্ষোভ। বাবা তার জীবদ্দশাতেই দেখে গেছেন মানুষের আলো আর অন্ধকারের দুটি দিক। তবু তিনি অহিংসার নীতিতেই বিশ্বাস রেখেছেন। আমরাও তার কাছে সে শিক্ষাই নিয়েছি। আজ তাই ঘৃণা করি হিংসা আর স্বার্থপরতাকে। বিসর্জন দিতে শিখেছি লোভ-লালসাকে। সৃষ্টিকর্তার কাছে যা পেয়েছি, তাতেই সন্তুষ্ট হতে শিখেছি।

ক্ষণে ক্ষণে ঠিকানা বদল

মনে হতো শরীরে শিকড় গজিয়েছে, সহজে উপড়ে ফেলা যাবে না। তবু তা করতে হয়েছে। একবার দু'বার নয়, বাবা বেঁচে থাকাকালীন এ কাজটি করতে হয়েছে ১৫ বার। হতে পারে তা ছিল ইট-কাঠের চার দেয়াল। সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা গড়িয়ে সেই বাসভূমে যখন রাত নামত, তখন তা একান্তই পেয়েছিলাম। এক কথায় শিল্পী জীবনের শুরু এখান থেকেই। দিনগুলোও হাসি-গানে কাটছিল। ততদিনে নিশ্চিত হয়েছি, আর কখনও শেকড় উপড়ে ঠিকানা বদল করতে হবে না। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, সেখানেও স্থায়ী হতে পারলাম না আমরা। মানুষের নিষ্ঠুরতায় পরাস্ত হতে হলো। হঠাৎ করেই একদিন গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেওয়া হলো আমাদের। সেই ভয়ঙ্কর দিনের ছবি আজও চোখে ভাসে। ঠিক মাঝদুপুর। বাবা, মা দু'জনেই বাইরে। এমন সময় কয়েকজন গুণ্ডা এসে অতর্কিত হামলা চালাল। আমরা প্রাণভয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। হামলাকারীরা বাসার সমস্ত জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। দখল হয়ে গেল এম ফাইভ। বাবা-মা ফিরে এলেন। স্তম্ভিত হলেন নিষ্ঠুর এই দৃশ্য দেখে। কোনো বাদ-প্রতিবাদে গেলেন না। পরে বুঝেছি, থানা পুলিশ করতে গেলে ছেলেমেয়েদের ওপর অতর্কিত হামলা হতে পারে ভেবে বাবা নীরব ছিলেন। অধিকার নিয়ে কোনো আওয়াজ না তুলে সন্ধানে নেমেছিলেন নতুন এক আশ্রয়ের। শেষমেশ আশ্রয় মিলল তাজমহল রোডের এক বাড়িতে।

এ কোন আলো লাগল চোখে



আমার পরিবার আমার জগৎ

আপন হয়ে ধরা দিত। যতদিন থেকেছি, ততদিন তেমন কোনো টান অনুভব করিনি। যখন ঠিকানা বদলের ঘোষণা এসেছে, তখনই অনুভব করেছি, অজানা এক শেকড়ের টান। মনের পর্দায় ভেসে উঠেছে এক ছাদের নিচে কাটানো বহুদিনের অসংখ্য স্মৃতি। এ বছর গোপীবাগ তো, অন্য বছর হাতিরপুল, আবার এলিফ্যান্ট রোড কয়েক বছর থাকতে না থাকতেই শুরু হলো আবার বাসা বদলের হাঙ্গামা। এভাবে বাসা বদল করতে করতে পুরো রাজধানী চক্কর দেওয়া হয়ে গেছে। অনেক ঘুরেফিরে শেষমেশ আমাদের ঠিকানা হলো মোহাম্মদপুরে। সরকারের তরফ থেকে নূরজাহান রোডে একটা কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছিল। সেই এম ফাইভ কোয়ার্টারে কেটেছে জীবনের অনেকটা সময়। সেখানে থাকাকালীন বেশ কিছু গানে কণ্ঠ দেওয়ার সুযোগ

সত্যি বলতে কী, আমি কী হবো, তা নিয়ে শৈশব-কৈশোর-যৌবনে কখনও কোনো ভাবনা ছিল না। এখনও যেমন আট-দশজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করছি, তখনও এমন জীবনের প্রত্যাশা করেছি। শিল্পী হওয়ার কথা তো স্বপ্নেও ভাবিনি। ভাবতাম, ডাক্তার হতে পারলে খুব ভালো হয়। মানুষের সেবা করার সুযোগ পাব। কিন্তু কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? যে সঙ্গীতবলয়ে বেড়ে উঠেছে, সে শিল্পী ছাড়া অন্য কিছু হতে পারবে না, বিধাতা হয়তো সেটাই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। নইলে কৈশোরেই প্লেব্যাক করার সুযোগ পেতাম না। ছোটবেলায় নাটক করেছি, রেডিওতে শিশুদের অনুষ্ঠানে সংবাদ পাঠ করার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। যখনই গানের প্রসঙ্গ এসেছে, পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছি। এমন নয় যে গানের প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা ছিল না। ছিল, তবে

শিল্পী হওয়ার কোনো বাসনা লালন করিনি। নুমা চমৎকার গাইত, এখনও গায়। শৈশব থেকেই আমি নুমার গায়কীর ভক্ত। চাইতাম নুমা গাইবে, আমি তার সঙ্গে কি-বোর্ড বাজাবো। সে ইচ্ছা থেকেই লাকী চাচার [লাকী আখন্দ] কাছে কি-বোর্ড শিখেছি। অথচ হঠাৎ করেই সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। বাবার অবাধ্য এই সঙ্গীত শিক্ষার্থীকে অংশ নিতে হলো 'নতুন কুঁড়ি' প্রতিযোগিতায়। তখন সবে মাত্র ওস্তাদ মোশাদ আলীর কাছে গানের হাতেখড়ি হয়েছে। কেমন গাইব, তা নিয়ে ভাবার অবকাশ ছিল না। অনেকটা হুজুগে পড়েই প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছিলাম। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে দেশাত্মবোধক গানে অর্জন করেছিলাম প্রথম স্থান। এই



আশা ভোঁসলের আশীর্বাদ নিয়ে

সাফল্যে অন্যদের চেয়ে আমি নিজেও কম বিস্মিত হয়নি। বিস্মিত হয়েছিলাম আরও একবার যখন আলাউদ্দিন চাচা [আলাউদ্দিন আলী] প্লেব্যাক করার কথা বলেছিলেন। স্কুলের গণ্ডি পেরুনোর আগেই প্লেব্যাক করব– এটা ছিল ভাবনার অতীত। আলাউদ্দিন চাচার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিতে হয়েছিল। সেটা ছিল ১৯৮১ সাল। ক্লাস এইটের ছাত্রী আমি। ঘরের বারান্দা ঝাড়ু দিচ্ছিলাম। এমন সময় আলাউদ্দিন চাচা এলেন। এসেই মাকে বললেন, 'ভাবি, আপনার মেয়েকে নিয়ে গেলাম'। আমাকে বললেন, চলো সুমা। ফ্রক পরা অবস্থায় চলে গেলাম স্টুডিওতে। আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন আমজাদ হোসেন চাচার লেখা একটি গান। আলাউদ্দিন চাচা সুরটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন গাও। সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইলাম। রেকর্ড হয়ে গেল 'জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো' গানটি। সেই সঙ্গে প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটল। একই সঙ্গে এই গান আমার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াল। কারণ এর ক'দিন পর বুলবুল ভাই [আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল] এসেও প্লেব্যাক করার প্রস্তাব দিলেন। বাবার কাছের মানুষ না বলার ক্ষমতা ছিল না। সে জন্য গাইতেই হলো। গাইলাম আমার বুকের মধ্যেখানে...। এ গানটি রেকর্ড করা হয়েছিল 'নয়নের আলো' ছবির জন্য। অবাক করা বিষয় হলো এই দুই ছবিতে গান গেয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলাম আমি। যার কারণে পরিস্থিতি এমন হলো, যাকে কবির ভাষায় বলতে হয়–

এ কোন আলো লাগল চোখে,
হয়ে গেলাম অন্ধ,
সামনে নাকি পেছনে যাব,
তাই নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।।

অনেকে যখন আমার গানের প্রশংসা করছেন, তখনও শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিনি। প্রথম যেদিন রেডিওতে নিজের গান শুনি, তখন নুমাকে বলেছিলাম, নুমা এটা আমার কণ্ঠ! ছিঃ এতো পচা আমার কণ্ঠ, আগে জানলে তো গাইতামই না। মা বলতেন, কণ্ঠ ও গায়কী লতা মঙ্গেশকরের মতো না হলে গান গেয়ে লাভ কী? কিন্তু কে শোনে কার কথা। পরিচিত মানুষদের না বলার সাহস হয় না। চাওয়া-পাওয়ার হিসাব-নিকাশ ভেস্তে দিয়ে আমাকে গাইতেই হয়। আল মনসুর ভাইয়েরও এমনই এক অনুরোধ রাখতে গিয়ে গাইতে হয়েছিল বিটিভিতে। সেটা ছিল ১৯৮২ সালের ঘটনা। ১৫-২০ বছরের বড় হলেও বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে ছিল অন্যরকম বন্ধুত্ব। আমরা একসঙ্গে ঘুরতাম, নাটক দেখতাম, অভিনয়ের রিহার্সাল করতাম। সেই সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া করতাম। একদিন এমন ঝগড়া হলো যে, তার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিলাম। এরপর মনসুর ভাই বাসায় এসে হাজির। মান ভাঙাতে নয়, তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। আমাকে দিয়ে গান গাওয়ানো। আমাকে বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তাই নুমার আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাকে শুনিয়ে তিনি বললেন, 'নুমা, সুমারে কও এই গানটা একটু তুলে নিতে।' আমি তার কথা রাখতে মোটেও রাজি নই। অনেক অনুরোধ আর নুমার মধ্যস্থতায় শেষে গাইতে রাজি হয়েছিলাম। অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'শিউলিমালা'। সেখানে গেয়েছিলাম মনসুর ভাইয়ের লেখা আমিনুল ইসলাম নিঝুর সুরের 'ফুল ফোটে ফুল ঝরে' গানটি।

টিভিতে গান গাওয়া শুরু হলেও অ্যালবাম নিয়ে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। ১৯৮৬ সালে কীভাবে কীভাবে যেন সে কাজটিও করে ফেললাম। অবশ্য অ্যালবামের কাজ শুরু হয়েছিল তারও দু'বছর আগে ১৯৮৪ সালে। সঙ্গীতশিল্পী জানে আলমের সঙ্গে একদিন বাসায় এসেছিলেন সুরকার নকীব খান। জানালেন, তারা আমাকে নিয়ে একটি অ্যালবাম করতে চান। শুরুতে যে কোনো বিষয়ে নিয়ে না না করা ভাব করা আমার স্বভাব। তাই অ্যালবামের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলাম। অনেক অনুরোধের পর একপর্যায়ে রাজি হয়ে যাই। তারপর একটার পর একটা গান তৈরি হতে থাকে। এই কাজ করতে গিয়েই নকীব ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় গাঢ় হতে হয়। পারিবারিক বন্ধু হয়ে ওঠেন তিনি।

দুই বছরের কাঠখড় পুড়িয়ে স্বনামে প্রকাশ পায় আমার প্রথম অ্যালবাম। এরপর থেকে প্লেব্যাক, টিভি, অ্যালবামসহ সব মাধ্যমেই বেড়ে যায় ব্যস্ততা। না চাইতেই পেয়ে যাই নাম-খ্যাতি-যশ। তারপরও কখনও সস্তা জনপ্রিয়তার জোয়ারে গা ভাসাইনি। কারণ বাবা আমাদের বলতেন, 'পায়ের নিচের মাটি শক্ত না হলে কখনও তুমি দাঁড়াতে পারবে না।' এ কথা মেনে নিয়ে শিল্পীসত্তাকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই



আমার প্রিয়

ব্যক্তিত্ব : মা রাশেদা চৌধুরী ও শ্বশুর মজিবর রহমান খান
মুখ : মা ও সন্তান
স্থান : পুরো পৃথিবী
অভিনয় শিল্পী : ফেরদৌসী মজুমদার, রেখা, আল মনসুর
কণ্ঠশিল্পী : আশা ভোসলে, লতা মঙ্গেশকর, মাহমুদুন্নবী, ফরিদা পারভীন, গোলাম আলী
লেখক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খাবার : চাইনিজ
রঙ : সাতরঙ
পোশাক : স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি এমন যে কোনো পোশাক

নয়, আমি আর নুমা নকল গান গাইব না বলে ঘোষণা দিয়েছিলাম। প্রায় দশ বছর আমরা কোনো ছবিতে প্লেব্যাক করিনি। তবু নিজ সিদ্ধান্তে ছিলাম অনড়।

অসমাপ্ত গল্পে আমি ও আমরা

মানুষটাকে দেখি আর অবাক হই। ভাবি, এতদিকে সামাল দেয় কীভাবে? তিন-তিনটি টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ করেও ক্লান্তি নেই। ঘরে ফিরে বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প কিংবা আড্ডা, কখনও রান্না করে খাওয়ানো, এর-ওর খবরা-খবর নেওয়া থেকে শুরু করে একটি সংসারের যাবতীয় যা দায়িত্ব আছে সবই পালন করে সে। এজাজ খান স্বপন নামের এই মানুষটির সঙ্গে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না ভাগাভাগি করতে করতে কখন যে ২৩ বছর পেরিয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। বিয়ের আগে থেকেই আমাদের পরিচয়। তাই একে অপরকে কাছে থেকে জানার সুযোগ হয়েছিল। এর পরই সিদ্ধান্ত নেই বাকি জীবন আমরা একসঙ্গে কাটাব। কেবল স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নয়, বন্ধু হয়ে একসঙ্গে পথ চলতে চেয়েছি আমরা। বন্ধু হয়েই এতটা পথ পাড়ি দিয়েছি আমরা। মনে পড়ে সেই দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা; স্বপন কয়েকজনের কাছে থেকে ৩৮ লাখ টাকা সংগ্রহ করে একটি রিয়েলিটি শো' নির্মাণ শুরু করেছিল। কিন্তু চ্যানেলের জন্য কাজ করেছিল, তারা সব টাকা আত্মসাৎ করে ফেলে। ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে তখন আমাদের দিশেহারা অবস্থা। তবু ভেঙে পড়িনি। কারণ আমার শ্বশুর মজিবর রহমান খানের কাছে শিখেছিলাম মনকে শক্ত রাখার মন্ত্র। আমার আদর্শ তিনি। সেইসঙ্গে জীবনযুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণাদাতা। শুধু স্বপন নয়, আমি নিজেও মানুষের কাছে বহুবার প্রতারিত হয়েছি। দেখেছি, আমাকে দমিয়ে রাখার কূটকৌশল, স্টেজ শো কিংবা কোন গান কেড়ে নেওয়া। তবু নীরব থেকেছি। আস্থা রেখেছি সৃষ্টিকর্তার ওপর। কারণ আজ আমার যে শিল্পী পরিচয়, তার জন্য কখনও সংগ্রাম করতে হয়নি। অনেক কিছু না চাইতেই আমার জীবনে ধরা দিয়েছে। এ সবই হয়তো ঈশ্বরের মহিমা। আমিও তাই আমার সন্তানদের তেজি ও বীরবলে মাথায় প্রত্যাশা বোঝা চাপিয়ে দেইনি। চাই কেবল ওরা স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠুক; হোক মানুষের মতো মানুষ। তাই ওদের বলি, 'নাম-যশ-খ্যাতির পেছনে কখনও ছুটতে নেই। কারণ সৃষ্টিকর্তা না চাইলে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলা। কারণ জীবন যত বর্ণময়, ততই এর পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে অপার রহস্য। ❖

ছবি : সামিনা চৌধুরীর ব্যাক্তিগত অ্যালবাম থেকে নেওয়া।

এক ঝলক

নাম : সামিনা চৌধুরী
ডাকনাম : সুমা
জন্ম তারিখ : ২৮ আগস্ট ১৯৬৬
জন্মস্থান : দিনাজপুর [নানাবাড়ি]
বাবা : মাহমুদুন্নবী
মা : রাশেদা চৌধুরী
ভাইবোন : ৩ বোন ১ ভাই
বিয়ে : ৪ নভেম্বর ১৯৯৩
জীবনসঙ্গী : এজাজ খান স্বপন
সন্তান : কন্যা ফাবাহসির জাহান খান [তেজি] ও পুত্র মাহদীন নবী [বীরবল]
শখ : গিটার ও কি-বোর্ড বাজানো, চুল কাটা বা কাউকে সাজিয়ে দেওয়া, কাপড়ে নকশা আঁকা ইত্যাদি
ভালো লাগে : ছবি আঁকা
খারাপ লাগে : মিথ্যা বলা
ঘৃণা করি : ঈর্ষা, স্বার্থপরতা
ভয় পাই : সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে
এড়িয়ে চলি : অন্ধমোহে ছুটে চলা
প্রথম গান : জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো [প্লেব্যাক]
আনন্দের স্মৃতি : শৈশব-কৈশোরের অসংখ্য স্মৃতি
বেদনার স্মৃতি : আমার বাবা মাহমুদুন্নবী ও তৃতীয় সন্তানকে হারানোর বেদনা কখনই ভুলবার নয়
অবসর কাটে : গান গাওয়া; প্রিয়জনের সঙ্গে আড্ডা, পড়াশোনা, ছবি আঁকা থেকে শুরু নানা ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে
গর্ব হয় : মাহমুদুন্নবী ও রাশেদা চৌধুরীর সন্তান হিসেবে জন্ম নেওয়ায়
জীবনটা যেমন : বৈচিত্র্যময়
আবার জন্ম নিলে : সামিনা চৌধুরী হতে চাই



মঞ্চায়নের পোশাকে শিশু কিশোরীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐতিহ্যের পোশাক



ফ্যা শ ন

মগধের কথা পাওয়া যায় রামায়ণ ও মহাভারতে। মগধ একটি প্রাচীন ইন্দো-আর্য রাজ্য। বাংলার বেশিরভাগ অঞ্চল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে শক্তিশালী রাজ্য মগধের অংশ ছিল। এ দেশের ঐতিহ্যের পোশাক বলতে গেলে ওই আমল চলে আসার কারণ, পোশাকশৈলী সময়ের সম্পর্কে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, গ্যাজেটবন্দি এ যুগে ফ্যাশনেবল পোশাক যখন অনলাইনে বসেই ক্রয়যোগ্য, সে পরিবর্তনটাও সময়ের সঙ্গে এসেছে সেই প্রাচীন আমল থেকে। সভ্যতার দায়ে উন্নত হয়েছে পোশাকের ভাব-চেহারা, গুণ-মান। এক যুগ থেকে অন্য যুগের কাপড় টেকসই বেশি বা পাতলা বেশি। অথবা কয়েক যুগ পরে একদম পরিবর্তিত হয়েছে পোশাকের আকার-গড়ন। কিংবা শৈলী, নকশা ফিরে আসতে দেখা যায় কয়েক যুগ পর। কোনো যুগের রাজ পোশাকের ঢক-পদ আধুনিক যুগের জমকালো ফ্যাশন। ঐতিহ্যের কোনো পোশাক এভাবেই ফিরে এসেছে সময়ের সঙ্গে, ফ্যাশনের সম্পর্কে। পোশাকের কোনো রীতি আবার হারিয়ে গিয়ে নিবন্ধিত আছে ইতিহাসে মাত্র।

প্রাচীন পোশাকের হাবভাব ঠিক ফ্যাশন দিয়ে বিচার করার উপায় নেই। এর অর্থ নিহিত ফ্যাশন এবং শৈলী বা স্টাইলের সঙ্গাতে। ফ্যাশন হচ্ছে, কোনো স্টাইল বা শৈলী যখন মানুষের মধ্যে

একাধারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।এবং তাতে ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মগধের সময়ে শৈলী ছিল: ছিল না জনপ্রিয়তার প্রশ্ন। সে আমলের পোশাকে তাই ফ্যাশন না খুঁজে মাত্র শৈলীতেই বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এবার বলি স্টাইল বা শৈলীর কথা। শৈলী হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর বিশেষ কোনো আচরণ। তা হতে পারে বিশেষ নকশা বা আকৃতির কোনো পোশাক অথবা চুলের কোনো বিশেষ ঢক অথবা অন্য যে কোনো কিছুর বিশেষত্ব।

মূল কথায় আসা যাক আবার: মগধ সময়ের পোশাক। এ আমলে পুরুষ-মহিলা উভয়ের পরিধেয় তালিকায় একটি মাত্র পোশাকই দেখা যায়– শাড়ি অথবা ধুতি। তবে আকারেও ছিল তা খাটো পদের। পুরুষের ধুতি ছিল কেবলই হাঁটু থেকে নামানো। মহিলাদের শাড়ি ছিল হাঁটু এবং পায়ের টাকনির মাঝামাঝি। শরীরের ওপরের অংশ খোলা থাকত বেশিরভাগ সময়। শুধু উৎসব আনন্দে কখনও কখনও মহিলারা ওড়নাবিশেষ অথবা স্তন ঢাকার ব্লাউজ আকৃতির পোশাক ব্যবহার করত। শীতের সময় চাদর ব্যবহার করার কথা পাওয়া যায় ইতিহাসে। রাজা-রানীর বেলাতে একটু আলাদা। রাজাদের মাথায় মুকুট আবশ্যক। উভয়ের বেলাতেই ছিল অলঙ্কারের ব্যবহার। রানীদের কোমরে ভাঁজ করা কাপড় বিশেষ পরতে দেখা যায় ওই আমলের মূর্তিতে। আর তাদের জন্য মুকুট আবশ্যক না হলেও অনেক রানীর ক্ষেত্রেই তা প্রচলিত ছিল। এই প্রচলন প্রায় একইভাবে চলে আসে মধ্যযুগ জুড়ে। অর্থাৎ রাজা-বাদশা বাদে পোশাকের একটাই রীতি ছিল; প্রয়োজনের তাগিদে ন্যূনতম কাপড়াংশ।

১৭০০ থেকে ১৮০০ সালের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে নবাবদের কথা। ঐতিহ্যবাহী পোশাকেরও অসাম্য অংশ মেলে এই আমলে। এ সময়ে মানুষ ছিল সংকটপূর্ণ অবস্থায়।


উনিশ শতকের বাঙালি নারী


অভিজাত শাড়ি ও গহনায় বাঙালি নারী

আর এই শতকেই দেখা যায় প্রথম দুর্ভিক্ষ। তাই সাধারণ মানুষের পোশাকে খুব বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে নবাবি পোশাক ছিল ঐতিহ্যের অন্যতম ভিত। এ আমলে সাধারণ জনগণের পোশাক ছিল প্রায় একই ছকে বেঁধে দেওয়া কাপড়বিশেষ। এক পোশাকেই বছর বছর পার করত সাধারণেরা। মুসলিম পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল একখানা লুঙ্গি আর ফতুয়া বা কুর্তা আকৃতির জামাবিশেষ। তাও অধিকাংশ সময় কেবলই লুঙ্গি বা তহবন্দ পরেই থাকা হতো। মহিলাদের পরনে থাকত সুতির শাড়ি কাপড়। আর কিছু হাতে গোনা সচ্ছল মুসলমান পুরুষদের ইজার বা পা'জামা পরতে দেখা যায়। তবে এর ঠিক শ'বছর আগে এ অঞ্চলে বহিরাগত মুসলমানদের মাথায় পাগড়ি বিশেষ প্রতীক হিসেবে পরিলক্ষিত। কিন্তু এ অঞ্চলের আবহাওয়া মাথার পোশাক উপযোগী না হওয়ায় মুসলমানি পোশাক হিসেবে তা দিন দিন বিলীন হয়ে যায়। তবে সে রীতি নবাবি যুগ পর্যন্তও চালু থাকতে দেখা যায় বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে। ধারণা করা হয়, এখনকার বিয়ের পাগড়ি বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাগড়ির প্রচলন এভাবেই এসেছে। আর তৎকালীন নবাব বা নবাব পরিবারের পুরুষ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যেও পাগড়ির প্রচলন খুবই টেকসই ছিল। নবাবদের পাগড়ি ছিল এক প্রান্তে পালকের মতো ও পেছনের দিকটি কিছুটা খোঁপা আকৃতির। নবাবি আমলের শেষ হলেও পাগড়ির এই শৈলী অভিজাত পরিবারের মধ্যে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তবে নবাবের পোশাক যে বিশেষ কিছু ছিল– সে ধারণা আমাদের অধিকাংশেরই আছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বা অন্য সব নবাবই এক ধরনের বিশেষ লম্বা পোশাক পরতেন। এটিকে বলা হতো গলা-বন্ধ চাপকান। সঙ্গে জোব্বা, কোমরবন্ধ। আর নিম্নে পরতেন চুড়িদার পা'জামা ও চোখা উঁচু শুঁড়ের নাগরা জুতা। এতে ব্যবহৃত হতো সিল্কের জমকালো কাপড়। সে সময় থেকেই পোশাক বানানো ও সেলাই কাজে অভিজ্ঞ ছিল কিছু মুসলমানদের এক গোষ্ঠী। সেই সূত্র ধরে মূলত দর্জির কাজ আসে। সে সময়ে হিন্দুদের পোশাক বলতে ধুতি, কুর্তি ও সুতির শাড়ি কাপড়কেই ধরা হয়। বেশিরভাগ সময় পুরুষরা শুধু ধুতি পরেই দিন কাটাত। আর পোশাকের এই রীতি একনাগাড়ে বিশ শতক পর্যন্ত চোখে পড়ে।

বলাবাহুল্য, উনিশ শতকেও জুতার ব্যবহার জনসমাজের কাছাকাছিও পৌঁছেনি। এ সময়ে অঙ্কিত চিত্রকর্মে দেখা যায় ঈদের পোশাকের সঙ্গে মানুষের নগ্ন পদ। তবে পোশাকি



রবীন্দ্রনাথের দুই বড় ভাই ও তাদের স্ত্রীরা

ভাষা ছিল অনেকটা নবাব আমলের কাছাকাছি। মাথার পাগড়ি এ সময়েও ছিল উৎসবের অপরিহার্য সঙ্গী। আর পরনে আলখাল্লা। আলখাল্লা বলতে বোঝানো হয় লম্বা ও একটু ঢিলেঢালা পোশাকবিশেষ। সঙ্গে থাকত কোমরবন্ধ। কিন্তু এই পোশাকও তখন পর্যন্ত জনসাধারণের নাগালের বাইরে। তা বেশি দেখা যেত তৎকালীন ধনী মুসলমানদের মধ্যে। আর পোশাকের এই চিত্রকে বলা হয় মোগলাই বা হিন্দুস্তানি মুসলিম পোশাক। তবে উনিশ শতকের শেষদিকে পোশাকে বড় একটি পরিবর্তন চোখে পড়ে। সে সময়ে সমাজের প্রভাবশালীদের পাগড়ির বদলে তাজ মাথায় নিতে দেখা যায়। তাজ হচ্ছে জরি দিয়ে কাজ করা টুপিবিশেষ। তাজের প্রচলন পুরান ঢাকাতে এক-দুই যুগ আগেও ছিল রমরমা। তবে আধুনিক ফ্যাশনের যাঁতাকলে প্রায় হারিয়েই গেছে এই ঐতিহ্য। তাজের প্রচলন হওয়ার সময়ে প্রচলন ঘটে কোচানো ধুতি, ধোপদুরস্ত কামিজ, শান্তিপুরী উড়ুনি বা ক্রেপ এবং নেটের চাদরের। তার কয়েক বছরের মধ্যেই ঐতিহ্যের অন্যতম পোশাক কামিজের প্রচলন হয়। প্রথমে তা রামজামা নামে পরিচিত ছিল। সাধারণত লম্বাকৃতির কারণে এই পোশাককে রামজামা বলা হতো। পরবর্তীকালে আকারের পরিবর্তন ও নতুনত্ব আসতে থাকলে সেটিকে কামিজ বলা হতো। মূলত কামিজের সঙ্গে রামজামার পার্থক্য হলো, কামিজ বিভিন্ন উচ্চতার হতে পারে, কিন্তু রামজামা শুধু লম্বাই হয়। অর্থাৎ বর্তমানের লং কামিজবিশেষ তখনকার রামজামা। যতদূর জানা যায়, এই জামা থেকেই পাঞ্জাবির আগমন। পাঞ্জাবি আসার পর থেকে কুর্তা আর পাঞ্জাবির পার্থক্য করা হতো রঙ দেখে। মানে রঙবিহীন জামাকে বলা হতো কুর্তা। আর সে আমলের ছেলেদের কুর্তা এ যুগে ফ্যাশন হয়ে ফিরে এসেছে। তাই তখনকার যুগ থেকে এ যুগের ফ্যাশনে ফিরে আসা সবচেয়ে বড় পোশাক হিসেবে কুর্তাকে ধরা যায়। আর পোশাক তালিকায় প্রথম যোগ হয় মহিলাদের ব্লাউজ। তাও ছিল পরিবার বুঝে এবং বিশেষ সময়েই তা পরা হতো।

পোশাকে নিজদের শিকড়ের ঐতিহ্য বলতে আগের গল্পেই তা শেষ বলা যায়। কারণ, ১৯০০ সালের শুরু থেকে এ অঞ্চলে পশ্চিমা পোশাকের প্রভাব দেখা যেতে শুরু করে। শুরুতে ধুতির সঙ্গে শার্ট পরতে দেখা যায় পুরুষদের। এর অধিকাংশই ছিল হাফহাতা। এ আমলে রবীন্দ্রনাথ পরিবারে দেখা যায় আধুনিক ও দামি পোশাকের হাব-ভাব। পুরুষদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় গলাবন্ধ কোটের প্রচলন। গলাবন্ধ নবাবদের পরতে দেখা গেলেও এবেলায় তা একটু আধুনিকতার ছোঁয়া পায়। তাও ওই অভিজাত শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ ছিল। প্যান্টের প্রচলন ১৯৪০-এর আগে দেখা যায়নি বললেই চলে। এ সময়ে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে সনাতন শাড়ি। আর তখন বাইজিদের পরনে জমকালো ঘাগরা ও ওড়না পরিলক্ষিত। মহিলাদের শাড়ির নিচে পেটিকোট পরা শুরু হয় তখন থেকেই। তখন ব্লাউজ ছিল কিছুটা লম্বা হাতার। কিছু কিছু ব্লাউজের হাতা ও আটকানো গলায় অতিরিক্ত কাপড়ের ডিজাইন দেখা যায়। ঘটি হাতার ব্লাউজও পরতেন তখনকার মহিলারা। তখনও জনসাধারণে দেখা মেলেনি জুতা পরার রীতি। শাড়ির আঁচলে বৈচিত্র্য আসে প্রথম রবীন্দ্রনাথের আমল থেকে।

ঈদ, পূজার মতো উৎসবে মহিলারা দুল, মালা, চুড়ি পরতেন তখন। এটি অভিজাত পরিবার পেরিয়ে দিন দিন সাধারণে প্রবেশ করতে থাকে এ সময় থেকেই। ১৯২০ সাল বা এর পরের সময় থেকে মুসলমানদের মধ্যে কিছু সচ্ছল পরিবারে প্রথম সালোয়ার-কামিজ, ওড়নাসহ সম্পূর্ণ থ্রি-পিস পরতে দেখা যায়। বিশেষ করে ঈদের মতো উৎসবে বিশেষ সাজ থাকত এই পোশাক ঘিরে। পরা হতো বিভিন্ন অলঙ্কারও। দেশ স্বাধীনের পর থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সালোয়ার-কামিজের জনপ্রিয়তা। এটি পরে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা যায় এবং মুসলমান মেয়েদের ভালো পর্দা হয় বলেই প্রথমদিকে এর জনপ্রিয়তা খুব দ্রুত এগিয়ে যায়। আস্তে আস্তে তা হিন্দু মেয়েদের মধ্যেও ঢুকে পড়ে। আর আধুনিক যুগে তো তার ভেদাভেদ একদম লক্ষ্য করা যায় না। তবে প্রথমদিকে তা শুধু কিশোরীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিশ শতকের শেষদিকে এসে তা মাঝ-বয়সী থেকে শুরু করে বয়স্ক মহিলাদের মধ্যেও প্রচলিত। এবং এই আধুনিকতম সময়ে দাঁড়িয়ে কামিজ ও সালোয়ারে দেখা যায় ফ্যাশনের রকমারি ব্যবহার। কখনও সেই কামিজকে ক্যানভাস ধরে তাতে তুলে ধরা হচ্ছে কোনো ঐতিহ্যের প্রিন্ট বা কাপড়ের ধরন অথবা আকার-গড়ন। ব্লাউজের বেলাতেও তাই।

স্বাধীনতার পর ছেলেদের পোশাকেও দেখা যায় বড় পরিবর্তন। ধীরে ধীরে সবাই পশ্চিমা পোশাকের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। এবং বিশ শতকের শেষদিকে সরাসরি পশ্চিমা ফ্যাশন চর্চা শুরু হয় অভিজাত মহলে। দিন দিন তাদের বিভিন্ন সময়ের ট্রেন্ড ছড়িয়ে পড়ে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যেও। আর ২০০০ সালের শুরুতে পোশাকের সে পরিবর্তন পরিপক্ব হয়েছে বলা যায়। মানে এই সময়েই পশ্চিমাদের প্রায় সব রকম পোশাক আমাদের নিয়মিত পোশাকে রূপ নেয়। তবে শুরুতে তা একদম এলোমেলো হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে দেশীয় ফ্যাশন উদ্যোক্তাদের সুবাদে টিকে থাকে আমাদের ঐতিহ্য। অর্থাৎ এখন শাড়ি, পাঞ্জাবির মতো ঐতিহ্যবাহী পোশাকে আনা হচ্ছে বিশ্বায়নের ছোঁয়া। আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ট্রেন্ড অনুসরণ করে অন্যান্য দেশের মতো এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের ফ্যাশন বাজার। ❖

লেখা : আবদুল্লাহ আল কেমী ও আফসানা ফেরদৌসি